বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৯—পৌষ, ১৩৩৯

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ, ১৩৩৯—পৌষ, ১৩৩৯)

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ, ১৩৩৯—পৌষ, ১৩৩৯)

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ)



নদীতীরে

বিচিত্রা

শ্রাবণ, ১৩৩৯

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিচিত্রা

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৩৯	১ম সংখ্যা

বধূ-মঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম
গর্জ্জি উঠে ;
অতীত তিমির-গর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে :
উন্মেষিছে মহা ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব্ব পর্ব্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উড়ায় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্য্যোদয় পানে।

যে অদৃষ্ট, যে অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
দৃপ্ত বীরমূর্ত্তি ধরি', দেখিয়াছি,
তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপকরাগে সৃষ্টিবাণী মরণ-বিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা শ্রীমতী অমিতা দেবীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে রচিত

এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর মাঝে, বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে,
নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে,
চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ;
নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নব জীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উদ্ঘাটন।
ইতিহাস-বিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্ব দুঃখ-সুখে
দেশে দেশে যে বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে,
নরনারী হৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব ইতিহাসে ॥

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রাচীন কীর্ত্তি"

এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা গত মাসের বিচিত্রায় পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। পরে সৌভাগ্যবশতঃ কবির লিখিত সমগ্র পারস্য-ভ্রমণ-কাহিনীটি আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

বিশ্ব-ভারতী কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভ্রমণকাহিনীটি আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়া কবি আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক বিচিত্রা এবং অন্যান্য কাগজে বিজ্ঞাপিত কবির "পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ-কাহিনী" বিচিত্রায় প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন বহু চিত্রে শোভিত হইয়া এই "পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ-কাহিনী" বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে। "প্রাচীন-কীর্ত্তি" প্রবন্ধটি এই ভ্রমণ-কাহিনীর অংশ স্বরূপ পাঠকেরা যথাস্থানে ও যথাসময়ে পাইবেন।—বিঃ সঃ

পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

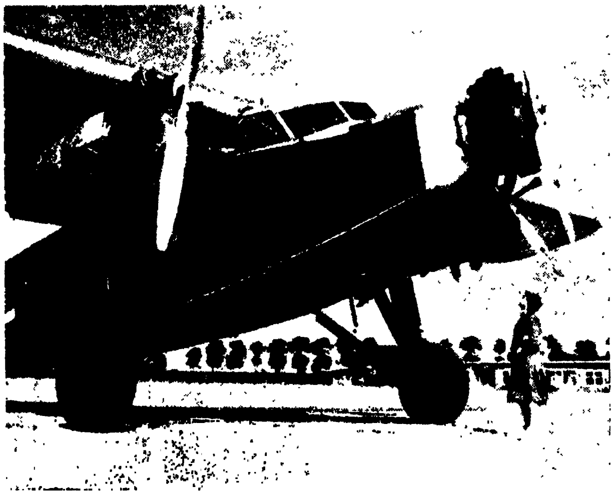
মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এসিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেচে মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদ-প্রধান ব'লে খর্ব্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্চে বিশুদ্ধ বর্ব্বর। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা ক'রে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্য-সাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই সত্যকে জয় করেচে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেচে তাদের। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।



বামদিকে—পারস্যের সম্রাট রেজা শাহ পহ্লাবি
দক্ষিণদিকে— ইরাকেশ্বর সম্রাট ফয়সল

সচল প্রাণের শক্তি যত দুর্ব্বল হয়ে আসে দেহের জড়ত্ব ততই নানা আকারে উৎকট হয়ে ওঠে। একদিন

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে এসিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেই প্রাণধর্ম্মের প্রভাবে তার আত্মসৃষ্টি বিচিত্র হয়ে উঠত। তার শক্তি যখন ক্লান্ত ও সুপ্তিমগ্ন হোলো, তার সৃষ্টির কাজ যখন



ডচ্ বিমানপোত

হোলো বন্ধ, তখন তার ধর্ম্মকর্ম্ম অভ্যস্ত আচারের যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিরর্থক হয়ে উঠল। এ'কেই বলে জড়তত্ত্ব, এতেই মানুষের সকল দিকে পরাভব ঘটায়।

অপর পক্ষে পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ আজ যা দেখা দিয়েচে সেও একই কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেচে, এই প্রভাব সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধচে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠ্চে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠচে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুল্চে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধন-খোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয় তার কারণ মত্ততা।

বয়স যখন অল্প ছিল তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েচি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা করে তার সাধকদের পরে ভক্তি হয়েচে মনে। এর ভিতর দিয়ে মানুষের যে-পরিচয় আজ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েচে তার মধ্যেই তো শাশ্বত মানুষের প্রকাশ। এই প্রকাশকে লোভান্ধ মানুষ অবমানিত করতে পারে। সেই পাপে হীনমতি নিজেকেই সে নষ্ট করবে কিন্তু মহৎকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই মহৎ সেই জাগ্রৎ মানুষকে দেখব বলেই একদিন ঘরের থেকে দূরে বেরিয়েছিলুম, য়ুরোপে গিয়েছিলুম ১৯১২ খৃষ্টাব্দে।



বিমান-পোতের ভিতরের দৃশ্য

এই যাত্রাকে শুভ বলেই গণ্য করি। কেননা আমরা এসিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্ব্বল

মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েচে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেচে। লজ্জা নেই, কেননা এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেমন সহজ শরীর এবং বর্ম্ম-পরা শরীরের ধর্ম্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব

কিন্তু সেই কারণেই একটা কথা মনে করে বেদনা বোধ করি। যে দেশে বহুসংখ্যক লোকের মন পলিটিক্সের যন্ত্রটার মধ্যেই পাক খেয়ে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা যন্ত্রের ছাঁদে পাকা হয়ে ওঠে। কাজ উদ্ধার করবার নৈপুণ্য একান্ত লক্ষ্য হয়। এ'কেই বলে যান্ত্রিক জড়তা, কেননা যন্ত্রের চরম সার্থক্য কাজের সাফল্যে। পাশ্চাত্য দেশে মানব-চরিত্রে এই যান্ত্রিক বিকার ক্রমেই বেড়ে উঠচে এটা লক্ষ্য না করে থাকা যায়



বিমান-পোত হইতে বোধপুর

প্রকাশ পায় আর একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখলুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো বা বরণীয়। আমি তাকে ভালোবেসেচি শ্রদ্ধা করেচি, ফিরেও পেয়েচি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।

না। মানুষ-যন্ত্রের কল্যাণবুদ্ধি অসাড় হয়ে আসচে তার প্রমাণ পূর্ব্বদেশে আমাদের কাছে আর ঢাকা রইল না। মনে পড়চে ইরাক-এ একজন সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইংরাজজাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার?" আমি বল্লেম, "তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best।" তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর যারা next best?" চুপ করে

রইলুম। উত্তর দিতে হলে অসংযত ভাষার আশঙ্কা ছিল। এসিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next bestএর সঙ্গেই। তাদের সংখ্যা বেশি, প্রভাব বেশি, তাদের স্মৃতি বহুব্যাপক লোকের মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে। তাদের সহজ মানুষের স্বভাব আমাদের জন্যে নয়, এবং সে স্বভাব তাদের নিজেদের জন্যেও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসচে।

কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনো মরেনি। এত বড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয়নি। এ'কেই বলি জড়তত্ত্ব, এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দেখা যায় এসিয়ার নাড়ী হয়েচে চঞ্চল। তার কারণ য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার



যোধপুরে মণ্ডলীর ভিতরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এসিষ্টেণ্ট, সার্জ্জেন — শ্রীপান্নালাল নাগ ফিজিক্সের অধ্যাপক — শ্রীকেদাররূপ রায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গেষ্ট হাউস্ — শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, নিউ প্যালেস — শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এসিষ্টাণ্ট, এঞ্জিনীয়ার

৮

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করচে মানুষের মহা সর্ব্বনাশের কাজে। এই সর্ব্বনাশা বুদ্ধি যে-আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেচে

মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্ব্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ধরে নিয়েছিল। আজ এসিয়ার এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই।

য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েচে তৎসত্ত্বেও এসিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব কেননা য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্ব্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করচে, "But the next best ?"



করাচী এয়োড্রোমে রবীন্দ্রনাথ

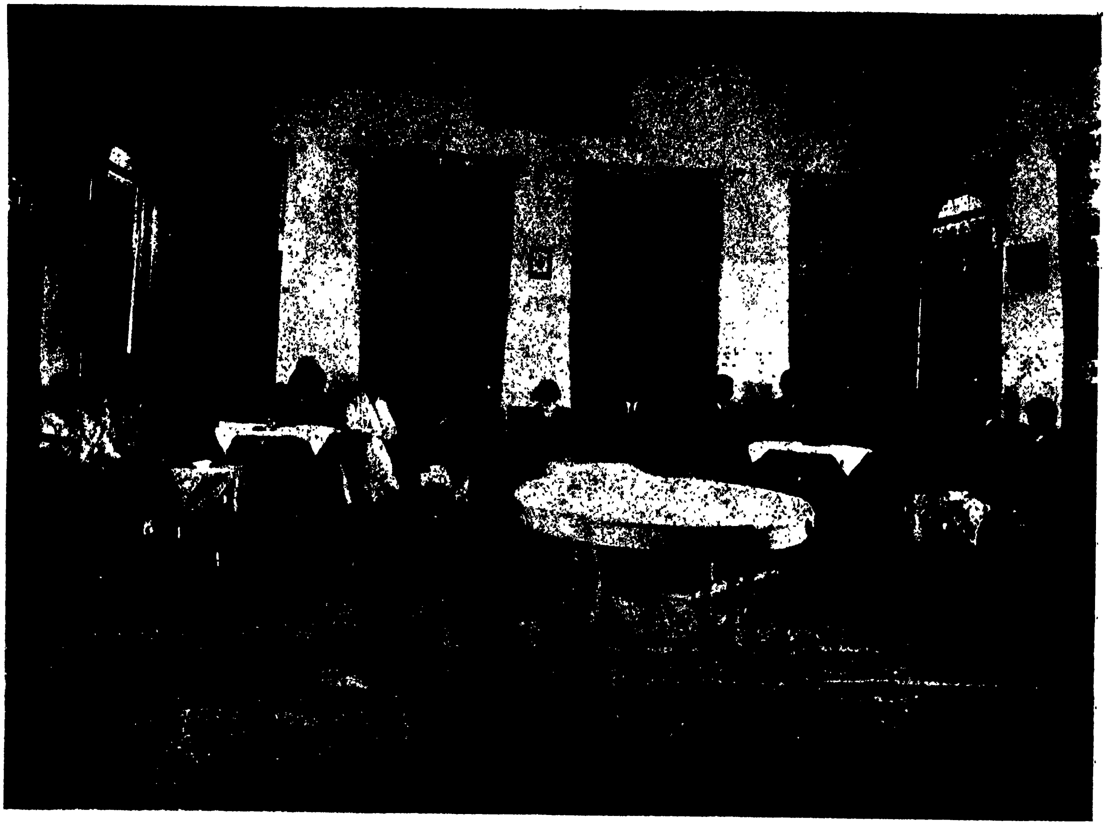
আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেচি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পট পরিবর্ত্তন হচ্চে। এসিয়ায় নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নব প্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিষ বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি, এসিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এসিয়ার দুর্ব্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এসিয়ার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা-কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠ্‌চে সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধন-সমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলচে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব্ব এসিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এসিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েচে, লঘু করে দিয়েচে এসিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হোলো। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে একদিকে নিরাপদ হয়েচে তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেচে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম, সে নিজের চারদিকে মথিত করে তুলচে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় ভাবী কালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্ব্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গণে দিতে হবে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুরঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হোলো বলেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি বলিনে। আমি এই বলতে চাই এসিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এসিয়া তাকে নতুন করে আপন ভাষা দিক্‌। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জ্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্ত্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তাহলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠ্‌চে তার খবর

দূর থেকে শোনা যায়। যখন ভাবছিলুম তুরস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত করে নতুন করে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা সহজ হোলো ছোটো পরিধির মধ্যে। সাম্রাজ্য



বুশেয়ার—মাহমুদ্ পুরে রেজার ভবনে কবির পার্শ্বে উপবিষ্ট পারস্য উপসাগরের গভর্ণর

বল্‌তে বোঝায় যারা আত্মীয় নয় তাদের অনেককে দড়ির বাঁধনে বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক স্থূল করে তোলা। দুঃসময়ে বাঁধন যখন ঢিলে হয় তখন ঐ অনাত্মীয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হতে থাকে। তুরস্ক হাল্কা হয়ে গিয়েই যথার্থ আঁট হয়ে উঠল। তখন ইংলণ্ড তাকে তাড়া করেচে গ্রীসকে তার উপরে লেলিয়ে দিয়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতক্তে তখন বসে আছেন লয়েড জর্জ্জ ও চার্চ্চহিল্।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তখনকার মিত্রশক্তিরা একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় আঙ্গোরার প্রতিনিধি বেকির সামি তুরুষ্কের হয়ে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনেকটা পরিমাণে ত্যাগ করতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীস আপন ষোলো আনা দাবীর পরেই জেদ ধরে বসে রইল, ইংলণ্ড পশ্চাৎ থেকে তার সমর্থন করলে। অর্থাৎ কালনেমি মামার লঙ্কাভাগের উৎসাহ তখনো খুব ঝাঁঝালো ছিল।

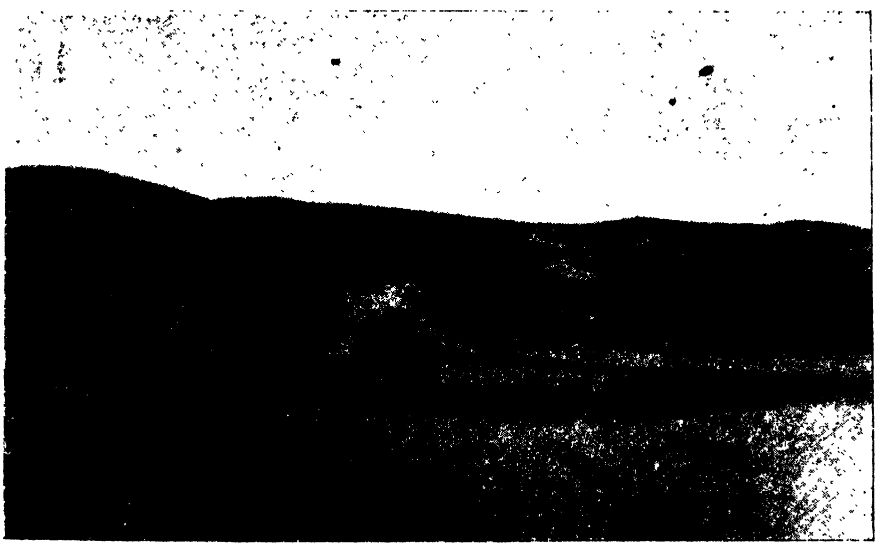
এই গোলমালের সময় তুরস্ক মৈত্রী বিস্তার করলে ফ্রান্সের সঙ্গে। পারস্য এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হয়ে গেল। আফগানিস্থানের সন্ধিপত্রের দ্বিতীয় দফায় লেখা আছে :—

"The contracting parties recognize the

emancipation of the nations of the East and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent and to govern themselves in whatever manner they themselves choose."

এদিকে চল্‌ল গ্রীস তুরুষ্কের লড়াই। এখনো আঙ্গোরা-পক্ষ রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশে বারবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে। কিন্তু ইংলণ্ড ও গ্রীস তার বিরুদ্ধে অবিচলিত রইল। শেষে সকল কথাবার্ত্তা থামল গ্রীসের পরাজয়ে।

মন্ত্রী বল্‌লেন, "Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern, civilised nation, and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us." এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসঙ্গতভাবে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধ সংস্কার। আধুনিক লোক-ব্যবহারে তার প্রতি নির্ম্মম হতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।



পারস্যের পথ

যুদ্ধজয়ের পরে কামালপাশা যখন স্মির্ণা সহরে প্রবেশ করলেন সেখানে একটি সর্ব্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বল্‌লেন, "যুদ্ধে আমরা নিঃসংশয়িত জয়সাধন করেচি কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না করো। শিক্ষার জয়সাধন করো তোমরা, তা হলে আমরা যতটুকু করেচি তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারবে। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি আধুনিক প্রাণযাত্রার পথে তোমরা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর না হও। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি তোমরা গ্রহণ না করো আধুনিক জীবননির্ব্বাহনীতি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেচে।"

কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরুষ্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হোলো আঙ্গোরা রাজধানীতে।

নব তুরুষ্ক একদিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর একদিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামালপাশা বল্‌লেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুষ্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন সকলের আগে চাই। তুরুষ্কের বিচারবিভাগের

এ যুগে য়ুরোপ সত্যের একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেচে। সেই সাধনার ফল সকল কালের সকল মানুষের জন্যেই, তাকে যে না গ্রহণ করবে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এই কথা এসিয়ার পূর্ব্বতমপ্রান্তে জাপান স্বীকার করেচে এবং পশ্চিমতম প্রান্তে স্বীকার করেচে তুরুষ্ক। ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই এই

অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্চে মনকে সংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।

কথাটা সত্য। কিন্তু আরো চিন্তা করবার বিষয় আছে। য়ুরোপ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেচে সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়েচে অনেকদিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। যেখানে করেনি, সে জায়গাটা গভীরে, মূলে, তাই সেটা অনেককাল থেকে প্রচ্ছন্ন রইল। হয়ে এল আসন্ন। য়ুরোপীয় স্বভাবের অন্ধ অনুবর্ত্তী জাপান সিদ্ধিমদমত্ততায় নিত্যতত্ত্বের কথাটা ভুলেচে তা দেখাই যাচ্চে কিন্তু চিরন্তন শ্রেয়স্তত্ত্ব আপন অমোঘ শাসন ভুলবে না এ কথা নিশ্চিত জেনে রাখা চাই।

নবযুগের আহ্বানে পশ্চিম এসিয়া কী রকম সাড়া দিচ্চে সেটা স্পষ্ট করে জানা ভালো। খুব বড়ো করে সেটা জানবার এখনো সময় হয় নি। এখানে ওখানে একটু একটু লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো প্রবল করে চোখে পড়বার নয়, কিন্তু সত্য ছোটো হয়েই আসে। সেই সত্য



পারস্যের পথ

এইখানে সে বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতি করেচে এবং সেই ক্ষতি ক্রমেই ফিরে আসচে তার নিজের অভিমুখে। তার যে-লোভ চীনকে আফিম খাইয়েচে সে লোভ তো চীনের মরণের মধ্যেই মরে না। সেই নির্দ্দয় লোভ প্রত্যহ তার নিজেকে মোহান্ধ করচেই, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয়, মানব-জগতেও নিষ্কাম চিত্তে সত্য ব্যবহার মানুষের আত্মরক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনার প্রতি পাশ্চাত্য দেশ প্রতিদিন শ্রদ্ধা হারাচ্চে, তা নিয়ে তার লজ্জাও যাচ্চে চলে। তাই জটিল হয়ে উঠেচে তার সমস্ত সমস্যা, বিনাশ এসিয়ার সেই দুর্ব্বলতাকে আঘাত করতে সুরু করেচে যেখানে অন্ধ সংস্কারে, জড় প্রথায় তার চলাচলের পথ বন্ধ। এ পথ এখনো খোলসা হয় নি কিন্তু দেখা যায় এই দিকে তার মনটা বিচলিত। এসিয়ার নানা দেশেই এমন কথা উঠেচে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মানবের সকল ক্ষেত্র জুড়ে থাকলে চলবে না। প্যালেষ্টাইন শাসন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে বিদায় ভোজ দেওয়ার সভায় তিনি যখন বললেন,—

"Palestine is a Mahommedan country, and its government should, therefore, be in

the hands of the Mahommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are represented in it."—তখন জেরুজিলামের মুফ্‌তি হাজি এমিন এল্‌-হুসেইনি উত্তর করলেন, "For regard the Christians not as a minority, but as Arabs."



জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ—তেহেরাণ, ৬ই মে, ১৩৩২

us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no distinctions between Mohommedan and Christian Arabs. We

জানি এই উদারবুদ্ধি সকলের, এমন কি, অধিকাংশ লোকের, নেই, তবু সে যে ছোটো বীজের মতো অতি ছোটো জায়গা জুড়েই নিজেকে প্রকাশ করতে চাচ্চে এইটে আশার কথা। বর্ত্তমানে এ ছোটো কিন্তু ভবিষ্যতে এ ছোটো নয়।

আর একটা অখ্যাত কোণে কী ঘটচে চেয়ে দেখো। রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অতি অল্পকালের মধ্যেই এসিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেচে তা আলোচনা করে দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই সব ছোটো ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাব্লিক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েচে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্ব্বেই অন্যত্র বলেচি বহুজাতিসঙ্কুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিতাই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয় সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এসিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে সুরু করেচে।

তাই বহুযুগ পরে এসিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়ালো। এই মুক্তি-প্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখ-যন্ত্রণা থাক্, তবু এই উত্তম, মনুষ্য-গৌরব লাভের জন্যে এই যে আপন সব কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে। এ-কথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে য়ুরোপ আজ নিজের ঘরে এবং নিজের বাইরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি এখানে কেন এসেচ?" আমি বলেছিলুম, "য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেচি।" য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলেচে, প্রাণের আলো জ্বলেচে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানাদিকে প্রকাশ করচে।

সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলেম, পারস্যে যে-মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেচি। তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলেচে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হোলো।

রোগ-শয্যা থেকে তখন সবে উঠেচি। ডাক্তারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম না—সাহস ছিল না,—গরমের দিনে জল-স্থলের উপর দিয়ে রৌদ্রের তাপ এবং কলের নাড়া খেতে খেতে দীর্ঘ পথ বেয়ে চলব সে সাহসেরও অভাব ছিল। আকাশযানে উঠে পড়লুম। ঘরের কোণে একলা বসে যে-বালক দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আহ্বান শুনতে পেত আজ সেই দূরের আহ্বানে সে সাড়া দিল ঐ আকাশের পথ বেয়েই। পারস্যের দ্বারে এসে নামলুম দু-দিন পরেই। তার পরদিন সকালে পৌঁছলুম বুশেয়ার-এ। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অজ্ঞাত বাস

শ্রীলীলাময় রায়

একাকী

১

পাট্‌নীতে টেম্‌স্‌ নদীবক্ষে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেস হয়ে গেল, বাদল দেখ্‌তে পেল না। উইণ্ডহাম্‌স্‌ থিয়েটারে ইব্‌সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইবসেনের নাটকাবলীর অভিনয় হয়ে গেল, বাদল দেখ্‌তে পেল না। লণ্ডনের বাইরে এসে লণ্ডনের কত কি বাদল দেখ্‌তে পেল না। কাগজে সকলে পড়ে পরের খবর, বাদল পড়ে তার নিজের—সে নিজে কি দেখ্‌তে পেল না, কিসে যোগ দিতে পার্‌ল না, কার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌ল না। তার রোজ আফশোষ হয় কেন সে লণ্ডন ছাড়্‌তে গেল—লণ্ডনের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা যে কোন সুদূর অতীতের, সে অতীতকে ডিঙ্গিয়ে স্মৃতি তার পশ্চাদ্‌গতি হতে পারে না।

যে বাদল অতীতকে অস্বীকার কর্‌ত, অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিত না সেই এখন লণ্ডনের বিগত দিনগুলির উপর স্মৃতির আঙুল বুলিয়ে যায়। মরা হাড়ের স্বরগ্রাম থেকে কড়ি ও কোমল সুর নির্গত হয়। মিসেস্‌ উইল্‌সের সঙ্গে গল্প ও বাজার করা, তর্ক ও মনোমালিন্য, তাঁর মিষ্টি হাতের কোকো; কলিন্স ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, একত্র আহার, থিয়েটারে যাওয়া; সুধীদার সঙ্গে বিচ্ছেদ; ওয়েলীর কাছে পরাভব। সমস্ত দিন পথে পথে বেড়ান; দোকানে ঢুকে এটা ওটার ফরমাজ দিয়ে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা করে নেওয়া; নাপিত দর্জি রুটিওয়ালা কসাই মুদি মনোহারীর দোকানী দুধওয়ালা ফলওয়ালা পাহারাওয়ালা সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা; কুইন্স হলে কন্সার্ট কিম্বা ফিলহারমনিক হলে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়ে দণ্ডায়মান জনতার queueতে ভিড়ে যাওয়া; পার্কে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দীঘির ধারে বসে পড়ে ছোটদের নকল বাচখেলা দেখা; আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে নেমে বাইরের দুর্জ্জয় শীতের বায়ুবাণ কিম্বা বর্ষার খোঁচা এড়ান; টিউবট্রেনের যখন দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন গতিহিল্লোলের পুলকাবেশে শির্‌শিরিয়ে ওঠা; অভীষ্ট ষ্টেশনে ট্রেন থাম্‌লে বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে লিফ্‌টওয়ালার হাতে টিকিট গুঁজে দেওয়া ও দীপালোকিত অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট সূর্য্যালোকিত অন্ধকারে উপনীত হওয়া; বাসের মাথায় চড়ে টাটকা বাতাস প্রাণ ভরে ও ঘ্রাণ ভরে পান করা। এই সমস্ত বাদলের মনে পড়ে যায় আর বাদলের উপস্থিত চিন্তা ঘুলিয়ে যায়।

চিন্তার একাগ্রতায় বাধা সইতে পারে না বলে বাদল লণ্ডন ছাড়্‌ল, কিন্তু লণ্ডনের স্মৃতি তাকে ছাড়ে না। লণ্ডনের অভ্যাস ছাড়া শক্ত। এখন যেখানে সে থাকে সেটা একটা সরাই। সেটার বিশেষত্ব এ নয় যে সেটা Ye Olde Englishe Inn.—সেটার আশে পাশে জনমনুষ্যের বাস নেই, এই সেটার বিশেষত্ব। দক্ষিণে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে বাতাস যখন আসে তখন মাটীর খবর আনে না, হাজার হাজার মাইল কেবল জলের গন্ধ বয়ে আনে। উপকূল বন্ধুর বলে কেউ স্নান কর্‌তে নামে না। নিকটে জালজীবীদের বসতি নেই। সরাইটাতে বাদলের মত পর্য্যটক আশ্রয় নেয়, দু'পাঁচ দিন থাকে। মোটর সাইক্লিষ্ট কিম্বা মোটরিষ্ট সরাইতে পানাহার, সাধারণতঃ পান করে আবার পথ ধরে, দৌড় দেয়। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ আসে, আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে সরাইওয়ালার সঙ্গে ভাব জমায়। সরাইতে সমস্তক্ষণ থাকে সরাইওয়ালা নিজে, তার স্ত্রী ও তার মেয়ে। বাদলকে এরা খাতির করে

খুবই, বাদল যা চায় তাই সংগ্রহ কর্‌বার ভার নেয়, কিন্তু বাদল ঠিক জিনিষটি ঠিক সময়ে পায় না—নিকটতম সহর যে চার পাঁচ মাইল দূরে। সকালবেলা তাজা খবরের কাগজ না পেলে তার ব্রেকফাষ্টের সব কটা কোর্স বিস্বাদ লাগে। রাত্রে প্রশস্ত বাথ টাব্ ও যথেষ্ট গরম জল না পেলে তার স্নান করতে বিশ্রী লাগে। বীফ সম্বন্ধে এখনো তার সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এরাও চিক্‌ন্ যদি বা দেয় তার সঙ্গে রাঁধ্‌তে না জানার পরিচয় দেয়। বাসন তেমন পরিষ্কার হয় না, খাদ্য তেমন পরিপাটী হয় না। উৎকর্ষের অভাব এরা পরিমাণের দ্বারা ঢাকতে চায়। চাযাড়ে ব্যাপার।

তবু বাদলের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গেল। আটলান্টিকের হাওয়া খেয়ে তার ক্ষুধার বার আনা মিট্‌ল, বাকীটা মিট্‌ল প্রচুর খাঁটি দুধ খেয়ে। সরাই-ওয়ালার নিজের গোরুর দুধ, সে গোরু সরাইওয়ালার নিজের জমিতে চরে। সরাইওয়ালার ডাগর মেয়ে করে গোদোহন। দৃশ্যটি বাদলকে ক্ষুধা পাইয়ে দেয়, তার বহুদিনের অগ্নিমান্দ্য সারিয়ে দেয়। বাঁটের পিচ্‌কারী থেকে বাল্‌তিতে সফেন দুধ ছুটে এসে পড়্‌ছে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। টুলের উপর বসেছে সেই ডাগর মেয়েটি। তার গালের রং টক্‌টকে লাল। তার হৃষ্ট মুখ ও পুষ্ট দেহ দেখে কবি হলে বাদল প্রেমে পড়ে যেত। কিন্তু কবি নয় সে, ভাবুক। মুহূর্ত্তকাল অমনোযোগী হলে সে চিন্তার চাবুক খেয়ে হুঁশিয়ার হয়। ভাবে, কি ভাব্‌ছিলুম? আমি আছি, এর স্বপক্ষে কি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যতক্ষণ না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি ততক্ষণ আমি এই জনহীন সমুদ্রোপকূলে এই প্রাগৈতিহাসিক সরাইতে আবদ্ধ থাক্‌ব, উপরতলা থেকে নীচের তলার নাম্‌ব না, যদি সম্ভব হয়।

জানালা খোলা রেখে বাদল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই বাহুকে জড়ায়। সারা অতীতকালটা যেন সে ছুটাছুটি ও পায়চারি করেছে, আজ যেন তার ছুটী ও বিশ্রাম। ঢেউগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে, তাদের আর্ত্তনাদ থেকে থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে স্তব্ধতাকে আকুল্ কর্‌ছে, ক্রন্দননিরতের কণ্ঠরোধের মত। বাদল কানে তুলো গুঁজে ভাব্‌ছে, কি ভাব্‌ছিলুম? আমি আছি কি না এর স্বপক্ষে যুক্তি আছে কি না।

একই চিন্তা বার বার আসে। বাদল কতবার কত যুক্তি আবিষ্কার কর্‌ল, কিন্তু একদিনের যুক্তি তার অন্য দিন মনঃপূত হল না। একটা চিন্তাকে চিরকালের মত চুকিয়ে না দিলে অন্য চিন্তাকে সে আমল দেয় না; আমল দেবার অবকাশ পায় না।

২

বাদল ভেবেছিল ইংলণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এসে সূর্য্যালোক অধিকাংশ দিন অধিকাংশ সময় পাবে, কিন্তু তেমনি শীত তেমনি স্বল্পবিরাম বৃষ্টি তাকে সেদিক থেকে নিরাশ কর্‌ল। রক্ষা এই যে লণ্ডনের ধূমমসীলিপ্ত আকাশ চুঁইয়ে ছাতার কালির মত জল পড়ে না। হাওয়া ত মুক্তগতি। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ফেনা উড়ে এসে বাদলের গায়ে লাগে। তাইতে বাদলের ভারি আমোদ।

সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার নামে, অর্থাৎ গাঢ়তর হয়, তখন দূরস্থিত লাইটহাউসের আলোকে চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পর্য্যায়ক্রমে চোখের পাতা পড়ে ও সরে। বাদল সেই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন দূরগামী জাহাজের আভাস দেখ্‌তে পায়। পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে কিম্বা পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে সেই জাহাজ। হয় ত রণতরী হয় ত লাইনার। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাদলের মনে হয় সে যেন রবিন্‌সন ক্রুসোর মত নির্জ্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়েছে। সাম্‌নে দিয়ে হুস্ হুস্ করে ছুটে যেতে যেতে বাস্ থামে, আরোহী নামে। তখন বাদলের হোঁস হয় যে সে লোকালয় থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। নীচের তলায় কারুর মাত্রাধিক্য ঘটেছে, সে প্রাণপণে তান ছেড়েছে; বাদল তখন ভাবে রবিন্‌সন ক্রুসো মানুষটা মন্দ ছিল না।

জীবনে কোনোদিন এত একাকী বোধ করে নি সে। শৈশবাবধি মাতৃহারা, ভাই বোন হয় নি, তবু তার সঙ্গীর অভাব ছিল না, তার ছিল বৃহৎ লাইব্রেরী। চাইলেই বাবা বই কিনে দিতেন, দামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর্‌তেন না। আজ

সেই বাদলের সঙ্গে মাত্র একটি ছোট বুককেস, তাতে কয়েকখানা বাছা বাছা বই। বাদল সেদিকে দৃক্‌পাত করে না। বই পড়ার দিন গেছে। স্কলার হওয়া আর স্পৃহনীয় নয়। খবরের কাগজের মৌতাত অদম্য বলেই হোক কিম্বা বাহ্যজগতের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করা অনুচিত বলেই হোক, বাদল ভেণ্টনর থেকে বহু কষ্টে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান আনিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে পড়া বলে না। বাদল পড়ার জিনিষের অভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। তবু পড়ার জিনিষ আন্‌তে দেয় না। সমস্তক্ষণ চিন্তা কর্‌বার জন্য তার এখানে আসা। চিন্তার একাগ্রতা যেন হ্রাস না পায়। সমুদ্রটাই যথেষ্ট বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে, তার বেশী বিক্ষেপ অনিষ্টকর।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তখনো বাদল জানালা খোলা রেখে লাইট হাউসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তার ঘুম আসছে না। সে তার চিন্তিত বিষয়ের শেষখানে পৌঁছতে পারছে না। প্রত্যয় ত সোজা। প্রত্যয়কে যুক্তিতে তর্জ্জমা করে অপরের গ্রহণযোগ্য করা যে কঠিন। আমি আছি, আমার প্রত্যয় হয়। কিন্তু আমি আছি, তোমার প্রত্যয় যদি না হয়? তারপর আমি না হয় আছি, কিন্তু আমার আত্মা আছে, তার প্রমাণ কি? পশুপাখীর আত্মা আছে কিনা তা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। একদা খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিল স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। বিজ্ঞান কারুর আত্মার দিশা না পেয়ে ও সম্বন্ধে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছে। বাদলের ও সম্বন্ধে প্রত্যয় বড় দুর্ব্বল। কেবল তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিজে নিঃসন্দেহ। নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে তার মনে আগে কোনোদিন প্রশ্ন জাগে নি। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে আগে কোনোদিন তার মুখোমুখি হয় নি। তার মৃত্যুর সম্ভাবনা যে আছে এমন একটা আশঙ্কা তার সর্ব্বপ্রথম হয় যখন সে জাহাজে করে ইংলণ্ডে আস্‌ছিল তখন। একদিন হঠাৎ এলার্ম দেয়। যে যার ক্যাবিন থেকে লাইফ বেল্ট নিয়ে উপরের ডেকে দৌড়িয়ে যায় ও রিহার্সল দেয়। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র। জাহাজ যদি ডুবত তবে লাইফ বেল্ট কিম্বা লাইফ বোট যে তাকে ভাসিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ত সে আশা তার ছিল না। মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে এক ধাপ উপরে অমরত্বের ভাবনা। আমি আছি, কিন্তু চিরকাল থাক্‌ব কি না, এ হল তার তৃতীয় জিজ্ঞাসা। তারপরে আত্মা আছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা চিরকাল থাক্‌বে কি না তার প্রমাণ প্রয়োজন হবে। চতুর্থ জিজ্ঞাসা তার ঐ।

সরাইয়ের অন্য সকলের প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞা হয়। সে ভাব্‌ছে কত বড় বড় বিষয়, তার মনের ঘুড়ি উড়ছে কোন আকাশে। আর এরা ভাবছে ঘোড়ার খুরের নাল কিম্বা গোরুর গায়ের পোকার কথা। কি সামান্য প্রসঙ্গ নিয়ে এদের গভীর আলোচনা। বাদলের কানে পড়লে বাদল কান ফিরিয়ে নেয়। কানে তুলো গোঁজে। কিন্তু যেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রখর হয় অমনি বাদল সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করে। হয়ত মিসেস মেল্‌ভিল্‌ একখানা চিঠি এনে তার ঘরের দরজায় টোকা মারলে বাদল নিয়ে দেখে সুধীদার চিঠি।

সুধীদাকে বাদলের মনে পড়ে। নিষিদ্ধ স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাদল একটু সুখ পায়। কি মজা, সুধীদাকে কি ফাঁকিটাই না দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের ঠিকানায় চিঠি না লিখে সে বেচারা লেখে কোথায়! তার জন্য একটু মমতাও হয়। "For he is a jolly good fellow." কতখানি ভালবাসে বাদলকে। ডিয়ার ওল্ড সুধীদা।

চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে বাদল নিজের ঠিকানাটি ফাঁস করে দেয় আর কি! তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেল্ল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোন খবরের কাগজে? সুধীদা ত টাইম্‌স নিত বলে বাদলের মনে পড়ে। টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখাই যাক। বাদল একখানা টাইম্‌স আনতে দিল; বিজ্ঞাপনের হার খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞাপন ও চেক্‌ লিখে টাইম্‌সের ঠিকানায় পাঠাল। আশা করা যাক সুধীদার চোখে পড়বে। কিন্তু যদি না পড়ে? তার প্রতীকার করতে হয়। একবার কর্‌লে অন্যান্যবার কর্‌তে হয় না এমন প্রতীকার টেলিফোন করা। ভাগ্যক্রমে বাদলের সরাইতে টেলিফোন ছিল। বাদল লণ্ডনের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে সুধীদার শাখা ও নম্বর উল্লেখ করল। সুধীদা বাড়ী ছিল না। না থাকাই সম্ভব বলে বাদল জান্‌ত। নেই শুনে আশ্বস্ত হল। সুজেৎকে বল্ল,

"কোনখান থেকে কথা বলছি জিজ্ঞাসা কোরো না। প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স কাগজের personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

টাইম্‌সের সঙ্গেও বাদল সেই বন্দোবস্ত করল। বুধবারে বিজ্ঞাপন পড়ে বৃহস্পতিবারে সুধীদা ভারতবর্ষের চিঠি ডাকে দেবে। ভারতবর্ষের ওরা হয়ত বাদলের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে চায়। বাদলের উপর ওদের কিছুমাত্র দাবী না থাক্ বাদলের সংবাদ চাওয়া এমন কিছু অনধিকার চর্চা নয়। বাদল একদিন একটা world figure হবে; দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ জানতে চাইবে সে কেমন আছে, কোথায় আছে ইত্যাদি। তার অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ নেবার জন্য প্রতিদিন ভিড় হবে, সেই ভিড় কাটিয়ে সে কোন চুলোয় যে লুকোবে তাই এক মস্ত সমস্যা। তবু ভক্তবৃন্দকে রয়টারের মারফৎ মোটামুটি সংবাদটা জানিয়ে রাখতে হবে। তখনকার সেক্রেটারীর কাজ এখন তার নিজেকে করতে হচ্ছে, রয়টারের স্থান নিচ্ছে টাইম্‌স্। এইটুকু যা তফাৎ।

৩

ব্রেকফাস্টের পর মিসেস মেল্‌ভিল বিছানা ঝাড়তে ও ঘর সাফ করতে আসে। বাদলের উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে গা করে না, সে বলে, "তুমি কিছু মনে করবে না ত, মিসেস মেল্‌ভিল্। করবে?" মিসেস সরল হাসি হেসে বলে, "না, সার। আমি কেন করব, আপনি যদি না করেন।"

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কোঁকড়া কোঁকড়া কাঁচা পাকা চুল। কাঁকড়ার মত ফুটে বেরিয়ে পড়তে থাকা চোখ। ফুলকো গাল। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। বাঁধান দাঁত। গায়ের রং ময়লা। প্রথমটা বাদল অনুমান করেছিল জিপ্‌সী জাতীয়া হবে। কিন্তু আলাপ করে ও বংশ পরিচয় নিয়ে অনুমানটা ভিত্তিহীন বলে জেনেছে। অন্তত মিসেস মেলভিলের মা বাবার ফোটো দেখে মনে হয় না যে ওদের কেউ জিপ্‌সী। অবশ্য এমন হতে পারে যে ওদের একজনের পূর্ব্বপুরুষ জিপ্‌সী ছিল; বংশের উপর মেণ্ডেলিস্‌মের ক্রিয়া চলেছে।

মিসেস মেলভিল লোক বড় ভাল। অনবরত গৃহকর্ম নিয়ে আছে; গৃহকর্ম্মের মধ্যে গৃহপশুর সেবাও পড়ে। গৃহপশু বলাতে পাঠক হয়ত ভেবে বসবেন তার স্বামীটি পশু। তা নয়। লোকটা মিলিটারী চাল দেয় এবং স্ত্রীকে ধরে মারেও বটে, কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি করে না, বাদলকে কোনোদিন অপমান করেনি। বাদলকে সে ছাত্র বলেই জানে আর ছাত্রকে ইংরেজমাত্রেই সমীহ করে। দু একবার ভাব জমাবার চেষ্টা করে সফল হয়নি; বাদল তার সুলভ রসিকতার মর্ম্ম বোঝেনি। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে তার যুদ্ধের মেডেল ঝুলিয়ে একা একা মার্চ করে বেড়ায়, কদাচ বাদলের সঙ্গে চোখোচোখি হলে হঠাৎ করে bow করে। ১৯১৪ সালে সে "Old contemptible" দলের একজন হয়ে Mons থেকে পিছু হটেছিল। পিছু হটতে জানাও মস্ত গুণ। তারপরে সে Marneতে লড়েছে, Ypresতে লড়েছে। অবশেষে আহত হয়ে অব্যাহতি পায় ও সরাই কেনে। তখন থেকে সে এই নিরস্তপাদপ পল্লীর এরণ্ডরূপে অবস্থান করছে। "Mine host" কে সম্মান দেখায় তার সকল অতিথিই। কেউ কেউ দাম দিতে না পারলে তাকে ক্যাপটেন বলে ডাকে ও মাফ পায়। ক্যাপটেন মেল্‌ভিল্ ভক্তদের কাছে লম্বা চওড়া গল্প ফাঁদে, ওরাও তার পাণ্টা যা গায় তা বিশুদ্ধ গাঁজাখুরি। মেল্‌ভিলের সামরিক কৃতিত্ব যাই হোক্, তার সঙ্গে তার অতিথিদের বচসা কিম্বা দ্বন্দ্ব কোনো দিন ঘটে না, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বা ঘটতে যায় মেল্‌ভিল টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "Now, boys, তোমাদের ক্যাপটেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এটা গৌরবের আকর সংগ্রাম ভূমি নয়, এখানে মারামারি করে তোমরা কেউ এমন মেডেল পাবে না। তোমরা সকলেই Englishmen and gentlemen; তোমাদের কেউ Hun নও। অতএব এস আমরা এই সরাইয়ের স্বাস্থ্য পান করি। Ye olde Englishe Inn!" পরিশেষে God Save the King গান করে পানকর্ত্তারা বিদায় নেয়।

মেয়ের নাম মেরিয়ন। নিকটবর্ত্তী সহরের স্কুলে পড়াশুনা করত, ওখানকার পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন বাড়ীতে বসে

আছে। পড়াশুনায় তার কতটা মনোযোগ ছিল বোঝবার উপায় নেই। কেন না সে সার্টিফিকেট যদিও পেয়েছে এবং সরাইয়ের বসবার ঘরে তার মা তার অসংখ্য বই আলমারিতে করে সাজিয়ে রেখেছে তবু কোনোদিন তাকে একখানা মাসিকপত্র বা উপন্যাস পড়তেও দেখা যায় না। তার সব চেয়ে আনন্দ গোরু, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, শূয়োর ও মুরগিদের পরিচর্য্যা। সব রকম পশুই তাদের আছে। প্রধানত মেরিয়নের আগ্রহে তার বাবা ওসব কিনেছেন, পুষেছেন ও জন্মসূত্রে সংখ্যায় বাড়িয়েছেন। মেরিয়নের অভিলাষ আছে লণ্ডনের পশু-পক্ষী প্রদর্শনীতে কুকুর এবং মুরগী পাঠাবে। সেজন্য সে অতি যত্নে breed করছে। কুলীন কুকুর বা মোরগ যদি কোথাও পায় তবে দাম দিয়ে কেনে, কিনতে না পারলে অন্য বন্দোবস্ত করে। সে তার মায়ের মত হাসি-খুসী কিম্বা তার বাপের মত সাড়ম্বর নয়। সে কথা বলে এত অল্প যে একদিনের পরিচয়ে তাকে বোবা বলে ভুল হতে পারে। তার মাথায় এক রাশ কটা চুল কানের কাছে চাকার মত বিনুনি করে বাঁধা। তার নাকটা যদি খাঁড়ার মত নেমে এসে আঁকশির মত বাঁকা হয়ে উর্দ্ধগতি না হত তবে তার মত সুগঠিতা সুন্দরী ষোড়শীকে দশ মাইল দূরের পাণিপ্রার্থীরা রাত্রি দিন উত্ত্যক্ত করত। তাকে তার মা বাবাও ভাবতে দিত না যে Rhode Island Red-এর সঙ্গে Light Sussex কিম্বা Leghorn এর সঙ্গম রামপক্ষী জগতের যুগান্তরকারী ঘটনা। মেয়েকে মনুষ্য সমাজে ধরে রাখা যায় না, কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পাঁচ মিনিট পরে সে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পলায়ন করে। তাকে দেখে যতক্ষণ না তার ঘোড়ারা চিঁহি চিঁহি করে ওঠে, কুকুররা চোখ বুঁজে জিভ লক লক করতে থাকে এবং মোরগরা কক্ কক্ কক্ কক্করে—এ কক্ রব তোলে ততক্ষণ তার প্রাণে শান্তি আসে না। সে ভাবে, এইবার আমার নেলী বুলডগের উপযুক্ত বর খুঁজতে বেরব। কাল যাব স্যাণ্ডাউনে। একজনের কাছে খবর পেয়েছি সেখানে একজন বড়লোক এসেছেন সঙ্গে অনেক রকমের কুকুর নিয়ে।

নেলী প্রভৃতি কুকুর ও অপরাপর জন্তুকে মেরিয়ন ঘুরে বেড়াবার ফাঁক দেয় না, কঠোর শাসনে চোখে চোখে রাখে। পাছে তারা যার তার সঙ্গে মিশে সন্তানের জাত নষ্ট করে। বাদল তার কেনেল, আস্তাবল ডেয়ারী ও পোলট্রী ফার্ম দেখতে যায় নি। গেলে দেখতে পেত মেরিয়ন একাই এক-শ। অবশ্য চাকর চার্লি তাকে সাহায্য করে, কিন্তু চার্লির বয়স হ'ল গিয়ে সত্তরের কাছা-কাছি। সেই চার্লিই এখানকার আদিম বাসিন্দা, তারই সরাই কিনে নিয়ে মেলভিলরা তাকে চাকর রেখেছে। বুড়োর কোথাও কেউ নেই, খাওয়া দাওয়া করে সরাইতে, শোয় মেরিয়নের পশুশালায়। মেরিয়নের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বাক্যালাপের অপেক্ষা রাখে না, তারা বিনা কথায় কথা বলে। মেরিয়ন না থাকলে মেলভিল কোন দিন তাকে ভাগিয়ে দিত, কারণ চার্লিকে দেখলে তার মনে পড়ে যায় যে একদিন এ সমস্ত চার্লির ছিল ও মেলভিল্ এখানে আগন্তুক। চার্লিকে সরাতে পারলে কেমন চাল দিয়ে বলতে পারা যেত Ye Olde Englishe Inn যত দিনের মেলভিলরাও এই অঞ্চলে ততদিনের। এখানকার বনেদি বংশ বলে মেলভিল তার পূর্ব্ব পুরুষের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর অব্দ সরাইয়ের গায়ে উৎকীর্ণ করে দিত এবং সমাগত অতিথিদিগের হাতের পেয়ালা ভরে দিয়ে নিজের বংশের টোষ্ট নিজেই প্রস্তাব করত:—"To the Melvilles of Niton."

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা গান ও তাহার রচয়িতার গতি-প্রবণতা

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য বঙ্গ-যুবক-যুবতী মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা গান সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, সে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া মনে কতকগুলি সংশয়ের উদয় হওয়ায়, তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি বিষয়টির সম্যক আলোচনা হইলে বাঙ্গলা গানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রথমেই ভাষা ও রচনা ভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনুযোগ আছে। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ। পুরাকালে যখন বিদ্বজ্জনের ভাষা সংস্কৃত ছিল, তখনও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা অন্যপ্রকার ছিল—তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিত। মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা এবং সাধারণ ভাষায় প্রভেদ ছিল; যথা, ভারতচন্দ্রের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বঙ্কিমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, হেমচন্দ্রাদির ভাষা; উপরন্তু মেয়েলি ভাষাও ছিল। ইঁহাদের ভাব গভীর হইলেও ভাষার সরলতা ও ভাব-ব্যঞ্জকতা থাকায় ভাব গ্রহণ করিতে শিরঃপীড়া হইত না।

সঙ্গীত বিষয়ের প্রবন্ধাদি জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ, অতএব সরল ও নিরলঙ্কার ভাষাই তাহা ব্যক্ত করিবার উপযোগী, অথচ কোন কোন নবীন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন শ্লেষ-বক্রোক্তি-পূর্ণ চটকদার ও রংদার ভাষা ব্যবহার করেন যে অনেক স্থলেই তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তাহা ধরা কঠিন হয়; যথা, "চিন্তার ছন্দ" "সঙ্গীত সাগরের চলোর্ম্মির নাদ ব্রহ্মের ভেলায়," "সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ করে দেওয়া" "শ্রুতির বিভীষিকায় তাকে স্তম্ভিত করা" প্রভৃতি শ্লেষোক্তির দ্বারা এক শ্রেণীর প্রবন্ধকার আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। অপিচ, একশ্রেণীর লেখক-লেখিকা আছেন, তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় কর্ড বা হারমণি আমাদের সঙ্গীতে প্রবেশ করাইবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হইলেও পুনরুক্তি করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকের কথা ধরুন। আর্য্য সঙ্গীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এ সঙ্গীতের আবিষ্কার-কর্ত্তা, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে চিন্তা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত শ্লোকেই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের সঙ্গীত-রসিকের পক্ষে সেই প্রাচীন চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় রক্ষা করাও কি অপরাধ? তারপর শ্রুতির কথা। অনেকেই জানেন আর্য্য সঙ্গীতের স্বর পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হইল স্বরের শ্রুতি-বিভাগ। আজকাল হারমোনিয়মের যুগে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। স্বরের সূক্ষ্ম শ্রুতি-বিভাগ এখন ক্রমশঃ কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের রাগরাগিণীর গঠন ও অঙ্গ-বিন্যাস, বাদী সম্বাদীর সম্বন্ধ বিচার সমস্তই এই শ্রুতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সঙ্গীতে শ্রুতির খেলা নাই সে সঙ্গীত এ দেশের সঙ্গীত বিদের নিকট প্রাণহীন ও মাধুর্য্যহীন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে-কোন কলাবিদ্যার রসবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া মূল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নীরস তত্ত্বাংশ একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা যে রস-বোধের বিঘ্ন স্বরূপ না হইয়া সহায়তাই করিয়া থাকে, শিল্পরসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃ-শাস্ত্র কাব্য সৌন্দর্য্যের সম্যক উপলব্ধির পক্ষে সহায়তাই করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, শিল্পীর পক্ষে, শিল্প সমালোচকের পক্ষে, এই তত্ত্বাংশের সম্যকজ্ঞান অপরিহার্য্য। নব-শিল্প-সমালোচক সম্প্রদায় কি সত্যই মনে করেন ভারতীয় সঙ্গীতের এই অক্ষর

জ্ঞান না হইলেও সঙ্গীত-সমালোচক বা সঙ্গীত-সংস্কারক হওয়া চলে?

অধুনা নব্যদলের এই ধারণা যে "ওস্তাদগণের অধিকাংশই আজকের দিনে সঙ্গীতের দুরবস্থার জন্য কম বেশী দায়ী"। একথা আংশিক ভাবে সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে এই সঙ্গীত যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহাও এই ওস্তাদগণের একনিষ্ঠ সাধনার গুণে? যতই দুরবস্থা হউক এখনও প্রাচীনভারত-সঙ্গীত ভারতবাসীকে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরস উপভোগ করাইতেছে তাহার তুলনা অধুনা-সৃষ্ট অন্য কোন শিল্পের মধ্যে নাই। এ সঙ্গীতের ভিত্তি জাতীয় আত্মার গভীরতম স্তরে নিহিত। খাঁটু প্রভৃতি সিনেমা-থিয়েটার-রসিক তরুণ বঙ্গ তাহা অস্বীকার করিতে পারে, কারণ তাহাদের অন্তরাত্মার দ্বার আজ সকল প্রকার গভীর রস-তত্ত্ব-বোধের পক্ষে নিরুদ্ধ। কিন্তু দ্বার একদিন খুলিবেই এবং তখন ঐ ওস্তাদদিগের নিকটে তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তরুণ-সঙ্গীত-সংস্কারকগণ যে তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখেন সেই তরুণদের ধারণা ওস্তাদি সঙ্গীত একটি কিম্ভূতকিমাকার হাস্যাস্পদ পদার্থ। এই ভ্রান্ত ধারণা অবস্থা বিশেষের। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন

"মন গরীবের কি দোষ আছে?
বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচায় তেমনি নাচে।"

আর একটি কথা, প্রায় শুনিতে পাই যে ধ্রুপদের যুগ গত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গজল, ঠুংরী, টপ্পাই নাকি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী। তবে নিরবচ্ছিন্ন গজল, টপ্পা, ঠুংরী এক ঘেয়ে হইতে পারে, তাই ধ্রুপদ ও খেয়াল অন্ততঃ মিউজিয়মে তুলিয়া রাখিবার মত বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথার উত্তর রামপ্রসাদের গানে পাইয়াছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল গভীর ও স্থায়ী রসের সৃষ্টি করে; গজল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির নিম্নস্তরের চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী লঘু মনোহারিতা অপেক্ষা ধ্রুপদ খেয়ালের স্থান যে বহুউর্দ্ধে তাহা কূপের জীব বুঝিতে পারেন না, কিন্তু জীবতত্ত্বদর্শী রসিক মাত্রেই তাহা অনুভব করেন। আজিকার চঞ্চল জীবযাত্রায় সেই গভীর রসের অনুভূতির অবকাশ স্বল্প; অধিকাংশ লোকেই এখন চঞ্চলচিত্ত। কিন্তু রসতত্ত্ব চিরন্তন; যুগভেদে সমাজে রসবোধের প্রসার বা সঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু এই আবর্ত্তনের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চতম শিল্পের চিরন্তন রসভাণ্ডার রক্ষা করিয়া যান তাঁহারাই জাতীয় সভ্যতার ও মানব সভ্যতার প্রকৃত ভাণ্ডারী। যাহা নিত্যকালের সম্পত্তি তাহার উপর ক্ষণিক যুগধর্ম্মের দাবী খাটে না। এই স্থানে সামান্যতঃ বলিয়া রাখি, যুগধর্ম্ম বা কালধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা আমার মনে হয় না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। আমার "নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব" ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিশদরূপে বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রচলিত ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, অর্থকরী শিক্ষার ফল স্বরূপ এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই সকল গভীর চিন্তার স্থলে মহাত্মা শঙ্করের "অর্থমনর্থম্" কথার গূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়।

অনেকের ধারণা "বাঙ্গলা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢং আমদানী করিতে গেলে সে চেষ্টা সার্থক হইবে না। বাঙ্গলা গানের মধ্যে একটু বাঙ্গালীত্ব থাকা চাই।" প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক শ্রীমান দিলীপকুমার। তিনি বলিতে চান যে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের গানে হিন্দুস্থানী স্বর বৈচিত্র্যের সহিত বাঙ্গলা কাব্যের দরদের অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য হইয়াছে। অতুলপ্রসাদের ঠুংরী-অঙ্গ গান ও কাজীনজরুলের গজল-অঙ্গের গান সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই বলিতে চান। বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য এই যে বাঙ্‌লা গানে এই সকল আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গান সমূহে কি ভাবে এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই। বুঝাইবার কিছু থাকিলে বুঝাইয়া বলিতেন।

বাঙ্‌লা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ রাগিণী শুদ্ধ-স্বর প্রয়োগ চেষ্টা বহুকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। জয়দেব মহাপ্রভুর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। পরে গৌরাঙ্গদেবের সময়ে যখন ধর্ম্মভাবের রোল ছুটিয়াছিল, তখন ধর্ম্মার্থে সমবেত হইয়া প্রচার কার্য্যের জন্য কীর্ত্তনাদি গান পুনরায় প্রচলিত হইল। ইহাতে বাঙ্‌লা কাব্যের দরদ রক্ষা করিয়া রাগ রাগিণীর

দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া পুরাদমে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা হইয়াছে।

সমসাময়িক বাবা হরিদাস স্বামী নিজ শিষ্যদের দ্বারা রাগ রাগিণীর বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে কীর্ত্তন গানের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া রাগ রাগিণীর সম্পূর্ণ সম্পর্ক না রাখিয়া কয়েক প্রকার গানের উদ্ভব হইয়াছে। যথা, ঢপ্, বাউল, রামপ্রসাদী গান। এই সকল গানের মধ্যে এক এক প্রকার বিশেষ রসের উদ্বোধন হইয়াছে, এবং বাঙালী হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই উহাদের উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সুর মুখ্যতঃ কাব্য রসের বাহন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতকলা তাহার নানা বিচিত্র উপাদান ও অলঙ্কার লইয়া স্বকীয় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠান লাভ করে নাই; করিল স্বর্গীয় দেওয়ান মহাশয়ের গানে, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থার বহু ধর্ম্মসঙ্গীতে, নিধুবাবুর টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে, গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমময় আত্মনিবেদনে।

ইতিপূর্ব্বে আদর্শ স্বরূপ যে তিনটি সঙ্গীত-রচয়িতার নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের ন্যায় নব্য বঙ্গের অধিকাংশ সঙ্গীত-রচয়িতাদের গানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের গানে কথার এত আধিক্য যে তাহার মধ্যে সুরের স্বচ্ছন্দ লীলা পদে পদে ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য তাহা স্বর-বিন্যাসের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে "বাগর্থ" বিন্যাসের দ্বারা নহে। গান যদি রাগ-পদ-বাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে রসসৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ মীড়গমক মূর্চ্ছনাদি সুরের কারুকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুরের সৌন্দর্য্য প্রকাশের পক্ষে গানের বাক্যাংশের উপাদান স্বর ব্যঞ্জনাদি বর্ণের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বরবর্ণের মধ্যে আ, এ এবং ও, ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ, ল, হ প্রভৃতি বর্ণ গমক প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিন্দুস্থানী গান প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদের রচিত, সেই জন্য তাহাদের সুরের স্বচ্ছন্দ-বিকাশের অবকাশ দিয়া বাক্যাংশকে যোজনা করা হয়, এবং যে স্থানে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে সে, স্থানে তদুপযোগী বর্ণ ব্যবহার করা হয়। সে গানে বাক্যাংশ এলোমেলো ভিড় করিয়া সুরকে চাপিয়া মারে না বরং প্রচুর অবকাশ দিয়া সুরকে স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয়, আবশ্যক মত সুরের সহকারী হইয়া রাগের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করে। উপরন্তু প্রকৃত রাগ রচয়িতাকে রাগ, তাল, লয়, ছন্দ, রূপরসের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকলের বিশেষ বিবৃতি লিখিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং পাঠকেরও বিরক্তির সম্ভাবনা, সেই কারণে সংক্ষেপে বলি। ধ্রুপদ-অঙ্গের তালের মধ্যে সাধারণতঃ আট-দশটি তালের ব্যবহার দেখা যায়; যথা চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁক্‌তাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের ছন্দ ও গতিপ্রবণতা পৃথক। চৌতালের জন্য যে গান রচিত তাহা অন্য কোন তালে গীত হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ ধামার বা অন্যান্য তালের গান অন্য তালে গীত হইবার উপায় নাই। টপ্পা ঠুংরী ধরণের গান, ধ্রুপদ অঙ্গের তালে কিম্বা ধ্রুপদ অঙ্গের গান টপ্পা, ঠুংরী ধরণের তালে গীত হইতে পারে না। এই হইল তাল, লয়, ছন্দ বিষয়ের কথা। রাগ, রূপ ও রসের বহু ব্যাপার। রাগ বিশেষের রস বা ভাব বিশেষের কথা শাস্ত্রে আছে। সাহিত্যসেবক সমিতির সভ্যগণ তরুণ। তরুণদের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া আদি রসের (অনুরাগ) ব্যাপার লইয়া রাগ, রূপ ও রসের ব্যাপার একটু 'তা না না' করিয়া সঙ্গীতাচার্য্য-গণের গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। 'তা না না না' এই যে:—উপনিষৎ বলিলেন, ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভেদ, যেমন সূর্য্য ও তাহার জ্যোতি বা হীরক আর তাহার দীপ্তি। গুণঃক্ষোভ হইলে বিকাশ বা সৃষ্টি হয়। পুনরায় গুণত্রয়কে (সত্য, রজ, তম) সংযত করিয়া শক্তির বিকাশ রহিত করাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্ত এই সিদ্ধান্তকে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ, মায়া বা অজ্ঞানতা বলিয়াছেন। এই মায়া অর্থাৎ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হইবে। এই মূল ধরিয়া সাংখ্যকার তাহাকেই পুরুষ প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝাইলেন। এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহার ফলে বৈষ্ণবেরা নাড়া-নাড়ী, আর আমরা সাহেব-মেমে পরিণত হইয়াছি। এখন ডাইভোর্স ব্রতাবলম্বন করিলেই আমরা সহজে অদ্বৈত

ইয়া সর্ব্বব্যাপী হইতে পারিব। বেদান্ত আমলের
ান, যথা :—

ভৈরবী—তাল চৌতাল

"আদি রমা জ্যোতিকো যো জানে জানে অন্তর্যামী।
পাবে যৈ সে যোগী ধ্যায়ে তাহে দেত অচল স্মরণ"॥ ইত্যাদি।

সাংখ্যযোগ ভাবের গান, যথা :

পুরিয়া—তাল চৌতাল

"আজু কেতকী সে কেশোরায়, গুলাব সে গোপাল লাল,
মোগরে সে মদনমোহন, পিয়ারি ছব দেত।
দাওদী সে দামোদর, শীলা সে শ্রীজগন্নাথ,
পারলে মে অপার ব্রহ্ম, সেউতী সে সীতারাম সর-রস পিয়ে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-লীলার গান বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে আমার কিছু
লিবার আছে। সাহিত্যসম্রাট অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার
ৃষ্ণ-চরিত গ্রন্থে বলিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম
নাতন ভাবেন তাঁহাদের জন্য তিনি কৃষ্ণ-চরিত লিখেন
াই; আমাদের মত ভাবাপন্ন লোকের জন্যই লিখিয়াছেন।
স জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব ধরিয়াছেন। আমিও
ঽস্থানে তাঁহারই পদ স্মরণ করিলাম। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে
ূর্ণ-ব্রহ্ম ভাবেন তাঁহাদের গান :

জৈমিনি-কল্যাণ—তাল চৌতাল

১। "পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলখ, নিরঞ্জন অব্যক্ত অবিনাশী
নর হর নারায়ণ নরোত্তম।" ইত্যাদি

ভক্তি ভাবের গান, যথা :

মুলতানী—তাল ধামার

২। "মৈনে দেখি অনোখি হোরিরে। মনোমোহন কি
কুঞ্জ গলিন মে অনুপম সোর মচোরি।
মমতা কেশর ভর পিচকারী মারতুহৈ বরজোরী,
জ্ঞান গুলাল উড়ে অতি ভারী, উড়ে ভব ঝোঁরী।"

প্রেম ভাবের গান, যথা :

খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

৩। "এ সখি শ্যামরো রূপ-যৌবন মন ললচায়ে, অধর
ধর মধুরী মধুরী মুরলী বজায়ে। সপ্ত সুর
তিন গ্রাম গায়ে শুনায়ে, মনমে মনমে নিরত
কর ভাব বতায়ে॥"

প্রতীক্ষা ভাবের গান, যথা :

আসাবরী—তাল চৌতাল

৪। "সোগনহো আজু তোর আলী, ভুজ ফরকত
মোরি পিয়া মিলনকো। মনসে উমগ ভই,
পিয়াকে আবন লাগী ঘরি পলন গিনন কো"

বিরহ ভাবের গান, যথা :

মালকোশ—তাল সুরফাঁক্তা

৫। "আওন কহগয়ে অজহুন আয়ে, সব নিশ বিতি,
সোহে গিনবত তারা। দীপ জ্যোত মলিন হোত
চলি আয়ে, কেয়া করি এ সখী নিত ভর মারে॥"

অভিমান ভাবের গান যথা :

কামোদ—তাল ধমার

৬। মত বারো ঠঢ়ো বাট মাঝ, মতো বারো কঠিন ভয়ো ঘর যায়েরী,
সজনি জিয়া কাঁপত, জহ জহ পড়ত স াঁঝ। ইত্যাদি

বিষাদ ভাবের গান যথা :

শঙ্করা—তাল ধমার

৭। হারে নিরদয়ীরে লুংগর-মোহন মোহলই।
জবসে শ্রবণ শুনি বাঁশরী, সুধ বুধ বিসর গই॥ ইত্যাদি

গোপ বালকদের বিরক্তির গান, যথা :

অলৈয়া—তাল ঝাঁপতাল

৮। 'ইয়ালে তোরি লাকরি কামরি লে, গৌয়ে চরাওন ন
জাউরী মায়ী। সঙ্গকে গোয়াল বলভদ্র কিউনি মোকলো,
বনমে অকেলো ন জউরী মায়ী॥"

সখা ভাবের গান, যথা : (গোপিনীর)

মুদ্রাকানড়া—তাল রূপক

৯। "কনৈহা যানে দেহো যমনা জল ভরণ, আপন দান
লে কনাহি। হমারে সঙ্গকি দুর নিকম গয়ী,
পরিহো তোরি পইয়াঁ।॥"

ভাবের লঘুগুরু বিচারে ও যে সময়ে গান গীত হইবে সেই
সেই সময়ের অনুযায়ী রাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাল
নির্ব্বাচনও সেই অনুসারে করিলে রাগ ও ভাব সুন্দররূপে
ফুটিয়া উঠিবে, এতদ্ভিন্ন অন্য-পন্থা গ্রহণে রসের কিছু অভাবই
পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত গান কয়টির কেবল স্থায়ী এবং

মনে মনে বল্লুম তাই হবে। জিজ্ঞেসা করলুম তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই?

নাম শুনে যেন চম্‌কে গেলুম। জানোত গোঁসাই ও-নামটা আমার করতে নেই?

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, ' জিজ্ঞেসা করলুম বন্ধু দেখ্‌তে কেমন? বয়স কতো? গোঁসাই কত-কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেলনা, কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে লাগ্‌লো। তুমি ভাব্‌বে এমন মানুষ তো দেখিনি,—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি।

বলিলাম, তার পর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজে-কর্ম্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আস্‌বে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাবো কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল. সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসেনা। পূর্ব্ব-জন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে?

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, আমি জানি তুমি থাক্‌তেও আসোনি, থাক্‌বেও না। যত প্রার্থনাই জানাইনে কেন দু'-এক দিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সাম্‌লাবো তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্ব্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং, ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমল-লতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়-হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়-বার্ত্তায় তাহার গানে তাহার যত্ন ও অতিথি-সেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে, এবং সেই ভালো-লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই কিন্তু, দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রু-মোচনে ও মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে আমার তিক্ততায় এমন পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি স্বস্তি রহিল না। জানিনা কোন অশুভ-লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যেন এক-পুঁটুর জাল কাটিয়া আর-এক-পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়-মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এ দিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙ্গাইতেছে, এই অসময়ে অযাচিত, নারী-প্রেমের বন্যা নামিল না কি, কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়-ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচির হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবেনা এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধু-সঙ্গ মাথায় থাক্‌, স্থির করিলাম কালই এ স্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল —এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়েছি গোঁসাই।

—বলো কি? পেলে কোথায়?

—সহরে লোক পাঠিয়েছিলাম। যাই, তৈরি করে আনিগে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

—না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেই দিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত, নিষেধই আছে তবু, ও-জিনিষটা যে আমি ভালোবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং সহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানিনা, বর্ত্তমানেরও না, কেবল আভাষে এইটুকুই শুনিয়াছি তাহা ভালো নয়, তাহা নিন্দাই, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি, আমার কাছে সে কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজি হই নাই। আমার কৌতূহল নাই,—কারণ, প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না,—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমল-লতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানিনা কে তাহার অত্যন্ত স্নেহের ধন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্ন-সাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানেনা,—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার গোপন কিছুই নাই,—তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়।

* * *

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল, সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্ত্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমল-লতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমল-লতা হাসিয়া বলিল, না, সোণার-বেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে তো প্রভেদ নেই,—ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ, আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হলেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই তো মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মতো হয় নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। এমন শান্ত, আত্ম-ভোলা মিষ্টি-মানুষ আর কখনো দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কা'কে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধলো, গহরের বাপ ছিল বদ্‌রাগী লোক, আমরা তো ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টা কয়েক পরে চুপি-চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটা কতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হোলো?

বলিলাম, আমরাও তো তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থাম্‌লে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বল্‌লেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু। ও দিব্যি নেয়ে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলে-পুড়ে মরচি! কি দরকার বলোত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ-অভিমান ধুয়ে-মুছে নির্ম্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কতবড় গুণ তা' ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোসাঁই?

মনে মনে বল্‌লুম তাই হবে। জিজ্ঞেসা করলুম তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই?

নাম শুনে যেন চম্‌কে গেলুম। জানোত গোঁসাই ও-নামটা আমার করতে নেই?

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, 'জিজ্ঞেসা করলুম বন্ধু দেখ্‌তে কেমন? বয়স কতো? গোঁসাই কত-কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেলনা, কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে লাগ্‌লো। তুমি ভাব্‌বে এমন মানুষ তো দেখিনি,—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি।

বলিলাম, তার পর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজে-কর্ম্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আস্‌বে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাবো কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসেনা। পূর্ব্ব-জন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে?

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, আমি জানি তুমি থাক্‌তেও আসোনি, থাক্‌বেও না। যত প্রার্থনাই জানাইনে কেন দু'-এক দিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সাম্‌লাবো তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্ব্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং, ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমল-লতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়-হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়-বার্ত্তায় তাহার গানে তাহার যত্ন ও অতিথি-সেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে, এবং সেই ভালো-লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই কিন্তু, দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রু-মোচনে ও মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে আমার তিক্ততায় এমন পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি স্বস্তি রহিল না। জানিনা কোন অশুভ-লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যেন এক-পুঁটুর জাল কাটিয়া আর-এক-পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়-মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এ দিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙ্গাইতেছে, এই অসময়ে অযাচিত, নারী-প্রেমের বন্যা নামিল না কি, কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়-ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচির হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবেনা এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধু-সঙ্গ মাথায় থাক্‌, স্থির করিলাম কালই এ স্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়েছি গোঁসাই।

—বলো কি? পেলে কোথায়?

—সহরে লোক পাঠিয়েছিলাম। যাই, তৈরি করে আনিগে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

—না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেই দিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত, নিষেধই আছে তবু, ও-জিনিষটা যে আমি ভালোবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং সহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানিনা, বর্ত্তমানেরও না, কেবল আভাষে এইটুকুই শুনিয়াছি তাহা ভালো নয়, তাহা নিন্দাই, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি, আমার কাছে সে কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজি হই নাই। আমার কৌতূহল নাই,—কারণ, প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না,—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমল-লতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানিনা কে তাহার অত্যন্ত স্নেহের ধন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্ন-সাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানেনা,—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার গোপন কিছুই নাই,—তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়।

* * *

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল, সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্ত্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমল-লতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমল-লতা হাসিয়া বলিল, না, সোণার-বেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে তো প্রভেদ নেই,—ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ, আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবই এক হলেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই তো মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মতো হয় নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। এমন শান্ত, আত্ম-ভোলা মিষ্টি-মানুষ আর কখনো দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কা'কে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধলো, গহরের বাপ ছিল বদ্‌রাগী লোক, আমরা তো ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টা কয়েক পরে চুপি-চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটা কতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হোলো?

বলিলাম, আমরাও তো তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থাম্‌লে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বল্‌লেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু। ও দিব্যি নেয়ে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলে-পুড়ে মরচি! কি দরকার বলোত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ-অভিমান ধুয়ে-মুছে নির্ম্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কতবড় গুণ তা' ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোসাঁই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমল-লতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরূ-ওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখোনি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও-তো আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোসাঁই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

—বেশ, বলো।

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মতো নত-মুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিগ্রহে জয়ী হইয়া এক সময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন, আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরেনা গোঁসাই। আমাদের বড়-গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকি-ধিকি জল্‌চে। কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও তো বাড়াতে পারবো না। আমার এ-পথে আসাই যে তা হলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন। কিন্তু, মেয়ে-মানুষ তো,—হয়ত, সব কথা খুলে বলতেও পারবোনা।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগেনা কমল-লতা। তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহঙ্কার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্দ্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এসব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমল-লতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো,—জীবনে হয়ত, আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে তো আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কালকের পরে আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যই বল্‌তে চাও? না, কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে,—আমি সেই আশা নিয়েই থাক্‌বো। কিন্তু যথার্থই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জান্‌তে ইচ্ছে করেনা? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাক্‌বে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে-লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুক্‌তে দাওনা, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

—কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

—হাঁ, এই তো মনে হয়। কিন্তু কে-ও?

—কে-ও? ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই তো অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী, মানুষের ওপর থেকে এতবড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও,—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আমার সকল সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ, ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না,—জগতে অতো ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালোবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারি ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গোঁসাই, এতো শুধু ওর বাইরেটা,—ওর ভেতরের পরিচয়টা শোন।—

—বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল,—আমার আরও দুটি ছোট ভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ী আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারি লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় বলে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ। মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়ীতেই থাকেন, আমি পূজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতাম মাস খানেকের বেশি থাক্‌তে পারতাম না। আমার ভালোও লাগতো না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই। তাঁর নামের জন্যই গোঁসাই, তোমার নামটা তোমার বন্ধুর মুখে শুনে আমি চম্‌কে উঠি। এই জন্যেই নতুন-গোঁসাই বলে ডাকি, ও-নামটা তোমার, মুখে আনতে পারিনে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর ?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে আজ তোমার দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়েস যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তান সম্ভাবনা হলো—

শুনিয়া ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাক্‌তো, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালোবাসতো তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বোল্‌লাম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাই নি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মতো আমাকে একটু সাহায্য করো,—আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝ্‌তে পারে নি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বোল্‌লাম, দেরী করলে হবেনা ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না। সে ভাব্‌তো আমাকে দেবতা, ডাক্‌তো আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল যেন আর শেষ হতেই চায় না। বল্লে, উষা দিদি, আত্ম-হত্যার মতো মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড়ো অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও ? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির করে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য কোরব না। এ ছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন কোরব। তার জন্যেই আমার মরা হলো না।

ক্রমশঃ, কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বল্‌লেননা, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায় দু-তিন দিন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারলেন না। তারপরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হলো মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল ক'রে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানিনে কিন্তু যে-শিশু গর্ভে এসেছে মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবেনা সেই ভরসাতেই যেন অর্দ্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চল্‌লো, দীক্ষাই বলো আর ভেখই বলো তাও আমাদের সাঙ্গ হলো, আমার নতুন নামকরণ হলো—কমললতা। কিন্তু, তখনো জানিনে যে বাবা দশহাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিন কয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহ খানেক হবে। মন্মথকে বড়-একটা দেখিনে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এম্‌নিই ক'দিন যায়, তারপরে শুভ-দিন আবার এসে উপস্থিত হলো। স্নান করে, শুচি হয়ে শান্ত মনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষণ্নমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিল্‌লো, হঠাৎ, সমস্ত মনের ভেতরটায় যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে তার পায়ের ধূলো একটু মাথায় নিয়ে আসি। কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠ্‌লোনা।

আমাদের কলকাতার পুরণো দাসী কি-সব জিনিস-পত্র নিয়ে এলো, সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারি হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বল্‌লে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বল্‌লে, মন্মথ হঠাৎ দশহাজারের বদলে বিশহাজার টাকা দাবী করে বসলো। আমি কিছুই জানতুম না চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেসা করলুম মন্মথ কি টাকার বদলে রাজি হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বল্‌লে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা তো সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ, জাত-কুল-মান সব যাবে। মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বল্‌লে দায়ী তো সে নয়, দায়ী তার ভাই-পো যতীন। সুতরাং, বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় তো বিশ হাজারের কমে পারবেনা। তা'ছাড়া পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া,—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিলো তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হলো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে বল্‌লে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জ্জন করে উঠ্‌লো—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম! যে লোক তোকে ভাত-কাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্ব্বনাশ! কি কালসাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম!—ভেবেছিলাম বাপ-মা মরা ছেলে মানুষ হবে! ছি ছি—এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত করতে লাগ্‌লো, বল্‌লে, একথা ঊষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস্, না।

যতীন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, ঊষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি তো কখ্‌খনো মিথ্যে বলেননা,—এতবড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে তো কিছুতেই বার হতে পারেনা।

মন্মথ আর একবার তর্জ্জন করে উঠ্‌লো—ফের! তবু অস্বীকার করবি পাজি হতভাগা শয়তান! জিজ্ঞেসা কর্ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন!

কর্ত্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্ত্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জান্‌তো, এরপরে আর প্রতিবাদ করলেনা, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেলো। কি ভাবলে সে-ই জানে।

রাত্রে কেউ তার খোঁজ করলেনা, সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখ্‌লে আমাদের ভাঙা আস্তাবলের এক কোণে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌চে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচের বিধি আছে কি না জানিনে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়,—সে যাই হোক্, শুভ-দিন দিন কয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল,—তার পরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ, শুচি হয়ে মন্মথ-গোঁসাই মালা-তিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ সংকল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মেই ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। মন্মথর অশৌচ গেলো, কিন্তু পাপিষ্ঠা ঊষার অশৌচ ইহ-জীবনে আর ঘুচ্‌লোনা নতুন-গোঁসাই।

কহিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিলনা। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্নকরা উচিত কিনা ভাবিতেছিলাম বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, দেখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাস মতো জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মতো কোরে বুঝে রেখেচি গোঁসাই। স্পর্দ্ধাভরে তুমি কতলোককে বল্‌তে শুনবে কিছুই হয়না। তারা কতলোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার তো কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছুই আমাদের হয়নি। হ'লে একে এতো ভয়ঙ্কর আমি বল্‌তুমনা। কিন্তু তাতো নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দ্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলোত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এম্‌নিই হয়, এম্‌নি কোরেই ঠাকুর বোধহয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম, তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ পুণ্যের উপলব্ধি অর্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমল-লতা, এরপরে কি হলো?

শুনিয়া সহসা সে যেন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বলো গোঁসাই এরপরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

—সত্যিই বল্‌চি করে।

বৈষ্ণবী বলিল আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলাম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিন চারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলাম। বাবা কেঁদে বল্‌লেন, আমি তো আর থাক্‌তে পারিনে মা। বোল্‌লাম, না বাবা, তুমি আর থেকোনা তুমি বাড়ী যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবোনা।

বাবা বল্‌লেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি তো মা?

বোললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা কোরোনা।

কিন্তু তোর মা যে এখনো বেঁচে রয়েছে ঊষা?

বোল্‌লুম, আমি মরবনা বাবা, কিন্তু আমার সতী-লক্ষ্মী-মা, তাঁকে বোলো ঊষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাবেন বাবা। চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কমল-লতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল, বাড়ী-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল,—তারা যাচ্ছিলো শ্রীবৃন্দাবনধামে,—আমিও সঙ্গ নিলাম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কতদিন কেটে গেল—

বলিলাম, তা' জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শত-সহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ তো তুমি বল্‌লেনা কমল-লতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্ম্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম না, না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইচি কমল-লতা।

এবার সে হাসিল না বটে কিন্তু চাপা-হাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে-বাবাজী ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বল্‌তে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক্‌। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বলো। গোঁসাইজি দ্বারিকদাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমল-লতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

—গুরুদেব? তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছো?

শেষ ভুল

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার কল্পনা-মাঝে আমি যা'রে পূজি
বাহির-ভুবনে তা'রে কোথা পা'বে খুঁজি !
এ মোর নিজেরি সৃষ্টি খেয়ালের ভুল,
স্বপনে জোগাই তা'র মালিকার ফুল।

রজনী প্রভাতে জাগে, প্রভাত নিশায়
প্রসুপ্তির অন্তরেতে শান্তি খুঁজি পায়।
আমার পরাণ সেও দিবস-শর্ব্বরী
কল্পনার পক্ষে ফিরে পরিক্রমা করি'
সুরের মাধুরীলোকে, সেথায় নির্জ্জনে
রচিবে শান্তির নীড় একান্ত গোপনে
মত্ত-জনতার সর্ব্ব কল-কোলাহল
সর্ব্ব ব্যর্থতার উর্দ্ধে, স্থির অচঞ্চল।

ভ্রমিনু কতনা পথে কত দুরাশায়,
ডুবিল দু'আঁখি কত আঁখি-তারকায়।
এ দেহ তুলিতে ভরি' রূপ-সরোবরে
গাহন করিনু হায়, কতনা আদরে ;
প্রাণের পরম-তৃষা তবু মিটিল না
শুকায়ে মরিল মনে অতৃপ্ত-কামনা !

এবার সাধনা মোর সঙ্গীতের সুরে
ধরণীর ধূলি-লোক হতে বহু দূরে
গোধূলি-ধূসর-লগ্ন যেথা অন্তহীন,
বেদনা-গভীর-ছন্দে অন্তরের বীণ্
অলক্ষিতে অন্ধকারে অবিশ্রাম বাজে,
সুরের সুনীল সেই সাগরের মাঝে
আপনা ভাসায়ে চলি কোন্ নিরুদ্দেশে
স্নানশেষে বালু-তটে যেথা সিক্তকেশে
চাহিয়া সুদূর পানে দাঁড়ায়েছ তুমি
অবসন্ন দেহ মোর নিতে তুলি' চুমি'।

কূলের কামনা ত্যজি' ভাসিনু অকূলে,
সকল ভুলের শেষ হোক্ শেষ ভুলে ॥



শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়



শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়
স্বহস্ত-অঙ্কিত প্রতিকৃতি

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রার চিত্রশালায় আমরা শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত সাত খানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম। ইহার মধ্যে প্রথম চারখানি প্রতিকৃতি চিত্রণ (Portrait painting), বাকি তিনখানি কল্পনা-জাত চিত্র।

এই তরুণ চিত্রকরের বয়স মাত্র ২৭ বৎসর, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে ইঁহার জন্ম; অল্প বয়সেই চিত্র এবং ললিত কলার প্রতি ইঁহার অনুরাগ প্রকাশ পায়। ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিখ্যাত রসকার শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ইনি শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার উপদেশে Indian Society of Oriental Artsএ প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব-শিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। বৎসর দুই পরে দৈবক্রমে তিনি Bengal Ordinanceএ ধৃত হইয়া আড়াই বৎসর বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীরূপে অতিবাহিত করেন। শিল্প জগৎ হইতে সহসা এইরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া শিল্প-সাধনার পক্ষে অন্তরায় হইবারই কথা, কিন্তু ইঁহার পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। কর্ম্মে ঐকান্তিক অনুরাগ এবং অবিচল গুরুভক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চৈতন্যদেব শিল্প-সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রকৃতপক্ষে কারাজীবনেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভা উন্মেষ লাভ করে। বন্দী অবস্থায় এক বৎসর কাল দার্জ্জিলিং জেলার কালিম্পং গ্রামে অবস্থান কালে তিনি স্থানীয় লামা-শিল্পীদের সংস্পর্শে আসিয়া অধুনা-লুপ্ত অবনীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত ভারত শিল্পের রূপ-প্রকরণের সন্ধান লাভ করেন। তৎকালীন অঙ্কিত তাঁহার 'অর্দ্ধনারীশ্বর' ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' চিত্রে তিব্বতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি তাঁহার চিত্রাবলী অবনীন্দ্রনাথকে ও গগনেন্দ্রনাথকে দেখান এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া তাঁহাদের উপদেশে চিত্রগুলি বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠান। ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার চিত্রগুলি সমাদর লাভ করিয়াছে। বহু দেশীয় স্বাধীন নরপতি চৈতন্যদেবের চিত্র ক্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রাসাদ সজ্জিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি চৈতন্যদেব সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় ভারতীয় ছন্দে প্রতিকৃতি চিত্রণে (Portrait painting) মনোনিবেশ করিয়াছেন। মোগল যুগের পর হইতে ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতিতে জল-রঙা প্রতিকৃতি অঙ্কনের (water colour portrait) চলন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে আত্মবিস্মৃত বহু ভারতীয় ধনীগৃহে পাশ্চাত্যরীতিতে অর্দ্ধশিক্ষিত চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র স্থানাধিকার করিয়াছে। বহুকালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার ফলে ভারতবর্ষে যে শিল্পপ্রকরণ (Technique) পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহাকে বর্জ্জন করিয়া কোনও উচ্চ অঙ্গের শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নহে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া চৈতন্যদেব ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কনের পুনঃপ্রবর্ত্তনে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যের নমুনা-স্বরূপ আমরা চিত্রশালায় প্রথম চারটি প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আকৃতির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা তাঁহার ছবিখানি হইতে চৈতন্যদেবের কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। অপর তিনখানি ছবির মূল আকৃতির সহিত সাধারণের পরিচয় নাই, তথাপি এই তিনখানি ছবিতে প্রতিকৃতি আঁকিবার এই অভিনব এবং মনোরম পদ্ধতি দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন।

আমরা এই প্রতিভাবান শিল্পীর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

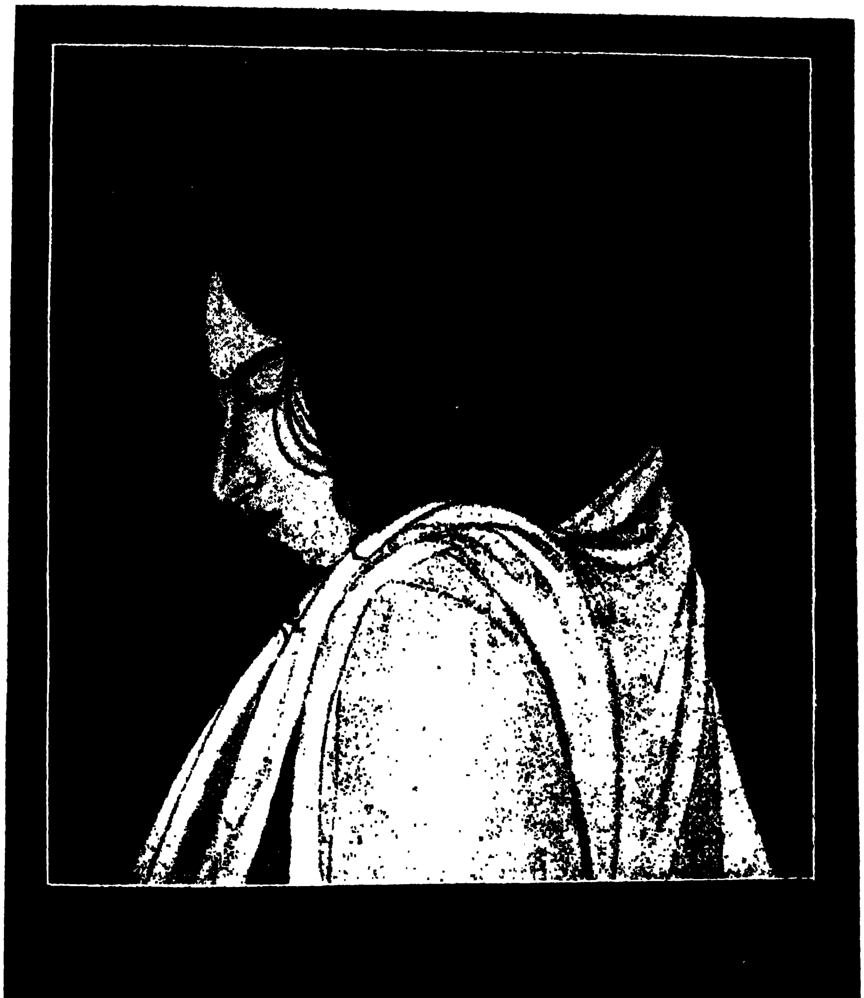
সম্পাদক

বিচিত্রা

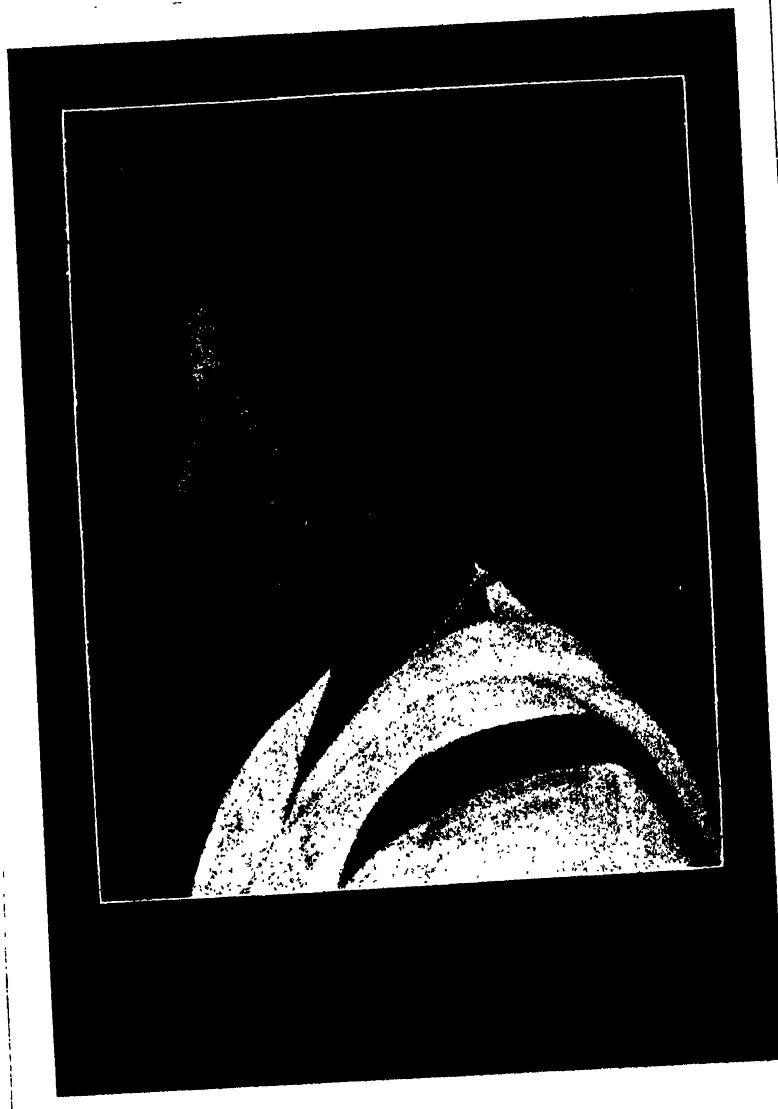
শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব



অনবগুণ্ঠিতা



বঙ্গবধূ



কুমারী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়



শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়



সমবেদনা

ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ

১

বাংলা ছন্দের আলোচনায় সর্ব্বপ্রথমেই অযুগ্ম ও যুগ্মধ্বনির ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি, অথচ * * * পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্ব্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না" (পরিচয়—১৩৩৮, মাঘ)। যুগ্মধ্বনিই যে ছন্দের প্রধান সম্পদ, একথা খুবই সত্য এবং যুগ্মধ্বনিকে যে ছন্দের মধ্যে 'নির্ব্বিচারে' ব্যবহার করা যায় না, এ কথাও সত্য। আসলে ওই যুগ্মধ্বনি-ব্যবহারের বিভিন্ন প্রণালীর উপরেই ছন্দের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অযুগ্মধ্বনির ব্যবহারের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই; সকল ছন্দেই এর মূল্য সমান। কিন্তু স্থলবিশেষে যুগ্মধ্বনির মূল্যে তারতম্য ঘটে। প্রকৃতপক্ষে আমি যুগ্মধ্বনির মূল্য নির্ণয়ের তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাংলা ছন্দকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। একটি প্রণালী হচ্ছে অযুগ্ম-যুগ্ম-নির্ব্বিশেষে শুধু ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যার হিসাব ঠিক্ রেখে ছন্দ রচনা করা। এই ধ্বনি-সংখ্যাত ছন্দের নাম দিয়েছি **'স্বরবৃত্ত'**, কেননা প্রত্যেকটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্-এর ভিতরকার তত্ত্ব হচ্ছে একটি করে অযুগ্ম (single) বা যুগ্ম (dipthong) স্বর অর্থাৎ vowel-এর অস্তিত্ব। সুতরাং ধ্বনি-সংখ্যা স্থির থাক্‌লে স্বর-সংখ্যাও স্বতই স্থির থাকে। যুগ্মধ্বনির মূল্য-নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ধ্বনিকে উচ্চারণ-কালের ব্যাপ্তি বা পরিমাণের (duration বা quantity-র) দিক্ থেকে বিচার ক'রে যুগ্মধ্বনিকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ মর্য্যাদা দেওয়া। একটি অযুগ্মধ্বনির উচ্চারণ করতে যে-সময় লাগে তার নাম হচ্ছে এক 'মাত্রা' (mora, metrical moment বা instant); কাজেই কাল-ব্যাপ্তির দিক্ থেকে যুগ্মধ্বনিকে দু-মাত্রার মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়ে থাকে। অযুগ্ম ও যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ-কালের পরিমাণ বা ব্যাপ্তির বিচারকেই ছন্দের মাত্রাবিচার বল্‌তে পারি। কাজেই ছন্দ-রচনার দ্বিতীয় প্রণালী হচ্ছে অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনির মাত্রার সংখ্যার হিসাব রক্ষা করে চলা। এই মাত্রা-সংখ্যাত ছন্দকেই **'মাত্রাবৃত্ত'** আখ্যা দেওয়া যায়। বাংলা ছন্দ-রচনার তৃতীয় প্রণালীটি হচ্ছে উক্ত দুটি পদ্ধতির যোগে উৎপন্ন একটি যৌগিক প্রণালী। এই যৌগিক প্রণালীতে রচিত ছন্দকে বল্‌তে পারি **'যৌগিক'** ছন্দ। এই যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনিগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্থানবিশেষে স্বরবৃত্তের কায়দায় এক unit-এর মর্য্যাদা পায় এবং অন্যত্র মাত্রাবৃত্তের কায়দায় দুই unit-এর মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দগুলিকে 'পয়ার-সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন সে-গুলিকেই আমি যৌগিক ছন্দ নাম দিয়েছি। গোড়ায় 'অক্ষর-সংখ্যার হিসাব রক্ষা ক'রে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দগুলি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান আকৃতি লাভ করেছে এবং বর্ত্তমান সময়েও এসব ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা মোটামুটি ভাবে স্থির রাখা হয়। তাই এই যৌগিক ছন্দগুলিকে বিকল্পে 'অক্ষর'-বৃত্ত নামও দেওয়া যায়। কিন্তু একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষর-সংখ্যা কখনও কোনো ছন্দের মূল তত্ত্ব হ'তে পারে না; ধ্বনি-সাম্যই সমস্ত ছন্দের মূল কথা। অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা না থাক্‌লেও ধ্বনি-সাম্য রক্ষিত হওয়া সম্ভব; আবার অক্ষর সংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হ'লেও ধ্বনি-সাম্য বজায় না থাক্‌তে পারে। সুতরাং বাংলা যৌগিক অর্থাৎ তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষর সংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না, ধ্বনির সমতার উপরেই নির্ভর করে।

বোধ করি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে এই

অক্ষর-সংখ্যার হিসাব স্থির রেখে ছন্দ-রচনার প্রথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অর্থাৎ তিনিই বাংলা ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার গণ্ডীর মধ্যে কঠিনরূপে বেঁধে দিয়েছিলেন। অক্ষর গোণার এই অন্ধ প্রথাটা বাংলা কাব্য-জগতের উপর এক শো বছরের উপর আধিপত্য করেছে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই বাংলা ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার বন্ধন-মোচন ঘটেছে।

প্রশ্ন হ'তে পারে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের 'বৃত্ত' কথাটির মানে কি। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যাকে আশ্রয় ক'রে 'বর্ত্তমান' থাকা যায় তাকেই বলা যায় বৃত্ত বা বৃত্তি। এ শব্দটার গৌণ অর্থ হচ্ছে ধর্ম্ম, আচরণ, জীবিকা ইত্যাদি;—যথা দুর্বৃত্ত, চৌর্য্যবৃত্তি। কাজেই যে-ছন্দ 'মাত্রা'কে আশ্রয় ক'রেই বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ যে-ছন্দ 'মাত্রা'-ধর্ম্মী তাকেই মাত্রাবৃত্ত বলা যায়; তেম্নি 'স্বর'-ধর্ম্মী ছন্দকে নাম দেওয়া যায় স্বরবৃত্ত।

আমি বাংলা ছন্দের ধ্বনিকে যুগ্ম ও অযুগ্ম এই দুটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। আর যুগ্মধ্বনির তিন প্রকার বিভিন্ন আচরণের উপর নির্ভর ক'রে সমস্ত বাংলা ছন্দকে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক বা তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত, এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌তে চাই। আমি ছন্দ সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছি তার সমস্তই সম্পূর্ণরূপে এই শ্রেণী-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই শ্রেণী-বিভাগকেই যদি স্বীকার করা না যায় তবে আমার সমস্ত আলোচনাই দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠ্‌বে। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এবং অন্যান্য কেউ কেউ এই শ্রেণী-বিভাগ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে কি মনে করেন তা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় নি। কিন্তু প্রকারান্তরে বেশ বোঝা যায় যে, তিনিও ওইরকম শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা, তিনি প্রথমত' প্রাকৃত-ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ এবং সাধু-ছন্দ বা সাধু বাংলার ছন্দ এ দুটি শ্রেণীর 'অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তার পর আবার সাধু-ছন্দের মধ্যে "পয়ার জাতীয় দ্বৈমাত্রিক" বা সম-মাত্রিক এবং 'ত্রৈমাত্রিক' বা অসম-মাত্রিক এই দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁর মতেও বাংলা ছন্দে প্রাকৃত, 'দ্বৈমাত্রিক' সাধু এবং 'ত্রৈমাত্রিক' সাধু—এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। কিন্তু সাধু-ছন্দ ও প্রাকৃত-ছন্দ, এই নামকরণটি নির্দোষ নয়; কেননা সাধু ও প্রাকৃত হচ্ছে বাংলার দুটি স্বতন্ত্র ভাষারচনা-রীতির নাম। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি ভাষারীতির উপর নির্ভর করে না, ছন্দ-প্রকৃতি নির্ভর করে ধ্বনির ব্যবহার-প্রণালীর উপর। সুতরাং ধ্বনি-ব্যবহারের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করা উচিত। যাহোক্, রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাকৃত-ছন্দ বলেন তাকেই আমি স্বরবৃত্তনাম দিয়েছি। তাঁর কথিত 'দ্বৈমাত্রিক' সাধু-ছন্দ অর্থাৎ পয়ার-সম্প্রদায় আর আমার কথিত যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অভিন্ন। আর রবীন্দ্রনাথের 'তিনমাত্রা' মূলক বা অসমমাত্রার ছন্দ আমার কথিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের এলাকার মধ্যে পড়ে। একটু পরেই দৃষ্টান্তের সাহায্য এই শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজনীয়তাটা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

২

ছন্দ এবং ছন্দোবন্ধ এক জিনিষ নয়; ওদুটি সম্পূর্ণ-রূপে স্বতন্ত্র জিনিষ। ওদুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। প্রকৃতি ও আকৃতির মধ্যে যে-প্রভেদ, ছন্দ ও ছন্দোবন্ধের মধ্যে সেই প্রভেদ। ছন্দ নির্ভর করে ধ্বনির প্রকৃতি বা ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের উপর; আর ধ্বনি-সমবায়ের বহির্গঠন-কৌশলের দ্বারা ছন্দের বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলা ছন্দের মৌলিক শ্রেণী তিনটি, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক ওরফে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু বাংলার ছন্দোবন্ধ অর্থাৎ ছন্দের বাহ্য আকৃতি বা বহির্গঠন বহুপ্রকারের হ'তে পারে—পয়ার, ত্রিপদী চৌপদী ইত্যাদি। একই ছন্দে বহুরকমে ছন্দোবন্ধ হ'তে পারে। আবার তিনটি বিভিন্ন ছন্দের বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ একই হ'তে পারে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

(১) আমি যদি | জন্ম নিতেম্ | কালিদাসের | কালে
দৈবে হতেম্ | দশম্ রত্ন | নব রত্নের | মালে।
—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) বরষার | নিঝ্‌রে | অঙ্কিত | কায়্‌
দুই তীরে | গিরিমালা | কতদূর | যায়!
—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) এলায়ে জ | টিল্‌ বক্র | নিঝ্‌রের্‌ | বেণী
নীলাভ দি- | গন্তে ধায়্‌ | নীল্‌ গিরি- | শ্রেণী।
—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত তিনটির অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত একেক জাতীয় স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত। আবার এদের বাহ্য আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওই তিনটি দৃষ্টান্তই বহির্গঠনের দিক্‌ থেকে সম্পূর্ণরূপে এক। এদের অন্তরের গঠন বিভিন্ন, কিন্তু বাইরের গঠন অভিন্ন; এরা আকৃতিতে সদৃশ হ'লেও প্রকৃতিতে বিসদৃশ। অর্থাৎ এদের ছন্দোবন্ধ এক হ'লেও ছন্দ স্বতন্ত্র।

প্রথমেই দেখা যাক্‌ উক্ত দৃষ্টান্ত তিনটির প্রকৃতি-গত পার্থক্য কোথায়। যে ধ্বনি-সমাবেশের দ্বারা ছন্দ রচিত হয় ওই ধ্বনির unit-এর প্রকৃতির উপরেই ছন্দের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যে-রকম unit নিয়ে ছন্দ-রচনায় প্রবৃত্ত হব ছন্দের প্রকৃতি সে unit-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। unit শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'একক' বা 'ধ্বনি-ব্যষ্টি' কথা ব্যবহার করব। এখন দেখা যাক্‌ উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির unit বা ব্যষ্টির প্রকৃতি-গত পার্থক্য কি। প্রথম দৃষ্টান্তটির প্রতি-পংক্তিতে যুগ্ম-অযুগ্ম-নির্ব্বিশেষে চোদ্দটি ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌ আছে। শুধু তাই নয়, এর প্রতি পংক্তি-পর্ব্বেও ধ্বনি-সংখ্যার সমতা রয়েছে; কেননা এর প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে ধ্বনি বা স্বর আছে, কেবল শেষ পর্ব্বে দুটি ক'রে। সুতরাং দেখা গেল এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে ধ্বনি, স্বর বা সিলেব্‌ল্‌। ধ্বনি স্বর বা সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা-গত সমতার দ্বারাই এছন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং এ ছন্দকে ধ্বনি-সংখ্যাত বা স্বর-সংখ্যাত ছন্দ বলতে পারি; সে জন্যেই এ ছন্দের নাম স্বরবৃত্ত। দ্ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে ব'লেই ধ্বনিবৃত্ত নাম দেওয়া নির্দ্দোষ হবেনা।

এবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির unit বা ধ্বনি-ব্যষ্টির প্রকৃতি নির্ণয় করা যাক্‌। এ দৃষ্টান্তটিতে কিন্তু ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌কে ছন্দের unit বা ব্যষ্টি ব'লে ধরা যায় না; কারণ এ দৃষ্টান্তটির পর্ব্বে পর্ব্বে কিংবা পংক্তিতে পংক্তিতে ধ্বনি-সংখ্যার সমতা নেই। কিন্তু কোনো কিছুর সমতা নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এ ছন্দই হ'তে পার্‌ত না। যে-তত্ত্বের সমতার উপর নির্ভর ক'রে এছন্দ বর্ত্তমান আছে তাকেই এছন্দের unit বলব। সে unit-টি কি তাই দেখা প্রয়োজন। প্রথম দৃষ্টান্তটির মতো এছন্দে ধ্বনিগুলিকে যুগ্ম-অযুগ্ম-নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করা হয়নি। এ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ মূল্য দেওয়া হয়েছে; কারণ যুগ্মধ্বনির উচ্চারণে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ সময় লাগে। অর্থাৎ এছন্দে অযুগ্মধ্বনি এক unit এবং যুগ্মধ্বনি দুই unit। এই unit-এর নাম হচ্ছে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র মতে 'মাত্রা'। এই 'মাত্রা' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে mora কথাটা ব্যবহার করতে পারি। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে এই unit বা মাত্রার অপর নাম হচ্ছে 'কলা'। এই 'কলা'কে ইংরেজিতে বল্‌তে পারি metrical digit। এদিক্‌ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে মাত্রা বা কলা আছে চোদ্দটি ক'রে। শুধু তাই নয়, এর প্রতি পংক্তি-পর্ব্বেও, মাত্রা-সংখ্যার সমতা আছে; কেননা এর প্রতি-পর্ব্বেই চারটি ক'রে মাত্রা আছে, কেবল শেষ পর্ব্বে দুটি ক'রে। সুতরাং দেখা গেল এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে মাত্রা বা কলা। মাত্রা বা কলার সংখ্যা-গত সমতার দ্বারাই এছন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং এছন্দকে মাত্রা-সংখ্যাত বা কলা-সংখ্যাত ছন্দ বলতে পারি। মাত্রা-সংখ্যাকে আশ্রয় ক'রে বর্ত্তমান ব'লে এর নাম মাত্রাবৃত্ত।

আমরা দেখলুম যে প্রথম দৃষ্টান্তটির ছন্দ হচ্ছে স্বরবৃত্ত। এর প্রকৃতি হচ্ছে স্বর-সংখ্যক বা syllabic। এ ছন্দকে ইংরাজিতে বলা যায় syllabic metre। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি স্বর-সংখ্যক নয়, এটির প্রকৃতি হচ্ছে মাত্রিক। অর্থাৎ এছন্দের প্রকৃতি-বিচার করতে হবে ধ্বনির উচ্চারণ-কালের ব্যাপ্তি (duration) বা পরিমাণের (quantity-র)

দিক্ থেকে। সুতরাং এই মাত্রিক ছন্দকে ইংরেজিতে বল্‌তে পারি quantitative metre।

এবার তৃতীয় দৃষ্টান্তটির ছন্দ-বিচার করা যাক্। এ ছন্দ পুরোপুরি ধ্বনিসংখ্যক ও (syllabic) নয়, মাত্রিক ও (quantitative) নয়। এ ছন্দের unit বা ব্যষ্টি কি তাই আগে দেখা প্রয়োজন। যদি শুধু ধ্বনি-সংখ্যার unit অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর হিসাব রাখা যায় তাহ'লে এ ছন্দের সমতা পাওয়া যায় না। আবার যদি শুধু ধ্বনি-পরিমাণ বা quantity-র unit অর্থাৎ মাত্রার হিসাব রাখা যায় তাহ'লেও এ ছন্দের সমতা-তত্ত্বের সন্ধান মিল্‌বে না। কিন্তু কোথাও সমতা আছে নিশ্চয়ই অর্থাৎ কোনো একটা তত্ত্বের unitকে আশ্রয় ক'রে এ ছন্দ বর্ত্তমান রয়েছে। সকলেই জানেন যে এ দৃষ্টান্তটি 'পয়ার' ছন্দে রচিত অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দটি ক'রে unit আছে। কিন্তু সেই unitগুলি কি ও কোন্ তত্ত্বের, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। উক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি-পংক্তিতে চোদ্দটি সিলেব্‌ল্ নেই; সুতরাং সিলেব্‌ল্ এ ছন্দের unit নয়। অযুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রা (mora) এবং যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা ধ'রে এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ মাত্রাও পাওয়া যাবেনা। সুতরাং মাত্রাও এ ছন্দের unit নয়। লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে যে এ ছন্দে শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি এক unit কিন্তু শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি দুই unit ব'লে গণ্য হয়েছে; একস্বর (monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনিও দুই unit। এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের কায়দা। অর্থাৎ এছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্ত-ধর্ম্মী এবং শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্ত-ধর্ম্মী। এই হিসেবে দেখা যাবে প্রত্যেক পর্ব্বে চার uuit এবং শেষ পর্ব্বে দুই unit ক'রে প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ unit ঠিক্ আছে। অতএব এ ছন্দকে বল্‌তে পারি যৌগিক ছন্দ; কেননা স্বরবৃত্তের প্রকৃতি ও মাত্রাবৃত্তের প্রকৃতির যোগে এ ছন্দের উৎপত্তি। স্বরবৃত্তের unit হচ্ছে স্বর বা সিলেব্‌ল্; মাত্রাবৃত্তের unit হচ্ছে মাত্রা (mora) বা কলা। কিন্তু এই যৌগিক ছন্দের unitকে কি বলা যাবে? কিছুই বলা যায় না, কারণ যে জিনিষটা আসলেই দুটি বিভিন্ন পদার্থের যোগে উৎপন্ন তার মূল উপাদানকে তো কোনো একটি বিশেষ নাম দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু একটা নাম দেওয়া চাই, কেননা তা না হ'লে এছন্দের unit নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা চল্‌বে কি ক'রে? তাই এই যৌগিক ছন্দের unit-কে নাম দেওয়া যাক্ 'অক্ষর'; কেননা লৌকিক কায়দায় এই পয়ার ছন্দকে চোদ্দ 'অক্ষরের' ছন্দই বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এই 'অক্ষর' জিনিষটা ব্যকরণের বর্ণ বা letter নয়, সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের 'অক্ষর' বা সিলেব্‌ল্ ও নয়। এটি হচ্ছে বাংলায় প্রচলিত অর্থের একটি অদ্ভুত জিনিষ—কখনও letter, কখনও syllable। যেমন 'জটিল' শব্দের জ এবং টি এই দুটি সিলেব্‌ল্‌ও একেকটি অক্ষর আর হসন্ত ল্-ও একটি অক্ষর। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই যৌগিক পয়ার ছন্দে চোদ্দ 'অক্ষর' না থাক্‌লেও চোদ্দ unit ঠিক্ থাকতে পারে এবং চোদ্দ 'অক্ষর' ঠিক্ থাক্‌লেও চোদ্দ unit-এর ব্যতিক্রম ঘট্‌তে পারে। কারণ একেকটি অক্ষর সকল সময় একেকটি unit-এর প্রতীক নয়। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (বিচিত্র-মাঘ); এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যাহোক্, প্রচলিত প্রথায় 'অক্ষর'-সংখ্যার দ্বারাই 'পয়ার-জাতীয়' ছন্দের হিসাব রাখা হয় ব'লে এই সব যৌগিক ছন্দকে বিকল্পে 'অক্ষরবৃত্ত' নামেও অভিহিত করা যায়।

৩

এবার উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তিনটিতে যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণ-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা যাক্। প্রথম অর্থাৎ স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণ আয়ত নয়, অর্থাৎ এদের উচ্চারণ-কাল অযুগ্মধ্বনিগুলির দ্বিগুণ নয়। কেননা স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে একটু ঠেসে উচ্চারণ ক'রে অযুগ্মধ্বনির প্রায় সমান ক'রে দেওয়া হয়। তাই এ ছন্দে মোটের উপর যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনিকে প্রায় সমান মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু মাত্রাবৃত্তে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ আয়ত এবং ব্যাপ্তি বা পরিমাণের দিক্ থেকে অযুগ্মধ্বনির দ্বিগুণ।

তাই এছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সব সময়ই একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

তখন তাদের । চতুর্দ্দিকেই | রাত্রিবেলার | প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার । পথিক-মতো
মন্দ-গমন | ছন্দে লুটায় | মন্থর কোন্ | ক্লান্ত বায়ে ;
বিহঙ্গ-গান | শান্ত তখন | অন্ধ রাতের | পক্ষ-ছায়ে।
—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটিকে কি ছন্দ বলব ? এ দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পর্ব্বেই দুটি ক'রে যুগ্মধ্বনি আছে, কেবল প্রতি পংক্তির অন্তিম পর্ব্বগুলিতে যুগ্মধ্বনি আছে একটি ক'রে। যদি এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্বরবৃত্তের কায়দায় একটু ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করি তাহ'লে এটি হবে চতুঃস্বর-পর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় একটু টেনে আয়তভাবেও উচ্চারণ করতে পারি : তাহ'লে কিন্তু এটিকে আর স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা যাবেনা ; তখন এটিকে বলতে হবে ষন্মাত্র-পর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যে-সব ছন্দকে এম্নি রূপে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় কায়দায়ই পড়া যায় অর্থাৎ যে-সব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় প্রকৃতিই যুগপৎ বিদ্যমান থাকে সে-সব ছন্দকে আমি **স্বর-মাত্রিক** নামে অভিহিত করেছি। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিকেও তাই স্বর-মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করতে পারি। তাহ'লে এ ছন্দটির নাম হবে চতুঃস্বর-ষণ্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ। যা হোক, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে স্বর-মাত্রিক ছন্দ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারার যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করছিলুম। আমরা দেখেছি স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ আয়ত। যৌগিক অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কিরূপ তা লক্ষ্য করলেই ও ছন্দের যথার্থ প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। পূর্ব্বেই দেখেছি, এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দের (word-এর) শেষ ধ্বনিটি মাত্রিক (quantitative) প্রকৃতির, আর অন্য অংশের ধ্বনিগুলি স্বরবৃত্ত (syllabic) প্রকৃতির। কাজেই এ ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটিকে মাত্রাবৃত্তের কায়দায় টেনে আয়তভাবে উচ্চারণ করতে হয় ; আর শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে স্বরবৃত্তের ভঙ্গীতে ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করতে হয়। তাই এ ছন্দে ধ্বনির সমতা রক্ষা হয়। নতুবা, অর্থাৎ এই যৌগিক ওরফে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই যদি একই কায়দায় আয়ত বা সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করা হয়, তাহ'লে, এ ছন্দের ধ্বনি-সাম্য রক্ষিত হবে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

। । ॥ । ॥ ॥
শুধু বৈকুণ্ঠের্ তরে | বৈষ্ণবের্ গান্ ?
—বৈষ্ণব কবিতা, সোনারতরী, রবীন্দ্রনাথ

এই 'পয়ারে'র পংক্তিটিতে ধ্বনি (syllable) আছে সবসুদ্ধ এগারোটি। তার মধ্যে অযুগ্মধ্বনি পাঁচটি, কোনো চিহ্নের দ্বারা এরা নির্দ্দিষ্ট নয়। আর বাকি ছ'টি ধ্বনিই যুগ্ম ; যথা— বৈ, কুণ, ঠের্, বৈষ্, বের্ এবং গান্। কিন্তু এছন্দে এই ছ'টি যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ-প্রকৃতি ও মর্য্যাদা সমান নয়। যদি স্বরবৃত্তের পদ্ধতিতে যুগ্মধ্বনিগুলিকে ঠেসে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ক'রে একেক unit ব'লে গণ্য করা যায় তবে এ পংক্তিটিকে মোটে এগারোটির বেশি unit বা ব্যষ্টি পাওয়া যাবে না। আবার যদি এগুলোকে মাত্রাবৃত্তের রীতিতে টেনে আয়ত উচ্চারণ করা যায় অর্থাৎ যদি যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রার মর্য্যাদা দেওয়া হয় তাহ'লে এ পংক্তিটিতে unit-এর সংখ্যা বেড়ে সতেরো হ'য়ে যাবে। অর্থাৎ স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কোনো পদ্ধতিতেই এ পংক্তিটিতে পয়ারের চোদ্দ unit পাওয়া যাবে না। আসল কথা এই যে, এখানে শব্দের মধ্যবর্ত্তী তিনটি যুগ্মধ্বনিকে (বৈ, কুণ্ এবং বৈষ্) স্বরবৃত্তের প্রথায় ঠেসে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ক'রে এক unit ব'লে গণ্য করা হয়েছে। আর শব্দের প্রান্তবর্ত্তী তিনটি যুগ্মধ্বনিকে (ঠের্, বের্ এবং গান্) মাত্রাবৃত্তের প্রথায় টেনে আয়ত উচ্চারণ ক'রে দুই unit ব'লে ধরা হয়েছে। তাই এ পংক্তিটিতে সবসুদ্ধ ৫ (অযুগ্ম) + ৩ (শব্দ মধ্যবর্ত্তী যুগ্ম) + ৩ × ২ (শব্দ প্রান্তবর্ত্তী যুগ্ম) = ১৪ unit আছে। তাই এ পংক্তিটির ধ্বনি-সমতা ও ছন্দ অব্যাহত আছে, এ পংক্তিটিতে চৌদ্দটি তথাকথিত 'অক্ষর' আছে ব'লেই নয়। যুগ্মধ্বনির স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির যোগে গঠিত

ব'লেই এ ছন্দকে যৌগিক ছন্দ বলেছি। এ ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির যে আয়ত বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ, তার প্রমাণ "বৈকুণ্ঠের্ তরে" কথাটার মধ্যে 'কুণ্ঠ' এবং ঠের্‌ত অংশ দুটির তুলনা কর্‌লেই পাওয়া যায়। 'কুণ্ঠ' অংশটাকে আমরা সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি; আর 'ঠের্‌ত' অংশটাকে উচ্চারণ করি বিশ্লিষ্টভাবে, যেন 'বৈকুণ্ঠের' এবং 'তরে' এই দুটি স্বতন্ত্র শব্দের স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকে। আবার যৌগিক ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে যে ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করা হয় তার প্রমাণ নীচের পংক্তিটিকে বিশ্লেষণ কর্‌লেই পাওয়া যাবে।—

কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি ॥ সুরেন্দ্র-বন্দিতা

—উর্ব্বশী, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিটিকে আবৃত্তি করার ধ্বনি অর্থাৎ এর 'পয়ার-জাতীয়' ধ্বনি সকলেরই পরিচিত। এ পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনি আছে মোট ছ'টি, যথা—কুণ্, শুভ্, নগ্, কান্, রেন্ এবং বন্। আর এই সবগুলিই শব্দের মধ্যবর্ত্তী। এই ছ'টি যুগ্মধ্বনিকেই যে আমরা পয়ারের স্বাভাবিক প্রথায় ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করি এবং একটি মাত্র unit-এর মর্য্যাদা দেই তার প্রমাণ এই যে, যদি এই ছ'টি যুগ্মধ্বনিকে আমরা আয়ত উচ্চারণ ক'রে দুই unit-এর মূল্য দিতুম তা'হলে এ ছন্দ আর পয়ারই থাকৃত না; সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির ছন্দে পরিণত হ'ত। এই ছ'টি যুগ্ম-ধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য কর্‌লে এ ছন্দটার প্রকৃতি হ'ত এ রকম—

॥ । ॥ । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥ । ।
কুন্দ শুভ্র | নগ্নকান্তি | সুরেন্দ্র বন্- | দিতা

অর্থাৎ তাহ'লে এ ছন্দটি আর চোদ্দ unit-এর পয়ার না থেকে ৬+৬+৬+২ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হ'য়ে দাঁড়াত। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি উচ্চারণ-ভঙ্গীর উপর ছন্দ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এক ভঙ্গীতে পড়্‌লে উদ্ধৃত পংক্তিটির ছন্দ হবে যৌগিক; অন্য ভঙ্গীতে পড়্‌লে তার ছন্দ হবে মাত্রিক।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্ব্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না।" আমাদের সমালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে 'পয়ার-সম্প্রদায়ের' মধ্যেও যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ 'নির্ব্বিচার' নয়। পয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যেও যুগ্মধ্বনি-ব্যবহারের একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং কবিরা স্বাভাবিক ছন্দ-বোধের দ্বারা চালিত হ'য়ে একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই ওই নিয়ম পালন ক'রে থাকেন। অর্থাৎ এই নিয়মটি তাঁদের কাছে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত না হ'লেও তাঁদের রচনার মধ্যে ওই নিয়মটি নিগূঢ়-ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে।

আশা করি বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারার প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় তা পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। ধ্বনির দুই রকমের unit নিয়ে দু'রকম ছন্দ (স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত) গঠিত হয় এবং ওই দুই রকম unit এর বিশেষ একপ্রকার সমাবেশের দ্বারা আরেকটি যৌগিক ছন্দ উৎপন্ন হয়। আরও স্পষ্ট ক'রে এই বলা যায় যে, যুগ্ম-ধ্বনির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপর স্বরবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত এবং যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা মাত্রাবৃত্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। আর যুগ্মধ্বনির এই সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট এই দুই রকমের উচ্চারণের একটি বিশেষ সমাবেশের দ্বারা বাংলা ছন্দের তৃতীয় ধারার অর্থাৎ যৌগিক বা তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গঠিত হয়।

। ॥ । ॥ । ।
"বাক্য তার্ | অনর্গল্ ॥ মল্ল সজ্জা- | শালী।

। । । ॥ ॥ ।
তর্ক যুদ্ধে | উগ্র তেজ্, ॥ শেষ্ যুক্তি | গালি।"

এই পংক্তি দুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যেখানে সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষায় কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে ব'লে আমি তো জানিনে।" (পরিচয়—১৩৩৮, মাঘ)। তাঁর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই যে অসামান্যতা "এর কৌশলটা কোন্‌খানে" এবিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যতি-স্থাপনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই এ ছন্দের ভার-সামঞ্জস্য হ'য়ে থাকে। এ ছন্দে যতি-স্থাপনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা এর প্রকৃতি অন্য ছন্দের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই। কিন্তু যতি-স্থাপনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এর ভার-সামঞ্জস্য হয় না; সে-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় যুগ্মধ্বনির বিচিত্র ব্যবহারের দ্বারা। উপরের দৃষ্টান্তটির প্রতি মনোযোগ দিলেই একথাটি বোঝা যাবে। এখানে যুগ্মধ্বনি আছে বারোটি, আটটি শব্দ মধ্যবর্ত্তী। (অযুগ্মদণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট) এবং চারটি শব্দ প্রান্তবর্ত্তী (যুগ্মদণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট)। ওই আটটি যুগ্মধ্বনিকে আমরা সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করি এবং বাকি চারিটি যুগ্মধ্বনিকে আমরা বিশ্লিষ্ট-ভাবে উচ্চারণ ক'রে পরবর্ত্তী শব্দ থেকে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের বিচ্ছিন্নতা রক্ষা ক'রে থাকি। তাই পয়ার ছন্দ অসমান ভার বহন ক'রেও সামঞ্জস্যহীন হ'য়ে পড়ে না।

৪

পূর্ব্বেই বলেছি বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান ধারা প্রকৃতিতে পৃথক্ হ'লেও আকৃতিতে সদৃশ হ'তে পারে। অর্থাৎ তিনটি স্বতন্ত্র রচনা ছন্দ-প্রকৃতির দিক্ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'লেও ছন্দোবন্ধের দিক্ থেকে সম্পূর্ণরূপে এক বা সদৃশ হ'তে পারে। পূর্ব্বে যে তিনটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছি সেগুলির বাহ্য আকৃতি অর্থাৎ বহির্গঠনের প্রতি লক্ষ্য করলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি হবে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) দূর প্রবাসে | সন্ধ্যাবেলায় | বাসায় ফিরে | এনু,
হঠাৎ যেন | বাজ্‌লো কোথায় | ফুলের বুকের | বেণু।
—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) আমি তব | জীবনের | লক্ষ্য তো | নহি,
ভুলিতে ভু- | লিতে যাবে, | হে চির বি- | রহী।

* * *

মার্জ্জনা | করো যদি | পাবে তবে | বল,
করুণা ক- | রিলে নাহি | ঘোচে আঁখি | জল।
—দায়-মোচন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(৩) প্রাণ দিয়ে, | দুঃখ স'য়ে | আপনার | হাতে
সংগ্রাম ক- | রিতে দাও | ভালো মন্দ | সাথে।
—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত। কেননা তিনটি দৃষ্টান্তের ধ্বনির unit বিভিন্ন রকমের। প্রথমটির ছন্দ স্বরবৃত্ত, এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়টির ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট। তৃতীয়টির ছন্দ যৌগিক, কেননা এখানে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথাও সংশ্লিষ্ট কোথাও বিশ্লিষ্ট। এই তিনটি দৃষ্টান্তের unit-এর ধ্বনি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের; সুতরাং এদের ছন্দ-প্রকৃতিও বিভিন্ন।

ধ্বনির অন্তঃপ্রকৃতির তরফ থেকে উক্ত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে; কিন্তু ধ্বনি-সন্নিবেশের বাহ্য আকৃতি বা বহির্গঠনের তরফ থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণরূপেই এক ধরণের। কারণ প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তির ব্যষ্টি সংখ্যা চোদ্দ। এদের মধ্যে যে শুধু পংক্তিগঠনেরই সাদৃশ্য আছে তা নয়; প্রতি পর্ব্বের আকৃতি এবং গঠন-বিষয়েও এদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কারণ প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে ধ্বনি-ব্যষ্টি বা unit আছে, কেবল শেষ পর্ব্বে দুটি ক'রে। ছন্দ-গঠনের এই বাহ্য আকৃতিকে বলেছি ছন্দোবন্ধ। সুতরাং দেখা গেল এ দৃষ্টান্তগুলির ছন্দের প্রকৃতি পৃথক্ হ'লেও, আকৃতি একই। অর্থাৎ এদের ছন্দ বিভিন্ন হ'লেও ছন্দোবন্ধ অভিন্ন।

যে-ছন্দোবন্ধে প্রথম তিন পর্ব্বে চারটি ব্যষ্টি এবং শেষ পর্ব্বে দুটি ব্যষ্টি থাকে, সে-ছন্দোবন্ধকে প্রচলিত প্রথায় বলা হয় 'পয়ার'। সুতরাং ছন্দোবন্ধ হিসেবে উপরের তিনটি দৃষ্টান্তকেই 'পয়ার' বলতে পারি। কিন্তু ছন্দ হিসেবে এরা বিভিন্ন প্রকৃতির। সুতরাং ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ উভয় দিক্ থেকে এ দৃষ্টান্তগুলির নাম হবে যথাক্রমে—স্বরবৃত্ত পয়ার, মাত্রাবৃত্ত পয়ার এবং যৌগিক পয়ার। এই যৌগিক পয়ারকেই প্রচলিত প্রথায় শুধু পয়ার বলা হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে স্বরবৃত্ত-পয়ারকে প্রাকৃত-পয়ার এবং যৌগিক-পয়ারকে সাধু-পয়ার বলতে পারি। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত-পয়ার বা মাত্রিক পয়ারকে তিনি কি বলবেন জানিনে। ইংরেজিতে এই জাতীয় পয়ারকে যথাক্রমে syllabic (স্বরসংখ্যক), quantitative (মাত্রিক) এবং mixed (যৌগিক) পয়ার বলতে পারি।

শুধু পয়ার নয়, প্রায় সব ছন্দোবন্ধের তরফ থেকে এই তিনটি ছন্দ বাহ্য আকৃতিতে সদৃশ হ'তে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) তেমনি করে | যখন কভু | আমার পানে | চাবে,
মর্ম্মভেদী | কৌতূহলের | আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখ্‌তে যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকী।
— ছায়া-লোক, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(২) বন্ধু তো- | মার পথ | সম্মুখে | জানি
পশ্চাতে | আমি আছি | বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি'
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
—দায়মোচন, ঐ

(৩) তোমার আ- | পন কোণে | স্তব্ধ করি | যবে
পূর্ণরূপে | দেখি না তো- | মায়,
মোর রক্ত-তরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।
—মুক্তরূপ, ঐ

এই দৃষ্টান্ত তিনটি যে তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দে রচিত তা আবৃত্তি করার সময় এদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং বিশেষ ক'রে এদের যুগ্মধ্বনিগুলির তিনটি বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে অতি অনায়াসেই টের পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্তরের প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র হ'লেও বাইরের গঠন প্রণালীতে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ হিসেবে এরা সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। ছন্দ হিসেবে দৃষ্টান্ত তিনটি যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দে রচিত। কিন্তু ছন্দোবন্ধ হিসেবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেরই প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি পয়ার আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি খণ্ডিত বা একোনপর্ব্বিক পয়ার। কারণ প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে তিনটি পূর্ণ পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধপর্ব্ব আছে; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে দুটি পূর্ণ পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধপর্ব্ব আছে। পর্ব্ব-গঠনের প্রণালীতেও ওই তিনটি দৃষ্টান্তের ছন্দোবন্ধ অভিন্ন; কেননা তিনটিতেই প্রতিপর্ব্বে চারটি ক'রে ধ্বনি-ব্যষ্টি বা unit আছে। কিন্তু তিনটি দৃষ্টান্তের এই unit বা ধ্বনি-ব্যষ্টি তিনটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির, একথা বলাই বাহুল্য। কারণ ধ্বনি-ব্যষ্টির প্রকৃতি স্বতন্ত্র ব'লেই তো ওই তিনটি শ্লোককে তিনটি ছন্দের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

(১) আজকে নবীন চৈত্রমাসে
পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা,
আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু।
—৩৮, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

(২) বুঝিয়াছি অনুভবে
বন-মর্ম্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।
—অদেখা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) বসন্তের জয় রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের গন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
— মাধবী, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্ত-তিনটির বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ছন্দহিসেবে এগুলি পৃথক্ বটে কিন্তু ছন্দোবন্ধ হিসেবে এক। ছন্দের দিক্ থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং যৌগিক ছন্দে রচিত; কিন্তু ছন্দোবন্ধের দিক্ থেকে এরা সকলেই দীর্ঘ-ত্রিপদী। প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেরই তিনটি 'পদে' যথাক্রমে আট, আট ও দশটি ক'রে ধ্বনি-ব্যষ্টি বা unit আছে, শুধু মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তটির তৃতীয় পদে একটি ক'রে ব্যষ্টি বেশি

আছে। যাহোক, এই দৃষ্টান্ত তিনটিকে যথাক্রমে স্বরবৃত্ত-ত্রিপদী, মাত্রাবৃত্ত-ত্রিপদী ও যৌগিক-ত্রিপদী নামে অভিহিত করতে পারি।

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ যে-দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে আশা করি তার থেকেই একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা পদ্যের ছন্দ পৃথক্ হ'লেও ছন্দোবন্ধ একই রকম হ'তে পারে। বাংলা পদ্যের ছন্দ প্রধানতঃ ত্রিবিধ এবং ছন্দোবন্ধ বহুবিধ। কিন্তু ওই বহুবিধ ছন্দোবন্ধের প্রায় প্রত্যেকটিকেই ওই ত্রিবিধ ছন্দেই প্রয়োগ করা যায়।

৫

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যৌগিক-ত্রিপদী ছন্দ বাংলা সাহিত্যে বহুকাল যাবৎই প্রচলিত আছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্বরবৃত্ত-ত্রিপদী ছন্দের প্রবর্ত্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ; আর তাঁরই হাতে এ ছন্দটি চরম পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত-ত্রিপদী ছন্দের অভাবটা খুব বেশি অনুভব করি। আমাদের আধুনিক কবিতায় এ ছন্দের বিরলতাটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্য-সাহিত্যের মধ্যেও এজাতীয় ছন্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব কম। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ-ত্রিপদীর আরেকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি।—

যেখানে সে বুড়া বট
নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে-দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে
বন-দেবতারা নাচে
চাঁদিনীতে রুনুঝুনু নূপুরে।

—ঘুমচোরা, শিশু, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটিতে শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি অর্থাৎ যুক্তবর্ণ আছে মাত্র একটি। কিন্তু যুগ্মধ্বনির প্রাচুর্য্যের দ্বারা এ ছন্দে ধ্বনির যে চমৎকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধু-মঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন,—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন-রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

—বধূ-মঙ্গল, প্রবাসী (১৩৩১, ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ

এ রচনাটি 'মহুয়া'তে স্থান পায়নি কেন বুঝতে পারলুম না। যাহোক্, আমার বিশ্বাস, যৌগিক-ত্রিপদী ছন্দ যেমন গুরু-গম্ভীর বিষয়ের উপযোগী, মাত্রিক-ত্রিপদী ছন্দ তেমনি গীতি-কবিতার অতি সুন্দর বাহন। আর বাংলায় মাত্রিক-ত্রিপদী ছন্দ রচনা করাও কিছু শক্ত নয়, এমন কি যৌগিক-ত্রিপদীতে যে-সব কবিতা রচিত হয়েছে সেগুলিকেও অতি অনায়াসেই মাত্রিক-ত্রিপদীতে রূপান্তরিত করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। একটু পূর্ব্বে 'মহুয়া' থেকে যে যৌগিক-ত্রিপদীটি উদ্ধৃত করেছি সেটিকে অতি সহজেই নিম্নলিখিতরূপে মাত্রিক আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়।—

বসন্ত-জয় রবে
দিগন্ত কাঁপে যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুল-গন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে
টুটিল সকল তার লজ্জা।

পাঠক 'মহুয়া'র যৌগিক-ত্রিপদীটির উচ্চারণ ধ্বনির সঙ্গে এই পংক্তি-কটির তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন, একটির ধ্বনি গুরু-গম্ভীর আরেকটির ধ্বনিতে রয়েছে গীতি-কবিতার সুর। বস্তুত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে আদি ও মধ্যযুগে এ ছন্দটিই ছিল আমাদের গীতি-কবিতার প্রধান বাহন। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রথম দিকে এ ছন্দটি আমাদের কাব্য-সাহিত্য থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের আজকালকার কবিরা আবার এ-ছন্দটিকে আদর করতে সুরু করেছেন এবং তার ফলে এ ছন্দটি আবার নবতনুরূপে

ও বিচিত্র ভঙ্গীতে আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। এস্থলে আমরা সে-আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। রবীন্দ্রনাথের চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দ অর্থাৎ মাত্রিক (quantitative) পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে বারান্তরে এ-বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

৬

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এই মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দটির উৎপত্তি ও পরিণতির ধারাটি অতি বিচিত্র ও ঔৎসুক্য-জনক। বাংলা ছন্দের ইতিহাস যখন লিখিত হবে তখন এ ছন্দটি বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সে-আলোচনার স্থান এটা নয়। এস্থলে আমি এছন্দটির গীতি-কবিতার উপযোগিতা সম্বন্ধে আর একটিমাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। পূর্ব্বেই বলেছি বাংলা কাব্যের আদি ও মধ্যযুগে এছন্দটি ছিল গীতি-কবিতার একটি প্রধান বাহন এবং প্রাচীন বাঙালী কবিদের একটি বিশেষ আদরের বস্তু। তার প্রথম পরিচয় পাই জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যে। যথা—

চন্দন- | চর্চ্চিত- ‖ নীলক- | লেবর- ‖ পীতব- |
সনবন- | মালী।
কেলি চ- | লন্মণি- ‖ কুণ্ডল- | মণ্ডিত- ‖ গন্দযু- |
গস্মিত- | শালী ‖

—গীত-গোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ গীত

এ ছন্দটি আসলে চার মাত্রার সাতটি পর্ব্বের যোগে উৎপন্ন হয়েছে। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা ক'রে সাত পর্ব্বে মোট আটাশ মাত্রা আছে। তাই অনেক সময় এ ছন্দকে আটাশ মাত্রার ছন্দও বলা হয়। কিন্তু শুধু আটাশ মাত্রার ছন্দ বললে এ ছন্দের আসল রূপটির কথাই বলা হয় না। এর আসল রূপটি নির্ভর করছে এর পর্ব্ব-বিভাগ ও যতি-স্থাপন রীতিটির উপর। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যাবে, উভয় পংক্তিতেই প্রতি পর্ব্বের পরেই একটি ক'রে ঈষদ্ যতি রয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বের পর যতিটা একটু অধিকতর স্থায়ী, আর পংক্তির শেষের যতিটা পূর্ণ বিরাম সূচক। এই তিন রকম যতিকে যথাক্রমে ঈষদ্-যতি, অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতি বলতে পারি। একটি ছেদ-চিহ্নের দ্বারা ঈষদ্-যতি আর যুগ্ম-ছেদ-চিহ্নের দ্বারা অর্দ্ধ-যতির নির্দ্দেশ করেছি। ঈষদ্-যতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট একেকটি অংশকে বল্‌ব একেকটি 'পর্ব্ব'; আর অর্দ্ধ-যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশকে বল্‌ব একেকটি 'পদ'। উদ্ধৃত শ্লোকটিতে এরকম 'পদ' আছে তিনটি, প্রথম ও দ্বিতীয় পদে পর্ব্ব আছে দুটি ক'রে এবং তৃতীয় পদে পর্ব্ব আছে তিনটি। সুতরাং ঈষদ্-যতির বিভাগের দিক থেকে এছন্দকে বল্‌ব সপ্ত-পর্ব্বিক। আর অর্দ্ধ-যতির বিভাগের তরফ থেকে এছন্দ হচ্ছে ত্রিপদী। যদি একটি ক'রে অতিরিক্ত মিল দিয়ে প্রতি পংক্তির অর্দ্ধ-যতি দুটিকে কানের কাছে আরও স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় তাহ'লেই এ ছন্দের ত্রিপদী রূপটি আরও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। এ রকম পদে-পদে মিল-দেওয়া সুস্পষ্ট ত্রিপদী দৃষ্টান্তও গীত-গোবিন্দে আছে। যথা—

মুখরমধীরং
ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং
সতিমির-পুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্ ‖

—গীত-গোবিন্দ, পঞ্চমসর্গ, একাদশ গীত

বাংলা কাব্য-রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ের" গানগুলিতেও এই মাত্রিক-ত্রিপদী ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়।—

রাউ তু ভণই কট ‖ ভুসুক ভণই কট ‖ সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া ‖ অচ্ছসি ভাণ্ডী ‖ পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ‖

— চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, ৪১

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতেও এছন্দের প্রচুর নিদর্শন আছে। তাঁদের কাছে এ ছন্দটি খুবই আদর পেয়েছিল। গোবিন্দদাসের পদাবলী থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গৌর-বরণ তনু ‖ শোহন মোহন ‖ সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণকি- ‖ রণ জিনি অম্বর ‖ সুন্দর চারু বয়ান ‖

ভাবহি ভোর ॥ ঘোর দুহু লোচন ॥ মোচন ভব-নদ-বন্ধ।
নব নব প্রেমভর ॥ বরতনু সুন্দর ॥ উয়ল ভকত জন সঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পদাবলী"তেও এছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। লক্ষ্য করার বিষয় আদিযুগের বৌদ্ধ পদাবলী এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে গীত-গোবিন্দের ত্রিপদীর অনুসরণ ক'রে সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সে-চেষ্টা সফল হয়নি। উপরের দৃষ্টান্ত দুটি আমি এমনভাবে বেছে উদ্ধৃত করেছি যেন এদুটিতে সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি যথাসম্ভব কম লঙ্ঘিত হয়। এ হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আদি ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ মাত্রিক ছন্দেই সংস্কৃত উচ্চারণ-পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে; ছন্দরক্ষা ক'রে আবৃত্তি করতে গেলে কোথাও হ্রস্বকে দীর্ঘ আর কোথাও দীর্ঘকে হ্রস্ব উচ্চারণ করতে হয়। এরূপ হবার কারণ এই যে, বাংলায় সংস্কৃত-পদ্ধতির হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ চালাবার চেষ্টাই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি সংস্কৃত উচ্চারণের বিরুদ্ধধর্ম্মী; বাংলার ধাতুতে সংস্কৃত উচ্চারণ বরদাস্ত হয়না। তাই দেখ্‌তে পাই পদাবলী সাহিত্যে সংস্কৃতের উচ্চারণ রীতি এত ঘন ঘন খণ্ডিত হচ্ছে। তার মানে এই যে ওই সাহিত্যে সংস্কৃত পদ্ধতি ও বাংলার স্বকীয় পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরোধ চল্‌ছে এবং বহুস্থলেই বাংলা পদ্ধতি সংস্কৃতকে অতিক্রম ক'রে আপন প্রাধান্য ঘোষণা করছে। তারপর ক্রমে যখন বাংলা উচ্চারণের নিকট সংস্কৃত সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হ'ল তখন বাংলা সাহিত্যে মাত্রিক ত্রিপদী বিলুপ্ত হ'য়ে গেল এবং তার স্থানে যৌগিক বা তথাকথিত দীর্ঘ-ত্রিপদী দেখা দিল। অর্থাৎ তখন আট-আট-বারো মাত্রা'র ত্রিপদীর স্থলে আট-আট-দশ 'অক্ষরের' ত্রিপদীর প্রচলন হ'ল। বোধ করি 'মাত্রিক' ত্রিপদীর এই 'আক্ষরিক' রূপান্তর অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছিল। সে-সময় থেকে উনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যে আক্ষরিক দীর্ঘ ত্রিপদীরই একাধিপত্য চল্‌ল। অবশেষে বাংলা ছন্দে রেনেসাঁস্-এর প্রবর্ত্তক ছন্দ-দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র যুগে (১৮৮৮ খৃঃ) আবার বাংলায় মাত্রিক ত্রিপদীর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। যথা—

তোমারে ঘেরিয়া ফেলি'
কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত-পবন?

—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী

'মানসীর যুগেই তিনি খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে 'আক্ষরিক' ত্রিপদীকে 'মাত্রিক' রূপ দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর এই প্রথম প্রয়াস সফল হয়নি। কেন হয়নি এবং অবশেষে কিরূপে বহু পরীক্ষার পর বাংলার প্রাচীনতম মাত্রিক ত্রিপদীটি বিংশ শতাব্দীর ছন্দ-রেনেসাঁস্-এর ফলে আবার নবতন রূপ ধারণ করেছে, সে-কথা বারান্তরে বিশদরূপে দেখাতে চেষ্টা করব। বর্ত্তমানকালে এই মাত্রিক ত্রিপদীর নবীনতম ও খাঁটি বাংলা রূপ কেমন হয়েছে দুটি দৃষ্টান্তযোগে তাই দেখিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

(১) অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয়-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া ॥

—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(২) মধুকর-পদভর ॥ কম্পিত চম্পক ॥ অঙ্গনে
ফোটেনি কি আজো?
বন্দন-সঙ্গীত ॥ গুঞ্জন-মুখরিত ॥ নন্দন-
কুঞ্জে বিরাজো ॥

—২৫, প্রবাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু

'আপনার সঙ্গে,' ভদ্রলোক বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আলাপ হওয়ায় খুব খুসি হ'লুম। আপনার লেখা আমি অনেক পড়েছি; আপনার লেখার আমি খুব অনুরাগী। আজকালকার লেখকদের মধ্যে আপনাকেই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। অনেকদিন যাবৎ ইচ্ছে ছিলো আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার; কোনো সুযোগ পাই নি। আজ দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেলো। সত্যি খুব খুসি হ'লুম।'

আমি লজ্জিতভাবে মৃদু হাস্য করে' অস্ফুট একটা শব্দ কর্‌লুম।

'আমার দিক থেকেও একটা পরিচয় দরকার। এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট যে আমিও আপনাদের ব্যবসাতেই আছি। অবিশ্যি, উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।—হ্যাঁ, কী নেবেন, বলুন? এদের এখানে এক-শো বছরের পুরোনো ব্র্যাণ্ডি আছে—তা'রি একটা? মন্দ নয়। তা-ই? আচ্ছা।—আমিও একটু লিখে'-টিকে' থাকি; বিরূপাক্ষ দেব আমার নাম।'

আমি আরো বেশি লজ্জিত হ'য়ে কিছুই বল্‌তে পার্‌লুম না; বোকার মত টেব্‌ল্‌-ক্লথের ওপর নখ্‌ দিয়ে আঁচড় কাট্‌তে লাগ্‌লাম।

'আপনার লজ্জিত হ'বার কোনো কারণ নেই; আমার নাম আপনার শোন্‌বার কথা নয়। আপনার মত পাঠকের জন্য আমি লিখি নে। মৃণালিনী-সাহিত্য-ভবন বলে' একটা ব্যাপার আছে - সেটা আমারি।'

আমি ভদ্রভাবে বল্‌লুম, 'ও।'

'মৃণালিনী-সাহিত্য-ভবনের কোনো বই আপনার চোখে পড়েছে কি? পড়া অসম্ভব নয়—ট্রেনে ষ্টীমারে বাস্‌-এ ট্রামে অনেক জায়গাতেই সে-সব বই ফিরি করা হয়। এক টাকা করে' দাম। মলাটে তিন-রঙা মেয়েমানুষের ছবি থাকে; ভেতরেও খান-কয়েক ছবি অবিশ্যি ফোটোগ্রাফ। এক-একখানা বইয়ের পেছনে যা খরচ হয়, সে অনুপাতে দাম খুব সস্তা, বল্‌তে হ'বে। এই যে। সোডা? নয় তো? রাইট্‌। সোডায় পুরাণো ব্র্যাণ্ডির সব স্বাদই চলে' যায়। Say when...তবে খরচ পুষিয়ে যায়, তিন হাজার করে' এডিশন্‌ দিই। Your health, একটা সিগ্রেট নিন্‌।

'হ্যাঁ, সিরিজটা চলে ভালো; প্রত্যেকটা বইয়ের কিছু না হোক্‌ বছরে একটা করে' এডিশন্‌ হয়ই। সবসুদ্ধ এ-অবধি আটান্নখানা বই বেরিয়েছে; পঁয়ত্রিশখানাই তার মধ্যে আমার। আপনি অবিশ্যি একখানারও নাম শোনেন নি, কারণ বাইরের মাসিক পত্রে আমি বিজ্ঞাপন দিই নে। আমার তা'তে কিছু লাভ নেই। সে-জন্য আমার নিজেরি একটা কাগজ আছে—প্রণয়িনী তা'র নাম। বছরে দেড় টাকা করে' চাঁদা—ছ' থেকে আট ফর্ম্মা পড়বার জিনিষ আর দশ ফর্ম্মা বিজ্ঞাপন থাকে। হাজার দশেক কাটে—সহরে কম, মফঃস্বলেই বেশি। ছোট সহরে, পল্লীগ্রামেই আমাদের খুব প্রচার। কাগজটা থেকে যা লাভ হয়, তা'র ওপর বইগুলোর বিজ্ঞাপনও বিনি পয়সায় হ'য়ে যায়। প্রণয়িনী যে-শ্রেণীর কাছে যায়, আমার লেখা তা'রা সব চেয়ে পছন্দ করে। তা'দের মত করে'ই আমি লিখি। আমি তা'দেরি লেখক। মাঝে মাঝে ক্যাটালগ ছেপে প্রণয়িনীর সব গ্রাহকদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই; তা'তে বইয়ের তালিকা ছাড়া আমার তৈরি কতগুলো ওষুধের বিজ্ঞাপনও থাকে। না, ডাক্তারি আমি পড়ি নি; চুল-ওঠা নিবারণ কি স্ত্রী-বশীকরণের ওষুধ তৈরি কর্‌তে হ'লে ডাক্তারি জান্‌লে চলে না। ওষুধগুলো থেকে যথেষ্ট লাভ হয়।

'হাস্‌ছেন? হ্যাঁ, ওষুধগুলো লোক ঠকানো বই কি; কিন্তু দেখুন, ঠক্‌তেই যা'রা চায়, তা'দেরকে না ঠকালে

তাদের প্রতি বড় বেশি অবিচার করা হয়। তা ছাড়া, সংসারে চলাফেরা কর্‌তে গেলে হয় ঠকাতে না হয় ঠক্‌তে হয়ই; এবং, ঠকানোটা যখন খুব বড় স্কেইলে করা যায়, সেটাই হয় মস্ত একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্‌ ব্যাপার। "The less is there of yours, the more is there of mine"—এই তো হচ্ছে সমস্ত বিজ্‌নেস্‌, পলিটিক্স—সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের মূল কথা। খাঁটি কমন্‌-সেন্স্‌ একজনের কম না হ'লে আর একজনের বেশি হয় না: এক হাজার কেরাণীর মাইনে পঁচিশ টাকা না হ'লে একজন আই-সি-এস্‌-এর মাইনে দু'হাজার হ'তে পারে না; চীন কষ্টে না থাক্‌লে জাপান ফেঁপে উঠ্‌তে পারে না। আরো দেখুন, chewing gum এমন জিনিষ নয়, যা'র অভাবে পৃথিবীর কোনো লোকের কোনো কষ্ট হ'তে পার্‌তো বা পারে; অথচ তা-ই বেচে রিগ্‌লি সাহেব কোটীপতি হ'য়ে গেলেন। শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে পৃথিবীর লোককে তিনি বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লেন যে chewing gum না চিবোলে বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই। অথচ এটা ঠকানো নয়, এটা হচ্ছে Big Business। আপনার দরকারের সময় প্রকাশক হয়-তো সামান্য কিছু টাকা আগাম করলে; পরে হয়-তো সে-বাবদ আপনাকে দিয়ে একটা বইয়ের কপিরাইট্‌ লিখিয়ে নিয়ে পঞ্চাশগুণ লাভ করলে। সেটাও ঠকানো হ'বে না; হ'বে, প্রকাশকের উদারতা, সহানুভূতি। আপনি হয় তো দেখ্‌লেন, আপনার লেখা লোকে নিচ্ছে; তখন তাড়াতাড়িতে, অযত্নে যা-তা সব চালাতে লাগ্‌লেন; সেটাও ঠকানো হ'লো না; সে-জন্য আপনার সাহিত্যিক দুর্ণাম হ'লেও নৈতিক অপবাদ কখনো হ'বে না। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছেন, লোক-ঠকানো ব্যাপারটা কায়দা করে' কর্‌তে পার্‌লে শুধু যে ক্ষমার যোগ্য, তা'নয়, রীতিমত প্রশংসনীয়, সম্মানীয় একটা গুণ হ'য়ে ওঠে। এ-গুণ যা'দের মধ্যে প্রবল থাকে, নেপথ্যে কি প্রকাশ্যে পৃথিবীকে শাসন করে তারাই।

'বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, আমি আপনার মত সাহিত্যিক নই; আমি হচ্ছি ব্যবসায়ী। সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার এটুকু মাত্র মিল যে আমি কাগজের ওপর কলম ব্যবহার করি। কিন্তু আপনাদের সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আমি বাইরে; আমার জাত নেই। জেনে-শুনেই আমি এ-পথ নিয়েছি; সুতরাং এতে আমি আপত্তি করি নে। তবু, আপনার পরিচয় আজকে দাবী করলুম বলে' আশা করি মনে কিছু করবেন না। আমার দিক থেকে এটুকু সাফাই আছে যে আমি নিজে যা লিখি, তা পড়্‌তে পারি নে। পড়্‌বার যখন ইচ্ছে হয় ভালো সাহিত্যই পড়ি: আপনাদের লেখাই পড়ি। আমার ব্যবসায় আমার নিজেরি নৈতিক আস্থা নেই। কিন্তু তা'তে কী আসে যায়? কতগুলো সাংসারিক সুখ-সুবিধে পেয়েছি—তা'র দাম কম নয়। বছর পনেরো এ-কাজে আছি; এতদিনে তা'র পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাচ্ছে। বালিগঞ্জে আমার বাড়ি তৈরি হয়েছে: আজ সে-বাড়িতে গেলুম। একটা সিট্রোঞে ছিলো; সেটা বদলে সম্প্রতি একটা নতুন ক্যাডিলাক কিনেছি। এ-এ-বি আমাকে তা'দের মেম্বর করেছে, ফির্‌পোর লম্বা-নাক ম্যানেজার আমার কাছে এসে সম্ভ্রমে বিগলিত হ'য়ে কথা বলে; নানা জায়গা থেকে চাঁদার খাতা নিয়ে আমার কাছে লোক আসে। মন্দ কী? এ-ই বা মন্দ কী? সবার জীবনে সব হয় না; যেটুকু হ'লো, তা-ই নিয়ে খুসি থাকাই হচ্ছে বিচক্ষণতা। বিশপ ব্লুগ্রামের কথা মনে করে' দেখুন; এক-একটি ছোট কেবিন নিয়ে আমাদের জীবন—তা'তে কত জিনিষই তো তুল্‌তে ইচ্ছে করে—এক সেট্‌ বল্‌জাক্‌, একটা পিয়ানো হয়-তো—কিন্তু জায়গায় কুলোয় না; যা'র পক্ষে যেটুকু সব চেয়ে দরকার, না হ'লেই নয়, তা-ই রেখে বাকিটা ফেলে দিতে হয়। বিশপ ব্লুগ্রাম তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবর্জ্জনা ফেলে দিয়ে কেবিনটি শুধু আরামের উপযোগী করে' নিয়েছিলেন। আমিও তা-ই। আমি আজ কল্‌কাতার বড়লোকদের মধ্যে একজন; শুধু এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক জিনিষই আমাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হয়েছে—সে-জন্যে আপশোষ করি নে। যা চেয়েছিলুম, তা-ই হয়েছে; আমি আজ সুখী।

'দেখুন্‌, ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা; সেখানে অন্য কোনো বিবেচনা নেই। বাজারে যা চলে, লোকে যা চায়, তা-ই দিতে হয়। লোকে যদি নাগ্‌রা পর্‌তে না চায়, তা হ'লে জুতোর ব্যাপারী স্বপ্নেও নাগ্‌রা তৈরী করবার কথা ভাব্‌বে

না। এমন যদি হয় যে ভারতবর্ষের পুরুষদের মধ্যে হঠাৎ পাছা-পাড় ধুতি পর্‌বার ফ্যাশান এলো, তখন যে-মিলওয়ালা প্রাণপণে পাছা-পাড় ধুতি উৎপন্ন না কর্‌বে, লোকে তা'কে পাগল বল্‌বে। সব ক্ষেত্রেই এ-নিয়ম চলে; শুধু বইয়ের ব্যাপারেই তা'র অন্যথা হ'বে কেন? আর্টের কথা ছেড়ে দিন, শুধু ব্যবসার দিক থেকে জিনিষটাকে দেখুন। বেশির ভাগ লোক যদি বাজে বটতলাই চায়—বেশ, বাজে বটতলাই দিতে হবে। আপনি এই সমস্ত জিনিষটাকেই দারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখেন—দেখতেই পারেন। আমিও মনে প্রাণে একে অবজ্ঞা করি, ঘৃণা করি। কিন্তু তবু—টাকা এতেই আস্‌ছে; এবং টাকা দরকারী। আমার বইগুলোর নাম হচ্ছে সতীর অভিশাপ, লাজাঞ্জলি, শেষ রাতে বিয়ে—এম্‌নি সব; আর মনে নেই, একসঙ্গে তিনটের বেশি নাম আমি কখনোই মনে রাখতে পারি নে। দুটো গল্প আছে; এক দুর্জ্জয় সতীর ওপর চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে এক দুর্বৃত্তের চরম দশা; আর—অত্যন্ত পবিত্র প্রেমের গল্প, মাঝখানে একটু মনোমালিন্য, শেষ পাতায় উলুধ্বনি। এই দুটো গল্পেরই রকমফের করে' পঁয়ত্রিশখানা বই লিখেছি—আরো পঁয়ত্রিশখানা হয় তো লিখবো। একখানা বই শেষ করতে আমার সাত দিনের বেশি লাগে না; মনে-মনে সব ছক-কাটা আছে—পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অনায়াসে, তর্‌তর্‌ করে' লিখে গেলেই হয়। মাঝে-মাঝে একটু করুণ রসের স্ক্রু মেরে কান্না বার করা—এবং দুর্বৃত্তের পাপ-মন বা প্রেমের নির্জ্জলা নিষ্কামতার বর্ণনাচ্ছলে বেশ একটু রসালো, ঝাঁঝালো মশলা মিশিয়ে দেয়া—যাকে বলে গিয়ে পেপ্‌। ব্যস্‌, হ'য়ে গেলো। যেমন স্বচ্ছন্দে লিখি, তেমনি তরতর্‌ করে বই কেটে যায়। নিজেই প্রকাশ করি; কাজে-কাজেই বেশ মোটা মার্জিন থাকে। আর, টাকা দিয়েই তো কথা—তা-ই নয়?

'আপনি হয় তো বল্‌বেন, টাকাই সব নয়—not by bread alone। হ্যাঁ, আমারো সে-ই মত—not by bread alone। আরো অনেক জিনিষ মানুষের দরকার—রুটির ওপর মাখন, আরামের উপকরণ, বিলাসের আয়োজন। কায়ক্লেশে দু'বেলা দু'টি খেয়ে যে বেঁচে থাকা, তাকেই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। কেবল শুকনো রুটি চিবানো আমার পছন্দ হয় না; রুটির ওপর বেশ মোটা এক পর্দা মাখন চাই। সেই মাখনটুকুর জন্যেই তো—আপনার গ্লাস যে খালি হয়ে গেছে, আরো একটু নিন্‌। একটা সিগ্রেট?

'জানিনে, টাকার ওপর আপনি কতটা মূল্য আরোপ করেন। কেউ-কেউ আছেন, জানি, অর্থের প্রাচুর্য্য যাঁদেরকে বাস্তবিক লুব্ধ করে না। বল্‌তে পারেন, যত বেশি টাকা, তত বেশি সুখ, এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। স্বীকার করি, সে-কথা ঠিক। কিন্তু টাকা জিনিষটাকে আমি কখনো অবহেলা কর্‌তে পারি নি; কারণ, ছেলেবেলায় আমি খুব গরীব ছিলাম। কত কষ্টে যে লেখাপড়া শিখেছিলাম, বললে উপন্যাস মনে হবে। ছেলেবেলা থেকেই একটা সুখ আমার ছিলো—স্বাধীনতা। তার মানে, এমন কেউ ছিলো না, যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারতুম। ইস্কুল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে' আস্‌ছি—আজ পর্য্যন্ত। আপনার বয়েস কম, হয়-তো তেমন-কোনো অভাবেও পড়তে হয় নি; সে-সব দিনের বৃত্তান্ত বলে' আপনাকে ক্লান্ত কর্‌বো না।

'ইস্কুলে যখন পড়ি, তখন থেকেই আমার একটু একটু লেখবার ঝোঁক। সে-সময়ে মনে দুরাশা ছিলো, লেখক হ'বো। আমার এক বন্ধু ছিলো, আমার মতই গরীব। এক সঙ্গে পড়তুম আমরা। সে-ছেলেটি কবিতা-টবিতা লিখতো—বোধ হয় খুব খারাপ লিখতো না। আমরা দু'জনে মিলে কত যে স্বপ্ন দেখতুম—বহু দুঃখে, বহু অভাবেও স্বপ্ন মরতো না। আমাদের দু'জনের ছিলো অবিচ্ছেদ্য বন্ধুতা—এক স্রোতে দু'জনের জীবন কাট্‌তো। ওর জন্যে আমি কী যে না কর্‌তে পার্‌তুম, জানি নে, এত ভালোবাস্‌তুম ওকে। দু'জনে যখন বি-এ পড়ি, ক্লাশের ছেলেরা মিলে' চাঁদা করে' ওর একটি কবিতার বই বার করে। সে-সময়ে সাহিত্য-জগতে সে-বই নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছিলো। অনেকদিন আগেকার কথা—আপনি তখন বোধ হয় শিশু। সে-বই আপনার চোখে পড়েছে কি? বইখানার নাম ছিলো 'রক্ত-মেঘে সূর্য্যাস্ত'—তখনকার পক্ষে একটু অতি-আধু-নিক—কী বলেন?'

'ও—' আমি বললুম, 'পার্ব্বতীকুমার বিশ্বাসের লেখা তো? ও-বই অনেক দিন আগে আমি একবার পড়েছিলুম—খুব ভালো লেগেছিলো। এখনো অনেক লাইন আমার মনে আছে। পরে ও-বই একখানা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে পাই নি। এখন আর পাওয়া যায় না—না, কী?'

'আপনি পড়েছিলেন বইখানা? ভালো লেগেছিলো? সত্যি? বড় খুসী হলুম শুনে'। এখনো দু' একজন ওকে মনে রেখেছে, তা হ'লে। আমার ধারণা ছিলো, ও বুঝি একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার বন্ধু বলে' বলছি না; সত্যি আমি বিশ্বাস করতুম, এখনো করি, ওর খানিকটা ক্ষমতা ছিলো; আশা করেছিলুম, ও অসাধারণ কিছু করতে পারবে। কিন্তু এমন হ'লো, ও কিছুই করতে পারলে না।'

'উনি আর কিছু লেখেন নি?'

'লিখলেও আর কিছু প্রকাশিত হয় নি। এবং, আমি বন্দুর জানি, সে-বইখানা বেরোবার পরও আর বিশেষ-কিছু লেখেও নি। ওর সেই প্রথম বই আড়াই শো কপি ছাপা হয়; তার মধ্যে দেড়-শোর ওপরে যায় বিতরণে, সব শুদ্ধ আঠারো কি উনিশখানা বিক্রি হয়, আর বাকি বইগুলো কী হয়েছে, কেউ জানে না। সম্ভবত, বইয়ের দোকানীরা বাজে কাগজের সঙ্গে সের দরে বেচে দিয়েছে। ও-বই আর দ্বিতীয়বার ছাপা হয় নি।···আর একটু নিন্।

'যা হোক্ করে' আমি আর পার্ব্বতী কলেজ থেকে বেরোলাম; আশা হ'লো এবার হয়তো একটা সংস্থান হবে। আমার নিজের জন্য ততটা ভাবনা ছিলো না, যতটা ছিলো পার্ব্বতীর জন্য। আমি বুঝতে পারতাম, পার্ব্বতীর চেয়ে আমি অনেক স্থূল প্রকৃতির লোক; আমার সাহায্যে ও যদি নিজেকে পরিণত করে তোলবার সুযোগ পায়, আমার পক্ষে সেটাই সর্ব্বোচ্চ কাজ। মনস্থ করলুম, যেমন করে পারি, ওকে আর কষ্ট করতে দেবো না; যা-কিছু কষ্ট আমাকেই যেন করতে হয়।

'কবিতা লিখে' আমাদের দেশে রোজগার হয় না; পার্ব্বতীর পক্ষে অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র পথ ছিলো চাকরি—এবং চাকরি মানে কেরাণীগিরি। পার্ব্বতীর কলম কোনো সওদাগরী আফিসের মোটা খাতার উপর নিযুক্ত হচ্ছে, এ চিন্তা আমার পক্ষে বিষের মত হয়ে উঠলো। পার্ব্বতী কবিতা লিখুক, কবিতা লিখুক—আমি ওর ভার নেবো। কিন্তু আমিই বা কী করতে পারি? সে সময়ে চাকরীর বাজার এখনকার মতো অসম্ভব ছিলো না; চেষ্টা করলে একটা কিছু হয় তো জুটে' যেতো। কিন্তু ছেলেবেলায় বহু কষ্টে যে-স্বাধীনতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম; অভাবে, লাঞ্ছনায়, দুর্দ্দশায় দিন দিন যে-স্বাধীনতা তীক্ষ্ণতরো হয়ে উঠেছে, এত সহজে তা খোয়াতে ইচ্ছে করলো না। গরীবের আত্ম সম্মান জ্ঞান বড় তীক্ষ্ণ, পাকা ফোঁড়ার ব্যথার মত একটু ছুঁলেই অসহ্য হয়ে ওঠে। ভাবলুম আমাদের কতটুকুই বা দরকার—অন্য কোনো উপায়ে চালিয়ে যেতে পারবো।······আর একটু নিন্।

আমার লেখ্বার যা-একটু ঝোঁক ছিলো, সেটাকে ঝালিয়ে নিতে লেগে গেলুম। ঠিক করলাম, উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হ'বো। ওতে পয়সা আছে। খাবার পয়সা থেকে বাঁচিয়ে তেল কিনে' রাতের পর রাত জেগে, অনেক কাটাকুটি, ছেঁড়াছিঁড়ি—বিরাট গর্ভ-যন্ত্রণার পর শেষটায় তৈরি হ'লো আমার প্রথম উপন্যাস। চারদিন রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি কর্‌বার পর একজন প্রকাশক পাওয়া গেলো—এক শো টাকায় সে কপিরাইট কিনে' নিলে। মনে অসীম ফুর্ত্তি হ'লো। উৎসাহ সাম্‌লাতে না পেরে আর একটা লিখ্তে বসে' গেলাম। প্রথম বইখানা বেরুলো; প্রকাশক বললে, মন্দ কাটছে না। বলতে কী, সে-বইটা বেশ একটু success গোছেরই হয়েছিলো; অনেক কাগজে প্রশংসা এবং নিন্দে বেরুলো; সবাই নাম জেনে গেলো। একেবারে স্বর্গে উঠে' গেলুম। প্রাণপণ করে' দ্বিতীয় বইখানা শেষ করলাম। সেখানা, আমাদের দেশের যেটা সর্ব্বপ্রধান প্রকাশালয়, তারাই নিলে। টাকাও বেশ ভালো পেলাম। ভাব্‌লুম, এবার বুঝি কপাল ফিরলো।···একটা সিগ্রেট নিন্।

'তখনকার দিনে প্রকাশালয়ের সংখ্যা আজকালকার চেয়ে অনেক কম ছিলো; একটার পর একটা বই লিখে' যাওয়া যদি বা যেতো, সেগুলো পাত্রস্থ করা সহজ হ'তো না। কোনো একজন প্রকাশকের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে'

নিতে না পারলে চলতো না। টাকার জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত লিখতেই হচ্ছে; সব সময় ভালো লাগতো না; তবু এই বলে' নিজকে সান্ত্বনা দিতুম যে অনেক কাজের চেয়েই এ ভালো। দ্বিতীয় বই বেরোবার মাস তিনেক পরে আর একটা শেষ করলুম: এটা আয়তনেও বড়, লেখাও একটু ambitious। আমার এখনো মনে হয় ও-বইটা একেবারে অপাংক্তেয় হয় নি; ও-বই পড়লে আপনিও বোধ হয় খুসি হ'তেন।

'কিন্তু কী হ'লো, শুনুন। সে-বই নিয়ে গেলুম আমাদের সেই প্রধান প্রকাশকের কাছে। অনেক আশা নিয়েই গেলুম। ভদ্রলোক মুখে খুব ভদ্র—যেতেই আধ হাত লম্বা নমস্কার করলেন। আমি বললুম, "আর একটা বই লিখেছি।"

"বেশ।" ভদ্রলোক আর-কিছু বললেন না।

'আমি পরিষ্কার করে' বলতে বাধ্য হ'লাম, "বইখানা আপনারা নেবেন মনে করে—"

"এখন আর আমাদের কোন বইয়ের দরকার নেই।" বলে'ই ভদ্রলোক মুখের সামনে একটা খবরের কাগজ মেলে' ধরলেন।

'মনটা একেবারে ড্যাম্প্ হ'য়ে গেলো—চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে' রইলাম। কী করা যায়? কী বলা যায়? মনে-মনে খানিকক্ষণ আবৃত্তি করলাম—"আমার বড্ড টাকার দরকার, এখন নিলে বড় উপকার হ'তো।" কিন্তু কিছুতেই, কিছুতেই সে-কথা মুখ দিয়ে বা'র করতে পারলাম না। অথচ দরকার, টাকার ভয়ানক দরকার, নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক দরকার। বলবো!' আর-একবার বলে' দেখবো? হয়-তো শেষ পর্য্যন্ত বলে'ও ফেলতাম, যদি না ঠিক সেই সময় ভদ্রলোক খবরের কাগজের আরাল থেকে আধ হাত লম্বা এক নমস্কার করতেন। তা'র পর আর থাকা যায় না; আমাকে উঠতেই হ'লো। রাস্তায় যখন বেরোলাম, আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

"এখন আর আমাদের বইয়ের দরকার নেই।" বটে! কতগুলো জিনিষ লক্ষ্য না করে' পারলুম না। সেই প্রধান প্রকাশক কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরীর বইগুলো—রাশিশের স্তূপ—স্বচ্ছন্দে একটার পর একটা বা'র করে' যাচ্ছে—কেন না, তিনি একজন প্রকাণ্ড জমিদার। বিজলীভূষণ অধিকারীর অকথ্য উপন্যাসগুলো সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্ন ওঠে না; কারণ তিনি ডি-লিট্. বার য়্যাট্-ল, নাম করা ব্যারিষ্টর, দশজনের একজন। যে-হেতু তিনি ডি-লিট্, বার-য়্যাট্-ল—সেই জন্যই তিনি ভালো উপন্যাসিক, সেই জন্যই লোকের চোখে তাঁর প্রতিষ্ঠা। উপলব্ধি করলুম, গরীবের পক্ষে টাকা রোজগার করা ভয়ানক শক্ত, বড়লোকের পক্ষে তা'র টাকা বাড়ানো খুবই সোজা। আপনি যদি প্রার্থী হন্, তা হ'লেই আপনাকে ঠক্‌তে হ'বে; আর, আপনার যখন তেমন কোনো দরকার থাকবে না, সবাই দেখবেন, গায়ে পড়ে' আপনাকে টাকা দিচ্ছে। যত সচ্ছলতা হ'বে, ততই স্বচ্ছলতা বাড়বে।

'বড়লোক হ'তে হ'বে, যেমন করে' হোক্, বড়লোক হ'তে হ'বে। এ-ভাবে আর চলবে না; exploited হওয়াতে কোনো পুণ্য নেই। সেই উপন্যাস অপ্রকাশিত রইলো - এখনো বোধ হয় তা'র পাণ্ডুলিপি আমার কোনো এক বাক্সয় পড়ে' রয়েছে। আমি মন ঠিক করে' ফেললুম। পনেরো দিনের দিন আর একখানা উপন্যাস তৈরি হ'লো; তা'র নাম প্রেমের পূর্ণিমা। আঃ, ব্র্যাণ্ডিটা বেশ—নয়?

'এক অন্ধকূপ গলির মধ্যে এক প্রেস খুঁজে বা'র করলুম। প্রেসের কর্ত্তা ছেঁড়া গেঞ্জি আর আট হাত ধুতি পরে' থাকতেন—ইন্‌কম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য। তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশ্যে ধর্ম্ম-মূলক সব বই ছাপা হ'তো—গীতার বাঙলা তর্জ্জমা, উপনিষদের ব্যাখ্যা—এই সব। কিন্তু আরো যে সব ছাপা হ'তো—যৌনতত্ত্ব, কামশাস্ত্র, শিক্ষিতা পতিতার জীবন কাহিনী, সেগুলোই ছিল আসল। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে—দরকার হ'লে ঘুষ দিয়ে—তিনি দিব্য ব্যবসা চালাতেন। তা'র ওপর, অশ্লীল ছবির কারবারেও তাঁর মোটা মুনাফা থাকতো। সারা জীবন ছেঁড়া গেঞ্জি পরে' কাটিয়ে মরবার সময় তিনি ক্লীন এক লাখ টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

'সেই প্রেস থেকে বেরুলো আমার প্রেমের পূর্ণিমা। পরের মাসেই আর-একখানা লিখতে হ'লো, তা'র দশদিন

পর আর-একখানা। হাওয়ায় যেন টাকা উড়িয়ে আমার পায়ের কাছে এনে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু অল্পে সুখ নেই। আমি আকস্মিক স্বচ্ছলতায় বিচলিত না হ'য়ে মাথা ঠিক রেখে একটু একটু করে' এগোতে লাগ্‌লাম। কপাল যখন ফেরে, কেউ আট্‌কে রাখ্‌তে পারে না। পাঁচ বছর পর নিজেই প্রেস কিন্‌লুম। মৃণালিনী সাহিত্য-ভবনের সূত্রপাত হ'লো, তারপর বেরুলো প্রণয়িনী। আরো পাঁচ বছর গেলো। মনে হ'লো, টাকার অঙ্কটা আরো দ্রুতবেগে বাড়া উচিত। মা-লক্ষ্মী পরামর্শ দিলেন—বা'র করলুম কতগুলো ওষুধ। আর আজ বালিগঞ্জে আমার নিজের বাড়ি, ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে আমি কল্‌কাতার রাস্তায় চলি। এখনো বুড়ো হই নি; এখনো হয়-তো জীবনের কুড়ি বছর আছে, এবং সে-সময়ের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের আরো অনেক ওপরের ধাপে উঠ্‌তে পারবো, আশা করি। কিন্তু যদি আজকেও মরে' যাই, তবু এটুকু সান্ত্বনা আমার থাক্‌বে যে এক জীবনের পক্ষে কিছু কম করি নি। যথেষ্ট, যথেষ্ট—তাই নয়?

বিরূপাক্ষবাবু চুপ করলেন। একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনার সেই বন্ধু—পার্ব্বতীবাবু, তাঁর কী হ'লো? তাঁর কথা তো কিছু বল্‌লেন না।'

বিরূপাক্ষবাবু একটা সিগ্রেট ধরালেন। 'আজ জান্‌তে পারলুম, পার্ব্বতী মারা গেছে আজ আমার বড় দুঃখের দিন।"

এর পর বিরূপাক্ষবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলেন। তাঁর দু' আঙুলের ফাঁকে অবস্থিত সিগ্রেটের মুখ থেকে নীল সুতোর মত এঁকে-বেঁকে ধোঁয়া উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমিও আর কোনো কথা বল্‌লুম না।

ফুটপাথের সঙ্গেই বিরূপাক্ষবাবুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো; তাঁকে আস্‌তে দেখে শোফার সেলাম করে' দরজা খুলে' দিলে।

'বড় আনন্দ পেলুম আপনার সঙ্গে কথা কয়ে,' সত্যি বড় আনন্দ পেলুম।' গাড়িতে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বল্‌তে লাগলেন, 'দয়া করে' কি একদিন আস্‌বেন? ভয় নেই- আমার কাগজের জন্য লেখা চাইবো না। গল্প-টল্প করা যাবে। আসবেন—যদি সময় করতে পারেন।' গাড়ি ষ্টার্ট দিলো। 'এই যে—আমার ঠিকানা।' বিরূপাক্ষবাবু তাড়াতাড়ি আমার হাতে একখানা কার্ড গুঁজে' দিলেন। 'আচ্ছা গুড্‌ নাইট্‌।'

'গুড্‌ নাইট্‌।' গাড়ি চৌরঙ্গীর যান-স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়্‌লো।

কার্ডখানায় দেখলুম, লেখা রয়েছে, 'পার্ব্বতীকুমার বিশ্বাস, ৮২ ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ।'

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবনা

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

বিদ্যালয়ে আমরা যে বিদ্যালাভ করি, তাহার একটা নগদ মূল্য আছে। এখানে যতটুকু শিক্ষা হয়, তাহার একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়; মানসিক শিক্ষা ও জ্ঞানদান ব্যতীত, অনেক কাজ চালাইবার, অর্থার্জ্জন করিবার, ভদ্র সমাজে মিশিবার যোগ্যতা ইহা দান করে। এইজন্য সহজেই লোকে ইহার মূল্য বুঝিতে পারে। গ্রন্থালয়, বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানকে পুষ্ট করিতে পারে, লোকের পাণ্ডিত্যলাভে সাহায্য করিতে পারে, জ্ঞান-তৃষ্ণা ও জ্ঞানচর্চ্চাকে জাগাইয়া রাখিতে পারে। ইহার কার্য্য পরোক্ষ, আশু কোনও লাভ দেখাইতে পারে না, কাজেই, লোকে মুখে যাহাই বলুক, ইহাকে মানসিক বিলাসের ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক উচ্চাসন দিতে চায় না।

এই জন্য আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশেও সাধারণ লোকের চেষ্টায় নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় যাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহা দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা; কিন্তু, গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে নিতান্তই সামান্য। যাহা হইয়াছে, তাহারও পুস্তকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা, পরিচালনের অবস্থা প্রভৃতির খোঁজ করিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে। গ্রন্থাগারের সর্ব্বপ্রধান কাজ অবশ্য লোককে পণ্ডিত হইতে, বিশেষজ্ঞ হইতে সাহায্য করা। কোনও বিষয় ভালভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য যে বিপুল বহুমূল্য গ্রন্থরাজির প্রয়োজন হয়, কোনও একজন লোকের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। এবং অন্যপক্ষে পুস্তকগুলিরও গুণ ও মূল্য এত অধিক যে, মাত্র একজন লোকের কাজে লাগিলেই, তাহার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয় না, - অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ইহা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অথবা পরিবারস্থ সকলের সহিত ভোগ করা যায় না। কাজেই, সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হইয়াছে। এই অর্থে গ্রন্থাগার সাধারণের হইলেও মাত্র পণ্ডিত দিগেরই সম্পত্তি—সাধারণ লোকের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকে না। বিশেষ বিদ্যামূলক, দুষ্প্রাপ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থরাজী পণ্ডিতদের কাজে লাগিলেও সাধারণ পাঠকের তাহা কোনও প্রয়োজনে আসে না।

কিন্তু, সাধারণ পাঠকেরও পড়া দরকার এবং তাঁহাদেরও বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, এবং এক্ষেত্রেও ২।১ জনের প্রয়োজন মিটাইয়াই বইগুলির উপযোগিতা নিঃশেষিত হইয়া যায় না। এইজন্য অতি সাধারণ পুস্তক সকলেরও সংগ্রহ রক্ষা এবং সাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা অর্থাৎ এক কথায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার স্থাপনা বহু ব্যয় এবং চেষ্টা সাপেক্ষ। রাজসরকার বা বিশেষ কোনও ধনী লোকের চেষ্টায় বিশিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্র সমূহে মাত্র এরূপ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। যে উদ্দেশ্যে আমরা গ্রন্থাগারের আলোচনা করিতেছি, তাহার সহিত এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই।

জন-শিক্ষার কাজে গ্রন্থাগারের বিশেষ উপযোগিতা আছে দেখা গিয়াছে। ইহা অবশ্য শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার।

দেশের গবর্ণমেণ্ট লোককে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন দেশহিতৈষিরাও মনে করেন, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি শিক্ষার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু, তাহাতে ইহা বুঝায় না যে, যাহাতে আমরা, দোকানের হিসাব বুঝিতে পারিবার, খাজনা আদায় করিতে পারিবার, আত্মীয়-স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লিখিতে পারিবার এবং রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিবার মত বিদ্যার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারি, ইঁহারা সেইজন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেজন্য অন্য লোকের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?

দেশের উন্নতির জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহার অর্থ আর একটু ব্যাপক। যাহাতে আমাদের মধ্যে পৌরচেতনা এবং পৌর কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত হয়, আমাদের সমাজের রাষ্ট্রের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের সাধারণ সমস্যাগুলি আমরা বুঝিতে

পারি ; সহজে যাহাতে আমাদের অজ্ঞতাকে কেহ নিজের স্বার্থে নিয়োগ করিতে না পারে এবং সর্ব্বোপরি যাহাতে আমাদের শরীর ও মনের অলস ঔদাসীন্যকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উদ্যম ও আগ্রহ লাভ করিতে পারি, জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের এমন শিক্ষারই প্রয়োজন।

এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ে লাভ হইতে পারে না, অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত নহেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা এইজন্য বলিতেছি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা দেশের প্রত্যেক লোকের পক্ষেই সমভাবে দরকার এবং সকল লোকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ত কথনও সম্ভব হইবে না। কিন্তু, গ্রন্থাগারের সাহায্যে এরূপ শিক্ষাবিস্তার সহজেই সম্ভব। এক বরোদা ব্যতীত আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষার চেষ্টা আর কোথায়ও হয় নাই।

আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা করিলে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে পাঠাগারের সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের উপযোগিতা অধিক আছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন অচিরে তাঁহাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই পড়িবার আগ্রহ ও অভ্যাস কম। যাঁহাদের বিদ্যা অল্প, তাঁহাদের মধ্যে এই অভ্যাস একেবারেই নাই। কাজেই, এই প্রকারের অল্প বিদ্যা, ইঁহাদের নিজেদের যদিও বা কিছু কাজে লাগে, বুদ্ধির মার্জ্জনা এবং মনের ঔদার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারায় সমাজকে ইঁহারা বিশেষ কিছু দান করিতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, যুক্তিবিমুখতা, নূতনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রভৃতি অজ্ঞতার কুফলগুলি কিছুমাত্র কম নহে। শিক্ষার একটা বিশেষ ফল, বাহিরের সহিত মনের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া মনের প্রসারতা বৃদ্ধি হয়। এ সব ক্ষেত্রে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাকে বাহির হইতে পুষ্ট করিবার বিশেষ ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পূর্ণ সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে লক্ষিত হইবে না।

জাতীয় উন্নতিকর কোনও চেষ্টা যখন আমরা করিতে যাই, আংশিক ব্যতীত পূর্ণ সফলতা লাভ কথনও তাহাতে আমাদের হয় না। যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞলোকদের যদিও বা কিছু বুঝান যায়, অল্প শিক্ষিত লোকদের অজ্ঞতা একেবারেই দুর্ভেদ্য। কিন্তু, এরূপ দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে যে লোককে তাহার নিতান্ত হিতকর কোনও বিষয় কোনও ক্রমেই বুঝান যায় নাই, ছয় মাস ধরিয়া তাহাকে বাংলা দৈনিক পত্র পাঠ করিতে দিবার পর তাহার মতের আনুপূর্ব্বিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে ছাত্র নিজের পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে কোনও জগৎ আছে বলিয়া জানিত না, কিছুদিন ধরিয়া তাহাকে বাংলার ২।১ খানি শ্রেষ্ঠ মাসিকের পাঠক করিয়া দিবার পর দেখা গিয়াছে অন্য বিশেষ কিছু না পড়িয়াও সে up-to-date হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সমগ্রদেশ আজও পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থার কথাই ভাবা যা'ক, সর্ব্বপ্রথম আমাদের পল্লীর কথা মনে করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের পল্লীগুলির আর্থিক সামর্থ্য ও শিক্ষার অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে, প্রতি পল্লীতে অথবা ২।১ পল্লী অন্তর গ্রন্থাগার স্থাপন অনেকটা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা পল্লীতে অধিক না থাকায় ইহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারও হইবে না। আবার অন্যদিকে যে অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের শিক্ষাকে বাড়াইবার চেষ্টাও অব্যাহত রাখিতে হইবে।

বাংলার পল্লীতে যে সকল পুস্তকাগার স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলিরই ইতিহাস ব্যর্থতার কাহিনী। কতকগুলি পুরাতন অকেজো বই সংগৃহীত হয়; ২।৪ খানি ক্রয় করা হয় এবং একটি ভাঙ্গা আলমারি ও ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল লইয়া মাস ছ'য়েক উৎসাহের সহিত কাজকর্ম্ম চলে; তাহার পর সব বন্ধ। তাহার পর ২।১ বৎসর অন্তর অন্তর ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা চলে। সহরের কথা বাদ দিয়া ইহাই বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ও করুণ ইতিহাস।

আসল কথা, বাংলাদেশে এই আন্দোলনকে সফল ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে ইহার রূপ বদলাইয়া ফেলিতে

হইবে। বাংলার পল্লীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, ইহার উপযোগিতাও বিশেষ নাই। গ্রন্থাগারের যে অংশ জনশিক্ষার কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা হইতেছে ইহার পাঠাগার বিভাগটি। পণ্ডিতেরা অথবা যাঁহারা বেশী কিছু শিখিতে চান, মাত্র তাঁহারাই পুস্তকাদি পড়িতে চাহিবেন; কিন্তু, সাধারণ পাঠকেরা সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকাদি দ্বারাই উপকৃত হইবেন।

গ্রামের শিক্ষা এবং জনসংখ্যা অনুসারে কোথায়ও প্রতিগ্রামে একটি, কোনও গ্রামে দু'টি, আবার কোথায়ও ৩।৪ গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপন করিয়া সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী পাঠাগার সঙ্ঘ গড়িয়া তুলা যাইতে পারে। যে সকল স্থান শিক্ষায় খুব পশ্চাদ্বর্ত্তী সেখানে মাত্র ২।৩টি বাংলা সংবাদপত্র রাখিলেই চলিবে এবং যে সকল স্থান শিক্ষায় অগ্রসর, সে সকল স্থানে ইহার সহিত বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি রাখিলেই চলিবে। ইহাতে খরচ অধিক হইবে না এবং প্রতিস্থানে মাত্র একজন লোক উদ্যোগী হইলেই, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিবেন।

পল্লীগ্রামের পুস্তকাগারগুলি যে সকল কারণে নষ্ট হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, পুস্তকাদি নিয়মিত ধার দেওয়া, হিসাব রাখা এবং আদায় করা প্রভৃতি কাজ অবৈতনিক লোকের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না; পুস্তকাদি চুরি যায় এবং প্রথমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা প্রথমবার পুস্তক কিনিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। নানা কারণে পরে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আর কেহ আর্থিক সাহায্য করিতে চায় না। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে পুস্তকাদি সংগ্রহ করা বা ধার দিবার প্রশ্নই নাই, অসুবিধা হইলে সংবাদপত্র রক্ষা না করিলেও চলিতে পারে। সাময়িক পত্রিকাদি প্রয়োজন হইলে, পাঠকেরা নিজেদের মধ্যে পালাক্রমে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। অন্ততঃ খুব অল্প পরিশ্রমেই একজন এই বণ্টনের কার্য্য করিতে পারেন। ইহার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন, লোকের একবার পড়া অভ্যাস হইয়া গেলে, তাঁহারা ততটুকু অতি সহজেই দিতে সম্মত হইবেন। যেখানে শুধুমাত্র সংবাদপত্রের প্রয়োজন, সেখানে মাসিক দুই টাকা হইলেই দু'টি বাংলা দৈনিক কাগজ গ্রহণ করা যাইবে; এবং ইহার সহিত মাসিক আর দুই টাকা যুক্ত হইলে, দু'খানি বাংলা দৈনিক এবং চারিখানি মাসিক গ্রহণ করা যাইবে।

ইহাতে বাংলা সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলির প্রসারের ক্ষেত্র এরূপ অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, সম্ভবতঃ পত্রিকা পরিচালকবর্গ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই প্রচেষ্টার সহযোগিতা করিবেন। জেলাবোর্ডগুলি যদি এরূপ পাঠাগারগুলিকে অর্থসাহায্য করেন, তবে, কাজ আরও ভালভাবে চলিতে পারে। গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, গ্রাম্যবোর্ড-গুলির কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এ বিষয়ে তাঁহাদেরও দায়িত্ব রহিয়াছে।

সংবাদপত্র পাঠে অল্প শিক্ষিতেরা দেশের সাধারণ খোঁজ-খবর রাখিয়া সর্ব্ববিধ ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নিরূপণে কতকটা সমর্থ হইবেন এবং নিজেদের পারিবারিক জীবনের বাহিরে বৃহত্তর জগতের সহিতও যে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে সে সম্বন্ধেও কতকটা অবহিত হইবেন। অপর পক্ষে ছাত্র-সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা সাময়িক পত্রিকাদিতে নিজেদের মানসিক শিক্ষা ও শক্তির কতকটা উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইবেন।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষি এবং চিন্তাশীল লেখকগণের প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রিকাগুলিতে লিখিয়া থাকেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী বহু লেখক আমাদের জীবনের সাময়িক এবং স্থায়ী নানাবিধ সমস্যা, নানাদিক দিয়া আলোচনা করেন। আধুনিক বাংলার চিন্তা ও ভাবের ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত, আমাদের নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা আমাদিগকে কোনপথে চলিবার ইঙ্গিত করিতেছেন, সাময়িক পত্রিকাগুলি আমাদের দ্বারে সে বাণী বহন করিয়া আনিবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিই আমাদের সাহিত্য এবং চিন্তার সর্ব্ব-প্রধান বাহন।

দেশে গ্রন্থাগারআন্দোলনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি আমার কথাগুলি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

হ্রদের তীরে

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্‌-এ

আকাশপথে সহ্যাদ্রি অতিক্রম করতে করতে যদি মধ্য ভাগে এসে এরোপ্লেনের জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকাও, তবে দেখ্‌তে পাবে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, কঠিন, পাঁশুটে, পাথুরে,—একের পর এক মাথা তুলে উঠেচে, আবার নেমেচে, আবার উঠেচে। ভাব্‌বে, হয় ত এখানে আদিমযুগে একটা বিরাট সমুদ্র ছিল, তা'তে প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছিল, হঠাৎ কোনো দেব বা দৈত্যের যাদুতে সমস্ত পাষাণে পরিণত হয়ে গেচে! এ সবের মাঝখান থেকে সহসা একটা শাদা ধব্‌ধবে জিনিস রোদের মধ্যে ঝিলিক মেরে উঠ্‌বে। এরোপ্লেন যদি নীচু হয়ে চলে, তবে দেখবে ওটা একটা পার্ব্বত্য হ্রদ,—একরাশ নির্ম্মল স্বচ্ছ জল পাথরের মধ্যে বাধা পড়ে আছে। আর এরোপ্লেনের আশপাশ দিয়ে যে-সব বুনো হাঁসের ঝাঁক দূর হ'তে উড়ে' আস্‌চে, তারা ঐ হ্রদেরই দিকে গিয়ে নাম্‌চে।

এ উষর পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে হ্রদটি যে শুধু বুনোহাঁস আর পানকৌড়িরই আশ্রয় তা' নয়। এর কল্যাণে পাশে একখানি বড় সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বসেচে; যেদিক দিয়ে বর্ষার জল উপ্‌চে পড়ে সেখানে সবুজ শস্যের খেত হয়েচে; আর পাড়ে পাড়ে বড় বড় গাছ—বট, বাবল, সেগুন—মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পাড় হ'তে পনর বিশ হাত পর্য্যন্ত হ্রদের জল নানা রকমের জলীয় উদ্ভিদে ঢেকে আছে। প্রথম ছয় সাত হাত পর্য্যন্ত হ্রদের সমস্ত তলাটা সবুজ জলীয় ঘাসে ছেয়ে ফেলেচে, তার মাঝে মাঝে গাঢ় নীলাভ আঁটালো শেওলা গজিয়েচে, তার উপর কলমীর লতা আর দামে জড়াজড়ি হয়ে দস্তুর মত এক জঙ্গলের সৃষ্টি করে বসেচে। কলমী লতার এক একটা আগা সাপের মত হয়ে মধ্যের সাদা ভাগটার উপর গিয়ে ছড়িয়ে পড়েচে। মাঝে মাঝে শালুকের ডাঁটা জল ছেড়ে উঠেচে, তা'তে শাদা ফুল ফুটে আছে। আশে পাশে হল্‌দে রেণুওয়ালা মোলায়েম ছোট ছোট ফুল ছিটিয়ে রয়েচে।

শুধু হ্রদের মধ্যভাগটা শাদা, তকতকে। এটাই রোদে ঝল্‌সে ওঠে। এ ভাগটার কিনারে কিনারে পান কৌড়িরা ডুবের পর ডুব দিচ্ছে, মাঝখানে বুনো হাঁসরা মৃদু ঢেউয়ের ওপর দোলা খাচ্চে। অতি দূর হ'তে, বহু পাহাড়, মাঠ, জনপদ অতিক্রম করে তারা এসেচে। কারো আদিস্থান মধ্য এসিয়া, কারো সাইবিরিয়া, কারো বা পোলাণ্ড। গ্রীষ্মে স্বদেশে বাস করে, শীতের সময় দক্ষিণের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

হ্রদের দক্ষিণ দিকে দাম ও কলমীর বন সাফ করে তিনটে ঘাট করা হয়েচে। সারাদিন গ্রাম হ'তে মেয়ে পুরুষেরা জল নিতে আসে। কেউবা হাত মুখ ধোয়, কেউ স্নান করে। নির্ম্মল তক্‌তকে জল, হাতে নিলে মন খুসী হয়ে ওঠে!

সেদিন বেলা তিনটায় হ্রদের পূব দিকের ঘাটটীর কাছে, ঘাট হ'তে ঠিক পনর হাত দূরে, মাহারদের মেয়ে আউশী একটি মেটে ঘড়া নিয়ে চুপ করে বসে ছিল। তার চক্ষু হ্রদের মাঝখানটায় নিবদ্ধ ছিল। সে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখ্‌ছিল বুনো হাঁসেরা কেমন করে' বসে বসে ঢুল্‌চে। সে মনে মনে গুণ্‌ছিল, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে! ঐ বুঝি একটা হাঁসে ছোট একটা মাছ ধরে খেল। ওসব হাঁসেরাও ঝগড়া করে। দুতিনটা হাঁসে ছুটাছুটি করে জল তোলপাড় করে তুললে যে! কি রকম তীক্ষ্ণ চীৎকার তাদের!

ঘাটের দিকে কে এল। আউশী চোখ তুলে চাইলে। সে জাতে অস্পৃশ্য, জল ছোঁবার অধিকার নেই, যদি কেউ

তুলে দেয় তবে জল পাবে। চোখ তুল্‌তেই আউশীর ঠোঁঠ দুটি বিরক্তিতে বাঁকিয়ে পড়্‌ল। সে তার কালো নোংরা হাতখানি দিয়ে তার চেয়েও নোংরা শাড়ীর আঁচলটি টেনে ফিরে বস্‌ল। এযে ইনামদারের বাড়ীর ঝি ইটাবাঈ। দেমাকে পা ফেলে। ছোট জাতকে দেখ্‌তে পারে না। কোনো-দিন কোনো অছুঁতকে জল তুলে দেয় নি। অছুঁতদের দেখ্‌লেই সে নাক সিট্‌কায়। সে আবার জল তুলে দেবে!

আউশী আবার স্থিরদৃষ্টিতে হ্রদের দিকে চাইল। এবার পান কৌড়ির খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কি দুষ্টু, ওসব পান কৌড়ি, জলের তলে ডুব দিয়ে গিয়ে মাছ ধরে খায়! ঐ যে দিল ডুব! আচ্ছা কোন্ দিকে ওঠে দেখা যাক্। ও কলমী লতাটার দিকে যাবে নিশ্চয়। কৈ, তা তো নয়! কোন্ দূরে গিয়ে উঠ্‌ল ঐ পান কৌড়িটা? ভারি চালাক তো!

ইটাবাঈ হ্রদের জলে হাত পা মুখ ধু'ল, ঘাগর ধু'ল, তারপর গপ গপ্ করে' জল ভরে', একটা "ইশ্‌শ্" করে', ঘাগর কাঁকে তুলে চলে গেল। আউশী তার দিকে ফিরেও চাইল না। ইনামদারের বাড়ীর ঝি, দেমাক দেখে কে! অছুঁতদের জল তুলে দেয় না। না দিক্।

অজ্ঞাতভাবে আউশীর কালো ভারী ঠোঁটটি বাঁকিয়ে পড়্‌ল। ইটাবাঈ চলে গেলে আবার তার মুখখানা শান্ত হ'ল। সে এক দৃষ্টিতে গ্রামের পথটির পানে চেয়ে রইল। কৈ, আর তো কেউ আস্‌চে না! কখন এসেচে সে! এ জল নিয়ে রান্না চড়াতে হ'বে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ওরা এসে পড়বে,—ওর স্বামী আর শ্বশুর। সকালে দুটো খেয়ে দুপুরের ভাকরী নিয়ে চলে গেচে। সারাদিন কাঠ কাট্‌বে। সন্ধ্যাবেলা রাক্কুসী ক্ষুধা নিয়ে ফিরে আস্‌বে। এক মুহূর্ত্ত তর সইবে না। ভাত তৈরী না পেলে যা' হাতে ওঠে তা' দিয়েই তার পিঠে খুব ক'ঘা বসিয়ে দেবে। এতে শ্বশুর বা স্বামী কেউ খাতির করে চলে না। আউশী সারাদিনে একঘড়া জল মাত্র নিয়েচে। একঘড়া জল তো বাপ বেটায় পিয়েই ফেল্‌বে। ভাত সেদ্ধ হবে কি দিয়ে?

আউশীর কালো, কাল্‌চে-পড়া মুখখানা নৈরাশ্যে ভরে গেল। সে অছুঁত! হ্রদের জল ছুঁতে পারে না। যদি কেউ দয়া করে তুলে দেয় তবেই সে জল পাবে। দয়া ক'জনের আছে? তাই তা'কে বস্‌তে হয়। কোনো দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তবে এঁরা এতে অভ্যস্ত। তাই অধৈর্য্য হয় না।

সহসা আউশীর মুখের ভাবটা কতকটা হাল্কা হয়ে এল। ঐ যে নাপিতদের কৌণ্ডি-মামা আসচে! কৌণ্ডি-মামা আধপাগ্‌লা লোক। এক একদিন ঘড়া ঘড়া জল ভরে এনে দেয়। বলে, যত ইচ্ছে নিয়ে যা। আর এক একদিন কথাও বলে না আজ কি জল দেবে?

"মামা, আমায় জল এনে দাও, আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।" আউশীর মুখে, কথায়, অসীম কাতরতা!

কৌণ্ডি ঘাড় বাঁকিয়ে বল্‌লে, "ওরে বাপ্! আমার বাড়ী অতিথ্ এসেচে, নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই।" বলে দু'লাফে ঘাটে গিয়ে, জল তুলে, ঘড়া কাঁধে করে চলে গেল।

আউশীর এখনো বয়স পাকে নি, তাই বসে থেকে থেকে মন খারাপ হয়ে যায়। পশ্চিমের ঘাটের পাশে যে বুড়ী চিঙ্গা-বাঈ বসে আছে, তার ওরকম মন খারাপ হয় না, সে জানে গাঁয়ের কারা জল তুলে দেয়, সে তাদের আশায় বসে থাকে। তারা এলে পরে জল পায়।

আউশীকেও জল তুলে দেবার লোক আছে। সে কুন্‌বীদের ভাগু-বাঈ। ভাগুবাঈর কালো রং, চিম্‌সে মুখ, সামনের দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। কিন্তু সে মুখখানা যখন হ্রদের পথের উপর ভেসে ওঠে, তখন আউশীর অন্তর খুসী হয়ে পড়ে। আউশীর কাছে গাঁয়ের সব মেয়েদের মধ্যে ঐ ভাগুর মুখখানাই সুন্দর মনে হয়। ভাগুর স্বামী ভাগুকে পছন্দ না করে থাকে, থাকুক্। সে তাকে ছেড়ে আর এক বিয়ে করে থাকে থাকুক্। কিন্তু আউশীর কাছে তার মুখখানা ভারি সুন্দর! ভাগু যখন কাল বল্‌ছিল, "আ লা! কতক্ষণ ধরে বসে আছিস? কাল তোর মালিক খুব মেরেচে বোধ হয়, ঐ যে কপালে দাগ!" তখন কি জানি কেন আউশীর দুচোখ ভরে জল এসেছিল। —ভাগুর কথাগুলি কি মিষ্টি! থাক্‌না তার যজমান,—এ:টা কেন পাঁচটা! তা'তে গাঁয়ের লোকের কি হয়েচে?

তার স্বামীতে তাকে ফেলে গেল কেন? সে বজমান করবে না? গাঁয়ের লোকে মিলে তা'কে খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করে দিক্ না! আউশীর স্বামী যদি তাকে ফেলে গিয়ে আর একটা বিয়ে করে, তবে সেও মামাকে বলে নোটিশ দিইয়ে, এক মাসের মধ্যে এ বিয়ে ভেঙে', আর একটা বিয়ে করে ফেল্‌বে।

কৌণ্ডি চলে যাবার পর হ'তে আউশী শুধু ভাগুবাঈর কথাই ভাব্‌ছিল। সে ভাবনার মধ্যে যে জগতের বড় বড় নীতিবিদ্‌দের অতি দুরুহ সমস্যার সহজ ও সংক্ষেপ সমাধান করে ফেল্‌ছিল সে কথা অবশ্যি তার জানবার উপায় ছিল না।

হঠাৎ চিন্তা ছেড়ে আউশী ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ল, ওঘাটে গাঁয়ের কষাই সীতারাম চিঙ্গা-বাইকে একঘড়া জল তুলে দিচ্ছে। চিঙ্গা আনন্দে জলের ঘড়া মাথায় তুলে বাড়ীর দিকে চল্‌ল। আউশী ভাব্‌ল, সীতারাম কি তাকে আর এক ঘড়া জল তুলে দেবে? অসম্ভব! ঐ যে সে নিজের জল নিয়ে চলে যাচ্চে।

হঠাৎ আউশী জলের কথা একেবারে ভুলে গেল। একটা ঘর্ঘর শব্দ শুনে' চেয়ে দেখ্‌ল হ্রদের পূব দিকে একখানা মোটর গাড়ী এসেচে। আউশী ঘড়া রেখে পাড়ের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। মোটরটা হ্রদের পাশে এসে থাম্‌ল। তা' থেকে বেরিয়ে এল, একদল লোক, খাকির পোষাক পরা, মাথায় ইংরেজী টুপী, আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে বন্দুক। দৃশ্যটা নেহাৎ নূতন না হ'লেও আউশীর সমস্ত মন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিমেষ-নেত্রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, লোকেরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে হ্রদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌চে। তারা এখন বুনো হাঁস শিকার করবে।

পাশ হ'তে নেংটিপরা একদল নোংরা ছেলে এল। তারা আউশীরই স্বজাতি, মাঠে মোষ চরাচ্ছে, মানে, মোষ ছেড়ে দিয়ে গুলি-ডাণ্ডা খেলচে। এতক্ষণ দূর হ'তে আউশী তাদের ঝগড়া ও অশ্লীল গালি-গালাজ শুনেচে। তারা আউশীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "রাজপুত্তুর এসেচে!"

আউশী কান খাড়া করে সে কথা শুনল। তার চোখ দুটি বড় হয়ে পড়ল, চোখের তারা জ্বলে' উঠ্‌ল। সে ডেকে বলল, "ওরে শামিয়া!" শামিয়া ফিরে দাঁড়ালে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল, "রাজপুত্তুর কোনটা রে?"

ঘাটে কে এল আউশী ফিরেও দেখ্‌ল না। শুধু এক দৃষ্টিতে ঐ দূরের টুপী মাথায়, খাকি পোষাক পরা লোক-গুলির দিকে আন্‌মনে চেয়ে রইল।

হঠাৎ চকিত হয়ে দেখ্‌ল দুজন এ পাড়ের দিকে আস্‌চে। পেছনের লোকটা নিশ্চয়ই চাকর হ'বে, ও বন্দুক বয়ে আন্‌চে। সামনে বড় বড় পা ফেলে চলেচে তার মনিব। কি সুন্দর রং তার মুখের। কি সুন্দর নাক! আউশী অবাক হয়ে ভাব্‌ল, "এইই কি রাজপুত্তুর?" তার বুক দুরু দুরু করে উঠ্‌ল। বহুকালের কাদায় লেপা তার পা দুখানি মৃদুভাবে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

শিকারী ভৃত্য সহ তার পাশ দিয়ে চলে গেল। পশ্চিম পাড়ের মাঝখানটায় গিয়ে চাকরের হাত হতে বন্দুক নিল। তার পর পাড়ের ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বস্‌ল।

মুহূর্ত্তের তরে আউশী অবাক হয়ে একবার হ্রদের পাড়ে বসা খাকিপরা লোকদিগের দিকে, আর একবার হ্রদের মধ্যের ঐ সাদা জলের ওপর দোলায়মান হাঁসগুলির দিকে চাইল। সে মুহূর্ত্তের নীরবতার মধ্যে যেন একটা ভীষণ দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল। একটা গভীর ষড়যন্ত্র যেন সারা হ্রদটাকে ঘিরে ফেলেছিল।

ফট্—ফট্—ফট্! হঠাৎ হ্রদের একধার থেকে একজনে বন্দুক ছুড়ল। তীরবেগে হাঁসের দল জল ছেড়ে' আকাশের দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ বন্দুকের আওয়াজ তাদের নেহাৎ অপরিচিত নয়।

ফট্—ফট্—ফট্!—ফটা-ফট্! চারদিকে আবার বন্দুক ফুটে উঠ্‌ল। তারপর একটা—দুটো—তিনটে হাঁস ঝুপ্ ঝাপ্ করে জলে পড়তে লাগ্‌ল। আউশী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে একটা পড়ল। সে পাড়ের উপর উঠে গলা বাড়িয়ে দেখ্‌ল শালুক গাছের পাশের জলটা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠেছে। একটা হাঁসের বোধ হয় শুধু পাখায় গুলি লেগেছিল, তাই সে ঘুরতে ঘুরতে কলমীবনের

ভিতরে পড়ে ছটফট্ করতে লাগল। তার একটা তীক্ষ্ণ ডাক সহসা বাতাসকে বিদ্ধ করল।

আবার সব নীরব হ'ল। হ্রদের জল শান্তভাব ধারণ করল। মধ্যখানটার সাদা জায়গাটা আবার মসৃণ হ'য়ে পড়ল এবং রোদে চক্‌মক করতে লাগ্‌ল। কিন্তু হাঁসেরা আকাশেই রইল, হয়ত অপর কোনও হ্রদের উদ্দেশে গেল, এ হ্রদে তখন আর ফিরে এল না।

চাকরেরা জলে নেমে মরা হাঁসগুলিকে তুল্‌তে লাগ্‌ল। নেংটিপরা ছেলের দল পাড়ে দাঁড়িয়ে সন্ধান দিচ্ছিল। হ্রদের পশ্চিম তীর হতে শিকারী ও তার চাকর আউশীর কাছে যে হাঁসটা পড়েছিল তার খোঁজে এল। হাঁস জলের নীচে ডুবে গেচে, জলে যে লাল রং হয়েছিল তা' শুধু মুহূর্ত্তেকের জন্যে; তাই তারা হাঁসের কোনও চিহ্ন পে'ল না। চাকর আউশীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, সে হাঁস পড়তে দেখেচে কিনা। শিকারীও আউশীর পানে চাইল। লজ্জায় আউশীর চোখ দুটি নুয়ে পড়ল। সে ধীরে ধীরে জড়ানো স্বরে বল্‌ল, "ঐ সুঁদিফুলটার কাছে"। চাকর জলে নেমে হাঁসটাকে তুল্‌ল। তারপর তাকে ঠ্যাঙে ধরে ঝুলিয়ে মনিবের পেছনে পেছনে চল্‌ল।

আউশী নিজেকে ভুলে সেই হাঁস, সেই চাকর আর সেই সুদর্শন শিকারীর দিকে চেয়ে রইল। এ-ই রাজপুত্তুর! কিরকম লাল তার হাত দুটি! সে যখন আউশীর পানে চেয়েছিল, তখন আউশী তার দিকে চোখ তুল্‌তে সাহস পায় নি। রাজার বেটা! সোনার থালায় ভাত খেয়ে রূপার ঘটীতে আঁচায়! সোনার খাটে শোয়!

সেই তৈলহীন উস্কু-খুস্কু চুল আর ময়লা ঘোমটাটার নীচে আউশীর মাথাটি অদ্ভুত সব কল্পনায় ভরে উঠ্‌ল।

ছেলের দল আবার ফিরে এল। আউশী শামিয়াকে ডেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল, "রাজপুত্তুর!" বল্‌তে বল্‌তে তার ঘাড়টি নুয়ে পড়ল, চোখ দুটি জলে উঠ্‌ল, ঠোঁট দুটি ভেঙে ভেঙে আসতে লাগ্‌ল। শিশুকে লজেঞ্জেস দিলে যেমন হয় তেমনি তার মুখের ভাব!

আউশী এক দৃষ্টিতে শুধু ঐ শিকারীদের দিকেই চেয়ে রইল। একে একে সবে মোটরের কাছে গিয়ে জড়ো হ'ল, একে একে সবে বন্দুক নামিয়ে গাড়ীতে রাখল, তারপর সকলে গাড়ীতে উঠ্‌ল। "ধ্বক্" করে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ হ'য়ে পড়ল। তারপর দুই একবার "ঘড়ার-ঘড়ার" করে গাড়ী চলে গেল! আউশীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল।

আউশী ভাব্‌তে লাগ্‌ল, ওসব ইংরেজী টুপী পড়লে লোককে কি অদ্ভুত দেখায়! তাদেরই পাড়ার তাদের স্বজাতীয়, সখারাম শহরে গিয়ে খৃস্তী হয়ে যায়। সেখানে তাকে টুপী আর পাঁতলুন দিয়ে সাজায়। সখারাম গাঁয়ে এলে লোকে বলে, 'কি রে! কি খবর?' সখারাম বলে সে সাহেব হয়েচে! সকলে হাসে! সখারাম জোর গলায় বলে, ইনামদারের ছেলে তার পিঠ চাপড়ে' কথা কয়! ইনামদারের শহরের বাড়ীতে তাকে কুর্সিতে বস্‌তে দেয়! তখন আউশীর শ্বশুর ভীমা এগিয়ে বলে, "তুই মাঙ্গ এর হাতের অন্ন খেয়েছিস্ কিনা? মাঙ্গ রসুইয়ে তোদের ঘরে রাঁধে কিনা?" সখারাম বলে "খৃস্তীদের মধ্যে জাত বিচার নেই!" সকলে ছি! ছি! করে। খৃস্তী হ'লে কি লাভ? দুদিন খাবার দেয়। এইটুকু! তারপর? সাহেবী পোষাকেই তো আর পেট ভরে না। তা'তে আবার ছোট্ট জাতের হাতে খেতে হয়। হয়ত ছোট জাতের সঙ্গে বিয়েও হবে! তখন?

আউশীর শ্বশুর ভীমা রোজ বার গণ্ডা পয়সা কামাই করে। তা'র মত কুড়ুল মারতে পারে এ অঞ্চলে ক'জন আছে? পরুক না সখারাম টুপী আর কুর্ত্তা! কাঠ কাটতেই যদি না পারল। জাত ব্যবসা যদি হারাল— তবে খৃস্তী হয়ে কি লাভ?

সখারামের কথায় মনে পড়ল যেবার তাদের জাতের সোনিয়া মুসলমান হয়ে লুঙি পরেছিল। তা'তে তো তাকে হিন্দু বা মুসলমান কেউ ঘরে নেয় নি। সে অছুঁতই রইল। শুধু জাত ব্যবসাটা খোয়ালে। তখন সোনিয়া বললে আমি মুসলমান হই নি, লুঙি খুলে ফেললে। মোল্লা তেড়ে এসে বল্‌লে, হয়েছিস্। তখন জাত ভাইরা মিলে সোনিয়াকে বাঁচালে, সে জাতে ফিরে এল।

কোথায় সখারাম আর সোনিয়া, আর কোথায়ই বা রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর যা ইচ্ছে তাই পরতে পারে, তার জন্যে ধর্ম্মত্যাগ করতে হয় না। তার যে সবই নিজ ইচ্ছাধীন। তাকে তো আর খেটে খেতে হয় না! পরমেশ্বর সোনায় সোনায় তার বাড়ী ভরে দিয়েচেন। সে শুধু শিকার করবে, আর বাড়ী ফিরে সোনার থালায় করে খাবে, রূপার ঘটীতে আঁচাবে, আর সোনার খাটে শোবে!

আউশী আজ এসব চিন্তাতেই বিভোর হয়ে রইল। ঘাটে যে কতলোক এল, গেল, তার খবরও রাখ্‌ল না। দর্জ্জিদের শান্তাবাঈ, কুমোরদের ধোণ্ডীরাম, বামুনদের গঙ্গাবাঈ, মারাঠাদের চিমাবাঈ—এদের সে লক্ষও করে নি। তার ঘড়া পথের ধারেই পড়ে আছে। সে হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে শুধু রাজপুত্তুরের কথাই ভাব্‌চে। সর্ব্বশেষে মুসলমানদের বেনুবিবি মাথায় ঘোমটা টেনে ঘাটে বসে জল ভরে নিয়ে গেল। আউশী কারো দিকে ফিরে চাইল না। সে যখন তার ঘড়ার কাছে ফিরে এসেছে, তখন ঘাট খালি। পশ্চিমের পাহাড়ের ভিতর সূর্য্য ডুবে গেচে। চারিদিক আব্‌ছা হয়ে পড়েচে। পানকৌড়ির দল ডুবিয়ে ডুবিয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে বসে আছে। হাওয়া থেমে গেচে, মাঝখানটার জলটা ইস্পাতের মত পালিশ হয়ে রয়েচে। তার উপর আকাশের সোনালি ছায়া খেলা কর্চ্ছে। শুধু এক একবার মাছের গুপ্‌ গাপ্‌ সে নিথর জলের উপর আভের কণার মত ছোট ছোট ঢেউ তুল্‌চে।

শূন্য ঘাটটির দিকে চেয়ে আউশী মরমে মরে গেল। এখন কে তা'কে জল দেবে? কখন সে গিয়ে ভাত চড়াবে? আউশী অসহায় ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল।

হঠাৎ হ্রদের পূব পাড় হ'তে একটা মস্ত মোষ হুড়মুড় করে কলমীবন ভেঙে জলে গিয়ে নাম্‌ল এবং এক নিঃশ্বাসে জলপান করতে লাগ্‌ল। পাড়ের নীচে হ'তে একটা রাখাল ছেলে নানারকম মুখভঙ্গী করে মোষকে ফিরে যেতে ইশারা করলে। মোষ যখন তা' শুন্‌ল না, তখন সে অশ্লীল ভাষায় মোশের ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষকে গালি দিতে লাগ্‌ল। আউশী দেখ্‌ল ও তাদেরই জাতের ছেলে, বাবু। আউশী তার দিকে চেয়ে, বেশ ঝাঁঝালো এবং অশ্লীল ভাষায়ই বল্‌ল, "ওরে হতভাগা, মোষকে জল খেতে দিবি না?" এর পর মিনিটখানেক ঐ তরুণী ও বালকের মধ্যে যে বাক্‌যুদ্ধ হ'ল, তা'তে যে উভয়েই শ্লীলতার সীমা অতিরিক্ত রকম লঙ্ঘন করে গিয়েছিল, তা' দুজনার কেউ উপলব্ধি করল বলে বোঝা গেল না। বাবু জলে নেমে সজোরে মোষটাকে টেনে পাড়ের দিকে নিয়ে চল্‌ল। মোষ গাঁয়ের পথে ফিরল, কিন্তু বাবুর গতি মন্থর দেখে আউশী ফিরে চাইল। দেখ্‌ল সে একটা মরা বাছুরকে টেনে নিয়ে যাচ্চে। আউশীর মনে পড়ল এ মোষের বাচ্চাটা একমাস আগে জন্মেছিল। তার তো কোনো অসুখ ছিল না। হঠাৎ মৃদু হাসিতে আউশীর কালো ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে পড়ল। এযে নর-বাছুর। একে রেখে কি লাভ? আবার হঠাৎ তার মুখখানা অত্যন্ত কালো হয়ে উঠ্‌ল। একটা অকথ্য গালি উচ্চারণ করে সে বল্‌ল, "বাঁদীর বেটা ওটাকে উপোষ করিয়ে মেরেচে!"

বাবু চলে গেলে আউশী ভাব্‌ল, আজ আর জল পাওয়া যাবে না। ফিরেই যেতে হ'বে। কিন্তু কি করে তার চোখদুটি ঐ পাহাড়ের উপর ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে নিবদ্ধ হ'য়ে রইল। সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল গাছগুলি ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্চে। তলাওয়ের উপরের সোনালি রং ম্লান হয়ে পড়চে, আকাশটা যেন স্তব্ধ হয়ে, ঐ হ্রদেরই জলের মত নিথর হয়ে, আস্‌চে।

তখন গ্রামের পথ দিয়ে দিগন্ত প্রকম্পিত করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আউড়াতে আউড়াতে ভটজি মোরোপন্ত এল। পথে অছুতকে দেখে হঠাৎ বিদ্যুতাহতের মত এক পাশে সরে গেল। ঘাটে এসে বসে বসে কিছুক্ষণ সন্ধ্যা তর্পনাদি করল। তারপর উচ্চকণ্ঠে আবার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গ্রামের দিকে চল্‌ল।

"দ্যৌঃ শান্তিঃ! অন্তরিক্ষং শান্তিঃ! পৃথিবী শান্তিঃ! আপঃ শান্তি! ঔষধয়ঃ শান্তিঃ! বনস্পতয় শান্তিঃ!...... সা মা শান্তি রেধি!"

ব্রাহ্মণ! বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করচে। যুগ যুগ ধরে তারই পূর্ব্বজেরা মুখে মুখে বেদকে রক্ষা করে এসেচে! কিন্তু ভটজি সে মন্ত্র উচ্চারণই কর্চ্ছিল। ঐ যে আকাশে,

অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, ঔষধিতে, বনস্পতিতে শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে, আর সে শান্তি আমাতে আসুক বলে সে প্রার্থনা কর্চ্ছে, তা'তো তার হৃদয় স্পর্শও করে নি। যদি সেখানে কেহ মুহূর্ত্তের তরেও সে শান্তির কণামাত্রের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে সে ঐ ভটজি নয়, তার ঘৃণিত, পথের পাশে বসা, ঐ মাহারের মেয়ে। তার মন ঐ শান্ত হ্রদের উপরের ঘনায়মান আঁধারের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছে! ব্রাহ্মণের মনে যদিও এক আধটুকু শান্তি আস্‌বার সম্ভাবনা ছিল, তা' এই শুভমুহূর্ত্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক অস্পৃশ্য দর্শনে তিরোহিত হ'য়ে গেচে!

সবুরে মেওয়া ফলে! আউশীরও তাই হ'ল। ব্রাহ্মণ চলে যাবার পর গ্রামের দুটি বউ এল। সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়ে তারা বেশ উল্লাসের সহিত কথা বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিল। আউশীকে দেখে একজন বল্‌লে, "তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে আবার এসেছিলাম, মাঙ্গদের মেয়েরা এসে জল নিয়ে গেল! তোর ঘড়াটা অম্‌নি পড়ে ছিল!"

মুহূর্ত্তের তরে আউশীর মুখের খুসীর ভাব দূর হয়ে গেল। সে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বল্‌ল, "সে মাঙ্গেরা আমার ঘড়া ছোয় নি তো?"

বড় বধূটি হেসে বলল, "না! তোর ভয় নেই!"

আউশীর ঘড়া জলে ভরে গেল। খুসীতে তার কালো মুখের মধ্যে শাদা দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ছোট বউটি সে হাসিতে যোগ দিয়ে, রসিকতা করে বলল, "তোর মালিক তোরে ভালবাসে লো মাহারীন?" আউশী ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠ্‌ল। তারপর কলসী মাথায় করে অর্দ্ধনৃত্যের তালে ঘরের দিকে চল্‌ল। যেতে যেতে তার মাথায় শুধু খেল্‌তে লাগ্‌ল, সেই রাজ-পুত্তুর! খেটে খেতে হয় না, পথ চলতে হয় না, মোটরে বসে থাকে, শিকার করে, আর সোনার থালায় খেয়ে, রূপার ঘটীতে আঁচিয়ে, সোনার খাটে গিয়ে শোয়! রাজ-পুত্তুরের বৌ যে হয় সে কি মেয়েমানুষ, না স্বর্গের কোনো পরী-অপ্সরা?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

—o—

মাতোয়ালা

ডাঃ মহম্মদ শহীহুল্লাহ, এম্-এ, বি-এল, ডি-লিট্

(হাফিয হইতে। মূলের ছন্দের অনুকরণে)

কা'ল রাতে পীর কুটীর ছেড়ে শরাবখানায় গিয়ে,
ব্রত ভাঙিয়া মত্ত হ'ল পান পিয়ালা পিয়ে।
জোয়ান কালের প্রিয়তমায় দেখে স্বপন ঘোরে,
বুড়ো মাথায় প্রেমের বাতিক আবার এল জোরে।
বুদ্ধি-ধরম নাশকারিণী পার্শী-বালার লাগি
আত্ম-স্বজন ঘর সংসার হলেম সকল ত্যাগী।
গুলের গালের আগুন পোড়ায় বুল্‌বুলেরি বাসা,
বাতির হাসি মুখখানি হায়! পতঙ্গ-প্রাণ নাশা।

সকাল সাঁঝের কাঁদন আমার বিফল নাহি গেল,
ধন্য খোদা! বৃষ্টি বিন্দু মোতির দানা হ'ল।
সাকীর আঁখি বশীকরণ মন্ত্র পড়ে কি রে!
ধ্যানের আসন পড়্‌ল মোদের তার পিয়ালা ঘিরে।
কালকে সূফী সভার মাঝে ভাঙ্‌লে মদের বাটী;
গেল রাতে এক চুমুকেই হ'ল সেয়ান খাঁটি।
হাফেযেরি ঠাঁই হ'য়েছে খোদার বিরাজ থানে,
দিল্ গিয়েছে দিল্ দারেতে, প্রাণ মিশেছে প্রাণে।

—o—

প্রাচীন ভারতে নারী

শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

নারী রহস্য

উত্তর পশ্চিম প্রবাহী দুর্দ্দান্ত ঝঞ্চার যে বিপর্য্যয় মূর্ত্তি জন বয়ার(১) কল্পনা করেচেন পুরুষ-চিত্তে নারী আবির্ভাবের তুলনায় সে'ও যেন অতি শান্ত। কখনো বা অবমানিতা বীরাঙ্গনার বিলুণ্ঠিত কৃষ্ণ বেণীর সর্পিল আন্দোলনে ভীষণ সমরানল ধূমায়মান; কখনো বা চন্দ্রাননীর রূপরশ্মি সম্পাতে উদ্বেলিত সমুদ্রে সহস্র রণতরী নৃত্য-চঞ্চলা; কখনো বা গরবিনীর রূপলাবণ্যের গৌরব রক্ষার্থে কোষমুক্ত অযুত অসি সূর্য্য কিরণে ঝলসিত। আবার কখনো প্রণয়িনীর রূঢ় অনাদরে মহামনীষী আর্ত্ত; কখনো বা দুর্নিবার রমণী আকর্ষণে তপস্যা নিরত সাধক সন্ত্রস্ত। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্মসাহিত্য ও রসসাহিত্য নারী চরিত্রের বিচিত্র কীর্ত্তনে মুখর। সুপ্রাচীন এক যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ২) নারীর ব্যাখ্যা কর্‌লেন—'নিঋতি'—অমঙ্গলের মূর্ত্তি। প্রাচীন বাংলার এক পরিহাস-রসিক কবি(৩) নারীর নির্ম্মমতায় অভিযোগ কর্‌লেন :—"নারীর নাই কোন ভার,

ভাবের মধ্যে বদন ভার।"

ইংরেজ এক মহাকবি তাঁর স্বভাব সুলভ সৌজন্য বিস্মৃত হ'য়ে নারীকে সম্বোধন কর্‌লেন—'নরের অরি'(৪)। কিন্তু হয়ত বা সে এত বিরূপ নয়। হয়ত বা প্রমদার আচরণে প্রমাদ গুণ্‌বার এত কিছুই নেই। তবুও জ্ঞানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নারীর মায়াবিনী রূপে রুষ্ট হ'য়ে বল্লেন—কামিনী ত্যাগ কর। কিন্তু হায়, ললনার ললিত কলায় পৌরুষের সকল দম্ভ মন্ত্রমুগ্ধ। যত নামে ডাকা যায়—প্রমদা, প্রমীলা, অঙ্গনা, ললনা, রমণী, কামিনী—সব আহ্বানেই কী যেন মিনতির মর্ম্মরধ্বনি! রমণীবিশেষের রস-সম্ভার বিরস হ'লেও, প্রণয়-বিড়ম্বিত পুরুষ-হৃদয় রমণী-সাহচর্য্যের ভাব বিলাস ব্যতীত সান্ত্বনা জানে না। বিরক্তিতেই হোক্, বিষাদেই হোক্, একের সঙ্গ-হারা হ'লে অন্য নারীর বন্ধন অনুসন্ধান যদি না'ও হয় তবে কাল্পনিক কান্তার উদ্দেশে পুরুষের অন্তর-নিবেদন অনিবার্য্য। কামিনীর সঙ্গ কামনায় পুরুষের কল্পনা এমনই প্রবল বেগে চলেচে যে তার উন্মাদনা কোন দুঃসহ বেদনারই বাধা মানে না। নারী-সান্নিধ্যের মলয় পবনে পুরুষের চেতনায় কী এক অবোধ আনন্দের শিহরণ জাগে তার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েচেন নুট্ হাম্‌সুন্(১) :—'এক অপূর্ব্ব মুগ্ধ ভাব আমাকে আবিষ্ট করেচে—তরুণীর সমীপবর্ত্তী হওয়ার নিশ্চিত অনুভূতি। তার দিকে চেয়ে চেয়েই সারাটি পথ চলেচি। তার অলকগুচ্ছের আকুল সুগন্ধ, তনু দেহের উষ্ণ আবেশ, রমণী-হৃদয়ের রমণীয় সুরভি, দৃষ্টিবিনিময় মাত্রে প্রবাহিত নিঃশ্বাস-পরিমল—এর প্রত্যেকটিই আমার সকল ইন্দ্রিয় অবাধে ভেদ করে' চলেচে।' শিল্পীর আনন্দে বিধাতা গড়েচেন এই নারী—হৃদয়ে মধু, নয়নে মাধুরী; বাহুতে বন্ধন, চরণে নৃত্য; বিষাদে আসন্ন আষাঢ়ের কমনীয়তা, আনন্দে বিহ্বল বসন্তের হিল্লোল। বিধাতার আদরে মোহিনী যখন অমৃত পরিবেশনের ভার পেয়েচে তখন কোনো প্রথা বা মোহ বা অভিনয় আতিশয্যে তার যথাপ্রাপ্য সমাদর না দেওয়াই অমঙ্গল।

বেদে নারী গৌরব

বৈদিক ভারতের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে দেখা যায় স্ত্রী দেবতা-সম্মানিত আসন লাভে দেব-সমাজ উজ্জ্বল করেচেন। স্বয়ং যজ্ঞে-পুরোহিত অগ্নিদেবের জন্মকারণ যুগল অরণী

(১) Johan Bojer—Great Hunger—আরম্ভ। (২) মৈত্রায়ণী সংহিতা—১,১০,৬। (৩) দাশরথি রায়। (৪) 'Woe to man.'

(১) Knwt Hamsem—Hunger—পৃঃ ১৭৮।

মধ্যেও(১) বৈদিক ঋষি স্ত্রী-শক্তির কল্পনা না করে' পারেন নি। আবার যজ্ঞীয় বেদীর রূপ পরিকল্পনাতেও রমণী দেহ-ভঙ্গিমার আদর্শ ই (২) ঋষির শিল্পবোধ জাগিয়েচে :— 'বেদী পশ্চিমাংশে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, মধ্যাংশে সঙ্কুচিত, পুনশ্চ পূর্ব্বাংশে বিস্তৃত হবে, কারণ এরূপ সুগঠিত রমণীই আর্য্যগণের প্রশংসিত—নিতম্ব বিশাল, উভয় বাহুসন্ধির দেহ মধ্যাংশ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপরিসর এবং কটিদেশ ক্ষীণ। এইভাবে বেদি রচনায় উপাসক দেবমণ্ডলীকে প্রীত করেন।' অধিকন্তু, বেদে (৩) নারী শব্দের গৌরবসূচক অর্থ—'নেত্রী'। মনস্বীগণের চিন্তায় সুন্দর মিল দেখা যায়—সুবিখ্যাত এক ফরাসী দার্শনিক(৪) নারীকে 'সুনীতি বিধায়িত্রী' ব'লে অর্ঘ্য নিবেদন করেচেন।

ধর্ম্ম শিক্ষায় অধিকার

মেধা মার্জ্জিত হয়, শক্তি বৃদ্ধি হয়, নীতি ও আত্মজ্ঞান বিকশিত হয়, গুরুর তত্ত্বাবধানে এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুশিক্ষা সেই অতীত যুগের বিশাল আদর্শ। এই শিক্ষার নাম 'স্বধ্যায়'(৫) ও 'ব্রহ্মচর্য্য'(৬)। বেদ অধ্যয়নের আশিস্ লাভে বালক বালিকা উভয়েরই সমান অধিকার ও একত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা। 'পুরুষের ন্যায় নারী(৭) বেদ মন্ত্র পাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য কত্তে পারেন'। যদিচ কন্যাকে 'কৃপণং'(৮) অর্থাৎ দুঃখ-কারণ বলাও হ'য়েচে তথাপি আর্য্য সভ্যতার মধ্যযুগের শেষ অবধি বালিকার শিক্ষাদানে(১) অতি যত্ন নেওয়া হয়েচে। জ্ঞানলাভে নারীর আগ্রহও অপরিসীম। বিদ্যান্বেষণে আর্য্যা আত্রেয়ীর(২) দাক্ষিণাত্যে গমন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। বেদ বিধি(৩) সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করেচেন, 'পত্নী গ্রন্থ ধারণ পূর্ব্বক এই সমুদয় বেদমন্ত্র পাঠ করবেন'। মূর্খের মত আবৃত্তি চল্‌বে না। শাস্ত্র পুনশ্চ(৪) বিধান দিচ্চেন—'স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা অগ্নিহোত্র যাগে তাঁর সামর্থ্য হয় না'। কথাটির উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েচে(৫)—'স্ত্রীলোকের বেদ পাঠ উচিত'। কিন্তু সমসাময়িক ভিন্ন সূত্রকার(৬) বেদপাঠের বিরুদ্ধবাদ তুলেচেন। আর পরবর্ত্তী স্মৃতিকার(৭) অগ্নিহোত্রের অধিকারও হরণ করেচেন। গুরুর নিকট বেদ শিক্ষায় প্রবেশ লাভ কত্তে হ'লে দীক্ষা নেওয়া রীতি আছে। সে দীক্ষারই নাম 'উপনয়ন সংস্কার'(৮)। বেদ-অধিকারে সংশয়ের সঙ্গে উপনয়নের ও গোল উঠ্‌লো। হারিত সংহিতা(৯) দুই শ্রেণীর মহিলা উল্লেখ করেচেন:— 'ব্রহ্মবাদিনী' উপবীত ধারণ, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও নিজগৃহে ভিক্ষা দ্বারা অন্নসংগ্রহ করেন; অপর, 'সদ্যোবধূ'—তাঁর উপনয়ন বিবাহের পূর্ব্বে কোন মতে সমাধা কত্তে হবে। যম সংহিতাও মহিলার উপনয়ন সম্বন্ধে বলেন—'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে'—ব্রাহ্মণগ্রন্থের পুরাকল্প অধ্যায়ে কুমারীগণের যজ্ঞসূত্র ধারণ অভিপ্রেত হয়েচে। অন্য সব স্মৃতিই বিরুদ্ধে। মনু বলেন(১০) বিবাহ সংস্কারই মহিলার উপনয়ন সংস্কারস্বরূপ, পৃথক্ উপনয়ন নেই। পরে, নারীর যে উপনয়ন হ'তে পারে এ ধারণাই একেবারে উবে গেছে; হয়-ই-না—এ কল্পনার বিরুদ্ধ সম্ভাবনা মাত্রও রইল না। ব্রাহ্মণগণ ক্ষোভ কচ্চেন(১১), 'আমাদের অদৃষ্টে

(১) সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও সাহিত্য সমালোচক Georges Clemencean তাঁর In the Evening of my Thoughts, Vol. 1, গ্রন্থে নারী জাতির প্রতি বেদের এই শ্রদ্ধা নিবেদনে আনন্দ প্রকাশ করে' বলেচেন, এই কারণেই অনুমান হয় প্রাচীন আর্য্যের আদর্শ ও উৎকর্ষ অতি মহান্ ছিল।

(২) শতপথ ব্রাঃ, ১, ২, ৫, ১৬। (৩) ঋঃ বে, ১, ৯২, ৩ ঋকের সায়ন ভাষ্য। (৪) Auguste Comte, the founder of Positivism; the expression referred to is—'moral providence.' (৫) বাজসনেয়ী সং, ১১, ৫, ৬—৮; তৈত্তীঃ উপ, ৭, ৯। (দৈনিক বেদ পাঠ) (৬) অথর্ব্ব বেদ, ৩, ৪, ১৮, ১—সায়ন ভাষ্য—'ব্রহ্ম ব্রহ্ম শব্দো বেদ বাচী'; অথর্ব্ব বেদ, ১৯, ২, ১৯ ৮—সায়ন ভাষ্য—ব্রহ্মো সাঙ্গ বেদঃ, ব্রহ্মচারিভিঃ ব্রহ্মণি বেদে বেদবিহিতে যজ্ঞকর্ম্মাণি চরিতুং শীলং যেষাং'। (৭) জৈঃ পূঃ মী, ৫, ১,২৪। (৮) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ১৬।

(১) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮, ৪৭। (২) ভবভূতি—উত্তররামচরিতম্। (৩) শ্রৌত সূত্র, ১, ২,—'……ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।'

(৪) গোভিলগৃহ্য, ১, ৩। (৫) গোভিল, ১, ৬। (৬) বৌধায়ন, ১, ৫, ১১, ৭। (৭) মনু—৪, ২০৬; ১১, ৩৭। (৮) বাজসনেয়ী শুক্ল যজুঃ, ১১, ৫, ৪। (৯) বোম্বে সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১ম খঃ, ২য় পরিঃ, ৮২ পৃঃ, পরাশর স্মৃতির মাধবাচার্য্য ভাষ্যে ধৃত বচন। (১০) মনু, ২, ৬৭। (১১) ভাগবৎ, ১০, ২৩, ৪২।

হ'ল না অথচ এই সমুদয় স্ত্রীলোক যাঁদের উপনয়ন হয় না তাঁরাও কৃষ্ণকৃপায় সৌভাগ্যব্রতী হ'লেন।' তান্ত্রিক যুগ নারীর শাস্ত্রে ও মন্ত্রে অধিকার ফিরিয়ে আন্‌লেও, তাঁর প্রেরণাময়ী ব্যক্তিত্বের গরিমা ব্যর্থ করে' পুরুষের সাধনায় তাঁকে উপাদানমাত্র রূপেই ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়েচে। নব-জাগ্রতা নারীর আত্মপ্রকাশের সুর(১) অন্য :—

"হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের পরে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে
নির্ব্বারিত স্রোতে।'

অন্যদিকে, প্রেম ও প্রাণের কেন্দ্র স্বরূপিনী হওয়াই নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ, এ কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ও অন্যান্য বর্ত্তমান শিক্ষাগুরুগণ সামঞ্জস্যের এই প্রাচীন আদর্শ ধরেচেন। ফলে, ভ্রান্ত উত্তেজনায় বিশেষত্ব হারাবার দুর্গতি থেকে নব্যা নারী ত্রাণ পেয়েচেন, আবার পুরুষের নারী-বন্দনা সুসংযত হওয়ায় নারী-প্রগতি ছন্দ-পতনের বিপদ্-মুক্ত হয়েচে।

ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকার

বেদধর্ম্ম আচরিত গৃহে 'মিলিত-চিত্ত দম্পতি' (২) সোম-দেবতার যজ্ঞে স্তুতিগান করেন। ইন্দ্রদেবতার স্তবনিরত স্বামী-স্ত্রী যুগলের(৩) সাক্ষাৎও পাই। কখনো বা জায়া একাকিনীই ক্রিয়াকলাপে নিযুক্তা; বিশ্ববার (৪) দাম্পত্য সুখ কামনায় অগ্নিদেবের প্রার্থনা কচ্চেন। যজ্ঞ "উদ্‌যাপনে দ্রৌপদী(৫) ও কৌশল্যাদেবী(৬) স্বামীর পার্শ্বচারিণী ও সহধর্ম্মিণী। সীতা অন্বেষণে (৭) ভ্রাম্যমান হনুমান্ সন্ধ্যা সমাগমে এক স্বচ্ছতোয়া নদী দর্শনে ভাব্‌চেন বুঝিবা রাঘববাঞ্ছা এখনই সান্ধ্যকৃত্যের জন্যে এই পুণ্যসলিলে

(১) রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, সরলা। (২) ঋঃ বে, ৭, ৬১, ১-৭। (৩) ঋঃ বে, ১, ১৬৬, ৪। (৪) ঋঃ বে, ৫, ২৮, ৫। (৫) মহাভারত, অশ্বমেধ. ৯১ অঃ। (৬) রামায়ণ, আদি, ১৪ অঃ, ৩৩-৩৪ শ্লোক। (৭) রামায়ণ, সুন্দর, ১৪ অঃ. ৪৯।

আস্‌বেন। প্রিয় শিষ্য 'আনন্দের' অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ (১) কিঞ্চিৎ সমীহ সত্ত্বেও নারীকে 'সঙ্ঘে' গ্রহণ কত্তে বাধা রাখ্‌লেন না।

ধর্ম্ম চিন্তায় প্রতিভা

কিন্তু নারীর জ্ঞান বিকাশের দীপশিখা ধর্ম্মের নিষ্ঠামাত্র অনুসরণের অনেক উর্দ্ধে উঠেচে। তাঁর মৌলিক রচনা শক্তিতে বেদ সংহিতা সমুজ্জ্বল। বিশ্ববারা, শাশ্বতি, অপালা, ঘোষা, রোমশা, লোপমুদ্রা প্রভৃতি অনেক যশস্বিনী ঋষি আছেন। এঁদেরই একজনা, অম্ভৃন্ ঋষিকন্যা 'বাক্', স্বীয় আত্মাকে বিশ্বশক্তি জ্ঞানে যে স্তুতি করেচেন তাই দেবী সূক্ত নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী দেবীর আত্মজ্ঞান(২) জিজ্ঞাসার অমল প্রভায় আজো বিশ্ব আলোকিত।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেসা কর্‌লেন—স্বামিন্, যদি এই ঐশ্বর্য্যবহুলা বিপুলা ধরণী আমার আয়ত্ত হয়, বলুন দেব, আমি কি তাতে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর কর্‌লেন—কল্যাণি, কেবল মাত্র তাতে তুমি বিত্তলাভেরই তৃপ্তি পাবে; ধনসম্পদ দ্বারা অমরত্বের সম্ভাবনা হয় না। তখন মৈত্রেয়ী বল্লেন- তবে সে সবে আমার কী হবে যদি না আমি অমৃতা হ'তে পারি। প্রাচীন ভারত রমণীর উন্মেষশালিনী মেধার বহু পরিচয় দেয়। বিদ্যাদানে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার হয়েচে। শিক্ষয়িত্রীর অস্তিত্ব বিষয়ে মহাভাষ্যের বচন(৩) উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে—'যে মহিলার নিকটে গিয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন করে' আসা যায় তাঁকে উপাধ্যায়ী বলে। মহাভারতে(৪) বহু ধীমতী নারীর দেখা পাই। কুমারী সুলভার যুক্তিতর্কে বিদেহরাজ জনক শান্ত হ'লেন। পিঙ্গলাদেবীর শ্লোকে রাজাসেনজিৎ সান্ত্বনা পেলেন। এমন কি কপিরাজ মহিষী তারা(৫) শিক্ষায় এতদূর অগ্রসর যে

(১) বিনয় পিটক, চুল্লবগ্গ—১০, ১০, ৬। বৌদ্ধ ও চৈতন্য উভয় ধর্ম্মই নারীকে অতিরিক্ত আশঙ্কার চোখে দেখায় ভাগ্যের পরিহাসে নারী এদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। (২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২, ৪।' (৩) কুদন্ত অধ্যায়ের 'ইগুশ্চ সূত্রের পর পাতঞ্জল মহাভাষ্যের বার্ত্তিক। বৌদ্ধ 'ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ' প্রায়শ্চিত্ত, ৬২নং বিধান। (৪) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। (৫) রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

তিনি জানেন, স্বামীর সহিত অভিন্না হওয়ায় ভার্য্যা বেদ-বিহিত যজ্ঞকার্য্যে অধিকারিণী। কিন্তু জ্ঞানবতী অসংখ্য ভারতীয় মহিলার শীর্ষস্থান আলো করেচেন দুটী মহিমময়ী বিদুষী। তাঁদের আদর্শ বহুযুগ ধরে' জ্যোতি বিকীর্ণ করে' আসচে। দুটী বিরাট মহাসভা হ'ল—একটি প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগে, অপরটি বুদ্ধপরবর্ত্তি যুগে। কোন্ জ্ঞানের আদর্শে দেশের ধর্ম্মশাসন চল্বে, তাই নিয়ে এই সভা আহুত হ'ল, বৃথা পাণ্ডিত্যের কৌশল প্রদর্শন জন্য নয়। প্রথম তর্কযুদ্ধের নেতা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, দ্বিতীয়ের মণীষী শঙ্করাচার্য্য। প্রথম মহাসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেচেন রাজর্ষি জনক। সমগ্র ভারত আগত ঋষিবৃন্দ পরাজয়ে নতশির হয়েচেন এমন সময়ে দুটি শাণিত প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্ধ কর্‌বার জন্যে দাঁড়ালেন বাচক্নবী গার্গী। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, এঁরই পরাজয় সিদ্ধ হ'লে তবে মহর্ষির বিজয় সর্ব্ববাদীসম্মত হবে। প্রশ্নের প্রখরতায় পুলকিত চিত্ত মহর্ষির তর্কশক্তি অধিকতর বেগবতী করে' বচক্নু দুহিতা পরাজিতা হ'লেও মুগ্ধবিজয়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রচুর সমাদর লাভ কর্‌লেন। শাস্ত্রীয় দিগ্বিজয়ে বহির্গত বেদান্ত বিশারদ শঙ্কর তাঁর বিরুদ্ধবাদী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মুখীন হওয়ায় দ্বিতীয় ধর্ম্ম মহাসভার সংঘটন হ'ল। এহেন দুই প্রচণ্ড জ্ঞানীর শাস্ত্র তর্ক বিচারকের উপযুক্ত বিবেচিতা হ'লেন শঙ্কর-বিবাদী পণ্ডিতরাজের পত্নী শ্রীমতী উভয়ভারতী। আর, অকুণ্ঠিত চিত্তে সংস্কারমুক্ত অন্তরে তিনি জয়গৌরব দিলেন স্বীয় স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে ও স্বামীস্ত্রী উভয়ে বিজয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে' তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ভারতব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌লেন।

কান্তবিদ্যা—নৃত্যগীত

সে বৈদগ্ধের সাধুবাদ কিছুতেই দেওয়া যায় না যাতে করে' সৌন্দর্য্য জ্ঞান বিকশিত না হয়। 'ললিতে কলাবিধৌ'(১) বিদ্যাদানে প্রাচীন ভারতে কল্পনার দীনতা বা আগ্রহের কৃপণতা ছিল না। বেদ হ'তে কাব্য-যুগ পর্য্যন্ত সর্ব্ব কালেই রমণীগণ স্বচ্ছন্দে নৃত্য-গীত সাধনা-

(১) রঘুবংশ, অজবিলাপ, ৮, ৬৭।

কর্‌তেন। একে গন্ধর্ব্ব বিদ্যা বলা হ'ত। 'যেমন দুটি নৃত্য-পরা রমণী'(১) উপমায় এমন ছবি বেদে বহু পাওয়া যায়। মতদ্বৈধ সব সময়েই আছে; গন্ধর্ব্ব বিদ্যাকে যে হেয় না করা হ'য়েচে এমন নয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থ(২) বল্‌চেন:—'তখন দেবগণ বীণাযন্ত্র সৃষ্টি কল্লেন ও বাগ্দেবীকে খুসী করার, উদ্দেশে বীণাধ্বনি যোগে সঙ্গীত আলাপ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। দেবগণের প্রতি মনোযোগের পরিবর্ত্তে তিনি নৃত্যগীত রসে বিহ্বলা হ'লেন। সে জন্য আজো রমণীগণ বৃথা বিষয়ে আকুলা হন। বাগ্দেবীর হ'য়েছিল এই ভাব, আর সেই দৃষ্টান্তে অন্য রমণীগণেরও এরূপ হয়। এজন্য রমণীগণ সহজেই নৃত্যগীত পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি আসক্তা হন।' এই পথ দিয়ে মদ্যপান ও এসেচে। বেদে(৩) এর প্রমাণ দুর্ল ভ নয়। কাব্যযুগ অবধি আস্‌তে ইতি মধ্যে পানলিপ্সার(৪) জনপ্রিয়তা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েচে। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে রাজ্ঞী ইরাবতী সুরাকীর্ত্তনে উল্লসিতা হ'য়ে বল্‌চেন—'এ প্রবাদ কি তবে সত্য যে মদ্যপান রমণীর অলঙ্কার?' যাহোক্, নাট্যারম্ভেই কালিদাস সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে যে অমূল্য বাণী প্রকাশ করেচেন, এ বিষয়েও সে কথা স্মরণ করা যায়—'পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্'—প্রাচীন মাত্রেই সব কিছু সাধু নয়। শিল্পরসগ্রাহী বৌদ্ধ রাজসভায় গন্ধর্ব্ববিদ্যা চরম উৎকর্ষ লাভ করেচে।

কান্ত বিদ্যা—বসন-ভূষণ

পরিচ্ছদের ক্রমবিকাশ জাতীয় সংস্কৃতির গতি(৫) নির্দ্দেশ করে; এর নানাবর্ণ তার সভ্যতাকে রঞ্জিত করে। বেশ বিন্যাসের পটভূমি রচনায় রূপ প্রদর্শণের কলাকৌশল আর্য্যনারী ভালোই জানেন। তাঁর বসন, ভূষণ ও প্রসাধনের প্রাচীন ভঙ্গিমা আজো অতি অভিনব বলে'ই শ্রদ্ধা পেয়ে আস্‌চে। বৈদিক যুগে তিনি 'অতি শোভন বসন'(৬)

(১) অথর্ব্ববেদ—১০, ৮, ৪৩। (২) শতপথ ব্রাহ্মণ—৩, ২, ৪, ২—৬। (৩) ঋ: বে—৭, ৮৬, ৬; অথর্ব্ব, ৪, ৩৮, ১—৪। (৪) রঘু ৯, ৩১; কুমার, ৪, ১২। (৫) Dr. R. L. Mitra—Indo Aryan Vol I. P. 166. (৬) ঋ: বে—১০, ৮৫, ৬।

উপহার পেলেও শ্লীলতার নির্ম্মম শাসনে সর্ব্বাঙ্গ জড়ানো তাঁর ভালো লাগে নি ; 'নটীর ন্যায় তনু দেহ ঘিরে' তিনি উজ্জ্বল অঙ্গাবরণ(১) ঝুলিয়ে দেন।' পৌরাণিক যুগে তাঁর বস্ত্রসম্ভার আরো বেড়েচে। ভাগবৎ 'কঞ্চুক' আবরণে তাঁর কুচযুগল সংযত করেচেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত তাঁকে বিচিত্রিত শাড়ী পরিধান করিয়েচেন, কাব্যযুগে আবার নীবিবন্ধ যোগে পরিহিত শাড়ীর প্রান্তে হংস-মিথুন আঁকা হয়েচে। প্রেম অনুরাগে স্বামী(২) আবহমান কাল প্রিয়াকে অলঙ্কার শ্রীতে মণ্ডিত করে' আস্‌চেন। বৈদিক কবি(৩) তাঁর সুকুমার গ্রীবা আবেষ্টনে নানাবিধ স্বর্ণমালিকা আন্দোলিত করেচেন, সুবর্ণের বক্ষাভরণে আচ্ছাদন ছলে তাঁর স্তন গৌরব ব্যক্ত করেচেন, সেবানিরত করে কঙ্কণের মঙ্গল-গীতি শ্রবণলালসে তাঁকে বলয় শোভিতা করেচেন, মুকুট অর্পণে তাঁর ললাটে প্রদীপ্ত যৌবনের জয়শ্রী নিবেশিত করেচেন। বিষ্ণুপুরাণ পতির আয়ু অভিলাষিণীকে বদনকমলে লুব্ধ ভ্রমর সদৃশ দোলায়মান কর্ণভূষণ দিয়েচেন। শিল্প পরিচায়ক স্বল্প পরিচ্ছদের সঙ্গে মনোহর অলঙ্কার বাহুল্যের(৪) মিলনে অপরূপ চিত্রের মত তিনি রূপের অন্তর্লীন মাধুরী বিকশিত করেন। শিল্পীর প্রকৃতি নিয়ে তিনি পুরুষের মনে আপনার মোহ বিস্তার করেন। উজ্জ্বল সাজে স্মিত হাস্যের সলজ্জ আভা ছড়িয়ে উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা বনিতা(৫) স্বামীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ান ; তখন তাঁর জিজ্ঞাসুনেত্র যেন প্রশ্ন করে—প্রিয়তম! আমাতে তুমি আনন্দ পাও ?' আর সুমধুর আলাপনের অবসরে মঞ্জুদেহের রহস্য প্রকাশে(৬) পতির হৃদয় হরণ করেন। উষা বর্ণনার অন্তরালে আর্য্য-নারীর কান্তবৃত্তির(৭) যে পূর্ণ বিকশিত ছবি ফুটেচে নবীনা রমণীরত্ন মধ্যেও সেটি বড় সুলভ নয় :—

(১) ঋঃ বে,—১, ৯২, ৪। (২) মনু—৩, ৫৯ ; মহানির্ব্বাণ—৮, ৪২ ও ৪৭। (৩) ঋঃ বে—৫, ১৯, ১৩ ; ৫, সূক্ত ৫৩—৫৮। (কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ২, ১১, দ্রষ্টব্য) (৪) প্রিয়তমা কেমন হবে—Theophile Gantier তাঁর Mademoisselle de Manpin উপন্যাসে একে একে অনেক আদর্শ যাচাই কচ্চেন ; তার মধ্যে অশেষভূষণ মণ্ডিতা যে এক দীপ্তিময়ীর দেখা পাই, প্রাচীন আর্য্য নারীর বিবিধ গহনার বিবরণে সেই কথা মনে পড়ে। (৫) ঋঃ বে, ৭, ৭৭, ১ ; ১, ১২৪। (৬) ঋঃ বে—১০, ৭১, ৪। (৭) Aesthetic faculty.

'অথবা, উষা(১) কুশলা অভিনেত্রী—গানের সুরে, নাচের লীলায়, হাবভাবের ললিত বিভ্রমে, বসনভূষণের বর্ণচ্ছটায় অনিমেষ দৃষ্টি জনতাকে তিনি মুগ্ধ করেন।' অলঙ্কারের প্রভাব ভাবরাজ্যও অধিকার করেচে। ছন্দোময় মন্ত্রে রচনা-শোভার জন্য চিন্তিতা ঋষি কন্যার(২) মনে সম্প্রদান কালীন সালঙ্কারা নববধূর রূপ জেগে উঠ্‌চে। রমণীর রূপ প্রকাশে অলঙ্কার যে কত কৃতার্থ পুরুষের সেই নিবিড় অনুভূতিই সায়নভাষ্যে(৩) অলঙ্কার প্রশস্তির প্রেরণা দিয়েচে।

কান্তবিদ্যা—প্রণয় ও প্রসাধন

রূপ-বিহ্বলা প্রণয়িনী প্রেমাস্পদের চিত্র(৪) এঁকে বিরহ শান্ত করেন। নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও তিনি খুব সচেতন। বিজ্ঞান সেবিতা* পাশ্চাত্য নারীর অনন্ত আয়োজন জানা না থাক্‌লেও জীবন রস নির্ঝরের ঝঙ্কার-মুগ্ধা আর্য্য নারী প্রসাধন কলাপে প্রচুর কবিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর রূপ অনুরাগের সূক্ষ্ম অনুভূতির সংবাদ পাওয়া যায় কামসূত্রে(৫) ও কাব্যসাহিত্যে। দারু হরিদ্রা(৬) দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চা করেন। উচ্চে স্থাপিত জলধারা নীচে স্নানান্তে(৭) তিনি সুবাসিত ধূমে(৮) তরঙ্গ-কুটিল কুন্তলরাশি শুষ্ক করেন—

"ধারা যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে।"(৯)

তারপর, যৌবনোন্নত বক্ষঃ চন্দন লিপ্ত(১০) করেন—

"প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।"(১১)

(১) ঋঃ বে—১, ৯২ ; ১, ১২৩ ; ১, ১২৪ ; ৫, ৮০ ; ৭, ৭৫। (২) ঘোষা—ঋঃ বে—১০, ৩৯, ১৪। (৩) সামবেদ ভাষ্যভূমিকা শেষে। (৪) কাব্যসাহিত্যের সর্ব্বত্র চিত্রাঙ্কন বিস্তার উল্লেখ আছে—যথা, শ্রীহর্ষ, রত্নাবলী, ২য় অঙ্ক। * সুশ্রুত সংহিতায় নারীর পাদুকা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। তন্ত্রসারের ৬৪ প্রকরণ মধ্যে স্বর্ণ খচিত পাদুকার উল্লেখ আছে। (৫) বাৎসায়ন, কামসূত্র, ৭ম অধ্যায়। (৬) ঋতু সংহার, হেমন্ত, ৫। (৭) অবগাহন ও সন্তরণ পটুতা ও আছে—রঘু, ১৬, ৬২। (৮) রঘু—১৯, ৪১। (৯) রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল। (১০) রঘু ১৯, ৪৫। অন্য কাব্যের দৃষ্টান্ত—'ন লুপ্তং সখি চন্দনং স্তন তটে।' (১১) রবীন্দ্র, কল্পনা, স্বপ্ন।

তিনি বিম্বাধর লাক্ষা(১) অথবা তাম্বুল(২) রঞ্জিত কণ্ঠে ভালবাসেন ও মুকুর-প্রতিবিম্বে(৩) অনুপম মুখশোভা নিরীক্ষণ করেন। অনুরক্ত নাথের নিপুণ তুলিকার রঙের লোভে তাঁর চারু চরণ যুগল(৪) স্থির থাকে আবার নূপুর(৫) বন্ধনে চপল হ'য়ে ওঠে। তাঁর অঞ্জন-সুন্দর(৬) মোহন নয়ন প্রণয় লাজে নিমীলিত(৭) হয় আবার বিশেষ ভঙ্গিমায়(৮) প্রণয়ীর চিত্ত কাতর করে। পতির উৎকণ্ঠা যেন না বুঝে' বিলম্বিত(৯) যামিনীতে শয়ন কক্ষে যাওয়া অভ্যাস হ'লেও, 'বর্ষণ-হর্ষ-ভরা' সন্ধ্যায়(১০) কিন্তু কুসুম সজ্জিতা দয়িতাকে গুরুজনের কাছে বেশীক্ষণ পাওয়া যায় না। প্রিয় সমাগম আশায় প্রসাধনে পরাগ-গর্ভ পেলব পুষ্পই তাঁর 'কনকাভরণের প্রতিনিধি'(১১)। রজনী যাপনের শয্যা সমীপে(১২) 'সুগন্ধ নির্য্যাস' ও 'সুগন্ধ লেপন' প্রভৃতি অঙ্গরাগের আয়োজন রাখ্‌তে তাঁর ভুল হয় না কিন্তু তাঁর পুষ্প-বিজড়িত কবরী(১৩) 'রতি-শ্রান্তিতে বিগলিত-বন্ধ' হ'য়ে আসে।

শারীরিক পটুতা

তবুও কেবলই তিনি লাবণ্যের প্লাবন মাত্র নন। উষার(১৪) অরুণরশ্মি জাল বিস্তার মধ্যে বৈদিক ঋষি সাহসী যোদ্ধার অস্ত্র নিষ্কাশনের উপমা দেখেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে আহ্বানে গার্গীর যে দৃপ্ত ভঙ্গীটি ঋষি কল্পনা(১৫) করেছেন সহজেই তা' পরাক্রমশালী কাশী অথবা বিদেহরাজের শরাসনে জ্যা-আরোপণের ছবি এনেছে। রমণী বিষয়ে বীরত্বের কাল্পনিক চিত্র সম্ভব হয় না যদি তাতে বাস্তবিক সংস্রব একেবারেই না থাকে। কিন্তু কল্পনার মূলীভূত আভাষ মাত্র নিয়ে জল্পনা না কল্লেও চলে। প্রকৃত ব্যাপারের অভাব নেই। পুষ্পচয়ন নিরতা সাহসিকা রমণীর দ্রুতবেগে পর্ব্বত আরোহণ উল্লেখে সায়ন(১) একটি কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যজ্ঞভূমিতে শীঘ্র পৌছবার জন্য সরস্বতীদেবীকে অশ্বারোহণে(২) আস্‌তে অনুরোধ করা হ'য়েছে। নববধূকে 'বীরকামা ও বীরপ্রসবিনী'(৩) হওয়ার আশীর্ব্বাদ করা হয়েছে। রাজ্ঞী বিশ্‌পলা(৪) রণোল্লাসে সমরক্ষেত্রে ছিন্নচরণা হ'লেন ও অশ্বিনদেব যুগল লোহার পা' জুড়ে' দিলেন। দৈহিক ও নৈতিক উভয় বলেরই পরিপূর্ণ আদর্শ দ্রুপদ-নন্দিনী। কুরুরাজ সভায় নির্য্যাতিতা হওয়ায় ভীষ্মদ্রোণকে তিনি অসঙ্কোচে তিরস্কার কল্লেন আবার বনবাস কালে অভিলাষ-বিকল-চিত্ত রাজা জয়দ্রথকে চরণাঘাতে বিগতস্পৃহ করেন। পরবর্ত্তী বাৎসায়ন যুগ(৫) অবধিও স্বামীর অভিপ্রেত সকল রকম প্রচলিত খেলাধুলায় আর্য্যনারীর সুডৌল দেহ বলিষ্ঠ আমোদে স্ফূর্ত্তি পেয়েছে। প্রাচীন যুগে যোষিৎগণ সর্ব্বত্র বাধাহীন সঞ্চরণে(৬) জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। বাধার সুরু হ'ল স্মৃতি যুগে। পুরুষের ঈর্ষাকুঞ্চিত নেত্রের পাহাড়া বস্‌লো তাঁর চলাফেরা(৭) কথাবার্ত্তা(৮) সব কিছুরই উপর। তাঁকে আর কোথাও নিমন্ত্রণে বা উৎসবে একাকিনী(৯) পাঠান যায় না। সন্দিগ্ধ কুটিল শাসনের প্রকোপে তাঁর মুমূর্ষু অন্তরাত্মা অবলা নামের প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হ'লো।

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

(১) কুমারসম্ভবম্—৫, ১১। (২) ঋতুসংহার—শিশিরবর্ণনম্—৫। (৩) রঘু—১৯, ২৮। (৪) মালবিকাগ্নিমিত্রম্—ইরাবতীর প্রশ্নে বকুলার উত্তর [আল্‌তা পরা] (৫) বিক্রমোর্ব্বশী, ৩য় অঙ্ক; ঋতু সংহার—গ্রীষ্ম, ৫; শরৎ, ২০। (৬) কুমার—৭, ৫৯: [কাজল পরা] (৭) রঘু—৭, ২৩ [প্রণয় ভাব] (৮) উত্তর মেঘ—১২—[বিলাস বিভ্রম] (৯) রঘু—৫, ৬৪। (১০) ঋতু সংহার—বর্ষা, ২১। ১১) রঘু—৯, ৪০। (১২) বাৎসায়ন—কামসূত্র—'সৌগন্ধপুটিকা (Scent box) ও 'সিক্থ করণ্ডক' (Pomade) (১৩) রঘু—৯, ৬৭। (১৪) ঋঃ বে—১, ৯২, ৩। (১৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৩, ৮, ২।

(১) ঋঃ বে—১, ৫৬, ২, সায়ন ভাষ্য। (২) ঋঃ বে—১, ৩, ১০। (৩) ঋঃ বে—১০, ৮৫, ৪৪। (৪) ঋঃ বে—১, ১১৬, ১৫।

(৫) কামসূত্র—৪, ১, ১৬। (৬) Winternitz—History of Indian Literature, Vol I, P. 67. Lala Lajpat Rai—unhappy India, P. 155. (৭) মনু—৯, ১৬ (৮) মনু—৭, ৩৬১ (৯) মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র—৮, ৪৩।

স্বপ্নের খোকা

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

আশালতার মনে হইল, মা-মা-মা—করিয়া টানিয়া টানিয়া বড় আকুল স্বরে পাশ হইতে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। তার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বামী একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন। নাড়িয়া ঠেলিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল—ওগো, সরো—একেবারে চেপে পড়েছ ওকে, সরে যাও একটু—

ঘুমের ঘোরে শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল ?

—খোকা কাঁদছে, তুমি ব্যথা দিয়েছ; শুনতে পাচ্ছ না ওর কান্না ? ও ত আমার কাঁদবার ধন নয়—

ঘর অন্ধকার। বৈশাখ মাসে অকাল বর্ষা সুরু হইয়াছে। জানলার ওপাশে রেল লাইনের ধারে ধারে কসাড় জঙ্গলে ঠাণ্ডা জোলো বাতাস সরসর খসখস শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে আচমকা তাহার এক এক ঝাপটা ঘরে আসিয়া ঢোকে, কবাট নাড়াইয়া, মশারী উড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়।······গলার স্বরে মনে হইল, আশার চোখ দিয়া বুঝি জল পড়িতেছে।

শ্রীশ খুব কাছে আসিয়া সস্নেহে তার মাথাটি বুকের উপর তুলিয়া লইল। বলিতে লাগিল—ও আশা, স্বপ্ন দেখলে নাকি······চুপ করে ঘুমোও, ভয় কি !······

তারপর ঘণ্টাখানেক হইবে কি না হইবে, শ্রীশ আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—এবারে আশা ধড়মড় করিয়া একদম বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে শুনিতে লাগিল, খুব শ্লেষ্মা হইয়া অসুখ করিলে গলা দিয়া যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় ঘরের মেজে কি আর কোনখান দিয়া তেমনি ধরণের যেন একটা অস্পষ্ট চাপা কাতরাণি···আর কাটা কবুতরের মত কি যেন এদিক-সেদিক পাখা ঝাপটাইয়া বেড়াইতেছে। আশা বসিয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ দিল না। ক্রমশঃ শুনিতে লাগিল, সেই একটানা গলার আওয়াজ একটু পরিস্ফুট হইয়া তাহাকেই ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছে।

খোকার গলা—সেইরকম মিষ্টি জড়ানো-জড়ানো, অবিকল !

উজ্জ্বলমুখে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। যেন রেললাইন ছাড়াইয়া কত দেশ-দেশান্তর নদী-সমুদ্রের পরপার হইতে স্তিমিত-তারা রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া ফুঁড়িয়া শব্দ আসিতেছে। আবার সন্দেহ হয়, এ ডাক ঘরের মধ্যেরই···অনেক—অনেক নীচের পাতালপুরী হইতে সমস্ত মাটি ইট ও সিমেণ্ট ভেদ করিয়া অতিশয় করুণ ক্ষীণকণ্ঠে খোকা তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতেছে—মা, মা, মা, মা,—

পা ছড়াইয়া দিয়া বহুকালের অসংস্কৃত সুরকী-ওঠা মেজের উপর পাষাণ প্রতিমার মত সে বসিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে দুচোখ ছাপাইয়া নিঃশব্দে জল পড়িতে লাগিল। জানলা দিয়া বাহিরে কেবলমাত্র সিগ্‌ন্যাল-পোষ্টের রক্তচক্ষুটি দেখা যায়। আশা ভাবিতে লাগিল, কোন দেশে এই রাত্রে ঘুমভাঙা একটি অসহায় ছেলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা চিরিয়া ফেলিতেছে, ওখানে ছেলে শান্ত করিবার কি কেউ নাই ? ··

আরও অনেক রাত্রে মেঘ কাটিয়া চাঁদ উঠিল, ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একসময়ে জাগিয়া উঠিয়া শ্রীশ দেখিল, আশা বিছানায় নাই, নীচে সিমেণ্টের উপর এলোচুলের বোঝা এলাইয়া ঝড়ঝাপটায় আহত পাখিটির মত পড়িয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া দেখিল, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অঘোরে ঘুমাইতেছে। সে ছবি দেখিয়া শ্রীশের মন কেমন করিয়া উঠিল, সোনার পদ্মের কি দশা হইয়া যাইতেছে দিন দিন !

ভোরে জাগিয়া প্রথমটা আশা এরকমভাবে নীচে পড়িয়া থাকিবার মানে বুঝিতে পারিল না। শেষে মনে পড়িতে লাগিল। ভাগ্যিস্ উনি এখনো জাগেন নাই, জাগিয়া এই দশা যদি দেখিতে পাইতেন লজ্জার কি আর কিছু বাকী থাকিত? তাড়াতাড়ি চুল ও কাপড়চোপড় ঠিক করিয়া ভালমানুষ হইয়া বিছানার উপর যাইবে এমন সময় ঠাহর হইল—সর্ব্বনাশ, মেজেয় পড়িয়া থাকিবার সময়েও যে তার পাশে ছিল পাশবালিশ, মাথার নীচে ছোট্ট তাকিয়াটা! কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বালিশ নিশ্চয় যে নিজে খাটের উপর হইতে নামাইয়া আনে নাই। মাথার নীচে বালিশ কে গুঁজিয়া দিল তবে? শিয়রের দিকে আবার একখানা হাত পাখাও পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘরের মধ্যে তখনও স্পষ্ট আলো হয় নাই; আবছা আলো শ্রীশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। করুণ অসহায় মুখ—ঘুমন্ত অবস্থায়ও যেন মনের দুশ্চিন্তা কাটে নাই। আশা সঙ্কল্প করিল, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যেমন করিয়া হোক সে ভাল হইয়া উঠিবে, খোকার কথা একবিন্দু ভাবিবে না আর; ওঁকে আর ভাবাইয়া মারিবে না…

ন'টা পঁচিশের লোকাল ট্রেণ বিদায় হইলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আর গাড়ী নাই। সেই ফাঁকে শ্রীশ বাজারে গিয়া নূতন একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার লইয়া আসিল। আশাকে খবর দিতে সে হাসিয়াই খুন।

—তুমি পাগল হলে নাকি? ঠিক পাগল হয়েছ… নিশ্চয়—

—হয়েছি হয়েছি, বেশ। বলিতে বলিতে বারকতক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আশার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ শ্রীশ খপ করিয়া তার ডান হাত টানিয়া বাহির করিল।—কি সর্ব্বনাশ বলো দিকি—আবার রান্না ঘরে হলুদ বাটতে বসে গেছলে?

একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গিয়া আশা আর জবাব দিতে পারিল না।

চেঁচাইয়া বাড়ীমাত করিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া শ্রীশ বলিতে লাগিল—কাপড়ের নীচে হাত ঢাকা হচ্ছে, তখনই বুঝেছি। এত করে মানা করি রান্নাঘরে আগুনের কাছে যেও না…পয়সা দিয়ে রাঁধুনী রাখলাম কি জন্যে? আজ আমি কুরুক্ষেত্র করে ছাড়ব। ভালমানুষ পেয়ে কথা গ্রাহ্য হয় না, না?

আশা বলিল—ইস, ভালমানুষ না আরো কিছু। আমায় ছুঁয়ে দিলে ত ষ্টেশনের ঐ সাতবাসী কাপড়ে—কেন আমায় ছুঁয়ে দিলে বল ত? কিচ্ছু আর বাচবিচার রইল না তোমার জ্বালায়—ম্লেচ্ছ কোথাকার—

হুড়মুড় করিয়া কুলুঙ্গী হইতে মশলা-ভরা বিস্কুটের টিন পাঁচ সাতটা পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে আলনার কাপড় জামা একরাশ এবং আচারের জারটিও মাটিতে পড়িয়া শতকুচি হইয়া গিয়াছিল আর কি—

আশা তাড়াতাড়ি আসিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল। এবারে সত্যসত্যই বিরক্ত হইয়া বলিল—ও কি হচ্ছে আমার মাথামুণ্ডু? কি চাই, বল্লেই ত হয়। সব হাণ্ডুল পাণ্ডুল করে…আমার একবেলা লাগবে গোছাতে…কি খুঁজছ?

অপ্রতিভ হইয়া শ্রীশ কহিল,—সাবান খুঁজছিলাম। তুমি শিগগীর হলুদ-মাখা হাত ধুয়ে সাফ হয়ে এস, ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে—

আশা ধীরে সুস্থে একটা একটা করিয়া জিনিষ-পত্র তুলিয়া গোছাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া আবার শ্রীশ কহিল—যাও, দেরী কোরো না, শিগগীর এস, এক মিনিটের মধ্যে—

—ইঃ হুকুম চালাচ্ছেন, ভারী ইয়ে হয়েছেন। আসব না আমি শিগগীর, এই গিয়ে কুয়োতলায় বসলাম, আস্‌ব সে-ই বিকেল বেলায়—বলিয়া কয়েক পা গিয়া আবার আশা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমায় বলা হ'ল না, কওয়া হ'ল না, ডাক্তার আনা হয়েছে—দেখো কি বেকুব করি আজ তোমাকে। টাকা পয়সা আমার বাক্সে তো, ভিজিট এক পয়সাও বের করব না, দেখি—

সেইখানে দাঁড়াইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিল, অপর পক্ষের যত ব্যস্ততা দেখে ততই হাসিতে থাকে।

শ্রীশ কাছে আসিয়া অনুনয়ের ভঙ্গীতে কহিল—না, ন —দেরী কোরো না আর, যাও—যাও—

যাচ্ছি গো—বলিয়া আশা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। স্বামীর দুই কাঁধে বাহু দু'টি রাখিয়া স্নিগ্ধ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল—

আচ্ছা, এই যে সব ডাক্তার কবরেজ হেনো তেনো—আমার কি হয়েছে যে তুমি এত করছ ?

—আয়না ধরে দেখ আগে কি হয়েছে—তারপর বোলো—

—ছাই হয়েছে—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া আশা স্বামীর বিশুষ্কমুখে আনন্দ আনিবার প্রয়াস করিল। সোনার চুড়ি ঝিনমিন করিয়া বাজাইয়া একখানা হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দেখছ, কত মোটা হয়েছি আমি দেখ একবার। তুমি কেবল মিছেমিছি ভাববে তা কি হবে ?

শ্রীশ বলিল—মিছেমিছি বই কি—

—এমন ভীত মানুষ, তোমায় নিয়ে কি যে করি—। সহসা রাত্রির ঘটনা মনে পড়িয়া আশা আর হাসিতে পারিল না।

নিশিরাত্রে কোনদিকে কেউ যখন জাগিয়া থাকে না, মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, আপনার জনকে দেখিবার জন্য সেই সময়ে দলে দলে ওপারের লোক পৃথিবীর পথে বেড়াইতে আসে !

কাল রাতে তার মা-হারা খোকা ঐ জানালার ধারে কি কোন খানে আসিয়া তাহাকে মা-মা-বলিয়া ডাকিয়াছিল।

যে-খোকাকে চার বছরের মধ্যে একটা দিন সে কোল-ছাড়া করিতে পারিত না, সে আবার কোলে আসিতে চাহিয়াছিল, দিনের আলোয় এই কথা ভাবিতে গিয়া ভয়ে আশার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর সহজ গলায় বলিল—দেখ, রোগ আর কিছু নয়—বড্ড খারাপ স্বপ্ন দেখি। তোমার ডাক্তারে তার কি করবে ?

—ডাক্তারী অষুধ আছে।

—ছাই আছে, তা হলে কি খোকন আমার—আশার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, আর শব্দ বাহির হইল না। অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া আঁচল টানিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন শুইবার আগে আশা নূতন ডাক্তারের দেওয়া উৎকট বিস্বাদ ঔষধ পরপর দুই দাগ খাইল। অত রাতে চুলের বোঝা ভিজিয়া গেল, বালিশ বিছানাও ভিজিয়া যাইবে তবু অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া মাথায় জল দিল। গোবিন্দ গোবিন্দ—বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িল, ঐ নামে নাকি দুঃস্বপ্ন বিছানার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে পারে না। শুইয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিল, কালো বকনা গরু···কাঁটা-ঝিটকের জঙ্গল···জবাফুল···জলের কলসী···আর কিছুতে কোনক্রমে খোকার কথা মনে ঢুকিতে দিবে না।

তখন অনেক রাত্রি। জ্যোৎস্না উঠিবার কথা, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘে আঁধার হইয়া চারিদিক গুমট করিয়াছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া আশার মনে হইল, বরফের মতো শীতল কচি কচি পাঁচটা আঙুল কে যেন তার মুখের উপর দিয়া চোখ-কান-গালের উপর বুলাইয়া লইয়া গেল। একবার চোখ মেলিয়া আবার তখনই চোখ বুজিয়া সতর্ক হইয়া রহিল, এইবার যেই মুখের উপর হাত লইয়া আসিবে অমনি ধরিয়া ফেলিয়া চেঁচাইয়া উঠিবে।···কিন্তু সে বুঝি টের পাইয়াছে, আর আসিল না।

একটু পরে শুনিতে লাগিল, মেজের উপর তালে তালে ঘুট-ঘুট শব্দ হইতেছে, নূতন জুতা পরিয়া অনভ্যস্ত পায়ে সানন্দে চলিয়া বেড়াইবার মত ভাবটা। আর আশা বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না, উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিল। মুখ-চোখ আনন্দে চকচক করিতে লাগিল, হাসিমুখে শব্দের তালে তালে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল—

হাঁটি হাঁটি পা—পা—
খোকন হাঁটে দেখে যা—

অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে লাগিল, সাদা সাদা দুধে দাঁত মেলিয়া খোকন হাসিতেছে। চার বছরের, খোকা তাহার মৃত্যুপারের দেশ হইতে আবার এক বছরেরটি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এক বছর বয়সে নূতন হাঁটিতে শিখিয়া যেমন করিত ঠিক তেমনি। হাত বাড়াইয়া আশা ডাকিতে লাগিল —এসো, এসো, মাণিক এসো, আমার ধন এসো—

খোকা আসে—আসে—এক পা দু'পা তিন পা করিয়া আসিতে থাকে—আবার আসে না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুষ্টুমী ভরা চোখে চায়, মিটিমিটি হাসে, কোলে সে আসিল না।

—চলে আয় ও দুষ্টু ছেলে, আসবি নে? ও খোকন, আসবিনে তুই আর? দুই হাত বাড়াইয়া স্বপ্নাচ্ছন্ন আশা উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলে ঐ আঙ্গুল মুখে পুরিয়া ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া হাবার মত তাকাইয়া আছে। আকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়া আশা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ধরিয়া দেখে তার সাদা সেমিজটা টাঙাইয়া দেওয়া ছিল, তাহাই। ও মাগো—বলিয়া সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই শব্দে শ্রীশের ঘুম ভাঙিল। উঠিয়া দেখে আগের রাত্রির মতো আশা নীচে পড়িয়া আছে। জোরে জোরে ডাকিয়াও সাড়া পাইল না। আলো জালিয়া দেখে, চোখ বুজিয়া আছে, আপাদ মস্তক যেন বিদ্যুতের ছেঁায়ায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে কতক্ষণ পরে আশা পাশ ফিরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—ও মাগো—

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শ্রীশ ডাকিতে লাগিল—ও আশা·· আশা, একটাবার কথা বল, ভয় করছে?

না—না—বলিয়া যেন সহসা সম্বিৎ পাইয়া কাপড় চোপড় গোছাইয়া আশা উঠিতে গেল। শ্রীশ বাধা দিয়া কহিল—উঠো না, ওখানে অমনি থাক, পাটিটা পেতে দিচ্ছি···বাতাস করব?

সমস্ত রাত আলো জালা রহিল। শ্রীশ একরকম জাগিয়া কাটাইল। মাঝে মাঝে একটু ঘুমের ভাব আসে কিন্তু একটা কিছু পড়িলে কি ঘুট করিয়া সামান্য কোন শব্দ হইলে অমনি সে লাফাইয়া উঠিয়া বসে। আশা সারারাত্রের মধ্যে আর গোলমাল করিল না, চোখ বুঁজিলেই যেন দেখিতে পায় বড় বড় কোঁকড়ানো চুল—তার হারাণো খোকা ডাগর চোখ মেলিয়া মুখে আঙ্গুল পুরিয়া খানিক একদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মাকে দেখিতেছে, খানিক খানিক আবার চোখ নামায়। এক একবার আশা নিজেই ভাবে, এসব মিথ্যা—স্বপ্ন, তবু চোখ বুজিয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল মনের আনন্দে খোকাকে দেখিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবে, রাত্রি যেন না পোহায়, ভোর যেন মোটে না হয়···

রোদে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, তখনও শ্রীশ বিছানায় পড়িয়াছিল। ঘরের মধ্যে চাকার ঘড় ঘড়ানি শুনিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, খোকার ঠেলা গাড়ীটা একপাশে সযত্নে গত কয়েক দিন পড়িয়াছিল, আশা তাহার উপর রাশীকৃত পুতুল্ সাজাইয়াছে এবং সাটিনের সেই লাল জামাটি—যেটি খোকার গায়ে পরাইয়া দিয়া বছর দুই আগে এক বিজয়া দশমীর দিন আশা বলিয়াছিল—গড় কর, ওঁকে গড় করত খোকা··· সব বোঝে তোমার ছেলে, দেখবে কি সুন্দর প্রণাম করবে এখন—

খোকা কিন্তু ঘাড় নোয়াইয়া আশা যে রকম চাহিয়াছিল সেভাবে প্রণাম করিল না, দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কারের মতো একটা ভাব করিল। দুই রকমই সে শিখিয়াছে, কোনটা কখন করিতে হয় ঠিক করিতে পারে না।

আশা হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।—ওরে বোকা, গুরুজনকে বুঝি অমনি সেলাম করে? সাহেব হয়ে গেলি নাকি? খোকা আমার সাহেব—কেমন রঙ দেখেছ?—ঠিক সত্যিকার সাহেব। তুমি একটা টুপি কিনে দিও—লাল টুপি—

খোকাও দেখাদেখি হাসিয়া উঠিল। পদ্মের পাপড়ীর মত রাঙা ঠোঁট দুখানি চাপিয়া শব্দের শেষ দিকটায় অসঙ্গত জোর দিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে মায়ের কথার উপর বলিয়া উঠিল—তুপ পী-ই-ই-

সেই লাল টুকটুকে ছোট্ট জামা এবং লালটুপিটিও ঠেলাগাড়ীর উপর রাখিয়া ঘড়ঘড় করিয়া আশা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল।

শ্রীশ জিজ্ঞাসা করিল—ওসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

আস্তাকুড়ে—বলিয়া আশা বিষণ্ণ-দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। বলিল—এক কাজ কর, তুমি এগুলো একেবারে গাঙের জলে ফেলে দিয়ে এস। যেখানে খোকা গেছে, তার জিনিষ পত্তোর যাক সেখানে—

শ্রীশ উঠিয়া আশার হাত হইতে গাড়ী সরাইয়া রাখিয়া কহিল—পাগল হ'লে আশা? তুমি এসব মোটেই আর ভাবতে পাবে না। এই শোন, আমার মুখের দিকে চাও একবার—

আশা বলিল—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ভাবতে আমি চাইনে। সে কি রাত্তিরে আসবে, আমি কি করব—এসে মা-মা-করে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে। সে কি কম শত্তুর?

নিজে গেল, এবার আমাকে নেবে। আজ তার কিছু আর এবাড়ীতে রাখব না, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। ঐগুলো দেখলে ঘর যেন খালি ঠেকে, সেই সব ছাই ভস্ম কথা মনে পড়ে যায়—

বলিয়া অবসন্নভাবে একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল—দিনমানে এই আমাকে দেখছ এই রকম, আর রাত্তিরে যেন কি হয়ে পড়ি। সারাদিন—ফন্দি আঁটি যাতে সে না আসে, কিন্তু শুয়ে আলো নিভিয়ে দিলেই অস্থির হয়ে পড়ি—মন ছটফট করতে থাকে··এ কি সাংঘাতিক রোগ? আমি মরে যাব—এবার আর বাঁচব না—আমাকে বাঁচাও তোমরা।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আশা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া হাসিবার চেষ্টায় বিকৃত মুখে বিকৃতস্বরে বলিল—আমি বলি কি, এ বাড়ী-ঘর-দোর সে চিনে ফেলেছে। এখান থেকে কিছুদিন পালিয়ে যাই, চল। এমন দেশে যাব যেখানে সে যেতে পারবে না। এখন ছুটি চাইলে ছুটি দেবেনা তোমাকে?

সেইদিন শ্রীশ ছুটির দরখাস্ত দিল। বুড়া ষ্টেশনমাষ্টারও সেই কথা বলিলেন। বলিলেন—কচি বয়স, প্রথম শোক—তাই বড্ড বেজেছে। কিছুদিন কোন ভাল জায়গায় নিয়ে রাখগে, ঠিক হয়ে যাবেন। আমার মনে আছে শ্রীশ, যেদিন বিপিন ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল বিকেল বেলার দিকটা ঝণ্টুকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছি, থান দুই কাপড় আর কি-কি কিনতে, দেখি মা-লক্ষ্মী ইঁদারার চাতালের উপর কলসীরেখে জল তুলছেন মুখ শুকনো এতটুকু, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জল নিয়ে চল্লেন—আহা, যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি···

ইহার পর কয়েকটা দিন বেশ ভালই কাটিল, কোন গোলমাল নাই, আশা একেবারে সহজ সাধারণ মানুষ। সেদিন নাইট ডিউটি সারিয়া শেষরাতে বাসায় আসিয়া শ্রীশ দেখিল, আশা জানালার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আলো জ্বলিতেছে। ঘরে পা দিতেই অস্বাভাবিক উত্তেজিত স্বরে আরক্ত মুখে আশা বলিতে লাগিল—তুমি বিশ্বাস করবে না, সন্ধ্যে রাতে আমি রান্নাঘরে ছিলাম, ঘুমোই নি—স্বপ্ন দেখিনি—খোকা এসেছিল। আমায় কি বল্লে জান?

সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া যাইতেছে, শ্রীশ শুনিতে লাগিল।

—বল্লে, মা, আমায় দু'টো ভাত দিবি? এই দেখ্ গায়ে জ্বর নেই—গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দু'টো ভাত খাব কাঁঠাল-বিচি ভাতে দিয়ে। আর বল্লে কি—

শ্রীশ চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বলিল—চুপ কর, চুপ কর তুমি, আমি আর শুনব না—

বাধা পাইয়া আরও অধীরভাবে হাত মুখ নাড়িয়া আশা বলিতে লাগিল—শোন, শোন,···আমি বল্লাম, ও খোকা তুই কোথায় থাকিস? সে হাত দিয়ে ঐ গাঙের দিকে দেখিয়ে দিল। বলে বড্ড কষ্ট হয় মা, কেবল সাগু আর বার্লি খেতে দেয়, ভাত খেতে দেয় না। এই দেখ, আমার গা জুড়িয়ে গেছে—তবু ভাত দেবে না।

শ্রীশ ভাবিল, আশা বুঝি সত্যিই পাগল হইয়া গেল।

খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, কিন্তু শ্রীশের আর খাওয়া দাওয়া হইল না। কোন দিন কোন অবস্থাতেই আশা স্বামীর এতটুকু অযত্ন হইতে দেয় না আজ যে বিকাল হইতে সুরু করিয়া এত খাটনীর পর সে অনাহারে বসিয়া রহিল আশার সে খেয়ালই নাই। বাকী রাতটুকু তাহার কেবল ঐ একই কথা। খোকা আসিয়াছিল, সে খুব মোটা হইয়াছে, স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে, রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। খোকার গায়ে গোলাপী-সিল্কের ফ্রক, চুলে সিঁথি কাটা। কপালে টিপ, চোখে কাজল। চোখ কচলাইয়া সারামুখে কাজল মাখিয়া ভূত হইয়াছে। খোকা কত কথা বলিল। কত হাসিল। উচ্চারণ তাঁহার এখন খুব স্পষ্ট হইয়াছে, আবার বাঁধুনী দিয়া বেশ পাঁকা পাকা কথা কহিতে পারে যে।···

শ্রীশ অবিশ্বাস করিলে আশা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তর্ক করিয়া ঝগড়া করিয়া জোর গলায় বুঝাইতে চায়, সে যাহা দেখিয়াছে তাহা স্বপ্ন নয়—সত্য, অতি সত্য—। অতএব শ্রীশ সায় দিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু রাত পোহাইবামাত্র কোন দিকে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি আশা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, শ্রীশকে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতেছিল।

টিপি-টিপি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক ফাঁকে গাঙের ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিল।···উঁকি ঝুঁকি দিয়া দেখিল, রাত্রি-জাগরণের পর শ্রীশ এইবার শুইবার উদ্যোগে আছে। আশাকে দেখিতে পাইয়া হাসিমুখে কহিল—এই যে, এরি মধ্যে দিব্যি নেয়ে ধুয়ে বা-রে—

একটু সলজ্জ হাসিয়া আশা শিয়রে আসিয়া বসিল। একটু পরে স্বামীর চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে স্নেহ-সুকোমল কণ্ঠে কহিল—কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি—ঘুম পাচ্ছে, না? যা কাণ্ড লাগিয়েছি আমি। একটু ম্লানভাবে হাসিল। বলিল—খান দুই লুচি ভেজে নিয়ে আসি—কাল রাত্রে তুমি কিচ্ছু খাওনি একেবারে—যাই—

শ্রীশ বলিল—তুমি যাচ্ছ নাকি? তা হ'লে কিন্তু খাব না—

আশার হাসিভরা মুখ এক নিমেষে অন্ধকার হইল। ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল—এমন কপাল করে এসেছি···থাক, আমি যাব না; বামুন-মেয়েকে বলছি।

শ্রীশেরও দুঃখ হইল। বলিল—রাগ করতে নেই, লক্ষ্মি। তুমি ভাল হও আগে—তারপর যত খুসী রেঁধে খাইও—খাইয়েছ ত বরাবর—আচ্ছা, না হয় ··মোটে দু' খানা, আমার ক্ষিদে নেই—দু' খানার বেশী না হয় যেন—

আশা মহাউৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—দু' খানা নয়, দশ খানা।···আট খানার কম কিছুতে শুনব না—এই ত এত টুকুটুকু, ওর কমে কেমন করে পাতে দেব? আর একটুখানি হালুয়া—আর কিচ্ছু করব না, ভয় নেই গো—

শ্রীশ বলিল—যাও, শুনবে না ত! শরীরের অসুখ-বিসুখ—

—অসুখ। ভারী ডাক্তার হয়ে পড়েছেন উনি। তোমার ডাক্তারীপণায় যাই যে কোথায়—! বলিয়া চঞ্চলপদে হাসিতে হাসিতে আশা বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন হেড কোয়ার্টার হইতে লোক আসিয়া শ্রীশের চার্জ্জ বুঝিয়া লইল। ছুটি; বেলা তখন দু'টা তিনটা। আনন্দ-দীপ্ত মনে শ্রীশ বাড়ি চলিল। এমন সময়ে কোন দিন সে ফিরিতে পারে না। জিনিষ-পত্র কি আর এমন বেশী, আজ রাত্রের গাড়ীতেই রওনা হইয়া যাওয়া যাক। হঠাৎ এই খবর শুনিয়া আশা খুব উৎফুল্ল হইবে, চলিয়া যাইবার জন্য সে যা ব্যস্ত হইয়াছে! দু'জনে মিলিয়া এখন হইতে বাঁধা ছাঁদা সুরু করিলে আর কতক্ষণ?

শোবার ঘরে আশা নাই, রান্না ঘরও তালাবন্ধ। বামুন-মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতে সে ভাঁড়ার ঘর দেখাইয়া দিল। চমক দিবার অভিপ্রায়ে টিপি টিপি সেখানে ঢুকিয়া শ্রীশ একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল, আর কথা বলিবার জো রহিল না।

জানলাহীন আধ-অন্ধকার ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরটি, তাহার মধ্যে খোকার পোষাক জুতা-জামা বল মার্ব্বেল পুতুল রেললাইন হইতে কুড়াইয়া আনা একরাশ নুড়ি—সমস্ত মেজের উপর ছড়াইয়া দিয়া তাহাদেরই মাঝখানে আশা চুপ করিয়া বসিয়া আছে—কাঁদিতেছে না, নিঃশব্দ, নিশ্চল, বোধ করি বা চোখের পলকটিও পড়িতেছে না। ইহার চেয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া সে বাড়ী ফাটাইয়া ফেলে না কেন?

হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া আশা ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়া গেল। চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, এই রকম ভাব। মুখ লাল করিয়া কৈফিয়তের ভাবে আপনা-আপনি বলিল—ভাবলাম, দুপুর বেলাটায় একটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি, তোমার ত ভাব জানি—কোন্ দিন হুস করে এসে বলবে, ছুটি মিলে গেছে—এক্ষুণি চলো—। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

শ্রীশও পাল্টা একটু হাসিল।

সহসা আশা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—দেখ, কাণ্ড আমার। তুমি এসেছ আর বসে বসে বাজে বকছি। এসো খাবার দিই গে—

শ্রীশ বলিল—চলো—

বাহিরে আলোয় আসিয়া শ্রীশ আশার হাত ধরিল।

—শোন আশা,—

মুখ ফিরাইতে শ্রীশের বেদনাহত মুখ আশার নজরে পড়িল। শ্রীশ বলিতে লাগিল—আমি একটা কথা জানতে

চাচ্ছি, রোজই দুপুর বেলা তুমি এই রকম ওর জিনিষ পত্তোর ছড়িয়ে বসে থাক?

আশা ঘাড় নাড়িল এবং মুখেও কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শ্রীশ অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া বলিল—ফাঁকি দিও না. আমি বেরিয়ে গেলে তুমি রোজ ঐ রকম চুপ করে বসে থাক, না?

হাঁ-না—আশা কিছুই বলিতে পারিল না। একটু পরে কহিল আহা, হাত ছাড় দিকি—খাবার তৈরী করা আছে, নিয়ে আসি—

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীশ কহিল—খাবার আন্‌তে হবে না তোমার—খাবার আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব—

আশাকে পাশে লইয়া সে খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি দু'জনে মিলিয়া জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করিবার আর উৎসাহ রহিল না। হঠাৎ শ্রীশের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে আশা কথা বলিল—কি রকম হাঁড়ি পানা মুখরে বাবা—ভয় করে। তুমি বড্ড দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। এত সকাল সকাল আজকে এলে কি করে?—পালিয়েছ বুঝি? কোনদিন ষ্টেশন মাষ্টার ধরে ফেলবে আর গুরুমহাশয়ের মতো চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যাবে। আমি ছোট্টকালে যে গুরুর কাছে পড়তাম ঠিক তোমার ঐ ষ্টেশন মাষ্টারের মতো তার দাড়ি ছিল—সত্যি—।

শ্রীশ বলিল—ভুলোতে চাচ্ছ? আমি তোমার ব্যথার ব্যথী নই, যে আমি জানি—

চুপ! বলিয়া আশা তাড়া দিয়া উঠিল। ক্ষণপরে শান্ত সুরে বলিল—ঐ রকম বল্লে আমার কত কষ্ট হয়, জান? আজকে জিনিষ গুছোতে গেছলাম। ওর ঐ পুতুল টুতুল নামিয়ে নিয়ে হাত যেন অবশ হয়ে গেল, কিছুতে আর হাত তুলতে পারলাম না। বলিতে বলিতে স্বর উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—দোষ ত তোমারি। গাঙের জলে ফেলে দিয়ে আসতে বলিনি? আমি না মলে তুমি কি শুনবে? এক্ষুণি ফেলে দিয়ে এস—আমি বাঁচি।

সারা বিকাল দুজনে খুব খাটিয়া বাক্স পেঁটরা গোছাইয়া সন্ধ্যার দিকে নদীর ধারে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। সে দিকে লোকজন কেহ নাই। এই রকম মাঝে মাঝে তাহারা বেড়াইত।

আশা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাওয়া যাবে আগে? এক্ষুণি ঠিক করে ফেল।

শ্রীশ বলিল—পুরী। সমুদ্দুরে যাওয়া সে যে কি আরাম তুমি জান না আশা, ঠিক যেন নাগর দোলায় চেপে দুলতে দুলতে ফিরে এসে বালির বিছানায় গড়িয়ে পড়া—

আশা বলিল—না, না, পাহাড়ে যাই চলো—দার্জ্জিলিং কি আর কোথাও—। বলিতে বলিতেই ছাৎ করিয়া মনে আসিল, অসমতল পাহাড়ের দেশে খোকাকে লইয়া চলাফেরা করা যাইবে না ত—সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল, খোকা যে নাই। এক বছর আগে এই ষ্টেশনে আসিয়াছিল ইহারা তিনজনে, আজ রাত্রে অবোধ বালকটিকে রেল লাইনের ওপারে বুড়ী-ভৈরবী তলায় গাঙের কোলে একলা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

আশা বলিল—তা যেখানে হয় হোক্‌গে—আজই যেতে হবে কিন্তু, শেষটা যে তুমি বলে বসবে গোছানো হয়ে উঠল না—

শ্রীশ কহিল—কাপড়ের বোঁচকা কটা বেঁধে নিলেই ত হয়ে গেল, আর কি? গাড়ী সেই রাত দুটোয়। খুব হয়ে যাবে।

আশা বলিল—খুব—খুব—ভারী ত! আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি সব ঠিক করে দেব, আর বেড়াব না—চল দেখি বাড়ী—।

উৎসাহভরে আশা আগে আগে চলিল। কয়েক পা চলিয়া আবার গতি মন্দ হইল।

—একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

—কি?

আশা বলিতে লাগিল—একটু ঘুরে যাই চল। যেখানে খোকাকে তোমরা রেখে এসেছিলে সেই জায়গাটা একবার দেখব? আর ত কোন ভয় রইল না। আজ চলে যাচ্ছি, কতদিন পরে আসব, শরীরের যে দশা—এ জন্মে আর আসি না আসি, তুমি রাগ কোরো না।

শ্রীশ আপত্তি করিল না। বলিল—চলো—

চারিদিকে দু-দশখানা পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসী, ভাঙা খাটিয়া আজই বোধ হয় একটা চিতা পুড়িয়াছে, তাহার চিহ্নাবশেষ। শ্রীশ চাহিয়া দেখিল, আশার চোখ অস্বাভাবিক রকম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোনখানে?—কোনখানে?

এতক্ষণে শ্রীশ বুঝিল, আশাকে এখানে আনা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। বলিল—এখানে নয়, আগে আর একটা শ্মশান আছে সেখানে। রাত হয়ে এল, আজ আর যাওয়া যাবে না—

—আমি যাবো—

শ্রীশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—না। চল, ফিরে যাই—

এক ঝাঁকিতে হাত ছাড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে আশা কহিল—বাড়ী আমি যাব না, খোকনের জায়গা না দেখে যাব না আমি বাড়ী। এই আমি বসলাম, নিয়ে যাও দেখি কেমন।

সেই শ্মশান ঘাটায় এখানে-সেখানে মানুষের মাথা, পাঁজরার হাড় জঙ্গল, বর্ষার জল-কাদা, তাহার মধ্যে আশা বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আশা জিজ্ঞাসা করিল—আমায় নিয়ে যাবে না তা হলে?

—আজ নয়।

—তবে চল বাড়ী। বলিয়া মুখ ভারী করিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া শ্রীশ বলিল—খিদে যা পেয়েছে আশা, একটু উঠে দাও না কিছু—

আশা নড়িল না, নিস্তব্ধ বসিয়া রহিল।

শ্রীশ বলিতে লাগিল—হাত পা কোলে করে বসে রইলে, বেশ তো লোক—বড় যে বলছিলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে বেঁধে-ছেঁদে সব ঠিকঠাক করে দেবে। কেবল তোমার মুখের বড়াই—

আশা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—আমি পারব না, যাও—

আচ্ছা তুমি থাকো, আমি করছি—বলিয়া শ্রীশ আলনার সমস্ত কাপড়ের রাশ মেজেয় ফেলিয়া ভাঁজ করিতে লাগিল। আশা বসিয়া বসিয়া তাই দেখিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বাজপাখীর মত ছুটিয়া আসিয়া যেন ছোঁ মারিয়া তার হাতের কাপড় কাড়িয়া লইয়া কান্নাভরা গলায় বলিল—কত জ্বালাবে আমায় শুনি? আমায় খুন করে ফেল না কেন?—চুলগুলি অবিন্যস্ত, মুখচোখ লাল হইয়াছে। শ্রীশকে ফেলিয়া দিয়া সেই কাপড়ের বোঝার মধ্যে আশা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা আর্ত্তনাদের মত বলিয়া উঠিল—মাগো মা—কি নিষ্ঠুর তুমি, কি পাষাণ তুমি, আমায় দেখালে না—

শ্রীশ বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—আশা, তোমায় মিথ্যে কথা বলেছিলাম—যেখানে গিয়েছিলাম ঐখানেই—

ঐখানেই?—দেখিতে দেখিতে আশার মুখের ভাব অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া মুখের একেবারে কাছে মুখ আনিয়া বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিল—ঐখানে? ওগো, ঠিক বলছ ঐখানে? ঐখানে আমার খোকামণিকে রেখে এসেছ? কোনখানটায় বল ত—কেয়াঝাড়ের পাশটায়, না?

শ্রীশ আশাকে টানিয়া বুকের উপর আনিল। তারও কান্না পাইতেছিল।

হাতমুখ নাড়িয়া আশা বলিতে লাগিল—আমি তা জানি, তখনি ভেবেছিলাম। ঐ কালো কালো কেয়ার জঙ্গল, শুঁড় উঠেছে, যেই গিয়েছি অমনি যেন ডেকে উঠল—মা। তুমি ঢাকলে কি শুনি? আমি স্পষ্ট শুনেছি—আমি তাকে দেখেছি—কসাড় জঙ্গলের মধ্যে কেষ্ট ঠাকুরের মতো। যাবে আর একবার?

—বামুন-মেয়ে, বামুন-মেয়ে—বলিয়া শ্রীশ বার কয়েক ডাকাডাকি করিল। তখনো সে আসে নাই। তখন শ্রীশ কোলের উপর আশাকে শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। আর যে কি করিতে হইবে বুঝিতে পারিল না।

আশা জড়াইয়া জড়াইয়া বলিতে লাগিল—যেন ফিশ ফিশ করে বল্লে, মা, আমাকে ফেলে যাচ্ছিস, একলা একলা ভয় করবে আমার, কড়ির পুতুলগুলো দিয়ে যাস—খেলবো।



নৃত্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

বলিতে বলিতে থামিল। সহসা কোল হইতে সজোরে মাথা তুলিতে গেল। বলিল—বুড়ো বয়সে তোমার এ কি রকম! খোকা যদি এসে পড়ে কি লজ্জা—মাগো! তুমি সরে গিয়ে বোসো—

বাতাস করিতে করিতে অবশেষে আশা চোখ বুজিল। একটু দেখিয়া আস্তে আস্তে মাথা নামাইয়া নীচে একটা বালিশ দিয়া শ্রীশ ডাক্তারকে ব্যাপারটা জানাইবার জন্য বাহির হইল।

ফিরিয়া আসিতে রাত একটু বেশী হইল। আসিয়া আশাকে পাওয়া গেল না। বামুন-মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতে সে আকাশ হইতে পড়িল।—ওমা, আমি তা ত জানিনে, আমি ওদিকে ছিলাম। আর আমি ভাবলাম, আপনারা বেড়াতে গেছেন, হয় ত নগেনবাবুর বাড়ী গেছেন, এখনও ফেরেন নি—

কোনদিন কোন অবস্থাতেই যে আশা একা-একা বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহা কল্পনাতীত।

ঘর দুয়ার পাতি-পাতি করিয়া দেখা হইল। বাহিরে বড় অন্ধকার। নদীপারে ঘন কালো মেঘ করিয়াছে। লণ্ঠন হাতে লইয়া গাঙের ধারে ধারে শ্রীশ ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল – আশা, ও আশা—

লণ্ঠন ফিরাইয়া হঠাৎ দেখিল, সাদা কাপড়-পরা একজন বউ মতো গাঙের অনেক জলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। লণ্ঠন রাখিয়া জলে নামিল। কাছে গিয়া দেখিল, এক বোঝা পোয়াল, জোয়ারের টানে কোনখান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় ঝণ্টু চাপড়াসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল—মা ঠাকরুণ বাড়ীতেই আছেন, নীচে হইতে উঠিয়া ছাতের উপর গিয়া ঘুমাইয়া ছিলেন, এখন জাগিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ছাতে গিয়া খুঁজিয়া দেখার কথাটা কাহারও মনে হয় নাই বটে!

খোলা হাওয়ায় অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া আশা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে সেই রাশীকৃত কাপড় একা-একা ভাঁজ করিয়া বোঁচকা বাঁধিতেছিল। শ্রীশকে দেখিয়া সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে হাসিয়া বলিল—আজই যাব কিন্তু, গাড়ীর এখনো ঢের সময় আছে।

গাড়ী আসিলে ঝণ্টু চাপরাসী মেয়ে-গাড়ীর বেঞ্চের উপর লম্বা বিছানা করিয়া দিল। আশা চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, গাড়ীর মধ্যে একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই, যে যার মতো জায়গা লইয়া ঘুমাইয়া আছে। শ্রীশ পাশের গাড়ীতে রহিল।

গুম-গুম করিয়া গাড়ী পুলের উপর উঠিতে তাড়াতাড়ি সে জানলা দিয়া মুখ বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের আলো, নীচে গাঙের নৌকায় ক্ষীণ ল্যাম্পোর আলো, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় নদী-স্রোতের ঝিকিমিকি সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর আশা শুইয়া পড়িল।

চাকায় চাকায় লাইনের উপর বাজিতেছে। কী জোরে গাড়ী চলিয়াছে, উঃ—। রোজ দুপুর রাত্রে আমরা যখন ঘুমাই এ গাড়ী এমনি ত চারিদিক তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া চলে! আজও জগৎশুদ্ধ ঘুমাইতেছে, আর কতলোককে লইয়া গাড়ী চলিয়াছে।···

মরিয়া গেলে মানুষ কোথায় যায়? মরিবার পর কি তারা দৌড়িতে পারে? রেলগাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়িতে পারে? বুড়ী ভৈরবীর শ্মশানঘাটা হইতে পোল কি দেখা যায়? আজ বিকালে কিন্তু নজর পড়ে নাই। যদি এই সময়ে পুলের উঁচু কিনারাটায় দাঁড়াইয়া কেউ কাঁদিয়া উঠিত—ওমা কোথায় যাচ্ছিস? কোথায় চল্লি আমায় ফেলে? ও রাক্কুসী?···

মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামে, লোকজনের উঠানামা, হৈ-চৈ···ঘণ্টার বাজনা···আবার গাড়ী হুসহুস করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করে মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া···। ঠাণ্ডা মাঠের বাতাসে ঘুম ক্রমে আঁটিয়া আসিল, আশা আর কিছু জানিতে পারিল না।

তখনো ভাল করিরা ফর্শা হয় নাই, গাড়ীর মধ্যে অল্পবয়সী আর একটি বধূ জাগিয়া উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল— ও দিদি, দেখ— খোকার

কাণ্ড দেখ। আমি জানি তোমার কাছে শুয়ে রয়েছে। ওমা আমার কি হবে—দস্যিছেলের আপন পর জ্ঞান নেই, একবিন্দু অচেনা নেই, ঐ বউটির কোলে কেমন নেতিয়ে রয়েছে, দেখ না—যেন ওরি ছেলে। কখন গেল ?

ওদিকের বেঞ্চে প্রৌঢ়া মহিলাটি বিপুল বপু লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—তাই নাকি ? ও তবে আমারই ভুল ছোটবউ। ছিল বেশ আমার কাছে ঘুমিয়ে—তারপর দেখি খোকা আমার চোখের পাতা ধরে টানছে, বলে—মা যাব। পাশ ফিরে শুয়ে আছে বউটি, দেখতে অবিকল তোর মতো। আমি চিনতে পারি নি—ওকেই দেখিয়ে দিলাম। খোকা কোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল আর বউটাও অমনি আলগোছে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিল। বউটারও কিন্তু আচ্ছা ঘুম !

ঘুমের মধ্যে আশার মনে হইল, তাহার নিবিড় বাহু-বেষ্টনের মধ্য হইতে খোকাকে কে ছিনাইয়া লইতেছে। আরও ব্যগ্রভাবে ছেলেকে বুকের মধ্যে চাপিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কে ?

তাহার ভাব দেখিয়া খোকার মা একটু থমকিয়া গেল। বলিল—খোকাকে নিয়ে যাব এইবার—

—কেন ? কেন ? বলিয়া আশা ঝোঁকের মাথায় উঠিয়া বসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রথমটা ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই।

বধূ বলিল--ইষ্টিশান এসে পড়ল, এইবার আমরা নেমে যাব। সেই নিমতে-গৌরীপুর যেতে হবে, ইষ্টিশানে গরুরগাড়ী এসে থাকবার কথা।···কি রকম ভালমানুষের মত আপনার কোলের উপর পড়ে আছে দেখছেন, অথচ ওর যে দুষ্টুমি, কি আর বলব। ঐ হচ্ছেন আমার বড় জা, খোকনের জেঠাই মা। ও দিদি, এই জুতো পড়ে রয়েছে—নামবার সময় হাতে করে নিয়ো তুমি।···খোকনবাবু, চোখ মেল, বাড়ী যাবে না, ওঠো—

খোকা জাগিয়া অচেনা মানুষ দেখিয়া আশার কোল হইতে মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আশা হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—বাড়ী যাচ্ছ খোকন বাবু ? এসো তো জুত পরিয়ে দিই—বাবু হয়ে বাড়ী যেতে হয়।

গাঃ—বলিয়া তাহার কচি হাতের আঘাতে খোকা আশার প্রসারিত হাত সরাইয়া দিল।

জংশন-ষ্টেশন। গাড়ী অনেকক্ষণ থাকে। ইঞ্জিনে জল লইতে লাগিল। পাশের কামরা হইতে একজন পুরুষ অভিভাবক নামিয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইল। বউটি ও তাহার বড়'জা সাবধানে নামিয়া পুরুষটির পিছে পিছে প্লাটফরম পার হইয়া ছই দেওয়া গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল। আশা দেখিতে লাগিল।

বৈশাখের শেষ। সোনার বরণ ডাঁসা খেজুর-ভরা খেজুর-বন, ছড়া-বাঁধা হলদে হলদে সোঁদালফুল, বাবলাফুল, বেগুনী রঙের আকুন্দফুল, শিরীষগাছভরা অগুন্তি সূঁচের মতো শিরীষফুল, ডগমগে লাল কৃষ্ণচূড়ার ফুল। পেঁপেতলায় ছোট্ট একটি কুঁড়ে, তার ও-পাশে কাল গরু একটা, টিনের ঘর, কলাবাগান, তালবনে গাছে গাছে কচি তাল পড়িয়াছে। তার পাশ দিয়া মেটে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তারপর মাঠ—মাঠ—মাঠ, উলুক্ষেত—

গরুর গাড়ী ক্যাঁচ কোঁচ করিতে করিতে খেজুর বন তালবনের ফাঁকে ফাঁকে মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। বাঁকের মুখে একটা অশ্বত্থগাছের আড়ালে খানিকক্ষণ অদৃশ্য হইল, তারপর আবার দেখা গেল; গাড়ী চলিতেছে—চলিতেছে—চলিতেছে—ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর হইয়া যাইতেছে। চাকার ধূলায় ধূলায় পিছনটা অন্ধকার।

শ্রীমনোজ বসু

বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ *

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস্

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দ-বিচার' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই বিচারসহ নহে। বাংলায় তিনটি বিভিন্ন ছন্দ এবং তিনটি বিভিন্ন মাত্রাপদ্ধতি প্রচলিত আছে এই মত কি কি কারণে অগ্রাহ্য তাহা আমি অন্যত্র (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯। ১ম সংখ্যা) 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সেইখানেই আমি বাংলা ছন্দের নিয়ম কি কি এবং কি ভাবে সমস্ত বাংলা ছন্দে মাত্রা নির্ণয় হইয়া থাকে তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তথাকথিত 'মুক্তক' ছন্দ বা বাংলা free verse সম্বন্ধে তাঁহার মতের আলোচনা করিব।

প্রথমেই একটি গুরুতর প্রমাদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে 'বলাকা'র ছন্দ 'যৌগিক মুক্তক', 'পলাতকা'র ছন্দ 'স্বরবৃত্ত মুক্তক' এবং 'সাগরিকা'র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তক'। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্ব্বের মাত্রা বিচারের দিক্ দিয়াই ঐ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা সকলেই একরূপ, সকলেই free verse বা মুক্তক। 'বলাকা'র ছন্দ free verse আখ্যা পাইতে পারে কি না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু 'বলাকা'য় ছন্দের আদর্শ যে 'পলাতকা' বা 'সাগরিকার' ছন্দের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'বলাকা' 'পলাতকা' বা 'সাগরিকা' সর্ব্বত্রই অবশ্য পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দৈর্ঘ্য মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (printed line) অনেক সময় কেবল মাত্র অন্ত্যানুপ্রাস (rime) নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'বলাকা'য় পংক্তি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়া ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের (prosodic line or verse) সহিত এক। কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না। বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব (measure বা bar), এবং পর্ব্ব এক একটি (inpulse-group) অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত শব্দ-সমষ্টি। পর্ব্বের মাত্রা, গঠনপ্রকৃতি ও পরস্পর সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য এক হইয়া যদি পর্ব্বের মাত্রা ও পর্ব্ব সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও পৃথক্ হইয়া যাইবে।

"মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো"

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি"—

এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্ব্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দ ও পৃথক্।

এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দের আদর্শ এক—এইরূপ ভ্রম করিবেন না।

'পলাতকা' হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি করা যাক্।

	পর্ব্বসংখ্যা
মা কেঁদে কয়, | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে,	= ৪
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে? | বয়সে ওর | চেয়ে	= ৪
পাঁচগুণো সে | বড়ো;—	= ২
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড়।	= ৪
এমন বিয়ে | ঘট্‌তে দেবো | না কো।"	= ৩
বাপ ব'ল্‌লে, | "কান্না তোমার | রাখো;	= ৩

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ vers libre বা free verseর প্রতিশব্দ হিসাবে 'মুক্তবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

পর্ব্বসংখ্যা
পঞ্চাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খোঁজে, = ৪
জানো না কি | মস্ত কুলীন | ও-যে ! = ৩
সমাজে তো | উঠ্‌তে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবো ? = ৪
ওকে ছাড়্‌লে | পাত্র কোথায় | পাবো ? = ৩

উপরের উদাহরণ হইতেই 'পলাতকা'র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তি-ই এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। চরণে পর্ব্বসংখ্যা খুব নিয়মিত নয়,—দুই, তিন, চার পর্ব্বের চরণ দেখা যাইতেছে। বাংলা ছন্দের বহু প্রচলিত রীতি অনুসারে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ। বাংলায় চার মাত্রার ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ—মোট চারটি পর্ব্ব থাকে। উপরের পংক্তিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুকরণ করা হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন—

শুধু অকারণ | পুলকে
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে।
ধরণীর পরে | শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ | করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে।
মর্ম্মর তানে | ভরে ওঠ্ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে॥
(ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ)

এই চরণস্তবক-কে অবশ্য কেহই free verse বলিবেন না। কিন্তু এখানে পর্ব্বসমাবেশের যে আদর্শ, 'পলাতকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ তাই। অবশ্য 'ক্ষণিকা', হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের সমাবেশে স্তবক (stanza) গড়িবার একটি সুদৃঢ় আদর্শ আছে। 'পলাতকা'য় সেরূপ কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখা যায় যে এক একটি চরণ কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হইতেছে। (কিন্তু পাঁচ পর্ব্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পর্ব্বের চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ-পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত পংক্তিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি সুপরিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, স্তবক গঠনের সুদৃঢ় আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে free verse বলা যায় না। কবি wordsworthর Ode on the Intimations of Immortalityতে ছন্দগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ।

Number
of set
There was | a time | when mead | ow,
grove, | and stream, = 5
The earth, | and eve | ry
comm | on sight = 4
To me | did seem = 2
Appa | relled in | celes | tial light, = 4
The glo | ry and | the fresh | ness
of | a dream. = 5

এখানে বরাবর iambic feet ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি lineএ footর সংখ্যা কত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে। 'পলাতকা'য় ছন্দের আদর্শ এবং Immorality Odeএ ছন্দের আদর্শ এক। Immorality Odeকে কেহ free verseর উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই free verse বলিবেন না। 'পলাতকা'র ছন্দকে free verse উদাহরণ বলা free verse শব্দটির একান্ত অপ-প্রয়োগ।

'সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বসংখ্যা

সাগর জলে | সিনান করি' | সজল এলো | চুলে = ৪
বসিয়াছিলে | উপল-উপ | কূলে। = ৩
শিথিল পীত | বাস = ২
মাটির পরে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাশ। = ৪
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে = ৩
চিকন সোনা- | লিখন ঊষা | আঁকিয়া দিলো | স্নেহে = ৪

এই আদর্শে অন্যান্য কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নজরুল্ ইস্লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বসংখ্যা

(ব)—বীর = ১
(বল)—উন্নত মম | শির = ২
(শির)—নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর
হিমা | দ্রির। = ৪
(বল)-- মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি = ২
চন্দ্র সূর্য্য | গ্রহ তারা ছাড়ি = ২
ভূলোক দ্যুলোক | গোলোক ছাড়িয়া = ২
খোদার আসন | 'আরশ' ভেদিয়া = ২
উঠিয়াছি-চির | বিস্ময়-আমি | বিশ্ব-বিধা | ত্রীর = ৪

বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত (hyper-metric)

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক্ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ লইয়া ইহাকে free verse বলিলে প্রমাদ গ্রস্ত হইতে হয়।

এইবার 'বলাকা'র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় কুত্রাপি এই ছন্দের পরিচয় প্রদান বা বিশ্লেষণ করেন নাই। ইহাকে 'মুক্তক' বলিলে কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (negative) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার পরিচয় প্রদান করা হয় না।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে 'নবীন' 'শঙ্খ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ চারিমাত্রার ছন্দে এবং সুদৃঢ় আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তির ছন্দোলিপি দিতেছি।

তোমার শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে, |
কেমন ক'রে | সইবো ? = ৪ + ৪ + ৪ + ২
বাতাস আলো | গেলো ম'রে |
এ কী রে দু | দৈব ! = ৪ + ৪ + ৪ + ২
লড়্বি কে আয় | ধ্বজা বেয়ে = ৪ + ৪
গান আছে যার | ওঠ্না গেয়ে = ৪ + ৪
চল্বি যারা | চল্ রে ধেয়ে, |
আয় না রে নিঃ | শঙ্ক, = ৪ + ৪ + ৪ + ২
ধুলায় পড়ে | রইলো চেয়ে |
ঐ যে অভয় | শঙ্খ ॥ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ free verseর আভাস নাই।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নূতন এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ 'বলাকার ছন্দ' বলা হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না বলিয়া অনেকে ইহাকে free verse বা vers libre বলিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার যথার্থ প্রকৃতি কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই।

'বলাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার। 'বলাকা'র পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (Prosodic line or verse) মানে পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ। কয়েকটি পর্ব্বের সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে। প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব্ব-সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা ঘটে। সুপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণ ভাঙিয়া সাধারণতঃ দুইটি পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্ব্ববিভাগ ও অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি বুঝিবার সুবিধা হয়। বাংলায় অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখা যায় বলিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অন্ত্যানুপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে নিবদ্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহা দ্বারা সুশৃঙ্খলিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। প্রবোধবাবুর প্রবন্ধগুলিতে কুত্রাপি যতি ও ছেদের পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই এবং এই কারণে তিনি অনেক কবিতার ছন্দোবন্ধের সূত্র ধরিতে পারে নাই। কিন্তু এই পার্থক্য না বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্ তাহাদের প্রকৃতি বুঝা যাইবে না, নানা রকমের অমিতাক্ষর (blank verse) ছন্দের আসল রহস্যটি অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। এই পার্থক্যটি না বুঝার জন্য প্রবোধবাবু একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"ছন্দের ধারা যখন অক্ষর সংখ্যা ও পংক্তির অন্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম ক'রে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখনও প্রতি ছত্রকে একটি নির্দ্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ ক'রে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না।" অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যে run-on ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, সেখানে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পংক্তি রচনা করিয়া কেবল মাত্র একটা কৃত্রিম নিরর্থক রীতির দাসত্ব করিয়াছেন। এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্ব্বে ["বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব", "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ (১ম ও ৪র্থ সংখ্যা), ১৩৩৯ (১ম সংখ্যা)] ব্যাখ্যা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, "ছেদ" মানে ধ্বনির বিরাম স্থল; অর্থবাচক শব্দ সমষ্টির (phrase) শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে। যে কোন রকম গদ্যে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical pause) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যছন্দে পরিমিত কালানন্তরে যতি থাকিবেই। অনেক সময়ই অবশ্য যতি কোন না কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে যতি ধ্বনির বিরতির সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার বা গাম্ভীর্য্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়া যতির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যতি পতনের সময়েই বাগ্‌যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর একটি প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে যতির অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা যায়। সুতরাং যতি ও ছেদ দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবিতায় স্থান পাইয়া থাকে। যে কোন রকম ছন্দের দ্যোতনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা ঐক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য সূচিত হয়। মধুসূদনের অমিতাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চরণ সুতরাং প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে। প্রতি পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্ব, সুতরাং প্রত্যেক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতি থাকে। এইরূপে সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে ঐ ছন্দ গ্রথিত। কিন্তু মধুসূদনের ছন্দে ছেদ যতির অনুগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ সেখানে পূর্ণযতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময় কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্ব্বের মধ্যে তাহার অবস্থান হয়। এইরূপে মধুসূদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের সূত্র ধূপছায়া রঙের বস্ত্রখণ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসানুভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুসূদনের ছন্দের অনুযায়ী; অর্থাৎ প্রতি পংক্তি চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুসূদনের অনুসরণ তিনি কখন করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের যে চরম সীমা মধুসূদনের ছন্দে দেখা যায়—ততদূর রবীন্দ্রনাথ কখন অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন প্রভৃতি কবিগণের

ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মৃদুতর রূপ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাহারই অনুসরণ করিতেন। এক একটি অর্থসূচক বাক্য সমষ্টির মধ্যে যতি স্থাপন অথবা পর্ব্বের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্ন নহেন। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইতে পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার পরে যতি স্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্যকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও যতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণযতি রাখিয়া তিনি ছন্দের ঐক্যসূত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মানুবর্ত্তিতা তুলিয়া দেওয়ার জন্য ছন্দের ঐক্যসূত্র কতকটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু চরণের অন্তে মিত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণযতিটি ও ঐক্যসূত্রটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অন্তে উপচ্ছেদ প্রায়ই রাখিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্ দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ আছে; তবে পূর্ণযতি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে। তাঁহার ১৮ মাত্রার অমিতাক্ষরেও এই এই লক্ষণ বর্ত্তমান। সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে ৮ ও ১০ মাত্রার করিয়া দুইটি পর্ব্ব দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সময় পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু পরিবর্ত্তিত রূপ দেখা যায়। 'বলাকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি লওয়া যাক্। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্তিগুলি সজ্জিত হইয়াছে—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে ছন্দোবন্দের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে অন্ত্যানুপ্রাস আছে, এবং এই অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি বৈচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্রভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। ছেদের সহিত অন্ত্যানুপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রভাব বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগ গুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে কোন নিয়ম নাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয়। কিন্তু অমিতাক্ষর ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে পারে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে না
(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো * * ততক্ষণ * তব আলো *
(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই * তার সব ধন। * *
(ক) (ক)
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে
(গ)
দীপ তার * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে। * *

এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে সূচী-অক্ষর দিয়া মিত্রাক্ষরের রীতি দর্শিত

হইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে এক একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শানুযায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান করিয়া লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সর্ব্বদা ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনি প্রবাহের বিরতি ঘটিবে না কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীব্রতার হ্রাস হইবে, শুধু একটা সুরের টান থাকিবে; সেই সময়ে বাগ্‌যন্ত্র নূতন করিয়া শক্তির আহরণ করিবে। অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দের ন্যায় এখানেও চরণের দৈর্ঘ্যের একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণ-ই সাধারণ অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে অমিতাক্ষর ছন্দে চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে অর্থাৎ পূর্ণ যতির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থসূচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,—এই টুকু এ ছন্দের নূতনত্ব। ফলে অবশ্য যতির বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং এ ছন্দে ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রভাবই অধিক। যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া একটা নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে free verse বলা ঠিক সঙ্গত হইবে না। ইহাকে free verse বলিলে 'রাজা ও রাণী'র blank verseকেও free verse বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন ঐক্য সূত্র পাওয়া যায় না, মাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে একটা যতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনা দিতেছি—

"আমি এ রাজ্যের রাণী *—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?" * *
"প্রণাম, জননি। * * দাস আমি, * * কেন মাতঃ, *
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ * মন্ত্রগৃহে কেন ? * *
প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। * * এসেছি করিতে প্রতীকার। * *

এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই। চরণের শেষে কেবল একটা যতি আছে,—সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকন্তু এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্য ইহাকে সাধারণ blank verse বলিয়া অভিহিত করা হয়, free verse বলা হয় না। সে হিসাবে 'বলাকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে blank verse বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, free verse আখ্যা দিবার আবশ্যক নাই।

'বলাকা'র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বাংলা পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত দুই একটি শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্ব্বে নজরুল্ ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতা হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্ত্তময় হইয়া উঠে, ছন্দ-প্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রূপ একটা উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র্য আসে। এই জন্যই বাংলা কীর্ত্তনে 'আখর' যোগ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। বলাবাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা খুব নিয়মিতভাবে করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে (কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ করার সময় এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে।

'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্ত্যানুপ্রাস রাখিয়া তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে। অন্বয়ের দিক্ দিয়াও ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত আবৃত্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে বলাকার অনেক কবিতার ছন্দের গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থের পংক্তির অনুসরণ না করিয়া ছন্দের যথার্থ চরণ অনুসারে পংক্তিগুলি নূতন করিয়া সাজাইতেছি।

১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিম্নের অংশটি লইয়া ছন্দোলিপি করিতেছি।

নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে =১০
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ; =৮+৬=১৪
শুভ্র নবমল্লিকার বাস =১০
স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ; =৮+৬=১৪

সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা =১০
সপ্তর্ষির পূজা দীপ মালা =১০
তাদের মত্ততা পানে | সারারাত্রি চায়— =৮+৬=১৪
(হে সুন্দর,) তব গায় * ধূলা দিয়ে | যারা
চলে যায়! =৮+৬=১৪

(হে সুন্দর,) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে, =৮+১০=১৮
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে =১০
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে, =১০
তরঙ্গ চুম্বিত তীরে | মর্ম্মরিত
পল্লববীজনে। =৮+১০=১৮

অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ৮, ৬ ও ১০ মাত্রার একটি কি দুইটি পর্ব্ব লইয়া এক একটি চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই যে চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন দুই, তিন, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়া স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে।

এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-ঈশ্বর
সাজাহান =৮+১০=১৮
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন
ধনমান =৮+১০=১৮
শুধু তব অন্তরবেদনা =০+১০=১০
চিরন্তন হয়ে থাক্ | সম্রাটের ছিল
এ সাধনা। =৮+১০=১৮

রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন =০+১০=১০
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক
লীন, =৮+১০+১৮
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস =০+১০=১০
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে | সকরুণ করুক
আকাশ=৮+১০=১৮
এই তব মনে ছিল আশ। =০+১০=১০

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা =০+১০=১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা=৮+১০=১৮
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্ =০+১০=১০
(শুধু থাক্) একবিন্দু নয়নের জল =০+১০=১০

কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল =৮+৬=১৪
এ তাজমহল =০+৬=৬

এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্ব্ব-সমাবেশ এবং চরণের সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ মাত্রেই দ্বিপার্ব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পূর্ণ পর্ব্বিক ও অপূর্ণপর্ব্বিক চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত কৌশল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'পূরবী' পর্য্যন্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পূরবী'র 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায় ; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত পদ যোজনা এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত পংক্তিপর্য্যায়কে কি কেহ free verse বলিবেন ?

উদয়াস্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা | শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলো * একদা যেমনি

নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি' ;
সে তব সঙ্কেত মন্ত্র | ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান্,
কর্ম্মের তরঙ্গে মোর ; | ** স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি'।

(পূরবী—অন্ধকার)

এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, 'বলাকা'র-সাজাহান' হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ তাহাই।

Free verse কাহাকে বলে? যেখানে verse বা পদ্য নিয়মের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসারী, সেখানে free verse আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কি আদৌ verse বা পদ্য বলা যায়? দু'একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের অধীন হইতে হইবে। পদ্যের উপকরণ পর্ব্ব; সুতরাং বিশিষ্ট ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, যথোচিত রীতি অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব্ব সমস্ত পদ্যেই থাকিবে। গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু পদ্যে পর্ব্ব যোজনার দিক্ দিয়া কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্য পর্ব্বপরম্পরার মধ্যে এক প্রকার ঐক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া, অথবা চরণের মাত্রা কিম্বা গঠনের সূত্রের দিক্ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের সূত্র দিয়া এই ঐক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। সুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্ দিয়াই ঐক্য থাকে। কিন্তু সব দিক্ দিয়া ঐক্য থাকার আবশ্যিকতা নাই, এক দিকে ঐক্য থাকিলেই পদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার। এ জন্য অনেক সময়ই কবিরা উপর্য্যুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক দিয়া ঐক্য বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারে-ও নানারূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কবিরা ঐক্যের দিকেই নজর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাব-বিলাসের ব্যঞ্জনা করা সম্ভব হইত না। মধুসূদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য যতি ও ছেদের বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, পর্ব্বের ও চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা মধুসূদনের ন্যায় ছেদ ও যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না। সাধারণ রীতি অনুসারে যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টা তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ তাঁহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তিনি ছন্দে ঐক্য সূত্রের নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের মধ্যে কোন কোন এক দিক্ দিয়া ঐক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাঁহার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন খাটে। সম্পূর্ণরূপে free verse অর্থাৎ পর্ব্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা গঠন-রীতির দিক্ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ তিনি কখন রচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 'বলাকা' হইতে যে কয় রকমের নমুনা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতায় আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্ত্তনশীল। কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্ত্তী পংক্তিপর্য্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন্য ঐ জাতীয় কবিতায় কোন আদর্শের বন্ধন নাই এ কথা বলা চলে কি?

'বলাকা'র নিম্নলিখিত চরণপরম্পরায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ free verseর কাছাকাছি আসিয়াছেন।

মাত্রাসংখ্যা পর্ব্বসংখ্যা

যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে | ক্লান্তিভরে*
দাঁড়াও থমকি,' = ১০ + ১০ —২
তখনি চমকি' | উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ
বস্তুর পর্ব্বতে ; = ৬ + ৮ + ১০ —৩
পঙ্গু মূক | কবন্ধ বধির আঁধা | স্থূল তনু
ভয়ঙ্করী বাধা = ৪ + ৮ + ১০ —৩
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাঁড়াইবে পথে ; = ৮ + ৬ —২

অনুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের
অচল বিকারে = ৮ + ৬ + ১০ —৩
বিদ্ধ হবে ! আকাশের মর্ম্ম-মূলে | কলুষের
বেদনার শূলে = ৪ + ৮ + ১০ —৩

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য
সুন্দরী, = ১০ + ৬ —২
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি' ঝরি' = ৮ + ৬ —২
তুলিতেছে শুচি করি' | মৃত্যুস্নানে
বিশ্বের জীবন। = ৮ + ১০ —২
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে | বিকাশিছে
নিখিল গগন। = ৮ + ১০ —২

তত্রাচ এখানেও চরণে পর্ব্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী স্তবক গঠনের আভাস রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকেও free verse ঠিক্ বলা উচিত নয়। Christabel প্রভৃতি কবিতাতে foot or lineর দৈর্ঘ্যের দিক্ দিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে free verse বলা হয় না, কারণ সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে তবে free verse কথাটি তত সূক্ষ্ম অর্থে না ধরিলে এ রকম ছন্দকে free verse বলা চলিতে পারে, কারণ পর্ব্বের মাত্রা বা চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই।

গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেই বরং free verse নাম দেওয়া যাইতে পারে। সেখানে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা স্থির নাই ; চার, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় ; ভাষা গম্ভীর হইলে আট ও দশ মাত্রার, এবং সহজ কথোপকথনের ভাষা হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। অবশ্য প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া মাত্র পর্ব্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্যই একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না ; কারণ পর পর চরণ সহযোগে কোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই।

কিন্তু এই রকমের ছন্দ, যাহাকে prose verse বলা হয় তাহা হইতে বিভিন্ন। free verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক দিয়া পদ্যের আদর্শের বন্ধন নাই। Prose verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব্ব নাই। এক একটি phrase বা অর্থসূচক শব্দসমষ্টি prose-verseর উপাদান। সুতরাং Prose-Verseএ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না। Prose-Verseর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্য কোনরূপ ধ্বনিগত লক্ষণের দিক দিয়া নহে। কিন্তু Prose-Verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ নাই, কিন্তু পদ্যছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ Walt Whitman হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

All the past | we leave behind,
We debouch | upon a newer |
mightier world, | varied world,
Fresh and strong | the world we seize, |
world of labour | and the march,
Pioneers ! | O Pioneers !

We detachments | steady throwing, |
Down the edges, | through the passes, |
up the mountains | steep
Conquering, holding | daring, venturing |
as we go | the unknown ways,
Pioneers ! | O Pioneers !

এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষে চারিটি পংক্তি লইয়া আর একটি পদ্যছন্দের আদর্শানুযায়ী

স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি phrase ব্যবহৃত হইয়াছে। এক একটি phraseএ কম বেশী চার syllable থাকিলেও, কোন ধ্বনিগত ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ prose-verse রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি—

এখানে নাম্‌লো সন্ধ্যা
সূর্য্যদেব,] কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে |
তোমার প্রভাত হলো ?

অন্ধকারে (এখানে) | কেঁপে উঠ্‌ছে | রজনী গন্ধা
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা | নব বধূর মতো ;
কোনখানে (ফুট্‌লো) | ভোর বেলাকার | কনক-চাঁপা ?

জাগ্‌লো কে ?
নিবিয়ে দিলো | সন্ধ্যায় জ্বালান দীপ
ফেলে দিলো | রাত্রে গাঁথা | সেঁউতি ফুলের মালা।

কিন্তু Whitman-র prose-verse বা 'লিপিকা'র ছন্দ ছাড়া আরও অন্য প্রকারের ছন্দ গদ্যে ব্যবহৃত হয়। prose-verseএ গদ্য পদ্যের আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এমন অনেক গদ্য আছে যাহাতে পদ্যের উপকরণ বা পদ্যের আদর্শ কিছুই নাই, অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দ-স্পন্দন অনুভূত হয়, নূতন এক প্রকৃতির রস মনে সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গদ্যছন্দের ঔৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র ইত্যাদি অনেক সুলেখকের রচনায় গদ্যছন্দ দেখা যায়। নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি —

"নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন-ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক্!"

গদ্যছন্দের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ সূচনা করা আবশ্যক। সুতরাং এ প্রবন্ধে শুধু তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াই নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক্, ঐক্যপ্রধান পদ্যছন্দ ও বিশিষ্ট গদ্যছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার; তাহারা সাধারণ ঐক্যপ্রধান পদ্যছন্দের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 'মুক্তক' বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

এই প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

৮৪ পৃঃ, ১ম কঃ, ২৪ পংক্তি—'শিক্ষা-বাধন' স্থলে 'শিথিল-বাঁধন' হইবে।

ঐ „ ২য় কঃ, ২৬ ও ২৭ পংক্তি—'Immorality' স্থলে 'Immortality' হইবে।

৮৭ পৃঃ, ২য় কঃ, ৫ পংক্তি—'ছন্দোবন্দের' স্থলে 'ছন্দোবন্ধের' হইবে।

ভ্রষ্ট লগ্ন

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

আমারে ডেকেছ কেন ?
তোমাদের প্রতিভার মাঝে
আমি কি দাঁড়াতে পারি ? তাই দূরে সরে থাকি লাজে
নিজ অক্ষমতা নিয়ে, তাই এই মায়াজাল টানি'
গোপন নিভৃত কোণে রচিয়াছি ক্ষুদ্র নীড়খানি
কল্পনার স্বপ্ন দিয়া। সেথা নাই পিক কণ্ঠ-রোল
দক্ষিণ মলয় আসি' করে না করে না উত্তরোল
অঞ্চল বীজনে তার ; সচঞ্চল করি বনবীথি
নূপুর নিক্কণে কভু সঞ্জীবিতে বিশীর্ণা ব্রততী
আসে নাকো বাসন্তিকা। বেণু বনচ্ছায়ে নদীনীর
এমনি বহিয়া যায়—হয় না সে চঞ্চল অধীর
কারো পরশণ তরে ;—সেথা সেই ছায়ারি আড়ালে
সহসা আপনা ভুলি' যদি বেজে ওঠে কোনোকালে
আমার মনের বীণা ; কেন শোন সে নিষ্ফল সুর ?
কি আছে তাহার মাঝে—নাই অর্থ নয়নে মধুর
তবু ঘুম টুটে যায় ? নামে তার এত পরমাদ
ক্ষমার অযোগ্য মেকি—এত তার গুরু অপরাধ !

ছিল দিন—একদিন যদিও সে আকাশ স্বপন
সেদিন প্রভাতে জাগি' কত সাধ করেছি বপন
আশার ছলনে ভুলি' কতবার গেঁথেছি যে মালা
জানি না কাহার আশে, কত সন্ধ্যা কেটেছে নিরালা
বিফলেতে পথ চাহি'।
হায় বন্ধু কেটে গেছে দিন
তখন আসনি কেন,—জীবনে কি বসন্ত নবীন
বার বার ফিরে আসে ? আজ এই ধূসর সন্ধ্যায়
জাগিবে কি উষালোক ? অসম্ভব ! শুনে হাসি পায়
দুরাশা—দুরাশা এযে—জানি—জানি এবারের মত
ফিরানো যাবে না আর—হয়ে গেছে ভুল ত্রুটি যত।
আজ এই স্বপ্নালোকে সায়াহ্নের ছায়ার আড়ালে
চলি' ক্লান্ত পদ ক্ষেপে,—তাহারি মন্থর তালে তালে
শুনি' কার আগমনি ; বুকে এসে লাগে খোলা হাওয়া
চুপি চুপি কারা কয়—'বুঝি ওরে—বুঝি পথ চাওয়া
সমাপণ হয়ে এল !'

ওই দূরে মেঘেরি আড়ালে
আঁকা যে রক্তিম রেখা, দিনান্তের দিক্ চক্রবালে
কার ও বিদায় ছবি ? বাতাস লেগেছে এসে পালে
সচঞ্চল তরীখানি দুলে ওঠে নদীর কিনারে
কারা ডাকে—'বেলা যায়' !

বেলা হোল—বেলা হোল শেষ ?
তবে কেন ফিরে ডাকা—আজ আর কেন এ উদ্দেশ
আজন্ম বিস্মৃত জনে ;—সে কি আর পথে থেমে রবে ?
কল্পনা—কল্পনা থাক্ ; চোখে তারে কে দেখেছে কবে !

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

অচ্যুতানন্দ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার কালেই তাঁহার জীবনের উপর যবনিকা পড়িয়া যায়। বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকারা তাঁহার কবিতা মধ্যে মধ্যে পড়িয়াছেন, স্মরণ থাকিতে পারে। বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত তিনি বাণীর মন্দিরে কিছু স্থায়ী সম্পদ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার অসমাপ্ত জীবনের এই আখ্যায়িকার লেখিকা তাঁহার ছোট বোন। জীবন-চরিত লিখিবার উপযুক্ত কোনো কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার মত অচ্যুতানন্দের বয়স হয় নাই; সেদিক দিয়া এই আখ্যায়িকার কোনো মূল্য না থাকিতে পারে; কিন্তু লেখিকা তাঁহার ব্যক্তিগত শৈশব জীবনের সুখদুঃখের নিবিড় অনুভূতি প্রাণ খুলিয়া সহজ অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ইহার মধ্যে কথা-সাহিত্যের কিছু রস থাকিতে পারে। বিঃ সঃ।

পরিচয়

আমার ছোট্ট-জীবনের কয়েকটি কথা আজ বলতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, কারো ভালো লাগ্‌বে কি না জানি না। আমার এ লেখায় অনুভূতির গভীরতা আছে, কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসও নেই, ভাষার বিন্যাসও নেই, ব্যাকরণ ভুলও হয় ত কিছু থাকবে। তবু আমি লিখছি, না লিখে থাকৃতে পারছি না বলে।

জয়নগরে আমাদের দেশ। আমার পিতামহ ৺রাধারমণ ঘোষ ছিলেন খুব তেজস্বী পুরুষ। যদিও তাঁর আগের পুরুষে আমাদের গৃহদেবতাকে স্থাপনা করে গেছলেন কিন্তু দেবতার ভোগের সংস্থান করে যেতে পারেন নি। আমার ঠাকুরদা অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখে উপার্জ্জন আরম্ভ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। পাঁচ ছেলেকে দেশের বাড়ীর অর্দ্ধেক ও কলিকাতার বাড়ী দিয়া যান।

আমার বাবা ঠাকুরদার চতুর্থ পুত্র। তিনি ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতি করতেন। একলাই সেখানে থাকতেন চাকর-বাকর নিয়ে। আমরা চারিটি ভাই-বোন। দিদি সবচেয়ে বড়, দিদির চেয়ে প্রায় তিন বছরের ছোট ছোট্‌দি। তারপর দাদা দু'বছর পরে জন্মেছিল। দাদা যখন গর্ভে তখন বাবা স্বপ্নে দেখলেন একটি সুন্দর ছেলে দেখিয়ে ঠাকুরদা যেন বল্‌ছেন "দেখ তোমার কি সুন্দর ছেলে হয়েছে।"

১৩১৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দাদা জন্মগ্রহণ করে। দাদার জন্মক্ষণ বেশ শুভ ছিল, দু'এক সেকেণ্ড আগে জন্মালে একাদশ বৃহস্পতিতে জন্মাতো। দাদা জন্মাবার পর বাবাকে কোন ব্রাহ্মণ জানান যে 'এ ছেলেকে সাবধানে রাখ্‌বে।' বাবা ভাব্‌লেন বোধ হয় কোন গুরুজন তাঁর সন্তানরূপে এসেছেন। তাই তিনি কোন দিন দাদাকে তাঁর পায়ে হাত দিতে কি প্রণাম করতে দেন্‌নি। দাদা যখন দু'মাসের ছেলে, মা তখন ডায়মণ্ডহারবারে এলেন। দাদার মুখ যে নিখুঁত সুন্দর ছিল, তা নয়। কিন্তু মুখে এমনি একটি ভাব ছিল যাতে মনে হোত যেন একটি দেব-শিশু।

দাদার অন্নপ্রাশনের সময় নাম হোল—অচ্যুতানন্দ।

মার কাছে শুনেছি সাধারণ ছোট ছেলেদের মত দাদার কান্নাকাটি বড় একটা ছিল না, ক্বচিৎ কখন কাঁদতো; মা বলতেন 'অচুকে মানুষ করতে আমায় একটুও কষ্ট পেতে হয়নি, ও যেন আপনি মানুষ হচ্ছিল'। দাদা ভয় কাকে বলে ছোটবেলা থেকে জানতো না। বাবা-মাও ছেলেদের ভয় দেখান পছন্দ করতেন না।

ছোটবেলায় দাদার বড় একটা অসুখ হোত না; খুব সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল বলে আমার ছোট মেশোমশাই দাদাকে 'ডাকু' বলে ডাকতেন। কিন্তু একবার মা'র মামার বাড়ী দেবানন্দপুর গিয়ে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে এল, অনেক

দিন ভুগেছিল। ভাল হয়ে গেলেও দাদার আর আগের স্বাস্থ্য ফিরে আসে নি। তবে কোন রকম অসুখও ছিল না।

দাদা যখন পূর্ণ দু'বছর হয়ে তিন বছরে পড়্‌ল, তখন আমি জন্মালাম। আমাদের সব ভাই বোনের নাম বাবা রেখেছিলেন। ছোট মাসীমা আমার নাম 'সাবিত্রী' রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবার পছন্দ হোল না। বাবা আমার নাম রাখ্‌লেন 'প্রকৃতি'। এ নাম অনেকের পছন্দ হয় নি। কিন্তু আমার এই নামটি এত সুন্দর লাগে যে তা আমি বোঝাতে অক্ষম। নামটী যখন কোন কথায় বার বার কানে এসে বাজে তখন ভারী ভালো লাগে।

২

আমরা চার ভাই বোনে প্রকৃতি মায়ের শ্যামল আঁচলের ছায়ায়, মা-বাবার অফুরন্ত স্নেহের আশ্রয়ে বেড়ে উঠ্‌ছিলাম। কোন রকম অশান্তির ছায়া আমাদের সেই শান্তিকুঞ্জে কেউ দেখতে পায় নি। স্বর্গের অনাবিল আনন্দের ধারা যেন পথ ভুলে আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে এসে পড়েছিল। ছোটবেলায় আমরা অপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশতাম না, বাড়ীতেই কয় ভাইবোনে খেলা করতাম, বাবা-মা আমাদের খেলায় গল্পে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন।

দাদা পাঁচ বছরের হ'লে হাতে খড়ি হোল। হাতেখড়ি হবার আগে দাদা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ শেষ করেছিল, হাতে খড়ি দিয়ে কথামালা First Book ধরল। মার কাছে কিছুদিন পড়ে বাবার কাছে পড়তে লাগল। বাবা দাদাকে প্রথম দিন পড়িয়েই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বাবা বলতেন 'আমি অবাক হ'য়ে গেছ্‌লুম অচুর ইংরিজি পড়া দেখে, কেমন অনায়াসে ও অনেক শক্ত শক্ত কথার উচ্চারণ করতো।' দাদার স্মরণশক্তি খুব আশ্চর্য্য রকমের ছিল। পড়াশুনায় দাদা বেশি খাট্‌তে পারতো না বটে কিন্তু স্মৃতিশক্তি ভালো থাকাতে অল্প আয়াসেই পড়া কর্‌তে পার্‌তো।

বাবা ছেলেদের মারা পছন্দ কর্‌তেন না বলে আমরা বড় একটা মার খাইনি, মন্দ গালাগাল কখনো খাইনি। বাবা মা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন, কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় কখনো দিতেন না। বাবা মিথ্যে কথা কি অসরলতা কখনো পছন্দ কর্‌তেন না, আমাদের বলতেন "তোমরা সহস্র দোষ করে এসে যদি সত্য কথা বলে দোষ স্বীকার করো তবে তোমাদের সব দোষ ক্ষমা করবো।" দাদাও মিথ্যের উপর অত্যন্ত চটা ছিল, কেউ মিথ্যে কথা বল্লে কিছুতেই সহ্য করতো না। দাদার সব রকম গুণ থাক্‌লেও একটি মহৎ দোষে সব মাটী করেছিল, সেই দোষটি হচ্ছে রাগ। যদিও এই রাগ দাদা আমাদের বংশের কাছ থেকেই পেয়েছিল, তবুও তার রাগের মাত্রাটা ছিল একটু বেশি। দাদা রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকতো না। এ ছাড়া আর কোনো দোষ ছিল না। একমাত্র ছেলে বলে কোন দিন আমাদের তিন বোনের চেয়ে বেশী আদর সে পায়নি। কখনো কোন জিনিষের জন্য আব্‌দার ধরতো না।

* * * *

দাদার খেলার সময় বেড়াবার সময় আমি যদি না থাকতাম তবে দাদা খেলতে কি বেড়াতে চাইতো না। মনে পড়ে ছোটবেলায় দুজনে ধনুক নিয়ে কাল্পনিক শিকারে বেরুতাম। কখনো নদীর ধারে, কখনো গাছের তলায়, কখনো বা গোরস্থানের পাঁচিলের পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে কাল্পনিক পশু তৈরি করে চেঁচাতাম "ঐ একটা হরিণ পালাল।" খানিকটা দুজনে খুব দৌড়াতাম। তারপর হয় তো ক্লান্ত হ'য়ে ঝাউতলায় বস্‌তাম, বাতাস আর ঝাউ পাতার সাঁ সাঁ শব্দ কাণে বাজতো, মাথার উপরে কত রকমের পাখী ডাকতো, তাদের দিকে কখন বা নদীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌তুম, পায়ের তলায় গাছের ছায়া নড়ে উঠ্‌তো। ফেরবার সময় কতকগুলো ইট পাথর নিয়ে যেতাম, তাই দিয়ে আমরা তিনজনে মিলে পাহাড় করতাম। ছোটদি আবার তার চার ধারে ছোট গাছ বা গাছের ডাল পুঁতে দিতো, ছোট একটি পুকুর খোঁড়া হোত। দাদার সঙ্গে সর্ব্বদাই বেড়িয়ে বেড়িয়ে ছোটবেলায় গাছে চড়তে ও দৌড়তে খুব অভ্যস্ত হয়েছিলাম। একদিন আমাদের প্রতিবেশী পোষ্টমাষ্টারের বাড়ী গিয়েছি। পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী আমাদের দুজনকে 'পোকা, মাকড়' বলে ডাক্‌তেন। তিনি আমাদের জন্য প্রায় পেয়ারা পেড়ে রাখ্‌তেন আমাদের দেখে

তিনি দাদাকে বল্লেন, "ওরে তুই গাছে চড়্‌তে পারিস্ ঐ গাছটায় খুব বড় বড় পেয়ারা হয়েছে, আমি তোদের জন্য পাড়তে গেলাম আঁক্‌শি দিয়ে, কিন্তু পারলুম না, তোরা দেখ্ দিকি পারিস্ কি না?"

আমরা দুজনে ছুটে গাছের তলায় গেলাম বটে, কিন্তু দেখলাম আমাদের মত ক্ষুদ্র শরীরের সে গাছে চড়া সম্ভব নয়; কারণ গাছটি সোজা থামের মত খানিকটা উঠে তারপর ডালপালা মেলে দিয়েছে, আর নীচের দিকে এমন কোন অবলম্বন ছিল না যার সাহায্যে আমরা উঠ্‌তে পারি। দুজনে ভেবে অস্থির কি করে গাছে ওঠা যায়! আহা যদি একটু বড় হতাম তাহলে এখনি উঠে পড়তাম। দাদা বল্লে "ওরে হয়েছে, একজন ঘোড়া হ'বে আর একজন তা'র পিঠে চড়ে গাছে উঠবে।" আমি বল্লাম "আমি ঘোড়া হই তুমি গাছে চড়।" দাদা বল্লে "তুই পারবি না হাঁটুর উপর হাত দিয়ে দাঁড়াতে হ'বে।" আমি বল্লাম "বটে আমি পারব দাদা।" কিন্তু কাজে পারলাম না। দাদা বল্লে "দেখলি তো পারলি না। আমি ঘোড়া হই তুই ওঠ।" আমি রাজি হলাম না—"না দাদা সে কি করে হ'বে তোমার গায়ে আমি পা দিতে পার্‌বো না।" দাদা রাগ করাতে আমি শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলাম, দাদার পিঠে যখন পা দিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমার পা থর্-থর্ করে কাঁপছে, যাহোক করে গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে নেমে এলাম; দাদার পিঠের উপর আমার ধূলো শুদ্ধ পায়ের ছাপ দেখে আমি ফুলে ফুলে কেঁদে উঠ্‌লাম। অতি কষ্টে সেদিন দাদা আমায় থামিয়েছিল।

সাত বৎসর ক'মাস বয়স হ'লে দাদা স্কুলে ভর্ত্তি হয়। প্রথমে শিক্ষকেরা ভর্ত্তি করতে চায়না, বলে এইটুকু ছেলেকে ভর্ত্তি কি করে কর্‌ব, ওর সঙ্গে যে সব ছেলে পড়বে তারা ওদের চেয়ে ঢের বড়, তার উপর পরীক্ষা লিখে দিতে হবে। দাদা অঙ্কে তেমন ভাল ছিল না। ক্লাসের সব ছেলেই পাঠশালায়-পড়া ছেলে (পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায়-পড়া ছেলেরা অনেক দূর অবধি অঙ্ক কসে স্কুলে ভর্ত্তি হয়।) তারা দাদার চেয়ে ঢের বেশী অঙ্ক জান্‌তো। আর দাদা যখন স্কুলে ভর্ত্তি হয় তখন দ্রুত লিখতে পারতো না; ভর্ত্তি হবার কয়েক মাস পরে যে পরীক্ষা হয়েছিল তাতে দাদার ফল ভাল হোল না, প্রথম চার জনের মধ্যে দাঁড়াতে পারেনি, ইংরাজিতেও দু এক নম্বরের জন্য সেকেণ্ড হোল। এইবার ছাড়া দাদা প্রত্যেক বারেই ইংরাজিতে প্রথম হয়েছিল। এর পরের বারও দাদার অন্য বিষয়ে ভাল হলেও অঙ্কের জন্যে stand করতে পারলো না। মা দাদাকে বল্‌লেন,—"শুধু পাশ করে গেলেই হবে না, যা'তে ভাল হও তার চেষ্টা করো।" দাদা আবৃত্তি খুব ভাল করতো, এবং বরাবর এইজন্যে প্রাইজ পেত। একদিন মা বল্লেন 'এ রকম প্রাইজ পাওয়ায় তোমার কোনও গৌরব নেই, লেখাপড়ায় ভাল হয়ে প্রাইজ আনতে পারলে তাইতে গৌরব।' পরের বারে দাদা ফোর্থ হোল, তার পরের বারে সেকেণ্ড, তারপরই ফার্ষ্ট। এর পর থেকে স্কুলে দাদা বরাবর ফার্ষ্ট হয়েছিল, প্রায় সব বিষয়েই ফার্ষ্ট হোত। যে-অঙ্কের জন্য পরীক্ষার ফল খারাপ হোত সেই অঙ্কে দাদা একশ' নম্বরের মধ্যে একশ' রাখতো। দাদাকে কখন পড়তে বল্‌তে হোতনা। দাদা মাকে বল্‌তো 'মা সকলের বাপ মা ছেলেদের পড়্ পড়্ করে, কই তুমি, কি বাবা, আমাকে পড়তে বলো না কেন?' মা বল্লেন, 'অন্য ছেলেরা পড়তে চায়না তাই তাদের পড়তে বলতে হয়, তুমি যে বাবা না বলতেই পড়।' দাদা সন্ধ্যার পর কিছুতেই পড়তে পারতো না ঘুমিয়ে পড়তো। দাদা যখন পড়তে বস্‌তো তখন মনে হোত দাদা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে পড়া করছে। একজন ভদ্রলোক দাদার পড়া দেখে বলেছিলেন 'আমি অবাক হয়ে যাই অচ্যুতের পড়া দেখে, আমার মনে হয় পড়বার সময় অচ্যুত যোগে বসে।' দাদা খুব শান্ত ছিল। বরাবর স্থির ছিল। অনেকেই দাদার শান্ত স্থির ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতো।

২

ছোট বেলায় আমাদের বাড়ীতে গরু ছিল। সেই গরুর যখন বাছুর হোল, তখন আমাদের যে কি আহ্লাদ! বাছুরটির নাম বাবা রেখেছিলেন 'সুরভী।' সুরভী আমাদের বড় আদরের হয়ে উঠল, বিশেষ করে আমি তাকে

বড় ভালোবেসেছিলাম। আমরা কচি কচি ঘাস তুলে এনে তার মুখে ধরতাম, সে তার ছোট্ট জিভটি বার করে সব খেয়ে ফেলে আমাদের হাত চাট্‌তো। কখনো বা ফুলের মালা গেঁথে তাকে পরিয়ে দিতাম। মাঝে মাঝে সে তার মার কাছে গিয়ে দুধ খেত। সে সময় আমরা বটগাছতলায় গিয়ে বটের ঝুরি দিয়ে যে দোলা করা থাকতো তাইতে বসে দোল খেতাম। আমি যখন বসতাম দাদা দোল দিতো দাদা বসলে আমি দিতাম। কখনো কখনো বলতাম 'দাদা তুমি বড্ড জোরে দোল দাও আমার ভয় করে যদি পড়ে যাই।' দাদা বল্‌তো 'তুই বড্ড আস্তে দিস আমার একটুও দোল লাগে না, তুই আমায় যত জোরেই দোল দিস্‌না কেন আমার একটুও ভয় হবে না।' নেমে পড়ে আমি বললাম 'আচ্ছা এইবার তুমি বসতো।' প্রাণপণ বলে দাদাকে দোল দিতে আরম্ভ করলাম—'কেমন ভয় করছে না?' দাদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল 'মোটেই না, তোর গায়ে কিচ্ছু জোর নেই।' আমি রেগে বললাম 'না আমার গায়ে জোর নেই, তোমার আছে।' দাদা বল্লে 'হ্যাঁ আমার গায়ে জোর আছেই তো।' আমি রাগ করে বললাম 'আমি বাড়ী যাই।' একটু পরেই আমাদের ঝগড়া মিটে গেল। দাদাই মিটিয়ে নিলে। আমাদের যতবার ঝগড়া হয়েছে সববারই দাদা আগে মিটিয়ে নিতো। আমার অভিমান বড় বেশী ছিল। দাদার উপর সব চেয়ে বেশি হোত। দাদা যদি কিছু বল্‌তো আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। কোন কথা যদি দিদি ছোটদিকে আগে বলতো তবে আমার বড় অভিমান হোত, দাদা যতক্ষণ না ডেকে বলতো ততক্ষণ কথা বলতাম না।

একদিন দাদা আর আমি ডাংকড়ে খেলছিলাম, সেদিন দাদা কেবল হেরে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমার হাতের ডাংটা দাদার চোখের পাশে সজোরে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানটা কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল "কি হবে দাদা?" দাদা বল্লে 'কি হয়েছে এতে, খেল্‌তে গেলে অমন হয়েই থাকে আয় পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলি।' দাদা পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলল। আমি বললাম 'দাদা মা কিন্তু বকবে যে।' দাদা বল্লে 'মাকে বল্‌ব না।' আমি ডাংকড়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে বল্লাম 'আর কখনো এ খেলা খেলব না।' আর কখন খেলিওনি দাদা পরে যদিও অনেকবার বলেছিল। বাড়ী যেতেই মা জিজ্ঞেস করলেন "খুচু তোর ওখানটা কি করে কেটে গেল রে?" দাদা বল্লে 'ও কি করে কেটে গেছে।' মনটা আমার ভারি খারাপ হয়ে গেল, আমার জন্য দাদাকে মিথ্যে কথা বল্‌তে হোল। দাদাকেও সে কথা বললাম, দাদা বল্লে "আমি তো বলি না কিন্তু কি করব তুই যে বকুনি খেতিস্।" খানিকটা চুপচাপ থেকে আমরা মার্বেল খেলা আরম্ভ করলাম, খেল্‌তে খেল্‌তে মনের ভার অনেকটা কমে গেল।

আমি একদিন লক্ষ্য করলুম ছোটদি আর দাদা আমায় লুকিয়ে কোথায় যায় রোজ। আমি জিজ্ঞাসা করাতে ছোটদি প্রথমে কিছুতেই বল্‌তে চায় না, শেষে বলল 'আচ্ছা বিকেলে তোকে নিয়ে যাব।' বিকেলে ছোটদির কথামত আমার খাবারের একভাগ সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গে গেলাম। নদীর ধারে বাঁধের নীচে এসে ছোটদি একটি বড় গোল পাথর দেখিয়ে বললে 'এইখানে আমরা পূজো করি খাবার দিই, শিব!' আমরা তিনজনে সেইখানে ফুল খাবার দিলাম, স্তব পাঠ করা হোল; ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করলাম। দাদা বল্লে "ছোটদি আমরা তো ধ্যান করি না—এস আমরা ধ্যান করি।" আমরা তিনজনে তিনটে পাথরে বসে ধ্যান করতে লাগলাম, আমি খানিকটা করে করি আর চেয়ে দেখি ওরা কেউ চাইছে কিনা। ছোটদি এক আধ বার চাইল, কিন্তু দাদা স্থির! যেন ভিতরে কি দেখছে। এই রকম দিন কতক বেশ চলল, তারপর বাধা পড়তে লাগল কারণ খোলা জায়গা চারিদিকে লোকজন যাচ্ছে। ছোটদি বল্লে "এখানের চেয়ে বাড়ীতে আমরা করবো।"

বৈশাখ মাসে আমরা তিন বোনে শিব পূজা করতাম, তার সঙ্গে পুণ্যিপুকুরও কর্‌তাম। শিব পূজোর জন্য যে ফুল তুলে আনতাম তার মধ্যে বেছে বেছে দাদার জন্যে ভাল ফুলগুলি রেখে দিতাম, শিবকে না দিয়ে। ছোট বেলা থেকে দাদা ফুল বড় ভালোবাসতো। পুণ্যিপুকুর করতে গেলে যে ছড়া বলতে হয় তা আমরা বলতাম শুধু এক জায়গায় একটু উলটে নিয়ে। সেখানটা এই রকম ছিল

'সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।' আমি বলতাম 'এক ভায়ের বোন ভাগ্যবতী'; দিদি ছোটদি বল্‌তো 'ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।' আমরা চিরকাল মনে করতাম আমাদের একটি ভাই ভাল আর ভাই আমাদের দরকার নেই! আমার মনে হোত যদি আর ভাই থাকতো তবে হয়তো দাদাকে এত ভালোবাসতে পারতাম না। আমি অনেক সংস্কার মানতে চাইতাম না; কিন্তু কেউ যদি বলতো এতে ভায়ের দোষ হয় তা হলে সে সংস্কার খারাপই হোক আর ভালই হোক তা আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে যেতাম। দাদার ভারি ঘোড়া আর কুকুরের সাধ ছিল। বলতো 'দেখ্‌, বড় হয়ে আমি একটা টাট্টু ঘোড়া কিনবো তাতে চড়ে আমি কত দেশ বিদেশ, বন, জঙ্গল, পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াব, হাতে বন্দুক থাকবে, ঘোড়ার সঙ্গে একটা বড় বড় লোমওলা কুকুর থাকবে।'

সেদিন দাদা আর আমি পুকুরে স্নান করতে গেছি, পুকুরটা নতুন কাটান হয়েছে। আমরা ধারে স্নান করছিলাম, তখন দাদা কি আমি কেউ সাঁতার জানি না। একটি দুষ্টু ছেলে আমাদের দুজনের পা ধরে টেনে জলের মধ্য দিয়ে মাঝ পুকুরে ছেড়ে দিয়ে ঘাটে চলে এল। এদিকে আমরা সেই অথই জলে দুজনকে দুজনে জড়িয়ে ধরে, হাবুডুবু খেতে লাগলাম। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর কেবলি জল খাচ্ছি, উঃ! সে কি কষ্ট! এখন মনে হলে ভয় হয়। প্রাণপণ বলে দাদাকে আমি জড়াচ্ছি আর দাদা আমাকে জড়াচ্ছে। তাতে এই হ'ল লাভের মধ্যে, যে আরো ঘাট থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। পুকুরটা লম্বায় খুব বড় ছিল। ঘাটে কোন বড়লোক ছিল না যে আমাদের তোলে। এমন সময় পোষ্ট অফিসের টেলিগ্রাফ মাষ্টার স্নান করতে এলেন, তিনি দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি জলে নেমে আমাদের তুল্‌লেন। তুলেই দাদাকে এক ঘা চড় বসিয়ে দিলেন। প্রথমটা দাদা থতমত খেয়ে গেল, তারপর একটু রাগত স্বরে বল্লে "আমাকে মারলেন কেন?" তিনি বল্লেন 'মারবোনা বোনটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলি এক্ষুণি যে।' আমি বল্লাম "আপনি শুধু শুধু দাদাকে মারলেন, দাদা আমায় ডুবোয়নি —আমাদের দুজনকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।" তিনি বল্লেন 'কই সে'? চেয়ে দেখলাম যে সে পালিয়েছে।

৩

সরস্বতী পূজায় আমাদের সেই দুদিন যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যেত। আমরা বলতাম সরস্বতী পূজায় আমরা যত আমোদ পাই দুর্গা পূজাতেও তত পাই না। আমি না খেয়ে থাকতে পারতাম না বলে মা বলতেন 'প্রণাম করে জল খেয়ে নাও।' আমি রাজি হতাম না বলে মার কাছে বকুনি খেতাম। আমার মনে হ'ত যদি মরেও যাই তবুও অঞ্জলি না দিয়ে খাব না। দুটো আড়াইটার সময় অঞ্জলি দিতাম। দাদা স্কুলে অঞ্জলি দিত, আমি বাড়ী এসে যদি দেখ্‌তাম দাদা তখনো আসেনি তাহ'লে আবার চুপি চুপি পালাতাম, পাছে মা জোর করে দাদার আগে খাইয়ে দেন। সরস্বতী পূজার আগে কুল খেতে নেই বলে আমরা আগে কখনো কুল খাইনি। একবার পূজোর দিন পনেরো আগে গোটা দুই খুব ভাল কুল পেয়েছিলাম, দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্‌লাম 'দেখ দাদা কি সুন্দর গন্ধ কুলটায়।' আমি নিজে আর একবার শুঁকে দাদার হাতে দিলাম। দাদা বল্লে "তুই কুল খেলি?" আমি বললাম "না দাদা আমি তো কুল খাইনি সত্যি বল্‌ছি।" দাদা কুলটা ফেলে দিয়ে বল্লে "তুইতো শুঁকলি ওতেই খাওয়া হয়ে গেল, জানিস্‌না ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন।" আমি এইবার বুঝতে পেরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লাম 'কি হবে দাদা আমার লেখাপড়া হবে না?' দাদা বল্লে 'আর কখন এমন করিস না, না জেনে করলে দোষ নেই, কুল সরস্বতীকে দিতে হয় তাই পূজার আগে খেতে বারণ।'

বৎসরান্তে দুর্গা পূজার সময় আমরা এক মাসের জন্য ডায়মণ্ডহারবার ছাড়তাম, প্রথম দেশে যেতাম তারপর মামার বাড়ী। আগে আমাদের দেশে যেতে হলে প্রথমে রেলে উঠে মগরাহাট ষ্টেশনে নেমে নৌকা করে খালের মধ্য দিয়ে যেতে হোত। কিন্তু এখন নৌকা ছাড়াও অন্য পথ হ'য়েছে রেল, মোটার। নৌকায় বড় দেরী হয় বলে কেউ যেতে চায় না। আমার নৌকায় যেতে ভারি ভাল

লাগতো, খুব ছোট বেলায় নৌকায় যেতাম কিন্তু এখনো আমার নৌকো পথের দৃশ্য আমার বেশ ভাল মনে আছে। খালটি কোথাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোথাও কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠে নদীর মত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দুধারে কত রকমের নাম-না-জানা গাছ, লতা, কোনো গাছে ফুল কোনো গাছে ফল। মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা বাঁশ গাছ। তাদের মধ্যে কোনোটা বা একা কোনোটা বা বনলতার সঙ্গে খালের জলে নুয়ে পড়েছে। মধুর কলকণ্ঠে কত পাখী খালের তীর মুখরিত করছে। হয়তো খানিকটা শুধুই ধূধূ করা মাঠ চলল, তারপরেই আবার ধানের ক্ষেত, দু'চার জায়গায় জেলেদের মেয়েরা ছাঁকনি জাল নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করে; যখন তাদের পাশ দিয়ে নৌকো চলে যায় তখন তারা নিজেদের কাজ ভুলে অজানা যাত্রীদের দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সাত আটটা রাজহাঁস জলে খেলা করছে একসঙ্গে।

* * * *

বিজয়ার পর আমরা মামার বাড়ী যেতাম। মামার বাড়ী হুগলি জেলায় সুগন্ধাগ্রামে, কিন্তু সে দেশ আমি কখন দেখিনি কেন না আমার মামারা কলকাতায় থাকেন, আমার দাদামশাই সাব্‌জজ্‌ ছিলেন। আমি যখন খুব ছোট তখন তিনি মারা যান। বাবা আমাদের জয়নগরে রেখে কাশী চলে যেতেন। দাদাও স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর থেকে বাবার সঙ্গে যেতো। কালী পূজার পর আবার আমরা ডায়মণ্ডহারবারে ফিরে আসতাম। আবার আগের মত হাসি, গল্প, ঝগড়া ভাব,—এমনি করে আমাদের দিনগুলো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটতো। আমরা ভাবতাম আমাদের মত সুখী পরিবার খুব কমই আছে। আমাদের ভাইবোনের ঝগড়া আর ভাব দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার হোত। আমি আর দাদা বেশীর ভাগ একদিকে থাকতাম, আর ছোটদির সঙ্গেই আমাদের ঝগড়া প্রায় হোত, আবার ভাবও তেমনি; কেন-না ছোটদির মতন নতুন নতুন খেলা বার করতে ও গল্প বলতে কেউ পারতো না। ছোটদি পড়াশুনা বেশি দূর করেনি, মোটামুটি বাংলা লিখতে পড়তে জানতো, কিন্তু তার মনটা ছিল একেবারে অদ্ভুত। বড় সরল ছিল বলে সকলে ছোট্‌দিকে বোকা বলতো, বাইরের লোকের সঙ্গে সে খুব অল্প কথা কইতো। সকলে ছোট্‌দিকে পাগল বলতো। কিন্তু ছোট্‌দি সংসারের কাজ যেমন সুন্দর করতো তেমনি শীঘ্রও কর্‌তো। নির্জ্জনে থাক্‌তে পছন্দ করত আর গাছপালা ফুল ভালোবাসতো। বড় হয়ে আমি বুঝেছিলাম ছোট্‌দিকে। ছোট্‌দি একটু কল্পনাপ্রিয় ছিল। ছোট বেলায় আমাদের গল্প বলতো নিজে মুখে তৈরী করে। তাই ছোটদির সঙ্গে ঝগড়া হলে আমাদেরই অসুবিধে।

আমরা চারজনে মিলে ঠিক করলাম বাগান করবো। আমাদের বাড়ীর পাশেই খুব সামান্য একটুখানি পোড়ো জায়গা ছিল, সেইখানে বাগান হ'বে ঠিক হোল। দিদি বল্লে 'কোদাল দিয়ে কোপাতে হবে আগে।' দাদা কোদাল নিয়ে এসে বল্লে 'আমি কিন্তু কোপাব।' খানিকটা কুপিয়ে দাদা হাঁপিয়ে উঠল, দিদি বল্লে 'একজনে কোপাতে পারবে না। কষ্ট হবে সকলে মিলে একটু একটু করে কোপাবে।' আমি আর ছোট্‌দি নাম মাত্র কোদাল ছুঁতাম, দিদি আর দাদা সব কোপাল। ছোটদি বল্লে 'ফুলের সঙ্গে দু'একটা ফল গাছও দেওয়া হোক।' দাদা রাজি হোল না দেখে ছোট-দি কিছু বল্লে না। একটু পরে দাদা বল্লে 'আচ্ছা ভোট নেওয়া হোক ভোটে যা'হবে তাই।' ভোটে সকলেই দাদার দিকে মত দিলাম এমন কি ছোট্‌-দি পর্য্যন্ত বল্লে 'ফুলই হোক শুধু।' দাদা বল্লে 'গোলাপ গাছ লাগাবো, খুব বড় রক্ত গোলাপ ফুটবে।' দিদি বল্লে 'এখানে তো গোলাপ গাছ পাওয়া যায় না।' আমি বল্লাম 'জয়নগরের বাড়ীতে অনেক গোলাপ গাছ আছে কিন্তু সেতো আর আমাদের দেবে না।' ছোট্‌-দি বল্লে 'সে ফুল বড় ছোট।' দাদা বল্লে 'বাবাকে বল্‌বো বাবা কলকাতা থেকে গোলাপ গাছ কিনে এনে দেবেন।' ছোটবেলা থেকে গোলাপ ফুল দাদার বড় প্রিয় ছিল। ফুল মাত্রই দাদা ভালোবাসতো গোলাপ ফুল বিশেষ করে। মা আমাদের বাগান করা দেখে বল্লেন, 'হ্যাঁরে অত করে কর্‌ছিস্‌ গরুতে যে খেয়ে যাবে।' আমাদের তখন হুঁস্‌ হোল—সত্যিই তো। মাকে সবাই মিলে ধরলাম 'মা আমাদের বাগানের বেড়া ঘুরিয়ে

দাও।' মা রাজি হ'লেন। কিছুদিন পরেই আমাদের বাগান ঘেরা হোল। সকলে খুব পরিশ্রম করে বাগান করলাম। দুটি একটি ফুল ফুট্‌তে আরম্ভ করলে। পূজা এসে পড়্‌ল, আমরা চলে গেলাম, এক মাস পরে ফিরে এসে দেখি আমাদের অত কষ্টের বাগান একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বাগানের বেড়াগুলো বাড়ীতে যে ঝি ছিল সে সব ভেঙ্গে পুড়িয়েছে, গাছ কতক গরুতে খেয়েছে কতক মরে গেছে বাগানের দশা দেখে আমাদের চোখে জল এলো।

ছোটদি 'বল্লে বাগান আর করবোনা কেবল নষ্ট হয়ে যায়। আমরা পোষ্ট অফিস করি আয়।' সব জোগাড় হোল, দাদা হবে পোষ্ট মাষ্টার ছোটদি ক্লার্ক, আমি পিয়ন দিদি তখন বড় হয়েছে বলে সব সময় দিদিকে আমরা আমাদের খেলার মধ্যে টানতাম না। কিছুদিন আমাদের এই খেলা বেশ চলল, তারপর আর ভাল লাগেনা। আমি বল্লুম 'ডাক্তার ডাক্তার খেলা হোক্।' তাই আবার দিন কতক চল্‌ল। একদিন দাদা আমায় চুপি চুপি ডেকে মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে ঘাসের উপর বসে দাদা বল্লে 'একটা কথা বলব কাউকে বলিস্‌নি ছোটদিকেও না।' আমি ব্যগ্র হ'য়ে বল্লাম 'বলোনা দাদা আমি কাউকে বোল্‌বোনা।' দাদা বল্লে 'কল্‌কাতায় যাবি।' আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কার সঙ্গে?' দাদা— 'কার সঙ্গে আবার, আমরা দু'জনে এক্‌লা যাব, আমি পথ জানি হেঁটে যাব।' আমি আরও অবাক্ হলাম। 'হেঁটে যাব! সে যে অনেক রাস্তা বত্রিশ মাইল না?' দাদা বল্লে—'তাতে কি হ'য়েছে আমরা তো একদিনেই যাব না। আজ খানিকটা যাব আবার বাড়ী ফিরে আসব আবার তার পর দিন একটু এগিয়ে যাব এমনি করে রোজ এগিয়ে এগিয়ে কল্‌কাতায় পৌছব।' আমি আনন্দের সঙ্গে বল্লাম 'আজই আরম্ভ করবে তো?' দাদা বল্লে 'হ্যাঁ'। বিকেল বেলা একটু বেশ বেলা থাক্‌তে আমরা বেরিয়ে পড়্‌লাম। দাদা বল্লে 'যাবার সময় ছুটিস্ নি আসবার সময় ছুটতে হ'বে, হাঁপিয়ে পড়্‌বি।' এ সব রাস্তায় কখন আসিনি, নতুন অভিজ্ঞতা। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখি কিন্তু সাম্‌নে কত অজানা রহস্য আছে এই ভেবে এগিয়ে যাই। সূর্য্য পাটে বস্‌লে আমরা ফেরার পথ ধরি, রাখাল ছেলেরা গরু নিয়ে ফিরছে, মনে হোল এদের কেমন মজার জীবন বাড়ী ফিরতে যত রাতই হোক্ না কেন কেউ বক্‌বে না, একলা কতদূর চলে যাচ্ছে কেউ বারণও করে না। রাস্তায় বড় ধূলো কিন্তু ধূলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে আমার বেশ ভালো লাগে। অল্প অল্প করে আঁধার নামে আমাদের চলার বেগ বেড়ে চলে। একটু অন্ধকার হলেই আমরা দু'জনে হাত ধরে দৌড়াই। পোলের ওপর উঠ্‌লেই নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগে। এই রকম করে দু'চারদিন যাবার পর একদিন দুপুর বেলা (সেদিন দাদার ছুটী ছিল) দাদাকে বললাম 'দাদা যাবে না' দাদা বল্লে—'আর একটু পরে এখন বড় রোদ।' মা যে সেখানে আছে আমাদের অত হুঁস্ ছিল না। মা জিজ্ঞাসা করলেন 'কোথায় যাবিরে।' আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম, আমায় চুপ করে থাক্‌তে দেখে আবার মা বল্লেন 'বল কোথায় যাবি চুপ করে রইলি যে।' আমি ভয়ে বলে ফেল্‌লাম 'আমায় দাদা বল্‌তে বারণ করেছে আমি বল্‌তে পারবো না।' মা দাদাকে বল্‌তে বল্লেন, তারপর সব শুনে বল্লেন 'এ বুদ্ধি দিলে কে? ওরকম করে যেতে চেষ্টা করো না আর, পারবে না। আমার কাছে সত্যি কর যে আর যাবি না।' আমরা দু'জনেই বল্লুম 'না মা, যাবো না আর।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

ওরা ও আমরা

ডাঃ ডি-আর-ধর, এম-আর-সি-পি, (লণ্ডন) এম-বি

প্রথম যেদিন আমাদের জাহাজ এসে Plymouth-এ লাগ্‌ল সেদিন ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪। Plymouth থেকে special train ছাড়্‌ল আমাদের জাহাজের যাত্রীদের London পৌঁছে দিতে। সুন্দর উঁচু নীচু জমির উপর দিয়ে ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন ছবির মত সুদৃশ্য ইংরেজ পল্লীর মাঝ দিয়ে গাড়ী ছুটল। পথের দুধারে যে সব পুষ্টকায় গাভী চর্‌তে দেখ্‌লাম - তাতে মনে হল আমাদের দেশের গাভী আর এ দেশের গাভীতে কত আকাশ পাতাল তফাৎ—অথচ আম্‌রা গরুকে দেব্‌তা বলে মানি আর এরা গরু খায়!

আগেই জায়গা ঠিক ছিল—২১নং Cromwell Road-এ উঠা গেল। এটা ভারতীয় ছাত্রদের London এর সাথে পরিচয় ক'রে দেবার মিলন-ক্ষেত্র—প্রায় অনেকেই এখানে এসে প্রথমে ওঠেন। ভারতীয় ছেলেদের আড্ডায় প্রথমেই যেটা আমার চোখে লাগ্‌ল সেটা হচ্ছে প্রাদেশিকতার বাহুল্য। বাংলার ছেলেরা এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছেন মাদ্রাজের ছেলেরা দিচ্ছেন অন্য জায়গায়—এম্‌নি সব প্রদেশেরই আড্ডা বসেছে বড় বসার ঘরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এটা দেখে স্বভাবতঃই মনে হয় আম্‌রা এতদূরে এসেও প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়াতে পারি নি। অবশ্য প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বদেশী ভাষায় কথা বলার লোভ অনেক সময় সম্বরণ কর্‌তে পারেন না—বিশেষ যখন সারাদিন কাজের সময় ইংরেজী বল্‌তেই হয়। কিন্তু সাধারণের মিলন ক্ষেত্রে এম্‌নি সব প্রাদেশিকতাকে বজায় রাখা কতটা উচিৎ তা হয়ত ভেবে দেখার সময় এসেছে। তাছাড়া আরো একটা ক্ষোভের কারণ এই যে এই সব বৈকালিক আড্ডায় আলোচনার বিষয় ছিল অতি সামান্য। এতদূরে এসেও সামান্য বিষয় নিয়ে পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে সময় কাটানর মত দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের কবে ঘুচ্‌বে জানি না। অবশ্য অনেকে কাজের কথা বলেন খবরের কাগজ পড়েন তবে দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগই বিশ্রাম লাভ করেন অতি সামান্য বিষয় নিয়ে আড্ডা দিয়ে।

এই ছাত্রাবাসের কথা কিছু বল্‌তে চাই। এটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত সরকার শুনেছি বছরে ৩০ হাজার টাকা দেন, বাকী ছেলেদের থাকার দরুণ যে টাকা পাওয়া যায় তাই থেকে চলে। এরি সাথে National Indian Association এর দুটো বড় বড় ঘর আছে। সেখানে প্রায়ই বক্তৃতা পার্টি ইত্যাদি হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমাবেশ ভাবের আদান প্রদান এবং বন্ধুত্ব এবং চিন্তার সংযোগ—ইত্যাদি।

এই ছাত্রাবাসে অনেকগুলো ঝি চাকর। বিলেতে এসেও দেশের নবাবি বজায় রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা কি না তা বল্‌তে পারি না। ওদেশে সাধারণতঃ বড় বড় লোকরাও নিজেদের কাজ নিজে হাতে করেন। তার কারণ অনেক—যথা, চাকরের খুব বেশী মাইনে স্বাবলম্বন, অর্থাভাব ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌ছি নে। শীতকালের একদিন সন্ধ্যা বেলা বাংলা সর্‌কারের চিকিৎসা বিভাগের কোন এক উঁচুদরের অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীর সাথে আমি দেখা কর্‌তে যাই। আগুনের কাছে বসে কথাবার্ত্তা হ'ল, মাঝে মাঝে তিনি নিজে হাতায় করে কয়লা এনে আগুনে দিতে লাগ্‌লেন। এতেই বোঝা যাবে যে নিজের কাজ করতে ওদেশে কেউ লজ্জা বোধ করেন না। আমাদের দেশের এই গ্লানিজনক প্রথা যাতে লোকে নিজের হাতে নিজের কাজ কর্‌তে লজ্জা বোধ করে এটা কোথা থেকে এসেছে তা জানি না। বিলেতে সব লোকেই নিজের নিজের হাত-বাক্স এবং ভারী বাক্সও

হাতে করে পথ চলে—এত সস্তা মুটে ওদেশে নেই, সুন্দরীরা ভারী ভারী বাক্স হাতে করে প্রায়ই "ট্রেণ" "বাসে"র জন্যে ছুটোছুটি করে থাকেন। স্বাধীন দেশে এতে মান যায় না আর আমাদের দেশে স্বাবলম্বী হতে মানুষের মাথা কাটা যায়।

প্রথম যেদিন হাঁসপাতালের খোঁজে London সহর ঘুরে দেখ্‌তে হয়, সেদিন যা খুব আশ্চর্য্য বলে মনে হল সেটা ওদেশের পুলিসের ভদ্রতা আর যোগ্যতা। London পুলিশের মত পুলিশ পৃথিবীর কোথাও নেই বল্লেই হয়। প্রায় সকলেই পুরো ছয় ফিট লম্বা—তেমনি চওড়া দেখ্‌লেই একটা বিশাল পুরুষ বলে মনে হয়। চেহারাই অন্যায়কারীর পক্ষে যথেষ্ট ভীতিজনক, অন্য কোনও অস্ত্র শস্ত্রের দরকার হয় না।

সত্তর লক্ষ লোকের বাস লণ্ডনে—তার মাঝে কত বিদেশী কত গ্রামের লোক, তারা অবিরত পথ জিজ্ঞাসা করছে আর প্রতিবারই যেন মুখস্থ করা বুলির মত London পুলিশ বলে দিচ্ছে। প্রত্যেক কথায় বল্‌বে 'মহাশয়', আমি প্রথম দিনই তাদের ব্যবহারে ভদ্রতা ও নম্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। এদের দেখে স্বভাবতঃই দেশের পুলিশের কথা মনে হয়। London পুলিশ এত সুদক্ষ কর্ম্মপটু আর দেশের পুলিশ এদের তুলনায় এত অকর্ম্মণ্য ক্ষমতা-প্রিয় এবং নানাদোষে দুষ্ট কেন এর কারণ যতদূর অনুমান করতে পারি, এইখানে লিপিবদ্ধ করলাম; অবশ্য আমার যে সব ধারণাই ঠিক তা নয় তবে কিছু কিছু সত্য এর মধ্যে আছে আশা করি।

প্রথমতঃ London এর পুলিশের মাইনে এত বেশী যে খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত স্বাধীন দেশের জনসাধারণের সহিত ব্যাবহার ভদ্রতার সহিত হওয়া দরকার তাই পুলিশও ভদ্র। তৃতীয়তঃ শিক্ষা ও চরিত্রবত্তার দৃঢ়তা। আমাদের দেশের পুলিশ,—যাদের সাথে সাধারণের ব্যবহার করতে হয়,—সেই সব constable inspector, subinspectorরা একেত কম মাইনে পান—(সেজন্য ভালো লোক পাওয়া যায় না), তার উপর প্রলোভন বেশি সেজন্য চরিত্রের দৃঢ়তা না থাক্‌লে পতনের সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বড় বড় চাকুরে সাহেব—I. G., D. I. G., D. G. এঁরাই সব বেশী টাকা পান তাইতে নীচের দিকের কর্ম্মচারীদের দেবার টাকার অভাব হয়। পুলিশের চাক্‌রী এত বিপদজনক এবং দায়িত্বপূর্ণ, যে তাতে কম টাকা দিয়ে ভাল লোক পাওয়া যাবে না। London এর একটি constable প্রায় ৪১৫ পাউণ্ড প্রতি সপ্তাহে পায়—তারপর সারাজীবন মাইনের মত pension পায়। সেইজন্য London পুলিশকে সহজে ঘুসে বশ করা যায় না। তারা জানে যে অসৎ কাজে ধরা পড়্‌লে সারাজীবনের pension নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য চরিত্রবত্তা শিক্ষার উন্নত অবস্থা প্রভৃতিও এই সব উন্নতির কারণ।

আর এক্‌টা ব্যাপার দেখেছি প্রায়ই যখন কোনও কাজে পুলিশ বাড়ীতে আস্‌ত তখনি যেন তারা সাহায্য করতে এবং দশেরি একজনের মত ব্যবহার কর্‌তে আসত—আর আমাদের দেশের পুলিশ যেন কোন অতিকায় রাজপুরুষ যার নামে এবং দৃষ্টিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রায়ই মনে হত London-এর পুলিশ সাধারণের সাহায্য এবং উপকারের জন্য আর দেশের পুলিশ একটা প্রাণহীন শাসনযন্ত্র। আজকাল কল্‌কাতায় পুলিশের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে তবে London এর তুলনায় কিছুই নয়। Londonএ অনেক মেয়ে পুলিশ আছে। তারাও খুব দক্ষ সৎকর্ম্মপটু এবং বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। এদের বেশী দেখা যায় যেখানে বেশি অসৎ মেয়েদের আড্ডা সেই সব যায়গায়।

য়ুরোপের প্রায় হাঁসপাতালে রোগীদের কিছু কিছু পয়সা দিতে হয়, অবশ্য যারা দিতে পারে তারা দেয়—অনেক হাঁসপাতালে পয়সা দিতে হয় না। তবে আমাদের দেশে যে ধারণা 'হাঁসপাতালে আবার পয়সা দেব কেন?' সেটা সব সময় ঠিক ধারণা বলে আমার মনে হয় না। কারণ যে দিতে পারে তার কিছু কিছু দেওয়া উচিত, তা নইলে হাঁসপাতাল চল্‌বে কেমন করে?

আর একটা ব্যাপার প্রায়ই দেখ্‌তাম। আজ বেরুল কাগজে অমুক্ হাঁসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা চাই আর অম্‌নি টাকার বেনামী-নামী চেক সব আসতে

লাগ্‌ল—দশ দিনে টাকা উঠে গেল। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ জাতির দেশে কই কত লক্ষপতি ত আছেন কিন্তু কয়জনে এই সব দরিদ্র পীড়িতের সাহায্যে টাকা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই materialist ইংরেজ বণিক হলেও এদের দেশে যা দান ধ্যান হয় তার সহস্র ভাগের এক ভাগও ভারতে হয় না। অবশ্য অনেকে হয় ত আমার এসব মন্তব্য পছন্দ করবেন না কিন্তু যাঁরা Times or Daily Herald খুলে দেখেছেন তাঁরাই দেখ্‌তে পাবেন দান ধ্যানে এরা জলের মত কত লক্ষ লক্ষ টাকা দেয়। শিক্ষাতেও ঠিক অম্‌নি ভাবে দান করে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানই সাধারণের দানে গড়ে উঠেছে। আর আমাদের দেশের কলকাতার একটা বেসরকারী হাঁসপাতাল ও কলেজ চালান শক্ত।

এই সব হাঁসপাতালেই, বিশেষতঃ যে সব হাঁসপাতাল বিশেষ বিশেষ রোগের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সে সকল হাঁসপাতালে খুব নামজাদা বড় ডাক্তাররা সপ্তাহে দু-এক ঘণ্টা ক'রে রোগী দেখেন, কিন্তু সাধারণ রোগীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কত ভদ্র কত নম্র তা বলা যায় না। এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল—কারণ দেশে সব নতুন পাশ করা ছোক্‌রা ডাক্তারদের এবং অনেক সময় তাদের উপরওয়ালাদের রোগীদের প্রতি ব্যবহার অতি নিন্দনীয়।

লণ্ডনে প্রত্যেক বড় ডাক্তারই কোনও না কোন হাঁসপাতালের পরিদর্শক ডাক্তার—অবশ্য এঁরা অধিকাংশই অবৈতনিক। আমাদের দেশে বিশেষ কলিকাতায় এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া দরকার। আর একটা বিশেষ জিনিষ লক্ষ করার আছে—যে, এখন ডাক্তারী শাস্ত্রের এত বেশী বই লেখা হচ্ছে যে একজন লোকের পক্ষে সব পড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। তাই ডাক্তারীতে বিশেষ বিশেষ অংশের জন্য লোকে শরীরের এক এক যন্ত্রের বা অঙ্গের চিকিৎসা শিখ্‌ছে—কালে কালে তারা সেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়। সবজান্তার ভাত ইয়ুরোপে প্রায় নেই বল্লেই হয়। অবশ্য ছোট ছোট ডাক্তারও আছেন তাঁরা সবই দেখেন। তবে বেশীর ভাগই এখন বিশেজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা হয়। আমাদের দেশে এখনও এটা হয় নি কিন্তু হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে একজন ডাক্তার অস্ত্র ব্যবহার করেন ধাত্রীবিদ্যার কাজও বাদ দেন না জ্বরের চিকিৎসা ত করেনই, ফলে তিনি কোনটাই ভাল করে শেখেন না—শিখ্‌তে পারেন না, কারণ আধুনিক সব জিনিষ পড়ার সময় নেই। একটি বিশেষ বিষয়ে যে যে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হ'চ্ছে, তাই পড়্‌তে একটা লোকের সব সময় চলে যায়। এই কারণে দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রায়ই হয় না এবং রোগও সারানো কষ্টকর হয়ে পড়ে; সেই জন্য গোবদ্দ্যি আধাবদ্দ্যি এবং অবদ্দ্যি সবাই আমাদের দেশে বেশ সুখে পয়সা রোজগার করে। অবশ্য চিকিৎসকের সংখ্যা লোক-সংখ্যা হিসাবে ঢের কম বলেও ঐ সব অর্দ্ধ-শিক্ষিত চিকিৎসকরা খুব জাঁকালো ভাবে দিন চালান।

ডাক্তারী বিদ্যায় প্রতিদিন এত কল কব্জা যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তাদের ব্যবহার এত দরকার যে ভাল ভাল হাঁসপাতাল দেশে স্থাপিত না হ'লে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা হওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ কোনও একজন ডাক্তারের এতটাকা নেই যে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিজে কিনে চিকিৎসা করেন। হাঁসপাতালে সব কেনা হবে তাই থেকে সাধারণে উপকার পাবে। এই ব্যবস্থা হলে বোধ হয় ভাল হয়।

ডাক্তারী শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা দেশে প্রায় হয় না বল্লেই হয়। তার কারণ এবং পরিমাণ ইত্যাদি পরে বলবার ইচ্ছা রহিল।*

সন্ধ্যাবেলা হাইড্‌ পার্কে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হ'ত। এই পার্কের এক কোণে প্রসিদ্ধ Marble Arch—এখানে প্রতিদিনই বিশেষতঃ শনিবারের বিকেল বেলা খুব

* আমাদের দেশে কোনও ডাক্তারী স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে পাশ করেই লোকে ডাক্তার হয়ে বসে—কিন্তু য়ুরোপে তা বড় হয় না। জার্ম্মানিতে ডাক্তারী পাশ করার পর ২।৩ বছর হাঁসপাতালে কাজ করতে হয়, তারপরে সে ব্যবসা সুরু করে। এর অবশ্য অন্য কারণও আছে—জার্ম্মানিতে ছেলেরা যখন ছাত্র থাকে তখন রোগী দেখে না—পাশের পর তবে ভাল ক'রে শেখে—তাই জার্ম্মাণি থেকে যাঁরা সদ্য পাশ করে Dr. Med. হন্‌ তাঁদের যোগ্যতা কতদূর তা বলা শক্ত। অবশ্য গবেষণা জার্ম্মানিতে খুবই হয়। এসব বিষয়ে পরে বলবার ইচ্ছে রহিল।

বক্তৃতা হয়। এক একজন উঠে বক্তৃতা দিতে সুরু করে—আর তার পাশে লোক জমে যায়, এই বক্তৃতা বড় আমোদ-জনক—কখনও কেউ বা মাথামুণ্ডু নেই যা তা বকেই চলেছে—কেউ বা খৃষ্ট ধর্ম্ম নিয়ে বল্‌ছে কেউ রাজনীতি আলোচনা কর্‌ছে। এখানে প্রায়ই Labour দলের সাথে Fascist দলের মারামারি' হত। বোতল ছোঁড়া মাথা ফাটাফাটি পুলিশ জেল সবই হত।' শুধু আমাদের দেশেই মারামারি হয় না, রাজনীতি নিয়ে এই সব সভ্যদেশেও হয়ে থাকে।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ অতি সৎ এদের সততা সম্বন্ধে দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। Omnibusএ উঠে টিকিট নিতে দেরী হল দেখ্‌তে দেখ্‌তে গন্তব্য স্থানে এসে গেলেন—আর টিকিট নেওয়া হল না পয়সা হাতে দিয়েই নেমে গেলেন। Conductor টিকিটখানা punch করে বাইরে ফেলে দিলে। আর দেশে কতবার দেখেছি ট্রামে Conductor ফাঁকি দিয়ে পয়সার ভাগ নেয় এবং টিকিট দেয় না। এতে জনসাধারণের এবং Cnoductorএর দুজনারি অসৎ শিক্ষা ধরা পড়ে। এরা পথে ঘাটে চলা ফেরায় প্রায় ঠকিয়ে নেয় না বল্লেই হয়, অবশ্য চোর গাঁটকাটাও আছে তবে আমাদের দেশের তুলনায় খুবই কম। (ক্রমশঃ)

ডি-আর-ধর

চম্পক

শ্রীযুক্ত প্রতাপ সেন বি-এস্‌-সি

মধু-যামিনীর স্বপন-আবেশে চম্পক-বালা মেলিয়া আঁখি
চাও-নি তখনো নয়নের কোলে নিশি-জাগরের সুর্ম্মা মাখি;
তখনো কুঁড়ির আধ-ফোটা দলে নামেনি রঙের তীব্র ছাপ
শ্যামল বোঁটায় মৃদু হিল্লোল আনেনি তখনো অলির চাপ।
যেদিন কলির ধেয়ান ভাঙ্গিল সুদূর রবির উষ্ণ-চুমে,
আকুল আলোর পরশ বুলায়ে মাগিল ও তনু লুটায়ে ভূমে',
বিশ্বের যত আকূতি লইয়া কহিল সবিতা প্রাণের কথা,
তুমি শুধু ছিলে বিভল্ নয়নে কিশোরীর মত লজ্জানতা।
শেখোনি তখনো চটুল বয়ানে অতুল সুরভি ছড়াতে বালা,
ছোপায়ে কপোল, খোঁপায় বাঁধিয়া সরমের যত কপট-মালা।
সেদিন অলকা দেখেছি প্রথম—যৌবন-তীরে দেখেছি তোমা',
মঞ্জরী তব মমতায় ভরি' মর্ত্ত্যে করেছ কী-অনুপমা!
নন্দন হ'তে এসেছ ধরায়, যৌবন চির অঙ্গে নিয়া,
যৌবন ভরি' সুষমার গীতে, কনক-ওড়না মাথায় দিয়া
কোরক আজিকে উদ্বেলি উঠে, পরাগের ব্যথা লইয়া পুটে,
চঞ্চরী ওই সঞ্চরি' ফিরে, ফুলে ফুলে ভ্রমে মাধুরী লুটে'।
আজি ফুলবালা মরমের জ্বালা পাপ্‌ড়ীর দলে বিকশি' তোল,
রূপ-সৌরভ-সম্ভার নিয়ে মধু-মঞ্জুষা আপনি খোল।

"আধ টুকরো কাগজ"*

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

শেষ গাড়ি বোঝায় জিনিষপত্র চলে গেল। ভাড়াটে, বয়স ত্রিশের নীচেই, টুপিতে তার "ক্রেপ্" ঘেরা, আর একবার ঘরগুলো দেখে নিচ্ছিল, কিছু পড়ে রইল কি না। না, কিছুই পড়ে নাই—একেবারে কিছুই না। তাই সে বেরিয়ে এল সামনের 'হল্'টায়, মনটা দৃঢ় করে—যে-দিনগুলো এই বাড়ীটাতে কেটেছে তার কথা আর কখনও ভাবা হবে না—কখনও না। থামো একটু, 'হলে' টেলিফোনটার পাশে আধখানা কাগজের টুকরো গোঁজা, আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে হরেক রকম লেখায় ঢাকা, কতক পরিষ্কার কালিতে, কতক হিজিবিজি পেন্সিলে, আর কতক বা লাল খড়ির টুকরো দিয়ে। ঐ আধখানা কাগজের টুকরো-টুকুতেই দু'বছর ধরে যে জীবনটা তার স্বপ্নের মত কেটে গেল তারই ইতিহাস। সে যা' কিছু ভুলতে চায়, সবই সেইখানে। একটা মানুষের জীবন-কাহিনী আধখানা কাগজের পাতায়।······

কাগজের টুকরোটা সে টেনে নামালে; এক রকম চক্‌চকে সস্তা ফিকে হলুদে কাগজ পাওয়া যায়, এটা তাই। তারপর 'ম্যান্‌টুপিসের' ওপর কাগজটা বিছিয়ে, ঝুঁকে পড়তে লাগ্‌ল।

প্রথমেই তা'র নাম; "অ্যালিস্।" এর চেয়ে মিষ্টি নাম তার আর জানা ছিল না, কারণ এ নামটা যে তার বাগ্‌দত্তার। আর তার নম্বর ১৫১১; যেন একটা মন্ত্রের বীজাক্ষর। তারপর লেখা ব্যাঙ্ক; তার কাজের রাজ্য—তাঁর কর্ম্মভূমি—যার দৌলতে তার ঘরবাড়ী, খাবার রুটি, আর এমন স্ত্রী; তা'র সমস্ত জীবনটা একে ঘিরেই বোনা। কিন্তু এটা কাটা, কারণ ব্যাঙ্কটা ফেল হয়ে গেল। শিগ্‌গীরই অবশ্য তাকে অন্য ব্যাঙ্কে কাজ দেওয়া হ'ল—যাই হোক্, ভারী দুশ্চিন্তায় কেটেছিল সে ক'দিন।

তারপরই সুরু হ'ল—ফুল, মালা, চাকরদের নূতন পোষাক। তার বাক্‌দান হয়ে গেল; পকেটে তখন তার চক্‌চকে নগদ টাকা ঝনঝনিয়ে বাজে।

তারপর, জিনিষপত্র—বাড়ী সাজান—মনের মতন করে ঘর-দুয়োর গোছান হল, গাড়ি ভাড়া—নূতন বাড়ীতে উঠে এল তারা।

অপেরা বক্স অফিস, ৫০৫০: সবে বিয়ে হয়েছে তা'দের; প্রতি রবিবার তারা অপেরায় যায়। জীবনের সবচেয়ে সুমধুর ক্ষণটুকু, পাশাপাশি যখন বসে থাকে দু'জনা, হাতে হাত দিয়ে নীরবে—ও-পাশে রূপ আর সুরের যাদু-খেলা ঢেউয়ের মত উঠে মিলিয়ে যায়।

এইখানে একটা লোকের নাম লেখা, কিন্তু পরে আবার কেটে দেওয়া। তা'রই এক বন্ধুর নাম; সমাজের অনেক গুলি ধাপ বেয়েই সে ওপরে উঠেছিল, কিন্তু এত সুখ তার সইল না। তলিয়ে গেল কোন্ অতলে, সবারই চোখের বাইরে—দূরে, বহুদূরে। জীবনটা একটা টুস্‌কির ঘাও সয় না।

তাদের মাঝে বুঝি এবার নূতন কারও আগমন হল; মেয়েলী হাতে পেন্সিলে লেখা—

মিসেস্—; মিসেস্ কে?—ও নিশ্চয়ই; লম্বা 'ক্লোক্' পরা হাসি-হাসি মুখ যে স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে আসতেন বন্ধুর মত। কখনও খাবার ঘর দিয়ে যেতেন না, 'প্যাসেজ্' দিয়ে বরাবর চলে যেতেন শোবার ঘরে······

তাঁর নামের নীচেই—ডক্টর এল্।

এইখানে, এই প্রথমবার, একটি আত্মীয়ার নাম—মা। তার শাশুড়ী; বুদ্ধিমতীর মত এতদিন তিনি দূরে দূরেই ছিলেন—নব-দম্পতীর ওপরে নিজেকে জাহির করার বাসনা

* August Strindberg রচিত একটি ছোট গল্পের অনুবাদ।

তাঁর ছিল না। কিন্তু এখন কাজের সময় তাঁকে ডাকা হয়েছে—আপনাকে কাজে লাগাতে পারবেন জেনেই তিনি খুসী।

বড় বড় হরফে, লাল-নীল পেন্‌সিলে এবার লেখা আরম্ভ; রেজিষ্ট্রি অফিস; ঝি চলে গিয়েছে, কিংবা হত ত নূতন একজন খুঁজতে হবে।···ডাক্তারখানা—আঁধার ঘনিয়ে এসেছে—

ডেয়ারী—রোগীর জন্যে দুধ আনান হল।

মুদী, মাংস, আরও কত কি...টেলিফোন দিয়েই এখন সংসার চলছে। কেন বাড়ীর কর্ত্রী নেই না কি!—যা অসুখে তিনি শয্যা নিয়েছেন।···

তারপর আর সে পড়তে পারল না; চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এল, জলের তলে ডুবে কেউ যদি চোখ মেলে চাইতে চায়, তেমনি। তারপর কিন্তু লেখা ছিল 'আন্‌ডারটেকার'। ব্যাপার বোঝাই গেল; একটা বড় আর একটা ছোট—'কফিন্' কথাটা আর লেখা ছিল না—। তারপর দুটো ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা "ছাই"।

বাস্। ছাই হয়েই সব শেষ; তাই হয়েই থাকে।

কিন্তু ফিকে হল্‌দে কাগজের টুকরোটা সে তুলে নিল; চুমো খেয়ে অতি যত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল বুক-পকেটের মধ্যে।

দু'মিনিটেই তা'র জীবনের শেষ দুটো গোটা বছর আবার ফিরে এসে কেটে গেল।

ধীর পায়ে সে চলে গেল বাইরে—একটুও নুয়ে পড়ে নি কিন্তু।

বরং দর্পীর মত মাথাটা তা'র উঁচু হয়ে উঠ্‌ল মহাসুখে; কারণ সে যে জানে যে পৃথিবীর মাঝে যা' সবচেয়ে ভালো, সব চেয়ে সুমধুর সে ত তার ভাগ্যে ঘটেইছিল।

ক'জনার ভাগ্যেই বা সেটুকুও জোটে?···

শ্রী বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

অনাগত ও আমি

শ্রীযুক্ত বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তোমারে খুঁজেছি আমি হে অজানা বন্ধু, স্বপ্ন-সাথী,
যৌবন জগতে মোর সুবিচিত্র মর্ম্মের মুকুরে,
মিলনের স্বপ্ন ল'য়ে কাটায়েছি লক্ষ দিবারাতি
মনের মাণিকখানি পাই নাই তবু,—তুমি দূরে।

ফুটন্ত যৌবন-বনে স্বপ্নাতুর আজো বারে বারে
কামনা-কস্তুরী গন্ধে ঘুরিতেছি মত্ত মৃগ সম,
'আনন্দের হাসি-আলো বেদনার অশ্রু-অন্ধকারে
তুমি এস' হে সুন্দর অনাগত ভূমানন্দ মম!

আমার এ তিক্ত-চিত্ত-গুহামাঝে দুঃশঙ্কার রাতে
আঁখির অমৃত বর্ত্তি জ্বালায়েছি তোমার সন্ধানে,
অন্তরের মহাভাব এ তৃষ্ণায় মোর রিক্ত হাতে
অমৃতের ভাণ্ড দাও, তৃপ্তি দাও সঙ্গ-সুধা দানে।

* * *

অনন্ত অভাব মোর; অন্তহীন প্রেমের পূজারী
আমি তাই দেহ-পদ্মে খুঁজিতেছি 'মধু'র আস্বাদ,
কুৎসিত কল্পনা এ-তে করিও না বন্ধু তৃষাহারী,
এ নহে দেহের ক্ষুধা,—বঞ্চিতের প্রেম-আর্ত্তনাদ!

চিত্তের চাঞ্চল্য এই; এ-রে যদি তনুর তর্পণ
বলে কেহ, কায়া-কীট কামনার ক্রীতদাস আমি,—
তোমারে পাবার গর্ব্বে তুচ্ছ সব, হে বাঞ্ছিত ধন
তুমি নর কিংবা নারী সে সন্ধান জানে অন্তর্যামী।

ছন্দ-রণ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক এম্-এ

ছন্দের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্রমেই কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। অমূল্যবাবু একটি নূতন অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পাঠকমণ্ডলীকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন বাংলা ছন্দ মাত্রই মাত্রিক ছন্দ, সিলেব্‌ল্ এর কোন ছন্দই নাই। এ-কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি পাইলেও মুস্কিলে পড়িলাম তাঁহার মাত্রা গণনার দৃষ্টান্ত দর্শনে। 'বাপ্‌ বল্লেন', 'এক লগ্নেই,' 'রাজপুত্তুর'—এই সকল পর্ব্বে অমূল্যবাবুর মতে মাত্র চার মাত্রা, কারণ তাঁহার মতে প্রাকৃত ছন্দের প্রতি পর্ব্বেই চারমাত্রা থাকে। রবীন্দ্রনাথের ছয়মাত্রা বরং বুঝিলাম, কিন্তু এই চারিমাত্রা বুঝিতে পারিলাম না। এই অক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছি না। মাত্রা-গণনার নিয়ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা থাকা উচিত ছিল। অন্ততঃ অমূল্যবাবু তাঁহার গবেষণা-গ্রন্থ হইতে তৎ-প্রচারিত যুক্তিগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতেন।

আমরা চিরকাল জানি 'বাপ্‌ বল্লেন'—এরূপ পর্ব্বে ছয় মাত্রা, এবং রবীন্দ্রনাথের মতেও এক্ষেত্রে অন্যূন ছয়মাত্রাই আছে। ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্দ্ধমাত্রা গণিলেও 'বাপ্‌ বল্‌লেন্'—এতে ১ + ½ + ১ + ½ + ১ + ½ এই মোট সাড়ে চারি মাত্রা পাওয়া যায়। অতএব যেখানে তিন সিলেব্‌ল্ ও ছয় মাত্রা স্পষ্ট বিদ্যমান, সেখানে অমূল্যবাবু কি করিয়া চার মাত্রা আবিষ্কার করিলেন তাহা আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। নতুবা কবিতা-পাঠকের (লেখকের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) সাধারণ মাত্রা-জ্ঞানটুকুও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়! দেখিতেছি, অবশেষে কবি-কুলকে ছন্দের অকূলে ভাসিতে হইবে।

পরিশেষে অমূল্যবাবু আর একটি নূতন ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ নয়মাত্রার পর্ব্ব, যদিও এ-ইঙ্গিতটি বর্ত্তমান আলোচনায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আমার মতে নয়মাত্রার কোন পর্ব্বই হইতে পারে না। একত্র নয়মাত্রা উচ্চারণ আমাদের জিহ্বা-সঞ্চালন ও কণ্ঠ-ধ্বনির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘতম পর্ব্বে সাতমাত্রা পাওয়া যায়, যথা ৩ + ৪, তবে ছয়মাত্রাই বেশী দেখা যায়। নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা করিতে গেলেই ছয়মাত্রার পর্ব্বের দেড় পর্ব্ব হইয়া পড়ে। অতএব মাত্রাবৃত্তে নয়মাত্রার পর্ব্বরচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রবোধবাবু যে-ছন্দকে পূর্ব্বে অক্ষরবৃত্ত, এখন যৌগিক ছন্দ বলেন, তাহাকেও কি অমূল্যবাবু মাত্রিক ছন্দ বলেন? এই জাতীয় ছন্দে কখনও অযুগ্ম-সংখ্যক ধ্বনির পর যতি পড়ে না, সুতরাং যৌগিকেও নয়মাত্রার পর্ব্ব অসম্ভব। আর 'স্বরবৃত্তে' নয় 'মাত্রা'র পর্ব্ব যে কি করিয়া হইতে পারে তাহা বোধগম্যই হয় না। তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আমি অমূল্যবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে একবার মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতিতে যথাবুদ্ধি নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

ঝরিছে বরষা অঝোরে ×গুরু ছন্দ-গর্জ্জন;
কামিনীর দল লুটিল ×করি' বৃন্ত বর্জ্জন।
যূথী চঞ্চলা শিহরে, ×কাঁদে কেতকী কণ্টকে;
বাদলের মেঘ-ছন্দে ×হায় তৃষিত মন ঠকে!
×হ'লো পন্থা পিচ্ছিল, লাগিছে কাদা অন্তরে;
×এলো বন্যা নদীবুকে হর্ষে মন সন্তরে।

* * * *

×এ কবিতা-পর্ব্বে আজি রাখিলাম নয়-মাত্রা,
×নবতর ছন্দ-লোকে করিলাম মহা-যাত্রা।

ঢেড়া-চিহ্নিত পর্ব্বগুলিতে অমূল্যবাবুর নির্দ্দিষ্ট ২ + ৩ + ৪ এবং ৪ + ৩ + ২ সঙ্কেত অনুসৃত হইয়াছে, ছন্দ কিছু হইয়াছে কিনা ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

পূর্ব্বমেঘ

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

কর্ম্মে বীতরাগ প্রহত-অনুরাগ যক্ষ প্রভুশাপ উদ্‌যাপনে,
ভ্রষ্ট মহিমায় বর্ষ তরে, হায়, বিরহ সহে দূর নির্ব্বাসনে।
শৈল রামগির্ যেথায় জানকীর পরশ-পূত বয় উৎস ধারা,
স্নিগ্ধ তরুছায় কুটীর সেথা ভায় বসতি করে তায় কান্তাহারা ॥১॥

মাসের পরে মাস প্রবাসে করি' বাস যক্ষ তনুরুচি মলিন ক্ষীণ,
শীর্ণ বাহু তার বলয় গুরুভার বহিতে নারে আর ভূষণ হীন।
নবীন আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘের খেলা হেরি' গিরির তল,
—করীর ক্রীড়া হেন মনেতে লাগে যেন—উদাস দিঠি তার অচঞ্চল ॥২॥

কুবের-অনুচর বিরহ-জরজর জলদ পানে চাহি নির্নিমেষ—
আবেগ প্রশমিত চিত্তে উপজিত ভাবনা ভাবে—যার নাহিক শেষ।
দেখিলে নবঘন সুখী যে তারো মন উথলে বেদনায় কারণহীন,
সুদূরে প্রিয়া যার কি যে সে ব্যথা তার বুঝাতে পারে সেকি বাক্য দীন ॥৩॥

শ্রাবণ-সমাসনে যক্ষ ভাবে মনে বাঁচি কি রবে প্রিয়া এ ভরা মাস –
আমার চিতচোর না যদি পায় মোর কুশলবাণী সেথা মেঘের পাশ।
বিরহী সেইখনে ব্যগ্র প্রীত মনে কুটজফুলভারে অর্ঘ্য ভরি'
বিনয়ে পুটকরে নম্র দীন স্বরে নিল সে জলধরে বরণ করি' ॥৪॥

সলিল সমীরণে জ্যোতির সম্মিলনে ধূমিকা রূপে যার অধিষ্ঠান,
বার্ত্তা কেমনে সে বহিবে দেশে দেশে—মনন নাহি তার নাহিক প্রাণ।
দৌত্যে বরিবারে তারে তো সেই পারে যক্ষ সম যেই বুদ্ধিহত,
চেতন অচেতনে প্রভেদ নাহি গণে বুকেতে লেখা যার কামনা ক্ষত ॥৫॥

"বিশ্বে নাহি তুল বিদিত মহাকুল পুষ্করা বর্ত্তে জনম যার,
ইন্দ্র সহচর কামগ নভচর,—যাচক আমি আজ দুয়ারে তার।
সুদূরে প্রিয়া মোর নিয়তি লেখা ঘোর শ্রেষ্ঠ পাশে বরপ্রার্থী আমি—
বিফল হ'লে যেথা মনে না লাগে ব্যথা, অধম করে নহি সুফলকামী ॥৬॥

"তাপিত তাপহর সুখদ জলধর বার্ত্তা বহ মোর প্রিয়ার পাশ,
কুবের শাপে ক্রূর বিরহ জ্বালাতুর, শীতল ছায়ে তব শরণ-আশ।
যাওগো যাও সেথা অলকাপুরী যেথা যক্ষ দেবতার গরিমা বয়,
হর্ম্ম্য মনোলোভা হরের শিরোশোভা ধৌত হয়ে যেথা উজলি রয় ॥৭॥

"তোমারে দেখি নভে পথিক-বধূ সবে—প্রিয় যে গৃহমুখী—মনেতে জানি,
রুক্ষ কেশভার সরায়ে আপনার চাহিবে তব পানে স্বস্তি মানি।
স্নিগ্ধ তব ছায় মিটাতে কে না চায় বিরহ-বিধুরার চিরাবসাদ,
মিলনসুখ আশে যাইতে প্রিয়া পাশে—আমি যে পরাধীন— আমারো সাধ ॥৮॥

"দীর্ঘ তব পথ মন্দগতি রথ অলস বায়ে তুমি ভ্রাম্যমাণ,
যাত্রা অনুকূল বামেতে সমাকুল পিয়াসী চাতকের শুনিবে.গান।
না যেতে বহুদুর দেখিবে প্রেমাতুর বলাকাযুথ তোমা সেবিতে চায়
—নয়ন অভিরাম তুমিতো নহ বাম—মিলন ঘন আশে তোমারি ছায় ॥৯॥

"পথে না বাধা পেয়ে দেখিবে তুমি যেয়ে ভ্রাতৃজায়া তব আমারি প্রিয়া
একেলা আনমনে কেমনে দিন গণে আছে সে বাঁচি' মোরে প্রতীক্ষিয়া।
কোমল নারীচিত আশাতে উপচিত বৃন্তে ফুলসম রহেগো ফুটি',
নহেতো বাঁচিত কি আমার প্রিয় সখী, বিরহী প্রাণ তার যাইত টুটি ॥১০

"তোমারি মনোহর শ্রবণ-সুখকর নিনাদ ধ্বনি শুনি ধরিত্রীর
সৃজনী বেগভার বাধা না মানে আর জনম হয় ভূমি-কন্দলীর।
সে নাদ শুনি নভে মরাল-চিত হবে মানস সরোবরে গমন-আশ
পাথেয় সাথে ল'য়ে মৃণাল কিশলয়ে সঙ্গী হবে তারা আকৈলাস ॥১১॥

"তুঙ্গ শিলাভার মেখলা পরে যার শ্রীরামচরণের চিহ্ন ভায়—
তোমারি প্রিয়া সে যে যাইবে তারে ত্যেজে—আলিঙ্গনে ঘন লহ বিদায়।
জান সে প্রতিবার বঁধুরে বরে তার বিরহ-ব্যথাজাত অশ্রু সনে,
স্নেহের পরিচয় ব্যক্ত দেহময় বাষ্পাকারে নব মিলন খনে ॥১২॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

শিক্ষা

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

ইউরোপে অবস্থান কালে বহু শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে দেখা ও মোলাকাৎ হইয়াছিল। অনৈক শিক্ষানুরাগী বন্ধুর কাছে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। আজ আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা লইয়া আলাপ আলোচনা চলিতেছে। যে কোনো জাতির গড়নের মূলে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা বড় জিনিষ। সেই ভরসায় দেশের শিক্ষানুরাগী পাঠকদের কাছে শোনা গল্পটি পুনরাবৃত্তি করিতেছি ;-- করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একদা মর্ত্ত্যধামে সয়তান মহাশয় আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে মানুষ জাতিটা এখনো সৎ বলিয়া জিনিষটিতে বিশ্বাস রাখে। সয়তানের কুবুদ্ধি একেবারে পাকা—তা' কে না জানে ? তাই সে সহজেই বুঝিতে পারিল যে সৎ লোকেরাই সততা নামক গুণটার আখ্যা দেয়। সেই সৎ লোকেরা সাধারণতঃ শান্ত, স্থিরচিত্ত,—সে জন্য সুখীও। তাই সে ভাবিয়া ঠিক করিল যে যখন সংসারে সকলেই আর সৎ লোক নয় তখন সকলকেই অসৎ করিবার উপায় করা সহজ।

নিজের মনে-মনে ভাবিল শিশুরাই তো ভবিষ্যৎ সংসারের মানুষ, তা' কাজটা এদের হইতেই আরম্ভ করা দরকার। এই ভাবিয়া নববেশে সুপুরুষ সমাজ সংস্কারক-ব্রতচারী সাজিয়া সে মানুষদের কাছে আগমন করিল এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভগবান তোমাদিগকে মার্জ্জিত রুচিবিশিষ্ট সাধু প্রকৃতির হইতে দেখিতে চান। ইহাই সভ্য মানুষ হওয়ার প্রথম ও প্রধান কথা। কিন্তু তাহা হইতে গেলে শিশুকাল হইতেই সেরূপ সাধনামূলক শিক্ষা দেওয়া ও পাওয়া প্রয়োজন। সে তপস্যাময় জীবনে আনন্দ করা অন্যায়। অমার্জ্জিত হাস্য হাসা ও আমোদ করা স্মরণ ; কারণ ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার উপর অবজ্ঞা আরোপিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সত্যভাবে শিশুদিগকে শিক্ষামূলক সাধনায় দীক্ষিত করিতে হইলে মাতৃস্নেহ পাওয়া শিশুদের পক্ষে বিপজ্জনক ; কারণ, তাহাতে শিশুদের অন্তরাত্মার অবনতি ঘটিতে পারে। ভগবৎ ঈপ্সিত সাধনায় যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য সন্তানদিগকে মাতৃক্রোড় হইতে দূরে রাখা প্রয়োজন। শিশুরা যাহাতে কর্ম্মশীলতার (?) স্বাদ পায় এবং সেজন্য যে অপ্রতিহত চেষ্টার দরকার তাহা একঘেয়ে হইলেও যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। যাহা জীবনে অকারণ অহেতুক ইচ্ছা জাগায় তাহাকে একেবারে দমন করিয়া রাখিতে হইবে।"

সয়তানের বক্তৃতা শেষ হইলে সমস্ত মানুষেরা মিলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আরো উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল :—"প্রভো, আমরা নরেরা বাঁচিতে চাই। অতএব আমাদিগকে কী করিতে হইবে উপদেশ দি'ন।"

উত্তর আসিল—"তবে যাও, গিয়া বিদ্যালয়ের সৃষ্টি কর।"

তাই সাধুবেশী সয়তানের আদেশে প্রথম বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল।

শিশুরা প্রকৃতিকে ভালবাসে,—তাহাদিগকে জোর করিয়া প্রথমেই গৃহে আবদ্ধ করা হইল। খেলা-ধূলায় শিশুদের আনন্দ প্রবল, কিন্তু তাহাদিগকে জোর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত করা হইল। শিশুরা চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে চায়, এই ইচ্ছার মূলে চারিদিকের জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের ইচ্ছা কিন্তু তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের নিয়ম-মাফিক রুটিনের মাঝে ফেলিয়া সেই দৃষ্টিগত ইচ্ছার সহজতা ও স্বাভাবিকতাকে খর্ব্ব করা হইল—যেন জীবনে তাহার নিজস্ব ইচ্ছা বলিয়া কিছু না থাকে। শিশু নড়িতে-চড়িতে

ভালবাসে কিন্তু ক্লাসে তাহাকে কাষ্ঠ পুত্তলির মত বসিয়া শিক্ষকের উপদেশ শুনিতে জোর করা হইল। শিশু সকল প্রকার বস্তুকে আপন হাতে ঘাঁটাইতে চায়—চিনিয়া লইতে চায়, কিন্তু সে সহজ পথে না গিয়া তাহাকে ধারণা শক্তির সংযোগে আনা হইল। শিশু তাহার হাতকে নাড়িতে চায় কিন্তু মাথার বুদ্ধি চালনায় তাহাকে বাধ্য করা হইল। শিশু কথা বলিতে ভালবাসে, যুক্তিতর্ক তুলিতে চায়, সকল কিছুতেই "কেন" জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাহা সে "কেন"র উত্তর না দিয়া শিখানো জিনিষে মাথা বোঝাই করিতে বাধ্য করা হইল। বিচিত্র ও রহস্যময় প্রকৃতি শিশুর মনে কত কি বিজ্ঞানমূলক প্রশ্ন জাগাইয়া দেয় কিন্তু তৈরী বৈজ্ঞানিক তথ্যের বই পড়িয়া পরীক্ষায় পাশের জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাকে বাধ্য করা হইল। শিশুর মন কল্পনা লোকে বিচরণ করিতে চায় কিন্তু তাহাকে বয়স্কের অধীনে আদেশ মত চিন্তা-শক্তি চালনা করিতে শিখানো হইল। শিশু আপনার জীবনকে পূর্ণ আনন্দের মধ্যে পাইতে চায়, আনন্দে মাতোয়ারা হইতে চায়—কিন্তু তাহাকে সংযত করিবার জন্য শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আসল কথা,—শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চায় কিন্তু তাহাতে আজ্ঞানুকারী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থার ত্রুটি রহিল না।

এইদিকে দাড়ি-গোঁফের অন্তরালে সমাজ-সংস্কারকবেশী সয়তান লুকাইয়া হাসিয়া লইল।

অল্প কথার মধ্যে দেখা গেল যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা বেশ কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে। শিশুরা অল্পকালের মধ্যেই এই কৃত্রিম জীবন-যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম মাতারা সন্তানদিগকে দূরে রাখিয়া আনন্দ পাইতেন না। অথচ তাহাদিগকে বলা হইল—"এইরূপই যে হইতে হইবে।" পিতারা প্রথমে সন্তানদিগকে ঘরের কাজকর্ম্মের সাহায্য করিতে পাইতেন না বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে বিদ্যালয়ে থাকিলেই সন্তানদের মঙ্গল। ক্রমে শিশু সন্তান ও ইহাদের পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধটা স্বাভাবিক (?) ব্যবধানে পরিণত হইল। শিশুরাও ক্রমে বুঝিল পিতামাতারা এদের অনুপস্থিতিতে তেমন কোনো দুঃখ বোধ করেন না। তাই গৃহবাসের আনন্দ তাহাদের আর পূর্ব্বের মতো বড় হইয়া রহিল না। ছুটির বেলা বাড়ীতে থাকা কালে বিদ্যালয়ে দেওয়া কাজ শেষ করিতেই সমস্ত সময় যায়, এমন কি ধীরে সুস্থে সময় লইয়া খাওয়া দাওয়ার সময়ও নাই। এই নীতি সম্বন্ধে শিশুদের মনে কোনো দিন কোনো বিপরীত প্রশ্ন আসিয়া থাকিলেও কেহ তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতে গ্রাহ্য করিল না। পরন্তু শিশুদিগকে এই বাধ্যবাধকতার সৃষ্টির মধ্যে ফেলিয়া সকলেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইভাবে শিশুরা যাহা শিখিল অন্যভাবে তাহা সহ্য করা সম্ভব হইত না। এখন তাহারা জানে কি ভাবে 'লোক-রক্ষা' করিতে হয়—কি ভাবে প্রয়োজনের খাতিরে সত্য সৃষ্টি করিতে হয়। বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের খাতায় নাম উঠিল তাহাদের যাহারা শান্ত নিরীহভাবে প্রশ্ন না করিয়া শুধু শিক্ষকদের আদেশ প্রতিপালন করিল। বিদ্যালয় তাহাদিগকে সুচরিত্রের পুরস্কার দিয়া সেই আদর্শ শিশুদিগকে সকলের কাছেই ধরিলেন; যেন সকলেই এই রকম হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই আদর্শ শিশুরাই হইল পরে সমাজের শাসকতন্ত্রবাদী। বিদ্যালয়ও প্রয়োজন মত অবজ্ঞার দ্বারা, জানু পাতাইয়া নিজের হাতে নিজের কাণে ধরাইয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া কাজ সম্পন্ন না করার দরুণ কাজ আরো বাড়াইয়া—নানাভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে বাধ্যবাধক করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। শিশুদের মধ্যে কিন্তু একদল আপন ক্ষমতার প্রাচুর্য্যে আস্থাবান ও চিন্তাশীল যাহারা শিক্ষকদের সকল শাস্তিকেই উচিত বলিয়া নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইল না, আর এক দল প্রতিভাশীল যাহারা শিক্ষকদের আদেশ প্রতিপালন করা বা দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা সর্ব্বদা প্রয়োজন মনে না করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া আপন আমোদে মত্ত রহিল তাহাদিগকে সকলেই অকাল-পক্ক কুচরিত্রবান ইত্যাদি আখ্যা দিতে ছাড়িল না।

মানুষদের মনে হইল বিদ্যালয়ের রীতি উত্তম এবং প্রয়োজনীয়ও। এদিকে সাধুবেশী সয়তান আপনাকে জয়যুক্ত মনে করিল। সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ সাধুবেশী সমাজ-সংস্কারকের এই নির্দ্দেশিত পথকে সর্ব্বোত্তম

পথ বিবেচনা করিলেন। পণ্ডিতেরা শিশুদের অন্তরাত্মাকে সঙ্কীর্ণ, জন্মগত ক্ষমতাকে মলিন, স্মৃতিশক্তিকে মুখস্থবিদ্যা দ্বারা বোঝাই, করাইয়া শিশুসুলভ চরিত্রের সৌন্দর্য্যকে কৃত্রিম করিয়া তুলিতে লাগিলেন,—নতুবা যেন সভ্যতার আর মান থাকে না। কিন্তু সভ্য হওয়া চাই-ই।

ফলে, জগতে একদা এক বিশেষ পরিবর্ত্তনের সূচনা অনুভূত হইল। সাধুবেশী সয়তানের নির্দ্দেশ মত যে জাতি গড়িয়া উঠিল, দেখা গেল যে তাহার অধিকাংশই ক্রমে নিস্তেজ, কেমন যেন শক্তিহীন, সকল বিষয়েই উৎসাহ উদ্যমহীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতেছে। সভ্যতার চাপে গৃহের বদ্ধ বাতাসে চুপ করিয়া পড়াশুনা করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করিয়া যাওয়া এই সব মানুষ সমাজকে বিকৃত করিয়া তুলিল। মানুষের স্বাস্থ্যে অস্বচ্ছন্দতা আসিয়া ঢুকিল। জীবনটা যেন কেমন ভারী-ভারী, বহন করিয়া চলিতে কষ্ট হয়। স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের সহজ প্রসন্নতা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। অসুখীদের আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যাই বাড়িয়া চলিল। আত্মঘাতী হওয়া যেন সভ্য সমাজের এক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যেমন করিয়া অপরাধী সশ্রম কারাদণ্ডকে বহন করে তেমনি মানুষও সভ্য জীবন যাপনে তাহার দৈনন্দিন কাজের বোঝাকে বহন করিয়া চলিল। মানুষেরা আপন শাশ্বত ধর্ম্মের বাণী যে "সকলেই সুখী হও" তাহা যেন ভুলিতে বসিল। কিন্তু সকলেরই মনে হইল কাজের চাপটা বড় বেশী ক্লান্তিজনক; সুতরাং ক্লান্তির অবসাদকে দূরীভূত করিবার বা ভুলিয়া থাকিবার জন্য মানুষ মদ, গাঁজা, আফিং ইত্যাদি নেশার সাহায্য লইতে লাগিল। ক্রমে নেশার বড় দোকান খোলা হইল। দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজে এই সকলের ভার লইলেন যাহাতে রাষ্ট্রকোষেও অর্থাগম হয়। এই দিকে কিন্তু মানুষের মনের এত দুর্গতির পর নেশা-পান, সততা-সরলতা বলিয়া গুণসকলকে মলিন হইতে মলিনতর করিয়া তুলিল। মানুষেরা শুষ্ক, চাটুকার, কুরসিক ও কুটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কু ও বিকৃত রুচি সুরুচিকে অভিভূত করিল।

স্বাস্থ্য গেল, সুখ গেল, প্রীতির অনুভূতি কমিয়া আসিল। সততাও লোপ পাইতে লাগিল। মানুষের অন্তরাত্মা হাঁপাইয়া উঠিল। অর্থলোলুপতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসাদ্বেষ এমন ভাবে বাড়িয়া উঠিল যাহার ফলে সন্দেহের আতিশয্য বাড়িয়া যাওয়ায় গুপ্ত পুলিশ-বিভাগের সৃষ্টি হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল, চিরসুন্দর সত্য বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের কাছে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির লীলা খেলা পূর্ব্বের মত আর আনন্দ যোগায় না।

এই ভাবে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তখনও বিদ্যালয়ের কুটিরগুলি আদর্শানুযায়ী বিবেচিত হইল না। তখনও কুটিরগুলিতে সে সব জিনিষের অভাব বর্ত্তমান ছিল যে সব কারাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে। যথা—দরোজা জানালায় মোটা মোটা শিকল, বড় বড় তালা ও চাবি যাহাতে রৌদ্র আলো খোলা হাওয়া বাতাস খেলিতে না পারে।

কিন্তু সয়তান আপন দূরদর্শিতার অভাব বশতঃই হউক বা কুঅভিসন্ধির জন্যই হউক নিজের এই কৃতসৃষ্টির ফল কি হইবে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ দেখা গেল, কি যেন এক নূতন ভাবের স্রোত মানুষের মনে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে যেন ঘুমন্ত শিশু হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। শিশুদের আর সয়তানী বিদ্যালয়ে আসিতে মনোযোগ নাই। তাহারা মুক্ত হাওয়ায় হাটে মাঠে ঘাটে দৌড়াদৌড়ি, গাছের ডালপালায় লাফালাফি করিতেছে, তাহারা জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দের উৎসে আপনাদিগকে চিনিতে চায়। আত্মশক্তিতে তাহাদের বিশ্বাস জাগিয়াছে। সে কী জাগরণ! ভণ্ড সাধুসজ্জনদিগকে তাহারা বিদ্রূপ করে, শুধু তাই নয়, শিশুরা আপন জীবন-যাত্রার পথে সকল বাধা বিঘ্নের দুরূহতাকে সংকল্পের দৃঢ়তার দ্বারা অতিক্রম করিতে চায়।

স্বাস্থ্য সম্পদ এই দুরন্ত শিশুদের কাছে সহজভাবে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহারা অসীম সাহসী; কোনো কাজেই হাত দিতে ভয় পায় না। দুরূহ কাজের সংকল্পে যে দুঃখ আসে তাহাতেও তাহারা সুখবোধ করিতে লাগিল। বক্ষের প্রশস্ততা তাহাদের বাড়িল। তাহারা আত্মসংযমী হইয়া উঠিল। পরহিতে, জনহিতে আত্মদান পরম তৃপ্তিকর—এমন কি ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। পবিত্র প্রেমধর্ম্ম তাহাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। বিশ্বরাজ্যের বৈচিত্র্যময়

বিচিত্রতার মাঝে একত্বের রস ও সৌন্দর্য্য তাহাদের কাছে ধরা দিল। তারপর একদিন মানুষের অন্তরাত্মা অখণ্ড সুরে বাজিয়া ঘোষণা করিল—ভগবান মানে সত্য এবং প্রেমমূলক জ্ঞান।

এই দিকে দাড়ি গোঁফের অন্তরালে সয়তানের দুষ্ট হাসি-রেখা মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছদ্মবেশও আপনা হইতেই খসিয়া পড়িল। বিকট দন্তপাতি বাহির করিয়া সয়তান আপন দণ্ডহস্তে মনুষ্যজাতিকে শাসাইয়া অভিশাপ দিতে দিতে কোনো এক অচেনা রাজ্যে উধাও হইয়া গেল। শিশুরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সয়তানের উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানী বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল।

* * *

আজ আমাদের দেশের প্রাণের সকল তারে নব জাগরণের সাড়া ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু কে বলিবে এই শিশুরা সয়তানী শিক্ষার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে কি-না। সেই সয়তান নিজ শিক্ষানীতিচালকদের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে কি না এবং নিজে দাড়ি গোঁফের অন্তরালে এখনও মুচকিয়া দুষ্ট হাসি হাসিতেছে কিনা, তাই বা কে বলিবে?

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

একটি কথা

শামসুল হুদা

মনের মাঝে একটি কথার ঢেউ
সেই কথাটি জানতে নারে কেউ,
সেই কথাটি বুঝিয়ে না যায় বলা
হোক্ না রচন হাজার কাব্য-কলা।

স্বপন-তটে কপাল হানি' কাঁদে
হঠাৎ ভাঙে হঠাৎ আবার বাঁধে;
মুহূর্ত্তে সে বিশ্বেরে লয় কিনে,
মুহূর্ত্তে তায় দেয় সে মূল্য বিনে!

রূপকথারি রাজ-তনয়ের বাঁশি
সুর জাগে তার হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসি,
জীয়ন-কাঠি, পেয়ে তাহার চুম
রাজ-কুমারীর ভাঙে মরণ-ঘুম।

সেই কথাটি ঊর্দ্ধ-শিখা হোম
সেই কথাটি জলে ব্যথার মোম,
কোন দেবতা পায়রে তাকে, হায়
কেউ না জানে, কোন্ সে অবেলায়।

সেই কথাটি একলা বুকের মাঝে
আপন সুরে মর্ম্মরিয়া বাজে,
চিনবে কে তায় কিনবে কে তায়, ওরে
মন যে আমার তারেই খুঁজে মরে।

মিথ্যা কথা

(সত্য ঘটনা।)

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম্-এ

মিথ্যে কথাও যে স্থান বিশেষে আর্ট হয়ে ওঠে, সামান্য একটু মিথ্যে কথার সাহায্যে সময় বিশেষে যে কতখানি রস সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি সে দিন পেয়েছি।—

সন্ধ্যের পর বাড়ীর সামনে মাঠে বসে তিন বন্ধু ও দুই বন্ধুপত্নীতে মিলে গল্প হচ্ছিল। চৈত্র সন্ধ্যা, আকাশ তারায় ভরা, অন্ধকার খুবই স্বচ্ছ, ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাস দিচ্ছে,—সময়টা বড় মনোরম ছিল। কথায় কথায় ভূতের গল্প উঠে পড়্ল; সকলেই নিজের নিজের গল্প বল্তে ব্যস্ত, আমিই শুধু একটু দূরে চুরুট মুখে দিয়ে ষোল আনা শ্রোতা হয়ে বসেছিলাম। (—একটু দূরে সরে বসবার করণ আমার বন্ধুপত্নীদ্বয়ের মধ্যে একজন চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না।) কিছুক্ষণ পরে আমার এক বন্ধুপত্নী বল্লেন, "প্রমোদ বাবুর বুঝি ভয় করছে?"

আমি বল্লাম, "কিসে বুঝ্লেন?"

"যেমন চুপ্ চাপ্ বসে আছেন!"

আমি বল্লাম, "দেখুন, আপ্নাদের গল্প শুনে মনে হচ্ছে আপনারা কেউই চাক্ষুষ ভূত দেখেন নি। কিন্তু যে একাধিকবার ভূতের কবলে পড়েছে সামান্য দুটা ভূতের গল্প শুনে তার ভয় হবার কথা নয়।"

"কি রকম?"

আমি বল্লাম, "আমি একবার নয়, দুবার নয়, সাড়েচারবার ভূতের হাতে পড়েছিলাম।"

সাড়ে চারবার কথাটার মধ্যে বোধ হয় একটু রসিকতা ছিল, সকলেই হেসে উঠ্লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শুনবার আগ্রহ খুব বেড়ে গেল। আমি বল্লাম, "কিন্তু সাড়ে চারবারের ঘটনা এক সঙ্গে বলা যায় কি করে?"

"আচ্ছা একটাই বলুন।"

আমি বল্তে আরম্ভ কর্লাম—

*　　*　　*　　*

প্রায় ১০ বৎসর আগের কথা, তখন সবে আমি এম্-এ পাশ করেছি এবং তখনও আমি অবিবাহিত।

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিবাহে বরযাত্র যাবার কথা ছিল। সে গ্রামটার নাম ভুলে গিয়েছি। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে চিংড়িপোতা ষ্টেসনে নেমে আড়াই ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। যে দিন রওনা হবার কথা সে দিন হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে আমার যাওয়া বন্ধ হল। আমার বন্ধু বিশেষ দুঃখিত হলেন। আমি বল্লাম, "আমি কাল সকালের গাড়িতে নিশ্চয় যাব; তুমি ষ্টেশনে একটা গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত করো।" কিন্তু তার পরদিন সকালের গাড়ীতেও আমার যাওয়া হল না; আমি রওনা হলাম রাত্রের গাড়ীতে। চিংড়িপোতা ষ্টেশনে যখন পৌছলাম তখন রাত বোধ হয় ১১৷৷০টা। ষ্টেশনে আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। থাকবার কথাও নয়। বিদেশে একা, পথ চিনি না, তার উপর গভীর রাত্রি। উপায় না দেখে ষ্টেশনেই রাত্রি যাপন করা ঠিক্ করলাম। ছোট ষ্টেশন, কোন Waiting room নেই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে দুখানা বেঞ্চি পাতা আছে। তারই একটার উপর ছোট চামড়ার বাক্সটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি! বাপ্ কি ছারপোকা! অনেকক্ষণ চেষ্টা করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষে উঠে পড়ে প্লাট্ফরমে পায়চারি করতে আরম্ভ করলাম। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ কি দ্বিতীয়া, বিশ্বসংসার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত; প্লাটফরমে দুটো কুলী ঘুমচ্ছে, ষ্টেশনে আর জনমানব নেই;

চারিদিক নিস্তব্ধ শুধু আফিস ঘরে একটা বড় ঘড়ির অবিশ্রান্ত টক্ টক্ শব্দ। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় এই ঘুমন্ত জগতের উপর চন্দ্রদেব একমাত্র সজাগ প্রহরী।

রাত বোধ হয় তখন আড়াইটে কি তিনটে, কোথা থেকে দুর্ব্বুদ্ধি এল জানি না। ভাবলাম এভাবে প্লাটফরমে পায়চারি করে রাত কাটানোর চেয়ে ত এগোন ভাল, বরাবর সোজা রাস্তা শুনেছি। এইখানে একটা কথা বলি, ছেলেবেলা থেকে আমি বেপরোয়া,—ভয় কাকে বলে জানতাম না। বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টেশন থেকে আরম্ভ করে সোজা চওড়া মাটির রাস্তা পশ্চিম দিকে চলে গেছে: সেই পথ ধরে কয়েক পা মাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে, বোধ হয় হাত ৫০।৬০ দূরে এক নারীমূর্ত্তি—পথ দিয়ে চলেছে। তার পিছন দিকটা মাত্র দেখতে পেলেও এটুকু বঝলাম রমণী যুবতী ও সুন্দরী। একখানি রক্তজবা রঙের সাড়ী পরা, তার ভিতর দিয়ে যে একখানি নিটোল শুভ্র বাহুলতা দেখা যাচ্ছিল সে বাহুর শুভ্রতা চাঁদের আলোকেও যেন লজ্জা দেয়। দেহের গড়ন চলনভঙ্গী অনিন্দনীয়। অবাক্ হয়ে ভাবলাম—এই চন্দ্রালোকিত নিঝুম নিশীথ রাত্রে এই জনহীন স্থানে কে এ রমণী। নিঃসঙ্গ একাকী কোথায় যাচ্ছে! ষ্টেশনে ত একে দেখি নি, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের দুটি বাড়ি ছাড়া নিকটে কোথাও মানুষের বসতি নেই। এরমণী হঠাৎ কোথা থেকে এল! ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি, কোন কারণে হয়ত সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছে, আমার দ্বারা যদি এর কোন সাহায্য হয়। আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কে?' রমণী দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি আরও কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" কোন উত্তর না দিয়ে মুহূর্ত্ত পরেই রমণী আবার চলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম কারও সাহায্যে তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, আমি তার অনুসরণ করলাম। পথ চলতে চলতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম তার ও আমার মধ্যে দূরত্ব সব সময়ই প্রায় সমান রয়েছে। আমি কখনও খুব জোরে হেঁটেছি, কখনও আস্তে চলেছি কিন্তু উভয়ের মাঝখানের দূরত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা প্রশ্ন আমার মনে উদয় হল—এ রমণী মানবী ত! সঙ্গে সঙ্গে আমার আপাদমস্তক কণ্টকিত হয়ে উঠল, থামবার চেষ্টা করলাম থামতে পারলাম না, দেখলাম কি এক আকর্ষণী শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, আমার পা আর আমার বশে নেই। নিজের অবস্থা বুঝতে আর বিলম্ব হল না। ঠিক্ সেই সময় সেই নারীমূর্ত্তি পথ চলতে চলতে সহাস্যে একবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। কী অমানুষিক সে চাহনি!—সমস্ত প্রাণের একটা তীব্র জ্বালা, একটা নৃশংস প্রতিহিংসার স্পৃহা, জয়ের একটা আনন্দ সেই সহাস্য চাহনির ভিতর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছিল। আমার সমস্ত শরীর অসাড় হিম হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পথ চলার পর সেই রমণী পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছন পিছন মাঠে নামলাম। চষা ভূমির উপর দিয়ে, পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে, আলের উপর দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে শেষে আমরা একটা পড়ো জমিতে এসে উপস্থিত হলাম। ছড়ান কতকগুলো বাবলা গাছ, দু একটা সেওড়া ও তাল গাছ, আর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা নেড়া গাছ সম্পূর্ণ পত্রপুষ্পহীন, সেই নির্জ্জন জ্যোৎস্নালোকে বিরাট কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছটার কাছে গিয়ে সেই নারীমূর্ত্তি সহসা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও জ্ঞান হারালাম। শুধু ভোরের প্রথম কাকলী ক্ষীণ ভাবে কানে এসে পৌছল, আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম সকাল বেলার রোদ তখন যথেষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই নেড়া গাছের নীচে পড়ে আছি, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, যেন উঠবারও ক্ষমতা নেই। কিছু দূরে মেঠো পথ দিয়ে তিনজন লোক যাচ্ছিল, তাদেরই সাহায্যে অতি কষ্টে গন্তব্য স্থানে পৌছলাম। সেখানে ঘটনা যা শুনলাম তার সার মর্ম্ম এই।—

ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে, রূপসী বলে তার খ্যাতি ছিল। সেই গ্রামেই তার বিবাহ হয়। কিন্তু তারপর যৌবনের

মোহে সে কুলত্যাগ করে। অনেকদিন তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। তারপর সে যখন তার প্রণয়ী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে গ্রামে ফিরে এল তখন শুধু তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা নয় তার পিতামাতাও তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার দুই দিন পরে ঐ নেড়া গাছতলায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ও অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস এ রকম আরও অনেক যুবককে সে নাকি আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে প্রাণ নাশ করেছে।

* * *

সরযূদেবী জিজ্ঞাসা করলেন "আপনাকে মারতে পারল না কেন?" আমি বল্লাম "তার কারণ তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল।"

কারণটা বোধ হয় সকলেরই যুক্তসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর আমার বন্ধুপত্নীদ্বয় যখন গল্পটির প্রশংসায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছেন তখন আমার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "বাস্তবিক, নভেলে এ রকম গল্প পড়া যায় বটে কিন্তু একজন লোকের সত্যিকারের experience—;"

কিন্তু যে কথাটা বল্‌বার জন্যে আজ কলম ধরেছি সেটা হচ্ছে এই যে এ আমার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা মোটেই নয়। গল্পটী সম্পূর্ণ আমার কল্পনাপ্রসূতও নয়। অনেক দিন আগে কোন্ এক মাসিকে যেন এই ধরণের একটা গল্প পড়েছিলাম। তারই যে-টুকু মনে ছিল তাই ভেঙ্গে চুরে উল্টে পাল্টে একটু artistic snape দিয়ে গল্পটাকে বলবার চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টা সফল হয়েছিল কারণ সকলেই গল্পটীর খুব তারিফ করলেন। কিন্তু সে আসরে আমার এগল্প কিছুতেই এত জমত না যদি গল্পটিকে আমার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা বলে না চালাতাম। সুতরাং রস-সৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করলে আমার সেদিনকার সেই মিথ্যে কথায় কোন পাপ হয়নি। তবে নীতির দিক দিয়ে যদি কোন পাপ হয়ে থাকে তার প্রায়শ্চিত্ত আজ করলাম।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

তৃপ্তি

সুফী মোতাহার হোসেন

বধূরে লভিনু যবে—প্রথম মিলন-লজ্জাভরে
কুণ্ঠিত আনত এক অনিন্দিত লাবণ্য-লতিকা,
'আমি সে লজ্জারে ভাঙ্গি,' সিন্দুর-শোভিত ললাটিকা
বাসনা সোনার রাগে প্রোজ্জ্বল সুন্দরতর করে'—
কী আগ্রহে চুমেছিনু দুটি ক্ষীণ্ রক্ত-ওষ্ঠাধরে!
হেরেছিনু মুগ্ধচক্ষে সঘন-কম্পিত দেহ-শিখা,
পল্লব-পেলব বক্ষে নবোস্ফুট কমল-কলিকা,
অমৃত আস্বাদে যা'র মিটে নাই অতৃপ্তি অন্তরে।

সে নব-বধূরে মোর আজি হেরি অপূর্ব্ব নূতন!
আনন্দ-নন্দিত চোখে মাতৃ-ব্যথা হয়েছে মেদুর,
সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধতায় বরতনু শুভ্র সুশোভন।
জানি, জানি, কী মঙ্গল-স্বপ্ন সেই—বেদনা-মধুর,
সে যৌবন উচ্ছলারে অলক্ষিতে করিছে উন্মন,
বুঝেছি লভিব তৃপ্তি স্নিগ্ধচ্ছায়ে কল্যাণী বধূর।

দেব-দেবীর মূর্ত্তি-শিল্প

শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ সিদ্ধান্তরত্ন

সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি জীব চৈতন্যের যে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী তৃষ্ণা মূর্ত্তিপূজা তাহারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। পৌত্তলিকতা ইহার মধ্যে কিছুই নাই, আছে অনুরাগের তীব্রতা। মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা



নটরাজ মূর্ত্তির প্রতিলিপি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

সত্যাদি চতুর্যুগেই প্রচলিত, সত্যে সুরথের দেবী পূজা, ত্রেতায় লঙ্কাধিপ রাবণের ভগবতী আরাধনা, দ্বাপরে অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনুষ্ঠানসমূহ মূর্ত্তি পূজারই পরিচায়ক। মূর্ত্তি পূজার ব্যবহার যে অতি

প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আলোচ্য বিষয় হইতেছে ঈশ্বরের মূর্ত্তি কিরূপ হইবে? মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয় মূর্ত্তি কি তদনুযায়ী হইবে কিংবা ইহার কোন নিয়ম আছে,



জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

তাহারই অধীন হইয়া চলিতে হইবে? অনেকে মনে করেন বিংশ শতাব্দীর ভারত যখন সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতিশীল জগতের অনুসরণ করিতেছে তখন এ বিষয়েই বা সে প্রস্তরময় যুগের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে কেন? তাহার বন্ধন-রজ্জু মুক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের কিন্তু মনে হয় আমরা আর যে সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করি না কেন, যে সমস্ত বিষয়ে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় প্রভাব মুক্ত করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বৈশিষ্ঠ রক্ষা করিয়া চলিব। এক্ষণে আমরা মূর্ত্তি-শিল্পের শিল্পিগণকে একটি কথা বলিতে চাই। কথাটি হইতেছে এই,—মূর্ত্তি শিল্পিগণ যেন প্রতিমাদি নির্ম্মাণ সময়ে মনে রাখেন যে এই সমস্ত দেব-প্রতিমার উপর সাধকের জীবন মরণ সমস্যা নির্ভর করে। শাস্ত্রাদিতে শোনা যায় প্রতিমায় যদি ভীষণত্ব থাকে তবে দেবতারও ভয়ঙ্কর ভাবের অভিব্যক্তি হয়; প্রতিমা যদি সুন্দর হয় তবে পূজকের ভাগ্যও সুখময় হয় আর প্রতিমায় যদি কোন অঙ্গহানি বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে সেই মূর্ত্তি পূজার মহাননর্থ সংঘটিত হয়। এই নিমিত্ত দেবতার যে রূপ, যে বর্ণ, যে বেশ, যেরূপ পরিকর ধ্যান মন্ত্রে সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋষিগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন,



সরস্বতী মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

এবং সেই সমস্ত মূর্ত্তির অঙ্গ সৌষ্ঠব যাহাতে নিখুঁত সর্ব্বসুন্দর হয় তাহার জন্য তাঁহারা চতুর্বর্ণের অন্তর্ভূত কুম্ভকার নামে

এক শ্রেণীর লোককে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক অধিকার দান করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ হইল শ্রীভগবানের যে অব্যক্ত অচিন্ত্য ভাব উত্তম ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়ে রসময় প্রেমময় রূপে প্রতিফলিত হয় তাহাকে যথাশক্তি বাহ্যিক করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন শ্রেণী আজ অস্থির; উন্মূলিত মহামহীরুহের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে হইতে কে কোথায় ছুটিয়াছে কিছু নিশ্চয় নাই। শিল্পিগণ যদি প্রাচীন ভাবধারা অটুট রাখিয়া আর্য্যশাস্ত্র সমূহের আনুগত্যে প্রতিমাদি নির্ম্মাণে



সরস্বতী-মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

রূপ রস দিয়া লোকহৃদয়ে দিব্য ভাবের উদ্বোধন করান। কিন্তু ঘূর্ণ্যমান কালচক্রের এমনই ভীষণাবর্ত্তন মাঝে দেশ আজ মগ্ন যে তাহাতে তাঁহারা কেন ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ হস্তক্ষেপ করেন তবে এ বিষয়ে জটিল হইয়া পড়ে না। নতুবা প্রতীচ্যের ভাবধারার অনুকরণে নীলবসনা সরস্বতী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া 'শ্বেতাম্বরা' বলিয়া তাহার ধ্যান করিতে থাকিলে

মূর্ত্তিপূজার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, ধ্যান ধ্যেয় ও ধ্যাতার অভিন্নবোধ, তাহাই বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়া যাইবে। স্বাধীনতায় শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় সত্য, কিন্তু জড় জগতে, ঐশী জগতে, যেখানে মানবীয় সর্ব্ব বুদ্ধি পরাভূত সেখানে স্বাধীনতা বহুল অনর্থের মূল।

ঈশ্বরের প্রতিমাদি নির্ম্মাণ বিষয়েও আমাদের মনে হয় শাস্ত্র ও প্রাচীন দেশীয় শিল্পীগণের অধীনতা স্বীকার করিলে কল্যাণই হইবে। অতীত ভারত ব্যতীত বহুদিন প্রাচ্যকলা প্রসূত দেবমূর্ত্তি চক্ষে পড়ে নাই, দেশ প্রতীচ্য ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রতিমার মূর্ত্তিতেও প্রতীচ্য কলার



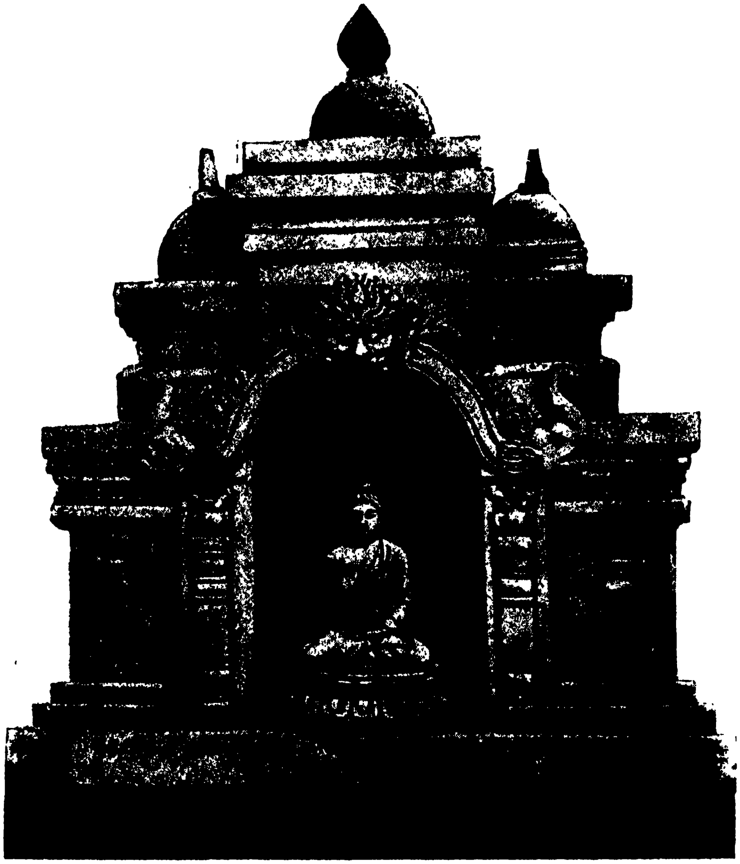
সরস্বতী মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

বস্তুতান্ত্রিকতার আভাস প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু বস্তুর পশ্চাতে যে গভীর ভাব-সত্ত্বা, যাহা প্রাচ্য কলার আদর্শ তাহা আর পরিলক্ষিত হয় না। বর্ত্তমানে আমরা শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র পাল মহোদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রীসরস্বতী মূর্ত্তিতে বিস্মৃতপ্রায় প্রাচ্য কলার সমাবেশ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত ভাবের আভাস প্রদান করিয়া থাকে, মনে দেব-ভাবের তন্ময়তা আনয়ন করে। মূর্ত্তিগুলির অন্যতম বিশেষত্ব এই যে প্রতি মূর্ত্তিতে একই শতাব্দীর প্রচলিত অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিল্পী বহুল আয়াসে মিউজিয়ম হইতে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিমার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। শিল্পীর



গণেশ-মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

ও আশান্বিত হইয়াছি যে আবার বুঝি প্রাচ্য কলা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। দেবী মূর্ত্তি দর্শনে যদি আমাদিগকে বাস্তব জগত হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে না পারে তবে সে দর্শনে লাভ কি? উক্ত মূর্ত্তি আমাদিগকে এক অতীন্দ্রিয় বয়স অল্প, প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের গৌরবময় আদর্শের পুনরাবর্ত্তন করুন। শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র পাল মহাশয় প্রস্তুত সিমলায় সার্ব্বজনীন দুর্গা প্রতিমা ও আরও কয়েকখানি প্রতিমা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।



বুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রতিলিপি
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

প্রতিমাগুলি অতি সুন্দর ও যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রস্তুত বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য শিল্পীগণও যদি ভারতীয় ভাবধারাকে বৈশিষ্ট্য দান করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুসরণ করেন তাহা হইলে মূর্ত্তি-শিল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি অল্প দিনের মধ্যে সংশোধিত হইয়া প্রাচীন মহৎ আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

'কবিতারসমাধূর্য্যং কবিবেত্তি ন তৎকবিঃ।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষা-সমালোচকের কখনও অভাব হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এ বিভাগে অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি হাত দিয়াছেন,—দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, শকুন্তলাতত্ত্বলেখক চন্দ্রনাথ বসু, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সমালোচক কবি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার সরকার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের নাম করিতে পারি। সঙ্গীতে শিল্পে ও সাহিত্যের নানাবিভাগে যেমন সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনই রবীন্দ্রনাথ নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন ও আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। সমালোচক হিসাবে, সাহিত্যের রসবোদ্ধা হিসাবে প্রিয়নাথ সেনের নাম ইঁহাদের মত লোক-প্রসিদ্ধ না হইলেও তাঁহার স্থান পূর্ব্বোক্ত সকলের হইতেই বিশিষ্ট রকমের ছিল। ইহার কারণ শুধুই যে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়,—তিনি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবর্গের এবং বিশেষতঃ ফরাসী সমালোচকদিগের অতি নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ফরাসীচরিত্রের যাহা বিশিষ্টতা—এবং যে বিশিষ্টতা ফরাসী সাহিত্যেতিহাস প্রণেতা লাঁস (Lanson) মনীষী রেণার চরিত্রে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেই l'ame ecclesiastique une âme de douceur, de finesse, de nuances—শোভনতা, শালীনতা, সৌন্দর্য্য-প্রীতি, অনুভূতির বৈদগ্ধ্য প্রিয়নাথের চরিত্রেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

প্রিয়নাথের ভাষা শিক্ষার প্রণালী অতি অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি মাত্র একখানি ভাল অভিধান ও একখানি ভাল ব্যাকরণ পাইলেই কয়েকমাসের মধ্যেই একটি নূতন সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন। অবশ্য, এই ভাবে একটি নূতন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে বা রচনা প্রকাশ করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু যখন মাত্র সেই ভাষায় রচিত পুস্তক পাঠই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তখন ইহাতেই বেশ কাজ চলিয়া যায়। প্রিয়নাথ বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিবার পর ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন; এবং সর্ব্বশেষ ফার্সী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। যে সকল অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা পুনঃপুনঃ আকৃষ্ট হইয়া দিনের পর দিন প্রিয়নাথের সাহিত্য-সাহচর্য্য লাভ করিতে যাইতেন। এবং তাঁহারা যে সকলেই প্রিয়নাথের ভাবৈশ্বর্য্যে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

সুইনবার্ণই বোধ হয় প্রিয়নাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ইংরেজী কবি ছিলেন—প্রিয়বাবু তাঁহার গদ্য-পদ্য সমস্ত রচনাই অতি যত্ন সহকারে নিজ গ্রন্থাগারে রাখিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি তাঁহার ছন্দের যাদুকর সুইনবার্ণের প্রতি প্রীতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে প্রিয়বাবু তাঁহার বিশাল জ্ঞানের অনুরূপ তেমন কিছু গ্রন্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মাত্র দুদশটী বাঙ্গালা ও ইংরেজী কবিতা ও সমালোচনা-বিষয়ক দুচারটী নিবন্ধ রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ইহা সত্য নহে যে তিনি আর বেশী কিছু লিখিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার যোগ্যতা সত্ত্বেও লিখিতে চাহিতেন না। ঐতিহাসিকপ্রবর লর্ড অ্যাকটনের মত তিনি তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকারদিগের যে কোনও গ্রন্থ লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এই রচনা-বিমুখতা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি অকৃতী শিল্পী ও রচনায় অকৃতকার্য্য ছিলেন বলিয়াই সমালোচক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ইহাই মনে

হইয়াছে যে তিনি সেই শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন যাঁহাদের সমালোচনা সম্বন্ধে মনীষী হাডসন বলিয়াছিলেন "প্রকৃত সমালোচনা জীবন হইতেই তাহার বস্তু ও মর্ম্ম গ্রহণ করে এবং তাহাও আপনার ভাবে সৃজনপ্রয়াসী।" তিনি সাহিত্য-পুষ্পের মধুপানে বিভোর হইয়া সে মধু সঞ্চিত করিয়া উত্তর কালের লোকের জন্য রাখিয়া যান নাই। তিনি যে সুধাস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন সাহিত্য-রসিক পাইলেই আত্মহারা হইয়া সেই সুধাস্বাদের আনন্দের কথা তদ্গতচিত্ত হইয়া বলিয়া যাইতেন—এবং কোথায় কোন পদ্মে কোন পুষ্পে কে মধুপান করিয়াছেন তাহার কথা সকলকে বলিতে চাহিতেন,—তাহার সন্ধান জনে জনে বিতরণ করিতেন। তিনি স্বীয় মানসের কল্পলোকে চিরনবীন স্বপ্নকুঞ্জ রচনা করিয়া বাণীকে সেই কুঞ্জে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহারই বীণাধ্বনিতে প্রমত্তচিত্ত হইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন মাসিকপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি পড়িয়া আমাদের ইহাই মনে হইয়াছে যে প্রিয়নাথের মধ্যে কবিপ্রতিভার বীজ নিহিত ছিল—তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাত্র; কারণ, কবি তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সাধনায় সচেষ্ট ছিলেন না। প্রিয়নাথের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি দুঃখের গান গাহিতেই বোধ হয় অধিক পছন্দ করিতেন। এ বিষয় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদিগেরই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ইংরেজী ভাষাতেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার 'বর্ষ শেষ' শীর্ষক একটী ইংরেজী কবিতা সমালোচকপ্রবর এড্‌মণ্ড্‌ গস গায়টের কবিতার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার 'স্বপনপুরে' নামক কবিতাটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

স্বপনপুরে
তোমাতে আমাতে
বেড়াব দুজনে
নিকটে দূরে
স্বপনপুরে।
সুরভি-শ্বাস
মৃদুল মধুর
যূথী মুকুলের,
ঘন উচ্ছ্বাস
ক্ষীণ মদিরা
ঝরা বকুলের,
মৃদু গুঞ্জন
অলস পাখার
বন মধুপের,
মৃদু কাঁপন
তরঙ্গ দোল
তটিনী বুকের,
বাঁশীর সুরে—
তোমাকে আমাকে
বাহিবে দু'জনে
নিকটে দূরে
স্বপনপুরে।

উদ্ধৃত কবিতাটীতে যদিও একটু আধটু ছন্দপতন হইয়াছে, তবুও ইহাতে প্রিয়নাথের কল্পনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে রসিক, সমজদার বোদ্ধা ও সমালোচক ছিলেন। তিনি নিজে রচনাপরাঙ্মুখ ছিলেন কিন্তু তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যজ্ঞান লইয়া কত সাহিত্যিককে যে তিনি তাঁহার প্রশংসা ও উৎসাহদানে উন্নতির পথে অধিরূঢ় করিয়াছিলেন তাহা অনেক জীবিত লেখকও ভুলিতে পারিবেন না। রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া কবি কালিদাস রায় পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার উৎসাহ ও প্রশংসাঋণে অল্পাধিক পরিমাণ আবদ্ধ। প্রতিভাকেন্দ্র ঠাকুর বংশের অনেকেরই তিনি আজীবন সাহিত্য-সঙ্গী ছিলেন। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁহার প্রভাব কতখানি গভীর ও ব্যাপক ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতেই সকলের বোধগম্য হইবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারা আমি এমন এক বন্ধু পাইলাম, যাহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমার

কাব্যরচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে "ভগ্নহৃদয়" পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক তিনি, দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভালোলাগা, মন্দ লাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ-কালেই যে কত উপকার করিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি, সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম, তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চকণ্ঠের প্রশংসা হইতেই বুঝা যাইবে প্রিয়নাথের কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা কোনখানে ছিল। তিনি নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু, তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্য খুবই মূল্যবান; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করাও বড় কম মূল্যবান নহে। প্রিয়বাবুর বন্ধু যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই বহুবিস্তৃত বিপুল সাহিত্য মজলিসের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন যেখানে যে কেহ রাগলয়ে সুর ধরিতে পারিয়াছে, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ও শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই তখনই তিনি বড় গলায় বাহবা দিয়া উঠিয়াছেন। কাছে পাইলে বন্ধুভাবে তাহার পিঠ চাপড়াইয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই আলোচনা, উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি মিত্রোচিত ব্যবহারে তদীয় কৃত ও কর্ত্তব্যকার্য্যের পন্থা ও প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজে উৎসাহিত হইয়াছেন ও তাহাকেও উৎসাহিত করিয়াছেন। নানাভাবে ও নানাভাষায় পারদর্শিতা থাকায় এই বন্ধুকৃত্যে তিনি বিশেষ অধিকারও রাখিতেন। তাঁহার এই সাহিত্য-বান্ধবতার ব্যবহারে একটা অসাধারণ সরলতা ছিল, একান্ত অকপট ভাবেই তিনি নিন্দা বা প্রশংসা করিতে পারিতেন এবং ঐ আন্তরিকতাই বন্ধু জনের নিকট তদীয় বক্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত। বয়সের প্রভেদ তাঁহার এই সাহিত্য-সাহচর্য্যের কখনও অন্তরায় হয় নাই; যুবা-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই বন্ধু হইতে পারিতেন। সাহিত্য-তীর্থের যাত্রী হইলেই হইল—আর কোন কিছু তিনি দেখিতেন না—দেখিতে জানিতেন না। সাহিত্যের বয়স নাই—সাহিত্যিকের বয়স লইয়া কি হইবে! রসই সব; তাই নিজে সেই রসের রসিক, রসের মর্ম্মী হইয়া ঐ রসের পথিক পাইলেই তিনি একেবারে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিতেন —রসের পাত্র বিচার করিতেন না।"

এ সংসারে অধিকাংশ লোকেই যে অহমিকতার প্রভাব এড়াইতে পারেন না, তিনি সেই অহমিকার ধার ধারিতেন না। সাহিত্যের নিঃস্বার্থ সেবাই তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম সাধনা ছিল। যে ভাব, যে চিন্তা তিনি নিজে প্রকাশিত করিয়া লোকপ্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন - সেই সমস্ত অমূল্য সম্পদ তিনি তাঁহার সাহিত্য-বান্ধবদিগের রচনার মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদেরই কৃত কার্য্যে বঙ্গবাণীর চরণে উপহার দিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সুবর্ণবণিকসমাচার পত্র লিখিয়াছিলেন, "লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে সঞ্চিত তাঁহার পুস্তকাগারে বহুমূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সঞ্চিত আছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসে তিনি ত্রিশ টাকার পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন।" তাঁহার মত অদম্য জ্ঞানপিপাসা খুব কম বাঙ্গালীরই আছে। এই বিষয়েও কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বর্গত বন্ধু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন সমগ্রভাবে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিলাম না,—

"এই সরস্বতী সেবা তাঁহার ইহ জীবনের একমাত্র সাধনা

ছিল। ইহা তাঁহার দিবসের চেষ্টা, তাঁহার রজনীর চিন্তা, জাগ্রতের ধ্যান, তাঁহার সুপ্তির স্বপ্ন ছিল। তাঁহার হৃদয়পুষ্প দিনে কমল এবং রাত্রে কুমুদ হইয়া সূর্য্য বা চন্দ্ররূপী বাণীচরণ চাহিয়াই নিয়ত উন্মুখী হইয়া থাকিত। কোন কার্য্যই তাঁহার করণীয় নহে, যদি তাঁহার পরম কর্ত্তব্য স্বরস্বতীসেবা সার্থক হইয়া না উঠে; আত্মীয় পরিবারও তাঁহার নিকট প্রিয় নহে, যদি তাঁহার প্রিয়তম সাধনা প্রতিদিন তৎসাহায্যে প্রিয়তর হইবার অবকাশ না পায়। নিউম্যান বা থ্যাকার-এর দোকানে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রাণপণ চেষ্টায় গচ্ছিত রাখিয়াছেন, ব্যাঙ্কেও মানুষ তেমন প্রাণপণে গচ্ছিত রাখেনা; দপ্তরীর বাড়ীতে তাঁহার প্রিয় পুস্তকের আচ্ছাদন অলঙ্কার প্রতিনিয়তই প্রস্তুত হইতেছে, গৃহ তাঁহার পুস্তকরাশির আবাসস্থান, আলমারিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের সেখানে থাকিবার যতই অসুবিধা হউক। পঞ্চতপার ন্যায় পাঁচদিকে পুস্তক পরিবৃত হইয়া অহরহ তিনি তপস্যামগ্ন, কিন্তু সে তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে—তাহা ভূমানন্দের। নিজে 'টাকায় তিন খানা' কাপড় পরিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু হস্তে যে পুস্তক তাহা বিলাত হইতে বহুমূল্যে বাঁধিয়া আসিয়াছে। শীতবস্ত্র তাঁহার শতছিদ্র, কিন্তু কীটের সাধ্য কি তাঁহার পুস্তক দেহে একটি ছিদ্র করে! স্পর্শশক্তি তাঁহার এত প্রবল দেখিয়াছি যে অসংখ্য অর্থক্রীত সংখ্যাতীত গ্রন্থরাজির মধ্যে যে কোন খানি গ্রন্থ আঁধারে অনুভব করিবা মাত্র বলিতে পারিতেন, ইহা অমুক বইয়ের অমুক সংস্করণ! হীনজ্যোতিঃ চক্ষুও বুঝি প্রিয়বস্তুকে দূর হইতে দেখিয়া তৃপ্ত হইত না—তাই পাঠকালে পুস্তক একেবারে প্রায় চক্ষুসংলগ্ন করিয়াই রাখিত।"

তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সাহিত্যালোচনায় একেবারে সচকিত ও সজাগ হইয়া উঠিত। সাধারণ বিষয়ে তিনি মিতভাষী ছিলেন। কাজের কথা উঠিলে তাড়াতাড়ি তিনি তাহা শেষ করিতেন। কিন্তু কাব্যালোচনা পাইলে প্রিয়নাথ একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। শ্রোতার মনে হইত, তিনি যেন বদলাইয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্বের মানুষটীর মধ্য হইতে যেন আর একটি রসসর্ব্বস্ব, হৃদয়বান আত্মা বাহির হইয়া আসিয়াছে। তখন তাঁহার উচ্ছ্বাসের আর অন্ত থাকিত না—স্থানকালপাত্রজ্ঞান থাকিত না—তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইত—হাস্য প্রবল হইত, দীর্ঘশ্বাস মর্ম্মান্তিক হইত, মৌন সুগভীর হইত। নূতন শ্রোতা সে সময়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িত। ভাবরাজ্যের—সাহিত্য-রাজ্যের কথা উঠিলে তিনি যেন বসন্তের পাখীর মত পরিপূর্ণ বাতাসের বক্ষে পক্ষ মেলিয়া দিয়া সুস্বর লহরীতে আকাশ ভুবন পূর্ণ করিয়া তুলিতেন।

প্রিয়বাবুর এই সাহিত্য সাধনার একটি মনোরম চিত্র তাঁহার কবি বন্ধু যতীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। "ফরাসী সাহিত্যের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ সাহিত্যের গল্পরচনা তাঁহার মতে রচনার আদর্শ—একথা তাঁহার মুখে যে কতবার শুনিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সাহিত্যরস পাইলে পাত্রবিচার করিতে জানিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে যদি Victor Hugoর কথা উঠিল, তবে বুঝিতে হইবে যে সেদিন তাঁহার স্নানাহার বন্ধ, সময়ের পরিমাণ রাখিবারও সময় নাই। Victor Hugo লোক কেমন, তাঁহার মনুষ্যত্ব কত বৃহৎ, দেশহিতৈষণা তাঁহার কত গভীর ও সত্য, তাঁহার গল্পরচনার মূলমন্ত্র কি, গীতিকাব্যে তাঁহার বিশেষত্ব কোথায়, Shakespeareর সহিত তাঁহার প্রভেদ কোনজাতীয়—সেই খানেই কি শেষ? তাহা হইলে ত নিস্তার ছিল। Victor Hugo হইতে Guy de Maupassant, Maupassant হইতে Theophile Gautier; কাহার কি বিশিষ্টতা, কৃতিত্ব কাহার কতখানি—অর্থাৎ শ্রোতার আর সেদিন অন্য কোন কাজকর্ম্মের আশা নাই। Balzac ও Rousseau সম্বন্ধে তাঁহার মত, তাঁহার ভাষায়:—"ঐ দেখ, কি কাণ্ড! কি অদ্ভুত ঐ Balzac লোকটা! কি ব্যাপার! কি plot কি বাঁধুনি! কি বিদ্রূপ! কি চাবুক! আর ঐ Rousseau! কি অকুতোভয় সত্যপ্রিয়তা! জায়গায় জায়গায় কি নূতন মতপ্রকাশের সাহস—মনে হয় যেন যে পাতার উপর লেখা তা জ্বলে যাবে এমনি তেজ!" তাঁহার মতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে কালিদাসের তুলনা নাই, সৌন্দর্য্য-রচনার আর এক মহাজন Keats। Gautierর রচনা কোথাও কোথাও সেই কালিদাসকে approach করিয়াছে।

মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনার আদর্শ লেখক Victor Hugo ও Guy de Maupassant। ওরূপ broad sympathy বেদব্যাস ও Shakespeare ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে Shelley, Keats ও Browning তাঁহার বিশেষ প্রিয়। Shelleyর কল্পনার সুদৃঢ়তা ও গভীরতা অনন্যসাধারণ। Shelleyর কাব্য তাহার উধাও পক্ষে পাঠককে উড়াইয়া এমনি স্থানে লইয়া যায়, যেখানে বাতাস নাই, সুধু ether সেখানে দম আটকাইয়া আসে। নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। Swinburne তাঁহার আর এক প্রিয় কবি। সমুদ্র যেমন একক, অনন্ত অসীম, সঙ্গীহারা, সৃষ্টিছাড়া, তাঁহার সিন্ধু সম্বন্ধীয় সঙ্গীতগুলিও তেমনি দ্বন্দ্ব রহিত; জার্ম্মান কবি Goethe তাঁহার মতে উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।......ইত্যাদি কত রসের কথা, কত ভাবের কথা, কত সাহিত্যের মর্ম্মের কথা পরস্পর সম্পর্ক রাখিয়া অবলীলা ক্রমে তিনি বলিয়া যাইতেন যে একসঙ্গে সেগুলি বুঝিয়া লইতে শ্রোতাকে বিব্রত হইতে হইত।......রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার যে কি ধারণা, কতখানি দরদ তাহা লিখিয়া বোঝান শক্ত। একে প্রতিভার টান—তাহাতে সৌহার্দ্দ্যের আকর্ষণ, তাই রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁহার রচনার কথা, তাঁহার ভাবের উদারতা, তাহার কল্পনার অসীমত্ব, তাঁহার ভাষার সম্পদ, তাঁহার কত কিছু বলিতে বলিতে সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর বেদী পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তেমন আন্তরিক সাহিত্যপ্রীতি—তেমন অকপট রসানুরাগ তেমন অকৃত্রিম কাব্যপ্রিয়তা জীবনে দেখি নাই—বুঝি আর দেখিবও না।"*

কাব্যের স্বরূপবিশ্লেষণে প্রিয়নাথ যে রসগ্রাহিতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। ১৩২২ সালের সাময়িক পত্রাদিতে সাহিত্যের একটি অবিসংবাদিত ও সুমীমাংসিত প্রশ্নের আলোচনা চলিয়াছিল। 'সবুজপত্রে' 'বাস্তব', 'সাহিত্যের বাস্তবতা', প্রভৃতি প্রবন্ধে "সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি?" এই পুরাতন প্রশ্নের আলোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু লেখক যোগ দিয়াছিলেন। প্রিয়নাথও এই বিষয়ে নীরব থাকিতে পারেন নাই—তিনি 'মানসী'তে প্রকাশিত 'কাব্যকথা' নামক মনোজ্ঞ নিবন্ধে কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা শুধু অনিন্দ্যনীয়, আদর্শস্থানীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালী সমালোচকদিগের সহিত ফরাসী ও ইংরেজ সমালোচকদিগের এবং জার্ম্মান কবি গ্যয়টের অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'উদ্দীপনা' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া, তিনি তাঁহার মতে, প্রাগ-রবীন্দ্র যুগের বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা—বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন,—"কাব্যের উদ্দেশ্য কি? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতিশিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে, 'হিতোপদেশ' রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য; কেননা, বোধ হয় হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতির বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

"কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য সতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য—মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধির জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা; কিন্তু নীতিনির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

প্রিয়নাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারশক্তি ও রসগ্রাহিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কলাবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যে ভ্রান্ত-মত পোষণ করেন নাই ইহা আমাদিগের বহুভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ লিখিয়াছিলেন, "...এই সৌন্দর্য্য লইয়াই কবির ধ্যান ধারণা—কবির জীবন। কোন্‌কালে

* মানসী ও মর্ম্মবাণী—মাঘ, ১৩২৩।

কোন্ কবি তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত সৌন্দর্য্যে চিরপরিতৃপ্ত! যাহা এখন চরম সৌন্দর্য্যরূপে প্রতিভাত, পরক্ষণেই অভিনব সৌন্দর্য্যের মদিরস্বপ্নে কবির হৃদয় চঞ্চল*—অনিবার্য্য ঔৎসুক্যে দোদুল্যমান—"পাইলেও নাহি পাই—মেটেনা পিয়াস।" সৌন্দর্য্যের দিগ্‌বলয়ের পরিধি নাই—সীমা নাই, তাহার অনন্ত বিকাশ কাহারও দ্বারা কখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়না।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এবং ইহার প্রভাবও অসীম। সৌন্দর্য্যের অশেষ শক্তি—সকলই করিতে পারে—পশুকে মানুষ করে—লোকশিক্ষা কোন্ ছার।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "সৌন্দর্য্যকে সংজ্ঞার মধ্যে আনা অসম্ভব, যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা অপার্থিব। মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী হইলেও ইহার দ্বারা মানুষের কোন অভাবই পূরণ হয়না—জীবনের কোন কাজেই লাগে না। হিত-বাদীদের (utilitarians) গাত্রে কালি ছিটাইবার জন্য লিখিত হইলেও, Theophile Gautier সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য, এবং আমার বিবেচনায় অভ্রান্ত সত্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত। যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না—যাহা কিছু মানুষের ব্যবহারে আসে তাহাই অসুন্দর কুৎসিত, কারণ, উহা কোন না কোন অভাবের পরিচায়ক—এবং মানুষের সকল অভাবই নীচ ও তাহার দীন দুর্ব্বল প্রকৃতিরই ন্যায় হেয়। বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান শৌচাগার। তথাপি আমরা কিছুতেই তত মুগ্ধ নহি, কিছুতেই আমরা তত তীব্র ও অসীম আনন্দ উপভোগ করিনা যেমন সৌন্দর্য্যে, ইহার মধ্যে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর একটি রহস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। Goethea কথাই সত্য। তিনি বলিয়াছেন,—"সৌন্দর্য্য নিসর্গের গূঢ় নিয়ম সকলের অভিব্যক্তি—সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে যাহারা কখনও প্রকাশ পাইত না।" ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, আমাদের জাগ্রত চেতনার অন্তরে যে অব্যক্ত চেতনা আছে, তাহা সৌন্দর্য্যের মোহময় স্পর্শে সেই সকল প্রচ্ছন্ন নিয়মের সঙ্গে অস্পষ্ট সহানুভূতি অনুভব করে এবং অনির্দ্দিষ্ট ভাবসঙ্ঘের আঘাতে চঞ্চল হয়? হৃদয় এই অবস্থায় কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পায়না বলিয়া উৎকট ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ণ উপভোগের অভাবে পরিতৃপ্তি পায়না।"

এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রিয়নাথ বলিয়াছিলেন—সেই রসসাহিত্যকে—সেই আনন্দের সৃষ্টি বিশাল দেবমন্দিরকে—সেই সৌন্দর্য্যের অসীম পীঠস্থানকে কে পাঠশালার সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে? আশা করি, কেহ নয়।"

এই ভাবেই প্রিয়নাথ স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেন এবং স্বীয় মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন।

কাব্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' জিনিসটির আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধেই তিনি লিখিয়াছিলেন,—

'রসোদ্ভাবনেই কবির মর্য্যাদা—কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা; বস্তু সমাধানে কবির কৃতকার্য্যতা থাকিতে না পারে তাহাতে আসিয়া যায় না; কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ্য অমার্জ্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহার বস্তু যৎকিঞ্চিৎ, সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করেনা; কিন্তু রসের প্রাবল্য এবং প্রাচুর্য্যে রসোদ্ভাবনের গুণে তাহারা সাহিত্য-সংস্কারে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। পদ্যকাব্যে Byron Shelley, Keats প্রভৃতি এবং গদ্যকাব্যে Victor Hugo, Dickens, Thackeray, Ruskin, বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

"Shakespeare লিখিত Tempest নাটকের ঘটনা সংস্থান-বস্তু সামান্য। পাত্রপাত্রীদের মধ্যেও কেহ বা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট—কেহ বা মানুষ অপেক্ষা নিম্ন-স্তরের, আবার কেহ বা মানুষ হইয়াও মানুষের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত; কিন্তু এই সকল উদ্ভট পাত্র পাত্রী লইয়া যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বনে মহাকবি মানবের চিত্তবৃত্তির কি অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়াছেন। নাটকের বস্তু সামান্য হইলেও একাধিক বিচিত্র রসের বিস্ময়কর উদ্বোধনে সাহিত্য জগতে Tempest এর তুল্য দ্বিতীয় নাটক নাই।

* মূল প্রবন্ধে এইখানে রচনায় একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে।

"ফরাসী কবি Coppée (কোপে) লিখিত Passant (পথিক) নামক নাট্য-কাব্যের আখ্যানবস্তু কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র নাটিকা আগাগোড়া মধুর রসে সিক্ত। একবার পাঠ করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইয়া একাধিকবার পড়িতে হয়।"

"কালিদাসের মেঘদূত রসের ভাণ্ডার—কিন্তু ইহার বস্তু কি? এবং Coleridge এর Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনারহিত, বস্তুগৌরবে নয়—রসের গুণে। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বিখ্যাত ফরাসী কবি এবং সমালোচক রমি দ' গুরমঁ, (Remy de Gourmont) বলেন—কাব্যকলায় বস্তু সম্বন্ধে আদর বা অনুরাগ শিশু বা অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাহারও নাই। ফরাসী ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিতার বস্তু কি? Odysseyর কি এবং L'education sentimentale এরই বা কি?"

প্রিয়নাথ আজ বহুদিন হইল, ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন—কিন্তু আজিও যেন বাঙ্গলার রসিক সমাজ তাঁহার প্রাণপূর্ণ সাহিত্যোপভোগের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন। যখন এই রসপিপাসু গুণী ও জ্ঞানী প্রিয়নাথ পরলোকে গমন করিলেন, তখন বাঙ্গলার বহু কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য-সহচর হারাইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, "সাহিত্যের একটা দিক্‌পাল সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে।" তাঁহাদের "বই-পাগলা চন্দর দা—ইহলোকের চিরপ্রিয় পুস্তক ফেলিয়া পরলোক-পথের পথিক হইয়া 'সেখানে কোনও জ্যোতিষ্কের আলোকে, কোনও তারার লেখা গ্রন্থের কোনও অজ্ঞাত রহস্যের অনন্ত পাথারে নিমজ্জিত হইতে গিয়াছেন'। বাঙ্গালার সাহিত্যিক মণ্ডলী এই রসজ্ঞ জনকে হারাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, তাঁহারা যাহা হারাইলেন, তাহার অভাব আর পূর্ণ হইবার নহে,—কারণ প্রিয়নাথ সেই দলের একজন ছিলেন যাঁহাদের সম্বন্ধে মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, "প্রকৃতি দ্বিতীয় আত্মার মধ্যে তাঁহার গোপন রহস্য প্রকটিত না করিয়া পৃথিবীতে কোনও মহামানবকে প্রেরণ করেন না।"

এই প্রিয়নাথ বাঙ্গালার বহু সাহিত্যিকের 'হৃদয়ং দ্বিতীয়ং' ছিলেন।

এই শ্রেণীর সহৃদয় ও রসবোদ্ধা কবির সমানধর্ম্মীদিগের কথা মনে রাখিয়াই মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছিলেন,—

'যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবসত্তাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়



৺সতীশচন্দ্র ঘটকের প্রতি

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী এম-এ

শৈশবের সাথী মোর—হে আমার প্রিয়
শোননি করুণ ডাক 'দিও সাড়া দিও'
অনন্তের যাত্রাপথে ?—বাজে নি কি ব্যথা
ছাড়িতে মোদের সভা ?—আজ তুমি কোথা ?
উৎকর্ণ উৎকণ্ঠ প্রাণ চাতকের মত
তৃষার্ত্ত তোমার আশে তাকায় সতত !
হে সুকণ্ঠ আজ তব উঠিবে না বাণী
আমাদের গৃহাঙ্গণে ?—সেই মুখখানি
চির পরিচিত ঘুরে যাবে না কি ঘরে ?
সেই নিরমল হাসি কৌতুকের ভরে
আবার দিবে না দেখা ?
হে শান্ত, হে প্রিয়
চির নিমীলিত তব নয়ন অমিয় ?
শৈশবের সাথী মোর যৌবনের সখা
বার্দ্ধক্যে ভরসা ছিলে আঁখির তারকা !
আজ ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়া আকাশ
চলিলে কোথায় তুমি—জাগে মনে ত্রাস !
কুলকষা নদীতীরে আকুল পথিক
যেই দৃঢ় তটভূমি আঁকড়ি' নির্ভীক
দাঁড়ায় বিশ্বস্ত মনে, সে পড়িলে ধ'সে
নির্ব্বাক্ বিহ্বল যথা থাকে চেয়ে ব'সে
মোদের তেমনি ভাব তোমার অভাবে।
সে সাহস সে উৎসাহ মন কোথা পাবে
প্রতি পদে তুমি যাহা দেছ অনিবার,
যোগাইতে ভারতীর পূজার সম্ভার ?

হে বাণীর বরপুত্র একাগ্র সাধক
সুরসিক এনেছিলে হাসির ঝলক
রোদন বহুল সদ্মে—পদ্মরাশি সম
বেদনার অশ্রুজলে শান্ত নিরূপম
ফুটেছিল রঙ্গ ব্যঙ্গ ; নাই কি হে আর
মুছিতে নয়ন জলে সে শক্তি তোমার ?
মেল ভাই চোখ্ মেল—একি নিদ্রাবেশ !
একি মৌন বধিরতা ! কাঁদে সারাদেশ !
হে তাপস ! হে সুযন্ত্রী ! ভাবিতে পারি না
বিকল তোমার আজি মধুতন্ত্রী বীণা।
মনে হয় এই বুঝি উঠিছে বাজিয়া
নীরবতা ভাঙো ভাই—ভেঙে যায় হিয়া !
রস শুধু যশঃ নহে তোমার সাধনা—
তা' দিয়া আবার দেশে আনো উন্মাদনা।
না না ভাই কর ভোগ অর্জ্জিত বিশ্রাম
সহিয়াছ এ জীবনে ক্লান্তি অবিরাম
আজ সে বিরতি হোক্ তার। শিরে তব
চামর ঢুলাক্ ধীরে নিত্য অভিনব
অনন্তের দেশ হ'তে সুরভি পবনে
সাগর সঙ্গীত সুর তুলুক্ শ্রবণে
চাহিয়া থাকুক মুখে বৃদ্ধ হিমালয়
ঘুমাও সে ঘুম যাহা ভাঙিবার নয়।
সাগর কপোত কেঁদে যাক্ কলরবে
'কোথা তুমি ?' 'কোথা তুমি ?'
'কোথা তুমি ?' রবে !

বিবিধ সংগ্রহ

শ্রীচিত্রগুপ্ত

নগ্নতা-বিভ্রাট

সৃষ্টির আদিকালে আদিম মানব-দম্পতী আদাম এবং ইভ্‌ যেদিন জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন সেইদিন তাঁরা প্রথম বস্ত্রের অভাবের লজ্জা বোধ ক'রেছিলেন। আর সেই থেকে বসন জিনিষটা মানুষের পক্ষে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলেই পরিগণিত হ'য়ে আস্‌ছে। মানুষ যে সভ্য, তার প্রথম এবং প্রধান নিদর্শন হচ্ছে ঐ বসনের ব্যবহার—তবুও মধ্যে মধ্যে অনেকে সহসা বসনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ বস্তুটির প্রয়োজনকে অস্বীকার করে বসনের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রধানতঃ বিভিন্ন যুগের কলা-শিল্পীরাই এ বস্তুটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও অস্বীকার করেছেন। তাছড়া অতি প্রাচীন যুগে রোমে বৎসরের মধ্যে বিশেষ একটি তারিখে সহরের প্রকাশ্য রাজপথে নরনারীর নগ্নদেহে বিশিষ্ট আচারের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করার বিবরণ দেখ্‌তে পাই। মধ্যযুগে য়ুরোপে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহে ধর্ম্মপ্রণোদিত হয়ে নরনারীর একত্রে নৃত্যাদি করার বিবরণেরও অভাব ইতিহাসে নেই কিন্তু কালে নানাকারণে এ সমস্ত ব্যবস্থার কোনটিই স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি। এবং সমাজে শারীরিক আচ্ছাদনকে পরিহার ক'রে এক পাও চলা যে অশুভফলদায়ক এ কথা বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবু এখনো এক সম্প্রদায়ের লোক মাঝে মাঝে বসনের ওপর তাঁদের দারুণ বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ছাড়েন না। সে যুদ্ধটা কেউ করেন লেখনীর সাহায্যে আর কেউ রীতিমত ব্যবহারিকভাবে। অবশ্য এঁদের সকলেই নিজেদের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রবল যুক্তি প্রদর্শন ক'রে থাকেন। গত জৈষ্ঠ সংখ্যার বিচিত্রায় আমি পাঠকদের জানিয়েছিলাম যে সম্প্রতি বিলেতে কৃত্রিম সূর্য্যালোকে স্নানকারীদের একটি সমিতি হয়েছে এই সমিতিটিতে পুরুষ ও নারী একত্রেই নগ্ন দেহে কৃত্রিম সূর্য্যালোক সেবন ক'রে আপনাপন স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান ক'রে থাকেন এবং এই সময়ে অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে ওই অবস্থাতেই বিভিন্ন ক্রীড়াদিতেও লিপ্ত হ'য়ে থাকেন। এই সমিতিটির সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সেখানকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁরা যে রীতিমত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছেন সে বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ মাত্র নেই। এবং সেইজন্যেই তাঁদের এই সমিতিটির বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন আন্দোলন উঠেছে ব'লেও জানা যায় নি।

সম্প্রতি কিন্তু অক্সফোর্ডে এই নগ্ন দেহে স্নান করা নিয়ে একটু গোলোযোগ বেধেছিলো। ওখানে Pearsons Pleasure এবং Tumbling Bay নামক দুটি স্থানে বহুদিন ধরে পুরুষ স্নানার্থীরা নগ্নগাত্রে স্নানাদি করে আস্‌ছেন। সম্প্রতি কিন্তু এই ভাবে স্নান করার বিরুদ্ধে সেখানে একটি ইস্তাহার জারী করা হয়েছে, ফলে সেখানকার স্নানার্থীদের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেখানে দুটি দলেরও উদ্ভব হয়েছে ;—বলাবাহুল্য যে এ দুটি দলের একটি নগ্নতার স্বপক্ষে এবং অপরটি বিপক্ষে। কিন্তু অনেক বিচক্ষণ লোক পর্য্যন্ত স্বীকার করছেন যে জায়গাগুলি পাহাড় দিয়ে এমন ভাবে ঘেরা যে ওগুলিকে প্রকাশ্য স্থান বলা চলেনা সুতরাং ওখানকার বহুদিন প্রচলিত প্রথাটিকে উড়িয়ে দেওয়ার সত্যিকরের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেক অভিভাবক তবুও ও-প্রথাটিকে কিছুতেই অনুমোদন করতে পারছেন না, কারণ তাঁরা এ-জিনিষটির দ্বারা আহত হচ্ছেন অন্তরের দিক দিয়েই যেহেতু তাঁদের , নিজেদের

সন্তানরা এর সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত। কিন্তু তবুও স্থানটির ওপর সহর কর্ত্তৃপক্ষের কোন হাত না থাকায় এবং ওটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভূখণ্ডের অন্তর্গত বলে, তাঁরা কোনো ব্যবস্থাই করতে পারেন না। তার ওপর আবার এদিকে নগ্নদেহে স্নানের সমর্থনকারীদের দল প্রবল থাকায় আপাততঃ ও-প্রথাটির রদ হোল না। সুতরাং স্নানার্থীরা আগেকার মতই বিনাবাধায় স্নান সমাপন করছেন।

বিলেতের নগ্নতা-প্রচারকারী সম্প্রদায় তাঁদের প্রচারকার্য্য বর্ত্তমানে খুব প্রবলভাবেই চালাচ্ছেন। এই সম্প্রদায়ের লোকদের মত হচ্ছে দেহের কোন অংশে কোনরকম কাপড়-চোপড় ব্যবহার করাটা হচ্চে বর্ব্বরতা, এবং মানুষের কল্যাণের পরিপন্থী। এঁরা বলেন ওসব কৃত্রিমতা বর্জ্জন করে সকলেরই আজ আবার সেই আদিম কালের মত প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া উচিত।

এঁদের এই মতকে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এঁরা আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে চেষ্টা ক'রে এসেচেন। এবার এঁরা এঁদের মতের বিরোধী এবং সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য লোকেদেরও বাড়ী বাড়ী পত্রের সাহায্যে রীতিমত প্রোপাগাণ্ডা করতে সুরু ক'রে দিয়েচেন।

ডাকযোগে তাঁরা বড় বড় লোকের বাড়ী তাঁদের এই মর্ম্মে নিমন্ত্রণ করে এক সার্কুলার প্রেরণ করছেন যে যদি কেউ নগ্নতার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তা'হলে তিনি ডাকযোগে চাঁদা স্বরূপ নগদ্ একগিনি পাঠিয়ে দিলেই সাক্ষাতে তাঁকে জামাকাপড় পরার অভ্যাস ত্যাগ করার যে মহৎ উপকারিতা তা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে, এবং আবেদনকারী ব্যক্তি যদি তাঁদের সমিতিতে যোগদান করেন তা' হ'লে এই টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এবং তিনি যদি যোগদানে অনিচ্ছুক হন তা হ'লেও যদি তাঁর অনিচ্ছার সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারেন তো তিনি ঐ টাকার অর্দ্ধাংশ ফেরৎ পাবেন। যে সমস্ত ভদ্রমহিলা এই বসনবর্জ্জনকারী সমিতির সম্বন্ধে আগ্রহশীলা তাঁদের সম্বন্ধে এঁদের প্রেরিত পুস্তিকায় লেখা আছে, যে মহিলাদের কোনরূপ প্রাথমিক চাঁদা দিতে হবে না এবং এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসার সময় তাঁর যদি মত না থাকে তা' হলে তাঁকে বিবস্ত্রা হ'তে হবে না।

এই উপলক্ষ্যে এই সম্প্রদায়ের একটি সমিতি বেশ জোর গলায় ঘোষণা করচেন, যে, ঘরে এবং বাইরে সর্ব্বত্র নগ্নতার প্রবর্ত্তন করা, জীবনে আনন্দের সৃষ্টি করা, এবং মানুষের মন থেকে কপট বিনয়, কৃত্রিম লজ্জাশীলতা, বৃথা ভণ্ডামি এবং মিথ্যা দম্ভবাজির আমূল উচ্ছেদ সাধন ক'রে, তার স্থলে লোকের মনে বিবস্ত্র দেহ-সৌন্দর্য্যের গৌরব-বোধকে জাগরিত করতে শিক্ষাদান করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই সমিতির প্রবর্ত্তনকারী ভদ্রলোক কোনরূপ গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি এবং তিনি খুব সাহসের সঙ্গেই তাঁর নাম এবং ঠিকানা প্রকাশিত করেছেন। এবং তিনি গত কয়েকমাস ধ'রে যে রকম প্রবল উদ্যমে তাঁর এই প্রচার-কার্য্য চালিয়ে আসচেন, তা' দেখে মনে হয়, যে, একাজে ঐভাবে তিনি যথেষ্ট আর্থিক উৎসাহও পেয়ে এসেছেন।

ভিয়েনাতে কিন্তু নগ্নতার উপাসক একদল লোক সম্প্রতি যে কাণ্ড কচ্ছে'ন সেটা পুলিশ কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না। পুলিশের অসম্মতিকে অবহেলা করে সেখানকার ৮০ জন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র নারী ও পুরুষ নগ্নতাকে পরিহার কর্ব্বার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে পেট্রিয়ার নিকটস্থ এক পর্ব্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশ সহস্র চেষ্টা করেও তাদের সেখান থেকে হঠাতে পারেনি। এই দলটি নিজেদের Innocentist বা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নিরীহ জীবের সম্প্রদায় ভুক্ত বলে অভিহিত কর্চ্চেন। এবং তারা বলছেন জগতে নগ্নতার প্রচার করাই, তাদের জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। যাইহোক পুলিশ তাঁদের উদ্দেশ্যের মহিমা বুঝতে না পেরে এবং তাদের উক্ত কাজ থেকে নিবৃত্ত করবার সর্ব্বরকম প্রচেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়ে অবশেষে একদিন গুহামুখ অবরোধ ক'রে বসলো। তার ফলে গুহাবাসী ভদ্রলোকেরা হঠাৎ দল বেঁধে গুহার অপর মুখ থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের দলকে আক্রমণ করে। পুলিশ তখন কোনরকমে তাদের নিরস্ত করতে না পেরে বাধ্য হ'য়ে গুলি চালায়। এই গুলি-

চালানোর ফলে এই দলের দুইজন নিহত চারজন আহত এবং কুড়ি জন ধৃত হয়। কিন্তু Innocentist দলের বাকী লোকগুলি এই সুযোগে আবার গিয়ে সেই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এখন আর পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই তাদের বার করতে পারছে না সুতরাং তারা ভারী মুস্কিলে প'ড়ে গেছে।

তামাক খাওয়ার অপরাধে ফাঁসী

ধূমপান করা বর্ত্তমানে দোষের নয় তো বটেই অধিকন্তু আমেরিকাতে বর্ত্তমানে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁদের পনেরো বছর বয়সের ছাত্রদের পর্য্যন্ত ক্লাসে রীতিমত নিয়ম ক'রে ধূমপান শিক্ষা দেবার কিরকম ব্যবস্থা করেছেন গত বৈশাখের বিচিত্রায় সেকথা পাঠকদের আমি বলেছি। তামাকের অদৃষ্ট কিন্তু চিরকাল তার ওপর এত প্রসন্ন ছিলো না। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় সব দেশেই কর্ত্তৃপক্ষরা সাধারণের ধূমপানের বিরোধী ছিলেন। তার প্রধান কারণ তার দ্বারা তথনকার প্রচলিত কাঠের বাড়ী গুলিতে আগুন লেগে যাবার প্রবল আশঙ্কা থাক্‌তো।

বিলেতে রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ও ধূমপানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেন। পোপেরাও তামাকের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। রাশিয়াতে তামাক খোরদের নানারকম ভীষণ শাস্তি দেওয়া হোত এমন কি যারা নস্যি নিতো তাদের নাক কেটে দেওয়া হোত।

তুর্কীস্থানের সুলতান "নিষ্ঠুর মুরাদ" সর্ব্বপ্রকারে তামাকের ব্যবহার নিষেধ ক'রে যে আইন প্রণয়ণ করেন তার ফলে ঐ আইন অমান্যকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত। এই ভাবে তার রাজত্বকালে হাজার হাজার হতভাগ্য তামাক-খোরকে এই চরম ভয়াবহ দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

পারস্যে তামাকখোরদের নিত্য একটু একটু ক'রে অত্যাচার করে তিলে তিলে তাদের প্রাণে মারা হোত। কথনো কথনো তাদের তরল সিমেণ্টের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হোত আর সেই সিমেণ্ট যথন পাথরের মত জমাট বাঁধতো তথন তার ভীষণ চাপে অপরাধীর জীবনলীলা সাঙ্গ হ'য়ে যেতো।

কিন্তু এই নেশাটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার এতো চেষ্টা সত্ত্বেও তার একনিষ্ঠ ভক্তের অভাব কোন দিনই ঘটে নি।

অবশ্য একটি কথা এখানে বলা দরকার যে সে সময় অনেকে ওষুধ হিসাবে তামাকের ব্যবহার প্রশস্ত ব'লে মত প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি কাউণ্ট কর্টি (Count Corty) তাঁর History of Smoking বইতে লিখ্‌ছেন যে ১৬৬৫ খৃঃ বিলেতে প্লেগ যখন মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিলো তখন ঈটন্ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষরা ছাত্রদের ধূমপান করতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং যারা ধূমপান করতে অস্বীকার করেছিলো তাদের কঠোর ভাবে শাস্তি দিয়ে অবশেষে ধূমপান করতে বাধ্য করেছিলেন।

তাম্রকূটের নেশা

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাম্রকূটের ধোঁয়ার বাবদ কত খরচা হয় তার হিসেব শুন্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। প্রতি বৎসর আমাদের এই ভারতবর্ষেই সিগারেট ও তামাক খাওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। তার হিসেব ভারত সরকারের বাৎসরিক হিসেবের chart-এ পাওয়া যায়। এক একজন লোক কত বেশি সিগারেট বা তামাক পাতার শ্রাদ্ধ ক'রে থাকেন, তার একটা মজার বিবরণ সেদিন একখানি বিলিতি কাগজে বেরিয়েছে। মিঃ জর্জ্জ ষ্ট্রোমেন্‌জার (Stromenger) সেদিন একটি নৈশ ক্লাবে বাজি রেখে, মিনিটে ৪০টা ক'রে সিগারেট খেয়ে সকলকে বিস্মিত ক'রেছেন—এর থেকেই অনুমান করা সহজ কতগুলি ক'রে সিগারেট খাওয়া তাঁর অভ্যাস আছে। অবশ্য সমস্ত সিগারেটগুলি নিঃশেষিত হ'য়ে যাবার পর তিনি অজ্ঞান হ'য়ে যান এবং তাঁকে সুস্থ করবার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'তে হয়। তবে এই ভদ্রলোকই এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে ১০০০ ফ্রাঙ্ক বাজি রেখে এক হাজারটি কড়া চুরুট ১০ দিনের মধ্যে নিঃশেষিত ক'রে ফেলেছিলেন।

এতো গেল বাজি রেখে খাওয়া, তাছাড়া সহজভাবে এক একজন লোক এই নেশার জন্যে কত খরচ করেন

বলছি। একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক সেদিন তাঁর খরচের খাতা দেখিয়ে বললেন যে ২৭ বছর ধ'রে তিনি সবশুদ্ধ ৬ লক্ষ ৩০ হাজার বড় সিগার খেয়েছেন এবং সেজন্যে খরচ পড়েছে ৪৫,০০০৲ টাকা। এ ছাড়া তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা যত সিগার উপহার দিয়েছেন তারও তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন বেশ ভালভাবে। সেগুলো হিসেবের বাইরে। তাঁর ব্যবহৃত সিগারের দৈর্ঘ্য নিয়ে হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে ২৭ বছরে তিনি ৪৫ মাইল ব্যাপী ঘন তামাক পাতার ধোঁয়া গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁরই দেশের আর একটি ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় একটি ডায়েরী রেখে যান। সেই ডায়েরীতে তিনি লিখে রেখে গেছেন যে আমি জীবনে সবশুদ্ধ ৫ লক্ষের কিছু ওপর সিগার খেয়েছি, সেজন্যে ১০ হাজার দিন লেগেছে। এবং জীবনে সেজন্য যা সুখানুভব ক'রেছি তা' অতুলনীয়। রমণীর সাহচর্য্য-সুখের চেয়েও তা' মধুময় এবং আমি বিশ্বাস করি যে জগতের কোন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তার সমস্ত ভালোবাসা আমার প্রতি উজাড় ক'রে দিলেও আমাকে এর চেয়ে বেশী সুখী করতে পারতো না। এই সুখটুকু উপভোগ ক'রতে গিয়ে অবশ্য আমারও হাজার পাউণ্ড খরচ হ'য়ে গিয়েছে। একজন ডাচ্ নাবিক সপ্তাহে গড়ে এক পাউণ্ড ওজনের তামাক খেতো। ৭০ বছর পর্য্যন্ত নাবিকটি সবশুদ্ধ ৪১ মণ তামাকের ধোঁয়া পান ক'রেছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ সিগারেট বা তামাক খোরদের মধ্যে Champion হ'য়েছেন 'পল্ কামিংস্কাই'—দশ মিনিটে ১০০টা সিগারেট খেয়ে তিনি একটি ক'রে সিগার ফাউ স্বরূপ খেতে পারেন। বিলেতে বর্ত্তমানে লর্ড ল্যান্সডেল্ খুব বড় তামাক খাইয়ে ব'লে পরিচিত। তা'ছাড়া পরলোকগত প্রসিদ্ধ লেখক এড্গার ওয়ালেসেরও অসম্ভব ও অবিশ্বাস্তভাবে সিগার ও সিগারেট খেতে পারার জন্যে প্রসিদ্ধি ছিলো।

তামাক খোরেদের সুবিধে

কয়েক বৎসর থেকে পাশ্চাত্যের মেয়েরা সিগারেটটা খুবই খে'তে আরম্ভ ক'রেছিলেন। সম্প্রতি তামাক ওয়ালাদের রিপোর্ট অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, আজকাল পাশ্চাত্যের মেয়েরা সিগারেটের চেয়ে পাইপে ক'রে তামাক খাওয়ার দিকেই বেশী পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। সে যাই হোক, কি পুরুষ, কি মেয়ে উভয়েরই সম্বন্ধে তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তির কারণ হচ্ছে, তামাকের মধ্যে নিকোটিন্ এবং এ্যামোনিয়া নামক দুটি বিষাক্ত পদার্থ আছে যা' আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, যদিও মানুষের শরীর অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিষ সহ্য করতে সক্ষম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু অতিরিক্ত ধূমপান যাঁরা করেন, তামাক খাওয়ার ফলে তাদের শরীরের যে ক্ষতি হবেই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তবু লোকে এ নেশার অভ্যাসটি থেকে বিরত হ'তে চান্ না। সেই জন্যে কয়েক বৎসর থেকে তামাকের মধ্যের নিকোটিন এবং এ্যামোনিয়া বাদ দিয়ে সিগারেট প্রস্তুত করার প্রচলন অনেক স্থলে হ'য়েছে।

সম্প্রতি আবার ঐ দু'টি বিষ থেকে মুক্ত,—এমন তামাকের চাষের ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে এবং চেষ্টা প্রায় ফলবতীও হ'য়ে এসেছে। সুতরাং এবার তামাক খোরদের ভারী সুবিধে। আর তাদের তামাকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বল্তে যাওয়ার মধ্যে আগেকার মত ততখানি জোর থাক্‌বে না।

ধূমপানে বিপদ

কিন্তু ধূমপানকারীদের ডেকে আর কি কিছু বল্বার নেই? তা নয়। অন্ততঃ একটা বিষয়ে এখনো তাদের সাবধান ক'রে দেওয়া চল্‌বে। সেটি এই, যে, ধূম-পানকারীদের মধ্যে যাঁদের পাইপে ধূমপান করা অভ্যেস্ আছে তারা যেন কখনো তামাকের অর্দ্ধেকটা খেয়ে বাকীটা পরে খাবার জন্যে রেখে না দেন। কারণ, সম্প্রতি বিলেতের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বহু গবেষণার পর মত প্রকাশ ক'রেচেন, যে, ঐভাবে ঠাণ্ডা-ছাই-ঢাকা ড্যাম্প্ তামাক দ্বিতীয়বার ধরিয়ে খাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কিছুদিন থেকে বিলেতের হাঁসপাতালগুলিতে এক নতুন ধরণের রোগে আক্রান্ত হ'য়ে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক রোগী সমাগত হ'তে আরম্ভ করায় ওখানকার কয়েকজন

খ্যাতনামা চিকিৎসক ঐ রোগটির নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগ্‌লেন এবং দেখলেন যে উক্ত রোগটি যাঁদেরই আক্রমণ করেছে, তাঁদের সকলেই ধূমপানকারী। তাঁদের মধ্যে উল্লিখিত চিকিৎসক ভদ্রলোকটি বহু শত রোগী পরীক্ষা করবার পর এখন বল্‌চেন, যে, শুধু ধূমপান করাই যে রোগটির কারণ, তা' নয়। শুধু ধূমপান বাস্তবিক মানুষের শরীরের ততখানি ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু অর্দ্ধদগ্ধ তামাককে নিভিয়ে রেখে পুনরায় তা' খাওয়ার ফলেই হয় রোগের উৎপত্তি। ঐ রকম অভ্যাসের ফলে হয় কি,—ধূমপান করবার সময় ধূমপানকারী ব্যক্তিদের ফুস্‌ফুসে পাইপের অর্দ্ধদগ্ধ তামাকে সঞ্চিত কার্ব্বণ মনোক্সাইড্‌ (Carbon Monoxide) নামে বিষটি প্রচুর পরিমাণে নীত হয়। এবং সেখান থেকে অতি সহজেই শরীরস্থ রক্ত-কণিকাগুলির (Blood Corpuscle) সঙ্গে মিশে যায়। ফলে রক্ত পাতলা হয়ে গিয়ে অনেকেই রক্তহীনতা রোগে ভোগেন। সুতরাং যাঁরা অর্দ্ধদগ্ধ তামাক নিভিয়ে রেখে দ্বিতীয়বার সেই তামাকের ধূমপান করতে অভ্যস্ত তাঁরা তাঁদের শরীরের দিকে চেয়ে ও-বদ্‌অভ্যাসটি বর্জ্জন করবেন।

নস্যি নেওয়া

নস্যি নেওয়ার অভ্যাসটা আবার বর্ত্তমানে যেন লোকের মধ্যে একটু বেশি করেই ফিরে আস্‌ছে বলে মনে হয়। গত পাঁচ বছর ধ'রে একমাত্র লণ্ডন সহরেই আগেকার ঠিক দ্বিগুণ ক'রে নস্যি খরচ হ'চ্ছে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যেও নস্যির খরচ আগেকার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে ব'লে জানা গেছে। হাডারস্‌ফিল্ডে নস্যি খোরদের একটা ক্লাব আছে। এমন কি হাউস অব্‌ কমন্সের প্রধান প্রবেশ পথের মুখেও একটা ঐ ধরণের ক্লাব আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে হাউস্‌ অব্‌ কমন্সের এক মেম্বার কিছু টাকা ঐ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকল্পে দান ক'রে যান। সেই অর্থেই ক্লাবটি চল্‌ছে।

যাঁরা নস্যি নেন তাঁদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে নস্যি নেওয়ার অভ্যাস রাখ্‌লে মানুষের চট্‌ ক'রে ঠাণ্ডা লাগ্‌তে বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হ'তে পারে না। এবং এক সময়ে নষ্ট দৃষ্টি-শক্তির পুনরুদ্ধার সাধন করবার পক্ষে বিশেষ উপকারী ব'লে লোকের ধারণা ছিল। এমন কি এরকম দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যেখানে লোকে বলেছে যে কেবলমাত্র নস্যি নেওয়ার ফলেই তারা অন্ধতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রেছে।

Infra-red রশ্মির নবতম ব্যবহার

বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষের যে একটা ধারণা আছে যে বেড়াল অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায় বৈজ্ঞানিকরা বলেন এ ধারণাটি বাস্তবিকপক্ষে সত্য নয়। তিনি বলেন যে তেমন তেমন অন্ধকারে নিয়ে গেলে একজন মানুষের সঙ্গে একটি বেড়ালের দৃষ্টিশক্তির কোন প্রভেদই দৃষ্ট হয় না। কারণ বেড়ালের চোখ থেকে সত্যিই কিছু আলো বেরোয় না, তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বেড়াল ইচ্ছে করলে তার চোখের তারাটিকে খুব বেশী পরিমাণে বিস্ফারিত করতে পারে এবং তার ফলে মানুষের চোখের অগোচর এমন ক্ষীণ আলোক রশ্মিকেও দেখ্‌তে পায়। হালে আবার আর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে সেটি হচ্ছে Infra-red রশ্মি। এবস্তুটিকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। সুতরাং আমাদের চোখে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের অগোচরে আজকাল কোনকিছু ফোটোগ্রাফ তোলা খুবই সহজ হয়ে উঠেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে বেড়ালের চোখে এই Infra-red রশ্মিগুলি সাড়া জাগায় এবং তার ফলে যে অন্ধকারে আমরা কিছু দেখ্‌তে পাই না তেমন অন্ধকারে তারা দেখ্‌তে পায়।

যাই হোক এরপর কয়লার খনি, সমুদ্রের তলদেশ প্রভৃতি যে সব স্থানে Infra-red রশ্মি প্রবেশ করতে পারে, সেই সব স্থানে ফোটোগ্রাফ তোলা ক্রমে খুবই সহজ হয়ে পড়্‌বে। দারুণ ঘন কুয়াসা যার মধ্যে দিয়ে সাদা আলো কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না তার মধ্যে দিয়েও এই Infra-red রশ্মিগুলি প্রবেশ করতে পারে এবং সেইজন্যে আজকাল সেইরকম কুয়াসার মধ্যে দিয়েও খুব ফোটোগ্রাফ তোলা হচ্ছে। সেইজন্যে সম্প্রতি এই রশ্মিটিকে চোর ধরবার কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একটি

অন্ধকার ঘরকে মানবচক্ষুর অগোচর এই অতিক্ষীণ Infra-red রশ্মির সাহায্যে আলোকিত করে রেখে এবং যন্ত্রের সাহায্যে আপনাআপনি ফটো তোলার ব্যবস্থা ক'রে রাত্রে ঘুমালে রাত্রে যদি ঘরের মধ্যে চোর আসে তো তার ছবি তার অগোচরেই ক্যামেরায় উঠে যাবে আর তখন সেই ফটোর সাহায্যে তাকে খুঁজে বার করা মোটেই অসম্ভব হবে না।

অন্ধের দৃষ্টিলাভ

অন্ধতার দুঃখ যে কি ভয়াবহ তা' শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন। একদিন যে-লোক এই রূপৈশ্বর্য্যময়ী ধরিত্রীর শতলক্ষ বৈচিত্র্য-সম্ভারের দিকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকাতে পেরে চক্ষুকে সার্থক মনে ক'রেছে, সেই লোকের চোখের সাম্‌নে থেকে এই পৃথিবীর আলোকিত শ্যামল শোভা চিরকালের জন্যে মুছে যাওয়ার সে বেদনাকে কল্পনায় বোধ করা চক্ষুষ্মানের পক্ষে খুব সহজ নয়। যাই হোক এতদিন লোকে দৃষ্টিহীনদের মনোবেদনার ওপর সহানুভূতির প্রলেপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি। সম্প্রতি কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে মানুষের এই মহাদুঃখের কতকটা প্রতিবিধান করবার ব্যবস্থা করছেন। আজকাল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বহু শক্ত শক্ত অন্ধতার অবসান ঘটিয়ে অনেক চিকিৎসক লোককে নতুন ক'রে দৃষ্টিশক্তি দান করচেন। এই সম্পর্কে দুটি ব্যাপারের বিবরণ দিচ্ছি।

(ক) মিস্ হেনিংসেন ব'লে একটি মহিলা তাঁর ৮ বছর বয়সের সময় সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে যান। ২৭ বছর পরে বিলেতের প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ হাসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসক ও চক্ষুরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফ্লেমিংয়ের সাহায্যে তিনি আবার তাঁর হারাণো শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তিনি ব'লছেন, এতদিন পরে জগতের এই বিরাট, বিচিত্ররূপ দেখে আমি বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে এ যেন কোন্ স্বপ্ন দিয়ে গড়া পরীর রাজ্য! অতি তুচ্ছ নোংরা জিনিষটি পর্য্যন্ত আমার কাছে যে কতভাল ঠেক্‌ছে তা' বলতে পারিনা। আলাদীনের প্রদীপ যেন সহসা কে আমার চোখের সামনে জেলে দিয়ে গেল। ৮ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অবধি দৃষ্টিশক্তিটাকে যে কি সে সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধারণাই লুপ্ত হ'য়ে গেছলো। মানুষের মুখগুলির সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতাম আজ চোখের সামনে দেখে ভাব্‌ছি যে আমার ক্ষুদ্র কল্পনার চেয়ে কতবেশী সুন্দর তাদের মুখগুলি। কি চমৎকারই না প্রত্যেককে দেখ্‌তে। পৃথিবীতে যে এত রং আছে তা কখনো ধারণা করতেই পারিনি—প্রত্যেক রংটি দেখে আমি শুধু স্রষ্টার শক্তির পরিচয় পাচ্ছি, ধরণীর ফুলগুলির সৌরভই পেয়ে এসেছি কিন্তু তারা যে বর্ণে ও বিচিত্রতায় এতখানি অপরূপ তাতো কল্পনাতেও আন্‌তে পারিনি। সত্যকথা বলতে কি আরসিতে যখন আমার নিজের মুখ, আমার নীলাভ চোখ, আমার কাঞ্চনবর্ণ চুলগুলি দেখলুম তখন নিজেকে স্বর্গের দেবকুমারীর মতই অপরূপ সুন্দরী ব'লে মনে হ'ল—এ আমার গর্ব্ব নয় এই অনুভূতি আমার সর্ব্বপ্রথম, তাই অন্তরের মণি-কোঠায় এ স্মৃতি আমার চিরকালই সঞ্চিত থাকবে। যেদিন ডাক্তার ফ্লেমিং আমার চক্ষু খুলে দিলেন সেদিন নিজের বিস্ময়ে নিজে কেঁদে উঠেছিলুম—ঠিক তখন মনে হ'য়েছিল যেন কে আমাকে মৃত্যুর অন্ধগহ্বর থেকে স্বর্গের বাতায়নে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল। মিস্ হেনিংসন এখন স্কুলে পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন এবং তিনি বলেন যে যে-শাস্ত্রের কল্যাণে আমার পুনর্জ্জীবন হ'ল তারই সাধনায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ ক'রবো। মিস্ হেনিংসন বর্ত্তমানে জনৈক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

(খ) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে একজন ৮৭ সাতাশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আজ দীর্ঘ বৎসর কাল অন্ধ থাকবার পর সম্প্রতি অন্ধতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রচেন। দারুণ রোগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হ'য়ে গেছ্‌লো। তারপর তিনি দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাল তাঁর এক কন্যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। পরে সেই কন্যার মৃত্যু হ'লে তিনি নিউ ইয়র্কের ইহুদী অন্ধদের আশ্রয়স্থলে প্রেরিত হন। তারপর মাত্র কয়েক সপ্তাহ হোল নিউ-ইয়র্কের চোখকানের হাঁসপাতালে তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার

করা হয়, এবং তার ফলে তিনি এখন অতি পরিষ্কার ভাবে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তিনি বলেন যে এখন আমি যে আনন্দ উপভোগ করছি, বিখ্যাত ধনী রক্‌ফেলার সাহেব তাঁর অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হ'য়েও বোধ হয় কোনদিন সে আনন্দ পান নি।

নক্ষত্রের সঙ্গীত

গত বৎসরের ফাল্গুনের বিচিত্রায় আমি একটি সংবাদ দিয়েছিলুম যে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে Arcturus নক্ষত্রটি থেকে যে আলো পৃথিবীর দিকে আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, সেই আলো আগামী ১৯৩৩ খৃঃ অব্দের ১লা জুন তারিখে আমেরিকার শিকাগোতে যখন বিশ্ব মেলা বস্‌বে তখন ধরাধামে এসে পৌঁছবে। তাই আগামী বিশ্ব মেলার কর্তৃপক্ষ ঐ আলোক ধ'রে তার সাহায্যে সেখানকার Hall of Science এ কলকব্জা চালাবার কল্পনা করেছেন।

অবশ্য জিনিষটির সম্বন্ধে কেবল কল্পনাই চলছে, এর সাফল্য কতখানি হয় তা দেখবার জন্যে আমাদের আরও বছরখানেক অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এই সেদিন যে ব্যাপারটি ঘ'টে গেছে, সেটিও বড় কম বিচিত্র নয়। সেটি হচ্ছে নক্ষত্রের সঙ্গীত ব্রড্‌কাষ্ট্‌ করা।

ব্যাপারটা খুলে বলি। "নক্ষত্রের সঙ্গীত" ব'লে যে একটা কথা বহুদিন ধ'রে চ'লে আস্‌চে, সেটির আধিপত্য এতকাল ছিল কেবল কাব্যের এবং কল্পনার রাজ্যে। তার মধ্যে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ সত্য যে কিছু থাক্‌তে পারে, একথা কেউই কোনদিন ভাবে নি। সেদিন কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে Venus বা শুক্রনামক গ্রহটি থেকে আগত একটি সঙ্গীত ধ্বনিকে ধ'রে চারিদিকে ব্রডকাষ্ট্‌ ক'রে জন সাধারণকে সত্যিসত্যিই নক্ষত্রের সঙ্গীত শোনানো হয়েছিলো। ঐ গ্রহের একটি আলোকরশ্মিকে Telescope—দূরবীক্ষণের সাহায্যে ধ'রে--তাতে Photoelectric cell এর মধ্যেদিয়ে চালিত করা হয়েছিলো। তারপর তার অতি মৃদু ধ্বনিটিকে মাইক্রোফোনের সম্মুখে বহুগুণে বর্দ্ধিত ক'রে তাকে ব্রডকাষ্ট করা হয়েছিলো। ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে নক্ষত্র-লোকের বিচিত্র-সঙ্গীত সুধা পরিবেষণ করা হয়েছিলো। সেই গীতধ্বনি নাকি বেহালার সুরের মতনই শুনতে লেগেছিলো।

চিত্রগুপ্ত



পুস্তক পরিচয়

ভুলের ফুল—গল্পের বই, শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীশচীনাথ ঘোষ, সান্যাল বুক ষ্টোর, ১৫ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বইখানি বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত নয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ ক'রে ভুলের ফুল, পূর্ণ-মিলন, "ইগ্নেসিয়া—৬" ও ভাগ্যচক্র আমাদের ভালো লেগেছে। এ বইখানির গল্পগুলি থেকে বিচার করলে দেখা যায় কথা সাহিত্যে ব্যবহৃত রস-নিচয়ের মধ্যে কৌতুক রসের অবতারণাতেই রামেন্দুবাবুর সমধিক অধিকার। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম গল্প 'ভুলের ফুল' এ-কথার প্রমাণ। গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠক-চিত্ত কৌতুকের সুমিষ্ট তরল ধারায় সিক্ত হ'তে থাকে—গল্পের শেষে ওষ্ঠাধরে পরিতৃপ্তির একটা মৃদু-হাসি ফুটে ওঠে। রামেন্দু বাবুর ভাষাও কৌতুক-রস সঞ্চারের উপযোগী,—স্বচ্ছ গতিশীল,—যে বস্তুকে বহন করে সুষ্ঠুভাবেই বহন করে।

জটিল মনস্তত্ত্বাকীর্ণ গল্প সাহিত্যের অভিজাত পংক্তিতে স্থান ধারণ করে বটে, কিন্তু যে পদার্থ দুঃখবেদনাময় জীবন-যাপনের মধ্যেও পাঠকের তিমিরাচ্ছন্ন মনে আনন্দের একটি দীপ্ত শিখা জ্বেলে দেয় সেই কৌতুক-রসও সাহিত্য সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। সুতরাং কথা সাহিত্যে কৌতুক রসের অনুশীলন করলে রামেন্দু বাবু বাংলা সাহিত্যের প্রতি সদাচারই করবেন।

আলোচ্য বইখানির ভূমিকায় রামেন্দুবাবু অতি-আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে যে কথা তুলেছেন সে বিষয়ে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। 'পাপকে প্রশ্রয় দিবার জন্য অথবা সে পথে প্রলুব্ধ করিবার জন্য' সাহিত্য সৃষ্টি করলেই যেমন সাহিত্য হয় না, সাহিত্য-সাধনাকে 'সযত্নে', 'দুঃখ-দুর্দ্দশাময় জীবনের ধূলি-ক্লেদ হইতে' বাঁচিয়ে চললেও সাহিত্য হয় না। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় নৈতিক উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে ত' তাকে সরস শাঁসের মধ্যে শক্ত বীজের মত দৃষ্টির অন্তরালে ঢেকে রাখ্‌তে হবে, নইলে উদ্দেশ্যের প্রকট বীজটিকে দেখে রসিক ব্যক্তি শাঁসের দিকে কিছুতেই ভিড়তে চাইবে না, তা সে উদ্দেশ্য যতই সাধু অথবা যতই অসাধু হোক। Art for art's sake কথাটির অর্থ আর্টের মধ্যে আর্টেরই উদ্দেশ্যটি ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, অন্য কিছু নয়,—আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টিটি কি বস্তু তা সাহিত্যরসিক ব্যক্তি সহজেই নির্ণয় করেন।

বইখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

* *

দরবেশের দোয়া—শ্রীযুক্ত এম্ ওয়াজেদ আলী বি-এ (ক্যান্টাব), বার-এট্-ল প্রণীত। ৫২ নং লোয়ার সার্কুলার রোড্ কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

মুসলমান ধর্ম্মের পৌরাণিক কথা ও কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় বড়ই অল্প এবং সেটা বিশেষ দুঃখের কথা। এই সব কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়েই প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তরের সত্যকারের রূপটি সহজ এবং সরল হয়ে ওঠে আমাদের মনে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের মন আপনা হতেই আকৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, আজকের দিনে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের সত্যিকারের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যথার্থ আত্মীয়তা স্থাপনের দিন এসেছে। এবং এই জন্যই মুসলমান ধর্ম্মের অন্তরের রূপটির সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত ওয়াজেদ আলীর বইখানির এই দিক্ দিয়ে একটা সত্যিকারের মূল্য আছে। সহজ এবং মনোরম ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশগুলি গল্পাকারে শ্রীযুত ওয়াজেদ আলী আমাদের মনের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য সেগুলিকে নিজের মনের মধ্যে তুলে নেওয়া। পাঁচটি বড় বড় গল্পে বইখানি শেষ হয়েছে। এবং প্রথম

গল্পটি আরবী পুরাণের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। শেষ গল্পটি "প্রেমের মোসাফের" Washington Irving-এর The Alhambraর একটি গল্পের মর্ম্মানুবাদ্। উঁচুদরের মুসলমানী রূপকথা। পড়তে পড়তে কল্পনার ভাবাবেশে প্রাণ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়।

এই বইখানি লিখে শ্রীযুত ওয়াজেদ আলী হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ গুপ্ত

* *

মনের কথা—শ্রীসরসীলাল সরকার প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

এই বইখানি পড়িয়া একটি অনাবিষ্কৃত রহস্যলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রত্যেক গোচরীভূত কার্য্যের অন্তরালেই স্পষ্ট একটা কারণ বর্ত্তমান—এই স্থূল কথাটা আমরা ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের মনোরাজ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অজ্ঞাতসারে কত যে লীলা চলিয়াছে তাহা আমরা আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করিতে পারি না। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত তুচ্ছ কাজ ও আচরণকে আমরা সাধারণত বিনা কারণেই সংঘটিত হইল বলিয়া নির্ণয় করি তাহার অন্তরালেও যে অনেক দুর্নিরীক্ষ্য ও সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রুদ্ধ ইচ্ছার অনুপ্রেরণা আছে—এই বইয়ে তাহার প্রমাণবহুল পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দবোধ হইল। বস্তুত মনোব্যাপার বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চময়। আমাদের দৈনন্দিন ঘটনায় যাহা আমরা ভ্রম-প্রমাদ বলিয়া উড়াইয়া দেই তাহারও যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, ক্ষুদ্রতম ভ্রূকুটিটিও যে অকারণে ঘটিতেছে না—ইহার প্রমাণ-সাপেক্ষ আলোচনায় বইটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। যে-স্বপ্নকে আমরা নিতান্তই স্বপ্ন বলিয়া অবহেলা করি তাহার মধ্যেও কোনো না কোনো ছদ্মবেশে আমাদের রুদ্ধ ইচ্ছার প্রভাব পড়ে। কর্ম্মজগতের গভীর অন্তরালে এই সব ইচ্ছার বহু বিকৃত আত্মপ্রকাশের চেষ্টার কাহিনীর কথা শুনিয়া আমরা এক অভিনব রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হই।

বইটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। দৃষ্টান্তগুলি মনোজ্ঞ—এবং পাঠক মনোব্যাকরণের সাহায্যে নিজেরই জীবন হইতে এইরূপ বহু ঘটনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মোট কথা, বইখানি প্রত্যেক পাঠককেই অল্প বিস্তর তত্ত্বসন্ধিৎসু করিয়া তুলিবে। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি না হইলেও মনোজগতের রহস্য-সমাধানের প্রতি এমন একটি নির্ভুল ইঙ্গিত আছে যে পাঠকমাত্রেই আপনার অগোচর ও নেপথ্যস্থিত দ্বিতীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইবেন। বক্তব্য বিষয়টি নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অনুরাগ—শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত; প্রকাশক রাখালবন্ধু নিয়োগী—১৯২।এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি সমন্বিত কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। শোকের বিষাদ ছায়া কবিতাগুলিতে একটি মন্থরতা আনিয়াছে, কিন্তু অনুরাগের নিবিড়তায় কবিতাগুলি মর্ম্ম-স্পর্শী হইতে পারে নাই। সবল অনুভূতির যতখানি তীব্রতা থাকিলে নিদারুণ দুঃখও গভীর আনন্দরূপে কবিতায় রূপান্তরিত হয়, এই কবিতাগুলিতে সেই জাতীয় বেদনানুভূতির আভাস পাইলাম না। তাহা ছাড়া অন্য শ্রেণীর কবিতার অনধিকার-প্রবেশের দৌরাত্ম্যে এই গ্রন্থটির মূল সুর ব্যাহত হইয়াছে। সুর-সমতায় যে-ভাবটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত তাহা বহু বিচিত্র কোলাহলে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। অনুকূল ভাব-পরম্পরায় বিচ্ছেদ-ব্যথাটি প্রকাশ নিবিড় হইয়া উঠে নাই। তবু বিশেষ একটি ব্যক্তির প্রতি নারীর এই স্পষ্ট ও সমুচ্ছ্বসিত অনুরাগের মধ্যে একটি সবল মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল। বইটিতে অনেক ছন্দ-বিচ্যুতি চোখে পড়িল, মুদ্রাকর প্রমাদের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

নানা কথা

দেশের কাজ ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর গত দু'বছরের বার্ষিক বিবরণী আমাদের হস্তগত হোলো। তার মধ্যে বিশ্বভারতীর কার্য্যাবলীর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে তার পুনরাবৃত্তির এখানে স্থানও নেই, প্রয়োজনও দেখি না; কারণ বিবরণীর এক একখানির দাম মোটে দু' আনা, অথচ তার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রায় এক শো পৃষ্ঠা ধরে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করা আছে,—বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ, জীবন-সমস্যার প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপারে তার প্রয়োগের ব্যবস্থা ও প্রণালী, বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের সময়ে কোন্ দিকে কতখানি আয়োজন করা সম্ভব হ'য়েছে,—ইত্যাদি। আমাদের এই নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের দেশে অচলায়তন জনমনকে চালনা করতে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন হয় তা' সহজেই অনুমেয়;—বিশ্বভারতীর বিবরণী পাঠ করলে আশা হয়,—যে তার আচার্য্য-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে এই শক্তির বীজ বপন করতে সমর্থ হ'য়েছেন। অদম্য উৎসাহে শ্রীনিকেতনে মানুষের বাহ্যিক ও আন্তরিক সকল রকম রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন দেখ্‌তে পাই। পল্লীসংস্কারের সকল দিকেই প্রভূত প্রচেষ্টা চলছে,—পল্লীবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ, চরকা ও খদ্দর প্রচার, বস্ত্রবয়ন, নানারকম কুটির-শিল্প ও পল্লী-ব্যবসা প্রভৃতির সাহায্যে পল্লী-বাসীদের আর্থিক উন্নতি-বিধান এবং মোটের উপর সর্ব্ববিষয়ে পল্লীজীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলার কোনো দিকেই কোনো চেষ্টার অভাব নেই। শান্তি-নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় তো ভারতবর্ষের গৌরব। আজ পর্য্যন্ত সেখানে যে-সমস্ত মৌলিক গবেষণা করা হ'য়েছে,—তার বিস্তারিত তালিকা বিবরণীতে আছে।

আমাদের মনে হয় দেশের উন্নতির জন্য আজকাল যাঁরা চিন্তা করছেন ও কাজ করছেন,—তাঁদের সমস্ত উদ্যম শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন ও বক্তৃতাতে ব্যয়িত না হ'য়ে, বিশ্বভারতীর এই উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। সত্যসত্যই যাঁরা দেশের কাজ করতে চান, বিশ্বভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তা'দের পক্ষে কতখানি সুবিধাজনক,—দেশের কর্ম্মীদের সে-কথা ভেবে দেখ্‌বার সময় হ'য়েছে। সমস্ত দেশের উদ্যম বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে মিলিত হ'লে দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চেহারা একেবারে বদ্‌লে দেওয়া যায়,—এমন আশা করা মোটেই বাতুলতা নয়, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সাম্‌নে রেখে। দেশের জন্যে কারাবরণের উপর প্রিমিয়মটা অতিরিক্ত মাত্রায় দেওয়া হ'চ্চে; যাঁরা জেলে যাচ্চেন তাঁরা ভেবে দেখ্‌ছেন না, জেলে গিয়ে শক্তির অপচয়ই হয়; বিস্তীর্ণ কাজের ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে কারাগৃহের বাইরে, অথচ সেখানে কোনো অর্ডিন্যান্সের বাধা নেই। অর্ডিন্যান্সের দ্বারা দেশ-শাসনের অগৌরবটা শুধুই শাসন-কর্ত্তাদের উপর ফেলে দিলে চল্‌বে কেন? তার সমস্ত লজ্জাটাই কি আমাদের নিজেদের নয়? যে-দেশের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে,—সে-দেশের উপর অর্ডিন্যান্স-জারি কখনো সম্ভব? যতদিন না ভিতর থেকে দেশের শক্তির উদ্বোধন হ'চ্চে, ততদিন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই চল্‌বে না, কয়েক সহস্র নির্ভীক কষ্ট-সহিষ্ণু লোকের কারাবাসের মধ্যে যে প্রতিবাদ,—সমস্ত দেশের তরফ থেকে বিচার করলে তা দুর্ব্বলের ক্ষীণ প্রতিবাদের মতই শোনাবে, কার্য্যকরী হ'বে না। দূরদর্শী সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগেই বুঝেছিলেন যে ভিতর থেকে দেশের শক্তির উদ্বোধনেই দেশের মুক্তি, অন্য কোনো পন্থা নেই; এই শক্তির বিকাশ যতদিন না হ'চ্চে ততদিন সকল রকম রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই বৃথা, তাই তখনকার রাষ্ট্রীয় নেতারা যে পথে যেতে চেয়েছিলেন, সে-পথে তিনি যেতে পারলেন না, "আনন্দময় অগাধ অগৌরবে মগ্ন" হ'য়ে পিছিয়ে পড়লেন। এই 'অগৌরবে'র বোঝা

চিরকাল বহন করে তিনি নীরবে নিভৃতে তপস্যা করেছেন,—যা' কিছু চিন্তা করেছেন, অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, বিশ্বভারতীর মধ্যে তাকে মূর্ত্তিদান করেছেন। তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথ যদি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকে দেশ-নেতারা অনুসরণ করতেন, তবে গত পঁচিশ বছরের ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হ'তে পারত। আজও যদি সমস্ত দেশের মিলিত শক্তি বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে দেশের অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে কিছু আলো দেখা যায়; নইলে আন্দোলনের দোলায় সহযোগ থেকে অসহযোগে এবং অসহযোগ থেকে সহযোগে দোল খেতে খেতে দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারণা করা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় মনীষি মহাপুরুষের জন্ম জগতে কচিৎ কখনো ঘটে,—তাঁকে পেয়েও যদি আজ ভারতবর্ষ মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে না পারে,—তবে ভারতবর্ষের দাসত্বের যুগ আরো কত শতাব্দী প্রলম্বিত হ'বে কে জানে? এত বড় মনীষিরা জনপ্রিয়তার লোভে আপনার পথ থেকে কখনো একতিলও বিচলিত হন না, তাই বোধ করি জনপ্রিয়তা তাঁদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। যীশুখৃষ্টকে তাঁর সমসাময়িকেরা বোঝে নি, লাঞ্ছিত করেছিল; রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বুঝ্‌ল না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে অবশ্য সেজন্য কিছু এসে যায় না, এর বেদনা বহন করার শক্তি তাঁর মহত্বের মধ্যেই নিহিত আছে নইলে "আনন্দময় অগাধ অগৌরবের" ভিত্তির উপর আজ বিশ্বভারতীর মত এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌ত না। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে খৃষ্টকে বোঝ্‌বার পরেও আজ বিংশ শতাব্দীর খৃষ্টান জগতের যে-অবস্থা, রবীন্দ্রনাথকে বোঝ্‌বার পরেও আমাদের মুক্তির সাধনার সেই রকম পরিণতি হ'বে না কি?

৺সতীশচন্দ্র ঘটক

গত ২রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরলোক-গমন করেছেন। তিনি সন ১২৯২, ২২শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর হয়েছিল।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু তাঁর মত সহায় ও সুহৃদকে হারিয়ে বিচিত্রার কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল তা হয়ত' অনেকেই জানেন না। ইদানীং শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে তাঁর লেখা দিয়ে বিচিত্রাকে তিনি সাহায্য করতে পারতেন না, কিন্তু বিচিত্রার আদি যুগে, বিচিত্রার অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে এত বড় একখানি মাসিকপত্র দাঁড় করাবার উদ্যম, পরিশ্রম এবং



৺সতীশচন্দ্র ঘটক

অধ্যবসায়ে তিনি যেরূপ আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন তা স্মরণ ক'রে তাঁর বিচ্ছেদে আমাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। শুধু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের কথাই নয়, বিচিত্রার প্রতি অনুরাগ বশতঃ তা' ত' তিনি মনের আনন্দেই করতেন, কিন্তু বিচিত্রাকে দুঃখ এবং গ্লানির হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে যে নির্ম্মম লাঞ্ছনা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল তা স্মরণ করে আমাদের হৃদয় আজ কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল। বিচিত্রা তার একজন অকৃত্রিম অনুরাগী বন্ধুর বিয়োগে শ্রদ্ধার তর্পণ করে' বলছে, বন্ধু তুমি

তৃপ্ত হও, তোমার দেহ-বিমুক্ত আত্মা তৃপ্তিলাভ করুক, যেখানে যে অবস্থায় থাক সুখে থাক।

সতীশচন্দ্রের শোক আমাদের পক্ষে ব্যক্তিগত শোক, সুতরাং সাধারণভাবে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির আলোচনা করবার সময় আমাদের এখন নয়। কিন্তু একথা এখানে বলা অসঙ্গত হবে না যে, সাধারণের নিকট হ'তে যে পরিমাণ সমাদর তাঁর পাবার কথা ছিল তাঁর জীবদ্দশায় তা তিনি পান নি।—অথচ এ কথাও সত্য যে, সাক্ষাতভাবে তাঁর প্রতিভা এবং সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল তাঁদের সতীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা সুগভীর ছিল। এর প্রধান কারণ বোধ হয় ছিল সাহিত্য-সাধনায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সাধারণ পাঠকের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য নিজের আদর্শকে বিস্মৃত হয়ে তিনি কখনো সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি। তার পর আত্ম-প্রচারের জন্য যে-সকল উপায় প্রচলিত আছে সেগুলির খোঁজ খবর তিনি রাখতেন না। তিনি ছিলেন সাহিত্যের নীরব সাধক, নিজ গৃহের নির্জ্জন কোণে ব'সে সাহিত্য-সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন, যার সন্ধান দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কেউ সহজে পেত না।

সতীশচন্দ্র যে তাঁর জীবদ্দশায় উপযুক্ত সমাদর পাননি তার বহুবিধ প্রমাণের মধ্যে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'গাছ' শীর্ষক রচনার কথা বললেই যথেষ্ট হবে। বহুকাল ধ'রে মাসে মাসে প্রকাশিত উদ্ভিদ সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটিকে উদ্ভিদের কাব্যকথাও বলা যেতে পারে—এমনই সরস ভাবে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক তথ্য এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েচে। সতীশচন্দ্রের ঐকান্তিক বাসনা ছিল বহু চিত্রে চিত্রিত ক'রে এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে তা হয়ে উঠল না। হ'লে অসার কথা-সাহিত্যে স্ফীত বঙ্গভাষার একটি রত্ন-সঞ্চয় হোত। কিন্তু পাঠক নেই, সুতরাং প্রকাশকও নেই। এমনি ভাবে তাঁর রচিত চারখানি নাটক—ইরাণের ফুল, সাবিত্রী, মুষ্টিযোগ ও রাবণ —এখনো অপ্রকাশিত রয়েচে। সহৃদয় প্রকাশকেরা তৎপর হবেন না কি?

সাহিত্যের বাজারে সতীশচন্দ্রের বইগুলির সবেমাত্র টান ধরেছিল, ঠিক সেই সময়েই তিনি চ'লে গেলেন। পূর্ণ থিয়েটারে তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি নাটিকার অভিনয় হয়েছিল, মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। সম্প্রতি ম্যাডান সিনেমা কোম্পানী সতীশবাবুর শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তর দপ্তরের একটি ছায়া-নাট্য লিখিয়ে নিয়েচেন। কমলাকান্ত নামে সে নাটিকাটি সিনেমায় যখন অভিনীত হবে তখন কমলাকান্তের দপ্তর থেকে কি রকম উপাদেয় নাটিকা রচিত হ'তে পারে তা দেখে সকলে সতীশচন্দ্রের ক্ষমতায় বিস্মিত হবেন।

সতীশচন্দ্রের ছিল বহুমুখী প্রতিভা, আর সে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল গতির দ্রুততা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, রস রচনা, কৌতুক রচনা—সমস্ত বিষয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁর অধিকার উচ্চদরের ছিল। এমন একটি দীপ্ত প্রতিভার অকাল-বিলয়ে আমরা গভীরভাবে সন্তপ্ত।

সতীশচন্দ্রের শোকাকুল আত্মীয়বর্গকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

বড়ই দুঃখের বিষয় বাঙলা দেশে ঠিক যে-সময় স্বর্ণকুমারীকে সম্মান করার আয়োজন চলছিল, ঠিক সেই সময় দেশবাসীকে বঞ্চিত করে তিনি পরলোকে চলে গেলেন। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে বাঙলাদেশের নারী-সমাজের যে ক্ষতি হ'ল তার পরিমাপ করা কঠিন। তাঁর লেখায় ও কর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই তিনি বাঙালীর মেয়েদের প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন, মেয়েদের সকল রকম প্রচেষ্টাতেই তিনি ছিলেন অগ্রণী। মেয়েদের কথা ছেড়ে দিয়েও সাধারণ দিক থেকে বাঙলা দেশ ও সাহিত্য তাঁর নিকট প্রভূত ভাবে ঋণী; তাঁর নিজের সাহিত্যের ত কথাই নাই, তাঁর সুদক্ষ সম্পাদনায় 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা অনেক দিন ধরে বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল।

স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী,—একথা সকলেরই জানা আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কন্যাদের মধ্যে এখন রইলেন শুধু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আর একটি জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বর্ণকুমারী। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলতম রত্ন,—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,



স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী প্রভৃতিকেও দেশের লোক চিরকাল মনে রাখ্‌বে। আগামীবারে আমরা স্বর্ণকুমারীর জীবনকথা সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করব। তাঁর আত্মার শান্তি হো'ক, কল্যাণ হো'ক।

"শ্রী", "শ্রীমতী" ও "শ্রীযুক্ত"

পাঠকপাঠিকাগণ লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দু'টি লেখায় তাঁর নামের পূর্ব্বে "শ্রী" অথবা "শ্রীযুক্ত" পদ যোগ করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছেন, ভবিষ্যতে তাঁর কোনো লেখায় তাঁর নামের পূর্ব্বে

"শ্রী" পদটি থাকবে না। অপরে যখন তাঁকে লিখবেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখ্‌বেন, কিন্তু তিনি নিজের লেখায় বা বই-এ নিজের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহার করবেন না।

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এ বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত এবং ভবিষ্যতে সকল বাঙালীরই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যুক্তিটা এইরূপ,—সহৃদয়তা এবং সৌজন্য প্রকাশ করবার জন্য অপরে আমার নামের পূর্ব্বে শুধু "শ্রী" অথবা "শ্রীযুক্ত" কেন, অনেক কিছুই যোগ করতে পারেন কিন্তু তাই ব'লে আমি নিজে করি কেন? আমার অভিভাবকেরা যদি আমার নামকরণ "রসিকলাল" করে থাকেন এবং আমার বংশ-পদবী যদি "বসু" হয় তাহ'লে আমার পুরো নাম "রসিকলাল বসু",—সুতরাং মুখে উল্লেখ করবার সময়ে কিম্বা ভাষায় লেখবার সময়ে আমি নিজে মাত্র "রসিকলাল বসু"ই ব্যবহার করব, অপরে "রসিকলাল বসু"র পূর্ব্বে "শ্রীযুক্ত" অথবা "সৌন্দর্য্যযুক্ত" যা-ই যোগ করুন না কেন। নিজের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" যোগ করলে যে-টুকু আত্ম-প্রীতি প্রকাশ পায় সূক্ষ্ম রুচিবোধে তা একটু বাধে।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও, আমাদের মনে হয়, মেয়েরা যদি নিজ নামগুলি কোনো পদ দিয়ে ভারাক্রান্ত না ক'রে মাত্র নামটি ব্যবহার করেন এবং "শ্রীমতী" পদটি অপরের ব্যবহারের জন্য বর্জ্জন করেন তা হ'লে মোটের উপর ভালই হয়। শ্রীরসিকলাল বসুর স্ত্রী নিজ নাম ব্যবহার করবার সময়ে "নিভাননী দেবী" অথবা "নিভাননী বসু" (বসু-জায়া নয়) ব্যবহার করতে পারেন, অপরে তাঁকে "শ্রীমতী নিভাননী দেবী" ব'লে উল্লেখ করবেন। শ্রীমতী শব্দটা ব্যবহার ক'রে ক'রে সহ্য হয়ে গেছে ব'লে মেয়েদের নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করতে বাধে না, নচেৎ বাধা উচিত। "শ্রী"র মত "হ্রী" জিনিষটাও মন্দ নয়, কারণ লজ্জা নারীর ভূষণ; কিন্তু তাই ব'লে কোনো-একটি মেয়েও তাঁর নামের পূর্ব্বে "হ্রীমতী" শব্দ যোগ করতে স্বীকৃত হবেন ব'লে মনে হয় না।

সুতরাং এই বিবেচনার ফলে দাঁড়াচ্ছে যে, পুরুষেরা এবং মেয়েরা নিজেদের নাম বাহুল্য পদ বর্জ্জিত ক'রে ব্যবহার করবেন এবং অপরে ব্যবহার করবার সময়ে পুরুষদের এবং মেয়েদের নামের পূর্ব্বে যথাক্রমে "শ্রী" এবং "শ্রীমতী" পদ ব্যবহার করবেন। ভবিষ্যতে বিচিত্রায় লেখক-লেখিকা প্রভৃতির নামোল্লেখের সময়ে এই নিয়ম আমরা অনুসরণ করব। এ বিষয়ে কারো আপত্তি থাক্‌লে তাঁর নামের বিষয়ে তাঁর নির্দ্দেশই পালন করা হবে।

এ সম্পর্কে এই কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে, বিচিত্রায় প্রবন্ধের শিরোদেশে লেখকের যে নাম থাকে তা আমাদের উল্লেখ, সুতরাং সে নামের পূর্ব্বে "শ্রী" অথবা "শ্রীমতী" পদ থাক্‌বে; এবং প্রবন্ধের শেষে যে নাম থাকে তা লেখকের আত্ম-পরিচয়, সেজন্য তার পূর্ব্বে সে রকম কোনো পদ থাক্‌বে না।

সম্মিলনী

গত ২৭শে জুন, সোমবার, ২৬এ মদন মিত্র লেনে এই সমিতির দশম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভ্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষীরোদপ্রসাদের "রঘুবীর" অভিনীত হয়েছিল। আমরা অভিনয় দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। স্বহস্তে প্রাচ্য-কলানুমোদিত রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ ক'রে এবং বেশভূষা ও অঙ্গসজ্জাদি স্বহস্তে সম্পন্ন ক'রে সভ্যগণ যথার্থ রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় কালে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এ বিষয়ে সভ্যগণের সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান দেখে আন্তরিক সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীকালীপদ সরকার নাম-ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় ক'রেছিলেন। স্ত্রী-ভূমিকাগুলির অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। শ্রীমান রাজীবচন্দ্র ও বিশ্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('বুণ্টু ও পণ্টু')—বয়স অনুমান ৯।১০ বৎসর—ভীল সর্দ্দার ও গায়কের অংশে অভিনয়-চাতুর্য্য ও সঙ্গীতালাপের অদ্ভুত নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ ক'রেছিলেন। চাষার ভূমিকায় শ্রীকালীসাধন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় চমৎকার স্বাভাবিক হয়েছিল।

উপস্থিত সম্মিলনীতে পাঁচটি বিভাগ বর্ত্তমান আছে, যথা,—সঙ্গীত বিভাগ, নাট্য বিভাগ, ক্রীড়া ও ব্যায়াম বিভাগ,

সাহিত্য বিভাগ, চিত্র ও ফটোগ্রাফী বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। ক্রীড়া কৌতুকের সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকে যুক্ত ক'রে সম্মিলনীর পরিচালকগণ এই সমিতিটিকে সত্যই একটি সদনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

একটি জিনিষ লক্ষ্য ক'রে সেদিন আমরা সুখী হয়েছিলাম,—এই সমিতির সঙ্গে কয়েকটি মাড়বারী ভদ্রলোকের নিবিড় যোগ আছে। রায় বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চোপড়া, শ্রীযুক্ত কে, এস, নাহার প্রভৃতি সম্মিলনীর পৃষ্ঠপোষক; বাবু লছমীপৎ সিং কোঠারি অন্যতম পরিচালক; বাবু খড়্গা সিং কোঠারী সম্পাদক; তা ছাড়া সভ্যগণের মধ্যেও কয়েকজন মাড়বারী আছেন। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য হচ্চে ব্যবধানের পর ব্যবধান তার পরেও ব্যবধান। কোনো জায়গায় তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লে মনে আনন্দ হয়।

শনিবারের চিঠি

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস শনিবারের চিঠিতে যে অসঙ্গত এবং অশিষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হয় তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা একটি চিঠি পেয়েছি। 'প্রয়োজন মনে হ'লে' চিঠিখানি বিচিত্রায় প্রকাশ করবার জন্যে চিঠির শেষাংশে অনুরোধ আছে।

সমস্ত জিনিষটা ঠিক এইখানেই মীমাংসার অপেক্ষা করছে,—প্রয়োজন আছে কি-না। এ পর্য্যন্ত অনেকেরই মতে, প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেন, শনিবারের উক্তি প্রতিবাদের সম্মান পাবার যোগ্য নয়, তার প্রতি একমাত্র আচরণ ষোল-আনা উপেক্ষা। আমাদের মতও বহুদিন পর্য্যন্ত সেই রকমই ছিল, কিন্তু এখন আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা উচিৎ নয়। তাতে ক'রে শনিবারের চিঠির কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা হ'তে পারে যে, তাঁদের উৎপন্ন বস্তু দেশের লোক আদরের সঙ্গে গ্রহণ করচে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার দুঃসাহস কোনো সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষের নেই। এই শূন্যগর্ভ দম্ভ হ'তে শনিবারের চিঠি যত শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল—কারণ এ রিপু কখনো তাঁদের মঙ্গল করবে না, যে-পথে টেনে নিয়ে যাবে সে পথে মঙ্গল নেই। সে যা হোক, এ সব কথা প্রয়োজন হ'লে পরে বলা চল্‌বে, আপাততঃ আমরা উল্লিখিত চিঠিখানি নিম্নে প্রকাশ করলাম।

11. 7. 32.
২৪ নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা।

বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

'শনিবারের চিঠি' আমি কোনও দিন পড়িনে, দৈবাৎ সেদিন একখানা হাতে এসে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'পারস্য যাত্রা'র (প্রবাসী, আষাঢ়) এক জায়গায় ভোর বেলাকার অস্পষ্ট অন্ধকারকে "প্রদোষের অস্পষ্টতা" বলেছেন, এবং তাই নিয়ে কবির অজ্ঞতাকে (!) উপলক্ষ্য করে 'শনিবারের চিঠি'র দল একচোট খুব হেসে নিয়েছেন। প্রদোষ শব্দের সটীক ব্যাখ্যা ও তুলে দিতে ভোলেন নি।

কিন্তু একথা তাঁরা জানেন না, যে প্রদোষ শব্দের আর একটা মানে হচ্ছে 'রাত্রি', এবং এ অর্থ খুঁজে পেতে তাঁরা যদি 'বাচস্পত্যাভিধান' জোগাড় করে না উঠ্‌তে পারেন তো ছোটখাট একখানা 'শব্দসার' হলেও চলে যেতে পারে। এত অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে সমালোচনা করা,—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা—যে কত বিপজ্জনক কাজ, এ ধারণাও বোধ হয় তাঁদের নেই।

কিন্তু এ তো গেল তর্কের দিকের কথা,—সংস্কৃত অর্থ নিয়ে। কিন্তু এছাড়া প্রচলিত বাংলাতে প্রদোষ শব্দে ইংরাজী twilightএর force কতকটা নেই কি? সেই হিসাবে ভোরবেলাকেও স্থান বিশেষে প্রদোষ বলা যায় না কি? আর রবীন্দ্রনাথ যদি সেই অর্থে প্রদোষ শব্দ ব্যবহার

করে থাকেন, তো আমরা কি নতশিরে সে কথা মেনে নেবো না?

এই নিয়ে তাঁরা আবার রবীন্দ্রনাথকে একটু retort করেছেন—ঋষি বলে। কেন, রবীন্দ্রনাথ কি যে-কোন ঋষির চেয়ে কম নাকি? বরঞ্চ শুধু ঋষি বললেই তো তাঁকে খাট করা হয়। আমি তো মনে করি সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁরা আর্ষ প্রয়োগ করে গেছেন, এমন যে-কোন ঋষি রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বস্‌বার সৌভাগ্য লাভ করলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে, তাঁর সঙ্গে এক দেশে একযুগে জন্মাবার সম্মান লাভ করে, তাঁকেই যদি আমরা অশ্রদ্ধা করি, তো আমাদের হাসাহাসি নয়, দলবেঁধে মাথা চাপ্‌ড়ে কাঁদতে বসবার সময় হ'য়েছে বুঝ্‌তে হবে।

তাঁকেই কটূক্তি, ছিঃ।

বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ বই কাটে, এবং বোধ হয় ভালই কাটে।

ইতি—

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

পুঃ—প্রয়োজন মনে হলে চিঠি-খানি বিচিত্রায় প্রকাশ করতে পারেন, ইতি।





দোললীলা

শিল্পী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৩৯	২য় সংখ্যা

জরতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসান রজনীতে দীপবর্ত্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে শুভ্রকেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে,—
উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ।

শিশির মন্থর বায়ু,
অশোকের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছধারা কলশব্দহীন
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে,
শূন্য গৃহপানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।
হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিয়ে শস্যে ভরা ক্ষেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর।
হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিমতটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষ-কৃষ্ণ শিলাবেদীমূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্তমহিমা
চিরন্তন
চরম প্রসাদ তার
নামিল তোমার নম্র শিরে
মানস সরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্ব্বশেষ আলোর মতন॥

১৩ জুলাই
১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুশেয়ার সমুদ্রের ধারে জাহাজ-ঘাটার সহর। পারস্যের অন্তরঙ্গ স্থান এ নয়।

বৈকালে পারসিক পার্লামেণ্টের একজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন আমি কী জানতে চাই। বল্লুম, পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই যে-পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি বললেন, বড়ো মুস্কিল। সে পারস্য কোথায় কে জানে। এ দেশে এক বৃহৎ দল আছে তারা অশিক্ষিত, পুরোনো তাদের মধ্যে অপভ্রষ্ট, নতুন তাদের মধ্যে অনুদ্গত। শিক্ষিত বিশেষণে যারা খ্যাত তারা আধুনিক, নতুনকে তারা চিনতে আরম্ভ করেচে, পুরোনোকে তারা চেনে না।



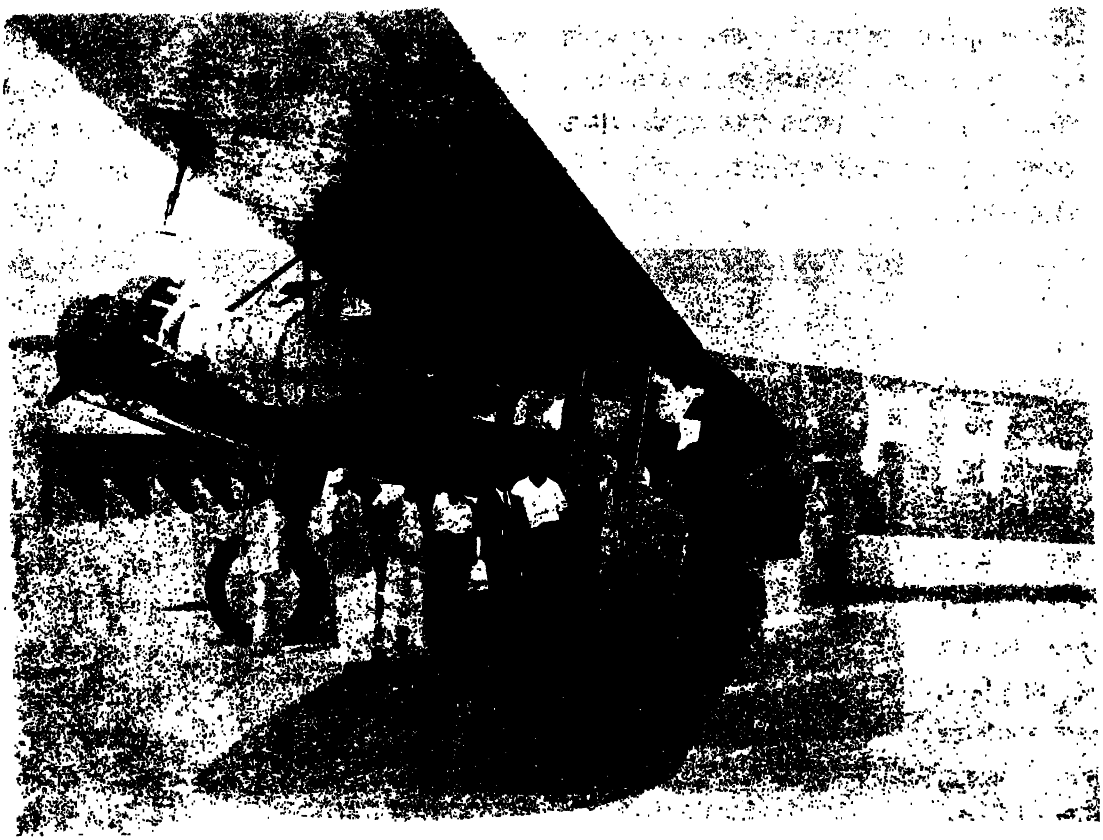
এরোপ্লেন কক্ষে রবীন্দ্রনাথ

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই মধ্যে দেশ প্রকাশমান নয়, বহুর মধ্যে সে অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট। দেশের যথার্থ প্রকাশ কোনো কোনো বিশেষ মানুষের জীবনে ও উপলব্ধিতে। দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোন্ ফাটল দিয়ে একটি কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে। যা গভীরের মধ্যে সঞ্চিত তা সর্ব্বত্র বহুলোকের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় না। যা অধিকাংশের আবিল চিত্তের আড়ালে থাকে, তা কারো কারো প্রকৃতিগত মানসিক স্বচ্ছতার কাছে সহজেই অভিব্যক্ত হয়। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা কতদূর, তাঁকে দেশ মানে কি মানে না সে কথা অবান্তর। সে রকম কোনো কোনো দৃষ্টিবান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে, তারা সম্ভবত নামজাদাদের মধ্যে নয়, এমন কি তারা বিদেশীদের কেউ হতেও পারে, কিন্তু পথিক মানুষ কোথায় তাদের খুঁজে পাবে।

যাঁর বাড়িতে আছি তাঁর নাম মাহ্মুদ রেজা। তিনি জমিদার ও ব্যবসায়ী। নিজের ঘরদুয়োর ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্ত দুঃখ পেয়েচেন কম নয়, নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে নিজের অভ্যস্ত আরামের উপকরণকে উল্টোপাল্টা করেচেন। আড়ালে থেকে সমস্তক্ষণ আমাদের প্রয়োজন সাধনে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সর্ব্বদা সমুখে এসে সামাজিকতার অভিঘাতে আমাদের ব্যস্ত করেন না। এঁর বয়স অল্প, শান্ত প্রকৃতি, সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ।

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলচে। এই জিনিষটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না,

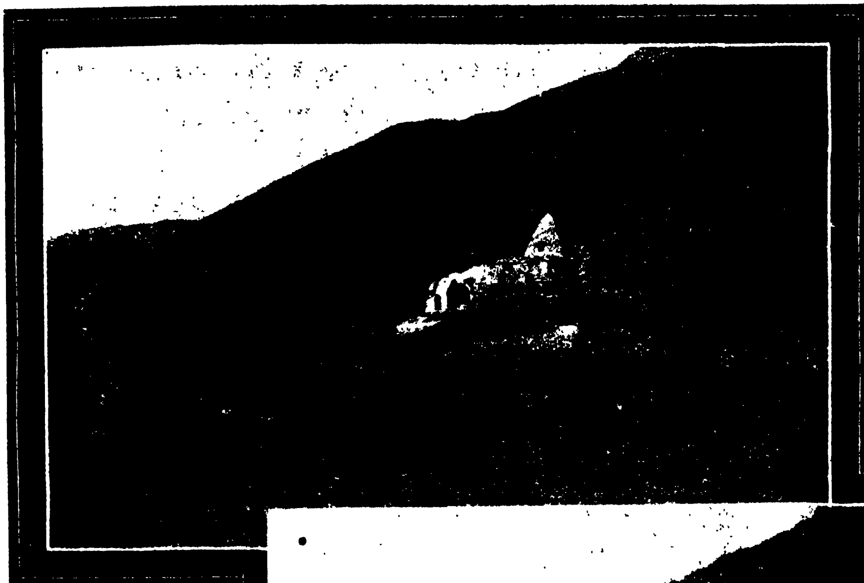
নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাইনে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেইবা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্ম্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেচে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়। এদের পলিটিশিয়নের দরবারে তার আসন পড়েনা, এখানে সেই গণ্ডি দেখা গেলনা। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেচেন তাঁরা প্রধানতঃ রাজদরবারীদের দল। মনে পড়ল ইজিপ্টের কথা। সেখানে যখন গেলেম রাষ্ট্রনেতারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে এলেন। বল্লেন, এই উপলক্ষ্যে তাঁদের পার্লামেন্টের সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতবি রাখতে হোলো। প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব। এদের কাছে আমি



বুশেয়ার—এরোপ্লেনে রবীন্দ্রনাথ

কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বল্‌তে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার পরে আরোপ করতে এদের বাধেনি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েচি। অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকের আদর, শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেই জন্যে এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেচে কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য্যঅভিমান-বোধ

বরাবর চলে এসেচে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তারপরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেচে যে পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার



শিরাজের পথে মুসাফিরখানা



পারস্যের পার্ব্বত্য পথ

আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি—এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজপথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেচে সহজ মানুষের সম্বন্ধে,—এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনা পাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেচে তখন ভুল করেনি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেচি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্ট অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডীর, সেটা

আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষ্যই আমার গোচর হয়নি। য়ুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দুসভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরো কঠিন; বাংলায় নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই, দক্ষিণেই যাই কারো ঘরের মধ্যে আপন স্থান করে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়; এমন কি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় বলে বিখ্যাত, সে আতিথ্যে পংক্তিভেদ নেই।

১৬ এপ্রেল। সকাল সাতটার সময় শিরাজ অভিমুখে ছাড়বার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত তবু অভ্যাস মতো ভোরে উঠেচি, তখন আর-সকলে শয্যাগত। সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে বেরতে নটা পেরিয়ে গেল।

মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ির চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বোঝা।

মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির চিহ্ন দেখিনে। পারস্যদেশের বেশির ভাগ উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ে বেষ্টিত, আবার মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী। এই মালভূমি সমুদ্র-উপরিতল থেকে পাঁচ ছয় হাজার ফিট উঁচু। এর মাঝখানটা নেমে গিয়েচে প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। এই অধিত্যকায় পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘ পৌঁছতে বাধা পায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। পর্ব্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্ব্বরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষীণজল এই স্রোতগুলি সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রায় পৌঁছয় না, মরু নেয় তাদের শুষে কিম্বা জলার মধ্যে তাদের দুর্গতি ঘটে।

বন্ধুর পথে নাড়া খেতে খেতে ক্রমে সেই বিশাল নীরস শূন্যতার মধ্যে দূরে দেখা যায়, খেজুরের কুঞ্জ, কোথাও বা বাব্‌লা। এই জনবিরল জায়গায় দশমাইল অন্তর সশস্ত্র পুলিস পাহারা। পথে পথিক প্রায় দেখিনে। আমাদের দেশ হলে আর্ত্তনাদমুখর গোরুর গাড়ি দেখা যেত। এদেশে তার জায়গায় পিঠের দুই পাশে বোঝা ঝুলিয়ে গাধা কিম্বা দলবাঁধা খচ্চর, মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল নিয়ে মেষপালক, দুই এক জায়গায় কাঁটা ঝোপের মধ্যে চরে বেড়াচ্চে উটের দল।

বেলা যায়, রৌদ্র বেড়ে ওঠে; মোটর-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলো উড়িয়ে বাতাস বইচে, আমাদের শীতের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। কচিৎ এক এক জায়গায় দেখি তোরণওয়ালা মাটির ছোটো কেল্লা, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডান দিগন্তে একটা পাহাড়ের চেহারা ফুটে উঠ্‌চে, যাত্রা আরম্ভে আকাশের ঘোলা নীলের মধ্যে এ পাহাড় অবগুণ্ঠিত ছিল।

এই অঞ্চলটায় বাখ্‌ক্রি জাতের বাস, তাদের ভাষা তুর্কি। পূর্ব্বতন রাজার আমলে এখানে তাদের বসতি পত্তন হয়। এদের ব্যবসা ছিল দস্যুবৃত্তি। নূতন আমলে এদের ঠাণ্ডা করা হচ্চে। শোনা গেল কিছুদিন আগে পথের মধ্যে এরা একটা সাঁকো ভেঙে রেখেছিল। মালবোঝাই মোটরবাস্ উল্‌টে পড়তেই খুনজখম লুঠপাঠ করে। এই ঘটনার পরে রাজা তাদের প্রধানের ছেলেকে জামিনস্বরূপে তেহেরানে নিয়ে রেখেচেন। শাস্তিটা কঠোর নয় অথচ কেজো। এই জাতের দলপতি শাকুরুল্লা খাঁ তাঁর বসতিগ্রাম থেকে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর কয়েক বছর আগে হলে এই অভিবাদনের ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম হোতো যাকে বলা যেতে পারত মর্ম্মগ্রাহী। বুশেয়ার থেকে বরাবর আমাদের গাড়ির আগে আগে আর একটি মোটরে বন্দুকধারী পাহারা চলেচে। প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝিবা এটা রাজকায়দার বাহুল্য অলঙ্কার, এখন বোধ হচ্চে এর একটি জরুরী অর্থ থাকতেও পারে।

মেটে রাস্তা ক্রমে নুড়ি-বিছানো হয়ে এল। বোঝা যায় পাহাড়ের বুকে উঠচি। পথের প্রান্তে কোথাওবা গিরিনদী চলেচে পাথরের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। কিন্তু তারা তো লোকালয়ের ধাত্রীর কাজ করচে না। মানুষ কোথায়? মাঠে মাঝে মাঝে আকন্দ গাছ কুল গাছ উইলো,—মাঝে মাঝে গমের ক্ষেতে চাষের পরিচয় পাই কিন্তু চাষীর পরিচয় পাইনে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়। শিরাজের পথ দীর্ঘ। একদিনে যেতে কষ্ট হবে বলে স্থির হয়েচে খাজরুনে গবর্নরের আতিথ্যে

মধ্যাহ্নভোজন সেরে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু বিলম্বে বেরিয়েছি, সময়মতো সেখানে পৌঁছবার আশা নেই, তাই পথে কোনারতাখ্‌তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় আমাদের মোটর গাড়ি থামল। মাটির মেঝের পরে



পারস্যের বাগান



পারস্যের বাগান

তাড়াতাড়ি কম্বল কার্পেট বিছিয়ে দিলে। সঙ্গে আহার্য ছিল, খেয়ে নিলুম। মনে হোলো, এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুরকুঞ্জের মাঝখানে।

এবার পাহাড়ে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে উঠচি। পাহাড়গুলো সম্পূর্ণ টাক-পড়া, এমন কি, পাথরেরও প্রাধান্য কম। বড়ো বড়ো মাটির স্তূপ। যেন মুড়িয়ে দেওয়া দৈত্যের মাথা। বোঝা যায় এটা বৃষ্টি-বিরল দেশ, নইলে গাছের শিকড় যে-মাটিকে বেঁধে রাখেনি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিঁকতে পারে। স্বল্পপথিক পথে মাঝে মাঝে কেরোসিনের বোঝা নিয়ে গাধা চলেচে। বোঝাইকরা বড়ো বড়ো সরকারী মোটর বাস্‌ আমাদের পথ বাঁচিয়ে নড়বড় করে ছুটেচে নীচের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তৃণহীন জনহীন রুক্ষ, যেন পৃথিবীর বুক থেকে একটা তৃষার্ত দৈত্যের অশ্রুহীন কান্না ফুলে ফুলে উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

বেলা যায়। একজায়গায় দেখি পথের মধ্যে খাজরুনের গবর্নর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েচেন আমাদের আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বোঝা গেল তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করচেন।

প্রাসাদে পৌঁছলুম। বড়ো বড়ো কমলালেবু গাছের ঘন সংহত বীথিকা; স্নিগ্ধচ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে। সেকালের মনোরম বাগান, নাম বাগ্‌-ই-নজর। নিঃস্ব রিক্ততার মাঝখানে হঠাৎ এই রকম সবুজ ঐশ্বর্য্যের দানসত্র, এইটেই পারস্যের বিশেষত্ব।

বাগানের তরুতলে আমাদের ভোজের আয়োজন। কিন্তু এখনকার মতো ব্যর্থ হোলো। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত। একটি কার্পেট বিছানো ছোট ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বাতাসে তাপ নেই, সামনে খোলা দরজা দিয়ে ঘন সবুজের উচ্ছ্বাস চোখে এসে পড়চে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে বাগানে গিয়ে দেখি গাছতলায় বড়ো বড়ো ডেকচিতে মোটা মোটা পাচক রান্না চড়িয়েচে, আমাদের দেশে যজ্ঞের রান্নার মতো। বুঝলুম রাত্রিভোজের উদ্যোগপর্ব্ব।

অতিথির সম্মানে আজ এখানে সরকারী ছুটি। সেই সুযোগে অনেকক্ষণ থেকে লোক জমায়েৎ হয়েছিল। আমাদের দেরি হওয়াতে ফিরে গেছে। যাঁরা বাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে গেলুম। সকলেরই মুখে তাঁদের রাজার কথা। বল্‌লেন, তিনি অসামান্য প্রতিভার জোরে দশ বছরের মধ্যে পারস্যের চেহারা বদ্‌লিয়ে দিয়েচেন।

এইখানে আধুনিক পারস্য ইতিহাসের একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কাজার জাতীয় আগা মহম্মদশার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এই ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায় আরম্ভ হোলো। এরা খাঁটি পারসিক নয়। কাজাররা তুর্কি জাতের লোক। তৈমুরলঙ্গ এদের পারস্যে নিয়ে আসে। বর্ত্তমানে রেজা শা পহ্লবির আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারস্যের রাজ-সিংহাসন এই জাতীয় রাজাদের হাতেই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শা নাসির উদ্দীন ছিলেন রাজা। তখন থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। এই সময়ে পারস্যের মন যে জেগে উঠেচে তার একটা নিদর্শন দেখা যায় বাবিপন্থীদের ধর্ম্মবিপ্লবে। ঠিক এই সময়েই রামমোহন রায় বাংলাদেশে প্রচার করেছিলেন ধর্ম্মসংস্কার। নাসির উদ্দীন অতি নিষ্ঠুরভাবে এই সম্প্রদায়কে দমন করেন।

পারস্যের রাজাদের মধ্যে নাসির উদ্দীন প্রথম য়ুরোপে যান আর তাঁর আমল থেকেই দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করা সুরু হোলো। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফর উদ্দীনের আমলে এই জাল বিস্তৃত হবার দিকে চল্‌ল। তামাকের ব্যবসার একচেটে অধিকার তিনি দিলেন এক ইংরেজ কম্পানিকে। এটা দেশের লোকের সইল না, তারা তামাক বয়কট করে দিলে। দেশশুদ্ধ তামাকখোরদের তামাক ছাড়া সোজা নয়, কিন্তু তাও ঘটল। এই উপায়ে এটা রদ্‌ হয়ে গেল কিন্তু দণ্ড দিতে হোলো কম্পানিকে খুব লম্বা মাপে। তারপরে লাগ্‌ল রাশিয়া, তার হাতে রেলওয়ে। বেলজিয়ম থেকে কর্ম্মচারী এল পারস্যে ট্যাক্স আদায়ের কাজে— ইংরেজও উঠে পড়ে লাগ্‌ল পারস্য বিভাগের কাজে।

এদিকে দেশের লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসচে রাষ্ট্রসংস্কারের। শেষকালে রাজাকে মেনে নিতে হোলো। প্রথম পারসিক পার্লামেণ্ট খুলল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে।

এ রাজা মারা গেলেন। ছেলে বসলেন গদিতে—শা মহম্মদ আলি। পারস্যে তখন প্রাদেশিক গবর্নররা ছিল একএক নবাব বিশেষ, তারা সকল বিষয়েই দেয় বাধা। প্রজারা এদের বরখাস্ত করবার দাবী করলে, আর মাশুল আদায়ের বেলজিয়ান কর্ত্তাদেরও সরিয়ে দেবার প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উঠল।

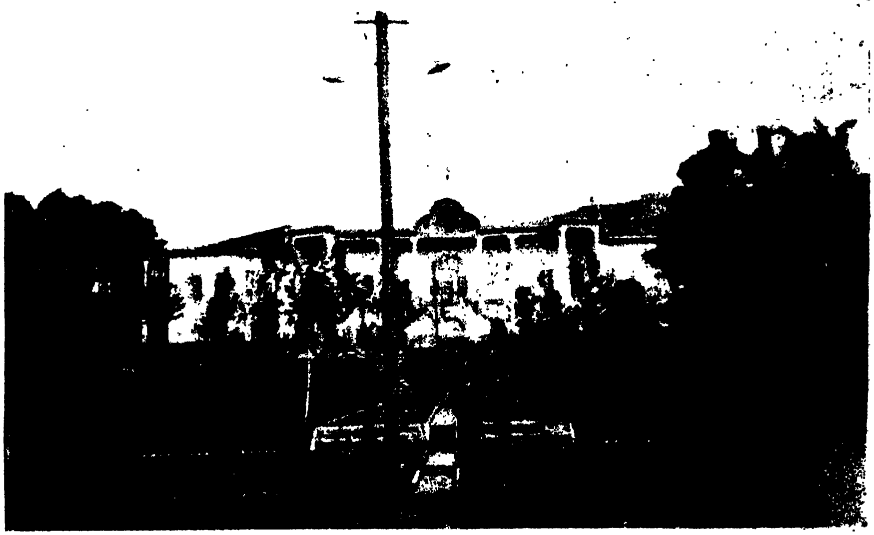
বলা বাহুল্য, দেশের লোক পার্লামেণ্ট শাসনপদ্ধতিতে ছিল আনাড়ি। দায়িত্ব হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে তাদের হাত পেকে উঠল। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, রাজস্ব বিভাগ ছারখার।

অবশেষে একদা ইংরেজে রাশিয়ানে আপোষ হয়ে গেল। দুইকর্ত্তার একজন পারস্যের মুণ্ডের দিকে আর একজন তার ল্যাজের দিকে দুই হাওদা চড়িয়ে সওয়ার হয়ে বসল, অঙ্কুশরূপে সঙ্গে রইল সৈন্যসামন্ত। উত্তরদিকটা পড়ল রুশীয়ের ভাগে,

দক্ষিণদিকটা ইংরেজের, অল্প একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্‌টিম্ করে জ্বলচে।

রাজায় প্রজায় তক্‌রার বেড়ে চল্‌ল। একদিন রাজার দল মোল্লার দলে মিশে পড়ল গিয়ে সহরের উপর, পার্লামেন্টের বাড়ি দিলে ভূমিসাৎ করে। কিন্তু দেশকে দাবিয়ে দিতে পারল না। আবার একবার নতুন করে কন্‌ষ্টিট্যুশনের পত্তন হোলো।

ইংরেজ ও রুশ উভয়েই মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে শাহকে দেশের লোক এমন বিশ্রীরকম ব্যস্ত করচে বলে। বলাই বহুল্য নতুন কনষ্টিট্যুশনের প্রতি তাদের দরদ ছিল না। রুশীয় কর্ণেল লিয়াকভ একদিন সৈন্য নিয়ে পড়ল পার্লামেন্টের উপরে। লড়াই বেধে গেল, বড়ো বড়ো অনেক সদস্য গেলেন মারা, কেউবা হলেন বন্দী, কেউবা গেলেন পালিয়ে। লণ্ডন টাইম্‌স্ বল্‌লেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্চে স্বরাজতন্ত্র ওরিয়েণ্টালদের ক্ষমতার অতীত।



পারস্যের বাগান বাড়ি

তেহেরান্‌কে ভীষণ অত্যাচারে নির্জ্জীব করলে বটে কিন্তু অন্য প্রদেশে যুদ্ধ চল্‌তে লাগল। শেষে পালাতে হোলো রাজাকে দেশ ছেড়ে, তাঁর এগারো বছরের ছেলে উঠ্‌লেন রাজগদীতে। রাজা যাতে মোটা পেন্সন পান ইংরেজ এবং রুশ তার ব্যবস্থা করলেন। রুশীয়ের সাহায্যে পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ করলেন। হার হোলো তাঁর।

আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্‌টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ববিভাগকে খাড়া করে তুলতে। ঠিক যে সময়ে তিনি কৃতকার্য্য হয়েচেন রাশিয়া বিরুদ্ধে লাগল। পারস্যের উপর হুকুম জারি হোলো শুষ্টারকে বিদায় করতে হবে। প্রস্তাব হোলো, ইংরেজ এবং রুশের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে রাষ্ট্রকার্য্যে আহ্বান করা চলবে না। এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিরুদ্ধ আন্দোলন চলল। কিন্তু টি'কল না। শুষ্টার নিলেন বিদায়, রাষ্ট্রসংস্কারকরা কেউবা গেলেন জেলে, কেউবা গেলেন বিদেশে। এই সময়কার বিবরণ নিয়ে শুষ্টার The Strangling of Persia নামক যে বই লিখেচেন তার মতো শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।

এদিকে য়ুরোপে যুদ্ধ বাধল। তখন রুশিয়া সেই সুযোগে পারস্যে আপন আসন আরো ফলাও করে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হোলো। অবশেষে বল্‌শেভিক বিপ্লবের তাড়ায় তারা গেল সরে। এই সুযোগে ইংরেজ বসল উত্তর পারস্য দখল করে। নিরন্তর লড়াই চল্‌ল দেশবাসীদের সঙ্গে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সার পার্সি কক্স এলেন পারস্যে ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনি পারসিক গভর্মেণ্টের এক দলের কাছ থেকে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, সমগ্র পারস্যের আধিপত্য থাকবে ইংরেজের হাতে, তার শাসনকার্য্য ও সৈন্যবিভাগ ইংরেজের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত হবে। এ'কে ভদ্রভাষায়

বলে প্রোটেক্‌টোরেট্। এর নিগূঢ় অর্থটা সকলেরই কাছে সুবিদিত,—অর্থাৎ ওর উপক্রমণিকা বৈষ্ণবের ঝুলিতে, ওর উপসংহার শাক্তের কবলে। যাই হোক সম্পূর্ণ পার্লামেণ্টের কাছে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে পেশ করতে কারো সাহস হোলো না।

এই দুর্য্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরান। ওদিকে সোভিয়েট্ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর পারস্যে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে এলো। ইংরেজ পারস্য ত্যাগ করলে। এতকালের নিরন্তর নিপীড়নের পর পারস্য সম্পূর্ণ নিস্কৃতি লাভ করল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্‌ষ্টাইন এসে এই লেখাপড়া করে দিলেন যে, এতকাল সাম্রাজ্যিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্ত্তন করেছিল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্চেন; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হোলো এবং রাশিয়া পারস্যে যে সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্ম্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবী না করে সে সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হোলো।

রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী তারপরে প্রধান মন্ত্রী তারপরে প্রজাসাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌চে। রাষ্ট্রের নানাবিভাগে যে সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ, লুণ্ঠনবিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ কড়া পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জ্জনী তুলে। উদ্‌ভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েচে। জয় হোক্ রেজা শা পহ্লবীর।

এঁদের কাছে আর একটা খবর পাওয়া গেল, দেশের টাকা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। বিদেশ থেকে যারা কারবার করতে আসে সমান মূল্যের জিনিষ এখান থেকে না কিন্‌লে তাদের মাল বিক্রি বন্ধ। আমদানি রফতানির মধ্যে অসাম্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুশেয়ারে সর্ব্বসাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্নর কর্ত্তৃক কবির অভিনন্দন উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল ও কবি তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন এই উপলক্ষ্যে এখানে তাহার অনুবাদ আমরা প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক

"আজ যে শ্রদ্ধেয় অতিথিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করবার দুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ আমাদের ঘটেছে, এঁর মোহিনীশক্তি অগ্রদূত হ'য়ে এসে কিছুকাল ধরে আমাদের অধীর আগ্রহান্বিত প্রতীক্ষাকে হর্ষোজ্জ্বল করে রেখেছিল। এঁকে পৃথিবীর সকল জাতি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে-বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; যেখানেই মনের উৎকর্ষ আছে, বিদ্যা আছে, সেখানেই এঁর গ্রন্থাবলী যে-সমাদর লাভ করেছে, জনে জনে ইনি বিতরণ করেছেন যে-প্রেমের ও সমবেদনার বাণী তাই থেকেই এঁর গুণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যাকাশে ইনি উজ্জ্বলতম তারকারাজির অন্যতম; মানুষের চিন্তার মধ্যে ইনি সঞ্চারিত করেছেন যে কল্যাণের শক্তি তা যেমনই পবিত্র তেমনই নিষ্কলঙ্ক।

"ইন্দো-ইরাণ বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ডক্টর ঠাকুর আদর্শস্থানীয়; প্রাচ্য মনীষার মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও মহীয়ান, তারই প্রাণবান্ প্রতীক। তাঁর বাণীর ঐশী শক্তি পাশ্চাত্য চিন্তা ও তথাকথিত সভ্যতাকে স্বীকার করিয়েছে যে বর্ত্তমান যুগের এই জড়-চৈতন্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বের মীমাংসনে প্রাচ্যের কিছু দেবার আছে, কিছু ক্ষমতা আছে। মনুষ্যত্বের প্রগতিতে তাঁর রচনা ছন্দ রক্ষার সহায়তা করে, কারণ আজ আমাদের পশ্চিমের ভ্রাতারা যে জড়-রূপের মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট হ'য়ে আছেন এবং তার ফলে চরিত্র-বিকৃতির যে-আশঙ্কা ঘটছে সেই আশঙ্কা দূর করবার

জন্য জড়ের মধ্যে এই ঐকান্তিক অভিনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন।

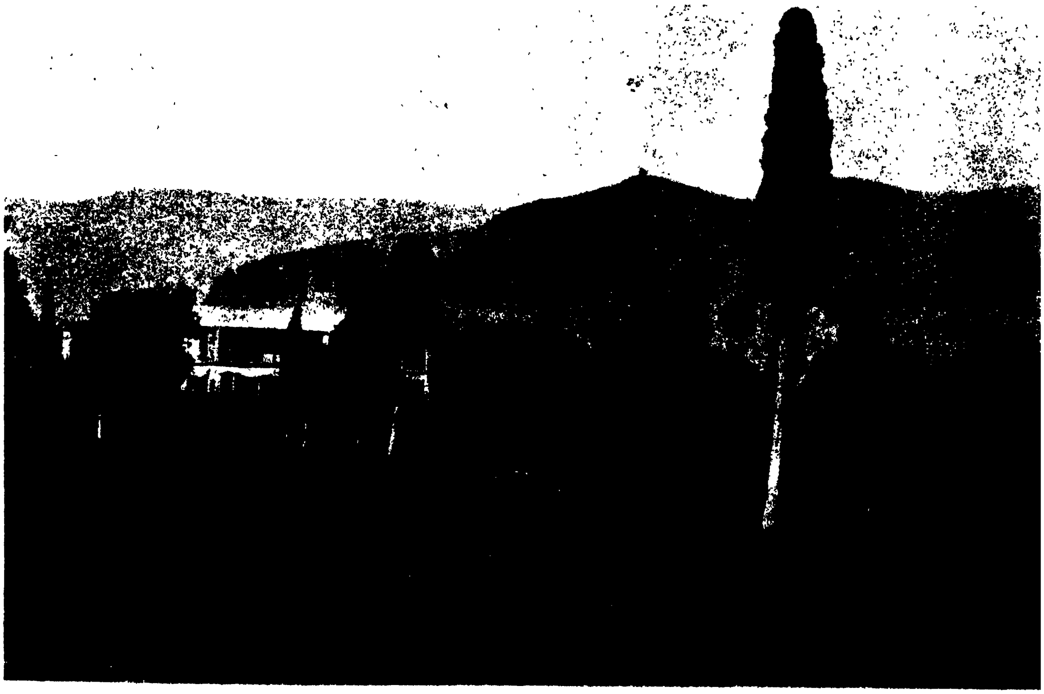
"ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্য-পরিদর্শন যেমনই সন্তোষের বিষয় তেমনি গুরুফলপ্রসূ, কেন না এতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্চে পারস্যের বুদ্ধিগত কৃতিত্বের প্রতি উদার ভারতীয়দের কৌতূহল কতখানি, আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ও

"হায় মানুষ! এই জগৎটা শুধু দৈহিক অহং-এর পুষ্টির জন্য নয়;

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন;

ভোরের পাখীর সুর-লহরী নিদ্রিত মানুষ জানে না;

মানুষের জগৎটা যে কি,—তা পশু কেমন করে জানবে?



পারস্যের পর্বত-বেষ্টিত একটি বাগান বাড়ি

সাহিত্যকে তারা কতখানি সমাদর করে। এই শ্রদ্ধেয় সাধু আজ আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধলেন, কেন-না অল্পদিনের জন্যে হ'লেও এমন একজন মহাপুরুষের দীপ্তির কাছাকাছি আসার সৌভাগ্যটা সাধারণ লোকে যতখানি ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের কবি সাদি এক জায়গায় বলেছেন,—

"তেমনি, সাধারণ লোকে না বুঝলেও এটা সত্য যে ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্যে আগমন সেই ভারতীয় জাতিরই মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন, যে জাতি একটি অপরূপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'চ্চে। এমন জাতিই তার অতীত গৌরব আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত নিয়ে ন্যায়ত দাবি করতে পারে যে মানুষের চিন্তাকাশে

অত্যুজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে অনেকগুলি তারই, আর জগৎকে সে এক অতি গভীর দর্শনশাস্ত্র দান করেছে।

"নীতিতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক দিয়ে অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। সাসানীয়-যুগের প্রাচীনতম সাহিত্যের যে-সব পুঁথি আজ প্রচলিত আছে, তার মধ্যেও পাওয়া যায় এই দুই জাতির পরস্পর আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময়ের কথা।

"ইরাণে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রসার ও ভারতে তার প্রভাব-বিস্তৃতির পর থেকে ভারত-পারস্যের এই মিলন-সূত্র পরিবর্ত্তন পরম্পরার ভিতর দিয়ে নব নব তেজে দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে,—এবং আশা করা যায় এর পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হবে।

"এইখানে আমাদের অতিথির অবগতির জন্য বলাটা প্রাসঙ্গিক হবে,—বর্ত্তমান মহারাজের নিকট পারস্য জাতি



সাদাতাবাদে রবীন্দ্রনাথ

দেখা যায় আজকের যুগের মতো প্রাচীন পারস্যবাসীরাও ভারতবর্ষকে সম্ভ্রমের চোখে দেখ্‌ত, গভীর চিন্তা ও নিগূঢ় তত্ত্বরাজির দেশ হিসেবে। প্রথম সাসানীয় সম্রাট অর্দশির বাবেকানের কার্ণামেতে বর্ণিত আছে যে যখন তিনি তাঁর রাজ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চান তখন কোনো ভারতীয় সম্রাটের নিকট তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। ফারদৌসীর শানামেতেও এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কতখানি ঋণী। চির-সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিশৃঙ্খলের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন; অক্লান্ত উদ্যম ও অত্যাশ্চর্য্য গঠন-শক্তির দ্বারা তিনি এখানে এমন একটা শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সর্ব্ববিষয়েই তাঁর উন্নতিশীল প্রজাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। চতুর্দ্দিক যখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দেশ যখন সর্ব্বনাশের প্রান্তে এসে টলমল করছে, তখন যেন তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন স্বর্গ থেকে আদেশ

নিয়ে এসে; এবং প্রকৃত দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন যে অনেকেরই মনে হ'য়েছিল তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। শিক্ষা ও মানসিক সংস্কারের ব্যবস্থা এতদিন অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এখন আবার সে-সব মহারাজের উৎসাহ পাচ্ছে। আধুনিক প্রণালীতে অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ত হ'য়েছেই,—

বিদেশী পারস্য-বন্ধুদের মনে আশা হ'য়েছে যে এই অদ্বিতীয় সম্রাটের সুদক্ষ নেতৃত্বে পারস্যদেশ আবার জগতের কল্যাণ-সাধনের শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

"আশা করি ডক্টর ঠাকুরকে এই যে আমাদের প্রাণভরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম, এর জন্য তাঁর স্পর্শভীরু স্বভাবে কিছু আঘাত লাগ্‌লেও তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।



এরোপ্লেন্ হইতে শিরাজের দৃশ্য

তা ছাড়া নিয়মিত ভাবে যোগ্যতম ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো হ'চ্চে টেক্‌নিকাল শিক্ষা লাভের জন্য।

"আমাদের কবি ও ঋষিদের স্মৃতি এতদিন তাঁদের ভক্তদের প্রাণের মধ্যেই বাসা বেঁধেছিল; এখন সেই স্মৃতিকে বহির্জগতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চল্‌ছে। এটা শুভ লক্ষণ; এর থেকে বোঝা যায় আমাদের অতীত গৌরবের চেতনা জাতির প্রাণের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হচ্চে। সমস্ত পারস্যবাসী ও

যদিও জানি "অলঙ্কার-বিহীন সৌন্দর্য্যই সুন্দরতম অলঙ্কার," তবুও তাঁর প্রতি আমাদের যে-ভক্তি তা একটু নিবেদন না করে পারলাম না।

"আমাদের ভরসা আছে, ডক্টর ঠাকুর তাঁর এই ভ্রমণে আনন্দ পাবেন, এবং সত্যকারের শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরুর প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা পারস্যে তার কোথাও কোনো অভাবই হবে না।

কবির উত্তর।

পারস্যের ভ্রাতৃগণ !

আমার সম্বন্ধে আপনাদের অনুগ্রহবাণীর জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে আসাটা আমার জীবনে একটা বড় সুযোগ,—একথা নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি। এই প্রথম নিবিড়ভাবে পারস্যের স্পর্শ অনুভব করা গেল। আর যে ক' দিন আপনাদের দেশে থাক্‌ব, তার মধ্যেই পারস্যবাসীদের সঙ্গে আরও গভীরতর পরিচয় সাধনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করচি।

আমি কবি,—আমি সেই কবি-সঙ্ঘের একজন, যাঁদের বাণী মনুষ্যত্বের অন্তরে পৌছনোর পথ খুঁজে নেয় কোলাহলময় বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নয়, অনন্তের আলয় যে গভীর স্তব্ধতা তারই মধ্য দিয়ে। প্রচার করা বা শিক্ষা দেওয়া আমার কাজ নয়, আমি আছি প্রাণের আহ্বানে সাড়া দেবার কাজে অনুভূতির ভাষায়, সৌন্দর্য্যের ভাষায়। কবি-যশের কোনো দাবি যদি আমার থাকে, তবে তার উদ্ভব হোলো সেই মৌন নিঃসীমতায়, যেখান দিয়ে মানব-হৃদয়ের মহাদেশে অনুপ্রেরণা ও ভাব-স্পন্দনের প্রাণময় আদান-প্রদান চল্‌তে থাকে।

শৈশব থেকেই আমি মানুষ হ'য়েচি নির্জ্জনতার আবহাওয়ায়, প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে। তার থেকে অনুপ্রেরণা যত পেয়েচি, আমার স্বপ্নে ও কল্পদৃষ্টিতে প্রতিদানও দিয়েচি তেমনি। নিয়তির দুর্ব্বোধ্য লীলায় এই নিঃসঙ্গ কবিকে বেরিয়ে আস্‌তে হ'য়েছিল এশিয়া ও পশ্চিম মহাদেশের বড়ো বড়ো দেশগুলিতে সহস্র লোকচক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টির মাঝখানে। তথাপি সে সব জায়গায় যে-সকল বাণী ও যে-সমস্ত অভিভাষণ আমাকে দিতে হ'য়েছিল, আমার সত্যিকারের ভাষা সেখানকার নয়, সে আছে আমার সৃষ্টি-নিরত আত্মার গভীরে,—যেখানে আমার চিন্তারাজি বাক্য হারিয়ে ঘুরে বেড়িয়েচে, সেইখানে।

যদি আজ আপনাদের দেশে না আস্‌তাম তবে আমার তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আজ আপনাদের দেখা পেয়ে নির্ম্মল আনন্দে আমার জীবনের এই সন্ধ্যা কাণায় কাণায় ভরে উঠেচে। যে-প্রেমসূত্রের নিদর্শন আজকের এই সভা, সেই প্রেমসূত্রে প্রাচ্যের এই দুটি প্রাচীন সভ্যতাকে মিলিত করতে পেরে আজ আমি ধন্য।"

কবির সম্বর্দ্ধনা-ভোজের অন্তে বুশেয়ারের গবর্ণরের বক্তৃতা

"জনাব্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্যাকাশের উজ্জ্বলতম তারা ; তাঁর মনীষার দীপ্তি শুধু এশিয়া মহাদেশকে নয়, সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেছে। আজ যে তিনি পারস্যদেশে পদার্পণ করেছেন, এতে আমাদের দেশ গৌরবান্বিত হল।

"পুরাকালে ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল ; ধর্ম্ম, শিল্প এবং আরো অনেক উপায় অবলম্বন করে তারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই নিবিড় আত্মীয়তায় দুটি দেশেরই প্রচুর লাভ ; সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকৃষ্ট উপায় হ'চ্চে এই মহাপুরুষের আমাদের দেশে পদার্পণ। আজ তাঁর আগমনে সমস্ত ইরানদেশে একটা সাড়া পড়ে গেছে ; আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি, তাঁর এই ভ্রমণে যেন তিনি আনন্দলাভ করেন, আমাদের মধ্যে যা কিছু সত্য যা' কিছু ভালো আছে, আমাদের দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান কালে তাই দিয়ে যেন আমরা তাঁকে খুসী করতে পারি।"

কবির উত্তর

"চিন্তা-সমৃদ্ধ এই প্রাচীন দেশের প্রতি আমি চিরকালই অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেচি ; এই দেশ দেখা এবং এ দেশের অধিবাসীদের পরিচয় লাভ করাটা আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বাংলাদেশের কবি আমি, আজ ইরাণদেশে এসেছি,—প্রাণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে। দুঃখ এই, আমার এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে আমি ইচ্ছামতো ঘুরেবেড়াতে পারব না,—প্রাণভরে এখানকার জীবন যাত্রার নিকট সংস্পর্শে আস্‌তে পারব না। তবুও এটা বলতে পারি যে এখান থেকে আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা ও শাশ্বত মূল্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব। পারস্যে এসে আপনাদের নিকট যে বিরাট অভ্যর্থনা পেলুম এর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।"

"প্রদোষ"

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখায় "প্রদোষ" শব্দের প্রয়োগে অর্থের ভুল ঘটেচে, সেই নিন্দা ক্ষালনের জন্ম তোমার পত্রিকায় কিছু প্রয়াস দেখা গেল। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে জেনেই আমি বলচি এর কোন প্রয়োজন ছিল না। অজ্ঞতা ও অনবধানতায় স্বকৃত ও অন্যকৃত দোষে অনেক ভুল আমার লেখায় থেকে গেছে। মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত হই নে। পাণ্ডিত্যের অভাব এবং অন্য অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও সমাদরের যোগ্য যদি কোনো গুণ আমার রচনায় উদ্বৃত্ত থাকে তবে সেইটের পরেই আমার একমাত্র ভরসা, নির্ভুলতার পরে নয়।

রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোন শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ঐ শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলা ভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকেনি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্ত্তন করব না এই রকম স্থির করেচি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবী কালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সঙ্গম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চল্‌বে না।

আমার লেখায় এর চেয়ে গুরুতর ভুল, ইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়চে এমন ছেলে চিঠি লিখে একবার আমাকে জানিয়েছিল। আমি মিথ্যা তর্ক করিনি, তাকে সাধুবাদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েচি। অপবাদের ভাষা ও ভঙ্গী অনুসারে কোনো কোনো স্থলে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু না করা ক্ষুদ্রতা। আমি পণ্ডিত নই, শোনা কথা বলচি; কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েচে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় বলেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জ্জনাও হ'য়েচে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েচে। সাহিত্যে চিত্রকলায় এই গল্পটির প্রয়োগ খাটে।

বুদ্ধির দোষে, শিক্ষার অভাবে এবং মনোযোগের দুর্ব্বলতায় এমন অনেক ভুল ক'রে থাকি যার স্বপক্ষে কোনো কথাই বলা চলে না। তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় আমি অভ্রান্ত নই। ত্রুটি যাঁরা মার্জ্জনা করেন ঔদার্য্য তাঁদেরই, যাঁরা না করেন তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। অনতিকাল পূর্ব্বে আমার একটি প্রবন্ধে "ব্যঞ্জনান্ত" শব্দের স্থলে "হলন্ত" শব্দ ব্যবহার করেছিলুম। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পত্রে আমার এই ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়েচেন কিন্তু তিনি উল্লাস বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি। আমি সেজন্যে কৃতজ্ঞ। সবুজ পত্রে আমার লিখিত কোনো প্রবন্ধে ঠিক এই ভুলটিই দেখা যায় তার থেকে প্রমাণ হয় এটার কারণ অন্যমনস্কতা নয়, ব্যাকরণের পারিভাষিকে আমার অজ্ঞতা। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ

বিচিত্রার পরিচালক শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র।—বিঃ সঃ

বাংলার বানান সমস্যা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য বাংলা পাকা করে গড়েচে। অথচ গদ্যভাষা যে-সর্ব্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি। পণ্ডিতেরা বাংলাভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হোলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়ম সঙ্গত নয়—তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মতো প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবর্ণরে পণ্ডিতি করে মূর্দ্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।

এমন সময়ে সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েচে—বাকি সমস্তটা তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হতে হতে ক্রমে সেটা গড়ে উঠ্‌বে সন্দেহ নেই। হিন্দীভাষায় গড়ে উঠেচে—কেননা এখানে পণ্ডিতির উৎপাত ঘটেনি. সেইজন্যেই হিন্দী পুঁথিতে "শুনি" অনায়াসেই "সুনি" মূর্ত্তি ধরে লজ্জিত হয় নি। কিন্তু শুনচি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেচে, ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেচে আর কি। প্রাচীন কালে যে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভাষার প্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙালীদের মতো তাঁদের এমন লজ্জাবোধ ছিল না।

এখন এ সম্বন্ধে বাংলায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম চলচে—নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়। অন্তত এ কাজটা আমাদের নয়, এ সুনীতিকুমারের দলের। বাংলাভাষাকে বাংলাভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসঙ্গত নিয়মগুলি তাঁরাই উদ্ভাবন করে দিন। যে হেতু সম্প্রতি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব হয়েচে সেই কারণে টেক্‌ষ্ট্‌বুক প্রভৃতির যোগে বাংলার বানান ও শব্দ প্রয়োগরীতির সঙ্গত নিয়ম স্থির করে দেবার সময় হয়েচে। এখন স্থির করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে সেটা চলে যাবে। নইলে কেন্দ্রস্থলে কোনো শাসন না থাক্‌লে ব্যক্তি বিশেষের যথেচ্ছাচারকে কেউ সংযত করতে পারবে না। আজকাল অনেকেই লেখেন "ভেতর" "ওপর" "চিবুতে" "ঘুমুতে", আমি লিখিনে, কিন্তু কার বিধানমতে চল্‌তে হবে। কেউ কেউ বলেন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। কিন্তু এমন ভীরু তর্কে সাহিত্য থেকে আজ প্রাকৃত বাংলার ধারাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কারো নেই। সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলেনি। নিকষ এবং তৌলদণ্ডের যোগে সেই সীতার মূল্য পাকা করে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্ম্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজো ধরা দেয়নি বলেই তাকে দুয়োরাণীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্ত্তন করার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে সেটা চিন্তা করবার সময় হয়েচে সে কথা স্বীকার করি। আমি এক সময় সুনীতিকুমারকে প্রাকৃত বাংলার অভিধান বানাতে অনুরোধ করেছিলুম, সেই উপলক্ষ্যে শব্দ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে বানান যদি বেঁধে দেন তবে বিষয়টাকে মীমাংসার পথে আনা যেতে পারে। একাজে হাত লাগাবার সময় হয়েছে সন্দেহ নেই॥ ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৯,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিমল নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের উত্তরে কবির বক্তব্য। বিঃ সঃ

বাংলার বানান-বিভ্রাট

শ্রীবিমলনারায়ণ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

আজকাল বাঙ্‌লা সাহিত্যে উৎকটভাবে বানান-বিভ্রাট দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক সাহিত্যিক নিজ নিজ রুচি অনুসারে বানান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বানান-বৈচিত্র্যের ঘটা দেখিয়া মনে হয় এ যেন একই ভাষার বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় (dialectএ) প্রবন্ধ লেখা হইতেছে। কেবল বানান কেন, ভাষা শিখিবার রীতি সম্বন্ধেও তাই। করিয়াছিলাম, করেছিলেম, করেছিলাম, করেছিলুম; করিয়াছি, করেছি, করেচি; হইতেছে, হচ্ছে, হচ্চে, প্রভৃতি সকলই সাহিত্যে অবাধে স্থান পাইতেছে। বর্ত্তমান লেখকগণ এমন কি কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা না মানিয়া ক (f) রব, লি (f) খব, যা (ই) ব প্রভৃতির কথ্য ভাষার অপভ্রংশকেও সাহিত্যে স্থান দিতেছেন। ইংরেজীতেও ত can't, don't প্রভৃতিকে লেখ্যভাষার রূপান্তর ধরা হয়। সেইরূপ বাংলাতেও ক (f) রব প্রভৃতির 'ই'কার কথ্যভাষায় লুপ্ত হইয়া কথ্যভাষাকে দ্রুত উচ্চারণ করিবার সাহায্য করে। কিন্তু লেখকগণ যে কেন এই স্পষ্ট সরল নিয়ম মানে ননা বুঝা কঠিন। এইরূপ বিশৃঙ্খলতা থাকায় অন্য অসুবিধার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু যে বিদেশী বাঙ্‌লা শিখিবার জন্য উৎসুক তাহার উৎসাহ ত বানানের অরাজকতা দেখিয়া দমিয়া যাওয়ার কথা।

যদি ধরা যায় কলিকাতার কথ্যভাষা আদর্শ (standard) লেখ্য ভাষা হওয়া উচিত এবং বর্ত্তমান সাহিত্যে তাহাই হইয়াছে—তাহা হইলেও সমস্যা মিটে না; কলিকাতা নগরীতে যে সকল সাহিত্যিক বাস করেন তাঁহাদের ভাষা লিখিবার রীতির (style) দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। শরৎচন্দ্রের ভাষার রীতি নরেশ সেনগুপ্তের ভাষার রীতির চেয়ে একেবারে বিভিন্ন। তাহা ছাড়াও কলিকাতার ভাষা বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভাষাই নাই, কারণ কলিকাতায় যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বাঙ্‌লাদেশের অন্য জেলার অধিবাসী, এবং তাহাদের ভাষা বলিবার পদ্ধতি নিজ নিজ জেলার ভাষার অনুযায়ী। বরং শান্তিপুরের ভাষা বলিলে একটি বিশিষ্ট ভাষা বুঝা যায়।

আর যদি বলা যায় যে ভাষা সম্বন্ধে কোন নিয়ম খাটেনা; যে স্থানীয় ভাষা স্বীয় প্রভাবে অন্যান্য স্থানীয় ভাষার উপর প্রাধান্য স্থাপন করে সাহিত্যিকগণ তাহাকেই সম্মান দিয়া আসিতেছেন তাহা হইলে পৃথিবীর উন্নতির আশা ত্যাগ করিতে হয় কারণ এ জগতে মোহে ভুলাইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা সৎ অপেক্ষা অসতের অনেক বেশী। দেবতার চেয়ে উপদেবতা আমাদের নিকট হইতে সম্মান আদায় করে বেশী।

ইংরেজীতে আজকাল উচ্চারণপদ্ধতির উপর (Phonetic Spelling) নির্ভর করিয়া যেরূপে বানান রচিত হইতেছে বাঙ্‌লা ভাষায় যদি সে পন্থা গ্রহণ করা যায়—এবং বোধ হয় তাহাই যুক্তিসঙ্গত—তাহা হইলে বাঙলাভাষাকে ঊ, ঋ, ৯, ঞ, ণ, ষ, য প্রভৃতি বহু অনাবশ্যক অক্ষর ও সংযুক্ত অক্ষরের ভার হইতে মুক্ত করিয়া সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট করিয়া তোলা উচিত। ইহাতে বানান ভুল করিবার ভয়ের হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক বাঙ্‌লাভাষার বর্ত্তমান বানানপদ্ধতি যে চীনা ভাষার অক্ষরের মতই ভীতিপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আপনি আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ভগবানের কাছে আমরা একান্তভাবে আপনার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। ইতি

সেবক
শ্রীবিমলনারায়ণ চৌধুরী

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

এখানে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তখনি কে-যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইসারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন? ছ'সাত দিন থাকবে ব'লেই তো এসেছিলে,—থাকোনা। কষ্ট তো কিছু নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টা মৎলব দেয়। কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনার? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এম্‌নি কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভালো বলিয়া মনে করি ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে, পরক্ষণে সেই মনের দু-চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন,—এই সব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা?

তথাপি, যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবেনা। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায় বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্ত্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়,—শুধু, আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহারা রহিল তাহাদের পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল আরতি সুরু হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুস্কিল পুঁটুর পণের টাকাটা ছোট্ট ব্যাগ সমেত কমল-লতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক্। হয় কলিকাতা, নয় বর্ম্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্য্যন্ত কমল-লতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে, যে-কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এম্‌নি করিয়াই কাটিল। এবং ঘুমাইবনা বলিয়া বারবার সঙ্কল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানিনা, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই, আবার মনে হইল প্রত্যূষের মঙ্গল-

আরতি বুঝি সুরু হইয়াছে। কিন্তু কাঁসর-ঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়াও ভাঙে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারিনা, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধু-কণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান— রাই জাগো, রাই জাগো শুক-শারী বলে, কত নিদ্রা যাওল কালো মাণিকের কোলে। গোঁসাইজি, আর কত ঘুমবে গো,—ওঠো ?

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূবের জানালা খোলা,—সম্মুখের আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরির কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে-ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা যায়গায় ফিকে-রাঙার আভাস দিয়াছে,—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মতো,—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটা কয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল তাহাদের পক্ষ-তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল, বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখীর দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী,—কলিকাতা সহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেন-দেন কাজ-কারবারের বড়বাজার,—দিনের বেলায় ভিড় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোষাক পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দ্দিকের বনে-জঙ্গলে ডালে-ডালে তাহাদের অগুণতি আড্ডা। ঘুম-ভাঙার সাড়া-শব্দ কিছু কিছু পাওয়া গেল,—ভাবে বোধ হইল চোখে-মুখে জল দিয়া তৈরি হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিবসব্যাপী নাচ-গানের মোচ্ছব সুরু হইবে। সবাই এরা লক্ষ্মৌয়ের ওস্তাদ,—ক্লান্তও হয় না, কসরৎও থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্ত্তনের পালা যদি বা কদাচিৎ বন্ধ হয়, বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোট বড়, ভাল-মন্দর বাচ-বিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক্ না থাক্ গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধকরি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখীর চড়া-গলায় পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ, আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন-একটা ডাহুক নদীর কলমী-দলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিন কণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভালো যে এদেশে ময়ূর মিলেনা, নহিলে উৎসবে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত, আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সংকল্পের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও যো নাই,—প্রহরীর সতর্কতায় মৎলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই,—দুপুর রাতে ঘুম-ভাঙানোর কি দরকার ছিল বলোত ?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়ীতে কলকাতা যাবার কথা। মুখ হাত ধুয়ে এসো আমি চা তৈরি করে আনি গে। কিন্তু স্নান কোরোনা যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়ীতে যখন হোক্ আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলোত ?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই। স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেলনা, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা,—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আস্‌বে তো ?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো,—টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইলনা, তারপরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছো,—একটুও বদলাতে পারোনি।

—কেন বলো ত ?

—তুমি বলো ত কেন বল্‌লে আমাকে টাকা গুণে নিতে ? গুণে নিতে পারি বলে কি সত্যিই মনে করো ? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়-গোঁসাইজিকে আমি নালিশ জানিয়ে যাবো আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টম-দলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল। আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

—নেই ? তা'হলে আর একটু ঘুমোও। উঠ্‌লে আমাকে খবর দিও,—কেমন ?

—কিন্তু, এখন তুমি করবে কি ?

—আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাবো।

—এই অন্ধকারে ? ভয় করবেনা ?

—না, ভয় কিসের ? ভোরের পূজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমল-লতা একাকী বহন করে। তাহার কর্ত্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্ব্বোপরি সবিনয় কর্ম্ম-কুশলতায় এই কর্ত্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে কোথাও ঈর্ষা, বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জ্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রম-লক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নর-নারী স্খলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশ বোধ হইল। এই মঠে মাত্র দুটি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি,—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্খা না করিয়াই যেন পারি না এম্‌নি মনোভাব। ভাবিলাম লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম,—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট উপগ্রহের মতো সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোবোনা কমল-লতা, চলো তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনিগে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি তোমার ছোঁয়া ফুলে পূজো হবে কেন ?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবেত ? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ, সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারবোত ? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই,—আচ্ছা চলো। আমি সাজিটা আনিগে তুমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘন ছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুক্‌না পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই। বলিলাম, কমল-লতা, পথ ভুলবে না তো ?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ, তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চল্‌তে হবে।

—কমল-লতা, একটা অনুরোধ রাখবে ?

—কি অনুরোধ ?

—এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়োনা।

—গেলে তোমার লোকসান কি ?

জবাব দিতে পারিলামনা চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারী ঠাকুরের একটি গান আছে,—সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও। গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবেনা,—না?

বলিলাম, কি জানি, আগে সকাল বেলাটা তো কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিলনা, একটু পরে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিল,—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

—তারপরে আর জানিনে।

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে। দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারি ইচ্ছা করিতে লাগিল দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু-একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবেনা, বাধা দিবেনা, কিন্তু কিছুতেই পা-ও চলিলনা, মুখেও একটা কথা আসিলনা যেমন চলিতেছিলাম তেম্‌নি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়া ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান। ঠাকুরের নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা যায়গায় অন্ধকার আর নাই কিন্তু ফর্সাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন শাদা হইয়া আছে। সামনের পাতা-ঝরা ন্যাড়া চাঁপা গাছটায় ফুল নাই কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটা কয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপ্‌সা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচছয় স্থল-পদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত-আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যুষে শয্যা ছাড়িয়া উঠিনা, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়,—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারিনা। পূর্ব্বের রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ম্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন,—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমল-লতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছো, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপা ডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল,—হঠাৎ তোমার হলো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপ-ছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদ-পদ্মে আপনাকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইলনা। সে মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল,—কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—

থামাইতে হইল। বলিলাম, যত্নাথ দাস থাক্, ওদিকে কাঁসরের বাদ্যি শুনতে পাচ্চো কি? ফিরবেনা?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—আচ্ছা, নতুন গোঁসাই, জানো, মেয়েদের মুখের গান অনেক ভালো লোকে শুন্তে চায়না, তাদের ভারি খারাপ লাগে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্ব্বর নই।

—তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

—ওদিকে হয়ত আরতি সুরু হয়েছে,—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

—এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

—ছলনা হবে কেন?

—কেন তা' তুমিই জানো। কিন্তু এ কথা তোমাকে বল্লে কে? আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

—করি। আমাকে কেউ বলেনি কমল-লতা,—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিলনা, কি-একরকম অন্যমনস্কের মতো ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে,—আরনা।

—স্থল-পদ্ম তুল্‌লেনা?

—না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চলো এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ,—এদিকে বড় কেহ আসেনা। তখনো পথ ছিল জন-হীন, এখনো তেম্‌নি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখানথেকে সত্যিই চলে যাবে?

—বারবার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া চলিলাম সত্যই কেন বারবার একথা জানিতে চাই,—জানিয়া আমার লাভ কি।

* * *

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙ্গানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দুজনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সে-ই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নিচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমল-লতা সস্নেহ-কৌতুকে তর্জ্জন করিয়া বলিল, হাস্‌লি যে পোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিলনা। কমল-লতা ঠাকুর-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথা সময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়ীতে আমার যাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুর-ঘরে। ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুন-গোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করোনা ভাই। পদ্মা মাথাধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু-বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে,—কি যে হবে জানিনে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দুখানি কুঁচিয়ে দাওনা গোঁসাই।

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যূষের ফুল-তুলিবার সঙ্গী আমি, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, একটা-না-একটা কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া দিনগুলা যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায় সহৃদয়তায়, আনন্দে আরাধনায়, ফুলে গন্ধে, কীর্ত্তনে পাখীর গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ, সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া সহসা ভৎ‍‍র্সনা করিয়া উঠে এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংশ্রব রুদ্ধ করিয়া গুটি কয়েক নির্জ্জীব পুতুল লইয়া

এ কি মাতামাতি? এত বড় আত্ম-বঞ্চনায় মানুষে বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই-যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারিনা। এ দিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি, অনেকেই এই সময়টায় জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটি দিন মাত্র আসিয়াছিল আর আসে নাই, তাহারও খোঁজ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না,—এ আমার হইয়াছে ভালো।

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—এ আমি করিতেছি কি? সঙ্গ-দোষে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে নাকি? স্থির করিলাম আর না,—যা-ই কেননা ঘটুক এ জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।

প্রত্যহ রাত্রি-শেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জাগায়। ভোরের-সুরে বৈষ্ণব-কবিদের ঘুম ভাঙানোর গান। ভক্তি ও ভালোবাসার সে কি সকরুণ আবেদন! হঠাৎ সাড়া দিইনা কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর জানালা খুলিয়া দেয়,—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি, এবং মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিন কয়েকের অভ্যাসে আপনিই আজ ঘুম ভাঙিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু সন্দেহ জন্মিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম,—দেখি রাত কোথায়, সকাল হইয়াছে। কে-একজন খবর দিতে কমল-লতা আসিয়া দাঁড়াইল, এমন অস্নাত, অপ্রস্তুত চেহারা তাহার পূর্ব্বে দেখি নাই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারো অসুখ নাকি?

সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতেছো গোঁসাই।

—কিসে বলোত?

—শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠ্‌তে পারিনি।

—আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আধ-মরা একটা টগর গাছে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল তাহাই দেখাইয়া কহিল, এ বেলা যা' কোরে হোক্ ওতেই চলে যাবে।

—কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

—মালা আজ তাঁদের পরাতে পারবোনা।

শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল,—সেই নির্জ্জীব পুতুল গুলার জন্যেই,—বলিলাম, স্নান কোরে আমি তুলে এনে দিই।

—তা' যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবেনা। অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড় গোঁসাইজিকে দেখ্‌চিনে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি তো এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখ্‌তে।

—কবে ফিরবেন?

—সে তো জানিনে গোঁসাই।

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকদাসের সহিত ঘনিষ্টতা হয় নাই। কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি এ লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাষ্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জ্জনে ঘরের মধ্যে কাটে। ইহাঁর ধর্ম্ম-মতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গী এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশি এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখ বোধ হয়। আপনিই বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসি-মুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তার পরে হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতাম। তবে, একটা কৌতুহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের

অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্ম্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য যাবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধকরি আর মিলিলনা। মনে মনে বলিলাম আবার যদি কখনো আসা হয় তো তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহ মূর্ত্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারেনা, কিন্তু এ-আশ্রমে সে বিধি ছিলনা। ঠাকুরের বৈষ্ণব-পূজারী একজন বাহিরে থাকে সে আসিয়া যথারীতি পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। একি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি, আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধহয় এই বলিয়া বুঝাইলাম যে এতদিন এখানে আছি এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও তো একটা কথা আছে!

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম যার স্বভাব শোক করা সে করবেই। আমি তাকে থামাবো কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমার পিছনে দাঁড়াইয়া কমল-লতা।

দ্বারিক দাস কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ কোরোনা গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিলো। আর বোষ্টম-বৈরিগীর আদর যত্ন করবার কি-ই বা আছে! কিন্তু, আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখিরীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমল-লতা সেখানেই তেম্‌নি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্ব্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্যক্ত, অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

আরও দুই দিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমল-লতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম। গোঁসাইজি কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

—সে তো জানিনে গোঁসাই।

—কমল-লতা কিন্তু কেঁদে-কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা এঁর কানেও গেছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজি একটু হাসিয়া বলিলেন, তুমি জানোনা বুঝি?

—না।

—ওর স্বভাবই এম্‌নি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম,—সে কি নবীন, সে তো এখানেও আর আসে না।

নবীন বিশেষ বিচলিত হইলনা, বলিল তবে বোধ হয় কোন্ বনে-বাদাড়ে ঘুরচে,—নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন্ সাপে কাম্‌ড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

—তার সন্ধান করা তো দরকার নবীন?

—দরকার তো জানি, কিন্তু খুঁজবো কোথায়? বনে-জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে নিজের প্রাণটা তো আর দিতে পারিনে বাবু। কিন্তু তিনি কোথায়,—একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

—তিনিটা কে?

—ঐ যে কম্‌লি-লতা।

—কিন্তু সে জান্‌বে কি কোরে নবীন?

—সে জানেনা? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমল-লতা কিছুই জানে না নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন চার দিন সে আখড়ার বাহিরেও যায়নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানেনা? ও সব জানে। বোষ্টুমি কি মন্তর জানে,—ও পারেনা কি? কিন্তু পড়তো একবার নবনের পাল্লায় ওর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেল্‌কিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমল-লতা টাকা নিয়ে কি করবে, নবীন? বোষ্টম মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুঃখ ভিক্ষে করে ঠাকুর-দেবতার সেবা করে, দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া বইত নয়,—ওকে টাকার কাঙাল বলে তো আমার বোধ হয়না নবীন।

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখ্‌লে যেন ভদ্দর ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেম্‌নি চেহারা, তেম্‌নি কথাবার্ত্তা। বড়-বাবাজীটাও লুভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে! ঠাকুর-সেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘী-দুধ নিত্যি চাই। নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানা-ঘুষোয় শুন্‌চি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাক্‌বেনা বাবু, যা আছে সব বৈরিগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুক্‌বে।

বলিলাম, হয়ত গুজোব সত্যি নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও তো কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন? সেদিন খামোকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দান-পত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম শুনলে না। বাপ বহুত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বল্‌লে কি জানেন? বল্‌লে আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার তো কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা? শুনুন কথা।

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি একথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানিনা, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইলাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম কাল কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিলনা।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলা-পাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বেগে একটা সন্দেহ জাগিল। বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরু-ওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠি-বদল-করা-স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়,—এ গহ্বর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন সকৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবেনা গোঁসাই। রাগ করিবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসেনা? হয়ত বা নিজের মনে-মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চির-নিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্ম-ভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমল-লতা পলাইতে চায়। নবীন চলিয়া গেছে, বকুলতলার সেই ভাঙা বেদিটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম পাঁচটার গাড়ী ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এম্‌নি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বউ-ভাতে অন্ন গ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্ত্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাক্‌চে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌঁছতে তোমার রাত হবে নতুন-গোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতোই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলেনা।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুন-গোঁসাই আবার আস্‌বে তো?

—তুমি থাক্‌বে তো?

—তুমি বলো কতদিন আমাকে থাক্‌তে হবে?

—তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আস্‌তে হবে?

—না, সে তোমাকে আমি বোলবনা।

—না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না, সে-ও তোমাকে আমি বলবোনা। তোমার যা' ইচ্ছে হয় ভাবোগে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমল-লতা, কাল যাবো,—কিন্তু কিছুতেই একথা বলা গেলনা।

—চল্লুম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমল-লতার দেখা-দেখি সে-ও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কিরে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় হঠাৎ যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

অজ্ঞাতবাস

শ্রীলীলাময় রায়

৪

বাদল—বাদল! ঘুম তোমার জন্য নয়। তুমি চির জাগ্রত মানব। আরাম তোমার জন্য নয়, তুমি প্রমিথিয়ুসের দোসর। বাদল—বাদল! মানবমন তোমার মনের নামান্তর। তুমি যা চিন্তা করছ তাই মানবের চিন্তা ও চিন্তনীয়। তুমি যে পথ দিয়ে যে প্রান্তে উপনীত হবে মানব সেই পথ দিয়ে সেই প্রান্তে। তুমি অগ্রসরদের অগ্রণী। তোমার ক্লেশ ও ক্লান্তি সকলের। বাদল—বাদল!

বাদলের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সেই চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেল না। কে যে তাকে সম্বোধন করল এত রাত্রে, ভাবতে বাদলের গা ছমছম করল। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু বল পেল না। শয্যা যেন তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

বাদল—বাদল!

কে?

কেউ না। বাদল খোলা জানালা দিয়ে দেখল সমুদ্র রাত্রি জাগছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বীচিভঙ্গের পরেও তার ছুটী নেই। মানবের আদিম সঙ্গী। সেই বুঝি বাদলকে সম্বোধন করল। বাদল মনে মনে তাকে প্রীতি জ্ঞাপন করল। কিন্তু চোখ মেলে রাখতে পারল না।

এখানে এসে অবধি তার ঘুম কিছু কিছু হচ্ছে। সমুদ্র ঘুমতে না পারুক ঘুম পাড়াতে পারে ভাল। কিন্তু যে বাদল একদিন ঘুমের জন্য সাধ্য সাধনার বাকী রাখে নি সেই বাদল আজ ঘুমকে তার চিন্তার বিঘ্ন মনে করে। ঘুমকে উপেক্ষা করে চিন্তায় বিভোর থাকা যায় না, অবসাদ আসে, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ হয়, হতাশ হয়ে আজকের চিন্তা কাল পর্যন্ত তুলে রাখতে হয়। তার ফলে কাল সব কথা মনে পড়ে না, গোড়া থেকে সুরু করতে হয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তবু কতগুলো ভাব চিরকালের মত ফেরার হয়ে যায়, স্মরণের সরণি বেয়ে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। বাদলের বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়। এক একটি আইডিয়া এক একটি দুর্লভ রত্ন। একবার হারালে আবার চোখে পড়ে না। কেন যে বাদল নোট বুকে টুকে রাখল না! কিন্তু টুকে রাখবার সময় কোথায়। ভাব যখন আসে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। একটিকে খাঁচায় পুরতে বসলে বাকীগুলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। নোট বুকে না, স্মৃতিপটে টুকে রাখতে পারলে কাজে লাগত। বাদল স্মৃতিলেখনীর মুখে শান দেয়। রাত্রে ঘুম ভাঙলে স্মরণ করতে লাগে ঘুমের আগে কি ভাবছিল। এই ব্যায়ামের ফলে বাদল শ্রুতিধর হয়ে উঠছে বল্লে চলে। কিন্তু ঘুম যেটুকু সময় হয় সেটুকু সময় বড় জোর পুরাতন চিন্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যায়, নূতন চিন্তা থাকে স্থগিত। নূতনকে পেছিয়ে দেওয়া বাদলের পক্ষে যার-পর-নাই লজ্জাকর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারটে ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে সুখ পায়, এই সুখের কথা তার যখনি মনে পড়ে সে লুকিয়ে লজ্জা পায়।

আহার সম্বন্ধে সে চিরকাল উদাসীন। গোপালের মত সুবোধ, যা পায় তাই খায়, পীড়াপীড়ি করলে তার কি খেতে ইচ্ছা করে তা বলে, কিন্তু ঠিক জিনিষটি পায় না। ভদ্রতার অনুরোধে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হাঁ, চমৎকার হয়েছে খেতে। পরিণামে মিসেস্ মেলভিল বার বার সেই জিনিষ রাঁধে।

আহারক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। বাদল খবরের কাগজ পড়তে পড়তে খায়, একসঙ্গে দুই অকাজ সারা করে; ভাল পরিপাক হয় না, বার বার একটি বিশেষ স্থানে ছুটতে হয়। ইংলণ্ডের মফঃস্বলে ওরূপ স্থানে যেমন দুর্গন্ধ তেমনি অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং বাদল রাগ করে খাওয়া কিন্তু

কমিয়ে। রাত্রে খায় না, সন্ধ্যার আগে High Tea খেয়ে মনকে বোঝায় যাবতীয় শারীর ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার বিক্ষেপ ঘটায়। বৈজ্ঞানিকরা এত কিছু আবিষ্কার করছে; ইঞ্জেক্শন দিয়ে শরীরের মধ্যে আবশ্যক পরিমাণ পুষ্টি প্রবিষ্ট করতে পারে না? কাজটা পাকস্থলীর সাহায্যে হয় বলেই না উক্ত স্থানবিশেষে দৌড়াদৌড়ি করা?

সরাইয়ের বাইরে পদক্ষেপ করে না, অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে না, মেরিয়নের জীবজন্তু দেখতে যায় না ও চায় না, মদ কিম্বা সিগ্রেট খায় না—এ কেমনধারা মানুষ? কি এখানে এর কাজ? শরীর সারাতে যারা আসে তারা সারাদিন ঘরে বসে থাকে না, সরাইওয়ালার ঘোড়া ভাড়া করে সমুদ্রের ধারে বেড়ায়, টেনিস্ কোর্ট ভাড়া করে টেনিস্ খেলে, সন্ধ্যা হলে নিত্য নূতন বোতলের ছিপি খোলায়। তাদের সেবার জন্য গ্রামে দু একঘর সেবাদাসীও মজুত। মেল্ভিল শরীর সারানর কোনো উপকরণ বাদ দেয় নি।

যা হোক কাঁচা টাকা পকেটে আসছে। ছোকরার মতলব যাই হোক, চোখ বুজে বিল শোধ করে। তাই তাকে চোখ বুজে ঠকান যায়। ন পেনীর ঘরে ন শিলিং লিখতে মেল্ভিল সংকোচ বোধ করে না। কেনই বা করবে? বোতল বল্তে গেলে বাদলের হাতের কাছে রয়েছে। ইচ্ছা করলেই খুলিয়ে নিতে পারত। ইচ্ছা করেনি বলে মাফ পাবে না। দাম দিতে হবে। মিসেস্ মেল্ভিল চোখে ভাল দেখতে পায় না, আঁক কষ্তে একেবারেই জানে না, স্বামী যে ন পেনীর জায়গায় ন শিলিং লিখছে বেচারি সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা যোগ দেবার সময় টের পায় না। মেয়েকে শিক্ষিতা করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে নিজেকে শিক্ষিতা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

চার চারটে সপ্তাহ চলে গেল। মেল্ভিলদের কাছে তার ক্ষ্যাপামি বেশ লাভজনক হয়ে এসেছে। এমন সময় যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা সুধীর খামে ভর্ত্তি হয়ে হাজির হল। কে এক যোগানন্দ বাদলের খবর জানতে চান্। বাদলের স্মৃতি পশ্চাদ্গমন করতে করতে অবশেষে হোঁচট খেয়ে থাম্ল। ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্ত, বাদলের শ্বশুর। বাদলের মনে পড়ে গেল সে এই ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের একটি কন্যাকে ভারতবর্ষীয় পদ্ধতিতে বিবাহ করেছে এবং সে বিবাহ অদ্যাপি বলবৎ আছে। কি আপদ! ব্যাঙ্কের লোকগুলো কেন যে এই সব চিঠি বাদলের কাছে আস্তে দেয়। ব্যাঙ্কের উপর, সুধীদার উপর, যোগানন্দের উপর সে প্রথমটা খুব চটে গেল। এক রাত্রির তথাকথিত বিবাহের অধিকারে এক ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তার মত বিশ্বভাবুকের সম্বন্ধে অশিষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এ যে অসহনীয়। কোনো ফিলিপিনো যদি টেলিগ্রাম করে জান্তে চায়, "where is Bernard? Why Reuter's message?" তবে কি বার্ণার্ড শ তার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন?

টেলিগ্রামখানা বাদল ছুড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে তার মনে হল, এত লোক থাকতে ইনি এত অর্থ ব্যয় করে cable করলেন আমার খোঁজ নিতে। কারণ কি? তার মনে পড়ল যোগানন্দের বিগত দিনের একটি উক্তি, "চিন্তা-জগতের ঘোড়দৌড়ে তোমার উপর বাজি রেখেছি, বাদল।" আহা, লোকটা বেশ ত। বাদল টেলিগ্রামখানা উঠিয়ে রাখল। অশিষ্ট কৌতূহল নয়, যুক্তিযুক্ত উৎকণ্ঠা। বাদলের মনটা ভিজ্ল। সে টাইম্স্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, BADAL TO CAPTAIN GUPTA ইত্যাদি।

তার কয়েকদিন পরে আবার এক টেলিগ্রাম। সুধীকে মহিমচন্দ্র জানিয়েছেন যোগানন্দ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। তারপর খুসী হয়ে নিজের মনকে বল্ল, যোগানন্দ নেই। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে আমি আছি। তারপর উচ্চস্বরে বল্ল, "থ্রী চীয়ার্স্ ফর্ মাইসেল্ফ্, হিপ্ হিপ্ হুর্রে।···ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন গুপ্ত। আপনি আমাকে আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে গেলেন।"

৫

এমন অভাবিত ভাবে তার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে বাদল নিজের ঘরে নিজের খেয়াল মত কিছুক্ষণ নাচ্ল। তার মাথার উপর থেকে কত বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

সে যে আছে এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল; প্রত্যয় না থাক্‌লে সে লিখ্‌ত না, SUDHIDA, I AM. কিন্তু প্রত্যয় এক কথা, প্রমাণ অন্য কথা। প্রমাণের অভাবে সে দিশাহারা বোধ করছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ যোগ দিতেই সে দিশা পেল।

যোগানন্দ নেই, এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে বাদল আছে। বাদল না থাক্‌লে যোগানন্দের না থাকার কোনো অর্থ হত না। আবার যোগানন্দ থাক্‌লে বাদলের থাকা যদিও অপ্রমাণ হত না, তবু প্রমাণসাপেক্ষ হত। এখন কেমন অনায়াসে তুলনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একজন নেই, অন্যজন আছে।

জীবনের প্রমাণ মরণে। অস্তিত্বের প্রমাণ নাস্তিত্বে। নেতি নেতি কর্‌তে কর্‌তে ইতি ইতি। এই হল ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ। বাদলের মার্গ। আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে বাদল বিস্মিত হল যে যোগানন্দের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা তার সময়োচিত কর্ত্তব্য। খামকা টাইম্‌স্‌ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বস্‌ল, SUDHIDA, I CERTAINLY AM.

ওঃ কি আরাম! কি স্বস্তি! সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে; সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে একাকী যাত্রী অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েছে; কাল কি খাবে কোথায় যাবে তা কালকের ভাবনা; আজ শুধু কি স্বস্তি! কি আরাম!

বাদল দোতালা থেকে নেমে পড়ল। মাটীতে পা ঠেকাতে তার ভারি অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল। চলি চলি পা পা কর্‌তে কর্‌তে যেখানটাতে গিয়ে পড়ল সেখানে চার্লি ঘোড়ার পিঠ ডলছে। বাদলকে দেখে টুপি উঠিয়ে বল্ল, "গুড্‌ মর্ণিং, সার।" বাদল আলাপ জমিয়ে তুল্ল।

তিনটে ঘোড়া এগারটা কুকুর বাহান্নটা শূওর আটটা গোরু বিরাশীটা মুরগী (মায় মুরগীর ছানা)—মেরিয়ন মন্দ আয়োজন করেনি। তবে চার্লির বয়সের অনুপাতে খাটুনির বরাদ্দ কিছু কম কর্‌লে ভাল কর্‌ত। মেরিয়নকে এ বিষয়ে বলা দরকার; কিন্তু বলে লাভ নেই, তার বাবা চার্লির বুড়ো হাড় ক'খানা কবরস্থ কর্‌বার আগে অন্য লোক বাহাল করবে না।

বাদল ঘোড়াগুলোর পিঠ চাপ্‌ড়াল। কোনোটাকে সোহাগ করে বল্ল, "Old Dobbin"; কোনোটাকে আদর করে ডাক্‌ল, "Jill." শূওরগুলোর কাছে ভিড়্‌ল না। কুকুরদের কোনো কোনোটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ছোট বেলায় বাদলকে একবার কুকুরে কামড়ায়, সেই থেকে কুকুরের উপর তার বিষম সন্দেহ। যতক্ষণ শিকলে বাঁধা অবস্থায় বিশ হাত দূরে থাকে ততক্ষণ বাদল তাকে হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করে, শিস্‌ দিয়ে ডাকে। কিন্তু বেচারা কুকুর ছুটে আস্‌তে চেয়ে যেই শিকলে আটকা পড়ে এবং একবার উঁ ইঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু বিশিষ্ট অস্পষ্ট ধ্বনি করে ও একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তখন বাদল রীতিমত ভড়কে যায় ও ধীরে ধীরে পিছু হাঁট্‌তে লাগে।

মুরগী দেখে বাদলের জিবে জল আসে আর কি! মেরিয়ন তাদেরকে দানা খাইয়ে মানুষ কর্‌ছে, অর্থাৎ মুরগীই কর্‌ছে, যদিও মানুষের মত তাদেরও একজোড়া পা। সরাইয়ের অতিথিদের জন্য বাজারের মুরগী আমদানী হয়, মেরিয়ন তার মুরগীবংশ ধ্বংস হতে দেয় না। তার অসাক্ষাতে মেল্‌ভিল একটাকে জবাই করেছিল, টের পেয়ে মেরিয়ন এমন অনর্থ বাধায় যে মেল্‌ভিলকে সেই জাতের তেমনি একটা মুরগী আনিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে হয়। চার্লির কাছে গল্পটা শুনে বাদলকেও লোভ সম্বরণ কর্‌তে হল।

বাইসিক্ল থেকে মেরিয়ন নামল। সে কোথায় কি একটা কাজে গেছ্‌ল, ফির্‌ল ম্লান মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে। অনেকক্ষণ যাবত বাদলকে লক্ষ্য কর্‌ল না, যখন কর্‌ল তখন চম্‌কে উঠ্‌ল। বাদল তাকে কত কথা বল্‌বে ভাব্‌ছিল, কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেল। দু পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চঞ্চল। চার্লি ইত্যবসরে সরে গেছে বাইসিক্ল তুলে রাখ্‌তে। আকাশ সেদিন আলোর ভারে ভেঙ্গে পড়্‌ছিল। সূর্য্য যেন একটি রঙ্গিন বুড় ফল, অদৃশ্য বৃন্তে ঝুলছে। তার তেজ দগ্ধ কর্‌বার মত নয়। বাদলের মনটা আকাশের মত পরিষ্কার ছিল। সেখানেও লাল আগুনের উত্তাপহীন দীপ্তি। সে আছে, নিশ্চিতরূপে আছে, কোনোমতে অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই যে সে আছে। নেই যোগানন্দ। তিনি জগতের

কোথাও নেই একথা অবশ্য বলা যায় না, প্রমাণাভাব। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে নেই, মানবের মাঝে নেই, বাদলের জ্ঞাতসারে নেই। বাদলের মনটা অস্তিত্বের প্রাধান্যের উপলব্ধিতে ভরে রয়েছিল। তার যে হাসি পাচ্ছিল তা নয়। জ্বর থেকে উঠ্‌লে প্রথম প্রথম যেমন লাগে তেমনি। আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিল, নতুন লাগ্‌ছিল। মেরিয়নকে তার চোখে অপূর্ব্ব ঠেক্‌ছিল। মেরিয়নের দুধের মত সাদা পশমের ফ্রক্‌ তার দুধের মত সাদা গায়ের রঙের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছ্‌ল, কেবল তার গাল দুটিতে আল্‌তার আমেজ। রাজহংসীর সঙ্গে তার তুলনা হয়। সে যে বাদলকে দেখে কি ভাব্‌ছিল সেই জানে। হয়ত ভাব্‌ছিল এই মজার মানুষটিকে কোনোদিন দোতালা থেকে নামতে দেখা যায় নি; আজ এমন কি ঘটল যাতে ইনি সশরীরে আমার রাজ্যে পদার্পণ করলেন। চেহারা থেকে মনে হয় ভিন্ন দেশের মানুষ; কি জন্য এত দিন এখানে আছেন বোঝা যায় না, হয়ত খুব পড়াশুনা করেন। ভয়ানক রোগা; পেট ভরে খান না বলে মার কাছে শুনি; খেলাধূলা করেন না; দেখে বড় দয়া হয়।

তাদের দুজনকে তাদের অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার করল চার্লি। বল্ল, "ডাক্তারকে ফোন করতে হবে, মেরিয়ন। 'সেরা'র বাছুরটা কেমন কর্‌ছে।" মেরিয়ন বাদলকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

লীলাময় রায়

অপবাদ

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কায়ার কাঙাল আমি; দেহ-দ্বারে উঞ্ছবৃত্তি, ললিতার লাবণ্য-বিলাসে
আমারে ক'রেছি আজ অমানুষ মানুষের এ সমাজে,—তাই অপবাদ;
জ্যোতিশুভ্র জ্যোৎস্নারাত, মধুর মুহূর্ত্তগুলি কাটায়েছি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
বিরহের ব্যর্থতায়,—ওরা ব'লে, দেহ ছাড়া নাহি মোর অমৃতে আস্বাদ।
কায়ার কল্পনা ল'য়ে জীবন-উৎসব-পাত্র রূপ রসে পরিপূর্ণ ক'রে
প্রেয়সীর দেহ-লতা জড়ায়ে রেখেছি নাকি অকল্পিত মোর বাহু-জালে,
আকাঙ্ক্ষিতা অলক্ষ্যার সমুজ্জ্বল আঁখি-রশ্মি, নীলাঞ্জন নয়নের 'পরে
উজ্জ্বল হইয়া রব'—ইহা ছাড়া কিছু নাকি চাহি নাই কভু কোন' কালে!

অফুরান্ অভিসার, দেহ-রূপ-হ্রদে স্নান, নিখুঁত নিটোল একখানি
অনুপম নারীমূর্ত্তি কামনা ক'রেছি আমি,—কল্যাণীয়া মোর কল্পনায়—
সে নারী আসিবে শুধু দেহের দীপালী জ্বালি' এ মিথ্যারে কভু নাহি মানি,
অন্তরের আকাঙ্ক্ষায় আরো কি চেয়েছি নিত্য এ কথা জানেনা কেহ হায়!
দেহাতীত সে মাণিক জ্যোতির্ম্ময় প্রেম-রত্ন অলক্ষিতে ক'রেছে উন্মাদ,
খেয়ালিয়া উচ্ছৃঙ্খল যৌবন চঞ্চল আমি, তাই মোর এই অপবাদ।

ওরা ও আমরা

ডাঃ ডি. আর. ধর, এম-বি, ডি-টি-এম (কলিঃ) এম-আর-সি-পি (লণ্ডন)

লণ্ডন সহরের মাঝখানে ট্রাম নেই, বড় বেশি শব্দ হয়; লোকের ঘুমের ও কাজের ব্যাঘাত হয় বলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—সহরের মাঝে "বাস্" (bus) যান। আর আছে মাটির নীচে "নল-গাড়ী, "tube" অথবা underground"—এ সবই দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক ট্রেন। Lift এ করে মাটির নীচে ৫০।৬০ হাত কোনও কোনও স্থানে বা আরো বেশী নেমে গিয়ে নলের মধ্যে গাড়ীতে উঠ্তে হয়। প্রতি ৫।৭ মিনিটেই গাড়ী পাওয়া যায়। গন্তব্য স্থানে নেমে "লিফ্ট"-এ করে আবার উপরে রাস্তায় উঠ্তে হয়। এতে অনেক লোক যাতায়াত করে কারণ ইহা খুব দ্রুত, তাই সময় বাঁচে, আর লণ্ডন এর যে আবহাওয়া, বৃষ্টি লেগেই আছে বল্লেই হয় তার হাত থেকে লোকে রক্ষা পায়; তাই এই রেল কোম্পানীরা যখন বিজ্ঞাপন দেয় তখন বলে "আমরা লণ্ডন এর ছাতা" ("Umbrella of London")। এই সব ট্রেনে London এর যে কোন যায়গায় যাওয়া যায়। আর এর বড় বড় ষ্টেষণের সাথে ইংলণ্ডের নানা স্থানে যে সব steam Railway যাতায়াত করে তাদের সাথেও সংযোগ আছে। তাই লণ্ডন এর এক দূর প্রান্ত থেকে নল-গাড়ীতে এসে ইংলণ্ড এর যে কোনও যায়গায় ট্রেনে ট্রেনেই চলে যাওয়া যায়—সামান্য দু দশ গজ হাঁট্তে হয় মাত্র।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকে গাড়ীতে উঠলেই হয় খোস গল্প করে অথবা ঝিমোয় আর ওদেশে জীবনযাত্রা কঠিন বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক—যাত্রীরা কাজে যাবার মাঝে যে সময়টুকু পায় তখন খবরের কাগজ বা বই পড়ে। মুটে ভদ্রলোক সবাই খবরের কাগজ পড়্ছে ট্রেণে বসে এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করে না। এই সব কাগজে তারা সব খবর ত পায়ই, তা ছাড়া এটা দেশের লোকশিক্ষার একটা মস্ত উপায়। শুনে অনেকেরই আশ্চর্য্য লাগ্বে যে অনেক ইংরেজ যাদের ভারতবর্ষে কোনও আত্মীয় স্বজন নেই বা স্বার্থ নেই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা বিশেষ কোন খোঁজই রাখে না। তাদের পক্ষে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তাদের লাভ ক্ষতি দুইই সমান তবে যাঁরা রাজনৈতিক ব্যবসায়ী যাঁদের ভারতে ব্যবসায়ে মোটা মোটা অংশ আছে যাঁরা লাঠ বেলাঠ হন, হবেন বা হয়েছেন তাঁরাই খবরের কাগজের মধ্য দিয়ে ভারত-সম্বন্ধে লোকমত গড়ে তোলেন। আমার ধারণা যে মুষ্টিমেয় রাজনীতি বিশারদ লোক এই বিশাল পৃথিবী-ব্যাপী ইংরেজ-সাম্রাজ্য শাসন কর্‌ছে। আর তার প্রধান ভিত্তি হল খবরের কাগজ। এই সব খবরের কাগজে এমন বাছা বাছা প্রবন্ধ বেরোয় যাতে সব ইংরেজরাই জানতে পায় যে তাঁরা যা কর্‌ছেন তার চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না। সাধারণ লোকে সেই সব পড়ে সেই মতামত অনুসারে কাজ করে। বিশেষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেখেছি যাঁরা ভারতবর্ষে চাক্‌রী করে ফিরেছেন তাঁরা প্রায়ই কাগজে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন কারণ তাঁরা সবজান্তা, ভারতবর্ষে ছিলেন নিজে চোখে দেখে এসেছেন। তবে সব সময় যে তাঁরা খুব ঠিক কথাই লেখেন এবং সত্যের অপলাপ করেন না তা বলা শক্ত। অবশ্য ভাল মন্দ সব রকম লোক সব দেশেই আছে তা সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখ্তে হবে। ভারতের বন্ধু যে ওদেশে নেই দু চারজন তা বল্লে নিশ্চয়ই অন্যায় বলা হবে।

আমার মনে হয় (London) লণ্ডনএ আমাদের একটা ভারতীয় কাগজ থাকা উচিত—যারা শুধু সত্য ঘটনা বিবৃত করে এবং অঙ্ক কষে দেখাবে যে কি ভাবে ভারতবর্ষ আছে এবং এই দেড় শত বছর ইংরেজ শাসনে তার কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়েছে। এতে লাভ হবে এই যে ন্যায়পরায়ণ

এব সত্যপ্রিয় ইংরাজরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলে এবং ভারতের লোকের ইচ্ছা ও চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সহজ হ'তে পারে। যেমন আমাদের আত্মশক্তির বৃদ্ধি করা দরকার তেমনি বাইরে থেকে যে সাহায্য পাওয়া সম্ভব তাকে পায়ে ঠেলে দেওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এই খবরের কাগজের সম্পর্কে শিক্ষাসম্বন্ধে একটা দরকারী গোড়ার কথা এসে পড়ে—প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এসব দেশের লোকেরা খবরের কাগজের সাহায্যে জান্‌তে পারে কোন দেশ কেমন; তাদের কি সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি। যে সব অসুবিধা দূর করা সম্ভব তা দূর করে এবং এমনি করে তাদের উন্নতি হয় ও হচ্ছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আন্দোলন করাও যেমন দর্‌কার তেম্‌নি নেতাদের দেখাও দরকার কেমন করে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য-শিক্ষণীয় করা যায়। দেশের পক্ষে তার মত দর্‌কারী কোন কাজ হতেই পারে না। মহামতি গোখ্‌লে যা ভেবেছিলেন, সেই মত কাজ হলে তার মত পাকা কাজ আর কিছুই হতে পারত না। ওসব দেশের জনমত এত শক্ত তার কারণ তারা শিক্ষিত এবং নিজেরা ভাব্‌তে পারে।

তার পর শিক্ষা হলেই হবে না আমাদের জাতীয় ভাষায় বড় বড় দর্শন বিজ্ঞান এবং কার্য্যকারী সব বিদ্যায় বই লেখা দরকার। ইংরেজী শিখ্‌তে যা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় তা যদি দেশী ভাষায় লেখা বই পড়ায় খরচ হয় তা হলে লোকে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে অন্যান্য কাজ করতে পারে। আর ইংরাজী বা কোন বিদেশী ভাষা তাঁদের শিখ্‌তে হবেই যাঁরা বেশী জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জ্জন কর্‌তে চান, যাঁরা বিজ্ঞান দর্শনে গবেষণাদি কর্‌বেন। তবে সাধারণের পক্ষে এদের দেশে যে কোন লোক ইচ্ছে কর্‌লেই একটা পাঠাগারে পড়ে পড়ে মস্ত পণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তাকে আগে ইংরেজী শিখ্‌তে হবে তার পর হ'বে পড়া শোনা। জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে যে-জাতি এমন ভাবে বঞ্চিত তার পক্ষে বড় হওয়া খুবই শক্ত। যেমন স্বরাজ রাজনীতি ক্ষেত্রে চাই তেমনি জ্ঞানে বিদ্যার ক্ষেত্রেও স্বরাজ নিতে হবে। যতদিন পরের কাছ থেকে পরের ভাষায় শিক্ষালাভ করতে হবে তত দিন মনের দাসত্ব ঘুচ্‌বে না এবং এই মনের দাসত্বই আমাদের পরাধীনতার গোড়া।

এখন দেখা যাক কেমন করে এই সব জ্ঞান-ভাণ্ডার বাংলা ভাষায় হতে পারে। প্রথম চাই বাংলা ভাষায় সব দর্শন বিজ্ঞানের শাস্ত্রের শব্দের তর্জ্জমা বা প্রতিশব্দ—রসায়ন চিকিৎসা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সবই বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করার অনেক উপায় হতে পারে—তার মাঝে গোটা কয়েকের কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

১। বাংলা ভাষাকে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল শিক্ষার বাহন বলে ধরে খুবই ভাল করেছেন সন্দেহ নেই। এখন যদি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিজের বিষয়ে—যে সব প্রচলিত শব্দ তার তর্জ্জমা করেন—এবং ক'রে সেই সব বিষয়ে সোজা সোজা বই এবং জনসাধারণের পাঠের উপযোগী বই লেখেন তা হলে কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এটা অবশ্য আবশ্যিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইন কর্‌তে পারেন যে প্রতি অধ্যাপক তাঁদের নিজের নিজের বিষয়ের কিছু বই বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ কর্‌বেন। কিংবা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই কাজটা নিতে পারেন। তাতে তাঁরা দেশের যা উপকার কর্‌বেন তা বড় রাজনৈতিক নেতাদের কাজের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। এটা গঠন করার কথা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশী। জাতি গড়ে তোলা শক্ত কাজ, তার গোড়ায় অনেক ত্যাগ অনেক ধৈর্য্য অনেক বহুদিনব্যাপী পরিশ্রম ব্যয় করার দরকার। কথায় বক্তৃতায় জাতি গড়ে ওঠে না।

যতদিন না আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে দাসত্ব—অর্থাৎ মনের দাসত্ব—না ঘুচ্‌বে ততদিন বিশেষ বড় কিছু হবেই না। যেই মনের দাসত্ব ঘুচ্‌বে সেই দিনই—বাহিরের বাঁধন আপ্‌নি খসে যাবে। যার যোগ্যতা আছে তার কাছ থেকে প্রাপ্য বস্তু কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। ভিক্ষা করে হাতী পাওয়া যায় না—আর পেলেও তাকে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মার্‌তে হয়। আমাদের একথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার, পরের কাছে চাইবার আগে নিজেরা কি কর্‌তে পারি তাও চোখ খুলে দেখ্‌তে হবে। (ক্রমশঃ)

ডি. আর. ধর

শিল্পী শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রার চিত্রশালায় আমরা শিল্পী শ্রীমণিমোহন রায় চৌধুরীর সাতখানি চিত্রের অনুলিপি প্রকাশিত করিলাম। সাতখানি চিত্রের মধ্যে চারখানি উড্‌কট্, একটি রেখাঙ্কন এবং বাকি দুইটি সাধারণ পদ্ধতির চিত্র। এই ছবিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। চিত্রশালার প্রথম চিত্রে শুধু রেখাঙ্কনের মধ্য দিয়া জননীমূর্ত্তির অপরূপ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ চিত্রে জননীক্রোড়ে শিশুর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভাবটি সত্যই উপভোগ্য।

শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী বয়সে তরুণ। ইঁহার নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার চোঁয়া গ্রামে। কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে চার বৎসর শিক্ষালাভের পর ইনি এক বৎসর শিল্পী শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। তাহার পর ব্রতীন্দ্রনাথ ইঁহাকে শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সেখানে ইনি শিক্ষা সমাপন করেন। সম্প্রতি ইনি শিল্প শিক্ষকের কার্য্যলাভ করিয়া সিন্ধু হাইদ্রাবাদে গিয়াছেন। সঙ্গীত ও শিল্প বিদ্যা সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীনন্দলাল বসুর নিকট একটি সুদক্ষ শিল্পী চাহিয়া পাঠান। নন্দলাল বাবু মণিমোহনকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা এই নবীন শিল্পীর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক





জননী

চিত্রশালা

শ্রীমণিমোহন রায়চৌধুরী
অঙ্কিত চিত্রাবলী



গ্রামের পথে



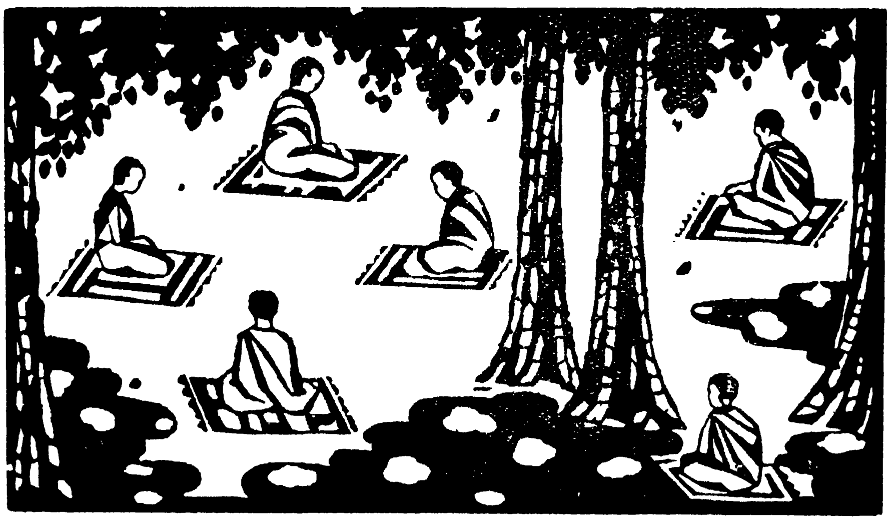
বাউল



কর্ম্মান্তে

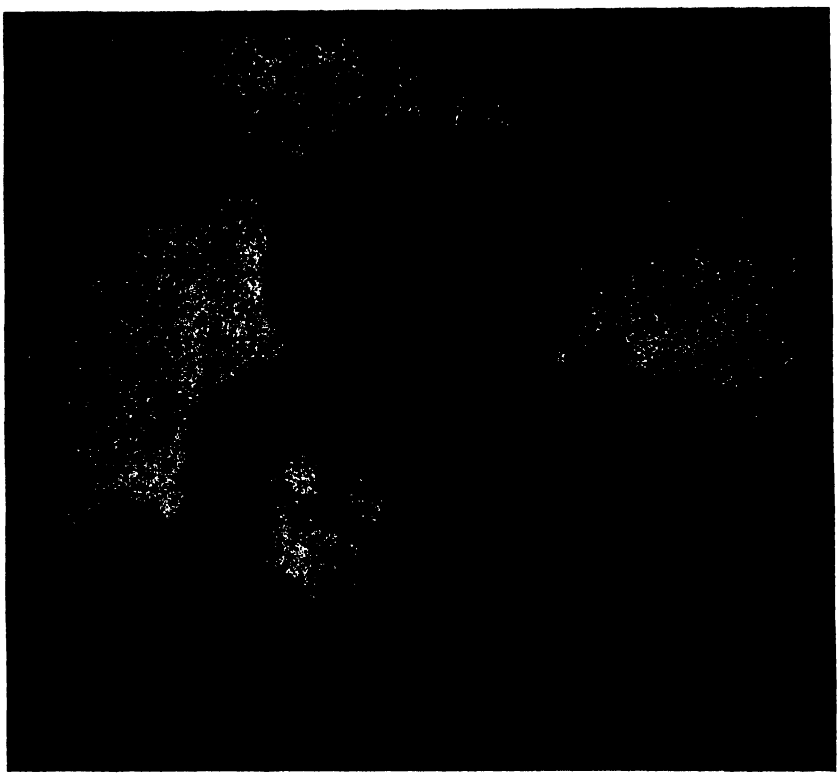


শান্তিনিকেতনের ঘণ্টা



বৃক্ষতলে অধ্যয়ন

শান্তিনিকেতন



শিশু

নিষ্কৃতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কনক অনেকেরই সহপাঠী হ'তে হ'তে ক্রমে আমারও সহপাঠী হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা সে তার বন্ধুর সংখ্যাও বেশ বাড়িয়ে চলেছিল। তারপর ফার্ষ্ট ক্লাসে পৌঁছে সে ইস্কুলের স্থাবর সম্পত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল।

কনক ছিল যেমন সরল তেমনি সহৃদয়। সে বলত,—"কি করব, অ্যাল্‌জাবরায় আমার টেষ্টই এল না, আমি ছুঁতে পারি না। ইংরিজিটে বুঝতে, বলতে আর লিখতে পারলেই ব্যস্। সেক্সপিয়ার, বাইরণ, শেলী প্রভৃতি উপভোগ করতে পারলেই হ'ল। ওর মত আনন্দের জিনিষ আর নেই। চাকরি করবার মত ইংরিজি আর রুল্-অফ্-থ্রি এসে গেছে। সে তিরিশ থেকে তিনশো পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, দিচ্ছেও দেখছি।"

শুনে আমরা হাসতুম। একদিন তার পড়ার ঘরে ঢুকে সে-হাসি থেমে গেল। দেখি বাইরণ, টেনিসন্ রীতিমত দাগ দিয়ে, নোট করে পড়েছে! রবীন্দ্র-কাব্য তার পেয়ারের পাঠ্য।

সে তখন বারাণ্ডায় বসে' একমনে সরস্বতী ঠাকুর গড়ছিল। এটা ছিল তার অবকাশ-রঞ্জন।

কনক বাপের একমাত্র সন্তান। অবিনাশ বাবু ছিলেন ব্যাঙ্কের কেসিয়ার, পয়সাও করেছিলেন। ছেলেকে কিছু বলতেন না। বরং সে কি সুন্দর ঠাকুর গড়েছে, কি তাজমহল বানিয়েছে, বন্ধুদের ডেকে তা দেখাতেন।

তার ঠাকুর গড়ায় আমাদের লাভই ছিল। সে-ঠাকুরের পূজা হোক্ বা না হোক্ ভোগটা খুব ঘটা করেই হত, এবং আমরাই তা উপভোগ করতুম।

এমন সময় তার মাতৃ-বিয়োগ হ'ল। সে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। বাড়ীতে মাষ্টার পূর্ব্ব হতেই নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে বড় বড় লেখকদের লেখা পড়তে আরম্ভ করে দিলে। একান্তেই কাটায়।

বাপ প্রথম প্রথম খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, কিন্তু সে-ভাব বেশি দিন রইল না। বছর ফিরতেই কথাবার্ত্তায়, ভাবে, পরিবর্ত্তন দেখা দিলে। তিনি যে আর কোনো কিছুতে সুখ পাচ্ছেন না, সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। মুখে একটা বিরক্ত ভাব সর্ব্বদাই সুব্যক্ত।

—"এ রকম করে' দিন কাটানো আর চলবে না,—কি করবে ঠিক করো" বলে, মাষ্টার ছাড়িয়ে দিলেন।

কনকের পুতুল গড়ার নেশা, সময় পেয়ে বেড়ে গেল। তার কি মনে হ'ল, সে মনের মত করে গড়লে,—ডেভিড্ কপারফিল্ড্ গা থেকে ওভার-কোট খুলে একজন নির্ম্মম দোকানদারকে বিক্রি করছে। চিত্রটি সর্ব্বাংশে জীবন্ত দাঁড়িয়েছিল।

বাপকে দেখাতে গিয়ে বকুনি খেয়ে এলো।

কনকের ছিল মধুর স্বভাব, মিষ্ট ভাষণ, হাস্য মুখ। সেইদিন কেবল তার বিরস মুখ দেখেছিলুন—যেন স্বচ্ছ আকাশে সহসা মেঘের সঞ্চার। সে-মুখে চিন্তার আভাসও কোনো দিন দেখিনি, সেই দিনই তার প্রথম ছায়াপাৎ লক্ষ্য করি।

সে বললে,—"আমাকে বোধ হয় বাবার আর ভালো লাগছে না। লাগবেই বা কিসে? বাজে ছাড়া কোনো কাজই তো করি না, তা আর কোন্ বাপ-মার"—এই পর্য্যন্ত বলেই সামলে নিয়ে বললে "কোন্ বাপের ভালো লাগে! "গীতাঞ্জলী" পড়ি আর পুতুল গড়ি" বলে, একটু হাসবার চেষ্টা করলে। পরে বললে "আমাদের বিদ্যে আর কাজ মানে তো যাতে পয়সা আসে? এই সোজা কথাটা কোনো দিন মনে আসেনি, ভাবিও নি। একটা কিছু ভেবে বোলো তো ভাই, তাই করতে চেষ্টা পাবো।"

"ভেবে দেখি" বলে,—ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলুম।—কাজ সম্বন্ধে নয়, কনক সম্বন্ধে।

২

হীরু কিছুকাল গ্রাম থেকে গায়েব ছিল। সে যে কোথায়, কি করছে, এ সব প্রশ্ন বড় একটা শুনিনি। এক-একজন থাকে, যার অভাব মাঝে মাঝে লোকে অনুভব করে, তার প্রসঙ্গ ওঠে, চর্চ্চা হয়। তার কোনো না কোনো গুণ তাকে খোঁজায়। হীরু কিন্তু সে কষ্ট কা'কেও দেয়নি।

দীর্ঘ দু'বছর পরে হীরু ফিরেছে। তাতেও যে গ্রামে বিশেষ সাড়া পড়তো এমন বোধ হয় না। কিন্তু শোনা গেল, হীরু কেবল ফেরেনি, একটা কিছু হয়ে ফিরছে!—জাপান থেকে পেন্‌সিল্ বানাতে শিখে এসেছে। আবার শিবু বললে, সে দেশলাই শিল্পেও এমন সার্টিফিকেট আদায় করেছে, যার একটা কাটিতে গাঁ জ্বালানো যায়!

শিবুর কথাই ওই রকম, তাই সকলে ডেকে শোনে! সকল আড্ডায় তার সমাদর। কিছু পূর্ব্বে সে হিরুর কথা শুনতে গিয়ে নাকি ওই কথা শুনেছে। শুনতেই গিয়েছিল, কথা-কওয়া কেনো? সে নাকি বলে বসেছে,—"তা হ'লে দোহাই বাবজি, আমাদের গরীবের গাঁ-খানা বাদ দিয়ে তোমার দেশালায়ের পরীক্ষাটা যেন করা হয়।"

এতে হীরু চটবে না তো কি!

যাক্, এতদিন হিরুকে বুঝিনি,—চিনতেও পারিনি। কেমন্ ফুস্ করে গা-ঢাকা দিয়ে, এতটা এলেম আদায়-করে' এলো! কার মধ্যে যে কি আছে ওপরটা দেখে বোঝাই যায় না।

কনকের জন্যে একটা কিছু কাজের চিন্তা মাথায় তো ছিলই। যদি কিছু হাত লাগে, একবার হীরুর কাছে যেতেই হয়েছে।

গ্রামের মেয়ে-পুরুষ যাচ্ছে আসছে। আশ্চর্য্য হয়ে কত কথা বলতে বলতে ফিরছে। রমা-পিসি ফিরছিলেন, দেখা হওয়ায় বললেন,—"রাজ্যির লোক দেখে এলো, তুই এখনও যাস্‌নি! যা যা, একবার দেখে আয়। গাঙ্গুলিদের ন' গিন্নি কি রত্নই গব্বে ধরেছে,—গাঁয়ের মুকোজ্জ্বল! ঐ-টুকু ছেলে সাত সুমুদ্দুর পারে গিয়ে, বিদ্যের জাহাজ হয়ে এসেছে। দু'টো কাটি দিয়ে ভাত খেলে, যেন ফুল-খুঁটি খেললে! অবাক করে দিয়েছে। আহা—মাগির বড় কষ্ট ছিল,—বেঁচে থাক্।"

পেসাদি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বললে,—"ঝাঁপান, সে কি এখানে গা, কোন্ পচ্ছিমে! একরত্তি ছেলের কি বুকের পাটা গো!"

* * * *

যেতেই হ'ল।

একজন ফিরছিলেন, বললেন—"এই নেয়ে এসে বসলো"।

বিকেলে নাওয়া?

"শুনলুম ছ'বার নায়,—শোবার আগেও একবার।"

গিয়ে দেখি হীরু একখানা নতুন 'বেণ্টউড' চেয়ারে বসে। তার শ্যামবর্ণটা অনেক সাবান খেয়ে, এবং ঘসে-কোচ্‌লে,—ধোয়া মাগুর মাছের মত দাঁড়িয়েছে। গায়ে সার্টের উপর সবুজ সিল্কের লুঙ্গি, পায়ে মোজা আর স্যাণ্ডাল, হাতে জাপানী পাখা। সবই জাপান থেকে ফেরার পরিচয় দিচ্ছে।

'এই যে, এসো' বলে, বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা কায়দায় আহ্বান করে,' পৈত্রিক মোড়াটার দিকে ইঙ্গিৎ করে' বললে,—"ভালো ত' সব?"

বললুম—"মন্দ কি। অ-ভালো থাকাটা অভ্যাস হয়ে গিয়ে সেটা এখন ভালো থাকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে,—বেশ আছি।"

"There,—ঐতেই তো দেশ মরেছে। ভালো থাকবার চেষ্টাও নেই যে। দেখে এসো একবার ও-সব দেশ,—রাত ১২টায়ও 'সেলুন খোলা পাবে। চুল ছাঁটো, খেউরি হও—যা ইচ্ছে। আর এখানে সারা গাঁ-খানার মাথা, সেই এক বেটা কিনে রেখেছে! এদেশে লোক ভালো থাকে, না উন্নতি হয়? দু' বছর পরে আজ 'ডায়ারিতে' এই প্রথম 'বে-খেউরি' লিখতে হ'ল! কম দুঃখের কথা?"

বললুম—"দুঃখের কথা ভাই অনেকই আছে, দু'বছরে এত দ্রুত সে সব ভোলবার শক্তি আয়ত্ব করলে কি করে? থাক্, সে কথা পরে হবে। এখন কিছু শোনাও হীরু—কি কি শিখে এলে? কি করবে ঠাওরাচ্চো?"

গলাটা খোলসা করে নিয়ে, বেশ ভারিক্কি ভাবেই হীরু আরম্ভ কল্লে,—"সব যে সায়েন্সের কথা,—বুঝবে না তো।

ও-সব দেশে শ্যালক শ্যালিকা স্বজনাদির মত সায়ান্সও সংসারের আত্মীয়দের অন্যতম। প্রত্যেক কাজে প্রতি পদক্ষেপে সায়েন্সের সম্পর্ক। সাধনা ভিন্ন, তার অন্তর্গূঢ় মহিমা উপলব্ধ হয় না,…বুঝলে ?"

তার ওই 'অন্তর্গূঢ়'ই আমাকে 'অতিষ্ঠ করে' দিলে। নেকামী বরং সহ্য হয়, জ্যাঠামী একদম জ্বালিয়ে দেয়। বললুম—

'যখন বুঝতেই পারব না,—থাক্। সময় নষ্ট কোর না। শুনলুম পেন্‌সিল বানাতে শিখে এসেছ নাকি ? তা হলে' ভারতের বিদ্যার্থীদের অর্দ্ধেক অভাব এক বাংলাদেশই মিটিয়ে দিতে পারবে ; আর তুমিই তার 'পায়োনিয়ার্' রূপে যশের অধিকারী হয়ে, আমাদের গ্রামের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে দেবে। এটা আমাদের কম্ গর্ব্বের কথা নয়। আজকাল পেন্‌সিল্ আর 'নোট্‌বুক'ই লেখাপড়ার প্রধান উপকরণ।"…

বললে—"Not so easy my friend—অত সহজ নয় বন্ধু! লেকড়ি কোথায় ? তোমার তাল, শাল, তমালের আস্ফালনে, ও মাল জন্মায় না। দেশের একটু ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। সেরা সেরা কাট সব পুড়িয়েই সেরে দিলে। এক শবদাহের জন্যে, একা সুন্দরবনই লাকো লাকো মোণ দিয়ে সাফ্ হয়ে বসলো! এত বড় মূর্খ দেশ আছে ? মরেও দেশকে মেরে যায়! এই সৃষ্টিছাড়া দেশটি ছাড়া, আর কোথাও পোড়াবার কুপ্রথা নেই। সেটা জানো তো ?"

হীরুর চিন্তাশক্তিও বেশ বেড়েছে দেখছি। বললুম—"আরো যে কি কি আদায় করে' এসেছ' শুনলুম, দেশালাই না কি ?"

"তাতেও লেকড়ি! তা ছাড়া তাদের কাছে বাক্যদত্ত আছি—দ্বাদশ বৎসর ওতে হাত দেব না। তাদের ভয়, ইণ্ডিয়ার ফিল্ড তাদের মাটি হয়ে যাবে। বেইমানী করতে পারব না,—সেই সর্ত্তে শিক্ষা।"

"ইস্—তাই তো! ওটা যে বড় দরকারি জিনিষ ছিল। প্রত্যেক ভদ্রসন্তানের নিত্য এক বাক্স চাই-ই। বোধ হয়—গাড়োয়ানদেরও।"

হীরুর প্রশ্ন-দৃষ্টি দেখে বললুম,—"দেশে যে আর সিগারেট ছাড়া ভদ্রসন্তান নেই। সময়টা বেশ ভালো ছিল, ফিল্ড্ দিন দিন ফ্যালাও দাঁড়াচ্ছে, কুলি মজুরেরাও কোমর বেঁধে ঝুঁকেছে। যাক্, সে এরপর ভেবে দেখো। শুনেছি জাপানীরা নাকি হোম্-ইণ্ডাষ্ট্রির হারকিউলিস্, সেখানে আর কি কি শিক্ষার সুযোগ আছে ?"

"কিসের নেই—তা বরং জিজ্ঞাস্য করতে পারো, এস্তোক্ চুল বাঁধা। খোঁপাই হাজারো রকমের।

—"এই বিনি, বাইরে আয় তো" বলে হাঁক্ দিলে।

চার বছরের চেহারা নিয়ে আট ন' বছরের একটি মেয়ে, যেন পেছু হটে বেরিয়ে এলো। এটা আমারই দেখবার ভুল হয়েছিল। তার মাথা থেকে খোঁপাটা, পেছন দিকে এমন ঠেল্ মেরে ৭ ইঞ্চি বেরিয়ে রয়েছে, হঠাৎ দেখলে সেইটাই সামেন দিক্ বলে ভ্রম হয়। মাথাটি একদম ডুডুপাখীর মডেল্ দাঁড়িয়ে গেছে।

হীরু সোৎসাহে বললে,-"এই ছাখো, এও একটা বিদ্যে—চারু শিল্প। সে সব দেশ কি! এক্ চুলবাঁধা শিখে হাজার হাজার মেয়ের পেট চলে।"

সুখ্যাত করতেই হ'ল।

বললে,—"তারপর—পাখা, পুতুল, 'পটারি' সিল্ক্, ফ্লাওয়ার, পেন্টিং,—কতো বলবো ?"

আমি আর কথা বাড়ালুম না, বললুম—"কনককে তোমার মনে আছে তো ? দেখি তার যদি সখ্ হয়"…

"তা যায় তো মানুষ হয়ে ফিরতে পারে। ইংরিজিতে কথা কইতে পারবে কি ?—আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও"…

"সেই ভালো কথা" বলে আমি উঠে পড়লুম। ভাবতে ভাবতে ফিরলুম—আর কিছু হোক্ না হোক্, গ্রামে একজন মুরুব্বি বাড়লো।

৩

আমার কাছে সব শুনে, একটু ম্লান হাসি টেনে কনক বললে,—"নিম্নে আনন্দ-আন্দোলিত অসীম সিন্ধু, উপরে বিশ্বজোড়া সুনীল চন্দ্রাতপ, তার মধ্যে ভেসে বেড়াবার সাধ

আমার বহুদিনের। কিন্তু তা সার্থক হবার পথ কোথায়? তুমি পুতুল-পটারির কথা বলচো, আর বাবা সেদিন কি বলেছেন জাননা তো!—"এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, কুমোর বাড়ি নয়। অনেক সয়েছি,...আমার একটা মান সম্ভ্রম আছে, মনে রেখো।"—তবে ও-সব শুনে আমার আর কি হবে ভাই?"

বললুম, "ওঁদের ভদ্রতা বজায় রাখবার মত একটা অন্য কিছুর নাম করলেই তো"—

"না ভাই, মিথ্যে কিছু বলতে চাই না! যাই তো ভাস্কর্য্যেই আমার ঝোঁক"...

কথা এগুতে পেলে না, অবিনাশ বাবু প্রসন্নমুখে এসে বললেন, "কি রে কনক, কিছু শিখতে জাপানে যাবি? সে সাহস আছে?"

পরে আমার দিকে ফিরে, "এই যে তুমিও আছ। ওকে বোঝাও দিকি। গেলে মানুষ হয়ে আসতে পারে। সঙ্কল্পের জোর চাই। এই দ্যাখো না গাঙ্গুলিদের হীরু,—কবে গ্যালো, কি করে গ্যালো, জানিও না! Where there is a will, কিছু আটকায় না। এমন পেন্‌সিল্ বানাতে শিখে এসেছে, এর মধ্যেই রাধা-বাজারের বিশ্বেসরা এগ্রিমেন্ট করতে চায়! আবার বরিজহাটির একজন বিশিষ্ট লোক জামাই করবার জন্যে কাজ কামাই করে', গাঙ্গুলির দ্বারস্থ হয়েছেন, দেখে এলুম। বিদ্যে এমনি জিনিষ,—চার-দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে।"

বললুম—"আপনি গিয়েছিলেন বুঝি?"

"যাব না? ও যাতে দশজনের একজন হয় সে চিন্তা আমার দিন রাতের। তার উপায় আমাকেই তো দেখতে হবে। একবার দেখে এসো গিয়ে, জার্ডিনের বাড়ির বিল্-সরকার সেই শ্রীনাথ গাঙ্গুলির আজ পায়া কত বড়। ভদ্রলোক পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উঠেছেন, গাঙ্গুলি সাত হাজার বলে' বাড়ির মধ্যে চলে গেল! ও-রূপ সম্ভ্রান্ত লোক ও-ভিটে কখন মাড়ায় নি। বিদ্যের কদর এতখানি।—যাবি তো বল?"

বললুম—"যাবে না কেনো? আপনি পাঠালেই যাবে।"

অবিনাশবাবু বললেন,—"ওর জন্যে আমি কি না করতে পারি? কখনো কি কোনো বিষয়ে না বলেছি? ওই আমার একমাত্র সন্তান, ওর যাতে ভালো হয়, সে চেষ্টা আমি পাব না? ও যদি যেতে চায়, আজই আমি স্পেসি-ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়ে দিচ্ছি। তাদের ম্যানেজারকে বলে, সেখানে সব সুবিধে করিয়ে দিতেও পারবো। কি বলিস্ রে?"

কনক বললে,—"যাব না কেনো, আপনি সব ঠিক্ করে' ফেলুন।"

"দেখিস, শেষ আমাকে যেন অপদস্থ না হ'তে হয়।"

কনককে বললুম—"বেশ ভেবে চিন্তে, না হয় কাল বোলো।"

আমার কথাটা অবিনাশবাবুর নিশ্চয়ই ভালো লাগে নি। তিনি বললেন,—"বিদ্যে শিখতে যাবে, তাতে আবার অতো ভাবা-চিন্তার কি আছে?"

কনকই জবাব দিলে "আমি তো বলেছি, আবার কি বলবো?"

অবিনাশবাবু বললেন,—"বেশ, তা হলে—settled—আজ শনিবার, আসছে বেস্পতিবার জাহাজ ছাড়বার দিন, মাঝে চার-পাঁচ দিন পাচ্ছো, তয়ের হও।"

বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

দু'জনে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করলুম। মানে, সহসা এমনটা কেউ আশা করি নি। তাঁর এতটা স্নেহ-উদার ভাব, কিছুদিন কেউ দেখি নি। বললুম—"বস্, আর কি, তয়ের হয়ে পড়ো।"

কনককে কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখলুম। এই ঈপ্সিত অথচ অপ্রত্যাশিত পাওনাটা তাকে যেন অবিমিশ্র আনন্দ দেয় নি, কোথায় যেন অস্পষ্টতা আছে।

বললুম—"কি হে, কথা কইছ না যে?"

"না, তবে দাদামশাই আর দিদিমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে তাঁরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হবেন, দুঃখও করবেন। কিন্তু ভাগলপুর যাওয়া আসার সময় আর কই? এর পরের জাহাজে গেলে কি হয়?"

বললুম—"না কনক, যদি যাবার সঙ্কল্প করে' থাকো

তো ও-কথা আর তুল না ভাই, শুভস্য শীঘ্রম্। দাদামশাইকে অবস্থা জানিয়ে, অনুমতি দিতে আর আশীর্ব্বাদ করতে লেখো ."

কনক তাই করলে।

* * * *

বেস্পতিবার তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলুম। বাড়ি ফেরবার সময়, ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মত মনে হ'তে লাগলো। কনকের ম্লান মুখখানা মনে পড়ে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল। কথার মধ্যে বললে—"মা'কে কেবল মনে পড়ছে।" ব্যথাটা চাপতে গিয়ে, তার দীর্ঘশ্বাসটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল!

দিন-দশেক বড় একা-একা ঠেক্‌তে লাগলো! কনকের সেই সুমিষ্ট হাসি, আত্মভোলা সরল প্রকৃতি, সন্ধ্যার পর টেনে নিয়ে গিয়ে কবিতা শোনানো, 'সমুদ্রের প্রতি', 'বালিকা বধূ,' 'হ্যাম্লেট্'—শুনতেই হবে!—"বহু ভাগ্যে আমরা রবীন্দ্র-যুগে জন্মেছি,—না? আচ্ছা, বেশি শোনাব না, আজ কেবল তাঁর 'পুরস্কার' আর 'সেকাল'। হ্যাঁ—আর কেবল এইটি—'সুদূর'। কেমন?"

এই ভাবে কখন যে রাত এগারটা বেজে যেত জানতেও পারতুম না। তার পর তাদের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করতে করতে, আমাকে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত। কাল, 'কল্যাণী' শুনতে হবে, দেখো কি পবিত্র!"

জাপান যাত্রার পূর্ব্বরাত্রে আমাকে "প্রবাসী" আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' শুনিয়ে বললে, 'কি আর শোনাবো, সবই রয়ে গেল! কাঙালকে যেন রত্নভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন!"

কাব্যই ছিল তার অবলম্বন, সঞ্জিবনী, প্রিয়া। জাহাজে তুলে দিয়ে, 'পাথেয়' বলে, তার হাতে রবিবাবুর 'নৈবেদ্য'-খানি দিলুম। সে তা মাথায় ঠেকিয়ে, 'my all' বলে নিলে।

সে চলে গেল, আমারও অনাবিল আনন্দের দিন যেন ফুরিয়ে গেল। তার সেই—"মা'কে কেবলি মনে পড়ছে," কানে রয়ে গেল।

* * * *

আজ মাত্র এগারো দিন—কনক চলে গেছে। মা গঙ্গা স্নান করে' বাড়ি এসে বলছেন, 'কনকের নতুন-মা দেখে এলুম। বেশ বড়োসড়ো মেয়েটি,—বছর সতেরো হবে। তবে 'প্রতিমার' মতো কোনো খানটাই নয়। অমন ছেলে থাকতে, আবার এ কি! আহা, তাই বাছাকে সাত তাড়াতাড়ি বেস্পতিবারে বিদেয়"···

আমি তখনো বিছানায়। সংবাদটা যেন বিষাক্ত বাণের মত লাগলো। উঠে পড়লুম।—"তুমি দেখে এলে মা?"

"হ্যাঁ রে। শুনলুম শিবপুরের মেয়ে।—'প্রতিমার' কড়ে-আঙুলের যুগ্যিও নয়, পুরুষালি গড়ন। অবিনেশটা কি বেহায়া! চাকরটাকে চেঁচিয়ে বলছে—"ওরে ছাখ্, ছাখ্ চা খাওয়া হয়েছে কি না। সে কি ব্যস্ততা!"

মনে পড়লো, সে দিনকার তাঁর সেই স্বতঃ প্রবৃত্ত স্নেহ-উদার প্রস্তাব, মুক্ত-হস্ত ব্যবস্থা! সেই বৃহস্পতিবারেই কনককে বিদেয় করবার তাই এত দরকার ছিল! ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল। কনকের সেই 'মা'কে কেবলি মনে পড়ছে' মনে হয়ে, আর তার অন্তর্নিহিত বেদনাটা পরিস্ফুট হয়ে, আমার অন্তরটা টন্‌টন্ করে উঠলো। মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরুলো,—"এখন্ আরো মনে পড়বে ভাই"।

৪

এক বছর কেটে গেছে। কনকের পত্র পাই, জাপানে সে ভালই আছে। তার নতুন-মা'র সংবাদ তাকে দিতে পারিনি।

দ্বিতীয় বৎসরের পত্রে বুঝলুম, সংবাদটা সে পেয়েছে, সম্ভবতঃ তার দাদামশায়ের কাছে। আমার আর তাকে জানাতে বাধা রইল না,—তার একটি ভাই-ও হয়েছে।

* * * *

হীরুই উত্তর-সাধক রূপে, পিতা পুত্র উভয়কেই সাহায্য করেছে। তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরটা নেওয়াও আমাদের উচিত, অন্ততঃ ভদ্রতা রক্ষার্থে।

হীরুর বিবাহ হয়ে গিয়েছে। গাঙুলী মশাই খুব উদারতা দেখিয়ে, কন্যা-কর্ত্তাকে বলেন,—"ভদ্রলোক

হিন্দুঁর-বাড়ি এসেছেন, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করে' ফেরাতে পারি না। আমরা সামাজিক লোক, তাতে গাঁয়ের মাথা হেঁট হয়। যাক্, আমার ও সাত হাজারও যাক্ আপনার পাঁচ হাজারও যাক্, উভয়েরি কথা থাক্, আপনি মাত্র ছ'হাজার একশো এক টাকা দেবেন। ব্যস্—হ'ল তো? এ বংশ তেমন নয় যে, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করে' শুধু হাতে ফেরাবে! নিন্ এখন ছেলেকে মন-খুলে আশীর্ব্বাদ করুন। ও-ছেলের তুলনায়, ছ'হাজার কেনো, ছ'-লাকও ছ'কড়া। যে বিদ্যে শিখেছে, তা কেবল পেটেই কুলোয় না, হাত দিয়ে বেরয়"...

ভদ্রলোকটি কি বলতে গিয়েছিলেন, অমনি শিবু বলে' ওঠে—"এর ওপর আর কথা নেই, আপনি নির্ব্বিঘ্নে আশীর্ব্বাদ করুন। দেখলেন না, কতো ব্যয়ে এ মাল্ উতরেছে, গাঙুলী মশাই সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না···

গাঙুলী মশাই ঝটিতি কাণে হাত দিয়ে,—"রাম কহো রাম কহো, ব্যয়ের কথা মুখে আনতে আছে শিবু? সে যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, তার সুদের টাকা বাড়ি ঢোকে তো···হুঁঃ···"

শিবু বললে,—"যাক্ সে কথা। হীরু যে রকম ছেলে, বাগবাজারের পোলের এ-পারে ও রকমটি আর দ্বিতীয় পাবেন না,—সহরতলির প্রথম ফল। দেখবেন এক পেন্‌সিলেই ও আমাদের মতিশীল বনে' যাবে। তার ওপর দেশালাই তো হাতেই রইলো। একদিন দেখবেন তার শুভ সংযোগে—চারদিক—কুরকুট্টি!"

শিবু বেয়াড়া মারছে দেখে, গাঙুলী মশাই চট্ হেসে বললেন,—"বেয়ায়ের সঙ্গে এখুনি যে খুব আপনার হয়ে' পড়লে? বাজে কথা থাক্,—আজ কিন্তু এইখানেই এক সঙ্গে ...বুঝলে?"

ভদ্র লোকটির না-হেসে উপায় ছিল না, এবং আশীর্ব্বাদ না করেও নিস্তার ছিল না।

হীরুর বিবাহও যথা সময়ে হয়ে গেছে। আজও সেই 'লেকৃড়ির' সন্ধানই চলছে।

ইতি মধ্যে—মিছে বসে' থেকে কি হবে,—দেশটা ওই করেই গোল্লায় গেছে, এই বলে হীরু 'যেসফ' কোম্পানীর বাড়ি ৩৫৲ টাকা মাইনের চাকরি সুরু করে' দিয়েছে। whatever comes first, এই তো চাই। একেই বলে—moral courage.

বছর দুই পরে গাঙুলী মশার বেই একবার এসেছিলেন। তাতে গাঙুলী বলেছিলেন, "ভায়া দেখছেন তো, ও আমার লগ্ন-চাঁদা ছেলে! বসে' থাকবার বাচ্চা নয়। যদ্দিন না 'লেকৃড়ি' পাচ্ছে, অন্ততঃ 'নুনের' টাকা কামাবেই!—"

—"তোমার মনে আছে তো শিবু, ভাদ্রের সেই ভীষণ রাত্রের কথা? কি দুর্যোগ! কি ডাক্! ঝড় বৃষ্টি, বিদ্যুৎ বজ্র। কিছুই দৃক্‌পাৎ না করে' হীরু ভূমিষ্ট হ'ল।"

শিবু সোৎসাহে বললে—'মনে আর নেই, সে কি ভোলবার কথা? চণ্ডীমণ্ডপে বসে আপনি দুর্গা নাম জপ করচেন, আমি হুঁকো হাতে করে, হতভম্ব,—টান্ ভুলিয়ে দিয়েছে! শাঁক্ বাজলো,—তামাক টেনে বাঁচি! দেব জন্ম, দেব জন্ম! ও অসাধারণ হবেই।"

শুনে বেইমশার খুসি হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে, দীর্ঘনিশ্বাসটা ফেলে ছিলেন বেই-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে। লোকের দুঃখ-দুর্ভাবনা বহন করবার জন্যেই পথগুলো বুক্ পেতে থাকে, তাই রক্ষে।

* * * *

শিবুর গতি সর্ব্বত্র। সে বলে' বেড়ায়,—হীরু ব্যাভেরিয়া থেকে 'লেকৃড়ির' বীজ আনিয়ে বুনেছে,—গ্রামময়। এ আমার স্বচক্ষে দেখা। তোমরাও দেখবে যখন পিল্‌পিল্ করে, চারা বেরুবে। এই বেরয় বলে'।

বর্ষা নাবতেই চারায় গ্রাম ছেয়ে গেল! দাঁড়ালো শেষ—'কাল্‌কাসুন্দে'য়।

শিবু বললে,—"বেটারা সাফ ঠকিয়েছে-কি জোচ্চোর! এ সব 'হটিকল্‌চাল্' জুচ্চুরি। এখন বলে' কিনা, দেশের মাটির দোষ! বললেই হোলো? চিরকাল শুনে আসছি, আমাদের 'স্বর্ণ-পশু' ভারত, তানা তো হীরুর মত ছেলে জন্মায়? আর আজ বলে কি না···হুঁঃ—বললেই হোলো! হুঁঃ···"

গাঙ্গুলী মশাই বেশ নির্ব্বিকার ভাবে বললেন, "জানি ধর্ম্মের-ঘরে পাপ সয় না। ও জানা কথা। চুলোয় যাক্, কাজ নেই আর জোচ্চোরদের সঙ্গে কারবারে। চিরকেলে ঋষি বংশে ও সব সইবে কেনো। হীরু আমার ধর্ম্মপথে থেকে—'যেসফের' বাড়িতেই বাড়ুক্,—সনাতন ধর্ম্ম বজায় থাক্।"

বরিজহাটির বে'ই মশাই—লেক্‌ড়ির বীজ আনাতেও নাকি স'দেড়েক টাকা এড্‌ভান্স্ করেছিলেন! গাঙ্গুলী মশার কথা শুনে, তিনি আজ শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে'—'আ-মেন্' বললেন।

৫

ইতিমধ্যে প্রায় চার বৎসর অতীতের আশ্রয়ে গিয়ে পড়েছে। দিনও কেটেছে রাতও কেটেছে, তারা নিয়মিত এসেছে গিয়েছে। দুঃখও দিয়েছে, সুখও দিয়ে থাকবে। আমাকে দেয়নি কেবল একটা অকেজো আনন্দের ফাঁক, অকারণ পুলকের বাতায়ন।

কনক না থাকায়, সেইগুলি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়-কর্ম্ম লাভ-লোকসান আর রোজগারের রপটে, জীবনটাকে যেন লোহার নীরেট্ কল্ বানিয়ে দিয়েছে।—স্বস্তির একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়বার, বাধামুক্ত ফাঁক্ পাইনি। সে কী দৈন্য! সব থাকতেও, অতি বড় দুঃখির মত দিন কেটেছে! হিসেব, দুর্ভাবনা আর উপায় চিন্তা।

আজ রাত-পোয়ালে—'হিরোশী' জাহাজে কনকের কলকেতা পৌছুবার কথা। কলকেতাতেই রইলুম তাকে পাবার আনন্দে। প্রভাতের প্রত্যাশায়—ঘণ্টাগুণে রাত কাটালুম। ভোরে উঠেই জেটিতে গিয়ে উপস্থিত।

জেটি তখনো লাগেনি। শীতল প্রভাত বায়ু আর জাহ্নবী-জল-কল্লোল উপভোগের মধ্যে, প্রত্যাশাপন্ন চিত্ত, চঞ্চল হয়ে, এক একবার জলপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে, সুদূর সীমান্তে, লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে—'হিরোশী' আমার চক্ষে, উষসীর মন্থর গতিতে এসে স্থির হ'ল। আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আরোহিদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি,—সহসা চম্‌কে দিয়ে কনক আমাকে জড়িয়ে ধরে' বলে' উঠলো, "আমি জানি—তুমি আসবেই"।

মুখে সেই সরল হাসি, "আমি জানি, আমি জানতুম" ...তার পরই গঙ্গার দিকে চেয়ে, মুক্ত করে—

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর—জীবন জুড়ালে তুমি।"

শুনে আমার দেহ মন আনন্দে দুলে উঠলো,—"সেই কনকই আছে; বাঁচলুম।"

বাক্স বাণ্ডিল দেখে শুনে নিতে, কিছুক্ষণ গেল। তার পর গাড়ী করে বাড়ি-মুখো। পথে এলো-মেলো কত কথা। একটা না ফুরুতে একটা, কোনোটারই সমাপ্তি নেই!

বরাহনগর পার হতেই সহসা সে বলে' উঠলো, "এসে গেলুম যে"!

উৎসাহ উত্তেজনা দপ্ করে' নিবে, তাকে নীরব করে' দিলে। মুখ থেকে প্রাণ-চাঞ্চল্যের খেলা মুছে গেল!

বললুম—"চুপ করলে যে?"

বললে,—"না,—বাবা এতক্ষণ বোধ হয় বেরিয়ে গেছেন?"

বললুম—"সময় হয়েছে বটে, তবে আজ তা যাবেন না।—ঐযে আপিসের কাপড় পরে',—তোমার ছোট ভাইটিকে কোলে করে', বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন"।

গাড়ি থামতেই কনক নেবে গিয়ে, বাপকে প্রণাম করে', তাঁর কোল্ থেকে ভাইটিকে নিলে।

অবিনাশবাবু সোৎসাহে বললেন—"খোকোন্ কি শান্ত দেখছো!" তার দিকেই হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে, একাগ্রে চেয়ে রইলেন।

তার পরই, "কোন্ ঘরে থাকবে বলো দিকি? এখন তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে অনেকেই আসবে দেখচি। ভেতরে ·"

তাঁকে শেষ না করতে দিয়ে কনক বললে,—"বার-বাড়িতেই আমার সুবিধে হবে বাবা।"

"সেই ঠিক্। তবে তাই ঠিক্ করে নাও। তোমার অসুবিধে না হলেই হ'ল। আর ছাখো সে পুরোনো

ঝি-চাকর নেই। বিমলি আর বাসদেবকে বললেই, তারা সব ঠিক্ করে দেবে,—আমি তাদের বলেও যাচ্ছি। বাড়ীতে শাশুড়ী ঠাকরুণও আছেন,—কোনো অসুবিধে হবে না। আচ্ছা,—আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে,—কথা-বার্ত্তা সব এসেই হবে"।

কনক বাপের সঙ্গে ভেতর-বাড়ি গিয়ে, সকলকে প্রণাম করে' এলো।

বাইরে এসে অবিনাশবাবু—'make yourself Comfortable' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

* * * *

দু'জনে মুখ চাওয়াচায়ি করলুম। তার পর মিনিট-দুই নিৰ্ব্বাক।

'এসো, ঘরটা গুছিয়ে ফেলি' বলে, তাকে টেনে নিয়ে, বাক্স, বেডিং ঘরে ঢোকালুম।

বাসদেব বেরিয়ে এসে বললে—"থাকতে দিননা বাবু, মা ঠাকরাণের কাজগুলা সেরে তুলে দিবথুন"।

বললুম,—"থাক্ আমরাই তুলে নিচ্ছি। তুমি কাজ কর'গে"।

কনক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে—"তুমি এখন যেতে পাবে না ভাই"···

সেটা আমি বুঝেই ছিলুম।

বললে,—"চলো, গঙ্গাস্নানটা করে' আসি।"

বললুম,—"ঘরে তালা দিয়ে যাওয়া চাই কিন্তু"।

"সেটি আমি পারব না ভাই, সব বন্ধই আছে।"

বললুম—"তা হলেও, টাকাকড়ি থাকে তো বার করে' নাও।"

"তবে তোমার কাছে রাখো" বলে, 'পকেট্ কেস্‌টা বার করে' আমাকে দিলে।

স্নানান্তে তার খাওয়া হলে, তাকে শুতে বলে' বাড়ি ফিরলুম।

সে নীরস হাসি টেনে, পূৰ্ব্বাভ্যাস মত বললে—

"ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মাল্যর ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাসনে কো কুড়াতে।"

বাড়ি ফিরে—মা'কে সব বললুম। মা চোখের জল মুছলেন।

* * *

কনকের তিনটে দিন কোনো প্রকারে কাটলো। বললে "খাবার সময় বাড়ির মধ্যে যেতেই হয়। নতুন মা ঘোমটা দিয়ে কক্ষান্তরে সরে যান। আজ তাঁর মা কথা কয়েছেন, "বেটাছেলের কি বাড়ি বসে' থাকা ভালো দেখায় বাবা, তোমার যা ভালো লাগবে কেনো, তাকি আর বুঝিনা", ইত্যাদি।

এই বলে কনক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে "এখন কি করতে বলো ?"

"তোমার বাবা কি বলেন ?"

"তিনি পটারির সার্টিফিকেট্ থানার ওপরই জোর দিলেন, বললেন—"ওইটাই লাভের কাজ। তা হলে 'সেয়ার' খুলে, ধনীদের ধরতে হয়। ও-কাজের 'ফিল্ড' বেহার। ওই অঞ্চলে ফ্যাক্‌টরি খোলবার চেষ্টা পাওয়াই ভালো। ভাগলপুর ধনী-প্রধান স্থান, তোমার দাদামশায়ের সাহায্যও পাবে। ও-প্রদেশে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। বুঝলে ? সেই চেষ্টাই করো। বসে থাকলে মাটি হয়ে যাবে, সেটা আমি পছন্দ করিনা।"

'শুনলে' ? বলে, কনক হাসলে।

"তুমি কি ঠাওরালে ?"

"আমি ওই সুবিধাই খুঁজছিলুম। বললুম "কাল শনিবার, কালই রওনা হই, সময় নষ্ট করব না"। শুনে তিনি উৎসাহের সহিত বললেন 'এই তো চাই। তোমার দাদামশায়ের বয়স হয়েছে,' এই বেলা তিনি থাকতে থাকতে, বুঝলে ?" ইত্যাদি—

"তার পর ?"

"তারপর, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু, অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্যে। কি বলো ? কে আর আছে, কা'কে বলবো" ?

শুনে বড় লাগলো, চোখে জল এসে গেল। বললুম, "বাড়ির মোহ কাটাবার ইচ্ছে নাকি ?"

"মোহ? সে তো মা'র সঙ্গে মুছে গেছে ভাই"। তার ওষ্ঠপ্রান্তে স্নেহ-কাঙাল প্রাণের হাসি, অস্ফুটই থেকে গেল, —যেন গভীর বেদনার 'ছায়া-ছবি'!

তারপর করুণ কণ্ঠে আবৃত্তি করলে—

"ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।"

ভাগলপুর যাত্রার সময়, অবিনাশবাবু কর্ত্তব্য সারতে ভুললেন না,—ছেলেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। তার সংক্ষিপ্ত সার,—"পুরুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া চাই—আত্ম-নির্ভরশীল হতে চেষ্টা পাওয়া, ও তা হওয়া। যেহেতু তা হওয়াই চাই এবং সেটা হতেই হবে,—ইত্যাদি।

বেরুবার সময় কনকের কণ্ঠ হতে 'দুর্গা' নামটা এমন সুরে বেরুলো, সে যেন আসন্ন বিপদ উত্তীর্ণ হ'ল।—সেটা আমাকে স্বস্তিই দিলে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম-পাড়ানি

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

(১)

চুপ্‌টি ক'রে ঘুমাও গো মোর দুষ্টু মেয়ে,
আমার বুকে মুখটি লুকাও আজ।
নাম্‌লো রাতের গভীর ছায়া আকাশ ছেয়ে,
পথের পানে চোখ মেলে নেই কাজ।—
"শুন্‌ছো কি গো,—ঐ কে করুণ ডাক্‌ছে বুঝি,
কা'র যেন কি রতন নিলে চোরে;
জোনাক্ জেলে বনের পথে বেড়ায় খুঁজি',—
আমার বুকের কি ধন দেবো ওরে?"
ঘুমাও গো মোর দুষ্টু মেয়ে,—ঐ সে অনেক দূর,—
কেউ ডাকেনি, কেউ ডাকেনি,—পাগ্‌লা ঝিঁঝি সুর!

(২)

ঘুমাও ঘুমাও দুষ্টু মেয়ে আমার বুকে,
আঁখির স্নেহে রাখ্‌বো তোমায় ঘিরে;
চুমুর মায়া বুলিয়ে দেবো কোমল মুখে,
শিথিল কেশে আন্‌বো আবেশ ধীরে।—
"দেখ্‌ছো কি গো,—পথ হারা'লো কাহার ছেলে,
নীল গগনে বেড়ায় খেলে একা;
হার-ছেঁড়া তার মাণিকগুলি যায় সে ফেলে,—
আমার সাথে হয় না কি ওর দেখা?"
ঘুমাও গো মোর দুষ্টু মেয়ে,—ঐ সে আলোর ফাঁদ,—
কেউ খেলেনি, কেউ খেলেনি,—একলা রাতের চাঁদ!

(৩)

দুষ্টু মেয়ে, বুকের মাঝে ঘুমাও তবে,
মনের তলায় মিলিয়ে থাকো চুপে;
আমার খুশী আজ্‌কে তোমার স্বপন হবে,
অরূপ আমার মিল্‌বে তোমার রূপে—
'ভাব্‌ছো কি গো,—ঐ যেন কা'র অশ্রু ঝরে,
ভুবন ভ'রেই কাহার ব্যথা জাগে;
ঐ যেন তার লাগ্‌লো ছোঁয়া শয়ন 'পরে,
এক নিমেষের বাসর বুঝি মাগে?
ঘুমাও গো মোর দুষ্টু মেয়ে,—ঐ সে রাতের ছল,
কেউ কাঁদেনি, কেউ কাঁদেনি,—হাল্কা শিশির-জল!

(৪)

দুষ্টু মেয়ে, ঘুমাও হ'লো অনেক রাতি,
শিয়র-বাতি নিব্‌লো কখন কেঁপে;
নীল সায়রে ডুব্‌লো কোথায় তারার পাঁতি,
উদাস বায়ু বয় যে অকূল ছেপে।—
"শুন্‌ছো কি গো—আবার কাহার সুর বেজেছে,
'জাগো জাগো' কয় সে বুকের তলে;
মোর নূপুরের নিক্কণে সে যায় যে নেচে,
মোর আঁচলে শিহর তাহার দুলে—?
ঘুমাও গো মোর দুষ্টু মেয়ে, ঐ সে পরম প্রাণ,
কেউ নাচেনি, কেউ নাচেনি,—আমার জীবন-গান!

বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, এম্ এ

জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দ-বিচার' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ছন্দ-বিষয়ক যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, নানা দিক্ থেকে তার বিশেষ মূল্য আছে ব'লে মনে করি। ওই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি সেটিকে আনুপূর্ব্বিক দেখে অনুমোদন করেছেন। শুধু 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্য যোগ ক'রে দিয়েছেন। কাজেই মনে হচ্ছে, বাংলা ছন্দের পরিভাষা, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আমার মত সমর্থন করেছেন। একমাত্র 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত ও আমার মতে খুবই পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে দেখা যাক্ কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতসাম্য আছে। প্রথমত যুগ্ম ও অযুগ্মধ্বনি, প্রবহমানতা (enjambement), মুক্তক প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দকে আমি যে-সব নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তাতে তাঁর আপত্তি নেই। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এবং নামকরণ বিষয়েও বিশেষ মতভেদ আছে ব'লে মনে হয় না। "প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি" প্রভৃতি ষড়্ব্যষ্টিপর্ব্বিক ছন্দের কবিতাতে তিনি কেন যুগ্মধ্বনিকেও এক ব্যষ্টি বা unit রূপে ব্যবহার করেছিলেন তাও এই উপলক্ষ্যেই জানা গেল। "স্বরমাত্রিক" ছন্দ সম্বন্ধেও মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হবার কারণ নেই। 'পূরবীর' 'বিজয়ী' কবিতাটির ছন্দ কিরূপে প্রধানত স্বরমাত্রিক হয়েছে এ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা থেকেই আমি এ অনুমান করছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার ফলে যে-বিষয়টা সব চেয়ে বেশি ক'রে অনুভব করেছি সেটি এই যে, বাংলা যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি এ ছন্দকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করি তিনিও ঠিক তাই করেন। মাঘের (১৩৩৮) 'পরিচয়ে' যৌগিক অর্থাৎ তাঁর কথিত সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক স্থানে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার থেকেও একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। ওই মন্তব্যটুকু এস্থলে উদ্ধৃত করলেই আমার কথা প্রমাণিত হবে। যথা—

"—রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি—

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত ক'রে ফাঁক ভর্ত্তি ক'রে নিয়েচে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উকার ধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন একারকে পরবর্ত্তী হসন্ত র-য়ের পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েচে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলেচে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে দুই মাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার ধ্বনি-সমারোহ বাড়িয়ে তুল্‌লে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হোলো রূপসিন্ধুতলে।"

—পৃঃ ৩৮৮

অর্থাৎ "রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি" এই পয়ারের পংক্তিটার ধ্বনিবিন্যাস হচ্ছে এ রকম—

রূপ্‌ সাগরের্ তলে ॥ ডুব্ দিনু আমি

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যুগ্মধ্বনিগুলির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ এবং তাদের ধ্বনিমূল্য দুই মাত্রা ; তাই রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বলেছেন "দুই মাত্রার ধ্বনি।" অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে আমিও যৌগিক ছন্দের ধ্বনি বিশ্লেষণ ঠিক এ ভাবেই করেছিলুম। লক্ষ্য করার বিষয় এই পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনিগুলি সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তে অবস্থিত। আর, যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ যে সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক, এ কথা আমি বহুবার বলেছি। এই পংক্তিটিতে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটিও নেই ; কাজেই যৌগিক ছন্দের পয়ারে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির প্রকৃতি কিরূপ, তা এই দৃষ্টান্তটি দ্বারা বোঝা যায় না। সুতরাং আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

॥ ।
আজ শতবর্ষপরে পরে
।॥ ।॥ । ॥
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
॥ ॥
কাঁপিবে না আমার পরাণ ?

—বসুন্ধরা, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শব্দান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (আজ্, দর্, ণের্, বের্, সার্, রাণ্) সমস্তই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যষ্টিক এবং শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলি (বর্, সুন্, রণ্, পল্) সমস্তই সংশ্লিষ্ট ও এক-ব্যষ্টিক। সুতরাং দেখা গেল এই সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথাও সংশ্লিষ্ট ও এক-ব্যষ্টিক এবং কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈব্যষ্টিক। এইরূপে যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট এই দুই প্রকৃতির যোগে উৎপন্ন বলেই সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দকে 'যৌগিক' ছন্দ নামে অভিহিত করেছি। মাঘের 'পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনিও এ ছন্দের উক্ত রকম ধ্বনি-বিশ্লেষণেরই পক্ষপাতী। বৈশাখের 'বিচিত্রা'তেও দেখিয়েছি যে যৌগিক (অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় সাধু) ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পদ্ধতি ও আমার পদ্ধতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। সর্ব্বশেষে 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধটি থেকে নিঃসংশয়ে দেখা গেল যে যৌগিক ছন্দের ধ্বনিসন্নিবেশ-প্রণালী সম্বন্ধে কবিগুরুর সঙ্গে আমার লেশমাত্রও মতভেদ নেই। এই উপলক্ষে মাঘের 'পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত তাঁর উক্তিটির সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের বিচিত্রায় যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটি ('ছন্দ-বিচার', পৃঃ ৫৭৬-৭৮) তুলনা করলেই আমার এ কথার যথার্থ্য বোঝা যাবে।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে চাতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে একটি কথা বলা অন্যায় হবে না। উপরে উদ্ধৃত—"রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি" এই পংক্তিটিকে যৌগিক পয়ার এবং মাত্রিক পয়ার, এই দুইটি স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করা যায়। আর এই দুই ভঙ্গীতে একই পংক্তির ধ্বনি-প্রকৃতি দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে দেখা দেয়। যৌগিক ছন্দে এই পংক্তিটির ধ্বনিরূপ হচ্ছে এই—

॥ ॥ ॥
রূপ্ সাগরের্ তলে ॥ ডুব্ দিনু আমি

এখানে প্রত্যেকটি শব্দ পরবর্ত্তী শব্দ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়।" এইটে গদ্যের মতো যৌগিক ছন্দের একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি ও লক্ষণ। দ্বিতীয়ত যৌগিক ছন্দের যতিস্থাপন-রীতি। এই পংক্তিটিতে আট unit বা ব্যষ্টির পর অর্দ্ধ যতি এবং পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। অর্দ্ধ যতিটির দ্বারা সমগ্র পংক্তিটা দুইটি পদে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এই পদ-দুটি একেকটি ঈষদ্-যতির দ্বারা দুটি করে পর্ব্বে বিভক্ত হয় নি। অর্থাৎ ঈষদ্-যতি লুপ্ত হওয়াতে দুটি ক'রে পর্ব্ব যুক্ত হ'য়ে দুটি যুক্ত-পর্ব্বিক পদ উৎপন্ন হয়েছে। (ছন্দোবিশ্লেষ —প্রবাসী, ১৩৩৮, ফাল্গুন—চৈত্র দ্রষ্টব্য)। এই যুক্ত-পর্ব্বিক পদের চালটা যৌগিক ছন্দের একটি বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা" (সবুজপত্র—১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২২৮)। যাহোক্, শব্দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এবং যুক্তপর্ব্বের চাল যৌগিক ছন্দের দুটি বিশেষত্ব। মাত্রিক ছন্দে এদুটি লক্ষণের কোনোটিই সাধারণত দেখা যায় না। অর্থাৎ মাত্রিক ছন্দে শব্দগুলি সুস্পষ্টভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না এবং যুক্তপর্ব্বের চালও এছন্দে খুব বিরল। উপরের পংক্তিটিকে যদি চাতুর্মাত্রিক ভঙ্গীতে রূপান্তরিত করা যায় তবে তার ধ্বনিরূপ হবে এরকম—

রূপ সাগ। রের্ তলে॥ ডুব্ দিনু। আমি

এখানেও যৌগিক ছন্দের মতো যুগ্মধ্বনির মূল্য দ্বৈমাত্রিক। কিন্তু এ ছন্দের মাত্রা যৌগিক ছন্দের মাত্রার চেয়ে লঘুতর; তাই এ ছন্দের গতি চপল এবং তার তাল নৃত্য-পরায়ণ। যৌগিক ছন্দের গতি মন্থর এবং তার তাল ধীর। যাহোক্, এই মাত্রিক বিশ্লেষণটির প্রতি লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে যে, এখানে যুক্তপর্ব্বের চাল নেই; অর্দ্ধ ও পূর্ণ যতির ন্যায় ঈষদ্-যতিও এখানে সুস্পষ্ট। সে জন্যেই এছন্দে লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালও নেই। আর এইটেও এ ছন্দের গতির চপলতার হেতু। দ্বিতীয়ত, এ ছন্দের শব্দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক নয়; এ ছন্দে শব্দগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন ব'লে গণ্য কর্‌লেও ছন্দের প্রকৃতিতে ত্রুটি ঘটে না। উপরের দৃষ্টান্তটিকে যথাযথ ভাবে আবৃত্তি কর্‌লেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। অর্থাৎ উপরের দৃষ্টান্তটিকে যদি

রূপসাগ। রের্ত্তলে॥ ডুব্দিনু। আমি

এ ভাবে লেখা যায় তা'হলে এর চাতুর্মাত্রিক প্রকৃতিটি ধরা পড়বে। "বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়" (নিষ্ফল উপহার, মানসী) "অঞ্জনা নদীতীরে খঞ্জনী গাঁয়ে" (সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ) প্রভৃতি পংক্তির সঙ্গে এটির তুলনা করলেই আমার একথার সার্থকতা উপলব্ধি হবে। কিন্তু যৌগিক ছন্দে এভাবে এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার যো নেই, কেননা তাহ'লে ও ছন্দের মূল প্রকৃতিরই বিকার ঘটবে। এবিষয়ে যৌগিক ছন্দ হচ্ছে পুরোপুরি গদ্যধর্ম্মী এবং এখানেই তার গৌরব ও এরিস্টোক্রেসি।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

১

এবার বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন প্রাকৃত ছন্দ বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ আমি তাকেই বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ অর্থাৎ syllabic ছন্দ, কেননা আমার বিবেচনায় এ ছন্দ সিলেব্‌ল্-এর বিভাগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমার বিশ্বাস বাংলা দেশের কবি এবং পাঠকরা সকলেই এছন্দকে সিলেব্‌ল্-নিয়ন্ত্রিত ব'লেই মনে করেন। এরকম বিশ্বাস পোষণ করার পক্ষে আমার অনুকূল নজিরও আছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ ছন্দকে সিলেব্‌ল্-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন ব'লেই আমার ধারণা ছিল এবং তাঁর রচনার বিশ্লেষণ ক'রেই আমার এ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' যখন প্রথম দেখ্‌লুম তিনি এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত বা 'সিলেব্‌ল্'-বৃত্ত ব'লে গণ্য না ক'রে 'মাত্রা'বৃত্ত ব'লে গণ্য করেছেন তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। পরে আশ্বিনের 'উত্তরা'য়ও দেখা গেল "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দের ছড়াটাকে তিনি চার-চার সিলেব্‌ল্-এ ভাগ না ক'রে ছয়-ছয় মাত্রায় ভাগ করেছেন। কিন্তু এটা কিছুতেই আমার কাছে যুক্তিসহ ব'লে বোধ হ'লো না। তাই স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এ বিষয়ে কবিগুরুর অভিমতটা আরও বিশদরূপে জানার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ আলোচনা হয় তখন বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি। কিন্তু "ছন্দ-বিচার" এবং "কবির পুনশ্চ বক্তব্য" (বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ) দেখা গেল প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে চার সিলেব্‌ল্-এর ছন্দ ব'লে গণ্য কর্‌তে কবিগুরুর খুবই আপত্তি আছে, তিনি এটাকে ছয় মাত্রার ছন্দ এবং সাধু বাংলার ষাণ্মাত্রিক ছন্দের সগোত্র ব'লেই মনে করেন।

২

একটা কথা গোড়াতেই ব'লে রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু ছন্দ ও সঙ্গীতের মতোই একটি ধ্বনিশিল্প, সেহেতু ছন্দ মাত্রেই প্রত্যক্ষত হোক্ বা পরোক্ষতই হোক্ ধ্বনি-পরিমাণ বা quantityর একটা স্থান থাক্‌বেই; কেননা সম্পূর্ণরূপে ধ্বনি-পরিমাণ-নিরপেক্ষ ধ্বনিশিল্প রচনা করা স্বভাবতই অসম্ভব। কারণ ধ্বনির উচ্চারণে যে কাল ব্যয়িত হয় সেই কালের পরিমাণটাই মোটামুটি ভাবে ঐ ধ্বনির পরিমাণ এবং কাল নিরপেক্ষ ধ্বনি হ'তে পারে না; তার কল্পনাটাও স্ববিরোধী। ধ্বনি পরিমাণেরই পারিভাষিক নাম 'মাত্রা'। অতএব বোঝা গেল সম্পূর্ণরূপে 'মাত্রা'-নিরপেক্ষ ছন্দ হ'তেই

পারে না; কোনো ভাষাতেই পারে না। মুখ্যত' হোক্ গৌণত', হোক্, কোনো ছন্দই একেবারে মাত্রানিরপেক্ষ নয়। তাই যখন বলা হয় অমুক ছন্দটা মাত্রিক বা quantitative নয়, তখনই মনে রাখ্তে হবে যে সেটা মুখ্যত' মাত্রিক নয়; সেটা গৌণতও মাত্রিক নয় একথা বলা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। কেননা সমস্ত ভাষার সমস্ত ছন্দই মুখ্যত বা গৌণত মাত্রিক (quantitative) হ'তে বাধ্য। ছন্দোবিৎরা যখন বলেন সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ কিংবা বৈদিক ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দ quantitative নয় পরন্তু syllabic, তখন বুঝ্তে হ'বে ওসব ছন্দ প্রত্যক্ষত' এবং প্রধানত' quantitative নয় বটে কিন্তু পরোক্ষত' এবং গৌণত' এগুলি quantitative বটেই। পার্সী ধর্ম্মগ্রন্থ অবেস্তার ছন্দও মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত বা syllabic, ছন্দোবিৎদের এই অভিমত। কিন্তু ওসব ছন্দও যে গৌণত' মাত্রাবৃত্ত একথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি ছন্দ স্বরবৃত্ত (syllabic) না মাত্রাবৃত্ত (quantitative) এ বিষয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে ও ছন্দ প্রধানত' স্বরবৃত্ত, কারও মতে প্রধানত' মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু ফরাসী ছন্দ যে syllabic এ বিষয়ে দ্বিমত নেই; যাঁরা ইংরেজি ছন্দকে মাত্রাপরিমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁরাও স্বীকার করেন যে ফরাসী ছন্দ সিলেব্ল্-নিয়ন্ত্রিত। "French prosody, except in eccentric instances, has been from the first, and is to the present day, strictly syllabic" (G. Saintsbury's Manual of English Prosody p. 14). রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে ফরাসী অধ্যাপকের আলোচনা হয়েছিল, তিনিও একথার সমর্থন ক'রে বলেছেন যে ফরাসী ছন্দ syllabic (বিচিত্রা,—জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৮১)। কিন্তু তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ফরাসী ছন্দও মাত্রিক, কেননা ছন্দমাত্রই ধ্বনিপরিমাণকে মেনে চল্তে বাধ্য। সুতরাং ফরাসী ছন্দের আসল পরিচয় দিতে হ'লে বল্তে হয় যে, ওছন্দ মুখ্যত' স্বরবৃত্ত এবং গৌণত' মাত্রিক।

বাংলা ছন্দের যে শ্রেণীটা মুখ্যত' quantitative তাকেই আমি বলেছি মাত্রাবৃত্ত। কিন্তু বাংলা ছন্দের আরও দুটি শ্রেণী আছে যা গৌণত' মাত্রিক বটে, কিন্তু মুখ্যত' নয়। সে-দুটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত এবং যৌগিক। বাংলা ছন্দের এদুটি শ্রেণীও যে গৌণত' মাত্রিক একথা বলা বাহুল্য ব'লেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ মুখ্যত' স্বরবৃত্ত বা syllabic নয়, ও ছন্দ মুখ্যত'ই মাত্রিক। এ বিষয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমি এক মত হ'তে পারিনে।

৩

বাংলায় স্বরবৃত্ত বা syllabic ছন্দ ব'লে কোনো ছন্দ আছে কি না সেটাই আগে দেখা প্রয়োজন। ১৩১৪ সালে "আলেখ্য" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (syllabic); 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব্ব হ'তে এ ছন্দ বঙ্গ দেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণ প্রায়ই এছন্দ বর্জ্জন ক'রে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি।" অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে syllabic ছন্দ ব'লেই মনে করতেন। তিনি syllabic কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'মাত্রিক' কথাটি ব্যবহার করেছেন; আমার মনে হয় 'মাত্রিক' শব্দটিকে 'syllabic' অর্থে প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। যাহোক্, আমি এই syllabic ছন্দকেই বলেছি 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ। (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)।

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর "ছন্দ-সরস্বতী" প্রবন্ধে প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে syllable বা 'শব্দ-পাপড়ি'র সংখ্যা গুনেই বিশ্লেষণ করেছেন (ভারতী—১৩২৫, বৈশাখ, পৃঃ ১০-১৫)। প্রাকৃত বাংলার ছন্দে প্রতিপর্ব্বে সাধারণত' চারটি ক'রে সিলেব্‌ল বা 'শব্দ-পাপড়ি' থাকে ব'লে তিনি এ ছন্দকে "চারের ঘরানা ছন্দ" ব'লে অভিহিত করেছেন (ঐ পৃঃ ২৩) এই "চারের ঘরানা" ছন্দকেই আমি বলেছি চতুঃস্বর (tetrasyllabic) স্বরবৃত্ত ছন্দ। ইদানীং দিলীপকুমার (পরিচয়—বৈশাখ, পৃঃ ৭১৮-৭২০) এবং শৈলেন্দ্রকুমারও

(বিচিত্রা—আষাঢ়, পৃঃ ৭৪২-৪৪) প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে সিলেবল-সংখ্যাত ছন্দ ব'লেই গণ্য করেছেন।

পূর্ব্বোক্ত ফরাসী অধ্যাপকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন যে, তিনি quantitative এবং syllabic দুরকম ছন্দই ব্যবহার ক'রে থাকেন (বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৮১)। কিন্তু বাংলার যে ছন্দটি সাধারণত syllabic ছন্দ ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে সে-ছন্দটিকেই যখন তিনি যাণ্মাত্রিক হিসেবে বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁর এই উক্তির সার্থকতা কি ? রবীন্দ্রনাথ কোন্ বাংলা ছন্দকে syllabic ব'লে গণনা করেন তা বোঝা গেল না। আমার বিবেচনায় প্রাকৃত ছন্দকেই syllabic ছন্দ ব'লে মনে করতে হবে, নতুবা syllabic ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তিটিকেই নিরর্থক ব'লে গণ্য করতে হবে।

৪

এখন দেখা যাক্ রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতছন্দের বিশ্লেষণ করতে চান কিরূপে ? তাঁর মতে এছন্দের প্রতি পর্ব্বার্দ্ধে তিনমাত্রা ধরতে হবে; প্রকাশ্যত' তিন মাত্রা না থাক্‌লেও প্রতি পর্ব্বার্দ্ধে তিনমাত্রার অবকাশ আছে, আবৃত্তির ঝোঁকে ওই ফাঁক পূরণ ক'রে নিতে হয় (পরিচয়—১৩৩৮, মাঘ, পৃঃ ৩৭৯-৮০ এবং ৩৮৮-৮৯)। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ আসলে যাণ্মাত্রিক ছন্দ এবং এইটেই এছন্দের যথার্থ পরিচয় (বিচিত্রা-জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৮২)। বাংলা প্রাকৃত ছন্দের এই মাত্রাগত প্রকৃতিটিকে অর্থাৎ এর যাণ্মাত্রিক প্রকৃতিটিকে আমিও কখনও অস্বীকার করিনে। আমি শুধু বল্‌তে চাই এইটুকু যে, এছন্দের syllabic দিক্‌টাই এর আসল কথা, এর মাত্রিক দিক্‌টা এ ছন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌণ। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য কি তাই এখন দেখানো দরকার।

ছন্দবিচার-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "পুনশ্চ বক্তব্যে" মন্তব্য করেছেন, "এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান, অথবা মাত্রা প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা গৌণ, তার ঝঙ্কারের লয়টাই আসল কথা।" তাঁর এই উক্তিটি বড়ই গুরুতর। প্রশ্ন উঠেছিল বাংলা প্রাকৃতছন্দের স্বরূপ নিয়ে, সকল ছন্দ সম্বন্ধে নয়। কিন্তু তিনি ওই প্রশ্নটিকে প্রয়োগ করেছেন সমস্ত ছন্দের সম্বন্ধেই। তাঁর এই উক্তি থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই হয় যে, সিলেব্‌ল্-প্রধান অর্থাৎ syllabic ছন্দ ব'লে কোনো ছন্দই হ'তে পারে না। যদি একথা বলাই তাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে আমি মনে করি যে তাঁর এই উক্তি কখনও সমর্থন-যোগ্য নয়। কেননা, ছন্দ-বৈয়াকরণি-করা syllabic ছন্দের অস্তিত্ববিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈদিক অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দ যে syllabic এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত (পরিচয়—১৩৩৯, বৈশাখ, পৃঃ ৫৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য)। আর, বাংলা প্রাকৃত ছন্দ ও আসলে syllabic এ বিষয়েও বাংলা দেশের অধিকাংশ ছন্দোরসিক কবি ও পাঠক যে নিঃসন্দেহ, এ রকম মনে করার হেতু আছে। এবিষয়ে কিছু নজির পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে, এবং এই মতের পক্ষে যে-সব যুক্তি আছে তা যথাস্থানে উপস্থাপিত করব।

কিঙ্কিণীর ঝঙ্কার যদি ঘুন্টির সংখ্যা ও সন্নিবেশপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ওই ঘুন্টির সংখ্যা ও সাজানোর ভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের চোখে কখনও গৌণ নয়, একথা অবশ্যই বল্‌ব। বীণাযন্ত্রের ধ্বনিমাধুর্য্যই সঙ্গীতরসিকের কাম্য বটে; কিন্তু যেহেতু ওই যন্ত্রের তারের সংখ্যা ও সন্নিবেশপ্রণালীর উপর সে মাধুর্য্য একান্ত ভাবেই নির্ভর করে সে-জন্যে ওই তারগুলি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সেকথা সঙ্গীত বৈজ্ঞানিকের নিকট কখনোই গৌণ নয়। যদি তাই হ'তো তাহ'লে বীণাযন্ত্রই কখনও উৎপন্ন হ'তো না। বাক্যের অর্থই সাহিত্যিকের নিকট মুখ্য; কিন্তু বৈয়াকরণিকের নিকট বাক্যের ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি এবং তাদের সন্নিবেশপ্রণালীটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। ছন্দো-ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাটিই প্রযোজ্য। বাংলা প্রাকৃত ছন্দের প্রতিপর্ব্বের ধ্বনিটা যাণ্মাত্রিক বটে; কিন্তু কোন্ বিশেষ-সংখ্যক সিলেব্‌ল্ এবং তাদের কোন্ বিশেষ সাজানোর ভঙ্গী থেকে ওই যাণ্মাত্রিক ধ্বনিটা উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ছন্দো-বৈয়াকরণিকের নিকট সেটা কখনোই

গৌণ হ'তে পারে না। কবির "পুনশ্চ বক্তব্য" থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি বাংলায় দু রকম যাণ্মাত্রিক ছন্দ স্বীকার করেন, যথা—সাধু যাণ্মাত্রিক এবং প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক। এই দু'রকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্য কোথায় তা দেখা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত—

(১) দুটি বোন্ তারা | হেসে যায় কেন | যায় যবে জল |
আন্‌তে ?
দেখেছে কি তারা | পথিক কোথায় | দাঁড়িয়ে পথের |
প্রান্তে ?
—দুই বোন, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) কামিনী, মালতী, | আমি তিন জন | দেখে লোক জন |
অল্প,
জল তোল্‌বার | মিছে ছল কোরে | জুড়তুম সেথা |
গল্প।
—সুখের সাহারা, নতুন-খাতা, কিরণধন

(৩) চলেন তিনি- | গোপল চালে- | স্বাধীন তাঁহার | ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে- | দিচ্চে, এবং | কেই বা তাঁরে- |
নিচ্চে।
—অচেনা, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের ছন্দ 'সাধু' যাণ্মাত্রিক এবং তৃতীয়টির ছন্দ 'প্রাকৃত' যাণ্মাত্রিক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের ভাষাও তৃতীয়টিরই মতো প্রাকৃত বাংলা। সুতরাং এ দুটির ছন্দকে 'সাধু' যাণ্মাত্রিক বলার কোনো সার্থকতাই নেই। অতএব আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ওই দু'রকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্যটা ভাষাগত নয় এবং এই যাণ্মাত্রিক ছন্দ-দুটিকে 'সাধু' এবং 'প্রাকৃত' এই দুটি বিশেষণে বিশেষিত কর্‌লেই এদের আসল পার্থক্যটাকে নির্দ্দেশ করা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ এই দুরকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের আরেকটি পার্থক্যের নির্দ্দেশ করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রতি পর্ব্বে "কবিরা বিনা দ্বিধায় (দুয়েক মাত্রার) ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ— সে-সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়" (পরিচয়—১৩৩৮, মাঘ, পৃঃ ৩৮০)। প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান্ ব'লেই আমি মনে করি। প্রাকৃত বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতির একটা দিক্ তাঁর এই উক্তিতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর এই মন্তব্যটির যথার্থ মর্য্যাদা কতখানি ছন্দরসিকমাত্রই তা অনুভব কর্‌বেন। এবিষয়ে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা যাবে এবং আমরা দেখব যে শুধু এই কথাতেই প্রাকৃত ছন্দের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না, তার syllabic প্রকৃতির নির্দ্দেশ করা একান্ত আবশ্যক। যাহোক্, দেখা গেল প্রাকৃত বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দে প্রতি পর্ব্বে দুয়েক মাত্রার ফাঁক রাখা সম্ভব এবং অধিকাংশ স্থলেই সে ফাঁক রাখাও হয়। কিন্তু সাধু বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দে সে রকম ফাঁক রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দু রকম যাণ্মাত্রিক ছন্দের পার্থক্য নির্দ্দেশ করার জন্যে বলা যেতে পারে যে, একটি হচ্ছে বে-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ এবং আরেকটি হচ্ছে স-ফাঁক যাণ্মাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এই পার্থক্যটিও গৌণ এবং উভয় ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নয়। কেননা, প্রাকৃত বাংলার ছন্দও অনেক সময় বেঁফাক হ'য়ে থাকে এবং এভাবে ছন্দ রচনা করা খুবই সহজ সাধ্য। তাহ'লেই এই ফাঁকের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এই উভয় ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে নির্দ্দেশ করে না, একথা নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) ফাগুন যামিনী, | প্রদীপ জলিছে | ঘরে
দখিন বাতাস | মরিছে বুকের | পরে।
—ভ্রষ্টলগ্ন, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

(২) আজকে কেবল | বউ কথা কও | ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার | পুষ্প-পাগল | শাখে।
—সম্বরণ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

সাধু এবং প্রাকৃত বাংলার পার্থক্য কিংবা ফাঁকের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটির ছন্দোগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ একটিকে সাধু যাণ্মাত্রিক এবং আরেকটিকে প্রাকৃত যাণ্মাত্রিক ছন্দ বল্‌লেই

এদের ছন্দের পার্থক্য কোথায় তা ধরা পড়বে না। আবার, এটাকে বে-ফাঁক এবং আরেকটিকে স-ফাঁক বলারও উপায় নেই; কেননা এদুটির কোনোটিতেই মাত্রার ফাঁক নেই। অথচ দৃষ্টান্ত-দুটিতে যে ছন্দোগত পার্থক্য রয়েছে সে-বিষয়ে সংশয় করা চলে না; ওই পার্থক্যটি সম্বন্ধে কানই নিঃসন্দেহরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর এক্ষেত্রে কানের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নয় এবিষয়ে বোধ করি কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটির ছন্দোগত পার্থক্য কোথায়। আমার মতে সে পার্থক্যটি হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা নিয়ে। একটি হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌-নিরপেক্ষ যাণ্মাত্রিক ছন্দ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌-সাপেক্ষ যাণ্মাত্রিক ছন্দ। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে মুখ্যত' মাত্রাবৃত্ত (ছয় মাত্রার) ছন্দ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গৌণত যাণ্মাত্রিক এবং মুখ্যত' syllabic অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দ। প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে আমি কেন syllabic বা স্বরবৃত্ত বলি যথাস্থানে তা বোঝাতে চেষ্টা করব।

৫

প্রাকৃত বাংলা ছন্দের পর্ব্বগুলোতে যে কবিরা বিনা দ্বিধায় মাঝে মাঝে দুয়েক মাত্রার ফাঁক রেখে দিতে পারেন তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ও ছন্দটা মাত্র গৌণত' যাণ্মাত্রিক, মুখ্যত' নয়। যদি এ ছন্দটা মুখ্যতই যাণ্মাত্রিক হ'তো তাহ'লে ওভাবে মাঝে মাঝে মাত্রার ফাঁক রাখাই সম্ভব হ'তো না। রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু বাংলার যাণ্মাত্রিক ছন্দটা মুখ্যতই যাণ্মাত্রিক ব'লে ওছন্দে মাঝে মাঝে মাত্রার ফাঁক রেখে দেওয়া সম্ভব হয় না। তা-ছাড়া, এ ছন্দটি যদি মুখ্যতই যাণ্মাত্রিক হ'তো তাহ'লে এ ছন্দের কোনো পর্ব্বে কখনও ছয় মাত্রার বেশি থাক্‌তে পারত্‌ না। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এ ছন্দের পর্ব্বে কখনও কখনও ছয় মাত্রার বেশি অর্থাৎ সাত মাত্রা এবং এমন কি আট মাত্রাও থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) শেষ বসন্তের | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্য শূন্য | মাঠে
উঠ্‌ল হাহা | করি।
—পরামর্শ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) তোমরা যদি | পুনর্জন্মে | হও পুনর্ব্বার | সমালোচক
—কর্ম্মফল, ঐ, ঐ

(৩) নবরত্নের | সভার মাঝে | রৈতাম একটি | টেরে
—সেকাল, ঐ, ঐ

(৪) রোগের ঋণের | শেষ রাখ না, | কলঙ্কের শেষ |
রাখ্‌বে কি ?
— মৃত্যু-স্বয়ম্বর, অভ্র-আবীর, সত্যেন্দ্রনাথ

(৫) এমনি কশাই | মাষ্টার মশাই | শুন্‌বে নাকো | সে ওজর
—নাম-কাটা সেপাই, নতুন-খাতা, কিরণধন

(৬) মন চুরির সেই | মন্ত্রখানা—
আমার যেটা | ছিল জানা,
বিলিয়ে সেটা | দিলেম পথে | ঘাটে |
—পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে, ঐ, ঐ

(৭) সে যদি তোর | থাক্‌তো, খানিক | আবদার কর্ত্তিস্‌ |
শোবার আগে,
দাবী কর্ত্তিস্‌ | চুমা।
—মাতৃ-হারা, আলেখ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল

(৮) অনেক বাক্য | হানাহানি ;
গর্জ্জন বর্ষণ | অনেক খানি।
—বিবাহ-যাত্রী, ঐ, ঐ

লক্ষ্য করার বিষয়, ঢেরা-চিহ্নিত পর্ব্বগুলিতে ছয় মাত্রার বেশি আছে; প্রথম ছ'টি দৃষ্টান্তে আছে সাত মাত্রা ক'রে এবং শেষ দুটি দৃষ্টান্তে আছে আট মাত্রা ক'রে। এখানে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে; প্রয়োজন হ'লে আমাদের কাব্য-সাহিত্য থেকে এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের কবিরা এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু স্থলেই তাঁর কথিত প্রাকৃত বাংলা ছন্দের যাণ্মাত্রিকতার বিধি লঙ্ঘন ক'রে থাকেন। এর থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে,

হয় রবীন্দ্রনাথের কথিত ষাণ্মাত্রিকতার বিধি প্রাকৃত বাংলার ছন্দের পক্ষে গৌণ, না-হয় উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে (এবং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও) ছন্দ-পতন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার কি মীমাংসা করেন তা জানতে উৎসুক আছি।

৬

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে আট পর্ব্বেই ষাণ্মাত্রিকতার বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় ওই আটটি পর্ব্বেই চার সিলেব্‌ল্-এর বিধি রক্ষিত হয়েছে। তার থেকে শুধু এই অনুমানই করা যায় যে, প্রাকৃত বাংলার ছন্দ রচনার সময় কবিরা (এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও) স্বতই প্রতিপর্ব্বে চার সিলেব্‌ল্ রক্ষা ক'রে থাকেন; প্রতিপর্ব্বে ছয় মাত্রার বেশি হচ্ছে কি কম হচ্ছে সেটা তাঁদের নিকট গৌণ ব'লেই গণ্য হয়।

প্রাকৃত ছন্দের ষাণ্মাত্রিক প্রকৃতিটা গৌণ ব'লেই কবিরা বিনা দ্বিধায় এ ছন্দের পর্ব্বে দুয়েক মাত্রার ফাঁকও রাখেন এবং দুয়েক মাত্রা বেশিও রাখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করি যে, এ ছন্দটা মূলত' ষাণ্মাত্রিকই বটে। কিন্তু ওই ষাণ্মাত্রিকতাই এ ছন্দের আসল কথা নয়, ওর ভিতরকার চার সিলেব্‌ল্-এর সমাবেশটাই এ ছন্দের আসল কথা। আমার বক্তব্য এই যে, চার সিলেব্‌ল্-এর যোগে ছয় মাত্রা রক্ষা করাই প্রাকৃত ছন্দের সাধারণ বিধি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ ছন্দের পর্ব্বে প্রকাশ্যত ছয় মাত্রা থাকে না। প্রায়শই দুয়েক মাত্রা উহ্য থাকে; আবৃত্তির ঝোঁকে সুরকে টেনে সে অভাব পূরণ ক'রে নিতে হয়। আবার কখনও কখনও দুয়েক মাত্রা বেশিও থাকে; তখন ওই সাত বা আট মাত্রার ধ্বনিকে ঠেসে কমিয়ে ছয় মাত্রায় পরিণত ক'রতে হয়, যথা—

এই কি তবে- | অন্তিম বিকাশ ?
এই কি জীবের | চরম গতি- ?
নাই কি কিছু- | পরে-?
—সত্যযুগ, আলেখ্য, দ্বিজেন্দ্রলাল

এখানে তিনটি পর্ব্বে প্রকাশ্যত' পাঁচ মাত্রা ক'রে আছে। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই এক মাত্রার ফাঁক আছে, আবৃত্তির ঝোঁকে আপনি তা পূরণ হ'য়ে যায়। আবার, একটি পর্ব্বে ('অন্তিম বিকাশ') আছে প্রকাশ্যত সাত মাত্রা; কিন্তু এখানেও আবৃত্তির ঝোঁকে ধ্বনিকে ঠেসে এক মাত্রা কমিয়ে নিতে হচ্ছে। অতএব দেখতে পাচ্ছি, এ ছন্দ আসলে ষাণ্মাত্রিকই বটে। কিন্তু এ ছন্দের গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, ওই ছয় মাত্রা চারটি সিলেব্‌ল্-এর যোগে উৎপন্ন হওয়া চাই। প্রকাশ্যত এর পর্ব্বের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়; কিন্তু সিলেব্‌ল্-এর পক্ষে সে-কথা খাটে না। অর্থাৎ এ ছন্দের পর্ব্বে সিলেব্‌ল্-সংখ্যাকে যথেচ্ছ ভাবে বাড়ানো কমানো যায় না। (এ বিষয়ে দুয়েকটি ব্যতিক্রম আছে; যথাসময়ে তার আলোচনা করা যাবে)। সাধারণ ষাণ্মাত্রিক ছন্দে পর্ব্বগত সিলেব্‌ল্-সংখ্যার কোনো স্থিরতা নেই; এ ছন্দের পর্ব্বে তিন, চার, পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ থাক্‌তে পারে। কিন্তু প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রতি পর্ব্বে অনধিক চার সিলেব্‌ল্ থাক্‌বেই। এইটেই এ ছন্দের প্রধান কথা; তাই আমি এ ছন্দকে চতুঃস্বর (tetra-syllabic) স্বরবৃত্ত ছন্দ ব'লে অভিহিত করেছি। এ ছন্দের পর্ব্বে যদি চারের অধিক সিলেব্‌ল্ থাকে তবে অমনি পাঠকের শ্রুতিরুচি পীড়িত হয় অর্থাৎ ছন্দ-পতন ঘটে। "পুনশ্চ বক্তব্যে" রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রাকৃত বাংলা ছন্দে প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে সিলেব্‌ল্ থাকা আবশ্যক নয়; পাঁচ সিলেব্‌ল্ও চল্‌তে পারে। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই—

৫ ৪ ৩ ১
শিবু ঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান

এখানে শেষ পর্ব্বে আছে এক সিলেব্‌ল্। এ ছন্দে শেষ পর্ব্বে এক থেকে চার পর্য্যন্ত সিলেব্‌ল্ অনায়াসেই থাক্‌তে পারে। সুতরাং এক সিলেব্‌ল্ আছে ব'লে কোনো বিশেষত্ব হয়নি। দ্বিতীয় পর্ব্বে আছে চার সিলেব্‌ল্, আর এইটেই এ ছন্দের সাধারণ নিয়ম। তৃতীয় পর্ব্বে আছে তিন সিলেব্‌ল্, এইটে একটি ব্যতিক্রম এবং এরকম ব্যতিক্রম এ ছন্দে চ'লে থাকে। কিন্তু প্রথম পর্ব্বে আছে পাঁচ সিলেব্‌ল্। আমি বলি এটা এ ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশে প্রচলিত যে-সব ছড়া আছে সেগুলিকে সর্ব্বদাই টেনে সুর ক'রে

পড়তে হয় এবং ঐ সুরের দ্বারাই ছন্দের অনেক ত্রুটি ঢাকা প'ড়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যিক কবিতায় ওসব ত্রুটি কখনও মার্জ্জনীয় নয়। ঠিক্ এই কারণেই এই ছড়ার লাইনটিতে "শিবুঠাকুরের" পর্ব্বটি মার্জ্জনীয় হ'তে পারে। কিন্তু কবিতার ছন্দে এ রকম পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর পর্ব্ব কানের সমর্থন পাবে মনে করিনে। আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় শৈলেন্দ্র বাবুও এই কথাই বলেছেন। তা-ছাড়া, এই ছড়াটিও আমরা বাল্যকালে যে-ভাবে শুনেছি ও শিখেছি তাতে আমরা "শিবঠাকুরের"ই পেয়েছি, "শিবুঠাকুরের" নয়। আমার বিশ্বাস ছড়ার পক্ষেও "শিবুঠাকুরের" কথার চেয়ে "শিবঠাকুরের"ই অধিকতর সঙ্গত।

প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যে কোনো পর্ব্বে পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ কখনোই হয় না তার প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যে এ ছন্দের প্রবর্ত্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্য সাহিত্যে এ ছন্দে পাঁচ সিলেব্‌ল-এর একটিমাত্র পর্ব্বও আমি খুঁজে পাই নি। যদি এ রকম একটি মাত্র পর্ব্বও পাওয়া যায় তাহ'লে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের চতুঃস্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো তর্কের খাতিরে উপরের ছড়ার পংক্তিটিতে একটি পর্ব্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্-এর অস্তিত্ব সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের ঠিক অনুরূপ রচনায় কি করেছেন দেখা যাক্।—

কবে বিষ্টি | পড়েছিল | বান এল সে | কোথা ?
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ'ল | কবেকার সে | কথা ?
—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, কড়ি ও কোমল

এখানে তো তিনি "শিবুঠাকুরের" লেখেননি। কেন? কারণ 'শিবু' লিখ্‌লেই কবির স্বাভাবিক ধ্বনিরসবোধ পীড়িত হ'বে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বাহিরে ছিল | সাধুর আকার | মনটা কিন্তু | ধর্ম্ম-ধোয়া।
* * * *
যেমন কর্ম্ম | ফল্‌লো ধর্ম্ম | বুড় শালিকের | ঘাড়ে রোঁয়া।
—মধুসূদন

এখানে দুটি পর্ব্বে ('বাহিরে ছিল,' 'বুড় শালিকের') পাঁচ সিলেব্‌ল্ আছে এবং তাতে ছন্দে ত্রুটি ঘটেছে ব'লে আমি মনে করি। কেননা ওই দু'পর্ব্বের ধ্বনি আমার কানের সমর্থন পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ এই দুই পংক্তির ছন্দকে নিখুঁৎ মনে করেন কি না জান্‌বার ঔৎসুক্য হয়। কিন্তু তাঁর কোনো রচনাতেই ওরকম একটি মাত্র পর্ব্বও আজ পর্য্যন্ত পাইনি ব'লে মনে হয় তিনিও ওদুটি পর্ব্বকে নিখুঁৎ মনে কর্‌বেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত—

ছেলে ঘুমুলো | পাড়া জুড়ুলো | বর্গী এলো | দেশে—
বুলবুলিতে | ধান খেয়েছে | খাজনা দেব | কিসে ?

এ ছড়াটার ছন্দ সম্বন্ধে কী বলা যায়? এটাকে কি পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বল্‌ব? না, রবীন্দ্রনাথের কথিত প্রাকৃত বাংলার যাগ্মাত্রিক ছন্দ বল্‌ব? যদি এটাকে বলা হয় পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, তাহ'লে তো এর পর্ব্বের সিলেব্‌ল্-সংখ্যার অসমতা নিয়ে কোনো তর্কই হ'তে পার্‌বে না। কিন্তু যদি বলা যায়, এটা প্রাকৃত বাংলার যাগ্মাত্রিক ছন্দ, তাহ'লে এর প্রথম দুটি পর্ব্বকে "শিবুঠাকুরের" পর্ব্বটির স্বজাতীয় ব'লেই গণ্য কর্‌তে হবে; অর্থাৎ বল্‌তে হবে ছড়াতে এরকম চল্‌লেও কবিতায় এরকম চলে না, অন্তত' আজ পর্য্যন্ত কেউ এরকম চালান নি। আমার বিবেচনায় এটিকে পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ব'লে গণ্য করাই সঙ্গত, কারণ এই দুই পংক্তির সব পর্ব্বেই (অবশ্য শেষ দুটি পর্ব্ব ছাড়া) পাঁচ মাত্রা ক'রে আছে।

৭

প্রাকৃত বাংলার ছন্দ যে সিলেব্‌ল্-সংখ্যা-নিরপেক্ষ যাগ্মাত্রিক ছন্দ নয় এবং এটি যে আসলে একটি চতুঃস্বর-যাগ্মাত্রিক ছন্দ, একথার স্বপক্ষে আরও দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের রচিত এ ছন্দের যে-কোনো একটি পংক্তি নিয়ে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে পরীক্ষা কর্‌লেই এ ছন্দের যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়'বে। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ "রূপ সাগরে ডুব দিয়েচি অরূপরতন আশা ক'রে" এই পংক্তিটি ছন্দ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—

রূপ্ সাগরে- | ডুব্ দিয়েচি- | অরূপ রতন | ইত্যাদি।

অর্থাৎ এ ছন্দটা যে আসলে যাগ্মাত্রিক তিনি তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমি বলি এটা যাগ্মাত্রিক বটে; কিন্তু

এর প্রতি পর্ব্বের ছয় মাত্রা সিলেব্‌ল্-সংখ্যা-নিরপেক্ষ নয়, পরন্তু প্রতি পর্ব্বেই চারটি সিলেব্‌ল্-এর যোগে ওই ছয় মাত্রাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়েছে। প্রতিপর্ব্বের মাত্রাপরিমাণ স্থির রেখে যদি এর সিলেব্‌ল্-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো যায় তাহ'লেই দেখা যাবে যে মাত্রা পরিমাণ ঠিক্ থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ঠিক্ থাকে না। যেমন—

(১) রূপের সাগরে | ডুব দিয়েছি | অরূপ রতন | আশা করি

কিংবা

(২) রূপ সাগরে | ডুব দিলাম | অরূপ রতন | আশা করি

এখানে প্রথমটিতে "শিবুঠাকুরের" এই নজিরে এক সিলেব্‌ল্ বাড়িয়েছি। কিন্তু ছয় মাত্রা ঠিক্ রেখেছি। অথচ এই পংক্তিটিতে যে ছন্দপতন ঘটেছে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নেই। রবীন্দ্রনাথের কথিত ষাণ্মাত্রিকতাই যদি এ ছন্দের আসল কথা হ'তো তাহ'লে সিলেব্‌ল্-সংখ্যার এই পরিবর্ত্তনে ছন্দ অব্যাহতই থাকৃত। কিন্তু তা যখন থাকেনি তখন বল্‌তে হবে যে ষাণ্মাত্রিকতাই এর আসল কথা নয়, চতুঃস্বরতাই এর মূল কথা; কেননা চারটি সিলেব্‌ল্ ঠিক্ রেখে মাত্রাসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিতে এ ছন্দের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণই থাকে।

উপরের দ্বিতীয় পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্ব্বে এক সিলেব্‌ল্ কমিয়েছি, 'তিন কন্যে'র নজিরে; কিন্তু মাত্রা-পরিমাণে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি। তথাপি এই পংক্তিটিতেও যে ছন্দ-পতন ঘটেছে তা সকলেই স্বীকার করবে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এখানে চতুর্থ পর্ব্বটি দুমাত্রার ফাঁক থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত আছে, কারণ ওখানে চার সিলেব্‌ল্ আছে। অথচ দ্বিতীয় পর্ব্বটিতে মাত্র এক মাত্রার ফাঁক আছে, তথাপি এ পর্ব্বটির পঙ্গুতা ঘোচেনি; কারণ এখানে চার সিলেব্‌ল্ নেই।

আশা করি এখন আর সন্দেহ নেই যে, প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ষাণ্মাত্রিকতাই প্রধান কথা নহে, এর চতুঃস্বরতাই প্রধান কথা। অর্থাৎ চার সিলেব্‌ল্-এর যোগে স-ফাঁক বা বে-ফাঁক ছয় মাত্রা রক্ষা করাই এ ছন্দের রীতি।

রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের যে বেফাঁক দৃষ্টান্তটি রচনা করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

স্বপ্ন আমার | বন্ধনহীন | সন্ধ্যা তারার | সঙ্গী
মরণযাত্রী | দলে,
স্বর্ণবরণ | কুজ্ঝটিকায় | অস্তশিখর | লঙ্ঘি'
লুকায় মৌন | তলে।

—পরিচয়, ১৩৩৮, মাঘ পৃঃ ৩৮০

এ ছন্দটাকে 'প্রাকৃত' বলার কোনো কারণ নেই; কেননা এখানে প্রাকৃত বাংলার বিশেষ কোনো লক্ষণই নেই। তথাপি এটিকে তিনি প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত ব'লেই গ্রহণ করেছেন; তার কারণ এই যে এটিতে প্রাকৃত বাংলা ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ধ্বনি রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এর প্রতি পর্ব্বেই চারটি ক'রে সিলেব্‌ল্ রয়েছে। কিন্তু যদি তৃতীয় লাইনের দ্বিতীয় পর্ব্বটিতে এক সিলেব্‌ল্ বাড়িয়ে লেখা যায় "কুজ্ঝটিকাতে", তাহ'লে অমনি প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনিটিতে পঙ্গুতা ঘট্‌বে। চতুঃস্বর ছন্দের কোনো পর্ব্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্ বসালেই ছন্দে স্খলন ঘটে তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। কিন্তু আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, "কুজ্ঝটিকাতে" লিখ্‌লেও ওই লাইনটাকে সিলেব্‌ল্-নিরপেক্ষ ষাণ্মাত্রিক ছন্দ হিসাবে অতি অনায়াসেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ আবৃত্তির ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে। চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত হিসাবে ওই লাইনটাকে যে লয়ে আবৃত্তি করা হয়, নিছক ষাণ্মাত্রিক হিসাবে আবৃত্তির লয় তার চেয়ে বিলম্বিত হবে। কেননা, স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট। যুগ্মধ্বনির এই উচ্চারণ-পার্থক্যের জন্যই স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবৃত্তির লয়ে এমন পার্থক্য ঘটে। যথাসময়ে এবিষয়ে আরও বলা যাবে।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান" এই স-ফাঁক ষাণ্মাত্রিক (অর্থাৎ চতুঃস্বর ষাণ্মাত্রিক) পংক্তিটার ফাঁক ভরিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতরূপে রূপান্তরিত করেছেন—

বৃষ্টি পড়্‌চে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌চে বন্যা

—পরিচয়, ১৩৩৮, মাঘ, পৃঃ ৩৭৯

এটা হ'লো বেফাঁক ষাণ্মাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেন এভাবে ফাঁক ভর্ত্তি করা সত্ত্বেও ছন্দের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণই রইল অর্থাৎ সফাঁক ও বেফাঁক ষাণ্মাত্রিক ছন্দ মূলত একই। আমি পূর্ব্বেই বলেছি ফাঁক রাখা ও ফাঁক পূরণ নিয়েই এদুই ছন্দের আসল পার্থক্য নয়; আসল পার্থক্য প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিকে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার স্থিরতা এবং তথাকথিত সাধু ষাণ্মাত্রিকে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার অ-স্থিরতা। লক্ষ্য করার বিষয়, 'বৃষ্টি পড়ে' প্রভৃতি লাইনটার স-ফাঁক ও বে-ফাঁক উভয় রূপেই প্রতিপর্ব্বে চার সিলেব্‌ল্‌ আছে এবং সেজন্যই এই উভয় রূপের মধ্যে ধ্বনিগত বিশেষ পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সেজন্যই এই উভয় রূপের ছন্দ মূলত একই। কিন্তু যদি সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটানো যায় তবে ছন্দ অপরিবর্ত্তিত থাক্‌বে না। যদি এই ছন্দের ধ্বনিকে অপরিবর্ত্তিত রাখ্‌তে হয় তবে এর প্রতিপর্ব্বের সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যাকেও অপরিবর্ত্তিত রাখ্‌তে হবে। আর যদি সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যায় পরিবর্ত্তন ঘটানো যায় তাহ'লে প্রতিপর্ব্বে ছয় মাত্রা পূরণ ক'রে দিতে হবে, নতুবা ছন্দ-পতন ঘট্‌বে। কেননা, যখন সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক্ থাকে তখন মাত্রার ইতরবিশেষে ক্ষতি হয় না; আবার মাত্রাসংখ্যা যখন ঠিক থাকে তখন সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক্ রাখা আবশ্যিক নয়। সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা স্থির না থাক্‌লেও শুধু মাত্রাসংখ্যার স্থিরতার দ্বারাই ছন্দ-রক্ষা হয়; উপরের লাইনটিতে যদি সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক্ না রেখে লেখা যায়

বৃষ্টি পড়িছে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল বান

কিংবা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর | নদীতে এল | বান

তাহ'লে ছন্দ নিখুঁৎ থাক্‌বে না। এমন কি, "বৃষ্টি পড়িছে টাপুর টুপুর নদীতে এল বান" এরূপ লিখে তৃতীয় পর্ব্বে এক মাত্রার ফাঁকের দোহাই দিলেও ছন্দের পঙ্গুতা ঘুচবে না। সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা ঠিক্ না রেখে ছন্দ ঠিক রাখতে হ'লে প্রতি পর্ব্বে ছয় মাত্রা পূরণ ক'রে দিয়ে লিখ্‌তে হবে—

বৃষ্টি পড়িছে | টাপুর টুপুর | নদীতে আসিল | বান।

নতুবা ছন্দ ঠিক্ থাক্‌বে না। সুতরাং আমরা দেখ্‌লুম যে, এক রকম ছন্দের প্রতি পর্ব্বে চার সিলেব্‌ল্‌ ঠিক্ রেখে ছয় মাত্রার স্থলে দুয়েক মাত্রার ফাঁক রাখা চলে; এই ছন্দকেই আমি বলি স্বরবৃত্ত চতুঃস্বর ছন্দ। এর ষাণ্মাত্রিকতাটা যে গৌণ সে-সম্বন্ধে বোধ করি আর সন্দেহ নেই। আরেক রকমের ছন্দের প্রতি পর্ব্বে ছয় মাত্রা থাকা চাই-ই, সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার স্থিরতা রক্ষা করা আবশ্যিক নয়। এই ছন্দটাকেই মুখ্যত ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বলা যায়, অপরটাকে নয়। এই জন্যেই—

বৃষ্টি পড়্‌ছে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌ছে বন্যা,
শিব ঠাকুরের হয় পরিণয় দান হবে তিন কন্যা।

এটাকে বল্‌ব স্বরবৃত্ত ছন্দ, যদিও এর প্রতিপর্ব্বেই ছয় মাত্রা ঠিক্ আছে। কেননা, এছন্দটা স্বরসংখ্যা-নিরপেক্ষ নয়। এর চতুঃস্বরতাই মুখ্য কথা; ষাণ্মাত্রিকতাটা গৌণ। আবার—

বৃষ্টি পড়িছে টাপুর টুপুর নদীতে আসিল বন্যা,
শিবু ঠাকুরের বিবাহ বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

এটাকে বল্‌ব ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কেননা, এটা সম্পূর্ণরূপেই স্বর সংখ্যা-নিরপেক্ষ। এটার ষাণ্মাত্রিকতাই মুখ্য কথা এবং এর পর্ব্বের সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার প্রশ্নটা একেবারেই অবান্তর।

৮

এবার উপেন বাবুর ঘোষিত "ছন্দের দ্বন্দ্ব" সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। উপেন বাবু দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন বটে এবং অস্ত্রাগারের দ্বার উন্মোচন না ক'রে স্ব-নির্ম্মিত দারুণ অস্ত্রই প্রাণপণে নিক্ষেপও করেছেন। কিন্তু দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু কি এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের লক্ষ্য কি, সে-বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যমাত্রও নেই। সুতরাং তাঁর শাণিত শর যে লক্ষ্যবেধ করতে সমর্থ হয়নি, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। শুধু হুঙ্কারে এবং টঙ্কারেই লড়াই ফতে হয় না; স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। "বাংলা ছন্দে চার সিলেব্‌লের সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌লের মিল হয় না" (ছন্দের দ্বন্দ্ব, বিচিত্রা—বৈশাখ, পৃঃ ৫৬৮), এমন কথা আমি কখনও বলিনি। কিংবা "ছন্দে সিলেব্‌ল্‌ প্রধান অথবা মাত্রা প্রধান" (কবির পুনশ্চ বক্তব্য, বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৮২), প্রশ্নটা তাও ছিল না। আমার বক্তব্য ছিল প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত "ছন্দের পর্ব্বগুলিতে কখনও

পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্‌ চালানো যায় না" (ঐ, পৃঃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)। আমার এই উক্তিটিকে অপ্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে তিনি "গুরুর আদেশে" যে "ত্রিবিধ প্রমাণ" হাজির করেছেন তার প্রত্যেকটিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, একটিও প্রাকৃত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত নয়। আর তাঁর রচিত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তের মধ্যে অভিনবতাও আছে। যথা—

(১) ঘন তমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব!

(২) বুঝি না কি যে আছে তব মনে সঙ্গোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায়-ক্ষণে!

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই দৃষ্টান্ত দুটিতে রচনা নৈপুণ্য এবং ছন্দের নূতনত্ব আছে; এই নূতনত্ব চার সিলেব্‌ল্‌-এর সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌ল্‌-এর যোগে নয়, ছ'মাত্রার সঙ্গে পাঁচ মাত্রার যোগে।

কিন্তু মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে স্বরবৃত্তের স্বরূপ নির্ণীত হ'তে পারে না, একথা বোধ করি উপেন বাবুকে ব'লে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে তিন, চার, পাঁচ, ছয় সব সিলেব্‌লই চলে সে-কথা সকলেই জানে। সুতরাং এই সর্ব্বজনবিদিত তথ্যটিকে প্রমাণিত করার জন্যে তিনি এতটা কষ্ট স্বীকার না করলেও পারতেন। আষাঢ়ের বিচিত্রায় অমূল্য বাবু এবং শৈলেন্দ্রবাবু উভয়েই একথা বলেছেন। সুতরাং আমার আর কিছু না বললেও চলত। কিন্তু উপেন বাবুর মনে প্রতীক্ষা আছে; কেননা তিনি বলেছেন "দেখিব এখন কি বিধি করেন প্রবোধ সেনে।" তাই দুয়েকটি কথা বলতে হ'লো। কিন্তু তাঁর রচিত দৃষ্টান্ত-তিনটি দেখেও কোনো নতুন বিধি করার আবশ্যকতা বোধ করিনি। কেননা একটি পুরাণো 'বিধি'তেই আমি ওই সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছি। আমি সেটির প্রতিই উপেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৩৩০ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী' থেকে সেটি উদ্ধৃত করছি।—"কবিরা অনেক সময় কেবল স্বর-সংখ্যা ঠিক্‌ রেখেই ছন্দ রচনা করেন। এইটেই খাঁটি স্বরবৃত্ত ছন্দ; এছন্দে মাত্রা-পরিমাণ স্থির থাকে না। আবার অনেক সময় তাঁরা কেবল মাত্রা-সংখ্যা ঠিক্‌ রেখেই কবিতা-রচনা করেন। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; এছন্দে স্বর-সংখ্যা স্থির থাকে না" (পৃঃ ৮৫)। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে 'স্বর' কথাটি আমি সিলেব্‌ল্‌ অর্থেই ব্যবহার করেছি।

আশা করি উপেনবাবু এখন তাঁর ত্রি-শূল অস্ত্রের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু নিরস্ত্র হয়েছেন ব'লেই যে তিনি নিরস্ত হবেন এমন আশা আমি করিনে। কেননা, নিরস্ত্র হ'লেও যে অনেকে নিরস্ত হন না, সে কথা কে না জানে? তিনি নিরস্ত্র হোন্‌ বা না হোন্‌, আমার পক্ষে আশ্বস্ত হবার একটু কারণ আছে। কোনো ছন্দেই চার সিলেব্‌ল্‌-এর সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌ল্‌-এর মিল হয় না, আমি একথা বলেছি এরূপ অকারণ আশঙ্কা ক'রে তিনি আমার সঙ্গ ছাড়বেন এরূপ ভয় দেখিয়েছিলেন। আমার উক্তরূপ কৈফিয়তের পরে আশা করি তিনি আমাকে সঙ্গ-পরিত্যাগের শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন। পরিশেষে তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ছন্দের বিচারে তিনি কানকেই মানেন; আমি কানকে মানিনে কল্পনা ক'রে তিনি আমার বিরুদ্ধে কানখাড়া করেছেন। আমার জবাব এই যে, আমি কানকে তো মানি বটেই; উপরন্তু আমি ছন্দের যে শাস্ত্র ও নিয়ম রচনা করতে প্রয়াসী সেটা তো ওই কানেরই নিয়ম। কানকে যে মানেনা তাকে সুধীজন "বে-কানা কহে," এবিষয়ে আমি উপেনবাবুর সঙ্গে একমত। কিন্তু গুরুর নিকট এক ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনার আদেশ পেয়ে, যিনি অন্য ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনা ক'রে হাজির করেন, সুধীজনেরা তাঁকে কি কহেন?

৯

পরিশেষে অমূল্যবাবুর ছন্দোবিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা ব'লেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। তিনি বলেন "বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রা-ছন্দ"; বাংলায় সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দ নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে সমস্ত বাংলা ছন্দই quantitative; এবং বাংলায় syllabic ছন্দের অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই মতটা আপাতত রবীন্দ্রনাথের মতের সহিত অভিন্ন ব'লেই মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবির মতের সঙ্গে অমূল্যবাবুর মতের পার্থক্য খুবই গুরুতর। অমূল্যবাবু দুয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রে

যে-ভাবে ছন্দোবিশ্লেষণ করেছেন তার থেকেই এই পার্থক্যটা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। যথা—

বাপ বল্‌লেন্ | কঠিন হেসে | তোমরা মায়ে | ঝিয়ে
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রো | আমার মরার | পরে।
—নিষ্কৃতি, পলাতকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মতে এইটে হচ্ছে "ষাণ্মাত্রিক" ছন্দ। অমূল্যবাবু বলেন এটি হচ্ছে "চাতুর্মাত্রিক" ছন্দ। তবেই দেখা যাচ্ছে উভয়ের মতের মধ্যে এক মাত্র "মাত্রা"র কথা ছাড়া আর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। আমি বলি এইটে হচ্ছে "চতুঃস্বর" (tetra-syllabic) ছন্দ। অমূল্যবাবু যদি এখানে 'মাত্রা' শব্দটিকে ব্যষ্টি বা unit (এ ক্ষেত্রে ছন্দের সিলেব্‌ল্) অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাহ'লে তাঁর মত ও আমার মতে অমিল নেই। কেননা, আমিও আলোচ্য ছন্দের unit অর্থেই "স্বর" কথাটি ব্যবহার করেছি এবং সিলেব্‌ল্‌কেই এ ছন্দের unit ব'লে গণ্য করেছি। কিন্তু সম্ভবত অমূল্যবাবুর অভিপ্রায় অন্য রকম; তিনি ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের (quantityর) unit অর্থেই 'মাত্রা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ব'লে মনে হচ্ছে। কারণ, "বাপ বল্‌লেন" এবং "এক লগ্নেই" এই তিন-সিলেব্‌ল্-আত্মক পর্ব্ব-দুটিতেও তিনি চার মাত্রাই গণনা করেছেন ব'লে বোধ হ'লো। যদি তাই হয়, তাহ'লে তাঁর কথিত 'মাত্রা' আর সিলেব্‌ল্ যে আলোচ্য ছন্দেও দুটি ভিন্ন বস্তু তা সুস্পষ্ট। কিন্তু কোন্ গণনাপদ্ধতি অনুসারে তিনি উক্ত দুটি পর্ব্বেও চার মাত্রার হিসাব করেন তা তিনি বুঝিয়ে বলেননি। আর, কেনই বা তিনি সমস্ত বাংলা ছন্দকেই মাত্রা-ছন্দ ব'লে মনে করেন তাও ঠিক্ জানিনে। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর সমস্ত মত বিশদ রূপে প্রকাশিত না হবে ততদিন তাঁর মতের আলোচনা করা সম্ভব হবে না। যাহোক, চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দে কিরূপে মধ্যে মধ্যে ত্রিস্বর (trisyllabic) পর্ব্বের সমাবেশ ঘটে, এবিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। সুতরাং এ প্রসঙ্গটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল। (এই প্রসঙ্গে প্রবাসী—১৩২৯, মাঘ, পৃঃ ৫০০ ৫০১; বিচিত্রা—১৩৩৯, বৈশাখ, পৃঃ ৫১০ এবং জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য।)

প্রাকৃত বাংলা ছন্দের স্বরূপটি দেখছি ক্রমেই নানা তর্কের জালে আচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এটি হচ্ছে মূলত' ষাণ্মাত্রিক; অমূল্য বাবুর মতে এটি চাতুর্মাত্রিক। আবার সত্যেন্দ্রনাথের মতে এটি মুখ্যত' "চারের ঘরানা" অর্থাৎ tetrasyllabic হ'লেও গৌণত' পাঞ্চমাত্রিক। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, "তুমি যাকে চারের ঘরানা—চারালী বা লাচারী—বলছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালীও বল্‌তে পার। × × × (কারণ) লঘুর্ভবেদ্ একমাত্রো—ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্" (ভারতী—১৩২৫, বৈশাখ, পৃঃ ২৩; ওই প্রসঙ্গে বিচিত্রা ১৩৩৮, চৈত্র পৃঃ ৪০১ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি এছন্দটা কারও মতে চাতুর্মাত্রিক, কারও মতে পাঞ্চমাত্রিক এবং কারও মতে ষাণ্মাত্রিক; আবার এক মতে ছন্দটা মূলত' syllabic এবং আর মতে সিলেব্‌ল্-এর কথা এছন্দের পক্ষে একান্তই গৌণ। এই নানা তর্কের জাল বিদীর্ণ ক'রে এছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য হবে না।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এছন্দের প্রকৃতিগত আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব। আশা করি তাতে এর গঠন-প্রণালীগত জটিলতার কতকটা অবসান ঘট্‌বে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

অনুলেখ—শ্রাবণের "পরিচয়ে" দেখলুম রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সংস্কৃত বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দের মাপ দুইয়ের, তার ওজনও দুইয়ের, যেমন—তো-মা স-নে; কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় প্রায়ই সে-স্থলে মাপ দুইয়ের হ'লেও ওজন তিনের, যেমন—তো-মার সঙ্-গে।" আমিও বস্তুত' ওই কথাই বলেছি। আমার ভাষায় প্রাকৃত অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি পর্ব্বার্দ্ধে সিলেব্‌ল্-সংখ্যা দুই এবং মাত্রা পরিমাণ তিন। অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে সিলেব্‌ল্-কে আশ্রয় ক'রে ছ'টি ক'রে মাত্রা থাকে; আর এইটেই এ ছন্দের আসল রীতি। সুতরাং 'পরিচয়ে'র "ছন্দ-বিতর্ক" প্রবন্ধটি থেকে একথা নিসংশয়ে প্রমাণিত হ'লো যে, আমি স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনি বিশ্লেষণ যে-ভাবে করি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ-প্রণালীর যথার্থ পার্থক্য কি ই নেই।

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রণবের পরিণয়

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু

১

প্রণব-কুমার একজন ক্যানভাসার। কি সব সিল্ক না মুগার কাপড়ের রাশি রাশি নমুনা নিয়ে সারা ভারতময় ঘুরে বেড়ায়, অর্ডার-বুকে লোকের অর্ডার লিখে' লিখে' কারখানায় পাঠায়, আর বেশ ছ'পয়সা করে খায়। তার প্রমাণ তার পোষাকে আর চেহারাতে—দুইই বেশ সৌখিন, ফিট্‌ফাট্, কায়দা-দুরস্ত। এমন কি, রেলওয়ের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর তা'কে চল্‌তে দেখ্‌লে একটু বড় দরের লোক বলেই মনে হয়। পায়ে ক্রীপ্‌-সোলের অক্সফোর্ড কাটের জুতা, হাঁটু পর্য্যন্ত ফুল-মোজা, তার ওপর খাকির শর্ট, তার ওপর সফেদ, তক্‌তকে শার্ট,—কলারটাকে স্পোর্টিং ষ্টাইলে উল্টে' রাখা হয়,—মাথায় খাকির শোলা-হ্যাট। এ পোষাক শুধু সেকেণ্ড ক্লাসকেই মানায়; তবে ব্যবসাবুদ্ধি থেকে প্রণব সর্ব্বদাই থার্ডক্লাসে চলে।

এই সবে সে দারিদ্র্যের কঠোর নিগড় ভেঙে' একটু সচ্ছল অবস্থায় পড়েচে। পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন তার পিতা হোমোপ্যাথিক চিকিৎসক পরমেশ মুখুজ্জের মৃত্যু হয়, তখন তার মা ছুটি শিশু ছেলে মেয়েকে নিয়ে যাকে বলে সায়রে ভেসেছিলেন। তিনি দিনরাত টাকু দিয়ে সুতা কাটতেন ও সে সুতা দিয়ে পৈতে তৈরি করে বিক্রি করতেন। তখনকার দিনে খাদির আন্দোলন ছিল না, তবে সৌভাগ্যক্রমে তখন গ্রামের ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র তাঁতি ও বৈশ্যেরা, ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও কৈবর্ত্তেরা পৈতা নিতে আরম্ভ করেছিলেন, ফলে মুখুজ্জে-গিন্নী ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরেছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে, অতি কষ্টের মধ্যে, প্রণব আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল। আই-এ ফেল হ'য়ে কলিকাতার এক ইউরোপীয় সোদাগরী আফিসে বাইশ টাকা মাইনায় কেরাণীগিরি পায়। ফুটবল ম্যাচের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের জন্য একদিন বড় বাবুর অবাধ্য হয়, ও চাকুরিখানা হারায়। তার পর থেকে সে ক্যানভাসারের পেশা ধরেচে এবং বহু সংগ্রামের ফলে এখন একটু সুবিধা করতে পেরেচে। এক বৎসর আগে তার বোনের বিয়ে দিয়েচে, এখন নিজের বিয়েটা বাকী। তার মা গাইবান্ধা সবডিভিসনের পৈরতলা গ্রামে বসে বসে দিবারাত্র সে কথাটাই ভাবেন।

২

থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়েও যেমন প্রণবের পোষাকটা সেকেণ্ড ক্লাসের, তেমনি ক্যানভাসার হয়েও তার মনটি অভিজাতের। আজ চার মাস যাবৎ মা লিখ্‌চেন, গাঁয়ের যদু ভট্‌চাজ্জের মেয়ে ক্ষেমীর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান, মেয়েটি শান্তস্বভাব, কর্ম্মঠ, তাঁর খুব পছন্দ হয়। অবশ্যি যদু গরীব, বিয়েতে কিছুই দিতে পার্‌বে না। কিন্তু প্রণব এ বিয়েতে কিছুতেই রাজী হয় না। সে ওসব শান্ত, কর্ম্মঠ গ্রাম্য মেয়ে চায় না। আর গরীব বাপদেরকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করাও তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রণবের মস্তিষ্কটা শুধু কাব্য আর রোমান্সে ভরা। সে চায় রূপ, সে চায় ঐশ্বর্য্য, সে চায় বিলাস, ফ্যাসন। তার মন দখল করে আছে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রী তরুণীরা,—তাদের স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল মুখ, পাতলা টস্‌টসে ঠোঁট, মোলায়েম হাত পা, আলস্যজড়িত গতি, আর পোষাকের চাকচিক্য ও পারিপাট্য। প্রণব রূপের উপাসক, প্রেমের সাধক। কলেজে পড়বার সময়েই ছাত্রসমাজে ঘোষণা করেচে, সে ধর্ম্ম মানে না, নীতি মানে না, অতীত মানে না, আচার মানে না; সে মানে আর্ট, সে মানে প্রেম। সে তরুণ। কাজেই তরুণীতে অনুরক্ত!

মেসের ছেলেরা সেটাকে "আলুর দোষ" বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কলিকাতায় থেকে অতিরিক্ত গোল আলু খেয়ে নাকি লোকের ওরকম অবস্থা হয়। (গোল আলুর যে সেরকম স্নায়বিক বা মানসিক পরিণাম হয় তা' এখনও বিজ্ঞান মতে প্রমাণিত হয় নি।) মেসের ছেলেরা শুধু "আলুর দোষ" বলেই ক্ষান্ত হয় নি, তার নামের ব-টাকে য়-তে বদ্‌লিয়ে ডাক্‌তে শুরু করেছিল।

ওরকম করবার একটা চাক্ষুষ কারণ ঘটেছিল। প্রণবদের মেসটা ছিল বৌ-বাজারের বড় রাস্তার ওপরে। তাদের বাড়ীর সমুখে, রাস্তার পরপারে, একজন পশ্চিম দেশীয় ধনী মুসলমান সদাগরের বাড়ী ছিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। দরজার শার্সীতে চূণ লেপা। সে শার্সীর মাঝখানে, আঙুল দিয়ে ঘসে' ঘসে' চূণা সরিয়ে, একটা বড় ছিদ্র করা হয়েছিল, তা' দিয়ে পর্দ্দানশীন মুসলিম মেয়েরা বাইরের জগতের দিকে চেয়ে থাক্‌ত। একদিন দেখা গেল প্রণবের ঘরে একটা ছোট দূরবীন। মেসের ছেলেরা তা' দেখে অবাক হ'ল। খবর করতে করতে মেসের উড়ে' ঠাকুরের কাছে জান্‌ল প্রণব নাকি মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করে' দূরবীন নিয়ে ছাতে চলে যায়, এবং ওপারের বাড়ীটাতেও নাকি একটা মেয়ে সবুজ রেশমের শাড়ী পরে দূরবীন হাতে ছাতে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রণবের সহপাঠী এক ছাত্র তার কাগজপত্র খুঁজে দু'লাইন কবিতাও আবিষ্কার করেছিল,—"মধুর মধুর মম করেচে অবনী, সে এক যবনী!" শুধু আরম্ভ, হয়ত মিলের অভাবে কবিতাটি থেমে গিয়েছিল। অথবা হয়ত কবি-জীবন নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকাতে কাব্য আত্ম-প্রকাশের অবসরই পায় নি।

সে পাঁচ বছর আগেকার কথা। ওসব কারণে যে প্রণব আই-এ ফেল হয় নি কে জানে? তারপর ছ'মাস কাল কেরাণীগিরির চাপে প্রণবের প্রণয়ের স্রোতে বালুর বাঁধ পড়বার উপক্রম হয়েছিল। এখন স্বাধীন জীবিকার পথ ধরা অবধি, তা' আবার ছাড়া পেয়েচে এবং একটু জোরেই বইতে আরম্ভ করেচে।

৩

সেদিন দিল্লীর ঠিকানায় প্রণবের একখানা পত্র এসেচে। মা লিখেছেন, "বাবা, বাড়ী বাড়ী বিয়ে হচ্চে, তোমার বিয়ের নামটি নেই, এতে আমার প্রাণে কেমন লাগ্‌চে তা' তোমাকে কি করে বলব? যদু ভট্টাচার্য্য কাল সন্ধ্যায় এসেছিল, সঙ্গে তোমার ও-বাড়ীর জ্যেঠামশায় ছিলেন। যদু বল্‌লে, ২৯শে বৈশাখ বিয়ের দিন আছে, শুভকর্ম্ম হয়ে যায় ভাল। জান্‌লাম, যদুর হাতে অন্য আলাপও আছে। এখন আমরা সকলে তোমার মতের অপেক্ষায় আছি।"

প্রণব পত্রখানা ভাল ক'রে পড়ে' পকেটে পুরে' মনে মনে স্থির করল। বিয়ে শিগ্‌গিরই করবে—তবে গাঁয়ের ও "শান্ত-স্বভাব, কর্ম্মঠ মেয়ে" নয়।

দিল্লী হ'তে প্রণব নিজ কাজে মুসৌরি গিয়েছিল। সেখান হ'তে মোটর-বাসে বসে' দেরাদুন আসতে আস্‌তে প্রণব ভাব্‌ছিল, তা'কে জাত, পর্য্যায়, রাশি, নক্ষত্র মিলিয়ে দেশেই বিয়ে কর্‌তে হ'বে এমন কি কথা আছে? সে যেখানেই হোক, আর যে ধর্ম্মের মধ্যেই হোক্, নিজের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করবে।

তার পছন্দটা কি তাই প্রণব ভেবে ঠিক কর্চ্ছিল। দেখ্‌ল, সেটা ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। বাঙ্গালী মেয়েদের সে পছন্দ করে না, কেননা বাঙ্গালী মেয়ে বল্‌তেই তার মনে হয় তার বোন ঊষা, কাব্যহীন, রোমান্স্‌হীন, নেহাৎই ঘরোয়া, নেহাৎই সাধারণ। গুজরাটী মেয়েদের সে বিশেষ করে দেখেচে, তারা প্রায় বাঙ্গালীরই মত, শুধু কাঁচুলি পরে, আর উল্‌টো দিকে শাড়ীর আঁচল দেয়; তবে তারা কেমন পুরুষ মানুষের মত সোজাসুজি চোখে চোখে চেয়ে থাকে, প্রণবের তা' সহ্য হয় না। তার মতে, মেয়েমানুষ হ'বে ব্রীড়ানতা, দৃষ্টিতে রোমাঞ্চ বয়ে যাবে। মহারাষ্ট্রী মেয়েদের কাছাটা তার কাছে তত মানানসই মনে হয় না, আর তাদের ঐ গম্ভীর, পাথরের মূর্ত্তির মত মুখ,—নাক চোখ যতই সুন্দর হোক না কেন,—সে দেখ্‌তে ভালোবাসে না। মাদ্রাসীদের প্রায়ই কালো রং, তারপর ভাষার মধ্যে একটা খট্‌খটে আওয়াজ। তা সে পছন্দ করে না। প্রণব ভালোবেসেচে উত্তর হিন্দুস্থানের মেয়ে,—বিশেষতঃ

দিল্লীওয়ালী,—সেই লম্বা দেহ, ফর্সা রং, কোমল মুখ, পটলচেরা চোখ, তিলফুলের মত নাক, পরণে উর্ণা আর রঙিন শাড়ী বা চুড়িদার রঙিন পাজামা, পায়ে মল, আর পাম্পশু বা নাগরা জুতা। হাতের মধ্যে উর্ণা জড়িয়ে রুম্-রুম্, ঝুম্-ঝুম্ করে চলে। চোখের পাতার কোনে শূর্মার, আর চোখের তারার মধ্যে সরমের, অঞ্জন! আর সে ভালোবেসেচে তাদের মিঠে উর্দ্দু কথা,—সেই শক্স্ আর লুফে, আর বেশখ্— বল্‌তে বল্‌তে মুখ ভরে ওঠে; সেই ঈধর আর উধর আর লে—আনা, গানের সুরের মত ভেসে আসে; আর সেই মেয়েলি ভাষা, আউঙ্গী, জাউঙ্গী, লুঙ্গী, তুঙ্গী!

প্রণব স্থির করল, সে যদু ভট্‌চাজ্জের মেয়ে ক্ষেমীকে বিয়ে করবে না; দিল্লীওয়ালী বিয়ে করবে, সে হিন্দু হোক আর মুশ্লিম হোক। ধর্ম্মে কি এসে যায়? ও জিনিসটাকে অত বড় স্থান দিয়েই তো ভারতবর্ষ অধঃপাতে গেছে! —আমাদের মনে হয়, উনিশ বছর বয়সে, সেই কলেজের মেসে থাকা কালে, দূরবীনের ভিতর দিয়ে দেখা হিন্দুস্থানী তরুণীটি প্রণবের মস্তিস্কের মধ্যে স্থায়ী রেখা এঁকে গেছিল। কে জানে সে ছবিটা তার মনের, অবচেতন ভাগ থেকে তা'কে কেরাণীগিরি হ'তে ছিনিয়ে ক্যানভাসিং এর কাজে লাগায় নি?

৪

দেরাদুন থেকে ট্রেনে লাকসার এসে প্রণব গাড়ী বদ্‌লিয়ে একটা লক্ষ্ণৌ যাত্রী ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরল। কিন্তু সে-গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে এত ভিড় হয়েছিল যে প্রণব কুমারের দম আট্‌কে যাবার উপক্রম আর কি! সে উঠ্‌বার পর একদল পাহাড়িয়া মেয়েপুরুষ উঠ্‌ল, তার পর সিকি ডজন কাবুলিওয়ালা এল, তার পর আধ ডজন কাশ্মিরী পণ্ডিত-পণ্ডিতানী ও আধ কুড়ি সাধু সন্ত বৈরাগী প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে পেটরা, ধুচ্‌নি, লাঠি আর কমণ্ডলু!

মোরাদাবাদ ষ্টেশনে এসে প্রণব ভাব্‌ল, থার্ড ক্লাসের টিকেট খানাকে ইণ্টার ক্লাস করে নেবে। কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়াটার কথা ভেবে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল। ইণ্টার ক্লাসের অবস্থা কিরূপ দেখ্‌তে গেল। দূর হ'তে দেখ্‌ল জনাচুই লোক বসে আছে। ভাড়ার অতিরিক্ত বৈষম্যের জন্যে ইণ্টার ক্লাসে এদিকে কম যাত্রীই থাকে। প্রণব যখন ইণ্টার ক্লাসের কামরার সাম্‌নে এল তখন হঠাৎ অবাক হ'য়ে দাঁড়াল। দেখ্‌ল আজ সকাল হ'তে যে দিল্লীওয়ালীর স্বপ্ন দেখে এসেচে, তেমনই একজন সে কামরায় বসে আছে। সেই পটল-চেরা চোখ, তিলফুলের মত নাক, মোলায়েম মুখের ছাঁচ, গায়ে রেশমের শাড়ী ও উর্ণা,— এবং প্রণব জানালা দিয়ে আড় চোখে চেয়ে দেখল,— পায়ে মল ও নাগরা। বয়সে তরুণী। তার সামনে, অপর বেঞ্চে একজন প্রৌঢ় লোক বসে আছে।

প্রণব তাড়াতাড়ি ষ্টেশন ঘরে গিয়ে টিকেট বদ্‌লাল। পূর্ব্বে ভেবেছিল, বেরেলী পর্য্যন্ত বদ্‌লাবে, এখন অন্যমনস্ক হয়ে সে কথাটা ভুলেই গেল, লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্তই টিকেট ইণ্টার হ'য়ে গেল। পয়সা দিতে প্রণবের মোটেই বাধ্‌ল না।

টিকেট কিনে থার্ড ক্লাস হ'তে সুটকেস্‌টা আন্‌তে গেল। লোকের ভিড় এবং সময়ের সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও প্রণব সুটকেসটা খুল্‌ল, এবং ভিতর হ'তে তার দামী কোটখানা বের করে পরল। তারপর একটা গোলাপী রংয়ের সিল্কের রুমাল তুলে কোটের বুকের পকেটে রাখল এবং তার একটা কোন্ বের করে দিল। পোষাকের পরিবর্ত্তন করতে করতে প্রণব ভাব্‌ল, আজ লক্ষ্ণৌ পৌছেই মার কাছে লিখ্‌বে, "মা, আমি ক্ষেমীকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি তাদের বলে দাও অন্য সম্বন্ধ ঠিক করুক গে।"

তাড়াতাড়ি সুটকেস বন্ধ করে প্রণব প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়ল।

৫

সে একটু গম্ভীর ভাবেই ইণ্টার ক্লাসের কামরায় গিয়ে উঠল। সে কামরার অন্য কারো প্রতি তার কোনও কৌতূহল নেই তা দেখাবার জন্যে সে সুটকেস হ'তে একখানা অর্ডার বুক খুলে খুব মনোযোগের সহিত পড়তে আরম্ভ করল।

তখন সে কামরার প্রৌঢ় লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তারপর দরজার কাছে গেল, তারপর দরজা খুলে' বাইরে নাম্‌ল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর সিটি পড়ল। প্রণব বই বন্ধ করে' দরজার দিকে চেয়ে রইল। গাড়ী চল্‌তে লাগল, তবু সে লোকটা এল না। প্রণব অবাক হয়ে তরুণীটির দিকে চেয়ে উর্দ্দুতে বল্‌ল, "আপনার সঙ্গের লোক এল না?"

তরুণী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প্রণবের দিকে চেয়ে অতি মিঠে উর্দ্দুতে বলতে লাগল, "সে থার্ড ক্লাসের গাড়ীতে চলে গেচে। তার থার্ড ক্লাসের টিকিট। এ ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।" বল্‌তে বল্‌তে সে জামার ভিতর হ'তে নিজের ইণ্টার ক্লাসের টিকিটখানা বের করল।

প্রণবের বিষয়টা বুঝতে বাকী রইল না। বেটা থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ইণ্টার ক্লাসে চলছিল! তা'কে টিকিট-চেকার ভেবে সরে পড়েচে। লোকটা মেয়ের কে হ'বে? বাপ কি? ভারি 'কঞ্জুস' তা' হ'লে!

প্রণব তরুণীর দিকে চেয়ে বেশ মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় 'তশরীফ নিয়ে' যাচ্ছেন?"

তরুণী বলল, "বেরেলী"। সে তার টিকিটখানা প্রণবের দিকে তুলে ধরল।

প্রণব মুচকি হাস্‌ল। বলল, "আমাকে টিকিট দেখাতে হ'বে না। আমি আপনার মতই একজন 'মুসাফের'।"

একথায় তরুণী একটু লজ্জিত হ'য়ে চোখ নোয়াল। মিনিট দুই পরে আবার চোখ তুলে যখন চাইল, তখন দেখতে পেল প্রণব তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তখন সে ঈষৎ হেসে' প্রণবের গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসা করল।

প্রণব বলল, "লক্ষ্ণৌ"।

তরুণী বলল, সে সেখানে সরকারী "নোকরি" করে বুঝি?

প্রণব হঠাৎ বলতে যাচ্ছিল, সে ক্যানভাসার। নিজকে থামিয়ে বলল সে ব্যাপারী, ব্যবসা করে।

তরুণী গাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইল। তার সেই বঙ্কিম, অলস দেহভঙ্গী, যা' প্রণব দিনের পর দিন মেয়েদের মধ্যে অতিশয় তারিফ করে' এসেচে।

সে মুহূর্ত্তে প্রণব নিজের প্রতি খুব অসন্তোষের ভাব পোষণ করতে লাগল। ভাব্‌ল, সে যদি আরও লেখাপড়া করত, বি-এ, এম-এ পাশ করত, তবে হয়ত একটা বড় সরকারী নোকর হ'তে পারত। হয়ত একটা আই, সি, এস্‌—টাই, সি, এস্‌ হয়ে যেত। তখন সকলেই তাকে সম্মানের চক্ষে দেখত, বড় বড় লোক তার কাছে মেয়ে দিতে চাইত। প্রণবের মনে ভারি অনুতাপ এল, সে ঠিক মত পড়াশোনা করেনি, সময়ের অসদ্ব্যবহার করেচে, তাই আই-এ তেই ফেল হ'য়ে গেছে!

তারপর সে আবার সতৃষ্ণ-নয়নে সেই তরুণীর পানে চেয়ে রইল। লম্বা লক্‌-লকে ঘাড়, তার ওপর কালো চুলের খোপা,—পাতলা উর্ণা দিয়ে ঢেকে রয়েচে;—তরুণী ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

প্রণব ভাব্‌ল, সে হিন্দু না মুস্লিম? পায়ে সবুজ পাজামা—সাদা চুড়িদার, তার নীচে নাগরা জুতা। হিন্দুও হ'তে পারে মুস্লিমও হ'তে পারে।

তরুণী আবার মুখ ফিরিয়ে দেখল, প্রণব অতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে। সে আবার মৃদু হাস্‌ল। এবার তার ঠোঁট দুটি পূর্ব্বাপেক্ষা সামান্য বেশী ফাঁক হ'ল।

তা'তে প্রণবের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গের লোকটী আপনার কে হন? তিনি যে আপনাকে ফেলে চলে গেলেন?"

তরুণী বলল, "সে আমার 'নোকর', শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ওর তো এখানে থাক্‌বার কথা নয়!"

হঠাৎ প্রণবের মুখে চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল সে ভাবল, এতো মেয়েদের গাড়ী নয়? উঠে' দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে গাড়ীর দুদিকেই দেখ্‌ল, কিন্তু মেয়েদের গাড়ী বলে' কোনো চিহ্ন পেল না। তবু তার আতঙ্কের ভাব সম্পূর্ণ দূর হ'ল না। ভাব্‌ল, অনেক সময় সাধারণ গাড়ীতে শ্লিপ্‌ বেঁধে মেয়েদের গাড়ী করা হয়, কখন কখন সে শ্লিপ ছিঁড়ে যায়। প্রণব আবার উঠে দুটা দরজা দিয়েই বাইরের দিকে দেখল। কোনো শ্লিপ ছিল না, তবে একদিকে ডাণ্ডার ওপর সুতা বাঁধা ছিল বটে।

অতি অস্বস্তির সহিত প্রণব বেঞ্চে ফিরে এসে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কামরা মেয়েদের—জানানেকে ওয়াস্তে—নয় তো?"

তরুণী ঘাড় নেড়ে বল্‌ল, "মালুম নঁহী"।

তখন প্রণব অস্থির হ'য়ে তরুণীর পরিচয় নিতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, তার বাড়ী—'দৌলতখানা'—কোথায়, পিতার নাম কি।

তরুণী একটু দৃঢ় হয়ে শক্ত করে বলল, "আমাদের বাড়ী শারাণপুর। আমার বাবা সেখানকার রেইস (জমিদার) এক্রিয়ার আলিখান।"

উত্তরে প্রণব শুধু "ও!" বলে চুপ করল। সে কথাটা শুনে তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ভাব্‌ল, এগাড়ীতে এসে মস্ত ভুল করেচে। মুস্লিম মহিলার সঙ্গে ওভাবে একা 'মুসাফিরি' করা কোনো মতেই ঠিক নয়। বেরেলীতে তার আপনার লোক তা'কে নিতে আসবে। তখন প্রণবকে মেয়ের সঙ্গে একা দেখে' হয়ত তারা একটা গোলমাল বাঁধিয়ে বস্‌তে পারে; এমন কি তার থেকে একটা হিন্দু-মুসলমানের মস্ত দাঙ্গাও গ'ড়ে উঠতে পারে।

প্রণব কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। ভাব্‌ল যদি বেরেলীর আগে কোথাও গাড়ী থামে, তবে নেমে যাবে।

তরুণী কৌতুহলী দৃষ্টিতে প্রণবের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। প্রণব আবার জিজ্ঞাসা করল, "বেরেলীতে আপনার কে আছে?"

তরুণী অত্যন্ত করুণ সুরে, অথচ প্রগলভ ভাবে, বল্‌তে লাগ্‌ল, "দেখুন, বেরেলীতে আমার কেউ নেই। সেখানে আমাকে জোর করে, বুড়ো রেইস নবাব সৈয়দ উল্লার সঙ্গে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।"

এ কথায় প্রণবের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তরুণীর গাঢ় কালো দুটি চোখ আর রাঙা ঠোঁট জোড়ার দিকে চেয়ে রইল।

তরুণী আরও করুণভাবে বলে যেতে লাগল, "দেখুন আমার মা নেই, বুড়ো বাবা অসুখে পড়ে আছেন, এ সুযোগে কাকা আমাকে বিয়ে দিয়ে ফেল্‌চেন। সে বুড়ো রেইসের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি দশ পাঁচ হাজার টাকা লাভ করবেন। আমার "নসীব" বড় খারাপ।" বলে' তরুণী কাঁদ কাঁদ হ'য়ে পড়ল।

প্রণব জিজ্ঞাসা করল "আপনার সঙ্গে, তা' হ'লে, অনেক লোক আছে?"

তরুণী বল্‌ল, "হাঁ। তাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্রও আছে। আমি যাতে কোনোমতে পালিয়ে না যেতে পারি তার খুব ব্যবস্থা করা হয়েচে।" বলে তরুণী কাঁদতে লাগল।

প্রণব ভারি মুগ্ধ হ'য়ে তার পানে চেয়ে রইল। তার আর্টিষ্টের দৃষ্টিতে ঐ অশ্রুময় মুখখানি আশ্চর্য্য রকম সুন্দর দেখাতে লাগল। সে বল্‌ল, "দেখ্‌চি, এ শাদীতে আপনি নারাজ?"

তরুণী বল্‌ল, "বুড়োর সঙ্গে কেইবা শাদী করতে চায়, সাহেব?"

প্রণব সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ল, "কেন, বুড়ো তো কিছুদিন পর মরে যাবে, তখন তার সম্পত্তির হিস্‌সা পাবেন। তারপর আবার বিয়ে করতে বাধা কি?"

তরুণী বল্‌লে, "সে কবে হ'বে কে জানে? ততদিনে আমার সব 'খতম্‌' হয়ে যেতে পারে।"

প্রণব একটু ভেবে বল্‌ল, "তা' ঠিক বটে। তবে কোনো 'জওআনের' (তরুণের) সঙ্গে আপনার 'মুহব্বত' (প্রেম) হয়েচে?"

তরুণী কাঁদ-মুখে একটু হেসে বল্‌ল, তা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? সে রেইসের ঘরের মেয়ে, পর্দ্দার ভিতর রয়েচে। তার 'আশক' (প্রেমিক) এতকাল 'দিলের' মধ্যে,—'খোয়াবের' (স্বপ্নের) মধ্যেই ছিল। বাস্তব জগতে তার সঙ্গে 'মুলাকাৎ' হবার সুযোগ পেয়েচে কোথায়?

প্রণব দেখে অবাক হ'ল সেই মুসলমানীর প্রাণটা তারই মত কবিত্বময়।

তরুণী বল্‌তে লাগ্‌ল, "দেখুন না, কোনো লোকের সঙ্গে যেন আলাপ পরিচয় (জান-পহচান) না হয়, সে জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে না বসিয়ে এখানে বসিয়েচে। মেয়েদের ইণ্টার থাক্‌লে সেখানেই বসানো হ'ত। তখন আপনার কাছে আমার দুঃখের কথা বল্‌তে পারতাম না।"

বলে' সে অশ্রুসিক্ত মুখে বসে রইল। প্রণব তরুণীর আত্মকাহিনী শুনে' অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, সে-বুড়োর হাত হ'তে আত্মরক্ষা করবার কোনো উপায় খুঁজে দেখেচে কি না।

তরুণী অসহায়ভাবে বল্‌ল, কি আর উপায় আছে! বেরেলীতে পৌছুবে, আর শাদী হ'বে। যদি কোনও 'জওআন' এসে তা'কে বাঁচাতে পারে, তবেই সে বিয়ে বারণ করা যায়। তা' ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

প্রণব ঘাড় সোজা করে বস্‌ল। ক্ষীণ গোঁফ জোড়াতে বেশ করে একটা চাড়া দিল। তারপর তিন চার মিনিট ভাব্‌ল। ভেবে গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "জমিদার-কণ্যে (রেইস জাদী) আমি তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমার জীবন পন করতে প্রস্তুত আছি। তুমি কি এ গরীবের সাহায্য গ্রহণ করবে?"

একথা শুনে' তরুণী তার লক-লকে ঘাড়টি বাঁকিয়ে আবেগভরে বল্‌ল, "যে তরুণ আমাকে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার করবে,—সে বুড়ো রেইসের হাত থেকে পরিত্রাণ করবে, সে জগতে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

প্রণবের উচ্ছ্বাস দমন করা কঠিন হ'ল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত-ভাবে বল্‌ল, সে-ই সে তরুণ (জওআন)। বল্‌লে, "রেইস-জাদী, তুম্ মুঝে—মুঝসে—পেয়ার করেগা—করোগী?' উত্তেজনার ঝোঁকে প্রণবের মুখে তিনবছর আগেকার বাংলা হিন্দী এসে পড়ছিল!

তরুণী আগ্রহের সহিত বল্‌ল, "কোরবো!—বেশ্‌খ করুঙ্গী!" তারপর উর্ণা দিয়ে চোখের জল মুছে একটু আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে যাবে?"

প্রণব বল্‌ল, কষ্ট (তকলীফ্) ? প্রেমের জন্য (মুহব্বতকে লিয়ে) সে না করতে পারে এমন কাজ নেই।

তরুণী সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হ'ল। সে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে বল্‌ল, "ব্যস্। এ মুহূর্ত্ত হতে আমি তোমার। আমার জীবন যৌবন তোমার।"—"মেরী জিন্দেগী ঔর জওয়ানী তুম্‌হারী হ্যায়।"

"জিন্দেগী ঔর জওআনী!" কি চমৎকার কথা! প্রণবের হৃদয়-কূপে সে কথা দুটো বড় বড় দু'টুকরা ঢিলের মত গিয়ে ছুটে পড়ল।

৬

প্রণব তরুণীর হাত গ্রহণ করল। দেড় মিনিটকাল বিহ্বল ভাবে থেকে বল্‌ল, "তোমাকে কি বলে ডাকব? তোমার নাম তো বলনি, রেইস-জাদী!"

তরুণী বল্‌ল, তার নাম আমিনা। প্রণবকে তার "ইস্ম শরীফ" জিজ্ঞাসা করল। প্রণব একটু গর্ব্বের সহিতই বল্‌ল, "প্রণবকুমার মুখার্জ্জি!"

আমিনা বল্‌ল, "আপ কুঁয়ার হাঁায়?"

প্রণব বল্‌ল, সে নামে কুমার। তবে সে কুলীন। মানে, তার পূর্ব্ব পুরুষেরা রেইস ছিল।

আমিনা খুসী হ'ল। কিন্তু প্রণব হ'ল না। তার মনে সঙ্কোচ বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সে বল্‌ল, "প্যারী আমিনা, তুমি কি জান, আমি মুস্‌লিম নই, আমি হিন্দু আমি বাঙ্গালী।"

আমিনা তীক্ষ্ণভাবে প্রণবের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "তুমি বাঙ্গালীবাবু? সে তো আরো ভাল। যদি বাড়াবাড়ি হয় তবে রিভলভার চালাতে পারবে, হয়ত দু'একটা বোমাও ছুঁড়তে পারবে।"

প্রণব বল্‌ল, সেরকমের বাঙ্গালী নয়। সে গান্ধীর ভক্ত, অহিংসা-পন্থী। জাহান দিতে প্রস্তুত, নিতে চায় না।

আমিনা বল্‌ল, "তা' হ'লে আমাকে কি করে উদ্ধার করবে?"

প্রণব বল্‌ল, "ইংরেজের আইনের সাহায্যে। আমরা দুজনে বেরেলী পৌছেই পুলিশের আশ্রয় নেব, তারপর শহরে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমরা বিয়ে করতে চাই। তোমার বয়স আঠারো পেরিয়েচে, আমিনা?"

আমিনা বল্‌ল, "তা তো ঠিক করে বল্‌তে পারি না। ছেলেবেলায় মা মরে যান, আমাকে তো "উমর্" বলে যান নি।"

প্রণব বল্‌লে, "যা হোক, ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্‌বে তোমার "উমর" আঠার বৎসর,—বলো, উনিশবৎসর। তার মানে তুমি সাবালক। যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পার। সমাজে বা আইনে আটকাতে পারবে না।" আমিনা বল্‌লে,"তা বল্‌ব।

গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল। অল্পক্ষণ থেমে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল।

তখন প্রণব নিজের বেঞ্চ ছেড়ে আমিনার বেঞ্চে গিয়ে বসল। তার দুটি হাতই নিজের হাতের মুঠায় নিয়ে কোমলভাবে বল্‌ল, "সত্যি তুমি আমায় ভালোবেসেচ, আমিনা ?"

আমিনা বল্‌ল, "আমি বহুকাল পূর্ব্বেই খুদার দরবারে আর্জ্জি পেশ করেছিলাম যেন আমি একজন খুপ্‌সুরত জোওআন আশক পাই; আজ আমার সে আরজি মঞ্জুর হয়েচে।"

সেই গলার ভিতর হ'তে—মেয়েলি গলার ভিতর হ'তে—উচ্চারিত 'খুদা' আর 'খুপ্‌ সুরতের' 'খ'টি প্রণবের কানের ভিতর মধুবর্ষণ করল। সে আমিনাকে তার বুকের কাছে টেনে এনে চুমো খেল। পিঠের উপর হাত রেখে বল্‌তে লাগল, সে তার জানের অধিক প্যারী। সে তার দিলের দর্দ্দে দাওয়াই। সে দুনিয়ার রোশ্‌নি। সে বেহস্তের হুরী!

মিঠে হাসিতে আমিনার মুখখানি রাঙিয়ে উঠল। সে প্রণবের গায়ের উপর এলায়ে পড়ল।

প্রণব বল্‌ল, "আমাদের আজই বিয়েটা সেরে ফেল্‌তে হ'বে। নতুবা সে বুড়ো রেইস গোলমাল বাঁধাতে পারে।"

আমিনা সে প্রস্তাবে আন্তরিক সম্মতি জানাল।

৭

তারপর তিন চার মিনিট প্রণবের মুখখানা খুব গম্ভীর হয়ে রইল। সে খুব গুরুতরভাবে ভেবে বল্‌ল, "আচ্ছা, আমাদের বিয়েটা কোন্ প্রথামত হ'বে ?"

আমিনা প্রণবের ঘাড়ের ওপর হেলান দিয়ে বল্‌ল, "তোমার যেরকম ইচ্ছে।"

প্রণব বলল, "আমি মুসলমান হ'য়ে মুস্‌লিম ধর্ম্মমতে তোমাকে বিয়ে করব। তা' হ'লে এ বিয়েতে তোমাদের সমাজের আপত্তি থাক্‌বে না। তারা বরং খুসী হ'বে। কেননা, আমি তো শুধু হিন্দু নই, ব্রাহ্মণ, তার ওপর কুলীন ব্রাহ্মণ!

আমিনা ঘাড় তু'লে অবাক হ'য়ে প্রণবের মুখের দিকে চাইল। প্রণব বল্‌ল, "আচ্ছা আমিনা, বল তো মুসলমান হ'লে আমার কি নাম হ'বে ?"

আমিনা বল্‌ল, "তোমার যা ইচ্ছে।" বলে আবার প্রণবের ঘাড়ে মাথা রাখ্‌ল।

প্রণব বল্‌ল, "ইৎমাৎ উদ্দৌল্লা ?" লোকের উচ্চারণ করতে কঠিন হ'বে। গুলাম কাদের ?—গোলাম হ'তে যাব কেন ? আমিনুল ইস্‌লাম ? তা বেশ মানাবে। তুমি আমিনা, আমি আমিনুল।

আমিনা মিঠে করে বল্‌ল, "আমিন্‌-উল-ইস্‌লাম ! বেশ নামটি !"

প্রণব খুসী হ'য়ে বল্‌ল, "তবে এ নামই রাখা যাবে।"

সে-নাম রাখাই স্থির হ'ল।

কিন্তু প্রণবের মুখে আবার চিন্তার ছায়া পড়ল। হঠাৎ মগজের ভিতর একটা ছবি ভেসে উঠে তাকে বিব্রত করে তুলল। পইরতলার বাড়ীর পূবের ঘরটার দাওয়ায় বসে তার মা টাকু ঘুরাচ্চেন, তাঁর মুখ ক্লান্ত, হাত অবসন্ন।

প্রণব মাথা ঝাড়া দিয়ে বল্‌ল, "আমিনা একটা কথা হয়েচে।"

আমিনা বল্‌লে, "কি ?"

প্রণব বল্‌ল, "দেখ, আমার পূর্ব্বপুরুষরা পাঁচ শ' বছর ধরে জিজিয়া কর দিয়ে এ হিন্দু ধর্ম্মটাকে রক্ষা করেছিলেন, তার নিশ্চয়ই একটা মূল্য থাকবে।"

আমিনা বল্‌লে, "বেশখ্‌" (নিশ্চয়)।

"কাজেই আমার সে ধর্ম্মত্যাগ করাটা ভাল মনে হয় না। তার চেয়ে তুমিই হিন্দু হয়ে যাও না কেন ?"

আমিনা প্রণবের ঘাড়ে মাথা ঘসে বল্‌ল, "তুমি যা বল।"

প্রণব খুসী হ'য়ে আমিনাকে দ্বিতীয়বার চুম্বন করল। এরি নাম খাঁটি ভালবাসা! ধর্ম্মত্যাগে পর্য্যন্ত আপত্তি নেই! বল্‌ল,

"তা' হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে "একরার" করে আমরা আর্য্য সমাজে চলে যাব। সেখানে তোমার শুদ্ধি হবে। কেমন ?"

আমিনা বল্‌ল, "হিন্দু হ'লে আমাকে শুধু কপালে সিন্দুর পরতে হ'বে, তাই তো ? এ ছাড়া আর কিছু নয় ?"

প্রণব বল্‌ল, "আর বুরখাটা ছাড়তে হ'বে। তবে শাল জড়িয়ে, বড় ঘোমটা টেনে রাস্তায় চল্‌তে পারবে।"

আমিনা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "ঘোমটার ভেতর ছেঁদা থাক্‌বে কি, না হ'লে দেখ্‌বো কি করে ?"

প্রণব বল্‌লে, "দেখ্‌বার অসুবিধা হ'লে না হয় ঘোম্‌টা চোখের ওপরে রেখেই চল্‌বে। শুধু লোক এলে ঘাড় বাঁকিয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাক্‌বে।"

আমিনা বলিল, "আচ্ছা।" বলে আবার প্রণবের ঘাড়ে হেলান দিল।

প্রণব বল্‌লে, "শুদ্ধি করে তোমার নাম হ'বে কি আমিনা ?

আমিনা মাথা দিয়ে আস্তে আস্তে ঢু মারতে মারতে বল্‌ল, "তুমি যা বল।"

প্রণব বল্‌লে, "সাবিত্রী দেবী! কি বল ? না, সাবিত্রী নয়, গায়ত্রী দেবী, মানাবে বেশ, না ?"

আমিনা বলল, "হ্যাঁ। আমি কিছু কিছু গানও করতে পারি।"

প্রণব উচ্ছ্বসিত ভাবে বল্‌ল, "বটে ? আমার বড় সৌভাগ্য! তবে তার জন্যে আমি গায়ত্রী বলিনি। আমার নাম প্রণব, মানে গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর, তার সঙ্গে তোমার নাম গায়ত্রী হ'লে খুব মানাবে। না ?"

আমিনা প্রণবের ডান হাতের মাঝের আঙুলটাতে একটা টান দিয়ে বলল, "বেশথ্‌।" বলে' প্রণবের গায়ের ওপর আবার এলায়ে পড়ল।

কিন্তু আবার প্রণব দুই মিনিট কাল ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল। তারপর বল্‌ল, "আমিনা, আমাদের বিবেচনা ঠিক হয় নি।"

আমিনা বল্‌ল, "কেন ?"

প্রণব বল্‌ল, "দেখ, ওসব ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে বড় হৈ চৈ হয়। সমাজে শোর গোল পড়ে যায়। তার চেয়ে সিভিল ম্যারেজই ভাল।"

আমিনা ঘাড় তুলে বলল, "সে কি ?"

প্রণব বল্‌ল, "আমরা রেজেষ্টরি আফিসে গিয়ে শপথ করে বল্‌ব আমরা হিন্দু নই, মুস্লিম নই, খৃষ্টান নই, বৌদ্ধ নই, জৈন নই। কেমন ?"

আমিনা প্রণবের ঘাড়ের ওপর আবার মাথাটা এলায়ে দিয়ে বল্‌ল, "তুমি যা বল!"

প্রণব বলল, "আমিনা, আমাদের ওসব ধর্ম্মের কি দরকার ? মুহব্বতই আমাদের ধর্ম্ম! নয় কি ?"

আমিনা বল্‌ল, "বেশথ্‌।"

প্রণব উৎসাহের সহিত বলল, "সিভিল ম্যারেজ হ'লে, তোমার নাম আমিনাই থাক্‌বে, আর আমি প্রণবকুমার মুখার্জ্জিই থেকে যাব।"

আমিনা বল্‌ল, "সে খুব 'বেহতর'।"

প্রণব বল্‌তে লাগল, "তবে গোলমাল হ'বে ছেলে মেয়েদের নাম নিয়ে। তাদেরে প্রকাশ, প্রফুল্ল, লতিকা, যূথিকা বলে ডাক্‌বে, না তাদের নাম হবে মজরুল, সদ্রুল, সিরাজুল, আয়েষা, ফতেমা জাহনারা ?"

আমিনা ঘাড় তুলে বল্‌ল, "মুসলমান নাম রাখলে একজন করে বেশী ছেলে হ'বে নাকি ?"

প্রণব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌ল, "তা' নয়, ওটা আমার ভুল হয়ে গেচে। এক কাজ করা যাক্‌, আমিনা। ছেলেদের হ'বে সব হিন্দু নাম। প্রকাশ, প্রফুল্ল, প্রতুল, আর মেয়েদের হবে মুস্লিম নাম। জাহনারা, রোশনারা, ফতেমা। কেমন ?"

আমিনা তার মাথার খোপাটা দিয়ে আস্তে আস্তে প্রণবের পিঠটা ঘস্‌তে ঘস্‌তে বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা"

প্রণব উল্লাসিত হ'য়ে বল্‌ল, "দেখ আমিনা, তা' খুব চমৎকার হ'বে। ছেলেরা থেকে যাবে সব কুলীন ব্রাহ্মণ, হয়ত বিয়ের সময় বড় বড় পণ পাবে; আর মেয়েরা হ'বে সব রেইসজাদী, খান-জাদী, হয়ত তাদের বিয়েতে পণও দিতে হ'বে না।"

আমিনা এ প্রস্তাবে সম্মত হ'ল।

তখন দুজনে হাতে হাতে ধরে কয়েক মিনিট বসে রইল। তারপর প্রণবের মুখ আবার চিন্তাক্লিষ্ট হ'ল।

প্রণব বল্‌ল, "প্যারী আমিনা!"

আমিনা মৃদু হেসে অপাঙ্গে দৃষ্টি করে বল্‌ল, "কি?"

"আচ্ছা, আমরা বিয়ে না করে অম্‌নি থাক্‌তে পারি না? তুমি কি বিয়েটাকে খুব দরকারী বলে মনে কর?"

আমিনা একটু অবাক হয়ে বল্‌ল, "তার মানে?"

প্রণব বল্‌তে লাগ্‌ল, "দেখ আমিনা, তুমি হয়ত আজ কালকার নূতন যুগের—'নয়া জমানা'র—খবর রাখ না। আজকাল প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে বিয়েটা একটা কুসংস্কার। গুটি কতক পুরুত, পাদ্রী. মোল্লা মিলে এর সৃষ্টি করেচে। বিয়ে মানে, কণেকে তার আত্মীয়-স্বজনেরা বরের কাছে দান করে দেয়, তার মানে মেয়েটা পুরুষটার একটা সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। সে তাকে অন্য জীবিত সম্পত্তির মত খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌বে। কিন্তু তাকে দাসীর মত খাটাবে, ইচ্ছা হ'লে মার ধর ও করবে—"

"ইচ্ছা হ'লে তালাক দিয়ে তাড়িয়েও দিতে পারবে।"

"তোমাদের ধর্ম্ম মতে তা' পারে বটে। তবে তালাক দেওয়া স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে। আমাদের ধর্ম্মে সেটা নেই।"

"বিয়ে করতে পারে, যদি 'জওআনী' থাকে। নতুবা—"

"যা হ'ক, আমাদের ধর্ম্মে তাড়িয়ে না দিলেও তাড়ানোর চেয়ে বেশী কষ্ট দিতে পারে। সুতরাং বিয়েটা যে সব ধর্ম্ম মতেই নারীর ওপর পুরুষের জবরদস্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

আমিনা প্রণবের ঘাড়ে মাথা রেখে বল্‌ল, "তা' হ'লে বিয়ে না করাই ভাল?"

প্রণব বল্‌তে লাগল, "তা' ছাড়া অনেক লোক আছে, প্রেমিক হিসাবে তারা অতি উঁচু দরের, কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তারা বিয়ে করে ছেলেপিলের দায়িত্ব নিতে পারে না।"

আমিনা মোলায়েম করে বল্‌ল, "তুমি তো ছয়টির পর্য্যন্ত নিতে প্রস্তুত আছ!"

প্রণব সে কথায় কর্ণপাত না করে বল্‌ল, "শুধু তাই নয়, বিয়েটা নেহাৎ এক ঘেয়ে ব্যাপার। প্রেমের নিয়মই এই, সে নূতনত্ব চায়। বিবাহিতা স্ত্রীর নূতনত্ব অল্প সময়েই ফুরিয়ে যায়। তাই আমাদের দেশের কবিরা পরকীয়া প্রেমের প্রশংসা করে গেছেন।"

আমিনা ঘাড় তুলে' আবদার করে বল্‌ল, "আমি পরস্ত্রী হ'লে, তুমি বেশী ভালবাস্‌বে আমাকে?"

এমন সময় গাড়ী এক ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল। প্রণব ও আমিনা সরে বস্‌ল। একজন প্যাসেঞ্জার দরজায় এল। তা'কে দেখে উভয়েরই মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। সে দরজা খুল্‌বে, এমন সময়ে আমিনা বল্‌ল, "ইহঁা ডেঢ়া ভাড়া হ্যায়।" লোকটা চলে গেল।

গাড়ী ছাড়লে প্রণব আবার আমিনার কাছে এসে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আচ্ছা ধরা যাক, তোমাকে জবরদস্তি করে বুড়ো রেইসের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। তারপর তোমাতে আমাতে দেখা হ'লে তুমি আমাকে ভালোবাস্‌বে না? ঠিক এখনকার মত, হয়ত বা আর একটু বেশী?" বলে প্রণব আমিনার হাত দুটি আবার নিজ হাতের মুঠায় নিল।

আমিনা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রণব বলে গেল, "আমি জানি, তুমি বল্‌বে, তা' হতে পারে না, তা'তে সতীত্বের অপলাপ হ'বে!"

আমিনা বল্‌ল, "তবে?"

প্রণব ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌ল, "সতীত্ব সতীত্ব করেই তো হিন্দুস্থানটা গোল্লায় গেল! এই সতীত্ব রক্ষার জন্যে রাণী পদ্মিনী আর পনর হাজার রাজপুতানী আগুনে পুড়ে মরল, অথচ দেখ মিশরের মেয়েরা দিব্যি আরামে বিজেতা মুসলমানদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করল!"

আমিনা বল্‌লে "হিন্দুস্থানী মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব জেদী ছিল, হয়ত ভারী অহঙ্কারীও ছিল।"

আধ মিনিটকাল ভেবে প্রণব বলল, "আচ্ছা পরস্ত্রী হবার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। কথা হ'ল বিয়ের চেয়ে বিয়ে না করে থাকাটা বেশী ভাল কিনা।"

"মানে রক্ষিতা হ'য়ে থাকা?"

"তা' ঠিক নয়। যেমন ধর আমেরিকার সাহচর্য্য বিবাহ (Companionate marriage); তা'তে শুধু প্রেম।—"

"ছেলেপিলে গুলোকে মেরে ফেলা হয়?"

"তারা আসে না।"

"যদি এসে পড়ে ?"

"তবে হয়ত বিয়ে ভেঙে যায়।"

"ছেলেদের রক্ষা করে কে ?"

"ষ্টেট্।"

"রামপুর ষ্টেট্ ?"

"ষ্টেট্ মানে গবর্ণমেণ্ট, সরকার।"

"সরকার তো লোকের কাছ থেকে পয়সা নিয়েই করবে, তার মানে খোর পোষের টাকাটা দশে চাঁদা করে দেয়। তার চেয়ে যার দায়িত্ব সে দিলেই চুকে যায়।"

প্রণব অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "তা' করা যেই, বিয়ে করাও সেই। কেননা দায়িত্বই যদি নিল, তবে পরের কাছে রেখে আর নেবে কেন ? তা' হ'লেই পরিবার, অপত্য স্নেহ, সব এসে পড়ে! সেই সাবেকী যুগের ব্যাপার।"

'নৃত্যন্তৌ পুত্র নপ্তৃভি মোদমানৌ স্বেগৃহে!'—আমিনা তুমি সংস্কৃত জান ?"

"না, তবে তুমি আমাকে শিখিয়ে নেবে।"

"আরে বাপ! সংস্কৃত শেখা, সে ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার! তা'তেও কেউ যায় ?"

"কেন, দুনিয়াতে কি লোকে শুধু আরামই করে, কষ্টের কাজ করে না ? তুমি তো কষ্ট করেই উর্দ্দু শিখেচ, আর একটু বেশী কষ্ট করলে আরো ভাল করে বলতে পারতে।"

প্রণব উর্দ্দুর উচ্চারণটা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার করে বলল, "ওই সংস্কৃত কথাটা বলে' বিয়ের সময় বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করা হয়। তার মানে হচ্চে, 'ছেলে আর নাতীদের সঙ্গে নৃত্য করে করে নিজ গৃহে আনন্দের সহিত থাক।' ওকথাটা বেদেতে লেখা আছে। বেদ হাজার হাজার বছরের পুরানো! আমিনা, আমরা আজ ঐ সুদূরে অতীতের প্রথাটা ধরে বসে থাক্‌ব, এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কি হ'তে পারে ?"

আমিনা তার খোপাটা দিয়ে প্রণবের ঘাড়ে আস্তে একটা ঘসা দিয়ে বলল, "তা' হ'লে তুমি কি করতে বল ?"

প্রণব উচ্ছ্বাসের সহিত বলল, "আমাদের মধ্যে মুক্ত প্রেম হ'বে। আমরা ওসব সামাজিক বন্ধনে যাব না। তুমি স্বাধীনভাবে থাক্‌বে, আমি স্বাধীন ভাবে থাক্‌ব। তোমার নৈতিক চরিত্র নিয়ে আমি খুঁৎ খুঁৎ করব না। আমার নৈতিক চরিত্র নিয়ে তুমি খুঁৎ খুঁৎ করবে না।"

আমিনা মিষ্টি হেসে বলল, "আমার খাওয়া পরার কি ব্যবস্থা হ'বে ?"

"তুমিও উপার্জ্জন করবে, আমিও উপার্জ্জন করব। আমার উপার্জ্জনের টাকা তোমাকে দরকার মত দেব।"

আমিনা বলল, "প্রিয়তম, তুমি বলেচ তুমি ইজ্জৎ (সতীত্ব) মান না ; তবে ইমান (সততা) মান কি ?"

প্রণব গর্ব্বভরে বলল, "আমি সর্ব্বপ্রকারের নীতির বিরোধী।"

"তবে আমাকে যদি দরকার মত টাকা না দিলে॥"

"তা'তে যদি বাস্তবিকই সন্দেহ হয় তবে তা' আগাম আদায় করে নেবে!"

আমিনা প্রণবের কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলল, "প্রিয়তম, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ রাজী আছি।" বলে সহকারের ওপর মাধবী লতার মত প্রণবের গায়ে এলায়ে পড়ল।

প্রণব তৃতীয়বার আমিনার মুখচুম্বন করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বেরেলী ষ্টেশনের দূরের সিগন্যালের পাশে, পোর্টার ও পোর্টার গিন্নীর চারিটী চক্ষু তার প্রতি অতিরিক্ত রকম বিস্ফারিত হ'য়ে আছে দেখে সে নেহাতই অপ্রস্তুত হ'য়ে সরে বসল।

আমিনা বলল, "প্রিয়তম, তোমার একথাটা যদি প্রথমই খুলে বলতে, তবে আমাকে অযথা কতকগুলি মিছে কথা— 'ঝুটা বাত'—বলতে হ'ত না। তুমি যা' চাও আমি তাই। আমাদের মধ্যে সাত পুরুষেও কেউ বিয়ে করে নি।"

প্রণব আকাশ থেকে পড়ল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "অ্যাঁ! শারাণপুরের রেইস একতিয়ার আলি অবিবাহিত ? তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরাও সব অবিবাহিত ছিলেন ?"

আমিনা বলল, "তা' মোটেই নয়। জনাব একতিয়ার আলি একাধিক বিয়েই করেছেন। এবং তার মেয়ে আমিনারও আজ বিবাহ হবে, বিকেলে সে স্পেশল্ ট্রেনে আস্‌বে। তবে বুড়ো সৈয়দওল্লার সঙ্গে সে বিয়ে নয়, বিয়ে তাঁর ছেলে অহিদার রহমানের সঙ্গে।"

প্রণব উত্তেজিত হয়ে বলল, "তা' হ'লে তুমি কে ?"

তরুণী বিনীতভাবে বলল, "আমার নাম গহরজান। আমার গরীবখানা দিল্লীর চাঁদনীচৌকে। আমি বিয়ের মজলিসে নাচের মুজোরা নিয়ে যাচ্ছি।"

প্রণব আরও উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি নাচওয়ালী? তুমি বাঈজী?"

গহরজান বললে, "হ্যাঁ বাবুজী। তবে বাঈজী কথাটাকে হেয় মনে করো না। তা' বাবুজীরই স্ত্রীলিঙ্গ। অন্ততঃ আমাকে যে মাষ্টার পড়াতেন, তিনি তাই বলেচেন। বাবুজী, আমাদের মধ্যে সতীত্ব নিয়ে গোঁড়ামি নেই, নীতি নিয়ে মারামারি নেই, আমরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করি —তারপর আমাদের জীবনে আর্ট আছে,—আজকার দিনটা বেরিলি থেকে আমার নাচ গান দেখে যাও না?—আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য আছে; তোমার সব আদর্শই আমাদের মধ্যে পাও। নয় কি?"

প্রণব শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তরুণীর দিকে চেয়ে রইল। গাড়ীর বেগ কমে এল। তরুণী নাগরা পায়ে দিল, গায়ের উর্ণাটা গুছাতে লাগল। প্রণব হঠাৎ বলে উঠল,—তার স্বর ক্রোধমিশ্রিত ছিল,—"তুমি কেন বল্‌লে তুমি রেইস এক্তিয়ার আলির মেয়ে?"

তরুণী বলল, "বাবুজী, আমি কোনো কথাই বলতাম না যদি তুমি আমার পানে ওরকম করে বার বার না চাইতে! তোমার চাওয়া দেখে হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সপ্তাহ খানেক আগে আমি ভিনাস সিনেমা কোম্পানীতে অভিনয় করেছিলাম। তখন আমি এক রেইসের মেয়ে সেজেছিলাম। আমাকে এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু সহসা এক তরুণ এসে আমাকে বাঁচিয়েছিল ও তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার প্রেমিকটি ঠিক তোমারই মত করে চেয়েছিল। তাই তোমার চাওয়া দেখে আমি অজ্ঞাতভাবে আবার গল্পের অভিনয়টা করে ফেললাম!—'মাফ করুনা, বাবুজী। কিন্তু আমায় বলতে হয়, সে সিনেমার গল্প আমাদের এ প্রেমের কাহিনীর কাছেও ঘেঁসতে পারে না!"

প্রণব নির্ব্বাক। তার মুখ পাংশুবর্ণ। গাড়ী বেরেলী ষ্টেশনে এসে থামল। প্রণব চেয়ে দেখল, দুরজায় মুরাদাবাদে নেমে যাওয়া লোকটা এসে দাঁড়িয়েচে। তার পেছনে চার পাঁচ জন লোক তবলা, পাখোয়াজ, এস্রাজ প্রভৃতি হাতে নিয়ে এসেচে।

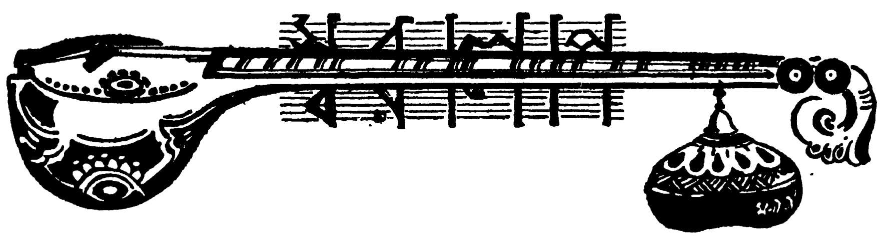
তরুণী নেমে যেতে যেতে মৃদু হেসে ফিস্ ফিস্ করে বলল "বাবুজী, আমাদের মুহব্বত (প্রেম) নিশ্চয়ই কায়েম (স্থায়ী) হ'বে। আমি তিনদিন পরে দিল্লী ফিরব, তখন আমার কাছে নিশ্চয়ই আসবে—'হমারে উহাঁ জরুর আন', জরুর্! জরুর্!"

তরুণী গাড়ী হ'তে নেমে গেল। সে তার লোকজনসহ প্লাটফর্ম্মের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রণব হতভম্ব হ'য়ে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল।

তারপর আড়াই মিনিট কাল সে মেঝের দিকে চেয়ে বসে রইল, তারপরের দেড় মিনিটকাল গাড়ীর ছাদের দিকে চাইল, তারপর হঠাৎ গাড়ী হতে নেমে ষ্টেশনে গেল, এবং মায়ের কাছে তার করল, "২৯শে বৈশাখ বিয়ের দিন ঠিক কর, আমি আসচি।"

গাড়ী ছাড়বার তিন মিনিট আগে গার্ড লক্ষ্য কর্চ্ছিল, বেশ ফিটফাট পোষাক পরা একজন যাত্রী জলের কলের নীচে মুখ ধুচ্চে, এবং বারবার কোষ ভরে জল নিয়ে ঠোঁটের ওপর ঘস্‌চে!

অবিনাশচন্দ্র বসু



আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।
ধরিত্রী তার অঙ্গনেতে
নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তার অঞ্চল যায় লুটে।
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পুব হাওয়া ধায় আকাশতলে
তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন কালের পানে ছুটে

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা -া সা । সা সা -া I সা সা -া । সা সা -া I সণ্‌্ সা া-। রাঃ-রপঃ -মা -পা I
আ জ্ শ্রা ব ণে র আ ম ন্ ত্র ণে ॰ দু য়া র্ কাঁ ॰ ॰

I পমজ্ঞা-া -া । -া -া -া I রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I
পে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ক্ষ ণে ॰ ক্ষ ণে ॰ ঘ রে র বাঁ ধ ন

জ্ঞমা -া -া । রা সা -া I সা ণা ণা । ণধা পা ধা I মপা মজ্ঞা -া । -া -া -া II
যা ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ যা য়্ বু ঝি আ জ্ টু টে ॰ ॰ ॰ ॰

‖ না না -া । না না -া I না -া র্সা । না র্সা -া I না র্সা -না । র্সা -া না I
ধ রি ০ ত্রী তা র্ অ ঙ্ গ নে তে ০ না চে র তা ০ ০

নর্রা -া -া । না -া -া I না র্সা -া । না র্সা -া I না -া র্রর্সা । ণা ণা -া I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ও ঠে ন্ মে তে ০ চ ন্ চ ল তা র্

ধা -া ণা । ধা ণা -া I -পা -া -া । -মা -া -া I পা-মা -র্সা । র্সা ণা -া ‖
অ ন্ চ ল যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ যা ০ য়্ লু টে ০

‖ ধা ণা -া । ধা ণা -া I ধা র্সণা -া । ধা পা -ধা I মা পা -া । -া -া -া I
প্র থ ম্ যু গে র ব চ ন্ শু নি ০ ম নে ০ ০ ০ ০

মা পা -মা । মণা ণা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা-রজ্ঞা I জ্ঞরা সা -া । -া -া -া I
ন ব ০ শ্যা ম ল প্রা ণে র নি কে ০ ০ ত নে ০ ০ ০ ০

না -া না । না না -র্সা I না র্সা -া । না র্সা -া I না -া র্রা । র্সা র্রা -র্সনা I
পু ব্ হাও য়া ব য়্ আ কা শ ত লে ০ তা র সা থে মো র্

না -া র্সর্রা । র্স ণা -া I ধা -র্সা ণা । ধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া । ধা পা -ধা I
ভা ব্ না চ লে ০ কা ল্ হা রা কো ন্ কা লে র্ পা নে ০

মপা পমা -া । -া -া -া ‖ ‖
ছু টে ০ ০ ০ ০

দাক্ষিণাত্যে আওরংজীব

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, এম-এ

১

কান্দাহার হইতে কাবুলে ফিরিয়া আসার পর, আওরংজীব সম্রাটের আজ্ঞায় দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন (১৬৫২)। প্রায় নয় মাস পরে, আওরঙ্গাবাদে পৌছিয়া তিনি এই পদ গ্রহণ করিলেন, (নভেম্বর, ১৬৫৩)। চারি বৎসর কাল এই কার্য্য করিবার পর, বাদসাহী-সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা অভিমুখে রওনা হইলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮)।

আওরংজীব দাক্ষিণাত্যের শাসন-কার্য্য ছাড়িয়া দিলে (১৬৪৪), সে দেশে মুঘল শাসনের অবনতি ঘটে। দেশে শান্তি বিরাজ করিলেও, কৃষিক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইল। কৃষককুল ধ্বংসোন্মুখ হইল ও তাহাদের সংস্থান লোপ পাইল। ফলে, রাজস্বের হ্রাস হইল। বারংবার শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির এই পদে নিয়োগই, দেশের এই গুরুতর অবস্থার জন্য দায়ী।

অনেকদিন হইতে দাক্ষিণাত্যের জন্য মুঘলদের যে অর্থ-ব্যয় চলিয়া আসিতেছিল তাহার আর বিরামের লক্ষণ ছিল না। এই দেশটি খুবই বড়, উঁচু নীচু ও চারিদিক অরণ্য-সঙ্কুল ছিল। ইহার সীমান্তে দুই শক্তিশালী রাজ্য; সুতরাং, দেশ রক্ষার জন্য এক বিরাট বাহিনী রাখিবার প্রয়োজন হইত। অথচ, ওদিকে, দেশে ভাল ফসল উৎপন্ন না হওয়ার দরুণ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায় হওয়া দুষ্কর ছিল। এই কারণে, দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের যাহা আয় হইত তাহা অপেক্ষা তাহাদের খরচই ছিল অধিক। ফলে, সেখানকার শাসন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাম্রাজ্যের পুরাতন ও বর্দ্ধিষ্ণু দেশগুলি হইতে অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করা ব্যতিরেকে উপায়ান্তর ছিল না।

দাক্ষিণাত্যে পৌছিয়া আওরংজীবকে এক ভীষণ অর্থ সমস্যায় পড়িতে হইল। রাজস্বের প্রকৃত আদায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের এক-দশমাংশ। ইহার উপর কু-শাসনের চিহ্ন চারিদিকেই। অল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া যথানিয়মে সৈন্য রক্ষা করিতে হইলে অন্নাভাবে সাহজাদাকে কাল-যাপন করিতে হয়। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া পিতা-পুত্রে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পত্র লেখালেখি চলিল। সম্রাট সাহজাহান অন্যান্য দেশ হইতে দাক্ষিণাত্যের জন্য অর্থ প্রেরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; আর, সাহজাদার ইচ্ছা ছিল, অন্যান্য দেশ হইতে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করা হউক; নিজের খরচের টাকা তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে লইতে প্রস্তুত নহেন।

দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী কর্ম্মে নিয়োগ সময়ে সম্রাট, আওরংজীবকে কৃষক-সাধারণ ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু, এক পুরুষ-ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে বা দশ বৎসরের কুশাসনের ফলে দেশের যে অনিষ্ট সাধিত হয়, দুই বা তিন বৎসর কালের মধ্যে তাহা দূর করা অসম্ভব। যাহাহউক, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে আওরংজীবের ব্যবস্থা শীঘ্রই চিরস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

২

খোরাসান দেশবাসী মুরশিদকুলী খাঁ আওরংজীবের অধীনে "দিওয়ান"এর কার্য্য করিতেন। সাহস ও শাসন-দক্ষতা এই দুই গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করেন ও দেশে এক নূতন ব্যবস্থা আনয়ন করেন।

এ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে ক্ষেত্রের চৌহদ্দি ঠিক করা, লোহার শিকল দ্বারা জরিপ করা, বিঘা প্রতি খাজনা

খাজনা নির্দ্ধারণ করা সরকার ও প্রজার মধ্যে উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগি করা রীতির চলন হয় নাই। কৃষক একটি লাঙ্গল ও একজোড়া বলদ লইয়া সাধ্যমত জমি চাষ করিত, ইচ্ছামত ফসল উৎপন্ন করিত এবং লাঙ্গলপ্রতি সামান্য খাজনা সরকারকে দিত। জমাবন্দী খামখেয়ালী ভাবেই হইত। তহশীলদারের ইচ্ছা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকের কোনই হাত ছিল না। মুঘলদের আক্রমণ ও উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। প্রপীড়িত কৃষকেরা দেশান্তরে পলায়ন করিল; কৃষিক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি জনহীন মরুভূমির আকার ধারণ করিল।

মুরশিদ কুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা রাজা টোডরমল কৃত রাজস্ব-প্রণালীরই সম্প্রসারণ। মুরশিদ কুলী ইতস্ততঃ পলাতক প্রজাদের একত্র করিয়া পল্লীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। ক্ষেত্র জরিপ, তাহাদের উর্ব্বরতা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সরকারী আমীন নিযুক্ত হইল। গ্রামের মণ্ডল নির্দ্ধারিত হইল। বলদ, বীজ, বা চাষের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদের জন্য নিঃসহায় প্রজাদের সরকারী তহবিল হইতে দাদন দেওয়া হইল। ঠিক হইল, ফসলের সময় কয়েক কিস্তিতে এই দাদন সরকার আদায় করিয়া লইবেন।

স্থান বিশেষে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত খাজনা লওয়ার রীতির পরিবর্ত্তন হইল না। বহুস্থানে ভাগীদারী বন্দোবস্ত বা ফসল ভাগাভাগি করার ব্যবস্থাও রহিল। উৎপন্ন ধান, যব, শাকশবজী বা ফল প্রভৃতির জন্য কৃষক সরকারের প্রাপ্যস্বরূপ ইহার একচতুর্থাংশ দিবে। কর দিবার সময় উক্ত চতুর্থাংশের মূল্য নগদ টাকা দিতে হইবে। ক্ষেত্রের পরিমাণ ফসলের বিশেষত্ব ও তাহার বাজার দরের উপর সদর জমা নির্ণয় হইত। যে ক্ষেত্রে বীজ বপন হইয়াছে তাহার জরিপ লওয়া হইত। মুঘল শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে এই প্রচলিত রাজস্ব প্রণালী কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত "মুরশিদ কুলী খাঁর ধারা" নামে পরিচিত ছিল। মুরশিদ কুলী খাঁর এই চমৎকার ব্যবস্থা, তাঁহার তত্ত্বাবধান ও সতর্কতার গুণে, শীঘ্রই রাজস্ববৃদ্ধি ও কৃষিকর্ম্মের উন্নতি সাধন করিল।

৩

দাক্ষিণাত্যের শাসন-পদে নিযুক্ত হইয়া আওরংজীব, কি উপায়ে ভালরূপে দেশ শাসন হইতে পারে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে বৃদ্ধ বা অযোগ্য কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিলেন, কাহাকেও বা অপেক্ষাকৃত ছোট কাজে বদলি করিলেন। কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারীদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হইল। অর্থ সাহায্য করিয়া মুঘল বাহিনীকে কার্য্যকরী করা হইল। এক দক্ষ ও কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মচারীর উপর সৈন্যের রসদ যোগাইবার ভার অর্পিত হইল। সাহজাদা নিজে প্রত্যেক দুর্গ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন; প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় সকল বিষয়েরই তিনি তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। গোলান্দাজ বিভাগের বৃদ্ধ ও নিষ্কর্ম্মার দলকে বন্দুক ব্যবহারে পরীক্ষা দিতে হইল। যাহারা লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইল তাহারা পদচ্যুত হইয়া অবসর বৃত্তি পাইল। সাহজাদার ব্যবস্থার ফলে মুঘল সেনা কার্য্যক্ষম ত হইলই, তাহার উপর খরচপত্র করার পর, তাঁহার তহবিলে প্রতিবৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্ধৃত হইতে লাগিল।

৪

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আওরংজীব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদাররূপে নিযুক্ত থাকার সময় পিতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। ইহার কারণ, আওরংজীবের শত্রুরা হয় সম্রাটের নিকট সাহজাদা সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদ করিয়াছিল, নয় সম্রাট সাহজাদার সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সাহজাদার কার্য্যের আরম্ভ কাল হইতেই সম্রাট তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। সম্রাট তাঁহার উপর সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন ও অযথা তাঁহাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। এই কারণেই, ব্যথিত ও ক্লিষ্ট সাহজাদা, সিংহাসন লইয়া ভাবী ভ্রাতৃবিরোধজনিত যুদ্ধে কঠোর নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আওরংজীব একবার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এমন কোন এক প্রদেশ দেওয়া হউক যাহার আমদানী দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা অধিক। এই বিষয় লইয়া সাহজাদার সহিত বাদশাহের অনেক দিন ধরিয়া যে পত্র ব্যবহার হয় তাহার ভাব ও ভাষা প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী।

পিতাপুত্রে যে মনান্তর উপস্থিত হয় তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে সাহজাদা তাঁহার কোন অধস্তন কর্ম্মচারীর নিয়োগ বা পদবৃদ্ধি সম্পর্কীয় সুপারিশ করিলে, বাদশাহ তাহা অগ্রাহ্য করিতেন। আর, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দরবারে প্রেরিত প্রতিনিধিসংক্রান্ত ব্যাপারে আওরংজীব চাহিলেন যে, ঐ দুই মুঘল প্রতিনিধি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের অধীনেই থাকিবেন ও তাঁহারই আজ্ঞামত কার্য্য করিবেন। অনেক পত্র বিনিময়ের পর, সাহজাদা তাঁহার শাসন আমলের শেষাশেষি কতকাংশে এই অধিকার পাইলেও, কোনও দিনই তাহা পূর্ণমাত্রায় পান নাই।

এক সময়ে, আওরংজীব সম্রাটের কটূক্তি ও বাধায় এরূপ বিচলিত হইয়া পড়েন যে, স্বেচ্ছায় কোন প্রয়োজনীয় কাজেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। নিজের এই নিষ্ক্রিয়তার কি কারণ, সাহাজাদা এক পত্রে সম্রাটকে জানান—"যে কর্ম্ম আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহার জন্যও আমি ভর্ৎসিত হইয়াছি; সেক্ষেত্রে কোন কর্ম্মের দায়িত্ব আমি কি প্রকারে লইতে পারি? ইদানীং আমি খুবই সতর্ক হইয়াছি।"

এই সময়ে, অর্থাৎ আওরংজীবের দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্য শাসনকালে মুঘল বাহিনী দুইবার আওরঙ্গাবাদ হইতে রণযাত্রা করিয়াছিল। ফলে দেওগড়ের গন্দরাজা ও নগণ্য জৌহর রাজ্যের রাজা মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

৫

গোলকোণ্ডা দেশটি ছিল খুবই উর্ব্বর; আর স্থানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্তও কর্ত্তৃপক্ষের বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক ছিল। এই দেশের অধিবাসীরাও ছিল বেশ কর্ম্মঠ এবং তাহারা সংখ্যায় খুব অধিক ছিল। ইহার রাজধানী হায়দ্রাবাদ, কেবল এশিয়ার মধ্যে কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হীরক ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু বিদেশী বণিকের আগমনে ও নানাবিধ ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। বঙ্গোপসাগরের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পত্তন মসুলিপটম এই দেশেরই অন্তর্গত। এই দেশের অরণ্যমধ্যে হস্তীযুথ বাস করায় এখানকার রাজা অর্থশালী হইয়া উঠেন। এই দেশে তামাক ও তালগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। তামাক ও তাড়ির উপর আবকারী শুল্ক আদায় হওয়ায় রাজার আমদানীও খুব বেশী ছিল।

আওরংজীবের সহিত গোলকোণ্ডার রাজার মাঝে মাঝে বিবাদ বিসম্বাদ হইত। গোলকোণ্ডার দেয় বাৎসরিক কর প্রায়ই বাকী পড়িত, এবং প্রাদেশিক মুঘল শাসনকর্ত্তা তাগিদ করিলে, অজুহাত ও দরখাস্তের অভাব হইত না।

ইহা ছাড়া, দক্ষিণাত্যে প্রচলিত মুদ্রা হোণের বিনিময় হার ৪৲ টাকা হইতে ৪৷৷০ টাকায় গিয়া দাঁড়াইল (১৬৩৬)। গোলকোণ্ডার রাজা এতদিন হোণের পুরাতন পরিবর্ত্ত হারেই মুঘল সম্রাটকে বাৎসরিক কর আট লক্ষ টাকা দিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু নূতন বিনিময়ের হারে হিসাব করিলে গত কয়েক বৎসরে পুরাতন হারে প্রদত্ত কর, নির্দ্ধারিত কর অপেক্ষা কম দাঁড়ায়। এই নূতন হিসাবে মুঘলেরা বাকী টাকার জন্য গোলকোণ্ডার নিকট দাবী করিলেন। মোটের উপর, গোলকোণ্ডা রাজার অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, তাঁহাকে নির্দ্ধারিত টাকার উপর আরও বিশলক্ষ টাকা মুঘলদের দিতে হয়। ইহা ছাড়া, গোলকোণ্ডার রাজার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। তিনি (সাধারণতঃ) মুঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু করিতে হইলে বাদশাহের অনুমতি লইতে হইত। কিন্তু তিনি সম্রাটের অজ্ঞাতসারে কর্ণাটক প্রদেশ জয় করেন; এবং তাহার ফলে দিল্লীশ্বরের দ্বারা বিশেষ তিরস্কৃত হ'ন।

৬

১৬৩৬ সালের সন্ধি মুঘল সাম্রাজ্য ও দুই দক্ষিণী রাজ্য, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার, সীমানা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। উত্তরে সুদৃঢ় সীমাবন্ধন দ্বারা মুঘলরা বিস্তারের

পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সৈন্যদের (হস্তে) উপস্থিত কোনই কাজ ছিলনা, এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিবার বাসনাও ছিল তাহাদের মধ্যে প্রবল। সুতরাং, এই দুই কারণে, দুই দক্ষিণি রাজ্য উত্তরে না গিয়া অন্যান্য দিকে দেশ আক্রমণ আরম্ভ করিল। কৃষ্ণা নদী হইতে আরম্ভ করিয়া কাভেরি নদীর অপর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ণাটক বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি লুপ্তগৌরব হিন্দুসাম্রাজ্য বিজয়নগরেরই এক এক অংশ। অবিলম্বে এই রাজ্যগুলি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। বিজয়োন্মত্ত গোলকোণ্ডা সৈন্য বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হইয়া চিল্কা হ্রদ ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করিল।

ওদিকে, বিজাপুর প্রথমে দক্ষিণ ও পরে পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া জিঞ্জিত হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল হস্তগত করিল। নষ্ট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ক্ষুদ্র চন্দ্রগিরি রাজ্যটি উত্তরে ও দক্ষিণে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার দ্বারা বেষ্টিত হইল; ধ্বংসনোন্মুখ কর্ণাটক বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার নিকট শির নত করিল।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মীরজুমলাই গোলকোণ্ডার কর্ণাটক আক্রমণের মূলে ছিলেন। মীরজুমলা বা মহম্মদ সএদ পারস্যের সৈয়দ বংশোদ্ভূত। ইহার পিতা তৈল ব্যবসায়ী ছিলেন। অপরাপর ভাগ্যান্বেষীর মত সএদ যৌবনে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তার দরবারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হ'ন (১৬৩০)। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ব্যবসায়ে দক্ষতা থাকায় ইনি শীঘ্রই হীরক ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার অদ্ভুত প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া গোলকোণ্ডার শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা কুতুব সাহ ইঁহাকে নিজের প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন। পরিশ্রমশীলতা, ক্ষিপ্রকারিতা, শাসনশক্তি, সমরপ্রতিভা ও জন নায়ক হইবার স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকায়, মীরজুমলা যে কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। অসামান্য শাসন ক্ষমতা ও সমরকৌশলের বলে তিনি শীঘ্রই গোলকোণ্ডার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ইঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে গোলকোণ্ডার শাসনকর্ত্তা কুতুব সাহএর নিকট কোন সংবাদ পৌছিত না। কর্ণাটক প্রদেশের শাসন কার্য্যে তিনি বহুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। সৈন্যবিভাগে ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও কামান নির্ম্মাণকারী নিযুক্ত হওয়ায় দেশীয় সিপাহীরা আজ্ঞাধীন ও কার্য্যকুশল হইল। গোলকোণ্ডার সৈন্যেরা দেশের পর দেশ জয় করিতে লাগিল। কুদাপ্পা জেলা, অজেয় গণ্ডীকোটা দুর্গ, কুদাপ্পার পশ্চিমে অবস্থিত সিদ্‌হউট, ও উত্তর আরকট জেলার চন্দ্রগিরি হইতে তিরুপটি ভূভাগ গোলকোণ্ডার বশ্যতা স্বীকার করিল। মীরজুমলা দক্ষিণে অবস্থিত পুরাতন হিন্দুমন্দিরগুলি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের গুপ্ত ধনাগার হইতে প্রভূত ধনরত্ন হস্তগত করিলেন। ইহার ফলে, মীরজুমলা দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া উঠিলেন। ইঁহার ধন ভাণ্ডারে প্রায় ২০ মণ হীরক ছিল। তাঁহার সম্পত্তি কর্ণাটক জায়গীরটি একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার বিস্তার দৈর্ঘ্যে ৩০০ মাইল ও প্রস্থে ৫০ মাইল। এই প্রদেশের বাৎসরিক আমদানী চল্লিশ লক্ষ টাকা ছিল। মীরজুমলা কর্ণাটকের প্রকৃত রাজা হইয়া উঠিলেন। ঈর্ষাপরবশ সভাসদরা কুতুব সাহএর নিকট মীরজুমলার নামে মিথ্যা অপবাদ দিল ও তাঁহাকে জানাইল যে, এই উজীরের সৈন্য-সামন্ত তাঁহার পক্ষে কোনরূপেই নিরাপদ নহে, আর, তাঁহার ঐশ্বর্য্য দরবারের গরিমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অধীন উজীর কর্ত্তৃক কর্ণাটক প্রদেশ বিজয় নিজেরই কৃত মনে করিয়া গোলকোণ্ডার শাসনকর্ত্তা লভ্যাংশের অংশীদার হইতে চাহিল, মীরজুমলা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ইঁহার মনে হইল, কর্ণাটক জয়ের গৌরব একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য, শক্তিহীন, নগণ্য কুতুব সাহএর ইহাতে কোনই অধিকার নাই। পরে, এই উজীর দরবারের চাকুরী ছাড়িয়া দিলে, গোলকোণ্ডার শাসনকর্ত্তা তাঁহার অবাধ্য কর্ম্মচারীটিকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৭

এখন মীরজুমলা নিজের একজন সহায়ের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। একদিকে যেমন তিনি বিজাপুর দরবারে চাকুরীপ্রার্থী হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার তিনি

মুঘলদের নিকটেও কৃপাপ্রার্থী হইলেন। এতদিন সাহজাদা আওরংজীব গোলকোণ্ডা রাজ্য জয় করিবার আশা গোপনে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এখন তিনি মনে করিলেন যে, যদি কুতুবশাহএর এই সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা মন্ত্রী মীরজুমলাকে নিজের পক্ষে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার খুবই সুবিধা হয়। সুতরাং, গোলকোণ্ডা রাজ্যে অবস্থিত মুঘল প্রতিনিধির সহায়তায়, মীরজুমলার সহিত সাহজাদার গোপনে পত্রের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। মীরজুমলাকে মুঘল বেতনভুক্ত করিবার জন্য প্রলোভন দেখান হইল। কিন্তু, মীরজুমলা সাহজাদার প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া তাঁহার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই উদ্দেশ্যে এক বৎসরের সময় চাহিলেন। ফলে, সাহজাদা গোলকোণ্ডার মন্ত্রীর এই কপটতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

কিন্তু, এক আকস্মিক ঘটনায় সাহাজাদার এতদিনের চেষ্টা সফল হইল। মুহম্মদ আমিন নামে মীরজুমলার এক উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী পুত্র ছিল। এই যুবক পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ গোলকোণ্ডা দরবারে চাকুরী করিতেছিল। অবশেষে, একদিন সে মদ্যপানে অচেতনপ্রায় হইয়া কুতুব সাহএর খাস গালিচার উপর বমন করিয়া দিল। এই ধৃষ্ট যুবক কুতুবশাহকে যথারীতি সম্মান না করায় একে ত' তিনি তাহার উপর অনেকদিন হইতেই বিরক্ত ছিলেন তাহার উপর এই ঘটনায় কুতুব শাহ আর তাঁহার ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না। তিনি মুহম্মদ ও তাহার পরিবারবর্গের সকলকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক করিলেন (১৬৫৫)। যে সুযোগের আশা আওরংজীব এতদিন করিয়া আসিতেছিলেন আজ তাহা উপস্থিত হইল।

আওরংজীব সম্রাটের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইলেন যে, মীরজুমলা ও তাঁহার পুত্র সম্রাটের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন ও সাহজাদাকে তাঁহাদের গোলকোণ্ডার দরবার হইতে আগ্রার দিকে রওনা হইবার সময় কুতুব শাহএর কোপদৃষ্টি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই পত্র পাইবামাত্র সাহজাদা কুতুবশাহকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে জানাইলেন যে তিনি যদি সম্রাটের আদেশ অমান্য করেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে। ওদিকে আবার সাহাজাদা গোলকোণ্ডার সীমানায় নিজের সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আর, কুতুবশাহ নিজের আসন্ন বিপদ লক্ষ্য না করিয়া সম্রাটের পত্র উপেক্ষা করিলেন।

মুহম্মদ আমিন ও তাহার পরিবারের সকলকে কারামুক্ত করিয়া দিবার জন্য সম্রাট কুতুবশাহকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন এই চিঠিতেই কাজ হইবে। কিন্তু, তিনি আর একখানি পত্র আওরংজীবকে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে লেখা ছিল, মুহম্মদ আমিন কারামুক্ত না হইলে সাহজাদা যেন গোলকোণ্ডা আক্রমণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গোলকোণ্ডা আক্রমণ সম্রাটের অনভিপ্রেত ছিল, কিন্তু সাহজাদাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই পত্র লেখা হয়। উক্ত দুইখানি চিঠি আওরংজীবের নিকট পৌছিলে (১৬৫৬), তিনি গোলকোণ্ডা ধ্বংশ করিবার জন্য এক কূট কৌশল অবলম্বন করিলেন। বন্দীদের কারামুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটকর্ত্তৃক লিখিত প্রথম পত্রটি পাইবার বা সেইমত কার্য্য করিবার অবসর কুতুবশাহকে না দিয়া, আওরংজীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, বন্দীদের ছাড়িয়া না দিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, সুতরাং সম্রাটের দ্বিতীয় পত্র অনুযায়ী, সাহজাদা গোলকোণ্ডা আক্রমণ করিবেন।

৮

শীঘ্রই আওরংজীবের আদেশমত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সুলতান মুঘল সীমানা অতিক্রম করিয়া হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করিলেন। পরে, আওরঙ্গাবাদ হইতে রওনা হইয়া আওরংজীব স্বয়ং পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন।

ইতিমধ্যে, সম্রাটের প্রথম পত্রটি কুতুবসাহএর হস্তগত হওয়ায় তিনি অবিলম্বে মুহম্মদ আমিন ও তাহার পরিবারবর্গকে মহম্মদ সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন ও সেই সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করিয়া সম্রাটের নামে একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু আওরংজীব ব্যাপারটি এমনিভাবে গড়িয়া তোলেন যে কুতুব সাহ আত্মসমর্পণ করিলেও কোন ফল দেখা দিল-না।

হায়দ্রাবাদের নিকট মুহম্মদ আমিন সাহজাদা মুহম্মদ সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হইল না; মুঘল সৈন্য গোলকোণ্ডার রাজধানী আক্রমণ করিল। কুতুব সাহ নিরাশ হইলেন; মুঘলেরা যে এত শীঘ্র আসিয়া পড়িবে তিনি ভাবেন নাই। নিজের আসন্নকাল সমুপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, কুতুব হায়দ্রাবাদ ছাড়িয়া গোলকোণ্ড দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

হায়দ্রাবাদের দুই মাইল উত্তরে মুঘল সৈন্য পৌছিল। শীঘ্রই মুহম্মদ সুলতান হায়দ্রাবাদ প্রবেশ করিয়া কুতুব সাহ এর মালখানা ও অন্যান্য সম্পত্তি লুঠ করিলেন।

এবার, আওরংজীব সৈন্য লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন ও ক্ষিপ্রতার সহিত গোলকোণ্ডা দুর্গ অবরোধ করিলেন। আওরংজীবের নিকট যে পরিমাণ যুদ্ধের উপকরণ ছিল, তাহা লইয়া তিনি এই দুর্ভেদ্য দুর্গের সহসা কোন অনিষ্ট করিতে পারিতেন না; সুতরাং অবরোধ কার্য্য মন্থর গতিতে প্রায় দুই মাস কাল চলিল। কুতুবসাহ আক্রমণকারীর শিবিরে কখন উপহার কখনও বা সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। ফলে, যুদ্ধের গতি কখনও বৃদ্ধি কখনও হ্রাসের মুখে চলিল। আওরংজীব বরাবর একইভাবে সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন; সমস্ত রাজ্যটির উপরই তাঁহার লোভ ছিল; তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। এই রাজ্যটিকে কবলিত করা যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা তিনি সম্রাটকে বুঝাইয়া লিখিলেন। কিন্তু, সম্রাট স্বধর্ম্মী কুতুবসাহ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে একেবারে সম্মত হইলেন না। সাহজাদা দারা কুতুবসাহ-এর পক্ষ-সমর্থন করায়, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্থের বিনিময়ে তাঁহাকে সে-বার মুক্তি দেওয়া হইল। এই কার্য্যের জন্য আওরংজীব দারার উপর বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, আওরংজীব কিন্তু কুতুবসাহকে ক্ষমা করা সম্বন্ধে লিখিত সম্রাটের পত্রখানি গোপনে রাখিলেন।

ওদিকে, সম্রাট দরবারে প্রেরিত গোলকোণ্ডার প্রতিনিধি সাহজাদা দারা ও সম্রাট-নন্দিনী জাহানারাকে নিজ পক্ষভুক্ত করিল। তাঁহাদের সাহায্যে সম্রাটের নিকট আওরংজীবের চাতুরীর প্রকৃত ঘটনা জানান হইল। কুতুবসাহের মনে কিরূপে সংশয় উৎপন্ন করা হইয়াছে, কিরূপে সম্রাটের আদেশ পত্র গোপন করা হইয়াছিল, আর কি প্রকারেই বা তাঁহার সম্বন্ধে সম্রাটের সদিচ্ছা কার্য্যকরী হইতে দেওয়া হয় নাই সব কথা সম্রাটকে খুলিয়া বলা হইল। এই ব্যবহারের জন্য সম্রাট আওরংজীবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অবরোধ তুলিয়া দিয়া, পত্রপাঠ গোলকোণ্ডা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া, সম্রাট আওরংজীবকে এক তীব্র ভৎর্সনাপূর্ণ পত্র লিখিলেন।

কাজে কাজেই আওরংজীব অবরোধ উঠাইয়া দিয়া গোলকোণ্ডার সীমানা পরিত্যাগ করিলেন। সন্ধির ফলে, কুতুবসাহএর দ্বিতীয়া কন্যা মুহম্মদ সুলতানের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন, আর, ক্ষতিপূরণের টাকা ও আদায়ের বাকী টাকা (প্রায় এক কোটী) ছাড়া, রামগীর জেলাটি কুতুবসাহকে মুঘলদের দিতে হইল।

ইতিপূর্ব্বে, মীরজুমলা খুব জাঁকজমকের সহিত গোলকোণ্ডায় আওরংজীবের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছয় হাজার অশ্বারোহী, পনের হাজার পদাতিক, ও একশত পঞ্চাশটি হস্তী ও বহুসংখ্যক কামান ছিল। পরে, ইনি সম্রাট-দরবারে উপস্থিত হইয়া, ২১৬ রতি ওজনের এক বৃহৎ হীরক খণ্ডের সহিত পনের লক্ষ টাকার সামগ্রী সম্রাটকে উপঢৌকন দিলেন। ফলে, সম্রাট মীরজুমলাকে ছয় হাজার সৈন্যের নায়ক ও তদুপরি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

৯

পিতার সহিত আওরংজীবের বিবাদ পুনরায় আরম্ভ হইল। হায়দ্রাবাদ লুণ্ঠন-কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া সম্রাটের নিকট পৌছিল। সম্ভবতঃ, গোলকোণ্ডার দূতই সম্রাটকে জানাইয়া থাকিবে যে, আওরংজীব ও তাঁহার পুত্রেরা কুতুবসাহএর নিকট হইতে বহুমূল্য উপহার-সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সম্রাটকে লিখিত পত্রে এ বিষয়ের কোনই উল্লেখ করেন নাই। আর, আওরংজীব অভিযোগ করিলেন যে, সম্রাট প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও, গোলকোণ্ডার লুণ্ঠিত দ্রব্য সাহাজাদার সহিত ভাগাভাগি করা হয় নাই।

সম্রাট স্বয়ং সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন ও দৌলতাবাদের রাজ-কোষে সেগুলি জমা করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে, যুদ্ধের জন্য যে টাকা কর্জ্জ হইয়াছে তাহা সাহজাদা এখন কি উপায়ে পরিশোধ করিবেন? আর, সিপাহীদের মাসহারার দরুণ যে বিশ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহারই বা জোগাড় তিনি কি প্রকারে করিবেন। আওরংজীব ইহাও জানান যে, সম্রাট-দরবারের ঈর্ষাপরায়ণ সংবাদ-প্রেরকেরা গোলকোণ্ডা হইতে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত ও অমূলক।

গোলকোণ্ডার সহিত আপাততঃ সন্ধি হইলেও বিবাদের একটি কারণ থাকিয়া গেল। কুতুবসাহ যে কর্ণাটক রাখিতে চাহিলেন ইহা খুবই ন্যায্য; কারণ, এই দেশটি তাঁহারই রাজ্যের এক অংশ এবং তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা এটিকে জয় করে। কিন্তু আওরংজীব এই দেশটিকে মীরজুমলার জায়গীরের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং সাহজাদা কুতুবসাহএর উপর বিরক্ত হইলেন। সাহজাদা সম্রাটের নিকট এই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিলে, তিনি কর্ণাটক ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না, ও কুতুবসাহকে ঐ প্রদেশ হইতে নিজের কর্ম্মচারী ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। ওদিকে গোলকোণ্ডার কর্ম্মচারীদের এই প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা ছিল না। তাহারা শীঘ্র সম্রাটের আদেশ পালন করিল না ও যাহাতে মুঘলেরা ঐ দেশ দখল করিতে না পারে ইহার জন্য সকল প্রকারে বাধা দিতে লাগিল।

১০

মুহম্মদ আদিলসাহএর শাসন সময়ে (১৬২৬—১৬৫৬) বিজাপুর রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। আরব্য সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতীয় উপদ্বীপ জুড়িয়া এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। ১৬৩৬ সালে আদিলসাহ মুঘল সম্রাটের সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে বদ্ধ হ'ন এবং সেই সময় হইতেই উভয় পক্ষে উপহার-সামগ্রীর আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছিল। আদিলসাহ খুব সরল ও সংসার-অনভিজ্ঞ ছিলেন; ধর্ম্মানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই সকল কারণে সম্রাট সাহজাহান তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মীরজুমলার আগমনের (জুলাই, ১৬৫৬) অব্যবহিত পরেই সম্রাট-বৈঠকে আওরংজীবের বিরোধ-নীতি প্রবল হইল। সুতরাং, বিজাপুর সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আওরংজীবের বিজাপুর আক্রমণ-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। বিজাপুর রাজ-বংশের সপ্তম রাজার মৃত্যুর (নভেম্বর, ১৬৫৬) পর, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ এবং রাণী বড়ি সাহেবার চেষ্টায় মৃত রাজার একমাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্রকে (আদিল সাহ ২য়) সিংহাসনে বসান হইল। কিন্তু, আদিল সাহ (২য়) প্রকৃত পক্ষে মৃত রাজার পুত্র নহেন; তিনি এক অজ্ঞাত কুলশীল বালক ও মৃত রাজার দ্বারা অন্তঃপুরে পালিত এই অজুহাত করিয়া বিজাপুর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে আওরংজীব সম্রাটকে একখানি পত্র লিখিলেন।

মুহম্মদ আদিলসাহ (১ম) এর মৃত্যুর পর কর্ণাটক প্রদেশে বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হইল। রাজধানীর অবস্থা আরও গুরুতর হইল। প্রাধান্য লাভ করিবার আশায় বিজাপুরী ওমরাহেরা পরস্পরের মধ্যে ও রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। ইহার উপর আওরংজীব তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করায় বিপদ আরও ঘনীভূত হইল। তিনি দরবারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকদের উৎকোচ দেওয়ায় তাহারা নিজের নিজের সৈন্য লইয়া আওরংজীবকে সাহায্য করিবে এই ভরসা দিল। ইহা ছাড়া, মীরজুমলার সাহায্যে অন্যান্য সকলকেও যে নিজের পক্ষে আনিতে পারিবেন এরূপ আশা আওরংজীব করিলেন।

সম্রাট সাহজাহান বিজাপুর আক্রমণে নিজের সম্মতি প্রদান করিলেন। আওরংজীব যাহাতে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইল। বিশহাজার সিপাহী একত্রিত করা হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা দরবারের লোক আর কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন জায়গীরের লোক। ইহা ছাড়া অনেকগুলি পদস্থ কর্ম্মচারী ও মীরজুমলা স্বয়ং আওরংজীবকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা করা একেবারে ন্যায়-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, বিজাপুর ত' সম্রাটের এক অধীন রাজ্য নয়; ইহা স্বাধীন, ও মুঘল বাদশাহের সমতুল্য। সুতরাং, বিজাপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন সম্বন্ধে সম্রাটের মতামত দিবার কি অধিকার থাকিতে পারে?

মীরজুমলা আওরঙ্গাবাদ পৌছিলেন। তখন, জ্যোতিষীর দ্বারা নির্ণীত এক শুভক্ষণে, আওরংজীব মীরজুমলাকে লইয়া বিজাপুর আক্রমণে বাহির হইলেন। বিজাপুর দুর্গটিকে অবরোধ করা হইল। সিদ্দি মর্জ্জন নামে জনৈক গোলকোণ্ডার কর্ম্মচারী সাহসের সহিত ইহার রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সংখ্যায় অধিক বলিয়া মুঘলদের সুবিধা হইল। মীরজুমলার উৎকৃষ্ট কামান শ্রেণী দুর্গ প্রাচীরের অনেক ক্ষতি করিল। দুইটি চূড়া, নিম্নের প্রাচীর ও বাহিরের দেওয়ালটি ধরাশায়ী হইল। পরে, পরিখা খনন কার্য্য শেষ হইলে দুর্গ আক্রমণ আরম্ভ হইল। মুঘল সৈন্য কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এক হাউএর স্ফুলিঙ্গ বিজাপুরীদের বারুদখানায় গিয়া পড়ামাত্র ভীষণ শব্দে দুর্গের সেই অংশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। নিজের দুই পুত্র ও বহুসংখ্যক সিপাহীর সহিত সিদ্দি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হইল। তখন উৎফুল্ল মুঘলসিপাহী পরিখা হইতে বাহির হইয়া সহর আক্রমণ করিল ও দুর্গরক্ষাকারীদের কাহাকেও বা নৃশংসভাবে হত্যা করিল, আর কাহাকেও বা বিতাড়িত করিল। সিদ্দি মর্জ্জন নিজের মৃত্যুশয্যা হইতে তাহার সাতটি পুত্র ও দুর্গ প্রবেশদ্বারের চাবি আওরংজীবের নিকট পাঠাইয়া দিল। লুণ্ঠন দ্রব্যের মধ্যে ২৩০টি কামান ছাড়া, বার লক্ষ টাকা নগদ, আটলক্ষ টাকার বারুদ, শস্য ও অন্যান্য জিনিষ বিজয়ী মুঘল সৈন্য হস্তগত করিল।

পরে, সমবেত শত্রুসৈন্যকে দণ্ড দিবার প্রয়োজন বোধে ও পশ্চিমে কলিয়ানী ও দক্ষিণে কুলবরগা পর্য্যন্ত বিজাপুর রাজ্যটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আওরংজীব মহব্বৎ খাঁর অধীনে পনের হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক পাঠাইলেন। ওদিকে বিজাপুরের পক্ষে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ও বিখ্যাত বিখ্যাত সেনানায়কগণ ছিলেন। প্রথমটা বেশ বেগ দিলেও, মহব্বৎ খাঁর সম্মুখে তাহারা বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না।

কল্যাণী সহরটি চালুক্যবংশীয় রাজা ও ক্যালাচুরিজদের এক বহু পুরাতন রাজধানী। বিদার হইতে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে, তুলজাপুরের পবিত্র দেবালয় হইতে গোলকোণ্ডা অভিমুখে যাইবার এক পুরাতন রাজপথের উপর এই সহরটি অবস্থিত। অল্পপরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আওরংজীব কল্যাণী পৌছিলেন। মুঘলেরা সহরটিকে বেষ্টন করায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ওদিকে, আবার মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ মহব্বৎ খাঁ, কল্যাণী হইতে দশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবল বেগে যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে রাজপুতদের উপরই প্রকোপ বেশী পড়িল। বিপক্ষ সৈন্য, রাওছত্রশাল হাদা ও তাঁহার স্বজাতি রাজপুতদিগের দুর্ভেদ্য প্রস্তর সদৃশ সৈন্যশ্রেণী আক্রমণ করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু, শত্রুর আক্রমণে রাজা রায় সিং শিশোদিয়া আহত হইলেন ও অশ্ব হইতে নিপতিত হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, মহব্বৎ খাঁ আক্রমণ করায় শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবরোধ দৃঢ়তর করিবার জন্য আওরংজীব উদ্যত, এমন সময় ত্রিশ হাজার বিজাপুরী সৈন্য সাহজাদার শিবির হইতে চারি মাইল দূরে একত্র হইল। আওরংজীব তখন শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ছয় ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। পরে, বিজাপুরীরা পলায়ন করিলে মুঘল সৈন্য তাহাদের পিছু লইল। মুঘলেরা যতগুলিকে পারিল হত্যা বা বন্দী করিল। বিজাপুরী তরফের যুদ্ধের সরঞ্জাম, নাচওয়ালী মেয়ে, অশ্ব, ভারবাহী জন্তু ও অন্যান্য মালপত্র মুঘলেরা লুঠ করিল। এই অবরোধ কার্য্যে, মুঘলেরা যেরূপ নিজেদের সাহসিকতার পরিচয় দেয়, অপর পক্ষে, আবিসিনিয়া বাসী দিলাওরও সেইরূপ নিজের বীরত্বের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। বিজাপুরীরা পুনরায় একত্র হইল। সেইজন্য, আওরংজীব নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান ও মীরজুমলার অধীনে এক বিরাট বাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষ সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল। কুলবর্গা পর্য্যন্ত

বিজাপুরীদের গ্রামগুলি ধ্বংস করিতে করিতে বিজয়ী মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইল।

এবার দুর্গ আক্রমণের পালা। আক্রমণকারী মুঘলসৈন্য তুমুল যুদ্ধের পর, দুর্গে প্রবেশ লাভ করিল। বিজাপুরী সৈন্যাধ্যক্ষ দিলাওর তখন নিরুপায় হইয়া দুর্গদ্বারের চাবি বিজয়ী শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিল।

এইরূপে মুঘলেরা কল্যাণীদুর্গ জয় করিলে, বিজাপুরের রাজা সন্ধি না করিয়া আর পারিলেন না। সম্রাট-দরবারে অবস্থিত বিজাপুরের এক রাজদূত কৌশলে সাহজাদা দারাকে হস্তগত করিয়া সম্রাটের নিকট স্বীয় প্রভুর তরফে সালিশী করাইল। সন্ধির ফলে, আদিলশাহ (২য়)কে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক কোটী টাকা, আর, বিদার, কল্যাণী ও পেরেন্দা দুর্গ ও ইহাদের অন্তর্গত দেশগুলি ভারত-সম্রাটকে দিতে হইল। পরে, সম্রাট আওরংজীবকে তাঁহার সৈন্য বিদারে ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। কি দুরদৃষ্ট! বিজয়লাভ করিবার মুখে আওরংজীব বাধা পাইলেন!! তিনি কেবল বিজাপুর সাম্রাজ্যের উত্তর দিক জয় করিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ করা হইল! ওদিকে, সাহজাদার চিত্তবিক্ষেপ হওয়ায় ও তাঁহার সৈন্যবল কমিয়া যাওয়ায় বিজাপুরীদের সুবিধা হইল। মুঘল হস্তে পেরেন্দা দুর্গ অর্পণ করিতে তাহারা বিলম্ব করিতে লাগিল, এমন কি, অবশেষে তাহারা একেবারেই অসম্মত হইল।

উক্ত ঘটনার এক মাস পরে সম্রাট সাহজাহান পীড়িত হইলেন। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এই মিথ্যা জনরব রাজ্যের চারিদিকে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল। এই কারণে, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার মধ্যে আওরংজীব কল্যাণী হইতে রওনা হইলেন (অক্টোবর, ১৬৫৭)।

কমলকৃষ্ণ বসু

"শ্রাবণ কখন আসে?"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

—শ্রাবণ কখন আসে?
রুদ্র তেজে বহ্নি যখন বিশ্ব ভুবন গ্রাসে;
ধরার দেহ ধূসর হয়ে ধূলায় ওঠে ভ'রে—
কাল-বোশেখী রাঙিয়ে আঁখি ক্ষ্যাপার মত ঘোরে—
এই চরাচর 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' হাঁকে হতাশ্বাসে—
—শ্রাবণ তখন আসে!

কপিষ জটা, পাটল আঁখি, নিশ্বাসে তা'র জ্বালা,
প্রলয় নাচন নাচেন নটেশ, কণ্ঠে অহির মালা!
ফুল্ল ফুলে, কলির দলে, মুঞ্জরিত শাখে,
গরল-মাখা মুখের চুমা সে নীল-কণ্ঠ আঁকে!
ভয়াল ভোলা ভয় দেখিয়ে যখন অট্ট হাসে,
—শ্রাবণ তখন আসে!

বজ্রে যখন বহ্নি জাগে, গগন জাগে মেঘে,
নীল চাঁদোয়ায় তড়িৎ জমে, পবন ওঠে রেগে!
ঊর্ম্মি-বাহু উত্তোলিয়া সিন্ধু কারে চাহে,
ফটিক জলের তৃষ্ণা-কাতর চাতকপাখী গাহে,
ময়ূর যখন নৃত্য করে অপূর্ব্ব উল্লাসে
—শ্রাবণ তখন আসে!

কেউ জানো কি এই জীবনে শ্রাবণ কখন নামে?
মরুভূমি যখন ঘেরে তোমায় ডাইনে-বামে,
বুকের শ্মশান হ'তে চিতার আগুন ওঠে জ্ব'লে,
ফুল-ঝরা-হার ফাঁসির মতন কণ্ঠে যখন দোলে,
বিষের বাটি সাম্‌নে রেখে ঝাঁপাও সর্ব্বনাশে,
সুধার প্লাবন ল'য়ে শ্রাবণ তখন নেমে আসে!

চোখের 'পরে যখন সুধু অস্তাচলের ছবি,
মৃত্যু-বাণের নৃত্য লীলায় শেষ হয়েছে সব-ই,
নাইকো আশা, ভালোবাসা, নাইকো ঘরের মায়া,
নাইকো কোথাও স্নেহের পরশ, পাষাণ হৃদয়-কায়া,
নিষ্ফলতায় মানুষ যখন মৃত্যু ভালোবাসে,
সঞ্জীবনীর মন্ত্র লয়ে শ্রাবণ তখন আসে!

দুর্য্যোগে আর অন্ধকারে প্রলয় সম রাতি
সেও চ'লে যায়,—ঊষায় আবার অরুণ ওঠে ভাতি'!
মেঘের আঁচল কালো হ'লেও রূপোর জরী পাড়ে—
মুক্তি ততই নিকট জেনো, বিপদ যতই বাড়ে!
রুদ্র যতই রাঙা'ক্ আঁখি চৈত্-বোশেখ মাসে,
ঠিক কিছুদিন পরে তারই শ্রাবণ আসে! আসে!

একটা বর্ষার সুর

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বন্ধুরা অভিযোগ করছেন, আমি আর কবিতা লিখ্‌ছি নে বলে'। ঈষৎ ভর্ৎসনা, এবং তা'রো বেশি বিদ্রূপের সুরে তাঁরা বল্‌ছেন যে তা'র কারণ এই যে কবিতা লিখে' পয়সা পাওয়া যায় না। কথাটা সত্যি -আবার (যেমন পৃথিবীর সব ব্যক্তিগত সত্যই হ'য়ে থাকে) সত্যি নয়ও। সত্যি; কারণ, কবিতা থেকে অর্থাগমের কোনো নিশ্চয়তা থাকলে হয়-তো আমার কবিত্বশক্তি আমার কাছে এমন ঘুমন্ত মনে হ'তো না; হয়-তো খানিকটা জোর করে'ই কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌তাম, এবং একটু চেষ্টার পরেই তা সহজ হ'য়ে যেতো। হয়-তো তা-ই। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে কবিতা লেখ্‌বার তেমন কোনো জোর তাগিদ কখনো যদি মনে আস্‌তোই, তা হ'লে আমি লিখ্‌তামই, না লিখে'ই পার্‌তাম না। যে কারণেই হোক্‌, সম্প্রতি সেই তাগিদেরই অভাব হচ্ছে। গল্প হচ্ছে এমন জিনিষ, যা আপনি ইচ্ছে কর্‌লে লিখ্‌তে পারেন, আবার ইচ্ছে কর্‌লে না-ও লিখ্‌তে পারেন; কিন্তু কবিতা হয় আপনাকে লিখ্‌তেই হয়, না-হয় আপনি আদৌ লেখেন না, লিখ্‌তে পারেনই না। অন্তত, আমার অভিজ্ঞতা তা-ই। সুতরাং, যা আমি পার্‌ছি নে, তা কর্‌ছি নে বলে' আমাকে দোষ দেয়া—না, আমার তো তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। বন্ধুদের অভিযোগের এ-ই আমার উত্তর। বর্ত্তমানে আমি হচ্ছি—শারীরিকভাবে কোনোরকমে জীবিত; সৌন্দর্য্যবৃত্তির দিক দিয়ে তৃষিত; হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে মৃত; এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ, নির্ম্মমভাবে জীবিত। জানি নে, অস্তিত্বের এটা খুব একটা উচ্চ স্তরের রূপ কিনা। সম্ভবত নয়। যদিও তা-ই বলে আমি প্রায়ই নিজেকে সান্ত্বনা দিই ও স্তুতি করি; কারণ, যে-কোনো উপায়ে মানুষের আত্ম-শ্লাঘা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই-ই; না হ'লে সে বাঁচে না। আমার এক বন্ধু, বাল্যকাল থেকে যাঁর সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গ, বলেন যে আমি যা ছিলাম, তা আর নেই; আমার সঙ্গে বন্ধুতা আর সম্ভব নয়; সম্ভব শুধু সাহচর্য্য আর সহকর্ম্মিতা। ও-রকম একটা সন্দেহ আমার মনেও সময় সময় হয়। সন্দেহ হয়, আমি একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছি, শুক্‌নো কাগজ হ'য়ে গেছি, এক মুঠো ধূমজ্যোতিমরুৎ—বোধ হয় জ্যোতির চাইতে ধূম আর মরুতের মাত্রাই বেশি। আমার গায়ে ছাপার কালির গন্ধ—লোককে তা কাছে আস্‌তে উৎসাহিত করে না। সন্দেহ হয়, আর বোধ হয় কখনো আমি কবিতা লিখবো না। কারণ, একটা জায়গায় এসে আত্ম-প্রকাশের শক্তি নিজকে নিজে পরাজিত করে; যেটা প্রকাশিতব্য, তাঁর চাইতে, প্রকাশের ভঙ্গীর ওপরই মনের সমস্ত উৎসাহ সন্নিবিষ্ট হয়; জীবনকে দেখা হয় নিছক কাঁচা-মাল হিসেবে, পেশাদারের সজাগ, মোহহীন দৃষ্টিতে। অন্য যে-কোনো পাপের মত, আর্টিস্ট্‌ হ'বারো নেমেসিস্‌ আছে। তবু—সন্ধ্যের পর কখনো বাস্‌-এর দোতালায় যেতে যেতে, বা হঠাৎ এক মেঘ-মুক্ত সকাল বেলায় আকাশের আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা দেখে—মাঝে মাঝে (বিরল, খুবই বিরল সে ঘটনা) মনটা যেন একটু ভিজে' আসে—যে-অবস্থায় কবিতা লেখা হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোনো কথা মনের মধ্যে গড়ে' ওঠ্‌বার আগেই সেটা—ভেসে যায়। বরং, আমি সেটাকে ভেসে যেতে দিই। হ'তে পারে—যদি জান্‌তাম যে মনের এই ক্ষীণ, অস্পষ্ট চাঞ্চল্যকে টাকায় পরিণত করবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তা হ'লে তা'কে আমি যত্নে পুষতাম, ফেনিয়ে তুল্‌তাম, শেষ পর্য্যন্ত হয়-তো সেটা কবিতা হ'য়ে বেরুতো। হ'তে পারে, আমার বন্ধুদের কথাই ঠিক, টাকার ব্যাপার ছাড়া এ আর-কিছুই নয়। কিন্তু তা না-ও হ'তে পারে; কারণ আমার মনের

সেই চাঞ্চল্য যে ভেসে যেতে পারে, তা'তেই প্রমাণ হয় যে তা যথেষ্ট প্রবল নয়; কবিতা তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, ততক্ষণ তা কোনো রকমেই টিকে' থাক্‌তো না। এ-সব ব্যাপারে কোনো নিশ্চিত মীমাংসা করা শক্ত।

মোট কথা, কবিতা এখন আর আমার হচ্ছে না। এবং, সে-জন্য যে কোনো দুঃখ কি ক্ষোভ অনুভব করি, তা-ও নয়। আমি যদি কাঠ হ'য়েও গিয়ে থাকি, তা'তেই বা কী? বেশ তো আছি, জীবনকে যে কিছুমাত্র কম উপভোগ কর্‌ছি, তা মনে হয় না। বরং, বেশি করে'ই কর্‌ছি। হৃদয়াবেগের ঘূর্ণীবাত্যার মধ্যে বাস করা—আমি জানি, সে কী ব্যাপার, তা'র যথেষ্ট হয়েছে। এককালে আমি প্রার্থনা কর্‌তাম: বিধাতা, নিষ্কৃতি দাও, শান্তি দাও। মানুষ যা চায়, তা-ই সে পায়। নিষ্কৃতি আমি পেয়েছি; শান্তি আমি পেয়েছি। হৃদয়-আন্দোলনের সেই উন্মত্ত অভিনয়ের ওপর আস্তে-আস্তে বিস্মৃতির যবনিকা নেবে এসেছে।

আজ লোভ হচ্ছে, সেই যবনিকার এক কোণ তুলে একটু তাকাই। মৃত অভিনেতাদের প্রেতেরা এখনো কি সেই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করছে? যে-সব কথা তখন বলা হয়েছিলো, তা'র ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কি এখনো রঙ্গমঞ্চের ধূলি-ঘন হাওয়ায় গুঞ্জিত হচ্ছে?···অতীত নিয়ে জল্পনা করা আমার স্বভাব নয়, সব সময়, যে-কোনো অবস্থায় আমি শুধু বর্ত্তমান নিয়েই বাঁচি; আমি হচ্ছি যাকে বলে গিয়ে extravert, নিজকে আমি বাইরে ছড়িয়ে দিই, জীবনের ধাবমান স্রোতের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে পড়ি। উপস্থিত মুহূর্ত্ত নিয়ে ব্যস্ত ও উৎসাহিত, পেছনে ফিরে' তাকাবার সময় কি অভিরুচি কোনোটাই আমার নেই। প্রেতনিবাসিত রঙ্গমঞ্চের অন্ধকারে আজ যে স্মরণের পাদপ্রদীপ জ্বলে' উঠছে, তা'র একটা কারণ, সামান্য একটা কারণ, বিশেষ একটা কারণ আছে। আজ একটি মেয়ের—না, মহিলার—সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। নিতান্ত দৈবাৎ। বাড়ি থেকে বেরুতে সাতটা বেজে গিয়েছিলো—আমার কলেজ স্কোয়ারস্থ প্রকাশক রাসবিহারী বাবুর সঙ্গে আজ দেখা না করলেই নয়, আজ তাঁর কাছ থেকে একটা উপন্যাস-বাবদ শেষ কিস্তি টাকা পাবার কথা। আটটার সময় দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে—আর, বাস্‌গুলোর আজকাল যা হাল হয়েছে, কতক্ষণে যে নিয়ে পৌঁছবে, জোর করে' বলা যায় না। যথাসাধ্য দ্রুত পদক্ষেপে বড় রাস্তায় এসে পড়তেই একটা বাস্ এসে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি সেটায় উঠতে যাবো, এমন সময় ঠিক আমার পেছনে স্পষ্ট, নির্ভুল, নারীকণ্ঠে আমার নাম উচ্চারিত হ'তে শুন্‌লাম।

ফিরে' তাকালাম। ফুটপাথে নীল সিল্কের শাড়ী পরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন—সঙ্গে এক ভদ্রলোক। মহিলাটি আমার দিকে - হ্যাঁ, আমার দিকেই তো—তাকিয়ে আছেন; আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই তাঁর চোখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। কিন্তু সে হাসিতে আমার চোখ সাড়া দিলে না। ব্যগ্র ভাবে, হতাশ ভাবে, করুণভাবে, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। বাস্‌টা, ইতিমধ্যে, আমার জন্য একটু ইতস্তত করে চলে' গেলো।

'আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না?' মৃদু, নরম, লঘু কণ্ঠস্বর; জিজ্ঞাসার সুরটা খুব স্পষ্ট নয়, যেন একটা সাধারণ উক্তি ভদ্রতা করে' জিজ্ঞাসার সুরে বলা হ'লো। মহিলাটির মুখে একটু সংশয় এবং সেই সঙ্গে একটু কৌতুক ফুটে উঠ্‌লো। হতাশ—আরো বেশি হতাশভাবে আমি তাকালাম। তারপর পুরাণা পল্টনে এক বর্ষার সকাল, বাইরে পাৎলা বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ ধূসর। বিস্তৃত প্রান্তর নতুন ঘাসের ঐশ্বর্য্যে ঘন-সবুজ। ঘরের মধ্যে আমি আর সুধা চুপচাপ করে বসে' আছি। এমন সময় মলিনা এসে ঢুক্‌লো। সুধা বল্‌লে, 'মলিনা-দি, একটা গান করো না।' মলিনা গাইলে—রবিঠাকুরের একটা বর্ষার গান। সুরটা মনকে জড়িয়ে জড়িয়ে, স্নায়ুগুলোর মধ্যে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এগোতে থাকে। মৃদু, নরম কণ্ঠস্বর। ঘুমের মত, আদরের মত মনের ওপর এসে পড়ে। সেই কণ্ঠস্বর তা'র পরে নিজের মনের মধ্যে অনেকদিন আমি শুনেছি। সেই কণ্ঠস্বর···

'পেরেছি বই কি। আপনি—'কিন্তু তা'র পর কী বল্‌বো? কেমন আছেন, কী কর্‌ছেন, এখানে কেন, পাঁচ বছর পর এক সামান্য আলাপিতা মহিলাকে এর যে-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অবান্তর, হাস্যকর, অসম্ভব।

'আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।—' আমার নাম

উল্লিখিত হ'তেই আমি নমস্কার করলুম। যাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'লাম, সেই ভদ্রলোকের নাম কিন্তু অনুচ্চারিত রয়ে' গেলো। বোঝা গেলো তু'জনের সম্পর্কটা। মলিনার স্বামী বল্লেন, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি।' মৃত্বস্বরে, অস্ফুটস্বরে, আমি যথাযোগ্য একটা শব্দ উচ্চারণ করলুম।

সেই মলিনা। নিয়তি অন্ধ; এক নির্বোধ, অযৌক্তিক, অসংলগ্নতায় আমাদের জীবনকে তা পরিচালিত করে; নিয়তির একমাত্র নিয়ম হচ্ছে বিশৃঙ্খলা: সৌন্দর্য্যজ্ঞানের, সামঞ্জস্যের তা'র একান্ত অভাব। কারণ, আমাদের জীবনে একটা ঘটনা যে-ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, করা স্বাভাবিক মনে হয়, শোভন, সঙ্গত, এমন কি, উচিত মনে হয়, তা কখনোই করে না; ঘটনা-পরম্পরা একটা নির্দ্দিষ্ট উপসংহারের দিকে নাটকীয়রূপে সজ্জিত হয় না; বিক্ষিপ্ত, পরস্পর-সম্বন্ধ-রহিত (এবং বিচ্ছিন্নভাবে অর্থহীন) কতগুলো খণ্ড-ঘটনার সমষ্টি আমাদের জীবন। হার্ডির উপন্যাসে যেমন হয়, প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা কোনো বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে পাত্রপাত্রীদেরকে নিয়ে যায় না; বেশির ভাগ ঘটনাই কোনোখানেই নিয়ে যায় না। একরাশ ছেঁড়া সুতোর মত এলোমেলো ভাবে সব চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। হার্ডির উপন্যাসের মত আমাদের জীবন যদি দারুণ, নিষ্ঠুর ট্রাজিডি হ'তো, তা হ'লে মর্‌তে-মর্‌তেও আমরা এ-গৌরব কর্‌তে পার্‌তাম যে নিয়তি আমাদেরকে তা'র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কিন্তু তুঃখের বিষয়, আমাদের জীবন ট্রাজিডিও নয়; এ নিয়ে ট্রাজিডি করবার মত মাথাব্যথাও নিয়তির নেই। যে-ঘটনা একটা অন্তিম ক্যাটাসট্রফিতে পর্য্যবসিত হ'তে পার্‌তো, তা—কী হয়? হঠাৎ থেমে যায়; তারপর ম্লান হ'য়ে যেতে-যেতে তা তুচ্ছতম অবান্তরতায় পরিণত হয়। যেমন মলিনার সঙ্গে আমার পরিচয়টা হয়েছিলো। পরিচয়—হ্যাঁ, পরিচয়মাত্র। নিয়তির শিল্পবোধ থাকলে সেই পরিচয় থেকে চমৎকার এক নাটক তৈরি হতে পার্‌তো, কিন্তু, সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, প্রস্তাবনার মাঝখানেই নেবে এলো যবনিকা। পাঁচ বছর (পাঁচ বছর কি? পাঁচ বছর এত কম সময়?) পর আজ মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনিকা উত্তোলিত হ'লো; সময়ের কুয়াশার ভেতর দিয়ে মলিনার মুখে তাকালাম। সেই মলিনা। কিন্তু ঠিক সেই মলিনা নয়; জীবন তা'র মুখে চিহ্ন এঁকে গেছে, নাকের তু'পাশ দিয়ে গভীর হ'য়ে গালের ওপর রেখা নেমে এসেছে, মুখের ভাবে গৃহিণীজনোচিত গুরুত্ব। হঠাৎ, আমার মন খারাপ হ'য়ে গেলো। মলিনার দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি কর্‌লাম, আমি বুড়ো হ'তে চলেছি। একটা চিরস্থায়ী ক্ষত-মুখ থেকে অবিশ্রান্ত রক্ত-ধারার মত অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে সময় ঝরে' যাচ্ছে; ঝোঁকের মাথায় আমরা চলি, খেয়ালও থাকে না—তারপর হঠাৎ কেনোদিক থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়। আমিও তা হ'লে বুড়ো হ'তে চল্‌লাম—আশ্চর্য্য!

খানিকক্ষণ খুচ্‌রো আলাপ হ'লো: কোনো কথা বল্‌বার না থাক্‌লে মানুষ যে-সব কথা বলে। মলিনার স্বামী একটু ব্যস্ততার ভাব প্রকাশ কর্‌লেন। মলিনা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'এখন কোন্‌দিকে যাচ্ছিলেন?'

'কল্‌কাতার দিকে।'

'একদিন আমাদের ওখানে আসুন না—এই তো কাছেই, টাউনসেণ্ড রোডে।' মলিনা তা'র বাড়ির নম্বর দিলে। 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'হরিশ মুখার্জি রোড।'

'তা হ'লে আর কী? এত কাছে থাকেন, আগেও আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পার্‌তো। আমি শুনেছিলাম, আপনি কল্‌কাতাতেই…'ফুটপাথ থেকে ওরা রাস্তায় নাব্‌লো। 'একদিন আস্‌বেন কিন্তু।'

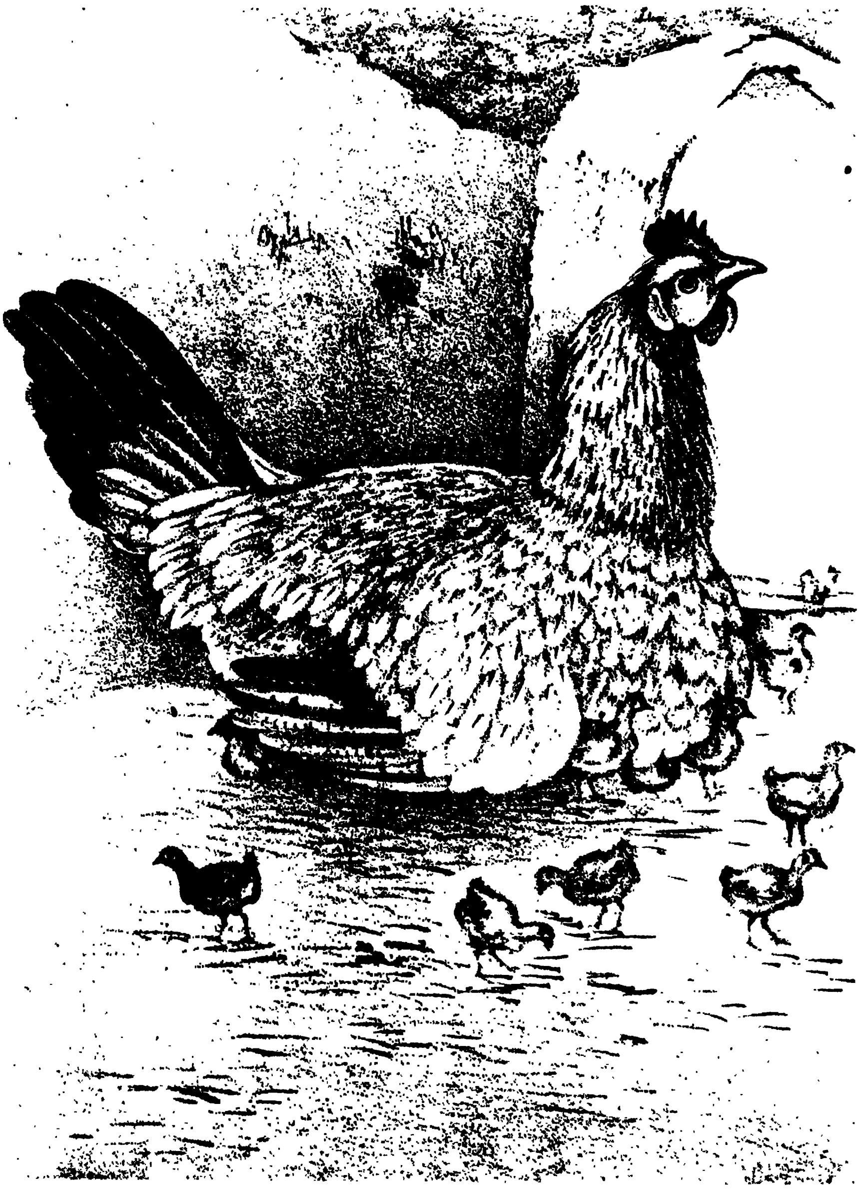
আমি অনায়াসে বল্‌লুম, 'হ্যাঁ, যাবো।' কিন্তু মনে-মনে তখনই জান্‌তাম যে যাবো না, কখনোই যাবো না। ইচ্ছে করে' যে যাবো না, তা নয়; হ'য়ে উঠ্‌বে না। মুহূর্ত্তের অর্থহীনতার চকিতের জন্য যবনিকা উঠেই নেবে এলো।

রাস্তা পার হ'য়ে ওরা চলে' গেলো, আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। তখনো সময় ছিলো; রাসবিহারী বাবুকে হয়-তো একেবারে ঠিক সময়ে গিয়ে ধরা যেতে পারে। আর, টাকাটারও বিশেষ দরকার ছিলো। কিন্তু না—আজ থাক্‌। আজ আর ইচ্ছে করছে না। আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে ফির্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ, বর্ষার সন্ধ্যা তা'র সমস্ত আর্দ্রতা

আর রহস্য নিয়ে আমাকে বেষ্টন করলো। খানিক আগে বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো—ঝির্‌ঝিরে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মধুর। প্রবৃত্তিচালিত পশুর মত, গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে' আমি বর্ষাকে গ্রহণ করলাম। নরম গ্যাসের আলোয় আধো অন্ধকার হরিশ মুখার্জি রোড বিশ্রামের মত এলায়িত; এই রাত্রিতে, আকাশের অন্ধকারে আর তারায় কী রহস্য, কী সৌন্দর্য্য! রোমাঞ্চের মত একটা অনুভূতি আমার মেরুদণ্ড দিয়ে নেবে গেলো। বাড়ি ফিরে এসে একটা বই পড়্‌বার চেষ্টা করলাম। (কারণ, অবিশ্রান্ত কাজ করতে বাধ্য হ'য়ে এমন বদভ্যাস হ'য়ে গেছে যে বিশ্রাম হ'লেও একটা বই কি কিছু হাতে চাই; খামকা বসে' থাকতে একেবারে ভুলেই গিয়েছি); চেষ্টা করলাম, মন বস্‌লো না। আমি যদি গাইতে পারতাম তা হ'লে গান করবার এর চেয়ে শুভ সময় জীবনে কখনো আস্‌তো না। কিন্তু যে হেতু আমি তা পারি নে, মনের কান পেতে একটা বক্রগতি সুরকে অনুসরণ করতে লাগ্‌লাম—রবিঠাকুরের সেই বর্ষার গান, মলিনার মুখ থেকে এক মেঘ-ধূসর সকালবেলায় যা শুনেছিলাম।···সেই মলিনা!

মলিনা আমার এক নিকট আত্মীয়ার নিকট আত্মীয়া; সেই সূত্রে ওর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। ও তখন হস্‌টেলে থেকে ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ে। একবার, আমার সেই নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে ও এসে কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে ছিলো। আমাদের উন্মুক্ত, বন্য পুরাণা পল্টনে তখন নিবিড় হ'য়ে বর্ষা নেমেছে। সেই সময়ের কথা ভাব্‌তে গেলেই মেঘে-ঢাকা আকাশের নীচে বর্ষণস্নিগ্ধ, সবুজ এক পৃথিবীর ঘ্রাণ মনে পড়ে। আজকের বাতাসেও সেই ঘ্রাণ; আমার রক্ত তাতে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে। আজকের বাতাসেও সুধার কেশ-সৌরভের অস্পষ্ট, অনির্ণেয় মোহ। কারণ, আমার পক্ষে সে-সময়টা সুধায় পরিপূর্ণ, আচ্ছন্ন; আমার বিশ্বের কেন্দ্র তখন সুধা। সুধা, সুধা। কতদিন পরে আজ আবার এই নাম উচ্চারণ কর্‌ছি—রুদ্ধস্বরে, নিজের মনে-মনে, একটু ভয়ে-ভয়ে। ভয়ে-ভয়ে; কারণ, যদি কোনো আশ্চর্য্য, অজ্ঞাত উপায়ে এমন হয় যে এই নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই অসহ্য ব্যাকুলতার ঘূর্ণীস্রোতে নিমগ্ন হ'য়ে যাই। কারণ, সে-সময়ে সুধাকে আমি ভালোবাস্‌তাম; হতাশভাবে, এলোমেলোভাবে, উন্মাদভাবে ভালোবাস্‌তাম—প্রথম যৌবনে লোকে যেমন ভালোবেসে থাকে। একটি আবিষ্ট হৃদয়ের সেই দ্রুতস্পন্দন, বিরামহীন অশান্ততা—তার অতি ক্ষীণ এক অপভ্রংশ আজ আমার মধ্যে অনুভব করছি। বর্ষার ম্লান আলোয় জানালার কাছে সুধার আনত মুখ; পাছে ও মুখ তুললে আমার চোখের ওপর চোখ পড়ে, সেই ভয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে আছি। কারণ আমাদের সে-ভালো-বাসায় সুখ ছিলো না; তা'র মৃত্যু ছিলো পূর্ব্বসিদ্ধ, এবং আমরা তা জান্‌তাম। অদৃশ্য ক্ষতের মত সেই কঠিন আশঙ্কাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা বহন করতাম; এবং সেটা সব চেয়ে স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌তো—সব চেয়ে যখন আমাদের ভালোবাস্‌বার কথা। আমাদের মাঝখানে সেই অদৃশ্য তৃতীয় এসে দাঁড়াতো; তা'র উপস্থিতির সচেতনতায় আমাদের দৃষ্টিও মিলিত হ'তে সাহস পেতো না। সেই মধ্যবর্ত্তী একদিন সুস্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট রূপগ্রহণ করলো; পর্ব্বতের মত অন্ধকার উঠ্‌লো দু'জনের মাঝখানে। সৃষ্টির ক্ষত-মুখ থেকে সময়ের রক্ত-ধারা ঝরতে লাগ্‌লো; তারপর একদিন—কোথায় সুধা? সে কি কোনোকালে ছিলো? ব্যস্ত পৃথিবীর কাজের সহস্র চাকা আমার ওপর দিয়ে সবেগে চলতে আরম্ভ করলো—কোথায় সুধা? সে যে কোনোখানে নেই, তা-ও কখনো অনুভব করিনে; আমার পৃথিবী থেকে সে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। না—একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাই তো—মুহূর্ত্তের জন্য মলিনার সঙ্গে দেখা হ'লো—তারপর আমি আবার সেই পুরানো পল্টনে, এক মেঘ্‌লা সকালবেলায়।

আজকের মত আমার পক্ষে, সেই বিগত দিনের সঙ্গে মলিনা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; আমার প্রথম যৌবনের সেই উন্মাদনা—প্রথম যৌবনের যা-কিছু আনন্দ আর যন্ত্রণা, মলিনা তারি প্রতীক; মলিনা অতীত একটা পরিচ্ছেদের চুম্বক; আমার পক্ষে, মলিনা স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। অন্ধকারে তাই আজ স্মরণের আলো জ্বলে উঠেছে—কী মোহে-ভরা, অপার্থিব, আশ্চর্য্য আলো! আমাদের স্মৃতি হচ্ছে মায়াবী, তা'র স্পর্শে রূপান্তর ঘটে। যে-কোনো সাধারণ, অতি



বিচিত্রা
[redacted]
ভাদ্র, ১৩৩৯

সন্ততি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রাঞ্জল, সেই সময়ে তুচ্ছ ঘটনা—স্মৃতির ভেতর দিয়ে দেখ্‌লে তা'তেই রহস্যের রঙ্‌, বিস্ময়ের অনুভব। যখন সত্যি-সত্যি সে-সময়টা বেঁচেছিলাম, তখন এমন আশ্চর্য্য নিশ্চয়ই মনে হয় নি। তখন নিশ্চয়ই অনেক ছোটখাটো খুঁত ছিলো, অসম্পূর্ণতা ছিলো—তুচ্ছ হ'লেও যেগুলো সেই সময়ে ঠিক তুচ্ছ মনে হয় নি। কিন্তু স্মৃতির রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় সেই খাদও আজ সোনায় পরিণত হয়েছে। সমস্ত জঞ্জাল, অবান্তরতা থেকে মুক্ত, শোধিত, সুসজ্জিত সার-বস্তুর আজ সাক্ষাৎ পাচ্ছি। অবিমিশ্র, খাঁটি ইমোশ্‌ন্‌—যা থেকে কবিতা হয়, জীবনে যা প্রয়োগ কর্‌তে গেলে একটু মিশ্রিত, একটু কলুষিত হ'য়ে পড়েই।

হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়্‌লো; উঠে' গিয়ে জানালার শার্সিটা লাগিয়ে দিলাম। মনের মধ্যে বর্ষার সেই সুরের গুঞ্জনের বিরাম নেই—মলিনার মুখ থেকে যেমন শুনেছিলাম। জিজ্ঞেস কর্‌তে ভুল হ'য়ে গেলো, মলিনা আজকালও গান করে কিনা। অনেক কথা জিজ্ঞেস কর্‌তেই ভুল হ'য়ে গেলো। হঠাৎ মনে হ'লো, মলিনা—ওর মধ্যেও কত জটিলতা, সংঘাত আত্ম-বিরোধ; অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ কর্‌বার জিনিষের ওর মধ্যেও অভাব নেই। আমার কাছে যে নিতান্তই একটা প্রতীক, সে যদি এখন এসে আত্ম-প্রকাশ করে, তা হ'লে কি কৌতূহলী হ'বো না, বিস্মিত হ'বো না, রহস্যে বিজড়িত হ'য়ে পড়্‌বো না? মনে হ'লো, মলিনাকে কখনো আমি জানিই নি, জান্‌তে ইচ্ছেই করি নি। যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, তখনো···মন ব্যাপৃত ছিলো। অথচ, তখন যদি ওর কাছে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম, কী হ'তো, বলা যায় না। সেই একটা সুযোগ, যা আমি ইচ্ছে করে' হারিয়েছি। আজ যেমন মলিনা আমার কাছে শুধু স্মৃতির আলো জ্বলবার সুইচ্‌, তেম্‌নি তখনো, আমার আর সুধার মাঝখানে, সে ছিলো আমাদের প্রেমের সহায়তা কর্‌বার জন্য বর্ষার একটা গানের সুর, আমাদের হৃদয়াবেগের প্রত্যক্ষ, শরীরী-মূর্ত্তি। যে-আলোয় আমি আর সুধা তখন পরিহিত, দীপ্ত, তা'রি প্রতিচ্ছায়ায় মলিনাকে তখন আমরা জ্যোতির্ম্ময়ী করেছিলাম। এত উজ্জ্বল সে-আলো যে তার নীচে মলিনা যে-মানুষ, সে চাপা পড়ে, গিয়েছিলো। তবু কখনো-কখনো, সে আলোর ব্যূহ ভেদ করে' মলিনার দৃষ্টি আমার চোখের সাম্‌নে এসে থম্‌কে দাঁড়াতো; এমন নয়, যে তার ভাষা বুঝ্‌তে পার্‌তাম না। অন্য রকম ঘটনা-সন্নিবেশ হ'লে, ওর সেই দৃষ্টি কোমল হ'য়ে আস্‌তে-আস্‌তে একেবারে বুজে যেতে পার্‌তো, সমস্ত সৃষ্টি মিলিয়ে গিয়ে—কিন্তু তখন আমার সময় ছিলো না, আর অল্পদিনের মধ্যেই মলিনা গেলো চলে'। আজ আবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হ'লো, ওর আর সময় নেই। এবং সুধা—সে আজ কোথায়?

যা-ই হোক্‌, ক্ষোভ আমি করি নে। সব যে শেষ হ'য়ে গেছে, এইটেই মস্ত শান্তি। শেষ, শেষ। সময়ের স্রোত অবিশ্রান্ত ছুটে' চলেছে। সেদিন যে-সব সম্ভাবনা নিষ্ফল হ'য়ে গিয়েছিলো, তা'রা আর ফিরে' আসবে না—অনুনয়ে নয়, প্রার্থনায় নয়, হৃদয়ের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষায় নয়। পুনরভিনয় আর হ'বে না; রঙ্গমঞ্চে শুধু প্রেতের রুদ্ধস্বর; আলো নিবিয়ে দাও, টানো যবনিকা।

আজ আমার আবার কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

বুদ্ধদেব বসু



পূর্ব্বমেঘ

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"যাত্রাপথ কথা প্রথমে বলিব তা'—শ্রবণে নিও পরে বার্ত্ত মোর—
চলিতে পথে যবে খিন্ন তনু হবে দূরিয়ো শিলাপরে ক্লান্তি ঘোর।
পরেও যদি তবু মনেতে লাগে কভু হ'য়েছ লঘুভার শিখরোপরি,
যাইতে পথে ধীরে সুপেয় স্রোতোনীরে নিওগো আপনারে পূর্ণ করি ॥১৩॥

তোমারে হেরি নভে চকিত চেয়ে রবে সিদ্ধবালা যত মুগ্ধ হিয়া,
বলিবে সবে—একি শৃঙ্গ এযে দেখি পবন বহি' লয় উৎপাটিয়া।
বেতসলতা-ভূমি ত্যজিবে যবে তুমি ঊর্দ্ধে যেয়ো চলি' পবন রথে—
কিছুনা গণি মনে-করীর আবাহনে করাবলেপ তার এড়ায়ে পথে ॥১৪॥

সমুখে দেখ চাহি' শৈল-দেহ বাহি' বল্মী পারে ওই উঠিছে ধীরে,
ইন্দ্রধনু খানি রচিত নাহি জানি কত না রতনের বক্ষ চিরে।'
তোমার শ্যাম কায়া মাখিয়া তারি ছায়া লভিবে অপরূপ কান্তি যে সে—
যেন রে নটবর উদিল ধরা'পর শিরেতে শিখী-চূড়া গোপের বেশ ॥১৫॥

তুমি যে ফলদায়ী তৃষিত রবে চাহি' কৃষকবধূ সবে তোমারি আশে—
বদনে প্রীত হাস না জানে ভ্রূবিলাস সজল স্নেহটুকু নয়নে ভাসে।
তাদের আঁখি আগে উঠিও অনুরাগে কৃষ্টি-সুরভিত ক্ষেত্র' পরি—
পিছুতে হটি' পুন ক্ষিপ্রগতি, শুন, ছুটিয়ো উত্তরা-পথটি ধরি ॥১৬॥

আম্রকূট যবে তোমারে শিরে লবে করিবে তব পথি-শ্রমাবসান—
জেনো সে রাখে মনে তোমারি বরষণে অগ্নি হ'তে তার পরিত্রাণ।
স্মরিয়া উপকার শরণ দিতে তার ক্ষুদ্র—সে'ও কভু বিমুখ নহে,
উচ্চ মহীয়ান গিরি সে গরীয়ান সেবা সে না ফিরায়ে কভু কি রহে! ॥১৭॥

শিখরোপরে তার শ্যামল মেঘভার শৈল বেণী সম মনেতে লবে,
পক্কফল শোভা বর্ণ মনোলোভা শৈলদেহে যেন ছড়ায়ে রবে।
মধ্যে শ্যাম তার ঘেরিয়া চারিধার পাণ্ডু শোভা হেরি, নিম্নআঁখি
অমরামরী দ্বয়ে রহিবে বিস্ময়ে ধরণী-পয়োধর শোভিছে নাকি! ॥১৮॥

বনের বধূ যত যেথায় কেলিরত—'কুঞ্জ' পরে সেই ক্ষণেক রহি,'
বরষি বারিধার, হইয়ে লঘুভার শৈলপথে দ্রুত আপনা বহি'
যাইতে আঁখিপরে ভাসিবে ক্ষণতরে বিন্ধ্যপাদমূলে শীর্ণা রেবা
উপলাহত গতি—শোভিছে' নিরবধি করীর দেহে আঁকা ত্রিবলী যেবা ॥১৯॥

(২০)

শীর্ণা রেবা তারে, তুষিয়ো জলভারে, নিজেও পিও তার কষায় বারি—
জম্বু-প্রতিহত সে বারি বিশোধিত মোদিত গজমদে গন্ধ তারি।
পূর্ণ রহ যদি পবন লঘুমতি তোমারে ল'য়ে কভু খেলিতে পায়?
রিক্ত লঘুভার ঘৃণ্য সবাকার—গরিমা আছে শুধু পূর্ণতায় ॥২০॥

নীপের মুকুলের অফোটা কেশরের হরিত কপিশের বর্ণ হেরি—
উপরে মনোলোভা-নীচেতে হেরি শোভা সিক্ত ভূমে ভূমি-চম্পকেরি—
হরিণ হরিণীতো গন্ধ-সুরভিত ছুটিবে পথে তব পাগল-পারা
শুষ্ক বনভূমি ভিজাবে যবে তুমি ঢালিয়া তারি পরে স্নিগ্ধ ধারা ॥২১॥

'আমারে প্রিয় মানি যাইবে দ্রুত জানি পথের বাধা তবু নাহি পাশরি'—
বাধাতো আছে সেথা কুচি ফুটে যেথা গন্ধ-আমোদিত শৈল প'রি,
যেথায় কেকারবে তোমারে বরি' লবে স্বাগত করি শিখী সজল চোখে—
ছাড়াতে সে বাধনে কোমল তব মনে কত না পাবে ব্যথা জানিগো সখে ॥২২॥

তোমারি আগমনে হেরিয়া নবঘনে ধরিবে নবরূপ দশার্ণ যে,
কেতকী উপবনে পুলক শিহরণে জাগিবে কুঁড়ি সূচী স্পর্শনে যে;
জম্বুছায়াঘন গ্রাম্য পথ বন বৃক্ষ শাখে নীড় রচনা রত
বিহগ কলরব শুনিবে সাথী তব মানসগামী সেই হংস যত ॥২৩॥

ছাড়িয়া বনভূমি উত্তরিবে তুমি প্রথিত রাজধানী বিদিশা ধাম
না গণি' পরমাদ পুরাবে মনোসাধ সদ্য হবে তুমি সিদ্ধকাম;
উপল প্রতিহত বহিছে অবিরত বেত্রবতী সেথা দুকূল ভাঙ্গি,—
মিথ্যা অভিমান ভুরুর বাঁকা টান—অধর পরশনে উঠিবে রাঙ্গি ॥২৪॥

(ক্রমশঃ)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

শেষ প্রশ্নের বৈঠক

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। লোচন বেড়াইয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া প্রজ্বলিত দীপালোকের সম্মুখে শরৎ বাবুর "শেষ প্রশ্ন"খানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। এমন সময় মোহিত ও রসিক কি একটা বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক করিতে করিতে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। চেয়ারে উপবেশন করিয়াই মোহিত বলিয়া উঠিল, লোচন দা, শেষ প্রশ্নখানা পড়ে ফেলেছ? exquisite! কেমন না?

রসিক গিয়া তাহার বাম পাশের চেয়ারখানি দখল করিয়া বসিয়াছিল। সে মাটির দিকে তাকাইয়া একটুখানি মুচকী হাসির সহিত কহিল। Rubbish!

বারুদে একটিমাত্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ! মোহিত দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, গাধা। গাধা। রসের নামমাত্র নেই, নাম নিয়েছেন রসিক! ও বই বুঝতে এখনও তোর ঢের দেরী। সাহিত্যের 'স' জানিস্ নে—মন্তব্য ফলাতে চাস্ কোন্ সাহসে?

রসিক জবাব দিল না, ঠোঁট বাঁকাইয়া কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেই থাকিল।

লোচন কহিল, শেষ প্রশ্ন শেষ করেছি। পড়তে পড়তে যে সব মন্তব্য মনে এসেছিল, এখন অবসর মতো সেগুলো নিয়ে জাবর কাটছি। তোমরা বুঝি এই বইখানা নিয়েই অমন তর্ক করতে করতে এখানে এলে? তা শুনে মনে হচ্ছিল, তর্কাতর্কি শেষে ঠোকাঠুকিতে গিয়ে না দাঁড়ায়!

মোহিত কহিল, সত্যি, লোচনদা, বড্ড রাগ হয়। ও বুঝে না কিচ্ছু, তবু cutting remark করতে ছাড়ে না।

রসিক পূর্ব্ববৎ নীরব—হাস্যময়।

মোহিত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, বল, লোচন দা, বইখানা ভাল লাগে নি কি?

লোচন একটু স্থির থাকিয়া উত্তর করিল, এ-সব বই সম্বন্ধে ভাল লেগেছে বলাও যেমন শক্ত, লাগেনি, বলাও তেমনি শক্ত। এটার মধ্যে উপন্যাস বস্তু যে খুব বেশী আছে, তাত নয়। তাহলে হয়ত গল্পাংশের দিক থেকে, চরিত্র-অঙ্কনের দিক থেকে এক কথায় এক-একটা মন্তব্য দেওয়া চলত। এযে, ভাই, প্রশ্ন—মানব-জীবনের সমস্যা! মন্তব্য দেওয়া ত সহজ নয়—অনেক দিক দিয়েই বাধে।

মোহিত সোৎসুক কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ লোচনদা, ঠিক বলেছ—নর-নারীর মিলন-সমস্যা। কি নিপুণভাবেই শরৎ বাবু সেটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রসিক তেমনি সহাস্যে মাথা তুলিয়া বলিল,

ফুটিয়ে তোলেন নি, ফাঁপিয়ে ফেলেছেন! মোহিত সক্রোধে কহিল, stupid, শরৎবাবুর argumentগুলো তুই ধরতে পেরেছিস্? কত বড় জোরের সঙ্গে—

রসিক বাধা দিয়া কহিল, জোর নয়, মুন্সিয়ানা! ও-হিসাবে লেখকের বাহাদুরী আছে, তা তাঁর অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার করে। কিন্তু argument কাকে বলছ? তাতে logic কই? কেবল sentimentএর ছড়াছড়িই ত বেশী দেখতে পাই।

মোহিত একটু নড়িয়া-চড়িয়া রসিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি উদ্ধত রোষে কহিল, তাঁর argument গুলো তুই কাটতে পারিস্?

পারি বোধ হয়।

Contradiction দেখাতে পারিস্?

পারি বোধ হয়।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ বোধ হয় পর্য্যন্তই! একেবারে বোধ নেই—তার বোধ হয়। রেখেদে তোর ডেঁপোমি। লোচন দা, তুমিই বল—argumentগুলো জোরের নয়?

লোচন স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল, ওগুলোকে ঠিক argument বলা চলে না—এক একটা মতের চরম দিক,—শুনায় অনেকটা aphorismএর মতো। অস্বীকার

ওয়াইল্ডের The Picture of Dorian Gray বা নীটশের Ecce Homo মধ্যে যেমন পাওয়া যায়। তবে শেষ প্রশ্নে সমস্যাটা বেশ তোলা হয়েছে।

রসিক বলিল, সমস্যা-ফমস্যা কিচ্ছু নয়—কেবল বাণ্ডিল—বড় একটা বাণ্ডিল!

লোচন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি রে? কিসের বাণ্ডিল?

আরে, মতবাদের বাণ্ডিল, লোচন দা, আর কিচ্ছু নয়! বলিয়া রসিক হাসিতে লাগিল। মোহিতের রোষরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কেবল stupid ছাড়া আর কোন শব্দই বহির্গত হইল না।

লোচন একটা উচ্চহাস্য দিয়া কহিল, মতবাদই বটে! তাতে রাগ করবার ত কিছু নেই। সেই গুলোই ত বিচার করে দেখতে হবে। তবে বিচার করা বড্ড কঠিন। আমাদের অনেকেরই কতগুলো প্রচলিত সংস্কার আছে। আমরা কোন মতবাদকে ভাল বা মন্দ বলি ঐ সংস্কারের সঙ্গে যাচাই করে। কিন্তু সেটা ত ন্যায়সঙ্গত বিচার নয়! মতবাদের নিজস্ব কোন মূল্য আছে কিনা তা নির্দ্ধারণ করতে হলে আমাদের খানিকটা সংস্কার-মুক্ত হতে হবে—চোখে কোন রকম ঠুলি রাখলে চলবে না, একেবারে সাহিত্যিকের খোলা চোখে ও-সব দেখতে হবে।

মোহিত প্রীতি-বিস্ফারিত চক্ষে লোচনের দিকে চাহিয়া রহিল। রসিকের চোখ দুইটি কৌতুকরসে ভরপুর। লোচন বলিতে লাগিল, কমল যে-সব মতবাদ প্রচার করেছে, তাতে গ্রন্থ-লিখিত কয়েকটি ব্যক্তিও যেমন আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের মতো যে-সব পাঠক আছেন, তাঁরাও তেমনি আঘাত পাবেন। লেখক বোধ হয় ঐ-সব ব্যক্তিকেই সেই সব পাঠকের মুখপাত্র করে খাড়া করেছেন। কিন্তু বইখানার শেষ দিকে দেখি, একে একে প্রায় সকলেই কমলের পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। পাঠকদের বেলাতেও তেমনি পরিবর্ত্তন হবে বলে লেখকের অন্তরে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে কিনা, বল্‌তে পারিনে। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন, বাংলা-সমাজে কমলকে এনে শরৎবাবু আর একটা boldness দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ভঙ্গীতে তাকে আনা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় তাঁর একটা weaknessই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মোহিত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি, লোচনদা, শরৎবাবুর weakness? এ কখনই হতে পারে না।

লোচন গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, কমলকে দো-আঁশলা করে দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যটা কি একবার ভাল করে বোঝ। শরৎবাবু জানেন, কমলের মতবাদটা বাঙ্গালীদের মুখরোচক হবে না। কিন্তু তার জন্মের ইতিহাসটা দিলে সে মতবাদটা যে মানান-সই হয়েছে, এটা তারা বুঝে নিয়ে আর কমলের উপর খড়্গ-হস্ত হবে না,—তারা তার মতবাদকে রক্তের হিসাবেই বিচার করবে। এমনি করে শরৎবাবু যেন বঙ্গ-সমাজের কাছে একটু কৃপা ভিক্ষা করেছেন। কেন, কমলকে খাঁটি বাঙ্গালী করে তার মতবাদ প্রকাশ করলে কি এমন দোষ হত? বাঙ্গালী কি স্বাধীন ভাবে ঐ ধরণের চিন্তা করতে পারে না? শরৎবাবু নিজেও ত বাঙ্গালী! আমার, ভাই, মনে হয়, বঙ্গসমাজের ভয়েই তিনি ঐরূপ করতে গেছেন, যদিও জানি ভয়-জিনিষটা তাঁর ধাতে বড় একটা নেই।

ব্যথিত কণ্ঠে মোহিত কহিল, কমল নামের সার্থকতা আছে, তা ধরতে পার নি, লোচনদা। কমল পাঁকেই জন্মায়। যে মায়ের গর্ভে তার জন্ম, তাঁকে পাঁকই মনে করতে হবে। "তাঁর রূপ ছিল কিন্তু রুচি ছিল না" বলে কমল নিজেই পরিচয় দিয়েছে। কু-ক্ষেত্রে জন্মেও যে কমলের মত অত বড় ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর, বোধ হয় লেখকের তাই দেখানই উদ্দেশ্য।

রসিক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, ব্যক্তিত্ব ত ভারি! কেবল কতগুলি বিলেতী ঝাঁঝালো মতবাদের মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিটা তার ইংরেজ বাপের দেওয়া। আর তার ভোগের ঝোঁকটা সে পেয়েছে মার কাছ থেকে। লেখক যে Law of heredity দেখাতে চেয়েছেন, তা এতেই বোঝা যায়। মায়ের রুচি ছিল না, কমলের রুচি আছে। তাইত সরল শিক্ষিত যুবক অজিতের ঘাড় ভাঙতে গেল। কমল হলে কি হয়? সেও পাঁক—শিক্ষার এসেন্স-মাখানো, এই যা তফাৎ।

লোচন বলিল, Law of heredityর দিকে লেখকের ইঙ্গিতটা আছে, আমার ত এইরূপ মনে হয়। সেই জন্যেই তাঁর weaknessএর কথাটা বলছিলাম। অবশ্য লেখকের weakness, কমলের নয়। তার মুখ দিয়ে তার জন্মের ইতিহাসটা নির্ব্বিকার ভাবে বলতে দেওয়ায় তার মতটা যে তার কাছে কতখানি সত্য, তা বেশ স্বাভাবিক—সুন্দর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা তার জন্ম-ইতিহাস না জেনেও তেজস্বিতা ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে আর কমলে কত পার্থক্য—তুলনা হয় না। একজন চায় বন্ধন—আর একজন মুক্তি। উভয়ের পথ একেবারে বিপরীত।

রসিক বলিল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিলে, লোচনদা। শেষ প্রশ্নের লিখন-ভঙ্গীটা গোরারই মতো—নয় কি?

তাতে কি হয়েছে? বলিয়া লোচন হাই তুলিতেই মোহিত ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, আজ তবে ওঠা যাক্, লোচনদা। রাত হয়ে গেল। কাল এসে আবার না হয় আলোচনা করা যাবে।

উভয়কে বিদায় দিয়া লোচন অন্দরমহলে প্রবেশ করিল।

২

পরদিন রবিবার। বেলা ৩টা না-বাজিতেই মোহিত আসিয়া লোচনের আড্ডায় দেখা দিল। দিন্‌টা ছিল মেঘলা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা পড়িতেছিল বটে, কিন্তু বর্ষণ-অপেক্ষা মেঘের আনাগোণাই বেশী। মোহিত বসিয়া একটু স্থির হইয়া বলিল, মমতাজের স্মৃতি-সৌধ মনে করে তাজমহল সম্বন্ধে অনেক কবিই অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু শরৎ বাবু দেখেছেন একে একেবারে পূর্ণ artistএর চোখে। স্মৃতি-ফিতি কিছু নয়—নিছক শিল্পসৃষ্টি! "মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ মাত্র। এত বড় বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের দান।" এমন করে মমতাজকে তুচ্ছ করবার সাহস এর পূর্ব্বে আর কারো দেখি নি।

লোচন বলিল, হঁ্যা, আনন্দ-লোকের দান ত বটেই। আমরা যা-কিছু বাইরে রচনা করি, সে সবই আমাদের অন্তর্লোকের—আনন্দলোকের সৃষ্টি। কিন্তু সে সৃষ্টি ত সব সময় হয় না—বাইরের কোন ঘটনা বা বস্তুর অপেক্ষা রাখে। তাই উপলক্ষকে একেবারে ছোট করে দেখলে চলবে না। উপলক্ষ যাই-ই হোক, অন্তরকে প্রবলভাবে নাড়া না দিলে আনন্দলোকের দানও মধুময় হয় না। দার্শনিক বিচারে—আধ্যাত্মিক হিসাবে অবশ্য 'বাহির' বলে কিছু নেই, সবই 'অন্তর'। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে বাহিরটাকে বাদ দিয়ে অন্তরকে বড় করে দেখবার উপায় নেই। মমতাজ বাদশার হৃদয়ে অনেকখানি জায়গা দখল করেছিল বলেই বাদশার সৌন্দর্য্য-পিপাসু 'ভাবুক' আর 'কবি' মন তার স্মৃতিকে অমন করে বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। মমতাজকে একেবারে আকস্মিক উপলক্ষও বলা চলে না। 'ধর্ম্ম উপলক্ষ'ই হোক আর 'সহস্র-লক্ষ-মানুষ-বধকরা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ'ই হোক—শিল্পীর মনকে নাড়া দেওয়া চাই। বিনা-নাড়ায় শিল্পীর মনও ন্যাড়া হয়ে থাকে, একথা মানতেই হবে।

মোহিত একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিছক কবিতা-সৃষ্টি বা চিত্র-অঙ্কন তা হলে হতেই পারে না। এই কথা তুমি বলতে চাও?

নিছক অর্থাৎ উপলক্ষ-ছাড়া ও-সব হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নেই। বাইরের একটা কিছু প্রবল প্রেরণা চাই-ই চাই।

'নিভৃত এ চিত্ত-মাঝে
নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত।'

সেই জন্যেই ত কোন্ কবি কোন্ occasionএ কোন্ পদ্যটা লিখেছেন, জানবার জন্যে অনেকেরই একটা আগ্রহ থাকে। তারপর তাজমহলকে নিছক শিল্প সৃষ্টি-রূপে দেখতে চাইলে কি হবে? মমতাজের কবর যে ওর সঙ্গে গাঁথা রয়েছে, ওর নামটা যে তাজমহল, এটা ত অস্বীকার করা যায় না।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মমতাজের প্রতি বাদশার একনিষ্ঠ প্রেম ছিল, এটাও তুমি মান না কি?

লোচন হাসিয়া উত্তর করিল, মানি বলতে ভয় নেই। বাদশার যত-ইচ্ছা বেগম থাক্ না কেন, তাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশাও হোক না কেন, ভাল তিনি বেসেছিলেন এক মমতাজকেই। এটা আশ্চর্য্য নয়। বহুর মধ্যে মন একজনকে কেমন করে আপনার বলে বেছে নেয়—মনোজগতের এ একটা রহস্য। সুতরাং মমতাজ সম্বন্ধে বাদশার প্রেমকে একনিষ্ঠ মনে করায়, ক্ষতি ত দেখতে পাইনে। বলতে পার—তাঁর ভোগটা একনিষ্ঠ ছিল না। সে কথা মানতে রাজি আছি।

উভয়ে খানিকক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। আকাশে মেঘের নৌ-বহর চলাফেরা করিতেছিল। দুই জনের অন্তর-দেশেও তেমনি কত চিন্তার বহর চলিতেছিল, কে জানে? হঠাৎ রসিকের আবির্ভাবে ইহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে আসিয়া একখানি চেয়ার দখল করিয়াই বলিয়া উঠিল, তোমরা বুঝি অনেকক্ষণ থেকেই আসর জমিয়ে বসে আছ? আমার আজ আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

না, অনেকক্ষণ নয়, বলিয়া লোচন বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিয়া আবার কি ভাবিতে যাইতেছিল। রসিক বাধা দিল। সে উভয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা সব চুপ-চাপ বসে ভাবছ কি?—শেষপ্রশ্নের কথা নয় ত?

লোচন উত্তর করিল, হ্যাঁ, তাই। তাজমহলের কথা হচ্ছিল। কমল এর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছে, তাই নিয়ে একটু আলোচনা হয়ে গেল। রসিক হাসিয়া কহিল, ঐ মন্তব্যটাই ত তার চরিত্রের চাবি-কাঠি, লোচনদা।

লোচন বলিল, তা বলতে পার। আমিও চুপ করে এতক্ষণ ঐ কথাটাই ভাবছিলাম। তার ঐ মন্তব্যের ভিতর দিয়ে তার জীবন-গতি অনেকটা বুঝে নেওয়া যায়। এই বলিয়া সে শেষপ্রশ্নখানি খুলিয়া একস্থান হইতে পড়িল,

'নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসছে, সেও তার প্রাপ্য নয়।'

'একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।'

আবার অন্যস্থান খুলিয়া পড়িল, 'আমার দেহ মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যে দিন জানবো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই, সেই দিন বুঝবো এর শেষ হয়েছে,—এ মরেছে।'

পাতা উল্টাইয়া আর এক জায়গা হইতে পড়িয়া শুনাইল, 'ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ লালন করে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতটাকেই ধ্রুবজ্ঞানে জীবন যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।' শুনাইয়া কহিল, কথাগুলো কি চমকপ্রদ, দেখ ত!

মোহিত কহিল, বঙ্গসাহিত্যে একেবারে নূতন! রসিক মাথা নাড়িয়া বলিল, চমকপ্রদ বলো না, লোচন দা। বল ভেল্কীপ্রদ। কথায় ভেল্কী লাগাতে শরচ্চন্দ্রের জোড়া নেই। নিষ্ঠার যে মূল্য আছে, তাও কমল মানছে, আবার যুগ-যুগ ধরে লোকে তাকে যে মূল্য দিয়ে আসছে, তাও তার প্রাপ্য নয় বলছে,—এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যে নিষ্ঠা মূল্য পাবার যোগ্য, তাকেই লোকে যুগে যুগে মূল্য দিয়ে থাকে। কমল-রাণী কোন্ নিষ্ঠার মূল্য স্বীকার করেন, তাত বুঝতে পারা গেল না। পরিবর্ত্তনকেই যে মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বলে ঠিক দিয়েছে, সে আবার নিষ্ঠার মূল্য দেবে কি? ভড়ং করে কথা কইলেই ত আর হয় না।

মোহিত গুম হইয়া বসিয়া রহিল। লোচন বলিল, কিন্তু কমলেরও নিষ্ঠা আছে। তার হবিষ্যান্ন খাওয়ার কথাটা মনে পড়ে ত?

রসিক হাসিয়া উত্তর করিল, হ্যাঁ পড়ে। ঐ হবিষ্যান্নের ছালেই যা একটু আটকে আছে! তবে আমার আশা হয়, অজিতের ধন-যৌবনের ধারাল ছুরিতে সেটাও শীঘ্রই কেটে যাবে।

কথাটায় লোচন হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মোহিত হাসিতে পারিল না। তাহার বুক যেন বাণ-বিদ্ধ। প্রতি-

বাদ করা সঙ্গত মনে ভাবিয়াও সে চুপ করিয়া থাকিল। লোচন বলিল, দেখ, বহুকাল ধরে ভোগ করতে না-পেয়ে পেয়ে ভারতের মন বর্ত্তমান ছেড়ে অতীতের দিকে—পরকালের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সত্যই তার মনটা হয়ে গেছে বুড়ো। যৌবন-ধর্ম্ম আর তাতে নেই তাই গতিবেগের কোন লক্ষণই আর দেখতে পাওয়া যায় না,—না মনের দিকে, না জীবনের দিকে। কমল সেই গতি-বেগই আনতে চায়। মনে পড়ে, অজিতের সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গিয়ে সে বলেছিল, 'দ্রুতবেগের ভারি একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি, আর এ জীবনেরই বা কি!'? সুতরাং সে যে কেন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তা বেশ বোঝা যায়। বার্গসোঁ জীবনকে দেখেছেন একটা series of changes রূপে। প্রতি মুহূর্ত্তে নবনব জলরাশির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকেই ত নদী বলে। জীবনটাও তেমনি। এই বার্গসোঁ তত্ত্ব অনেক উপন্যাস নাটকের খাদ্য জুগিয়েছে। ঘরের কাছে আমাদের ফাল্গুনীতেও সেটা অনেকটা ধরতে পাই। জীবনের অংশ বলে পরিবর্ত্তনকে আদর করতে হবে। তাকে হেলা করা অন্যায়। প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন ক্ষণস্থায়ী হলেও, সেই ক্ষণই কমলের চোখে মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'ধরণীর' পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।'

কমল সেই 'ঝলমল প্রাণ'ই যাপন করতে চায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকায় কতগুলো কবিতা আছে। খানিকটা খানিকটা তোমাদেরে শুনোচ্ছি। দেখবে, কমল যেন তাদের ভাবগুলোই জীবনে পরিণত করতে চেয়েছে। যেমন—

'ফুরায় যা দেরে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নিক কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাহিনা বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাইনা খুঁজিতে,
পূরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে॥'

আবার

'যেটুকু দেই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে', করিনে কেউ যোঝাযুঝি,
মধু মাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি।'

আর এক জায়গায় -

'যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই
ছাড়িনেক ভাই ছাড়িনে।
তাই বলে' কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে
কাড়িনে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দেই তারে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়িনে।'

এই সুরে জীবন বাঁধতে চায় বলেই একটা ছেড়ে আর একটায় যেতে কমলের যেন কোথাও বাধে না—আঁচড় লাগে না। সে যেন গতিবেগের জীবন্ত প্রতিমা!

এতক্ষণে মোহিতের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। দৃষ্টির মধ্যে একটা আগ্রহ লইয়া সে লোচনের দিকে চাহিয়া রহিল। রসিক কহিল, দ্রুতবেগে মোটর চলে যায়, কিন্তু তারি ফলে ধূলো কাদা তার চাকায় লাগে। তবে কমল কিন্তু এমন মোটর যে তা পর্য্যন্ত তার গায়ে লাগে না।

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে? রসিক হাসিয়া উত্তর করিল, মানে? মানে—সন্তানসন্ততি। কমলের সে বালাই নেই। ডাক্তার ফ্রয়েড যেটাকে বড় instinct বলে ঘোষণা করেছেন, কমল সেইটেকেই কেমন করে রস্তা দেখাল, ভেবে পাইনে।

বিরক্ত হইয়া মোহিত কহিল, নাঃ—এ অসহ্য। অশ্লীলতারও একটা সীমা আছে। তুই যে অক্ষয়কেও ছাড়িয়ে গেলি, দেখতে পাচ্ছি।

লোচন দুইজনকে থামাইয়া দিয়া কহিল, কমলকে একটা idea রূপে—যৌবনশক্তির প্রতীকরূপে দেখতে চেষ্টা কর। তাহ'লেই আর ঐ সব ছাই ভস্ম মনে আসবে না। জগতে আজ সেই যৌবনশক্তিরই জয় জয়কার।

রসিক ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কমলকে তাহলে একটা রূপক বলে মানতে হবে না কি ?

লোচন উত্তর করিল, না, ঠিক রূপক নয়—রূপকের আভাস। একটা idear living example। মানুষের যে ভাব-জীবনটা আছে, তার দিকে লক্ষ্য রেখে কমলকে বুঝ্‌তে চেষ্টা করা উচিত। নিষ্ঠা, সংযম, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, নূতন প্রাণ, নূতন শক্তি, নূতন কর্ম্মোদ্যম, নূতন জীবন-যাপন-প্রণালী, প্রাচীন ধরাকে নূতন করে দেখবার চোখ নিয়ে আসবে যে যৌবন-শক্তি কমল তার মতবাদে তারই উদ্বোধন-গীত গাইছে। অথচ এর জন্যে লেখককে কত লোকই যে দিচ্ছে গালাগালি তার আর অন্ত নেই। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখছে না—যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে কমল, তাঁরই হাতের সৃষ্টি—আশুবাবু! কমলের ভাষায় বলি, 'যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি। ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না।' আচ্ছা বল ত নিষ্ঠা, সংযম, ভারতের বৈশিষ্ট্য এই আশুবাবুর মধ্যে কি মূর্ত্তি পায় নি—জীবন্ত হয়ে ওঠেনি ? এঁর শান্ত সমাহিত ভাবটাই ভারতের বিশিষ্ট দান। ভারতের বেদ-উপনিষদ-কাব্য-পুরাণ-সংহিতা-দর্শনশাস্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যেরই ছড়াছড়ি। ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে সকলের জীবন-ধারা যাতে এই বৈশিষ্ট্যের দিকে যায়, তারই চেষ্টা ভারতবর্ষ করেছে। অন্যদেশে সেরূপ ব্যাপক ভাবে চেষ্টা হয়নি। অবশ্য তাই বলে অন্যদেশে যে ভারতের মতো আদর্শ ব্যক্তি হতে পারে না, তা মনে করা অন্যায়। এই বিশিষ্টতা যিনি লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যেই বিশ্বমানবিকতা ফুটে উঠতে বাধ্য। আবার আজ যারা তরুণের তাজা প্রাণ পেয়ে নেচে উঠছে, তারাও বলছে,

'মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা
মনে মনে আছে মিল,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল !'

এ দিক দিয়ে কমল ও আশুবাবুর মধ্যে একটা যোগ-সূত্র ধরা যায়। এ জন্যেই কমল পরিপূর্ণ যৌবন-শক্তি নিয়ে প্রাণপূর্ণ নিষ্ঠাবান্ শান্তিময় আশুবাবুর—তথা ভারতবর্ষের কন্যা হতে চেয়েছে। বাস্তবিক নিষ্ঠা যখন প্রাণ-রসে পরিপূর্ণ, যখন তাতে চিত্তের অগ্রগতি সূচিত হয়, তখনি তা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। নিষ্ঠা সংযম প্রভৃতির প্রাণহীন শুষ্ক বাহ্য আড়ম্বর ঘৃণার যোগ্য—একেবারে পরিত্যাজ্য। অক্ষয় হরেন্দ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লেখক সেই আড়ম্বর—সেই শুষ্কতার—সেই শূন্যগর্ভ হুজুগের পরিচয়টা দিয়ে দিয়েছেন।

কথা শেষ হইতে-না হইতেই একথালা খাবার, চা, চায়ের সরঞ্জাম আসিয়া উপস্থিত হইল। তা দেখিয়া রসিক কহিল, এই-ই ত চাই। ও-সব ভাবজীবনের কথা এখন থাক্, লোচনদা। এখন কর্ম্মজীবনে নামা যাক্। বলিয়াই একখানি কচুরি মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, রোজ এমনি মেঘ্‌লা দিন আর লোচনদার বৈঠকখানা হলে কি সুখেরি না হত ! কথাটায় সকলেই হাসিয়া উঠিল।

৩

দুই তিন দিন লোচনের সঙ্গে মোহিত রসিকের সাক্ষাৎ নাই। তাই লোক পাঠাইয়া তাগিদ দিয়া সে একদিন তাহাদিগকে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ডাকিয়া আনিতে সমর্থ হইল। দেখা হইতে প্রথম খানিকক্ষণ অভিমান-আপশোষের পালা গাহিয়া লোচন বলিল, শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে সব কথা যে বলা হয় নি, তা তোমরা বুঝতে পার নি না কি ?

রসিক বলিল, বুঝব আর কি? বুঝতে গেলেই রূপক—দূর ছাই!—ভাবজীবনের কথা তুলবে, ওতে আমার মনের খিদে মেটে না। তবে কথা না কয়ে যদি সেদিনকার মতো আবার জলযোগের ব্যবস্থা কর, তাহলে অন্ততঃ পেটের খিদেটা মেটে !

লোচন হাসিয়া বলিল, জলযোগ কেন ? রাত্রে তোমরা দুজন এখানেই আজ খেয়ে যাবে, তার আয়োজন করেছি। মোহিত কহিল, না, না, রাত্রে আর ও-সব হাঙ্গামা করো না। আলোচনা হোক, সেই-ই ভাল। লোচন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ভৃত্যকে মোহিত ও রসিকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের খবরটা দিতে পাঠাইয়া দিল। তারপর বাড়ীর ভিতর গিয়া খানিকবাদেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কমলের ভাব-জীবনের

কথাটা সেদিন হচ্ছিল। আজ তার কর্ম্ম-জীবনটা আলোচনা করা যাক্। শিবনাথ তাকে ছেড়ে গিয়েছে। কমলের ভাব-জীবন অর্থাৎ মতবাদ বলছে, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কিন্তু তার কর্ম্মজীবনে দুঃখটা এসে পড়েছে। যে আসন সে কিনেছিল শিবনাথকে বসাবার জন্যে, তাই-ই তাকে অজিতকে বসাবার জন্যে পেতে দিতে হল। সে আপশোষ কিছুই প্রকাশ করে নি অবশ্য। কিন্তু 'বিচিত্র এ দুনিয়ার ব্যাপার, অজিতবাবু', 'কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!'···'এই তো মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাদের নিজের হাতে, কিন্তু কোথায় বোসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না' ইত্যাদি কথাতে তার মর্ম্মের একটা বেদনা যেন ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। রুগ্ন শিবনাথের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডাতেও বেশ বুঝা যায়, তার ব্যবহার কমলের প্রাণে এক দাগা দিয়েছিল। আশুবাবু শিবনাথকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিলেন, তাও তার প্রাণে সয় নি। তাই সে শিবনাথকে সেবা করতে এসেছে। অতীতের স্মৃতি যে রাখতে চায় না, তার কেন এ-সব বিড়ম্বনা? বুঝতে হবে, হৃদয়ের গোড়াতে একটা টান নিশ্চিতই পড়েছে। সে যে শুধু মতবাদের সমষ্টি নয়—রক্তমাংসের মানুষ – চিত্তধর্ম্মী, অতি-বড় দরদ দিয়ে নিপুণ সাহিত্যিকের মতোই শরৎবাবু তা বুঝোতে চেয়েছেন। কোন কোন জায়গায় 'কমলের চোখে জল' দিয়ে লেখক তাকে খাটো করেন নি, বড়ই করেছেন। মতে, আর কাজে সব সময় মিল হয় না,—এই দুর্ব্বলতাই ত মানুষকে মানুষ করে। শরৎ বাবু ভোগের দেবতা বা ত্যাগের দেবতা গড়তে চান নি, মানুষই গড়তে চেয়েছেন। 'ফুরায় যা দেরে ফুরাতে' বলা বড় সহজ, কিন্তু ওটা কাজে পরিণত করা বড়ই কঠিন! লেখক যদি তার ত্রুটিগুলো উল্লেখ না করতেন, তাহলে তাকে আমরা একটা কথা ও ভোগের যন্ত্র বলে মনে করে নিতাম, মানুষ ভাবতে পারতাম না। কিন্তু কি অবলীল গতিতে—কি রসনিপুণ হস্তেই না লেখক তার মানবিকতা অঙ্কন করেছেন। আমরা মানুষই চাই—আমরা প্রায় সকলেই 'সহজিয়া' মতাবলম্বী। বক্তার সত্যই বলেছেন, the human in man is higher than all difference of opinion। সেই মানুষই লেখক আমাদেরকে দিয়েছেন।

মোহিত প্রীতিফুল্ল মুখে বলিল, নইলে কি আর শুধু-শুধুই লোকের নাম হয়? প্রতিভা চাই। শরৎ-বাবুর সাহিত্য-প্রতিভা অসাধারণ।

রসিক কহিল, কমলের ভোগমূর্ত্তিটা না দিলেই ভাল হত। ওটা দিয়ে লেখক যেন prostitution-এরই একটা উন্নত সংস্করণ প্রচার করতে চান। তাই বুকে বড় বাজে।

মোহিত বিরক্ত হইয়া কহিল, কি বলছিস্? ছ্যা—ছ্যা।

লোচন কহিল, কাকে বাজে? তা বাজুক। ওটা একটা সংস্কার।

রসিক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, সংস্কার বলে ঝেড়ে ফেল্লেই ত আর হয় না। ভাল সংস্কারেই মানুষের চরিত্র গড়ে থাকে—তা জান? ওটাকে হেলা করা চলে না।

লোচন একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল, হেলা করতে বল্‌ছি নে, তবে এইটে স্বীকার করতে বলছি যে মানুষ মাত্রেরই মধ্যে ভোগ-বাসনা কোন-না-কোন রকমে আছেই আছে। কেউ সেটাকে চাপতে জানে, কেউ জানে না। সমাজের ভয়েই অবশ্য চাপাচাপি। সমাজ-শাসন তুলে ফেল্লে আমরা অনেকেই যে কমলের সতীর্থ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

'কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।'

গীতার চোখে আমরা অনেকেই এমনি মিথ্যাচার। আমরা বাইরের চেয়ে ভিতরে—মনে মনে অনেক রকম prostitution করে থাকি। কমল আমাদেরই ভিতরটা উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছে। বাস্তবিক কমল-দর্পণে অনেক তথাকথিত শিক্ষিত মনেরই প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তবে আমরা অনেকেই 'সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ উপড়ে ফেল্‌তে' পারিনে বলেই মনের দুঃখ মনেই চেপে থাকি। কমল তার নিজের জীবনটা দেখিয়ে আমাদের দুঃখ ঘোচাবার পথ করে দিয়েছে। সে চায় ultra socialism এর free love। সমাজের আদিম পশুবৎ অবস্থা আনা তার অভিপ্রেত নয়। শিক্ষা দিয়ে মানুষকে সর্ব্ব রকমে

স্বাধীন করে ছেড়ে দিলে, মানুষ কি করে, তাই দেখাই তার উদ্দেশ্য। এদিক দিয়ে সমাজের অবস্থা কি দাঁড়াবে, এখনও তা জোর করে বলা চলে না। আদিম সমাজ আর বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে কত রকম অবস্থা এল আর গেল, sociologistরা তার বিবরণ দিতে পারবেন। হয়ত ভবিষ্যতে আর এক রকম সমাজ-পদ্ধতি সুরু হবে—কমল তারই আভাস দিচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক। তার কর্ম্ম-জীবনের কথা বলছিলাম। সে তার নিজের ত্রুটিগুলো ধরতে পারে রাজেনের সংশ্রবে এসে। অদ্ভুত লোক বা লেখকের অদ্ভুত সৃষ্টি এই রাজেন,—বইখানার মধ্যে অতি অল্পস্থানই জুড়ে আছে কিন্তু পাঠকের অন্তরের মধ্যে এ জায়গা দখল করে অনেকখানি। নারীর-রূপ, নারীর-দেহ যে পুরুষের ভোগের বস্তু, সে কথাও যেন রাজেনের মন জানে না। 'কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্ম্মে নিযুক্ত করে,—কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয় ত কোন কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জল বায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে।' তাই কমল যখন তাকে তার বন্ধু হতে বলেছে, তখন সে সেই বন্ধুত্বটা কি কাজে লাগবে জানতে চায়। কাজে না লাগলে কোন বন্ধুত্বই তার কাছে মূল্যবান নয়। কমলের পক্ষে এটা একটা নূতন অভিজ্ঞতা। তার রূপ—তার বুদ্ধি—তার তেজ প্রভৃতি, যা এতদিন সে পুরুষের লালসার বস্তু বলে মনে করে এসেছে সেই সবই হয়ে গেল ধূলিসাৎ এই রাজেনের কাছে। তারপর মুচীপাড়ায় তার সেবা-পরায়ণতাও রাজেনের কাছে হার মেনেছে, তাও সে বুঝতে পারল। লেখক যেন তার দম্ভকে চূর্ণ করবার জন্যেই—জগৎকে আর একটা নূতন চোখে দেখবার শিক্ষা দিতেই রাজেনের অবতারণা করেছেন। কমলের ধারণা মনের মিলই যথেষ্ট। মতের অমিল হলে তত ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু কর্ম্মী রাজেনের মনের মিল অপেক্ষা মতের মিলই বেশী আবশ্যক। সে বলে, 'সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়া-বাজি। এটা ভুল।'......'সর্ব্ব প্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।'......'কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্ম্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।' এমনি করে সে কমলকে একটা নূতন দিক দেখিয়েছে।

রসিক কহিল, তুমি কেবল কমলের কথাই বলছ, লোচন-দা। আর আর চরিত্রগুলো কি মাঠে মারা গেল?

লোচন হাসিয়া উত্তর করিল, এই কমলই ত কাঁটার মতো তোমাদের গলায় বেঁধেছে, তাই সেটাকে নামিয়ে দিতে চাই। আর গুলো সম্বন্ধে বেশী কিছু না বল্লেও চলে।

মোহিত কহিল, হ্যাঁ, লোচন-দা, যেখানে যাই, কেবল কমলের কথাটাই শুনি। কেউ যেন তাকে ভাল চোখে দেখতেই পারছে না।

লোচন বলিল, কেন পারছে না, বুঝতেই পারছ। আমাদের প্রচলিত সংস্কারে তার মতবাদ বড় আঘাত দেয় কি না—তাই। কিন্তু কমল যে ভাবী দিকটার ইঙ্গিত করছে, সমাজ সেই দিকে যাবে কি না, তা এখনও ঠিক বলা যায় না। মনীষীরা নিজের নিজের কল্পনা খাটিয়ে এক একটা ভাবী চিত্র আমাদের সাম্‌নে ধরেন, এই মাত্র। টলষ্টয় যখন Anna Karenina লেখেন, তখন রুসের সমাজপন্থীরা তাঁকে ভাল চোখে দেখেন নি। না দেখ্‌লেও, সমাজের ভিতর হতেই তিনি তাঁর কল্পনার সত্য বের করে নিয়েছিলেন,—একেবারে আরব্য-উপন্যাস রচনা করেন নি। শেখবের Darling ও অনেক রুচি-বাগীশের কাছে অশ্লীল বলেই ঠেকেছিল। কিন্তু চিন্তা-জগতের মাল মসলা জোগায় বস্তু-জগৎ। সুতরাং সেটাকে অন্যায় বল্লেও অসত্য বলা চলে না। রুসের আজকালকার সমাজ ঐ সব সাহিত্যের দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত, তা বিশেষজ্ঞদের অবিদিত নয়।

মোহিত কহিল, সেদিন কে যেন ঐ Darlingএর সঙ্গে কমলের তুলনা করছিল। কিন্তু আমার ও বইখানা পড়া নেই বলে কিছু বলতে পারলাম না। তুমি পড়েছ, লোচনদা?

লোচন কহিল, পড়েছি। কিন্তু Darlingএ পাই একেবারে প্রেমতরল নারীহৃদয়ের ছবি। তরল বস্তু যেমন আধারের আকার ধরে, তেমনি Darling যখন যে পতি গ্রহণ করে, তারই মতো হয়ে যায় তার মতি-গতি ধরণ-ধারণ—সব। কমলের মতো অমন স্বাধীন চিন্তা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অপরাজেয় তেজস্বিতা তার মধ্যে ত নেই। কেবল পতি-পরিবর্ত্তন দেখলেই ত চলবে না। সে রকম পরিবর্ত্তন শেখব কেন?—জোলা, ইবসেন প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় লেখকের উপন্যাস নাটকাদিতে আছে। তরলভাব কমলের নেই বল্লেই চলে। যুক্তিতর্কের—বিচারের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা একটা কঠিন সত্তা যেন তার মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। বঙ্গসমাজে নারীর এই দিকটা দেখানো অনেক দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। তার পাশে শিবনাথকে দাঁড় করিয়ে লেখক দেখিয়েছেন সে শিবনাথের ঢের উপরে। শিবনাথ মিথ্যাবাদী, সে তা নয়। কমলকে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে রুগ্না বলে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল, আর কোন অপরাধে নয়। জোহান বয়ারের Face of the World নামক উপন্যাসে তারি মতো একটা চরিত্রের কথা পড়েছি,—নামটা মনে আসছে না। স্ত্রীর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হওয়ায় তাঁর যৌবন গেছে সরে, রূপ গেছে উঠে। তাই সে আর তাঁতে তৃপ্তি পাচ্ছে না—এই রকম একটা ভাব তাতে আছে। শিবনাথ তারই দোসর। এই শিবনাথের উক্তি শুনে ঘৃণায় মনোরমার 'সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়ে উঠেছে', অথচ তাকেই শেষে সে ভালবেসে ফেল্লে—গায়কের কণ্ঠ-ফাঁদে কেমন করে আটকে পড়ে তাকে নিয়ে সে উধাও হয়ে গেল,—মনস্তত্ত্বের কি আশ্চর্য্য রহস্য! ঘৃণার পরিণাম যে ভালবাসা হতে পারে, তা শরৎবাবু শুধু মনোরমা ও অজিতের বেলাতেই দেখান নি—পূর্ব্বে তাঁর দেবদাসেও তা দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসখানিতে চঞ্চল চিত্তের অনেকগুলো নরনারী দেখা যায়। মনোরমা, অজিত, হরেন্দ্র, অবিনাশ, বেলা প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যেতে পারে। সেইসব চঞ্চলতা বা দুর্ব্বলতার ফাঁক দিয়েই লেখক তাঁর বক্তব্যটা ভাল করে বলবার বিস্তর অবসর পেয়েছেন। প্রকৃত শিল্পীর ধরণই ঐ।

মোহিত সোৎসাহে কহিল, বইখানা আমার বড় ভাল লেগেছে। কিন্তু কেন লেগেছে, তা তোমার মতো অমন করে গুছিয়ে কাউকে বলতে পারিনে।

রসিক বলিল, এক আশুবাবু ছাড়া আর কাউকে আমার ভালও লাগেনি, ভাল বলতেও চাইনে। শিবনাথের মতবাদ, কমলের মতবাদ, অক্ষয়ের মতবাদ, হরেন্দ্রের মতবাদ, অজিতের মতবাদ—কত মতবাদই যে বইখানায় পুঁজিকরা হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার তোমার মুখে যা শুনতে পাচ্ছি, লোচনদা, তাও একটা মতবাদ। নাঃ মাথা ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠছে।

লোচন ক্ষুণ্ণ হইল না। হাসিয়া বলিল, দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাশীল লেখকের বই মতবাদেই পূর্ণ। এক একজন এক এক দিক থেকে এক একটা সমস্যার অবতারণা করেছেন বা মীমাংসা করেছেন। যুগে যুগে আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনে জীবন-যাত্রার আদব-কায়দা-ধরণ-ধারণেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। যা-আছে, তাকে ধরে রাখা যায় না। গতিশীল মানব-সমাজে কোন সমস্যার চরম মীমাংসা হয়ে গেছে, একথা বলা বড়ই শক্ত। যুগে যুগে তাই সমস্যা বা প্রশ্ন শেষ অথবা চরমই থেকে যায়। ভারতে যেদিন বৈধব্যের আইন জারি হয়েছিল, সে দিন অনেকেই হয় ত ভেবেছিলেন—একটা সমস্যার চরম মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু আইনের বলে মানুষের চিত্তকে ত অভুক্ত রাখা যায় না—তার ক্ষুধা আইনের আবরণ ফেঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বেই। বেরিয়ে পড়ছেও অনেক দিন ধরে। অথচ যে দেশে বৈধব্যের আইন নেই, সে দেশেও বিধবা আছে। তাদের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মচারিণীই থাকে, সমাজ-সেবাতেও মন দেয়। সুতরাং আইন করেই যে ভারতবর্ষ লাভবান হয়েছে, একথা জোর করে বলা চলে না। নীলিমার চিত্তের ক্ষুধা আইনের কৃত্রিম উপায়ে যে মিটতে পারে না, শরৎবাবু সে কথা বেশ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পলাতকায় নিষ্কৃতি নামক গাথায় মঞ্জুলিকার ভিতর দিয়ে এই আইনকেই আঘাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পর হতে এদিক দিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন ও করেছেন। আর তারই ফলে আমরা

আজকাল অনেকে বুঝতে পারছি, আইন করে বৈধব্যকে অটুট রাখা ঠিক নয়—পদে পদে কৃত্রিমতা দেখা দেয়। হিন্দুদের মধ্যে তালাক দেওয়ার পদ্ধতিটা নেই বলেই খুব বড় গলায় আমরা সতীত্বের বা পতিত্বের গৌরব জাহির করি। কিন্তু তালাক দেওয়ার প্রথাটা যদি কোন দিন চলে, তাহলে হিন্দু পরিবারে ঐ সব গৌরবের মূলে যে কতখানি অসত্য জমা হয়েছে, তা অল্প দিনের মধ্যেই ধরা পড়বে। আমার একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, শরৎবাবু যে-সব সমস্যা তুলেছেন, সে-সবকে মীমাংসা মনে না করে, 'সমস্যা' ভাবেই তোমরা দেখবে, বুঝলে রসিক? সংস্কারের কাচ দিয়ে দেখো না। যথার্থই সে-সব সমস্যা কি না, তাই-ই বিচার করো।

খানিকটা থামিয়া বলিল' আশুবাবুকে শুধু তোমারই ভাল লাগেনি, রসিক। সকলেরই ভাল লেগেছে ও লাগবে। সব দিক দিয়েই তিনি আমাদেরকে মুগ্ধ করেন। অমন হৃদয়বান পুরুষ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। আধুনিক সমাজে কমলকে হেঁয়ালী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আশুবাবু একেবারে স্বচ্ছ—সাদাসিধা, কোনখানে তাঁর ঘোর প্যাঁচ নেই। আমার ত, ভাই, মনে হয়, বইখানা দাঁড়িয়ে আছে কমল ও আশুবাবু—এই দুটো স্তম্ভের উপর। আমি আগেই বলেছি, আশুবাবু দেখিয়েছেন—ভারত যা হয়ে এসেছে, আর কমল দেখাচ্ছে—ভারত কি হতে পারে। এই জন্যেই কমলকে বুঝতে আশুবাবুকেও অনেক জায়গায় বেগ পেতে হয়েছে। এ দুজন ছাড়া আর সব চরিত্রের কথা আর তুলব না। আজ এই পর্য্যন্ত। জগৎ-মনীষী-সভায় শরৎবাবুর স্থান এর মধ্যেই হয়ে গেছে, শেষ প্রশ্নে সেটা আরও কায়েম হল বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিল। রসিকের দুষ্ট বুদ্ধি তখনও খুঁজিতে লাগিল—আর কি কি বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করা যায়।

কুমুদনাথ লাহিড়ী

অনর্থ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ-গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবনের যে-ঘটনাগুলি নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে, সে-ঘটনাগুলি ঘটেছিল—ইংরেজী ১৯৩২ সালের ১৩ই মে থেকে ১৯শে জুনের মধ্যে।

এই তারিখ-নির্ণয়ের দ্বারা আমি দেখাতে চাই যে, কোন মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরিবর্ত্তন আস্‌বার পক্ষে ঐ ক'টা দিনের ব্যবধানই যথেষ্ট। পরিবর্ত্তনের দ্রুততা হয়ত তোমার মনে সন্দেহ জাগাতে পারে, কিন্তু জেনো, সন্দেহ জাগ্‌ছে ব'লেই কোন জিনিষ অসম্ভব নয়।

সময় ১৩ই মে, সন্ধ্যা। স্থান—রাসবিহারী য়্যাভিনুর ওপর যে বালিগঞ্জ-পার্ক আছে তারই উত্তর-পশ্চিম কোন্‌। পাত্র-পাত্রী—কাছে এবং দূরে যে-সব ছোট এবং বড়ো ছেলেরা খেলা করছে তাদের বাদ দিলে, শুধু ওরা দুজন।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ ক'রে ৩২ সালের ২৯শে জুনের মধ্যে যে-কোন দিন তুমি যদি ঐ-অঞ্চলে যেতে তাহলে দেখতে প্রত্যহ-ই বিকেল ছ'টার সময় একটি মেয়ে ঠিক ওই এক জায়গার বেঞ্চিখানিতে এসে বসে;—সামনে বই খুলে বসে, অর্থাৎ পড়ার ভান ক'রে পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে। একটু পরেই একটি ছেলে বেড়াতে বেড়াতে সেই দিকে এসে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বেড়াবার ভান ক'রে ঐ মেয়েটির কাছেই এসে উপস্থিত হয়। তারপর, হঠাৎ-যেন-দেখা-হল এমনি ভাবে বলে—এই যে, আপনিও এসেছেন দেখছি! আমি এই-দিকে বেড়াচ্ছিলাম···বেশ তো, দেখা হ'য়ে গেল!

এই হঠাৎ-দেখা-হওয়াটা ওরা দুজনে ইচ্ছে ক'রে এবং চেষ্টা ক'রে রোজ ঘটায়। তারপর, প্রথম কলেজের পাঠ্য-পুস্তক থেকে আরম্ভ ক'রে, আকাশে তারা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে, ওদের আলাপ এমনি কোমল খাদে নেমে আসে যে, ওরা দুজন ভিন্ন সে-সব কথা আর কেউ-ই শুনতে পায় না।

ওদের আমি প্রত্যহ দেখি। এক-একদিন ওদের পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে ব'সে ওদের কথা পর্য্যন্ত শুনেছি; ওরা জানতে পারে নি। জানতেই যদি পারতো, তাহলে ওদের তন্ময়তার মূল্য থাকতো কোথায়? দেড়-বছর ধ'রে দেখে এবং কৌতূহলী হ'য়ে অনুসন্ধান ক'রে (কৌতূহলী কেন হয়েছিলাম, বুঝতে পারছো? তোমাকে এই গল্প বলে আনন্দ দেবার জন্যে। ধন্যবাদ দিচ্ছ না?) ওদের সম্বন্ধে জানতে আমার কিছু বাকী নেই।

ওদের আসল নাম-ধাম কিন্তু প্রকাশ করতে পারবো না। তোমার কাছে গোপনে বলতে পারতাম, কিন্তু গল্পটা যখন ছাপার অক্ষরে 'বিচিত্রা'র শোভাবর্দ্ধন করবে তখন ওদের কাল্পনিক নামকরণ করা ছাড়া উপায় দেখছি না।

চরিত্রানুযায়ী নাম দেওয়ার প্রথাটা শরৎবাবু বেশ চালিয়ে দিয়েছেন। আধুনিকতম অতি-আধুনিকেরাও এটাকে মেনে চলছে। এখানেও সেই-প্রথাকে অবলম্বন করলাম।

বার্ন্‌স্‌-এর উগ্রতার সঙ্গে টেগোর-এর মিষ্টিসিজম্‌ মিশিয়ে যে-কবিতা রচিত হবে—ছেলেটির মধ্যে সেই কবিত্বের আমেজ পাওয়া যায়। ও এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের নাম-করা ছাত্র। ও স্বপ্নদর্শী। ও আদর্শবাদী। ওর সংস্পর্শে যারা একবার এসেছে, তারা আর ওকে অন্য সাধারণ পাঁচজনের মতো দূরে রাখতে পারে নি—ওর মধ্যে এমন একটি সুকুমার আকর্ষণ আছে। ওর নাম দিলাম - রঞ্জন।

আর মেয়েটি? ১৯৩৫ সালের আধুনিকত্ব ওর মধ্যে আছে, কিন্তু তবুও ওর চুল বব্‌ করা নয়। ওর মডার্ণত্ব সম্বন্ধে অন্য অনেক নজির দিতে পারি; কিন্তু সে-সবের শেষ কথা হচ্ছে এই যে, অর্থশাস্ত্রের শেষ-পাঠ অবধি আয়ত্ত ক'রেও ও ভবিষ্যত-জীবনে ব্যাঙ্ক চালানোর চেয়ে গৃহস্থের বধূ হবার কামনা করে বেশী। এক কথায় ও হচ্ছে—

অনাদি কালের সেই চিরন্তনী নারী। ওর নাম—নন্দিনী।

ওঃ! তুমি বুঝি আমার গল্প পড়? তাই ধরেছো। কিন্তু তাতে কী হয়েছে! এক গল্পের নাম অন্য গল্পে ব্যবহার করতে পারবো না—গল্প-লেখা-আইনে এমন নিষেধ কোথাও নেই। মনে কোরো না—এ আমার নতুন নাম উদ্ভাবনের অক্ষমতা। চরিত্রের অনুরূপ নাম দিতে গিয়ে নাম দুটী মিলে গেছে—এই যা। হ্যাঁ; 'অনর্থ'-কে তুমি 'বিয়োগান্ত'-র আর-এক-দিক বলতে পারো; কিন্তু এ তার উত্তর নয়।

শুক্রবার, ১৩ই মে সন্ধ্যাকালে বালিগঞ্জ-পার্কের এক-কোণের বেঞ্চিতে ব'সে ওরা দুজনে দুজনের কথায় মগ্ন হ'য়ে গিছল।

রঞ্জন বলছিল—আর দুমাস, নন্দিনী। তারপরে পরীক্ষায় যে-রকম আশা করছি সেই-রকম রেজাল্ট্ যদি করতে পারি, সাহেব ব'লেই রেখেছে—ষ্টার্টিং দিয়ে দেবে। আমি কিন্তু কল্‌কাতার বাইরে চাকরী নেব, তা এখন থেকে ব'লে রাখছি; তখন তুমি আপত্তি করলে চলবে না। কলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরে কোন-এক অজানা অদেখা শহরে গিয়ে আমরা নীড় বাঁধবো; ছোট, একখানি বাংলো, তাতে শুধু তুমি আর আমি,- মার্ভ্‌লাস্ হবে! কাজ থেকে ফিরে এসে ঘরের কোলে বারান্দায় ব'সে আমি তোমাকে তোমার ফেভরিট্ কবিতা 'আশা' আবৃত্তি ক'রে শোনাবো আর তুমি ষ্টোভে আমায় গরম গরম কাট্‌লেট্ ভেজে দেবে—মার্ভলাস্ হবে, নয়? (ঐ ইংরেজী কথাটা রঞ্জনের অত্যন্ত প্রিয়, দিনের মধ্যে কতবার যে ব্যবহার করে তা গুণে ঠিক করতে গেলে সুদক্ষ সংখ্যা-বিদের প্রয়োজন)।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলে—কিন্তু কল্পনায় তো স্বর্গ রচনা করছি, শেষ অবধি তুমি পিছিয়ে পড়বে না তো? কী জানি, হয়ত যখন তোমার বাড়ীতে গেলাম—আমার প্রস্তাব জানাতে;—তোমার গার্জেন্-রা ভীষণ আপত্তি হয়ত ভয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো তাঁদের আদেশ শিরোধার্য্য করলে! তাহ'লেই হয়েছে আর কি!!

রঞ্জনের কথা শুনে নন্দিনী হাস্‌লো। ওর ওই হাসিটুকুই যথেষ্ট বাঙ্‌ময়; কিন্তু ও জান্‌তো, রঞ্জনের কাছে তা যথেষ্ট নয়। বল্লে—বেশ তো সে-রকম যদি হয়, তাহ'লে এক কাজ কোরো। শোনো, তোমাকে একটা tip দিয়ে দিচ্ছি।

—শুনি।

—চুপচাপ আমাদের বাড়ী থেকে চ'লে আসবে—গোলমাল করবে না। গার্জেন্‌রা ভাববে—ব্যাপারটা সহজেই চুক্‌লো। তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন। তারপর, আমি কিছু রোজ রোজই বাড়ীতে বন্ধ হ'য়ে থাক্‌বো না—দু'একদিন পর থেকেই বেড়াতে বেরুবো। সেই-সময় আমার ওপর লক্ষ্য রাখ্‌বে। তারপর সুবিধে-মতো একটা ট্যাক্সি-ওলাকে ঘুষ দিয়ে ঠিক ক'রে রাখবে; সন্ধ্যের সময় আমি যখন একলা বাড়ী ফিরবো, সেই সময়—বুঝেছো তো? তোমাকে কথা দিলাম—আমি একটুও চেঁচাবো না।

নন্দিনীর কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে রঞ্জনের পেটে খিল ধ'রে গেছে। এত হাসি ও জীবনে কোনদিন হাসে নি।

নন্দিনী বল্লে—ভয়ে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সাম্‌না-সাম্‌নি তোমার সঙ্গে জোরে তো আর পারবো না। যদি সে প্রয়োজন কোনদিন হয়, আমার কথাগুলো মনে রেখো।

হাসতে হাসতে রঞ্জন বল্লো—রাখবো।

ওপরের কথা থেকে বুঝতে পারছো, ওদের আলাপ এখন কোন্ ধারা বেয়ে চলে? অর্থাৎ ওদের মধ্যে আদব-কায়দা অনুযায়ী স্তবস্তুতির দিন অনেকদিন গেছে কেটে, প্রথম হৃদয়-নিবেদনের সে অতিরঞ্জিত বাক-বাহুল্যের প্রয়োজনও আর নেই। অন্তরের নিবিড়-তম যোগ স্থাপিত হবার পর সংশয়-হীন দুটী মনের যে আবেগ-বাষ্প-শূন্য আলাপ হয়, ওদের কথাও তেমনি। তাই, ওদের কথা যদি এখন পারিবারিক এবং সাংসারিক অর্থাৎ ঘরোয়া-কথার পর্য্যায়ে নেমে আসে তাতে আশ্চর্য্য হ'য়ো না। শুধু সেগুলি আমার গল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ব'লে তাদের বাদ দিলাম। কিছুক্ষণ

—কিন্তু বেশ লোক ওঁরা। অত যে বড়লোক, কিন্তু একটুও চাল নেই। আমাকে ভারী স্নেহ করেন।

রঞ্জন রায় চৌধুরীদের কথা বলছে। কলিকাতার আরিস্তোক্র্যাটিক্ সমাজের খবর যদি রাখো তাহলে রায় চৌধুরী দের পরিচয় নিশ্চয় দিতে হবে না। তাঁদের কথাই রঞ্জন বলছে। তাঁদের বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তাঁর সঙ্গে রঞ্জনের বাপের পরিচয় ছিল; পরিচয় ছিল বল্লে ভুল বলা হবে,—স্কুলে এক ক্লাসে একসঙ্গে পড়েছিলেন ব'লে মিঃ রায় চৌধুরী দয়া ক'রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চেনেন; এবং সেই সূত্রে রঞ্জনকে স্নেহ করেন। রঞ্জন প্রায়ই তাঁদের বাড়ী যায়।

রঞ্জনের জীবনের সমস্ত কথাই নন্দিনী জানে; তাই কোন বিষয়েও অনর্থক কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে না। কিন্তু তবুও এই রায়-চৌধুরীদের কথা উঠ্‌লেই ওর মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখা দেয়, এবং তা দেখা দেয় ওর নিজেরও অজ্ঞাতে।

রঞ্জনের কথার উত্তরে নন্দিনী প্রশ্ন করলে—বীণার বিয়ের কথা শুনলে কিছু? শুনছিলাম—নতুন কোন্ বিলাত-ফেরৎ ডেন্‌টিষ্ট্-এর সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে। খবরটা সত্যি নাকি?

বীণার নাম শোন নি?—রায়-চৌধুরীদের বাড়ীর মেয়ে বীণা? ইন্‌ষ্টিটিউট্ কিম্বা প্রেসিডেন্সী কলেজের রায় মশায়ের রেঁস্তরায় যারা বসে তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বুঝি? কলকাতার ছাত্র মহলে এমন কোন মডার্ণ ছেলে দেখি নি যে বীণা-চৌধুরীর নাম না জানে। তাদের প্রত্যেকের খাতায় ওর মোটরের নম্বর লেখা আছে। দিনে ক'বার ক'রে ও শাড়ী বদলায় তা তারা জানে। বীণা যে-দোকান থেকে জুতো তৈরী করায় তার কী অসম্ভব খদ্দের, একদিন গিয়ে দেখো। অনেকের ধারণা, বীণাকে যদি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় পাঠানো যেতো, তাহ'লে অন্য দেশের মেয়েরা লজ্জায় সে প্রতিযোগিতায় নাম্‌তোই না। এমনি বীণা।

নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জন বল্লে,—কৈ না, কিছু তো শুন্‌লাম না। মিসেস্ রায়-চৌধুরীর সঙ্গে ব'সে আলাপ করছিলাম,—চমৎকার লোক! আমাকে খুব যত্ন করেন। আমার কিন্তু মিঃ রায়-চৌধুরীকে আরও ভালো লাগে। জীবনে অমন লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া সৌভাগ্য মনে করি। জীবনে কত যে ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করেছেন, দুঃসাহসিক কাজে কতবার যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন, তার সংখ্যা হয় না। একেই তো বলি লাইফ্! কিন্তু ছেলেবেলায় উনি যখন মুঙ্গের-এর ইস্কুলে সুবোধ ছেলেটির মতো চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন তখন কে ভেবেছিল একদিন উনি এমনি ক'রে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াবেন! বাবা তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে ওঁর ছেলেবেলার কথা আমার কাছে গল্প ক'রে বল্‌তেন। মুঙ্গের স্কুলে বাবা আর মিঃ রায়-চৌধুরী একসঙ্গে পড়তেন কি না—দুজনে ভারী ভাব ছিল! তখন ওঁদের আর কতই বা বয়েস,—১৫।১৬র বেশী নয়। হঠাৎ একদিন সকাল থেকে মিঃ রায়-চৌধুরীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল? কোন সন্ধান নেই। কত খোঁজাখুঁজী—কোন সন্ধান নেই। ছ'মাস পরে জার্ম্মেনী থেকে চিঠি এলো—সেখানে পড়াশোনা আরম্ভ করেছেন; বেশ ভালো আছেন। তারপর চিঠি এলো নরওয়ে থেকে। বাড়ী-শুদ্ধ লোক অবাক। মিঃ রায় চৌধুরী বিশ বছর ধ'রে পৃথিবীর সমস্ত দেশ বেড়িয়েছেন; এ-জীবনে কত কী যে দেখেছেন; কত যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তার হিসেব হয় না। আশ্চর্য্য জীবন ওঁর। সেই সব কথা যখন গল্প ক'রে বলেন, তখন শুন্‌তে আমার এমনি ভালো লাগে! কলকাতার মধ্যে উনি এখন একজন নামজাদা লোক কিন্তু তবুও বাবার নাম করবামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিলেন,—স্বভাবটি ওঁর ভারী মিষ্টি!

এ-সব কথা নূতন নয়। পুনরাবৃত্তি শুনে শুনে ও-গুলি নন্দিনীর প্রায় মুখস্থ হয়েই গেছে। বল্লে—আজ কি আর আমাদের বাড়ী ফিরতে হবে না? রাত্তির যে ন'টা বাজে!

প্রকাণ্ড বাগানটায় ওরা দুটি প্রাণী ছাড়া তখন আর কেউ নেই। দুজনে ধীরে ধীরে বাগান পার হ'য়ে ট্রাম-লাইন ধ'রে চলতে লাগ্‌লো। সেদিনকার রিপন কলেজের সেই ছেলেটির বীরোচিত কার্য্যের পর রঞ্জন প্রত্যহ নন্দিনীকে

ওর বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার সময় রঞ্জন আক্ষেপ ক'রে বলে—তোমাকে দিয়ে একটু knight errantry ক'রে কাগজে ছবি ছাপিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করব—এ অবধি তার সুযোগই পেলাম না।

নন্দিনী বলে—হতাশ হোয়ো না। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে?

তারপর মৃদু-হেসে হাতের বইখানি ওর কাঁধের কাছে ঠেকিয়ে বলে—দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? বাড়ী ফেরো।

রঞ্জন যেন সজাগ হ'য়ে বলে—হ্যাঁ; যাই। চল্লাম; গুড্ নাইট্।

তারপর গলির শেষ পর্য্যন্ত যতক্ষণ আলো-ছায়ার পথে রঞ্জনের চলমান দেহটিকে দেখা যায় ততক্ষণ নন্দিনী সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পথের বাঁকে ও যখন অদৃশ্য হ'য়ে যায়, নন্দিনী দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক দিনই এমনি। প্রত্যেক দিন ওই সময়টিতে নন্দিনী নিজের অন্তরের মধ্যে কেমন-যেন একটি কোমল ক্ষীণতা অনুভব করে; আর রঞ্জন কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে যায়।

২৪শে মে মঙ্গলবার।

রঞ্জন এসে বল্লে—তোমাকে একটা খবর দেব, এবং একটা জিনিষ দেখাবো! কিন্তু বল, দেখে-শুনে রাগ করবে না?

—কী এমন জিনিষ আমায় দেখাবে, যা দেখে আমি রাগ করব?

—আছে কিছু। যে-কাজটি করেছি, সে-কাজে তোমার অনুমতি নিই নি ব'লে রাগ করবে না বা ক্ষুণ্ণ হবে না—এই কথা যদি দাও, তাহলে বলি।

—আমার অনুমতি না নিয়ে যদি এমন কোন অন্যায় কাজ ক'রেই থাকো—বেশ তো, না হয় একটু রাগ করলামই। ক্ষতি কি?

—না, তাহলে আমি বলব না।

হাসি চেপে পরম উদাসীনের মতো নন্দিনী বল্লে—বেশ, বোলো না।

মনে মনে ও জান্তো, যে-কথা বলবার জন্যে রঞ্জন ওর কাছে এসেছে, সে-কথা সে বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারবে না; তেমন ধাত-ই তার নয়।

—কিন্তু এ তোমার ভারী জবরদস্তি; মুখের ওপর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টেনে এনে নন্দিনী বল্লে—তুমি অন্যায় করবে আর আমি রাগ করতে পাবো না—ভবিষ্যতে সারা জীবন ধ'রে এমনি এক-তরফা জবরদস্তিই চল্‌বে নাকি?

রঞ্জন বল্লে—না না, সারা জীবন ধ'রে আমি অন্যায় করব না; আর সারা জীবন ধ'রে তোমাকে রাগ চেপে রাখতে হবে না। শুধু এই বারটির মতো কথা দাও, লক্ষ্মিটী!

—না, আগে থাকতে কথা দিলাম না। আগে দেখি। আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় কিছু সিরিয়াস্ ব্যাপার।

—সিরিয়াস্ ব্যাপার কিছুই নয়। দিন দিন কী মোটা বুদ্ধিই হচ্ছে তোমার! এই ত্যাখো।

এত সহজেই রঞ্জন হেরে গেল দেখে, নন্দিনী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো; তারপর রঞ্জনের হাত থেকে এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগলো।

ব্যাপারটা সত্যই বিশেষ কিছু নয়। এ-বছর ডার্‌বি-লটারির টিকিট কেনার ভারী ধুম গেছে, তা তো জানোই। রঞ্জনের বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই টিকিট কিনেছে। এ-বছরে জুবিলী ক্লাবের লটারি-টা অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, বন্ধুদের দেখাদেখি রঞ্জনও সেই ক্লাবের একখানা টিকিট কিনেছে—পাঁচ টাকা দিয়ে। এবং টিকিটের নম্-ডি প্লুম্ দিয়েছে—'নন্দিনী।' রঞ্জন সেই টিকিটখানি নন্দিনীকে দেখাতে এনেছে এবং ওর বিনা অনুমতিতে ওর নাম ব্যবহার করেছে ব'লে ও যেন কিছু মনে না করে, সেই কথা বলতে এসেছে।

টিকিটখানি দেখে মনে মনে নন্দিনী কী ভাবলে তা জানা গেল না; মুখে বল্লে—কেন তুমি আমার নাম দিলে? যদি না পাও, তখন আমায় অপয়া ব'লে গালাগালি দেবে তো?

—পাগল! লোকে তাদের ভগবানের নামে টিকিট কিনছে। টাকা না পেয়ে তারা ভগবানকে গাল দিচ্ছে নাকি? বন্ধুরা কত দেব-দেবীর নামে টিকিট কিন্‌লো; আমি কিনলাম—তোমার নামে। তোমার ছাড়া আর কোন নাম আমার মনেই এলো না। তোমার নাম দিয়ে টিকিট্ কিন্‌লাম—এই আমার আনন্দ। টাকা পাবো কি পাবো না সে কথা একবারো মনে হয় নি।

—ও; নিছক কবিত্ব! তা মন্দ নয়। কিন্তু এখানি আমার কাছেই থাক্‌লো।

—থাক্ না। নম্বর আমার মনে আছে; থ্রি, টু, ফাইভ্, নাইন্, থ্রি।

বৃহস্পতিবার, ২রা জুন।

রঞ্জন এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বল্লে- এই, ওঠ। চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

ওর পানে তাকিয়ে নন্দিনী দেখ্‌লে—রঞ্জন যেন আজ অতিশয় উত্তেজিত; চোখ-মুখ ওর উচ্ছসিত হ'য়ে উঠেছে। ওর কথায় এবং ব্যবহারে যেন কিসের আবেগ ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিনী বল্লে—ব্যাপার কি? আজই আমায় কিড্‌ন্যাপ্ করবে নাকি? তাহলে দাঁড়াও বাড়ীতে খবর দিয়ে আসি।

সে কথায় কান না দিয়ে রঞ্জন বল্লে—নাঃ, ভেবেছিলাম, খবরটা তোমায় শেষ-মুহূর্ত্তে দিয়ে আশ্চর্য্য ক'রে দেবো। কিন্তু আর না ব'লে থাক্‌তে পাচ্ছিনে। জান জুবিলী-ক্লাবের লটারিতে ফার্ষ্ট প্রাইজ আমার নামে উঠেছে!

—সত্যি?

—সত্যি। আমার একটি বন্ধু কাল রাত্রে আমায় খবর দিয়ে গেছে। কাল সারা রাত আমার ঘুম হয় নি—কত কী যে মনে হয়েছে! আজ খবর জান্‌তে জুবিলী-ক্লাবে একাই যাচ্ছিলাম; হঠাৎ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে হল। তোমার জন্তেই তো পেলাম! দুজনে একসঙ্গে গিয়ে দেখে আসি, চল। শুন্‌লাম নাকি, নাম টাঙিয়ে দিয়েছে।

নন্দিনী প্রথমটা বিশ্বাস করলে না। তারপর যখন বিশ্বাস হল, তখন দেখলে যতখানি আনন্দিত হওয়া ওর উচিৎ ছিল, ততখানি আনন্দিত ও বোধ করছে না। তবুও ও খুসী হল নিশ্চয়। ওর নামে টাকা উঠেছে—এই প্রচ্ছন্ন আত্মগৌরবেই ও খুসী হল।

চৌরঙ্গীর ওপর জুবিলীক্লাব। তার তিন তালায় আপিস। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলে, ভীড় কমেছে। ঘরের বাইরে বোর্ড-এর গায়ে বড় বড় অক্ষরে প্রথম পুরস্কার বিজেতার নাম, নম্বর এবং নম্-ডি-প্লুম্ লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রঞ্জন এবং নন্দিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিচিত প্রিয় নাম দুটীর পানে তাকিয়ে রৈল। তারপর রঞ্জন আপিস-ঘরে ঢুকে ক্লাবের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। খবর শুনে তিনি নিজে বেরিয়ে এলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক; শান্ত সৌম্য চেহারা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—Are you the Lucky Man? My Congratulations!

তারপর সুদীর্ঘকাল ধ'রে অনর্গল অনেক কথাই বল্লেন; —যার প্রথম অংশে ছিল আনন্দ-জ্ঞাপনের পুনরুক্তি, এবং শেষ অংশে ছিল, কেমন ক'রে ক্লাব থেকে টাকাটা নিতে হবে সে-সম্বন্ধে বহু তথ্য-পূর্ণ উপদেশ। রঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, ইনকাম-ট্যাক্‌স্ এবং ক্লাবের কমিশন্ বাদ দিয়ে তার টাকা দাঁড়াবে, দু'লক্ষের কিছু উপর।

রঞ্জন হেসে পাশের নন্দিনীকে দেখিয়ে বল্লে—This is The lady who has brought luck to me!

সাহেব তখন নন্দিনীর দিকে ফিরে এক গাল হেসে বল্লেন Is that so? My Congratulations to you, little lady; God bless you both with everlasting happiness!

নন্দিনী মুখ লাল ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে কোন-মতে বল্লে—Thank you!

বাইরে এসে ও অত্যন্ত রাগ করতে লাগ্‌লো:

—কী বল তো তুমি? একটুও লজ্জা নেই! ছি, ছি; লোকটার সামনে কী বেহায়া-পনাই করলে!

রঞ্জনের তখন ও-সব কথায় বিচলিত হবার মতো মনের

অবস্থা নয়; ও তখন যেন জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা-হাওয়ার মতোই এলোমেলো হ'য়ে উঠেছে:

—আজকে আমাকে তিরস্কার কোরো না, নন্দিন্! আজ এই মুহূর্ত্তে আমার কী ইচ্ছে করছে, জানো?

নন্দিনী তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—থাক্; যথেষ্ট হয়েছে! মনে রেখো, এটা চৌরঙ্গীর রাস্তা এবং আশে-পাশে লোকজন যাতায়াত করচে।

রঞ্জন বল্লে—শোন, এক কাজ করি। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে সোজা নরেন-দা'র বাড়ী গিয়ে ওর কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার নিই। আগে হ'লে দিতো না; এখন বিশ টাকা চাইলে চল্লিশ টাকা এনে দেবে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, টাকা নিয়ে নিউ-ইয়র্ক থেকে দুজনে দুটো স্কোয়াশ্ খেয়ে সোজা ময়দানের ভিতর দিয়ে আলিপুর পার হ'য়ে ডায়মণ্ড্ হারবার রোড্ দিয়ে মাইল কুড়ি-পঁচিশ ঘুরে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিই। লক্ষ্মিটী? রাজী তো?

—মোটেই না। ও-সব পাগ্লামী রেখে এখুনি আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে।

নন্দিনী যখন সত্যিকারের গম্ভীর হ'য়ে কথা বলে, তখন ওর কথার ওপর, রঞ্জন তো দূরের কথা, ওর বাড়ীর লোক অবধি কথা বলতে পারে না। রঞ্জন বল্লে—যাবে না। আচ্ছা, চল; তোমায় বাড়ী পৌঁছেই দিয়ে আসি।

বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে নন্দিনী রঞ্জনের গলার কাছে বাঁ-কাঁধের ওপর নিজের ডান্-হাত খানি রাখলে; (এই প্রথম ও এমনি ক'রে রঞ্জনের কাঁধে হাত রাখলে) তারপর অল্প একটু হেসে বল্লে—আমার ওপর রাগ করলে না কি?

রঞ্জন ধীরে ধীরে নিজের ডান-হাত খানি দিয়ে ওর হাত খানি ধ'রে নামিয়ে নিলে; নামিয়ে নিলে বটে, কিন্তু ছেড়ে দিলে না; ওর হাতের মধ্যেই নন্দিনীর হাত খানি ধরা রইল। নন্দিনী আবার একটু হাস্‌লে।

রঞ্জন বল্লে—তোমার ওপর রাগ করতে পারি, সে-ক্ষমতা তুমিই হরণ করেছো। কিন্তু কবে তোমার অভিভাবকদের কাছে আমার দাবী জানাতে আসবো, বল?

নন্দিনী হেসে বল্লে—সময়-মতো এলেই হবে। তার জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি?

রঞ্জন বল্লে—না, আমার তাড়াতাড়ি আছে। কাল্‌কে এসে এ-বিষয়ে ঠিক ক'রে ফেল্‌বো—কি বল?

নন্দিনী বল্লে—তোমার ইচ্ছে। কিন্তু হাত খানাকে তো আলাদা ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না; তাই আজকের মতো ওকে মুক্তি দাও।

রঞ্জন ধীরে ধীরে ওর হাত খানিকে নামিয়ে দিলে।

শনিবার, ৪ঠা জুন।

—জানো নন্দিন্, কাল সারা রাত আমি ঘুমুই নি;—সমস্ত রাত ধ'রে ভবিষ্যতের কত কী যে ছবি চোখের সুমুখে আনাগোনা করেছে! সারা রাত ধ'রে বার বার ভগবান-কে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আগে ভাবতাম, জগতে টাকার প্রয়োজন বুঝি গৌণ; এখন বুঝ্‌ছি আজকের আমার এত খানি সার্থকতা, লোকের কাছে এতখানি মান,—এ-সবই ওই অর্থের জন্যে। আজ সকালে একজন জমীর দালাল এসেছিল, তাকে এই-অঞ্চলে জায়গা ঠিক করতে ব'লে দিইছি। একজন মোটর-এর দালাল এসেছিল—কাল তার সঙ্গে গাড়ী দেখতে যাবো। আচ্ছা, কি গাড়ী কিন্‌বো বল দেখি? বল্‌তে পারছো না? হিল্‌ম্যান্ উইজার্ড্। চমৎকার গাড়ী। একটুও শব্দ হয় না। সে-গাড়ী থাক্‌বে শুধু তোমার ব্যবহারের জন্যে। নিজের জন্যে একখানা টু-সীটার কিনে নেব। বড় গাড়ী থানায় সন্ধ্যের সময় তোমাতে আমাতে বেড়াতে বেরবো। —খোলা মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ী ছুটবে সিক্‌সটি মাইল্‌স্ পার্ হাওয়ার্! মাথার ওপর চাঁদ আমাদের সঙ্গে ছুটবে; তারার দল ভীড় ক'রে আমাদের সঙ্গে ছুটবে। হাওয়ায় তোমার মাথার চুল এসে আমার মুখে পড়বে; আমার হাতের মধ্যে তোমার হাত-খানি থাক্‌বে ধরা। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন আমার সফল হবে। মার্ভ্‌লাস্, নয়?

রঞ্জনের এতখানি উচ্ছ্বাস আর-একজনের মনে কিন্তু এতটুকুও তরঙ্গ তুলছে না। ওর কল্পনা যত সুদূর-প্রসারী

হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে, নন্দিনীর কল্পনা যেন ততই নিস্তেজ ম্রিয়মান হ'য়ে আসছে। কীসের যেন অশুভ আশঙ্কা ওর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কাল সারা রাত্ত ও ঘুমোয় নি। কেবলই ওর মনে হয়েছে, রঞ্জনের এই আকস্মিক অর্থ-সৌভাগ্য ওর পক্ষে যেন কল্যাণকর হবে না। যে-রঞ্জন-কে ও এতদিন কল্পনা ক'রে আসছিল, কামনা ক'রে আসছিল, তাকে ও যেন আর খুঁজে পাচ্ছে না। যে-রঞ্জন মুগ্ধ কণ্ঠে ওকে আবৃত্তি ক'রে শোনাতো—

'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলীর গন্ধটুকু জানালার ধারে
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে;
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।—

কাল থেকে সে-রঞ্জন যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে; আর তার দেখা পাওয়া যাবে না কোন দিন।

নন্দিনী মৃদু-কণ্ঠে বল্লে—তাহলে পরীক্ষাটা দেবে না, ঠিক করলে?

—রাখো পরীক্ষা! কিসের জন্তে দেব? আমি তো আর দেড়শো টাকা মাইনের চাকরী করতে যাচ্ছিনে। ভাখো, আজ চল্লাম—রাত্রে বন্ধুদের খাওয়াবো বলে রেখেছি; তারা সব আমার জন্তে অপেক্ষা করছে। কাল বোধ হয় আসতে পারবো না; বড্ড লোকজন যাতায়াত করচে। যাক্ না ক'দিন কেটে তারপর we two shall have honey-moon, life-long!

রঞ্জন ক্ষিপ্র-পদে প্রস্থান করলে। নন্দিনী আজ বহুদিন পরে একা বাড়ী ফিরলো। একা-একা বাড়ী ফিরতে তার গা ছম-ছম করছে। কান্না পাচ্ছে যেন।

৫ই, ৬ই, ৭ই, ৮ই জুনের পর ৯ই তারিখে রঞ্জনকে আবার বালিগঞ্জ পার্কের সেই বেঞ্চিটিতে দেখা গেল।

নন্দিনী কোন প্রশ্নই করেনি; রঞ্জন নিজেই কৈফিয়ৎ দিতে লাগ্‌লো।

—এমনি মুস্কিলের মধ্যেই পড়লাম ক'দিন! উঃ, কী হাঙ্গাম! গোলমালের মধ্যে প'ড়ে তোমাকে ভুলে যাবার জোগাড় হয়েছিল আর কি! (নন্দিনীর হাসিটুকু ও দেখ্‌তে পেলে না) তোমার সঙ্গে শেষ-দেখা হওয়ার পরদিন গেলাম—গাড়ী আর জমী দেখতে। তারপর দিন সমস্ত দিন গেল টাকা তোলা এবং ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার হাঙ্গামায়! পরশুদিন মিসেস রায় চৌধুরী বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন—ওঁর ওখানেই সমস্ত বিকেল এবং সন্ধ্যাটা কাট্‌লো। কাল আসবো ভেবেছিলাম—কিন্তু কাল সমস্ত দিন বাড়ীতে stream of visitors! একটুও সময় পেলাম না।

নন্দিনী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—রায় চৌধুরীদের বাড়ীতে বুঝি কোন কাজ-কর্ম্ম ছিল, তাই ওঁরা তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বুঝি?

—না, না। স্পেশালী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—খালি আমাকেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ যায় নি। কিন্তু যাই বল, ভারী চমৎকার লোক ওঁরা। মিসেস রায়-চৌধুরী বলছিলেন, 'মনে কোরো না, রঞ্জন, আজ তুমি হঠাৎ বড় লোক হয়েছো ব'লেই তোমাকে আমরা যত্ন করছি।' বল্লাম, 'আজ্ঞে না। আপনারা আমায় চিরদিন স্নেহ করেন, সে কি আমি জানিনে।' সত্যিই সেই প্রথম দিনটি থেকে ওঁরা আমায় আপনার-মতো ক'রে দেখছেন।

অনেকক্ষণ থেকে কথাটা বল্‌বে ঠিক ক'রেও নন্দিনী কিছুতেই তাকে প্রকাশ করতে পারছিল না; লজ্জায় বাধ ছিল। কিন্তু এইবার তাকে বলতেই হল, কারণ ও অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছে, লজ্জা করবার ওর সময় নেই। বল্লে—কবে আসছো আমাদের বাড়ী?

—তোমাদের বাড়ী? কেন বল তো? ও, হাঁ হাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। যাব, নিশ্চয় যাব। এই, আজ-কালের মধ্যেই যাব। চল, রাত্তির হ'য়ে গেছে, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

৭ই জুন মঙ্গলবার, অর্থাৎ যে-তারিখে রঞ্জন রায়-চৌধুরীদের বাড়ী নিমন্ত্রণ গিছলো, সেদিনের সব কথা বলা

হয় নি। রঞ্জন নন্দিনীকে বাড়ী পৌঁছে দিক, সেই অবসরে সেদিনের কথাটুকু তোমায় ব'লে নি।

মিসেস রায়-চৌধুরী সুমুখে-উপবিষ্টা মহিলাটিকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন—মাসীমা! এই-ই হচ্ছে রঞ্জন। ভারী ভালো ছেলেটি। রঞ্জন, ইনি হচ্ছেন আমাদের মাসীমা; মিসেস সরসী দত্তর নাম শুনেছো তো? —ইনিই। হাঁ, প্রণাম কর।

শুধু রঞ্জন কেন, মিসেস সরসী দত্তর নাম কে না জানে? অভিজাত-সমাজে তাঁর মতো অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহিমান্বিতা মহিলা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি প্রসন্ন হ'লে মিলনেচ্ছু তরুণ-তরুণীরা জগতে আর-কারুর সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে না।

মিসেস দত্ত বল্লেন—ও, তুমিই রঞ্জন! বেঁচে থাকো; দীর্ঘজীবী হও। বউমা তো তোমার কথা বলতে অজ্ঞান; —দেখ্‌ছি, এরা সকলেই তোমায় ভারী ভালোবাসে। প্রার্থনা করি, এদের ভালোবাসার যোগ্য হও তুমি। মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া সহজ নয়, রঞ্জন; অনেক তপস্যায় মেলে। একটা কথা তোমায় ব'লে রেখে দিই। এখন, যখন তোমায় নিজেই সব কাজ দেখ্‌তে শুনতে হবে, তখন প্রত্যেকটি কাজ খুব ভেবে চিন্তে করবে। তাড়াতাড়ি ক'রে বিনা বিচারে কখনো কোন কাজ ক'রে বোসো না, এবং সাময়িক উত্তেজনা বা মোহের বশে কোন দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে বেশীদূর এগিও না। দেখ্‌ছি তোমার এখন সৎ-পরামর্শের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার যতটুকু ক্ষমতা, সে-সবটুকু তুমি পাবে—যখনই চাইবে তখনই পাবে। কখনো যদি প্রয়োজন বোধ কর, দ্বিধা করো না, সোজা আমার কাছে চ'লে যাবে। আমার বাড়ী জানো তো? আচ্ছা।

এমন উপদেশ পূর্ণ মিষ্টি-কথা রঞ্জন জীবনে কখনো শোনে নি; সে গদগদ হ'য়ে গেছে। আর একবার মিসেস দত্তকে প্রণাম ক'রে বল্লে—যে আজ্ঞে। আপনার উপদেশ আমি কখনো ভুলবো না। আমি আপনার কাছে যাব—কালই যাব। অনেক কথা আপনার কাছে বলবার এবং জানবার আছে।

মিসেস দত্ত বীণার মায়ের দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্‌লেন, তারপর রঞ্জনকে বল্লেন—যেও। কাল দুপুরে আমি ফ্রী আছি।

চা-খাওয়ার পর রঞ্জন বিদায় নিতে চাইলে। তার অত্যন্ত মাথা ধরেছে। বাড়ী গিয়ে সে বিশ্রাম করবে।

এমন সময় বীণা এসে ঘরে ঢুকলো। রঞ্জন-কে নমস্কার ক'রে মৃদু হেসে বল্লে—আপনি ভালো আছেন?

রঞ্জন তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করে বল্লে—হাঁ। আপনি ভালো?

বীণা ঘাড় নেড়ে জানালে—হাঁ।

বীণার রূপশ্রীর মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। তার ওপর আজকের প্রসাধনের পারিপাট্য সে-আকর্ষণ-কে যেন দুর্নিবার ক'রে তুলেছে। রঞ্জন চট্‌ ক'রে বীণার দেহের ওপর থেকে ওর চোখ সরিয়ে নিতে পারলে না।

মিসেস দত্ত বল্লেন—বীণা, তুমি কি বেড়াতে বেরুচ্ছো?

বীণা বল্লে—হাঁ। কিছু বলবেন?

মিসেস দত্ত তখন রঞ্জনকে বল্লেন—রঞ্জন, তোমার মাথা ধরেছে বলছিলে না? যাও না, বীণার সঙ্গে খানিক মোটরে ঘুরে এসো—মাথা ছেড়ে যাবে'খন। Fresh air will do you a lot of good!

বীণার বীণা-নিন্দিত কণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—আসুন না!

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত খোলা মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ী ছুটেছিল—সিক্‌স্‌টি মাইল্‌স্‌ পার হাওয়ার! মাথার ওপর চাঁদ ওদের সঙ্গে ছুটেছিল; তারার দল ভীড় ক'রে ওদের সঙ্গে ছুটেছিল। হাওয়ায় একজনের চূর্ণ-কুন্তল এসে আর-একজনের মুখে পড়েছিল; একজনের হাতখানি আর একজনের হাতের মধ্যে ছিল ধরা! একজনের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন বুঝি সফল হয়েছিল! মার্ভ্‌লাস্‌, নয়?

গেটের কাছে এসে রঞ্জন বল্লে—আজ তোমাকে ভারী শ্রান্ত দেখাচ্ছে। কেন বলতো?

নন্দিনী বল্লে—না ভালোই আছি।

তার বেশী কথা ও বলতে পারলে না। ওর চোখে কী যেন পড়েছে। তাই নিয়েই ও বিব্রত হ'য়ে উঠেছে।

সেদিন বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি আগেকার দিনের মতো আর আবেশ-ময় হ'য়ে উঠ্‌লো না; আকাশে মেঘ করছে ব'লে রঞ্জন তাড়াতাড়ি ফিরলো।

তারপর—

কয়েকদিন আগে বাঙ্‌লা-দেশের নানা স্থানে যে ঝড়ের প্রাদুর্ভাব দেখা গিছলো, রঞ্জনের জীবনে যেন সেই ঝড়ের বেগ এসে লেগেছে; অর্থাৎ ওর দিনগুলো যেন ঝড়ের মতো ক্ষিপ্র বেগে ব'য়ে যাচ্ছে—একটির পর একটি। এমনি তাদের দ্রুতগতি যে তাদের সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব হবে না,—শুধু পর পর ক'দিন ধ'রে রঞ্জন যে-যে নিমন্ত্রণগুলি রক্ষা করেছিল তাদের এবং নিমন্ত্রণ-বাড়ীর অতিথিবৃন্দের নামের তালিকা দিয়ে দিলাম। তার বেশী বলার প্রয়োজনও বোধ করি হবে না। সে-ক'দিন রঞ্জন নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। মধ্যে, তাকে একখানা ছোট চিঠিতে জানিয়েছিল, আস্‌ছে বুধবার ২৯শে জুন বিকেল-বেলা ও নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করবে।

১২ই জুন, রবিবার। রায়-চৌধুরীদের বাড়ী ডিনার-পার্টি। অতিথিগণ—মিসেস দত্ত; রমলা দেবী; (ইনি মিসেস দত্তর আত্মীয়া) রেণু আর ললিতা; (এরা বীণার ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌) এবং রঞ্জন।

১৫ই জুন, বুধবার। মিসেস দত্তর বাড়ী টি-পার্টি। অতিথিবৃন্দ—মিসেস রায়-চৌধুরী; ওঁদের বাড়ীর আরও দুজন মহিলা; বীণা এবং রঞ্জন।

১৮ই জুন, শনিবার। রমলা দেবীর বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজন। অতিথিগণ—মিসেস দত্ত, মিসেস রায়-চৌধুরী, রমেন (রমেন রেণুর দাদা; ওর সঙ্গে ললিতার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে এবং ওর সঙ্গে রঞ্জনের খুব আলাপ হয়েছে); ললিতা; ললিতার দাদা হিরণ (মিসেস দত্তর এই ছেলেটির প্রতি লক্ষ্য আছে, এবং রেণুর মাকে তিনি আশ্বাস দিয়ে নিশ্চিন্ত করেছেন); বীণা এবং রঞ্জন।

২৬শে জুন, রবিবার। রেণুর জন্মদিনের প্রীতি-ভোজন। অতিথিগণ—হিরণ, ললিতা, বীণা এবং রঞ্জন।

উপরোক্ত প্রীতি-সম্মেলনগুলি যে সাতিশয় ফল-প্রসূ হয়েছিল তা বোধ করি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

২৯শে জুন, বুধবার। সন্ধ্যা, সাতটা চল্লিশ মিনিট।

ছবির পর্দায় লরেন্স্‌ টিবেট্‌ তখন গান গাইছে—you are the one and only girl for me!

বক্সের কোণে ব'সে বীণার পিঠের কাছে কানের নীচে মুখ রেখে রঞ্জন বলছে—তুমি আমায় বিশ্বাস কর, বীণা; এ পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়া আর-কাউকে এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিনি। যাদের কথা শুনে তুমি অভিমান করছ, কোনও দিনও তাদের যথার্থ ভালোবাসিনি। তারা অত্যন্ত সাধারণ অত্যন্ত কমন্‌; আমার ভালোবাসা তাদের জন্যে নয়। এ-জীবনে এই প্রথম একমাত্র তোমাকেই সত্যিকারের ভালোবাস্‌লাম। বীণা, আমায় বিশ্বাস কর; অমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

এই স্বীকারুক্তির পর বীণা আর মুখ ফিরিয়ে থাকে নি। এবং তারপর বীণার চোখের পানে চেয়ে রঞ্জন-ও আর সম্মতির অপেক্ষা রাখে নি,—বিশেষ, ব্যবধান যখন ছিল না বল্লেই হয়!

পার্কের কোনে নন্দিনী প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছে। মনে মনে ও অধীর হ'য়ে উঠেছে। এত দেরী? এত দেরী তো রঞ্জনের কখনো হয় না। চিঠিখানা ও আর-একবার পড়লে,—হ্যাঁ আজকের দিনের কথাই তো লেখা আছে। তবে? কিন্তু দেরী হওয়া কী অসম্ভব? দেরী তো হ'তেই পারে। তাঁর এখন কত কাজ! সে কী আর আগেকার মতো আছে। এই এলো ব'লে। দেরী ক'রে আসছে ব'লে নন্দিনী কি তার ওপর অভিমান করবে? মোটেই না। তার সব কথা ও হাসিমুখে শুন্‌বে—কত কাজ-কর্ম্মের কথা! আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ও এখানে ব'সে রঞ্জনের সঙ্গে গল্প করবে। রাত ক'রে ফেরার দরুণ বাড়ীতে হয়ত বকুনি শুনবে। তা শুনুক্‌, আর, দু'একদিন বৈত নয়! কিন্তু রাত বোধ হয় অনেক হ'ল। কত বাজ্‌লো? (রিষ্ট-ওয়াচ-বাঁধা ডান হাতখানা ও চোখের কাছে তুলে ধরলে) সাতটা পঁয়তাল্লিশ! ঘড়ি দেখ্‌তে গিয়ে ওর ডান-চোখটা কী কাঁপলো? না, ও কিছু নয়। রাত্তির এত বেশী কখনো হয় নি—ঘড়িটা ওর ফাষ্ট যাচ্ছে নিশ্চয়। নন্দিনী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। সে আসছে। সে এলো ব'লে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাল্যদান

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

হে কবি, তোমার পূজা বেদী যবে
উঠিল ভরি
কত বন্দন-গীতিকা-মুখর
ছন্দে, মরি !
ভাবিলাম দূরে দাঁড়ায়ে হেরিব
আপন জীবন ধন্য করিব ;
পুলকে গর্ব্বে ভরিল বক্ষ
একথা স্মরি—
আমার কবিরে বন্দনা করে
জগৎ ভরি।

চারিদিকে চাই, এ কী অপরূপ
দৃশ্য এ কি !
ওগো কবি, আজি নয়ন ফেরেনা
তোমারে দেখি।
কীর্ত্তি তোমার ধরিত্রীময়
বিশ্বহৃদয় করিয়াছ জয় !
ধরণী যাঁহার ছিল পথ চাহি,
তুমিই সে কি ?
ওগো কবি, আজ নয়ন ফেরেনা
তোমারে দেখি।

প্রিয়া কহে, 'তবে সোজা চলে যাও
সভার তলে
'ফুলের মালাটি পরাইয়ে এস
কবির গলে।'
সারাবেলা ধরি সযতনে প্রিয়া
গেঁথেছে মালাটি পরাণ ঢালিয়া,
সার্থক হবে যদি ওঠে তাহা
কবির গলে ;
মহা-উৎসাহে পঁহুছিনু এসে
সভার তলে।

মনে পড়ে গেল কত বিরহের
বাদল রাতে
তোমার কবিতা বসিয়ে পড়েছি
অশ্রু সাথে।
কত সুখহীন প্রবাস মাঝারে
কত সীমাহীন গভীর আঁধারে
তুমি বিলায়েছ নন্দন সুধা
মুক্ত হাতে ;
তোমার কবিতা বসিয়ে পড়েছি
অশ্রু সাথে।

তব ঋণভার বাড়ে অনিবার
নিত্য মম,
তোমার কবিতা ঘুচায় নিয়ত
চিত্ততমঃ।
রুদ্রেরে ভালো বাসিতে শিখালে
আঘাতের ভয় তুমিই ঘুচালে ;
গলিত-অনৃত-পঙ্ক ভেদিয়া
পদ্ম সম
সত্য শিবের সুন্দর গীতি
কী অনুপম !

মানব হৃদয়ে হেন ভাব নাই
যাহার ছায়া
তোমার কবিতা সুধার আঁখরে
দেয়নি কায়া।
হেন রূপ নাই, হেন রস নাই
গন্ধবরণ অনুভূতি নাই,
আকাঙ্ক্ষা আশা নাহি পরিণতি
মমতা, মায়া
মরণ-হরণ লেখনী তোমার
দেয়নি কায়া !

ভাবি এইবার দিতে হবে মালা
কবির গলে ;
দেখিনু তখন উৎসাহ যত
গিয়াছে চলে।
চলিতে আমার চলেনা চরণ
সরমে জড়ায় দুইটি নয়ন,
'দেবার মতন কী আছে তোমার ?'
সবাই বলে।
মালাটি আমার দেওয়া হ'ল নাক'
কবির গলে।

ঘরে ফিরে এনু কপালে পরিয়ে
লাজের টীকা
হ'ল নাক বলা চিত্তপটে মম
যা ছিল লিখা।
তথাপি জানিনু প্রীতি-নিবেদন
ছুঁয়ে গেল মোর কবি-শ্রীচরণ,
ভাবিলাম এই সার্থক হ'ল
প্রণয় শিখা
আমি ফিরে এনু কপালে পরিয়ে
জয়ের টীকা।

মালা হাতে দেখি প্রিয়া কহে—'সে কি,
দাওনি মালা ?
'ব'লে দিনু এত, সে সকল ঘৃত
ভস্মে ঢালা !
'লাজভরে বুঝি সরিয়া রহিলে
'কয়েছিনু যাহা কিছু না কহিলে ?
'কবি সভা মাঝে তুমি গেয়ে এলে
নিঝুম পালা !
'বৃথা হয়ে গেল সযতনে মোর
গাঁথা এ মালা।'

আমি কহি, 'সখি, কহ যে তুমি কি,
বৃথা এ মালা !
'বহু-সঞ্চিত কবি-আরতির
গন্ধ-ঢালা।
'আজিকে বুঝেছি কবির আসন
'এড়ায়ে আসিয়ে সভার শাসন
'ধন্য করিল কুটীর মোদের
দেখ গো বালা !
'দেবতা রাজেন যেথায় ভকতি-
-পূজার ডালা।

'কবিরে পূজিতে নাইবা গেলাম
সভার মাঝে
'জগতের সেরা কবিতার হেথা
আসন রাজে।
'ও মূরতি তব হেরি বার বার
'হৃদি মাঝে মম ওঠে ঝঙ্কার
'তোমারে আমার কবি সাজায়েছে
মোহন সাজে
'কবি-বন্দন ধ্বনিছে তোমার
মূর্ত্তি মাঝে !

'এই রূপ রস বিরহ মিলন,
এই যে ধরা
'উদার আকাশ নব যৌবন
আকুল করা
'কবির ছোঁয়ানো পরশ পাথরে
'সোনা হয়ে গেছে বহিরন্তরে ;—
'তোমার মাঝারে জগৎ মাঝারে
দিয়েছে ধরা—
'আমাদের কবি আমাদের রবি
তিমির হরা।

'রাঙায়ে দিয়েছে হাসিটি তোমার
কবির তুলি
'তব আঁখি জল,—মুক্তার ফল—
কবির বুলি।
'তব গতিছাঁদে ছন্দ যে বাজে
'সে যে ধরা দেয় কবিতার মাঝে
'তব সুকোমল কনকাঙ্গুলি,
যেওনা ভুলি,
'সেও ত এঁকেছে অনুরাগ ভরে
কবির তুলি।

'অতএব এই মালাখানি দিনু
তোমার গলে
'মিথ্যা কহি নি, কবিপূজা সখি,
এরেই বলে।'
মালাটি পরানু কণ্ঠে তাহার
সে কহিল হেসে—"শুন টীকাকার
"ব্যাখ্যা করেছ অতি অদ্ভুত,
পরাণ গলে !
"তাই ফিরে দিনু মালাটি আবার
তোমার গলে।"

সুধাংশুকুমার হালদার



অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪

একবার রাসের সময় দাদা ও আমি বাবার সঙ্গে দেশে গিয়েছিলাম। দেশে গিয়ে আমরা প্রথমে বাড়ীময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি যাত্রা বস্‌তে তখনো খানিকটা দেরী। আমরা রাশমঞ্চের পিছনে ছায়ায় ঘেরা বাগানটিতে চলে গেলাম, এই জায়গাটি আমাদের বড় ভাল লাগতো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু রোদ এসে মাটিতে লাগে, লোকজন নেই চারদিক্‌ গভীর শান্তিতে ভরা কি একটা ভাব যেন সেখানে মাখানো। বাগানের ধারেই পুকুর। এই বাগানের শেষ প্রান্তে ছোট ঠান্‌দির মাটীর ছোট্ট ঘরটি, সামনের খানিকটা জায়গা লেপে পরিষ্কার করে রেখেছে—ঠিক যেন একটি ছবি—পিছনে ঘন বাঁশবন। আমরা নারকোল গাছের তলায় বস্‌লাম। একটু পরেই যাত্রা বসলো আমরা গিয়ে আসরে বস্‌লাম। আমাদের বাড়ীতে আগে 'কেষ্ট' যাত্রা হোত। দাদা বলতো 'একি যাত্রা যুদ্ধ নেই কিচ্ছু নেই।' দাদা যাত্রা থিয়েটার দেখ্‌তে চাইতোনা স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে। দেশে যদি রাশের সময় আসতো তাহলে একটু আধটু দেখ্‌তো। আবার যখন জুড়ি উঠ্‌তো তখন আমাদের ভারি রাগ হোত। জুড়ি উঠ্‌লেই "আমি ততক্ষণ ঘুমোই ওরা থাম্‌লে আমায় উঠিয়ে দিস।' বলে দাদা আমার কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌তো। আর আমি বিরক্তির সঙ্গে জুড়িদের অঙ্গভঙ্গি দেখতাম। জুড়ি থেমে গেলেও আমি দাদাকে ওঠাতে পারতাম না মনে হোত একটু ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না। ছোট থেকে দাদার স্বপ্নছিল—স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবে। একটু বড় হবার পর থেকেই আমাদের এই নিয়ে আলোচনা হোত। একদিন আমি বলেছিলাম মানুষের যে মৃত্যু ভয় তা বেশীর ভাগই যা'দের চল্লিশ্‌ পার হ'য়েছে তাদের বেশী রকম। দিদি বল্লে 'কথ্‌নোনা।' আমি বল্লুম' তোমায় মান্‌তেই হবে, আমি কারণ দেখাচ্ছি। চল্লিশ পার হ'লে মানুষের রক্তের তেজ কমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে এইবার আমাকে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে, তখন ভয় আসে যৌবনের উদার মন ছোট হয়ে যায় যৌবনের ফেলে দেওয়া সংস্কার আবার কুড়িয়ে আনে, যেটুকু অবহেলা আগে করেছিল এখন তা সুদ শুদ্ধু পুষিয়ে নেয়। আর এই যে বুড় হবার পর সব বেশী করে ভগবানের নাম করে এটা কি জান? এটা অন্যমনস্ক হবার জন্যে। মৃত্যুভয় আসার সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের পাপ পুণ্য সব থলি ঝেড়ে বা'র করে সেগুলো দেখে আর মরণের কথা বেশী করে তা'র মনে চেপে বসে। দাদা বল্লে "বেশিদিন বাঁচা ভাল না। আমি চল্লিশ বছরের বেশি কিছুতেই বাঁচবোনা ওর চেয়ে কমও হ'তে পারে।" আমি বলেছিলাম "হ্যাঁ আমারো তাই মত, জীবনের সুখদুঃখ তিলে তিলে ভোগ করে যখন দেখব মনের ভিতর কিছু একটা আসন পাতবার জোগাড় করছে তখনি হাসিমুখে বিদায় নেওয়া উচিত। আমারও বেশিদিন বাঁচতে ইচ্ছে হয়না খুব জোর তিরিশ। কিন্তু দাদা, যারা জগতের উপকারে আসে তাদের বাঁচা দরকার, তারা অসময়ে গেলে বড় ক্ষতি হয়।" দাদা বলেছিল 'না, তাদেরও থাকা উচিত নয়। ক্ষতি হবে কেন, যে চলে যাবে তারপর আর একজন এসে তার চেয়ে কত ভাল কাজ করবে।' আমি বল্লুম 'আচ্ছা দাদা তোমার কোন্‌ সময়ে মরতে ভাল লাগে।' দাদা বল্লে 'জ্যোৎস্না রাত হ'বে, একটা ছোট পান্‌সি নিয়ে নদীর বুকে ভাসতে থাক্‌ব আর সঙ্গে একটা রিভলভার থাকবে এক, দুই, তিন, পর পর তিনটে গুলি বুকে মারব বাস্‌!

তারপর সব চুপ।' আমি বল্লুম 'হ্যাঁ জ্যোৎস্না রাতে মরা বেশ ভাল। আমার ইচ্ছে হয়, নদীর তীরে লতাপাতায় ঘেরা ছোট্ট একটা কুটীর থাকবে সেইখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকব। নদীর ওপারে সূর্য্য অস্ত যাবে, খেয়া ঘাটের নৌকো ঘাটে ফিরে আসবে, রাখালেরা ঘরে ফেরার মুখে বেলাশেষের গান গাইবে,- সন্ধ্যা নামবে—দুর হ'তে বাঁশীর সুর কাণে এসে বাজবে। নদীর তীর আর সন্ধ্যা আমার মৃত্যুর সময় থাকা চাইই।

ছোট্ট নদীর তীরে
এমনি সাঁঝের বেলা
মরণ বরণ করবো আমি
সাজিয়ে ফুলের ডালা।

৫

একদিন কথায় কথায় কে কাকে বেশী ভালবাসে সেই কথা উঠ্‌ল। আমি বল্লুম 'আমি তোমায় সব চেয়ে বেশী ভালবাসি, সবচেয়ে!' তারপর কি কি কথা হ'য়েছিল তা এখন আর মনে নেই খানিক পরে হঠাৎ দাদা বল্লে 'আমি তোকে ফেলে রেখে কোথাও যাব না খুব বড় বিপদে পড়লেও তোকে ফেলে পালাবো না।' কেন যে একথা বল্লে তা আমি এখন পর্য্যন্ত ভেবে পাইনি। তখন আমি বল্লুম 'আমিও তোমায় ফেলে পালাবো না।' আমার এই কথা বলবার একটু পরেই সামনে দেখলাম এক সাপ! সাপটা পথ জুড়ে রয়েছে। দুজনের ভারি ভয় হোল দাদা বল্লে 'পথ একটু ছাড়া পেলে তুই আগে যাস্, পিছনে থাক্‌লে তোকে কামড়াবে।' আমি বল্লুম 'না তুমি আগে যাবে তা না হলে তোমায় কামড়াবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু সুযোগ মিলল, আমি পথ পেয়েই পিছনে আর না চেয়ে ছুটে দিলাম একটু দূরে গিয়ে পেছনে চেয়ে দেখলাম দাদা আসতে পারেনি। খানিক পরে সাপটা চলে গেলে দাদা আমার কাছে এসে বল্লে 'তুই তো বেশ, একবার পেছন ফিরেও চাইলি না!' আমি বুঝ্‌তে পারলুম কতবড় স্বার্থপরতার কাজ হয়েছে। ভারি লজ্জা হোল, নিজের উপর রাগ এল। দাদা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল সেইজন্যে বল্লে 'তুই ছেলেমানুষ কিনা তাই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়েছিলি, বড় হ'লে কি আর এরকম করবি।' অন্য সময় হ'লে দাদা যদি আমায় ছেলেমানুষ বল্‌তো তবে আমি তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বল্‌তুম 'ইস্ আমি ছেলেমানুষ বই কি নিজে মোটে তো আমার চেয়ে দুবছরের বড় আবার আমায় বলে ছেলে মানুষ!' কিন্তু এখন আমার আর প্রতিবাদ করবার মত ক্ষমতা ছিলনা।

* * *

ছোটদি, আমি, আর দাদা তিনজনে আমরা বলতুম্ আমরা বিয়ে করবোনা কখনো। দাদা যখন খুব ছোট তখন যদি কেউ বলতো খোকাবাবুর বিয়ে হ'বে রাঙা বৌ আসবে, তাহ'লে দাদা ক্ষেপে আগুন হোত। আমরা কখন বলতুম না যে দাদার বিয়ে হ'বে। বাবা বলতেন 'অচুর বিয়ে আমি দেবো না, ও যদি মানুষ হ'তে পারে তবে দেশের কাজ করবে।' তারপর দাদা যখন বড় হোল তখন বাবা বলেছিলেন 'যদি অচুর ইচ্ছে হয়, তাহলে বিয়ে করবে আমি ওকে বিয়ে করতে বল্‌বোনা, তোমরাও কেউ ওর বিয়ে দেবার জন্যে জোর কোর না, ইচ্ছে হ'লে করবে।' দাদার ছোট বেলা থেকে বড় অবধি বিবাহের উপর ঘোর বিতৃষ্ণা ছিল। আমিও বিবাহের বিরোধী ছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল আমরা দুজনে বিয়ে না করে দেশের কাজ করবো। দাদাকেও বলতুম 'দাদা তুমি বিয়ে কোরনা, বিয়ে করলে মানুষ সংসারে জড়িয়ে পড়ে কোন কাজই আর তেমন ভাল করে করতে পারে না।' দিদি তর্ক করে বল্লে 'কেন সি, আর, দাশ, মহাত্মা এঁরা কি কাজ করেননি।' দাদা বল্লে 'করবেন না কেন, কিন্তু বিয়ে না করলে আরো বেশী কাজ এঁদের দিয়ে পাওয়া যেতো।'

৬

মামার বাড়ীতে একদিন মা দাদাকে কিসের জন্যে বকতে বকতে বল্লেন 'যা তুই আমার বাবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।' বল্‌বামাত্র দাদা তক্ষুনি সটান্ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তখন রাত আটটা ন'টা হবে। দিদিমা মা'কে খুব বকতে লাগলেন 'মেজ মামা, ছোট মামা, আমার বাড়ীর

পুরানো ঝি দাদাকে খুঁজে নিয়ে আস্তে গেল। অনেকক্ষণ পরে দাদাকে নিয়ে এল। দাদাকে জিজ্ঞেস করলুম 'কতদূর গিয়েছিলে দাদা'। দাদা বল্লে 'নারকোলডাঙার পোল অবধি গিয়েছি এমন সময় ঝি গিয়ে আমায় ধরেছে। একটুখানি চুপ করে থেকে দাদা আবার বল্লে 'তুই বেড়াতে যাবি আমার সঙ্গে?' আমি বল্লাম 'কোথায় যাব?' দাদা বল্লে 'রাস্তায়, রাস্তায়, কিন্তু লুকিয়ে যেতে হবে।' একদিন ভোর বেলা সুযোগ মিলে গেল। কোন্ চাকর উঠে বাহিরে গিয়েছিল, দরজা খোলাছিল। তখনো বাড়ীর কেউ ওঠেনি কেবল আমরা দুজনে উঠেছিলাম। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, কেউ জান্তেও পারলোনা। বড় রাস্তায় তখন গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়নি। একবার এরাস্তা একবার ওরাস্তায় ছুটে ছুটে চল্লাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল বাড়ীতে খোঁজ পড়বার আগেই ফিরে যাব তা'হলে কেউ টের পাবে না আর আমরা রোজ সকালে বেড়াতে আসবো। খানিক পরে আমি বল্লুম 'দাদা এইবার ফিরে চল বড্ড বেলা হ'য়েছে।' ফির্তে গিয়ে দেখি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। পথ খুঁজতে খুঁজতে বেলা বেড়ে যেতে লাগল। আমি ভয়ে ও ঘোরাতে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কাঁদকাঁদ হ'য়ে বল্লুম 'দাদা, তুমি আমায় কোথায় আন্লে? ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করোনা বরফ-কলের রাস্তা কোনদিকে।' দাদা জিজ্ঞেস করলে না একটা গলিতে ঢুকে বল্লে 'আয় দেখি এই গলিটা কোন্দিকে গেছে দেখি।' আমরা সেই গলির ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ ঠিক রাস্তা পেলুম। বাড়ী ঢুকছি, সামনেই মেজ মামা পড়লেন, আমাদের দেখে বল্লেন 'কোথায় তোরা গিয়েছিলিরে?' দাদা কোন কথা না বলে ছুটে পালিয়ে গেল, আমিও দাদার অনুসরণ করলাম।

৭

ছোটবেলায় আমি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা করিনি, কিন্তু দাদার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় আমার শৈশব কৈশোর ও যৌবনের কয়েক দিন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেছে। যশোলক্ষ্মীর নির্ম্মাল্য-প্রাপ্ত কোন লোকের কথা শুন্লে মনে হোত আমার ভাইও বড় হ'য়ে একদিন ওঁদেরি সঙ্গে একাসনে বসবে। কোন কৃতী ছেলের কাগজে ছবি দেখলে ভাবতুম একদিন দাদারও ছবি এইরকম ভাবে বেরোবে। দাদা যত বড় হ'তে লাগল ততই দিন দিন তার প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়্ছিল। অত অল্প বয়সে অত প্রশংসা খুব কম ছেলের ভাগ্যে জোটে, শুধু যে লেখা পড়ায় ভাল হচ্ছিল বলে সকলে সুখ্যাতি করছিল তা নয়, দাদার সৌম্য শান্ত ভাবে ডায়মণ্ডহারবারের ও অন্য জায়গার লোক দাদাকে ভালবাস্তো। যে দাদার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কয়েছে সে-ই দাদার নম্রতার সুখ্যাতি কর্তো। যে সব ছেলের দাদার উপর ভেতরে হিংসে ছিল তা'রা প্রথম প্রথম দাদাকে আঘাত দেবার চেষ্টা করতো, কিন্তু দাদা কিছু বলতো না বলে তারাও শেষে আর কিছু বলতো না। দাদা খুব ভাবপ্রবণ ছিল বটে কিন্তু কোন সময়ে, কোন কাজে কি ভাবে কখনও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্তোনা। নিজের মনকে সংযত করবার শক্তি দাদার অসাধারণ ছিল, শুধু রাগ হ'লে নিজেকে সামলাতে পারতোনা। দাদার কোন কোন বিষয়ে বেশ একটু জেদ্ ছিল। পড়াশোনার উপরই বেশী ছিল।

দাদার সুখ্যাতিতে পাছে আমার মনে কোন রকম অহঙ্কার আসে এই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাক্তুম। কি জানি যদি আমার মনে অহঙ্কার এলে তার কোন অমঙ্গল হয়। কখনো যদি একটু গর্ব্বের ভাব এসেছে তখুনি প্রাণপণে সে গর্ব্বকে দূর কর্তাম। বাইরের ছেলের সঙ্গে দাদা খুব অল্প মিশতো, নিজের পড়া করে যেটুকু সময় পেত আমাদের সঙ্গে বাড়ীতে মার্বেল কি লুডো বা অন্য খেলা খেল্তো, কখন কখন স্কুলের লাইব্রেরি থেকে ছোট ছেলেদের বই আন্তো মা পড়ে শোনাতেন। দাদা যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে তখনো অবধি মার বিনা অনুমতিতে কখনো কোন বাজে বই পড়ে নি। সেই জন্য বাঙ্গলায় ছোট বেলায় দাদা খুব ভাল ছিলনা। আমি বাজে বই দাদার আগেই পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। দাদা একবার বলেছিল 'মা, প্রকৃতি পড়্ছে আমিতো পড়িনা।' মা বল্লেন 'ও দুষ্টু মেয়ে, তুমি লক্ষ্মী ছেলে।' দাদা এর পর আর কিছু বলেনি।

মানুষ নিজের অতি প্রিয়জনকে যেমন ভালবাসে দাদা তেমনি পড়াশোনা ভালবাসতো। বই ছিল দাদার প্রাণ। কেউ যদি বইয়ের একটু অযত্ন করতো তা'হলে দাদা ভয়ানক রেগে যেতো। দাদা যখন B A পড়ছে তখন অবধি দাদার ছোট বেলাকার দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরম্ভ করে সব বই অক্ষত দেহে ছিল। দাদার লেখাপড়াই ছিল এক মাত্র ধ্যান জ্ঞান। সংসারের বিচিত্র গতির কোন খবরই সে জানতো না। প্রত্যেক মানুষকে দাদা এত বিশ্বাস করতো যে, আমরা যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতাম তাহলেও দাদা বুঝতে চাইতো না। দাদার মতে পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই ভাল। মানুষ মাত্রেই উদার এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে দাদা জীবনের পথ চল্‌তে গিয়েছিল; কিন্তু বারবার নির্ম্মম আঘাত দিয়ে মানুষ তা'র সে বিশ্বাসকে চূর্ণ করে দিয়েছিল। তাই দাদা জীবনের প্রভাতেই বলেছিল 'জগতে এত শোক, এত দুঃখ এত প্রতারণা যে সুখ আছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর আমি যা'দের বিশ্বাস করেছিলাম ও ভালবেসেছিলাম এখন দেখ্‌ছি তা'রা মুখে একরকম ভিতরে একরকম'। এখন আমরা বুঝতে পার্‌ছি যদি অন্য ছেলেদের মত বাইরের জগতের সঙ্গে ছোট থেকে তার পরিচয় থাকতো তবে এত অকালে ঝরে পড়তো না।

* * *

আষাঢ়ের এক সন্ধ্যা! আমি রান্নাঘরের সামনে বসে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। সারাদিন ধরে অনবরত বৃষ্টি হ'য়েছে, এখন ঝির্ ঝির্ করে পড়ছে। মনে হ'চ্ছে কি একটা ব্যথা যেন আকাশের বুকে বাজ্‌ছে। চারদিকে কেমন একটা বিষাদভাব মাখানো। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করছে, এমন সময় বাবা আদালত থেকে এসে বল্‌লেন 'সি, আর, দাশ, দেহত্যাগ করেছেন।' আমি বুঝলাম কেন আকাশে বাতাসে এ বিষাদ ভাব। বাহিরে এলাম তখন আমার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছিল যাঁকে কখন দেখিনি, শুধু কাণে শুনেছি তাঁর গুণাবলীর কথা আজকের কেন সেই দেশবন্ধুর জন্যে চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে। দাদা আমায় কাঁদতে দেখে বল্লে 'তুই ভারি নরম, কাঁদছিস কেন? জগতে কত এরকম আসে যায়, কেউ কি চিরকাল থাকে?" দাদার তখন তেরো বছর বয়েস আমি বল্লুম 'আমাদের দেশের কি হ'বে দাদা?' দাদা বল্লে 'আরো কত লোক এসে ওঁর কাজ করবে।' তারপর দাদা একটু চুপ করে থেকে বল্লে 'যদি দেশবন্ধু আরো কিছুদিন থাক্‌তেন তবে হয়তো আরো কত কাজ করে যেতেন। দেশবন্ধু আমাদের বাঙ্গলার গৌরব ছিলেন।' দাদা কান্না মোটে পছন্দ করতোনা, তার মত ছিল শোক, দুঃখ, আনন্দ, ভালবাসা, কোনটাই বাহিরে প্রকাশ করা উচিৎ নয়, যা'হবে তা' নিজের ভেতরেই রাখবে। আমাকে দাদা এইরকম ভাবে গড়তে চেয়েছিল, নিজে দাদা ঠিক ঐরকম ছিল।

৮

একদিন আমরা বাবাকে বল্লুম 'বাবা আমরা ভিক্‌টোরিয়া পার্কে বেড়াতে যাব।' বাবা রাজি হ'লেন না, বল্লেন 'ওখেনে গিয়ে কি হ'বে?' দাদা আর আমি পরামর্শ করলাম, দুজনে লুকিয়ে যাব আজ বিকেলে। বিকেল বেলা সবাই বেড়াতে যাব বলে বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, দাদা আমায় টেনে নিয়ে সকলের আগে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বল্লে 'আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কে চল্‌লাম।' বাবা মা দুজনেই বল্লেন 'ওরে যাস্‌নি ফিরে আয়।' আমরা সেকথা গ্রাহ্য না করে ছুটে চল্‌লাম। পেছনে বাবার ডাক্ কাণে আসতে লাগল। আমরা ছুটে গোধুলিয়ার মোড়ে এলাম। এখানে এসে দাদা বল্লে 'আমার হাত বেশ শক্ত করে ধর্ না হ'লে এত লোকের ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যাবি।' আমি দাদার হাত ধরতে দাদা আবার চল্‌তে লাগল। অনেকটা রাস্তা যাবার পর দাদাকে বল্লুম 'দাদা আরো অনেক রাস্তা আছে? আমাদের পথ ভুল হয় নি তো?' দাদা বল্লে 'না পথ ভুল হ'বে কেন, তোর কি পা ব্যথা করছে? এখন যে অনেক রাস্তা।' আমি বল্লুম 'না পা ব্যথা করে নি।" আরো অনেক রাস্তা হাঁটবার পর পার্ক দেখা গেল। আমরা ভেতরে ঢুকছি, আমাদের বয়সী কতকগুলো বাঙ্গালীর ছেলে বেরিয়ে আস্‌ছিল, আমাদের দেখে তারা ঢিল ছুঁড়তে লাগল। একটা ঢিল আমার হাতে এসে লাগল। তাদের ঝগড়া করবার

মতলব বুঝ্‌তে পেরে আমরা অন্য পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম পার্কে খুব গোলাপ ফুটেছিল। গোলাপ ফুল দেখে দাদার বড় আনন্দ হোল। 'ভিক্টোরিয়া'র মূর্ত্তির নীচে ঘাস দিয়ে ভিক্টোরিয়া'র নাম লেখা দেখে আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম 'কি করে এ রকম করে নাম লিখেছে দাদা?" দাদা বল্লে ঘাসের বীজ মাটীতে সাজিয়ে পুঁতেছে, তা' থেকে ঘাস বেরিয়েছে। ঐ ঘাস যখন আবার বড় হ'য়ে উঠে তখন সমান করে কেটে দেয়।' আমরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক জায়গায় কতগুলো ছেলে টেনিস খেল্‌ছিল একটুখানি সেখানে দাঁড়িয়ে আবার অন্য জায়গায় চল্লুম। ভারি আমোদ লাগছিল ফেরবার কথা কারোর মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কোন একটি ঘটনায় আমাদের মন একেবারে খারাপ হ'য়ে গেল, বেড়াবার উৎসাহ মুহূর্ত্তের মধ্যে চলে গেল। শ্রান্তভাবে দুজনে একটা পুকুরধারে ঘাসের উপর বস্‌লুম। দাদা আগে কত কথা বল্‌ছিল, কিন্তু এখন দাদা একেবারে চুপ করে রয়েছে। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তখন সন্ধ্যা নামবার দেরী ছিল বটে কিন্তু সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, অস্তগামী সূর্য্যের আভা দাদার বিষাদমাখা মুখের উপর পড়ে ঝল্‌মল্‌ করছিল। আমি আস্তে নিরবতা ভঙ্গ করে বল্‌লাম 'দাদা এইবার বাড়ী ফিরে চল ভাই।' দাদা অভিভূতের মত উঠে বল্লে 'চল্‌'। দাদার অবস্থা দেখে আমি নিজের দুঃখ ভুলে গেলুম। দাদাকে নানারকম কোরে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। দাদা কোন কিছুতেই ভোলে না, কিছু বলেও না, শুধু চুপ করে থাকে। অনেক বোঝাবার পর দাদা বল্লে 'প্রকৃতি তুই আমার কাছে সত্যি কর, জীবনে কখন কা'রোর কাছে আজকের কথা বল্‌বি না।' আমার অত দুঃখেও দাদার কথা শুনে হাসি পেল। বল্লুম 'দাদা তুমি আমাকে দুর্ব্বল বল, কিন্তু আজ আমি তোমার মনের দুর্ব্বলতা দেখে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, তুমি একটা সামান্য ঘটনার জন্যে এত মন খারাপ কচ্ছ।' দাদা দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লে 'না তুই আগে আমায় কথা দে, তারপর আমি যাব।' আমি বল্লুম 'বেশ আমি বল্‌ছি জীবনে কখন কাউকে একথা আমি বলবো না।' পথে আস্‌তে আস্‌তে দাদার সঙ্গে গল্প কর্‌তে লাগলাম, গঙ্গার ঘাটে এসে আমি বললুম 'এস দু'জনে চোখমুখ ধুয়ে ফেলি।' চোখে অশ্রুর চিহ্ন দেখ্‌লে পাছে মা কারণ জিজ্ঞাসা করেন এই ভয়ে বেশ করে আমরা মুখ ধুয়ে ফেল্‌লাম। তারপর খানিকটা এদিক সেদিক বেড়িয়ে মা'র কাছে গেলুম। ক্রমশঃ

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ



Mrs. K. Roy

(গল্প)

শ্রীনিশানাথ মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি, ডিপ্‌-এড্‌

শ্রাবণের রাত্রি, হাওড়া ষ্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফরমে দেরাদুন এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে রয়েচে। এঞ্জিনটা যেন একটা দৈত্যের মতো বিকট শব্দ করতে করতে কয়লার ধোঁয়া ওড়াচ্চে, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় ও একটি ছোকরা সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলি দেখতে দেখতে নিজেদের নাম লেখা কার্ড দেওয়া গাড়ীটার দরজা হড়াৎ ক'রে খুলে তাতে ঢুকে পড়লো। সঙ্গের চাকরটি তাদের নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে বিছানা পেতে জিনিষপত্র গুছিয়ে দিয়ে পাশের সার্ভেন্ট কামরায় চলে গেলো।

প্রৌঢ়টির বয়স পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু তাঁর বেশভূষার পারিপাট্যে দর্শকের মুখে কৌতুকের একটা মৃদু হাসি ফুটিয়ে তোলে। গায়ে গিলে-কোঁচানো আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডেল, মুখে হিমানী কিম্বা ঐ রকম একটা কিছু মাখায় যেখানে যেখানে চামড়া কুঁচকে গেছে সেখানে সেখানে সরু শাদা রেখা তৈরি করেছে। ছোকরাটিও বেশ ফিটফাট, আধুনিক নব্য ছোকরার যে রকম হওয়া উচিৎ। প্রৌঢ়টি বেশভূষার বাঁধন দিয়ে সুচিরগত যৌবনকে টেনে আনবার চেষ্টায় আছেন। ফলে, যা এসেছে তা যৌবন নয়,—যৌবনের শব। তিনি একজন জু—সঙ্গে তরুণ বন্ধুটি নিয়ে চলেছেন হরিদ্বার। প্রৌঢ় অমর তরুণ অমিতাভকে বললে, "ওহে, আর একটা কার নাম লেখা রয়েচে না?—দেখতো কে রিজার্ভ করেচে?" অমিতাভ মধ্যের বার্থটার কার্ডখানায় চোখ বুলিয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে বলে উঠলো "হুর্‌রে! ঘোষ মশায়! Mrs. K. Roy!" ঘোষ মশায় বেঞ্চে শুয়ে পড়েছিলেন, তড়াক করে উঠে বসেই বললেন, "এঁ্যা বল কি,—স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোক এ গাড়ীতে থাকবেন?—পাশেই তো লেডিস্‌ কম্‌পার্টমেণ্ট, তিনি যে বড় এ গাড়ীতে সিট নিলেন?"

অমিতাভ বললে, "এও একটা ফ্যাসান বুঝলেন কিনা? আজকালকার এই স্ত্রী-জাগরণের দিনে যদি মেয়ে কামরাতেই যাবেন তাহলে আর জাগলেন কোথায়? আহা! Mrs. K. Roy! কে জানে তাঁর বয়স কত, বছর কুড়ি হবে—"

ঘোষ মশায় বাধা দিয়ে বললেন, "ভায়া, অত কম নয়। ইনি নিশ্চয়ই আমারি মত পার হলি পঞ্চাশের কোঠা। তা না হলে এই কামরায়—"

অমিতাভ বাধা দিয়ে বললে, "না ঘোষ মশায়, সে হতেই পারে না, ইনি নিশ্চয় তরুণী; কেননা মেয়ে কামরা থাকতেও যখন এই কামরায় সিট্‌ নিয়েচেন, তার ওপর চলেছেন একলা, তখন অতি আধুনিকা না হয়েই যান না। আচ্ছা, কি নাম হতে পারে এঁর? Mrs. K. Roy এতো স্বামীর নামে পরিচয়। কি নাম হতে পারে—রেণু—বেলা—রমা—অণিমা—কমলা, হঁ্যা নিশ্চয় এঁর নাম কমলা, দেখতে নিশ্চয় খুব সুন্দরী, কমলা না হয়েই যায় না।" অমিতাভ এই রকম ব'লেই চলেচে এমন সময় ঘোষ মহাশয় বলে উঠলেন, "না বাপু—গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে নিই, লেডির সামনে খালি গা' করাটা ভাল হবে না।" ব'লে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কাপড়ে চোপড়ে একটু অগুরু ছড়িয়ে নিলেন। তারপর দু'জনে মিলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফরমের গেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন তরুণীকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখলেই অমিতাভ বলে, "এই Mrs. K. Roy আস্‌ছেন!" তারপর তরুণীটি অন্য কামরায় প্রবেশ করলে ঘোষ মশায়

মাথা নেড়ে বলেন, "আরে না, না, তরুণী হ'তেই পারে না ; চল্লিশের কিছু ওপর।" আবার কোনো প্রৌঢ়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করলে ঘোষ মশায় উৎসাহিত হ'য়ে বলেন, "এই এতক্ষণে Mrs. K. Roy আসচেন।" কিন্তু প্রৌঢ়া অন্যত্র প্রস্থান করলে অমিতাভ উৎফুল্ল হয়ে বলে, "আপনি দেখে নেবেন ঘোষ মশায়, একুশ বাইশের বেশী কিছুতেই নয়।" এদিকে গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে, প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে চেয়ে অমিতাভ ও ঘোষ মশায়ের চোখ টেনে ধরেচে এমন সময় সুটকেশ হাতে বগলে বিছানা নিয়ে ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে চশমা চোখে একটি তেইশ চব্বিশ বছরের যুবক গাড়ীগুলি দেখতে দেখতে হড়াৎ করে সেই গাড়ীর দরজা খুলে তাতে ঢুকে পড়ল। ঘোষ ম'শায় একটু কুপিত স্বরে বললেন "ওকি মশায়, আপনি এ গাড়ীতে কেন ? দেখচেন না এ একটি মহিলার সিট্, অন্য গাড়ীতে যান।"

যুবকটি বিছানা পাতছিলো, একটু চমকে উঠে, কার্ডে লেখা নামটি দেখে একটু মুচকি হেসে আবার বিছানা পাততে মনোযোগ দিল।

অমিতাভ ধৈর্য্য হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো, "মহিলার সিট্ দখল করছেন কেন মশায় ? আপার বার্থে যান।"

যুবকটি হেসে বললে, "আজ্ঞে আমিই সেই মহিলা, আমার নামই Mrs. K. Roy."

অমর ও অমিতাভ এমন ভাবে তার দিকে তাকালেন যা দেখে সে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললে, "আমার নাম সুনীলকুমার রায়। Mr. S. K. Roy লিখতে গিয়ে রেল কোম্পানীর দয়ায় "S"টি Mr.-এর সঙ্গে যোগ হয়ে Mrs. K. Roy-এ দাঁড়িয়েচে।"

যুবকের কথা শুনে অমিতাভ মনের মধ্যে একটা আঘাত বোধ করলে ; কি বলবে ভেবে না পেয়ে একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "এ কিন্তু ভারী অন্যায়।"

যুবকটি বল্‌লে, "অন্যায় হ'তে পারে, কিন্তু তাতে আপনাদের ক্ষতি কি হয়েচে বলুন ?"

ঘোষ মশায় দেখলেন প্রশ্ন কঠিন। ক্ষতি কি হয়েচে প্রকাশ করে বলা শক্ত। তখন তিনি একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে সটাং বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর পাশ ফিরে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে নীরব হাসিতে চোখ মিটি-মিটি করে বললেন, "বরাতের কথা ভায়া! বরাৎ ভালো হ'লে ঠিক এই 'S' এর গোলযোগেই Mr. S. K. Royর প্রতীক্ষায় Mrs. K. Roy দেখা দিতে পারেন। তবুও মোটের উপর তোমারই জিৎ, বয়সে তোমার অনুমানেরই মিল হয়েচে। এখন শুয়ে পড়।"

বয়সের মিল আবার একটা মিল! মনে মনে ঘোষ মহাশয়ের অশুভ কামনা করে অমিতাভ শুয়ে পড়ল।

বিস্মিত যুবকটি একবার অমিতাভর দিকে আর একবার ঘোষ মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললে "ব্যাপার কি, বলুন ত ?"

ঘোষ মশায় বললেন, "কতদূর যাবেন ?"

"বেরিলী।"

"তবে তাড়া নেই, কাল সকালে বলব" ব'লে ঘোষ মশায় পাশ ফিরে শুলেন। গাড়ী তখন ষ্টেশন ছেড়ে চলেছে।

নিশানাথ মুখোপাধ্যায়



স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীসুধেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ট ঠাকুর বংশে বাঙলা ১২৬৩ সনে ১৪ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী তিথিতে ইং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইনি পঞ্চম কন্যা। ইঁহার



স্বর্ণকুমারী দেবী
(১৮ বৎসর বয়সের ছবি)

তার নাম শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী। তিনি যশোহরের সিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশের মেয়ে ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর তা ও ভগ্নীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বহুপূর্ব্বে অমরধামে নাথ, ৺হেমেন্দ্রনাথ ও ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম সাহিত্য জগতে ও সঙ্গীতরাজ্যে বিশেষ সুপরিচিত। ভাইদের মধ্যে এশিয়ার কবি-সম্রাট বিশ্ববিশ্রুত কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও ভগ্নীদের মধ্যে কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীযুক্তা বর্ণকুমারী দেবী বর্ত্তমান আছেন।

বালিকা বয়স হইতেই স্বর্ণকুমারী সুশীলা সরল-হৃদয়া ও লজ্জাবতী ছিলেন। ভাই ভগ্নীদের সহিত খেলাধূলায় তাঁর শৈশব জীবন বিমল আনন্দে কাটিয়াছে। সদা হাস্যময়ী শান্ত মধুর মূর্ত্তি তাঁর ছিল। সকলে আদর করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ বলিয়া ডাকিতেন। সে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যপূর্ণ অঙ্গ সৌষ্ঠব! সারল্যের শুভ্রতায়, স্নেহ মমতা ও অনুরাগের দীপ্তিতে সে দেবীপ্রতিমা প্রকৃতই সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। যাঁহারা স্বর্ণকুমারীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত কিরূপ অসামান্য রূপ লাবণ্যময়ী ছিলেন। তাঁহার অনুপম রূপ সম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে নানা গল্প শুনিয়াছি। শৈশবে সকলেই তাঁহাকে "ইংরাজ কন্যা" বলিয়া ভুল করিতেন। কৈশোরে একদিন অপরাহ্নে বেড়াইতে গিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথী-তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন, —অদূরে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহীগণ তাঁহাকে শ্বেতবরণা প্রস্তর মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে তাঁহার আদরের কন্যা স্বর্ণকে স্বর্ণবলয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন—"স্বর্ণ, তোমার সুন্দর হাতের রংএর এ উপযুক্ত বালা।"

শৈশব হইতেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। যাহা কিছু পড়িতেন, যাহা কিছু শিখিতেন তাহাতেই তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। কেহ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আরব্ধ কার্য্য হইতে অমনোযোগী করাইতে পারিত না। অতি ছোট বয়স হইতেই তিনি রামায়ণ মহাভারত

পড়িতে খুব ভালবাসিতেন। বাল্যকালে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতুলানীকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনান তার নিত্য কাজের মধ্যে ছিল। ঐ পুস্তকদ্বয়ের অধিকাংশ স্থানই তাঁর শেষ বয়স পর্য্যন্ত মুখস্থ ছিল। কথিত আছে বালিকা বয়সেই ছড়া বাঁধিয়া কবিতাতে সমবয়স্কাদের সহিত তিনি কথা বলিতেন। কবিত্বশক্তি তাঁহার প্রকৃতিদত্ত ছিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে কলিকাতার খ্যাতনামা ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা দীক্ষা ও আচার নীতির ধারা একটু স্বতন্ত্র প্রকার। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যখন দেশের মধ্যে কোথাও নারীশিক্ষার প্রচলন হয় নাই, তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে অন্তঃপুর বাসিনী মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হয়। স্বর্ণকুমারী নিজে লিখিয়াছেন, "আহার বিহার পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের (ঠাকুরবাড়ী) অন্তঃপুরে লেখা পড়া মেয়েদের মধ্যে একটা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজি পুথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে থাকিতেন। তেমনি স্নানবিশুদ্ধা শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণব ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। অতএব বাঙলা ভাষা জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা শক্তি ছিল। কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতুহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধ মহিলার জন্য। বালিকা নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যারা ইঁহার কাছেই শিক্ষালাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালক দিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন ও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছুই না হউক, বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।



স্বর্ণকুমারী দেবী
(পরিণত বয়সের ছবি)

বৈষ্ণবঠাকুরাণীর নিকট প্রথম বাঙলা শিখিবার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান মিশনারী মহিলা আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইতেন। মেয়ের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ

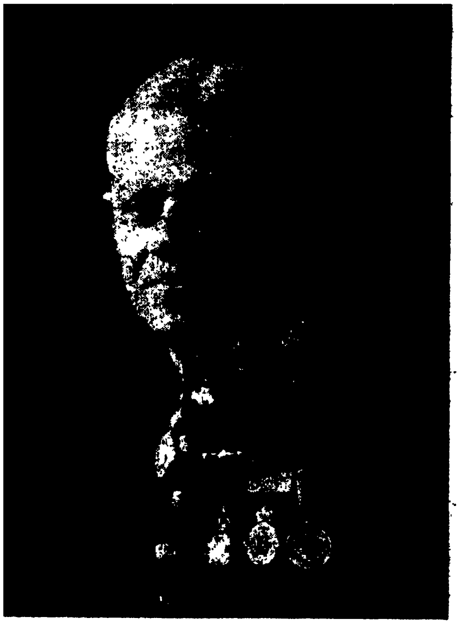
বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। তারপর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে শিক্ষকতার কাজ লইয়াই প্রথম প্রবেশ করিলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। পরে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নবীন আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময় সেজদাদামহাশয় হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার নিকট অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুল-পাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত বর্ণনা হইতে বেশ জানা যায় যে শৈশবে ও বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। ভাই বোন আত্মীয় ও আত্মীয়াদের সাথে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর স্কুল ও কলেজে পড়িবার সৌভাগ্য হয় নাই। তার পর দেশের মধ্যে যুগ-পরিবর্ত্তন আসিল। কলিকাতার নারীদের শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হইলে সমাজের নিন্দা অখ্যাতি অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা নিজেদের কন্যাগণকে স্কুলে পড়িবার জন্যে পাঠাইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে পাঠান। সমাজ সংস্কারে বাঙ্‌লাদেশে সর্ব্ব প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নারীদের সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তখন মেয়েদের স্কুলে গমন—নারীদের বেশভূষার নূতন পরিবর্ত্তন এবং মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথার অল্প বিস্তর উচ্ছেদ-সাধন কার্য্য দেখিয়া বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বরগুপ্ত বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"যত মেয়েগুলো, তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ, বি, শিখে বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে,
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

এইরূপ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপ-বাণে বিষাক্ত, দেশের বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তখনকার দিনে যে কয়জন নারী সুশিক্ষিতা হয়ে ছিলেন তন্মধ্যে স্বর্ণকুমারীর স্থান সকলের উপর।

স্বর্ণকুমারী মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহ এবং সাহায্য পাইয়া পাঠ্যাবস্থা হইতেই নিজের জীবনকে এক সুনিয়ন্ত্রিত সৎশিক্ষার আদর্শ পথে চালিত করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছোট ভগ্নীটীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ছোট ভগ্নীর কোন কিছু জানিবার ও শিখিবার তীব্র অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া খুব আনন্দ পাইতেন। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বাড়িতে দেখিলে সত্যেন্দ্রনাথ ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। অল্প বয়সেই স্বর্ণকুমারীর রচনাশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি দাদার মুখে অনুবাদ শুনিয়া শুনিয়া নিজে ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।



শ্রীজ্যোৎস্না ঘোষাল, আই-সি-এস্; সি-আই-ই
(স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র)

সে সময় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তখন তাঁহার বয়স খুবই কম।

স্বর্ণকুমারীর কথা লিখিতে গিয়া সেকালের অনেক কিছু না বলিলে তাঁহার শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ধারা জানিতে পারা যায় না। লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি শিক্ষা ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হইতে দেখা যায়। পঞ্চাশ বৎসর আগে অবাঙালীর ন্যায় নারীর শ্লীলতা পূর্ণ বেশ ভূষা যাহা বর্ত্তমানে বাঙলাদেশের নারীদের মধ্যে নিজস্ব বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে তাহার সর্ব্ব প্রথম

প্রচলন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজের মেয়েদের সম্পূর্ণ নূতন ধরণে সাজ সজ্জা করিতে শিখাইয়া ছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর "সেকেলে কথা" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"বঙ্গমহিলার সাধারণ প্রচলিত একখানি শাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না। পুরুষ অথবা নারী শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস কালীন অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি আমাদের মাতুলানী এবং বৌ ঠাকুরাণীগণ একরূপ সুশোভন পেশোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা ছিল। আমাদের বাড়ীতে সে কালে খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকাদের স্তায় বেশ পরিধান করিতেন। আমরা বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন রকম পোষাকে সাজিয়াছি। মেজ বধূঠাকুরাণী (৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন ও সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে তখনই পিতৃদেবের ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে নারীর পরিচ্ছদ যেমনটী চাহিয়াছিলেন ঠিক সেইরকম মনের মতনটি হইয়া বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাব মোচন হইল।" ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের পরিধেয় বেশভূষার প্রচলন তদবধি বাঙলার শিক্ষিত সমাজের নারীদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

সেকালে শিক্ষিত সমাজেও বাল্যবিবাহ ছিল। ১২৭৪ সালে ২রা অগ্রহায়ণ একাদশ বৎসর বয়সে বিখ্যাত স্বদেশ সেবক কংগ্রেস কর্ম্মী ৺জানকীনাথ ঘোষালের সহিত স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। ঠাকুর বাড়ীতে এই অনুষ্ঠানে হিন্দু-সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় "সপ্তপদী গমন" এক নূতন অঙ্গ বিবাহ পদ্ধতিতে যোগ করা হইয়াছিল। বিবাহে যথাসম্ভব হিন্দুরীতি ও আচারগুলি রক্ষা করিতে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহ সভায় দান-সজ্জাদি সাজান ছিল। স্বস্তিবাচন করিয়া অর্ঘ্য অঙ্গুরীয় মধুপর্ক ও বস্ত্রাদির দ্বারা কন্যার পিতা বরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী আচার প্রভৃতিও বাদ দেওয়া হয় নাই।

৺জানকীনাথ ঘোষাল নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত দশমী গ্রামের সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ জমীদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মাতৃহীন হন। তাঁহার পিতা ৺জয়চন্দ্র ঘোষাল ধার্ম্মিক ও উদার প্রকৃতির জমীদার ছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্ম এবং ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সে অঞ্চলে তখন ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

৺জানকীনাথ মেধাবী, সাহসী এবং সুপুরুষ ছিলেন। নদীয়া জেলার সদর মহকুমা কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে ৺রামতনু লাহিড়ী ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহের প্রভাব তাঁহার উপর প্রধানভাবে কার্য্য করে। তদবধি তিনি নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া কর্ম্মজীবনে ব্রতী হন।

বিবাহের পর স্বর্ণকুমারীর শিক্ষাভার স্বামীর উপর পড়িল। তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া স্বামীর শিক্ষায় দিন দিন নিজের জীবনকে নূতন ধারায় গঠিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজী ভাষা তিনি স্বামীর নিকটেই ভালরূপ শিখিয়াছিলেন। ৺জানকীনাথ পুরাতন প্রথার অনেক কিছু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। নারীদের সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাড়ীতে ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়া তিনি স্ত্রীকে গান বাজনা শিখাইয়াছিলেন। সকল রকমে স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা, জ্ঞানী ও আদর্শনারী করিবার চেষ্টা জানকীনাথের প্রবল ছিল। স্বামীর চেষ্টা, সহানুভূতি ও উৎসাহে তাঁহার জীবন দিন দিন উন্নতির পথে চালিত হইয়াছিল। ৺জানকীনাথের সহায়তায় ও চেষ্টায় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীজাতীর শিক্ষা ও সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৺জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বালীগঞ্জে ৩নং সানিপার্কে নিজ ভবনে থাকিতেন। ৺জানকী নাথের বিলাতে অবস্থানকালে শিক্ষার সুবিধার জন্য স্বর্ণকুমারী কিছুদিন পিতৃগৃহে থাকেন। তখন ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে।

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠাকন্যা হিরন্ময়ী দেবী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও মাতা পিতার আদর্শ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের অশিক্ষিতা বিধবা ও দুস্থা নারীদের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। মাতার সহিত একত্রে তিনিও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না নাথ ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিলাতে সিভিল

সার্ভিস পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। পরে উক্ত প্রেসিডেন্সির শাসনপরিষদে মেম্বর নিযুক্ত হইয়া কার্য্যকাল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মাতৃভক্ত সন্তান কিছুদিন পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়া পূজনীয়া জননীর সহিত একত্রে বাস করিতেছিলেন এবং জননীর সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এইরূপে মাতৃসেবার সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে বেশী দিন স্থায়ী হইল না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারীর তৃতীয় সন্তান স্বদেশসেবিকা সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। সরলা দেবীর নাম সাহিত্য ক্ষেত্রে ও স্বদেশের নানা কার্য্যে সকলের নিকট পরিচিত।

স্বর্ণকুমারীর উর্ম্মিলা নামে কনিষ্ঠা কন্যা শিশুকালেই মারা যায়। আনন্দপূর্ণ সংসারে সুন্দর ও সুখময় জীবনের প্রারম্ভে প্রাণ-প্রিয়া কন্যা উর্ম্মিলার অকাল মৃত্যুতে যে শোকের তীব্র ব্যথা এবং দাহ তিনি অনুভব করেছিলেন পরবর্ত্তী জীবনে স্বামী প্রথমা কন্যা হিরন্ময়ী, জ্যেষ্ঠ জামাতা (মিঃ পি, মুখার্জ্জি, আই, ই, এস্) ও কনিষ্ঠ জামাতা পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী আর্য্যসমাজী পণ্ডিত রামভূজ দত্তচৌধুরীর মৃত্যুতে তাহার ক্লেশ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার শ্বশুরকুলের শেষ চিহ্ন স্নেহের একমাত্র ভাগিনীয়ের মৃত্যু সংবাদে তিনি প্রাণে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন।

অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা স্বর্ণকুমারীর হৃদয় গভীরভাবে আঘাত করিলেও তিনি কখনও বাণীর সেবা হইতে বিরত হন নাই। দুঃখ কষ্ট হইতেই সৎসাহিত্যের উৎপত্তি। তাই মানবের কাব্য সাহিত্য দুঃখেরই বিচিত্র অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ।

কন্যার মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী দেবীর শোকাতুর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য বাণীর সাধনায় মন দৃঢ়রূপে নিয়োজিত করেন। স্বামীর উৎসাহ ও আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে তিনি বীণাপাণির অনুগতা সেবিকা হইয়া পড়েন। দিনের অধিকাংশ সময় পড়াশুনা ও সাহিত্য চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

বাঙ্‌লা ১২৮৩ ইং ১৮৭১ সালে তিনি "দীপনির্ব্বান" নামে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত করেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস লেখেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই "ছিন্নমুকুল" নামে একখানি উপন্যাস ও "বসন্ত উৎসব" নামে আর একখানি গীতি-নাট্য লেখেন।



হিরন্ময়ী দেবী
(স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ; বিবাহের পূর্ব্বের ছবি)

১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" রচনা প্রথম আরম্ভ হয়। গাথাতে স্বর্ণকুমারীর গভীর চিন্তাশক্তি ও বর্ণনার পারিপাট্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গাথা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"কে ঐ ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি ?

মধুর ঝলকে শুক তারা যেন
উষাতে আকাশ উজল করি।"

অন্য একটী গাথা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওগো কমল-আসনা, রঙ্গিনী-বীণাপাণি!
আমি কাহারেও আর জানিনা, ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহিনা মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।"

স্বর্ণকুমারী একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও উপন্যাস-লেখিকা ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে গভীর গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক "পৃথিবী" নামক পুস্তক লেখেন। তাঁহার রচিত শতাধিক কবিতা ও গান আছে। তিনি গান রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাণীসাধনায় নারীজীবনে তাঁহার গৌরবময় কীর্ত্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতী নামক মাসিক পত্রিকা প্রথম বাহির হয়। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তখন হইতে ভারতীতে স্বর্ণকুমারীর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের পরে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি এই সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার উপযুক্তা এবং সুযোগ্যা ভগিনী স্বর্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করেন। ইনি ১৮৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতী পত্রিকা অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ইহার পর নিজের দুই কন্যার উপর কর্তৃত্বভার দেন। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের কাজ করেন। ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত সরলাদেবী সম্পাদিকার কাজ করার পরে পুনরায় স্বর্ণকুমারী ভারতীর সম্পাদিকার ভার গ্রহণ করিয়া ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সুচারুরূপে কার্য্য করেন।

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর রচিত প্রায় ৭০খানি বই আছে। বোধ হয় আর কোন সাহিত্যিক এত সংখ্যক বই লেখেন নাই। দীপ-নির্ব্বাণ, নবকাহিনী, ছিন্ন-মুকুল, বসন্ত-উৎসব, গাথা, পৃথিবী, মিবাররাজ, ইমামবাড়ী, কাহাকে, কবিতা ও গান, ফুলের মালা, কনে বদল, রাজকন্যা, পাকচক্র, মিউটিনি প্রভৃতি তাহার পুস্তকাবলীর মধ্যে কয়েকখানি। তিনি বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের জন্য সচিত্র বর্ণবোধ, বাল্যবিনোদ, বালসুহৃদ, গল্পস্বল্প, কীর্ত্তিকলাপ নামে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন: ইহা ব্যতীত তাঁহার লিখিত নক্ষত্র-জগৎ ও ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় এখনো রহিয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে "ফুলের মালা" ও "কাহাকে" ইংরাজী ভাষায় "ফেট্যাল্ গার্ল্যাণ্ড" ও "দি আনফিনিষ্ট সং" নামে অনূদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইংরাজীতে 'সর্টষ্টোরীস্' নামক তাঁহার একখানি পুস্তক আছে। তাঁহার কতকগুলি গল্প তেলেগু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্লার বাহিরে বোম্বাই, আজমীর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার লিখিত ফেট্যাল গার্ল্যাণ্ড ছায়া-চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার দিব্যকমল নাটকখানি সুদূর ইউরোপে জার্ম্মাণ ভাষায় "প্রিন্সেস্ কল্যাণী" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র বাঙলার মহিলাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

স্বর্ণকুমারী কেবল বাণীর পবিত্র মন্দিরে সেবিকার কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বঙ্গমাতার আদরের দুলালী হইয়াও কষ্টসাধ্য স্বদেশ-সেবায় এবং নারীজাতির উন্নতি কল্পে অনেক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃত ভারতীয়চরিত্রসম্পন্না, আদর্শস্বভাবা স্বর্ণকুমারী যেমন স্বামীর সর্ব্বকর্ম্মে সহধর্ম্মিণী ছিলেন তেমনি সংগ্রামপূর্ণ দেশব্রতে যোগ্যা সহকর্ম্মিণী রূপে তাঁহার সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতেন। ৺জানকীনাথ তাঁহাকে অন্তঃপুরের বাহিরে নারীর যে আর একটি কর্ম্মক্ষেত্র আছে তাহার সহিত সম্যক পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর প্রচেষ্টায় ও শিক্ষায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেন।

তিনি নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার, তাঁহাদের মধ্যে দেশের মঙ্গল-চিন্তা, পরস্পরের মধ্যে মিলন ও প্রীতি-স্থাপন এবং জাতীয় ভাবের উদ্রেক ও শিল্পকলা প্রভৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৮৬ সালে "সখীসমিতি" স্থাপন করেন। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর এই সমিতির চেষ্টায় মহিলা-শিল্প-মেলার অনুষ্ঠান হইত। অন্তঃপুরবাসিনীদের বিমল আনন্দ উপভোগের জন্য সময় সময় শিল্প মেলায় কেবল নারীদের সঙ্গীত ও অভিনয়ের উৎসব হইত। সে উৎসবের কথা বলিতে গেলে কবির কথা মনে হয়।



মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী (উপবিষ্টা) ও কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী

"রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে, লেগেছে রমণী রূপের হাট।" বর্ত্তমানের ন্যায় সে সময় নারীদের উৎসবে পুরুষদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। কেবল নারীদের চেষ্টা ও পরিশ্রমেই শিল্পমেলার উৎসব হইত। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিশেষ চেষ্টায় এই সমিতির জন্য প্রায় পনর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। সঞ্চিত টাকার সুদ এখন হিরণ্ময়ী-বিধবাশ্রমে প্রদত্ত হয়।

কালের পরিবর্ত্তনে কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না। সখী-সমিতির আয়ু ফুরাইয়া গেলে বাঙলার নিঃসহায় বিধবাদিগের সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রার উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য হিরণ্ময়ী দেবী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কন্যার মৃত্যুর পর "হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম" নাম দিয়া স্বর্ণকুমারী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শুনা যায় এই বিধবা-আশ্রমের মহিলাদের দুইটি বৃত্তির জন্য ২৫০০৲ টাকা এবং নিজের সমস্ত পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়াছেন।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় হিউম সাহেব তাহার উদ্যোগী ছিলেন। সর্ব্ব প্রথম সে সময় বাঙালী মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (মিঃ দ্বারিকা গাঙ্গুলীর স্ত্রী) বসন্তকুমারী দাসী (সময় পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ দাসের পত্নী) এবং স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধিরূপে অধিবেশনে যোগদান করেন। তাহার পর ১৮৯০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসেও প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া-ছিলেন। ইহার পর কিছুকাল বঙ্গীয় থিওসফিক্যাল্ সঙ্ঘের মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার মধ্যে তাঁহার মধ্যমা ভ্রাতৃজায়ার সহিত একত্রে সমাজের অবরোধ প্রথা বিমোচনে অসীম সাহসের কাজ উল্লেখ-যোগ্য।৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে মেয়েদের পর্দ্দানসীন অবস্থায় থাকার কঠোর বিধান ছিল। অন্তঃপুর-প্রাচীর-বেষ্টিত নারীদের বন্দীজীবনের মুক্তি—দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের আবরণে নারীদের শ্বাসরুদ্ধ জীবনের উন্নতি সাধনা নিজের জীবনে এক মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারী এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া নব্য ধরণের জামা কাপড় পড়িয়া পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করেন। সমাজের বিরুদ্ধে এই সাহসিকতার জন্য তৎকালীন অনেক শিক্ষিত লোকের অপ্রিয় মন্তব্য ও তীব্র নিন্দা তাঁহাদের নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পথ সরল ও সুগম হইয়া উঠিল। আজ স্বদেশের মা ও ভগ্নীরা স্বাধীনভাবে ট্রামে, মটরবাসে চড়িতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন না। সভা সমিতিতে যোগদান করিতে, স্কুল কলেজে পায় হাঁটিয়া একাকী যাইতে সঙ্কোচ করেন না। এমন কি রাজনীতি আন্দোলনে যোগ দান করিতে কিছুমাত্র ভীত বা পশ্চাৎপদ নহেন।

কবি গাহিয়াছেন :—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না"।

এ কথার অর্থ দেশের নর-নারী সকলেই আজ বেশ বুঝিতে শিখিয়াছেন। দেশময় নারী-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে স্বর্ণকুমারী দেবীর অক্লান্ত চেষ্টার দান যে অনেকখানি আছে তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

স্বর্ণকুমারীর প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার জীবন নাট্যের বিয়োগান্ত ঘটনাগুলির অভিনয় সুরু হয়। আনন্দ ও নিরানন্দ পূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন-যাত্রার পথে চির-সহচররূপে পত্নীর সাথে সাথে থাকিয়া গত ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ২রা মে ৺জানকীনাথ পরলোকে গমন করেন। এতদিনে স্বর্ণকুমারীর সুখের দাম্পত্য জীবন বৈধব্যের গাঢ় কালিমায় ঢাকিয়া গেল। স্বামীকে তিনি দেবতা ও গুরুর ন্যায় চিরদিন মনে মনে পূজা করিতেন। সাধ্বী নারী জীবনের আরাধ্য দেবতাকে হারাইয়া সকল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে একেবারে নিঃসহায় বলিয়া বুঝিলেন। তাঁহার রচিত "ফেট্যাল গার্ল্যাণ্ড" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"আমার স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত সাহিত্য-সাধনায় এতদূর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দেশের লোকেরা আমাকে যে ভাবে আজ চেনেন সেই ভাবে তিনি আমার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিক্ষায় ও দীক্ষায় সাহিত্যে তরঙ্গায়িত জীবন আমার নিকট সরল সুখকর হইয়া উঠিল। আজ যদিও তিনি সশরীরে আমার নিকট উপস্থিত নাই তথাপি তাঁহার অমর আত্মা আমার মধ্যে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সাহায্য অনুভব করি। প্রত্যেক জটিল বিষয়ে তাঁহার সদিচ্ছাপূর্ণ আশীষ্ বাণী শ্রবণ করিয়া থাকি। আমার মধ্যে তিনি সাহিত্যের ও শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করেন। তাঁহারই সাহচর্য্যে তদানীন্তন ভারতী নামক পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করি। তিনি আমার মধ্যে যে দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি জাগাইয়া দেন তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমার স্বদেশবাসী নর-নারীর উন্নতি কল্পে কিছু করিবার জন্য ব্রতী হই।"

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে স্বর্ণকুমারী আমরণ বৈরাগ্য ব্রতধারিণী তপস্বিনীর ন্যায় যে অপূর্ব্ব পূত-সংযম জীবন যাপন করিয়া গেছেন তাহার মাধুর্য্য ও সৌরভের সম্যক্ পরিচয় দিবার স্থান এ নহে।

জীবনে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিলে ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি জীবনে অনেক শোক তাপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আধি ব্যাধির যন্ত্রণা ও শোকের দাবদাহ তাঁহার চরিত্রে কমনীয়তা ও সাহিত্য-সেবার উৎসাহ নষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি ধীর-স্বভাবা, স্বল্পভাষিণী ও গম্ভীর প্রকৃতির নারী ছিলেন। নীরবে সবই সহ্য করিতেন। তাই জীবনের অপরাহ্ণে বিষাদ মাখা করুণ সুরে গাহিয়াছেন—

"শীতল শান্ত বেলা
শাল শ্যামল নদী সৈকত অম্বর মেঘ মেলা
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা!
বাতাস গাহিছে মর্ম্ম কাহিনী,
পাতায় পাতায় হৃদয় দাহিনী,
করুণ হতাশ দোলা!
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা।
তলায় তলায় তরুবীথিকার ঘন কজ্জল ছায়া,
তার মায়া নাই তবু, মায়া নাই তার গো
অসহন দুখ-জ্বালা,
বড় একেলা আমি বড় একেলা।"

স্বর্ণকুমারী দেবী

যদিও সুদৃশ্য প্রাসাদ-শ্রেণী-শোভিত কলিকাতা মহানগরীতে সারা জীবন যাপন করিয়াছেন তথাপি পল্লী গ্রামের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। গৌরবময় শ্বশুর বংশের ভদ্রাসনটুকুর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। কয়েক বৎসর আগে কিছুদিনের জন্য হিন্দুনারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত উপাস্য শ্বশুরালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এক সময়ে যে গ্রামের কথা, যে উচ্চবংশের শৌর্য্য বীর্য্য এবং গুণ গরিমার পরিচয় কৃষ্ণনগরের রাজারও মনোযোগ এবং সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল নিয়তির ক্রুর চক্রে তখন সে বংশের এক রকম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ-স্তিমিত আলোর ন্যায় শ্বশুরকুলের ঘনিষ্ট আত্মীয় ভাগিনেয়

মাত্র সেই শ্রীহীন পুরাতন জমিদার বাটীর দৈনন্দিন ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করিয়া বংশের নাম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। সেই সুদূর পল্লীগ্রামে স্বর্ণকুমারী দেবী সহরের তুলনায় নানা অসুবিধার মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দে প্রায় এক পক্ষ কাল বাস করিয়াছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে গ্রামের প্রান্তে ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনী "নবগঙ্গা"র বক্ষে নৌকা চড়িয়া প্রকৃতির লীলাভূমি পল্লী-গ্রামের শ্যাম শোভা নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেন। কখন বা নদীর ঘাটে ঘাটে—অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা পল্লীবাসিনীদের সহিত মৃদুহাস্যে আলাপ করিতেন।



দুই ভগ্নী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী

গ্রামে কয়েকদিন মাত্র থাকিলেও তাঁহার জীবনে এই পল্লী-বাস' এক স্মরণীয় বিষয় ছিল। গ্রামের কত জিনিষ না তাঁর কবিত্বপূর্ণ জীবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নদীর অপর প্রান্তে বিস্তৃর্ণ মাঠ হইতে গোধূলিতে গৃহে-ফেরা রাখাল বালকদের হাতে তল্লাবাঁশের বাঁশীর মেঠো সুর তাঁকে বড়ই আনন্দ দিত। পরন্তু তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানি চির-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত পল্লীবাসীদের কষ্টের করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুঃখে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

গ্রামে বাস করিবার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক বৃদ্ধ বৈরাগী একতারা বাজাইয়া তাঁহাকে গান শুনাইত। সেই নিঃস্ব বৈরাগীর মুখে দুঃখের গান শুনিয়া এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে তাহার আজীবন মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখীর করুণ কাহিনীতে তিনি কাঁদিতেন। রাজ-নন্দিনীর ন্যায় জীবন তাঁর ছিল। কিন্তু পথের দুস্থ গরীবের অভাব মোচনে সতত ব্যস্ত ছিলেন। ধনে, মানে, শিক্ষায় সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের কন্যা হইয়াও এই মহীয়সী রমণী শ্বশুরবংশের গৌরবে সবিশেষ গৌরবান্বিতা ছিলেন। স্বর্ণকুমারী স্বামীর ভিটার প্রতি যে প্রীতির আকর্ষণ ও শ্বশুর কুলের বাসভূমি পল্লীগ্রামের প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক বঙ্গ-নারীদের কাছে এক অভিনব শিক্ষার বিষয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "গ্রামে বাস না করিলে, গ্রামকে ভালবাসিতে না পারিলে সমগ্র বাঙলা দেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।" মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের দুঃস্থ পরিবারকে এবং শ্বশুরকুলের আত্মীয়দিগকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতেন।

সাংসারিক জীবনেও তিনি আদর্শা নারী ছিলেন। সংসারে নিত্য নিয়মিত কাজগুলির মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও জীবনটাকে আনন্দময় করিয়া রাখিতেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গানের আসর বসিত। তিনি নিজে সুগায়িকা ও সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলিতে সুর-সাগর ব্রজেন্দ্রবাবু সুর-যোজনা করিতেন। কত সুকণ্ঠ-গায়ক এবং সুকণ্ঠী গায়িকা নূতন নূতন গান গাহিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। কখন বা তাঁহার ভবনে আধুনিক লেখকদিগের সাহিত্য আলোচনা হইত। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমানভাবে ছিল। তাঁহার গৃহখানি যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সকল সময়ই আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত থাকিত। আত্মীয়, অনাত্মীয় বা আগন্তুক যে কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, সকলকেই পরম আপ্যায়িত ও সাদর আহ্বানে পরিতুষ্ট করিতেন। আদর ও যত্নের সহিত সকলকে না খাওয়াইয়া বিদায় দিতেন না। অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার কথা না শুনিয়া আসা কঠিন

হইত। কী অকৃত্রিম গভীর স্নেহ ছিল তাঁর সকলের উপর। যিনি একবার তাঁর সদাহাস্যময় মুখের স্নেহবচন শুনিয়াছেন তিনিই জানেন যে কী মহান, উদার হৃদয়খানি তাঁর ছিল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু জীবনের অতি প্রিয় কাজ সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তি ছিল না।



শ্রীমতী কল্যাণী দেবী
(স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র দৌহিত্রী, ইঁহারই সৌজন্যে এ প্রবন্ধের সমস্ত ছবিগুলি পাওয়া গিয়াছে)

তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের লেখার মধ্যে "স্বপ্নবাণী", "বিচিত্রা" ও "মিলন রাত্রি" বহিগুলি মাত্র কয়েক বৎসর আগে বাহির হইয়াছে। সাহিত্য সাধনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর অপূর্ব্ব প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৯২৬ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রথম 'জগত্তারিণী স্মৃতি পদক' প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লার সাহিত্য ভাণ্ডারে তাঁহার অপরিমেয় দানের মর্য্যাদা কখন ক্ষুণ্ণ হইবে না। শিক্ষিত সমাজ তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। গত ১৩৩৬ সালে মাঘ মাসে কলিকাতায় ভবানীপুরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ২৯শ অধিবেশন হয় তখন স্বর্ণকুমারী দেবী সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। মহিলা-দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম তিনিই সাহিত্য সম্মিলনীর এই পদে বরিতা হন।

জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার স্বহস্তে লিখিবার ক্ষমতা ছিল না। নিজের বক্তব্য ও চিন্তার বিষয়গুলি অপরের দ্বারা লিখাইয়া বাণীর চরণ-পদ্মে নিত্য বন্দনা করিতেন। তাঁহার নূতন বাংলা পুস্তকের মধ্যে "দিব্য কমল" "সাহিত্য-স্রোত" "বাল-বোধ ব্যাকরণ" (স্কুল পাঠ্য যন্ত্রস্থ) এর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন না। গত বৈশাখ মাসে তাঁহার রচিত শেষ গ্রন্থ "সাহিত্য-স্রোত" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানি ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক করিয়াছেন।

শেষ জীবনে কেবল সাহিত্য সেবা ও বাণীর বন্দনা তাঁহার একমাত্র সাধনা কামনার জিনিষ হইয়াছিল। বাহিরের কর্ম্ম-জীবনের সহিত তাঁর সম্বন্ধ বড় বেশী ছিল না। মরণের পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত রোগ শয্যায় শুইয়াও সাহিত্য-স্রোতের ২য় খণ্ড রচনায় রত ছিলেন। কিন্তু হায়! বিধাতা তাঁহাকে সাহিত্য-স্রোতে ভাসমান পবিত্র পূজার ফুলটির মত নিজের শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

গত ১৯শে আষাঢ় ১৩৩৯ সালে বেলা আন্দাজ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় নিজ বাস-ভবনে (৩নং সানিপার্ক, বালিগঞ্জ) স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনপ্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাহার আত্মা অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনের শেষ রশ্মির সাথে সাথে সব শেষ হইয়া গেল। স্বর্ণকুমারীর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল আই-সি-এস, সি-আই-ই, একটি পৌত্র, পৌত্রী

এক কন্যা সরলা দেবী ও তিনটী দৌহিত্র ও একমাত্র দৌহিত্রী জীবিত আছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার সজ্জন সমাজের সৌজন্য উদারতা ও মহা-প্রাণতার একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্য-যুগের সন্ধিস্থলে এতদিন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পুরাতনের সহিত নূতনের—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইল। বাঙলা সাহিত্য-ব্রতধারিণীদিগের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর ন্যায় দীর্ঘ জীবন আর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁর নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনের অমর কীর্ত্তি চিরকাল থাকিবে। মানুষ চলে যায়—রেখে যায় পশ্চাতে তার বিপুল কাজের হিসাব। আর মধুর পবিত্র স্মৃতি। সেই মহাপ্রাণা সাধ্বী তপস্বিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে তাঁহারি চরণে বার বার প্রণত হই।

সুধেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব

(Arthur Symons হইতে

১

কুসুম সুরভি যথা সকালে সাঁঝে,
মগন হইয়া রহে পাঁপড়ি ভাঁজে,
তোমার ভাবনা, প্রিয়া, তেমনি করে,
রয়েছে দিবসযামী চেতনা ভরে,
যাবে না সে ;—সব কিছু যায় যে চলে,
তোমারে ফেলে।

২

আন্ কথা আসে যায় মনেরি পুরে ;
আন, খন যায় যদি কখনও ঘুরে,
বাউল হাওয়ার মতো,—মাধুরী ঢালা,
বিলিয়ে, চপল পায়ে, স্মৃতির ডালা,—
তারা তো যাওয়ার পথে ফিরে নাহি চায়,
আসে আর যায়।

৩

তোমারি ভাবনা শুধু রহে মরমে,
যেখানে রয়েছে তারা, ও মনোরমে,
কামনা-সুবাস মাখা, স্মৃতির পুরে,
গোপন মাধুরী সম, চেতনা জুড়ে ;
সকলি ছাড়িয়া যায়, কিছু রহে নাকো,—
তুমি শুধু থাকো।

প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যরীতি

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কবিতায় যে প্রভেদ তাহা বিষয়বস্তু অপেক্ষা বিষয় বস্তুকে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়াই স্পষ্টতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচীনযুগের কবিগণও চাহিয়াছিলেন রসকে, আনন্দকে, আদর্শ সৌন্দর্য্যকে। বর্ত্তমান যুগও তাহাই চায়। সুতরাং এই বিষয়ে এই দুই যুগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু রসানন্দের স্বরূপ লইয়াই এই দুই যুগের মতভেদ। রসানন্দকে সকল যুগের সকল কবিই চাহিয়া আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও চাহিবেন। তথাপি যুগের সহিত যুগের, জাতির সহিত জাতির রসসৃষ্টির প্রকাশরীতিতে (technique) যে এত প্রভেদ, তাহার কারণ এই যে—এক যুগে রসানন্দ যে পথে, যে উপায়ে রসস্রষ্টার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে, অপর যুগে অন্য পথে, অন্য উপায়ে তাহা কবির মনে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ এক যুগের কবিতার সহিত অপর যুগের কবিতার যে প্রভেদ তাহা সুন্দরকে উপভোগ করিবার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ। সামঞ্জস্যই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপাদান তাহা প্রাচীন যুগের এবং আধুনিক যুগের রসস্রষ্টা এবং রসবিচারকেরা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু আধুনিক যুগ তাহার উপর আর একটি লক্ষণ জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—শুধুই সামঞ্জস্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাহা এতই স্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ যে তাহার মধ্যে মন নিজের ইচ্ছামত লীলা করিবার অবসর পায় না। শুধুই সামঞ্জস্যের মধ্যে যে আনন্দ তাহার মধ্যে অনন্তের ব্যঞ্জনা নাই, তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আনন্দের যদি একটা সীমা থাকে, তবে তাহা মনকে একই স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখে, বেশীদূর আগাইয়া লইয়া যায় না। প্রাচীন যুগের কবিরাও এ-কথা জানিতেন তাই তাঁহারা মিলন অপেক্ষা বিরহের ব্যাকুলতার মধ্যে রসোপলব্ধির সীমাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেন। মিলন অপেক্ষা বিরহের মধ্যে যে অধিক ব্যঞ্জনা আছে একথা প্রাচীনেরাও জানিতেন এবং আধুনিকেরাও জানেন। কিন্তু বিরহের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা তাহাও আধুনিক যুগের রসস্রষ্টাদের নিকট যথেষ্ট স্থূল এবং লৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন—সৃষ্টি যে আমাদের মুগ্ধ করে তাহার কারণ ইহা নয় যে সৃষ্টি সুন্দর—তাহার কারণ এই যে—সৃষ্টি রহস্যময়। দুঃখের মধ্যে ব্যঞ্জনা আছে—কিন্তু সে ব্যঞ্জনা বাস্তব অভাববোধ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং স্থূল। রহস্যানুভূতির মূলে এরূপ কোন বাস্তব অভাববোধের ইঙ্গিত নাই। দুঃখ যেমন সুখের অভাববোধজনিত একটা লৌকিক ব্যাপার রহস্যানুভূতি সেরূপ কোন স্থূল বস্তুর অভাবজনিত মনোবিকার নয়। ইহা অনেকটা অহেতুক। সুতরাং রস যদি ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর হয় তবে এই রহস্যানুভূতিই সেই রসের শ্রেষ্ঠ উপাদান। আধুনিকেরা এই ভাবেই রসসৃষ্টিকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বলিতে আমরা অতি আধুনিক সাহিত্যকে ধরিতেছি একথা যেন কেহ মনে না করেন। আধুনিক বলিতে আমরা জার্ম্মানীর ওয়াগনার; ফ্রান্সের ভেয়ারলেন; ইংলণ্ডের শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ব্রাউনিং, আয়র্ল্যাণ্ডের ইয়েট্‌স, বেল্‌জিয়মের মেটারলিঙ্ক এবং আমাদের বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথকে ধরিতে চাই, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানী হইয়াছে—ইংরাজী সাহিত্যে যাহাকে Romantic movement বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আমরা সেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক মিঃ বেয়ার একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে Romantic লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার

মত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এই যে—It has added strangeness to beauty. অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগ সৌন্দর্য্যের সহিত রহস্যময়তাকে জুড়িয়া দিয়া রসসৃষ্টি করিতে চায়। তাহা না হইলে এ যুগের রসস্রষ্টাদের মন ভরে না। শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ব্রাউনিং ওয়াগনার, ভেয়ারলেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই ইঁহাদের কবিতাকে শুধু সুন্দর বলিলেই সমস্তটা বলা হইল না—সেই সঙ্গে একথাও বলিতে হয় যে ইঁহাদের কবিতায় কোথায় যেন একটা অপরিচয়ের মাদকতা রহিয়া গিয়াছে, কোথায় যেন একটা স্বপ্নকুহেলিকা, একটা অজানা-বিস্ময়, সঙ্গীতের রেশটুকুর মত মনের মধ্যে তাহার অনুরণন ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। এই যে মানসিক অবস্থা, ইহা সুখও নয়, দুঃখও নয় ইহা একটা অদ্ভুত অবস্থা—হয় ত ইহাই ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, হয় ত ইহাই লোকোত্তরবিচ্ছিত্তি।

আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

যুগের দেবতা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মৃত্যুপথের পথিক ওগো মরু পথের যাত্রী
রুদ্রলীলায় নৃত্য করো আজ,
শিউরে ওঠে তোমায় দেখে ধাতা এবং ধাত্রী
ধ্বংস করা—এই কি তোমার কাজ?
শবের বুকে চিতার উপর করলে তপস্যা
অমরপুরী গড়্‌তে নিজের হাতে
তোমার সাধন বিফল করা দারুণ সমস্যা,
শক্তি তুমি পে'লে দীপক্ রাতে।

গরল পিয়ে কণ্ঠ তোমার করলে তুমি নীল,
খেয়াল তোমার নাইকো কোথাও কভু
ক্ষীর-সাগরের সুরায় সবার মাতাল হোলো দিল্
রত্ন পেয়ে' নাচ্‌লো তাদের বপু;
তাইকি তুমি গর্জ্জে উঠে কর্‌ছো বিশ্বগ্রাস,
দাঁড়িয়ে এই অসীম সাগর-কূলে?
শান্তিপ্রিয় পরাণ মাঝে লাগ্‌লো ভীষণ ত্রাস
উঠ্‌লো আগুন বৃদ্ধ বটের মূলে।

ঝাণ্ডা নিশান উড়্‌ছে তোমার কালবোশেখী ঝড়ে
খুন্‌খারাবী রঙেই হোলে পাগল
বহুকালের ভিৎ যে ঐ তোমার ঘায়ে নড়ে
পড়্‌ছে ভেঙে রুদ্ধ লোহার আগল।
সতীর দেহ মাথায় নিয়ে বেড়াও তুমি নেচে
অপমানের নিচ্ছ দারুণ শোধ
এমন দিনে ভাব্‌ছি বসে আস্‌বে আবার কে যে,
মহাকালের কর্‌তে গতিরোধ।

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

আত্মহত্যা নিবারণের উপায়

অনেকেই হয়তো জানেন যে বিলেতের ব্রাইটনের পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাটা ওখানকার আত্মহত্যাকারীদের একটা যেন বিশেষ ফ্যাসন দাঁড়িয়ে গেছে। সেইজন্য বর্ত্তমানে ওভাবের আত্মহত্যা কি করে নিবারণ করা যায় তাই নিয়ে একটা আলোচনা চলচে। আত্মহত্যাকারীদের কাছে জায়গাটা নাকি তাদের কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী ব'লে ঠেকে। কারু আত্মহত্যা করবার দরকার হোলেই সে ঐ পাহাড়ের উপর উঠে যায়। কারণ সেখানে গিয়ে কিনারার দিকে পিছু হটতে হটতে বেগে ছুটে গিয়ে একবার নীচের দিকে পড়তে পারলে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আর অবকাশ মাত্র থাকে না।

যাই হোক এই দুষ্কৃতি দিন দিন ওখানে যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে জিনিষটা সম্বন্ধে ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এবং এর একটা আশু প্রতিবিধান করার সংকল্প করছেন। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রস্তাব ক'রেছেন যে সারা পাহাড়টার কিনারার দিকে বেশ ভালো বেড়া দিয়ে দেওয়া হোক। তাহলেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ঐ বেড়ার গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে। অপর দল বলছেন যে ঐভাবে বেড়া দিয়ে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে যে ফেরানো যাবে তা নয় বরং জন কয়েক দুর্ব্বলচিত্ত লোকের জন্যে শুধু শুধু পাহাড়টার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকুই ব্যাহত হবে—কাজ কিছুই হবে না। তার চেয়ে পাহাড়ের ধারের দিকে কতকগুলি পোষ্টের ওপর কয়েকটা সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে, "আত্মহত্যা" এই কথা কয়টি লিখে, তার তলায় "লাফিয়ে পড়বার আগে ভালো ক'রে ভেবে দেখ" এই কথা কয়টি লিখে দেওয়া হোক্। এর ফলে আত্মহত্যার সংকল্পকারী লোকদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হ'য়ে হয়তো কিছু কাজ হ'তে পারে।

শেষোক্ত প্রস্তাবটাই নাকি প্রথমে পরীক্ষার্থে গৃহীত হয়েছে।

দাঁত দিয়ে শোনা ঃ—

এক বধির বৃদ্ধ ভদ্রলোক—সম্প্রতি দাঁত দিয়ে পরিষ্কার শুনতে পাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বধিরদের শুনতে পাবার যত রকম যন্ত্রপাতি আছে তার সবগুলিই পরখ ক'রে দেখেছেন কিন্তু কোনটার সাহায্যেই তিনি বিন্দুমাত্রও শুনতে পান নি। এবং সেইজন্যে শুনতে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জন করা সম্বন্ধে তিনি একেবারে হতাশ হ'য়েও পড়েছিলেন।

শেষে তিনি একদিন এক রেস্তোরাঁতে বসে তাদের মেনুকার্ডখানাকে অন্যমনস্কভাবে কামড়ে ধরেছেন এমন সময় অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তিনি তাঁর পাশের লোকের কথাবার্ত্তা ভারী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কোনও শব্দ যে আমরা শুনতে পাই তার কারণ হচ্ছে, সেই শব্দ বাতাসের মধ্যে তরঙ্গ তোলে এবং কাণের পর্দায় সেই তরঙ্গের আঘাত ক'রে কানের মধ্যেকার Auditory Nerves—অর্থাৎ স্নায়ুর সাহায্যে শ্রবণের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে নীত হয়ে সেই স্নায়ুতে সাড়া জাগিয়ে দেয়। এখন, ঐ শব্দ-তরঙ্গ ঠিকভাবে গৃহীত হ'লে দাঁতের মতন একটা হাড়ের মধ্যে দিয়েও গিয়ে আমাদের স্নায়ুতে শ্রবণের অনুভূতি জন্মিয়ে দিতে পারে। সুতরাং একখানা কার্ড্ দাঁতের সাহায্যে চেপে ধরলে ঐ কার্ড খানিকে অবলম্বন করে বাতাসের মধ্যে উৎপাদিত শব্দতরঙ্গ যে দাঁতের মধ্যে দিয়ে গিয়ে স্নায়ুতে আঘাত ক'রে বধির

মানুষকেও শ্রবণের পূর্ণ অনুভূতি দান করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় Mr. Gordon Allen বলে একজন ইংরাজ স্থাপত্য-বিদের শ্রবণ-শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'য়ে গেছ্‌লো। তিনি বলেন যে তিনি সেই ভদ্রলোকটীর কাছ থেকে শুনে ঐ ভাবে শুন্‌তে চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য্য হয়েছেন। এবং তিনি বলেন যে যেকোন বধির লোক চেষ্টা করলে ঐভাবে শুন্‌তে পেতে পারেন। বধির লোকেরা দাঁতে একখানা ছুরির ফলাকে চেপে ধরে এবং ঐ ফলাকে একটী Wireless receiver এ ঠেকিয়ে অনায়াসে বেতারের প্রোগ্রাম শুন্‌তে পারেন।

পাশ্চাত্যে ডাইভোর্স :—

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহিত জীবনটা লোকের পক্ষে যেন ক্রমশঃই বেশি অশান্তিময় হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমেরিকার Columbia University Press থেকে আমেরিকান্ ডাইভোর্সের যে Statistical Analysis খানি প্রকাশিত হয়েছে তা' দেখ্‌লে ওখানকার লোকেদের বর্ত্তমান পারিবারিক অশান্তির পরিচয় পেয়ে বাস্তবিক দুঃখ হয়।

বর্ত্তমানে ওখানে প্রতিবছর পাঁচ লক্ষেরও ওপর নরনারী এবং বালকবালিকা এই ডাইভোর্সের বিষময় ফলভোগ করে। বর্ত্তমানে বিবাহ জিনিষটা ওখানে কিছুতে স্থায়ী হচ্ছে না। রিপোর্টে প্রকাশ, যে, ওখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়ের পর একটি মাসও যেতে না যেতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সে বিবাহিত জীবন বহন করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে এবং মনোমালিন্যের কালিমায় তাঁদের জীবন যখন বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠে, তখন তাঁরা আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

গত ১৯২৯ সনে ওখানে গড়ে প্রতি দু'মিনিট অন্তর একটা ক'রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। এ দু'বছর অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে মানুষকে বাধ্য হ'য়ে সেটা একটু কমাতে হ'য়েছে কিন্তু তাই ব'লে বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের মধ্যে মনের মিলটা যে খুব আছে তা বলা চলে না।

ওদেশে প্রতি ছ'টী ক'রে বিবাহের ক্ষেত্রে একটি ক'রে বিবাহের পরিণতি ঘটে, বিবাহ-বিচ্ছেদে। গত একশো বছর ধ'রে সারা জগতের মধ্যে আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘ'টে আস্‌ছে। এবং এও প্রকাশ, যে প্রধানতঃ অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস এবং চরিত্রের স্খলনই এই সমস্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ মাইলেরও অধিক ঊর্দ্ধে :—

বছর খানেক আগে বিখ্যাত বেল্‌জিয়ান্ বিমানবীর প্রফেসর পিকার্ড্ (Prof Picard) বেলুনে চ'ড়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ মাইল ঊর্দ্ধে উঠেছিলেন। মানুষ আজ পর্য্যন্ত এর চেয়ে ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারেনি সুতরাং এইটিই হোল সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার রেকর্ড্।

কিন্তু বর্ত্তমানে দু'জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, মিঃ ম্যাক্স ওবার হফ্ এবং মিঃ কার্ট আইক্‌বর্ণ্ সম্প্রতি আকাশযানের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কুড়ি মাইল এবং সম্ভব হ'লে তার চেয়েও ঊর্দ্ধে ওঠ্‌বার কল্পনা করচেন। এঁদের মধ্যে প্রথম ভদ্রলোকটি একজন খতত্ত্ববিদ্ এবং দ্বিতীয়টি একজন আবিষ্কারক ও বীমানবীর।

এরা দুজনে মিলে গত একবৎসর ধ'রে পরিশ্রম করার পর এই উপলক্ষ্যে যে নতুন যন্ত্রটির আবিষ্কার করেছেন, সেদিন সেটিকে নিয়ে একটি গুপ্ত পরীক্ষা করেছেন এবং এর ফল দেখে তাঁরা আশা করছেন যে এটির সাহায্যে তাঁরা তাঁদের আশাকে ফলবতী করতে পারবেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রঃ পিকার্ড এবং তাঁর সহকারী ডাঃ কিপ্‌কার্ তাঁদের বেলুন—যেটী পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বেলুন—তাতে একটি এয়ার টাইট্ (Air tight) গণ্ডোলা যুক্ত ক'রেছিলেন। এ দু'জন বৈজ্ঞানিক কিন্তু তাঁদের নিজেদের আবিষ্কৃত "Stratosphere"—ব'লে এক নতুন ধরণের এরোপ্লেন ব্যবহার করবেন। এটিকে প্রচণ্ডবেগে চলবার এবং খুব ঊর্দ্ধে ওঠবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী করেই প্রস্তুত করা হ'য়েছে।

যাত্রার সময় তাঁরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনসহ এরোপ্লেনের একটি বদ্ধগৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বেন। একটি বিশেষ তাপ-প্রস্তুতকারী যন্ত্রও তাঁদের সঙ্গে থাক্‌বে। তার সাহায্যে তাঁরা ইচ্ছে করলেই ঘরকে দরকার মত গরম ক'রে নিতে পারবেন। যাবার

সিনে ক্যামেরা প্রভৃতি ফটো তোলবার সরঞ্জামও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এরোপ্লেনে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বক্ষেত্রেই মানুষ অল্পব্যয়ে ও অল্পসময়ে অধিক সুবিধে সংগ্রহ কর্ব্বার চেষ্টা করছে। গতিকে বাড়াতে বাড়াতে মানুষ দ্রুতগতির যে রেকর্ড স্থাপন করেছে তা' কিছুদিন আগে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। আর আজ উড়োজাহাজে চড়ে ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চল্‌তে পেরেও লোকের মন উঠছে না। তাই সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলে ঘণ্টায় যাতে ৬০০ মাইল বেগে উড়োজাহাজ চালানো যেতে পারে তার চেষ্টা করছেন। তাঁরা এজন্য যে উপায়টিকে অবলম্বন কর্চ্ছেন সেটি একটু নতুন ধরণের। তাঁরা বল্‌ছেন যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কি ১৫ মাইল ওপর দিয়ে যদি উড়োজাহাজ চালানো যায় তা' হ'লে সাধারণতঃ এরোপ্লেন যত খরচে এবং যত মাইল বেগে চল্‌তে পারে তার অর্দ্ধেক খরচে তার দ্বিগুণ জোরে এরোপ্লেন চালানো সম্ভবপর হবে। অর্থাৎ নীচ দিয়ে যে উড়োজাহাজের গতি হয় মাত্র দেড়শো মাইল মাটী থেকে মাইল পনেরো উঁচু দিয়ে যদি তাকে চালানো যায় তা'হলে সেইটাই ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত বেগে চালানো যেতে পারবে। এবং তাতে পেট্রোল খরচ পড়বে, সাধারণতঃ যা পড়ে তার অর্দ্ধেক। কিন্তু তার জন্যে এরোপ্লেনটিকে একটু নতুন ধরণে তৈরী করতে হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে অত উঁচুতে উঠ্‌লে সেখানে যাত্রীদের ভয়ানক শীত করবে, তা' ছাড়া বাতাসের চাপও সেখানে এখানকার চেয়ে এত কম হবে যে তার মধ্যে থেকে নিশ্বাস নেওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হবে। সেইজন্যে সব দিক বিবেচনা ক'রে উপযুক্ত কেবিন, পাম্পের সাহায্যে বায়ুচাপকে এখানকার সঙ্গে সমান করে রাখবার জন্যে তার উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রভৃতি সমেত একটি এরোপ্লেন ফ্রেঞ্চ্ এয়ার মিনষ্ট্রি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছে। কি কি ভাবে যে এটি নির্ম্মিত হয়েছে তা' অবশ্য এখন জানবার উপায় নেই—কর্ত্তৃপক্ষ এর নির্ম্মাণ কৌশলটি অতি গোপনে রেখেছেন। যাই হোক বিখ্যাত বিমানবীর Lucien Coupet শীগ্‌গীরই এক শুভদিনে এই বিমানপোতটি পরিচালিত ক'রে এর কার্য্য কারিতার পরীক্ষা করবেন।

অভিশাপের ফল ঃ—

বিলেতে সেদিন এক ভদ্রলোক এক খবরের কাগজের সম্পাদকের কাছে যে এক কাহিনী বিবৃত করেছেন—তা যেমনি করুণ, তেমনি অদ্ভুত। তিনি বলেন যে অনেকদিন আগে তাঁর বাবা যখন প্রকাণ্ড এক কারবারের মালিক, সেই সময় এক জীপ্‌সী বালিকা তাঁর বাবার কাছে একদিন এসে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে কি একটা অনুরোধ করে। তাতে তাঁর বাবা সে মেয়েটীকে তাগিয়ে দেন। তার ফলে সে যাবার সময় এই ব'লে অভিশাপ দিয়ে যায় যে "আজ যেমন তুমি আমাকে তোমার দরজা থেকে বিদায় ক'রে দিলে তেমনি এর ফলটা খুব ভাল হবে না। শীগ্‌গীরই তোমার চারটী ছেলের অকালমৃত্যু হবে। তোমার মেয়েটীও অল্পদিন বাদে মারা যাবে। আর তোমার একমাত্র ছেলেটী জীবিত থাক্‌বে বটে কিন্তু তারও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকবে না। এ তুমি দেখে নিও।—এখন আমি চল্লুম—নমস্কার!—"

আশ্চর্য্যের বিষয় এর অল্প কাল পরেই তার দুটী ছেলে নদীতে নৌকাডুবি হ'য়ে মারা গেল, তারপর কিছু দিনের মধ্যে তাঁর তৃতীয় সন্তানটী এক মোটর-বাইক্ দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং চতুর্থটীও দৈবক্রমে বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। তারপর তিনি নিজে মারা যান—এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরে সেই জীপসীর কথামত তাঁর মেয়েটীও মারা যায়। তখন তাঁর পঞ্চম এবং শেষ সন্তান, এই বর্ত্তমান ভদ্রলোকটী পিতার পরিত্যক্ত প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালিক হন। কিন্তু জীপ্‌সী মেয়ের অভিশাপ এমন অক্ষরে অক্ষরে ফললো যে সে-সমস্ত টাকা খুইয়ে এখন পথে পথে দেশলাই ফিরি ক'রে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং গুটীতিনেক মেয়ের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন।

রংয়ের প্রভাব

আপনারা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন রংয়ের প্রভাব প্রত্যেক মানুষের ওপরে এক একটা ক্রিয়া করে। সূর্য্য রশ্মির মধ্যে যে সাতটি বর্ণ আছে তার প্রভাবে মানুষ বহু রোগ থেকে মুক্ত হ'তে পারে। সবুজ রং স্নিগ্ধতার প্রভাব বিস্তার করে ইত্যাদি, কিন্তু টকটকে লাল রং মানুষকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে এরকম আর কোন রং ক'রতে পারে না। যাঁরা ঘরে লাল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালান বা লাল রং ক'রে ঘরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ক'রতে যান তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। মিঃ হেনরি আর্ণস্ ব'লে এক ভদ্রলোক ঘরের দেওয়াল রংকরার কাজে, এবং ঘরে রঙীন কাগজ মারার জন্যে আমেরিকায় খুব প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছেন। তাঁর সেখানে প্রকাণ্ড কারবার। সম্প্রতি তিনি খবরের কাগজের মারফৎ সাধারণকে এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন যে কোন লোক যেন নিজের ঘর লাল কাগজ দিয়ে না মোড়ে, কিম্বা লাল রং করে। কারণ তিনি বলেন যে, আমেরিকার দুটি সম্ভ্রান্ত ঘরের দুটি ভদ্রলোক সারা দেওয়াল লাল রং ক'রেছিলেন এবং এই ঘরে তাঁরা প্রায়ই ব'সে থাকতেন, তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এবং তাঁরা আত্মহত্যা করেন। লাল রংয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত পশুশক্তি এতটা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে যে এক এক সময়ে সর্ব্বপ্রকার জঘন্য কার্য্য ক'রতে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এই লাল রংয়ের প্রভাবে মানুষের দৃষ্টিশক্তির হানি পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। সবুজ, নীল, গোলাপী, অল্প হলদে রং প্রভৃতি মানুষের সৌন্দর্য্য ও রুচিবোধের যেমন পরিচায়ক তেমনি তা সর্ব্বদিক দিয়ে হিতকর।

জর্জ্জ বার্ণাডশর নৃত্যানুরাগ

জর্জ্জ বার্ণাড শ'র বয়স বর্ত্তমানে পঁচাত্তর বছর। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। বিদেশে এই রসিক বৃদ্ধের নৃত্য-কলার প্রতি হঠাৎ এতটা অনুরাগ জন্মেছিলো যে এক নাচিয়েকে রেখে তিনি সেখানে নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। বার্ণাড শ'র নৃত্যশিক্ষক তাঁর একটি হস্তলিপি চান, তাতে বার্ণাড শ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়ের খাতায় লিখে দেন "এই লেখাটি আমি একমাত্র সেই লোককে দিলাম যে এই দ্বীপে আমাকে নতুন কিছু শেখাতে পারলে।"

চিত্রগুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

গীতিগুঞ্জ—গানের বই—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধাই ১॥০ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ২৲ টাকা। প্রকাশক শ্রীহরিহর চন্দ্র, বাণীবিতান, ২ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অতুলপ্রসাদ যে-সকল গান রচিত করেছেন সমস্তগুলি এই বইখানির মধ্যে স্থান পেয়েছে। অতুলপ্রসাদ বাংলা দেশের একজন বরেণ্য গীতি-কবি; তাঁর সুরে কথায় সুললিত গানগুলি বাংলার ঘরে ঘরে আদরের সহিত গীত হয়; সুতরাং এমন একখানি বইয়ের যে একান্ত প্রয়োজন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতুলপ্রসাদের সমস্ত গানগুলি একখানি বইয়ে একত্রে প্রকাশিত ক'রে শ্রীহরিহর চন্দ্র সঙ্গীতরসপিপাসু সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

উপহার দেওয়ার উপযোগী এই বইখানির ৩৷০ টাকা মূল্যের দেশী তুলট কাগজে ছাপা একটি রাজ-সংস্করণ আছে।

গীত-উপক্রমণিকা—প্রথম খণ্ড—শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস ১২০-২ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সঙ্গীত বিষয়ে ঔপপত্তিকসিদ্ধ ও ক্রিয়াসিদ্ধ জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হিসাবে এ বইখানি বেশ উপযোগী হয়েছে ব'লে বোধ হল। ওস্তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে যাঁরা গীতবাদ্য শিখতে আরম্ভ করেন সাধারণত দেখা যায় তাঁরা সুরের চেয়ে তাল নিয়েই বেশী বিড়ম্বিত হন। হার্মোনিয়ম বা অপর যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠের স্বর ভিড়িয়ে সর-সাধন যতটা সহজ, মেট্রোনোম যন্ত্রের সাহায্যে অথবা হাতে তাল দিয়ে তাল-সাধন ততটা নয়। অথচ তাল জিনিসটা এমন যে, গোড়া থেকে সে বিষয়ে সাবধান না হ'লে একবার বেতালা হ'য়ে গেলে পরে তার সংশোধন শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে মাত্রা সাধন এবং তাল-সাধন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এ বইখানিতে ঐ-দুটি বিষয়ই বেশ বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রচলিত স্বরলিপি পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা, কণ্ঠমার্জ্জন, গীত-অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বইখানি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়েছে।

কালিদাস—ছেলেদের নাটক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র। প্রকাশক—গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস্‌, ৫৯ অখিলমিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

কবি কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে-সব কিংবদন্তী ও গল্প প্রচলিত আছে সে-গুলিকে অবলম্বন ক'রে এবং তার সঙ্গে কল্পনা-জাত উপকরণের সাহায্যে ছোট ছেলেদের জন্য এই নাটিকাটি রচিত। শিশু-সাহিত্য রচনা ক'রে জ্ঞানেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বেই যে যশের অধিকারী হয়েছেন আলোচ্য নাটকটিতে সে যশ ক্ষুণ্ণ হয় নি। এ নাটিকাটি ছেলেমেয়েদের কল্পনা-বৃত্তিকে উন্মেষিত করতে সহায়তা করবে তা'তে সন্দেহ নেই।

আমরা অবগত হয়ে সুখী হয়েছি যে, এই নাটিকাটি অভিনীত হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছিল এবং কলিকাতা রেডিও কোম্পানী এটি রেডিওতে অভিনীত করবার ব্যবস্থা করেছেন।

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। বাঁধাইটা আর একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১। **পূর্ব্বাপর**—শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য। গোলাপ পাবলিশিং হাউস, ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা। পৃঃ ১৫৩।

এই উপন্যাসটির মধ্যে এমন একটি চরিত্র নাই যাহাকে স্বাভাবিক ও সুস্থমস্তিষ্ক বলা যাইতে পারে। লেখক কোনরূপ সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া আদৌ প্রয়োজন মনে

করেন নাই। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার উদ্ভট খেয়াল-অনুযায়ী যাহা লিখিয়া দিবেন পাঠক সম্প্রদায় যে পরমসমাদরে তাহাই মাথা পাতিয়া লইবে—বাংলা-সাহিত্যের সে দুর্দ্দিন আশা করি বহুকাল অপগত হইয়া গিয়াছে।

নায়কের নাম মুরলী। গোড়া হইতেই দাদাম'শায় ও তস্য নাতনীর প্রমুখাৎ মুরলীর নায়কোচিত বহুবৈশিষ্টের প্রচার সুরু হইয়াছে। মুরলী এম-এ পড়ে, মস্ত বড় কবি (কবিতার নমুনাও দেওয়া হইয়াছে), আবার এদিকে বস্তি-বিলাসী, মোটর ড্রাইভারী করিয়া বেড়ায়, ঘন ঘন উপবাস করিয়া থাকে এবং ফাঁক পাইলেই সমাজ-বিদ্রোহের বড় বড় বুলি কপচায়। অবশেষে আশ্রয়-দাত্রী বন্ধুপত্নীকে লইয়া রাত্রিযোগে পলাইল। উক্ত বন্ধু-পত্নীটি শিক্ষিতা এবং উপন্যাসের নায়িকা হইতে গেলে যে-যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা সমস্তই তাঁহার আছে। এই পলায়ন-ব্যাপারে সাহায্য করিল আর একটি শিক্ষিতা তরুণী—এবং সেও যে বড় সহজে রেহাই দিল তাহা নয়, যাইবার কালে 'মুরলীর হাতখানা সবলে বুকের মাঝে চেপে ধরে···ফুলে ফুলে' নিজের হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ছাপা বাঁধাই চলনসই।

২। **পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা**—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্। দাম ১৲—পৃঃ ১৫৮। জ্যাকেটে লাল রঙের উপর কালো ছবি—এক সৈনিক মৃত সঙ্গীকে কাঁধে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছে। কাঁটা তার··শব···আহত ঘোড়া···কামানের গোলা···চারিদিকে অপরিসীম ভয়াবহতার ইঙ্গিত।

পোর্ট আর্থার জয়ী মহাবীর জাপ-সেনানীদের মধ্যে লেফ্‌টেন্যান্ট সাকুরাই একজন। যুদ্ধে তাঁহার ডান হাত বিচূর্ণ হইয়া যায়। যুদ্ধাবসানে বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখে-দেখা সমস্ত বিবরণ লিখিয়া যান। সুরেশবাবু সেই বই অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন।

অতএব ইহা উপন্যাস নয়, সত্য বিবরণ। কিন্তু ইহার চেয়ে চিত্তাকর্ষক কোন উপন্যাস পড়িয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। প্রত্যক্ষদর্শী যোদ্ধা ছবির পর ছবি দিয়া 'মানুষ-বুলেট'এর কাহিনী সাজাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে নর-নারীর মধ্যে প্রাণ দেওয়া-নেওয়া বড় বেশীরকম চলিতেছে, এই এক ঘেয়েমির মধ্যে লেখক সত্যকার প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার মহিমাময় ভয়ঙ্কর রূপ উপলব্ধি করিতে দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইলেন। নব-উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ সমগ্রদেশ যে জীবন-লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে এই বই পড়িতে পড়িতে ক্ষণিকের জন্য তাহার স্বাদ পাওয়া যাইবে।

অনুবাদে একবিন্দু আড়ষ্টতা নাই—অতিশয় স্বচ্ছ, সহজ, সাবলীল। আমাদের আজিকার জীবন যাত্রায় ঐরকম ঘটনা যে একেবারে অসম্ভব; তাহা না হইলে এবং বিদেশী নামগুলা বাদ দিলে কে বলিবে যে ইহা অনুবাদ? ভাষা কলনাদিনী নদীর মতো ছুটিয়াছে। ছবিগুলি এমন যেন চোখের সামনে রণলিপ্সু বীরের আত্মঘাতী 'হুরিকিরি' দেখিতে পাই—রাতের অন্ধকারে শত শত সৈনিকের সাবধানী পদক্ষেপ কানে আসে—যুদ্ধের মাতামাতি, কে আগে প্রাণ দিতে পারিবে—তাহারই দুরন্ত প্রতিযোগিতা—সমস্তই মনের মধ্যে সজীব ও সচলভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'লক্ষ বক্ষ চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সকল ছুটে যেন নিজ নীড়ে—'। বই পড়িতে পড়িতে সেই উড্ডয়নশীল প্রাণ পক্ষীর পাখার ধ্বনি বারম্বার যেন কানে শুনিতে পাইলাম।

"এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ঝড় থামিয়াছে! এই শান্তি আসিল অযুত যোদ্ধার রুধিরের স্রোত বাহিয়া। অনাগত যুগে হয়ত এমন সময় আসিবে যখন পোর্ট-আর্থারের সুকঠিন গিরিশ্রেণী ধূলার সঙ্গে মিশিবে, যখন লিয়াওতুঙের নদী শুকাইয়া যাইবে! কিন্তু দেশভক্ত লক্ষ লক্ষ সেনা, যারা সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণ দিল, তাদেরও নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিবে—এমন সময় কখনো আসিতে পারে না! তাদের সে-নামের সৌরভ যুগযুগান্তে ছড়াইয়া পড়িবে, অনাগত জাপানী চিরদিন তাদের গুণগরিমা কৃতজ্ঞ অন্তরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে!"

যেন একটি অপরূপ স্তবগান!

শ্রীমনোজ বসু

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ায় গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে একটি বিদ্বৎকুল সভায় আমন্ত্রণ ক'রে তাঁকে বিশেষ ভাবে সংবর্দ্ধিত করেন, এ কথা সকলেই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বাংলা ভাষায় হওয়া স্থির হয়ে যে-সময়ে বাংলা ভাষায় নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ার প্রয়োজন হয়েচে ঠিক সেই সময়ে বাংলা ভাষার প্রধান আচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে এ পদে বরণ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যথার্থ বিবেচনা এবং কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই দুরূহ কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশাদি যে বিশেষ উপকারী হবে তাতে সন্দেহ নেই। বীজ রোপনের প্রথম অবস্থায় ভূমিতে সার পড়লে ভবিষ্যতের অঙ্কুর এবং বৃক্ষের পক্ষে যে মঙ্গল সাধিত হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ মঙ্গল সাধিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থ শরীর এবং সময়ের একান্ত অভাব উপেক্ষা ক'রে এই পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়ে সমস্ত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলর্ স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী যে অভিভাষণ দেন তার সমীচীনতায় এবং আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হয়েচি। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং গৌরবের যথার্থ উপলব্ধি এবং প্রকাশের দ্বারা তিনি তাঁর একান্ত শিক্ষিত মন এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। স্যার হাসান তাঁর অভিভাষণের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন—"Not only the Mussalmans of Bengal who speak Bengali as their mother tongue, but also the Mussalmans of India who speak in other tongues see in the Poet an embodiment of the refinements of Islamic culture even as the Hindus claim him as an incarnation of their own. The synthesis to which I have referred makes him India's fittest Ambassador in presenting once again the Unity of Asiatic civilisation inspired with common or at-least analogous ideals." এই অকুণ্ঠিত গুণগ্রাহিতার মধ্যে জাতিধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা একেবারে অবলুপ্ত। স্যার হাসান রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত পেয়েছেন মানবতার সেই ঊর্দ্ধ লোকে সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান ব'লে কোনো ভেদই নেই। মহামানবতার এই চেতনাটি যেদিন দেশের জনসাধারণের মধ্যে সহজ হয়ে ফুটে উঠ্‌বে সেদিন বিরোধের সমস্ত গ্লানি এক নিমেষে অন্তর্হিত হবে। ভারতবর্ষের এই পরম কল্যাণটি সাধন করবার জন্যে যে সামান্য কয়েকজন মনীষী সচেষ্ট, স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী তাঁদের মধ্যে একজন।

স্যার হাসানের অভিভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দেন তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি কৌতুকাবহ হয়েছিল। যে ভার তিনি গ্রহণ করলেন সে ভারের যোগ্যতা তাঁর আছে কি-না সে বিষয়ে তাঁর সংশয় এবং মন্তব্যগুলি সত্যই উপভোগ্য। বাল্যকালে নির্দ্ধারিত শিক্ষা পদ্ধতির কঠিন অবরোধ ভেঙে প্রকৃতির উদার অঙ্গনে মুক্তিলাভ ক'রে তাঁর প্রতিভাময় কবি-চিত্ত যে পরিণতি লাভ করেছিল তার উল্লেখটুকু চমৎকার—I strayed away from the high road of scholastic discipline into a green expanse of inconsequential leisure where my experiences found their source in perennial forms of beauty and human relationship, where my thoughts floated on the endless stream of continuous beginnings,

the beginning in the bud, the beginning in the flower, in the seed, in the sprouting life. The wonder of to-day and the expectation of tomorrow flowed in surprises of happiness......সেই জন্তে তাঁর অভিভাষণের উপসংহার ভাগে ছাত্র-সমাজকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন—"I feel that I stand here on the side of the students to tell them who are young that the strenuous course of their study, the pride of their acquisition must never harden all that is delicate and living in their nature, their power of faith, of simple joy, their sensitiveness to the subtle touches of existence."

প্রকৃত শিক্ষালাভ করবার বিষয়ে এই কথাটিই মূলের কথা: শিক্ষা পদ্ধতির কঠোরতা যেন সমস্ত সরসতা শোষণ করে মানুষের মনকে জ্ঞানের শিলাখণ্ডে পরিণত না করে।

"শ্রী", শ্রীমতী" ও "শ্রীযুক্ত"

নামের পূর্ব্বে এই পদগুলি ব্যবহার করবার বিষয়ে গত মাসের 'নানা কথায়' আমরা যে কথা লিখেছিলাম আশা করি তা সকলের মনে আছে। অনেকেই তাঁদের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' পরিত্যাগ করেছেন। কেউ কেউ একটু পৃথক মত ব্যক্ত করেছেন—যেমন শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন "শ্রী" বর্জ্জন করলে নামের পদবীও বর্জ্জন করা উচিত। তাঁর ইচ্ছানুসারে বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীকান্তর শেষে শুধু 'শরৎচন্দ্র' দেওয়া হ'ল।

ঢাকা থেকে মৌলভী শামসুল হুদা এ বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পত্র দিয়েছেন। পত্রটিতে ভাববার কথা কিছু আছে। স্থানাভাববশতঃ এ সংখ্যায় তাঁর চিঠি প্রকাশ করা অথবা চিঠি সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ হ'ল না। আগামী সংখ্যায় সে বিষয়ে কিছু বলবার ইচ্ছা থাকল।

পরলোকগতা কমলরাণী সিংহ

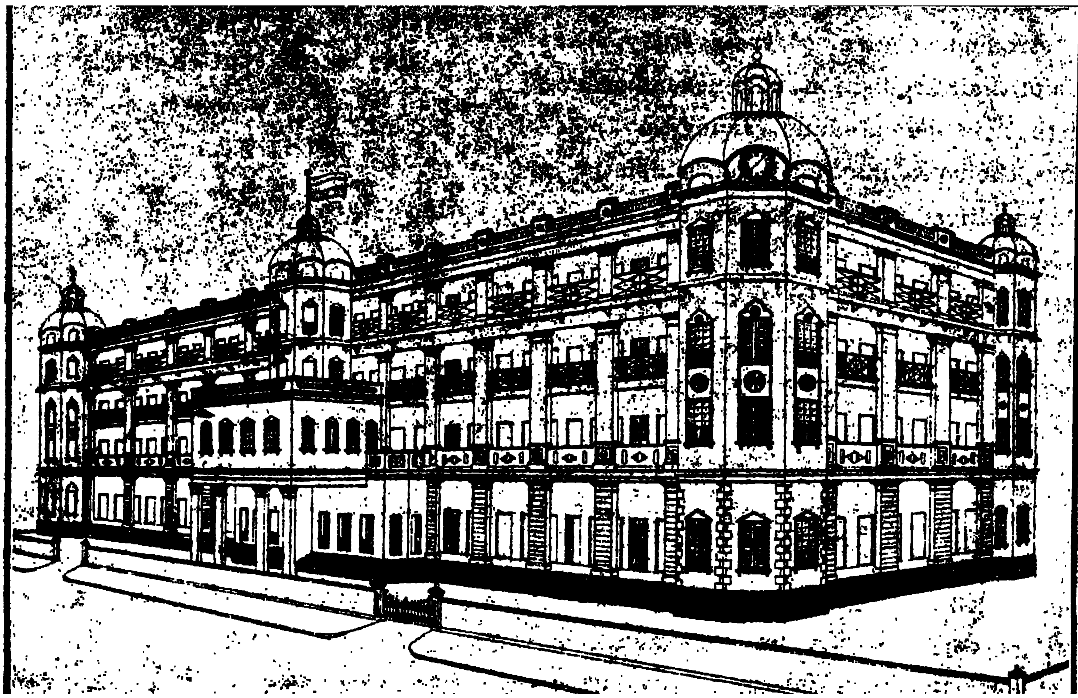
গত ২৯শে জুলাই ১৯৩২ শিলং-এ কমলরাণী সিংহ এম-এর মৃত্যু ঘটেছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় বেদান্ত বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকার করেছিলেন। মৃত্যুকালে এঁর বয়স মাত্র ২৩ বৎসর হয়েছিল।

এই প্রতিভাশালিনী মহিলার অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ দেশের সেবায় ইনি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আগামী সংখ্যায় আমরা এঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এবং চিত্র প্রকাশিত করব।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মনে যখন বঙ্গীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তখন এ দেশের চিরাগত চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের উপর সর্ব্ব প্রথম তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি কবিরাজ শিরোমণি শ্রীশ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে তাঁর নিজের আয়ুর্ব্বেদ টোলটি প্রসারিত ক'রে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পরিণত করবার জন্তে অনুরোধ করেন। এই টোলটিতে দ্রাবিড়, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকেই ছাত্র এসে শিক্ষালাভ করত। দেশবন্ধুর অনুরোধের ফলে বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ১৩২৮ সালে কলিকাতায় বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ৺চিত্তরঞ্জন দাশ, ৺মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ভি, জে প্যাটেল প্রমুখ ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত "An Appeal to Students" শীর্ষক একটি নিবেদন পত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই নিবেদন পত্র থেকে একটি জায়গা আমরা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।—
Can there be a matter of greater regret than the fact that in the land which first

gave birth to the science of medicine and whose improvements in surgery etc., still strike the modern scientists dumb, the indigenous system should be looked down upon simply because it is deprived of help and patronage from the state? We fervently desire that you should study and tory, Hospitals etc., along with Anatomy, Physiology etc. Above all, you will, in this institution, get an opportunity of learning the secrets of success in Ayurveda from old and vastly learned celebrated Kabirajes like Shyamdas Bachaspati and will be able to fulfil your mission in life



আপার সারকুর্লার রোডে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের প্রস্তাবিত গৃহের পরিকল্পন

revive this purely Indian system of medicine and establish its superiority over other systems in the world. It is for you alone that the "Vaidya Sastra Pith" has been established. All the branches of Ayurveda are being taught in the institution by learned Kabirajes and Scientists with practical demonstrations in Laboraas a man by removing a real want of the country.

ইংরাজীতে লেখা এই আবেদনপত্র দেখে কাহারও কাহারও মনে এরূপ আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবার হ'তে বুঝি বিলাতী সংস্কারে শুদ্ধ হয়ে নিজের বিশিষ্ট সত্তা হারাতে বসল। কিন্তু একবার বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠে গিয়ে সেখানকার অধ্যাপনা প্রণালী আর হাস্পাতাল পরিচালন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ

করার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের মন হ'তে ঐরূপ আশঙ্কা অপসৃত হয়।

পীঠ পরিচালকগণ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাকে প্রাচীন, নবীন ও কৃতবিদ্য—এই তিন বিভাগে বিভক্ত করেছেন। **প্রাচীন বিভাগে** সংস্কৃত ভাষায় ও ভারতীয় দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছাত্রদের এ দেশের চিরপ্রচলিত প্রথায় পাঠ দেওয়া হয়। **নবীন বিভাগে** বাংলা ভাষায় বুঝালে মূলগ্রন্থগুলি বুঝতে পারে এরূপ সংস্কৃত জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বাংলা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ পড়ান হয়ে থাকে। তার পরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন ও নূতন নূতন তত্ত্বানুশীলনের জন্য **কৃতবিদ্য বিভাগ** খোলা হয়েচে। সাধারণ বিভাগে চার বৎসর শিক্ষার পর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ আর অভিজ্ঞ কবিরাজ ও অধ্যাপকগণ কেবল এই বিভাগে প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকেন। এই তিন বিভাগেরই ছাত্রদের আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ দেবার জন্যে পীঠ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণ উপযুক্ত সজ্জোপকরণশালা (museum), রসশালা, অনুশীলনাগার (Research Laboratory), আরোগ্য-শালা (Hospital), গ্রন্থাগার (Library) প্রভৃতি স্থাপন আর ছাত্রদের দ্বারা শবব্যবচ্ছেদাদির (Dissection) বন্দোবস্ত ক'রে কলেজটিকে বাঙালীমাত্রেরই গৌরবের বস্তু করে তুলেচেন।



বর্ত্তমান বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ গৃহে রোগী-শয্যা

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই কয় বৎসরের মধ্যেই পীঠের ৪র্থ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ "বৈদ্যশাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বাংলাদেশের কয়েকটী জেলাবোর্ডের অধীনে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বঙ্গভঙ্গের যুগে তৎকালীন দেশবরেণ্য নেতাগণ কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ক'রে বাংলার জেলায় জেলায় যতগুলি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার আর সবগুলি স্বল্পায়ু হলেও সেই উদ্দীপনা ও উৎসাহকে মূর্ত্ত ক'রে যাদবপুর



বর্ত্তমান বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ গৃহে শবব্যবচ্ছেদাগার

বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ যেমন আজ বাঙালীর উদ্যমের সাফল্য প্রচার করছে, পরবর্ত্তী স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও এ দেশের মহাপ্রাণ নেতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তনের আর সব শাখা শুকিয়ে গেলেও কলিকাতার আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় আর বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ ক'রে বাঙালীর জাতীয় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টাকে এ পর্য্যন্ত ম্লান হ'তে দেয় নি।

কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে আইনমতে রেজিষ্ট্রী ক'রে সাধারণের অধিকার-ভুক্ত ক'রে দেওয়ার পর হ'তে কলিকাতা কর্পোরেশন "পীঠের" আয়ুর্ব্বেদ হাস্পাতালের জন্য বার্ষিক সাহায্য দান, এবং তার স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অপার সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিত সায়েন্স কলেজের নিকটবর্ত্তী ২বিঘা জমি দান ক'রে বিদ্যালয়টিকে উন্নতিশীল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের পরম হিতকর এই প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গল কামনা করি।

পরলোকগত নীতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গভীর দুঃখের বিষয় জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ব্ল্যাকফরেষ্টের স্যানাটোরিয়মে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নীতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটেছে। নীতীন্দ্র তাঁর পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন, বয়স ছিল মাত্র বছর কুড়ি।

আমরা এই অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনায় ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ও নীতীন্দ্রের পিতামাতাকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। রবীন্দ্রনাথ এ ঘটনায় দুঃসহ বেদনা পেয়েছেন আমরা জানি। কিন্তু দুঃখকে যিনি জীবনে সহজ সুন্দর মূর্ত্তিতে গ্রহণ করবার অমেয় শক্তি আয়ত্ত করেছেন তাঁকে আমরা সান্ত্বনার কোন্ বাণী শোনাব? তিনি তাঁর শান্ত সমাহিত চিত্তের সাহায্যে নিজেই এ বেদনাকে অতিক্রম করবেন।

শরৎ বন্দনা

আগামী ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯, সাহিত্যিক-প্রবর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্ম-দিবস উপলক্ষে বাঙালী জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবটির নামকরণ হয়েচে 'শরৎ-বন্দনা'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই শুভানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে স্বীকৃত হয়েচেন।

শরৎচন্দ্র বাঙলা দেশের অতিশয় জনপ্রিয় সাহিত্যিক, সুতরাং সময় অল্প হ'লেও এই আনন্দের উৎসবটি যে সাফল্যে মণ্ডিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে পত্রদ্বারা কোনো কিছু জান্‌তে হলে বিচিত্রা কার্য্যালয়ের ঠিকানায় 'শরৎ-বন্দনা কর্ম্মসচীবে'র নামে পত্র লিখ্‌লে চল্‌বে।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta



নৃত্য

আশ্বিন ১৩৩৯

শিল্পী—শ্রীমতী অনুকণা দাশগুপ্তা

বিচিত্রা

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

পুকুর ধারে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দোতালার জান্‌লা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কাণায় কাণায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টলমল করচে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, শাদা রঙন, একটি শিউলি;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরীবের মতো
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ওপারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলচে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো, গা খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঁঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে।

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ়-আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা,
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েচে,
টলমল করচে পুকুরের জল।
ঝিলমিল করচে বাতাবী লেবুর পাতা।

চেয়ে চেয়ে দেখি, আর মনে হয়
এ যেন আর কোনো দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।

তার সাদা সাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে বেঁকে পড়েচে।
দোতালার জান্‌লা থেকে
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধূলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে সজনের ডালে,
ফিঙে ল্যাজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বল্‌তে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে॥

১১ই আগষ্ট
১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পারস্যের নূতন তৈয়ারি পথ

আমার শরীর ক্লান্ত তাই রাত্রের আহার একলা আমার ঘরে পাঠাবেন বলে এঁরা ঠিক করেছিলেন। রাজি হলুম না। বাগানে গাছতলায় দীপের আলোকে সকলের সঙ্গে খেতে বসলুম। এখানকার দিশী ভোজ্য। পোলাও কাবাব প্রভৃতিতে আমাদের দেশের মোগলাই খানার সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না।

ক্লান্ত শরীরে শুতে গেলুম। যথারীতি ভোরের বেলায় প্রস্তুত হয়ে যখন দরজা খুলে দিয়েচি তখন দুটি একটি পাখী ডাকতে আরম্ভ করেচে।

যাত্রা যখন আরম্ভ হোলো তখন বেলা সাড়ে সাতটা। বাইরে আফিমের ক্ষেতে ফুল ধরেচে; গেটের সামনে পথের ওপারে দোকান খুলেচে সবেমাত্র। সুন্দর স্নিগ্ধ সকালবেলা। বাঁ ধারে নিবিড় সুবর্ণ দাড়িমের বন, গমের ক্ষেত, ক্ষেতে নতুন চারা উঠেচে। এ বৎসর দারুণ অনাবৃষ্টিতে ফসলে তেজ নেই, তবু এজায়গাটি তৃণে গুল্মে রোমাঞ্চিত।

উপলবিকীর্ণ পথে ঠোকর খেতে খেতে গাড়ি চলেচে। উঁচু পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এসে নামল। অন্যত্র সাধারণত নগরের কিছু আগে থাকতেই তার উপক্রমণিকা দেখা যায়, এখানে তেমন নয়। শূন্য মাঠের প্রান্তে অকস্মাৎ শিরাজ বিরাজমান। মাটির তৈরি পাঁচিলগুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল পপ্‌লার, কমলালেবু, চেষ্ট্‌নাট্‌, এল্‌ম্ গাছের মাথা।



পারস্যের জনপথ

শিরাজের গবর্ণর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেটপাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেচেন, তাঁদের সামনে ফল মিষ্টান্ন সহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোট ছোট টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজনাগরিকদের



কবি ও শিরাজের গভর্ণর

হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম্ম এই,—শিরাজ সহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্প-কানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান, তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্ত্তে এই কাননের আকাশে উর্দ্ধে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বল্‌লেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার-করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্চে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হোলো।

সভার পালা শেষ হলে পর চল্‌লেম গবর্ণরের প্রাসাদে। পথে যে-শিরাজের পরিচয় হোলো সে নূতন শিরাজ। রাস্তা ঘরবাড়ি তৈরি চলচে। পারস্যের সহরে সহরে এই নূতন রচনার কাজ সর্ব্বত্রই জেগে উঠ্‌ল, নূতন যুগের অভ্যর্থনায় সমস্ত দেশ উৎসাহিত।

সৈনিকপংক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হয়ে গবর্ণরের

প্রাসাদে প্রবেশ করলেম। মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন সেখানে অপেক্ষা করচে। কিন্তু অন্য সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই যাতে বিশ্রাম করতে পারি সেই প্রার্থনা মতোই ব্যবস্থা হোলো। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলুম শোবার ঘরে। তখন বেলা চারটে। রাত্রে নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে আহার করে দীর্ঘদিনের অবসান।

সকালে গবর্ণর বললেন কাছে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ি আছে সেটা আমাদের বাসের জন্য প্রস্তুত। সেখানেই আমার বিশ্রামের সুবিধা হবে বলে বাসা বদল স্থির হোলো।

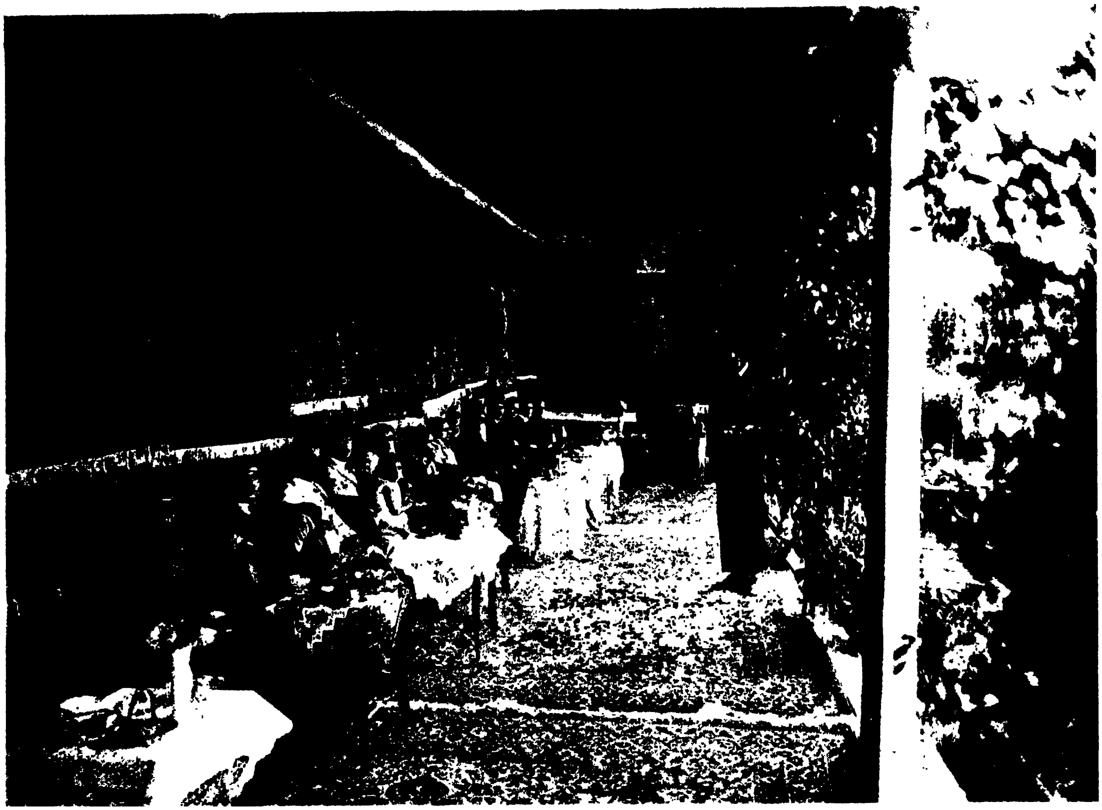


পারস্যের বাগান বাড়ি



শিরাজের বাজারের ঢাকা রাস্তা

১৭ এপ্রিল। আজ অপরাহ্ণে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্ণর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধিস্থানে। পথের দুইধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় এক দেশেই বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোষাক পরেচে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েচে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হাল্‌কা হয়ে এসেচে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের,



শিরাজ—অম্মাদিয়া উদ্যানে চেম্বার অফ্ কমার্স কর্ত্তৃক কবি-সম্বর্দ্ধনা

য়ুরোপীয়, কচিৎ দেখা গেল পাগড়ী ও লম্বা কাপড়। বর্ত্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেচে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।

আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন, ভারতের প্রথাবিরুদ্ধ ও বিদেশীঘেঁষা এও সেইরকম। কর্ম্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁকে। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে এমন'কি যারা সবাই একই বড়ো রাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরস্ক ইজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেচে সবাই এই সর্ব্বজনীন উর্দ্দি গ্রহণ করেচে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতিপরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়ত বা পোষাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েচি খণ্ড ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে? ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করচে,

হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসচে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল, মেয়েদের বেশে পরিবর্ত্ত নর ধাক্কা এমন করে লাগেনি, কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েচে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার মধ্যে গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে

সভারম্ভে পার্সিভাষায় কিছু বলা হলে পর আমি বল্‌লুম :—

প্রকৃতিতে নিমন্ত্রণের ভার বসন্ত ঋতুর পরে। তার সুগন্ধ পুষ্পগুচ্ছে, পাখীর গানে সেই নিমন্ত্রণ। তার আহ্বান স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিশেষে, তার বিশ্বভাষা তর্জমা করতে হয় না। কবিরা বসন্ত ঋতুর প্রতীক। তারা আপন দেশ আপন কালের মধ্যে থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালকে আমন্ত্রণ করে।



শিরাজ
সাদির সমাধি স্থলে

সমুচ্চ প্রাচীর অতি সুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েচে, মেজের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। সভার ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তে সূর্য্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ওপারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেচে,—অধিকাংশই কালো কাপড়ে আচ্ছন্ন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।

একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌচেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক তার বাণী সকল মানুষের।

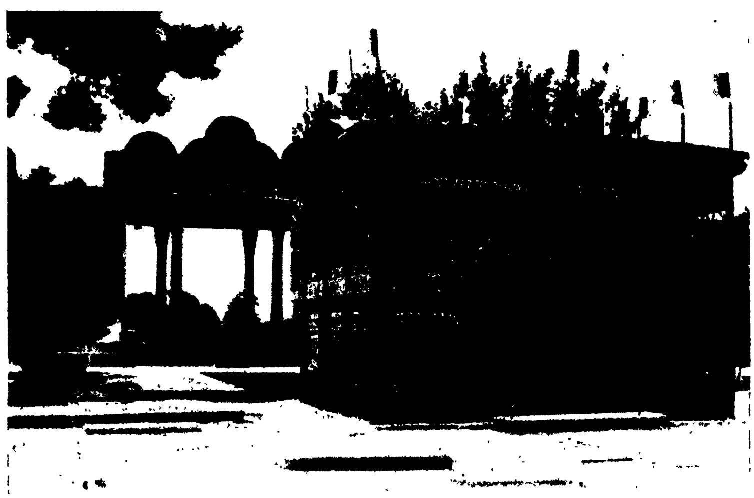
আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ



শিরাজ
সাদি উদ্যানে কবি-সম্বর্দ্ধনা। কবির দক্ষিণে শিরাজের গভর্ণর ও মিসেস্ ইরাণী।

অনেক শুনেচি। সেই কবিতার মাধুর্য্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

আজ পারস্যের রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেচেন সেই সঙ্গে সেই কবিদের আমন্ত্রণও মিলিত।— আমি তাঁদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই যাঁদের কাব্যসুধা জীবনান্ত কালপর্য্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েচে।



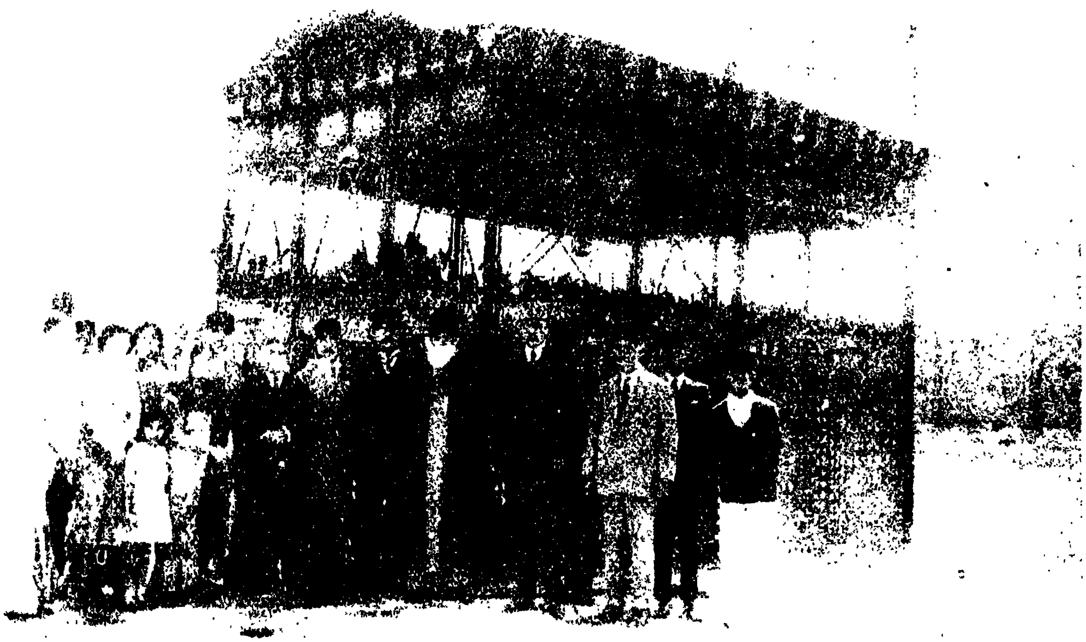
হাফিজের সমাধিস্থান

আমি বলার পর ধন্যবাদ জানিয়ে ও পারস্যরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ইরাণী কিছু বললেন। কৌতূহলী জনতার মধ্য দিয়ে গোধূলির আলোকে গবর্ণরের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলুম।

তিনটি পারসিক ভদ্রলোক তেহেরান থেকে এসেচেন আমাদের পথের সুবিধা করে দেবার জন্যে। এঁদের মধ্যে

একজন আছেন তিনি পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি। সকলে বলেন ইনি ফিলজফার; সৌম্য শান্ত এঁর মূর্ত্তি। ইনি ফ্রেঞ্চ জানেন কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তবু কেবলমাত্র সংসর্গ থেকে এঁর নীরব পরিচয় আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়। ভাষার বাধায় যে-সব কথা ইনি বল্‌তে পার্‌লেন না, অনুমানে বুঝ্‌তে পারি সেগুলি মূল্যবান। ইনি আশা প্রকাশ করলেন তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্য্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।

আজ সকালে হাফেজের সমাধি হয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা। তার পূর্ব্বে গবর্ণরের সঙ্গে এখানকার রাজার সম্বন্ধে আলাপ গেলো। একদা রেজা শা ছিলেন



হাফেজের সমাধি মন্দির

আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে। আমি বল্‌লুম, আপনাদের পূর্ব্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা, আমি তাঁদেরই আপন, এসেচি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করিনে। এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেচে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তাহলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র; বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পান নি, এমন কি পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়ল আমাদের আকবর বাদশাহের কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েচেন তা নয়, মোল্লাদের আধিপত্যজালে দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেচেন।

আমি বল্লুম—দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্ম্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধি নিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্ণর বল্লেন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বেড়া ডিঙিয়ে যতদিন না ভারত একাত্ম হবে ততদিন গোলটেবিল বৈঠকের বরগ্রহণ করে তার নিষ্কৃতি নেই। অন্ধ যারা তারা ছাড়া পেলেও এগোয় না, এগোতে গেলেও মরে গর্ত্তে পড়ে।

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলচে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েচে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হোলো যেন আমাদের পুলিস রাজত্বের অডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্ম্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরাণী ও কয়জনে মিলে যে তর্জ্জমা করেচেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই।—কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয় কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ।—মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।



শিরাজ
হাফেজের সমাধি-পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ। কবির দক্ষিণে শিরাজের গবর্ণর এবং শ্রীযুক্ত ডিনস্ ইরাণী

দ্বিতীয় অংশ।—স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি এও কি হবে সম্ভব? অহঙ্কৃত ধার্ম্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সঙ্গতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্ত প্রভাতে সূর্য্যের

আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সঙ্কেত। মনে হোলো আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্ত্তি করেচি। আমিও তো কতবার দেখেচি আচারনিষ্ঠ ধার্ম্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েচি অবাধ-প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হোলো আজ



শিরাজের বাগানে জনাব্ খলিলি ও রবীন্দ্রনাথ

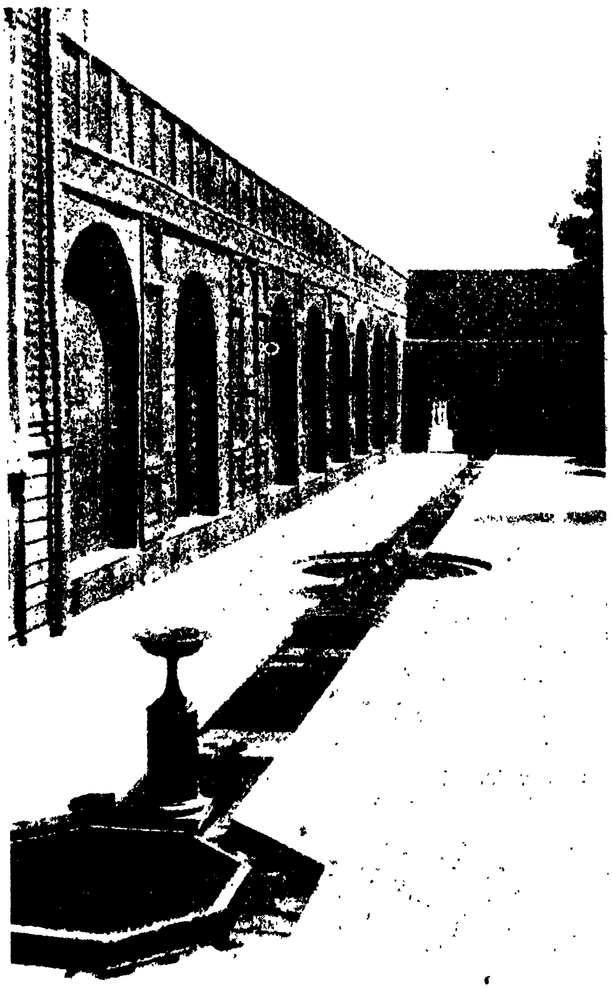
কত শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেচে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে এলুম। যাঁর বাড়ি তার নাম শিরাজী। কলকাতায় ব্যবসা করেন। তাঁরই ভাইপো খলীলি আতিথ্যভার নিয়েচেন। পরিষ্কার নতুন বাড়ি, সামনেটি খোলা, অদূরে একটি ছোটো পাহাড়। কাঁচের শাসির মধ্যে দিয়ে প্রচুর আলো এসে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল করে রেখেচে। প্রত্যেক ঘরেই ছোট ছোট টেবিলে বাদাম কিসমিস মিষ্টান্ন সাজানো।

চা খাওয়া হলে পর এখনকার গানবাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতার জাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তালদেবার যন্ত্র, বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সঙ্গীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য অংশ ধীর মন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেকটা মিল দেখতে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখচি এখানকার সঙ্গীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

ইস্ফাহানে যাত্রা করবার পূর্ব্বে বিশ্রাম করে নিচ্চি। বসে আছি দোতলার মাদুরপাতা লম্বা বারান্দায়। সম্মুখ-প্রান্তে রেলিঙের গায়ে গায়ে টবে সাজানো পুষ্পিত জেরেনিয়ম। নীচের বাগানে ফুলের কেয়ারির মাঝখানে ছোটো জলাশয়ে একটি নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা, আর সেই

কেয়ারিকে প্রদক্ষিণ করে কলশব্দে জলস্রোত বয়ে চলেচে। অদূরে বনস্পতির বীথিকা। আকাশে পাণ্ডুর নীলিমার গায়ে তরুহীন বলি-অঙ্কিত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর রেখা। দূরে গাছের তলায় কারা একদল বসে গল্প করচে। ঠাণ্ডা হাওয়া, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। সহর থেকে দূরে আছি, জনতার সম্পর্ক নেই, পাখীরা কিচিমিচি করে উড়ে বেড়াচ্চে তাদের নাম জানিনে। সঙ্গীরা সহরে কে-কোথায় চলে গেছে,—



পারস্যের গৃহের অন্তর্বর্ত্তী আঙিনা

চিরক্লান্ত দেহ চল্‌তে নারাজ তাই একলা বসে আছি। পারস্যে আছি সে কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার কিছুই নেই। এই আকাশ বাতাস, কম্পমান সবুজপাতার উপর কম্পমান এই উজ্জ্বল আলো, আমারি দেশের শীতকালের মতো।



প্রসিদ্ধ পারস্য সম্রাট্ শাহ আব্বাস্

শিরাজ সহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবের পারস্য জয় করার পরে তবে এই সহরের উদ্ভব। সাফাবি শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল সহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয় তার জায়গায় উঠেচে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েচে পৃথিবীতে আর কোনো দেশ এমন পায়নি, তবু তার জীবনীশক্তি বারবার নিজের পুনঃসংস্কার করেচে। বর্ত্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেচে, জেগে উঠেচে আপন মূর্চ্ছিত দশা থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজ্ঞাত বাস

শ্রীলীলাময় রায়

৬

পরদিন সূর্য্য উঠ্‌ল না। আকাশের মেঘ ছায়ার মিশাল দিয়ে সমুদ্রের জলকে কাল কালির মত করল। যেখানটাতে আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়েছে কেবল সেই খানটাতে কাল পাখীর গলায় সাদা রোঁয়ার মত সংকীর্ণ শ্বেত ব্যবধান।

বাদল সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কাটাল। পূর্ব্ব দিবসের সর্ব্বব্যাপী উজ্জ্বলতার সেইটুকু অবশেষ বাদলের বাইরে ও ভিতরে কেমন এক বিষাদের ভাব সঞ্চার করেছিল। কাল যাকে যুক্তিসহ মনে হয়েছিল আজ তার থেকে সামান্য সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে। যোগানন্দ নেই, আমি আছি। কিন্তু ক'দিন আছি? কাল হয়ত দেখা যাবে আমিও সেই, আছে মেরিয়ন্, আছে মেলভিল, আছে 'সেরা' নামক একটা গাই। দিগন্তের প্রান্তে ঐ রজত-রেখার মত থাক্‌বে কেবল আমার ক্ষীণ স্মৃতি। থাক্‌বে, কিন্তু ক'জনের মনে? আমার পরিচয় কটা মানুষ পেয়েছে? কই আমার কাব্য নাটক সঙ্গীত দার্শনিক নিবন্ধ রাজনৈতিক বক্তৃতা ঐতিহাসিক কীর্ত্তি? সংকল্প আছে, সিদ্ধি কই, সিদ্ধি সম্বন্ধে রটনা কই? অন্তত গোটা দশেক বছর আমার দরকার। কিন্তু যদি আজই হার্ট ফেল করে মরি?

মৃত্যুর সম্ভাবনায় বাদলের চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নেমে এল। কোথাকার হিমেল বাতাস তার পোষাক ভেদ করে হাড়ে ঠেক্‌তে থাক্‌ল। সে আগুন জালিয়ে আগুনের কাছে বস্‌বে ভাব্‌ল, কিন্তু তার হাত পা যেন পক্ষাঘাত রোগীর। তার মনে হল যেন তার মস্তিষ্কেরও পক্ষাঘাত হবে। এই কথা মনে হতেই তার বাঁচ্‌বার স্পৃহাও লোপ পেল।

এমন অবস্থায় কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল ছিল না। হয়ত সারাদিন খেয়াল থাক্‌ত না। খেয়াল হল যখন বুড়ী মেল্‌ভিল দরজায় ধাক্কা দিয়ে বল্ল, "মিষ্টার সেন, আপনার High Tea" বাদল কোনো মতে বলতে পারল, "আচ্ছা, নিয়ে এস।"

বুড়ী বল্ল, "একি মিষ্টার সেন! আপনার কি— আপনার কি—অসুখ করেছে?"

বাদলের গা দিয়ে তখনো ঘাম ঝর্‌ছিল ও মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। সে কোনোমতে বল্ল, "না। বড় ঠাণ্ডা। আগুন।"

বুড়ীর বিশ্বাস হল না। সে টুপ করে নীচে নেমে গিয়ে থার্ম্মমিটারটা নিয়ে এল। বাদল বাধা দিল না। তাপ পরীক্ষা করে বুড়ী বল্ল, "এমন কিছু নয়। কিন্তু কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

দশমিনিট পরে বুড়ী ফিরে এসে দেখ্‌ল বাদল তেমনি বসে আছে। সে বুঝ্‌তে পারল। আবার ছুটল নীচে। মেল্‌ভিল উঠে এল সশব্দ পদক্ষেপে। বাদলকে কিছু বল্‌তে না দিয়ে তার পোষাক ফেল্ল খুলে। তার গা ভাল করে তোয়ালে দিয়ে মুছে হাত দিয়ে ডলে মিলিটারী কায়দায় তাকে ঘুষি মেরে চিম্‌টি কেটে কাতুকুতু দিয়ে প্রায় কাঁদিয়ে তুল্ল। এই আসুরিক চিকিৎসার পরে তাকে গরম কাপড়ে মুড়ে হিড় হিড় করে টেনে নীচের তলায় নিয়ে গেল। সেখানে আধ আউন্স ব্রাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দিল।

এর পরেও যদি বাদলের অসুখ না সারে তবে অসুখটাকে নেহাৎ বেরসিক বল্‌তে হবে। বাদল ফিক্ করে হেসে উঠ্‌ল। তারপরে হো হো করে উঠ্‌ল। বল্ল, "ওগুলো কি সসেজ্? দেখি, দেখি, ভারি মজার জিনিষ ত? বা বেশ লাগ্‌ছে খেতে।"

খাচ্ছে ত খাচ্ছে। এটা দেখি, ওটা দেখি, স্যাণ্ডউইচ্ দেখি, পাই দেখি, ব্ল্যাঙ্কোভি ও চীস্ দেখি। কিন্তু সেই একলা দেখ্‌বে? তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সে ঘরে বসেছিল। তাদের একজন বল্‌লো, "ব্ল্যাক্‌বার্ড, ডিয়ার ওল্ড্ ব্ল্যাক্‌বার্ড, আমরা কি একটু আধটু দেখ্‌তে পাইনে?"

অন্য সময় হলে বাদল 'ব্ল্যাক্‌বার্ড' সম্বোধন শুনে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হত, তখন তাকে 'রেড্ হেরিং' বল্‌লে নেহাৎ ভুল বলা হত না। কিন্তু আধ আউন্সের প্রতিক্রিয়া তাকে দিল-দরিয়া করে তুলেছিল। সে গলে গিয়ে বল্লে, "নিশ্চয়। দাও ত গো বার মেড্ - না কি বলে তোমাকে—দাও এঁরা যা খেতে চান। আর আমাকে দাও আর একটু পানীয় - না, না, ওটা না, ঐ - ঐ—লাল প্রবালের মত রঙ্গীন——"

সেদিনকার সভা থেকে মিসেস্ মেল্‌ভিল তাকে উদ্ধার না কর্‌লে সে হয়ত সত্যিই মারা যেত। স্বামীকে খবর দিয়ে বুড়ী বকুমারি করেছিল, চার্লিকে খবর দিলে পারত। তখন ত আর জান্‌ত না যে স্বামীর একটা স্বকীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি সে হতভাগ্য বিদেশী যুবকটির উপর প্রয়োগ কর্‌বে। বুড়ী স্থির কর্‌ল আজ শোবার ঘরে ভীষণ ঝগ্‌ড়া কর্‌বে। নিজের ছেলে না হোক্ মায়ের ছেলে ত।

বাদলকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তার পদভরে মেদিনী টলমল করছিল। বাদল ভাব্‌ছিল, আছি, প্রবলভাবে আছি, কার সাধ্য আমার অস্তিত্ব ঘোচায়? মাটী আমার ভয়ে কাঁপছে, আকাশ আমার ভয়ে ঘুরছে, আমার শরীর যে তাপ বিকীরণ করছে তাতে আগুন লজ্জা পায়। হা হা হা। হা হা হা। মৃতদেহের শীতলতা এই দেহে আস্‌তে অনেক দেরি—হয়ত হাজার বছর। আমি যে মেথুসেলার দোসর হব না তার প্রমাণ কই? হা হা হা—that's the point. প্রমাণ কই? আমার মৃত্যু যে হবে, কিম্বা ইতিমধ্যে হয়েছে তার প্রমাণ কেউ আমাকে দিতে পার্‌বে না। বাদল হার্ট-ফেল করে মরেছে বলা বড় সোজা—কিন্তু বাদলের কাছে প্রমাণ করে দাও দেখি যে বাদল মৃত? মৃত্যুর্ণাস্তি প্রমাণাভাবাৎ।

৭

তা হলে দাঁড়াল এই যে বাদল নেই এ কথা অপরে এক-দিন বল্‌তে পারে, কিন্তু বাদল কস্মিন্‌কালে এর প্রমাণ পাবে না। পৃথিবীর লোকে বলে সূর্য্য অস্ত গেল, কিন্তু সূর্য্য কি জানে সে কখন অস্ত গেল, কেমন করে অস্ত গেল? অস্ত-গমন নয় অস্তিত্ব তার পক্ষে সত্য। তেমনি বাদলের পক্ষে সত্য, মরণ নয় অমরত্ব।

বেশ, তা না হয় হল—বাদল আবার তার ঘরের জানালার ধারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে টেনিস্ খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিন্তা কর্‌ছিল—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু অমরত্ব বল্‌তে কি এই বোঝায় যে বাদল কোনোদিন হার্ট ফেল কর্‌বে না, তার শরীরকে গোর দেওয়া হবে না, পৃথিবীর লোক তার অভাব বোধ কর্‌বে না? একি বিশ্বাস-যোগ্য যে তার চুল পাক্‌বে না, দাঁত পড়্‌বে না, মেরুদণ্ড বাঁকবে না, মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না, সে আজ যেমনটি আছে আশী বছর বয়সে তেমনিটি থাক্‌বে? না, না, আশী বছরের বেশী বাঁচা উচিত নয়, 'মানুষের যা প্রধান সম্পদ—মস্তিষ্ক-যন্ত্র - তার কলকব্জা ততদিন মজবুত থাক্‌বে না। মনন-ক্রিয়া পুরাণ ঘড়ির চলার মত মন্থর হবে, অনির্ভরযোগ্য হবে। কল যদি বিকল হয় তবে তার মত উৎপাত আর নেই।

লোকে যাকে বলে মরণ বাদলের তা চাইই। তবু সে যে আছে এ উপলব্ধি তার মর্‌বার নয়। সে মর্‌বে অথচ তার অস্তিত্বের উপলব্ধি মর্‌বে না, এ কেমনতর হেঁয়ালি? দেহ যদি যায়, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও যদি যায়, সেই সঙ্গে মননশক্তিও যদি যায়, তবে কোনো উপলব্ধি থাক্‌বেই বা কেমন করে আর থাক্‌লেই বা কি? বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। ধর্ম্মগ্রন্থে বলে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা যে কি তাই বাদল জানে না। আত্মা যে আছে তাই প্রমাণসাপেক্ষ। তবু ধরা যাক আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু আত্মা নিয়ে বাদল কর্‌বে কি যদি মন না থাকে, স্মৃতি না থাকে, মেধা না থাকে, বিচার-বুদ্ধি না থাকে? তবে কি ধরে নিতে হবে যে এগুলো আত্মার সামিল? তাই যদি হয় তবে দেহের বয়স অনুসারে এগুলোর বৃদ্ধি ও

হ্রাস ঘটে কেমন করে? মাথায় চোট লাগ্‌লে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় কেন?

গত রাত্রের পানভোজন বাদলকে সাময়িক উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দীর্ঘকালীন বিষণ্ণতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে তার স্মরণ থেকে বিদায় নিয়েছিল। কারণটা দৈহিক, কিন্তু ক্রিয়াটা চল্‌ছিল মনের উপর। বাদলের মন সেটা আঁচতে পার্‌ছিল না। পার্‌লে বল্‌ত, দেখ্‌লে ত? যা বল্‌ছিলুম। মন আত্মার অধীন নয়, দেহের অধীন। কিম্বা দেহের সঙ্গে তার সোদর সম্পর্ক, ওরা যমজ। মাঝখান থেকে আত্মাকে টেনে আন্‌বার দরকার ছিল না। আমি আছি এই কি যথেষ্ট নয়? আমার আত্মা যদি নাও থাকে তবে কি আমার অস্তিত্বের কোনো হানি হয়? সেকালে বল্‌ত স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। তা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের দ্বারা বংশরক্ষা হয়ে এসেছে, রাজ্য-শাসন শিল্পসৃষ্টি লোকসেবা হয়েছে। এখনো বলে পশু-পাখীর আত্মা নেই, কিন্তু পশুর মত স্বভাবত স্বাস্থ্যবান পাখীর মত স্বভাবত স্বাধীন হতে কোন্ মানুষের না সাধ যায়? আমি যদি ঐ Sea gullদের একতম হয়ে থাক্‌তুম তবে মস্তিষ্কের অভাবে আমার মননক্রিয়া বন্ধ হত কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি ঘট্‌ত কি? বরঞ্চ যখন যেখানে খুশী উড়ে বেড়ান যেত, ট্রেণ কিম্বা বাস্‌এর মুখাপেক্ষী হতে হত না, পাথেয় সংগ্রহ না কর্‌তে পেরে চারটি বছর ভারতবর্ষে অপচয় কর্‌তে হত না, বাধ্য হয়ে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে বিবাহের অভিনয় কর্‌তে হত না।

কে বল্‌বে কোটী কোটী ব্যাক্‌টিরিয়ার আত্মা আছে? তা হলে ত আমার দেহকে আশ্রয় করে কোটী কোটী আত্মা আছে বল্‌তে হবে। সংখ্যাতীত ব্যাধিবীজ যত্র তত্র বিচরণ কর্‌ছে। তাদেরও তবে আত্মা আছে? বাদল বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ল। টেনিস বলের আত্মা নেই? যে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে তার আত্মা নেই?

দেহ হচ্ছে অত্যন্ত ডেমক্রাটিক্ পদার্থ। সকলের তা আছে। মনও আছে সকলেরই, কিন্তু মস্তিষ্ক যতটুকু মনও ততটুকু, কিম্বা মস্তিষ্কের সম্ভাবনা যে পরিমাণ মনেরও সম্ভাবনা সেই পরিমাণ। মানুষ বড় কেন? কারণ মানুষের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মানুষের আত্মা আছে বলে মানুষ বড় এ যারা বলে তারা মানুষের প্রকৃত গৌরব যে মস্তিষ্ক তার চর্চ্চা করে না, তাই তাদের উক্তি যুক্তি নয়, তা বিচারের অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মত নিশ্চিন্ত হয়ে বাদল খেলা দেখ্‌তে থাক্‌ল। তার নিজের ইচ্ছা কর্‌ছিল খেল্‌তে, কিন্তু তার নিজের র‍্যাকেট ছিল না, পরের কাছে চাইতে লজ্জা কর্‌ছিল। দ্বিতীয়ত খেলার অভ্যাস নেই, কেন হাস্যাস্পদ হতে যাবে? এমনিতেই সে বিমর্ষ হয়ে রয়েছে। সে আছে, সে থাক্‌বে, কিন্তু তার দেহ মন যদি না থাকে তবে সে কি নিয়ে থাক্‌বে কেমন করে থাক্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। সে কি দেহমন-নিরপেক্ষ হয়ে থাক্‌তে পারে? যদি পারে ত 'সে' কে? আর 'আমি' কে? কোনো প্রকার রহস্য বাদল মানে না, ম্যাজিকের প্রতি তার উৎকট অশ্রদ্ধা। কিন্তু এ এক পরম রহস্য যে আমি আছি ও থাক্‌ব, অথচ আমি দেহমন-নিরপেক্ষ কি দেহমনেরই একটা বিশিষ্ট নামরূপ তাই বোধগম্য হচ্ছে না। আমি কি একটা compound যার সূত্র B^2CS^2? অথবা আমি যাবতীয় সংজ্ঞার অতীত?

এক তরুণীর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ের খেলা খেলাছাড়া অন্য কারণে দর্শনযোগ্য হয়েছিল। প্রৌঢ়টি বল serve কর্‌বার সময় ডান হাত উঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী কর্‌ছিল, কেবল মুখের নয় হাতেরও। তার হাত কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল। অথচ তার বল পড়্‌ছিল বেশ জোরের সঙ্গে এবং তরুণীর হাতের কাছ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তরুণী ফড়িঙ্গের মত লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রৌঢ়ের দিকে কোপ দৃষ্টিক্ষেপ কর্‌লে প্রৌঢ় দু একটা পয়েণ্ট তাকে দান করে মানভঞ্জন কর্‌ছিল।

এরা আজ সকালে টু সীটার্ মোটরগাড়ীতে কোত্থেকে এসেছে। চা খেয়ে আজকেই কোথায় চলে যাবে। হয়ত লণ্ডনের লোক। বাদলের ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, "কেমন আছে লণ্ডন? গুড্ ওল্ড্ লণ্ডন? কাগজে দেখ্‌ছিলুম মস্কো আর্ট থিয়েটার লণ্ডনে এসেছে। কেমন অভিনয় করছে তারা? চমৎকার। না? মেরিলবোনে কন্‌সারভেটিভ্‌রাই জিৎল? অবশ্য ওখানে ওরা সনাতন। তারপর? বাজেট নিয়ে পার্লামেণ্টে খুব তামাসা হচ্ছে? চার্চিল্ কেরোসিন ট্যাক্সের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে? চার্চিলের দোষ কি, আমিই জান্‌তুম না যে আমাদের দেশে কেরোসিনের বাতি জ্বলে ও সে বাতি গরীবরাই জ্বালায়।"

কিন্তু না। নীচের তলায় নামা হবে না। মনটাকে বিক্ষিপ্ত করা হবে না। আগে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাক্—কি নিয়ে চিরকাল থাক্‌ব?

লীলাময় রায়।

স্মৃতি ও প্রেম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

হেথা একজন চুপি চুপি দীপ জ্বেলে যায়!
আলোকের কণা নিবিড় তিমিরে মূরছায়—
সে শিখার' পরে দুটি চোখ্
গড়ে জীবনের মায়ালোক,
চারিপাশে তা'র এলোমেলো বায়ু কোথা ধায়!
জ্বালি' দীপটিরে লঘুপদে কে গো চ'লে যায়!

সে শিখার পাশে ঘুরে মরে মোর অলি-মন!
রঙের নেশায় মেতে ওঠে মোর এ ভুবন—
দীপ যে জ্বালিল, তা'রে আর
সারা ধরণীতে দেখা ভার!
হাসি-কান্নায় সে যে ভেসে যায় সারাক্ষণ—
নব দীপ জ্বালি' আলোকে ভরে সে গৃহকোণ!

শিশির রজনী যদি আসে, তবু একবার
আঁধার আকাশে তারায় হেরি যে আঁখি তার—
সে আমারে কহে: মরি নাই,
আমি কহি তা'রে: ভুলি নাই,—
দুজনের ভাষা ভেসে যায় দূর নিশা পার—
নির্দ্দয় দোলা দুলে উঠে—দোলে কেশভার!

হেথা একজন চুপি চুপি আসে পাশে মোর,
বলে: ওঠ ওঠ—তিমির ফুরায় নিশি-ভোর;
ক্লান্ত ললাটে দু'টি কর,—
কানে ভাসে তরু-মর্মর!
জাগর-অরুণ আঁখি 'পরে নামে ঘুমঘোর,
লঘুপদে সে যে চুপি চুপি আসে পাশে মোর!

তা'রে ল'য়ে মোর বাঁচিতে ধরায় বড় সাধ!
প্রভাত এখনো লভেনি দিনের সব স্বাদ;
পূর্ণ জীবন টলমল,
অশ্রু-হাসিতে টলটল—
সেই সুখছবি প্রাণে বহি, কোথা অবসাদ?
তা'রে ল'য়ে মোর বাঁচিতে ধরায় বড় সাধ!

আজো সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে, বাড়ে সুখনীড়
হেথা রচি মোরা স্বপন যে নব ধরণীর—
স্মৃতি আছে, তাই, আছে পথ
আছে জীবনের জয়রথ—
ছোট সে প্রদীপ, তা'রি তরে রাখি আঁখি-নীর!
আজো সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে—বাড়ে সুখনীড়।

ছুটির আয়োজন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাছে এল পূজোর ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেচে চাঁপা ফুলের রঙ।
হাওয়া উঠচে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।
মাষ্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,—
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়
ছবি দেখে আপন মনে,
কমল দিঘির ফাটল ধরা ঘাট,
আর ভঞ্জদের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষা
আতা গাছের ফলে ভরা ডাল;
আর গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা তিসির ক্ষেতে
গোয়াল পাড়ার ভিতর দিয়ে
চলে গেছে এঁকে বেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।
কলেজের ইকনমিক্‌স্‌-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ্দ নিচ্চে টুঁকে,—
চষ্‌মা চোখে মেডেল পাওয়া ছাত্র,
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিন্‌তে হবে,

ধারে মিলবে কোন্ দোকানে
মনে-রেখো পাড়ের সাড়ি,
সোনায় জড়া শাঁখা,
দিল্লির কাজকরা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে বাঁধাই করা
এন্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়চে না।
ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
সরু মোটা গলায় চলচে আলোচনা,
এবার আবু পাহাড়, না মাদুরা
না ড্যালহৌসী কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনালোকের দার্জ্জিলিঙ।
আর দেখচি সামনে দিয়ে
ষ্টেসনে যাবার রাঙা রাস্তায়
গলায় দড়িবাঁধা ছাগলের ছানা
—সহরের দাদন দেওয়া,—
টেনে নিয়ে চলেচে ;
তাদের কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে—
কেমন করে বুঝেচে তারা
এলো তাদের পূজোর ছুটির দিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৯



শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

আজ অবেলায় আনন্দহীন কলিকাতার বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তারপরে এরচেয়েও দুঃখময় বর্ম্মায় নির্ব্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবেনা, প্রয়োজনও ঘটিবেনা। হয়ত, এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গণিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা! তথাপি, মনের মধ্যে সন্দেহ নাই দশদিন পূর্ব্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিয়াছি তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে! অর্থাৎ, অমুকের জীবনটা যেন সূর্য্য-গ্রহণ চন্দ্র-গ্রহণের মতো তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাব। গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কষার বাহিরে দুনিয়ায় আর কিছু নাই। জানেওনা সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দ্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষও তীক্ষ্ণতায়, তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়া এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ষ্টেসনে চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাবার মতো। ট্রেণের সময় জানিনা, তাগিদও নাই,—শুধু জানি ওখানে পৌছিলে যখন হৌক গাড়ী একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথ গুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এ পথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গেছে। কিন্তু ঐ-না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান? তাই তো বটে। এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ার শেষ প্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মতো এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত, এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনিই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মতো, মাথাটা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুল গাছ যেমন হয় সেও তেম্নি। জনহীন পল্লী-প্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মতো চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল,—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছো? ভয় করেনা তো?

কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চল্‌লাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় পরিচিত ভারি একটি মিষ্ট গন্ধে চমক্ লাগিল—এদিক ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল,—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা-বৈষ্ণবীর আউশ ফুলের গন্ধ। ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলেনা, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙ্গিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যাড়া-বাঁকা গাঁটেভরা বুড়ো-মানুষের মতো তাহার চেহারা,—সেদিনের মতো আজও তাহার সেই একটি মাত্র সজীব শাখা এবং ঊর্দ্ধে গুটি কয়েক সবুজ পাতার মধ্যে তেম্‌নি গুটি কয়েক শাদা শাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি গোলকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান তো নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি, আর্শি-চিরুনি আলতা, তেলের মসলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশী প্রভৃতি লইয়া দুপুর বেলায় বাড়ী-বাড়ী বিক্রী করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজ-সরঞ্জাম। বড়ো ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোর-কাঁটা। এই কিনিতে যখন-তখন তাহার ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশ গাছের একটা শুক্‌নো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবা ঠাকুর, ও আমার দেব্‌তার ফুল, তুল্‌লে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানিনা,—হয়ত, খুব বেশি দিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি,—বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্ব্বর হইয়া বিছুটি ও বন-চাঁড়ালের গাছে-গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে,—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়া গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া, এবং তাহারি উপরে সেই শুক্‌নো ডালটি আছে আজও তেম্‌নি তেলে-তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই,—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে পথ আগ্‌লাইয়া আছে।

প্রায় পঁচিশবর্ষ পূর্ব্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্যে হইতে ভাঙা চালের নীচ দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা কঙ্কাল-সার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি তো?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস্?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুটা মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মতো আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এযে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুল-কাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস্ এখনো তাহার গলায়।

নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই,—অনশনে অর্দ্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও-না-কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, শুধু এ-ই কি এম্‌নি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাবার পূর্ব্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেলনা, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেব-দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নূতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির সখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায় মুগ্ধ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোন মতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেম্‌নি দুর্দ্দশায় পড়িয়া সেই রঙ্-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আল্‌তার বাণ্ডিল, দেখামাত্রই সেকথা আমার মনে পড়িল। আরও কি-কি যেন এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে-ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ীর এক কোণে এ যেন মৃত-শিশুর পরিত্যক্ত খেলা-ঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাঙা-চোরা জিনিস দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গেছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়া-মোছা করিবার তাগিদ গেছে ফুরাইয়া,—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা-ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এম্‌নি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম কেন এমন হয়? আর কোন-একটা-দিনে এসব দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তখনি গাড়ী মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবেনা। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশী বাজাইয়া সে যাত্রা সুরু করিল। ষ্টেসনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজল চক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয়না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল,—দশটা দিন মানুষের জীবনে কতটুকু, অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমল-লতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তারপরে চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুর সেবা। কি জানি, দিন-দশেকের সাথী নতুন-গোঁসাইকে ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে।

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদ-পদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেননা।

তাই হোক্। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই,

জোর করিয়া কোন-কিছু কামনা করিতেও জানিনা,—সুখ দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি, এতটা কাল কাটিল শুধু পরের দেখা-দেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্ব্বাহিত হয়না। দ্বিধায় দুর্ব্বল সকল সঙ্কল্প, সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধকরি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়া-রূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বারবার স্মিত-হাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমল-লতা। ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিচিত্তের অশ্রু-জলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার তো সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁদেরই দেওয়া কীর্ত্তনের সুর,—মর্ম্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই,—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল চলোনা গোঁসাই এখান থেকে যাই। গান গেয়ে পথে-পথে দুজনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই কিন্তু আমাকে বাধিল। আমার নাম দিল সে নূতন-গোঁসাই। বলিল, ও-নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত-জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিঘ্ন ঘটিবেনা। বৈরাগী দ্বারিকা দাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ ও স্বার্থে মিশা-মিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথাও কেহ আছে? জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শীকারের আয়োজনে কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দল-বল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনে দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি! যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারিনাই,—সেদিন শ্মশান-পথে তাহার সে কি ব্যগ্র-ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশ্বাসে সে কি তীব্র অভিমান। পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বল্‌লেই তোমাকে যেতে দেবো নাকি? কই যাওতো দেখি! এই বিদেশে বিপদ ঘট্‌লে দেখ্‌বে কে? ওরা না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চির-দিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিলনা,—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইলনা।

আরায় পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়ীতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারেনা,—এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে,—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তার পরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানিনা বলিয়া নয়,—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমল-লতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্য্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ।

ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মতো আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেনা।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকুরিতে? নূতন তো নয়,—সেদিনেই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হবে? কেবল কমল-লতাই তো বলে নাই, দ্বারিক গোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যে ভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকি নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে-কবে লাভ করিয়াছে?

•

গাড়ী আসিয়া হাবড়া ষ্টেসনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিস-পত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা' কিছু বাকি সমস্ত চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকুরি, রহিল আমার বর্ম্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম,—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিলনা। হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম,—রতন, কখন্ এলিরে?

—এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া,—আলিসিতে একটু খানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

—বেশ করেছিলে। খাওয়া হয়নি?

—আজ্ঞে না।

—তবেই দেখ্‌চি মুস্কিলে ফেল্‌লি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুসি হইয়া কহিল, তবে তো ভালই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারবো।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপ্‌তে বিনয়ের অবতার। কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা' হলে কাছাকাছি কোন দোকানে খুঁজে ত্যাখ্ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আন্‌তে পারিস্। কিন্তু শুভাগমন হলো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে না কি?

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখা-লিখিতে অনেক ভজকটো। যা' বলবার তিনি মুখেই বল্‌বেন।

—তার মানে? আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

—আজ্ঞে, না। মা নিজেই এসেছেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কিছু তো একটা করা চাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্য্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়ীতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে! না বাবু, আমরা চারদিন হলো এসেছি,—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্চি। চলুন?

—কোথায়? কতদূরে?

—দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ী ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর এক দফা জামা কাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারে কোন্-একটা গলির মধ্যে একখানি দোতালা বাড়ী, সুমুখে প্রাচীর-ঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান; রাজলক্ষ্মীর বুড়া দরওয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল,—তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না,—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাবুজি?

বলিলাম, হাঁ তুলসী দাস ভালো আছি। তুমি ভালো আছো?

প্রত্যুত্তরে সে তেম্‌নি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিতে কুর্ম্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙ্‌লা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দ-সাড়ায় বোধ করি সেই মাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক্‌ দিয়া রতন এ বাড়ীতে আপন মর্য্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্য্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁট্‌চো বাবা, তামাকটুকু পর্য্যন্ত সেজে রাখ্‌তে পারোনি? যাও জল্‌দি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর,—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুলকাটা জাজিম ও গোটা দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত, অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি, এবং ইহারই অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসচ্ছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটাও খোলা, এ ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নূতন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেম্‌নি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাবার পূর্ব্বে এগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিলনা, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা?

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলাম।

—কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থ-দেহে ওঁকে যে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌তে পেরেছি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নূতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ আর ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়-জলে স্নান করিয়া যেন সে নব-কলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়ীটার বিলি-ব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ, তাহার একটা-বেলার গাছ-তলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে,—গোটা কয়েকমাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরণের কাপড়-খানা দামী নয়,—সাধারণ মিলের শাড়ী,—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশে পাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অতো দেখ্‌চো?

—দেখ্‌ছি তোমাকে।

—নতুন নাকি?

—তাইতো মনে হচ্চে।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—না।

—মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে তুমি কি করবে বলো ত? বলিয়াই খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুড়ে ফেলে দেবেনা তো?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচো নাকি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক্‌, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারি হইয়া

উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি ক'রে কেটেচে?

—হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানবো কি ক'রে?

—হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বৈকি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাবো। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেবো? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্ছি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা ক'রে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলার কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না,—রান্না-ঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হলো?

বলিলাম, চোখে দেখেনি, কানে শুনেচি ভালোই হয়েছে।

—চোখে দেখোনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক্ করলে। আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

—সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু ছিলে কোথায়?

বলিলাম, মুরারীপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বই কি। বোষ্টুমীরা ওখান থেকেই তো পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসতো। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

—সেইখানে ছিলাম।

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল,—সেই বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা,—বল কি গো? তাদের যে শুনেচি সব ভয়ঙ্কর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা' তোমার অসাধ্যি কিছু নেই। আরায় যে মূর্ত্তি দেখেচি! মাথায় জট পাকানো, গলায় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে হাসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উল্কি-পরা অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো—

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেবো। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, কিন্তু বলিল, সে তোমার মতো বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লিজ্জায় মরে যাবে। সংসারে তোমার মতো ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে ভীতু বলে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলতো আমাকে অহঙ্কারী,—দাম্ভিক!

—কেন, তার কি করেছিলে?

—কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুন গোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার মতো উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে?

—বললে, এ রকম উদাসীন, বৈরিগীমনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কিনা আমি দুর্দ্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটে নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না,

কহিল, তোমার উদাসী মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈষ্ণবীদের প্রতি ওরূপ ভাষা অতিশয় সম্মান হানিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ। তিনি তোমার তো নাম দিলেন নতুন-গোঁসাই, কিন্তু তাঁর নামটি কি?

—কমল-লতা। কেউ-কেউ রাগ করে কম্‌লি-লতাও বলে। বলে, ও যাদু জানে। বলে, ওর কীর্ত্তন-গানে মানুষ পাগল হয়। সে যা' চায় তাই দেয়।

—তুমি শুনেচো?

—শুনেচি। চমৎকার।

—ওর বয়েস কতো?

—বোধহয় তোমার মতোই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

—দেখ্‌তে কেমন?

—ভালো। অন্ততঃ, মন্দ বলা চলেনা। নাক-খাঁদা, উল্কি-পরা যাদের তুমি দেখেচো তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেচি। যে-ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন কোরত ত?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা' করুক। যে সাধ্যি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরিগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাবো কোথাকা'র কে-এক কমল-লতাকে? ছি। এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশ্বাস পড়িল। বোধহয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁস হইল। মোটা-তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোর ছায়াটা তার মস্ত বড় বীভৎস জন্তুর মতো কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধহয় এইমাত্র চোখে-মুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এ রকম কলকাতায় চ'লে এলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন মন-কেমন করতে লাগলো যে কিছুতেই টিকতে পারলাম না, ভয় হলো বুঝি হার্ট ফেল করবে,—এ জন্মে আর চোখে দেখ্‌তে পাবোনা। এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জ্বালায় মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনে এম্‌নি অন্ধকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেলো কিন্তু পরিবর্ত্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠার মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, বউমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে, তাই।

—তার বেশি কিছু নয়?

—কিছু নয় তা বলিনে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারেনা।

—কিন্তু আমি কি দুঃখ তোমাকে কখনো দিয়েচি লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ, আমিই তোমাকে আজ পর্য্যন্ত কত দুঃখই না দিলাম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় কোরলাম, খেয়ালের ওপর তোমার অসম্মান হতে দিলাম,—তার শাস্তি এখন তাই দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌চে? দেখ্‌তে পাচ্ছো ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা'হলে মন্তর পড়ে কেউ দুচোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মতো কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা

মিট্‌লোনা, কোথাথেকে এসে জুট্‌লো ধর্ম্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলাম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হলোনা, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলাম।

তাহার দুই চোখ জলে টল্‌ টল্‌ করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরলো। খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেলো শুকিয়ে, এলো-মেলো কত-কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ড নেই,—গুরুদেব তখনো বাড়ীতে ছিলেন তিনি কি-একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশহাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলাম কই? মনের মধ্যে হুহু করে, পুজোয় বস্‌লেই দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে,—এম্‌নি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়লো।

—কে ধরলে,—গুরুদেব? এবার বোধহয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

—হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

—তাই দিও তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাট্‌লো। কোথা দিয়ে যে কাট্‌লো জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলাম। গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বোল্‌লাম, মা, চিঠিখানা সময় থাক্‌তে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন কোরে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে।

—স্বীকার করো?

—করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় এক মুহূর্ত্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস কোরো। এত পাপে ডুবে থেকেও এ আমাদেরই সম্ভব। পুরুষে সত্যিই এ পারে না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রী কোরত। বুড়ো আমাকে বড় ভালোবাসতো, আমাকে বেটি বলে ডাক্‌তো। আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, বেটি, তুম ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতাম, বল্‌লাম সাউজি, আমি কলকাতায় যাবো আমাকে একটা বাড়ী ঠিক করে দিতে পারো?

সে বল্‌লে, পারি। বাঙালী পাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ী ছিল, সস্তায় কিনেছিলো, বল্‌লে, চাও তো বাড়ীটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি। সাউজী ধর্ম্ম ভীরু লোক তার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজি হয়ে তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে টাকা দিলাম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এসব জিনিসপত্র কিনে দিয়েছে। ছ'সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এলাম, মনে মনে বল্‌লাম, মা অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেছো, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘট্‌তো না। দেখা তাঁর আমি পাবোই। এইতো দেখা পেলাম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্ম্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ তো চলোনা। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মন্দির আছে,—এ সব দেখ্‌তে পাবো।

কহিলাম, কিন্তু সে যে বড় নোঙ্‌রা দেশ লক্ষ্মী, শুচি-বায়ুগ্রস্তদের বিচার আচার থাকে না,—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি-একটা কথা বলিল ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো, শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপরে অসাড়ের মতো তেম্‌নি ভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস আমার গলার উপরে, আমার গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

'বলাকা'-র ছন্দ

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম-এ

আঠারো 'মাত্রা'র পংক্তি-সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে,' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি যে কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার ছন্দকে প্রবোধবাবু বলেন 'প্রবহমান' 'যৌগিক' ছন্দ। অমূল্যবাবু তাহাকে কেবল 'মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দকে তিনমাত্রার unitএ ভাগ করেন, তেমনি এই ছন্দকে দুইমাত্রার unitএ ভাগ করা চলে। প্রধানতঃ এই ছন্দের পংক্তিতে ৮+১০ মাত্রায় পর্ব্বভাগ হয়। পংক্তি-শেষের দুইমাত্রার একটি অর্দ্ধ-পর্ব্ব, এবং বাকী ষোল-মাত্রায় চার মাত্রার চারটি পর্ব্ব থাকে। কিন্তু এই চতুর্মাত্রিক পর্ব্বগুলি কেহ বা অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে, কেহ বা দুইপাশে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেয়। তাই এ-ছন্দে ৪, ৬, ৮, ১০, এই যে-কোন যুগ্ম সংখ্যক মাত্রার পর যতি রাখা চলে। চতুর্মাত্রিক পর্ব্বের 'যৌগিক' ছন্দে এইভাবে যুগ্মসংখ্যক মাত্রার নানাবিধ সন্নিবেশের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব ছন্দ শিল্প রচনা করিয়াছেন। এ-ছন্দের দীর্ঘতম পংক্তি অষ্টাদশমাত্রিক, এবং এই আঠারোমাত্রাতেই 'বলাকা' কবিতারও দীর্ঘতম পংক্তি গঠিত হইয়াছে।

'বলাকা' কবিতার প্রত্যেক পংক্তির শেষে যতি পড়ে। যৌগিকে চার মাত্রার পর যে যতি পড়ে আমি তাকে 'অপ্রকাশ যতি' এবং আট ও দশ মাত্রার পর যে যতি পড়ে তাকে 'সপ্রকাশ যতি' বলিতে চাই। 'বলাকা'র ছন্দে প্রতি পংক্তির শেষে এই সপ্রকাশ যতি আছে, ৪, ৬, ৮ বা ১০ মাত্রাই হোক্ না কেন। সে-যতি কেবল 'অন্ত্যানুপ্রাসের' জন্য নহে; যাঁহারা কিছুমাত্র ছন্দোবদ্ধ ভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে জানেন, তাঁহারাই সে-যতি স্বীকার করিবেন। সে-যতির অস্তিত্বের কারণ যথাস্থানে বলিব। বলাকার ছন্দোবন্ধে কোথাও কোন অতিরিক্ত বা hypermetric মাত্রা নাই। প্রত্যেক পংক্তিতে যে মাত্রাগুলি আছে তাহা ছন্দ-পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত। 'তাজমহল' কবিতাতেও সেই কথা।

—শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল—

ইহার ভিতর 'শুধু থাক্'-কে যিনি ছন্দোবন্ধের বহির্ভূত 'আথর' বলিয়া গণনা করেন তিনি 'যৌগিক' ছন্দের পর্ব্ববিন্যাসের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। 'তাজমহল' কবিতার পংক্তিকে এইরূপ বিকৃতভাবে দেখিলে কবির উপর অবিচার করা হয়।

'বলাকা'র দীর্ঘতম পংক্তিতে পাই আঠারো মাত্রা, (৪+৪)+(৪+৪+২), অর্থাৎ চার মাত্রার চার পর্ব্ব ও দুই মাত্রার একটি অর্দ্ধপর্ব্ব। হ্রস্বতর পংক্তিতে এই চারমাত্রার পর্ব্ব এক বা একাধিকবার কমিয়া গিয়াছে, তাই পাইতেছি চৌদ্দ, দশ কিংবা ছয় মাত্রা। 'বাঁকা তলোয়ার', 'ঐ পক্ষধ্বনি', 'বেগের আবেগ', প্রভৃতি পংক্তিতে ৪+২ এই ছয়মাত্রারই বিচিত্ররূপ দেখা যায়। এইসব হ্রস্বতর পংক্তির প্রত্যেকটিকেই ঐ অষ্টাদশমাত্রিক পংক্তির-ই একটি খণ্ডমূর্ত্তি বলা চলে। দীর্ঘ পংক্তিটিকে নানাপ্রকারে খণ্ডিত করিয়া বিভিন্নস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; তাই 'যৌগিক' ছন্দের একটি অসাধারণ লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং যে-হেতু 'যৌগিক'ছন্দে ৪, ৬, ৮, ১০ এই যে-কোন যুগ্মসংখ্যক মাত্রা-সমষ্টির পর যতি পড়িতে পারে, সে-হেতু 'বলাকা'-ছন্দে আমরা এই নানাবিধ যুগ্মসংখ্যক মাত্রা-বিশিষ্ট হ্রস্বতর পংক্তির সাক্ষাৎ পাই। এই অসমান পংক্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাজাইয়া সমান পংক্তির স্তবকে রূপান্তরিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

'বলাকা'-ছন্দের প্রকৃত প্রাণ ইহার 'গতির আবেগ'—যে-আবেগে ইহার গতি যতিসমূহকে পরিপ্লাবিত করিয়া

একটানা প্রবহমান বেগে; একেবারে একটি পূর্ণ-ছেদে আসিয়া পাঠককে থামিবার অবসর দেয়। কিন্তু এই গতি-সত্ত্বেও এ-ছন্দের প্রতিপংক্তির অন্তঃস্থিত যতিটি অবলুপ্ত হয় নাই; সুরের টানে বা আবৃত্তির ঝোঁকে উহা কোথাও কোথাও পরবর্ত্তী পংক্তির সহিত একান্ত সংলগ্ন হইয়া পড়ে, এই পর্য্যন্ত।

এই যে প্রত্যেক খণ্ডিত পংক্তিতে যতি, এবং এই যে পংক্তির প্রান্তে প্রান্তে মিল, অথচ এই যে প্রত্যেক খণ্ডিত পংক্তির অন্তরেও পরিপূর্ণ আঠারো মাত্রার সম্ভাব্যতা যার শক্তি পাঠকের কণ্ঠকে প্রবলবেগে আরও দূরে টানিয়া নিয়া যায়,—ইহাই 'বলাকা'-ছন্দের বৈশিষ্ট্য। 'অমিতাক্ষর' ছন্দে পংক্তির এই প্রমুক্ত গতি নাই, কারণ সে-ছন্দে যেখানেই ৬, ৮, বা ১০ মাত্রার পর যতি পড়িয়াছে, সেখানেই আবার তাহাকে আর একটি বা ততোধিক পর্ব্বে পরিপূর্ণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট চৌদ্দ অথবা আঠারো মাত্রার পংক্তিতে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'অমিতাক্ষরে' ছেদ ও যতির যতই বিয়োগ ঘটুক না কেন, উহার আবৃত্তিতে পংক্তির পরিমাণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, কিন্তু 'বলাকা'র আবৃত্তি শুনিয়া পংক্তিসংখ্যা সহসা নির্ণয় করা দুরূহ।

'বলাকা' কবিতাটিকে কোনমতেই সাজাইয়া অষ্টাদশ-মাত্রিক বা চতুর্দ্দশমাত্রিক 'অমিতাক্ষরের' পংক্তিতে সংগঠিত করা চলে না, এবং এরূপ করিতে যাওয়া অকবি-সুলভ অপকর্ম্মবিশেষ। ছান্দসিকরা অনায়াসেই অষ্টাদশমাত্রিক পংক্তির ৮+১০, ও চতুর্দ্দশমাত্রিক পংক্তির ৮+৬, এইরূপ পর্ব্ববিভাগ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাঁরা হাজার চেষ্টা করিয়াও সমগ্র 'বলাকা' কবিতার ছন্দে যথেচ্ছ পংক্তি-সমাবেশ করিলেও সে-রূপ পর্ব্বভাগ করিতে পারিবেন না। এমন কি কবির অসাবধানতায় যদি পর পর কয়েক পংক্তিতে ঠিক্ আট ও দশ মাত্রার মধ্যে সপ্রকাশ যতি পড়িয়া যায় তাহা হইলে ছন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠে; কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দে অর্থাৎ মুক্তক ছন্দে এই monotonyর কোন অবকাশ বা সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই সাধারণ 'অমিতাক্ষর' যৌগিক ছন্দ প্রবাহিনীর ন্যায় মুক্তগতি হইলেও 'বলাকা'র ছন্দ বসন্তবায়ুর ন্যায় মুক্ততর-গতি। অতএব 'বলাকা'-ছন্দকে একটি বিশিষ্ট নামে অর্থাৎ 'মুক্তক' নামে অভিহিত করিলে ক্ষতি কি?

অতঃপর ঠিক ইংরাজী free verseকেই 'মুক্তক' বলা হইয়াছে এরূপ যিনি ধারণা করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রবোধ বাবুর নিম্নলিখিত উক্তি দুইটি পড়িতে অনুরোধ করি:—

"বিদেশী free verse এবং আমাদের 'মুক্তক'ছন্দ বাইরের আকৃতিতে সদৃশ হ'লেও, ও-দু'ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি কখনও এক নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রেখে ছন্দকে মুক্তিদান করার যে কৃতিত্ব, ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে থাক্‌লেও রবীন্দ্রনাথের সে কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকবে।"

"মুক্তক ছন্দকেও পর্ব্বগঠন ও যতিস্থাপন সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়; কিন্তু পংক্তি ও শ্লোক নির্ম্মাণ এবং মিলস্থাপন বিষয়ে এ ছন্দের প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দগঠনের মূলতত্ত্বগুলিকে এ ছন্দে রক্ষা করতে হয়, অন্যবিষয়ে এর গতি প্রকৃতি বিধিবদ্ধ নয়" (বাংলাছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান পৃঃ ২৪ ও ২৫)।

শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক



প্রশ্ন শেষ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হয়তো তোমায় বাসিই নি ক' ভালো
হয় তো ঘন অন্ধকারে দেখেছিলাম ভুল আলেয়ার আলো ;
কেনই জানি, এই কথাটা ভুলেও মনে ভাব্‌তে ব্যথা পাই।
আজ আমাদের এতদিনের সুদীর্ঘ এই পরিচয়ের পরে,
(একটি জীবন, তাহার মাঝে এই ক'বছর অল্প তো নয় ভাই)
সুদীর্ঘকাল ধর্ণা দিয়ে তোমার প্রাণের দোরে
মনটা তোমার আমার মনে পরম যত্নে রাখ্‌তে গিয়ে বেঁধে
বিফল হয়ে ভাব্‌ছি বসে' মনটা ক'রে কালো,
ভুল করেছি, তোমায় আমি কোনো কালেই
বাস্‌তেম না ভালো !

তুমিই বল সত্যি ক'রে—ভাব্‌লে এমন দোষ কিছু কি আছে ?
কাঁটাপথে অন্ধ হয়ে আলোক হ'তে অন্ধকারের পানে
ব্যাকুলপ্রাণে দারুণ ছুটে' কল্পপ্রেমের মায়ামৃগীর পাছে
রক্তমাখা ক্লান্তপরাণ বিদ্ধ হয়ে নিষ্ফলতার বাণে
বুকফাটা তার বেদন নিয়ে বলেই যদি কেঁদে,—
'নেই কিছু নেই আগাগোড়া সমস্তটাই ফাঁকি'
কেমন ক'রে বল্‌তে পারি এমন কোনো দোষ হয়েছে তাতে ?
ভুলের পাছে অনেক ঘুরে' এখন আমার জান্‌তে যে নেই বাকী
মগজটারি ভাপের তাপে ফুলিয়ে-তোলা বৃহৎ জীবনটাতে
বেশীর ভাগই ফানুষপারা, ভেতর ফাঁপা,
হাল্কা হাওয়ার থেকে।

হায় অভাগা, এতটা দিন এক্‌লা বসে' বসে'
আপনমনে শূন্যভরে ফোটালি তুই এ কোন্ আকাশ-ফুল ;
সব বিকিয়ে দেউলে হয়ে, হায়রে মূঢ়, করেছিস্ কি ভুল ?
মাটির পানে তাকিয়ে তাহার পায়ের রাঙা দেখে
বাকীটুকু মনের মতন, মনে-মনেই তুল্‌লি নিজে গড়ে',
প্রাণের পাত্র কল্পনারি রঙীন্ নেশার ফেনায় নিলি ভরে'।
আজকে হঠাৎ অন্যমনে ওপরপানে চেয়ে
দেখ্‌তে পেলি সুধার নীচে কে রেখেছে বিষের জ্বালা ঢেকে ;
পাপ্‌ড়ি ফুলের প্রথম থেকেই হাজার হাজার
কাঁটায় আছে ছেয়ে।
অনেক ভ্রমর মৌমাছিতে ভিড় করেছে, মরছে ধুঁকে কত,
চোখ্ তুলে তুই দেখ্‌লি কি না আজ্‌কে যখন সময় হ'ল গত।

যা'ক্ সে কথা, এই জীবনে পূর্ণ তো আর হয়না সকল আশা,
স্বপ্ন তো ভাই দেখ্‌ছি কতই, হাতের মুঠোয় সব
নাহি যায় পাওয়া
তবু তোমায় একটু শুধাই, আমার প্রাণের গভীর ভালবাসা
এক্‌টু আঁচড় কাট্‌ল নাকি (আজ মনে হয় মর্ম্মেপড়া)
তোমার নারী প্রাণে ?
হয়তো তখন সকল কথা সহজ ক'রে বল্‌তে পারি নাই,—
—নূতন প্রেমের সঙ্কোচেতে গুছিয়ে বলা সহজ তো নয় ভাই—
নানাপ্রকার লোকের নানা অর্থবিহীন তর্কালাপের ভয়ে
মনের বনের আধেক ফোটা অনেক ফুলরাশি
ছিঁড়তে হ'ল সঙ্গোপনে কান্না চেপে, নিজেরি দুই হাতে।
সেদিন প্রাণের সকল কথার তুমিই কি গো আর
আপন ব্যথার দরদ দিয়ে সহজমনে কর্‌তে সুবিচার ?

তাওতো প্রাণে অনেক দ্বিধা, শঙ্কা লয়ে অনেক
জনস্রোতের হট্টগোলে নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে-দেওয়া
আমার সকল গানে
ভাষার জালের পর্দ্দাঢাকা বাতায়নে সকল কবিতার
আব্‌ছা-আলোয় ক্ষণে-ক্ষণে পড়্‌তো নাকি
তোমার তনুর ছায়া,
ললাট ঘিরে ঢেউখেলানো চূর্ণ তব কুন্তলেরি মায়া !

দেখ্‌তে পেয়েও দেখ্‌তে নাক, কিম্বা আধ-অহঙ্কারের বশে
ভাব্‌তে, 'এতো প্রাপ্য আমার, আমি নারী,
আমার এতে নিত্য অধিকার ;'
কিম্বা নিজের অগোচরেই ভাব্‌তে, 'যে-প্রেম এতই সুলভ তার
ঋণ-পরিশোধ একটু হাসির উপেক্ষাতেই,
অধিক কি দরকার ?'
নূতন প্রেমের মত্ত নেশায় নূতন পথে যাত্রা হ'ত সুরু,
নূতন ক'রে অবোধ মত কিশোর বুকে হান্‌তে ভ্রমর-ভুরু !

হায় রমণী, এই যে তোমার হৃদয় নিয়ে নেহাৎ ছেলেখেলা
হার যে এতে হ'ল তোমার, সময় এল সেইটে বলে যাবার।
এই জীবনের সকল কাজে কোলাহলের মাঝে
নিজেই আমি সকাল-সাঁঝে চিনি-নি হায় যাকে,
বুকের গোপন অন্ধকারায় ঝিমিয়ে-পড়া আমার আমিটাকে
তোমার চোখের দৃষ্টি, তোমার নিঃশ্বাসেরি
হাল্কা হাওয়ার ছোঁওয়া,
জগৎভরা বিপুল প্রাণের উৎসবের ওই অঙ্গনেতে আবার
নূতন ক'রে নূতন প্রাণের স্পন্দনেতে জাগিয়ে দিয়ে গেল,
সেদিন থেকে অবিশ্রান্ত চলেইছে যে আজো
চেষ্টা আমার আপনাকে তার আসলরূপে পূর্ণ ক'রে তোলার।
যা'ক্, এ আমার নিজের কথা, তোমায় কেন
বিরক্ত আর করা !
মনের কথা মনেই থাকুক্, পরের কাছে প্রকাশ মিছে করা।

তুমি ভালো বাস্‌ছ কিনা ? আমি ভালো বাসি কি নাই বাসি ?
প্রথম কান্না পেলেও এখন ভাব্‌তে এসব সত্যিই পায় হাসি।
এই যে নূতন জীবন পাওয়া, এই যে বাঁচা, এই তো মহৎ পাওয়া
দু-চোখ্‌ জলে ভিজিয়ে কেন অনন্তকাল কেবল আরো চাওয়া !

নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী শ্রীমনীষী দে

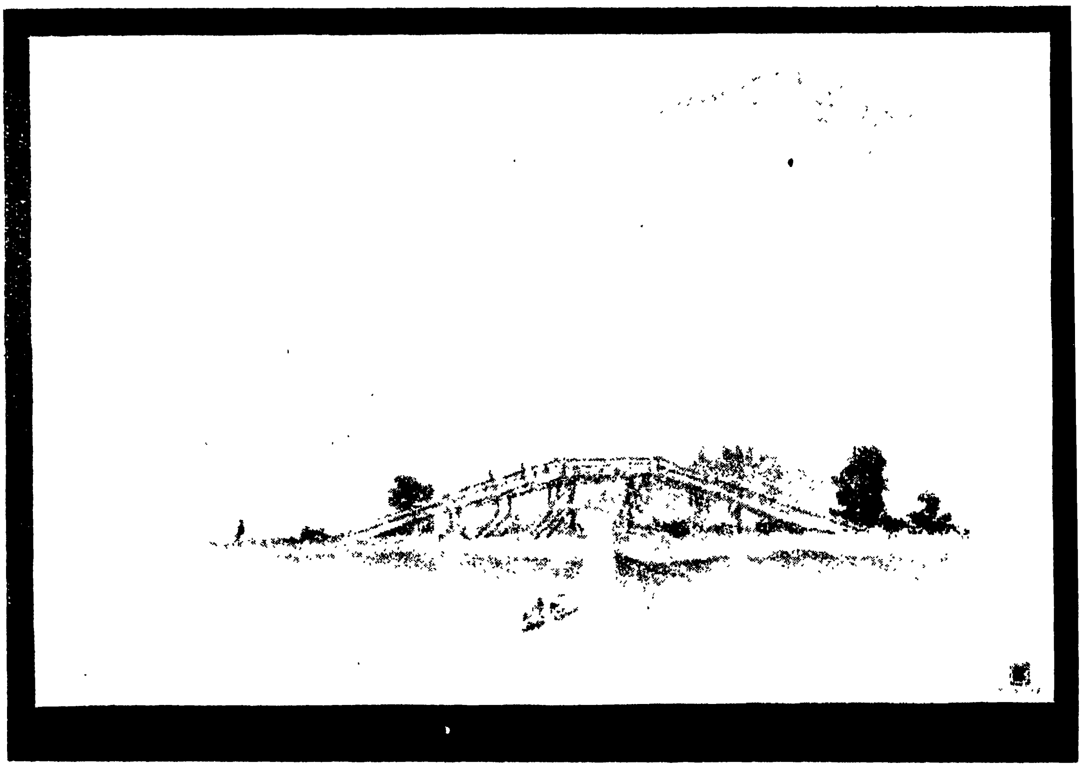
বর্তমান সংখ্যা বিচিত্রার চিত্রশালায় আমরা শিল্পী শ্রীমনীষী দের অঙ্কিত সাতখানি চিত্রের অনুলিপি প্রকাশিত করিলাম। কিছুদিন পূর্বে মনীষী বাবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। এ ছবিগুলি কাশ্মীরেই তথাকার পাহাড় পর্বত হ্রদ নদী নরনারী অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত। আসল ছবির সকলগুলিই বহুবর্ণে অঙ্কিত—সুতরাং সেগুলিতে বর্ণবিন্যাসের যে অপরূপ সুষমা বর্তমান, অনুলিপিগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত। তথাপি অনুলিপিগুলি দেখিয়া শিল্পরসিক সুধীবর্গ আনন্দলাভ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট মনীষী বাবু সুপরিচিত। পূর্বে তাঁহার বহু চিত্র, রঙিন এবং এক-রঙা, বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিচিত্রার প্রথম যুগের সহিত যে-সকল লেখক এবং শিল্পীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, মনীষীবাবু তাঁহাদের অন্যতম। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি দীর্ঘকাল দেশভ্রমণে গিয়াছিলেন, সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। দেশভ্রমণে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাঁহার শিল্প-সাধনায় নিশ্চয় সহায়তা করিবে।

কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীমুকুলচন্দ্র দে মনীষী বাবুর অগ্রজ। শ্রীমতী রাণী দে, যাঁহার লিনোকাট চিত্রাবলী আমরা কিছুদিন পূর্বে বিচিত্রা চিত্রশালায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম, মনীষী বাবুর সহোদরা। সুতরাং মনীষী বাবুদের পরিবারে শিল্প-দেবতার একটু যে কৃপাদৃষ্টি আছে তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রতিভার সহিত পরিশ্রম সংযুক্ত হইয়া এই উদ্যমশীল শিল্পীর সাধনা সফল হউক ইহাই আমাদের কামনা।

সম্পাদক





নিশাতবাগের পথে

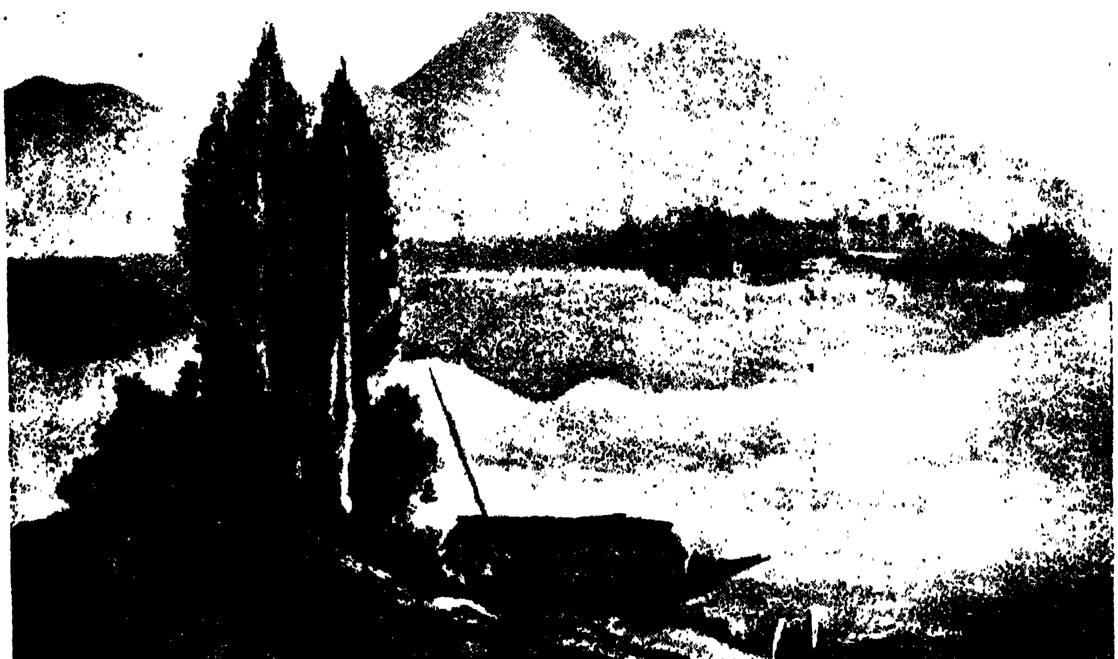
চিত্রশালা

শ্রীমনীষা দের

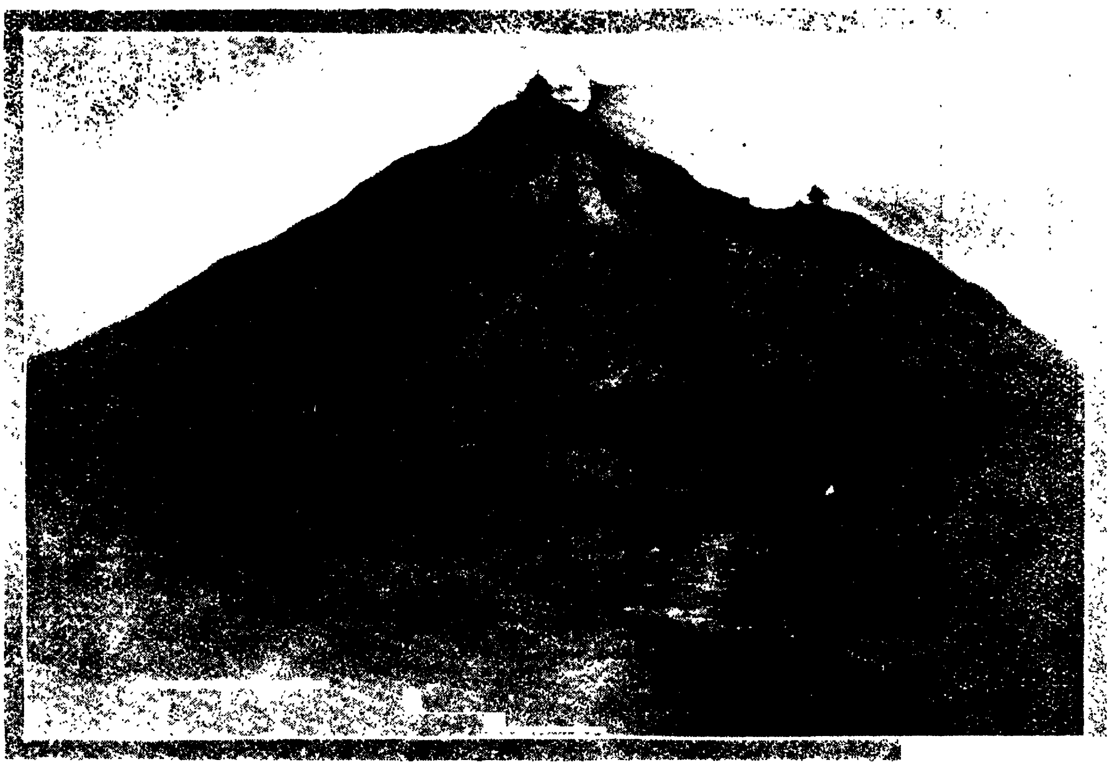
কাশ্মীর চিত্রাবলী



পাহালগামের পথে



চিনারবাগের ও-পার



চন্দ্রালোকে শঙ্করাচার্য্যের মন্দির



অন্ধ ভিখারী



পাহাড়ী মেয়ে



অবসর

বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-আর্‌-এস্‌

ইতিপূর্ব্বে জেনারেল সমরু এবং বেগম সমরুর কথা বলা গিয়াছে। এবার সমরুর বংশধরগণের বিবরণ দেওয়া যাইবে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার ইংরাজ বন্দীগণের হত্যাকাণ্ডের নায়ক সমরুর শেষ বংশধর কিরূপে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য হইয়াছিল এবং একজন বৃটিশ লর্ডনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিয়াছিল এবং ঐ বিবাহ হইতে কি জন্যই বা তাহার সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইয়াছিল এবারে তাহারই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

সমরুর পুত্র লুই ব্যালথাজার রীণহার্ড বা নবাব জাফর-ইয়ার খাঁর বিবাহ হইয়াছিল বেগম সমরুর সেনাদলভুক্ত কাপ্তেন লিফিভার নামক একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর কন্যা জুলিয়ানা বা 'বহুবেগমে'র সহিত। ১৮ই অক্টোবর ১৮১৫ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে জুলিয়ানার দেহান্ত হয়, সার্দ্ধানার ক্যাথলিক কবরস্থানে তাহার সমাধি অবস্থিত আছে। জুলিয়ানা ও লুইর একটি কন্যা হইয়াছিল; তাহার নাম জুলিয়া আনা বা বেগম সাহেবা (জন্ম ১৭ই নবেম্বর ১৭৮৯)। কর্ণেল জর্জ্জ আলেকজাণ্ডার ডেভিড ডাইস নামক একজন স্কচবংশোদ্ভূত ইউরেশীয় সৈনিক-পুরুষের সহিত জুলিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। জর্জ্জের পিতা লেফটেনাণ্ট ডেভিড ডাইস কোম্পানীর সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী ছিল, জর্জ্জের মাতা ভারতবর্ষীয়া রমণী। শৈশবে কলিকাতার "মিলিটারী অরফান স্কুলে" প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া জর্জ্জ সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। বেগম সমরু তাঁহার বন্ধু ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ সার ডেভিড অক্টারলোনীকে তাঁহার পালিতা পৌত্রী জুলিয়ার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে উক্ত জেনারেল মহাশয় এই জর্জ্জ ডাইসকে মনোনীত করিয়াছিলেন। অতঃপর জর্জ্জ সার্দ্ধানায় বেগমসকাশে প্রেরিত হয় এবং ৮ই অক্টোবর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জুলিয়ার সহিত তাহার মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

জর্জ্জ ও জুলিয়ার ছয়টী পুত্রকন্যার মধ্যে তিনটি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়, সুধু একটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জীবিত থাকে। পুত্রটীর নাম ডেভিড অক্টারলোনি ডাইস-সোম্ব্র (জন্ম ৮ই ডিসেম্বর ১৮০৮)। বেগম সমরু মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহাকেই নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। নানা কারণে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এই ব্যক্তির নাম সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কন্যা দুইটির নাম এন মেরী (জন্ম ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮১২) এবং জর্জ্জিয়ানা (জন্ম ১৮১৫)। জুলিয়ার মৃত্যুর পর (১৩ই জানুয়ারী ১৮২০) বেগম সমরু তাহার পুত্রকন্যাদের সকল প্রকার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেয়ে দুইটি বড় হইলে পরে বেগম তাঁহার দুইজন সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের বিবাহ দেন (৩রা আগষ্ট ১৮৩১)। এনের বিবাহ হয় কাপ্তেন জন রোজ ট্রুপ নামক একজন ইংরাজের সহিত, এই ব্যক্তি এককালে কোম্পানীর সেনাদলে ছিল। জর্জ্জিয়ানার বিবাহ হইল ব্যারণ পিটার পল মারি সোলারলি নামক একজন ইটালীয় ভাগ্যান্বেষীর সহিত, উত্তরকালে ঐ ব্যক্তি মার্কুইস ব্রিওনা নামক মহাগৌরবপূর্ণ উপাধির অধিকারী হইয়াছিল। বলাবাহুল্য উভয় পাত্রই বেগমের নিকট হইতে মূল্যবান যৌতুকাদি লাভ করিয়াছিল।

বেগম সমরু জুলিয়ার স্বামী কর্ণেল ডাইসকে প্রথমটায় খুবই স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার জায়গীর সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান তিনি জর্জ্জের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন কি এক সময়ে তিনি জর্জ্জকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ রুক্ষ মেজাজ ও গর্ব্বিত আচরণের জন্য জর্জ্জ শীঘ্রই বেগমের

অপ্রিয় হইয়া পড়িল এবং ১৮২৭ সালে তাহাকে বেগমের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার পরিত্যাগ করিতে হইল। কেহ কেহ বলেন যে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত ডাইস বেগমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বেগম একথা জানিতে পারিয়া জর্জ্জকে কর্ম্মচ্যুত করেন। অতঃপর বেগম তাঁহার সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্যের ভার জর্জ্জের পুত্র ডেভিডের প্রতি সমর্পণ করিলেন। বলাবাহুল্য, ইহার পর হইতে কর্ণেল ডাইস বেগমের প্রতি ঘোরতর শত্রুভাবাপন্ন হইয়া রহিল, এমনকি নিজ পুত্রের প্রতিও আর তাহার স্নেহসম্বন্ধ রহিল না।

বেগম সমরু ডেভিডকে নিজ গর্ভজাত পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার শিক্ষাবিষয়ক উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মীরাটের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাদ্রি রেভারেণ্ড ফিসার কিছুকাল বালকের গৃহশিক্ষক ছিল। ডেভিড পরে দিল্লী কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিল। এইরূপে ডেভিড ইংরাজী এবং তখনকার দিনে অপরিহার্য্য ফারসী ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিল। দয়ালু, সরলচিত্ত, কর্ম্মঠপ্রকৃতির যুবককে যে দেখিত সেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। শারীরিক গঠনে ডেভিড কতকটা স্থূলদেহ ও কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহার মুখেচোখে একটা বুদ্ধিমত্তা ও কোমলপ্রকৃতির বিকাশ দেখা যাইত। বেগমের বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকার্য্যে তাহাকে গুরু পরিশ্রম করিতে হইত এবং খুব ভালভাবেই সে তাহার কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিত। বেগমের স্নেহ ও উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য ডেভিড অনেকেরই মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছিল এবং ইহাতেই পরিণামে তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।

বেগম সমরু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নিজ উইল প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরিজনবর্গ এবং আশ্রিত ও অনুচরবৃন্দকে প্রদত্ত জানবাদে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার তিনি ডেভিডকে দিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্লিমেন্স ব্রাউন নামক কোম্পানীর একজন সৈনিক পুরুষ এবং ডেভিড বেগমের উইলের অছি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উইল ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উর্দ্দু ভাষা অনভিজ্ঞা বেগমের উহাতে প্রত্যয় না থাকায় তিনি আবার ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৪ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ মীরাটের তাবৎ অসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দকে সার্দ্ধানার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের সকলকার সম্মুখে ফারসীভাষায় রচিত এক দানপত্রের দ্বারা নিজের যাবতীয় ধনসম্পত্তির অধিকার ডেভিডকে প্রদান করিলেন। সেইদিন হইতে ডেভিড নিজ ডাইস নামের সহিত 'সোম্ব্রে' নাম যোগ করিয়া সমরুপরিবারভুক্ত হইলেন। এই দানপত্রের কথা সরকারী ভাবে গভর্ণমেণ্টকে জানান হইলে, এই ব্যবস্থায় কোনও আপত্তি করা হয় নাই বা জায়গীর বাদসাপুরের অধিকার লইয়া কোনও কথা তোলা হয় নাই; যদিও বেগম উক্ত দানপত্রের দ্বারা উক্ত জায়গীরও ডেভিডকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী বেগমের মৃত্যু হইল এবং তাহার তিনদিন পরে ৩০শে জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট যমুনার পশ্চিমতটবর্ত্তী বাদসাপুর-ঝাড়সা এবং আগ্রাসুবার অন্তর্গত ভোগিপুরসাহগঞ্জ বেগমের এই দুইটি পরগণা অর্থাৎ সমরুকে প্রদত্ত সামরিক জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। তদ্ভিন্ন বেগমের যাবতীয় সামরিক সম্ভারও কোম্পানী দখল করিলেন। ২০শে জুন গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার যে সকল জায়গীর গভর্ণমেণ্টের অধিকারে আসিয়াছে তাহা অতঃপর গুরগাঁও জেলার অন্তর্গত করা হইল এবং অতঃপর বৃটিশ ভারতের আইনাদি তথায় প্রচলিত হইবে। ঐ দুইটি পরগণা বাদে দিল্লী, মীরাট, আগ্রা, ভরতপুর, সার্দ্ধানার অন্তর্গত বেগমের বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকার ডাইসসোম্ব্রে পাইলেন। তদ্ভিন্ন বেগমের মণিরত্ন অলঙ্কার, বসনভূষণ, প্রাসাদদুর্গ, আসবাবপত্র, যানবাহন, হস্তীঅশ্বাদি সকল সম্পত্তির অধিকার তিনি পাইলেন। এ সকলের মোটমূল্য কত তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। ১২ই মার্চ্চ ১৮৩৬ সালে মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে বেগমসমরু সুধু কোম্পানীর কাগজেই ৪৭ লক্ষেরও অধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডেভিড যখন ইংলণ্ডে উন্মাদ প্রতিপন্ন হন এবং তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য কমিটি নিযুক্ত হয়

তখন শুনা গিয়াছিল যে তাঁহার সম্পত্তির মোট মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। বেগমের মৃত্যুকালে বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাঁহার সম্পত্তির বার্ষিক আয় লক্ষ টাকারও উপরে।

বেগম সমরু নিজ চরমপত্রে তাঁহার আত্মীয়, আশ্রিত ও অনুচরবর্গকে যে সকল অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহাও পরিমাণে নিতান্ত অল্প নহে। এখানে সকলগুলির কথা বলার স্থান নাই, মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করা চলে। জর্জ্জ টমাসের পুত্র জন বেগমের অন্যতম পোষ্যপুত্র ছিল। বেগম জর্জ্জের বিধবা মারিয়াকে সাত হাজার, জনকে আঠার হাজার এবং তাহার স্ত্রী জোয়ানাকে সাত হাজার টাকা দিয়াছিলেন। জর্জ্জের অন্যতমপুত্র জেকব বেগমের সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী ছিল, জর্জ্জের আর এক পুত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহের খালসা সেনাদলের একজন সৈনিক ছিল। ইহাদের দুইজন এবং জর্জ্জের এক কন্যা বেগমের নিকট হইতে তাঁহার উইলে বহু অর্থলাভ করিয়াছিল। বেগমের সৈন্যাধ্যক্ষ ইটালী দেশাগত মেজর অ্যান্টনিও রেখেলিনি নয় হাজার, তাহার স্ত্রী ভিকটোরিয়া এগার হাজার, উহাদের পাঁচ পুত্র ও কন্যা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার; বেগমের উইলের অন্যতম অছি কর্ণেল ব্রাউন সত্তর হাজার এবং চিকিৎসক ডাঃ টমাস ড্রেভার কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছিল। ডেভিডের দুই ভগিনী মেরী ও জর্জ্জিয়ানার জন্য বরাবরের মত পঞ্চাশ ও আশীহাজার টাকার সুদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ডেভিড ইংলণ্ড যাইবার প্রাক্কালে ইহাদের প্রত্যেককে দুইলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

ডেভিড গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাদসাপুর পরগণা অধিকার কোনমতেই সমর্থন করেন নাই। তবে তিনি এ বিষয়ে প্রতিবাদ এবং আবেদন নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন; আদালতের আশ্রয় অবলম্বন করেন নাই। ৪ঠা জুলাই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট সার চার্লস মেটকাফের (পরে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা অস্থায়ী গভর্ণরজেনারেল লর্ড মেটকাফ) নিকট প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত পরগণা অধিকার অন্যায় হইয়াছে যেহেতু বেগমের দানপত্র এবং উইলের বলে তিনিই উহার প্রকৃত অধিকারী। ছোটলাটের সেক্রেটারীপ্রদত্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আবার ২৩শে আগষ্ট তারিখে ডেভিড গভর্ণরজেনারেলের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার আবেদনপত্র আবার রিপোর্টের জন্য কেতাদুরুস্তভাবে বড়লাটের নিকট হইতে ছোটলাটের নিকট আসিল। ছোটলাট রিপোর্ট দিলে গভর্ণমেণ্ট ডেভিডকে ২১শে নবেম্বর জানাইলেন যে ছোট লাটের পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করিতেছেন এবং তাহা প্রত্যাহারের মত কোন কারণ দেখিতেছেন না। ইহাতেও হতাশ না হইয়া ডেভিড বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস এবং বোর্ড অব কমিসনার্স্-এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু না হওয়ায় পরিশেষে এক পত্র লিখিয়া রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ঐ দুই পরগণার অধিকার দান করিলেন!

সুবিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী যুবককে সৎপরামর্শ দিবার মত কোন হিতৈষী আত্মীয় বা অভিভাবক ছিল না। অতঃপর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইউরোপে গিয়া বাস করিবার এবং নিজ বিভবের ছটায় সকলকার তাক্ লাগাইয়া দিবার স্পৃহা ডেভিডের মনে প্রবল হইল। কতকগুলা কুসঙ্গীরও অভাব হইল না। উহারা এবং আরও অনেকে ডেভিডকে অনবরত উৎসাহ দিতে লাগিল। তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি ফীল্ড মার্সাল লর্ড কম্বারমিয়রকেও এই দলে ফেলা চলে, কারণ উৎসাহদানকারীদের অগ্রগণ্য ছিলেন তিনিই। বেগমের পুরাতন বন্ধু কর্ণেল জেমস স্কিনার তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি ডেভিডকে ফারসী কবিতায় রচিত একটি পত্রের দ্বারা নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা প্রাচ্যের লোক, প্রতীচ্যের সহিত আমাদের ঠিক বনিবে না।

কিছুতেই কিছু হইল না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যাত্রার অভিপ্রায়ে ডেভিড কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার যাত্রা বৎসরাধিক কালের মত স্থগিত হইয়া গেল।

বেগম সমরু সম্বন্ধে অনেক কথা তাৎকালীন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। "সমাচারদর্পণ" নামক পত্রে প্রকাশিত এইরূপ অনেক তথ্য বেগমসমরুর

ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে জীবনীলেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন। তাৎকালীন ভাষার নমুনা হিসাবে একাংশ এখানে দেওয়া যাইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি এখানে স্বীকার করা প্রয়োজন। ৪ মার্চ্চ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের "সমাচারদর্পণে" প্রকাশিত হইয়াছিল,

"মৃত বেগম সমরু আপন পৌত্র ডাইস সমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইসসমরুর পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে কর্ণলডাইস গত শনিবারে কলিকাতা সহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়া আপন পুত্রের নামে গ্রেফতারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তুল্য টাকার জামীন দিলেন। যেহেতুক কোম্পানীর খাজানাখানাতে তাঁহার তত্তুল্যোরো অধিক ৪০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত আছে।"

এখানে বলা প্রয়োজন কর্ণেল সাহেব বেগমের সম্পত্তির অছি হিসাবে ডেভিডের নামে বেগমের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য নয় বৎসরের বাকী বেতনের দাবীতে নালিশ করিয়াছিলেন। পিতাপুত্রের এ মোকদ্দমার বিবরণ "সমাচারদর্পনের" ভাষাতেই দেওয়া গেল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়,—"কিয়ৎকালাবধি সুপ্রিম কোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তাঁহার পুত্র ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে ঐ মোকদ্দমা রফা হইয়াছে এবং ডাইস সমরু পিতার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাকা দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা বোধকরি ঐ মুশাহেরা সম্পর্কীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন।"

পিতার সহিত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অল্পকাল পরেই তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাত্রাকালে তিনি ব্যারণ সোলারলিকে নিজ সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। পিতাপুত্রে এ জগতে আর সাক্ষাৎ হয় নাই, কারণ ডেভিডের যাত্রার অল্প কয়েক দিন পরেই হঠাৎ ওলাউঠা রোগে কর্ণেল ডাইসের মৃত্যু হইল (এপ্রিল ১৮৩৮)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদলের একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীরূপে ফোর্ট উইলিয়মে কবরস্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। জুন মাসে ডেভিড ইংলণ্ডে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরবৎসরের প্রারম্ভে তিনি ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বারাণসী রোম নগরে গমন করিলেন এবং তথায় মহা-সমারোহে বেগম সমরুর তৃতীয় শ্রাদ্ধবার্ষিকী নিষ্পন্ন করিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের কল্যাণকল্পে বেগমের দানশৌণ্ডে প্রীত ধর্ম্মগুরু পোপমহোদয় বেগমের উত্তরাধিকারীকে পরম সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিডকে এক অত্যুচ্চ পোপীয় সম্মান, Chevalier of the Order of Christ, প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন যীশু যে ক্রুশ-কাষ্ঠে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই আসল ক্রুশ হইতে গৃহীত ক্ষুদ্র এক দারুখণ্ডও তিনি ডেভিডকে দিয়াছিলেন। ইউরোপে মহাড়ম্বরে বাস করিয়া ও নিজ ঐশ্বর্য্যের ছটায় চারিদিকে চমক লাগাইয়া দিয়া ডেভিড ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাইকাউণ্ট সেণ্টভিনসেণ্টের দুহিতা মেরী এন জার্ভিসের পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহই হইল ডেভিডের সর্ব্বনাশের মূল। পরবৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচনে ডেভিড "সুডবরী" অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তাঁহার আর হাউস অব কমন্সে বসা হইয়া উঠে নাই, কারণ নির্ব্বাচনে অবৈধ উপায় অবলম্বন করার অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন পত্র পড়ে এবং অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় তাঁহার নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া যায়।

ডেভিডের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। ধর্ম্মে খৃষ্টান ও খৃষ্টানী নামধারী হইলেও এবং ধমনীতে ইউরোপীয় শোণিত কতক পরিমাণে প্রবাহিত হইলেও ভারতবর্ষীয় রক্ত-মিশ্রণ এবং ভারতীয়ভাবে থাকার ফলে ডেভিড যে শুধু দেহের বর্ণে ভারতীয় ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি মনেপ্রাণেও ভারতীয়ই ছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভাবধারা তাঁহার কাছে বিজাতীয়ই রহিয়া গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও একটি প্রধান দোষ ছিল, তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত এবং একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন একটা ধারণা তাঁহার

হৃদয়ে একবার বদ্ধমূল হইলে তাহা সহজে উৎপাটিত বা বিদূরিত হইত না। এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইল। শীঘ্রই দম্পতির মধ্যে মনোবাদ আরম্ভ হইল। ডেভিডের দিক হইতে ক্রোধ এবং উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল, যেহেতু তাঁহার ধারণা যদি সত্য হয় তবে বলিতে হয় যে মেরী মোটেই বিশ্বাসপরায়ণা সতী সাধ্বী ছিলেন না। পক্ষান্তরে মেরীও তাহার অর্দ্ধ-অসভ্য স্বামীর সাহচর্য্যে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর অনেক ধরণ-ধারণ আচার-পদ্ধতি তাহার নিকট উন্মাদের লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি স্বহস্তে লইয়া তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য জার্ভিসনন্দিনী এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। ইহাতে তাহার সহায় হইল ডেভিডের দুই ভগিনী-পতি। ট্রুপ ও সোলারলির ডেভিডের উপর আক্রোশের কারণ বেগম সমরু তাহাদের স্ত্রীদের তুলনায় ডেভিডকে সুবিপুল অর্থদান করিয়া ছিলেন। ডেভিডকে বাতুল প্রতিপন্ন করিয়া তাহার সম্পত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। মেরী হঠাৎ একদিন স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিতান্তই যত্নবতী হইয়া উঠিল। তাঁহাকে নিয়মিত-ভাবে দেখিবার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। ডাক্তারটি তাঁহার রোগীকে পরম যত্নে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর দেখিলেন তিনি নিজ ঘরে বন্দী হইয়াছেন। দ্বারপ্রান্তে তিন জন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা তাঁহার বহির্গমনে বাধা দিল। ডেভিড শুনিলেন তাঁহার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে। চারি মাসকাল স্বগৃহে আটক থাকিবার পর সত্যই ডেভিড উন্মাদ কিনা নিরুপণের জন্য ইংলণ্ডের তদানীন্তন লর্ড চ্যান্সেলারের আদেশে একটি কমিশন বসিল (৩১শে জুলাই ১৮৪৩)। কমিসনের সদস্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বাতুল এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে অসমর্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং নিরুপণ করিলেন যে ২৭শে অক্টোবর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছেন।

অতঃপর ডেভিডের সত্যই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাকে এক চিকিৎসকের রক্ষণাবেক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লিভারপুলে পাঠান হইল। এখান হইতে এক সুযোগে ডেভিড পলায়ন করিলেন। পরণের বস্ত্রখানি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি একেবারে ইংলণ্ড ছাড়িয়া ফ্রান্সে আসিয়া প্যারী নগরে আশ্রয় লইলেন (২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৩)। পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুদের দয়ায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। দৈবের কি বিড়ম্বনা! যাহার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দুই লক্ষেরও অধিক টাকা ছিল এবং নগদে যাহার অর্দ্ধ ক্রোরেরও অধিক টাকা সঞ্চিত ছিল আজ তাহাকে প্রাণধারণোপযোগী কয়েকটি তাম্র মুদ্রার জন্য পরের নিকট হাত পাতিতে হইল। ডেভিড ফরাসী দেশে আসিয়া আশ্রয় লইলে ইংলণ্ড হইতে ফরাসীকর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইল যে, তিনি বাতুল; এ কারণ তাঁহাকে উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে ধরিয়া দিতে হইবে। এ প্রস্তাবের উত্তরে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁদের তত্ত্বাবধানে গৃহীত ডাক্তারী পরীক্ষায় ডেভিড বাতুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহারা সে কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। অনন্তর প্যারীনগরীর পুলিশের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ডেভিডের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে অসম্মত হইলেন এবং ডাইসসোম্ব্রু স্বাধীন ভাবে ফরাসী দেশে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লর্ড চ্যান্সেলরের আদেশে ডেভিডের ভার লইবার জন্য জন পাস্কাল লার্কিন্স নামক এক ব্যক্তি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কমিটি দয়া করিয়া তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী যে সামান্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতেন তাহাতেই কায়ক্লেশে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এদিকে তাঁহারই অর্থ হইতে তাঁহার সকল সর্ব্বনাশের মূল তাঁহার বিশ্বাসহন্ত্রী পত্নী বার্ষিক চারি সহস্র পাউণ্ড হাত খরচ হিসাবে পাইয়া নিজ খেয়ালের পরিতৃপ্তি করিতেন।

অতঃপর ফরাসী চিকিৎসকগণের রিপোর্টসহ ডেভিড বিলাতে লর্ড চ্যান্সেলরের নিকট তাঁহার সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত কমিটি বিলুপ্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার

আদেশ দিবার জন্ত আবেদন করিলেন। তখন লর্ড লিণ্ডহার্ষ্ট চ্যান্সেলার। তিনি ডেভিডকে ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্য উক্ত দেশে আগমন করিতে বলিলেন এবং ইংলণ্ডে আসিলে তাঁহাকে যে আটক করা হইবে না এ ভরসাও দিলেন। লিণ্ডহার্ষ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ডাক্তারগণ ডেভিডকে পরীক্ষা করিলেন, তিনি নিজেও নাকি ডেভিডের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল ডেভিডের প্রতি সন্তোষজনক বিবেচিত হইল না, চ্যান্সেলর কমিটি রদ করিতে অসম্মত হইলেন (আগষ্ট ১৮৪৪)।

তখন ডেভিড ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলেন। তথা হইতে তিনি ইউরোপের নানাদেশে এবং ঈজিপ্টে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখানে বলা উচিত যে কমিটির খরচ, মেরীর হাতখরচ ও অপরাপর আনুসঙ্গিক ব্যয়বাদে ডেভিডের বিষয়ের আয় তাঁহাকে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রদত্ত হওয়ায় তাহার অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হইয়াছিল। এ প্রকার ব্যবস্থা হইবার কারণ এই যে, চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অর্থকষ্ট দুর হইলে ডেভিডের মানসিক অশান্তি কতকটা দূর হইতে পারে। তিনি যে সত্যই পাগল নহেন, দুষ্টলোকের হীন চক্রান্তের ফলে যে তাঁহার এ দশা ঘটিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ডেভিড পারী, সেণ্টপিটার্সবর্গ (জানুয়ারী ১৮৪৫), ব্রসেলস (জুন ১৮৪৫), এমন কি ইংলণ্ডেরও অনেক প্রখ্যাতনামা চিকিৎসকের নিকট (ডিসেম্বর ১৮৪৮) পরীক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাঁরা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ এবং নিজের সম্পত্তির ভার লইতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ঐ সকল রিপোর্টসহ ডেভিড তাঁহার বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য আবার চ্যান্সেলরের নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু চ্যান্সেলর যে সকল ডাক্তার কর্ত্তৃক তাঁহাকে পরীক্ষিত হইবার আদেশ দিলেন তাঁহারা ডেভিডকে উন্মাদরোগমুক্ত নহেন বলিয়া নিরুপণ করিলেন। লর্ড চ্যান্সেলরও কমিটি রদ করিলেন না (এপ্রিল ১৮৪৯)। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ডেভিড সম্পূর্ণ এক অভিনব ব্যবস্থার আশ্রয় লইলেন। তাঁহার প্রতি আরোপিত উন্মাদরোগ যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার ও একেবারেই অমূলক এবং শত্রুপক্ষের কারসাজি তাহা এক পুস্তক লিখিয়া তিনি জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সুবৃহৎ আকারের ৫৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁহার গ্রন্থ "Mr. Dyce Somber's Refutation of the Charge of Lunacy brought against him in the Court of Chancery" নামে প্রকাশিত হইল। উহাতে ডেভিড নিজের আদ্যন্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া তিনি উন্মাদ কি না তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন। ডেভিডের ইতিহাস বড় শোকাবহ— উহা পাঠ করিলে হতভাগ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হইয়া থাকা যায় না।—"I believe in the unchastity of my wife, therefore I am a lunatic" ইহাই হইল ঐ মর্ম্মপীড়িত ভাগ্যহীন যুবকের শেষ কথা।

এখানে একটি কথা বলা উচিত। ডেভিডের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার স্ত্রী মেরী বিশ্বাসহন্ত্রী, তাহার চরিত্র অতীব নিন্দনীয়, বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে অনেক ব্যক্তির সহিত সে ভ্রষ্টাচরণ করিয়াছিল।. চিকিৎসক ও বিচারকগণের মতে ইহাই হইল তাহার উন্মাদরোগের প্রধান লক্ষণ। ইংলণ্ডীয় চ্যান্সেলর-নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসকগণ যখনই ডেভিডকে এ ধারণা পোষণ করিতে দেখিয়াছেন তখনই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া নিরুপণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, "কেন"? হইতে পারে মেরী দেবী ছিল, হইতে পারে মেরী পিশাচীরও অধম ছিল। তাহার স্বামী তাহার দেবীত্ব অপেক্ষা পিশাচীত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে কথা অকপটে সকলকার কাছে প্রচার করিতে তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু এই বিশ্বাসকেই কি বাতুলতা অথবা প্রকৃতিস্থতা নির্দ্ধারণের মাপকাঠি বলিতে হইবে? কোন একটা বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস থাকা—যদি তাহা অসম্ভবও হয়—যদি উন্মাদরোগের লক্ষণ হয় তবে কোন না কোন কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বাতুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, চ্যান্সেলার-নির্ব্বাচিত ডাক্তারগণই ডেভিডকে উন্মাদ স্থির করিতেছিলেন; কন্টিনেণ্টের চিকিৎসকগণ, এমন কি ইংলণ্ডেরও অন্যান্য চিকিৎসকগণ,

তাঁহাদের কৃত উন্মাদরোগের লক্ষণ নির্ণয়ে সায় দিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহা হইতে স্বতই যদি এক কথা মনে হয়, তবে হয়ত বড় বেশী দোষের হয় না। তদ্ভিন্ন আরও এক গুরুতর কথা আছে। ডেভিডের বিশ্বাস যে একেবারেই অসম্ভব, প্রকৃতই ভীত্তিহীন ছিল তাহা নিরুপিত হয় নাই। ডেভিডের বিশ্বাস যে একেবারেই অমূলক ছিল না, তাহাই বা কে বলিবে? ডেভিডকে বড়জোর eccentric বলা চলে, lunatic কোন মতেই বলা চলে না—এবিষয়ে সকল কাগজপত্রাদি পড়িয়া আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

ভাগ্যচক্রের কঠিন আলোড়নে নিষ্পেষিত হতভাগ্য ডেভিডের জীবনীশক্তি দিন দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। তজ্জন্য তাহার উচ্ছৃঙ্খলজীবনযাত্রাপ্রণালীও অনেকাংশে দায়ী ছিল। শীঘ্রই সর্ব্বশান্তিহরা মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিল। পার্লামেন্টে আবেদন করিবার জন্য ডেভিড ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ১লা জুলাই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের "ফেণ্টন হোটেল" নামক এক হোটেলে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট কেহই উপস্থিত ছিল না। দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ পরে তাঁহার দেহাবশেষ ভারতবর্ষে আনীত এবং সার্দ্ধানায় তাঁহার প্রতিপালিকা বেগম সমরুর সমাধির পার্শ্বে প্রোথিত হয়।

সকল যন্ত্রণার মূল তাঁহার অবিশ্বাসিনী পত্নী যে তাঁহার দেহান্তের পর সকল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে এ চিন্তাও ডেভিডের অসহ্য হইয়াছিল। তাই মেরীকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ডেভিড মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের উইল করিয়াছিলেন (জুন ১৮৪৯)। সার্দ্ধানার অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি দুঃস্থ ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যকল্পে ১২৫০০০৲ টাকা দিয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ সার্দ্ধানায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি দান করিয়াছিলেন। বক্রী অংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে যাইবে উইলে এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। উইল প্রমাণ যাহাতে সহজসাধ্য হয় তজ্জন্য ডেভিড কোম্পানীর ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যান এবং তাঁহার সহকারীকে নিজ.অছি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উঁহারা ডেভিডের উইল প্রমাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেও বাতুলকৃত উইল বলিয়া তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইল না। সুতরাং ডেভিডের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার বিধবা মেরীর অধিকারে আসিল।*

মেরী কিছুকাল পরে জর্জ্জ সিসিলওয়েল্ড, তৃতীয় ব্যারণ ফরেষ্টার নামক একজন ইংরাজ লর্ডকে পুনরায় বিবাহ করে। এখানে বলা উচিত যে, যে সকল ব্যক্তি মেরীর সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় ঘনিষ্ঠ বলিয়া ডেভিডের বিশ্বাস ছিল, তন্মধ্যে ফরেষ্টার সাহেবের নামও দেখা যায়। তখনও তিনি লর্ড হন নাই, তখন তিনি শুধু কর্ণেল ফরেষ্টার নামে পরিচিত।

মেরী বাদসাপুর পরগণা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ডাইস-সোম্ব্ আবেদন নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় লিপ্ত হন নাই। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কমিটি লারকিন্সকে বাদসাপুরজায়গীরের অধিকার লইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার অনতিকাল পরে লারকিন্স ডেভিডের হইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বেগমের অস্ত্রশস্ত্রাদি সামরিক সম্ভারের মূল্য দাবী করিয়া আর একটী মোকদ্দমা আনয়ন করিলেন। দুইটিরই শুনানী একসঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলের নিকট গিয়াছিল। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ডেভিডের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী ও ভগিনীদ্বয় নিজেদের নামে মোকদ্দমা চালান। বাদসাপুরের মামলায় তাঁহারা পরাজিত হন; কিন্তু দ্বিতীয়টীতে মেরী স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীরূপে অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাইতে অধিকারিণী বলিয়া নিরূপিত হয়।†

* Henry Toby Prinsep and the East India Co. Vs. Mrs. Mary Anne Dyce-Sombre, Mrs. Anne Mary Truop, Georgiana Solaroli নামে এই মোকদ্দমার বিবরণ জন্য Moore's "Privy Council Cases", Vol. X. P. 232 দ্রষ্টব্য।

† Indian Appeals, Vol. IV. p. 137 এবং Indian Appeals (supplementary volume), p. 10. কৌতূহলী পাঠক ইহার বিবরণ দেখিতে পারেন।

লেডী ফরেষ্টার বরাবর ইংলণ্ডে বাস করিলেও যতদিন বাঁচিয়াছিল, সার্দ্ধানার প্রসাদাদি বেশ ভাল অবস্থাতেই রক্ষা করিয়াছিল। মেরী সার্দ্ধানায় "ফরেষ্টর হসপিটাল ও ডিসপেন্সারী" নামে এক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখানে বলা উচিত যে দুঃস্থ অধিবাসীদের প্রতি মমতাময়ী হইয়া সে উহা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। বেগম সমরু মেরী এন ট্রুপের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন দিয়া এক স্থায়ী ট্রাষ্ট স্থাপন করিয়াছিলেন। টাকাটার সুদ বর্ষে বর্ষে তাহাকে দেওয়া হইত। উইলের সর্ত্ত ছিল এই যে, যদি অপুত্রক অবস্থায় ট্রুপ-দম্পতীর দেহান্ত হয় তবে ঐ টাকা কোন সৎকর্ম্মে দেওয়া হইবে। কর্ণেল রোজ ট্রুপ (মৃত্যু ৫ই জুলাই ১৮৬২) এবং মিসেস ট্রুপ (মৃত্যু ১৮ই মার্চ্চ ১৮৬৭) কোন সন্তানাদি না রাখিয়া পরলোক গমন করিলে বেগম সমরু-প্রদত্ত ঐ টাকায় সার্দ্ধানায় পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। লেডী ফরেষ্টার একে একে ভারতবর্ষে তাহার যে সকল বহুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শেষে শুধু সার্দ্ধানার প্রাসাদটী ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ৭ই মার্চ্চ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মেরীর দেহান্ত হয়, তাহার কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে লর্ড ফরেষ্টার কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। লেডী ফরেষ্টারের মৃত্যুর পর সার্দ্ধানার প্রাসাদ ও আসবাবপত্রাদি নিলামে বিক্রীত হইয়াছিল। সেই সময়ে বেগম সমরুর সংগৃহীত বহুমূল্য চিত্রাদির কতকাংশ এলাহাবাদ ও কলিকাতার লাট প্রাসাদের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। সার্দ্ধানার প্রাসাদ আগ্রার ক্যাথলিক মিশন পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রায় কিনিয়া লয়। এক্ষণে তথায় দেশীয় খৃষ্টান বালকদের জন্য স্থাপিত একটি অনাথাশ্রম ও বিদ্যালয় অবস্থিত আছে।

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



আমার বন্ধু ভবভূতি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

হেরিডিটির রহস্য চিন্তা করলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়, ; আমি যে লেখক হয়েছি, আমার জন্ম দিয়ে বিচার করতে গেলে এ-ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, প্রায় অস্বাভাবিক ঠেকে। কারণ, আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে, যতদূর জানা যায়, কারো কোনো আর্টের প্রতি কোনো রকম উন্মুখতা ছিল না। উভয় দিকেই, নিরেট মধ্যবিত্ততা থেকে আমি জাত। যতদূর জানা যায়। কিন্তু জানা কতদূরই বা যায়? যেখানে আমাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না, সেই দূর অতীতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পশ্চাতে—আমার কোনো পূর্ব্বপুরুষ হ'য়ে সেখানে আমি ছিলাম ; এবং সেই পূর্ব্বপুরুষের হয়-তো শিল্পে খানিকটা ক্ষমতা ছিলো ; সেই ক্ষমতা, ভ্রূণাবস্থায় জন্ম পরম্পরার অজ্ঞেয় বিন্যাসের ফলে আজ আমি পেয়েছি বহু শতাব্দী পর, সহস্র নর-নারীকে অতিক্রম করে' সেই ক্ষমতার বীজ কী করে' যে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'লো, সৃষ্টির এই রহস্য—এমন যে আমাদের সর্ব্বজ্ঞ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, তা এখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। যে সম্ভাবনা লাখে একও নয়, তা-ই পরিপূর্ণ হ'লো ; সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মালাম।

অবিশ্যি সে-সম্বন্ধে সচেতন হ'তে জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছিলো। জ্ঞান হ'বার সঙ্গে-সঙ্গে কী করে' যেন আমার মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিলো যে সাংঘাতিক একটা কিছু হ'বার জন্য আমি উদ্দিষ্ট। কিন্তু সেই সাংঘাতিকত্ব যে সাহিত্যের দিকে হ'বে, তা উপলব্ধি করলাম সেদিন, হঠাৎ যখন ইংরিজি ভাষায় এক শোক-গাথা রচনা করে' ফেললাম। আমার বয়েস তখন দশ; নোয়াখালিতে ঠিক নদীর ধারে ভারি সুন্দর একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম। নদীর ধারে বলছি—কিন্তু গোড়ায় বাড়িটা ছিলো নদী থেকে মাইল খানেক দূর ; দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মধ্যবর্ত্তী মাটি অদৃশ্য হ'লো ; নদীটা ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। শেষে এমন সময় এলো, যখন আর ওবাড়িতে বাস করা যায় না : নদীর হাতে বাড়িকে সমর্পণ করে' আমাদেরকে সরে' পড়তে হ'বে। ব্যাপারটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং শোকাবহ বলে' আমার মনে বাজ্‌লো ; ঈশ্বরের রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল অবিচারের প্রথম দৃষ্টান্তে মর্ম্মাহত হ'লাম। লিখলাম সেই বাড়িকে উদ্দেশ্য করে' ইংরিজিতে এক বিদায়-পদ্য। যথাসময়ে এবং যথাক্রমে সে পদ্য হ'লো আবিষ্কৃত ; আমার পরিজনবর্গ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। আমার এই অসামান্য কীর্ত্তিকে তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না ; বুঝে উঠতে পারলেন না, কী করবেন আমাকে নিয়ে। তাঁরা উল্লসিত হ'লেন, উদ্‌ভ্রান্ত হ'লেন ; গর্ব্বিত হ'লেন, সন্দিহান হ'লেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দশ বছরের বালক আমি বাড়ির মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি হ'য়ে উঠলাম। দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে আমার কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়্‌লো সেই ছোট সহরের সর্ব্বত্র। নিজের সম্বন্ধে আমার ভীষণ উচ্চ ধারণার এমন একটা জলজ্যান্ত সমর্থন পেয়ে মনটা বেশ খুসি হ'য়ে উঠ্‌লো।

আমার কবি-কীর্ত্তি যা'তে ওখানেই ক্ষান্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমার এক আত্মীয় আমাকে উপহার দিলেন এক খাতা—হায় রে কালান্তক, মর্ম্মান্তিক খাতা! অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে আমি লেগে গেলুম সেই খাতার শাদা পৃষ্ঠাগুলো ভরাতে ; এবং সেই যে নেশা করলাম (কারণ, নেশা ছাড়া এটা আর কী ?), আজ পর্য্যন্ত আমি তা'র দাসত্ব করছি ; সাধ্য নেই, তা'র সর্পিল, বিষাক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারি। বরং, যত দিন যাচ্ছে, এ নেশা ততই কঠিন, ততই ভয়ানক হ'য়ে উঠছে। প্রথমে ছিলো, লিখ্‌তে ভালো লাগে ; তারপর হ'লো, না-লিখ্‌লেই খারাপ লাগে ;

এখন হয়েছে, লিখ্‌তে ভালো লাগে না, আবার না-লিখ্‌লেও খারাপ লাগে। নেশাখোরের এটা হচ্ছে চরম অবস্থা। মাতাল যে, একটা সময় আসে, যখন মদের কথা ভাবলেই তা'র হুক্কার হয়; তবু, সন্ধ্যে হ'তেই তা'র বোতল আর গেলাশ নিয়ে বসা চাই। তেম্‌নি, লেখ্‌বার কথা ভাব্‌লে আমার এখন মনের মধ্যে যন্ত্রণা হ'তে থাকে কিন্তু উপায় নেই, তবু আমাকে বস্‌তেই হয় কাগজ আর কলম নিয়ে; এবং আত্ম-নিপীড়ন যত নিষ্ঠুর হয়, কোনো-এক বিকৃত উপায়ে মন তা-ই থেকেই উপভোগ নিঙ্‌ড়ে বা'র করে। উৎকট উপভোগ! কত উৎকট, বুঝ্‌তে পারি নেশার হাত থেকে মাঝে মাঝে যখন প্রশান্ত বিরতি আসে। যদি কখনো প্রশান্ত বিরতি না আস্‌তো! যদি আমাকে আদৌ এনেশা পেয়ে না বস্‌তো! কিন্তু দেরি হ'য়ে গেছে; বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে; এখন আর এ-সব আক্ষেপ কর্‌বার সময় নেই।

যা বল্‌ছিলাম, সেই খাতা ভরিয়ে তোল্‌বার চেষ্টায় ভীষণ উৎসাহে আত্ম-নিয়োগ কর্‌লাম। মধুসূদন দত্তর মত, গোড়ায় মাতৃভাষার প্রতি আমার তাচ্ছিল্যের সীমা ছিলো না; পরিণত শৈশব পর্য্যন্ত ভালো করে' বাঙ্‌লা শিখি নি। কিন্তু মধুসূদনের অনেক আগেই বিভাষায় সাহিত্য-রচনার মূঢ়তা আমি উপলব্ধি করেছিলাম; ইংরিজিতে ঐ আমার প্রথম প্রচেষ্টা—এবং শেষ। আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাই রচিত হ'লো বাঙ্‌লায়; তা'র বিষয়—আমার এখনো মনে আছে—ছিলো 'ঊষা।' পয়ারে ত্রিপদীতে, মিলের পরে মিল দিয়ে দিয়ে, রোজ দু'একটি করে' নিয়মিতরূপে আমার পদ্য-রচনা চল্‌তে লাগ্‌লো। ভেবে-ভেবে আমি সব কাব্যোপযোগী বিষয় বা'র কর্‌তাম; সন্ধ্যা, নদী, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, ফুল, শিশু—আমার কাব্য-ছাগশিশু সদ্য-উন্মেষিত দাঁত দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু পরখ্‌ করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লো। সৌভাগ্যবশত, বাল্যকালে আমাকে ইস্কুলে পড়ে' সময় নষ্ট কর্‌তে হয় নি, প্রচুর সময় ছিলো আমার হাতে; অবাধ, অক্ষুণ্ণ, দিন থেকে দিন প্রবলতরো গতিতে পদ্যের পর পদ্য নিঃসৃত হ'তে লাগ্‌লো; কয়েক মাসের মধ্যেই খাতা উঠ্‌লো ভরে'।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হ'লো; আমার সাহিত্যিক জীবনের সেটাই সব চেয়ে প্রধান ঘটনা বলে' ধরা যেতে পারে। আমার আর-এক আত্মীয় আমাকে একখানা রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা উপহার দিলেন। (চারুবাবুর চয়নিকা—ছোট সাইজের, ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিখুঁত ছাপার। হায় সেই অতীত স্বর্ণ-যুগ, দশজনের ভোট কুড়িয়ে যখন চয়নিকা তৈরি হ'তো না, যখন জাঁদ্‌রেল আকৃতিতে, ভীম ওজনে, বিশ্বভারতী প্রেসের যত্নহীন ছাপায়, তারিখ-কণ্টকিত এ-অ্যা-র উচ্চারণের পার্থক্য-চিহ্ন-বিভূষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কেতাব চয়নিকা বেরুতো না!) সেই বই খুলে' প্রথম পৃষ্ঠায় পড়্‌লাম:

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর—

আর সঙ্গে-সঙ্গে, আমার মনেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'লো। এক সকালবেলায়, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর মুখ থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গিয়েছিলো; আমার পৃথিবীর মুখ থেকেও পর্দ্দা সরে' গেলো, জীবনে প্রথম যেদিন রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্পর্শে এলাম। আমার চোখের সাম্‌নে সমস্ত সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘট্‌লো; আকাশের রঙ্‌, ঘাসের রঙ্‌, মানুষের কথাবার্ত্তা, হাসির শব্দ—সব যেন এক গভীরতরো ইঙ্গিত নিয়ে আমার মনকে স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌লা। বদ্‌লে গেলো সমস্ত পৃথিবীর চেহারা; বদ্‌লে গেলাম আমি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর—

ভালো করে' বোঝ্‌বার ক্ষমতা তখনো হয় নি; বিস্ময়ের আনন্দের বন্যায় যা আমাকে তখন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, তা হচ্ছে কবির ছন্দ, তাঁর ধ্বনি, সঙ্গীত। উন্মাদনার মত সেই সঙ্গীত আমাকে অভিভূত কর্‌লো।

আনন্দময়ী মুরতি তোমার
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা—
অমৃত সরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

'পতিতার' প্রকৃত বিষয়বস্তু না বুঝে'ও এই সঙ্গীতকে ঘিরে' আমার বালক-মন অস্পষ্ট রহস্যের ইন্দ্রজাল বুনে' চল্‌লো; আমার মনের মধ্যে তা'র অবিশ্রান্ত গুঞ্জন; সেই সঙ্গীতের অশরীরী সঞ্চরণে আমার সমস্ত দিন মদির হ'য়ে উঠ্‌লো। গৃহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আমি একা এক গোপন জীবন যাপন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম; সুরের মায়াচক্রের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী আমি জীবনের প্রথম পূজার দেবতাকে আবিষ্কার করে' ধন্য হ'লাম। চয়নিকা হ'য়ে উঠ্‌লো আমার কাছে একটা অফুরন্ত খনি; এত ঐশ্বর্য্য একসঙ্গে পেয়ে প্রথমটায় আমি কী-রকম একেবারে দিশেহারা হ'য়ে উঠলাম। সেই যে রবীন্দ্র-মোহে পড়লাম, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে আনতে অনেক, অনেকদিন কেটে গেলো। এখনো কি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পেরেছি? সন্দেহ হয়।

তখন—প্রথম চয়নিকা পড়বার পর যা আরম্ভ হ'লো, সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, সেই দাস্য অনুকরণ—ওঃ, তার তুলনা হয় না। যা-কিছু আগে লিখেছিলাম, সব যে রাবিশ, নিতান্ত ছেলেমানুষি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ মনে রইলো না। এগারো বছরের আমি মৃদু হাস্য করে দশ বছরের আমির পিঠ চাপড়ালাম। সদ্য গিরি-গুহা-মুক্ত ঝর্ণার মত উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছুটলো আমার রবীন্দ্র-জাগরিত কাব্যস্রোত। সমস্ত চয়নিকা বল্‌তে গেলে গুলে' গিলে' ফেললাম; তারপর, বিপর্য্যস্ত, বিকৃত হ'য়ে সেই সব আমার কলমের মুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো; শিশুর মুখ দিয়ে দুধ যেমন ছানা হয়ে বেরোয়। পড়লাম শুধু 'অকারণ পুলকে—'; তৎক্ষণাৎ লিখে' ফেল্‌লাম এই গোছের এক পদ্য:

আজি উজ্জ্বল আলোকে
আমার পরাণ আপনা হারায়ে
ছুটিছে ব্যাকুল পুলকে।

'বর্ষা-সন্ধ্যা' পড়ে' হঠাৎ মেঘাক্রান্ত রক্ত-সূর্য্যাস্তের প্রেমে পড়ে' গেলাম; লিখলাম:

আজকে শুধু তোমার হাতের
মধুর পরশে,
হৃদয় আমার ফুলের মত
ফুটবে হরষে।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এম্‌নি অজস্র। যখনি যে-কবিতা পড়তাম, আমার মনের অপরিণত পাক-যন্ত্র থেকে তা ছানা হ'য়ে বেরুতোই। খাতার পর কবিতার খাতা ফেঁপে উঠতে লাগলো। তখন পর্য্যন্ত ভাবিনি, কবি ছাড়া আমি আর কিছু হ'বো; গদ্য জিনিষটা যে কষ্ট করে' কাগজের ওপর কলম দিয়ে লেখবার উপযুক্ত, তা আমি মনে কর্‌তাম না। কিন্তু এমন সময় আর একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটলো। আমাদের পরিবার-মহলের মধ্যে কয়েক দিন পর পর দুটো বিয়ে হ'য়ে গেলো। সেই ডবল বিয়ের উপলক্ষ্যে যত রাজ্যের বাঙলা উপন্যাস আর গল্পের বই এসে পড়লো আমার হাতে; আমার—কারণ, যে-মহিলাদেরকে বইগুলো উপহৃত হয়েছিলো, সে গুলোর দিকে তাকাবার সময় তাঁদের ছিলো না—অন্তত, তখন ছিলো না। বইগুলো আমি এক নিঃশ্বাসে পড়ে' ফেললাম; ঢক্‌ঢক্ করে গিলে' ফেল্‌লাম, বলা যায়। (প্রসঙ্গক্রমে, বাঙ্‌লা কথা-সাহিত্যে আমার যা-কিছু পাঠ, তা'র অনেকটা সেই যাত্রায় হ'য়ে যায়; যেটুকু বাকি ছিলো—ইস্কুলে থাকতে একবার অসুস্থ হ'য়ে মাস দুই রাঁচিতে কাটাতে বাধ্য হই—যেটুকু বাকী ছিলো, হিন্দুবাসী কেরাণীদের লাইব্রেরীর অনুগ্রহে তা শেষ করে ফেলি।) বাঙ্‌লা গল্পের একবার স্বাদ পেয়ে আমার মত বদলে গেলো; আরম্ভ কর্‌লাম গদ্য লিখতে। আমার সরস্বতী তখন খাতার কারাগারে ছটফট কর্‌তে লাগলেন; তাঁকে আরো প্রচুর ক্ষেত্র দেবার জন্য দরকার হ'লো এক হাতে-লেখা মাসিকপত্র বা'র করা। সে-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলাম আমি; তার অন্তর্গত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, সাহিত্য-সমালোচনা—বেশির ভাগ জিনিষ লিখতাম আমি; এবং আমার মত এত উৎসাহী পাঠক ও তার আর ছিলো না। না—একজন ছিলো, যে আমার সম্পাদিত সেই মাসিকপত্র বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে পড়তো; কারণ, প্রতি সংখ্যায়ই থাকতো তা'র দু' একটা লেখা। তা'র ওপর, কাগজের প্রচ্ছদপট হ'তো তার আঁকা। বস্তুত, মাসিকপত্র পরিচালনায় সেই আমার প্রথম প্রচেষ্টায় সে ছিলো আমার সহকারী। তার নাম ছিলো তার জন্ম ও পারিপার্শ্বিকের পক্ষে একটু অসাধারণ—

ভবভূতি। জজ কোর্টের টাইপিস্ট্ তা'র বাবা বোধ হয় কোনো-এক প্রচণ্ড দুরাশার মুহূর্ত্তে ছেলের এই নামকরণ করে ফেলেছিলেন; তারপর নিজের এই ভীষণ দুঃসাহসে নিজেই ভীত হয়ে প্রাঞ্জল, অভিমানহীন বিভু নামে ওকে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন। বিভু বলেই ওকে সবাই ডাকতো;—কিন্তু, এমন যে ওর চমৎকার, জমকালো ভবভূতি নাম, যা কিনা ওর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়, তা অব্যবহারে লুপ্ত হয়ে থাকবে, আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিদ্রোহ করেছিলাম। আমার কান তখন থেকেই তৈরী হয়ে আস্‌ছিলো; একটা ধ্বনিময় শব্দ পেলে আমি অস্পষ্টভাবে তাকে চিন্‌তে পার্‌তাম; তাই আমি কর্‌লাম ওর নামের উদ্ধার-সাধন।

ভবভূতির সেই ছেলেবেলাকার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে; কালো, রোগা-মত এক ছেলে, মাথায় ছোট ছোট চুল; মুখে এমন-কোনো বিশেষত্ব ছিলো না, যা উল্লেখ করা যায়। শুধু ওর চোখের দৃষ্টি ছিলো ভীত, অসহায় গোছের, একটু নির্ব্বোধ, একটু করুণ। তখন অতটা লক্ষ্য কর্‌তাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সব সময় ওকে এক বেশে দেখতাম; পরণে নীল একটা হাফ-প্যান্ট্, বেল্টের অনেকটা অংশ পেছন দিকে লেজের মত ঝুলছে; গায়ে খাকি একটা শার্ট্। ওর পকেট-ভর্ত্তি থাকতো ছোট-বড় নানা রকম মার্ব্বেল; মার্ব্বেল খেলায়ও ছিলো নোয়াখালি শহরের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু তা নিয়ে ওর এতটুকু গর্ব্ব ছিলো না; কোনো বিষয়ে গর্ব্ব কর্‌বার ক্ষমতাই ওর ছিলো না। ও ছিলো সেই ধরণের মানুষ, জন্ম থেকেই যারা বিনীত, যা'রা আনত, নিজের ক্ষুদ্রতা-বোধকে যারা কোনো রকমেই কাটিয়ে উঠতে পারে না, চায়ও না; অগৌরবের তমিস্রায় লুপ্ত হ'য়ে থাকা যা'দের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। মার্ব্বেল খেলার সখ আমারো খুব ছিলো, কিন্তু ক্ষমতা ছিলো না—উপরন্তু, অক্ষমের অভিমান ছিলো। ভবভূতির সঙ্গে খেল্‌তে গিয়ে বারে-বারেই আমি বিশ্রীরকম হেরে যেতুম; যত হার্‌তুম, ততই জেদ চড়ে' যেতো। কখনো-কখনো, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ভবভূতি আমাকে ইচ্ছা করে' জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করতো; এবং সে-অপমান পরাজয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর হয়ে আমার মনে লাগতো; রাগ করে আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তুম। আমি আহত হয়েছি, এই আশঙ্কায় ওর চোখের দৃষ্টি আরো ভীত, আরো অসহায় হয়ে উঠতো; তখন যদি কেউ ওকে বল্‌তো যে মার্ব্বেল-নিক্ষেপে অমোঘ ওর আঙুল কেটে ফেল্‌লে আমি তুষ্ট হ'বো, ও বোধ হয় অনায়াসে তা-ই করতে পার্‌তো।

কারণ, ভবভূতি ছিলো আমার প্রথম ভক্ত পাঠক; শুধু তা-ই নয়, আমার শিষ্য, আমার উপাসক। আমার দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক কীর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে ও একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়তো। আমার দুটো পদ্য কল্‌কাতার মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে, সতি-সত্যি ছা পা হ য়ে ছে! আমি দস্তুরমত বড়দের মত বিছানায় শুয়ে' মুখ বুজে ইংরিজি গল্পের বই পড়ি! ওঃ—ভবভূতির পূজা, তা ছিলো যেমন অযাচিত, তেম্‌নি সম্পূর্ণ, নিঃশংসয়। শুধু ওর চোখে নয়, ওর পরিবারের চোখেও আমি ছিলুম ছোটখাটো একটি গড্। ওর বাবা নিজে লেখাপড়ায় বেশিদুর এগোতে পারেন নি; ভবভূতিও ইস্কুলের পরীক্ষাগুলো অতি কষ্টে পাশ করে যাচ্ছে মাত্র, তা-ও কখনো-কখনো করে না (অথচ, পড়াশুনো কর্‌তে ও যে অবহেলা করে তা নয়; বরং রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বইপত্র নিয়ে বসে' আঁ্যা-আঁ্যা সুর করে' ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করে)। ওর বাবা, তাই, আমার সঙ্গে ওর বন্ধুতাকে একটা পরম শুভ ঘটনা বলে গ্রহণ করেছিলেন; অনেক সময় আমাকে মুখ ফুটেও বল্‌তেন: 'সবাই তোমার মত হ'বে, তা তো আর আশা করা যায় না; তবে তোমার সঙ্গ থেকে ছেলেটার যদি কিছু হয়! তুমি ওকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ো।' আমি ফ্ল্যাটার্ড্ হ'তাম, লজ্জিত হ'তাম, একটু যে গর্ব্ব অনুভব না করতাম, তা-ও নয়। ওদিকে, ভবভূতি এ-কথায় লেশমাত্র অবমাননা বোধ কর্‌তো না; বরং, আমার বন্ধুতা-অধিকারের গৌরবে নিজকে ধন্য জ্ঞান কর্‌তো। আমি যে ওর বাড়ীর লোকের কাছ থেকেই অতিরিক্ত সম্মান ও আদর পেতুম, তা'তে ওর মনে মুহূর্ত্তের জন্য ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া দূরে থাক্, ওর সমস্ত অন্তরাত্মা আনন্দে জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌তো। কারণ, ঈর্ষা আমরা তাদেরকেই শুধু করি, যাদেরকে সমপদস্থ জ্ঞান করি: আমার পক্ষে ফোর্ড্

সাহেবের ঐশ্বর্য্য ঈর্ষা করা স্রেফ পাগলামি, তেম্‌নি, ভবভূতি আমাকে ওর চাইতে এতই উঁচু স্তরের জীব বিবেচনা করতো যে আমাকে ঈর্ষা করার কথা স্বপ্নেও ওর কখনো মনে হ'তে পার্‌তো না। আমার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির মধ্যে নিজকে মিলিয়ে দেয়াই ছিলো ওর সর্ব্বোচ্চ সুখ।

তাই বলে' এ-কথা মনে কর্‌বার কোনো কারণ নেই যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুতায় কোনো রকম ভেজাল ছিলো। ও ছিলো আমার নিতান্ত একনিষ্ঠ অনুচর, পার্শ্ববর্ত্তী ছায়া, তা ঠিক: কিন্তু তা'র চেয়েও বেশি সত্য এই যে আমি ওকে ভালোবাস্‌তাম; ওকে না হ'লে কোনো কাজ আমার সম্পূর্ণ হ'তো না, সব মনের কথা বল্‌তাম ওর কাছে। আমাদের ছিলো—যেমন শৈশবের সব বন্ধুতাই হ'য়ে থাকে—নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা; কোনোকালে পরস্পরে ছাড়াছাড়ি—তা যতই স্বল্পস্থায়ী, যতই সঘন-পত্রব্যবহারে বিকম্পিত হোক্—কোনোকালে ছাড়াছাড়ি হ'বে, তা মনে করতেই প্রায় চোখে জল এসে যেতো। তবে, এ-বিষয়ে আমাদের কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিলো না যে মৃত্যু—সভয়ে, সশুদ্ধ রুদ্ধস্বরে আমরা কথাটা উচ্চারণ করতাম—মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা বন্ধু থাক্‌বো। ভব-ভূতিকে বল্‌লাম ভবিষ্যতের জন্য আমার সমস্ত প্ল্যান; শুন্‌তে শুন্‌তে ওর চোখের ভীত, অসহায় ভাব কেটে গিয়ে তখনকার মত সেখানে এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা ফুটে উঠ্‌তো; বিহ্বল নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করতো, "তুই হাই-কোর্টের জজ্‌ হ'বি—হ্যাঁরে?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে আমি বল্‌তাম, 'তা তো হ'বোই।'

'হাইকোর্টের জজ্‌দের কী কর্‌তে হয়?'

সে-বিষয়ে আমার মনেও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না, কিন্তু আমার সাত পুরুষ যেন হাইকোর্টের জজিয়তি করেছে, এইভাবে আমি বলে' দিতাম: 'বাঃ, তা আর কে না জানে!'

এই ব্যাখ্যাতেই তৃপ্ত হ'য়ে ভবভূতি জিজ্ঞেস কর্‌তো, 'কত মাইনে পায় তা'রা?'

'ওঃ, ঢের!'

একটু ভেবে ভবভূতি বল্‌তো, 'পাঁচ শো?'

'দূর বোকা। আমি আমার কল্পনাকে উদ্দাম করে ছেড়ে দিতাম, 'হাজার হাজার টাকা।'

'সেই কাজ তুই কর্‌বি!' বিস্ময়ে, আনন্দে ওর চোখ যেন ফেটে পড়্‌তো। মুহূর্ত্তের এক ভগ্নাংশের জন্য সেখানে একটু সন্দেহের ছায়া-পাতও হ'তো বোধ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিজাতীয় সংশয়কে যেন দুই হাতে ঠেলে ও বলে' উঠ্‌তো, কর্‌বি বই কি, নিশ্চয়ই তুই জজ্‌গিরি কর্‌বি।' এমনভাবে বল্‌তো যেন কাজটা ঠিক আমার উপযুক্ত নয়। সত্যি বল্‌তে, নিজের ওপর আমার যতটা বিশ্বাস না ছিলো, ভবভূতির ছিলো আমার ওপর তার চেয়ে বেশি। শেষ পর্য্যন্ত, জজিয়তিটা আমার ফস্‌কে যেতেও পারে, এ-রকম একটা সন্দেহ তখনই আমার মাঝে-মাঝে হ'তো। সেই অনুসারে, আমি অন্য রকম প্ল্যান কর্‌তুম। কখনো বা বৈষয়িকতায় ক্লান্ত হ'য়ে সঙ্কল্প কর্‌তাম, সন্ন্যেসী হ'বো। কিন্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আমার স্থির ছিলো; আমার সাহিত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কখনো ব্যত্যয় হয় নি। এবং ভবভূতির কাছে সেই সব-আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উজাড় করে ঢেলে দেয়া—আমাদের বন্ধুতার তা-ই ছিলো উচ্চতম স্বর্গ। কত রবিবারের দুপুর মাসিকপত্র পরিচালনার উপলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ-রচনার দীর্ঘ, গোপন গুঞ্জনে কেটে গেছে। আমার সেই পত্রিকার মলাটে নানা রঙের কালি দিয়ে বিচিত্র সব চিত্র কী আনন্দ আর কত কষ্ট নিয়েই যে ও আঁক্‌তো! চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার রুচি বিকশিত হ'তে তখনো দেরী ছিলো; ও যা আঁক্‌তো—আঁকাবাঁকা লতা-পাতায় ঘেরা পত্রিকার ও আমার নাম—তা-ই আমার তখন ভালো লাগ্‌তো; আন্তরিক প্রশংসা কর্‌তুম। আমার প্রশংসায় ও চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত—অনেকটা আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌তো; এলোমেলোভাবে বল্‌তো 'না—না, এটা কিছুই হয় নি; সাম্‌নের মাসেরটা আরো ভালো করে' এঁকে দেবো।' এখন বুঝ্‌তে পারছি, আমি যদি ওকে পর-পর ছবির ফরমায়েস দিয়ে দশটা প্রত্যাখ্যান করে, অনিচ্ছাসত্ত্বে একাদশটা গ্রহণ কর্‌তাম, যদি ছোটখাটো

একটি অত্যাচারীর মত ওকে ব্যবহার কর্‌তাম, তা হ'লেই ও সব চেয়ে খুসী হ'তো।

ভবভূতির কার্য্যকলাপ ছবি-আঁকাতেই সীমাবদ্ধ থাক্‌তো; ও-ও যে লিখতে পারে—এবং সে-লেখা, যে-মলাটটা ও এত যত্নে এঁকে দেয়, তা'র ভেতরে স্থান পেতে পারে, এ কথা ভাব্‌বার দুঃসাহস ওর কখনো হ'তো না, যদি না আমি ওর মাথায় তা ঢুকিয়ে দিতাম। আমার বালক-কালের সেই অবিবেচনার জন্য এখন মাঝে-মাঝে অনুতাপ হয়। যদি সে জন্যে না হ'তো, তা হ'লে ভবভূতি—হ্যাঁ, দুঃখ পেতো—কারণ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই—কিন্তু এতটা হয়-তো পেতো না। তা হ'লে সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখে, আশায়-ব্যর্থতায় ও-ও ওর জীবন একরকম করে' কাটিয়ে দিতে পার্‌তো—আর পাঁচজন যেমন কাটায়। কিন্তু অজ্ঞাতে আমি একটা ভুল করে' ফেলেছিলাম; অনেক বছর পর সেই ভুলের ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে গেলাম স্তম্ভিত হ'য়ে। সাধারণতার মসৃণ স্বর্গ থেকে ও ভ্রষ্ট হ'লো, এবং তার বদলে লাভ কর্‌লো—কী? অপরিসীম হতাশা; তিক্ত, তিক্ত আত্ম-গ্লানি। সাহিত্যিক হ'বার দুর্ব্বাসনা যদি ওর কখনো না হ'তো, তা হ'লে বিয়ে করে', সন্তানোৎপাদন করে', দীন অজ্ঞাততার আরামময় অন্ধকারে ও দিব্যি বসবাস কর্‌তে পার্‌তো; এ-কথা স্বপ্নেও ওর মনে হ'তো না যে কারো চাইতে ও খারাপ আছে বা ভাগ্য ওর ওপর কোনো অবিচার কর্‌ছে। দুঃখের পৃথিবীতে একজন লোকের অকারণে অসুখী হ'বার মূলে ছিলাম আমি, আমার অপব্যয়িত জীবনের এটা অন্যতম কুকার্য্য।

যথাসময়ে ভবভূতি একদিন তা'র প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এনে আমাকে দেখিয়েছিলো—সে যে কত লজ্জায়, কত ভয়ে-ভয়ে, তা লক্ষ্য করে' তখনই আমি মনে মনে হেসেছিলাম। জিনিষটা একটা পদ্য; পড়ে' আমি—খুব আন্তরিকভাবে নয়—বলেছিলাম, 'চমৎকার হয়েছে।' আমার সেই প্রশংসায় ভবভূতি এমনই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো যে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ভালো করে' কথা কইতে পারে নি। তা'র পর থেকে আমার মাসিকপত্রের ও হ'য়ে উঠ্‌লো একজন নিয়মিত লেখক; ওর বাবা ছেলের এই আকস্মিক সাহিত্যিক প্রতিভা উদ্গমে উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন; এবং আমার মত একজন তুখোড় ছেলের সঙ্গ লাভের কিছু-না-কিছু ফল যে ফল্‌বেই, এ-কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করে' বেড়াতে লাগ্‌লেন। ছেলেবেলায় আর যা-ই হোক্, সমালোচনার ক্ষমতা হয় না, কিছুদিনের মধ্যে ভবভূতির পদ্য আমার সত্যি-সত্যি ভালো লাগ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। অবিশ্যি আমার মত নয়—পাগল! তা-ও কি কখনো হ'তে পারে? কিন্তু ঠিক আমার পরেই; শুধু আমার লেখার চেয়ে নিকৃষ্ট। এ-বিষয়ে আমার মতের সঙ্গে ভবভূতির বিলক্ষণ ঐক্য ছিলো বলে' মনে হয়: কারণ, যখনি আমি ওকে কোনো প্রশংসার কথা বল্‌তুম, বিনা ব্যতিক্রমে ও বলে' উঠ্‌তো, 'তুমি যা লেখো, রামতনু, তুমি যা লেখ!' বা ঐ তাৎপর্য্যের অন্য-কোনো কথা। যা-কিছু আমি লিখতুম, ও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তো; বল্‌তো, 'তুমি যা-ই বলো, এ-রকম আমি কখনো লিখ্‌তে পারবো না।' আসলে, আমি কর্‌তাম রবীন্দ্রনাথের প্যারডি, আর ভবভূতি কর্‌তো আমার প্যারডি। নকল কর্‌বার পক্ষে আমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ও খুঁজে' পেলো না, এ থেকেই আমার বুঝ্‌তে পারা উচিত ছিলো যে সাহিত্যে ওর কিছু হ'বে না।

পুরো দু' বছর ভবভূতির সঙ্গে আমার চলেছিলো অবিচ্ছিন্ন বন্ধুতা; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে—ও বয়েসের পক্ষে যেটা আশ্চর্য্য—একদিনের জন্যও আমাদের ঝগড়া হয় নি। তার পরে এলো সেই সময়—ওঃ, অসহ্য, অসহ্য সময়—যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তেই হবে। বীরের মত হাসবার চেষ্টা করে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; পরবর্ত্তী জীবন একসঙ্গে কাটাবার বিস্তারিত প্ল্যান দু' জনের মধ্যে আবদ্ধ রইলো। একজনকে না হ'লে কোনো কাজে, কোনো আনন্দে, কোনো সার্থকতায় আর-একজনের চল্‌বে না, দু'জনের মনেমনে এই রইলো গোপন, গম্ভীর প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ছেলেবেলাকার বন্ধুতা—তা গভীর হয়, অন্তরঙ্গ হয়, পারস্পরিক নিঃশেষিত আত্ম-সমর্পণে উচ্ছ্বসিত হয়; কিন্তু স্থায়ী হয় না, হ'তে পারে না, বয়েস বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তা ভেঙে পড়্‌তে বাধ্য। কারণ, শৈশবে আমাদের বিচার-বুদ্ধি হয় না,

কার সঙ্গে নিজকে ঠিক মানাবে, বোঝ্‌বার ক্ষমতা হয় না ; তা ছাড়া, মনটা থাকে নরম, হাতের কাছে যা'কে পাওয়া যায়, তা'কেই ভালো লাগে, মন তা'র জন্যেই পাগল হ'য়ে ওঠে। খুব সহজেই তখন ভালোবাসা যায় ; মনটা ভালোবাস্‌বার জন্য তৈরিই হ'য়ে থাকে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য পেলেই হ'লো। যা'র চরিত্রের যেটা বিশেষত্ব, সেগুলো থাকে চাপা ; খোঁচা-খোঁচা হ'য়ে কোথাও কিছু ফুটে' নেই ; দু'জন মানুষ, তাই, অনায়াসে পরস্পরের মধ্যে মিশে' যেতে পারে, কোনোখানে এতটুকু আট্‌কায় না। কিন্তু যৌবনের সূচনার সঙ্গে-সঙ্গে—যখন আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে—তখন দেখা যায়, বালককালের সব বন্ধুতাই ভুল হ'য়ে গিয়েছিলো, সদ্য-জাগ্রত প্রকৃত নিজত্বের আলোয় সেই সব পরম, পরম অন্তরঙ্গদেরকে কী হাস্যকর, কী অসম্ভব মনে হয়! ভেবে অবাক লাগে, ওদের সঙ্গে কী করে' কখনো মিশ্‌তে পেরেছিলাম। এবং তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এই আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে—আর যেন কখনো তাদের সঙ্গে দেখা না হয়। কারণ, দেখা হ'লে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী হয়—এমন অস্বস্তিকর ; এমন কি, লজ্জাকর। লজ্জা হয়, পুরোণো বন্ধুতার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারছি নে ব'লে ; এই স্বল্পবুদ্ধি, বাজে চালিয়াৎ গোছের ছোক্‌রার সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গ ছিলুম, এ-কথা মনে ক'রে। (এবং এ-ধারণা উভয়ত, সন্দেহ নেই ; আমার 'বন্ধু'ও আমার সম্বন্ধে যা ভাব্‌তে থাকে, তা মোটেই সুশ্রাব্য নয়। না, এ-ধরণের পুনর্ম্মিলন না-হওয়াই ভালো, না-হওয়াই ভালো। আমরা দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেড়ে উঠেছি, আমাদের চরিত্রের জন্ম-গত বিরোধিতা এতদিনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে ; বনিবনা হওয়া অসম্ভব।) বন্ধুতা স্থাপন করবার সব চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে প্রথম যৌবন ; যখন আত্ম-সচেতনার উন্মেষ হয়, অথচ মনটা যখনও কঠিন হ'য়ে ওঠে না ; যখন আমাদের নির্ব্বাচন কর্‌বার ক্ষমতা হয়, অথচ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো তা'দের মূল সজীবতা, উন্মুখতা হারিয়ে ফেলে না। তখন পর্য্যন্ত, নানারকম সাংসারিক সংঘাতের ফলে আমরা সাবধানী, সতর্ক হ'য়ে উঠি নে ; নিজের চারদিকে নিরাপদ আড়াল রচনা কর্‌তে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি নে ; নিশ্চিন্ত আত্ম-কেন্দ্রগততার সমতলভূমি থেকে অন্তরঙ্গতার দুর্গম, বিপজ্জনক, উন্মুক্ত শিখরে আরোহণ কর্‌তে ভয় পাই নে, কুণ্ঠা করি নে। সেই হচ্ছে বন্ধুতা কর্‌বার বয়েস, জীবনের সেই মধুরতম সময় ; সেই সব বন্ধুতাই স্থায়ী হয়—এই পৃথিবীতে যদি কোনো জিনিষকে স্থায়ী বলা যায়। সেই সময়ে স্থাপিত বন্ধুতা নিয়েই বাকি জীবন কাটাতে হয় ; কারণ, পরবর্ত্তী জীবনে আমরা সঙ্গী পাবো, সহকর্ম্মী পাবো ; স্ত্রী, পরিজন, অনুচর —এ-সমস্তই পাবো ; কিন্তু বন্ধু সেই পুরোনো যারা ছিলো, তা'রাই থাক্‌বে, না-হয় আদৌ থাক্‌বে না। একটা বয়েস আছে, যার পরে আর নতুন বন্ধু করা যায় না। আমাদের মন তখন শক্ত হ'য়ে উঠেছে ; সন্দিহান, আত্মরক্ষাশীল হ'য়ে উঠেছে ; কোনো পরিচয়ই আর তখন নিবিড়তার রসে পেকে উঠ্‌তে পারে না ; একজন লোককে খুব ভালো লাগে, প্রচুর মেলামেশা করি তার সঙ্গে ; কিন্তু একটা জায়গায় বাধা থেকেই যায়, সেখানে লেশমাত্র আক্রমণ হ'লে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রোধ করি—হ'তে পারে, সচেতনভাবে নয়, কিন্তু রোধ করি, ভয়ে নিজের মধ্যে নিজকে গুটিয়ে ফেলি ; প্রথম সূচনাতেই সে-সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে' দিই।

অনিবার্য্যরূপে, ভবভূতি আমার মন থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো। আমি বড় হ'য়ে উঠ্‌লাম, পৃথিবীর দিগন্ত হঠাৎ বহু দূর অবধি বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো ; দক্ষিণ-পক্ক দ্রাক্ষার মত, আমার নতুন যৌবনাক্রান্ত মনে রস-পীড়িত বন্ধুতা ঘণীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন কোথায় বা গেলো ভবভূতি—আর কোথায় তা'র হাস্যকর, অসম্ভব সব পদ্য! ওর সঙ্গে কখনো আবার দেখা হ'বে আশা করি নি ; কিন্তু ভাগ্যের উদ্দেশ্য ছিলো অন্যরকম। ইণ্টারমিডিয়েট পড়্‌বার সময় আমার জীবনে আবার ভবভূতির উদয় হ'লো। বয়েসেও আমার বছর দু' একের বড় ছিলো ; দ্বিতীয় চেষ্টায় দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে' ভর্ত্তি হ'লো এসে ঠিক আমার বছরেই। আমাদের অত যত্নে করা সব প্ল্যান কবে ভণ্ডুল হ'য়ে, ধূলো হ'য়ে উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে গিয়েছিলো, মনেও নেই ; কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে চলেছিলো অদৃষ্টের প্ল্যানহীন, উচ্ছৃঙ্খল অনিয়মতা, তা'রি ফলে ভবভূতি আবার আমার সঙ্গে এসে জুটলো।

সত্যি কথাটা যদি বল্‌তেই হ'বে, ভবভূতির মত ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করবার চেষ্টা শুধু যে অর্থহীন, তা নয়, একাধিকভাবে ক্ষতিকর। সাধারণের চেয়েও নিম্ন-স্তরের বুদ্ধিতে অ্যাকাডেমিক বিদ্যা প্রবেশ করাবার চেষ্টা—তা এতই নিষ্ফল যে তা হাসিরও উদ্রেক করে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আমাদের দেশের সাংঘাতিকতম কুসংস্কারের মধ্যে একটা। কত কষ্ট, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে' কোনো-কোনো বাপ-মা ছেলেকে (তাও এমন ছেলেকে, কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করতে যে জন্ম থেকে অক্ষম) 'শিক্ষিত' কর্‌বার অদম্য প্রয়াসে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে যান্, তা দেখ্‌লে মর্ম্মাহত হ'তে হয়। শাদা যুক্তিদিয়ে বিচার কর্‌লে, ভবভূতিকে কলেজে ভর্ত্তি করানো তা'র বাবার পক্ষে নিছক বোকামি ছাড়া আর-কিছুই মনে হ'বে না; তাঁর একমাত্র কর্ত্তব্য ছিলো, একটা সুযোগ পেলেই তা'কে যে-কোনো একটা কাজে ঢুকিয়ে দেয়া; তাতে অর্থ ও সময় দু'য়েরই ব্যয়সঙ্কোচ হ'তো। কিন্তু এটাও কিছু কম সত্য নয় যে একটা জিনিষকে সব সময় শাদা যুক্তি দিয়ে দেখা যায় না, আশার মায়াবী আলো দৃষ্টিকে তোলে রঙীন করে'। ভবভূতির বাবার নিজের জীবনে যে-সব আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছিলো, তিনি আশা করেছিলেন, দুরাশা করেছিলেন, ছেলেকে দিয়ে সেগুলোর পরিপূর্ণতা সাধন কর্‌বেন। লেখাপড়ার ওপর ভদ্রলোকের একটা অমানুষিক সম্ভ্রম ছিলো—সেটা কুসংস্কারেরই সামিল। ঢাকায় তাঁর এক পিস্‌তুতো শালা ওকালতি কর্‌তেন, বেশ স্বচ্ছল তাঁর অবস্থা। তাঁর বাসায় থেকে ভবভূতি কলেজে পড়্‌বে—এইরূপ ব্যবস্থা হ'লো। পৃথিবী পরিচালনায় যদি লেশমাত্র ন্যায়জ্ঞান থাক্‌তো, তা হ'লে ওর বাবার আন্তরিক ইচ্ছার জোরেই ভবভূতি বিদ্যা-বিষয়ে কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব অর্জ্জন কর্‌তো। কিন্তু সত্যি-সত্যি ব্যাপার যেমন…

যা'ই হোক্, আশাতীত, অবাঞ্ছিত, ভবভূতি আমার জীবনে পুনর্প্রবেশ কর্‌লে। কলেজের দুর্ব্বিষহ অবসরের ঘণ্টায় একদিন কমনরুমে, বসে' পাঞ্চ্ পত্রিকার রসিকতা পড়ে' হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, অনুভব কর্‌লাম, উল্টো দিকের একটা চেয়ার থেকে একজনের দৃষ্টি বারে বারেই আমার ওপর নিবদ্ধ হচ্ছে। চোখ তুল্‌তেই—মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধা করা সম্ভব ছিলো না—আমার বন্ধু ভবভূতিকে দেখ্‌লাম। আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেলো, 'আরে!'

ভবভূতি উঠে' আমার পাশে এসে বস্‌লো। ও দাঁড়াতে লক্ষ্য কর্‌লাম, ও প্রকাণ্ড ঢ্যাঙা হ'য়ে গেছে। কিন্তু ওর চোখে সেই অসহায়, কাতর দৃষ্টি; তাঁর ওপর, প্রথম যৌবনোন্মেষের ফলে ওর চলাফেরায়, ধরণ-ধারণে কেমন-একটা অস্বস্তির ভাব, একটু বিসদৃশতা—নিজের সম্বন্ধে ও যেন অতিরিক্তরূপে, কষ্টকররূপে সচেতন। ওর রোগা (কারণ রোগা ও প্রায় আগের মতই আছে), লম্বা শরীর মূর্ত্তিমান একটা অ্যাপলজির মত—এমন বিনীত, সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত; কোনো ভঙ্গীতে বা আচরণে অন্যকে চটাবার ভয় সব সময় ওকে হানা দিচ্ছে; এবং ভয় পেয়ে ঠিক এমন-সব কাণ্ড করে' ফেল্‌ছে, যাতে লোকে চট্‌তে পারে। নাকের নীচে ওর গোফের রেখা বেশ স্পষ্ট, পুরু হ'য়েই ফুটে উঠেছে; লক্ষ্য করে' দেখ্‌লে থুত্‌নিতে দু'এক গাছা দাড়িও চোখে পড়ে। মাথার চুল ঘাড় আর কান বেয়ে ঝুলে' পড়েছে, তাতে যথেষ্ট তৈল-প্রয়োগান্তে টেড়ি কর্‌বার প্রশংসনীয় চেষ্টার চিহ্ন বিরাজমান। গায়ে একটা আধ-ময়লা ছিটের শার্ট; তার গলার বোতামটা আট্‌কানো, কিন্তু বুকেরটা অনুপস্থিত থেকে মাঝে-মাঝে বক্ষোস্থলে সদ্য-বিকাশোন্মুখ রোমরাজির আভাস দিচ্ছে। না, একবার ওর দিকে দৃষ্টিপাত করে' মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পক্ষে দ্বিধা করা সম্ভব ছিলো না।

ভবভূতি মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'তোমাকে দেখে কী যে খুসি হ'লাম, রামতনু—'

আমি—খুব সোৎসাহে নয়—বল্‌লাম 'আমিও'।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ কাট্‌লো। পাঞ্চ্-এর একটা ছবির ওপর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করে' আমি ভাব্‌তে লাগলাম, এর পরে কী বলা যায়? কী বলা যায়? আমার কপাল ভালো, তখনই ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি উঠে' পড়ে' আমি বল্‌লুম, 'একটা ক্লাশ আছে—আবার দেখা হ'বে।'

স্বীকার করবো, প্রথম থেকেই ভবভূতিকে আমি একটু দূরে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম; আভাসে-ইঙ্গিতে—

এমন কি, অনেকটা স্পষ্টভাবে—তা'কে বুঝ্‌তে দিয়েছিলাম যে তা'র আর আমার মধ্যে যে স্বাভাবিক ব্যবধান গড়ে' উঠেছে, তা অতিক্রম কর্‌তে আমি প্রস্তুত নই। অবিশ্যি অতিক্রম করা যে আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো তা-ও নয়; যদি সে-চেষ্টা কর্‌তাম, তা'র ফল আমার পক্ষে হ'তো শুধু যন্ত্রণাদায়ক, এবং ভবভূতি তা'তে খুব আরাম বোধ কর্‌তো না। সুতরাং, প্রথম থেকেই আমি সাবধান হয়েছিলাম। যে-পরিচয়কে বেশি দূর যেতে দেবার ইচ্ছে আপনার নেই, তা'কে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ কর্‌তে হয়: না হ'লে একবার প্রশ্রয় দিয়ে ফেল্‌লে, পরে আর সাম্‌লানো যায় না। সূচনাতেই আমি রাশ টেনে দিয়েছিলাম, পরে যা'তে বিপদে পড়্‌তে না হয়। আমার কোনো দোষ ছিলো না; ভবভূতিকেই বা কী দোষ দেবো? দোষ আমাদের মধ্যবর্ত্তী সময়ের। ভবভূতির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হ'বার পর হাওড়া পুলের নীচ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে; অনিবার্য্যরূপে, আমরা পরস্পরের অনেক, অনেক দূরে স'রে এসেছি। সময় যেখানে তা'র অদৃশ্য হাত দিয়ে জীবনের ছবির রঙ্ বদ্‌লে দিয়ে যায়, আমি সেখানে কী কর্‌বো? অসম্ভব ছিলো, ভবভূতির সঙ্গে আমার ভাসা-ভাসা আলাপের বেশি কোনো সম্পর্ক থাকবে। যদি ছেলেবেলাকার বন্ধুতার খাতিরে, কর্ত্তব্যবোধ থেকে, জোর করে' আমি ওর সঙ্গে নিকটভাবে মিশ্‌তে যেতাম, তা হ'লে যেটুকু হৃদ্যতা ওর সঙ্গে ছিলো, তা-ও বজায় থাক্‌তো না; একদিন বাধ্য হ'তাম পাকারকম ঝগড়া কর্‌তে। কোনো সন্দেহ নেই, তা'র চেয়ে এ-ই ভালো হয়েছে—এই ঈষদুষ্ণ, উত্তেজনাহীন পরিচয়। আর, ভবভূতিও এর বেশি কিছু চায় নি, আশা করে নি; এর বেশি কিছু পেলেই ও বিব্রত হ'য়ে পড়্‌তো। আমার প্রতি ওর বালক-কালের অ্যাডোরেশন নতুন উৎসাহে জেগে উঠ্‌লো; নিঃশব্দে, শান্তভাবে, অলক্ষিতে ও আমার সঙ্গে নিজকে যুক্ত কর্‌লো; আঠার মত আট্‌কে রইলো। অবিশ্যি আমার তা'তে কোনো ক্ষতি হ'তো না; ভবভূতি ছিলো সেই জাতের মানুষ, যাদের উপস্থিতি স্বচ্ছন্দে ভুলে' থাকা যায়। ও বিরক্ত কর্‌তো না, কাজে বাধা দিতো না; ও কাছে থাক্‌লেও অনায়াসে নিজের কাজ বা অন্য কারো সঙ্গে গল্প করা যেতো; নিজকে লুপ্ত করে' দেবার ক্ষমতা ছিলো ওর অসাধারণ, তা ছাড়া কাছে ও বেশি থাক্‌তোই না; ওর অ্যাডোরেশন প্রধানতঃ ছিলো দূর থেকে। কোনোদিক দিয়েই যে ভবভূতিকে বিশেষ-কিছু যেতো আস্‌তো, তা নয়।

সেই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আমি একটু একটু পরিচিত হ'তে আরম্ভ করেছি। এবং তা নিয়ে ভবভূতির কী উল্লাস; ওর ম্লান মুখে, চোখের ভীত দৃষ্টিতে কী আশ্চর্য্য দীপ্তির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ! ওর আনন্দ দেখে তখনকার মত আমারো যেন একটু আনন্দ হ'তো—কোনো এক নব্য মাসিক পত্রের আমি নিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভূর্ত হয়েছি, ভবভূতির চোখে ভয়ানক এই ব্যাপার। 'আমি জান্‌তুম, আমি আগাগোড়াই জান্‌তুম, রামতনু, যে তুমি ভয়ানক একটা-কিছু হ'বে।' 'দেখেছো রামতনু, এ-মাসের অরুণোদয় তোমার কবিতা সম্বন্ধে কী লিখেছে?' 'ক্ষণপ্রভার সাহিত্য-সমালোচনা পড়েছো? মাথা-খারাপ না হ'লে কেউ অমন গায়ে পড়ে' ঝগড়া করে!' ভবভূতির স্তুতিতে কুণ্ঠা ছিলো না, শ্রান্তি ছিলো না, বিচার-বোধ ছিলো না, মাত্রাজ্ঞান ছিলো না। আমার তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির এই অতিরঞ্জিত, হাস্যকর মূল্যীকরণে প্রত্যেক মানুষের যে-মজ্জাগত ভ্যানিটি আছে সেখানে আমারো যে একটু কণ্ডুয়ন না হ'তো তা নয়; কিন্তু তা হ'লেও ভবভূতির উচ্ছ্বাস শুন্‌তে-শুন্‌তে ক্লান্তিবোধ না করে' পার্‌তাম না। কারণ, ভবভূতির ছিলো সেই বিকৃত ক্ষমতা, যা'তে নিজের প্রশংসার মত প্রীতিকর বিষয়ও ওর মুখ থেকে শুন্‌লে অসহ্য লাগ্‌তো। আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতুম, অন্যদিকে তাকিয়ে হাই গোপন কর্‌তুম, চেষ্টা কর্‌তুম প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন কর্‌তে; কিন্তু ভবভূতি তা'র করুণ, অসহায় ধরণে আঁক্‌ড়ে ধরে' থাক্‌তো, আঠার মত আট্‌কে থাক্‌তো; সাহিত্য বিষয় থেকে ওকে স্খলিত করা সম্ভব হ'তো না। ও যেন আমার ভেতর দিয়ে ওর অপরিপূর্ণ—এবং অপূরণীয়—খ্যাতি-লিপ্সাকে চরিতার্থ কর্‌তো; পরোক্ষে, বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সাহিত্যিক জীবন বাঁচ্‌তো। আমার তা-ই মনে হয়েছিলো। অন্তত প্রথমটায়। কিন্তু কিছুদিন যেতেই টের পেলুম যে ভবভূতির একটা নিজস্ব—

হোক্ তা অতি গোপন, কৌমার্য্যের লজ্জা-জড়িত—উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে ; বাল্যকালে তা'র মনে যে-বীজ সঞ্চারিত হয়েছিলো—সে-অপরাধ আমার, আমার!—এখন পর্য্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ে সে তা লালন করে' এসেছে। একটু বিস্মিতই হ'লাম। সত্যি বল্‌তে ভবভূতির কাছ থেকে এতটা আশা করি নি।

কী কঠিন চেষ্টায় তা'র প্রবল লজ্জা জয় করে' ভবভূতি আমাকে তা'র ইদানীকার কাব্য-প্রচেষ্টা দেখিয়েছিলো, তা আমি সহজেই বুঝ্‌তে পারি। অনেকক্ষণ ধরেই সে এ-কথা ও-কথায় ভূমিকার অবতারণা কর্‌ছিলো ; ব্যাপারটা তা'র পক্ষে একটু সহজ কর্‌বার জন্যে আমি বলেছিলাম, 'তুমি আজকাল আর লেখো না ?'

'না—না, আমি আর কী লিখ্‌বো—না, আমি—হ্যাঁ, এই একটু-আধটু—' ভবভূতি এলোমেলো ভাবে কথাটা অসমাপ্ত রাখ্‌লো।

তখন আমার বলা কর্ত্তব্য হ'লো : 'আমাকে দু'একটা দেখালেও তো পারো।'

অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলুম, ভবভূতির জামার বুক-পকেট কাগজের তাড়ায় উঁচু হ'য়ে আছে। কাগজগুলো যে কী, তা-ও আমার বুঝ্‌তে বাকী ছিলো না। এইবার —শীতের সকালে লোকে যেমন করে' পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তেম্‌নি, চোখ-মুখ বুজে', দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে ভবভূতি তা'র বুক পকেটস্থ কাব্য-ভাণ্ডার আমার সাম্‌নে উজাড় করে' দিলে। আমি একটা পড়্‌লাম, দুটো পড়্‌লাম, তারপর বল্‌লাম, 'হুঁ।'

কাগজের দিকে তাকিয়েও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম, ভবভূতি রুদ্ধশ্বাস, অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এইবার ঢোক গিলে' বলে' উঠ্‌লো, 'কেমন ?'

আমি অম্লানমুখে—কারণ সেটা বলাই সব চেয়ে সহজ ছিলো—বল্‌লাম, 'চমৎকার।'

'না—সত্যি বলো।' উৎকণ্ঠায়, আনন্দে ওর গলা কেঁপে গেলো।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লাম, 'সত্যি বল্‌ছি।' সঙ্গে-সঙ্গে ভবভূতির সমস্ত মুখে চোখে এমন-এক আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘট্‌লো যে এই নির্লজ্জ মিথ্যা-ভাষণের জন্য নিজকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। এই দুঃখের সংসারে, তখন আমার মনে হয়েছিলো, এতখানি আনন্দ আন্‌বার ক্ষমতা যদি একটা মিথ্যার থাকে—কিন্তু আমার ভুল হয়েছিলো ; তখনো বিচার কর্‌বার সময় হয় নি।

তার পর থেকে ভবভূতি প্রায়ই আমাকে দেখাবার জন্য তা'র পদ্য নিয়ে আস্‌তো—একটা নয়, দুটো নয় ; রাশি-রাশি, অজস্র—শরতের সকালে ঝরে'-পড়া শেফালির মত, বর্ষায় গ্রামের পুকুরে কচুরি-পানার মত অগুণ্‌তি। রুল-টানা, মসৃণ কাগজে কোণবহুল হস্তাক্ষরে লেখা তা'র সব পদ্য—ও যে ধৈর্য্য ধরে' অত লিখ্‌তে পার্‌তো সেই জন্যেই ওকে প্রশংসা কর্‌তে হয়। শুধু অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত লিখে' যাবার ক্ষমতা যদি কাব্য-বিচারের একটা মানদণ্ড হ'তো, ভবভূতির আসন তা হ'লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অনেক ওপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তো, সন্দেহ নেই। ওর সঙ্গে আমার যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তা'র পর থেকে এই ক'বছর ও অবিচলভাবে কবিতার পেছনে লেগে রয়েছে, অবিশ্রান্ত লিখে'-লিখে'—একদিন ও আমার কাছে স্বীকার করে' ফেল্‌লো—ছোট একটা পোর্ট্‌ম্যাণ্টোয় ভরে' রেখেছে ; মাঝে-মাঝে বার করে' নিজেই সেগুলো পড়েছে। অন্যকে পড়াবার ইচ্ছে যে ওর না ছিলো, তা নয় ; মানুষমাত্রেরই সে-ইচ্ছে হ'য়ে থাকে। সে-উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও বার-বার কবিতা পাঠিয়েছে ; বেশির ভাগ ফেরৎ এসেছে, কোনোখান থেকে বা ফেরৎও আসে নি। মোট কথা, এ-পর্য্যন্ত একটা লেখাও প্রকাশ কর্‌তে ভবভূতি সক্ষম হয় নি। কিন্তু তা'তে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হ'য়ে ও আরো লিখ্‌তে বসে' গেছে। এমন অধ্যবসায়, এমন অবিচল নিষ্ঠা বাঙালী জাতে বিরল।

বাঙ্‌লাদেশের সাময়িকপত্র সাধারণত পদ্য একটু চলনসই হ'লেই ছাপে, এবং তা দুটো কারণে। প্রথমত, তা'র জন্যে পয়সা দিতে হয় না ; এবং, বাড়্‌তি স্থান-পূরণের উপায়-হিসেবে পদ্যের মত কিছু নেই। এই অবস্থাতেও, কোনো পত্রিকাই যখন ভবভূতির কোনো রচনাকেই স্থান দিতে স্বীকৃত হয় নি, এ থেকেই বোঝা যায়, ওর পদ্য কী-

শ্রেণীর। অবিশ্যি, ভবভূতির কাছে যা মনে হ'তো সম্পাদকদের অন্ধ অবিচার, তা নিয়ে ওর মনে একটু আক্ষেপ ছিলো। স্বভাবতই। সেটা মোটেও পরিস্ফুট নয়, কিন্তু টের পাওয়া যেতো। মাঝে-মাঝে ও আমাকে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো, 'তোমার কি মনে হয়, রামতনু, আমার কোনো কবিতা ছাপা যেতে পারে ?'

'আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায়', গম্ভীরমুখে আমি উত্তর দিলুম, 'নয়।'

'নয় !' ভবভূতির মুখ শুকিয়ে যেতো।

'না। কারণ তোমার কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করবার মত সূক্ষ্ম রসবোধ এ-দেশে এখন পর্য্যন্ত খুব কম লোকেরই হয়েছে। কে বুঝবে তোমার লেখা ? তুমি তো আর সাধারণ, জল-ভাত গোছের লেখক নও, যা'র লেখা যে-কোনো লোক পড়েই বুঝে' ফেলতে পারে ! বিশেষ, কাগজের সব সম্পাদক—তাদের মাথায় কি কিছু আছে ? আমি যদি তুমি হ'তুম, আমি তো কক্ষণো কোথাও লেখা পাঠাতুম না। এত ভালো যে লেখে, তা'র আবার ভাবনা কী ?'

'কাগজের সম্পাদকরা', আমার কথাগুলো উগ্র মদের মত ভবভূতির সাহস বাড়িয়ে দিতো, 'একটু যেন কেমন—না ? যে-সব লেখা আসে, হয়-তো না-পড়েই বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে' দেন ? হয়-তো বিশেষ কয়েকজন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাইরে কারো লেখা নেন্‌ই না ?'

'আর বোলো না ও-কথা। কাগজের আপিসের ব্যাপার সবই তো জানি ! এক-এক জায়গায় এক-এক দল ঘোঁট পাকিয়ে বসে' আছে—বাইরের কাউকে কি ঢুকতে দিতে চায় !'

'হুঁ।·· আচ্ছা, তোমার তো কোনো-কোনো কাগজে জানাশোনা আছে। তুমি চেষ্টা করলে পারো না—'

'চেষ্টা ! তোমার কবিতার জন্য চেষ্টা করতে হ'বে কেন ? সেটাই যে তোমার পক্ষে অপমান। লোকে তোমাকে লুফে' নেবে, তোমার পায়ে ধরে' সাধাসাধি করবে। তুমি তো আর দু'একদিনের সস্তা খ্যাতির জন্য হাত পাততে যাবে না। তুমি যা লিখছো, তা যে চিরকাল থাকবে। তখন—আজকাল যা'রা খুব আগডুম-বাগডুম করছে, কোথায় থাকবে তা'রা ? সম্প্রতি, লেখা ছাপা হওয়া আর না হওয়া—কী আসে যায় তা'তে ? তুমি যদি হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে' থাকো, তা হ'লেই বা তোমাকে আটকাবে কে ? সময়ের বিচারে জয় তোমার হবেই।'

এ-সব কথা বলতাম ; কিন্তু নিশ্চিত অমরত্বের আশ্বাসেও ভবভূতির মন সম্পূর্ণ সান্ত্বনা মানতো বলে' মনে হ'তো না। আশুলভ্য খ্যাতির অসারতা সম্বন্ধে তাকে বোঝাতে বাকি রাখি নি ; তবু মাসিকপত্রে কবিতা ছাপানোর লোভ সে কিছুতেই গোপন করতে পারতো না। আমার পরিচিত যা দু' একটা নব্য কাগজ তখন ছিলো, সেখানে তা'র লেখা পাঠাতে স্পষ্টভাবে কি প্রকারান্তরে একটু সুযোগ পেলেই আমাকে অনুরোধ করতে তা'র ভুল হ'তো না ; নানা অছিলায় আমি সে-সব এড়িয়ে যেতাম। শেষ পর্য্যন্ত—এক বছর কলেজ ম্যাগাজিনের ভার ছিলো আমার ওপর ; কলেজ-ম্যাগাজিনগুলোর যা হাল হ'য়ে থাকে, ভবভূতির পদ্যের মত লেখাও তা'র কোন ক্ষতি করতে পারে না ; সুতরাং সেখানে অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ অবস্থায় দিলাম ওর এক পদ্য ঢুকিয়ে। (বদলাতে গেলে নতুন করে' লিখতে হ'তো তাই সে-চেষ্টাও করলাম না।) ভবভূতির সমস্ত জীবনের পর্ব্বত-প্রমাণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ঐ একটিমাত্র লেখা ছাপার অক্ষরে বিদ্যমান।

ভবভূতিকে আমি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে তা'র লেখা হচ্ছে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর, এবং সেইজন্যই—যেমন চিরকাল হ'য়ে এসেছে—সাধারণের সমাদর পেতে তা'র দেরি হচ্ছে। তবে সেটা আসবে—অনিবার্য্য-রূপে, যেদিনই এবং যে-ভাবেই হোক্। এবং তখন—আজকের বাজারে লোকের চাহিদা অনুসারে খেলো জিনিষ তৈরি করে' যা'রা নাম কিনছে—কোথায় থাকবে তা'রা ? মুখে প্রকাশ না করলেও, এই ধারণা যে ওর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তা আমি বুঝতে পারতাম। আমার দিক থেকে এ-আচরণ অসঙ্গত, অন্যায়—এমন কি, একটু হীন—মনে হ'তে পারে। ঠিকই, মাঝে-মাঝে সে-কথা মনে করে' আমার লজ্জা হয়, তা'র বেশি দুঃখ হয়। কিন্তু তখন—ওকে নিয়ে মজা করবার জন্য যে আমি ও-সব কথা বলতুম,

তা নয়। এ ছাড়া আর কোন্ কথা বলে' ওকে সান্ত্বনা দেয়া যেতো। সত্যি যেটা, তা বল্‌লে বড় নিষ্ঠুর হ'তো, বড় বেশি নিষ্ঠুর হ'তো। খামকা একজন নিরীহ, নির্দোষ লোকের মনে কষ্ট দিয়ে সত্যবাদিতার গৌরবে উল্লসিত হওয়া—তা'র আমি কোনো সার্থকতা দেখি নে। অবিশ্যি অতদূর না গিয়ে মোলায়েম করে' বলা যেতো, ওকে বুঝিয়ে দেয়া যেতো—কিন্তু মুখে আমি যা বলি, ও তা-ই একেবারে বিশ্বাস করে' ফেল্‌বে, ওর বুদ্ধি যে এতই কম, তা আমি মনে কর্‌তে পারি নি। ও যে ও-সব কথা বিশ্বাস কর্‌তে পেরেছিলো, তা'তেই প্রমাণ হয় যে যে-কোনো অবস্থাতেই ও অসম্ভব আত্ম-বঞ্চনা অভ্যেস কর্‌তে পার্‌তো।

এখানে কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে যাচ্ছি; কারণ এই সময়ে ভবভূতি দ্বিতীয়বার আমার দিগন্ত থেকে অন্তর্হিত হ'লো। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে' আমি এসে ইউ-নিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হ'লাম, আর ভবভূতি পরীক্ষায় ফেল করে' কোথায় যে মিলিয়ে গেলো, তা'র আর কোনো দিশে পাওয়া গেলো না। ভবভূতি এমন লোক নয়, যা'র অভাব কেউ কখনো অনুভব কর্‌তে পারে; সুতরাং ওর দিশে পাবার আমি কোনো চেষ্টা কর্‌লাম না। চেষ্টা কর্‌লেও যে পেতাম, তা নয়। ও অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, স্রেফ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাঁচ বছর পরে এক সন্ধ্যায় হ'লো ওর পুনরা-বির্ভাব—কল্‌কাতায় এক বাস্-এর মাথায়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে আমার পাশে একজন এসে বস্‌লো, টের পেয়েছিলুম; কিন্তু রাস্তার দিকেই তাকিয়ে যেতে লাগ্‌লুম; বাস্-এ যেতে-যেতে যে-কেউ আপনার পাশে এসে বসে, তা'রই মুখের দিকে তাকাবার কথা আপনার মনে হয় না। কিন্তু সেই পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি যদি আপনাকে নাম ধরে' ডাকে, আপনি চম্‌কে ফিরে' তাকান; এবং রীতিমত একটা ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়েন, যখন দেখ্‌তে পান্, এমন একজন লোক আপনার পাশে বসে' আছে, এই পৃথিবীতে যা'র অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আপনি বছরের পর বছর সম্পূর্ণ নিশ্চেতন ছিলেন।

ভবভূতির গালে তিন দিনের দাড়ি, মুখে-চোখে এক সম্পূর্ণ দীর্ঘ দিনের মস্তিষ্কহীন, যান্ত্রিক কাজের ক্লান্তি। তা'র চুলের ভাগ-রেখা—লক্ষ্য কর্‌লুম—এতদিনে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে; তৈলাক্ত, সুবিন্যস্ত মাথায় সমস্ত দিন আপিস কর্‌বার পরও একটি চুল এদিক-ওদিক নয়। তা'র মলিন শার্টের বোতামগুলো এখন ঠিকই আছে। প্রায় তেম্‌নি রোগা, পাঁচ বছর আগে তা'কে যেমন দেখেছিলুম; সমস্ত শরীরের মধ্যে শুধু মুখের ওপর সময়ের চিহ্ন পড়েছে—প্রথম যৌবনের তীক্ষ্ণ আত্ম-সচেতনতা-প্রসূত অস্বস্তির ভাব কেটে গিয়ে এখন তা সাবালকতায় স্বচ্ছন্দ, আত্মস্থ হয়েছে। না—তা'রো বেশি: সে-মুখ পরিপক্ক, অতিরিক্ত পরিপক্ক; অকালপ্রৌঢ়ত্বের ছায়ায় সে-মুখ স্থবির, অনেকটা ব্যঞ্জনাহীন হ'য়ে পড়েছে। ওর চোখের ভীত, অসহায় দৃষ্টি এখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন।

পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে সাধারণ কুশল-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হ'লাম। অনিচ্ছায়, ছাড়া-ছাড়া-ভাবে ও নিজের কথা বল্‌লে—অবিশ্যি বল্‌বারই বা কী ছিলো; ও যে এখন সওদাগরী আপিসের কেরাণী, ওকে দেখে তা বল্‌বার জন্য শার্লক হোম্‌স্-এর দর্‌কার করে না। একবার ইণ্টার-মিডিয়েট ফেল করে' ওর পক্ষে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করা সম্ভব হয় নি; ওকে শিক্ষা-দান কর্‌তে ওর বাবার এমন যে উৎসাহ, তা-ও মিইয়ে এসেছিলো। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এ-সত্যটা স্বীকার কর্‌তে যে—যতই না তিনি চেষ্টা করুন্—তাঁর জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এ-ছেলেকে দিয়ে পরিপূর্ণ হ'বার নয়। অপ্রিয়, নিষ্ঠুর সত্য—কিন্তু এর হাত থেকে নিস্তার কোথায়? কত লোক তো নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্মে' পৃথিবীতে তা'দের নাম রেখে যায়—তাঁর ছেলে কেন ও-রকম হ'লো না? কেন? কেন? আশায়-আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত আমরা মানুষ প্রশ্ন করি—ব্যর্থতায়, বিদ্রোহে, অনুসন্ধিৎসায় প্রশ্ন করি: সমস্ত বিশ্ব নিরুত্তর। কেন যে তাঁর এত আশার ছেলে—আর-কিছু না হোক্, অন্তত কৃতবিদ্য, অর্থশালী হ'বে না, নিজের-জীবনে-ব্যর্থ সেই বৃদ্ধ এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পান্ নি। কিন্তু সত্যকে এড়ানো গেলো না; পুত্রের জন্য বিদ্যার অনুধাবনে তিনি ক্ষান্ত হ'লেন। ভবভূতির কপাল ভালো—ঠিক সময়ে তা'র একটা চাক্‌রিও জুটে' গেলো। ঢুকেছিলো পঁয়ত্রিশ টাকায়; এখন হয়েছে চল্লিশ। গেলো বছর, ছেলেকে তা'র

চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখে ভবভূতির বাবা মারা গেছেন। এখন, বিধবা মা আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে (চাকরি পেয়েই ভবভূতি বিয়ে করেছিলো) ও দর্জ্জিপাড়ায় এক বাড়ি ভাড়া করে' আছে। সংসারে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-ঝঞ্ঝাট আমাদের সকলেরই আছে ; ওর ভাগ্যেও তা'র অংশ জুটেছে। ইচ্ছে করলে অবিশ্যি ওর জীবন নিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এক স্যাঁৎসেঁতে দুঃখের গাথা রচনা করা যায় ; কিন্তু সত্যি বল্‌তে গেলে, ও বেশ সুখেই আছে ; ওর জীবনের উচ্চতম যা সম্ভাবনা, তা সফল হয়েছে ; ওর জন্যে বিশেষরূপে দুঃখ করবার কী কারণ থাকতে পারে ? ভবভূতির জীবনে এর বেশি কী আর হ'তে পার্‌তো ?

তবু, ওর সৌভাগ্যে মুখ ফুটে' ওকে ঠিক অভিনন্দন করতে পার্‌লাম না। বরং, ওর পাশে বসে' নিজের জন্য যেন লজ্জাবোধ করতে লাগ্‌লাম। জীবনের ভারে নুয়ে'-পড়া, ক্লান্ত, বিক্ষত-যৌবন ওর পাশে আমার বেশের পরিচ্ছন্নতা, মনের প্রফুল্লতা, আমার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, নিশ্চিন্ত লঘু-চিত্ততা—সব যেন ভাল্গার, অত্যন্ত ভাল্গার—এমন কি, একটু অশ্লীল—বোধ হ'তে লাগ্‌লো। ওর কথা শেষ হ'লে কী বল্‌বো ভেবে না পেয়ে পকেট থেকে সিগ্রেট বা'র করে বল্‌লাম 'খাও।'

'না, থাক্।'

'খাও না ?'

'তা নয়—তবে, এখন থাক্।'

'খাও না একটা।'

'আচ্ছা', একটু ইতস্তত করে' ভবভূতি বল্‌লে, 'দাও তবে একটা।' ঠোঁটের ওপর দু' আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করে' সিগ্রেটে টান দিয়ে বল্‌লে, 'তুমিতো আজকাল রীতিমত ফেমাস্ হ'য়ে পড়েছো—'

আমি তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লুম, 'পাগল—ফেমাস্ আর কী !'

নীরবে আমার মুখে একটু তাকিয়ে ভবভূতি জিজ্ঞেস করলে, 'সবসুদ্ধ ক'খানা বই হ'লো ?'

যেন এটা মস্ত এক অপরাধের ব্যাপার, এই ভাবে, অস্পষ্টস্বরে আমি বল্‌লুম, 'এই—খান ছ'য়েক।'

'বেশ আছো, মনে হচ্ছে।—তা বেশ থাক্‌বেই বা না কেন ?'

'বেশ ! হ্যাঁ, বেশই তো আছি !' কণ্ঠস্বরে আমি অতিরিক্ত আয়রনি প্রকাশ করে' ফেল্‌লুম, 'চাক্‌রি-চাক্‌রি ক'রে পাগল হ'য়ে গেলুম, তবু একটা জুটছে না।'

'কেন, তোমার আর চাক্‌রির দরকার কী ? বই লিখে' টাকা পাও না ?'

আমি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলুম।

'কোথায় যাচ্ছো এখন ? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো মেয়ের কাছে যাচ্ছো।'

ওর অনুমান যে একেবারে ভুল হয়েছিলো, তা নয় ; মৃদু হেসে আমি চুপ করে' রইলুম। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাট্‌লো। তারপর গাড়ি যখন হ্যারিসন রোড পেরিয়েছে, ভবভূতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা রামতনু তোমার সঙ্গে তো অনেক প্রকাশকের জানাশোনা আছে ?'

'না থেকে আর উপায় কী ?'

'আচ্ছা—' ভবভূতি আরম্ভ করে' হঠাৎ চুপ করে' গেলো।

'কী, বলো ?'

'তা হ'লে এমন তো হ'তে পারে যে—ধরো—তুমি যদি একটা বই রেকমেণ্ড্ করো, সেটা ছাপ্‌তে ওঁরা অতটা অনিচ্ছুক না-ও হ'তে পারেন ?'

ব্যাপারটা বুঝে' ফেলে' আমি সোজা জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, তোমার লেখা কোনো বই আছে নাকি ?'

ভবভূতি মাথা নাড়্‌লে।—'তুমি যদি দয়া করে' একটু দেখে দাও—'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি বল্‌লে কেউ হয়-তো একটা বই বা'র কর্‌তে রাজি হ'তে পারে।'

'সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।' কথাটা সত্যি, কিন্তু তা ব'লেই অনুতাপ হ'লো। ভবভূতির হয়-তো মনে হ'তে পারে, আমি তা'কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তা'কে সাহায্য করতে অস্বীকার কর্‌ছি। পরের মুহূর্ত্তেই, তাই, কৌতুহল প্রকাশ করে' বল্‌লাম, 'তোমার বই শেষ হ'য়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী—উপন্যাস?'

'উপন্যাস। গল্পও আছে।'

'তোমার অনেক লেখা জমা আছে বুঝি?'

শীতের সকালে পুকুরে ঝাঁপ দেবার ধরণে ভবভূতি স্বীকার করে' ফেল্‌লে চার-পাঁচখানা বই হ'বার মত গল্প আর খান দশেক উপন্যাস তা'র বাক্সে জমা হ'য়ে আছে। এর ভেতর থেকে অন্তত একটা সে প্রকাশ করে' দেখ্‌তে চায়। প্রথমে সে কিছু টাকা চায় না; বই বা'র করে দিলেই সে খুসি।

বজ্রাহত হ'য়ে আমি বল্লুম, 'সে কী! তুমি এত লিখেছো? সময় পাও কখন্?'

'সময় ইচ্ছে কর্‌লেই করে' নেয়া যায়। আপিস থেকে ফিরে' রোজ কয়েক ঘণ্টা লিখি—রাত্তিরে ভাত খেয়ে আবার অনেক রাত পর্য্যন্ত।'

'রোজ?'

'প্রায় রোজই।'

'কী করে' পারো? ক্লান্ত লাগে না?'

'তা লাগে বই কি, কিন্তু না লিখে'ও পারি নে।'

মুগ্ধদৃষ্টিতে ভবভূতির মুখে তাকিয়ে আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ক্ষমতা তোমার।' 'আমার মনে হয় কী জানো, রামতনু,' নিম্নস্বরে—পবিত্র, গোপন কথা বলার মত করে' ভবভূতি বল্‌লে, তার ম্লান, ক্লান্ত চোখ মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, 'মনে হয়, আমি যা লিখি, তা বোঝ্‌বার উপযুক্ত বাঙ্‌লাদেশ এখনো হয় নি। আমার সময় যখন আস্‌বে—তখন আস্‌বে। সেই জন্যেই মুহূর্ত্তের জন্যও আমি লেখা বন্ধ করে' দেবার কথা ভাবি নে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' বলে' আমি উঠে' দাঁড়ালাম; আমার গন্তব্য স্থান এসে গিয়েছিলো।

'তা হ'লে—একদিন তোমার ওখানে যাবো, কী বলো?'

'হ্যাঁ, যেয়ো।' আমি ওকে আমার ঠিকানা দিলাম।

'সাম্‌নের রোব্‌বার—কেমন?'

'আচ্ছা।'

রোব্‌বার সকালবেলাই ভবভূতি এসে উপস্থিত—সঙ্গে তা'র ফুলস্ক্যাপের তিন শো বারো পৃষ্ঠা এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। বল্‌লে, 'পড়ে' দেখো।'

'নিশ্চয়ই,' এ-ছাড়া আমার মনে কোনো উত্তর এলো না; যদিও জান্‌তাম যে শতবর্ষ পরমায়ু পেলেও ঐ পাণ্ডুলিপি আমি কখনো পড়্‌বো না।

'এ-বইটা,' ভবভূতি বল্‌লে, 'আমার নিজের খুব ভালো লাগে না; কিন্তু সেইজন্যেই এটা নিয়ে এসেছি। প্রকাশকদের হয়-তো বা পছন্দ হ'তে পারে। তা'র ওপর, তুমি যদি একটু বলো—'

'আমার যেটুকু সাধ্য, আমি কর্‌বো।' জেনে-শুনে' আর-একটা মিথ্যে কথা বল্‌তে হ'লো। অবিশ্যি, আমি আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌লেও যদি ভবভূতির বই প্রকাশিত হ'বার লেশমাত্র সম্ভাবনা থাক্‌তো, তা হ'লে, কোনো সন্দেহ নেই, আমি তা কর্‌তাম। কিন্তু ওর পাণ্ডুলিপির ওপর একটু চোখ বুলিয়েই যা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, তাতে সে-পরিশ্রম বাঁচানোই আমার কাছে সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিলো।

'এ-বইটা যদি বেরোয়', ভবভূতি বল্‌লে, 'আর লোকে যদি নেয়, তা হ'লে আস্তে-আস্তে সত্যিকারের ভালো বইগুলোও বার করা যেতে পারে। লোকের এ-ধরণের জিনিষ পড়ে' তো অভ্যেস নেই; সইয়ে-সইয়ে স্বাদ দেয়াই ভালো।'

'ঠিক কথা,' আমি বল্‌লাম।

দু' সপ্তাহ পর ভবভূতি আবার আস্‌তে আমি বল্‌লাম, 'আমাদের দেশের সব প্রকাশক—তা'দের কি বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞানগম্যি কিছু আছে? হাতের কাছে যে-কোনো রাবিশ পায়, তা-ই ছাপে, লেখক একটু নাম-করা হ'লেই হ'লো। নাম করা!—' তীব্র উষ্মার স্বরে আমি জুড়ে' দিলুম, 'কী-সব লিখে'ই নাম করেন এক-একজন!'

ভবভূতির ক্লান্ত চোখ নিরাশায় আনত হ'য়ে এলো: 'হলো না তা হ'লে?'

'পাগল!' আমি রীতিমত উত্তেজিত হ'য়ে পড়্‌লুম, 'এটা তো জানো যে প্রচলিত ফ্যাশানের বিরুদ্ধে যে যায়, তাঁর পক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা কত কঠিন! সাহিত্যেও

—আর্টেও সাময়িকভাবে এই ফ্যাশানের বিধানই চূড়ান্ত; হাতে-হাতে যশ আর টাকা পাবার লোভ যা'দের, তারা এই ফ্যাশানেরই দাসবৃত্তি করে। কিন্তু তুমি তা করো নি, করতে পারো না। যদি পারতে, তা হ'লে তুমি আর তুমি থাকতে না। এ তো জানা কথা—তোমার যে একটু সময় নেবে। আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দাও; স্ট্রেচির এমিনেন্ট্ ভিক্টরিয়ান্স বা'র করতে প্রথমটায় লণ্ডনের কোনো প্রকাশকই রাজি হন্ নি।'

স্ট্রেচির নাম শুনে' ভবভূতির মুখে কোনো দীপনা প্রকাশ পেলো না; এমন প্রমাণ পেলুম না, আমার কথা শুনে' ওর মনটা আত্ম-গৌরবে উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। একটু চুপ করে' থেকে ও নির্জীবস্বরে বল্লে, 'একবারেই তো আর কারো নাম হয় না। আজ যা'র নাম কেউ জানে না, হয়-তো একখানা বই বেরোলেই—'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে আমি বল্লুম, 'নিশ্চয়ই! কিন্তু এ-ও বল্‌ছি, ভবভূতি, তোমার পক্ষে এই আগ্রহ অশোভন হ'য়ে পড়ছে। এটা কেন বুঝতে পার্‌ছো না যে আগুন আর প্রতিভা কেউ চাপা রাখতে পারে না; একদিন তা ফুটে' বেরোবেই। বেরোবেই। আমার মত লেখককে যে-সব জিনিষের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়, অনেক কষ্টে কুড়িয়ে-কাচিয়ে জোগাড় করতে হয়, তোমার কাছে সে-সব নিজে থেকে, গায়ে পড়ে' আস্‌বে; তোমার পক্ষে চুপচাপ বসে' থাক্‌বার বেশি কিছুই করবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি যা লিখি', ভবভূতি একটা খাঁটি কথা বল্লে, 'লোকের তা পড়া তো দরকার।'

'যথা সময়ে,' সংক্ষেপে, হেঁয়ালি-ধরণে আমি বল্লুম।

'হ্যাঁ, যথাসময়ে,' গম্ভীর নিম্নস্বরে ভবভূতি বল্লে, 'সে-সময়ের দেরি থাকতে পারে, কিন্তু,' এখানে আমি মাথা নেড়ে সায় দিলুম, 'যখন আসবে, যখন আস্‌বে—'

ভবভূতি তা'র কথা শেষ করবার ভাষা পেলো না; আমি তাড়াতাড়ি বলে' উঠলাম, 'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু যতদিন তা না আসে,' সকুণ্ঠে, সলজ্জভাবে ভবভূতি বল্লে, 'একটু একটু চেষ্টা করতেই বা দোষ কী? যা-ই বলো, আজকালকার পৃথিবীতে কি আর প্রতিভার সে-রকম আদর আছে!'

'আজকালকার পৃথিবীর কথা আর বোলো না। একটা সিগ্রেট খাও।'

'আমি ভাব্‌ছি, তোমাকে আর একটা MS দিয়ে যাবো। বলা যায় না—হঠাৎ কারো হয়-তো খেয়াল হ'তে পারে—'

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে ভবভূতি আর-একটা দিয়ে গেলো। তৃতীয়টা ফেরৎ দিবার সময় আমি প্রকাশকদের ভয়ঙ্কর নির্ব্বুদ্ধিতা ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য বিজয়-গতি সম্বন্ধে আরো জোরালো ভাষায় এক বক্তৃতা দিলুম। ঠিক সেই সময়ে, দুর্ভাগ্যবশত, ডাকযোগে এক মাসিকপত্র এসে উপস্থিত হ'লো: তা'তে, দেখা গেলো, 'আধুনিক সাহিত্যে রামতনু' নামে এক প্রবন্ধ; এক ফর্মা-ভরা, কোটেশন-বহুল আমার এক উচ্ছ্বসিত স্তুতি। ভবভূতি লেখাটা খানিকক্ষণ উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখে চুপ করে' রইলো।

আমি হেসে বল্লুম, 'কী লিখেছে ইডিয়টচন্দ্র?'

প্রত্যুত্তরে ম্লান হেসে ভবভূতি বল্লে, 'তুমি একেবারে দিগ্বিজয় করে' ফেলেছো, দেখ্‌ছি।'

সশব্দে, আমি হেসে উঠলুম।—'আমি হচ্ছি ফ্যাশানের ঢেউয়ের ওপরকার ফেনা, আজকের এই ক্ষণিক সূর্য্যালোকে ঝিকমিক করছি। হ'তে পারে, এই ঢেউ আরো স্ফীত হ'বে; আমার ঝিকিমিকি আরো চোখ ধাঁধানো হ'বে; কিন্তু তারপর,—এই ঢেউ যখন ভেঙে পড়্‌বে—কারণ, ভেঙে পড়তে তা বাধ্য—কোথায় থাক্‌বো আমি? সময়ের সমুদ্রে একটা বুদ্‌বুদ, মুহূর্ত্তের একটা রঙীন রামধনু। আর তুমি? তুমি চিরস্থায়ী শিলার মত; তোমাকে ঘিরে' সময়ের অনেক জল চিরকাল বয়ে' যাবে; অসংখ্য ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মধ্যে স্থির, অক্ষয়, তুমি দাঁড়িয়ে।'

আমার এই কথা থেকে ভবভূতির মন গভীর প্রেরণা গ্রহণ করেছিলো কিনা জানি নে, কিন্তু তা'র পরে কিছুকাল আর ওর দেখা পাই নি। ভয় করেছিলাম, ও হয়-তো আরো কোনো পাণ্ডুলিপি আমার কাছে দিয়ে যাবে; ধারণা হ'লো, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে নিজেই নিজের পথ করে' নেয়,

সে-বিষয়ে ওর মনে বিশ্বাস উৎপাদন কর্‌তে আমি সক্ষম হয়েছি। শেষটায়—হিসেব কর্‌লে দেখা যাবে, প্রায় চার মাস পরে, কিন্তু জীবিকা-সংগ্রহের সর্ব্বগ্রাসী চেষ্টায় যা'কে ব্যাপৃত থাকৃতে হয়, তা'র কাছে তা অতটা সময় মনে হয় না—একদিন ওর এক পোস্‌ট্‌কার্ড পেলুম: ও রোগে শয্যাগত; আমি কি একবার সময় করে' ওকে দেখে আস্‌তে পার্‌বো?

গেলাম ওকে দেখ্‌তে—গলির পর সরু গলি পার হ'য়ে; পুরাণো, বনেদি কল্‌কাতার শ্বাসরোধকারী, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে; গায়ে গা-লাগা, বিবর্ণ, সূর্য্যহীন অন্তঃপুর-সমন্বিত সব বাড়ির সারি পার হ'য়ে। দিনের বেলায়ই প্রায়-অন্ধকার এক বাই-লেইনের ভেতর পাওয়া গেলো ভবভূতির বাড়ি। নীচের তলায়, রাস্তার ওপর ওর দু'টি ঘর; তা'রি মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ভালো, সেখানে এক তক্তপোষে বিছানা পেতে চাদরমুড়ি দিয়ে ভবভূতি শুয়ে' আছে। ওকে দেখে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। কোনো-কালেই ও রোগা বই ছিলো না; কিন্তু এখন আর ওকে মানুষ বলে'ই চেনা যায় না। মামির মত শীর্ণ, নিরক্ত বর্ণহীন ওর মুখ; কুয়োর মত কোটরের নীচে ভারি, সবুজ জলের মত মিট্‌মিট্‌ কর্‌ছে চোখ; চোখের নীচে, কপালে ছোট-ছোট সব শিরাগুলো স্ফীত হ'য়ে ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে; গালের ওপর অনেকদিনের দাড়ি কোনো বিষাক্ত আগাছার মত কুৎসিত। একবার তাকিয়েই উপলব্ধি কর্‌লাম, আমি এক মৃতদেহের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি যখন ঘরে ঢুক্‌লাম, ভবভূতির স্ত্রী ওর শিয়রে বসে' হাওয়া কর্‌ছিলো; আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে উঠে' দাঁড়ালো। মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির চোখ আমার চোখে পড়্‌লো; তা'তে কোনো অসাধারণ লাবণ্য বা দীপ্তি নেই; সে মুখের একমাত্র ভাব-ব্যঞ্জনা হচ্ছে অমানুষিক সহনশীলতা: সে-মুখে ভাগ্যের হাতে চরম আত্ম-সমর্পণের নির্ব্বুদ্ধিতা, আলোকহীনতা। অনুমান কর্‌লুম, মেয়েটির বয়েস আঠারোর মত হ'বে, মেয়েলোকের পক্ষে যে-বয়েসটা ঐশ্বর্য্যের মত—কিন্তু এই তা'র রূপ! হঠাৎ মনে হ'লো, এই মেয়ে যখন থান-কাপড় পর্‌বে, হাত থেকে খুলে' ফেল্‌বে শাঁখা, মুছ্‌বে কপালের সিঁদুর, তখন ওর সঙ্গে যেন তা মানিয়েই যাবে; বৈধব্যের কোনো কষ্ট অনুভব করবার ক্ষমতাও ওর নেই; ওর জীবনের এই অসাময়িক, কুশ্রী পরিসমাপ্তি ও অনায়াসে মেনে নেবে—মোট কথা, এখনকার চাইতে যে কিছুমাত্র খারাপ থাকৃবে, তা নয়।

ভবভূতি ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, 'বোসো।'

হঠাৎ, কী ভাব্‌ছিলাম, তা টের পেয়ে নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেলাম। ঘরের মধ্যে একটামাত্র চেয়ার; সেটা টিনের, এবং তার ওপর কতগুলো নোঙরা কাপড় স্তূপীকৃত। সমস্ত ঘর এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; মেঝে-ভরা পানের ডিবে থেকে আরম্ভ করে' মুদিদোকানের কাগজের ঠোঙা পর্য্যন্ত কাজের ও অকাজের নানারকমের জিনিষ ছড়ানো; তা'রি মধ্যে এক উলঙ্গ শিশু হাত-পা ছড়িয়ে বসে' কাল্পনিক এক সঙ্গীর কাছে ও ছাড়া অন্য সবার কাছে অর্থহীন কথা বলে' যাচ্ছে।

বৌটি নোঙ্‌রা কাপড়গুলো নামিয়ে চেয়ারটা আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে' গেলো। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কেমন আছো, ভবভূতি?'

ভবভূতি মাথা নাড়্‌লে।—'ভালো না।'

'কী হয়েছে?'

'জ্বর।'

'ক'দিন যাবৎ ভুগ্‌ছো?'

'আজ তেইশ দিন।'

'হুঁ।' একটু সময় আমি চুপ করে' রইলাম 'আপিস?'

একমাসের ছুটী পাওয়া গেছে। সাম্‌নের দশ তারিখে join কর্‌বার কথা। কিন্তু জ্বরটা কিছুতেই যে ছাড়্‌ছে না। ভাবছি—আরো ছুটী চাইলে দেবে তো?'

আমি কোনো কথা বল্‌লাম না। ভবভূতির অন্তহীন ছুটী মঞ্জুর হ'য়ে আছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌লে আপিসের ছুটীর কথা ভেবে ও বিচলিত হ'তো না।

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটায় ঢেকে ভবভূতির মা এলেন। তাঁর কাছ থেকে রোগের ও চিকিৎসার সব বিবরণ শোনা গেলো। অনেকদিন যাবৎই ভবভূতির খুস্‌খুসে কাশি, বিকেলের দিকে সামান্য জ্বরও হয়। একাদশী আর পূর্ণিমা-

অমাবস্যায় উপোস করে' ও সেটা কাটিয়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করেছে। কিছু ফল হয় নি। কাশিটা বরং দিন থেকে দিন বেড়েই চলেছে। শরীরও অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো, হাঁটুতে কষ্ট হয়। শেষ পর্য্যন্ত শয্যা নিতে হ'লো। পাড়ায়ই থাকেন এক কবিরাজ, তাঁর, আমার মনে হ'লো, সব চেয়ে বড় গুণ এই যে তিনি ভবভূতিদেরই দেশের লোক; তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা চল্‌ছে। তিনি বলেছেন, বিশেষ কিছু নয়; ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, কাশির সঙ্গে যে-রক্তটা পড়ে, সেটা বেশি কাশতে গলায় চোট লাগে বলে'। তাঁর নির্দ্দেশ-অনুসারে চ্যবনপ্রাশ আর সকালে-বিকেলে তুলসী পাতা আর মিশ্রীর অনুপান দিয়ে বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। কবিরাজটির হাত-যশ আছে; ভগবানের ইচ্ছায় বাছা এখন শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌লেই হয়।

ভবভূতির অসুখটা যে যক্ষ্মা, এবং যক্ষ্মারও বেশ-একটু পরিণত অবস্থা, তা, এ-সব বিষয়ে যা'র কিছু অভিজ্ঞতাও আছে, সে একবার ওকে চোখে দেখেই বুঝ্‌তে পারে। টিউর্ব্বল্‌-বীজাণু যে ওকে আক্রমণ করবে, তাতে কিছুই আশ্চর্য্য নেই; বরং যে-সব কারণে তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তা'র প্রত্যেকটি ও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিপূরণ করে' এসেছে। বলা যায়, যক্ষ্মার জন্য ও নিজকে সযত্নে প্রস্তুত করে' রেখেছিলো—তা ছাড়া ওর উপায় ছিলো না। এই গলির ভেতর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার এই ঘর, অপর্য্যাপ্ত, সারহীন আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম—এতেও যদি ক্ষয়রোগ না হয় তো সেটা একটা মির‍্যাক্‌ল্‌। এখন যা অবস্থা, ভবভূতিকে তাতে মৃতের মধ্যে গণনা করলেও ক্ষতি নেই। অথচ, এখন পর্য্যন্ত চ্যবনপ্রাশের ওপর নির্ভর করে' এরা সবাই নিশ্চিন্ত! কিন্তু মন্দই বা কী? তা-ই বা মন্দ কী? যে-কোনো অবস্থায়, ভবভূতি মরবেই; স্বগ্রামীয় কবিরাজের চিকিৎসা ওর এমন-কী আর ক্ষতি করতে পারবে? অন্তিম, ভয়ঙ্কর উপলব্ধি একদিন তো অনিবার্য্যরূপে আস্‌বেই—কেন সেটাকে অযথা এগিয়ে দেয়া? শীগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বে, এ বিশ্বাসে যতদিন ওরা সুখে থাক্‌তে পারে, থাক্‌ না। কী লাভ হ'বে ওদের জানিয়ে দিয়ে যে ভবভূতির ব্যাধিটা হচ্ছে যক্ষ্মা এবং ওর মৃত্যু আসন্ন? এ হচ্ছে গিয়ে বড়লোকের রোগ; অকৃপণভাবে অজস্র টাকা খরচ করতে না পার্‌লে সেরে ওঠ্‌বার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই: ভালোই তো, ওদের যদি ধারণা হয় যে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। কী হ'বে, আমি যদি একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসি? ডাক্তার এসেই তো বল্‌বে, আশিটা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দেয়া দরকার; তা'র একটার দামই ভবভূতির একমাসের মাইনে। তখন? বল্‌বে, গোপালপুর অন্-সী নিয়ে যাও—তখন? খেতে বল্‌বে ডিম দুধ মাখন লুচি মাংস অজস্র ফল—তখন? না, না—ডাক্তার না-ডাকাই ভালো; কেন মিছিমিছি মন-খারাপ করা? টাকার অভাবে, স্রেফ টাকার অভাবে একটা লোক মরতে বাধ্য হচ্ছে, এ-চিন্তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কারো কাছে অসহ্য, বাইরের লোকের কাছেও প্রীতিকর নয়। সেই প্রায়ান্ধকার, বিশৃঙ্খল ঘরে বসে' ভবভূতির মা-র অজ্ঞান, স্নেহান্ধ, মিথ্যা-আশা-অবলম্বী কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমার ভয়ানক মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। কয়েকদিনের মধ্যেই ভবভূতি যে-ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেয়ে-পেয়ে মরবে, সেই চিন্তায় আমি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছিলাম না। কিন্তু বৃথা চিন্তা; আমি কী করতে পারি? কী ক্ষমতা আমার আছে?

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। 'একটা আলো নিয়ে আসি,' বলে' ভবভূতির মা ভেতরের ঘরে চলে' গেলেন। হঠাৎ, ভবভূতির সঙ্গে একা বসে' আমি কী-রকম দুর্বল হ'য়ে পড়্‌লাম; ওর দিক থেকে রইলাম মুখ ফিরিয়ে। সেই শিশুও কখন্‌ তা'র কাল্পনিক (কিন্তু যা'কে আমরা বাস্তব বলি, তা'র চেয়ে কিছু কম সত্য নয়) বন্ধুর সঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে তা'র মা-র কাছে চলে' গেছে; স্তব্ধ ঘরে ভবভূতির দীর্ঘ, কষ্টকর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগ্‌লাম।

খানিক পরে ভবভূতি ডাক্‌লো: 'রামতনু।'

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'শোনো', তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভবভূতি বল্‌লে তা'র মনের কথা, 'অসুখটা করে' এমন বিশ্রী হ'লো; নতুন একটা উপন্যাস লিখ্‌ছিলাম—লিখ্‌তে পার্‌লে অ্যাদ্দিনে শেষ হ'য়ে যেতো।'

আমি কণ্ঠস্বরে প্রফুল্লতা আন্‌বার যথাসাধ্য চেষ্টা করে' বল্‌লাম, 'এমন আর তাড়া কী? সেরে উঠে' তুমি অনেক উপন্যাস', কথাটা আমার নিজের কানেই ঠাট্টার মত শোনালে, 'শেষ করতে পার্‌বে।'

'এ-বইটা খুব ভালো হচ্ছিলো; আমার সব চেয়ে ভালো।'

'না, না', আমি মিথ্যার ওপর মিথ্যা জড়ো করতে লাগ্‌লাম, 'এখন আর তোমার কী হয়েছে? সবে তো সুরু; তোমার যা সব চেয়ে ভালো, এখনো তার অনেক দেরি।'

কোটর-নিহিত ভবভূতির চোখে ক্ষণিকের আনন্দ ঝিক্‌মিক্ করে' উঠ্‌লো। – 'শুয়ে'-শুয়ে', প্রায়ই বইটার কথা ভাবি। এমন লিখ্‌তে ইচ্ছে করে!'

দিনব্যাপী অপিসের খাট্‌নির পর বাড়ি ফিরে এসে আবার লেখা—বোধ হয় এই তক্তপোষেই বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে'—অবিশ্রান্ত লেখা—সে-লেখায় যশ নেই, লাভ নেই, বাইরে থেকে কোনোরকম উৎসাহ নেই, তবু মুহূর্ত্তের জন্য দমে' না গিয়ে লিখে'-যাওয়া—কী আশ্চর্য্য, কী ভয়ানক! হঠাৎ আমার মনে হ'লো, এই লেখার জন্য না হ'লে ভবভূতির হয়-তো অসুখটা করতোই না। এত পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে ও জন্মায় নি। যদি সন্ধ্যে-বেলাটাও ও খোলা হাওয়ায় কাটাতো! কিন্তু তখনই আবার মনে হ'লো, এই ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার ও কোনো-রকমেই পেতো না; তবু যা হোক্ এই সান্ত্বনা নিয়ে ও মরতে পার্‌বে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ওর সাহিত্যসৃষ্টি থাক্‌বে ক্ষয়হীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে; ও অন্তত জেনে যাবে, ওর জীবন একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে ভবভূতি কি তা'র অনশ্বর সাহিত্যিক যশের নব-জিরুসালেমের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্নে মুগ্ধ হয়েছিলো? না কি মুহূর্ত্তের শীতল, শান্তদৃষ্টিতে সে তা'র নিয়তিকে উপলব্ধি করেছিলো—এক কণা ধুলোর মত সে তুচ্ছ, যা'কে তার মৃত্যুর দু'দিন পরে কেউ আর মনে রাখ্‌বে না, পরিবার-গণ্ডীর বাইরে যাঁ'র অভাব কেউ অনুভব করবে না? জান্‌বার উপায় নেই। তবে, শেষ যেদিন ওকে দেখি, আমার একবার সন্দেহ হয়েছিলো যে আমি ওর জন্যে যে-মোহ তৈরি করে' দিয়েছিলুম, তা এইবার ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে, হয়-তো কোনোকালেই ও সত্যি-সত্যি তা বিশ্বাস করে নি। একটা কাশির কাৎরানি শেষ হ'য়ে যাবার পর ও শান্ত হ'য়ে অনেকক্ষণ শুয়ে'ছিলো। ওর মুখের বিবর্ণতা কেটে গিয়ে—ক্ষয়রোগের শেষ অবস্থার যা লক্ষণ—তা রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে; কোটর-নির্গত চোখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা; হঠাৎ দেখ্‌লে মৃত্যুর এই প্রস্তাবনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য বলে' ভুল হয়। অনেকক্ষণ ভবভূতি রইলো চুপ করে', চোখ বুজে'; তারপর হঠাৎ সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিম্ন, অতি নিম্নস্বরে, কানে-কানে বলার মত করে' বল্‌লে, 'আমি জানি, রামতনু, এতদিন আমি ভুল নিয়ে ছিলাম। যা-কিছু আমি লিখেছি, সব বাজে, সব রাবিশ। তুমি আমার মনে কষ্ট না-দেবার অনেক চেষ্টা করেছো; কিন্তু কেন যে ও-সব পাগ্‌লামি করেছিলাম, এখন ভেবে অবাক লাগ্‌ছে।'

সেই মুমূর্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে আবদ্ধ আমার পক্ষে এ-সব কথার কোনোরকম প্রতিবাদ করা অসম্ভব ছিলো। নীরবতায়, অসীম সময় থেকে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত খসে' পড়্‌তে লাগ্‌লো। তারপর, আসন্নমৃত্যু যক্ষ্মারোগীর মনে যে-তীব্র দুরাশা, বাঁচ্‌বার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, তা'রি প্রেরণায় ভবভূতি বল্‌তে লাগ্‌লো, 'কিন্তু এখনো সময় আছে। আমার মনে হয়, রামতনু, আমি মরবো না। আমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো, শীগ্‌গিরই ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো। তারপর—তারপর আর-একবার দেখা যাবে। তুমি দেখে নিয়ো, রামতনু, আমি লিখ্‌বো। লিখ্‌বো। সত্যি-সত্যি এমন জিনিষ লিখ্‌বো—'

কিন্তু ভবভূতি তা'র কথা শেষ করতে পার্‌লে না। এই সামান্য উত্তেজনায় আবার তা'র কাশি উঠ্‌লো; রক্তে বালিশ লাল হ'য়ে গেলো, তবু কাশি থামে না। আর সহ্য করতে না পেরে আমি তখন-তখন সেখান থেকে চলে' গেলুম। পরদিন খবর পেলুম, সেই রাত্রেই ভবভূতি মারা গেছে।

বুদ্ধদেব বসু

বেদ ও বুদ্ধ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অক্ষয় বেদ-বৃক্ষের দুটী প্রাচীন শাখা। আর্য্যজ্ঞান-গঙ্গার এই দুটী বিভিন্ন স্রোত ভারত ও মরু-সদৃশ ভারতের বহু প্রদেশকে উর্ব্বর ও শস্য-শ্যামল করিয়াছে। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে, উভয় ধর্ম্মের নব্য অবলম্বীগণ তাহাদের সাধারণ উৎস ভুলিয়া গিয়াছেন। অপ্রধান ও নগণ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে তাহারা একটি তথাকথিত পার্থক্য ও বিরোধের প্রাচীর তুলিয়াছেন। কিন্তু এই সমন্বয় ও ঐক্যের যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে উভয়ের মিলন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; নচেৎ উভয়ের অকল্যাণ অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

অখণ্ড-সমষ্টিরূপে ভারতীয় চিন্তার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আলোচনা করিলে এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, অসম্ভব না হইলেও উভয়ের মধ্যে একটি প্রভেদ-রেখা টানা সত্যই কষ্টকর। কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্পকলার জনৈক শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁহার ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক পুস্তকাবলীতে(১) এই মূল্যবান বাক্যটি প্রচার করিয়াছেন যে, বৈদিক আদর্শের স্বর্ণসূত্র শুধু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মোগল ও সারাশেন শিল্পকলার ভিত্তি নহে, পরন্তু উহা চীন, জাপান, বালী, পার্শী, আরব সংক্ষেপে সমগ্র এশিয়ার শিল্প-তরুরও মূল। উক্ত ইংরাজ পণ্ডিত মহাভারতে এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়াছেন যে, মিশর, ক্রীট ও প্রাক্‌ফিডীয় গ্রীক-সভ্যতা বহু বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী।

তিনি আরও বলেন যে, বাবিলন ও মেসোপোটেমিয়া প্রায় ৬ শতাব্দী যাবৎ আর্য্য-শাসনের অধীন ছিল। কাশাইট নামক কোন আর্য্যজাতির দলপতি গাণ্ডাশ তথায় রাজত্ব করিত। তখন তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল—বৈদিক-দেবতা সূর্য্য। ইউফ্রেতিশ ও তাইগ্রিস নদীর মধ্য ভূভাগ মিট্টানী নামক অন্য এক আর্য্য-জাতির অধীন ছিল। বরুণ, ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ ছিলেন তাহাদের (মিট্টানীদের) উপাস্য। উক্ত মিট্টানীদের সহিত মিশর ও এসিরিয়ার যোগাযোগ হইয়াছিল। প্যারিসের অন্তর্গত লুভারে, লুগাবার রাজা শতুনীর পরাজয়সূচক যে ধাতু-মূর্ত্তিটি (২৭৫০ খৃঃ পূঃ) আছে, সেটি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতীয় শিল্পকলার সহিত, মেসোপটেমিয়ার শিল্প-কলার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম অর্থে বৈদিক ধর্ম্মকে নির্দ্দেশ করিতেছি) ও প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ ইহুদী ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রভেদের মত। প্রভেদ মাত্র এই যে, ইহুদীগণ যিশুখ্রীষ্টকে শুধু বর্জ্জন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল—আর হিন্দুগণ শাক্য-মুনিকে ঈশ্বরের আসনে তুলিয়া দেব-মানবজ্ঞানে পূজা করিল। ভগবান বুদ্ধ কিছুই ধ্বংস করিতে আসেন নাই। তিনি ছিলেন বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায়-সঙ্গত বিকাশ ও পূর্ণতা—তিনি বেদ-বিরোধী ছিলেন না। সাধারণে মনে করেন যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মে অকাল মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী বলেন, (২) বৌদ্ধধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে জাত হইয়াছিল পুনরায় তাহাতেই মিলিত হইয়াছে। বেদ প্রতিভার-প্রসার ও গ্রহণ-শক্তি উহাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া ফেলিয়াছে।

গৌতম বুদ্ধ হিন্দুরূপে জন্মগ্রহণ ও জীবন যাপন করেন।

(1) Ideals of Indian Art, Hand book of Indian Art, Indian Art and Sculpture etc.

(2) "Buddha and the Gospel of Buddhism." Pp. (vi)—"It has merged into Hinduism from which it issued."

স্বামী বিবেকানন্দ(৩) বলেন যে, ভারতে কখনও পৃথক মন্দির ও পুরোহিত-সম্বলিত বৌদ্ধধর্ম্ম নামক এক পৃথক ধর্ম্ম ছিল না! বৌদ্ধ চিন্তারাশি সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যেই ছিল—কেবল মাত্র তথাগত বুদ্ধের প্রভাব এক সময় প্রবল হওয়ায় ভারত ভিক্ষু ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ ডাঃ শ্রীমতী রিজ্ ডেভিড্স্—যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ বৌদ্ধ দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন—তিনি বলেন(৪) যে, বুদ্ধদেব উপনিষদের ধর্ম্মকে বাধাপ্রদান বা বিনাশ না করিয়া উহার পরিপূর্ণতা ও বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। তবে উপনিষদোক্ত মানবাত্মার 'ভূতি' (Being) এবং 'ভব' (Becoming) এই উভয় ধারণার মধ্যে 'ভবে'র 'man as Becoming' এর উপর বেশী জোর দিয়াছিলেন। ইংরাজ বিদুষী উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন যে "ভারত তাহাকে শাক্য মুনিরূপেই চিরকাল জানিত এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ শাক্য-সন্তান ও শাক্য-বংশধর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইতিবৃত্ত হইতে এইরূপই পাওয়া যায়। যখন শাক্যগণ ভারতে শক্তিহীন হইয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ভারতীয় গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগকে "বৌদ্ধগণ ইহা বলেন"—এইরূপে উল্লেখ করিতেন। পালি ত্রিপিটকের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় উহা ভারতীয় চিন্তা-জগতে অতুলনীয় বা সম্পূর্ণ অভিনব নহে—উহা ঔপনিষদিক চিন্তার ক্রম বিকাশের এক অখণ্ড ধারা মাত্র।" ওল্ডেনবার্গ(৫) (Oldenberg) নির্দ্দেশ করেন যে, বুদ্ধদেবের মধ্যে সাধারণভাবে এমন কিছুই ছিল না, যাহা তাহার সমসাময়িকগণের নিকট সম্পূর্ণ অসাধারণ প্রতীত হইত। তিনি মূলতঃ কিছুই নতুন প্রচলন করিয়া যান নাই।

হাভেল সাহেব বলেন—বুদ্ধ যে অষ্ট মার্গে তাঁহার শিষ্যদের জীবন চালিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহা প্রাচীন আর্য্য-পথ। ভগবান বুদ্ধ ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি এই অষ্ট মার্গের metaphor তিনি অষ্টদ্বার বিশিষ্ট আর্য্যনিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন(৬)। কালক্রমে বুদ্ধদেবের প্রকৃত-বাণী ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্র ও অনুষ্ঠানে এইরূপ বিকৃত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে যে, তাহার সার-উপদেশ জানিতে হইলে পালি-পিটকে পর-যুগের বহু তুষ ও ময়লা হইতে প্রাচীন তণ্ডুলকণা পৃথক করিতে হইবে(৭)।

ইংরাজ-বিদুষী(৮) গার্বে ও জাকোবির সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে দার্শনিক হিসাবে বুদ্ধ পূর্ণভাবেই কপিল ও পাতঞ্জলীর উপর নির্ভরশীল। অশ্বঘোষ তাহার 'বুদ্ধচরিতে(৯) বলেন যে, বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবাস্তুর নামও সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনির নামানুসারেই করা হইয়াছে। ডাঃ আনন্দকুমার স্বামীর মতে(১০) সাংখ্যের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মূল পার্থক্য এই যে, উহা সাংখ্যের পুরুষ অস্বীকার করে মাত্র—কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত একথা স্বীকার করে যে, সুখদুঃখ উভয়ই কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক। আনন্দোৎসবে অস্থিপঞ্জর দর্শনের ন্যায় সুখের স্থায়ীত্ব অলীক। অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—এই দুঃখত্রয়াভিঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভই সাংখ্যের উদ্দেশ্য। শুধু সাংখ্য নহে যোগদর্শনকর্ত্তৃকও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যোগদর্শনের ধ্যান প্রাচীন বৌদ্ধগণ 'ঝান' (jhana—পালি কথা) রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ডাঃ কার্পেণ্টার বলেন যে,(১১) উহা হইতে চীনদেশের চান (chan) এবং জাপানের জেন্ (zen) সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। জাপানে প্রচলিত ৮টী প্রধান

(3) Quoted by Sister Nivedita in her "The master as I saw Him."

(4) "The Sakya or Buddhist origins"—Latest Book of Dr. Mrs. Rhys Davids.

(5) "Buddh" By Oldenberg (Pp. 119) : "There was nothing in Buddha's attitude which could be regarded by his contemporories as unusual. He had not introduced any thing fundamentally new."

(6) 'Hand book of Indian Art' by Havel. Pp. 4.

(7) The Sakya origins by mrs. Rhys Davids (Pp. 3).

(8) "Buddhism" pp (31) (Home University series)—By Dr. Mrs. Rhys Davids.

(9) Quoted in "Foundations of Buddhism" By Natalie Rokotoff.

(10) "Buddha and Gospel of Buddhisom." pp. 196

(11) "Buddhism and Christianity" by Dr. J. E. Carpenter. pp. 288.

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জেন একটী প্রাচীন ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ ধ্যান-প্রণালী প্রায় পাতঞ্জল যোগসূত্র হইতে গৃহীত। 'আনাপান সতী' নামক বৌদ্ধ প্রাণায়ামও বৈদিক প্রাণায়ামের অনুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সার এচ, এস্, গৌর বলেন যে, বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের উভয়ের ভিত্তি বেদান্ত,তাহারা যেন তুইটী শাখা-নদী বেদান্তরূপ প্রধান নদীতে প্রবাহিত হইয়া উভয় তীর ভঙ্গপূর্ব্বক নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে এবং কিছুদূর স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হওয়ার পর পুনরায় উৎপত্তিস্থানরূপ প্রধান স্রোতে মিলিত হইয়াছে। (১২)

বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক প্রোটেষ্টাণ্ট (protestant) কারণ তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৈদিক ধর্ম্মের 'কালাপাহাড়' ছিলেন না। তিনি কেবল তাঁহার শিষ্যগণকে বৃথা শুষ্ক দার্শনিক আলোচনা হইতে সতর্ক করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন ও সাধুকর্ম্মদ্বারা জীবনের ক্রমবিকাশের বেগ বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নাটেলাই রকোটফ (১৩) বলেন যে, বুদ্ধের উপদেশ ও তাঁহার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল না। গভীর জ্ঞানসম্ভূত সতর্কতা প্রণোদিত হইয়া তিনি নিজের গভীরতম অনুভূতি সাধারণে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন। কারণ তৎসমূহ বিকৃতভাবে গ্রহণ করিলে বিপজ্জনক। ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে উহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। ঋষি সনৎকুমারের উপদেশ অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া বিরোচন নিজে ও অপরকে বিপথগামী করিয়াছিলেন।

একদা কৌশাম্বীস্থ শিংশপা বনে তথাগত নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকটী পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া সমবেত ভিক্ষুদের বলিলেন—"আমার হস্তস্থিত পত্রের তুলনায় বৃক্ষস্থ পত্রাবলী যেমন অসংখ্যগুণে অধিক তদ্রূপ যাহা আমি তোমাদের বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা যাহা আমি অনুভব করিয়াছি ও বলি নাই তাহা সহস্রগুণে অধিক। অন্তরঙ্গ, সঙ্ঘ-সভ্য ও সাধারণ—এই তিন শ্রেণীতে—তাঁহার শিষ্য-বিভাগের প্রবাদ আছে। তিনি শরীর-মনের আপেক্ষিকতা প্রচার করিয়া আত্মা বা চরম সত্যের বিষয় নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বুদ্ধের নীরবতা—সন্দেহবাদী বা নাস্তিকের নীরবতা নহে—উহা অপরোক্ষ অনুভূতিজনিত—যাহাকে উপনিষদের ভাষায় অনির্ব্বচনীয়—'অবাঙ মনসোগোচরম্' কহে। বেদান্ত-কেশরী শঙ্কর তাঁহার কোন উপনিষদের ভাষ্যে বলেন যে, ব্রহ্ম বা পরমার্থিক সত্যকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপে যে বর্ণনা করা হয়—তাহার কারণ আমাদের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের অসীমতা; কিন্তু উক্ত লক্ষণের দ্বারা উহার প্রকৃতস্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না—কারণ চরমসত্য নির্বিশেষ। প্রাগ্বৌদ্ধযুগের কোন উপনিষদের বর্ণনাই সমীচীন—তাহা (তৎ) বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাকে জানেন বলেন তিনি জানেন না এবং যিনি ব্রহ্ম-অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না—প্রকৃতরূপে তিনিই জানেন। ব্রহ্ম জানা ও অ-জানার পারে। শঙ্কর বেদের একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বাস্কলী বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মৌনাবলম্বন করেন। বাস্কলী দ্বিতীয়, তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন—আমি ব্রহ্মের স্বরূপ তোমাকে ইঙ্গিত করিয়াছি—বস্তুতঃ তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। মৌনমেবব্রহ্ম—ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২৯ সুক্তে—নাসদীয় সুক্তে যে বিশ্ব-সৃষ্টির বর্ণনা আছে তাহাও এইরূপ। তথায় অস্তি, নাস্তি, জীবন, মৃত্যু, দিবারাত্রি, স্বর্গমর্ত্ত্য কিছুই নাই। বেদের এই তথাকথিত সন্দেহবাদই বুদ্ধদেব গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে বৈদিক জ্ঞান-মার্গ। সিংহল-দেশীয় ভিক্ষু আনন্দ মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের সমসাময়িক এক পুরাতন পালি সুক্তে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ জনৈক নাস্তিকের নিকট মনও শরীরাতীত আত্মার সত্তা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। এবং আমার মনে হয় ত্রিপিটকের বিস্তৃত ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ হিন্দু পুরাণ হইতে তাহার অধিকাংশ 'মশলা' সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ত্রিপিটকোক্ত খরগোস ও চন্দ্রের উপাখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণ

(12) "Spirit of Buddhism" By. Sir H. S, Gour. pp. 28.

(13("Foundations of Buddhism" By Natalie Rokotoff pp. 30.

হইতে গৃহীত। কিন্তু পুরাণগুলি প্রচলিত ধর্ম্মের 'খতিয়ান' মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ জানিতে হইলে ষড়্দর্শন, গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যে নির্ব্বাণ বা বিমুক্ত অবস্থায় স্বর্গ ও নরক উভয় হইতে মুক্তিলাভ করা যায়—তাহা শূন্য নহে। বুদ্ধ বলিতেন—"যে ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছে সে দেখিতে পায়না, জানেনা বা শুনেনা—এইরূপ বলা অসঙ্গত। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এবং বৈদিক সমাধি উভয়েই এক। উভয়ই বাক্যমনাতীত অবস্থা। উপনিষদে উক্ত অবস্থায় এইরূপ বর্ণনা আছে: 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তরগচ্ছন্তি নামরূপে বিহার। তথা বিদ্বান নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥ উপনিষদের 'ভূমা' ও ত্রিপিটকের নির্ব্বাণ একই। নির্ব্বাণ অর্থে শরীর ও মনের বন্ধন হইতে চির-মুক্তি। নির্ব্বাণ অর্থে স্বরাজ যখন আত্মা-স্বৈ মহিম্নি বিরাজতে।' সমাধি ও নির্ব্বাণ উভয়েই অখণ্ড আনন্দের অবস্থা। বৌদ্ধগণও নির্ব্বাণকে চরম শান্তির অবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাযান শাখায় বুদ্ধের স্থান বেদের ব্রহ্মের মত। বেদে যেমন ব্রহ্মকে 'নেতি' 'নেতি' রূপে বর্ণনা করিয়াছে তদ্রূপ পাশ্চাত্য মিষ্টিক্ বা অতিন্দ্রিয়বাদীগণও বলেন যে, ঈশ্বরকে শূন্য বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

রকোটক্ সাহেব(১৪) বলেন যে, অসীম বিস্তারশীল, জ্যোতির্ম্ময় ও অনন্ত জীবনের দ্বার—এই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ শূন্য নহে। মহা পরি নির্ব্বাণসূত্রে উল্লেখ আছে যে মৃত্যুর প্রাক্কালে তথাগতের চিন্তা সুন্দর বস্তুর অভিমুখী ছিল। তিনি যে সকল মনোরম স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সব স্মরণ করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আহা! রাজগৃহ কি সুন্দর, বৈশালী কি সুন্দর!" ইত্যাদি।

বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে কোন মৌলিক বা আন্তরিক পার্থক্য বা বিরোধ নাই। বুদ্ধ বেদের পরিণতি। প্রত্যেক ধর্ম্মকে বিকাশের চরম সীমায় পৌছিতে হইলে উক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। ডাঃ আনন্দকুমার(১৫) স্বামী বলেন, "বেদের বিশাল চিন্তারাশির মধ্যে বুদ্ধ একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যদি বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যাতাগণ বুদ্ধ-বাণীতেই বৌদ্ধধর্ম্মকে পর্য্যবসিত করিতে জিদ্ করেন—তবে আমাদেরও স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম একটি আংশিক ও সঙ্কীর্ণ আদর্শের পক্ষপাতী—উহা জীবন ও দর্শনের পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে। পূর্ণ এবং অংশের সহিত যা প্রভেদ—বেদ ও বুদ্ধের সহিত তদ্রূপ পার্থক্য।" তাই 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' বৌদ্ধধর্ম্মকে সপ্তম বৈদিকদর্শনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে প্রভেদ যতই হউক না কেন উহা ভাব ও ভাষাগত, বাহ্যিক মূল ও অন্তর্গত নহে। সমস্ত প্রধান বিষয়ে বুদ্ধকে বেদ-মূর্ত্তি বলিলে ভুল হয় না। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়েই একটি পূর্ণ দর্শনের শাখা।

দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, হিন্দু-ষড়-দর্শন বুদ্ধদেবের পরে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে প্রায়ই দেখা যায় যে, ছয়জন দার্শনিক পণ্ডিত সর্ব্বদা বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, আমাদের ধারণা উহারা অন্য কেহই নহে—ছয়টি হিন্দুদর্শনের পণ্ডিত।

বুদ্ধের সময়ে বৈদিকধর্ম্মের প্রকৃতভাব 'বাগ্‌বৈখরী' 'শব্দ-ঝরী' ও ক্রীয়াকাণ্ড প্রকৃতিতে এত জটিল হইয়া ছিল যে, পৌরহিতবাদ ও কুসংস্কার ধর্ম্মের নামে চলিত। বুদ্ধদেব প্রচলিত এই বহিরঙ্গ-ধর্ম্মকে আঘাত দিয়াছিলেন। আত্ম-তত্ত্ব তখনও শিষ্য পরম্পরায় মুষ্টিমেয় সাধুদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাই বুদ্ধদেব তাঁহার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় নাই। তিনি কেবল প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী বলেন, (১৬) যে, বৌদ্ধ-বিতণ্ডার অধিকাংশই বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যয়িত হইয়াছে। তাই দেখা যায় ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যার সারভাগ প্রাচীন বৌদ্ধগণ বুঝিতে পারেন নাই। এতৎ-সম্পর্কে উরস্লে(১৭) সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধদেব তাহার প্রব্রজ্যার প্রথমভাগে বেদ-বিদ্যায় পারদর্শী দুইজন

(14) "Foundations of Buddhism" by Natalie Rokotoff. pp. 100.

(15) "Buddha and the Gospel of Buddhism" pp. 219.

(16) 161 D, pp. 200

(17) "Concepts of moni sur" by A Worsley. pp. 197.—"It is possible had Gautama chanced to meet in his earliest wanderings two teachers of the highest Vedic truth the whole history of the old world might have been changed."

শ্রেষ্ঠ ঋষির পরিচয় পাইতেন তাহা হইলে প্রাচীন জগতের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। তদ্ব্যতীত বুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশজ রাজকুমার ছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয়-সুলভ সমরবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তিনি ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

ভারতের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগনের আর এক মারাত্মক ভ্রম এই যে, তাঁহারা বলেন বৈদিকযুগে শিল্পকলা প্রভৃতির চর্চ্চা ছিলনা—তৎসমুদায় বৌদ্ধযুগে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হাভেল সাহেব বলেন যে, ভারতীয় আর্টের জন্ম বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কাষ্ঠ ও অন্যান্য অস্থায়ী দ্রব্য-জাত ছিল বলিয়া তাহাদের সামান্য মাত্র চিহ্ন পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য্যগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রথাগুলি এত পবিত্র ছিল যে, তাহারা ভাষা, বা কোন শিল্পকলায় সে সকল নিবদ্ধ করিতে চাহিতেন না। কারণ তাহাতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতির সম্ভাবনা অধিক। হিব্রু জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব মুসা যেমন বলিয়াছিলেন যে, "স্বর্গেও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার কোন মূর্ত্তি বা ছবি করা উচিত নহে।" বৈদিক ঋষিগণও উহা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। শ্রুতির মত বৈদিক আর্টের মূলসূত্রগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায়—পুরুষপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত। বৈদিক আর্ট ছিল সমন্বয় ও ভাব-মূলক (Subjective and idealistic) বাস্তব বা বিশ্লেষণ-মূলক (objective) নহে। প্রাচীনতম বৌদ্ধস্তুপের আকার ও পরিমাপ সমস্ত বৈদিক যজ্ঞবেদী হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ-আর্টে প্রাচীন ভারতীয় সূর্য্য-প্রতীক ধর্ম্ম-প্রতীকে পরিণত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, কেবলমাত্র তাহাতে হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতি—ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক ও পশুবধাদি ছিল না। অন্য কোন তারতম্য নাই।

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় আর্টের পুরাবৃত্তকার হাভেল সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন সিন্ধু, গঙ্গানদীর উভয়পার্শ্বে, রাজপুতানার মরুর নিম্নে কণৌজ, রাজগৃহ প্রভৃতি প্রাচীন নগরের নিম্নে প্রাচীন বৈদিক আর্টের নিদর্শন প্রোথিত আছে। উত্তর-ভারতীয় খননকার্য্যে কিছু কিছু চিহ্ন সত্যই পাওয়া যাইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বৈদিক শিল্পকলা কারুকার্য্য সমস্তই যজ্ঞ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল—তাই তাহারা ভারতীয় আবহাওয়ার রুদ্রপ্রভাব ও কীট-পতঙ্গের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে নাই। মাটীর দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র, কাষ্ঠময় কারুকার্য্য পুরাবৃত্তের অতি অস্থায়ী চিহ্ন—তাই অশোকের পূর্ব্বের সেইরূপ কোন আর্ট-রেকর্ড পাওয়া যায় নাই। তথাপিও মধ্যপ্রদেশের রায়গড় ষ্টেটে এবং যুক্ত প্রদেশের মির্জ্জাপুর ষ্টেটে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যৎকিঞ্চিৎ ড্রয়িং ও চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভের রেলিং গুলির নাম ছিল বেদিকা। বেদিকা একটী সংস্কৃত শব্দ। উহা বৈদিক যজ্ঞভূমির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। রেলিংএর সমান্তরাল কাষ্ঠগুলিকে শুচি বলা হয়। শুচিও আর একটী বৈদিক শব্দ। শুচি অর্থে একগুচ্ছ শুদ্ধ কুশ। কুশ যজ্ঞভূমিতে পাতিয়া রাখা হইত। যাত্রীদের পরিক্রমার জন্য স্তুপমূলে নির্দ্দিষ্ট বিস্তৃত পথকে মেধি বলা হইত। মেধ মানে যজ্ঞ। যথা অশ্বমেধ। বৌদ্ধ-তীর্থযাত্রীদের গোলাকারে স্তুপ-পরিভ্রমণের প্রথা বৈদিক সূর্য্যোপাসনা হইতে গৃহিত। বর্ত্তমান হিন্দুদের মধ্যে উক্ত-প্রথা খুব প্রচলিত। কোন কোন বৈদিক ক্রিয়াতে একটী ব্রাহ্মণ একটী স্তম্ভে রথের চাকা বাঁধিয়া উহা ডানদিক হইতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সাম গান করিতেন। তাহা হইতেই বৌদ্ধগণ 'ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তনের ভাব ও ভাষা পাইয়াছেন। বৈদিক আর্য্যদের রাজকীয় সমাধি-মন্দির হইতেই বৌদ্ধস্তুপের উৎপত্তি। স্তুপা পূজা বৌদ্ধদের একটী অতি প্রাচীন ও প্রধান অনুষ্ঠান। এই স্তুপ-পূজা নিঃসন্দেহে বৈদিক নরপতিগণের শ্রাদ্ধব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। লায়ার্ড সাহেব নিনোভর ৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত সেনাচেরিবের রাজপ্রাসাদে আবিষ্কৃত রিলিফে অঙ্কিত গৃহগুলির সহিত ভারতীয় শিকার ও স্তুপের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় বৈদিক আর্ট-আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্য দিয়া সুদূর ইউরোপেও বিস্তৃত হইয়াছিল। হাভেল সাহেব

বলেন গুজরাট, বিজাপুর, দিল্লী প্রভৃতির মোগল আর্ট ও কারুকার্য্যেও বৈদিক আর্ট-আদর্শ অটুট আছে।

মহম্মদের পূর্ব্বে বৌদ্ধ মহাযান শাখা পশ্চিম এশিয়াতে বিস্তৃত হইয়াছিল। হাভেল সাহেব বলেন যে, মুসলমান জগতের পবিত্রতম মন্দির ও মসজিদের প্রথম আদর্শ কাবা মন্দির। আরব লেখকগণ তাহার যে-বর্ণনা দিয়াছেন— তাহা হইতে বুঝা যায় যে কাবা, পূর্ব্বে খ্রীষ্ট, মেরী ও মহাযান মূর্ত্তি প্রভৃতিতে পূর্ণ একটী বৌদ্ধ মন্দির ছিল। আরবীয় অসুরগণ যেমন কাশী, গুজরাট প্রভৃতি ভারতীয় তীর্থে ধ্বংশের তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছে কাবারেও তদ্রূপ করে এবং উহাকেও একটী মসজিদে পরিণত করে। হাভেল সাহেব বলেন— শুধু ভারতে নহে আরব, তুর্কী, মিশর, স্পেন, কনষ্টান্টিনোপল্, কাইরো, কর্ডিভা, ও দামাস্কাশ্ প্রভৃতি ভারত বহির্ভূত প্রদেশেও আর্ট ও কারুকার্য্য বৈদিক আদর্শের বৌদ্ধ সংস্করণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক সমুদায় বৌদ্ধদের অভিনব আবিষ্কার নহে—উহা বৈদিক আর্য্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি। সাঁচি কারুকার্য্যগুলিকে বৈদিক চিন্তা ও সমাজের ভাষ্য ও টীকারূপে বুঝিলে উহার প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-শাস্ত্রসমূহ গৌতম-জননী মায়াদেবীর সহিত যে ড্রায়াদের (Dryad) সম্পর্ক আনেন তাহাকে বেদে অরণ্যানী বলিত। বৈদিক আর্য্য সমাজের আদর্শ হইতে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সৃষ্টি। বৌদ্ধ কারুকার্য্যের একটী সাধারণ প্রতীক শীকার। উহা প্রাচীন ভারতের পাহাড়-পর্ব্বত উপাসনায় বৌদ্ধ সংস্করণ। বর্ত্তমান হিন্দুগণও উহা মানিয়া চলেন। ভারতের প্রত্যেক পর্ব্বত শৃঙ্গে একটী দেব বা দেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। সিংহলের উচ্চতম শিখর—এডাম্‌স্ পিক্ (Adam's Peak) হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানগনের প্রধানতীর্থ। হিন্দুগণ হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াতে মহাদেবের বাসভূমি কৈলাস বলিয়া বিশ্বাস করেন।

Taurus নক্ষত্র-মণ্ডলে সূর্য্য প্রবেশ করিলে বৎসর আরম্ভ হয় ইহা অতি প্রাচীন শৈব প্রবাদ। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের জন্মতিথি চিহ্ন-স্বরূপ সেই Zodicat sign রূপে উহা ব্যবহার করিয়াছে। বৈদিক আর্য্যগনের জাতীয়সঙ্ঘ হইতে বুদ্ধ যে, ভিক্ষু-সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন তাহা ভারতীয় জীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত ছিল। অবশ্য শাক্য মুনিই সর্ব্বপ্রথম উহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ চৈত্যের প্ল্যান, ও সঙ্ঘগৃহ আর্য্য-একান্নবর্ত্তী পরিবারের সাজ, কিন্তু সুদৃঢ় বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থাপিত। ২য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত নাসিকের পর্ব্বতগাত্র খোদিত মঠগুলি সেইভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যেরূপভাবে তখন প্রকৃত ভারতীয় গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র অজন্তা ও ইলোরার বৌদ্ধবিহারগুলি ঠিক সেই প্ল্যানে নির্ম্মিত। থামের বন্দোবস্ত, কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য ও ছাদের প্রস্তর কার্য্য সমস্তই প্রাচীন বৈদিক প্রবাদের আদর্শের মধ্যে, বাহিরে নহে। ভারতীয় পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদর্শেই জাভার (৫ শতাব্দী পূর্ব্বের) চণ্ডী সেবা মন্দির নির্ম্মিত। অজন্তার স্তুপমন্দিরেও তাই। পদ্ম-পত্র ও পুষ্প ভারতীয় কাব্য, আর্ট প্রভৃতির সার্ব্বজনীন প্রতীক। মহাযান শাখা তাহা বোধিসত্ত্বের শির-জ্যোতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনন্ত-নাগের উপর যোগনিদ্রাভূত নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতীক, প্রজ্ঞাপারমিতারূপে মহাযান গ্রহণ করিয়াছে। তন্ত্র-তত্ত্ব অনুসারে মূলে উহা ব্রহ্ম বৃন্তে মায়া, ফুলে জগৎ এবং ফলে মুক্তি।

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে মিশিয়া যাওয়ার ফলে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। নেপালের মহাযান মূর্ত্তিগুলির এবং অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টার শৈব মূর্ত্তিগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ভারতেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম মহাযানের উক্ত উত্তরাধিকার রক্ষা করিতেছে। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ ও গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত যখন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তখন অর্থাৎ প্রায় ৪র্থ শতাব্দীতে জনৈক উত্তর ভারতীয় বিখ্যাত মগধী ব্যক্তির দ্বারা সিংহলের প্রসিদ্ধ সাইবিরিয়ার আর্ট ও অজন্তার চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়। গুজরাট ও উড়িষ্যার (কোনারক) সূর্য্য-দেবতার সহিত গৌতম বোধিসত্ত্বের নিকট সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ সূর্য্য-দেবতাই আদর্শ রাজা বা বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছেন। বৌদ্ধ শিল্প কলা, কারুকার্য্য প্রভৃতির সর্ব্বত্র বৈদিক আদর্শবাদের অখণ্ড-পরিণতি। জ্ঞান-মার্গে মুক্তি অন্বেষণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে

মুক্তিদাতা গুরুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। অভয়-মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ গুরুরূপে শিষ্যদের ভয় দূর করিতেছেন এইরূপ একটী প্রস্তর মূর্ত্তি বাংলার সুলতানগঞ্জের ধ্বংশপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহারে পাওয়া গিয়াছে। উহা ঠিক সিংহলস্থ বিখ্যাত অনুরাধা পুরের বুদ্ধের মত। ক্ষত্রিয় বা বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধ এক আর্য্য বীর—ইহাই বৌদ্ধ ভক্তিবাদের প্রধান মূর্ত্তি। ভক্তিবাদ ও অন্য আকারে মহাযানে প্রবেশ করিয়াছে। মজ্ঝিহাম নিকায়ে ২২ সূত্রে বুদ্ধ বলিতেছেন—যাহারা আমার ধর্ম্ম এখনও গ্রহণ করেন নাই তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে—যদি তাহারা আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। তাঞ্জোর মন্দিরে পিত্তল নির্ম্মিত কলার মূর্ত্তিতে বুদ্ধকে গুরুরূপে দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও বৈদিক আর্টের প্রতীক পৃথক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ হিন্দু-রাজা হয় সূর্য্যবর্ম্মা কর্ত্তৃক ১২শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট্ মন্দিরে যে সমুদ্র মন্থনের চিত্র আছে তদ্রূপ মান্দ্রাজের মামল্লাপুরের মন্দিরগাত্রে আছে। রামায়ণ ও মহাভারত জাভা ও কাম্বোডিয়াতেও বিস্তৃত হইয়াছিল। জাভার বৈষ্ণব মন্দির প্রাম্বাননের গাত্রেও রামায়ণের উপাখ্যান চিত্রিত। সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণের প্রতীক স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তিকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নে পরিণত করিয়াছে। এলিফ্যাণ্টার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন এবং নেপালের মহাযান ত্রিমূর্ত্তি হিন্দু-প্রতীক হইতে সঙ্কলিত।

মহাযান শাখা হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীকে তাহাদের ধর্ম্মে স্থান দিয়াছে। বেদে ব্রহ্মার শক্তি যেমন সরস্বতী তেম্নি মহাযান আদিবুদ্ধকে প্রজ্ঞা পারমিতা নামক শক্তিযুক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধ হারিতি ও হিন্দু-অদিতি এক। জাভায় বুদ্ধের শক্তির নাম তারা। বৈদিক উষা সাচিতে লক্ষ্মী এবং অন্যত্র বৌদ্ধ জননী মায়াতে পরিণত হইয়াছেন। শিব-শক্তির ধাতু-মূর্ত্তি দুর্গার (মান্দ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত) সহিত জাভাস্থ বরবুদুরের অবলোকিতেশ্বর এবং সিংহলের অনুরাধাপুর বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। হিন্দু শিব এবং বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী এক। জাভার ও মামাল্লাপুরের মহিষাসুর মর্দ্দিনী দুর্গার উভয় চিত্র একই। জাভার বিশাল-বপু গণেশ একটি বৈদিক দেবতা। বৌদ্ধ আর্ট-প্রতিভা ভারতীয় যোগদর্শন কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়। তাই বারহুত, বরবুদুর, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-আর্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে। নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ ধর্ম্মে এই পাতঞ্জলী-যোগ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ-আর্ট যেন উপনিষদ-কুঁড়ির প্রস্ফুটিত কুসুম। বোধিসত্ত্ব বজ্রপানি বৈদিক ইন্দ্র। শান্তিদেব তাহার 'বোধিচর্য্যাবতার' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের তিন প্রকার শরীরের বর্ণনা দিয়াছেন—ধর্ম্মকায়, সম্ভোগকায় এবং নির্ম্মাণকায়। উক্ত শরীর ত্রয় বৈদিক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর এবং অবতারের মতই। এই বিদুষী গ্রন্থকর্ত্রী তাহার শিক্ষা-সমুচ্চয় নামক সংস্কৃত পুস্তকে সংবৃত্তি সত্য ও পারমার্থ সত্যের বর্ণনা দিয়াছেন যাহা বৈদিক ব্যবহারিক (Relation) এবং পরমার্থ (Absolute) সত্যের তুল্য।

বৌদ্ধযুগ এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ। ইউরোপীয় মধ্য-যুগের ন্যায় উহা বিস্তার ও উদ্বোধনের যুগও বটে। এই যুগের কৃতিত্ব এই যে, উহা সমগ্র এশিয়ার নানা স্থান হইতে বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈদিক আর্টের বিস্তার ও সমন্বয় আনিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ সুপ্ত বৈদিক চিন্তাগুলিকে বিশাল বিস্তৃতির দ্বারা মানুষের জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে বৈদিক আপন ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নূতন সামাজিক আদর্শের সহিত ঐক্য স্থাপন করে। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহা বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া নবজীবন লাভ করে। বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন চিন্তা, সভ্যতা ও আদর্শের সমাগমে ভারত সমাজে ধর্ম্মসঙ্কর (বর্ণ সঙ্করের ত কথাই নাই) উপস্থিত হইয়াছিল। বুদ্ধ বৈদিক দর্শন ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে উহাতে প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাপি বৌদ্ধ চিন্তা ও সভ্যতার ঐতিহাসিক তত্ত্বও নূতন ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক কিছু করিবার বাকী আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বৌদ্ধধর্ম্ম বেদের একটি শিশু—তবে 'বিদ্রোহী সন্তান'। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Dr. Waddel (ওয়াডেল সাহেব) বলেন যে, সভ্যতা অর্থে aryanisation। ভগবান বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে বৃহত্তর ভারতে পরিণত করিয়াছেন, সমস্ত এশিয়াকে সুসভ্য

করিয়াছেন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধদেবকে কোন অংশে ছোট করা নয়। জন্মস্থানে বৌদ্ধ—সতেজ সজীব ছিল বলিয়া উহা বেদান্তে পরিণত হইয়াছে। কারণ ভারতের বেদান্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের logical পরিণতি মাত্র। তাই চীন জাপানে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ভারতীয় বেদান্তের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। মহাযান ও বেদান্ত উভয়ে এক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে প্রচলিত হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া ভয়ানক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নবযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মকে আবার জাগ্রত হইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের দর্শন বা বিজ্ঞানের সত্যকে ভয় করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঁচিবেনা। জাগ্রত হইতে হইলে হীনযান ও মহাযান উভয়কে জন্মস্থান বেদের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। মূল নদী শাখা নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন বেশী দূর প্রবাহিত হইতে পারে না ডাল যেমন বৃক্ষ হইতে পৃথক হইলে বাঁচে না সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম বেদ ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন না করিলে উহার মারাত্মক বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম Indianisation এড়াইয়াছে তাই দুর্ব্বল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এখন শক্তিশালী ও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম তাই প্রত্যেক শতাব্দীতে বহু জগৎ-বিখ্যাত ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে আর বর্ত্তমান যুগের ত কথাই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ১০ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম উল্লেখ যোগ্য কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রবীন্দ্র, গান্ধী, অরবিন্দ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, জগদীশ প্রফুল্ল চন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু-প্রতিভার জগদালোড়নকারী শক্তি। বৌদ্ধধর্ম্মকে বাঁচিতে হইলে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলিত ও বেদ-ভিত্তিতে দাঁড়াইতে হইবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

আজিও ছলনা ম্লান—

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

আজিও ছলনা ম্লান অন্তরের স্মৃতি দীপখানি,
আজো বাজে মনো মাঝে সেই তব মধুমাখা বাণী;
মনশ্চক্ষু হেরে তব তরুণ কোমল অরুণিমা,
তুমি ভরেছিলে মোর জীবনের প্রত্যেক অণিমা—
সেদিন যৌবন ছিল, দেহে মনে তোমার আমার,
কত অকথিত কথা, দিবারাত্রি শুক্লা ও অমার,
সব হয় নাই বলা, বসন্তের রাগিনী বাহার
শুনে গেলে, শুনাইলে এই হল তব উপহার।
নিদাঘ মরিল জ্বলে', শ্রাবণের বিপুল প্লাবন,
বার্থ বিদ্যুতের দ্যুতি, সুরভিত কেতকীর বন।
রোমাঞ্চিত নধর নিটোলনীপ করপুট তব
গন্ধ ও পরাগ স্পর্শে করিলনা স্নিগ্ধ, অভিনব।
আজ নেমে আসে শীত; উত্তরের মন্থর পবন
কাশের হিল্লোলে ভরে আকাশের আস্তম স্বপন,
মনে জাগে তব মুখ, অধরের শুচি শুভ্র হাসি,
বিদায়ের করুণিমা, চকিতের অশ্রু জল রাশি।

একদিন লেগেছিল ভালো—

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

আমার গোপন বুকে করুণ ক্রন্দন
বাজিতেছে দিবানিশি ; কিসের বন্ধন
চতুর্দ্দিকে ঘিরি' আছে যেন ; মর্ম্মমাঝে
কার যেন আর্ত্তস্বর অহরহ বাজে—
কহে শুধু অহর্নিশ—এ নয় এ নয় !
শব্দ গন্ধ রূপ রস এই বিশ্বময়,
এই ভূমণ্ডল, ওই উদার আকাশ,
সমুদ্রের-কলরোল, বাতাসের শ্বাস,
ওই চন্দ্র, ওই তারা গ্রহ উপগ্রহ,
বিধাতার লক্ষ কোটী সৃষ্টির বিগ্রহ,
সবি আছে—কিন্তু যেন কিসের আভাস
আমার বক্ষের মাঝে তোলে হতাশ্বাস,
কেবা যেন কানে কানে গুঞ্জরিয়া কহে :—
ওরে আত্ম-ভোলা ইহা নহে নহে নহে !

*　　*　　*　　*

মনে পড়ে একদিন লেগেছিল ভালো
এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর মায়া ছায়া আলো।
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু প্রেম প্রীতি ভরা
পুরাতন পরিচিত এই বসুন্ধরা
তুলিয়া বিচিত্র সুর নিয়েছিল ডাকি'
আপন অন্তর মাঝে—চোখে চোখে রাখি'
বলেছিল সঙ্গোপনে—রে মোর সন্তান
মোর অন্তরের এই যাহা কিছু দান
তোর তরে রাখিয়াছি করিয়া সঞ্চয়
যুগ যুগান্তর ধরি' ; যে-টুকু সময়
জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে সেই টুকু ধরি'
আমার সম্পদ দিয়া নে রে চিত্ত ভরি'

প্রাণের বাঁশরী তোর বাজা ওরে বাজা,
স্নেহের দুলাল তুই—তুই মোর রাজা।

সেইদিন—সেইদিন লেগেছিল ভালো
একখানি চিত্ত সাথে দুটী আঁখি কালো,
দুইটী বাহুর ডোর ; আধ আধ বাণী
গোপনে আড়াল খুঁজি মৃদু কানাকানি
মাধবী-বিতান তলে ; বকুলের মালা
গন্ধে মত্ত করে দিক—দুটী চোখে বালা
চতুর্দ্দিক ভরি' তোলে আলোক বিথারি,'
রূপে রসে হাস্যে গানে পুলক সঞ্চারি'
ছন্দিত করিয়া তোলে প্রাণের কল্লোল,
শুধু অবিরাম এক সুখের হিল্লোল
জীবনের রাসমঞ্চে ; আবীরে কুঙ্কুমে
জীবনের দোললীলা যেন বিশ্ব চুমে
রঞ্জিত হাসিতে ; ঊষা হতে সন্ধ্যাবেলা
শুধু খেলা শুধু খেলা পুনঃ শুধু খেলা,
আদি নাই অন্ত নাই নাই সাঙ্গ লেশ
সারা দিনমান ব্যাপী শর্ব্বরীর শেষ
কেটে যায় শুধু দুটী আঁখির সঙ্গীতে
মদিরা-বিহ্বল যেন নাচের ভঙ্গিতে।

সেইদিন—সেইদিন লেগেছিল ভালো
পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন ; ছায়া আলো
দিয়া যে আলেখ্য লিখি যুগ যুগ ধরি'
ধরিত্রী আপন অঙ্গ তুলিয়াছে ভরি'

রূপে রসে গন্ধে গানে, তারি মাঝে হিয়া
চিত্ত মন প্রাণ মোর সব সমর্পিয়া
খেলেছিল সকৌতুকে ; বিপুল উল্লাস
পৃথিবীর বক্ষ-বহা অযুত উচ্ছ্বাস,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার প্রাণের উদ্যম,
ক্লান্তিহীন শান্তিহীন দানবের শ্রম
স্নায়ুতে স্নায়ুতে মোর যেন তার ভাষা
তুলেছিল উন্মত্ত টঙ্কার ; লক্ষ আশা
দিকে দিকে কোটী বাহু করিয়া প্রসার
আমারে জড়ায়েছিল করিয়া সঞ্চার
শোণিতে শোণিতে এক মদমত্ত নেশা,
জীবন-তুরঙ্গ যেন তুলি ভীম হ্রেষা
ছুটে চলে বল্গাহীন। যন্ত্রের ঘর্ঘর
ধূলিখিন্ন নগরীর কাঁপায়ে পঞ্জর
অবিশ্রাম কর্ম্মরত : নাহি রাত্রি দিন
প্রাণের অদম্য বেগ চলে ক্লান্তিহীন
কম্পিত করিয়া ধরা : লক্ষ কলরোল
বক্ষ মাঝে দেয় যেন সঙ্গীতের দোল,—
সেইদিন—সেইদিন লেগেছিল ভালো
এই পৃথিবীর সেই মায়া ছায়া আলো।

সেইদিন—সেইদিন লেগেছিল ভালো
মানবের বিপুল প্রয়াস : ক্ষীণ আলো
তাহারি প্রদীপ ধরি' শঙ্কাহীন হিয়া
চলেছে মানব-যাত্রী মৃত্যুরে বরিয়া
প্রাণের বিচিত্র পথে বিপুল উদ্যমে,
জীবনের রথ কভু ভয় কিম্বা শ্রমে
হয় না বিকল তার : চলে —শুধু চলে —
পথসীমা নহে তার জলে কিম্বা স্থলে
অথবা আকাশে ; ক্ষুদ্র দুটী হাত তার
মানুষ দিয়েছে মেলি' অনন্তে অপার
যেথায় রয়েছে ফুটি' লক্ষ কোটী তারা
অনন্ত যোজন দূরে : ক্ষীণ আলো ধারা

তারি মাঝে খুঁজি ফেরে পথের সন্ধান
অদম্য সাহস-দৃপ্ত মানব-সন্তান ;
বক্ষে তার কৌতূহল সীমা নাহি জানে,
গলে তার জয়মাল্য ; নিঃশঙ্ক পরাণে
জলে স্থলে আকাশেতে রচে যাত্রা-পথ
মৃত্যুরে কৌতুক করি' জীবনের রথ
চলে তার উচ্চ-ধ্বজ করিয়া সঞ্চয়
জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যরাশি।

উচ্চ কণ্ঠে জয়
গাহিলাম সেইদিন মানবের নামে,
কোথায় চলেছে যাত্রী দূর অভিযানে
তারি ইতিবৃত্ত-কথা বুঝি দিকে দিকে
সমীর সাজায়ে রাখে নভাঙ্গনে লিখে।
মানবের উদ্যমের দীর্ঘ ইতিহাস
তারি জাল বুনে চলে সন্ধ্যার আকাশ,
প্রভাতের আলো আর রজনীর তারা,
দিকে দিকে পড়ে তার অন্তহীন সাড়া
জলে স্থলে আকাশেতে ফেলিছে নিশ্বাস
মানবের অন্তরের দীর্ঘ ইতিহাস।

তাই গাহি উচ্চ কণ্ঠে মানবের জয়,
জয় জয় মানবের নির্ভীক হৃদয়,
গাহ জয় মানবের ; উচ্চে তুলি' শির
যে-মানব চলিয়াছে প্রদীপ্ত অধীর
নিরুদ্দেশ যাত্রা পথে ; নিশ্চিত মরণ
পারে না ঠেকাতে যারে ; করে না বারণ
ঝড় ঝঞ্ঝা শিলাপাত অশনি সম্পাত ;
হেলায় বরণ করি সকল সংঘাত
বীর-বেশে যে-মানব চলেছে দুর্ব্বার
কোন্ দূর লক্ষ্য পানে ; সঞ্চিত সম্ভার

পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ; সমুখের পথ
শুধু তার আঁখি আগে জাগায় সম্পদ্ ;
জয় সেই মানবের ধূলি হতে উঠি'
সাহসে প্রদীপ্ত তুলি' ধরে দুই মুঠি
অনন্ত আকাশ পানে ; গ্রহ চন্দ্র তারা
বক্ষের কম্পনে তার দেয় বুঝি সাড়া,
মরু মেরু পর্ব্বতেরা গহন কান্তার
প্রভঞ্জন-মত্ত ক্ষিপ্ত জলধি অপার
খুলি' দেয় রাজপথ ; ভীম দুর্গমতা
মথিত দলিত করা নিত্য যার প্রথা।
তার নামে উচ্চ কণ্ঠে গাহিলাম জয়
জয় নিত্য মানবের নব পরিচয়,—

গাহিলাম "জয় জয়" উচ্চে তুলি' শির
মানুষ সবার বড় বক্ষে পৃথিবীর,
অপ্রমেয় অরিন্দম বীরোত্তম নর
ধূলিতে আসন যার দৃষ্টি লোকান্তর।

* * *

কিন্তু আজি বক্ষ মাঝে বাজিছে ক্রন্দন
চতুর্দ্দিকে ঘিরি' আছে কি যেন বন্ধন।
কোথা যেন যেতে হবে নাহি পড়ে মনে,
পথে পান্থশালে দিন কাটে অকারণে।



অভিনয়

শ্রীসুবোধ বসু এম্‌-এ

অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায় কলেজে পড়ে। পড়াশুনার জন্যই যে পড়ে তা নয়, কলেজে পড়া মেয়েদের একটা ফ্যাসান্‌, তাই। তার বাপ ব্যারিস্টর, ডিনার দেয়, ব্রীজ্‌পার্টী, মজলিস। মা সোসাইটীর একজন নামজাদা মহিলা,—বিস্তর শাড়ি, দুইটা মোটর, মহিলা সমিতি, বাড়িতে খানসামা রান্না করে, হাঁক দিলেই মুসলমান বয় দাড়ী লইয়া দৌড়াইয়া আসে, পি-আনোর শব্দ, ইংরেজী সেণ্ড্, সেণ্টের উগ্রগন্ধ, কখনো বিলিতী সুট্‌, কখনো খদ্দর, ড্রেসিঙ্‌ গাউন,—এক কথায় আদর্শ ফ্যাসনেব্‌ল্‌ পরিবার। কাজে কাজেই অঞ্জলি কলেজে পড়ে। কলেজ মানে, শেলী, শাড়ি, সেণ্ট, প্যারামল ও হ্যাণ্ড-ব্যাগ্‌। তাছাড়া বিলীতী ম্যাগাজীন্‌, নূতন গান ও টকির সম্বন্ধে আলোচনা। জ্যাক্‌দের সম্বন্ধে তো আছেই, ছোঁড়াগুলি ভারী হ্যাঙ্‌লা হয়, কেবল ফ্লার্টিঙ্‌ পছন্দ, এমন দুষ্টু।

সখীদের কাছে অঞ্জলির কথাবার্ত্তার নমুনা এই রকম। ওঃ মাই, পুরুষগুলি কি নাছোড় বান্দা হয়। তোদের সেই ভ্যালেন্টিনো, না না ডন্‌ জোয়ান অরবিন্দ ব্যানার্জ্জী লোকটা কি পার্‌সিভিয়রিঙ্‌ বলতো। একশো বার রিফিউস্‌ করেছি, তবু শুধু শুধু চিঠি লিখে জালাতন করে। আজকেরটা নিয়ে একশো পঁচিশটা চিঠি হলো। তারপর তোদের প্রিনস্‌,—সুবিমল, যেখানে যাব সেখানেই সে উপস্থিত ছায়ার মতো। এই, ব্যারিস্টার সুকুমার মিত্র আমার নামে যে কবিতাটা লিখ্‌ছে, পড়েছিস্‌। কাল নিয়ে আবার পড়িস্‌। বাবার কাছে কাজ শিখতে আসে না, আরো কিছু। তারপর আছে তোদের গাইয়ে রতন চন্দ, মনীশ দত্ত,—যাক্‌গে। আর পারিনে বাপু, এদের জালাতনেই শীগ্‌গীর একটা বিয়ে করে ফেলতে হবে।

অঞ্জলির কথার সুরে একটা কৃত্রিম আতঙ্ক। কিন্তু অভিজ্ঞমাত্রের বুঝিতে কষ্ট নাই যে এসব সে সগর্ব্বেই বলে। কেহ চিঠি লিখলে সঙ্গিনীদের যত জনকে সম্ভব পড়িয়া শোনায়, যে কেহ তাহার প্রতি কোন দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছে তার নাম ধাম পরিচয় খুসী-মিশানো কৃত্রিম অবজ্ঞার সাথে যাকে তাকে বলিয়ে বেড়ায়, বাড়াইয়াও বলে, সখীরাও তাদের কম বেশী অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনা অম্লান বদনে মিশাইয়া নিজেদের অজস্র-সম্বন্ধীয় কাহিনী প্রচার করিতে গর্ব্ববোধ করে। এদের কথাবার্ত্তার ২টী বিষয় প্রধান, এক বেশভূষা ফ্যাসান্‌ ও অপর ইয়ঙ্‌ম্যান্‌। তার চার দিকে গান, কবিতা, পিকনিক ও পার্টী।

সেদিন মিসেস্‌ নাগের পার্টীতে সোসাইটীর নিমন্ত্রণ, কাজে কাজেই ফ্যাসানের একজিবিশান বসিয়েছে। ক্রেপ্‌, জর্জ্জেট্‌, পাইভার ও রিগঁ, সুয়েড্‌, বাক্‌স্কিন্‌ ও লিজার্ড। কারো ব্লাউসের হাতা কব্‌জির উপর। কারো কাঁধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত,—ভঙ্গীভরে হাত উঠাইলে বগল দেখা যায়। কেউ ফ্যাসান করিয়া মাথায় রেশমী উড়নি দিয়াছে। একজনের সিল্কের পাছা পেড়ে শাড়ি, মেমেদের কোন ফ্যাসান্‌ অনুকরণ করিয়া পুরানো রীতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এর গায়ে হাতা-কাটা ব্লাউস্‌, সমুখের দিকে প্রায় সবটাই দেখা যায়, চুল ছাঁটা, মুখে রঙ্‌। অনভিজ্ঞের কাছে বহুরূপী ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উপায় নাই। অবিবাহিত মেয়েদের অনেকেরই মা নিজে দাঁড়াইয়া মেয়েদের বেশভূষার তত্ত্বাবধান করিয়াছে। অবিবাহিত পুরুষরা পাশ্চাত্য পুরুষীয় ফ্যাসানের আদর্শের দিকে যতটা পারিয়াছে আগাইতে চেষ্টার ক্রুটী করে নাই। সম্ভবপর হইলে ব্যাক্‌ ব্রাস্‌, ডোলা-ট্রাউযার্স, বাটন হোলএ ফুল। চোখ চঞ্চল, মুখে আপ্যায়নের হাসি।

সবাই উপস্থিত, মিসেস্‌ নাগ ডিনার দিতে হুকুম করিয়াছেন। সবাই চেয়ারে বসিয়া গেছে। হাসি এবং

গল্প। সুবিমল শান্তা গাঙ্গুলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুজাতা ওদিকে সুপ্রিয়ার সাথে গল্পরত ভানু দত্তের দিকে বার বার অসন্তুষ্ট ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। ব্যানার্জ্জী মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাত পা হাস্যকর ভাবে নাড়িয়া funny হইবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ টেবিলটার সামনা-সামনি তরুণ মিঃ ও মিসেস্ মিত্র বসিয়া স্বামীস্ত্রীতে সহাস্য গল্প করিতেছিল। সে দিকে চাহিয়া অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায় মলিকা ভট্‌চায্‌কে কহিল, পুওর ক্রিচার! ফ্লার্ট করচে স্ত্রীর সঙ্গে, আহা কিইনা সুন্দরী দেখ্‌তে।

অঞ্জলির বেশের বর্ণনা করিতে যাওয়া বৃথা। কোনটাকে যে কি বলে তাহার নাম অন্ততঃ সুবল মিত্রের অভিধানে পাওয়া যাইবে না। তারও হাত-কাটা ব্লাউস্, কেন জানা নাই, ব্লাউসের রঙ্ শাড়ীর রঙ্ হইতে বিভিন্ন। এক হাতে অত্যন্ত সরু-বালা, হীরারও হইতে পারে, কিম্বা অন্য কিছুর। তার সমস্ত দেহটা প্রায় হাতের তৈরী কাগজের ফুলের মত হইয়া উঠিয়াছে। উগ্র বিলিতী সুগন্ধির মূর্চ্ছা-কর গন্ধ। কিন্তু অঞ্জলি আজ বিশেষ সুখী নয়। যতটা আকর্ষণ দেখান উচিত ছিল, ইয়ঙ্‌ম্যানেরা আজ ততটা তাকে দেখাইতে পারে নাই। অল্প-পূজা পাওয়া দেবতার মত তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মলিকাকে চুপি চুপি কহিল, পুরুষগুলি কি নির্ল্লজ্জ হয়। সুবিমল আমার কাছে প্রপোজ্ করেছিল। আই স্পার্ন্ড্ হিম। তারপর আবার দুদিন যেতে না যেতে শান্তাকে পাক্‌ড়েছে,—সেম্।

একটু চুপ থাকিয়া আবার সে বলিয়া চলিল, পুরুষগুলির কি, ভারীতো একটু নেচে নাম করেছে, অমনি সে একবারে গডেস্ হয়ে উঠ্‌লো। নইলে শান্তা গাঙ্গুলী ফ্যাসান করে বেড়ায়—মাগো, বলি আয়নাতে কি মুখ কখনও দেখে না। কি বিশ্রী টেষ্ট তোদের সুবিমলের। আর মেয়েটাই কি আর ওকে ছাড়বে,—দেখতে ভালো, তার উপর এতো টাকা, আচ্ছা; সুবিমল ক'বছর বিলেত ছিলরে?

মলিকা তার একটা জবাব দিল বটে, কিন্তু তার বিশেষ দরকার ছিলনা, কারণ প্রশ্নকর্ত্রী নিজেই সেটা সবচেয়ে বেশী জানেন। কি অদ্ভুত hobby বলতো সুবিমলের, যাকে বিয়ে কর্‌বেন তাকে ফেমাস্ হতে হবে। হয় তিনি হবেন নামজাদা নাচিয়ে, নয়ত তার গানের কথা কলেজের ছোক্‌রাদের মুখে মুখে শোনা যাবে, নয়ত মাসিকে তার গল্প লিখতে হবে, নয়ত তাকে হতে হবে কোনো নামজাদা অর্গানাইসেসনের মাতব্বর,—এমনি সব। অর্থাৎ বুঝলি কিনা, তোর মত চুপ চাপ মেয়েকে তার পছন্দ নয়। আমাকে একদিন বলছিল কি জানিস্, তুমি তো চমৎকার নাচ, কেবল তোমার নাম হলো না এই দুঃখ। একদিন চ্যারিটী পার্ফর্ম্মেন্‌সে বড় বড় রোল্ নিয়ে নাচ না, নাম করতে কতক্ষণ। আমি মনে মনে হাসি, নাম করতে যেতে হবে তোমার জন্য, Oh my! আচ্ছা মণি, সত্যি বল্‌তো সুবিমলকে দেখে তোর লোভ হয় না? যাঃ কিরে, ওতো splendid match। মাঝে মাঝে ভাবি, ভুল করলাম না তো। কিন্তু তিন দিন ধরে তো সোসাইটীতে জায়গা পেয়েছে।……যাক্ আমার কথা, কিন্তু কি অদ্ভুত ওর hobby বলতো।……তুই যা মনে করছিস তা নয়, আমার বেলায় ওমনিই—Heavens ওর জন্য তপস্যা করবো, মাগো তুই যে কি বলিস্! কেন, ও এমন কি একটা?

ডিনার শেষ হইয়া গিয়াছে। কফি ও সিগারেটও শেষ। এইবার হৈ'-চৈ' আনন্দের পালা। প্রতিমা সান্ন্যাল গান গাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া কহিল তার গলা ভাল নাই, অর্থাৎ অতটুকু অনুরোধে চলিবে না। অবশেষে সে গাহিতে বসিল, শুধু একটি মাত্রের বেশী গাহিবে না। গান শেষে তার উপগ্রহের দল চঞ্চল এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ব্যানার্জ্জী কহিল, ওয়ান্‌ডারফুল্। চোধুরী কহিল, সুপার্ব্। হালদার কহিল সিলেস্‌চিয়াল্, বিবাহিত যুবকেরা শুধু হাতে তালি দিল। অবিবাহিত মেয়েরা ভ্রূকুটী করিল। তারপর নৃত্য, চারুকলার অন্যতম। শান্তা গাঙ্গুলী নামজাদা নৃত্য-শিল্পী, অবশ্য এমেচার বুঝিতে হইবে। সহরের চ্যারিটী পার্ফর্ম্মেন্সে সে অপরিহার্য্য। মিসেস্ নাগ তাকে সমাগতদের তরফ হইতে অনুরোধ করিলেন, শান্তা সুবিমলের সাথে এক কোণায় গল্প করিতেছিল, চোখে মুখে একটা চেষ্টা-কৃত শঙ্কা ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, নাচ, ভর-পেট খাওয়ার পরে, ওরে বাস্‌রে। তারপর, সুবিমলকে দেখাইয়া, ওদের বাড়ীতে কাল নেচে

যা গা ব্যাথা হয়েছে। সুবিমল কহিল, কিন্তু শান্তা, ইউ ক্যান্‌ট ডিস্‌এপয়েন্ট দেম্ অল্,—গেট্ আপ্, মৃদু দুষ্টুমির গলায় শান্তা কহিল, অঞ্জলিকে বলো,—

সুবিমল প্রায় তার কাণে কাণে কহিল, অঞ্জলি, রক্ষা কর ওর নাচ দেখতে হলে আগে থাক্‌তে লাইফ ইন্‌সুরেন্স, ডোণ্ট্ বি ক্রুয়েল্। মেয়েটা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, জানিনা ওর কি মনোগত ইচ্ছা, বিশ্বাস করবে না, সী হ্যাজ্ রিটন্ এট্ লিষ্ট্ এ ডজন্ লভ্ লেটার্স্ টু মি। এণ্ড্ ফর্ এ গার্ল টু ডু হ্যাট্ ফার্ষ্ট ওঠ লক্ষীটি, তুমি না নাচলে আমার সন্ধ্যাটাই মাটী হবে।

তখন অন্যান্য যুবক এবং বিবাহিতা মেয়েদের কাছ হইতেও অনুরোধ আসিতেছিল। মৃদু গলায় সুবিমলকে ন-টী বয় বলিয়া শুধু তাহারই অনুরোধে যে নাচিতে উঠিয়াছিল তাহা জানাইল। তারপর উঠিয়া মিসেস নাগ পি-য়ানোতে যে সঙ্গৎ সুরু করিয়াছিলেন তাহার তালে পা ফেলিয়া নাচিবার জন্য হলের মাঝখানে আগাইয়া গেল। আশ্চর্য্য বলিতে হইবে শান্তার পাথেই ঘুঙুর-গুচ্ছ ছিল। সেগুলি বাহির করিয়া কে সেগুলি পায়ে বাঁধিয়া দিবে এমন একটা চোখের ভাব করিতেই অঞ্জলি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। মণিকা নিতান্ত সরল মেয়ে, সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কারণ অঞ্জলি যে শান্তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে সে তো আর অজানা নয়। তাদের দুজনের রেষা-রেষি কলেজের প্রাইজ ডের পারফর্ম্মেন্স্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু অঞ্জলি আর সত্যই খুসী হইয়া শান্তাকে সাহায্য করিতে ছুটে নাই। সে লক্ষ্য করিয়াছিল শান্তা যখন ঘুঙুর পায়ে বাঁধিয়া দিবার জন্য লোক খুঁজিতেছিল তখন সুবিমল চঞ্চল হইয়া উঠে।

ফিরিয়া আসিয়া সে মণিকাকে কহিল সুবিমলটা কি নির্লজ্জ,—আমি না গেলে হয়ত ও-ই উঠে এসে পেত্মীর মতো মেয়েটার পায়ে,—সেম্। আমাকে অমনি কতদিন করেছে। এমন হ্যাংলা হয় পুরুষগুলি! তাও যদি মেয়েটা দেখ্‌তে পদের হ'তো। অমন চেহারায় ভাল ডান্সার কেবল ঢোল-ঢাক বাজিয়েই হওয়া চলে। সুবিমলের যা কাল্‌চার—পছন্দ আর কতো ভালো হবে।

শান্তার নাচ হইয়া গেল, তারপর মিসেস্ গুপ্তের প্রস্তাবনায় ও আগ্রহে তার নিজের মেয়ে চামেলীর গান হইল। এখন সভা স্তব্ধ। অন্ততঃ আধ ডজন মেয়ের মা ভাবিয়া রাখিয়া ছিলেন যে শেষ হইলেই নিজের মেয়ের নাম প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু সকলকে দুঃখিত, অপ্রতিভ ও পরাজিত করিয়া অঞ্জলির মা মিসেস্ চ্যাটারপাধ্যায় সমাগতদের হইয়া মেয়েকে অনুরোধ করিলেন, যা তো ডলী, এদের তোর নূতন শেখা সমীরণ-নৃত্যটা দেখিয়ে দেতো। জানেন মিসেস নাগ,—চমৎকার হয় নাচটা। তুমি ওর এ-নাচটা দেখেচো সুবিমল? তোমার মাতো সেদিন দেখে ভারী প্রশংসা করে গেলেন। উদয় শঙ্করের কাছ থেকে—

একদল যুবক হৈ'চৈ' করিয়া উঠিয়া দারুণ উৎসাহ দেখাইল। অঞ্জলির বুকটা একটু ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেই সুবিমল উঠিয়া বিনীত ভাবে জানাইল যে নিতান্ত প্রয়োজনে তাহাকে এবার উঠিতে হইবে এবং অঞ্জলির এই অপূর্ব্ব নৃত্য, যার কথা সে এরই মধ্যে শুনিয়াছে—সেটা দেখিতে পারিল না বলিয়া তার দুঃখের আর অন্ত নাই, তখন অকস্মাৎ অঞ্জলি একেবারে দমিয়া গেল। সুবিমল চলিয়া যাইতেই সে জানাইল,—তার গা-ব্যাথা ও মাথা-ধরা। অতএব সমীরণ-নৃত্য বন্ধ রহিল।

মিসেস্ চ্যাটারপাধ্যায় মিসেস্ নাগকে চুপে চুপে জানাইলেন যে সুবিমলের সাথে শান্তার ব্যবহার মোটেই শোভন দেখাইতেছে না। বাইরে গিয়ে গুডনাইট্ না জানাইলে যেন চলে না। আর কিছু না হোক দেখতে ভারী বিশ্রী।

অঞ্জলি ও সুবিমল সম্বন্ধে ব্যাপারটা এই রকম। এক সময় সত্য সত্যই সুবিমল অঞ্জলির প্রসাদ পাইবার জন্য ঘটা করিয়া পূজার্চ্চনা সুরু করিয়াছিল। এও ঠিক অঞ্জলি ও বর লইয়া একেবারে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মেয়েলী প্রথায়, সে এমন একটা ভাব দেখাইত যাকে ভাষায় রূপান্তরিত করিলে বলা যাইত,— বিশেষ গরজ নাই। এই সময় সুবিমল হঠাৎ অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া উঠিল। তারপর হিন্দু মুসলমান হইলে যেমন বেশী করিয়া মুরগী খায় তেমনি সহসা অঞ্জলির উপর অত্যন্ত অবজ্ঞা দেখাইতে সুরু করে। শান্তার মহার্ঘ্যতা



বিশ্রাম

বিচিত্রা

আশ্বিন, ১৩৩৯

শিল্পী—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর

ছিল তার নৃত্য করিয়া নাম করাতে। সুবিমল ভাবিয়া দেখিল, যে বাপের অর্থ এবং রূপ, ও আভিজাত্যে দুই শ্রীমতীই প্রায় সমান, উপরন্তু শান্তা কেবল কলেজের যুবক সমাজে নহে, তার সহকর্ম্মী ব্যারিষ্টর্ এবং সোসাইটীর বহু বহু অনূঢ় পুরুষদের সমাজে পূজিতা। খবরের কাগজে তার নাম বাহির হয়, বেশী কাটতির আশায় কোনো কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকাতে তার ছবিও ছাপে। অনেকে তাহার বন্দনা করে ও কল্পনা করে, এই হিসাবে উর্ব্বশীর সাথে শান্তার তুলনা হোক না হোক, সুবিমল কিন্তু তাহাকে জয় করাতে অকস্মাৎ ভারী গর্ব্ববোধ করিল। তার ফলে দাঁড়াইল যে সুবিমল নূতন অভিযানে মাতিয়া উঠিল। টাকাতে ফ্যাসানে, চুরুটে ও টু-সিটার মোটরে সুবিমল একজন আদর্শ পুরুষ। শান্তার আর তার পূজা উপেক্ষা করিবার কোন দরকার নেই, তাছাড়া শান্তা চালাক মেয়ে। অঞ্জলি সব বোঝে; ভারী তো নেচে নাম করেছে, পুরুষগুলি অমনি হয়। নাচতে কি আর ওর চেয়ে আমরাই খারাপ নাকি, কিন্তু নিজেকে অমন এড্ভারটাইস্ করতে লজ্জা করে না! মাগো—সেম্! অঞ্জলির অজানা নাই যে সেবার যেদিন শান্তা নাচিয়া একেবারে রাতারাতি ফেমাস্ হইয়া গেল তখন বাঙলা ও ইংরেজী খবরের কাগজে, বিশেষতঃ বাঙলা সাপ্তাহিকে তার কি প্রশংসাটাই না সুরু হয়। সে নাচের পরদিন শান্তাদের বাড়ীতে যা ফুল জড়ো হইয়াছিল তা শুধু নভেলেই পড়িয়াছে, পুরুষগুলি কি নির্লজ্জ হয়। সেই দিনই সুবিমল অকস্মাৎ শান্তার ভক্ত হইয়া পড়ে। তারপর কি ঢলাঢলিটাই না করিতেছে,—সেম্। কি বেহায়া মেয়ে, মাগো লজ্জায় মরে যাই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জী, বিখ্যাত চুরুটের ব্যবসায়ী এস্, কে ব্যানার্জ্জী, বি-কম্ (গ্লাসগো) র স্ত্রী,—পার্টিতে আসেন পুত্রের জন্য একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে খুঁজিতে। যথেষ্ট টাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসা করিতে হয় বলিয়া একটু লজ্জা ছিল। আশা নামকরা এক এরিষ্টোক্রাটিক্ পরিবারে ছেলের বিয়ে দিয়া সোসাইটীতে স্থান আরো ভালো করিয়া লইবে। অঞ্জলিকে বর্ত্তমানে একাকী ভক্তবৃন্দ হইতে মুক্ত দেখিয়া তিনি একান্তে ছেলেকে ডাকিয়া চুপে চুপে কহিলেন, —যা না, মিঃ চ্যাটারপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে আলাপ কর না গিয়ে, এসব মেয়েগুলির সাথে বসে বসে ফাজলামো করে লাভ কি?

সুবিনয় ব্যানার্জ্জী মায়ের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আগাইয়া গেল।

এই সব নানান্ কারণে মিসেস্ নাগের পার্টিকে একটা অথণ্ড সাক্‌সেস্ বলিতে হইবে!

বন্যা নয়, দুর্ভিক্ষ নয়, মহামারী নয়, তবু অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায় চ্যারিটী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অনাথ-আশ্রমের কেহই কোনো দিন তার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয় নাই, কিন্তু নাই বা হইল, তার নিজেরওতো একটা কর্ত্তব্য আছে। তাই সে একদিন অনাথ-আশ্রমের সম্পাদককে ডাকিয়া কহিল যে তাহার আশ্রমের সাহায্যের জন্য তাহারা, অর্থাৎ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা, এবং ছেলেরাও, এক অভিনয় করিবে। এই অযাচিত বদান্যতায় খুসী হইয়া বৃদ্ধ সম্পাদক শুধু এই ভাবিতে লাগিল, হইবে না দয়া, মায়ের জাত তো, মুখে পাউডার মাখিয়া দেখিতে না হয় ভূতের মতোই হইল।

ঠিক হইয়া গেল অনাথ-আশ্রমের সাহায্যের জন্য অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়রা শীঘ্রই এক চ্যারিটী পার্ফর্মেন্স্ করিবে। মিসেস্ নাগের বাড়ীতে কোন কাজ নাই। নভেল পড়া, ফ্যাসান বলিয়া সেলাই করার অভিনয়, এবং চা-পরিবেশন। বাকী সময় সে এমেচার অভিনয়ের দলের সর্দ্দারী করিয়া বেড়ায়। তার সঙ্গে প্রথমেই অঞ্জলির মত-বিরোধ। প্লে কি হইবে এখনও ঠিক হয় নাই,—কিন্তু সেটাকে যে নৃত্য-বহুল হইতে হইবে তা সবাই জানে, কিন্তু মুস্কিল এই, মিসেস্ নাগ বলিলেন, কলেজের ছাত্রদের যদি ড্র করতে হয় তবে শান্তাকে লিডিঙ্ রোল-এ নামাতেই হবে। অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায় ভ্রূকুটি করিল, মুখ-বিকৃত করিয়া সে কহিল,—কলকাতার সব ছেলেই অন্ধ নয়, আর রুচিও কারো কারো আছে। অতএব মিসেস্ নাগের দল ও মিস্ চ্যাটারপাধ্যায়ের দলে মতান্তর হইল।

অঞ্জলিদের দল কি অভিনয় করিবে তা ঠিক হইয়া গেছে। নাম—পুষ্প-রাগ। পদ্ম ফুলের ভূমিকাই প্রধান, তাতে নামিবে অঞ্জলি নিজে। সুকান্ত, অঞ্জলির দাদা, এই ভূমিকার জন্য সুমনার নাম প্রস্তাব করিয়াছিল। কারণ, তার মতে এত নৃত্যবহুল ভূমিকার পক্ষে অঞ্জলি অপেক্ষাকৃত মোটা। কিন্তু তার ফলে হইল এই যে অঞ্জলি দাদার সাথে পুরা তিনদিন কথা বলিল না এবং স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিয়া দিল সুমনার জন্য দাদার কেন এত মাথা-ব্যথা। সমস্ত কিছু লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাইত। ব্যাপার শোচনীয় জানিয়া অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক দৌড়াইয়া আসিল। তার সাথে অঞ্জলির কি কথাবার্ত্তা হইল জানা নাই, কিন্তু সম্পাদক মশায় মধ্যস্থ হইয়া এখানে ওখানে ঘুবাঘুরি করিয়া সঙ্কট মিটাইলেন। তারপর হইতেই অঞ্জলি পদ্মের ভূমিকার নৃত্য ও গান মক্স করিতে লাগিল।

কিন্তু আর এক মুস্কিল হইল। প্লের জন্য জন পাঁচেক পুরুষের দরকার, কিন্তু অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ জন যুবক ভূমিকা লইবার জন্য ব্যগ্র। এদের প্রায় সবাই এমন সব পরিচয়ে আসিয়াছে যাহা লইয়া কোন অনাত্মীয়া মেয়েদের সাথে কথা বলিতে যাওয়াও সৌজন্য-বিরুদ্ধ। যেমন চামেলীর পরিচয়ে দলে কে কে আসিয়াছে তার কথা বলা যাক্। চামেলীর ভাই অপূর্ব্ব, অপূর্ব্বের বন্ধু ইনষ্টিটিউটের পাণ্ডা সুশোভন, সুশোভনের মামাতুত ভাই নীরোদ, নীরোদের একদিন ট্রেণের চেনা মণীদত্ত, এবং মণীদত্তের বন্ধু তরুণ সাহিত্যিক,—নাম শোনেন নাই ?—হিন্দোল গাঙ্গুলী। এই অজস্র যুবকেরা দিনের পর দিন নূতন নূতন পাঞ্জাবী ও জুতা বদ্‌লাইয়া যত সামান্যই হোক একটা ভূমিকার জন্য ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। হয় ত অঞ্জলি এই বেকার দলের কাছে আসিয়া বলিল, রিহার্সেল সুরু হয়েছে, আপনারা একজন সুপ্রভাকে ডেকে দিন না। অমনি পলক পড়িতে না পড়িতে পনরো জন উঠিয়া সুপ্রভা-নাম্নী তরুণীর খোঁজে দৌড়ায়, কিন্তু সেই পঁয়ত্রিশ জন রবাহুতের মধ্যে কাহাকেও লওয়া হইল না, পাঁচটী ভূমিকার জন্যে তাদের চেয়ে অনেক যোগ্যতর যুবক ছিল। তারা অঞ্জলি এবং অন্যান্য অভিনেত্রীদের আরো অনেক অন্তরঙ্গ। তা হইলে কি হয়, সেই প্রত্যাখ্যাতের দল প্রতিদিন বর্দ্ধিতকায় হইয়া সমানে রিহার্সেলে আসিতে সুরু করিল। কোনো মেয়ে যদি তাদের কাহাকেও কোনো কিছু কাজ করিয়া দিতে বলে তবে তারা ধন্য হইয়া যায়। মেসে গিয়া গল্প করে, মেয়েরা কি ফ্লার্ট হয়,—এই তো আজ—

পোষ্টারে পোষ্টারে দেওয়াল ছাইয়া গেছে, ট্রামে বাসে সর্ব্বত্র হ্যাণ্ড-বিল্ বিতরণ। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা নিউ-এম্পায়ারে অভিনয় করিবে—পুষ্প-রাগ। নৃত্যে গানে ও আলোকসম্পাতে অপূর্ব্ব। প্রধান ভূমিকায় নামিবেন বিখ্যাত নৃত্য-পটীয়সী অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়। ইনি স্বয়ং উদয়শঙ্করের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তার নাচ যারা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছেন তাহারা এবার তার নবীন কৃতিত্বে বিস্মিত হইবেন। ইহা ছাড়া চামেলী গুপ্ত, সবিতা সান্ন্যাল, বিখ্যাত গায়িকা নমিতা রায় প্রভৃতি আরো অনেক আছে। টিকিট-লব্ধ সমস্ত টাকা অনাথ-আশ্রমের সাহায্যে যাইবে। অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রাচ্য নৃত্যকলার মহোৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে টিকিট সংগ্রহ করুন। প্রাপ্তিস্থান—এখানে একাধিক প্রাপ্তি স্থানের নাম করা হইয়াছে। অথবা মিস্ অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়ের কাছে,—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড্

অভিনয়ের যখন দুই সপ্তাহখানিক বাকী তখন অঞ্জলি বাবাকে ধরিয়া দৈনিক এবং বিশেষতঃ বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক পত্রিকা এমিউস্‌মেণ্ট্ কলামের সম্পাদকদের ডাকিয়া আনিয়া চা খাওয়াইয়া দিল। ফলে কয়েক দিনের মধ্যে বহু দৈনিক এবং বাঙ্‌লা সাপ্তাহিকে খবর বাহির হইল যে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ চ্যাটারপাধ্যায় বহু গুণান্বিতা কন্যা মিস্ অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়ের উদ্যোগে অনাথ-আশ্রমের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই নিউ এম্পায়ারে এক নৃত্য ও সঙ্গীতের উৎসব হইতেছে। প্রধান নৃত্য-বহুল ভূমিকায় শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী নিজে নামিতেছেন। অতএব তাহার কাছ হইতে আমরা অপূর্ব্ব কিছু পাইব এ আশা করা অন্যায় নয়। আমরা কলা-রসিকদের অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁরা এই অপূর্ব্ব সুযোগ না হারান।

সেদিন নিজে অঞ্জলি সুবিমলের কাছে টিকিট বিক্রী করিতে গেল। টিকিট, কাদের অভিনয়? ও তুমিই

অর্গেনাইস্ করেচ,—লিডিঙ্ রোল্-এ নামচে কে? আই সী, তুমি নিজে। হচ্ছে কিছু বিক্রী? টিকিট প্রায় ফুরিয়ে এলো! বলো কি? তা দাও একটা, কুড়ি টাকায়,—যেতে চেষ্টা করব। এসব কি? ওঃ বাঙ্লা সাপ্তাহিকে এরই মধ্যে তোমার অভিনয়ের ফোর্কাষ্ট বেরিয়ে গেছে। কিছু টাকা দিতে হলো নাকি? আহা চটো কেন? আই ডিড্ নট্ মীন্ এনী থিঙ্ ইল্। টাকা দিয়ে নাম advertise শাস্তার প্র্যাক্টিশ নাকি?--জানতুম না তো, সম্পাদকরা খবর শুনে নিজেরা এসে তোমার অভিনয়ের খোঁজ করে গেছে? আই অ্যাম্ গ্লাড্ টু লার্ণ, তবে সত্যি তুমিও ফেমাস্ হয়ে যাচ্ছ দেখি।

অঞ্জলির বুকটা ফুলিয়া ওঠে।

সুবিমল বলে, রাতারাতি তোমাকে ওরা ফেমাস্ করে দেবে দেখচি। ইউ আর লাকী, নইলে পয়সা না দিলে এমনটা প্রায়ই হয় না। কবে হবে? সোমবার? যেতে চেষ্টা করবো, নতুন জিনিষ হবে? আচ্ছা দেখবো, তোমার শেষের নাচটার কি বললে নাম, ছিন্ন দল? গুড্ নাইট্।

শান্তাগাঙ্গুলী, মিসেস্ নাগ ও ও-দলের প্রধানরা সেদিন ডাকের সাথে প্রায় সবগুলি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পাইল। আশ্চর্য্য বলিতে হইবে, সেগুলি খুলিলেই অভিনয় সমালোচনার জায়গাটা খুলিল,—সে পাতাগুলি ভাঁজ করা ছিল।

শান্তা সুবিমলকে সেদিন বলিল, নাম করার জন্য অঞ্জলিটা দারুণ খেপেছে। সাপ্তাহিকগুলিতে এতসব লেখাতে কম খরচ করতে হয়নি।

সুবিমল কহিল, বার্-এর জুনিয়ার ব্যাচ্ খুব মেতে উঠেচে কিন্তু, তাছাড়া বুকিঙ্ অফিসে খোঁজ নিয়ে শুনলাম, কলেজের ছেলেরাও—

শান্তা কহিল,—কিন্তু অঞ্জলির নৃত্য, মাগো দেখতে ইচ্ছা করে কি জিনিষ হয়। আর কাগজের এই সব কথা, যেন ও genuine ভেবোনা, got-up!

ঠিক এই কথাটা শুনাইবার জন্য শান্তা অঞ্জলিকে ফোনেও ডাকিয়াছিল। অঞ্জলি জবাব দিল,—নিজের মত সবাকে ভেবো না।

যখন এক সপ্তাহ মাত্র বাকী তখন অঞ্জলি বাঙ্লা সাপ্তাহিকের এমিউস্মেণ্ট্ সম্পাদকদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করিল। সম্পাদকদের যারা বৃদ্ধ তারা ভাল খাইয়া তৃপ্ত হইল। যারা যুবক, নূতন কলা-শিল্পের সমালোচক হইয়াছে, তারা এত বড় এরিষ্টোক্রেটিক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ এবং বিশেষত তরুণী হোষ্টেসের আদরে কৃতার্থ হইল। 'শিখা'র তরুণ প্রতিনিধি কহিল, এ সম্বন্ধে আমার তিন কলাম্ যাবে। "প্রদীপ" কহিল,—আপনার অভিনয় বিষয়ে আমরা কলম্ কার্পণ্য করবো না। "ফানুস"এর তরুণ সম্পাদক ভাবালস চোখে কহিল, আপনার কটা ছবি ছাপতে চাই, যদি আপত্তি না হয়। 'শিল্পী'র বৃদ্ধ প্রতিনিধি হিসাব করিয়া কহিল, প্রচ্ছদ পটে আপনার বড় একটা ছবি আমরাও ছাপতে পারি,—তবে আমাদের শস্তার ব্যাপার কিনা,—ব্লকটা আপনিই একটা ভালো দোকান থেকে করিয়ে দেবেন।

অঞ্জলি কহিল, বেশ, আপনাদের সবাইকে ব্লক্ পাঠিয়ে দেব। ইচ্ছে ছিল আপনাদের একদিন রিহার্সেল দেখিয়ে দিই, কিন্তু—

'ফানুস' কহিল, কোন দরকার নেই। আপনার অভিনয় যে অভিনব হ'বে তা আপনার সাথে আলাপ করেই বেশ বুঝতে পারচি। "প্রদীপ" কহিল—জানি আপনি প্রাচ্য-নৃত্যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করবেন। "শিখা" কহিল—নাচের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

অতঃপর অঞ্জলি তাদের সুরাত্রি জানাইল। মনে থাকবে তো,- সোমবারে প্রথম অভিনয়। তারপরই কিন্তু সমালোচনা বের হওয়া চাই। পাশ্ আগেই পাঠিয়ে দেব। কটা দিতে হবে বলুন তো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অভিনয়ের আগে গ্রীন্-রুমে এসে বন্দোবস্ত দেখে যাবেন। তাছাড়া যদি প্লে দেখ্তে দেখ্তে কোন সাজেস্সন্ দেবার দরকার হয়—

সোমবারে প্লে হইবে,—আজ শনিবার। অঞ্জলি প্রভাতীয় প্রসাধন শেষ করিয়া চা খাইতে আসিয়াছে। বেয়ারা বেতের ট্রেতে চিঠি খবরের কাগজ প্রভৃতি লইয়া আসিল। খবরের কাগজ উঠাইয়াই দেখে তার সাথে আসিয়াছে কতগুলি বাঙ্লা সাপ্তাহিক পত্রিকা। খবরের কাগজ রাখিয়া সেগুলিই সে খুলিতে লাগিল।

এটা 'শিখা'। খুলিতেই প্রচ্ছদপটে অঞ্জলির পূর্ণ-পৃষ্ঠ ছবি।' তার নাম লিখা—শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী, ইনি নিউ

এম্পায়ারে নৃত্য-গীত-মুখর নাটিকা 'পুষ্প-রাগে' পদ্মের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অঞ্জলির ভ্রূ সামান্য কুঞ্চিত হইল। ছাপখানার ভূতের দৌরাত্ম্যে কি অদ্ভুত অর্থ দাঁড়াইয়াছে। পরশু অভিনয় আর আজই কিনা লিখিতেছে,—অভিনয় করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন! তাড়াতাড়ি সে সমালোচনার জায়গা খুলিল। এক জায়গাতে চোখ পড়িল—শ্রীমতী অঞ্জলি দেবীর পদ্মের ভূমিকা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। কী তাহার অনবদ্য রূপ-সজ্জা, কি অপূর্ব্ব তার চলিবার লাস্য, কি মোহনীয় তার তাকাইবার ভঙ্গী, যে পদ্ম-নৃত্য তিনি সেদিন নিউ-এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে আমাদের দেখাইলেন তাহার তুলনা আমাদের এই বহুদিনের সমালোচক-জীবনে আর কখনো চোখে পড়ে নাই। যেন একটী শরৎ-সরসীর নীলোৎপল জলের ছন্দে, তীর-তরুর পত্র-ছন্দে নিজের অন্তরোত্থিত আনন্দ ফুটাইয়া তুলিল দেহের ভঙ্গীতে।...আগামী সোমবার দিন পুষ্পরাগের পুরভিনয় হইবে। প্রত্যেক কলা-রসিকের দ্রষ্টব্য।

অঞ্জলির চোখ বিস্ময়ে দীর্ঘ হইয়া গেল। বলে কি? এখন পর্য্যন্ত অভিনয়ই হইল না, আর লিখিতেছে কিনা—দেখিয়া আসিয়াছে, অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়াছে। ভ্রূকুটি করিয়া বিরক্ত মুখে সে 'প্রদীপ' খুলিয়া লইল। প্রচ্ছদপটে তেমনি পূর্ণ-পৃষ্ঠ ছবি। নীচে লেখা—শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী, ইনি নিউ এম্পায়ারে পুষ্পরাগে পদ্মের ভূমিকা করিয়াছেন।

ফানুষ? হাঁা, ঠিক তেমনি প্রচ্ছদ পটে অঞ্জলির ছবি। নীচে পরিচয়—পুষ্পরাগের অপূর্ব্ব নৃত্য-শিল্পী শ্রীঅঞ্জলি দেবী। এর অভিনয় দেখিয়া রসিক-সমাজ মুগ্ধ। ছাপায় ভুল হয় নাইতো! তাড়াতাড়ি সমালোচনার পাতা টানিয়া খুলিল। —আমরা সেদিন নিউ এম্পায়ারে পুষ্পরাগের অভিনয় দেখতে গিছলাম, অনেক আশা নিয়ে। সে আশা আমাদের ব্যর্থ হয়নি।······ পদ্মের ভূমিকায় শ্রীঅঞ্জলী দেবী কি অপূর্ব্ব অভিনয় সেদিন আমাদের দেখালেন, তা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাইনে। ঘরভরা সহস্র দর্শক এই নৃত্য-মায়াবিনীর অপরূপ নৃত্য-লীলায় কি মন্দারের সুধার সন্ধান পেয়েছিল, তা তাদের ঘন-ঘন হাতের তালি থেকেই প্রমাণ হচ্ছিল।······তার কর-পল্লবের লীলায়, তার গ্রীবা-ভঙ্গীতে, তার দেহের ভাষাতীত লাস্যে, তার সাবলীন পদক্ষেপে আমরা স্তম্ভিত নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিলাম।······সোমবার দিন পুষ্পরাগের পুনরভিনয় হইবে। যাদের এখনো দেখার সৌভাগ্য হয় নি তারা যেন ইত্যাদি।

অঞ্জলি স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি। এরা বলে কি! এরা কি ক্ষেপিয়া গেল নাকি? অভিনয় হওয়া তো দূরের কথা, তার আরো পুরা দুইটী দিন বাকী। তাছাড়া ষ্টেজ্ লইয়া একটু গণ্ডগোলও বাঁধিয়াছে। আর ওরা বলে কিনা—, বিরক্তে-শঙ্কায় তার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। আর রক্ষা নাই। কতগুলি অতি অমার্গিক সম্পাদক তাকে পথে বসাইয়াছে। অভিনয় হইবার আগেই অভিনয় দেখিয়া সমালোচনা! এর চাইতে তার মাথায় লাঠি মারিলেও ভাল ছিল। গেল তার সমস্ত প্রচেষ্টা মাটী হইয়া, সর্ব্বনাশ হইল। সর্ব্বনাশ নয়ত কি, এইবার প্রতিপক্ষ টিট্‌কারী দেবে, অভিনয় হইবার আগেই তার সমালোচনা। আর শান্তা? মাগো এইবার পেঁচী-মুখী মেয়েটা মুখের উপর তুড়ি দিয়া যাইবে, 'নিজের মত জগতকে ভেবোনা তাতো দেখতেই পাচ্ছি। অভিনয়ের আগে সমালোচনা, বাই জোভ্, কি অপূর্ব্ব না জানি অভিনয় হয়েছিল! কতটাকা দিতে হ'লো'। তারপর আসিবে সবচেয়ে বড় সর্ব্বনাশ। সুবিমলের কাছে সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে, 'ইউ আর লাকী, নইলে পয়সা না দিলে এমনটী প্রায়ই হয় না' তুমি একটা অপূর্ব্ব জিনিষ দেখালে অঞ্জলি। অভিনয় না হ'তেই—কতটাকা?

অঞ্জলির মাটীতে মাথা ঠুকিতে ইচ্ছা হইতেছে। একেবারে সাম্রাজ্যে পতন,—সর্ব্বনাশ। এইবার বিখ্যাত হওয়া তো দূরের কথা টিটকারীতে সহরে আর টেঁকা যাইবে না। শান্তা, সুবিমল, মিসেস্ নাগ! সুবিমল! কি অদ্ভুত hobby, যাকে বিয়ে করবেন তাকে বিখ্যাত না হলে চলবেনা। অঞ্জলির মাথায় আগুন জলিয়া উঠিল। গেল সব পুড়িয়া ছাই হইয়া, মাটী হইল সব। ছুটিয়া গিয়া 'শিখা'তে টেলিফোন্ করিল। তারপর প্রদীপে, তারপর "ফানুষে"। একই উত্তর,—শনিবারে কাগজ বাহির হয়,

তাই সোমবারে অভিনয় হইয়া গেলে তারপর সমালোচনা বাহির করিতে আবার সেই আরেক শনিবার, তাই বিশেষ দোষ কি আর হইয়াছে। সোমবার পুনরভিনয়ের কথা তো লিখাই আছে।

টেলিফোন্ রিসিভার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অঞ্জলি নিজের শোবার ঘরে ছুটিয়া গিয়া দরজা দিল। কিন্তু তাতেইকি রক্ষা আছে। শান্তা ফোন করিল একটু পরেই। কি কাণ্ড, অভিনয়ের আগেই সমালোচনা! নাম রটাইতে ইচ্ছে হয় রটা, কে মানা করছে বাপু। কিন্তু তারও তো একটু ধরণ ধারণ আছে। উঃরে বাবা, কি প্রশংসা! অতি-প্রশংসার অর্থটা উল্টো হয় জানিস্ তো, তাই হয়েছে। বাই দি বাই, কত টাকা দিতে হয়েছে।'

তার একটু পরেই মিসেস্ নাগের ফোন্। তারপর প্রতিপক্ষের ফোন্ আসিতেই লাগিল।

এরপরে যা হইবার তাই হইল। অঞ্জলি ঘরের মধ্যে বন্ধ রহিল। সঙ্গিনীরা হইতে আরম্ভ করিয়া মা বাবা সবাই অনুরোধ করিয়াও তাকে আর অভিনয় করিতে নামাইতে পারিল না। সুকান্তের প্রস্তাবনায় সুমনাকে পদ্মের ভূমিকায় নামাইয়া কোন প্রকারে সোমবার দিন অভিনয় করাণ গেল। অঞ্জলি অভিনয় দেখিতেও গেলনা, ঘরে বসিয়া বসিয়া মুখ ফুলাইয়া ও চোখ রাঙা করিয়া তুলিল। কিন্তু তা হইলে কি হয়, যারা সবুজ ঘরে যাইবার জন্য লালায়িত ছিল তারা যাইতে পারিল, কলেজের ছেলেরা অঞ্জলির অভাব টেরও পাইল না। বহু ব্যারিস্টারও তাই। তারা নিজ নিজ মেসে ও বাসায় গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, চমৎকার করলে অঞ্জলি চ্যাটারপাধ্যায়!

মঙ্গলবার দিন ভোরে সহসা সুবিমল বিস্তর ফুল লইয়া অঞ্জলিদের বাড়াতে উপস্থিত। মিসেস্ চ্যাটারপাধ্যায় তাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। মাস ছয় সুবিমল এ-বাড়ীতে আসে নাই। অঞ্জলি? দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি। বেয়ারা।—আস্‌ছেনা? কেন? সুবিমল বাবু আয়া, বলো। আচ্ছা আমিই ডেকে দিচ্ছি।

সুবিমল আসিয়াছে? অঞ্জলি প্রমাদ গণিল। সুবিমল-এর আজ ভোরে আসা মানে তার অপমানের পরম-মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। পেঁচী-মুখী শান্তা! কী নিষ্ঠুর হয় পুরুষ গুলি! শরীর ভালো নেই তার। কিন্তু মা না-ছোড়-বান্দা। অগত্যা তাকে অপমান গ্রহণ করিবার জন্য আগাইয়া যাইতে হইল। 'হাউ ন্যাকী, নইলে পয়সা না দিলে এমনটী প্রায়ই হয় না'।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া অঞ্জলি হলঘরে সুবিমলের কাছে উপস্থিত। দেখিয়াই সুবিমল একবার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছে। কঙ্গ্রাচুলেশান্‌স্, থাউসাণ্ড এণ্ড ওয়ান্ কঙ্গ্রাচুলেশান্‌স্, হোয়াট্ এ গ্লোরিয়াস্ থিং, সত্যি শেষে অঞ্জলি তুমি ফেমাস্ হয়ে উঠ্‌লে, আই অ্যাম্ সো হ্যাপী এণ্ড প্রাউড্।

হাত ছাড়াইয়া অঞ্জলি কঠিন স্বরে কহিল বাড়ী বয়ে এরকম ইন্‌সাল্ট্ করবার মানে?

সুবিমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ইন্‌সাল্ট্? বলো কি, সমস্ত পেপার্ তোমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, আর আমি বল্লেই ইন্‌সাল্ট্। তবে কি বুঝবো—ইউ হ্যাভ্ ট্রান্‌স্‌ফার্‌ড্ ইওর্ লভ্? আমাকে বিশ্বেস করো, তুমি নাম করেছ তাতে সত্যি আমি গর্ব্বিত, আই এডোর ইউ। অঞ্জলি প্রায় হতবুদ্ধি। সুবিমল যে সত্যসত্যি উচ্ছ্বসিত তা তাহার কথার সুরে বুঝা যায়। তবে সে কি এসব কিছু শোনে নাই? অভিনয় দেখিতে যায় নাই, শনিবারের কাগজ পড়ে নাই? সে কহিল, কিন্তু কাল তো আমি প্লে করি নাই।

সুবিমল সিগার ধরাইয়া কহিল, তা তো জানি, আমি নিজেই কাল প্লে দেখ্‌তে গিছ্‌লাম। কিন্তু That does not matter, এমন কাগজ নেই যাতে তোমার প্রশংসা বের হয়নি।

বিশ্বাস করবে, তুমি জুনিয়ার ব্যারিষ্টারদের একমাত্র টক্ হয়ে উঠেছ। আমার পক্ষে সেই যথেষ্ট। How I adore you! অঞ্জলি কহিল—কিন্তু—

সুবিমল তার মুখ চাপিয়া সবটা বলিতে দিল না। নাম হয়েছে তাতেই যথেষ্ট। তুমি নামনি তাতে কি এসে গেল। তবে নাম্‌লেই পারতে,—শনিবার দিন অভিনয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল তাতে কি এসে গেল। As for me—তোমার

নাম যে লোকে জেনেচে এবং ফ্যাস্‌নেব্‌ল্‌ ইয়ঙ্‌ ম্যান্‌দের তুমি টক্‌ হয়ে উঠেছ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচনা পড়ে তোমার নাচের কথায় সব উচ্ছ্বসিত······বাই জোভ্‌—বলো কি, শান্তার প্রেমে পড়্‌ব? বছরখানিক পরে পরে যার নামে দুচার লাইন বের হয়। হাসালে! ডোণ্ট্‌ বি সিলি, ওল্ড্‌ গার্ল্‌—আজ সন্ধ্যায় কিন্তু এখানে চা খেতে আসব।

দিন সাতেক পরে। সাজিয়া গুজিয়া মুখে পাউডার্‌ ও গায়ে সেণ্ট্‌ ঢালিয়া অঞ্জলি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সুবিমলটা, সাড়ে ছটায় মোটর নিয়ে আসার কথা। অঞ্জলির একটা চিঠি লিখবার ছিল, ভাবিল সুবিমল আসার আগে তাড়াতাড়ি সেটা শেষ করিয়া ফেলা যাক্‌। অতএব ঘরে যাইয়া সে অনাথ-আশ্রমের সম্পাদককে একটা চিঠি লিখিল। অভিনয়ে এগারোশো টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। ষ্টেজ ভাড়া পাচ শো, ট্যাক্‌সি চুরুট চা ও পেষ্ট্রিতে পাঁচ শো পঁচিশ টাকা খরচ। বাকী পচাত্তর টাকা একদিন আসিয়া লইয়া যাইবেন।

সুবোধ বসু

বর্ষামঙ্গল

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

তোমার চোখের শ্যামল ছায়ার মত
মেঘের রাশি ঘনিয়ে এল ধীরে।
পথ চেয়ে গো বসেই আছি শুধু
বারেক তবু চাইলে না ত ফিরে॥

মেঘের বুকে গুমরে ওঠে ব্যথা
বাতাস আনে ব'হে সজল বাণী।
আকাশেরই চোখের কোণে কোণে
জেগে ওঠে কী মিনতিখানি।

আমার মনেও কিসের বেদন বাজে,
গুঞ্জরিল অস্ফুট কি কথা,
চোখের তারায় জলের কাঁপন লাগে
জেগে ওঠে উদাস আকুলতা॥

শ্রবণ পেতে শুধুই আছি সখি,
পথ চাহিয়া তোমার আশায় বসে।
কম্প্র বুকে সলাজ পায়ে কবে
পাশে এসে কইবে কথা হেসে?

যে ব্যথা মোর ঘনিয়ে এল চিতে
আকুলতা জাগিয়ে দিল প্রাণে,
তুমি এসে সেই ব্যথাটি মম
কর রঙীন তোমার চোখের গানে॥

স্পর্শে তোমার হ রোমে রোমে,
কাকলীতে পুলক তোল তুমি।
চোখের ভাষায় মাতাল কর প্রিয়,
তোমার মাঝে আপন-হারা আমি॥

রবীন্দ্রনাথ ও ডাক্তার ফ্রয়েড

ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্‌-এ

১

মনোবিকাশের পথেই মানুষ পশু হইতে মানুষে পরিণত হইয়াছে। এবিষয়ে কবি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কাহারও মধ্যে মতভেদ নাই।

কিন্তু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার প্রণালী ইঁহাদের এক নয়। ডাক্তার ফ্রয়েড মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগের মনোবৃত্তি আলোচনা করিয়া "আমাদের অবচেতন মন ও তাহার ক্রিয়া" সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, আমরা যে সকল কাজ করি আমাদের মনের জ্ঞাত ইচ্ছা বশেই তাহা করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেক কাজ জানিয়া এবং ইচ্ছা করিয়াই করি। কিন্তু ডাঃ ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এই ধারণা সব সময় সত্য নয়। আমরা এমন অনেক কাজও করি যাহা কেন যে করিতেছি তাহা আমরা নিজেই জানিনা বা বুঝি না। ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন, আমাদের মধ্যে একটি অচেতন মন (unconscious mind) আছে, ইহার ক্রিয়া যখন আমাদের কার্য্যের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন সে কার্য্যের কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত রহিয়া যায়। আমাদের নানাবিধ মানসিক ব্যাধি ও দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি— (যাহার আমরা কারণ নির্ণয় করিতে পারি না)—প্রধানতঃ এই অজানা মনের মনোবৃত্তির ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ফ্রয়েড এই অচেতন মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা যাইতে পারে সে বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং ঐ পদ্ধতি অনুসারে আলোচনার দ্বারা—তিনিও তাহার শিষ্যগণ এই অচেতন মন সম্বন্ধে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়া মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে একটি নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন।

মনের যে এক গভীরতম প্রদেশ আছে কবিও ইহা স্বীকার করেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি মনোজগতের গভীরতম রহস্যগুলি সহজ উপলব্ধিতে অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে একটি গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছে। এই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি তাঁহার রচনায় মানবমনের অনেক রহস্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে এমন অনেক মনস্তত্ত্বের কথা আছে, যেগুলি ফ্রয়েড যাহাকে অচেতন মন (unconscious mind) বলিয়াছেন তাহারই ক্রিয়ার বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টি আরম্ভ করা যাক্।

কবিবর রজনীকান্ত সেন গলায় ক্যান্‌সার রোগে পীড়িত হইয়া মেডিক্যাল্ কলেজের কটেজ্ ওয়ার্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ব্যাধির জন্য তাঁহার বাক্‌শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় কবিসম্রাট একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। রজনীকান্ত কাগজে লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কান্তকবির জীবনবৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য কথার মধ্যে রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে এই কথাগুলি লিখেন :—

"যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' একবার আপনার কাছে অভিনয় করে শুনাতাম। আমি রাজার অভিনয় করেছি। এমন কাব্য এমন নাটক কোথায় পাব! রাজার পার্ট আজও অনর্গল মুখস্থ আছে।

এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে—পায়ে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়!"*

* রাজা ও রাণী ২য় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ইহার পরে রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি, মাংস, স্নায়ু ও পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়াও কোন মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :—

"এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"

এই কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে তা'রা পরাভূত করিতে পারে নাই।—পৃথিবীর সমস্ত আশা ও আবাস ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি ততই বেশী জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, —তাহা যে অস্থি ও মাংস, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মধ্যে নাই, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

কবিবর রজনীকান্তের—বিশেষ করিয়া ঐ কবিতাটি আবৃত্তির ভিতর—তাঁহার অচেতন মনের ক্রিয়া ছিল। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন ব্যক্ত অংশ—Manifest content। এই ব্যক্ত অংশের ভিতর অচেতন মনের গুপ্তভাবের আভাস পাওয়া যায়, তাহা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ Latent content। রজনীকান্তের আবৃত্ত কবিতা হইতে এই কবিতার ভিতর যে অব্যক্ত ভাব Latent content আছে তাহা বাহির করিতে হইলে ডাঃ ফ্রয়েড বা তাঁহার কোন শিষ্যকে স্বপ্ন বিশ্লেষণের নিয়মানুসারে মনোবিশ্লেষণরূপ (psycho-analysis) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত।

কিন্তু কবিসম্রাটের পক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োজন হয় নাই, তিনি তাহার অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে কেহ সে সময় কান্ত-কবিকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না যে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তখন রজনীকান্ত যদিও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে বাক্‌শক্তি একেবারে হারাইয়াছেন, তথাপি তিনি হারমোনিয়ামে বাজাইতেছেন,—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব্ব করিতে চূর।"

ডাঃ ফ্রয়েড মানসিক ব্যাধিগ্রস্তগণের মনোবৃত্তি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মানুষের এই মানসিক ব্যাধিই ভব-ব্যাধি, সুতরাং এক হিসাবে ডাক্তার ফ্রয়েড মানবের ভবরোগের নিদান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার সংসারের প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক দুঃখ, প্রত্যেক বিচ্ছেদ কত শতবার মানবের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিতেছে, এবং সেই সকল আঘাতে মানবের অন্তর্নিহিত গভীর ভাব ধারা কিরূপে বদ্ধতা হইতে জড়ত্ব হইতে বিকাশের পথে চলিতেছে, এবং বিকাশ লাভের সত্য পথ কি, কবি সম্রাট এই সকল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ফ্রয়েড যেমন ভবরোগের নিদান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কবি-সম্রাটও সেই ভবরোগের মুক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন।—কিন্তু তাঁহার আলোচনা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসুর ন্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ ধরিয়া নয়, তাঁহার আলোচনা ধর্ম্মসাধনার পথের বিষয় লইয়া। কবি নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা উপলব্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথাগুলির কেবল কাব্যের দিক দিয়া নয়, সুনিপুণ রচনার দিক দিয়া নয়,—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ডাক্তার ফ্রয়েড মনের এক দিকের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং কবি-সম্রাট মনের আর এক দিকের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। উভয়ের আলোচনার ক্ষেত্র বিভিন্ন, কিন্তু প্রকৃত সত্য লাভ উভয়েরই উদ্দেশ্য। সেই জন্য

কবি-সম্রাটের উপলব্ধির মধ্যে এমন অনেক বিষয় দেখিতে পাই যাহার সহিত ডাক্তার ফ্রয়েডেরও মিল আছে। কিন্তু ক্ষেত্রের বিভিন্নতার জন্য কবি সম্রাটের উপলব্ধির মধ্যে এমন অনেক জিনিস দেখিতে পাই, যাহার সত্যানুসন্ধানী ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে যেন কিছু কিছু আভাস পাইয়াছেন, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন কান্ত কবির আবৃত্তির যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন, তখন বুঝিয়াছিলেন ভক্ত রজনীকান্তের গভীর মনে ভূমার একটি উপলব্ধি হইয়াছে, সেই উপলব্ধিই তাঁহাকে সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে রক্ষা করিতেছে ও সান্ত্বনা দিতেছে—মাতা যেমন আশ্রয় দেন ও রক্ষা করেন। জাগতিক কোন শক্তিই এখন আর তাঁহাকে পীড়িত করিতে পারিতেছে না। ডাঃ ফ্রয়েড তাঁহার মনস্তত্ত্বের গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অহং বোধ থাকে তাহার এক অংশ ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া Super Ego বা শ্রেষ্ঠ অহং স্বরূপ পৃথক সত্তা লাভ করে। আমরা যাহাকে বিবেক বলি তাহা ইহারই ক্রিয়া। এই শ্রেষ্ঠ অহং যেন অহংএর রক্ষক স্বরূপ, যেমন পিতা মাতা সন্তানের রক্ষক। এই শ্রেষ্ঠ অহং, অহংএর প্রত্যেক কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে, প্রয়োজন হইলে অহংএর উদ্দেশ্য প্রকাশ হইতে দেয় না। আমরা যে দোষ করিয়াছি—এই ভাব, অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অর্থাৎ বিবেকলব্ধ শাস্তি ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়।*

ইহার পর ডাঃ ফ্রয়েড আরও একটি আশ্চর্য্য নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ অহং Super-ego যেমন ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত হয়, সেইরূপ ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজের মধ্যেও বিকশিত হয়; তাহারই প্রভাবে সমাজে মনঃকর্ষের (culture) বিকাশ হইতে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে সমাজে শ্রেষ্ঠ অহং-এর বিকাশ এই ভাবে হয়,—সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বশালী কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করেন। কিম্বা এমন কোনও অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার মধ্যে কোনও গুণ অসাধারণ প্রবল ও পবিত্রভাবে প্রকাশ পায়। অনেকস্থলে (অবশ্য সকল স্থলে নহে) এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিদ্রূপ অথবা মন্দ ব্যবহার পান, কোনও কোনও স্থানে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। কিন্তু নিহত হইলেও এই সমস্ত মহাপুরুষগণ পৃথিবীর জন্য যে ভাবরাশি রাখিয়া যান তাহাই সমাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অহং-এর কাজ করে। তাঁহারা জগতের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া যান তাহা পালন না করিলে মনের মধ্যে বিবেকের তাড়নার ন্যায় একটা গ্লানির দাহ অনুভব হয়।*

ডাক্তার ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশ দুইটি ধারার মিশ্রণের ফল। একটি ব্যক্তিগত সুখলাভের চেষ্টা বা উপভোগ নীতি, যেটি অহংভাব হইতে জাত, অপরটি সমাজের মধ্যে অপরের সঙ্গে মিশ্রণের আবেগ, যেটি বিশ্ব-জনীন ভাব হইতে উৎপন্ন।† এই দ্বিতীয়টির উল্লেখের সঙ্গে

* The super-ego is an agency or institution in the mind whose existence we have inferred ; conscience is a function, we ascribe, among others, to the super-ego ; it consists of watching over and judging the actions and intentions of the ego, exercising the functions of a censor. The sense of guilt, the severity of the super-ego, is therefore the same thing as the rigour of conscience.

Civilization and its Discontents (P. 127).

* The analogy between the process of cultural evolution and the path of individual development may be carried further in an important respect. It can be maintained that the community too, develops a super-ego, under whose influence icultural evolution proceeds. It would be an enticing task for an authority on human systems of culture to work out this analogy in specific cases. I will confine myself to pointing out certain striking details. The super-ego of any given epoch of civiliza-tion originates in the same way as that of an individual ; it is based on the impression left behind them by great leading personalities, men of outstanding force of mind, or men in whom some one human tendency has developed in unusual strength and purety, often for that reason very dispropor-tionately. In many instances the analogy goes still further in that during there lives often enough if not always—such persons are ridiculed by others ill-used or even cruelly done to death.

Civilization and its Discontents (P. 137).

† We may say individual development seems to us a product of the interplay of two trends, the striving for happiness, generally called egoistic, and the impulse towards merging with others in the community which we call 'altruistic.'

Civilization and its Discontents (P. 134).

সঙ্গে ফ্রয়েড ভূমার রাজ্যের সীমায় অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়াছেন।

ফ্রয়েড যেমন প্রথমে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ অহং-বিকাশ এবং পরে সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অহং-বিকাশের কথা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁহার নিজস্বভাবে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহাতে ফ্রয়েড মতাবলম্বীগণ, রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে, ফ্রয়েড কথিত এই শ্রেষ্ঠ অহংএর উপাদান খুঁজিয়া পাইবেন। কারণ কবির কথাগুলি বাস্তবিক পক্ষে মনস্তত্ত্বের রহস্যের কথা। কবিসম্রাট তাঁহার Personality নামক ইংরেজী পুস্তকে ব্যক্তিত্ব বোধের বিষয় বলিয়াছেন,—"স্বাধীনতার চরম উদ্দেশ্য এইটি জানা যে 'আমি আছি'। * * * * সন্তান মায়ের গর্ভের মধ্যে মায়ের সঙ্গে এক হয়েছিল, কিন্তু তখন তার নিজের সম্বন্ধে কি মায়ের সম্বন্ধে কোন অনুভূতি ছিলনা। * * * সন্তানটি যে একটি ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি তাহার সম্পূর্ণভাবে প্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জন্মের পর স্বাধীনতার মধ্য দিয়া মায়ের ও সন্তানের পরস্পরের ভিতরের যোগ সন্তানের নিকট ব্যক্তিত্বের চেতনার সম্পূর্ণ জ্ঞানের আনন্দ লইয়া আসে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন,—"ব্যক্তিত্বের চেতনা সকলের সঙ্গে পৃথকত্বের বোধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সকলের সঙ্গে একত্ববোধের মধ্যে ইহার পরিণতি হইয়াছে। পৃথকত্ব জ্ঞানের সঙ্গে একটি একত্ব জ্ঞান থাকিবেই, কিন্তু পৃথকত্ব জ্ঞান যেখানে প্রথম স্থান অধিকার করে সেখানে ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর যে জীবনে একত্বের জ্ঞানই প্রাথমিক, পৃথকত্বের জ্ঞান দ্বিতীয় কার্য্যকরী প্রতিনিধি, সেখানে সেইজন্যই ব্যক্তিত্ব বৃহৎ এবং সত্যের আলোকে উজ্জ্বল।"

কবির "কল্যাণ" শীর্ষক প্রবন্ধেও এই কথাই বলিয়াছেন :—"মানুষ যখন এই ভেদটাকে বড় করে, ঐক্যকে খর্ব্ব করে তখনি যত বিরোধ আর অমঙ্গল উপস্থিত হয়। জগতে যাঁরা মহাত্মা তাঁরা তাঁদের 'আমি'র মধ্যে সকল 'আমি'র ঐক্যটাকে বড় করে দেখেন। অতএব একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে 'আমি' কেবল ভেদকেই দেখে; সেই ভেদের মধ্যে ঐক্যকেও সে দেখে। সেই দেখাই সত্যকে দেখা, মঙ্গলকে দেখা, সুন্দরকে দেখা।"

ডাঃ ফ্রয়েড সমাজে শ্রেষ্ঠ অহং বিকাশের কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবে বলিয়াছেন,—"যে জনতাকে আমরা সর্ব্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শতশতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ।

* * * *

বড় জিনিস,—যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে, এই জন্য তাকে নিয়ে মানুষ অকর্ম্মক ভাবে থাকতে পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি, নিজের কল্পনা শক্তি দিয়ে নিয়তই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেননা বড় জিনিসের সঙ্গে তার যে প্রাণের যোগ কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায়, তেমনি তাদের প্রাণ দেয়।"

রবীন্দ্রনাথের ভূমা এবং ফ্রয়েডের শ্রেষ্ঠ অহং (super-ego) উভয়ই যে মূলতঃ একই ভাব হইতে উৎপন্ন তাহার প্রমাণ এই যে—ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে পিতামাতার ভাব লইয়াই শ্রেষ্ঠ অহং এর উৎপত্তি আর রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের "পিতাহনোসি" শ্লোক তুলিয়া ভূমার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২

ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যানুসন্ধান এবং রবীন্দ্রনাথের intuition বা অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যানুভূতির তারতম্য আমাদের নিকট তখনই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যখন সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানের সহিত আমরা তুলনা করি।

ডাঃ ফ্রয়েড সহজ ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন "যে মনোবিশ্লেষণ যদিও অনেক জিনিসের খবর দেয়, তথাপি সৌন্দর্য্য জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে খুব কমই খবর দেয়, এইটি একটি

দুর্ভাগ্য।"* কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভূমার দিক দিয়াই সৌন্দর্য্যানুভূতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"সৌন্দর্য্য হচ্ছে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়েই যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে "চেয়ে দেখ।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি তা'কে তাই বলি, বলি "তুমি আছ।" এই বার্ত্তাটিই তার সৌন্দর্য্য আমার কাছে উপস্থিত করলো সে যে সৎ, এইটি একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে।"

৩

ফ্রয়েড—Beyond The Pleasure Principle নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন মানুষ সুখ চায় বটে, কিন্তু জগতে তাকে চলিতে হইলে সুখ ছাড়াইয়া অন্য কিছুর দিক দিয়া চলিতে হয়। কিন্তু কোন পথে তাহাকে চলিতে হয়, সে পথটি কি, সে বিষয়ে তিনি কোন মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। ফ্রয়েড কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, কেননা ধর্ম্মকে তিনি 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন;—"যখন আমি বলি তা'রা (অর্থাৎ ধর্ম্মমতগুলি) মায়া, তখন আমাকে এই কথার অবশ্য একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। মায়া আর ভুল এক জিনিস নয়, বাস্তবিক পক্ষে মায়া যে ভুলই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

* * * *

মায়া যে মিথ্যাই হতে হবে তাহা নয়, অর্থাৎ কিনা মায়া এমন একটা জিনিষ যাকে বাস্তবতার দিক দিয়া পাওয়া যায় না, অথবা তাহাকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।"†

কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ আবার 'মায়া'কে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, বাস্তবের দিক দিয়া যাহাকে আমরা নামতা বা কড়া গণ্ডার অঙ্কের মত ঠিক ঠিক কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া লইতে পারি না, বিশ্লেষণের দিক দিয়া যাহা বুঝিতে যাওয়া নিরর্থক, কিন্তু তথাপি তাহার একটি সুপরিস্ফুট পরিপূর্ণ অর্থ আছে, যাহা আমাদের মন আপনা হইতে মানিয়া লয়, অর্থাৎ কবির ভাষায়,—

"না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।"

ভাবরাজ্যের যে সকল ছবি আমাদের মনে আসিয়া প্রতিবিম্বিত হয়, গল্পে উপন্যাসে উপকথায় চিত্রে অথবা ভাস্কর্য্যে যে সকল ভাব নিহিত, সেগুলি যখন আমাদের মনের অনুভূতিতে মূর্ত্ত রূপ ধারণ করে, বাস্তবের সঙ্গে হয়তো তাহার মিল থাকে না, কিন্তু তবুও সেগুলি এই কারণেই অসত্য নয় যে, সেগুলি মানবের মনোবিকাশের সহায়তা করে। মানুষ চায় চরম সত্য, চরম সৌন্দর্য্য, চরম মঙ্গল, কিন্তু মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, সে এ সকলের কাছাকাছি যাইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারে না। সেই জন্য আমরা আমাদের সেই প্রার্থিত চরমের যে আদর্শ দেখিতে পাই সে যেন একটা কুয়াসার মধ্যে দিয়া।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

ভূমাতেই আমাদের সুখ অল্পে আমাদের সুখ নাই। মানুষ বিকাশের পথে চলিয়াছে, এবং মানুষ ভূমার পথে চলিয়াছে। উপভোগ নীতির পথ ধরিয়া মানুষের চেতনা নানা দ্বন্দের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত বিকাশ লাভ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন আমাদের যে বিকাশ তাহা কেবল ব্যক্তিগত বিকাশ বা খণ্ড বিকাশ নয়। তাহা ব্যক্তিগত বিকাশ এবং অনন্ত বিকাশের সহিত অঙ্গীভূত বিকাশ। মানুষ চায় চরম, অল্পে তাহার তৃপ্তি নাই, ইহাই মানুষের বিশেষত্ব এবং ইহাই মানুষের মনুষ্যত্ব। উদ্ভিদের জীবন বা পশু-পক্ষীর জীবনের ন্যায় মানুষের জীবন প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া সহজভাবে বিকাশ হয় না। মানুষের জীবনের বিকাশ দুরূহ সমস্যার সমাধানে, দুঃসাধ্য সাধনে, দুর্ব্বহ বহনে এবং চরমতম দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবার মত শৌর্য্যের পথে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—মানুষ ভাব-জগতের অধিবাসী কেবল জড় জগতের অধিবাসী নয়। যাহাতে আমাদের খর্ব্বতা, আমাদের স্বল্পতা,—সেই সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ অনেক সময় আমাদের আরামের হইতে পারে—কিন্তু আনন্দ তাহাতে নাই। মানুষের আনন্দ সেই আত্মোৎসর্গে, যে আত্মোৎসর্গ নিজের স্বল্পতা হইতে—বৃহতের সহিত তাহাকে এক করিয়া দেয়। আমাদের আশা হয় যে ডাঃ ফ্রয়েডের Beyond the Pleasurs Principle এর সিদ্ধান্তের পরিণতি এইরূপভাবেই হইবে।

সরসীলাল সরকার

* Unfortunately, psycho-analysis too, has less to say about beauty than about most things.

Civilization and its Discontents (p. 39).

† When I say that they are illusions I must define the meaning of the word. An illusion is not the same as an error, it is indeed not necessarely an error; * * * * The illusion need not be necessarely false that is to say, unrealizable or incompattible with reality,

The Future of Illusion (p. 53 & 54)

অকারণ

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

অক্টোবর মাস শেষ হইতে আর ক' দিন-ই বা দেরি! রমেশ তখন সবেমাত্র আফিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডেস্কের চাবি খুলিয়া তাহার মধ্যে কাঁধের রেশমী চাদর আর টিফিন-বাক্সটা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল একটা জায়গায় কে যেন কি বলিতেছে আর অনেকে মিলিয়া তাহাকে চক্র-বেষ্টনে ঘিরিয়া তাহা শুনিতেছে।

এখনও সাড়ে দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি। সুতরাং সে হাজিরা বইয়েতে নাম সহি করিয়া আসিয়া সটান সেইখানেই দাঁড়াইল। বক্তা ষ্টোরসের রামতারণ বাবু। বক্তৃতাটি চলিতেছে রাজনৈতিক বিষয়ে নয়—দেশভ্রমণ বিষয়ে। রমেশ আকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ শুনিবার পর বুঝিতে পারিল গত বৎসর পূজার সময় রামতারণবাবু কারমাটার গিয়াছিলেনন তার-ই সবিস্তার বর্ণনা হইতেছে। সেই ছোট্ট সহর, রাণীগঞ্জ টাইলে-ছাওয়া লাল রঙের ছোট্ট বাড়ীগুলি, দূরে দিগন্ত-রেখার উপর হয়তো দু'একটা অস্পষ্ট পাহাড়, বালির মধ্যে পথ-হারাণ শীর্ণা একটা নদী, বাগানের ইউক্যালিপট্যাস্ গাছগুলির অশ্রান্ত ঝির ঝির রব প্রভৃতি কত কি!

রমেশ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেছে। ভাবের অজস্রতায় বুঝি ওর কণ্ঠ বুজিয়া আসে। একবার ঢোক্ গিলিয়া আবার শুনিতে থাকে। রামতারণবাবু বলিতে আরম্ভ করেন—"কি বল? এই ত' আমার হাতের কব্জি দেখচ, তিনটী হপ্তা যেতে না যেতেই তা ফুলে ইয়া মোটা হয়ে গেল—এমনি জল হাওয়ার গুণ। শুধু কি তাই! যা খাই, যখন যত ইচ্ছে খাই আর তার পর এক গ্লাস জল—ব্যস অমনি দুটো ঢেঁকুর সঙ্গে সঙ্গে হজম। আবার খেতে হত। দিনে অমন কম করে বার পাঁচেক না খেলে চলত না। সকালে বিকালে বেড়াই, সন্ধ্যে বেলা খোলা মাঠের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে গল্প করি—"

গল্প আর চলিল না। তখন সাহেব আসিয়া গিয়াছে। কাজেই যে-যার ডেস্কের দিকে অগ্রসর হইল।

সাড়ে পাঁচটার সময় রমেশ যখন আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ড্যালহাউসী স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তখন তার রামতারণবাবুর কারমাটার ভ্রমণের কথা মনে পড়িয়া গেল। বক্তা হিসাবে রামতারণবাবুর যে কোন বিশেষত্ব আছে এ কথা স্বীকার করিতে সে নারাজ। যে রকম এলো মেলো খাপছাড়া ভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন সে রকম ভাবে বোধ হয় না বলিলেই ছিল ভাল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁর বিবৃত বিষয়টুকু এখনও পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে রূপে রেখায় রঙীন হইয়া ছবির ন্যায় ভাসিতেছে।

বত্রিশ বৎসর বয়স হইলেও রমেশ আজ পর্য্যন্ত কলিকাতার বাহিরে দশ বিশ মাইলের বেশী কোথাও যায় নি। মনে পড়ে ই-আই-আর লাইনে সেই একবার গিয়াছিল ভদ্রেশ্বর, আর বি-এন-আর লাইনে বাউড়িয়া। ইহার পরিধির বাহিরে যে আর একটা বিচিত্র, বিপুলায়তন জগৎ রৌদ্র ও ছায়ায় নিত্য নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া পথিককে প্রলুব্ধ করিতেছে তার কাহিনী সে পুথিতেই পড়িয়াছে—মানসলোক হইতে স্খলিত করিয়া বাস্তবলোকে মুখোমুখী তাহার সহিত পরিচয় করিবার সুযোগ আর হয় নাই।···

এর জন্যে মাঝে মাঝে সে একটু ব্যথিত হয় কিন্তু—।

স্ত্রী শৈলও তাই। সেই ছেলেবেলায় কবে যে একবার বাপ্-মার সঙ্গে কাশী গিয়াছিল। কিন্তু তার পর কি আর বিশেষ কিছু মনে আছে? কিন্তু এখনও হয়তো একটু ভাবিয়া

বলিতে পারিবে সেই ওদের বাড়ীর সামনের প্রকাণ্ড মাঠটাতে ও ওর সমবয়সী বন্ধুদের সাথে ট্রেণ চলার অনুকরণে কেমন মুখে ঝক্-ঝক্…ঝক্-ঝক্ করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইত; আর মাঝে মাঝে গাছের তলাগুলো হইত ইষ্টিসান আর সেখান থেকে উঠিত যত কাঁচকড়ার পুতুল যাত্রী দল।…এ কথাগুলো আজকাল মনে পড়িলে তার হাসি পায়! তা পা'ক। কিন্তু এর বেশী আর কিছু সে মনে করিতে পারে না।

রমেশ কখন পাহাড় দেখে নাই এ কথা শুনিয়া বন্ধুরা হাসিত। তাদের মধ্যে কেহ কেহ খোঁচা মারিবার জন্য বলিত—ওহে এবার ছুটিতে কোথাও বাইরে বেরিয়ে পড়—একদম বিদেশ দেখনি! উত্তরে সে একটু হাসিয়া বলিত—হাঁ যাব। কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়ব একদিন।…

বাড়ী পৌছাইতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত পা ধুইয়া জল খাবার খাইয়া সে শৈলের নিকট রামতারণবাবুর গল্প করিতে লাগিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে তা শুনিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে বলিল—বাঃ বেশ তো চল না আমরাও কোথাও যাই। আমারও তো অম্বলের অসুখটা সারছে না—সেখানকার জল হাওয়ার গুণে সারতেও পারে।"

উত্তরে রমেশ বলিল—তা তো বুঝি, কিন্তু টাকা? পোষ্টাপিসে তো মাত্র একশ'টী টাকা জমেছে। তাও জমাতে পেরেছি তখন টিউসানি ছিল তাই; কিন্তু এখন তো আর তা হবার জো নাই।—

দশ বৎসর পূর্ব্বে গল্পের যবনিকা তুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে শৈল একটি চারুহাসিনী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে; চোখে মুখে কেমন একটা করুণ কোমল কান্তি। রংটা নেহাৎ ফর্সা না হইলেও ওকে কালো বলা চলে না; ও দুটোর মাঝামাঝি—সাধারণতঃ যেমন হয়। প্রথম যেদিন ও শ্বশুরবাড়ীর চৌকাটে আসিয়া পা দিল সেই দিন হইতেই সে এ বাড়ীটিকে আর শ্বশুর-বাড়ী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে নাই—এ যেন তার ছেলেবেলাকার সাজান একটি খেলাঘর, এর প্রতিটি অংশের সহিত তার অন্তরের আত্মীয়তা আছে।

শাশুড়ী সৌদামিনী বলিলেন—তুমি এবার সংসারের ভার নাও মা লক্ষ্মী আমি তীর্থ করে আসি।

কিন্তু মর্ত্ত্যের তীর্থে আর তাঁর যাওয়া হইল না তার পূর্ব্বেই কোন অজানা তারকার তীর্থলোকের নিমন্ত্রণে তিনি চলিয়া গেলেন।

সংসারে মাত্র দু'টি প্রাণী। রমেশ আর শৈল। দু'খানি শোবার ঘর ও একটি রান্নাঘর, ভাঁড়ার ওর মধ্যেই থাকে—এই নিয়ে ওদের সংসার। রমেশের একটি ভাই আছে—ভাই মানে আপনার ভাই। কিন্তু নিতান্ত হতভাগ্য সে। ছেলে বেলা হইতে কুসঙ্গে পড়িয়া আর লেখা পড়াও করিল না আর বাড়ীতেও থাকিল না। গাঁজা আর গুলির আড্ডায় গিয়া বাসা বাঁধিল। এখনও সে বাড়ী আসে না।…

শৈল এখন সংসারের গৃহিণী। পূর্ব্বের ন্যায় আর তন্বী নয়! একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে। মুখ চোখের ভাবও বুঝি হইয়া পড়িয়াছে একটু রুক্ষ—তা হোক' দুটো রুগ্ন ছেলে টানিতে টানিতে কার না হয়?

গল্পের পূর্ব্বে-পরিচয় এই।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিবার সময় রমেশ সিটি বুকিং আফিস হইতে একখানি ই-আই-আর টাইম টেবল কিনিয়া আনিয়াছে। সন্ধ্যার সময় জল খাবার খাইয়া ঘরে বসিয়া তার পাতা উল্টাইতেছিল। মেনলাইন বা তার আসে-পাশে যে-সমস্ত ষ্টেশন পড়ে তার প্রত্যেকটির নাম সে পড়িয়া গেল।

বর্দ্ধমান, অণ্ডাল, আসানসোল, মিহিজাম, জামতাড়া, কারমাটার, মধুপুর, গিরিডি, গয়া, দিল্লি—যতই পড়িয়া যাইতে লাগিল ততই তাহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। একবার ভাবিল যাইবে দিল্লি,—নাঃ দিল্লী নয়, পাঞ্জাব! কিন্তু তখনি হয়তো রেল ভাড়াটার কথা মনে পড়িল। তাই খনিকের মধ্যেই একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকিবার পর আবার পাতা উল্টাইতে লাগিল। এবার আর উপরের জায়গাগুলা না দেখিয়া টাইম টেবলের নীচের দিককার জায়গাগুলা দেখিতে লাগিল। মধুপুর—হাঁ মাঝামাঝি জায়গা। নেহাৎ মন্দ হইবে না। দেখিল সেখানে লেখা রহিয়াছে গিরিডির গাড়ী বদল করিবার স্থান। অমনি টাইম টেবলের গিরিডি ব্রাঞ্চ লাইনের পাতাখানি খুলিয়া বসিল। পর পর ষ্টেশনগুলির নাম পড়িয়া গেল। মধুপুর, জগদীশপুর, মহেশমণ্ডা, গিরিডি। গিরিডির নাম

সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল। এখানকার জল নাকি খুব ভাল—শৈলর অম্বল সারিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গেল সেই তো সেবার ওর বন্ধু বিমল তার স্ত্রী পুত্র লইয়া গিরিডি গিয়াছিল, না? হাঁ তার মনে পড়িয়াছে গিরিডি-ই তো! ওঃ ওর বৌটা কি মোটা হইয়া আসিয়াছিল। একদম চেনবার জো-টি নেই! কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার সময় ও-ই তো তাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। মা গো বৌটা ছিল কী বিশ্রী রকমের রোগা—যেন একটি সরল রেখা—দৈর্ঘ্য আছে শুধু, প্রস্থ নেই। কিন্তু দু'মাস বাদে যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে দেহে কী আতিশয্য—অস্থিসার বিশীর্ণ একটি তনু ঘিরিয়া যেন যৌবনের লীলা-পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে দিন রাত্রে শৈল যখন সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ সারিয়া আসিয়া রমেশের নিকট বসিল তখনও সে টাইমটেবল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। টাইমটেবলটা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—এ কি তুমি টাইম টেব্‌ল কিনে এনেচো যে! আমরা কালই যাচ্ছি নাকি?

খুসিতে রমেশ শৈলের দুহাত চাপিয়া ধরিল। আজ যেন ওর কণ্ঠস্বর ভাবের অজস্রতায় কূলে কূলে পুরিয়া উঠিয়াছে। একটি অপরিচিত নগরীর দর্শন কামনায় সে স্বপ্নোত্থিতের মতো উদাস…।

একটু কাশিয়া লইয়া সে বলিল—কাল যাব কিনা এ কথা বলে তুমি উপহাস কোরো না শৈল! সত্যই আমরা একদিন যাব, কিন্তু সে যাওয়ার একটা প্রতিবন্ধক আছে। টাকা কিন্তু ঐ একশোয় হবে না। আর কিছু চাই। তা জোগাড় করতে হবে আমাদের পরস্পরের স্বার্থত্যাগের দ্বারা বাজে খরচ কমিয়ে ফেলতে হবে। আমি আমার দিক থেকে কমাব খবরের কাগজ, মাসিক প্রভৃতি কেনা, অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়া, আর তোমার দিক থেকে তুমি কমাবে তোমার অকারণ কতকগুলো ছিট কিনে জামা তৈরী—

শৈল ঝাঁঝাইয়া উঠিল—বুঝেছি গো বুঝেছি। অর্থাৎ কিনা তুমি বলতে চাও একমাস ধরে এখন নির্জ্জলা উপবাস করে শুকিয়ে মর তারপর হঠাৎ একদিন পুরী মণ্ডার ভুরি ভোজন হবে। এই তো? না বাপু রইল তোমার দেশ-ভ্রমণ আমি ওতে নেই।

কথাটা শেষ করিয়া সে উঠিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ রমেশ তার আঁচল চাপিয়া ধরিল। এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়াই ছাড়িবে।……

ঠিক যুক্তি মত কাজ হইতেছে।

রমেশ আর আজকাল ট্রামে করিয়া আফিসে যায় না। সেই জন্য শৈলকে একটু সকাল সকাল রাঁধিয়া দিতে হয়। বলে—ড্যালহাউসি-স্কোয়ার কতটাই-বা! সে আর হেঁটে চলে যেতে পারব না? মাসিক বা দৈনিক কাগজ আর সে কেনে না। রাস্তায় বাহির হইলে যখন হকারেরা আসিয়া ধরে তখন যা-তা একটা বলিয়া দিয়া দায় খালাস হয়। কখন কখন তারা ঠাট্টাও করে। তা করুক, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। আর শৈলেরও কম বিপদ নয়! রেশমী চুড়িওয়ালী তো আজ তিন দিন ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রোজই বলে যে চুড়ি লইবে না, কিন্তু সে আসে রোজই! কিন্তু সবার থেকে বেশী দুঃখ হয় সাবান-তরল-আলতা প্রভৃতি বিক্রেতা সেই ছেলেটীর কথা ভাবিয়া। সেদিন দুপুর বেলা সে আসিয়া বলিল—মন্দাকিনী তিল তৈল নেবেন? এক শিশি দশ আনা, নতুন বেরিয়েচে বেশ মাথা ঠাণ্ডা থাকে। শৈল বলিল, না। ছেলেটী সে কথা শুনিয়া কি একটু ভাবিল তারপর বলিল—"দেখুন না হয় আপনি দু' আনা কম দেবেন। আজকাল আর আপনি আমার কাছ থেকে কিছু নেন না, অন্য লোকের কাছ থেকে নিচ্ছেন বোধহয়।" শৈল জানাইল তা নয়। আজকাল সে গন্ধ তেল মাখে না। কথাটা শুনিয়া ছেলেটি বলিল এ অঞ্চলটায় আর কেউ কিছু নেন না, যা আপনারা নিতেন সেইজন্যে অনেক দূর থেকে বলিতে বলিতে ওর মুখে কথা আটকাইয়া গেল। মুখখানা ভয়ানক রকম করুণ করিয়া আস্তে আস্তে সে চলিয়া গেল।

শৈল একবার ভাবিল একটা কিছু নেয়, কিন্তু কি করিবে সে নিতান্ত নিরুপায়।

রমেশ আজকাল প্রতিদিন রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট বসিয়া দেশ-বিদেশের গল্প করে। সে আজকাল বিভিন্ন দেশের কয়েকখানি 'গাইড-বুক' কিনিয়াছে। তাহা হইতে অনুবাদ করিয়া গল্পের আকারে সে শৈলকে পড়িয়া

শোনায়। শৈলর তাহা শুনিতে বেশ লাগে। সমস্ত দিনের কাজ ও কর্ত্তব্যের কচকচির পর বিশ্রাম সময়টীতে কোন একটি দূর দেশের গল্প তার নিকট রূপ-কথার মত মনে হয়। সেই ছোট্ট একটী বাড়ী, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত একটী প্রান্তর, মুক্ত প্রকৃতির অসহ দাপাদাপি। দূরে—বহু দূরে অস্পষ্ট একটি বন-লেখা, তারি উপর আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মায়ের সুগভীর মমতার মতো। শৈল এরূপ কত কি-ই ভাবিতে থাকে।

সংসার ঠিক চলিয়া যায়। নিরতিশয় নির্ব্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত এ পরিবারের দিনগুলি কাটিয়া যায়। কিন্তু প্রশান্ত আকাশের এক কোণে কাল-বৈশাখীর ঝড় যে একটি শান্তিময় নীড়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, তার খবর কে-ই বা রাখে। ·····

সেদিন রমেশ আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাদের বাড়ীর নীচের ঘরের ভাড়াটেদের ছেলেটি কোথা হইতে আসিয়া একেবারে তার পাশে দাঁড়াইয়াছে। 'কি খবর' জিজ্ঞাসা করিতে বলিল—আপনি আফিসে চলে আসবার পর থেকে ছোট খোকার বড় বমি হচ্ছে, বোধহয় কলেরা—বউদি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি একবার বাড়ী চলুন।

কথাটা শুনিয়া সে একবার নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইল। কি যে করিতে হইবে তাহা সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির করিতে পারিল না। শেষে একটু আত্মস্থ হইয়া সটান বড়বাবুর নিকট গিয়া সমস্ত জানাইল। কি জানি বিপদ শুনিয়া তিনি কেমন একটু নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—আচ্ছা যান, আমি আপনার কাজ সব ঠিক করে দেব'খন—তবে হ্যাঁ কাল একবার দেখা করবেন।

বড় বাবুর সহিত কথা শেষ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সে বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিল সত্যই! শৈল একা মেয়ে মানুষ তাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তখনি তাকে ডাক্তার বাড়ী ছুটিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া ইন্‌জেকসন দিতে আরম্ভ করিলেন। নেহাৎ বরাৎ তাই সন্ধ্যার মধ্যেই রোগ অনেকটা কমিয়া আসিল। ছেলেটা চোখ খুলিল, কথা বলিতে আরম্ভ করিল। এ যাত্রা বাঁচিল বটে কিন্তু এই নিয়ে চলিল তিন মাস। রমেশের আর নাওয়া খাওয়ার স্থিরতা নাই। সব দিন শৈল ঠিক সময় মত রাঁধিয়া দিতে পারে না, সেইজন্য খাওয়া হয় না। এক একদিন অভুক্ত অবস্থাতেই আফিস করিতে হয়। ঘর সংসার লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গেছে। কিন্তু তিনটি মাস পরে দেখা গেল যাহা কিছু জমিয়াছিল তা তো সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে বরং আরও বিশ টাকা ওষুধের দোকানে ধার হইয়া গেছে।

এ বিষয়ে আর কাহারও অনুযোগের কিছু নাই!

দিন যায়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেমন করিয়া কাটিয়া যায়। পূর্ব্বেকার সে নেশা মাঝে একটু কমিয়াছিল বটে কিন্তু আবার তা ঘাড়ে চাপিয়াছে। আবার অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা চলিয়াছে পূর্ব্বের মতন। এবার কিন্তু এটা অনেকটা ধাতস্থ হইয়া গেছে। বাজে খরচ আর আজকাল চেষ্টাকৃত সংযমের দ্বারা বন্ধ করিতে হয় না। ও দেখিলেই সে নিজেকে থামাইতে পারে। কোনটা বাজে কোনটা কাজের এ চেনবার মত শক্তি তার আসিয়াছে।

* * * *

সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠিবার পর হইতেই শৈলর মনটা কেমন খুসীতে ভরিয়া গিয়াছে। যে কাজ-ই করিতে যায় তাই ওর ভাল লাগে। বাতাসে পর্য্যন্ত বুঝি কিসের মধুর স্পর্শ লাগিয়াছে আজ। সকাল হইতে সে রমেশের সঙ্গে এমন দু'টা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে যে ওর মত দুটী সন্তানের জননীর পক্ষে না করিলেই ছিল ভাল।

রমেশ আফিসে চলিয়া যাইবার পরও ছেলে দুটিকে লইয়া খেলা দিতে বসিয়াছে। ও দরজার পাশে লুকাইয়া বলে 'টু!' মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া বাঘের অনুকরণে মুখ হাঁ করিয়া বলে 'হালুম!' তারপর ছোট মেয়েটীর মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কুটো-কুটি হইয়া পড়ে। ছেলে দুটিকে কোলে করিয়া পর পর হাজারো চুমায় বিরক্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।··

…ঠিক এমনি সময় একজন আগন্তুক উপরে সটান উঠিয়া রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈল তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়াই ঘোমটা নামাইয়া বলিল—ওমা ঠাকুরপো! একবারে চেনবার জো-টি নেই! মাগো এর মধ্যে কতো বড়োটি হয়ে গেছ! দেখলে ঘোমটা টানতে হয় বটে।

'ঠাকুরপো' নাম ধারী যে ব্যক্তিটি এই মাত্র আমাদের গল্পের আসরে আসিয়া মাথা গলাইল সে রমেশের আপনার ছোট ভাই। তার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি।…

…কিন্তু ঠাকুরপোকে শৈলর বড় ভাল লাগিল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে যেন এ বাড়ীর-ই একজন হইয়া গেল। ছেলেদের লইয়া আদর করিল, শৈলর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া তার কাজের কতো সহায়তা করিয়া দিল। বলিল—ব্যবসার কাজে কলকেতা এসেছিলুম বৌদি, তোমরা আপনার লোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাব না?

শৈল তখনিই নীচের ঘরের ভাড়াটেদের ছেলেকে কিছু কবলাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিল। ভাল মাছ আনাইয়া খাওয়াতে হইবে তো?

যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের পর শৈল রমেশের ঘরের মধ্যে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া দিল। বলিল দুপুর বেলা একটু গড়িয়ে নেবে তো ঠাকুর পো?

দিবা নিদ্রা সারিয়া যখন সে বাহিরে উঠিয়া আসিল তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। মুখ হাত ধুইয়া বলিল—এবার আসি বৌদি—ব্যবসার কাজে একবার একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শৈল বলিল—সে কি, তা কি হয়? তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হোল না? এত দিন বাদে এলে একদিন আর থেকে যেতে নেই। এখন অবশ্য বড়-সড় হয়েচো।

—না বৌদি সে আর হয় না আজ বিশেষ দরকার। আবার যেদিন আসব সেদিন থেকে যাব। বলিয়া ও শৈলর পায়ে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় সময় রমেশ ফিরিয়া আসিলে শৈল সমস্তই বলিল। রমেশ কিন্তু এ ব্যাপারটা আনন্দের সহিত লইল না। বলিল—সেরেচে! আপদটা আবার এসেছিল, কিছু মেরে নিয়ে যায় নি তো? যে হাতটান! শৈল বলিল—সে কিগো অমন কথা বলো না—অমন বিনয়ী, অমন মিশুক।

প্রত্যুত্তরে সে কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল। হঠাৎ তার নজর পড়িল চৌকির উপর পর পর বসান ট্রাঙ্কগুলোর দিকে। সবার থেকে নীচের যেটি সেটির উপর নজর পড়িতেই সে দেখিতে পাইল তার হাঁসকলটা যেন কিসের চাড়া দিয়া খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। তালাটি হেলিয়া পড়িয়াছে। সে কি! ওরি মধ্যে যে রমেশের জমান টাকাগুলি আছে! ওর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তখনি একটির পর একটি ট্রাঙ্কগুলি নামাইয়া ফেলা হইল। উপরেরগুলি নামাইতেই নীচের ট্রাঙ্কটীর ডালাটি ফস্ করিয়া খুলিয়া গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে কাপড়ের ভাজের মধ্যে হাতড়াইতে লাগিল। শেষে নিরাশ হইয়া ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করিয়া দিল। সব কটি টাকাই মারা গিয়াছে।

শৈলর আর মুখে ভাষা যোগাইতেছিল না। অমন একটা কুশ্রী, কুটিল জীবনকে ঐরূপ একটা করুণ আবরণ টানিয়া যে প্রতিনিয়ত লোকে পরস্পরকে ঠকাইতেছে তা সে প্রথমে ভাবিতে পারে নাই। তাহারি দোষে আজ এ বিভ্রাট ঘটিল। আবেগের আতিশয্যে ওর অন্তরের সমস্ত অশ্রু আজ চোখের পাতায় ভিড় করিয়া আসিল।

রমেশ তখনও মাথায় হাত দিয়া মেঝেয় বসিয়া আছে। যেন ক্রূর বিধাতা ঐ ক'টি টাকার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি নর-নারীর মুখের ভাষাটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন।

রমেশ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ উঠিয়া বলিল—নাঃ দিয়ে আসি রাস্কেলের নামে একটা ডায়েরী করে।

শৈল তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ছিঃ তাকি করে! আপনার ভাই! আমার-ই দোষে তো ওরকম হল। আমি ওকে ওখানে না বসালে পারতুম্।…

রমেশ আপনার মনে কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না।

আবার পরদিন অফিসে যাইতে হইল। বন্ধুদের সহিত ঠাট্টা ইয়ার্কি দিতে হইল—সমস্তই করিতে হইল। কিন্তু

এরূপ বৈচিত্র্যহীন জীবন আর তার ভাল লাগে না। সবেতেই কেমন নিরুৎসাহ ভাব। এক একদিন অফিসের কাজে ওকে হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে হয়। তখন আবার পূজার ছুটি আসিয়াছে। কত লোকে আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া বিদেশে যাইতেছে। তাদের চোখে মুখে কী অসীম উৎসাহ! পথে চলিতে চলিতে এক-একবার নজরে পড়ে ট্যাক্সিতে সুটকেশ, বেডিং প্রভৃতি ঝুলাইয়া কত লোকে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যাইতেছে। তাদের দেখিয়া ওর কত কি মনে হয়। ওর মনে হয় ও হয়তো একদিন স্ত্রী পুত্র লইয়া অমনি করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতে পারিত কিন্তু—

পথে পথে চলিতে চলিতে ও একবার দাঁড়াইয়া পড়িল। ওর বেদনাতুর চোখ দুটী হইতে দু ফোঁটা অশ্রু নামিয়া আসিল। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া চোখ দুটো মুছিয়া লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কাহার সহিত দেখা হইয়া গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইত বটে!···

ইহার পর পাঁচটা বৎসরের বিস্তীর্ণ ব্যবধান—।

রমেশ এখন আফিসের ভাল একটি পোষ্ট পাইয়াছে। মাহিনাও তার এখন কুড়িটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। এর মধ্যে টাউসনিও আসিয়া গিয়াছে একটা। এবারও প্রতিবারের মত পূজার ছুটি আসিয়াছে। এবার সত্যই ওরা বাহিরে যাইবে। রমেশের এক বন্ধু গিরিডিতে থাকে—সে সেখানে বাড়ী ভাড়া করিয়া গিয়াছে। ভাড়ার টাকাও অগ্রিম পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে একটি দিন আছে—আগামী পরশু ওরা বাহির হইবে। টিকিটও কেনা হইয়া গিয়াছে। রমেশের আজও আফিস আছে—আজ হইয়া তবে বন্ধ হইবে।

শৈল আজ সমস্ত দুপুর ধরিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া, নীচের ভাড়াটের মেয়েটীর সহিত গিরিডির গল্প করিয়া কাটাইয়া দিল। যতই বেলা পড়িয়া যাইতে লাগিল ততই সে রমেশের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। সে আসিলে সকাল সকাল খাওয়ার পাট মিটাইয়া তবে আবার গোছ করিতে বসিবে। তার আজ অনেক কাজ - তার কি বসিবার ফুরসুৎ আছে!

কিন্তু সন্ধ্যার সময় রমেশ এক-গা জ্বর লইয়া আফিস হইতে ফিরিয়া আসিল। উপরে উঠিয়া আসিয়া সটান বিছানার উপর শুইয়া চাদর টানিয়া দিল। একটিও কথা বলিতে পারিল না – জ্বরে তখন তার হাড় পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে!

গভীর রাত্রে শৈল রমেশের মাথায় জল-পটি দিতে দিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে যেন শীঘ্রই সে সারিয়া উঠে—তা না হইলে সমস্ত টাকাগুলিই পণ্ড হইয়া যাইবে। রমেশ তখন বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখে যেন তারা ট্রেণে করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে কোন একটি নগরের তেপান্তরের মাঠ বাহিয়া যেন ওদের ট্রেণ চলিতেছে—দূরে দিগন্ত রেখার উপর অস্পষ্ট পাহাড়গুলো মেঘের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটি নাম-না-জানা নদী! এরই মধ্যে হয়তো একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামে। একবার 'পান বিড়ি সিগ্রেট' 'হিন্দু-চা' 'পুরী মিঠাই' প্রভৃতির হাঁকাহাঁকি সুরু হয়। তারপর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়ে। আবার গাড়ী মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, ঝক্-ঝক্···ঝক্-ঝক্···ঝক্-ঝক্···কোন্ অসীমের উদ্দেশে সে চলে কে জানে!—

অমিয়কুমার ঘোষ



য়ুরোপীয়ানা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

রেজির সঙ্গে আমার আলাপ একটা পুরোণো বইয়ের দোকানে—প্যারিসে। রু স্যাঁলাভার থেকে পশ্চিম মুখে একটা গলি বেরিয়েছে, তারই মধ্যে এক ইহুদির পুরাতন খেয়ালি জিনিসের দোকান, বই-ও আছে। একটা পুরোণো বইয়ের উপর দুজনেরই নজর প'ড়েছিল। রেজির কিসের জন্যে জানি না, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল বইখানার চামড়ার উপর কাজ করা বাঁধাই—ভেনিসের একটা বিশিষ্ট পুরাতন শিল্পের নিদর্শন। ভিতরের ল্যাটিনের সঙ্গে রেজির হয়ত পরিচয় ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু বইখানা উভয়পক্ষের শিষ্টাচারের পর শেষ বরাবর আমারই ভাগ্যে প'ড়ল। বোধ হয় বিদেশী ব'লেই। আমার ফরাসী কইবার চেষ্টায় রেজি বুঝেছিল আমি আর যাই হই, ফরাসী প্রজা নই এবং তার ফরাসী ব্যাকরণশুদ্ধ হ'লেও সে যে ইংরেজ তা' তার উচ্চারণ পদ্ধতিতেই বুঝে নিয়েছিলুম। রাস্তায় বেরিয়ে জানলুম আমরা দুজনে এক হোটেলেই আছি। পরদিন ডোভারের পথে রেজির সম্যক্ পরিচয় পেলুম।

সে পরিচয়টা গোড়াতেই দিয়ে দিই। কেননা বিলাত সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই হবে রেজির কথার অনুবাদ মাত্র। সেইটেই হবে আমার পক্ষে শুধু সহজ নয়, শোভনও এবং তা' বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের কাছে নিতান্ত মামুলি ব'লে নাও বোধ হ'তে পারে।

রেজির বংশোপাধির সঙ্গে আমার পাঠকবর্গের কোন প্রয়োজন নেই। তার গোড়াকার নামটা হ'চ্ছে Reginald, সেটাকে কুঁচ্‌কে হ'য়েছে Reggie অথবা রেজি। লণ্ডন সহর থেকে কিছু দূরে তাদের বাড়ী, বাড়ীতে তার বিধবা মা এবং প্রায় সমবয়সী এক অবিবাহিত বোন আছেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় পরে হবে। রেজির বয়স ত্রিশ, কিছু কম হ'তে পারে, কিছু বেশীও হ'তে পারে। পাব্‌লিক স্কুল এবং অক্স্‌ফোর্ডের ছাপ তার কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণে এখনও বর্ত্তমান যদিও সে বছর সাতেক আগে ডিগ্রী না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ ক'রেছে। তার পর গুটিকয়েক বন্ধুর সঙ্গে মিলে এক মাসিক পত্রের উদ্বোধন—বিশ্ব-সমাজকে ভেঙ্গে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে। যেমন হ'য়ে থাকে, বছর দুই পরে উৎসাহ এল নিবে, সমাজ যেমন ছিল তেমনিই রইল এবং কাগজ তুলে দিয়ে রেজি বেরুল দেশ পরিভ্রমণ ক'রতে। সে য়ুরোপ—আমেরিকার প্রায় সমস্তটাই অবসর মত ঘুরেছে। সম্প্রতি চীন, জাপান বেড়িয়ে, ফেরবার পথে ভারতবর্ষে সপ্তাহ তিনেক কাটিয়ে এসেছে। বোম্বাই কলিকাতায় কিছুদিন এবং কিছু বেশী দিন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে তার এক সতীর্থ গন্দ জাতির সেবার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই খাদি-পরিহিত অক্সফোর্ড্-পাদ্রী মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুগত ভক্ত এবং সবরমতীর অনুকরণে মধ্য-প্রদেশে এক আশ্রম খুলেছেন। সম্প্রতি এঁকে নিয়ে একটু রাজনৈতিক গোলযোগ হ'য়েছিল তা' হয়ত 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের মনে থাকতে পারে। রেজি তাঁর প্রশংসায় শত-মুখ, কিন্তু নিজে ওরূপ জীবন যাপনে প্রস্তুত নয়—তা' বিশ্ব-সমাজ রসাতলে যাক্ না কেন। আসল কথা রেজি পুরো-মাত্রায় ভাব-বিলাসী এবং তার অবস্থার স্বচ্ছলতায় সেটা কোন রকমে মানিয়ে যায়। তার দৃষ্টি স্বপ্ন-বিভোল যদিও তার দেহ সুগঠিত এবং মনের দৃঢ়তাও কম নয়।

রেজির সঙ্গে আলাপটা লৌকিকতার স্তর ভেদ ক'রে ঘনিষ্ঠতায় পৌছতে বেশী সময় লাগে নি। সেটা রেজিরই গুণে। তাকে আমার খুবই ভাল লাগে, তার সম্বন্ধে একটা সত্যি-কারের স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করি এবং তার চোখ দিয়ে বিলাতী সমাজ তথা বিশ্বসমাজ দেখতে আমার মন্দ লাগেনা যদিও সব সময়ে তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না।

রেজির সতীর্থ পাত্রীটীর সঙ্গে আমার বোম্বাইয়ে দেখা হ'য়েছিল—দীর্ঘ দেহ খদ্দরের আলখাল্লায় আবৃত, পায়ে চপ্পল, অনাবৃত শির এবং মুখে শিশু-সুলভ সারল্য, বয়সে তরুণ—রেজিরই সম-বয়সী। তিনি সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন, রেজীর বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হ'তে প্রথমটা চিন্‌তেই পারিনি কেন না তাঁর পরিধানে ছিল সাধারণ ইংরাজ ভদ্রলোকের পোষাক—একটু এলোমেলো, তা'হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব'ললেন, এগুলোর প্রত্যেকটা আমার কোন না কোন ভারতীয় বন্ধুর দেওয়া। জাহাজে অবধি খদ্দর প'ড়েছিলেন, কিন্তু য়ুরোপে পদার্পণ করা অবধি এই পোষাকই চ'লেছে এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন তার জন্যে এই সাধারণ অনুমোদিত পোষাকই প্রশস্ত। রেজিও সে কথার অনুমোদন ক'রলে, ব'ললে, সকলেই তো আর মহাত্মা গান্ধী নন্। তিনি যে পোষাকে রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রেছেন, তা' শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ইতিহাসে ও-রকম দৃষ্টান্ত নেই।

সেটা কিন্তু রেজির ভুল। ষোড়শ লুই-এর দরবারে ফ্রাঙ্ক্‌লিন যে পোষাক প'রে উপস্থিত হ'য়েছিলেন এবং তা' নিয়ে যে সব কথা উঠেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ইতিহাসে সে সবের সঠিক বর্ণনা আছে। তবে ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন ঠিক মহাত্মার মত শুদ্ধ কটিতটাবৃত, কম্বলাচ্ছাদিত নগ্নপদ ছিলেন না এবং তিনি এসেছিলেন আমেরিকার দূত হিসাবে, ফরাসী রাজ্যের প্রজা হিসাবে নয়। তবে সে সময়কার ফরাসী রাজ-দরবারের কঠোর আদব-কায়দার কথা ভাবলে মনে হয় ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের তেজ মহাত্মারই সমজাতীয়।

দেশে থাকতে শুনেছিলুম ইংরাজ জাত পোষাক সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন—যাকে বলে clothes-Conscious, য়ুরোপের অন্য জাতের সঙ্গে তুলনায়। রেজি বলে, সে সব দিন আর নেই, রাস্তায় দেখনা, নগ্ন-শির ফতুয়া বিরহিত ভদ্রলোকের সংখ্যা বড় কম নয়। এটা অবশ্য গ্রীষ্মকাল, কিন্তু এই থেকেই বুঝতে পারবে, হাওয়া কতকটা ব'দ্‌লে গেছে। বাড়ীতে ডিনারের সময় আমরা পোষাক বদল করিনা তা'তো দেখেছ, আর আহারের পর থিয়েটারে যাবার জন্যেও সান্ধ্য-পোষাক প'রতে হয় না। তবে অবশ্য জায়গা বিশেষ এবং সময় বিশেষের তারতম্য কিছু না কিছু আছেই এবং তা' কিছুকাল থাক্‌বেও। তোমাদের দেশে শুধু লাট সাহেবরাই চিম্‌নি টুপি আর ফ্রক্‌কোট পরেন, এখানেও জেনো তাই।

রেজির কাছে আরও শুন্‌লুম, যুদ্ধের আগে ভদ্র ব'লে পরিচিত হ'তে গেলে এক হাতে বেত্র এবং অপর হাতে দস্তানা বহন ক'রতে হ'ত। বেত্রের রেওয়াজ বহুকাল উঠে গেছে, তবে দস্তানা বহন-ধারণ নয়—এখনও অনেককে ক'রতে দেখা যায়। রেজি নিজেও তাই করে, দোহাই দেয় অভ্যাসের, তবে অভ্যাসটা এখন শিথিল হয়ে আস্‌ছে। পরিপাটী ক'রে মোড়া ছাতা এখন বেত্রের স্থান নিয়েছে—তবে সেটা ঋতু বিশেষে, সব সময় নয়। নরম ফেল্ট্-হ্যাটের চলন সর্ব্বত্রই, তবে রেজি বলে, (Bowler) বৌলার সম্বন্ধে ইংরাজ জাতের একটু দুর্ব্বলতা আছে—ওটা তারা কথনো একেবারে ত্যাগ ক'রবে কিনা সন্দেহ—যদিও ওটা মোটেই শোভনীয় নয়। রেজি নিজে থাকে লণ্ডনের এক সমৃদ্ধ সহরগুলিতে—জনবিরল স্বাস্থ্যকর জায়গা এবং respectability-র অমোঘ দুর্গ। সেখানেই এইভাব—মফঃস্বল, বিশেষ ক'রে সমুদ্র তীরবর্ত্তী সহরগুলোর ভাব এই থেকেই আন্দাজ ক'রতে পারা যাবে।

সমুদ্রতীরে মেয়েরা বেড়ায় (Beach) বীচ্ পায়জামা স্যুট্ প'রে। আমার চোখে ভালই লাগে। হাঁটু খোলা স্কার্টের সঙ্গে তুলনায়, এই ঢিলে পায়জামা মোটেই অশোভন নয়। রেজির চোখে কিন্তু এ-পোষাকটা নিতান্ত বিদেশী-বিদেশী ব'লে ঠেকে। অথচ আশ্চর্য্য, আমাদের দেশের মেয়েদের পোষাক রেজির চোখে এত ভাল লাগে যে সে সব জাতের মেয়েদের মধ্যে ওই পোষাক চালিয়ে দিতে চায়। এদের মেয়েদের স্নানের পোষাক আমাদের অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু স্নানের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ও পোষাক পরবার সার্থকতা কি—যেমন জাহাজের ডেকে কারণে-অকারণে—তা' রেজিকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। রেজির মন্তব্যটা একেবারে Cynical ধরণের, অর্থাৎ সে নিজেও ওর কোন কারণ খুঁজে পায় নি। পুরুষদের স্নানের পোষাকের বুক-

পিঠ খোলা থাকবে কিনা, তাই নিয়ে কাগজে এখন ঘোরতর আন্দোলন চ'লেছে। মেয়েদের রৌদ্র-স্নানের পোষাক সম্বন্ধে রেজি এবং আমি একমত—যদিও বিভিন্ন কারণে। আমার ভাল লাগে না, ও পোষাকটায় সত্যই শালীনতার অভাব আছে ব'লে; রেজির ভাল লাগে না ওটাতে মার্কিনী ছাপ আছে ব'লে। পোষাকটাকে পোষাক বলা চলে না—কটিতটে মাত্র একটা পাতলা জাঙ্গিয়া—সত্যই জাঙ্গিয়া এবং বক্ষাবরণ যতটুকু না হ'লে নয়—কাঁচুলির চেয়েও স্বল্পায়তন—পিঠের দিকে দুটো ফিতে দিয়ে জাঙ্গিয়ার সঙ্গে আঁটা। আর সব খোলা। তবে রৌদ্র-স্নানের বাতিকটা সার্ব্বকালিক নয়, এই যা রক্ষা। রেজি বলে, ওটা সার্ব্বজনীনও নয়, যারা একটু বেশী স্মার্ট ব'লে পরিচিত হ'তে চায়, ওটা তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ।*

পোষাক সম্বন্ধে ইংরাজ পুরুষরা একটু ভীরু স্বভাবের। মেয়েদের মত হঠাৎ কিছু বদল করবার সাহস নেই। যা' কিছু এরা বদলাচ্ছে, তা' অতি সাবধানে, অতি ধীরে ধীরে, চারদিক চেয়ে। এরা বড্ড বেশী respectable, সেই জন্যেই "পরিহসিত" হবার ভয়টা মন থেকে দূর ক'রতে পারে না। রেজি বলে, এই respectabilityটাই তোমাদের দেশে prestige-এ রূপান্তরিত হ'য়েছে। তোমাদের দেশের গ্রীষ্মঋতুর সঙ্গে আমাদের পোষাকটা যে মানিয়ে নিতে পারি নি, তার মূলে হ'চ্ছে আমাদের এই সঙ্কোচ-মনোভাব। এ বিষয়ে আলোচনা হ'য়েছে অনেক, কিন্তু কাজ এগিয়েছে অল্পই।

* হাইড্ পার্কে এখন স্ত্রীপুরুষের মিলিত স্নানের ব্যবস্থা হ'য়েছে—লেবার গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে ল্যান্সবেরি 'খুড়ো'র উদ্যোগে। মার্গারেট লোয়েন ফেন্ট নাম্নী এক প্রসিদ্ধ মহিলা ডাক্তার কাগজে সম্প্রতি প্রচার ক'রেছেন যে শীঘ্রই তিনি একদল নরনারীকে নিয়ে হাইড্ পার্কে স্নানের পর নগ্ন দেহে বিচরণ ক'রবেন—রৌদ্র, আলো এবং বাতাস সেবনার্থে। তিনি জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সের দোহাই দিয়েছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে এই nudist cult চ'লবে ব'লে কেউ-বিশ্বাস করে না যদিও লণ্ডন সমাজ উৎসুক হ'য়ে আছে তামাসা দেখবার জন্য।

বোম্বাই-এর তরুণের গান্ধীটুপির নীচে "গাড়োয়ানী" ধরণের ছাঁটাচুল এবং দাঁত মাজবার বুরুশের মতন গোঁফ রেজির চোখে বড়ই বিসদৃশ ঠেকেছে। তার সঙ্গে তুলনায় বাঙ্গালী তরুণের গুম্ফ শশ্রুহীন সুকুমার মুখশ্রী, নগ্নশির, ইতালীর ধরণের ছাঁটা চুল রেজির বড়ই ভালই লেগেছে। কিন্তু আমাদের আটপৌরে ধুতি পরবার ভঙ্গীর সঙ্গে কাবুলি-ওলার ঢিলে ইজেরের তারতম্য তার চোখে ধরা পড়ে নি। আর ধুতির সঙ্গে গলাখোলা শার্ট এবং ইংরাজী কোর্ত্তার মিশ্রণ কারুর চোখে মোটেই শোভন লাগতে পারে না। কোঁচানো ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-লপেটার সৌন্দর্য্য তাকে স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে, কিন্তু তার সার্থকতা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নি। সে বলে, ও পোষাকটা কাজের উপযোগী কিছুতেই হ'তে পারে না। অথচ তার মতে সার্ব্বভৌমিক পোষাকের পরিকল্পনা ভারতবর্ষ থেকেই আসবে। মেয়েদের পোষাক তো নিশ্চয়ই, পুরুষদের পোষাকও বটে। পুরুষের পোষাক হবে—আঁট পায়জামা (চুড়িদার নয়) শেরওয়ানি এবং গান্ধীটুপি (খদ্দরের না হ'লেও চ'লবে)। সে এ-বিষয়ে একটা মস্ত নোট লিখে তার মাতুলের কাছে পেশ ক'রবে ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে। ব'লতে ভুলেছি, তার এক মাতুল লীগ্ অফ্ নেশন্সের Intellectual Co-operation বিভাগের একটা শাখার উপ-সভাপতি।

আমাদের আলোচনা যতক্ষণ চ'লছিল রেজির ভগ্নী ঈডিথ্ চুপ ক'রে ছিল। এতক্ষণে ব'ললে—এইবার লীগ্ অফ্ নেশন্সের সার্থকতা যে কোথায় তা' প্রমাণিত হবে। তবে আমেরিকা লীগে যোগদান না ক'রলে এ-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হ'বে না। ততদিন যে যার খেয়াল-মাফিক পোষাক পরুক আর লীগ্ অফ্ নেশনস্ যত আজগুবি ছোট খাট সমস্যার মীমাংসা ক'রতে থাকুক।

এটা হয়ত ঈডিথের পরিহাস; কিন্তু তার মুখে গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল না।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ছন্দ-ধন্ধের নিরসন

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রায়' 'ছন্দ-ধন্ধ' ও 'ছন্দ-রণ' নামক দুইটি রচনায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক মহাশয় বাংলা ছন্দ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ছন্দ লইয়া কতদূর আলোচনা করিয়াছেন জানি না. কিন্তু তাঁহার প্রশ্নে বুঝিলাম যে বাংলা ছন্দের কয়েকটি স্থূল তথ্য লইয়াই তিনি ধাঁধায় পড়িয়াছেন। তিনি যদি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৮ সনের ১ম ও ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩৩৯ সনের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' ও 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ কয়টি পড়িতেন তবে তাঁহার সমস্ত প্রশ্নেরই সমাধান সেখানে পাইতেন। যাহা হউক একই কথার পুনরুক্তির দোষ হইলেও সেই প্রবন্ধগুলি হইতেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ধন্ধ নিরসনের চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ, বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রাছন্দ কিনা এই সম্বন্ধেই তিনি গোলমালে পড়িয়াছেন। নানা ভাষায় নানা প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্ম্ম নানাবিধ; প্রত্যেক ভাষাতেই দেখা যায় যে বাগ্‌যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসারে এক এক জাতির ছন্দ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। বাংলা প্রভৃতি কতকগুলি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি quantitative equivalence বা মাত্রা সমক-ত্ব। ছন্দের এক একটি বিভাগ বা পর্ব্বের পরস্পর সমতা দ্বারাই বাংলা ছন্দের ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। এই তত্ত্বটি এত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে শৈলেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতের উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যদি একটু স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিতেন তাহা হইলে নিজেই ইহা ধরিতে পারিতেন। Syllable সংখ্যার মিল না থাকিলেও বাংলায় পর্ব্ব পরস্পর সমান হইয়া থাকে ইহা ত সকলেই জানে। তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। পয়ার জাতীয় (তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে-ও ত syllable সংখ্যার মিল না থাকিলেও দুইটি পর্ব্ব পরস্পর সমান হইয়া থাকে। তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দেও যে syllable সংখ্যার মিল না রাখিয়া দুইটি পর্ব্ব পরস্পর সমান হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমি আষাঢ় মাসের 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে দিয়াছি।

৩ | ৪ | ৪ |
রাজপুত্তুর | যাচ্ছে মাঠে ; এক্‌লা ঘোড়ায় | চেপে

ছন্দের হিসাবে রাজপুত্তুর = যাচ্ছে মাঠে = এক্‌লা ঘোড়ায়, যদিও 'রাজপুত্তুর' শব্দে ৩ syllable এবং 'যাচ্ছে মাঠে' 'এক্‌লা ঘোড়ায়' এই দুইটি পর্ব্বের প্রত্যেকটিতে ৪ syllable শৈলেন্দ্র বাবু একটু পরিশ্রম করিলেই এইরূপ বহু উদাহরণ প্রাচীন ছড়ায় এবং বর্ত্তমান যুগের স্বরবৃত্ত ছন্দে খুঁজিয়া পাইবেন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত কোনটির নিয়ম মানে না এরূপ বহু কবিতা আছে, সেখানেও এ কথা খাটে।

দ্বিতীয়তঃ, মাত্রা শব্দের তাৎপর্য্য কি তাহা লইয়াই তিনি গোলমালে পড়িয়াছেন। তাঁহার রচনা দুইটি পড়িয়া বোধ হয় যে মাত্রার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারার জন্যই তিনি গোলোক ধাঁধায় ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছেন। ছন্দের হিসাবের যে unit, যাহার দ্বারা কবিতার পর্ব্বের দৈর্ঘ্য মাপা হইয়া থাকে তাহারই নাম মাত্রা। মাত্রা সম্বন্ধে প্রবোধ বাবু ও শৈলেন বাবু উভয়েই অনেকটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন মনে হইতেছে।' মাত্রা অর্থে অবশ্য কাল-পরিমাণ বুঝায়, কিন্তু ছন্দের কাল পদার্থবিজ্ঞানের কাল অর্থাৎ বিষয়-নিরপেক্ষ (objective) কাল নহে. কালমান যন্ত্রে ইহা ঠিক্ ধরা পড়ে না। কেবল বাংলায় নয়, সমস্ত ভাষাতেই ইহা সত্য।

য়ুরোপ ও আমেরিকার Kymograph প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। "syllableর উচ্চারণের নিমিত্ত বাগযন্ত্রের প্রয়াসের উপর মাত্রা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে মাত্রাবোধ জন্মে।···মাত্রার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে। বিশেষ বিশেষ স্থলে উচ্চারণের প্রয়াসের কাল অনুসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,—কোনটি হ্রস্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি প্লুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু ছন্দের মাত্রার কাল ঠিক্ উচ্চারণের নিরপেক্ষকালের অনুপাতের উপর নির্ভর করে না। উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক syllable মাত্রই পরস্পর সমান নহে, এবং হ্রস্ব বা একমাত্রিক syllable মাত্রই পরস্পর সমান নহে, কিম্বা যে কোন দীর্ঘ syllable যে কোন হ্রস্ব syllableর দ্বিগুণ নহে। মাত্রাবোধের জন্য ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার। কোন বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান ইত্যাদিতেও ছন্দোরসিকের মাত্রা জ্ঞান জন্মে।" closed syllable মাত্রেই সর্ব্বদা দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাংলা গদ্যে বা পদ্যে কোথাও syllable মাত্রা কি হইবে সে সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। স্বেচ্ছায় syllableএর হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের ক্ষমতা বাংলার একটি বিশেষত্ব। কি কি স্থলে syllableর হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হয় এবং বাংলায় যথার্থ মাত্রাপদ্ধতি কি তাহা শৈলেন্দ্র বাবু আমার 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' প্রবন্ধের ১১ হইতে ২৯ সংখ্যক সূত্রে পাইবেন।

'বাপ বল্লেন'—এইরূপ একটি পর্ব্ব যে সর্ব্বদাই ছয় মাত্রার হইবে এইরূপ মনে করিয়া শৈলেন্দ্র বাবু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখানে পর পর তিনটি closed syllable আছে। সময়ে সময়ে ইহাতে ছয় মাত্রা হইতে পারে।

সব ঠাঁই মোর | ঘর আছে, আমি | সেই ঘর ফিরি খুঁজিয়া

এখানে প্রথম পর্ব্বটিতে তিনটি পর পর closed syllable লইয়া ছয় মাত্রা হইয়াছে। এখানে 'সব ঠাঁই মোর'='ঘর আছে, আমি'='সেই ঘর ফিরি'=৬ মাত্রা, যদিও প্রথম পর্ব্বে ৩টি syllable, দ্বিতীয়ে ৫টি ও তৃতীয়ে ৪টি।

তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্ব্বে যে ৪ unit হয় তাহা ত শৈলেন্দ্র বাবু 'ছন্দ-ধন্দ' প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রবাবু কি লক্ষ্য করেন নাই যে এই ধরণের ছন্দে পর পর তিনটি closed syllable দিলেই পর্ব্বপূরণ হয়, অর্থাৎ অন্যান্য তিনটি closed syllable দিয়া ছন্দের ৪ unit পাওয়া যায়?

আপিস যাবার | তাড়া তো নেই, | ভাবনা কিসের | তবে?
আগাগোড়া | সব শুন্‌তেই | হবে?

এখানে আগাগোড়া=সব শুন্‌তেই=৪ unit নয় কি? আশা করি, প্রবোধ বাবু এ ক্ষেত্রে আমার সহিত একমত হইবেন।

তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দকে বলা উচিত স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ। স্বরাঘাত বা Strong stress দ্বারা ইহার প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয় হয়। এই ধরণের স্বরাঘাতকে closed stress বলা যাইতে পারে; ইহা সঙ্কোচক; ইহার দ্বারা বাগ্‌যন্ত্রের দ্রুত আন্দোলন হয়, এ জন্য হ্রস্বীকরণের প্রবৃত্তি আসে। এই জন্য স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে **সাধারণতঃ** প্রতি syllableই এক মাত্রা বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু বাংলার একটি বিশেষ প্রকৃতি-**একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইটির অধিক** closed syllableর **হ্রস্বীকরণ চলিবে না**। এই নিয়ম সর্ব্বত্র, এমন কি স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দেও খাটে। সুতরাং স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে হ্রস্বীকরণের প্রবৃত্তি প্রবল হইলেও যেখানে একই পর্ব্বে পর পর তিনটি closed syllable থাকে, সেখানে যে কোন একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হয়, এবং এইরূপে ৪ মাত্রা পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্র বাবু যদি একটু অনুধাবন করিয়া স্বরাঘাত-প্রধান কবিতার আবৃত্তি লক্ষ্য করেন তবে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

বাপ্ : বল্‌লেন | কঠিন : হেসে | তোমরা : মায়ে | ঝিয়ে—
এক : লগ্নেই | বিয়ে : ক'রো | আমার : মরার | পরে

এই ভাবে ছন্দোলিপি হয়। সেইরূপ

এক: কল্পে | রাঁধেন: বাড়েন | এক : কল্পে | খান

এই ভাবে ছন্দোলিপি হইবে।

বাংলায় ছন্দের আদর্শ কি, প্রত্যেক রকমের পর্ব্বের গঠনের সূত্র কি, কিরূপে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ অনুসারে মাত্রা নির্ণয় হয় তাহা শৈলেন্দ্রবাবু 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' প্রবন্ধে পাইবেন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে আলোচনা শৈলেন্দ্রবাবু ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে পাইবেন। এ ছন্দে ৪ মাত্রার পর্ব্ব ভিন্ন অন্য প্রকারের পর্ব্ব কুত্রাপি ব্যবহার হয় না। ৫ মাত্রার পর্ব্ব স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে চলে না। যদি ছড়ার ছন্দ বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ হয় তবে

ঐ দেখ গো | আজ্‌কে আবার | পাগ্‌লি জেগেছে

এরূপে ছন্দোলিপি হইবে না।

ঐ দেখ গো | আজ্‌কে আবার | পাগ্‌লি জেগে | ছে—

শেষ পর্ব্বটি হ্রস্ব হওয়া বাংলা কাব্যের একটি বহু প্রচলিত রীতি।

এই ধরণের ছন্দে যে প্রতি পর্ব্বে অন্ততঃ একটি closed syllableর ব্যবহার অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে আমি শৈলেন্দ্র বাবুর সহিত একমত; কারণ closed syllableর উপর না পড়িলে স্বরাঘাতের প্রভাব স্পষ্ট হয় না। যেখানে closed syllable নাই সেখানে প্রথম পর্ব্বাঙ্গের একটি syllableর উপর একটু ঝোঁক দিয়া তাহাকে closed syllableর সামিল করিয়া লইতে হয়। এই ছন্দের এক একটি চরণে চারিটি পর্ব্ব থাকিলেও, অন্ততঃ তিনটি পর্ব্বে closed syllable রাখিলে চলিতে পারে এ বিষয়েও আমি একমত। কারণ কাবালী প্রভৃতি তালে যেমন একটি ফাঁক থাকে, তদ্রূপ ছন্দের চরণেও থাকিতে পারে। কিন্তু এই ফাঁকটি কখনই শেষ পর্ব্বে অর্থাৎ সমের ঘরে থাকিবে না। সাধারণতঃ তৃতীয় পর্ব্বে এটি থাকে।

বাংলা ছন্দ যে মূলতঃ মাত্রাসমকত্বের উপর নির্ভর করে, এবং বাংলায় syllableর মাত্রা যে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নহে, বরং ছন্দের অনুযায়ী—এই কয়েকটি মূল তথ্য ধরিতে না পারার দরুণ প্রবোধবাবু ও শৈলেন্দ্রবাবু অনেক সময়ই তথাকথিত কয়েকটি বৃত্তের নিয়মের ব্যভিচারী কবিতার চরণ দেখিলেই irregular বলিয়া পাশ কাটাইয়া যান। যাহাকে তাঁহারা irregular বলেন তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে সাহস করেন না। যদি তাঁহাদের কল্পিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ বজায় থাকে তবে তাঁহাদের প্রস্তাবিত নিয়মেরই ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা কেহই এখন পর্য্যন্ত বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব ও যথার্থ মাত্রা-পদ্ধতি ধরিতে পারেন নাই, তজ্জন্য নানাবিধ অসঙ্গতি ও প্রমাদে জড়িত হইতেছেন। শৈলেন্দ্রবাবু

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌

ইহার ছন্দোলিপি করিয়াছেন

বাইরে কেবল | জলের শব্দ | ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌

তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সমগ্র কবিতাটিতেই প্রতি চরণে চারিটি পর্ব্ব আছে, এবং উদ্ধৃত চরণটির প্রতিসম চরণটি হইতেছে—

দস্যি ছেলে | গল্প শুনে | একে বারে | চুপ্‌

উদ্ধৃত চরণটির ছন্দোলিপি হইবে এইরূপ—

বাইরে : কেবল | জলের : শব্দ | ঝুপ্‌ : ঝুপ্‌ | ঝুপ্‌

সুতরাং তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দেও মাত্রাসমকত্বের হিসাব রাখিতে হয়, আবশ্যকমত দীর্ঘীকরণ করিতে হয়, কেবল স্বর গুণিয়া গেলে চলে না। সেই আবশ্যতার স্বরূপ কি তাহা আমি অন্যত্র (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা) নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্দ্ধমাত্রা ধরার কথা শ্রুতবোধে আছে। কিন্তু সত্যই যদি সেইভাবে সর্ব্বত্র হিসাব আরম্ভ করা হয়, তবে ছন্দশাস্ত্রের ভরাডুবি হইবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ সম্পর্কে প্রত্যেক closed syllableকে দেড় মাত্রা ধরার কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে সময়ে সময়ে হিসাব মিলিলেও সব সময় মিলিবে না।

তাল পাতার ঐ | পুঁথির ভিতর | ধর্ম্ম আছে | বল্‌লে কে—

এখানে পরস্পর সমান প্রথম তিনটি পর্ব্বে যথাক্রমে ৫½, ৫ ও ৪½ মাত্রা হইতেছে। সুতরাং ঐ হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে ছন্দবোধের সহিত কোন ভগ্নাংশের হিসাব চলিতে পারে না। অবস্থা বিশেষে এক একটি syllable হ্রস্ব, দীর্ঘ বা প্লুত বলিয়া উপলব্ধি হয়; দেড়, সওয়া এক,

পৌনে দুই প্রভৃতি মাপের syllable আছে বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অবশ্য নিরপেক্ষ কাল হিসাব করিলে নানাবিধ জটিল ভগ্নাংশ পাওয়া যাইবে; দেখা যাইবে যে কোন দুইটি syllableরই দৈর্ঘ্য সমান নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাত্রা ও নিরপেক্ষ কাল এক নহে।

নয় মাত্রার পর্ব্ব চলিতে পারে কি না ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। কেন এতকাল চলে নাই তাহাও বলা যায়। কিন্তু চালান যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে জোর করিয়া 'না' বলিতে সাহস হয় না; কারণ বাংলা ছন্দের ইতিহাসে কত নূতন জিনিষ হইয়াছে, আরও যে হইবে না তাহা বলা যায় না। শৈলেন্দ্রবাবুর রচনা দেখিয়া এতৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। অন্যান্য সুকবি-দের রচনার অপেক্ষায় রহিলাম।

এই ক্ষুদ্র মন্তব্যে শৈলেন্দ্রবাবুর ধন্ধের নিরসন হইবে কি না জানি না। বিস্তারিতভাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তিনি যে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার সমাধান কি তাহারই ইঙ্গিত করা হইল। ছন্দঃশাস্ত্রের আলোচনায় তিনি যদি যথার্থ অধিকারী হন, তবে যে কয়টি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছি সেইগুলি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিলে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

পড়িছ কবিতা মোর

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতা আজি পড়িছ কি নিভৃত সময়?
মাঝে মাঝে নিরখিছ মুখ তুলে আকাশের পারে—
পঞ্চমীর ভীরু চাঁদ মেঘ ফাঁকে যেথা উঁকি মারে,
তারায় তারায় যেথা কাঁদে মোর কামনা নিচয়।
নয়নের নীলসরে স্মরণের অশ্রু মুঞ্জরয়,
হারায় অক্ষরগুলি অবশেষে অকূল পাথারে;
একটি পুরাণ ছবি ভেসে শুধু ওঠে বারে বারে,
শিয়রে কখন দীপ নিভিল সে চেতনা না হয়।

অমনি আমারো দীপ নিভিয়াছে কত নিঃস্বরাতে;
ভাবনার ছিন্নসূত্রে গ্রন্থি দিয়া গাঁথি অশ্রু-হার
কখন পোহাল নিশা নিদ্রাহীন সিক্ত বিছানাতে,—
ধূমাঙ্কিত কালী আর ছিল গাঢ় নিঃসঙ্গ আঁধার।

সেদিন মনের বীণে যত গান গুঞ্জরিল মোর—
মুখর করুক তা'রা আজ তব সকল প্রহর॥

শোধবোধ

শ্রীসুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত এম্-এ

অনিলার মন আজ মোটেই ভালো ছিল না। দুপুর-বেলাটা বসে বসে অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করতে পারলেই সে বেঁচে যেতো। কিন্তু পরীক্ষা অত্যন্ত নিকটে; যে-ভাবেই হোক্ দু'দিনের মধ্যে লজিক্ শেষ করা চাই-ই। সমস্ত সকালটা সুপ্রকাশের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে কেটেছে, এক পাতাও পড়া হয়নি। শান্ত মেয়ের মত Inductive Logicএর বই খুলে সে পড়তে লাগলো।

'From the standpoint of conservation of energy we should not only enumerate all the conditions essential to the production of an effect, but must also point out the quantitative equivalence of the cause and the effect.' কিন্তু লাইন্‌টা শেষ কর্‌বার আগেই গোড়ার দিকে কি পড়েছিল তা' বেমালুম ভুলে গেল। খুব মন দিয়ে সে আবার আরম্ভ কর্‌ল 'From the standpoint of conservation of energy we should not only enumerate all the conditions essential.........' সুপ্রকাশের আস্পর্দ্ধা বেজায় বেড়ে গেছে, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে সে ভাব্‌তে লাগল, অহঙ্কারে মাটিতে যেন আর পা' পড়ে না। না হয় বি-এতে ফার্ষ্ট ক্লাসই পেয়েছে। ও'রকম তো কত ছেলেই পায়; গেজেট্ খুল্‌লে এখুনি ঝুড়ি ঝুড়ি নাম বেরিয়ে পড়বে। ইংরেজি সাহিত্যে ফার্ষ্ট ক্লাশ, অথচ বিয়ারবোমের কোন লেখা পড়া দূরে থাক্ প্রায় নামই শোনে নি। শেইম্‌ফুল! হাক্‌স্‌লি কি লরেন্স-এর নাম শুনেছে কি না তাই সন্দেহ। এবারে এলে জিজ্ঞেস্ কর্‌তে হবে।.........'to the production of an effect but must also point out......' না, জিজ্ঞেস্ টিজ্ঞেস্ আর করা হবে না। ওর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। ও মনে করে যে ওর সঙ্গে কথা না বললে আমার দিন কাট্‌বে না। ছোঃ, যেমন চেহারা, তেম্‌নি কথা বল্‌বার ছিরি। তাও যদি নিজের চেহারা হোত। দর্জ্জি, লণ্ডারার, হেয়ার-কাটারদের হাতে গড়া মূর্ত্তি—একেবারে কার্পেট্ নাইট্। পকেটে হয় ত আয়না চিরুণি পাউডার পাফ্‌ও আছে। লজ্জাও করে না এই সংএর মত চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে; আমি হলে তো কবে গলায় দড়ি দিতাম।.........'the quantitative equivalence of the cause and the effect.........' আমি তো ঠিকই বলেছিলাম; ভুল তো ও-ই করেছে। বিয়ারবোম্ নামে কোন সাহিত্যিক নেই ঐ কথা শুনলে কে-ই বা না হেসে থাক্‌তে পারে। আবার সাবিত্রীর কথা বলতে আসে। না হয় সাবিত্রী লেখাপড়াতে ঢের ভালোই হোল। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করে আমাকে অপমান করবার কি প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীতে পরীক্ষা পাশ করাটাই যেন সব, বুদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি; সুপ্রকাশের কাছ থেকে অন্তত ঐ কথা কখনো আশা করি নি। অভদ্র ব্যবহার কোন ক্ষেত্রেই ক্ষমা করা যায় না—সুপ্রকাশ করলে তাকেও না। তা ছাড়া ক্ষমা তো সে চায়ই নি। অবিশ্যি চাইলেই যে পাবে তা' নয়; তবুও তার চাওয়া তো উচিত ছিল। যাক্‌গে, আমিই বা এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন। ওর যা' খুসি করুক, আমার তা'তে কিছুই আসে-যায় না। অনিলা আবার লজিকের পাতায় মন দিতে চেষ্টা করলো।

এখানে পূর্ব্বের ইতিহাস একটুখানি বলে রাখা ভালো। আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। তর্ক করতে কর্‌তে এক সময় সুপ্রকাশ বল্‌লে, 'মোটে চার পাতার প্রবন্ধ, তারি মধ্যে একটা লোকের জীবনী; আশ্চর্য্য নয়? আমার ইচ্ছে

ষ্ট্রেইচির ধরণে তার নিজের একটা জীবনী লেখা; তা হ'লেই তাকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে।"

অনিলা উত্তর দিয়েছিল, 'কাজটাতে হয়ত যথেষ্ট বাহাদুরী আছে, কিন্তু জীবনী হিসেবে তার কোন মূল্য আছে কিনা সন্দেহ।'

'নিশ্চয়ই আছে। কোন আর্টিষ্টের আঁকা ছবির দোষ-গুণের বিচার তা'র ক্যান্‌ভাসের পরিমাণ দিয়ে হবে না, হবে তার ছবি দিয়ে। সাহিত্য হিসেবেও তার যা মূল্য আছে তাও নিতান্ত কম নয়। নীরস জীবনী লেখাকে সরস সাহিত্যের কোঠায় আন্‌তে পেরেছে একমাত্র ষ্ট্রেইচি।'

'কেন, লুড্‌ভিগ্‌?'

'আমার তো মনে হয় লুড্‌ভিগ্‌কে শুধু বায়োগ্রাফার বল্‌লেই ঢের ভালো হয়।'

'তার কারণ লুড্‌ভিগ্‌ তার কাজ নিয়ে ছেলে-খেলা করে না; একটা লোকের জীবন নিয়ে সে মনগড়া প্রবন্ধ লিখ্‌তে বসে না, এই না?' অনিলা জান্‌তো এবারে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, সুপ্রকাশ চট্‌বে।

'প্রবন্ধ লেখাটা কী খুব অন্যায়?'

সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বরে একটা গোপন আগ্নেয়গিরির আভাষ পেয়ে অনিলা চুপ কর্‌লো। কী ছেলেমানুষ, এত সহজেই চটানো যায়। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা, ষ্ট্রেইচি কখনো গল্প লেখেনি?'

'গল্প? I should think not,' বিদ্রূপের হাসি হেসে সুপ্রকাশ বললে, যেন এই সামান্য কাজ করে হাত নোংরা করবার লোকই সে নয়।

'কেন প্রবন্ধ লেখকের কি গল্প লিখ্‌লে জাত যায়! ম্যাক্স্‌ বিয়ারবোম্‌ও তো গল্প লিখেছে, ও খুবই ভালো গল্প লিখেছে।'

'Max Beerbohm! The Cartoonist?' তাচ্ছিল্যভরে সুপ্রকাশ উত্তর দিল।

'কার্টুনিষ্ট, প্রবন্ধলেখক ও গল্পলেখক। সবটাতেই সমান সিদ্ধহস্ত। আশ্চর্য্য তার ক্ষমতা। নামই শোন নি? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি পরীক্ষা পাশ করেছ?'

'এই বুদ্ধি নিয়ে আমি পরীক্ষা পাশ করেছি। কিন্তু তুমি কর্‌বে ফেল্‌।'

'সত্যি কর্‌বো? আঃ, 'তা' হ'লে তো বেঁচে যাই। নিশ্চিন্ত হয়ে চিরকালের মত লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া যায়।' অনিলা একটা আরামের নিশ্বাস ফেল্‌লো।

'তা' হোলে মিছামিছি কেন কষ্ট করে পরীক্ষা দিচ্ছ। নিজের পেছনে কতগুলো অর্থ অপব্যয় না করে সেটা বরং সাবিত্রীকে দিয়ে দাও, বেচারার উপকার হবে।' বিয়ারবোম্‌ সম্বন্ধে উপহাসটা সুপ্রকাশ এখনও ভুলতে পারে নি; তাই সাবিত্রী নামে এক কল্পিত মেয়ে হোল তার প্রতিশোধ।

'সাবিত্রী? তার কথা তো আগে কখনও শুনি নি।' অনিলার কুঞ্চিত ললাটে একটুখানি মেঘের আভাষ দেখা দিল।

সুপ্রকাশ উৎসাহিত হয়ে বল্‌তে লাগল্‌ 'সাবিত্রীকে চেন না? গেল বছর ম্যাট্রিকে ফোর্থ্‌ হয়েছে। কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; লজিক্‌ কি সিভিক্‌স্‌এর কোন শক্ত জায়গা একবার বলে দিলেই চট্‌ করে ধর্‌তে পারে, তোমার মত পঞ্চাশ বার করে বোঝাতে হয় না।'

'তা'কে বুঝি রোজই পড়াতে হয়?' মেঘ গাঢ়তর হ'য়ে উঠলো।

'রোজ তো বটেই। কোন কোন দিন দু'বার। এ'রকম ছাত্রী পেলে কেই বা না পড়ায়। তবে বেচারা বড্ড গরীব। এই বইটইগুলোও আমাকেই কিনে দিতে হয়। আচ্ছা, আমি চললাম, এখনি ওর কাছে যেতে হবে একবার। কাল্‌কেই আস্‌তে বলে দিয়েছিল।'

'বড্ড তাড়া যে?'

'তা' আর হবে না।'

অনিলা নিজকে খুব শক্ত করে বললে, 'বেশ যাও। wish you good luck?'

সুপ্রকাশ জবাব দিল, 'Thank you'

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রকাশের মনে হোল বেজায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সব খুলে বলে' ক্ষমা চাইতে সে ফিরে গেল, কিন্তু অনিলা ততক্ষণে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সে ভাবতে লাগ্‌ল কোন্‌ উপায়ে অনিলার রাগ ঠাণ্ডা করা যায়। নিজের ওপরেও তার যথেষ্ট রাগ

হচ্ছিল; খামোকা ব্যাপারটাকে এতদূর না গড়ালেই হোত। চুলোয় যাক্ সাবিত্রী, আর কোন দিন ও নাম সে মুখেও আনবে না। সুপ্রকাশের মনে হোল যেন সত্যি-সত্যিই সাবিত্রী নামে কোন মেয়ে আছে এবং তা'রই জন্যে এখন তা'র এই দুর্দ্দশা। কল্পিত নারী সাবিত্রীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে তাকে অভিশাপে জর্জ্জরিত করেও সুপ্রকাশ নিজের মনে শান্তি স্থাপন করতে পার্‌ল না।

ঘরের ভেতরে টেলিফোন্ বেজে উঠলো। অনিলা লজিক্ পড়া বন্ধ করে', অর্থাৎ চিন্তাধারা ক্ষণিকের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে' রিসিভারটা কানে তুল্‌লো।

'হ্যালো'

'That you নিলা?'

'আমার নাম অনিলা, নিলা নয়।' এ' নামটা সুপ্রকাশের দেয়া, সুতরাং এ'তে একমাত্র তারই অধিকার ছিল।

'Never mind, শোন নিলা—'

'অনিলা,'

'আচ্ছা তাই। দেখ নিলা—'

'If you can't behave youself...'

'Oh,damn.'

ঝণাৎ করে রিসিভারটা হুকের ওপরে রেখে অনিলা মাঝ পথেই সুপ্রকাশের মাপ-চাওয়া বন্ধ করে দিল। তারের ওপারের আর্ত্ত ব্যাকুলতার প্রতিনিধি হয়ে টেলিফোনের ঘণ্টা সশব্দে বাজতে লাগল। অনিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বাজুক্ ওটা যত খুসী। সুপ্রকাশের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই—লেশমাত্রও নয়। এতদিনের বন্ধুত্ব কোন্-এক-সাবিত্রীর জন্যে সে যদি ভুলে যেতে পারে, তা' হ'লে অনিলাও পার্‌বে। এ'টুকু মনের জোর তার আছে। নাঃ, টেলিফোনটা দেখ্‌ছি জ্বালাতন করে মার্‌বে। সুপ্রকাশটাও তো কম একগুঁয়ে নয়; সেই তখন থেকে রিং করেই চলেছে।

'তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবার চেয়েও ঢের বেশি দরকারি কাজ আমার আছে। অনুগ্রহ করে এ কথাটা মনে রাখ্‌বে,' রিসিভারটা তুলে নিয়ে অনিলা বল্‌লে।

সুপ্রকাশের মুখ দিয়ে ফস্ করে' বেরিয়ে গেল, 'বাবা, মেজাজ তো নয় যেন কেউটে—'

ব্যস্, এর পরে আর কোন কথাই চলতে পারে না। কেউটে সাপ! যেন নিজের মেজাজই কত ঠাণ্ডা! ভেবে দেখ্‌লে সুপ্রকাশই অন্যায় করেছে ঢের বেশি। সে নিজে তার তুলনায় কোন কথাই বলে নি। যাক্, এক হিসেবে ভালোই হোল। সুপ্রকাশ রোজ এসে বক্ বক্ করে তা'র অনেকটা সময় নষ্ট করে' দিত। এখন সে নির্ব্বিঘ্নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়্‌তে পার্‌বে। কারণ সুপ্রকাশ আর কখনও আস্‌তে সাহস করবে না: এলেও সে তা'র সঙ্গে দেখা করবে না। নির্লিপ্ত বৈরাগ্য কল্পনায় অনিলার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।·········কিন্তু মানুষ এত অকৃতজ্ঞও হ'তে পারে। আজ অনিলা হোল কেউটে সাপ। সুপ্রকাশের এত দিনকার বিনিয়ে বিনিয়ে বলা সব কথাই তা' হ'লে ভুয়ো; একটাও আন্তরিক নয়। পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশের তারা আরও কত কি—মনে হ'লেও হাসি পায়। সাবিত্রীর কথা তো এতদিন সে গোপন করেই রেখেছিল; আজ হঠাৎ বেরিয়ে গেল। গড্, কী বাঁচাই সে বেঁচেছে।

ঘরের ভেতরে টেলিফোন্‌টা আবার বেজে উঠলো।

'হ্যালো'

'আমাকে ক্ষমা করো অনিলা।'

'আমার ক্ষমা করা না করাতে কিছু আসে-যায় না।'

'তুমি রাগ করেছ। শোন, let me explain—'

'দরকার নেই, কেন মিছামিছি কষ্ট কর্‌বে।'

'আমাকে বল্‌তে দাও, তা' হ'লেই সব বুঝতে পারবে।'

'Explain কর্‌বার কি কিছু আছে?'

'তোমাকে রাগাবার জন্যে সাবিত্রীর উপাখ্যানটা বানিয়ে বলেছিলাম। বিশ্বাস করো, ওটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সাবিত্রী বলে' কোন মেয়ে নেই, থাকলেও আমি চিনি না।'

'আমিও ভেবেছিলাম যে তুমি ঠিক এই কথাই বল্‌বে।'

'বিশ্বাস না হয় গেজেট খুলে দেখ।'

'গেজেট দেখবার দরকার নেই। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে অপমান করা।'

'কক্ষণো না।'

'কী, মিথ্যাবাদী তুমি।'

'ও রকম মিছে কথা সবাই বলে।'

'জয়ন্ত কখনও বলে না।'

'সে আবার কোথা থেকে উড়ে এলো?'

'বিলেত থেকে, ইলেকৃট্রিকাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী নিয়ে।'

'তা'কে তো তোমাদের বাড়ীতে কখনো দেখিনি।' বৈদ্যুতিক তারের অন্যদিকের গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো।

'তোমার দুর্ভাগ্য। সে প্রায় রোজই আসে।'

'প্রায় রোজই আসে?'

'প্রায় রোজই আছে। চমৎকার ছেলে। তার কাছ থেকে তোমার অনেক কিছু শেখবার আছে।'

'হুঁ'

'এমন মজার সব গল্প বলতে পারে, হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে। সেদিন একটা গল্প বল্‌ছিল—'

'চাইনা শুনতে।'

'ও যখন বিলেতে ছিল তখন নাকি—'

'Good-bye'

'একটু দাঁড়াও, গল্পটা এক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে যাবে।'

'ওর সম্বন্ধে আগে আমাকে বলনি কেন?'

'দরকার মনে করিনি বলে।'

'তাই নাকি?'

'এক বুড়ী মেম একদিন এসে বললে—'

'জয়ন্ত না কি-ওর-নাম আজ আস্‌বে?'

'আজ আস্‌বে কিনা ঠিক বলতে পারি না, তবে কাল আসবার কথা আছে।'

'হুঁ।'

'একটু চুপ কর। গল্পটা শেষ করতে দাও। সেই বুড়ী মেম বললে, তুমি যদি পাঁচ মিনিট চোখ বুজে থাকতে পার তা' হ'লে যীশুর দেখা পাবে—'

'তারপরে বুড়ী ঘড়ি চুরি করে পালাচ্ছিল তো? গল্পটা জানি, কারণ ওটা আমিই তোমাকে বলেছিলাম।' সুপ্রকাশের স্বর স্বাভাবিক লঘুতা প্রাপ্ত হোল।

'ওঃহো, তুমিই বলেছিলে বুঝি? খেয়াল ছিল না।'

'দিব্যি খেয়াল ছিল, কিন্তু তা' নিয়ে আমি তর্ক করতে রাজি না।'

'করোই না একটু। দেখা যাক্ কে হারে।'

'শোধ বোধ, নিলা?'

'কোয়াইট্।'

'সেদিন বলেছিলে 'নিউ এম্পায়ার'এ যাবে। চলো আজকেই যাওয়া যাক্।'

'অসম্ভব আজ আমাকে একশো পাতা লজিক্ পড়তেই হবে।'

'এ ক শো পাতা?'

'হ্যাঁ, তুমি এক্ষুণি এখানে চলে এসো। একটা জায়গা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। একটু সাহায্য করতে হবে।'

'Good, আমি দশ মিনিটের ভেতরে পৌঁছে যাব।' দশ মিনিট পরে অনিলাদের বাড়ীর সাম্‌নে একটা মোটর বাইক থাম্‌বার শব্দ হোল।

সুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত



আদিমযুগের জন্তুমন

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

আদিমকালে মানুষ যখন বন্যজন্তুর প্রতিবেশীরূপে অবস্থান করত এবং আচরণেও জন্তু-প্রকৃতিই ছিল তখন যে মনোভাব তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত আজ এই হাজার হাজার বছর পরে, বিবর্ত্তনধারার হাজার হাজার ধাপ পেরিয়ে, যুগ যুগান্ত ধ'রে সভ্যতার প্রভাবে পালিশ হয়ে এসেও সে তার সেই আদিম মনোভাবমুক্ত হ'তে পারে নি; জন্ম জন্মান্তর ধরে সে কত সংস্কারের আবরণ উন্মোচন ক'রে চ'লে এলো তার ঠিকানা নাই, কিন্তু এই যে তার সনাতন মনোভাব এর সে কিছুমাত্র ফেলে আসতে পারলো না। কারণে অকারণে প্রতিবেশীকে আক্রমণ করা, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরার প্রবৃত্তি এবং জীবহননে বিকট উল্লাস অনুভব করার যে আদিম সংস্কার তা'এখনও তার মধ্যে তেমন প্রকটই রইলো। মাঝে মাঝে তার অতিকায়মূর্ত্তি দেখে আমরা যে শিউরে উঠি তা' থেকেও এই কথাটাই বিশেষ ক'রে বোঝা যায়। যখন চোখের সম্মুখে দেখি, শিশু যেমন ব্যাংফুঁড়ে আনন্দ পায়, তেমনি একটা তুচ্ছ 'অজুহাত' নিয়ে মানুষ অম্লানবদনে তার প্রতিবেশীর কলিজায় ছুরি বসিয়ে বিজয়োল্লাস করচে, তখন কি মনে হয় যে, মানুষের সেই বর্ব্বর মনোভাবের এতটুকু ভাবান্তর হয়েছে? ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার জন্য, কিম্বা একটা বর্ব্বর বিজিগীষা চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য, যখন দেখা যায়, মানুষ তার সমস্ত মণীষাকে নিঃশেষে নিয়োজিত কচ্ছে যুদ্ধ হননকার্য্যের নিত্য নূতন উপকরণ প্রস্তুত করবার পথে, অথবা সেই আদিমযুগাদৃত প্রভুশক্তি বজায় রাখবার একটা নিদারুণ লালসায় মানুষের বুকচিরে দুই হাতে রক্ত নিয়ে বিজয়তিলক ললাটে পরচে, তখন কি মনে হয়, এই আবহমান কাল ধ'রে মানুষের যুগ-বিবর্ত্তিত সুসংস্কৃত মনোভাবের আপ্রাণ চেষ্টা তার সেই আদিম বর্ব্বর মনোভাবকে এতটুকু বিনীত বা ভদ্র কত্তে পেরেচে? পারেনি। তাকে যতবার মানুষ ভদ্রবেশে আবৃত করেচে, যতবার নীতি-ধর্ম্মের নির্ম্মল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত কর্ব্বার প্রয়াস পেয়েচে বিকট উল্লাসে ততবার সে তার সমস্ত আবরণ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে আবার সেই আদিম যুগের নগ্ন-জন্তুমূর্ত্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে;—এতটুকু লজ্জা বা হীনতা সে বোধ করে নি, তার সেই জন্তুপ্রবৃত্তির নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতা ও আসুরিক লীলার জন্য।

মানুষের এই বর্ব্বর অসুর মনকে পরাভূত ক'রে মানুষ একদিন বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী, ও প্রেমের এক আনন্দ রাজ্য স্থাপন কর্ব্বে ব'লে একদা যে এক মহাবাণী উদ্‌ঘোষিত করেছিল, যুগে যুগে সেই মহাবাণীর প্রতিধ্বনিই মানুষ পৃথিবীর নানা স্থান থেকে বার বার শুনে এসেছে কিন্তু সে আনন্দরাজ্যের দর্শন লাভ তার ভাগ্যে ঘটে নি। আত্ম-হননের উন্মাদ উল্লাসে মানুষ যখন ধরিত্রীর উপর দিয়ে নর-শোণিতের ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছে, সে মহাবাণী লজ্জায় আপন প্রতিধ্বনির মধ্যে শুব্ধ হ'য়ে গিয়েছে। মানুষের ভদ্র মুমুক্ষু মনকে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়েছে। তারপর, স্বজাতি হননের তাণ্ডবলীলায় যখন তার জন্তু-মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে তখনি আবার সেই মহাবাণী উদ্গীরিত হয়েছে। বিশ্ব-মানবের অন্তরাত্মা আবার আশা-আকাঙ্খায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেচে সেই মহাবাণী শুনে; কিন্তু তার সে আশা পরি-সমাপ্তি লাভ করেচে সেই আদিম জন্তু-প্রবৃত্তির উদ্যত খড়্গের সম্মুখে ভয়ত্রস্ত মানব-সন্তানের অসহায় ক্রন্দনের মধ্যে।

এই যে তার বর্ব্বর জন্তুমন, এর কাছে চিরদিনই নিষ্ফল হয়েছে, নিপীড়িত মনুষ্যত্বের আকুল আবেদন, মহীয়ান মানবের গরীয়ান আত্মদান। সেই মহাবাণী লক্ষ্য ক'রে

মানুষ যত তার বুকের রক্ত ঢেলে তর্পণ করেছে, দেহপাত ক'রে যত অর্ঘ্যদান করেছে তত বেড়ে উঠেছে তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, তত দাউ দাউ জ্ব'লে উঠেছে তার নিষ্ঠুর লালসার লেলিহান জিহ্বা। মানুষের অমৃত-প্রয়াসী অন্তরাত্মা আর তার এই জন্তু প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব দোলায় প'ড়ে বিশ্বমানব দিশে-হারা হ'য়ে পড়েছে।

নিশান্তের অরুণরেখা প্রকাশের সঙ্গে সেই তপোবন-বেদী হ'তে একদা যে আকুল আকুতি উদ্গীরিত হয়েছিল, "তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদ্গময়," আজও মানুষকে তারই প্রতিধ্বনি ক'রে পরিত্রাহি ডাকতে হচ্ছে। সেদিনও তাকে তার জন্তু-মনের কবল হ'তে মুক্তিলাভ কর্ব্বার জন্য যেমন আর্ত্তনাদ কত্তে হয়েছিল, যুগ যুগ ধ'রে, জন্ম জন্মান্তর ধ'রে কঠোর সাধনা ক'রে এসেও আজও তাকে তেমনি করেই ডাকতে হচ্ছে। মানুষের প্রতিভা, মানুষের শক্তি, মানুষের সাধনার ব'লে কত সংস্কার, কত সভ্যতার আদর্শধারা জন্মলাভ ক'রল; কত অভিনব সৃষ্টিতে পৃথিবীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল; কিন্তু তার এই যে আদিম মনোভাব, তা' তেমনি অপ্রতিহতই রইল, এতটুকু পরিবর্ত্তন তার হ'লো না।

কটিবাসালঙ্কৃত মহামানবতার সত্যবুদ্ধ মূর্ত্তি আজ মানবের সেই আদিম জন্তু-মনের সর্ব্বগ্রাসী দংষ্ট্রাব্যাদানের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীকে যে মহাবাণী শোনালেন, কত আশা, কত আগ্রহ নিয়েই না বিশ্ববাসী তা' শুনলো; কিন্তু মানুষের সেই যে চিরান্ধ-গুহাবাসী বর্ব্বর মনোভাব তার দুয়ারে কি এ মহাবাণী পৌঁছিল, না তার সেই নির্ম্মম উল্লাসকে স্তব্ধ কত্তে পারলো এক মুহূর্ত্তের জন্য? একই মাটি; একই আলো, একই আকাশ থেকে রসরক্ত নিয়ে দেহলাভ কর্‌লো যারা মুখোমুখী হ'য়ে, মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠলো যারা হাত ধরাধরি ক'রে—এতটুকু দ্বিধা হ'লোনা তার মনে, এতটুকু বেদনা বাজ্‌লো না তার বুকে নিষ্ঠুর হস্তে টুটি ছিঁড়ে ফেলতে তার যে তার জন্ম-সুহৃদ্, জীবন-উষার প্রথম আলোর বিকাশে যার মুখখানি দেখে ছিল সে সবার আগে? এতবড় করুণ কাহিনী, বোধ করি, মানুষের জীবন-ইতিহাসে আর কোথাও নাই।

কবে সে শুভদিন আসবে যখন মানুষের বর্ব্বর জন্তুমন মহামানবতার কল্যাণমূর্ত্তির চরণতলে তার, উদ্ধতশিরকে—চিরদিনের মত শ্রদ্ধানত দেখতে পাবে; বিশ্বপ্রেমের অমৃত-স্পর্শে তার চিরঅন্ধকারময় অন্তর্গুহায় আলোর কমল ফুটে উঠবে; সারাবিশ্বে এক অখণ্ড প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হবে। মহামানবতার অন্তরাত্মা সেই শুভদিনের আগমন-প্রতীক্ষায় আর কতকাল চেয়ে থাকবে কে জানে?

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার

ভালবাসা

অনিকেত

তোমারে যদি ভালো বেসেছি কোনোদিন
তা' নিয়ে কেন আজ ঝরিবে আঁখিজল?
সে কত সুদূরের ব্যথিত, আশাহীন
প্রাণের ব্যাকুলতা নীরব, নিস্ফল!
হয়ত একদিন ওদুটি আঁখিতারা
হইলে এমনই কোমল আভাময়,
জগতে একজন হ'ত না পথহারা,
একটী জীবনের বাঁচিত অপচয়!

কমলের কাণ্ড

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন সেন

দশ বছরের মেয়ে কমলকে আঁটিয়া ওঠা বড় দায়। কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কি করে, না করে, কিছুরই যদি ঠিক ঠিকানা থাকে! সকাল হইতেই মা খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করিয়া ফিরিতেছেন, কিন্তু তার কোনই খোঁজ নাই।

—অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল। ডাক্তার বাড়ীর পিছনে যে বড় জঙ্গলটা আছে সেখানে এক শ্যাওড়া গাছের নিভৃত অন্তরালে বসিয়া তিনি দুখু চাড়ালের ছেলেটার সঙ্গে ভাগাভাগি মুড়ী চিবাইতেছিলেন। বড় ভাই শচী এই খবর পাইয়া একেবারে তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রথমতঃ তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল; তারপর ইচ্ছামত এক চোট প্রহার করিয়া রোজকার মত মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া গুণগুণ করিয়া গান করিতে করিতে বাজারের সওদা করিতে চলিয়া গেল। বাড়ীর ছেলেপিলেদের শাসনকার্য্যে শচীর অধিকার ছিল একচেটে।

এ ব্যাপারটা কমলের একেবারেই মনঃপূত হয় নাই। তবুও সে এই নিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একটা হুলুস্থুলু বাধাইয়া শত্রুপক্ষের মুখ হাসাইবার মোটেও পক্ষপাতী ছিল না। সে চুপচাপ উপুড় হইয়া ঘরের খালি মেজের উপর পড়িয়া রহিল। ছোড়দি খাবার লইয়া অনেক সাধাসাধি করিল; কিন্তু সে মুখও ফিরাইল না, কথাও কহিল না। মা ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেমানুষকে এতটা মার-ধোর করা তিনি মোটেও পছন্দ করিতেন না।

ঘণ্টা দুই পরে ঘরে আসিয়া দেখা গেল, কমল আবার অন্তর্দ্ধান। কোথায় গেল, কোথায় গেল—বাড়ীর সকল লোকজন ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তারের আমবাগান, তাতাসীদের বাঁশতলা, হরু ধোপার পুকুরপাড়, ছিদাম মুচীর গোয়ালঘর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করা হইল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘণ্টা দুই ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর মা এবার সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন। যে পাগলী মেয়ে, কি অঘটন ঘটাইয়া ফেলিয়াছে ঠিক কি! শচী নেহাৎ অপরাধীর মত সমস্ত গ্রামটা টো টো করিয়া ঘুরিয়া মরিল; কিন্তু কমলের দেখা মিলিল না। ঠিক দুপুর বেলা জেলেদের রঘু আসিয়া খবর দিল যে ঘণ্টাখানেক আগে সে কমলকে কয়েকটি মুসলমান ছোকরার সঙ্গে পালদের বড় পুকুরটাতে ডুবাইতে দেখিয়াছে। সংবাদ পাইয়া সকলে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। লোক পাঠাইয়া কমলকে তখনই গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসা হইল। আসামী একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছিল। শচীর হাতদুটি নিসপিস করিতেছিল, কিন্তু বাড়ীর সকলের প্রতিবন্ধকতায় তাহাকে মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। হাতেনাতে ধরা এতবড় অপরাধীকে এভাবে বেমালুম নিষ্কৃতি পাইতে দেখিয়া সে রাগে গনগন করিতে করিতে চলিয়া গেল। কমল খুব প্রচণ্ড রকম এক চোট মার খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও কোন দিক হইতে কোনরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া সে ভাবিল যে বাড়ীর আর সকলে যদি ইহার কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহারই বা এত মাথাব্যথা কি! অতঃপর অত্যন্ত ভালমানুষের মত নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে "মা ভাত দাও" বলিয়া নিজের ছোট পীড়িখানি পাতিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

কমল সংসারে দুইটি জিনিষ সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করিত; এক পড়াশোনা করা, দুই ঘরে বসিয়া থাকা। তাই বলিয়া সে যে একেবারে অকেজো মেয়ে একথা বলিলে

তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। বাগান কোপানো, পুকুর পাড় হইতে মাটি কাটিয়া আনা, গাছ হইতে ফল-ফলারি পাড়িয়া দেওয়া, এবাড়ী সেবাড়ী হইতে কাঠকুটা সংগ্রহ করা এসব কাজে সে মায়ের অনেক সাহায্য করিত, আর এ সব বিষয়ে তাহার উৎসাহও ছিল অদম্য। মা হাসিয়া বলিতেন "কমলকে আর বিয়ে টিয়ে দেব না। ও থাকবে বাড়ীতেই, ক্ষেতখামারের কাজ করবে, গরুবাছুর পালবে, দিনমজুরী করে পয়সা আনবে। কিরে পারবি না ?" কমল মহা উৎসাহের সহিত তাহার কথায় সায় দিয়া বলিত "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভাল মা তাই ভাল। আমি ওসব খু-উ-ব পারব, তুমি দেখো'খন।"

তাই বলিয়া ত এই কথায় আর নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা যায় না। দস্যি মেয়ে লেখাপড়ার ধার দিয়াও যায়না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মার চিন্তার আর অবধি ছিল না। একদিকে মেয়ের এই দৌরাত্ম্য আর একদিকে মেয়ের দাদার কড়া শাসন, এই উভয়ের চাপে পড়িয়া মেয়ের পড়া-শোনার দফা রফা হইয়া গিয়াছিল।

অবশেষে কমলকে তাহার মাসীবাড়ী পাঠানোই স্থির হইল। মাসীর বাড়ী ২।৩ মাইল দূরের এক গ্রামে। সেখানে বাড়ীতে মাষ্টার আসে লেখাপড়ার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। আর দস্যিপানা করিবার সুবিধাও সেখানে কম। তাছাড়া মাসীর ছেলেপিলে কেউ নাই; তিনি কমলকে তাহার ওখানেই রাখিতে চান। এসম্বন্ধে তিনি অনেকদিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কমলের ইহাতে মহা আপত্তি, তাই এতদিন তাহাকে আর পাঠানো হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু এজন্য মেয়েকে ত এভাবে ঘরে বসাইয়া আর মুখ্যু করিয়া রাখা যায় না।

কমলকে যাইতেই হইল। যাওয়ার দিনে কাঁদিয়া কাটিয়া সে একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলিল। এইবার শচীর সাহায্যের দরকার হইয়া পড়িল। জোর জবরদস্তি করিয়া কমলকে তাহার সঙ্গে কোনমতে পাঠাইয়া দিয়া মা বারান্দায় বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

মাসীবাড়ীতে আসিয়া কমল মহাবিপদেই পড়িল। এখানে ছকু, হারু, রঘু, ছুটকি, টুনী প্রভৃতি বন্ধুবান্ধব নাই, পালদের বড়পুকুর নাই, ডাক্তারের আমবাগান নাই, লখা বারুইর পানের বোরো নাই—নাই বলিতে একেবারে কিছুই নাই। তবে আর কি লইয়া সে এখানে থাকিবে ? এখানে ঘড়ী ধরা রুটিনমাফিক সব কাজ, সময় মত স্নান, সময়মত খাওয়া, একচুলও এদিক ওদিক হইবার যো নাই। সকাল বিকাল মাষ্টারমশায় পড়াইতে আসেন। পড়া বলিতে না পারিলে চশমার ভিতর হইতে এমন কটমট করিয়া তাকান যে কমলের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে। মাসীমার সঙ্গে ছাড়া আর কখনও এক পাও বাড়াইবার উপায় নাই। তাছাড়া এখানকার গাছগাছড়া লতাপাতা, আকাশের মেঘ পুকুরের জল কিছুই যেন ওখানকার মত অত সুন্দর নয়। মাছকে জল হইতে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলে যে অবস্থা হয়, কমলের অবস্থা হইয়াছিল অনেকটা সেই রকম।

কমল ইহার আগে মাকে ছাড়িয়া আর কোনদিন থাকে নাই। সমস্তদিন বাহিরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলেও রাত্রিবেলা তাহার মাকে ছাড়া চলিত না। মাকে দুই হাতে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত মনে আপনাকে নিদ্রার কোলে সঁপিয়া দিত। এখানে মাসীমার কাছে শুইয়া কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতে চায় না। মাসীমাকে কি আর অমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া শোয়া যায় ! ছিঃ লজ্জা করে না ! মাঝ রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া সে বিছানার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। জানলার ফাঁক দিয়া ঝকঝকে তারাগুলি দেখা যায়, তাহার মত তাদের চোখেও যেন ঘুম নাই। চারিদিকে সব চুপচাপ, নিঃঝুম। মাসীমা মেসোমশায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। গাছ-পালা, পশুপাখী, মানুষ সব ঘুমাইতেছে—প্রকাণ্ড বাড়ীটার মধ্যে সে-ই কেবল একলা জাগিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেও কমলের গাটা কেমন করিয়া ওঠে। জানলার বাইরে অন্ধ-কারের কুণ্ডলী—একটার পর একটা, তারপর একটা, তার পিছে আরও কত কিলিবিলি করিতেছে। এখানে কত কি আছে কে জানে! রঘু ছকুর কাছে ত কতরকম গল্প শুনিয়াছে। অবশ্য তাহারা নিজেরা কেহই চোখে দেখে নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া ও-সব কিছু যে নাই সেত আর ঠিক কথা নয়। এতকালো, ইহার মাঝে কিছু কি আর

না থাকিয়া পারে! টুপ্ করিয়া একটা গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, সে ভাবে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিল। ভয়ে ভয়ে তাহার বুক হিম হইয়া আসে। দেয়ালের কাছে কিসের যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া নড়িতে দেখা যায়। কাঁপিতে কাঁপিতে সে বালিশ বুকে চাপিয়া শুইয়া পড়ে। শুইয়া শুইয়া সে মার কথা ভাবে, দাদার কথা ভাবে, ছোড়্দির কথা ভাবে, সঙ্গীসাথীদের কথা ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে শেষে কখন ঘুমাইয়া পড়ে।

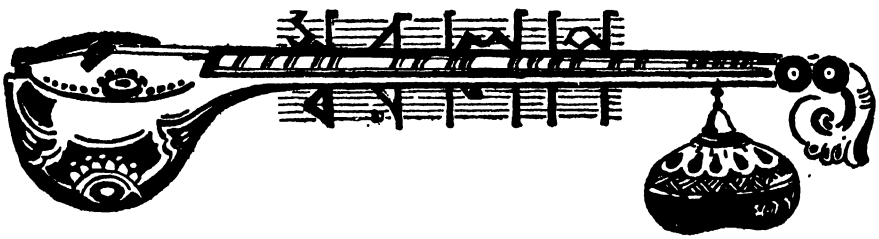
এতটুকু মেয়ে, সারাদিন কি যে তার এত চিন্তা। বাড়ীর লোকে রকম দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। এতদিন ধরিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে সেখানকার নাম একবারও মুখে আনে নাই। মাসী আদর করেন, মেসো আদর করেন, সে কোন সাড়া দেয় না। সকলের স্নেহ যেন পাশ কাটাইয়া ফেলিয়া দেয়। এইভাবে মনের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করিয়া এতটুক্ মেয়ে কতদিন টিকিয়া থাকিতে পারে! অবশেষে একদিন স্নানের পর কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া শুইয়া পড়িল। মাসী গায়ে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইস্ জ্বর ত দেখি খুবই উঠেছে। এই জন্যই ত বারণ করি এই জরজারির দিনে জলে নেমে স্নান করিসনে।"

সেদিন বিকালবেলা ঘরের বাহিরে ঘাসের উপর বসিয়া কমলের মা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। সূতা কাটিতেছিলেন অবশ্য, কিন্তু সূতার দিকে তাহার মন ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন সেই দিনটির কথা যেদিন কমল কাঁদিয়া কাটিয়া এবং তাহাকেও কাঁদাইয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে চলিয়া গেল। তাহার সেই "মাগো মাগো" ডাক এখনও যেন কাণের কাছে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ঠিক এমনই সময় "মাগো" বলিয়া পিছন হইতে কমল আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা ত অবাক! পাগলী মেয়ের এ কি কাণ্ড! গায়ে হাত দিয়ে দেখেন জ্বরে তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, কথা কহিবার ক্ষমতাটুকুও নাই; নিশ্চেতনের মত মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে পড়িয়া রহিল।

ক্রমাগতঃ ৭ দিন মরণের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়া ৮ দিনের দিন কমল চোখ মেলিয়া চাহিল। মাথাটি ঘুরাইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এ ত তাহাদের নিজেদের বাড়ীই বটে! সে তবে ঠিক জায়গাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঐ তাহাদের সেই পুরাণো ঘড়ীটা ঠিক আগেকার মতই টিক টিক করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। তাহার পাশেই বিবেকানন্দের ছবিখানি—এ ছবিটি কমলের বেশ ভালো লাগিত। ওপাশের দেয়ালে দাদার আয়না আর চিরুণী ঝুলিতেছে; ঐখানে দাঁড়াইয়া দাদা রোজ মুখ দেখে আর চুল আঁচড়ায়। কমলের ইচ্ছা করিতেছিল একটু কাৎ হইয়া এ আয়নার মধ্যে নিজের মুখখানি একবার দেখিয়া লইবে, কিন্তু অত দূর হইতে দেখা যায় না। আলনার ভিতর হইতে ছোড়দির খয়েরী পাড়ওয়ালা শাড়ীটার একটা অংশ দেখা যাইতেছিল। ঐ শাড়ীটিইত ছোড়দি নিজের হাতে কাটা সূতা দিয়া তৈরী করাইয়াছিল। কমলের মনে পড়িল ছোড়দির সঙ্গে সঙ্গে সেও ত তকলী দিয়া কত সূতা কাটিত। দাদামণি তাহার হাতের কাটা সূতা দেখিয়া কত প্রশংসা করিতেন। মনে হইল একযুগ পরে যেন সে আবার তাহাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। উহাকে দেখিয়াও তাহার খুব ভাল লাগিতে লাগিল। এ বাড়ীর যা কিছু, সবই যেন সুন্দর।

বিছানার পাশে মাথার কাছে মা বসিয়াছিলেন, চোখে তার জল। কমল মনে বড় ব্যথা পাইল, ভাবিল তাহার অবাধ্যতার জন্যেই মা বোধ করি কাঁদিতেছেন; মনে হইল তাহার মা বড় দুঃখী, চিরকাল বোধ হয় কেবল কষ্টই পাইয়াছেন। সে তাহার মায়ের হাত দুখানি তাহার হাতে লইয়া বলিল "মা, আমাকে ওখানে আর পাঠিয়ো না।" মা আর সামলাইতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোকে আমি আর কোথাও পাঠাবো না, এখানেই থাকিস্ তুই। এখন তুই সেরে ওঠ্।" মেয়ের মুখে এবার হাসি ফুটিল। সে দুই হাতে তাহার মায়ের চোখ মুছাইয়া দিল, শেষে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তুমি কিচ্ছু ভেবোনা মা। তুমি দেখো আমি কাল সকালেই ভাল হয়ে যাবো। পরশুই আমাকে ভাত দিতে হবে কিন্তু।"

সত্যেন্দ্রমোহন সেন



"শরৎ-বন্দনা"

সাহানা মিশ্র—একতালা

শরৎ আলো, প্রাণের আলো,
এলো, এলো, এলো রে,—
পরাও ভালে তিলক-লিখা,
বিজয়-বিষাণ তোল রে!

বিশ্ব-গুণীর সভাতলে,
আপন আসন পাত্‌লো যে,—
রত্নাকরের আগার খুলি,
রত্নমালা আনলো সে;—

বাঙ্‌লা মায়ের সোনার ছেলে,
বাণীর বরের পরশ পেলে,
বরণ করে
তোলো ঘরে,
জয়ের প্রদীপ জ্বালোরে!

সেই সে গুণী, রূপ-গুণাকর,
আজকে এলো সবার ভিতর,
বন্দনা গান,
ছন্দ সুতান,
কণ্ঠ-সুধায় ঢালোরে!!

কথা ও সুর—শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

স্বরলিপি—শ্রীতারকনাথ দে

I { পা র্সা ৷ । র্সা র্সনর্সা -নর্সর্রা । র্সা ণা র্সা । ধা পা -া I
শ র ত আ লো • প্রা ণে র আ লো •

I পা ণা -া । ধা পা -া । সা রা -গমা । জ্ঞা -া -া I
এ ল •• এ ল • এ ল • রে • •

সাহিত্যিকপ্রবর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মদিবস উপলক্ষে
শরৎ-বন্দনা উৎসবে ব্যবহারের জন্য রচিত।

I সা মা মা । মা মা -া । মা পা ধা । মপা জ্ঞা -া I
প রা ও ভা লে • তি ল ক লি খা •

I র্রা র্রা জ্ঞ্রা । র্রা র্সা র্সা । সা রা -পমা । জ্ঞা -া -মা II }
বি জ য় বি ষা ণ তো ল ে রে • •

I(না -া না । না না ধা । না নর্সা -া । না র্সা -া I
বা ং লা মা য়ে র সো না র ছে লে •

I পা র্রা -া । র্সা র্রা -া । র্সর্রা র্সণা ণা । ধা পা -ধা I) }
বা ণী র ব রে র প র শ পে লে •

I র্সা র্রা র্পা । র্মর্পা র্মজ্ঞ্রা -া । জ্ঞ্রা র্মা -া । র্রা র্সা -া I
ব র ণ ক রে • তো ল • ঘ রে •

I সা রা রা । রা রা সা । সা রা -পমা । জ্ঞা -া -া II
জ য়ে র প্র দী প জ্বা ল • রে • •

I সা -া সা । রা রা -া । গা গা -া । মা মা -া I
বি • শ্ব গু ণী র স ভা • ত লে •

I মা ধা ধা । ধা ধা দা । ধা র্সা র্সা । ধা -া -া I
আ প ন আ স ন পা ত ল যে • •

I না না র্সা । না র্সা র্সা । না না র্সা । না র্সা -মা I
র ত্ না ক রে র আ গা র খু লি •

I গা মা পা । ধা ণা -র্সর্রা । ধা র্সা ণধা । পা -া -া I
র ত ন মা লা • আ ন ল সে • •

I { না না না । না না -ধা । না র্সা না । র্সা র্সা র্সা I
সে ই সে গু ণী - রূ প গু ণা ক র

I পা র্রা র্রা । র্সা র্রা -া । র্সর্রা র্সণা া । ধা পা ধা } I
আ জ কে এ ল • স বা র ভি ত র

I র্সা র্রা পা । মপা মজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা মা মা । র্রা র্সা র্সা I
ব ন্ দ না গা ন ছ ন্ দ সু তা ন

I সা রা রা । রা রা সা । স রা -গমা । জ্ঞা -া -া II II
ক ন্ ঠ সু ধা য় ঢা লো : য়ে • •



অসমাপ্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

৯

দাদা ডাক্‌লো 'প্রকৃতি' আমি শুনতে পেয়েও উত্তর দিলুম না কারণ তখন একটা গল্প পড়্‌ছি। দাদা ফের দু'বার তিনবার ডাক্‌লো। দেখলুম চুপ করে থাকা চলে না। একটু বিরক্তির সঙ্গে বল্লুম 'কেন?' দাদার কাছে যেতে বল্লে "কই তুই আমায় গোলাপ ফুল এনে দিবি বলেছিলি দিলি না তো?" আমি বললাম 'সে ধারে এখনো যাইনি তো, যখন যাবো তোমায় এনে দেবো।' দাদা বল্লে "আচ্ছা 'গাং' ধারে চল।" যেতে যেতে আমি বল্লুম 'দেখ দাদা মেঘ করেছে কি রকম, ঠিক যেন বিকেলবেলা।' মেঘলা দিনে আমি নদীর ধারে বেড়াতে বড় ভালবাসি। বাঁধের উপরে বসে দেখ্‌তাম নদীর ওপার মেঘে ঢেকে গেছে, গাঢ় কালো মেঘের সঙ্গে ওপারের বনানীর রেখা মিশে এক হ'য়ে গেছে। নদীর জল কালো হ'য়ে গেছে। জোলো হাওয়া গায়ে এসে লাগতো, যেদিন মেঘলা করে কিম্বা বৃষ্টি হয় সেদিন আমার কোন কাজ, কোন চিন্তা ভাল লাগে না; কেবল চুপ করে বসে দেখতে ইচ্ছে হয়। নদীর ধারে বাঁধের উপর বসলাম। একটা জাহাজ যাচ্ছিল। দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম 'হ্যাঁ দাদা এই নদী দিয়ে তো বিলেত যাওয়া যায়।' দাদা বল্লে "হ্যাঁ এখান দিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায়।" আমি কলকাতার দিক দেখিয়ে বল্লুম 'এই দিকে বিলেত না?' দাদা বল্লে "দূর্‌, ওদিকে যে কলকাতা, সাগর যে দিকে সেইদিকে বিলেত, এইদিকে।" আমি বল্লুম 'আমার কিন্তু ঠিক উল্‌টো ধারণা ছিল। আচ্ছা শুনেছি বিলেত যেতে হ'লে একটা বড় মূর্ত্তির তলা দিয়ে জাহাজ যায়।' দাদা বল্লে "হ্যাঁ আগে যেতে হোত এখন আর হয় না, মূর্ত্তিটা ঝড়ে পড়ে গেছে।" আমি বল্লুন 'দাদা তুমি যখন বড় হ'য়ে বিলেত যাবে তখন এই নদী দিয়ে যাবে তো? আমরা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌বো তোমার জাহাজ যাবে দেখব।' দাদা হাসলে, বল্লে "আমি যদি বোম্বাই হয়ে যাই, আর ততদিন কি আমরা এখানে থাকব?" আমি একটু ভেবে বল্লুম 'তা বটে।' দাদা বল্লে "বড় হ'য়ে আমি এখানে বাড়ী করবো, বাগান ঘেরা ছোট্ট মেটে বাড়ী হ'বে; লালটালির চাল হ'বে; ঠিক ছবির মত সাজানো।" আমি মুখ বিকৃতি করে বল্‌লাম, 'মাগো মেটেবাড়ী কি বিশ্রী, কেবল সারাও, খালি গোবর দাও, তারপর চাকর বাকর না থাক্‌লে নিজেদের করতে হবে, কে করবে তখন, তোমার কি পছন্দ, এত সব অদ্ভুত খেয়াল পাত কোথা থেকে?' দাদা বল্লে "আমার পছন্দ ভালই, তোরই পছন্দ নেই। মেটে বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে কোটাবাড়ী তার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমি চাকরি করবো না অনেক জমি কিনবো তা'তে নানা রকম ফসল লাগাবো।" আমি বল্লুম 'কি নিজেই চাষে লেগে যাবে লাঙ্গল নিয়ে।' দাদা বল্লে "না, আমি লোক দিয়ে করাবো, নিজে দেখবো শুনব। গোপালদা'দের কাছে যে জমি আমাদের আছে মা বলেছে যদি কেউ দেখে শোনে তাহ'লে ওরা আর ফাঁকি দিতে পারবে না। সেও আমি দেখব। একটা খুব বড় লাইব্রেরী করব।" দাদা একটু চুপ করে থেকে বল্লে "আচ্ছা এখন আমাদের ছোট দেখে লাইব্রেরী করলে হয় না?" আমি বল্লুম 'হবে না কেন করলেই হয়, এখন বাড়ী চল বৃষ্টি আসছে।'

১০

দাদা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, তখন থেকে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত ভক্ত হ'য়ে উঠল। যতদিন যেতে লাগল ততই দাদা ভগবৎ ধ্যানে তন্ময় হয়ে উঠ্‌তে লাগল। এক এক সময় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌তো। একদিন পরমহংসদেবের ছবির সাম্‌নে ধ্যান করছে, ছবির সাম্‌নে একটা জলন্ত ধূপ ছিল, এক সময় সেই ধূপের উপর কপাল ঠেকে পুড়ে গেল, অনেকটা পুড়ে যাবার পর দাদার হুঁস হোল। আমরা অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে লুকিয়ে দেখতাম দাদা কি করে। এই ব্যাপার দেখবার পর আমি মাকে সব বল্লুম 'মা দাদা রামকৃষ্ণদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আপ্‌না আপ্‌নি কি বলে, আবার মাথা নাড়ে সে সময় আমরা ঘরে ঢুকলেও টের পায় না।' ক্রমশঃ দাদার এই অবস্থা বেড়ে চল্‌ল। আমাদের সঙ্গে কথা কইছে হঠাৎ আমরা উত্তর না পেয়ে দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখে চুপ করে যেতাম; সে সময় দাদা ভুলে যেতো যে আমরা সামনে রয়েছি। যদি বাইরের লোক কেউ থাক্‌তো তা'হলে আমরাই দাদাকে সাবধান করে দিতাম। এই ভাব দাদার অনেকদিন ছিল। সেকেণ্ড ইয়ারে শেষের দিকে দাদা ক্রমশঃ সব কমিয়ে ফেল্‌লে তারপর একদিন বল্লে "বাহ্যিক আর কিছু নয়।" সেই থেকে দাদা বাহ্যিক সব ছেড়ে দিলে। এ সব সম্বন্ধে দাদা কাউকে কিছু বল্‌তো না কি জিজ্ঞেস কিছু করতোনা। খুব চাপা ছিল এ বিষয়ে।

১১

আবার আমরা কাশী এসেছি। এবারেও আমরা খুব বেড়াতাম। সকালের দিকে ভোর থাকতে উঠে সবাই এক সঙ্গে বেরুতাম। আমরা দুজনে পরামর্শ করে সকলকে পেছনে ফেলে যাবার জন্যে খুব জোরে হাঁট্‌তাম। একমাইল দু'মাইল পেছনে বাবা মা থাকতেন, দিদি 'ত্রিশঙ্কুর' মত মাঝখানে থাকৃত। প্রাণপন জোরে হেঁটে আমাদের সঙ্গ ধর্‌তে চাইতো কিন্তু পার্‌তোনা। আমরা বল্‌তাম 'দিদি তুমি বাবা মার সঙ্গে এস।' দিদি বল্‌তো তোরা যদি একটু আস্তে হাঁটিস্ তা'হলে আমি তোদের সঙ্গে ঠিক যেতে পারি।" আমরা রাজি হতুমনা বল্‌তুম "না তোমায় নিয়ে আমরা যাবনা।" দিদি বল্‌তো "কেন প্রকৃতি তোর বোন আমি বোন নই?" দাদা বল্‌তো "তুমি বড় ও ছোট।" আমরা ইচ্ছে করে দিদিকে পেছনে ফেলবার জন্য আরো জোরে হাঁট্‌তাম। আমরা দুজন গুরুধামে যেতাম। সেখানে বকুল ফুল কুড়িয়ে আবার যেতুম দুজনে রোজই ফুল কুড়াতাম। দাদা ফুল কুড়োতে কুড়োতে বল্লে "সব ফুল শুঁকিসনি, রামকৃষ্ণদেবের জন্য নিয়ে যাব।" আমি বল্লুম 'আচ্ছা' তারপর একটু পরে দাদাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "দাদা তোমার বকুল ফুলের গন্ধ কেমন লাগে?" দাদা বল্লে "খুব সুন্দর, তোর কেমন লাগে?" আমি বল্লুম "ভাল লাগেনা, বড় উগ্র গন্ধ।" দাদা বোধ হয় এ উত্তর আমার কাছে আশা করেনি, অবাক হয়ে বল্লে "ভাল লাগেনা তোর, অদ্ভুত তুই। এফুলের গন্ধ কে না ভালবাসে? এমন সুন্দর গন্ধ যদি তোর ভাল না লাগে, কি ভাল লাগে শুনি?" আমি বল্লুম "আমার ভাল লাগে গোলাপ, চাঁপা, চামেলি, আরো অনেক রকম। বকুলফুল কাব্যেই ভাল লাগে বাস্তবে না।" দাদা বল্লে "যাদের ফুলের গন্ধের কোন জ্ঞানই নেই তারাই একথা বলে।" আমার মুখের গোড়ায় প্রতিবাদ এলেও চুপ করে রইলাম।

সেদিন শঙ্করাচার্য্যের মঠ থেকে ফেরবার সময় বাবা বল্লেন "রোজ তোরা এগিয়ে যাস্ আজ আমরা ঠিক তোদের সঙ্গে যাব।" আমরা বল্লুম 'আচ্ছা দেখা যাক্।' দাদা বল্লে "প্রকৃতি যে করে হোক্ ওদের আজ হারাতেই হবে।" আমি সেদিন বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, দাদা আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগল, আমিও খুব জোরে হাঁট্‌তে লাগ্‌লাম। খানিকটা যাবার পর আমার পায়ের গোড়ালীতে জ্বালা অনুভব কর্‌লাম, বুঝলাম নতুন জুতোর ঘেঁস্‌ড়ায় ফোস্কা পড়ে ছিঁড়ে গেছে তাই জ্বালা করছে। আমি দাদাকে বল্লুম "জুতো খুলে ফেলি বড্ড জ্বালা কর্‌ছে।" দাদা বল্লে 'ওরকম আমারো করছে তুই চ'লে আয়।' আমি বল্লুম "না দাদা যদি বিষিয়ে যায়।" দাদা বল্লে 'না তোর জুতো খু'ল্‌তে হ'বে মোজা খুল্‌তে হ'বে, সে দেরী হ'য়ে যাবে।'

আমি বল্লুম "আমি যে আর হাঁটতে পারছিনা, তুমি এগিয়ে যাও আমি আস্তে আস্তে ওদের সঙ্গে যাই দাদা।" দাদা রাজি হোলনা, এদিকে ওরা এগিয়ে এসে পড়ল। দাদা বল্লে "আচ্ছা আমি তোকে কোলে নিয়ে যাব, এরাস্তায় খুব কম লোক, যখন লোক দেখ্‌ব তখন তোকে নামিয়ে দেবো, আবার লোক চলে গেলে তুলে নেবো।" তাই দাদা কর্‌লে। অল্প শীত পড়েছিল বলে আমার গায়ে একটা খুব পাত্‌লা ভাগলপুরী চাদর ছিল, দাদা সেইটি দিয়ে আমায় আগাগোড়া ঢেকে নিল যাতে কেউ সহজে না বুঝতে পারে, তারপর দাদা খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌তে লাগল। আমি যখনই হাঁটতে পারতুমনা তখনই দাদা আমায় এমনি করে নিয়ে যেতো। দিদি বল্‌তো 'কচি খুকি আরকি, 'দাদার' কোলে চড়ে বেড়ানো হয়।' আমি বল্‌তুম "তোমাদের দাদা নেই কিনা তাই হিংসে হয় বুঝি।" বাড়ী পৌছলাম ওদের ঢের আগে। বাড়ী এসে দাদা নিজের পা আমাকে দেখালে। আমি দাদার সহ্যশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম, পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে একেবারে ছিঁড়ে গেছে, দাদা তার উপর এতখানি আমায় বয়ে নিয়ে এসেছে।

কালী পূজোর পরদিন আমরা কাশী থেকে রওনা হতুম। এবারেও আমরা তাই হলুম। দশটায় ট্রেণ। আমরা যে কামরায় উঠেছিলাম তাতে ধারের দুদিকের বেঞ্চ দু'জন হিন্দুস্থানী দখল করে বসেছিল। মাঝের বেঞ্চে আমাদের বস্‌তে হবে দেখে আমার ভারি বিরক্তি বোধ হো'ল। আমি উঠেই শুয়ে পড়লাম। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে দেখি বিকেল হয়ে গেছে। এমন চমৎকার বিকেল বেলা! আমি কিচ্ছু দেখ্‌বো না। দাদা সামনের ধারের বেঞ্চে বসেছে আমি উঠে দাদার কাছে বসলাম। তখন আমি পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখ্‌ছি, কৈশোরের মধুর বাঁশী আমার কাণে এসে বেজেছে। স্বভাবের বিচিত্র শোভা কোনদিন আমি অবহেলা করিনা, চিরদিনই সে আমার কাছে নিত্য নতুনরূপে এসেছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃতির শোভা এতসুন্দর এত বিচিত্র কেন? কোথাও কি একটু কম নেই, কোনদিন কি এশোভা পুরোণ হয়না। এখন তো এখানে গাছপালা কি নদী কিছুই নেই, শুধু জনশূন্য প্রান্তর। আস্তে ধীরে ধূসর সন্ধ্যা নাম্‌ছে, চার্‌দিক কি গভীর নিস্তব্ধ! আকাশে ও মাটীতে এক বিরাট শান্তি জেগে রয়েছে, শান্ত গম্ভীর দৃশ্য! এই ছবি দেখেই বোধ হয় দাদা ভবিষ্যতে বলেছিল

"ধূধূ করা মাঠের পারে সূর্য্য যাবে অস্তাচলে
রঙীন হিয়া সন্ধ্যাবধূ ঝিঁঝিঁর ডাকে পড়বে ঢলে
সূর্য্য যাবে অস্তাচলে।"

সূর্য্য অস্ত গেল। দাদা বল্লে 'প্রকৃতি তুই আস্তে আস্তে রবিবাবুর "কত অজানারে...ঐটে বল্‌তো।' আমি বল্লুম, দাদাও সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লে, রাত বেড়ে চল্‌ল। আমি নিজের জায়গায় এসে শুয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনা হঠাৎ "ওরে গটি গটীটা..." চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর দুটি ছেলে নিয়ে ট্রেণে উঠেছেন। অনেক বকাবকির পর ভদ্রলোক সুস্থির হয়ে বস্‌লেন। তারপর বাবার সঙ্গে ভদ্রলোক খুব কথা কইতে আরম্ভ করে দিলেন। আমার তন্দ্রা আসছিল, কতক কতক কথা কাণে এসে ঢুক্‌ছিল। ভদ্রলোক যশোহরের উকিল, যশিডীতে দুই ছেলের সঙ্গে হাওয়া খেতে এসেছিলেন। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গতে উঠে মুখ ধুয়ে এলাম, দেখি যশোহরের উকিলের ছেলেদুটি মা'র সঙ্গে কথা কইছে ঠিক যেন কত কালের পরিচিত। আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ভাবলাম যশোরের লোকেরা আচ্ছা কথা কইতে পারে তো। দাদা আর আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখ্‌তে লাগলাম। সূর্য্য তখনো ওঠেনি, লাইনের ধারে ধানের ক্ষেত, বেশী দুর দৃষ্টি চলেনা কুয়াসায় ঢাকা, সূর্য্য উঠ্‌ছে। আমি দাদাকে বল্লুম "আচ্ছা দাদা এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখে বুঝি শিল্পীরা ছবি আঁকে।" দাদা একটু হাস্‌লে। আমি বুঝলাম তখন বেশী কথা কইলে দাদা বিরক্ত হবে। আমার মনে হোল, আমি যদি ছেলেদের মত স্বাধীন হতুম তাহলে আমি সারাজীবনই ঘুরে ঘুরে স্বভাবের শোভা দেখে বেড়াতাম।

১২

দাদা অঙ্ক কস্‌তে কস্‌তে বল্লে "প্রকৃতি, অঙ্ক কসবি আয়, দুজনের মধ্যে কে বেশী অঙ্ক কসে দেখ্‌ব, একঘণ্টা সময়।"

আমি খুব খুসী হ'য়ে দাদার সঙ্গে অঙ্ক কস্‌তে বস্‌লাম। খানিকটা কসবার পর দাদা বল্লে "তোর কটা হোল রে। ওঃ মোটে চারটে, কি অঙ্ক কসিস্ তুই ?" আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লুম "খুব নীচের অঙ্ক, কেউ আমায় অঙ্ক কস্‌বার প্রসেস্ বলে দেয় না, নিজে বই দেখে ভাল বুঝতে পারি না।" দাদা বল্লে "আচ্ছা আমার পরীক্ষা হ'য়ে যাক, তোকে আমি দু'বছরের মধ্যে ম্যাট্রীক্ অবধি অঙ্ক কসতে শিখিয়ে দেবো"। দাদার তিন মাস বাদে ম্যাট্রীক্ পরীক্ষা ছিল। একটু খানি পরে আমি আস্তে আস্তে সেইখেনে শুয়ে পড়লাম দেখে দাদা বল্লে "ওকিরে শুয়ে পড়লি যে আর কসবি না ?" আমি বল্লুম "আমার পিট্ কন্ কন্ করছে, আর অঙ্ক কসতে আমার ভাল লাগেনা, অঙ্ক ছাড়া আমায় যা দেবে তা' আমি সারাদিন ধরে পড়তে পারি। অঙ্ক কস্‌তে গেলেই আমার ঘুম আসে।" দাদা বল্লে "আমার অঙ্ক কসতে বস্‌লে ঘুম পালিয়ে যায়।" আমি বল্লুম "দাদা তুমি অঙ্ক কস, আমি উঠে যাই।" দাদা বল্লে "না তুই যাস্‌নি আমার আর বেশী দেরী নেই, আমার একলা পড়তে ভাল লাগেনা, তুই কিন্তু কথা বলিস্‌নি, চুপ করে ব'সে থাকবি।" আমি বসে রইলাম কিন্তু কতক্ষণই বা চুপ করে বসে থাকা যায়। খানিক বাদে বল্লুম "দাদা এখন কত অঙ্ক কসবে, আমি কতক্ষণ বসে থাকব ?" দাদা বল্লে "আঃ তুই বড্ড জ্বালালি, বলছি হ'য়ে এল একটু বোস্।" আমি বল্লুম "আচ্ছা তোমার পড়া হ'য়ে গেলে আমায় ইংরিজি কবিতা পড়ে শোনাবে বল।" দাদা রাজি হোল, দাদার মুখে কবিতা শুনতে আমার খুব ভাল লাগতো। দাদার অঙ্ক কসা হ'য়ে গেলে আমি দাদাকে জিজ্ঞেস্ করলাম "বলতো দাদা শালগ্রাম শীলার ইংরিজি কি ?" দাদা বল্লে "তুই বল্‌না আগে" আমি বল্লুম "আমি প্রশ্ন করলুম আর আমি জানিনা, তুমি বল।" দাদা বল্লে। তারপর একটা ইংরিজি কবিতা শুনিয়ে বল্লে "যা এখান থেকে এখন।" দাদার একজামিন এসে পড়েছিল সেই জন্য দাদা বেশী সময় নষ্ট করতে পারতোনা, নিজে একলাই পড়তো একটুখানি সাহায্য পায় এমন কেউ ছিল না। অনেকে মাষ্টার রাখবার কথা বল্লে। বাবাও দাদাকে বল্লে "অচু তুই যে মাষ্টারকে ভাল বুঝিস তাঁকে রাখ্, তোর পড়ার সুবিধে হ'বে।" দাদা বল্লে "হ্যাঁ একজন সাহায্য করবার লোক থাক্‌লে খুব ভাল হোত, কিন্তু এখানের মাষ্টার রেখে আমার বিশেষ কিছু সুবিধে হ'বেনা, আমি দেখেছি আমি যা' চাই তা' এঁদের জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু এঁরা যা বলেন তা আমার মনঃপুত হয়না।" লেখা পড়ায় দাদা যা ভাল বুঝতো তাই হোত।

দাদা যখন ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠে তার আগে থাক্‌তেই আমি কেবলি ভাবতাম—দাদা যখন কলেজে পড়বে তখনো কি ঠিক এই রকমই থাক্‌বে, এই রকম করে আমাদের সঙ্গে মার্‌বেল, লুডো, বাগবন্দি খেলবে, এইরকম করে শুধু শুধু আমাদের সঙ্গে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঝগড়া আর ভাব করবে !

১৩

আমার মনে হোল দাদার পরীক্ষার ফল বা'র হোলে আমি বাইরে কি করে মুখ দেখাব। ডায়মণ্ড হারবার শুদ্ধ, সব লোক যে দাদার ম্যাট্রিকের ফলের দিকে চেয়ে ছিল। ওকে কেন সবাই মিলে আকাশে তুল্‌লে। আরো কত রকমের কথা মনে আস্‌তে লাগল। সকলেই বল্লে যখন অত নম্বর ছেড়ে দিয়েছে তখন আর স্কলারসিপ্ পাবার আশা নেই। ওখানকার একজন উকিল তিনি দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কেবল তিনি বল্লেন "অচু যতই খারাপ করুক তবুও স্কলারসিপ্ পাবে।" আমরা শুনে বল্লুম "হ্যাঁ, দাদা যদি মোটে একজামিন্ না দিতো তা'হলেও 'নারাণবাবু' বল্‌তেন "অচু তবুও পাশ হ'বে।"

আমাদের দিন এই সময় ভারি ভাবনার মধ্যে দিয়ে কাটছিল। শুধু দাদা নির্ব্বিকার! নিজের পড়াশুনার মধ্যে দাদা আবার ডুব দিল। একদিন দাদা আমায় একটা কবিতা শোনালে। এই দাদার প্রথম কবিতা। আমি কবিতা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, দাদা বাঙ্গলা কবিতা তখন খুব অল্প পড়েছিল। ছোট ছেলেদের কবিতা কখন কখন পড়তো। কবিতার নাম ছিল 'শ্বেত শতদল'। দাদা বল্লে "কেমন হয়েছে রে"। আমি বল্লুম "বেশ সুন্দর, কেউ ধরতেই পারবে না যে এটা তোমার প্রথম লেখা, তুমি যদি

লেখ তবে পরে একজন বড়দরের কবি হ'তে পার।" দাদা বারণ করে দিলে কবিতার কথা কাউকে যেন না বলি: দিন চারেক বাদে আমি দাদাকে বল্লুম "দাদা তোমার কবিতাটা আমায় একটু দাওনা আমি নিজে পড়ব।" দাদা বল্লে "কবিতাটা আমার ভাল লাগেনি, আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।" আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম "তুমি তো ভারি অদ্ভুত।"

কিছুদিন বাদে খবর এল দাদা ফোর্থ্ হ'য়েছে। তারপর চলে গেল কলকাতায় কলেজে পড়তে। বাড়ীটা বড় নিস্তব্ধ বোধ হোত। সোমবার দাদা চলে যেতো, মঙ্গলবার থেকে আমি দিন গুণতাম, কবে শনিবার আস্‌বে কেবল এই প্রতীক্ষা করতাম। শনিবার বিকেলে ট্রেণ আসবার সময় হোলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম রাস্তার দিকে চেয়ে। দাদাকে দেখ্‌তে পেলেই ছুটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতাম "দাদা আস্‌ছে, দাদা আস্‌ছে।" দাদা এলে এই সাতদিনের কথা যেন অজস্রধারে বলেও তৃপ্তি পেতাম না। আর দাদা বাড়ীতে ঢুকে অবধি অনর্গল কথা বলে যেত। দাদার অতি তুচ্ছ কথাও আমাদের অতি প্রিয় ছিল। দাদা নিজের লেখাপড়ার, ছেলেদের, প্রফেসরদের, এই সব গল্পই বেশী কর্‌তো। "ছেলেগুলো কি দুষ্টু মা, কি রকম সব মিছি মিছি অনিষ্ট করে।" আমি জিজ্ঞাসা করতাম "আচ্ছা দাদা, বঙ্গবাসীতে মেয়েরা পড়ে না কেন?" "মেয়েদের নেয়না।" "না তুমি জাননা দাদা, মেয়েরা ইচ্ছে করে যায় না, ওখানের ছেলেগুলো দুষ্টু কিনা, অন্য কলেজে তো যায়।" দাদা বল্লে "ইস্‌ তা' হলে কিনা হোত, যাক্ দিকি মেয়েরা প্রেসিডেন্সিতে!' আমি বিষণ্ণ হ'য়ে বল্লাম "কেন নেয়না দাদা মেয়েদের?" দাদা বল্লে "মেয়েদের ভারী কথায় কথায় চোখের জল পড়ে, মোটে কোন রকম দায়িত্ব জ্ঞান নেই—"আমি রেগে বাধা দিয়ে বল্লুম "দেখ দাদা, ভাল হ'বেনা বল্‌ছি, তুমি যে রাতদিন মেয়েদের দোষ দেখাও। পুরুষদের বুঝি মোটে দোষ নেই, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের শারীরিক শক্তি বেশী আছে বটে কিন্তু মনের জোর একটুও নেই ছেলেদের। ছেলেরা যেমন পয়সা আনে মেয়েরা তেম্‌নি নিজেদের সব স্বার্থ বলি দিয়ে কিসে তোমরা ভাল থাক তার জন্য প্রাণপাত করছে। মেয়েদের নাহলে তোমাদের চলেনা কিছুতেই।" দাদা বল্লে "নাইবা মেয়েরা আমাদের কর্‌লে, আমরা নিজেরাই সব করে নিতে পারি।" আমি বল্লুম "আমরাও কি নিজেরা রোজগার কর্‌তে পারিনা, অন্যদেশের মেয়েরা করছে না?" দাদা বল্লে "তোমরা তাও পুরুষের সাহায্য ভিন্ন পারবেনা। তোমাদের লেখাপড়া কা'রা শিখিয়েছিল, কারা তোমাদের চোখ ফুটিয়েছে।" আমি বল্লুম "সে আর বড়াই কোরনা। নিজেদের স্বার্থ ছিল তাই শিখিয়েছিলে। আর তোমরাই বা ক'ার দেহ থেকে বেরিয়ে পৃথিবী দেখ্‌ছ গো।" দাদা বল্লে "সে তো তোমাদের ভগবান বাধ্য করিয়েছেন।" "আচ্ছা তোমার কথাই না হয় ধরে নিলাম, কিন্তু মেয়েরা যদি ছোট ছেলেদের মানুষ না করে, তাদের তোমরা কি খাওয়াবে?" দাদা বল্লে "কেন গরুর দুধ।" আমি হাসি চেপে বল্লাম "গরুও যে স্ত্রী।" দাদা একটু ভেবে বল্লে "আচ্ছা বার্লি খাওয়াব।" "তা'হলে যে একদিনেই ভবলীলা সাঙ্গ করবে।" দাদা বল্লে "মরে গেলে টেনে ফেলে দেবো।" "ওমা তা'হলে যে দুদিনেই পৃথিবী উজাড় হয়ে যাবে।"

প্রকৃতি ঘোষ

ওরা ও আমরা

ডাঃ ডি, আর, ধর, এম-বি, ডি-টি-এম, (কলিঃ) এম-আর-সি-পি (লণ্ডন)

ওদেশে কোনও লোকই প্রায় বসে খায় না। যার শরীর খারাপ, দুর্ব্বল সেই কেবল বসে খায়। প্রায় লোকই সকাল আটটা বা নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা এবং কেউ কেউ আট দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করে। জীবন যাত্রা এদের দেশে খুব কঠিন। তার অনেক কারণ। প্রথমতঃ এত শীত যে বেশ ভাল রকম পোষাক থাকা দরকার, নইলে শীতে খুব কষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঘর বাড়ী গরম রাখার জন্যে কয়লা পোড়াতে হয় তার দাম অনেক। তৃতীয়তঃ, খাদ্য বেশীর ভাগ মাংস-জাতীয় এবং মাংসজাতীয় খাদ্যের দাম বেশী, আলু ও চাল জাতীয় খাদ্যের চেয়ে।

তার পর এদের একজন গরীব লোকের বাড়ীর আসবাব পত্র আমাদের দেশের সাধারণ ধনী লোকের বাড়ীর মত। মেজেতে কার্পেট পাতা—মোটা মোটা গদিওয়ালা নরম চেয়ার—পিয়ানো, ছবি, বিজলীবাতি—এ প্রায় সব বাড়ীতেই আছে। আর যার অবস্থা একটু ভাল তার একখানা Motor car আছেই। তাই আমাদের দেশের তুলনায় এরা ঢের বেশী আরামে থাকে বলেই এত পরিশ্রম করতে হয়, কারণ বেশী পরিশ্রম না করলে এই রকম খাওয়া-থাকার পক্ষে যথেষ্ট টাকা রোজগার হয় না।

এখানে আমাদের দেশের ও ওদের দেশের শ্রমজীবিদের আয়ের একটা মোটা-মুটি ধারণা দিতে চাই। যে রাস্তা ঝাড় দেয় বা এই রকম কোন সামান্য কাজ করে তার মাইনে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২৫।৩০ টাকা। অবশ্য সে কাজ করে আমাদের দেশের প্রায় ২ জন ঝাড়ুদারের সমান ত নিশ্চয়ই, বেশিও হতে পারে। ওদেশের লোকের পরিশ্রম করবার ক্ষমতা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে ঢের বেশী।

ওদেশে জাতি-ভেদ নেই—অনেক জুতোর ব্যবসায়ীর ছেলেকে দেশের নেতা হয়ে দেশবাসীর পূজ্য হতে অনেক বার দেখা গেছে। ফেরিওয়ালা থেকে সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক পণ্ডিত অনেকেই হয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত ওসব স্বাধীন দেশে শত শত। আমাদের দেশে আমরা গণ্ডী দিয়ে দিয়ে সব এমন করে বেঁধেছি যে মুচির ছেলে হাজার যোগ্য হলেও সে সহজে দেশপূজ্য হতে পারবে না। এই সব জাতি-ভেদের কঠিন গণ্ডীর কথা তলিয়ে দেখলে দেখা যায় আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা কোথায় এবং কেন আমরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখি না। যে সারা জীবন আমার প্রতিবেশী এবং আমার জুতো পরিষ্কার করে দেয় তাকে ঘরে ঢুকতে দেবো না, তা হলেই হাঁড়ি মারা যাবে—এই যে সঙ্কীর্ণতা যা মানুষকে মানুষ বলে মানতে চায় না এর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা কেমন করে জন্মাবে? আমাদের দেশে ছেলেবেলা থেকে উঁচু জাতের ছেলেরা শেখে "ও মুচি, ওকে ছুঁতে নেই জাত যাবে, ও চামার, ও নীচু—ইত্যাদি"। আমরা ভারতে শিখি "আম্‌রা বড় জাতের ছেলে আম্‌রা উঁচু"। কিন্তু সত্যি যদি ভেবে দেখা যায় তা হলে বলতে হয় আম্‌রাই ত নীচু। যাদের মন অত ছোট তারা কি উঁচু হতে পারে? তার পর এই সব সঙ্কীর্ণতার সব চেয়ে বড় দোষ হচ্ছে এই যে, ঐ সব লোক যাদের নীচু বলে ঘৃণা করা হয়েছে কত শতাব্দী ধরে, তারাও ভেবেছে তারা সত্যি নীচু, হীন—অমানুষ। তাতে এই জাতির মেরুদণ্ড যারা তারাই প্রাণহীন মান-প্রতিপত্তিহীন জীবন যাপন করে আমাদের সুপ্ত জাতিকে আরো মরণের পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

বিলেতে একজন মুচীর চামারের বুকে কত জোর। সে জানে যে যদি তার ছেলে বুদ্ধিমান হয়, এমন কি সে নিজেই যদি পড়ে শুনে বিদ্বান হতে পারে তবে সে বড় লোক ত হ'তেই পারে, এমন কি সে দেশের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হতে

পারে। অবশ্য আমাদের দেশেও ইংরেজ শাসনে সকলেই বড় হতে পারে। কিন্তু সেই বড় হবার পথে সব চেয়ে বড় বাধা সামাজিক ও জাতিভেদগত। সে সব বাঁধন শিথিল না হলে ভারত চির সুপ্তই থাক্‌বে। যিনি যত বড় হিন্দুই হ'ন না কেন এখন সজাগ হয়ে মানুষকে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিন, নইলে পৃথিবীর বিপুল এবং দ্রুত গতিতে কত হাজার বছর তাদের পিছিয়ে থাকতেই হবে। বাইরের বৃহৎ জগৎটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন আমাদের দাসত্ব শুধু রাজনৈতিক নয় মানসিক এবং সামাজিকও। অনেক অবান্তর কথা এসে পড়্‌ছে। তবে এসব খুব দর্‌কারী কথা বলেই সকলকে ভেবে দেখ্‌তে বল্‌ছি। স্বাধীন ভাবে চিন্তা না কর্‌লে আর চল্‌বে না। গড্ডালিকার দিন গিয়াছে, নিজে ভেবে মাথা খাটিয়ে চলার দিন এসেছে। এই দিন য়ুরোপে ১০০ বছর আগে এসেছিল।

৩

লণ্ডনএ লোকে দুপুরের খাওয়াটা প্রায়ই হোটেলে সেরে নেয়। তাই কতগুলো বিপুল কোম্পানী গড়ে উঠেছে তারা কেউ কেউ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক্‌কে খেতে দেয়—অবশ্য পয়সা নিয়ে। তার মধ্যে A. B. C. অর্থাৎ Ærated Bread Co., "Llyons" ও Express Diary এই তিন কোম্পানীই সব চেয়ে প্রধান। এদের তিন কোম্পানীর শাখা লণ্ডনের প্রায় পাড়ায় পাড়ায়ই আছে। এখানে মহিলারা খাদ্যাদি এনে টেবিলে দেন এবং সব কাজই করেন। পুরুষ মানুষের সম্পর্কই নেই এ সব দোকানে। এই সকল প্রায়ই অল্পবয়সী মহিলাদের যোগ্যতা ও কর্ম্ম-পটুতা দেখ্‌লে অবাক লাগে।

এই সব ভোজনালয়ের খাদ্যাদি বেশ ভাল এবং সস্তাও। প্রায় ১ টাকায় বেশ ভালমত দুপুরের ভোজন হয়, অবশ্য এই সব কোম্পানির ভোজনালয়ে। কোন ভাল সম্ভ্রান্ত ভোজনালয়ে গেলে ৩৲ টাকা থেকে সুরু করে ৫৲ ৬৲ টাকা এবং বেশিও লেগে যেতে পারে। লণ্ডনে দুধ অতিশয় সস্তা—ছয় আনায় খুব ভাল দুধ এক সেরের বেশী পাওয়া যায়। ভাল নির্জ্জলা দুধ ত আমাদের দেশে প্রায় পাওয়াই যায় না। অথচ আমরা ধর্ম্মপ্রাণ ন্যায়বান জাতি—আমরা দুধে জল ও অখাদ্য মিশোতে দ্বিধা বোধ করি না—আর এই গোখাদক ম্লেচ্ছর দেশে সবই প্রায় খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায়। তা হলেই বোঝা যাবে সততা কোথায় গড়ে উঠেছে। আমাদের ধর্ম্ম ও সততা ব'ইতে কেতাবে পুরাণে—ওদের সততা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহারে ব্যবসায় বাণিজ্যে। এই সব সত্যিকারের গুণেই ওরা বড় আম্‌রা ছোট, ওরা শাসক আম্‌রা শাসিত।

হিন্দুরা গরুকে দেব্‌তা বলে মানেন, কিন্তু গরুর যত্ন সব সময় খুব বেশী করেন বলে মনে হয় না—অন্ততঃ য়ুরোপে যেমন গরুর যত্ন হয়,-গরুর কেন সর্ব্ব গৃহপালিত জন্তুরই—তেমন আমাদের দেশে কখনও হয় বলে মনে পড়ে না। ইংলণ্ডের কোন গ্রামে এক চাষার বাড়ীতে তার গরুর ঘর দেখ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম, সেখানে আমি শুতে পেলেই ধন্য হই এত সুন্দর পরিষ্কার খটখটে। এক একটা গরু প্রায় দশ পনেরো সের, সময় সময় আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয় প্রতিদিন। আমাদের দেশে, যেখানে মাংসজাতীয় খাদ্য গরমের জন্য তত উপযোগীও নয় এবং সাধারণে খায় না ও খেতে পায় না সেখানে দুধের আরো বেশী প্রচলন হওয়া দর্‌কার। এর জন্যে চিন্তা কর্‌তে হবে কেমন করে দেশে দুগ্ধবতী গাই সৃষ্টি হয়—কেমন করে যৌথ কারবার ক'রে দেশের লোককে প্রচুর পরিমাণে ভাল খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। ও সব দেশের লোকের প্রতিদিনের যা খাদ্য তা যদি আমাদের দেশের লোকে খেতে পেত তা হলে তারাও আমার মনে হয় এত মৃতবৎ থাক্‌ত না। উপযুক্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি না পেলে চিন্তাশীল বুদ্ধিমান জাত গড়ে ওঠা খুবই শক্ত। এও আমাদের জাতীয় জীবনের আর একটি ভীষণ সমস্যা। এই সমস্যার জন্য কতকটা বোধ হয় দায়ী আমাদের জাতীয় জীবনের অসৎ বিবেকহীন কার্য্যাবলী। দুধের সাথে জল, বার্লি এবং সময় সময় অখাদ্য মেশানো শুধু অসৎ কর্ম্ম নয় এতে মানুষের স্বাস্থ্য ও সময় সময় জীবনের হানি হবারও সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ঘিয়ে সাপের চর্বি পর্য্যন্ত মেশাতে কুণ্ঠিত হয় না যে দেশে সে দেশের লোকের যতই ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল হোক না কেন

তারা যে অসৎ তাতে আর সন্দেহ নেই। য়ুরোপে খাদ্য দ্রব্যের উপর কড়া পাহারা,—যাতে কেউ কিছু ভেজাল দিতে না পারে। তার উপর বড় কথা হচ্ছে যে এদের প্রায় সব জাতেরি একটা সততা সম্বন্ধে বেশ উচ্চ ধারণা আছে এবং তা মেনে ওরা চলে। অনেক সময় দোকানদার ওদেশে বলেই দেয় যে অমুক জিনিষটা নেবেন না ওটা খারাপ। আমাদের দেশে খারাপ জিনিস খরিদ্দারের ঘাড়ে অনেকেই চাপাতে পার্‌লে বেঁচে যায়, কিন্তু এর ফল হয় এই যে, যে খরিদ্দার একবার ঠকে সে আর তার দোকান মুখোও হয় না। এই অদূরদর্শিতার জন্যে আমাদের দেশে অনেক ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়।

কল্‌কাতার দুধের সমস্যা কবে মিটবে জানি না। তবে ওদেশের সব বড় বড় সহরের উপকণ্ঠে বড় বড় গোশালা আছে। তাতে সব ব্যবস্থা ত আছেই, গোচিকিৎসক পর্য্যন্ত আছে। তারা দুধ দুয়ে—সেই দুধ সামান্য গরম করে তার জীবাণু মেরে তা বোতলে বন্ধ করে গালা মোহর করে খরিদ্দারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এতে করে খারাপ দুধ সরবরাহ করার কোন ভয় থাকেনা। এরকম কত শত শত কোম্পানী যে আছে তার ঠিকানা নেই। এরা খুব টাকা রোজগার ক'রে বড় লোক হয়। আমাদের দেশে বিশেষ কল্‌কাতার উপকণ্ঠে এই রকম গোশালা ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি খোলেন তাতে বোধ হয় বেশ ভাল ব্যবসা চল্‌তে পারে। অনেক বি-এ, এম-এ পাশ করা লোক ৩০ টাকার চাক্‌রীর জন্যে লালায়িত হয়ে ঘোরেন, কিন্তু তাঁরা যদি চেষ্টা করে কল্‌কাতায় খাঁটি খাদ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করার চেষ্টা করেন তা হলে দেশের ত উপকার হয়ই, স্বাস্থ্যবান কর্ম্মপটু জাত গড়ে ওঠারও সাহায্য হয়।

ওসব দেশের লোকের স্বাস্থ্য একটা দেখার জিনিস। প্রায় সকল লোকই সুস্থ। স্বাস্থ্য-বিভাগের গুণে ওসব দেশে কোন রোগই প্রায় হতে পারে না। কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, জ্বরাতিসার ইত্যাদি ব্যাধি ওরা দেশ থেকে তাড়িয়েছে বল্‌লেই চলে। তবে ইংলণ্ডে আজকাল একদল বায়না ধরেছে টিকে নেবে না। তারাই ওদেশটাকে আবার বসন্তের খনি করে তুলবে। জার্ম্মানিতে টিকে নেওয়া আবশ্যিক হওয়ায় ওখানে প্রায় বসন্ত হয় না। এখানে আর একটা কথা আমাদের দেশের চিকিৎসকদের খেয়াল নেই—সেটা হচ্ছে রোগ-নিবারণ প্রথা। ওসব দেশের প্রতি চিকিৎসক শুধু রোগ চিকিৎসা করেন না, তিনি সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ কর্‌তে বাধ্য। যে সকল সংক্রামক রোগে বাড়ীর অন্যান্য লোকের বা প্রতিবেশীদের পীড়িত হবার সম্ভাবনা সেই সকল রোগের জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগকে খবর দিতে হয়। তাহলেই স্বাস্থ্যবিভাগ দেখেন যাতে রোগের বীজাণু না ব্যাপ্ত হয়ে দেশকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের দেশে অম্‌নি স্বাস্থ্যবিভাগ না থাকায় আমাদের প্রত্যেক চিকিৎসকের স্বাস্থ্যবিভাগের কাজের কিছু ভার নেওয়া দরকার। আমি দেশে যখন মেডিকেল কলেজে পড়্‌তাম তখন আমার চেনাশোনা এক পরিবারে একটি ছোট ছেলের Typhoid (টাইফয়েড) হয়, তাতে সে ছেলেটি মারা যায়, এবং রোগ সারা পরিবারময় ছড়িয়ে প'ড়ে ভীষণ কাণ্ড হয়। এটা য়ুরোপের কোন পরিবারে হ'লে সে ডাক্তারকে বিচারালয়ে যেতে হত নিজের অযোগ্যতার জন্যে। আমারও মনে হয় রোগের বীজাণুকে এমন করে ছড়িয়ে পড়্‌তে দিয়ে লোকের বিপদ ঘটানো অতিশয় অন্যায় এবং অচিকিৎসকের কাজ। আমাদের দেশে যে একটি কলেরা রোগীর জীবাণু থেকে সারা দেশের লোক মরে, তার কারণ শুধু রোগ নিবারণের যে সব সাধারণ সোজা নিয়ম আছে তার অবহেলা। এটা প্রত্যেক চিকিৎসকের খেয়াল রাখা দরকার, নইলে দেশের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হতে পারে না। অবশ্য দেশের সাধারণ লোকের দারিদ্র্য জ্ঞানের অভাবও এই সব মহামারী দেশময় ছড়িয়ে পড়ার আর একটা কারণ।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষ বীজাণু সম্বন্ধে যত গবেষণা বেড়ে চলেছে ততই রোগ নিবারণ করা সহজ হয়ে পড়্‌ছে। য়ুরোপে এখন এই সব সংক্রামক রোগ এত কমে গেছে, বিশেষ ইংলণ্ডে, যে তারা এখন চেষ্টা করছে যাতে আর কোন রোগ না হয়। রোগ সারানোর চেয়ে তার নিবারণের প্রতি তাদের ঝোঁক চেপেছে তাতে ফলও হচ্ছে খুব ভাল।

(ক্রমশঃ)

ডি, আর, ধর

পূর্ব্ব-মেঘ

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কদম ফোটা সনে রোমের শিহরণে নীচৈ গিরি তব স্পর্শে জাগি
তোমারে তুষিবে সে পুলকে কি আবেশে—বসিও তুমি সেথা বিরাম লাগি ;
গুহার মাঝে তার মিলন অভিসার পণ্য নায়িকার নাগর সনে—
তাহারি পরিচয় পবন বিতরয় গন্ধ বহি' তার মিলন আনে। ॥২৫॥

বিরাম লভি পুন যাইতে পথে শুন হেরিবে নদী তীরে যূথিকা বীথি,
নবীন জলভারে সরস কোরো তায়ে—হরিও পথি 'পরে রৌদ্র-ভীতি
ক্লান্ত স্বেদ-ভারা পুষ্পবালা যারা বাহিরে বনে যেথা চয়নরতা—
শ্রমের অপনয়ে ক্ষণিক পরিচয়ে চাহিবে তব পানে চকিতে তথা। ॥২৬॥

পথটী বাঁকা সেথা উজ্জয়িনী যেথা সৌধক্রোড় তার মেলিছে হায়,
তবুও কোন মতে যাইও বাঁকা পথে—বিমুখ প্রিয়জনে করা কি যায় ?
পৌর ললনার আয়ত-নয়নায় চকিত-চাহনির বিজলী রাগ
ভাতিছে সেথা হায়, না যদি দেখ [illegible] বৃথা তব মন্দ ভাগ ! ॥২৭॥

হংস-শ্রেণী তার মেখলা রচা আর দেখিবে সেথা নির্-বিন্ধ্যা গতি,
তোমারি আগমনে স্রোতের আলোড়নে বাঁধন-খসা নাভি দেখাবে সতী
সরমে আপনার—নারী কি করে আর ব্যক্ত এরো চেয়ে মনের আশ
প্রথম দরশনে লজ্জা গণি মনে মুখে না ফোটে তার বুকের ভাষ ! ॥২৮॥

ভাগ্য তব কত—স্রোতস্বিনী যত বিরহে তব হায় শীর্ণ দীন,
তোমারি বিরহেতে—দেখিবে পথে যেতে—সিন্ধুবেণী সম শুষ্ক, ক্ষীণ
পাণ্ডু আভা তারি দিয়াছে তরুসারি জীর্ণ পাতাঢালি আঁবরি কূল
তোমারে লভি' আজি নবীন রূপে সাজি ফুটিয়া উঠিবে সে নাহিক ভুল। ॥২৯॥

পরেতে পাবে তুমি অবন্তির ভূমি—যেথায় আজো স্মরে বৃদ্ধ যত
সেই সে পুরাতন কাহিনী-উদয়ন—গ্রাম্য চত্বরে কথনে রত;
বিশালা রাজধানী লইবে মনে মানি যেন সে স্বরগের অংশচ্যুত
এনেছে অনুরাগে পুণ্যক্ষয় আগে কে যেন ভোগ তরে পুণ্যযুত! ॥৩০॥

কমল সুরভিত সায়র মুখরিত সারস কলরবে প্রভাত যেথা
শিপ্রা নদীবায় গন্ধ মাখি গায় কূজন মুখরিত বহে গো সেথা;
বীজন অতিধীর—জাগর রমণীর হরে সে রজনীর সুরত গ্লানি—
পরশ কি যে মধু—যেন গো প্রিয় বধূ শ্রবণে কহে ধীরে প্রণয়বাণী! ॥৩১॥

কান্তিচন্দ্র ঘোষ



ভাস্কর-শিল্পী গোপেশ্বর পাল

শ্রীপরমানন্দ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌



গোপেশ্বর পাল

কিছুকাল পূর্ব্বে একটি বাঙলা মাসিক পত্রিকায় পড়িতেছিলাম একজন বাঙালী লেখক বোম্বাইয়ের এক ভাস্করের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন যে বঙ্গদেশে কোন সুনিপুণ ভাস্কর নাই। কথাটা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম প্রকৃতই কি বাঙলা দেশে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর নাই? ইহার কিছুদিন পরেই কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব হইতেছিল। শুনিলাম সেখানে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল নামক জনৈক শিল্পী

৫ মিনিটের মধ্যে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের মুখের প্রতিকৃতি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে এই সংবাদ পড়িবার পর হইতেই শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পালের সহিত আলাপ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম। এবং শীঘ্রই তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া

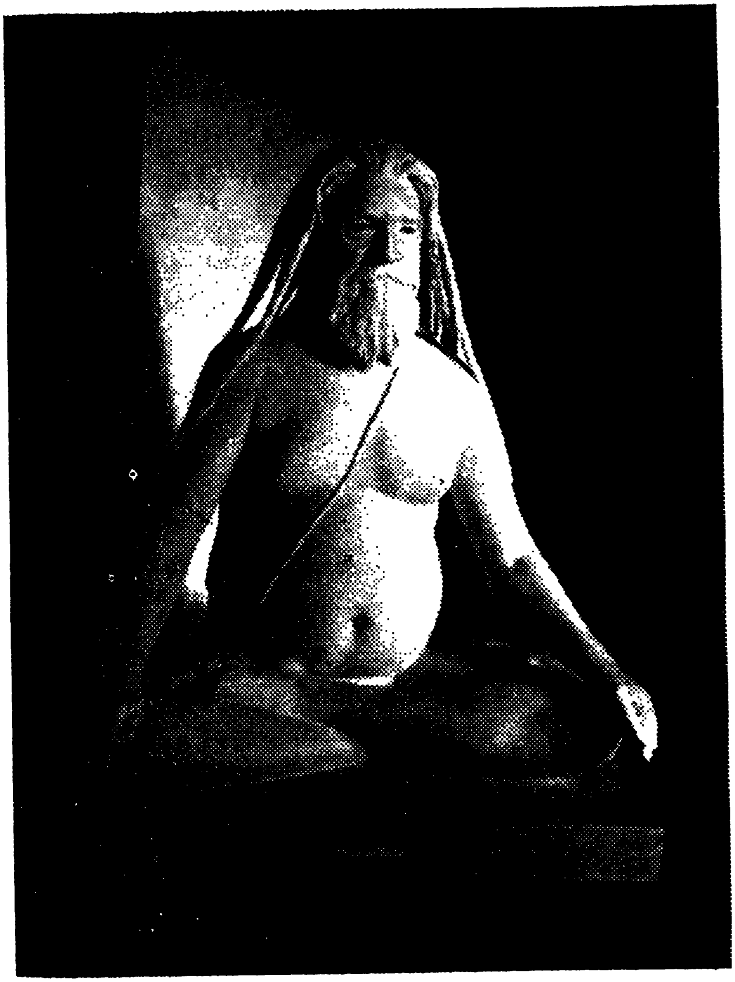


জষ্টিস্ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী
প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্যারিস প্লাষ্টারের বাষ্ট

বুঝিলাম তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। পূর্ব্বোক্ত মাসিকপত্রটি পড়িয়া সুনিপুণ বাঙালী ভাস্করের অভাব সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল তাহা দূর হইল।

গেপেশ্বর বাবুর কার্য্যকলাপ বাস্তবিকই চমকপ্রদ। তিনি যখন কার্য্যে নিরত থাকেন, তখন প্রকৃতই তিনি পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী। কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে তিনি অঙ্গুলি সঞ্চালন করেন ও সামান্য একটু কাদার তাল লইয়া তাহা হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে জীব মূর্ত্তি, মনুষ্য মূর্ত্তি বা অন্য কোন জিনিস্ গড়েন তাহা-সম্বন্ধে ধারণাই করা যায় না। প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম তখনকার কথা বলিতেছি। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে ৬নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীটে সাধারণ একটি দ্বিতল বাটীতে তিন চারটি ছোট ছোট ঘর লইয়া গোপেশ্বর বাবুর শিল্পগৃহ গঠিত হইয়াছে। এই খানেই তাঁহার কার্য্যালয়, এইখানেই তাঁহার কারখানা। তাঁহাকে কার্য্যনিরত অবস্থায় সেইস্থানে দেখিলে মনে প্রকৃতই আনন্দের উদয় হয়। হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, বয়স ৩৮ বৎসর, একহাতে লোহার বাটালি এবং অপর হাতে চিত্রকরের তুলি, কার্য্যে নিরত থাকার দরুণ হাতের মাংসপেশীগুলি যেন থাকিয়া থাকিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে, চতুর্দ্দিকে কয়েকটি শিক্ষার্থী ও সাহায্যকারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত,—শিল্পগৃহে কেহ কার্য্যকালে প্রবেশ করিলেই তিনি গোপেশ্বরবাবুকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইবেন। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমন কি পদবিক্ষেপ পর্য্যন্ত দর্শনেই মনে হইবে যে ইনি একজন শিল্পী এবং সামান্য শিল্পী নহেন। তাঁহার সহিত কথা কহিলেই বুঝা যাইবে তিনি যেন এজগতের মানুষ নহেন—কল্পনাকে মূর্ত্তি দিয়া নিজের একটি রাজ্য গঠন করিয়াছেন এবং সেইখানে যেন বাস করেন। তাঁহার ঘরে রাজা মহারাজারা দরিদ্রের সহিত একাসনে বসিয়া আছেন, শাসক ও শাসিতের প্রভেদ নাই—এমন কি মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলও সেখানে প্রবলের অপেক্ষা উচ্চাসন পাইয়াছে। দেবদেবীরাও সেখানে আছেন। দেবদেবীর মূর্ত্তি ভিন্ন কোন হিন্দু গৃহই সম্পূর্ণ নহে। গোপেশ্বরবাবু তাঁহার শিল্পগৃহে যে সকল মূর্ত্তি মৃত্তিকা, প্যারিস প্লাস্টার অথবা প্রস্তর দিয়া গঠন করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে কোন বাচ-বিচার করেন নাই। সেখানে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির পাশে রামকৃষ্ণপরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত জে, এম সেনগুপ্ত, বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণার স্যার্ ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন্, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার মহারাজা, দ্বারবঙ্গাধিপতি, ময়ুরভঞ্জের মহারাণী, বলদেও দাস বিরলা, মাদ্রাজের সুরঙ্গিপ্রদেশের রাজা হরিচন্দনযুগদেব আরও কত লোক, কতকি যে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জীব জন্তুর মধর মূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা বুঝি তাহাদের এইরূপই কল্পনা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের

ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী ৺চিন্তামণি ঘোষের একটি মার্ব্বেল নির্ম্মিত সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান মূর্ত্তির পার্শ্বেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি সাধুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সাধুর মূর্ত্তিটি হাত দিয়া ঠেলিবার চেষ্টা করিয়া গোপেশ্বর বাবু বলিলেন—এটা খুব ভারী, আপনি কিছুতেই ইহাকে নড়াইতে পারিবেন না। এটা সম্পূর্ণ পাথরের তৈয়ারী। ইহার ওজন বিশ মণেরও অধিক।

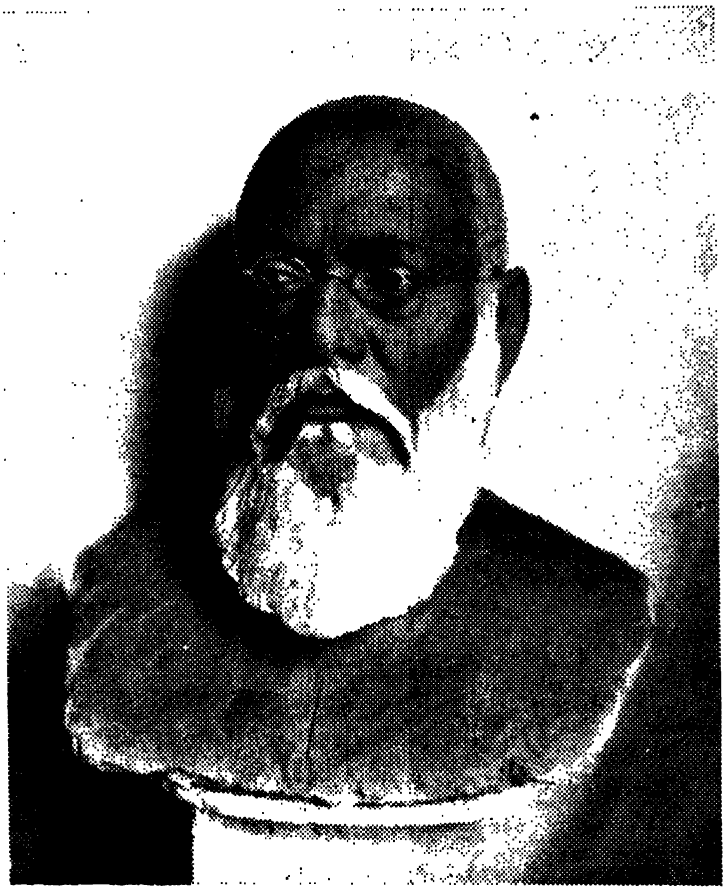


বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দ
তিন বৎসর পূর্ব্বে,—কৃত্রিম পাথরে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ইহা কিরূপে করিলেন। গোপেশ্বরবাবু বলিলেন, আমি যখন কাহারও পাথরের মূর্ত্তি গড়ি তখন প্রথমে তাঁহার একটি মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া লই। এইটাই হল আমার নেগেটিভ্ (negative)। যদি তাঁহাকে পাই তাহা হইলে তাঁহার সামনেই মাটীর মূর্ত্তি গড়ি। সেইটাই খুব ভাল হয়। যদি তাঁহাকে সামনে না পাই তাঁহার ফটোগ্রাফ্ দেখেও গড়ি। কাদার মূর্ত্তিটি যখন যাঁহার মূর্ত্তি গড়া হইতেছে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত লোকেরা বলেন ঠিক হইয়াছে তখন আমি সেই কাদার মূর্ত্তির অনুরূপ প্যারিশ্ প্লাষ্টারের মূর্ত্তি গড়ি। পরে বড় পাথরের টুকরা থেকে পাথরের মূর্ত্তি কাটিয়া বাহির করি। কাদার বা প্যারিশ্ প্লাষ্টারের মূর্ত্তি যেমন আমাকে গড়িতে হয় পাথরের মূর্ত্তি তেমনি বড় পাথর থেকেই কাটিয়া বাহির করিতে হয়। ইটালিতে যে সকল শিল্পী কাজ করেন তাঁহাদের উপর আমার একটা সুবিধা আছে। আমি আমার নেগেটিভ্‌টা (negative) এখানে পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারি কিন্তু ইটালির ভাস্করেরা ভারতবর্ষের লোকের মূর্ত্তি গড়িলে তাহা আর পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় না; তাঁহারা যেমন পাঠান এখানকার লোকের পছন্দ হোক আর নাই হোক তেমনি লইতে হয়। আমার সুবিধা এই যে যতক্ষণ না নেগেটিভ্‌টি গ্রাহকের পছন্দসই হবে ততক্ষণ আমি তাতে কাজ করতে পারবো।

কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম গোপেশ্বরবাবু ছোট, বড়, নানারকম লোকের বাষ্ট্ (bust) ও ষ্ট্যাচু (statue) গড়িয়াছেন। কলিকাতায় যখন কংগ্রেস উপলক্ষে একজিবিসন্ খোলা হয় তখন ডাক্তার আনসারী দশ মিনিট মাত্র তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যেই

গোপেশ্বর বাবু কাদা দিয়া তাঁহার বাষ্ট্ (bust) তৈয়ারি করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও দুইবারে পনের মিনিট কাল বসিয়াছিলেন এবং তাঁর যে বাষ্ট্ তৈয়ারি হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পণ্ডিতজি বলিয়াছিলেন—"It is an exact likeness of myself and is a real work of art" অর্থাৎ এটা ঠিক আমার প্রতিমূর্ত্তি হয়েছে এবং এটা প্রকৃতই একটা শিল্প-কার্য্য।

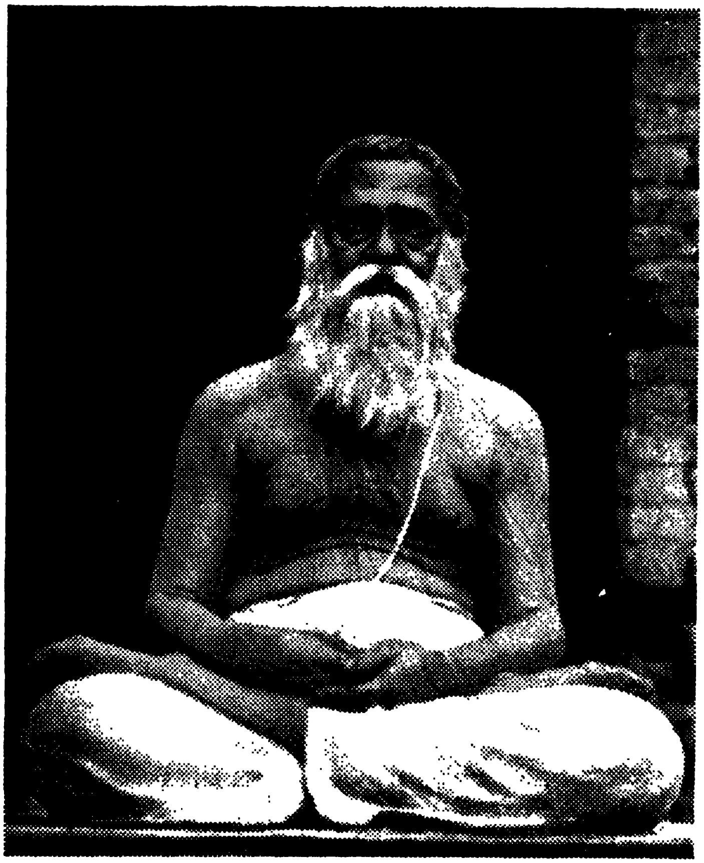


৺চিন্তামণি ঘোষ
মৃত্তিকার নেগেটিভ্—পরে কৃত্রিম পাথরের দণ্ডায়মান পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি

গোপেশ্বর বাবুর আদি নিবাস কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর পটুয়ার কাজের জন্য বিখ্যাত। ১৩০১ সালে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় গঠন কার্য্যে তাঁহার শিক্ষা হয় তাঁহার মাতুলালয়ে তাঁহার দাদামহাশয় ৺যদুনাথ পালের নিকট ও তাঁহার মাতামহ ৺পরাণচন্দ্র পালের নিকট। ৺যদুনাথপাল কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট্ স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। কলিকাতার মিউজিয়ামে যে সকল নানা প্রদেশীয় ও নানা জাতির লোকের মূর্ত্তি আছে তাহার অধিকাংশই ৺যদুনাথ পালের হাতের গড়া।

১৯২৪ সালে গোপেশ্বরবাবুকে গবর্ণমেণ্ট Wembley Exhibitionএ লইয়া যান। তাঁহার Wembley যাওয়া সম্পর্কে একটি গল্প শুনিলাম। ১৯১৫ সালে যখন লর্ড কার্‌মাইকেল্ বাঙ্‌লার গভর্ণর ছিলেন তখন তিনি একবার কৃষ্ণনগর পরিদর্শনকালে ৺যদুনাথ পালের বাড়ীতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে যান। গোপেশ্বর বাবু তখন সেইখানে কাজ শিখিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই লর্ড কার্‌মাইকেলের একটি বাষ্ট্ (bust) কাদা দিয়া তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দেন। লর্ড কারমাইকেল গুণের আদর করিতে জানিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গোপেশ্বর বাবুর খুব প্রশংসা করিলেন এবং গোপেশ্বর বাবুকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ স্বদেশবাসিগণকে দেখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নয়বৎসর পরে Wembley Exhibition আরম্ভ হওয়াতে লর্ড কার্‌মাইকেলের সুযোগ হইল এবং তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় ১৯২৪ সালে গভর্ণমেণ্ট্ Wembleyর British Empire Exhibition এ গোপেশ্বরবাবুকে নিমন্ত্রণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে লর্ড কার্‌মাইকেলের সম্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইয়াছিল। গেপেশ্বর বাবু এই প্রদর্শনীতে কতকগুলি মেডেল ও সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত হন এবং সংবাদ পত্রেও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা

প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই ডিউক্ অব্ কনট্ (Duke of Connaught) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে (British Empire Exhibition) গোপেশ্বর বাবুকে তাঁহার একটি বাষ্ট্ (bust) গড়িতে বলেন। গোপেশ্বরবাবু তাঁহার সমক্ষেই কাদামাটী দিয়া তাঁহার একটি বাষ্ট্ গড়িয়া দেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ডিউক্ অব্ কনট্ এত সন্তুষ্ট হন যে তখনই গোপেশ্বর বাবুর সহিত করমর্দ্দন করেন। তাহাতে তাঁহার হাতে কাদামাটি লাগিয়া যাইবে বলিয়া এতটুকু দ্বিধা করেন নাই। এ বিষয়ে তদানীন্তন সংবাদ-পত্রে আলোচনা হইয়াছিল।



স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
প্রথমে মৃত্তিকার পরে প্রস্তরের মূর্ত্তি

বিলাতের Daily Telegraph এ (১৯২৪ সালে জুলাই মাসে) গোপেশ্বর বাবুর সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"Remarkable talent in clay modelling is being shown in the Indian Pavillion at Wembley by Srijut Gopeswar Pal, who hails from Krishnagar in Bengal. Taking a handful of clay he changes it into a horse's head within forty five seconds. With a deft touch here and there the staid features of the horse are transformed into the snarling, biting, distorted mask—with ears lying wickedly flat, hair flying—of a wild horse under the first restraint of the rein. With a sweep of the hand Mr. Pal wipes out the image. A poke here and a twist there and within thirty seconds the head of a dog appears placidly contemplating the spectators !"

আর এক সংখ্যার Daily Telegraph এ প্রকাশ—

"The Duke of Connaught with Lady Patrici Ramsay visited the British Empire Exhibition on Saturday and devoted three hours to the Indian, Burmese and south African pavilions. His Royal Highness was one of the first English subjects to have his head modelled by Srijut Gopeswar Pal, the Indian sculptor who has just arrived in Wembley and who fashioned a remarkable likeness of the Duke of Connaught in less than five minutes."

গোপেশ্বর বাবুর ন্যায় অভাবনীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মস্থান বলিয়া ভারতবর্ষের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত।

পূর্ব্বপৃষ্টার চিত্রটি বর্দ্ধমান বগুল নিবাসী শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের প্রতিমূর্ত্তির চিত্র। এই মূর্ত্তিটি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার সম্মুখে গড়া। গোপেশ্বর বাবু কাদা মাটি দিয়া যখন এই মূর্ত্তিটি গড়িতেছিলেন তখন তাঁহাকে যেন ভাবাবিষ্টের মতো দেখাইতেছিল—কার্য্যে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটির অধিকাংশ ভাগ ২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনস্থ আশ্রম ভবনেই গড়া হয়। সেই সময়ে আশ্রমে যে সকল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছিল—"ওকি, বাবার গায়ে ও রকম করে মাটি মাখাচ্ছে কেন?" —"বাবা মাটি মেখে বসে আছেন কেন?" ইত্যাদি। একদিন মূর্ত্তিটি আশ্রমে গড়া হইতেছে এমন সময় সেখানে এক শিষ্য আসিয়া উপস্থিত। ইনি অনেক দিন আশ্রমে আসেন নি, সে জন্য জানিতেন না যে শিষ্যেরা গুরুদেবের মূর্ত্তি গড়াইতেছেন। একটা চৌকির ওপর মূর্ত্তিটি বসান ছিল। গোপেশ্বর বাবু পাশে বসিয়া মূর্ত্তিটির গায়ে কাদা মাখাইতেছিলেন ও হাত দিয়া চাঁচিতে ছিলেন। একঘর লোক; গুরুদেব অন্য ঘরে ছিলেন। উপরোক্ত শিষ্যমহাশয় ঘরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্তিটীর নিকটে গেলেন এবং সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে কয়েক টাকা প্রণামী রাখিলেন। ঘর শুদ্ধলোক স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রায় তিন চার মিনিট পরে অপর এক শিষ্য বলিলেন—"আপনি টাকা কয়টা উঠাইয়া নিন। বাবা ঘরে আসিলে তখন দিবেন।" তখন আগন্তুক শিষ্যের চমক ভাঙিল। তিনি বলিলেন আমি বুঝিতে পারি নাই ইহা বাবার প্রতিমূর্ত্তি—আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম—ইনি বাবার গায়ে মাটি মাখাইতেছেন কেন? যখন এই ঘটনা ঘটে লেখক তখন মূর্ত্তির অতি সন্নিকটেই বসিয়াছিল।

পরমানন্দ দত্ত

"আশা"

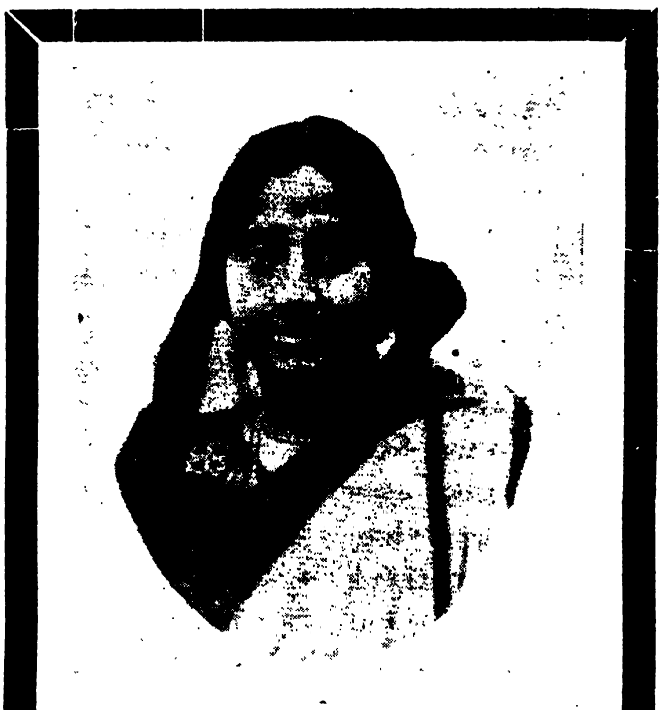
শ্রীমতী বরুণা দেবী

এ জনমে যদি সফলতা মোর
না হয় নাইবা হ'ল
পর জনমের আশায় থাকিব
সেওত আমার ভাল!
হৃদয় বীণাটী বেসুরে বাজিয়া
যায় যদি যাক্ ছিঁড়ে
মরমের মাঝে আশার মুকুল
না ফুটিতে যাক্ ঝরে!
সারা জীবনের যত কিছু সাধ
নিমেষে চূর্ণ হয়!
আঁধার নিশিতে ক্ষীণ আলো সম
আশা টুকু যেন রয়।

পরলোকগতা কমলরাণী সিংহ, এম্-এ

শ্রীমতী সুবর্ণা ঘোষ

বিগত ২৯শে জুলাই বাংলার কৃতী মহিলা কমলরাণী সিংহ এম্-এ অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তিনি আসাম গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর্ মিঃ জে, এন, চক্রবর্ত্তীর কন্যা ছিলেন। শৈশবের শিক্ষা রংপুরে শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এখান থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্ব আলোকের দিকে প্রসারিত লতার মত আপনিই উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল। শিক্ষয়িত্রী ও সহপাঠীরা তাঁহার প্রাণের প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেন। স্মৃতিশক্তি তাঁর খুব প্রখর ছিল। স্কুলের কোন পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন ও সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পান। বেথুন কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ২ মাস পূর্ব্বে গুরুতর টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হন, তবুও তিনি ছাত্রীদের মধ্যে ১ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে ১৯২৭ সালে ময়মনসিংহের এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, এম-বি'র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হিন্দু পরিবারের কুলবধূ হইয়া গেলেও তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল না। তিনি সংস্কৃতে Honors নিয়া বেথুনে বি, এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হইলেন। সংসারের কাজের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হইল। গৃহ-কর্ম্ম করিয়া অবসর সময়ে তিনি কলেজের পাঠ প্রস্তুত করিতেন। পরিবারের সকলেই তাঁহার গুণের অনুরাগী ছিলেন, এবং সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। বি-এ, পরীক্ষার পূর্ব্বেও তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার নিজের পড়িবারও সামর্থ্য ছিল না, অপরে তাঁহার বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইত। একবার তিনি যাহা শুনিতেন তাহাই মনে রাখিতে পারিতেন। বি, এ পরীক্ষায় তিনি ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সালে



কমলরাণী সিংহ এম্-এ

এম-এ পরীক্ষায়ও সংস্কৃত সাহিত্যে বেদান্ত-বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন এবং সংস্কৃতের সমস্ত বিভাগেও তিনি প্রথম হন।

স্বদেশকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। বাংলার মানসী মূর্ত্তি তাঁহার প্রাণে জীবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। পারিবারিক জীবনের শত বাধার মধ্যেও তিনি দেশসেবার সুযোগ খুঁজিয়া লইতেন। জাতীয় জীবনের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল। গঠন-মূলক কাজে তাঁহার আস্থা ছিল। খদ্দর ও চরকা প্রচারের জন্য কয়েকজন সহকর্ম্মীকে লইয়া একটি খাদি-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলি লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর্থিক সাহায্য করিতেন—কিন্তু ইহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। দেশমাতৃকা ও বঙ্গবাণীর সেবার আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য তিনি একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করার সংকল্প করিয়াছিলেন। পত্রিকাটির নাম 'প্রবাহ' রাখিবেন তাহাও স্থির হইয়াছিল।

'বিচিত্রা' পড়িতে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। তিনি উহার 'গ্রাহিকা' ছিলেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে বিচিত্রা পড়িয়া শোনান হইয়াছে এবং তিনি আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। আমাদের দেশের শিশু-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে গড়িয়া উঠে নাই। শিশু-মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইয়োরোপের প্রচলিত ব্যবস্থা যাহাতে এদেশে অনুসৃত হয় সে জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে Russell এর বই পড়িতে তিনি ভালবাসিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও montessori ও Adlerএর বই-এর অর্ডার দিয়াছিলেন। বিভিন্নদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাস পড়িতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। সৃষ্টির রহস্য-উদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য Atomic Physicsএর মূল-সূত্রগুলি জানিবার ইচ্ছা তিনি অনেকবার প্রকাশ করিয়াছেন। অঙ্ক-শাস্ত্রে অধিকার লাভের সুযোগ না পাওয়ায় তিনি দুঃখিত ছিলেন। সবেমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলেন কিন্তু তাঁর কোন আশাই পূর্ণ হইল না। অসময়ে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। মরণ হিসাবের কত আগে আসিয়া প্রাণভরা আশার সমাধি রচনা করিয়া গেল, কত সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল।

রূপ, রস গন্ধে অপরূপ এই সুন্দরী ধরণীকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। বিশ্ব-প্রকৃতিতে অরূপের রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন –

"কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ! তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর"

সংসারের নানা জটিল ও অবান্তর বিষয় তাঁর যাত্রাপথ আচ্ছন্ন করে নাই। জীবনে ক্ষতির রেখা কুটিল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। আকুল আগ্রহে তিনি জীবনকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। কিন্তু অজানা পথের ডাক আসিল। জীবন মুকুল নিষ্ঠুর মরণ-দেবতার পায়ে লুটাইয়া পড়িল!

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পালিতা হইলেও তিনি অনাড়ম্বর ছিলেন। বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে অমূল্য জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও বন্ধুগণ ভিন্ন কেহই তাঁহার সন্ধান জানিতেন না। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মে বিপ্লবের যুগে জন্মিলেও তাঁহার জীবনের আদর্শ কখনও মলিন হয় নাই। হিন্দু-কুল-বধূর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সহিত সুশিক্ষিতা মহিলার উচ্চাদর্শের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন বিচিত্র সম্ভাবনায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি স্বামীর প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিনী ছিলেন। স্নেহশীলতা, সেবাপরায়ণতা ও ধৈর্য্য তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি সঙ্গীতে নিপুনা ছিলেন, সূচীকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল এবং গৃহ-কর্মে তিনি তৎপর ছিলেন।

যে জীবন শুভ্র শতদলের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল—অকালে ঝরিয়া গেল। চির-চঞ্চল জীবন মৃত্যুর মৌনতায় বিলীন হইল। অস্ত-রবির শেষ-রশ্মির মত ক্ষণস্থায়ী জীবনের দীপ-শিখা দূর দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

সুবর্ণা ঘোষ

—o—

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

নারী মেরু অভিযানকারী

মিসেস্ অলিভ্ মারে চ্যাপ্‌ম্যান্ নামে একটী মহিলা কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর মেরুর সন্নিহিত ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড্ প্রদেশ ভ্রমণ ক'রে এসেচেন। তিনি ঐ প্রদেশে শীতকালে গেছলেন। আজ পর্য্যন্ত খুব কম য়ুরোপীয়ই তাঁর মত অত ঠাণ্ডার সময় ওদেশে গেছেন। শ্রীমতী চ্যাপ্‌ম্যান্ একজন প্রসিদ্ধ অভিযানকারিনী তো বটেই, উপরন্তু তিনি একজন পাকা চিত্রশিল্পী। তিনি ল্যাপ্‌লাণ্ডের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্যেই সেই দারুণ শীতের মধ্যে একাকী ঐ তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশের মধ্যে দীর্ঘ ছয় শো মাইল পথ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যখন ঐ অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন সে সময় ওখানকার উত্তাপের পরিমাণ ছিল শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও ত্রিশ ডিগ্রী নীচে।

তিনি বলেন আমার এই যাত্রার সময় সেখানকার পথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক কুটীরবাসী লোক আমার দুঃসাহস দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছ্‌লো। আবার তার ওপর যখন তারা আমার মুখ থেকে শুন্‌লে যে আমি একজন ইংরাজ মহিলা এবং একাকী এই ভ্রমণে বেরিয়েছি তখন তাদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেছ্‌লো। কারণ সে সময় সেখানকার সেই দারুণ ঠাণ্ডায় ওদেশের অধিবাসীরা পর্য্যন্ত বাইরে বেরুতে রীতিমত ভয় পেতো। যাই হোক আমি কিন্তু আমার ঐ অভিযানে যথেষ্ট আনন্দই লাভ করেছিলুম।

ঐ ভ্রমণের সময় মিসেস্ চ্যাপ্‌ম্যান্ যখন এক পর্ব্বতের কাছে গেছলেন তখন একজন স্থানীয় ল্যাপ্ তাঁকে দাঁড় করিয়ে এক গান শুনিয়ে দিলে। তিনি ওদেশের ভাষা জান্‌তেন্ না, তবু তাঁকে সে গান শুন্‌তে হোল। শেষে একজন দোভাষী তাঁকে বুঝিয়ে দিলে যে ঐ লোকটি তাঁকে যে গান শোনালে তার অর্থ হচ্ছে এই যে সে তাঁর রূপে গুণে এতখানি মুগ্ধ হ'য়েছে যে তিনি যদি তাঁকে বিবাহ করেন তো সে কৃতার্থ হয়ে যায়। সে লোকটি দরিদ্র নয়, ওখানকার হিসেবে রীতিমতই ধনী। তার এক হাজার হরিণ আছে এবং তিনি তাকে বিবাহ করলে তার হরিণের ওপর তাঁরও সমান অধিকার জন্মে যাবে। মিসেস্ চ্যাপ্‌ম্যান্ সেই দোভাষীর মারফৎ তাকে ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

পুরুষ বনাম নারী

সম্প্রতি বিলেতে মিস্ আইভী রাসেল্ নামে একটী চব্বিশ বছরের মেয়ে যে দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়। ইনি বিলেতের এ্যামেচার্ ভারোত্তোলন-সমিতির প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উক্ত সমিতিতে নারী-সভ্য গ্রহণ করা হয় না ব'লে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। কিন্তু শ্রীমতী রাসেল্ বলেন যে রীতিমত শিক্ষিতা হ'লে মেয়েরাও যে ভারোত্তোলন বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে তিনি তা প্রমাণ কর্‌বেনই। তিনি অনায়াসে ৩১০ পাউণ্ড ওজনের ভার তুলতে পারেন অথচ যে ভদ্রলোকটির কাছে তিনি ঐ বিদ্যাটি শিখেছেন তিনি তা নড়াতেও পারেন না। তিনি একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড ভার বহন ক'রে এমন কতকগুলি শক্ত শক্ত কসরৎ দেখাতে পারেন যা' তাঁর আয়তন এবং ওজনের কোন পুরুষ মাত্র ১৩৫ পাউণ্ডের বেশী ভার বহন করে দেখাতে পারে না।

মেসার্স্ ক্যাড্‌বেরী কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু বল্‌ছেন যে কতকগুলি বিষয়ে মেয়েরা কিছু কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও প্রধানতঃ পুরুষের তুলনায় তাদের যোগ্যতার অভাবই

পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা বলেন যে গত যুদ্ধের পর তাঁরা সর্ব্বসাধারণের কাছে থেকে যে কতকগুলি Scheme চেয়েছিলেন তাতে নারী এবং পুরুষ উভয় পক্ষকেই আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও নারীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। প্রতি দু'জন করে পুরুষের স্থলে মাত্র একজন ক'রে নারী Scheme পাঠাতে পেরেছিলেন অথচ মেয়েদের একথা বলবার উপায় ছিল না যে পুরুষদের চেয়ে ও-বিষয়ে তাদের কম সুবিধে ছিলো।

তা' হ'লেও একথা কিন্তু মানতেই হবে যে পুরুষদের সমকক্ষ না হলেও নানা বিষয়ে মেয়েরা আগেকার চেয়ে দিন দিন বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। যেমন রাশিয়ার আকাশযান চালনা শিক্ষার স্কুলে বর্ত্তমানে যত শিক্ষার্থী আছেন তার মধ্যে শতকরা ২০ জন নারী।

মহিলাদের মনোগতি

(ক) প্যারিসে এক প্রকাণ্ড হোটেলে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে বাস ক'রতেন এক মহিলা। টনি ব্লু তাঁর নাম। বড় বড় অভিজাত বংশীয়দের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ ক'রে, বিলাসিতার প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তিনি থাকতেন। গরীবদের দিকে কখনও ফিরে তাকাবার তিনি অবসর পাননি। বেশ স্ফূর্তির জীবনই চলছিল। এদিকে বুড়ো বাপ মা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রতে ক'রতে মৃত্যুকে বরণ করলেন—টনি ব্লু জেনেও তা জানলেন না। হঠাৎ সেদিন শীতের রাত্রে পথ চ'লতে গিয়ে দেখেন প্যারিসের এক রাস্তায় ছিন্ন ময়লা একটা পোষাক প'রে বৃদ্ধা পিতামহী অন্তিমক্ষণের প্রতীক্ষায় শুয়ে। টনি ব্লু গায়ে হাতটি ঠেকাতেই বৃদ্ধার প্রাণবায়ু নির্গত হ'য়ে গেল। সেদিন তাঁর জীবনের ওপর ধিক্কার এল। বৃদ্ধাকে সমাহিত ক'রে নিজের ভাল পোষাক গা থেকে ফেলে দিয়ে ছিন্ন তালি দেওয়া পোষাক এখন তিনি ব্যবহার করতে আরম্ভ ক'রেছেন। অতি দরিদ্রভাবে দেশলাই বিক্রী ক'রে এখন তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করছেন। প্যারিসের নতর্‌ডেম্ গির্জ্জায় তাঁর সমস্ত টাকা কড়ি গহণা উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। বড় লোকেরা হাসে, তিনি বলেন তাতে আমার লজ্জা নেই নিজের পূর্ব্বের অবস্থা আমাকে যে লজ্জা দেয় তার কাছে এগুলি কিছুই নয়।

(খ) বিলেতের এক থিয়েটারে শ্রীমতী সুসান্ হল্ (Susan Hall) গান শুনতে যান। জনৈক গায়ক ভাবাতিশয্যে তাঁর পাশে এসে গান গেয়েছিলেন—গানের দরুণই হোক্ কিম্বা তাঁর কোন রোগ থাকার দরুণই হোক্ শ্রীমতী অজ্ঞানের মত হয়ে যান। তিনি উক্ত থিয়েটার কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী নিয়ে নালিশ এনেছেন। এখনও বিচার চ'লছে, আদালত কি রায় দিয়েছেন তা' জানা যায় নি।

মেয়েদের নতুন জেল

ডুইট্ ইলিনয়েসে মেয়েদের জন্যে সম্প্রতি একটি নতুন জেল তৈরি করা হ'য়েছে। জেলটি এত চমৎকার হ'য়েছে যে অনেক মেয়ে এখানে থাকবার প্রলোভনে পাপকার্য্য করতে পারে ব'লে খবরের কাগজের সম্পাদকেরা মনে করেন। ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই জেলটি নির্ম্মিত হ'য়েছে। প্রত্যেক ঘরটি সাজানো, চারিধারে ফুলের টব। খাবার শোবার যা বন্দোবস্ত আছে তা' অনেকের বাড়ীতে নেই। মেয়েরা কোমল জাতি, যাতে তাঁরা ভাল আবহাওয়ার ভিতর থেকে নিজেদের চরিত্র সংশোধিত ক'রে নিতে পারেন তার সুযোগ দেবার জন্যেই এই অপরূপ ব্যবস্থা।

নারী মিডিয়মের অপূর্ব্ব শক্তি

সম্প্রতি বিলেতের Oldham ব'লে একটি স্থানে একটী মহিলা Medium হবার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশিষ্ট প্রেততাত্ত্বিকরা পর্য্যন্ত ব'লেছেন যে এই মহিলাটির শক্তি সত্যিই বিস্ময়কর!

ইনি এক সভায় তাঁর শক্তি প্রভাবে প্রেতলোকের শব্দ ও গন্ধের পরিচয় সাধারণে গোচর করেছেন ব'লে প্রকাশ। শুধু তাই নয় ভূতেরও যে রক্তমাংসের হাত থাকতে পারে সেই সভায় তিনি সকলকে তাই প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটা নিরেট জিনিষের মধ্যে দিয়ে আর একটা নিরেট জিনিষ ইনি এঁর শক্তিবলে অতি সহজে চালনা করতে পারেন।

Oldhamএ বর্ত্তমানে প্রতি রবিবার রাত্রে তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় দেন। বিলেতের প্রসিদ্ধ প্রেততাত্ত্বিকরা সকলেই এঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত। ইনি এঁর শক্তিবলে অনেক কঠিন রোগেরও উপশম ক'রেচেন ব'লে শোনা গেছে।

এই নারী মিডিয়ামের আর একটি গুণের পরিচয় এই যে ইনি সাধারণের কাছে নাম যশ পেতে একেবারেই চান না এবং সেই জন্যে তিনি তাঁর নাম কাউকে জান্‌তে দিতে চান না। প্রতি রবিবার এঁর যে প্রেততত্ত্বচর্চ্চার সভা বসে সেই সভায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে যদিও অনেকেই আবেদন করে তবু বিশিষ্ট লোক ছাড়া সাধারণে সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না।

প্রকাশ যে এক সভায় একবার ইনি এর অত্যদ্ভুত শক্তির কিছু পরিচয় দিয়েছিলেন। সেবার সভা বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই ঘরে এত ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইয়েছিলেন, যে দারুণ শীতে সকলকে কাঁপ্‌তে হয়েছিলো। তাছাড়া একই সময়ে ঘরের সর্ব্বত্র সকলেই নিজেদের গায়ে ভূতের হাতের স্পর্শ বেশ স্পষ্ট অনুভব ক'রেছিলেন।

তারপরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ বিলাতী গোলাপের সুবাস পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে যে যার রুমাল বার করতে অনুরোধ করা হোল। ফলে সকলেই দেখ্‌লেন যে তাঁদের রুমাল গোলাপের মধুর গন্ধে ভরে গেছে। শেষ কালে মহিলাটী তাঁর অলৌকিক শক্তি বলে কয়েক বোতল ঐ গোলাপের নির্য্যাস ঘরের মধ্যে হাজির করিয়ে তবে ক্ষান্ত হ'লেন। অবশ্য তাঁর এই সমস্ত ক্রিয়া কলাপের মধ্যে কোন ফাঁকি থাক্‌তে পারে এই সন্দেহ করে অনেক রকমের পরীক্ষা করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বে কোন রকম ফাঁকির সন্ধানই কেউ পান নি যদিও ঘরের মধ্যে চতুর লোকের অভাব ছিল না। যাই হোক অবিশ্বাসীরা তবু বলছেন যে একটু তাঁরা কৌশলে ভূতের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ ক'রে তার কারচুপি ফাঁস কর্‌বেন।

অদ্ভুত ক্ষমতা :—

ডাব্‌লিনের একটি যুবকের ভারী এক মজার শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি নাকি তাঁর ডানহাত এবং বাঁ হাতের যে কোন হাতে সোজা উল্টো যে কোনদিকে লিখ্‌তে পারেন। তাঁর নাম John Chichester. ইনি একজন লেখক এবং রিপোর্টার। তিনি বলেন যে ঐ কৃতিত্ব অর্জ্জন করবার জন্যে তাঁকে কোন দিনই বিশেষভাবে সাধনা করতে হয়নি। তিনি ছোটবেলায় সব কাজ বাঁ-হাতেই করতেন, এমনকি লেখবার সময়ও তিনি বাঁহাতই ব্যবহার করতেন। তারপরে তিনি বাঁ হাতে কাজ করা এবং লেখার লজ্জা এড়াবার জন্যে ডানহাতেই সব করতে অভ্যাস করেন। কিন্তু এই সঙ্গে তার পুরোণো অভ্যেসটিও থেকে যায়। ইনি ক্রিকেট্ খেলবার সময় বাঁ হাতে বল দেন আর ডানহাতে ব্যাট্‌ ধরেন। কিন্তু এর সবচেয়ে কৃতিত্ব হচ্ছে যেকোন অঙ্কের রাশিগুলোর উল্টোদিক ক'সে সেই অঙ্ককে নির্ভুল ভাবে ক'সে দেওয়া। কি ক'রে যে এটি তাঁরপক্ষে সম্ভবপর হয় তা কেউই বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।

অসাধারণ স্মরণশক্তি :—

মিস্ Minnie Quince ব'লে ডাবলিনের একটি উনিশ বছরের মেয়ে Stenographerও সম্প্রতি আর একরকমের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আবার আরো চমৎকার। এই মেয়েটি মাত্র ছ' সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ফ্রেঞ্চ্, জার্ম্মাণ এবং ইটালীয়ান্ এই তিনটি কঠিন ভাষা অতি সুন্দরভাবে শিখে নিয়েছেন। তিনি যে ঐ তিনটি ভাষা খুব ভাল ভাবেই শিখেছেন এর প্রমাণ এই যে তিনি অসাধারণ গৌরবের সঙ্গে এই তিনটি ভাষায় অতি কঠিন কঠিন পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে ডাব্‌লিনের বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকরা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেছেন। মিস্ কুইন্স্ বলেন যে তিনি একটি কাজে Interpreter (দোভাষীর) প্রয়োজন হবে জেনে এবং হাতে আর বেশী সময় না থাকায় তাড়াতাড়ি ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটি নতুন ভাষা শিখে নিয়েছেন। এত অল্প-সময়ে তিনি কি ক'রে ঐ ভাষা তিনটি আয়ত্ত করলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে যেকোন বইয়ের সবকয়টি পাতায় যদি তিনি একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন তো তার প্রত্যেক শব্দটি পর্য্যন্ত হুবহু তাঁর মনে থাকে।

সুতরাং ঐ ভাষায় গ্রামার্ এবং আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন সম্বন্ধীয় বইগুলি একবার পড়ে নেওয়ার ফলেই ঐ ভাষাগুলি তাঁর আয়ত্ব হ'য়ে গেছলো। তিনি বলেন যে বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণ নিয়ে তাঁর একটু মুস্কিল বেধেছিলো কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের কাছে একবার শুনে নেওয়ার ফলে তাঁর সে অসুবিধাও দূর হয়ে গেছলো।

ইঁদুর মারার ব্যবস্থা ঃ—

সারা জগতের সর্ব্বত্রই চিরকাল ইঁদুরের অত্যাচারে লোকে জ্বালাতন হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ইঁদুরগুলোর প্রতিপত্তি সম্প্রতি সেখানে এত বেড়ে গেচে যে তারা আজকাল বেড়াল-দের পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করচে না। ইঁদুরের অত্যাচার যে অষ্ট্রেলিয়াতেই আছে তা নয়। এদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে ফ্রান্সের লোকেরা সম্প্রতি এদের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেচে। সেখানে এই ইঁদুর ধ্বংস করবার জন্যে রীতিমত স্কুল প্রতিষ্ঠা ক'রে তাতে সেখানকার কতকগুলি বাছা বাছা বেড়ালকে রীতিমত শিক্ষিত করা হচ্ছে। এবং এই শিক্ষাদানব্যাপারে জন্তু জানোয়ারদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্কটলণ্ডের মিঃ রোণাল্ড্ ব্রেমার—তারপর ডাঃ জঁা লোয়া প্রভৃতি বিখ্যাত লোক সম্প্রতি ব্যস্ত আছেন। তাঁদের শিক্ষার সাহায্যে বেড়ালদের আদিম হিংস্রবৃত্তিকে পূর্ণভাবে জাগরিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর তাঁরা অনেক ভেবে দেখেছেন যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমস্ত ইঁদুরকে না মেরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তো কেবলমাত্র স্ত্রী ইঁদুরগুলোকে ধ্বংস করতে পারলেই অনেক অল্প আয়াসে, অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাই তারা বেড়ালরা যাতে দেখা মাত্রই ইঁদুরের স্ত্রীপুরুষ ভেদে জাতি নির্ণয় করতে পারে, তাদের সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন যে এই ভাবে যদি দেশের মেয়ে ইঁদুরগুলোকে ধ্বংস করা যায় তা'হ'লে অর্দ্ধেক ইঁদুর এমনি মরবে তো বটেই, তার ওপর ভবিষ্যতে বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাক্‌বে না উপরন্তু পুরুষ ইঁদুরগুলোও সব প্রিয়া-বিরহে বিধুর হ'য়ে এক এক ক'রে মরতে আরম্ভ করবে, আর যদি নিতান্ত না মরে তো অন্ততঃপক্ষে—তারা বিরহ-বেদনার জ্বালায় দেশত্যাগী যে হবেই তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই নাকি তাঁদের এই বিড়াল-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বহু-সংখ্যক বেড়াল-গ্রাজুয়েট্ কাজে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ফলে বাজারে তাদের ভারী কদর বেড়ে গেছে। লিয়ঁর মেয়র মিঃ হেরিয়ট্ ৬টা শিক্ষিত বেড়াল কিনে ইতিমধ্যেই এতখানি সুফল পেয়েছেন যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে শিক্ষকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেচেন।

তের নম্বর ঃ—

মিস এ্যানী ওয়ালিস্ গত চার বৎসরের মধ্যে সবশুদ্ধ তেরো বার Engaged হ'য়েচেন এবং এর মধ্যে বারোবার তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন ক'রেচেন। এবং ত্রয়োদশ বারে তিনি M. Roger Hardy ব'লে এক ভদ্রলোককে বিবাহ ক'রেচেন। গত ১৩ই জুন তারিখে তাঁদের শুভবিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়েছে। বিবাহের সময় ভোজের উৎসবে তেরোজন আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এই দম্পতীর বিবাহের তেরোমাস পূর্ব্বে তারা পরস্পর পরিচিত হ'য়েছিলেন। এবং তেরো সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁরা পরস্পর Engaged হ'য়েছিলেন। তারপর তাঁরা তেরোবৎসরের কনট্রাক্টে একখানি বাড়ী নিয়েছেন। সে বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে প্যারিসের ১৩ নম্বর ত্রয়োদশ Arrondissement এর এক রাস্তা।

শ্রীমতী ওয়ালিস্ বলেন যে তেরো সংখ্যাটিকেই তিনি তাঁর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক সংখ্যা বলে চিরকাল দেখে এসেচেন। তিনি তাঁর বাপমার ত্রয়োদশ সন্তান; ১৩ই জুন তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেন। তিনি আরও বলেন যে এই বিবাহের ফলে আমার যদি সবশুদ্ধ তেরোটী সন্তান হয় তা'হলে আমি সবচেয়ে সুখী হবো। যদিও তাঁর এই কথাটায় তাঁর স্বামী শুধুই একটু হাসেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ত্রয়োদশস্থান অর্জ্জন করেছিলেন সেই-জন্যই নাকি তিনি এই বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ব্যাঙ্কে চাকরী করতেন সেখানে মনোনীত হন।

বিবাহের পর এই দম্পতী ১৩ দিনের জন্যে হনিমুন্ যাপন করতে গেছ্‌লেন, তাতে তাঁরা তেরো নম্বর রিজার্ভেশন্এ ১৩ নং ট্রেণে ভ্রমণ করেন। এবং একটী হোটেলের ১৩ নম্বর ঘরে স্থানে গ্রহণ করেন। সেখানে আবার ১৩নং ওয়েটারের সাহায্যে খাবার দাবার আনিয়ে খেতেন।

শ্রীমতী ওয়ালিস্ যখন কোন জিনিষপত্র কিন্‌তে যান তখন ১৩টায় ডজন হিসেবে জিনিষ কেনেন অবশ্য অতিরিক্ত একটার জন্যে তাঁর স্বামীকে আলাদা দাম দিতে হয়।

"চিঠি"

পূজ্যপাদেষু—

* * * ভাদ্রের বিচিত্রায় দেখলুম প্রদোষ শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি আমার পত্রখানির সস্নেহ উল্লেখ করেছেন, তাতে আমি নিজেকে খুবই অনুগৃহীত মনে করছি। এই পত্রে সে প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই।—বিচিত্রায় আপনি "ব্যঞ্জনান্ত" ও "হলন্ত" এই শব্দ দুটির কথা যে-ভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে পাঠকের মনে কিছু ভ্রান্তি থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। "হলন্ত" ও "ব্যঞ্জনান্ত" এই দুটি শব্দের একই অর্থ। সুতরাং 'ব্যঞ্জনান্ত' শব্দের স্থলে "হলন্ত" শব্দ ব্যবহার করা ভুল নয়। শ্রাবণের "পরিচয়ে" "ছন্দবিতর্ক" প্রবন্ধে আপনি স্বরান্ত অর্থে "হলন্ত" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তাতেই আমার মনে কিছু সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কারণ "হলন্ত" মানে "স্বরান্ত" নয়, 'হলন্ত' মানে "ব্যঞ্জনান্ত"। সুতরাং "ছন্দ-বিতর্ক" প্রবন্ধটির আলোচ্য অংশে "হলন্ত" শব্দটির পরিবর্ত্তে "স্বরান্ত" শব্দটি প্রয়োগ করাই সঙ্গত কিনা, আমি তাই আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলুম। আপনার প্রতি ও আপনার রচনার প্রতি আমি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি, আমার পত্রযোগে আপনার নিকট তা নিবেদন করতে সমর্থ হয়েছি জেনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

আপনার "প্রদোষ" শব্দের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমি এ স্থলে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। "প্রয়োজনের তাগিদে, শব্দের অর্থ-বিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে," আপনার এই উক্তি সম্পর্কে কোনো তর্ক চলতে পারে না। যদি শব্দের অর্থ বিস্তার ঘটা অসম্ভব হ'তো তা হ'লে তার দ্বারা ভাষার জড়তাই প্রমাণিত হ'তো। কিন্তু ভাষা তো জড় বস্তু নয়। "রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সঙ্গম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে," এ কথাও সত্য। সুতরাং ওই দুই অর্থেই যদি "প্রদোষ" শব্দটিকে ব্যবহার করা যায় তা হলে আমাদের ভাষার সম্পদ বৃদ্ধিই হবে। এই দুই অর্থের জন্য ওই শব্দটির দুটি বিভিন্ন বৈয়াকরণিক ব্যুৎপত্তি উদ্ভাবন করাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু আপনার একই উক্তি সম্বন্ধে আমার একটু সংশয় আছে। আপনি লিখেছেন, "রাত্রির অল্পান্ধকার উপ-ক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই।" আমার বিশ্বাস প্রত্যূষ (বা প্রত্যুষ) শব্দযোগেই "রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষ"কে নির্দ্দেশ করা যায়। এ মাসের বিচিত্রায় "জরতী" কবিতায় আপনিই "প্রত্যুষ" শব্দটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যথা—

"দিগন্তে প্রণাম-নত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা"

'প্রত্যুষ' শব্দের দ্বারা যে 'রজনীর অবসান'কেই নির্দ্দেশ করা হয়েছে, তার প্রমাণ উক্ত কবিতার চতুর্থ লাইনেই রয়েছে। সংস্কৃত আভিধানিকেরাও 'অহর্মুখ' অর্থে 'প্রত্যুষ' এবং 'রজনীমুখ' অর্থে 'প্রদোষ' শব্দের উল্লেখ করেন।......

শ্রদ্ধাবনত স্নেহার্থী
প্রবোধচন্দ্র সেন

কল্যাণীয়েষু—

আবার একটা ভুল করেছি। এ ভুলটা অজ্ঞানকৃত নয়, অনবধান বশত। অর্থাৎ আমার যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলে সেটা স্বীকার করবার সময় ভুল করেছি। কুষ্টির প্রমাণের চেয়ে এতে জোর প্রমাণ পাওয়া যায় যে আমার বয়স সত্তর পেরিয়েছে।

কিন্তু প্রদোষ শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তুমি আমার বক্তব্যটি ঠিক হয় তো বোঝোনি।

প্রত্যুষ শব্দটি কালব্যঞ্জক—অর্থাৎ দিনরাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যুষ। বাংলা ভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো অন্ধকারের সমবায়ের যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায় সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করি। ইতি—২৩ অগষ্ট ১৯৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'প্রদোষ' ও 'হলন্ত' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, কবিগুরুর উত্তর সমেত সেই চিঠি এখানে প্রকাশ করা গেল। বিঃ সঃ

পুস্তক পরিচয়

বনমর্ম্মর ও অন্যান্য গল্পঃ—শ্রীমনোজ বসু প্রণীত, প্রবাসী কার্য্যালয় কর্ত্তৃক ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ২০৩ পৃষ্ঠা দাম এক টাকা বারো আনা।

মনোজ বাবুর গল্প বল্‌বার ভঙ্গিটি পাঠকের দৃষ্টি কখনো এড়িয়ে যায় না,—কেন-না তা' যেমনি মনোগ্রাহী, তেমনি একেবারে লেখকের নিজস্ব। প্রত্যেকটি গল্পের প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েই পাঠকের মনে হয় যেন জীবনের অন্তরতম স্থানে এসে পৌঁছান গেল। মানুষ ও মানব-জীবনের প্রতি মনোজ বাবুর দরদ অসাধারণ; সরল, অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সহস্র দুর্ব্বলতা, অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি লেখকের প্রাণের গভীর দরদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। পল্লীবাসীর নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার মধ্যেও কতখানি রস থাক্‌তে পারে তা' 'বাঘ' গল্পটি পড়লে বোঝা যায়। অন্য গল্পগুলিতেও জীবনের সহস্র ত্রুটি, সহস্রদিকের সহস্র অপূর্ণতা বর্ণিত আছে,—কিন্তু তবুও মোটের ওপর, জীবনটা সুন্দর,—মানবজীবনে ভালোবাস্‌বার অনেক কিছুই আছে,—এমনি একটা উপলব্ধি যে-কোনো গল্প পড়লেই পাঠকের মনে থেকে যায়। গল্পগুলির উপকরণ খাঁটি বাংলার নিজস্ব বস্তু,—কোনো একটা ভাবও বিদেশী সাহিত্য থেকে ধার করা নয়; পড়তে পড়তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত বাঙ্গালীর জীবনের একটা বিশিষ্ট অথচ সরস ও তাজা রূপ পাঠকের মনকে আঘাত করে। গল্পগুলির চরিত্রের মধ্যে না হোক, বিষয়-বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্যও যথেষ্ট আছে; কাজেই বইখানি পড়তে পড়তে কোথাও এক-ঘেয়েমিতে পাঠকের মন ক্লিষ্ট হয় না,—বরং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে যেতে পাঠকের মন্ একটা সুরুচি ও স্নিগ্ধতার আস্বাদনে প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে।

তবুও ঋণ যে কোথাও মনোজ বাবুর নেই,—এমন কথা বল্‌তে পারি না,—তবে সে ঋণ বিদেশী লেখকদের কাছে নয়, দেশী লেখকদের কাছে। তিনজন লেখকের নিকট মনোজ বাবুর ঋণ সুস্পষ্ট,—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর বিভূতিভূষণ। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে মনোজবাবু যা' নিয়েছেন, তা অজ্ঞাতসারেই নিয়েছেন,—এবং তা' একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। খাঁটি বাংলার অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে দরদ-মাখানো অন্তর্দৃষ্টি,—যার বলে শরৎচন্দ্র আজ সারা বাংলার হৃদয় জয় করে ফেলেছেন,—সেই ধরণের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মনোজ বাবুর মধ্যেও পাই। তবে সেখানে মনোজবাবু শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'লেও শরৎচন্দ্রকে অনুকরণ করেন নি,—তাই সেখানে মনোজ বাবুর নিকট আমরা যা' পাই, তার মধ্যে শরৎচন্দ্র উঁকি মারেন না,—তা' মনোজ বাবুরই নিজস্ব জিনিষ। কিন্তু ঠিক এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতি বাবুর নিকট মনোজবাবুর ঋণ সম্বন্ধে বলা চলে না। এখানে যেন একটু জ্ঞাতসারেই অনুকরণ করবার চেষ্টা দেখা যায়,—যেমন প্রথম গল্পটিতে। দৈনন্দিন জীবনের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্যের স্পষ্টতার অতীতে একটা যে স্বপ্ন-লোক দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে জীবনের কোনো কোনো বিরল মুহূর্ত্তে অন্তরকে আঘাত করে,—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্পষ্ট সত্যের চেয়েও যে সেটা কম সত্য নয়,—বরং বেশি সত্য এবং তারই মধ্যে যে মানুষ আপনার সীমা ও খণ্ডতার বেদনা ভুল্‌তে চায়,—'বন-মর্ম্মর' গল্পটির এইটেই প্রতিপাদ্য বিষয়। স্থানে স্থানে রচনার উৎকর্ষ একেবারে প্রথম শ্রেণীর,—যেমন এক জায়গায় আছে—

"সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল......সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের

মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনো দিন সে আর আসিবে না!····ক্রমশঃ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। * * * কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসিকান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। উদ্গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে"।

তথাপি গল্পটির অন্যান্য অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথকে ও বিভূতিবাবুকে অনুকরণ করবার চেষ্টা এত সুস্পষ্ট, যে মনে হয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তবলোক থেকে অতীন্দ্রীয় স্বপ্নলোকের মধ্যে আবার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকের মধ্যে পাঠককে বারেবারে টানাটানি করে আনাগোনা করানো হ'য়েছে। দুটি জগতের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। এখানে লেখক যেন আপনাকে একটু হারিয়ে ফেলেছেন।

এইটুকু দোষ সত্ত্বেও এই বইখানিকে উচ্চপ্রশংসা করলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। মনোজবাবু বাঙালী পাঠকদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী। যে-সকল তরুণ লেখক সম্প্রতি বাংলার কথা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, মনোজবাবুর স্থান তার মধ্যে অতি উচ্চে।

সুশীলচন্দ্র মিত্র

ইহাই নিয়ম—শ্রীআশীষ গুপ্ত প্রণীত : সরস্বতী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠা দাম এক টাকা।

বইখানি পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। লেখকের আবির্ভাব সাহিত্যক্ষেত্রে বেশিদিন হয় নি, বয়সও অল্প। লেখার মধ্যে কিন্তু কাঁচা বয়সের চিহ্ন বেশি নেই, যা-ও বা আছে তা'

অতি সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। লেখকের ভাষা চমৎকার, চরিত্র-সৃষ্টিরও ক্ষমতা আছে,—ভবিষ্যতে এই লেখকের দ্বারা বাংলার কথা-সাহিত্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হ'বে আশা করা যায়।

প্রথম গল্প—"ইহাই নিয়ম"। কর্ম্মচ্যুত কেরাণীর দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। কোথাও বা ধনের অজস্রতা,—সে ধনের অপচয়ের পরিসীমা নেই, কোথাও বা অভাবের তাড়না,—দু'-বেলা দু' মুঠো অন্ন জোটে না, জগতের ইহাই নিয়ম। সকরুণ ছবি, বেশ সরস ক'রে আঁকা। দ্বিতীয় গল্প—"অন্তরে বাহিরে"। মাতৃ-হৃদয়ের অন্তরে তুমুল ঝড়,—বাহিরে গম্ভীর স্তব্ধতা, এ-গল্পে এই চিত্র আঁকা হ'য়েছে। তৃতীয় গল্প—স্বামী-তীর্থ। স্বামী-গৃহ নারীর তীর্থ-স্থান,—এই ধারণাটিকে নিয়ে নিয়তি কত সময়ে কি রকম নিষ্ঠুর পরিহাস করে,—এই গল্পে তা' দেখানো হ'য়েছে। অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারের যত কিছু কদর্য্যতা তা লেখক প্রশংসনীয় দক্ষতার সহিত অন্তরের গভীর বেদনা দিয়ে দেখিয়েছেন। চতুর্থ গল্প—"বরণডালা"। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা বিবাহ করার মধ্যে যে কদর্য্যতা তারই ছবি। পঞ্চম গল্প—"বিদ্রূপ"—নিয়তির পরিহাসের কাহিনী।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ গল্পের টেকনিকের মধ্যে কিছু দোষ থাকলেও সব কটি গল্পই বেশ সুখপাঠ্য। নূতন লেখককে যদি উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন থাকে,—ত সে উৎসাহ আশীষ বাবু প্রভূতভাবে পাবার অধিকারী। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, সে-পক্ষে দামটা বেশ সস্তা। আমরা এমন বই-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

সুশীলচন্দ্র মিত্র

আঠারো বছর:—শ্রীজগৎ মিত্র প্রণীত। ৬:নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

পাঁচটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখকের সম্ভবতঃ ধারণা তাঁর "আঠারো বছর" শীর্ষক গল্পটি সব চেয়ে ভাল উৎরেচে—তাই সেই গল্পের নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ করেচেন। আমার মনে হ'ল সর্ব্বপ্রথম সন্নিবেশিত তাঁর "কাশফুল" গল্পটিই সব চেয়ে ভাল। জগৎ বাবুর ছোট গল্প, কবিতা, ছোটখাটো প্রবন্ধ মাঝে মাঝে মাসিকপত্রে পড়েচি কিন্তু পূর্ব্বে তাঁর লেখা সম্বন্ধে একটা পুরোপুরি ধারণা করবার সুযোগ হয়নি। এই গল্পগুলি একত্রে পড়ে একটা কথা আমি নির্ভয়ে বলতে পারি—সে কথাটি এই যে জগৎবাবু ছোটগল্প লিখতে জানেন। তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলে আজ হয়ত সেটা নিতান্তই একটা কথার কথা ব'লে মনে হবে কিন্তু সাহিত্যে আন্তরিকতার যদি কোন দাম থাকে তবে জগৎবাবু একদিন সে দাম পাবেন।

প্রকাশক ঠিকই বলেচেন যে বইখানির পাঁচটি গল্পের সুর বিভিন্ন। দু'টি গল্প একরকম নয়। আর তার চেয়ে বড় কথা এই যে প্রত্যেকটিই গল্প হয়েচে। আজকাল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় এবং সভা সমিতিতে অনেক গল্প পড়তে পড়তে এবং শুনতে শুনতে সব গল্পই জোলো লাগে—কোনটির ভাষা হয়ত ভাল কিন্তু ভাবের পূর্ণতা নেই, কোনটি হয়ত চুরি,' কোনটি অনুকরণ, কোনটি তর্জ্জমা, কোনটির মধ্যে লেখকের বিদ্যা জাহির করবার প্রবৃত্তি অমার্জ্জনীয়, কোথায়ও হয় ত সংযমের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাবে ভাষায়, লালিত্যে, সৌকুমার্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, অধিকাংশ গল্পই পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে শুদ্ধচিত্ত পাঠককে আনন্দ দিতে পারে না। জগৎবাবুর লেখায় সে ত্রুটি পাই নি। তাঁর ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর। চিন্তাশক্তির গভীরতা লক্ষ্যণীয়। সমস্ত মনুষ্যলোক, এমন কি পশুলোকের জন্যও হৃদয়ে বেদনা-বোধ আছে। তাঁর "স্বপ্নের বিড়ম্বনা" গল্পের অতি-প্রাকৃতিক চিত্রও অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েচে। "বিজয়িনী" গল্পের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ সুস্থ। মোট কথা জগৎবাবু নিজের আনন্দে সমস্ত ভুলে গিয়ে গল্প বলতে চেয়েছেন এবং তাঁর গল্প বলা সার্থক হয়েচে।

প্রচ্ছদ পট বিখ্যাত রেখা-শিল্পী শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশের আঁকা। সে ছবি তাঁর উপযুক্ত হয়েচে।

অবনী নাথ রায়

বেদুইনঃ—পনেরোটি কবিতার সংগ্রহ। শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীমণিমোহন মিত্র, বান্ধব পুস্তকালয়, শিবপুর রোড্, হাওড়া।

লেখকের সম্বন্ধে আমার প্রধান নালিশ এই যে তাঁর চিন্তা এখনো অপরিণত। তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখাচ্ছি ঃ—

"নারী জনমের সার্থক ক্ষণ আজো আমি লভি নাই.
বাল্যবিধবা, ব্রহ্মচারিণী, বড় বড় কথা ছাই!
কেতাবী বুলির ছটা—
নারীর জীবনে পরখ চালায় ক'রে ধুমধাম ঘটা।
বেদনায় হত প্রাণ—
ও সবে আমার কাজ নাই আর—আমি চাই সন্তান।"

এ সম্বন্ধে মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের সমস্ত বালবিধবা সন্তান কামনা করচে এ সংবাদ সত্যও নয়, উচিতও নয়। লেখকের বোঝা উচিত ছিল যে সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে শুধু সেন্টিমেন্ট্ই যথেষ্ট নয়, সে সমস্যার সমাধান রিজ্নের (reason)ও অপেক্ষা রাখে।

"আমার প্রিয়ার প্রিয়তম তুমি—আদর করিনু তাই,
তোমার মানসী আমারো মানসী—রাগ করিও না ভাই।"

লেখকের ঔদার্য্য প্রশংসনীয় কিন্তু এই ধরণের বহু কবিতা অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত লিখেচেন ব'লে স্মরণ হচ্ছে। বিশেষ ক'রে নীচের তু' লাইন ত হুবহু কোথায় পড়েচি যেন,

"আমি ম'রে গেলে আমার বিরহে কেঁদো নাক তুমি প্রিয়ে,
নিঃসঙ্কোচে হেসে কথা ক'য়ো মাথায় সিঁদুর দিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে অপহরণও আছে। পীযূষ বাবু লিখ্চেন দশ নম্বরের কবিতায় ঃ—

"কালের প্রয়াণ পথে –
আমি চলিয়াছি আপন তালেতে ভাঙনের মহারথে।"

রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন ঃ –

"বলো জয়, জয়, বলো নাহি ভয় ;—
কালের প্রয়াণ পথে
আসে নির্দ্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।"

পীযূষ বাবু আরো লিখেচেন :—

"বাঁচা ও মরার আগে ও পিছনে শুধুই অন্ধকার,
নীলিমার বুকে মাথা রেখে শুধু স্বপ্ন দেখাই সার।"

সর্ব্বনাশ, একেবারে পুরোপুরি Hedonism, ভবিষ্যতের গর্ভে আশা আর আকাঙ্খা করার কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

মোট কথা সরকারী বারীণদার যে প্রশংসাপত্র বইখানির উপর খুঁদে দেওয়া হয়েচে আমরা তার সঙ্গে একমত হ'তে পারলুম না। বারীণদা লিখ্চেন, "এত অল্প বয়সে তুমি যে বাঁশীটি খুঁজে পেয়েছ এটি বড় সুখের কথা ইত্যাদি।" বারীণদা নিশ্চয়ই বল্‌তে চেয়েছেন "বাঁশীর সুর খুঁজে পেয়েছ", কেননা খালি খালি বাঁশী খুঁজে পেয়ে ত কোন লাভ নেই, যদি সে বেচারা বাজাতে না জানে! কিন্তু আমাদের ধারণা পীযূষ বাবু এখনো সুর খুঁজে পান নি, তবে হয়ত ভবিষ্যতে খুঁজে পেতে পারেন, কেননা কবিতাগুলির একটা গুণ লক্ষ্য করেচি, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত (Spontaneous).

কবিতার ছন্দ একই ধরণের, কোন বৈচিত্র্য নেই। পাতায় কোন নম্বর দেওয়া নেই, সুতরাং কত পৃষ্ঠার বই না গুণ্‌লে বলা যাবে না। বইখানির বাঁধাই কিন্তু সুরুচির পরিচায়ক, পিছন দিকের ছবিটিও।

অবনী নাথ রায়

রস-চিকিৎসা—১ম খণ্ড—কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, জ্যোতির্ভূষণ, ভিষগাচার্য্য প্রণীত। মূল্য—১।০ টাকা। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

রস-চিকিৎসা ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। রস-চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান বস্তু পারদ। এই পুস্তকে পারদ ভস্ম, হরিতাল ভস্ম, লৌহভস্ম প্রভৃতি ধাতুঘটিত তান্ত্রিক মহৌষধগুলি কি প্রকারে সহজে এবং বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহার প্রণালী দেওয়া হইয়াছে। রস উপরস, ধাতু উপধাতু, রত্ন উপরত্ন, বিষ উপবিষ প্রভৃতির ব্যাখ্যাও এ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও ঝঞ্চাট ও সুখসাধ্য প্রণালীর অজ্ঞতা হেতু রসক্রিয়া সম্পাদন করিতে অর্থাৎ মকরধ্বজ, লৌহভস্ম, পারদভস্ম, হরিতালভস্ম প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি অনেকে প্রস্তুত করিতে সাহসী হন না।...ইঁহাদের সুবিধার জন্য আমি সহজে মকরধ্বজ ও রস-সিন্দুর পাকবিধি, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, কাংশ প্রভৃতি ধাতুসকলের ভস্মবিধি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার মত বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি।" সুতরাং মনে হয় এই পুস্তকের দ্বারা শুধু চিকিৎসক এবং শিক্ষার্থীই নয়, সাধারণ লোকেও উপকৃত হইবেন।

'বিষ্ণুশর্ম্মা'



ভরা বাদরে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বৃষ্টি, কেবলি বৃষ্টি, সমস্ত আকাশ ঘোলাটে, সবুজ গাছ পালার উপর, বৃষ্টি ধারার ঝাপ্‌সা ধূসর ভিজে পর্দা ঝুলছে— গাছগুলি যেন একটির সঙ্গে অন্যটি, নেপটে গেছে। আর আর পৃথিবীর ব্যবধানটাও বৃষ্টির আবির্ভাবে ছাইরংএর হয়ে গেল।

সামনের পুকুরের বুকের উপর যতগুলি গাছের ছায়া সটান শুয়েছিল, সব কোথায় অন্তর্ধান। এখন অবিরাম বারিবিন্দু পতনে কত রকমের আঁকাবাঁকা লেখা তার উপর জেগে উঠ্‌ছে, কিন্তু জলের লেখা কতক্ষণ থাকে? আবার সব চারিদিকে বিছিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের নিশ্বাসে সমস্ত পুকুরটা শিউরে উঠ্‌ছে—কেঁপে কেঁপে জল সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাঠের সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে, গঙ্গার ঢলনামা জলের মত গেরুয়া জল জমছে। আর চারিদিক হ'তে একটা গভীর শব্দ উঠ্‌ছে—"যাও"-"যাও।" কেবল দালানের শানের উপর জোরে যে বৃষ্টি বিন্দুগুলি পড়ছে, তারি মধ্যে একটি হাল্কা তাল বাজছে, তুড়ি দিয়ে তাল দিলে যেমন হয় তেমনি।

বৃষ্টি ছাড়ল, আকাশের ধোঁয়াটে মেঘের মাঝে মাঝে, সাদা আলোর ফাঁক দেখা যাচ্ছে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি চুপি চুপি কথা কইছে। গাছ-পালা আবার সব আলগা হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তালগাছের কাণ্ডটা একেবারে নিবিড় কালো, খেজুরও কতকটা তাই; তবে তার গায়ে শতেক খাঁজ কাটা। বছরে বছরে তার কত রস, কেটে বা'র করে নেওয়া হয়েছে, সেই সব খাঁজে খাঁজে কালো আরো নিবিড়। নারিকেল সুপারির গায়ে শাদা শাদা ছাতা পড়েছে, তাই তারা কালো না হয়ে ধূসর হয়ে গেছে। পুকুর-বুক শান্ত হয়ে এল, আবার সব ছায়া দেখা যাচ্ছে। তবে কাঁপুনিটা একেবারে শেষ হয়নি, শিউরে শিউরে উঠছে, তাতে করে ছায়ার সোজা গায়ে, ঢেউখেলান রেখা দেখা যাচ্ছে।

বিদায়ের যাও যাও শব্দ নিস্তব্ধ। দু' একটা পাখী মৃদু স্বরে ডাকাডাকি করছে, গাছের পাতা বেয়ে দু'চারটা বড় বড় ফোঁটা, ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে থেকে থেকে হঠাৎ খসে পড়ছে। ঐ একটা বুল্‌বুলি উড়ে এসে ঝুঁটি নাড়িয়ে কি বলে গেল! লেজ নাড়িয়ে, মশা তাড়িয়ে, গরু আবার ঘাস খেতে আরম্ভ করল, এতক্ষণ তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল।

*　　*　　*　　*

ঘন বনের বেড়া-ঘেরা দিগন্ত, আর ধূসর আকাশ এই আমার রাত্রি দিনের দর্শনীয় পৃথিবী। আমার ঘরের বারন্দার সম্মুখে একটু খানি ঘাস ঢাকা আঙিনা, তার পর তীরে নারিকেল সুপারি তাল খেজুর সারি দিয়ে দাঁড়ান একটি পুষ্করিণী। আরো খানিকদূর ঘন ঘাস-ঢাকা মাঠ—তার পর নিবিড় বনের বেড়া, গহনতরুশ্রেণী। ধূসর আর সবুজে ঢাকা এতটুকখানি পৃথিবী। ঘুঘু ডাকে, বুলবুলি ঝুঁটি নাড়িয়ে আনাগোনা করে, খঞ্জন ছোট্ট লেজটি দুলিয়ে যায়, বার বার চটুল চক্ষে চায়, আর দাঁড়কাক কি খাঁ খাঁ করে কেবলি ডাকে। এরি মধ্যে ছোট ছোট মেয়েদের করুণ কচি গলাও শোনা যায়।

যখন আলো ওঠে তখন ধূসর মেঘের কালিমা হাল্কা হয়ে আসে, রুপালি ঝালর দেওয়া একখানি ঝালর ঝুলে পড়ে, বনের সবুজেও বর্ণ-বিভিন্নতা দেখা যায়, আবার যখন মেঘের আড়ালে আলো লুকিয়ে পড়ে, তখন সব শুভ্র অনাবিলতা চলে যায়, ঘাস ছাড়া আর সব গাছের সবুজ এক হয়ে আসে, পুকুরের জল একেবারে কাদাগোলার মত দেখায়। শুধু

একটু আনন্দ আর জীবন দেখা যায় গাছপালার আন্দোলনে, বিচিত্র ভঙ্গী আর নিরন্তর পরিবর্ত্তমান মর্ম্মর সঙ্গীতে। কখনো বা স্বগতোক্তি, আবার কখনো চুপি চুপি প্রেমালাপ আবার কখনো বা মহা উৎসাহে কলকোলাহল। আমি একা একা বসে বসে দেখি, আর কত কি ভাবি।

সবচেয়ে ভাল লাগে সম্মুখের খণ্ড-আকাশ, বনের সীমানা দেওয়া এই ছোট্ট পৃথিবীটুকু দেখতে। এখানে কিছুরি অভাব নাই। পুকুরের বুকের মুকুরে, ছায়াতে আমি অনেক ছবি দেখতে পাই। আকাশের মেঘের লীলা, তীর তরুর অচল স্তব্ধতা নির্ব্বিকার ধ্যান, আকাশের নক্ষত্রের দিব্যালোক। জল যতক্ষণ স্থির থাকে ততক্ষণই ছায়ার, স্বপ্নের অবসর, তারপর যদি একটুখানি জোরে হাওয়া উঠ্‌ল সব মুছে যায়, ছায়ার চিহ্নও থাকেনা, তখন শুধু বাস্তব তরুরাজির উতলা ব্যাকুল আন্দোলন, অস্থির নিশ্বাস, অবিরাম ব্যগ্র কল-কোলাহল জ্ঞানগোচর হয়। ঘন বনের বেড়ার পরে নদীর প্রবাহ, সরীসৃপগতিতে সে বয়ে চলেছে, তার কোনও শব্দ কাণে আসেনা, মাঝে মাঝে পার ঘাটের জাহাজের বাঁশী আর শিঙা শোনা যায়।

প্রিয়ম্বদা দেবী

"কারারুদ্ধ"

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কোথায় থাকি কোথায় রাখি
হারিয়ে গেছে সকল দিশে
শুধাইলে বল্‌ব সখি
আজ্‌কে মাসের পইতিরিশে!

একটী কথা বল্‌তে শুধু
একটী কথা কইতে জানি
কান পাতিনে কারো কথায়
ভয় করিনে কানাকানি।

ঐ নয়নে নীলাঞ্জনে
নীল গগণে তারার হাসি
কাক চক্ষু সরোবরে
ফুটলো কমল রাশি রাশি।

আমার দুটী আঁখির তারা
ঐ নয়নে দৃষ্টি দিতে—
হায়রে কারারুদ্ধ হ'ল—
আর এল না খবর দিতে!

নানা কথা

ভ্রম সংশোধন

গত শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় "স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন" প্রবন্ধে তিন জায়গায় ভ্রমক্রমে "যতীন্দ্রমোহনে"র পরিবর্ত্তে "যতীন্দ্রনাথ" ছাপা হয়েচে। পাঠকগণ অনুগ্রহ ক'রে এই ভ্রমটি সংশোধিত ক'রে নেবেন। বলা বাহুল্য "যতীন্দ্রনাথ" বল্‌তে লেখক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মহাশয়কেই উল্লেখ করেছিলেন।

দেশপ্রীতির আদর

বিলাতের বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের উদ্যান সম্মিলনীতে এবার অনেক ভারতীয়ই উপস্থিত ছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই জাতীয় পরিচ্ছদে সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। অপরাপর ভারতীয়—বিশেষতঃ ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে একমাত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভারতীয় পরিচ্ছদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রাজদরবারে শ্রীসত্যেন্দ্রমোহনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুষমা দেবী বিলাতী "কার্টসির" পরিবর্ত্তে ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন ক'রে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, এবং আনন্দের বিষয়, সে অভিবাদন সম্পূর্ণ আদরেরই সহিত গৃহীত হয়েছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন ভারতীয় সঙ্গীতকলায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ এবং শ্রীমতী সুষমা দেবী এ বিষয়েও তাঁহার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী। উভয়েই বিলাতে অনেক সামাজিক সম্মিলনে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সৌন্দর্য্য বিদেশীর কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন, এবং এঁদের সমবেত চেষ্টায় অনেক বিদেশীয় সুধীজন ভারতীয় সঙ্গীতের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েচেন। এঁদের আতিথ্য এবং সৌজন্য ইংরাজ এবং ভারতীয় উভয় সমাজেই সর্ব্বজনবিদিত এবং যে উচ্চ বংশের সহিত এঁরা সংশ্লিষ্ট তারই পরিচায়ক।



শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্
ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী সুষমা দেবী

এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন "বিচিত্রার" পাঠকবর্গের পরিচিত শ্রীপ্রভাতমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুল্লতাত। অবকাশের অব্যবহিত-পূর্ব্বে শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন পাবনা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দীর্ঘ অবকাশের পর এঁরা দেশে ফিরে আস্‌চেন। আমরা এই কলাভিজ্ঞ দম্পতির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পরলোকগত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একজন ত্যাগী কর্ম্মবীর হারাল। রাষ্ট্রীয় বাংলার ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে শ্যামসুন্দর কিছু না কিছু কাজ করেছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম, চিরদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছিল। তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি বি-এ ক্লাশের ছাত্র। পড়াশুনো আর হোল না, তাঁকে স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হ'ল। কিছুদিন পরেই তিনি "প্রতিবাসী" নামে এক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বের করলেন; এ কাগজের আয়ু বেশি দিন ছিল না,—কিন্তু বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, "সন্ধ্যা" "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে শ্যামসুন্দর সেকালের জনমতগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁকে রাজরোষে পড়তে হ'য়েছিল, এবং ১৯১০ সালে ছাড়া পেয়ে স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" কাগজের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে কিছুকালের জন্য আবার তিনি কার্শিয়ং সহরে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯২০ সালে মনেপ্রাণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিক "Servant" কাগজখানির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস-সদস্যের প্রবেশ-সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর '*Servant*' কাগজে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেছিলেন। "Servant" কাগজখানিও বেশিদিন চল্‌ল না,—পরে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরেজি 'বসুমতী'র সম্পাদকতা করেছিলেন। এই কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি একরকম অবসরই গ্রহণ করেছিলেন,—কিন্তু সে অবসরে তিনি শান্তিতে ছিলেন না। তাঁর মত কর্ম্মী মানুষ অবসরের মধ্যে স্বস্তি পায় না; অথচ শেষ জীবনে ভগ্নস্বাস্থ্যে কোনো কর্ম্মের সুযোগ না পেয়ে তিনি একরকম আধমরাই হ'য়েছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-সি-ই

এই বাঙালী যুবকটীর কৃতিত্বের কথা শুনে আমরা প্রীত হ'য়েছি। ইনি পাট্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে Prince of Wales Scholarরূপে সাড়ে তিন হাজার টাকা বৃত্তি পেয়ে বিলাত যাচ্চেন। এঁর আগে মাত্র একজন বাঙালী এই পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পাট্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-সি-ই ও আই সি-ই, উভয় পরীক্ষাতেই প্রথমস্থান অধিকার করতে এঁর আগে কেউ পারেন নি। আমরা এই মেধাবী যুবকটির উন্নতি কামনা করি।

শরৎ-বন্দনা

৩১শে ভাদ্র শুক্রবার শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে কলিকাতার সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক একটি উৎসবের আয়োজন হওয়াতে আমরা প্রীত হ'য়েছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই শরৎ-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে "কালের যাত্রা" নামে একটি নূতন পুস্তিকা রচনা করেছেন, এবং সেটি তাঁর আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। বইখানি শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হ'বে। শরৎ-বন্দনা সমিতি কর্ত্তৃক উৎসবের যে আয়োজন করা হ'য়েছে, তার একটি তালিকা আমরা নীচে প্রকাশ করলাম:—

প্রথম দিন—৩১শে ভাদ্র শুক্রবার।

১। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় শরৎ সম্বর্দ্ধনা—সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ ব্রড্‌-কাষ্টিং সার্ভিস্ কর্ত্তৃক—এই সম্বর্দ্ধনায় প্রদত্ত বক্তৃতাদি বেতারযোগে প্রচার করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

২। সন্ধ্যা সাড়েসাতটায় ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ ব্রড্‌কাষ্টিং সার্ভিস্‌ কর্ত্তৃক শরৎ-বন্দনা—(ক) অভিনন্দন-পত্র পাঠ, (খ) শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল" বইখানির বেতারে অভিনয়।

৩। রাত্রি সাড়ে ন'টায় চিত্রায় বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা—পল্লী-সমাজ ও দেনা-পাওনা।

দ্বিতীয় দিন—১লা আশ্বিন, শনিবার। অপরাহ্ন পাঁচটায় ২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাটিতে বৈঠক।

তৃতীয় দিন—২রা আশ্বিন, রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটায়—টাউন-হলে সাহিত্য-সম্মেলন—সভাপতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চতুর্থ দিন—৩রা আশ্বিন, সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায়—কলিকাতার রঙ্গালয়গুলি কর্ত্তৃক টাউন হ'লে শরৎচন্দ্র'ক অভিনন্দন ও "পল্লীসমাজ" "ষোড়শী" ও "চন্দ্রনাথ" অভিনয়।

এই ব্যবস্থা করে শরৎ-বন্দনা সমিতি কলিকাতাবাসী সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। আমরা আশা করি,—শুধুই কলিকাতায় নয়, বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে অনুরূপ শরৎ-বন্দনার অনুষ্ঠান হ'বে। আজীবন সাহিত্য-সাধনার দ্বারা শরৎচন্দ্র দেশবাসীর যে প্রীতি অর্জ্জন করেছেন, দেশবাসীর তরফ থেকে তার পরিচয় প্রদানের কোনো ত্রুটি হ'বে না।

'বিচিত্রা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠযোগ আছে,—তা বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই জানেন। আমরা শরৎচন্দ্রের অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি,—আর আশা করি বর্ষে বর্ষে এই রকম অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের লোকে তাঁকে অভিনন্দিত করুক।

কার্ত্তিক মাসে বিচিত্রা

পূজার অবকাশের জন্য আগামী কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রা ১২ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে। সুতরাং বিজ্ঞাপন দাতারা ৩রা আশ্বিনের মধ্যে নূতন বিজ্ঞাপনের কপি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের অফিসে পাঠাইবেন।

শরৎচন্দ্রের নূতন গল্প

বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন গল্প প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ শরৎচন্দ্র গল্পটি আরম্ভ ক'রেও শেষ করতে পারেন নি। গল্পটি শেষ হ'লে যথাকালে বিচিত্রায় প্রকাশিত হবে।

বিচিত্রা প্রচ্ছদের নূতন নক্সা

এবারকার বিচিত্রা প্রচ্ছদের সুদৃশ্য নক্সাটি খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীঅর্দ্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। Commercial drawing-এ অর্দ্ধেন্দুবাবু বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

৺ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিগত ৯ই ভাদ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেওঘরে তাঁর কুণ্ডার ভবনে পরলোক গমন করেছেন। অধুনালুপ্ত "মানসী" পত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। তা ছাড়া কিছুকাল "মানসী" এবং 'পুষ্প-পা'ত্রের সম্পাদকও তিনি ছিলেন। 'তপস্যার ফল', 'পল্লীরাণী' 'অনুভূতি', 'স্মৃতিরেখা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁর রচিত। ফকিরচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

৺কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

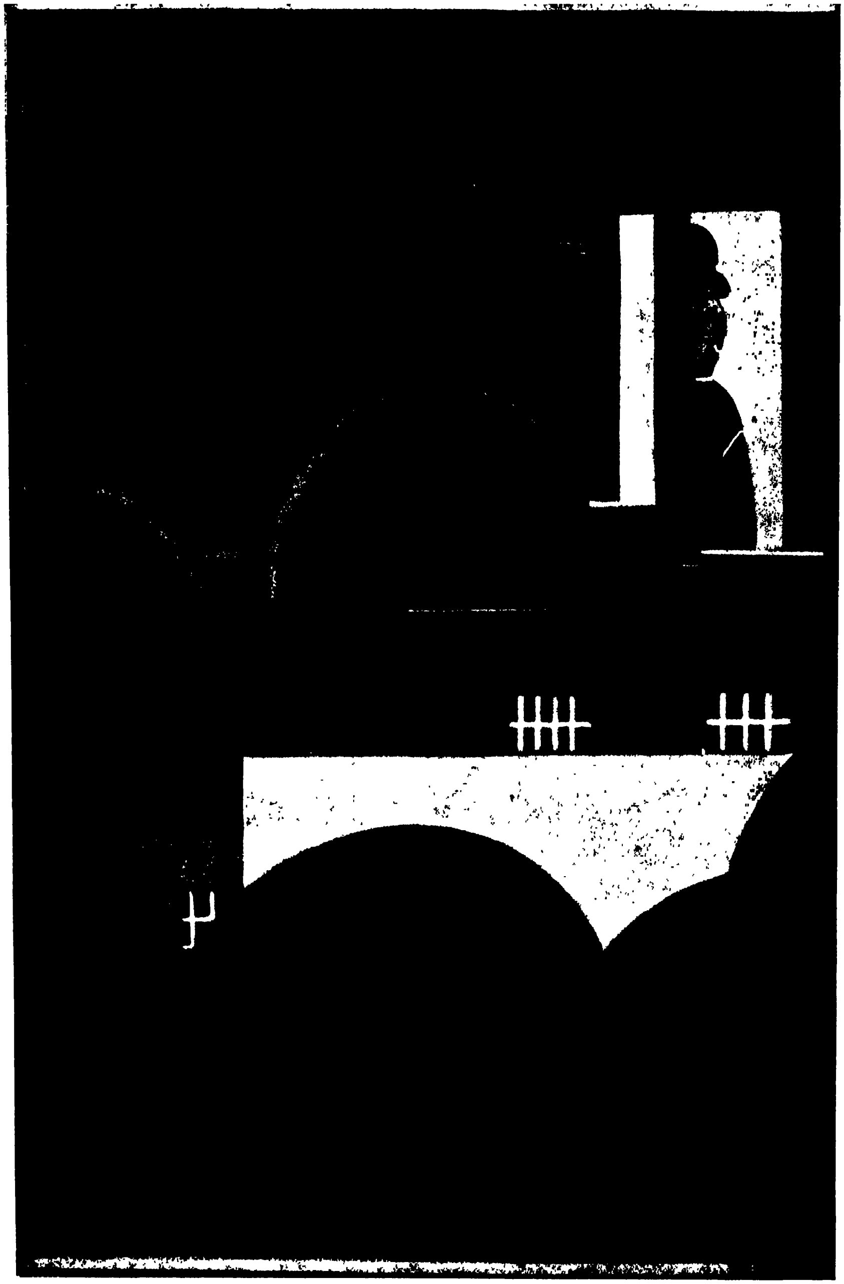
গত ১৩ই আগষ্ট পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক-গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স বিরানব্বই বৎসর হয়েছিল। কৃষ্ণকমল ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কৃষ্ণকমলের সহপাঠী ছিলেন। কৃষ্ণকমল প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন, পরে সে পদ ত্যাগ ক'রে তিনি হাওড়া কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। হাওড়ায় ওকালতী করবার সময়ে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তি পান। পরে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু ওকালতী ভাল না লাগায় ওকালতী ব্যবসা ত্যাগ করে রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকমল বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন।

কৃষ্ণকমলের ৮২' বর্ষীয়া বিধবা পত্নী এখনো জীবিতা।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের দৃঢ় সঙ্কল্প

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী স্থির করেছেন যে, গভর্মেণ্ট যদি ইত্যবসরে এ ব্যবস্থা রদ করে উন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ে একত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না করেন তা হ'লে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর হ'তে তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করবেন এবং প্রায়োপবেশন কালের মধ্যেও গভর্মেণ্ট যদি তাঁদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না করেন তা হ'লে তাঁর প্রায়োপবেশন শেষ হবে একমাত্র তাঁর দেহান্তর দ্বারা। তাঁর এই সঙ্কল্প তিনি কয়েকটি পত্র দ্বারা ভারত সচিব এবং প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছেন, সে-সব কথা দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রত্যেক স্তম্ভে সকলেই অবগত হয়েছেন। মহাত্মার এ সুদৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করবার পর একটা অতিশয় গুরুতর শঙ্কটের দ্বারা সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, গভর্মেণ্টও যে কতকটা নয়, তা নয়। মহাত্মাজীর আবেদনের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিজেদের সহিত এবং উন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ যদি অন্তর্হিত হয় তা হ'লে একত্র নির্ব্বাচন দিতে গভর্মেণ্টের কোনো আপত্তি থাকবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ বিষম সঙ্কটের সমাধানের ভার এখন পড়ল হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের উপর। আমাদের একান্ত অনুরোধ, ডাঃ আম্বেদকর, রাও-বাহাদুর রাজা, এবং উন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সম্মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিরোধের নিরসন করে যাতে মহাত্মার মত মূল্যবান জীবন রক্ষিত হয় অচিরে তার ব্যবস্থা করবেন। আমরা আশা করি গভর্মেণ্টও মহাত্মাজীকে অবিলম্বে মুক্ত করে এ বিষয়ের সহায়ক হবেন।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta



প্রাসাদ ভবনে

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

৺বিচিত্রা

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৩৯	৪র্থ সংখ্যা

প্রাসাদ ভবনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাসাদ ভবনে নীচের তলায়
সারাদিন কত মতো
গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত
সেথা তুমি তব গৃহ-সীমানায়
বহু মানুষের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্ম্মের বন্ধনে।
দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে,
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশ তলে।
শেষ আলো আভা মিলায় নদীর জলে।
হাওয়া থেমে যায় বনের শাখায়
আঁধার জড়ায়ে ধরে।
নির্জ্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে।

তখন একাকী সব কাজ রাখি,—
প্রাসাদ ছাদের ধারে
দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে
জানি না তখন কী যে নাম তব
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূর সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।
দিবস রাতির সীমা মিলে যায়,
নেমে এস তার পরে
ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কবিতা নন্দলালবাবুর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও তদ্দৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই "বিচিত্রিতা" নামে বই আকারে বাহির হইবে।



ক্যামেলিয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম তার কমলা,
দেখেচি তার খাতার উপরে লেখা।
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে, কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের একপাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই, আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হোলো না।
এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই,—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্ম্মল বুদ্ধির চেহারা মুখে, বিদ্যার শান-দেওয়া,
ঝক্‌ঝক্ করচে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসঙ্কোচ।
মনে মনে ভাবি একটা কোনো সঙ্কট ঘটে না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি,—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো একজন গুণ্ডার স্পর্দ্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলাজলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,

নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে আওয়াজ করে,
না সেখানে হাঙর কুমীরের নিমন্ত্রণ,
না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়,
কমলার পাশে বসেচে একজন আধা ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল অকারণে টুপিটা তার মাথা থেকে উড়িয়ে দিই,
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাইনে, হাত নিষপিষ করে।
এমন সময় সে এক মস্ত মোটা চুরোট ধরিয়ে
টানতে সুরু করলে।
কাছে এসে বললুম, ফেলো চুরোট।
যেন পেলেই না শুন্‌তে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে চুরোট ফেলে দিলেম রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার সে তাকালো কটমট করে,
কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
নাম আছে ফুটবল খেলায়
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নীচু করে পড়বার ভাণ করলে।
হাত কাঁপতে লাগল,
বীর পুরুষের দিকে কটাক্ষেও তাকালে না।
আপিসের বাবুরা বল্‌লে, বেশ করেচেন মশায়।
একটু পরেই মেয়েটি অজায়গায় নেমে পড়ল,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।
তার পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,

তৃতীয় দিনে দেখি
সে একটা ঠেলাগাড়ি করে চলেচে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেচি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই নিতে পারে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলাজলের ডোবা, —
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলি আজ আওয়াজ করচে
ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম ভুল শোধরাতে হবে!

খবর পেয়েচি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জ্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদ্‌লাবার জরুরী দরকার।
ওদের ছোট্ট বাড়ি, নাম দিয়েচে মোতিয়া,—
রাস্তা থেকে অল্প একটু নেমে এক কোণে,
বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে,
সামনে দেখা যায় বরফের পাহাড়
শোনা গেল আসবে না এবার।

ফিরব মনে করচি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,—
মোহনলাল,—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চষমা পরা,
দুর্ব্বল পাকযন্ত্র দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বল্‌লে, "তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না, তোমার সঙ্গে দেখা না করে।"
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু,
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।

ফুটবলের সর্দ্দারের পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি ঃ—
মনে করলে, আমি যে আলাপ করতে এসেচি সে আমার দুর্লভ দয়া
হায়রে ভাগ্যের খেলা।

যেদিন নেমে আসিব তার দুদিন আগে তনুকা বল্‌লে,
"একটি জিনিষ দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা,—
একটি ফুলের গাছ।"
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বললে, "দামী দুর্লভ গাছ,
এদেশের মাটিতে অনেক যত্নে তবে বাঁচে।"
জিজ্ঞাসা করলুম, "নামটা কী?"
সে বল্‌লে, "ক্যামেলিয়া।"
চম্‌কে উঠ্‌লুম—
বিদ্যুতের মতো আর একটা নাম মনের অন্ধকারে জ্বলে উঠ্‌ল।
হেসে বল্‌লুম, "ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।"
তনুকা কী বুঝলে, জানিনে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুসিও হোলো।

চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
সিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নিয়ে এলেম মোটরে,
দেখা গেল, পার্শ্ববর্ত্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কাম্‌রা গাড়ি নিলেম ভাড়া,
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক্ আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা

পূজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠ্‌ল
[illegible] সাঁওতাল পরগণায়।
জায়গাটা ছোট্টো ; নাম বলতে চাইনে,—
বায়ু-বদলের বায়ুগ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা এককালে ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়র,
এইখানে বাসা বেঁধেচেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালীদের পাড়ায়,
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেচে বালির মধ্য দিয়ে,—
পলাশবনে তসর রেশমের গুটি ধরেচে,
মহিষ চরচে হর্ত্তকি গাছের তলায়,—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাস-যোগ্য বাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলুম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেচে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে,
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,—
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।
অল্প জল নদীর উপর দিয়ে
হেঁটে পেরিয়ে যায় ওপারে,
সেখানে সিসু গাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেচে—
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

হায়রে ভাগ্য,
কেন ও জানলো না আমি ফুটবল ক্ষেত্রের বিজয়ী বীর।

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতী করচে এরা।
ইচ্ছে হোলো গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক,—
শর্ট পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,—
কমলার পাশে বসে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরোট খাচ্চে।
আর কমলা তার কথা শুনতে শুনতে
অন্যমনে টুকরো টুকরো করচে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি,
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিকপত্র।

মুহূর্ত্তে বুঝলেম
এই সাঁওতাল পরগণার নির্জ্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত,—ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন কয়েকের মধ্যেই ক্যামেলিয়ার ফুলটি ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

সমস্তদিন বন্দুক ঘাড়ে শিকার করে বেড়াই বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল,
আর দেখি কুঁড়ি এগোলো কতদূর।

সময় হয়েচে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেচি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়চি ডিটেক্টিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিস্বরে আওয়াজ এল, "বাবু ডেকেছিস্ কেনে।"

বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া ফুলটি
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেচে।
সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছিস্ কেনে?"
আমি বললুম, "এই জন্যেই।"
তারপরে ফিরে এলুম কলকাতায়।

২৮ শ্রাবণ
১৩৩৯



পারস্য-ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলেচি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর সিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা সুরু হোলো। পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে সিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েচে।

শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেচে এঁকে বেঁকে, সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।

প্রায় একঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যক্ষেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখিনে, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া লোমওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও বা ছাগলের কালো রোঁয়ায় তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেচে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল যেন তারা পাহাড়ের শাবক।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অনতিদূরে পর্সিপোলিস্। দিগ্বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো পাথরের থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্মম কালকে ধিক্কার দিচ্চে।

আমাকে চৌকিতে বসিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পাহাড়, ঊর্দ্ধে শূন্য, নীচে দিগন্ত-প্রসারিত জনশূন্য প্রান্তর, তারি প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের রুদ্ধ-বাণীর সঙ্কেত। বিখ্যাত পুরাবিশেষবিৎ জর্মান ডাক্তার হর্টজ্‌ফেল্‌ট এই পুরাতন কীর্তি উদ্ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত। তিনি বল্লেন বর্লিনে আমার বক্তৃতা



পার্সিপোলিস

শুনেচেন আর হোটেলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পাথরের থামগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। নিরর্থক দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে, ম্যুজিয়মে অতিকায় জন্তুর অসংলগ্ন অস্থিগুলোর মতো। ছাদের জন্যে যে সব কাঠ লেগেছিল, হিসাবের তালিকায় দেখা গেছে ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেগুন কাঠও ছিল তার মধ্যে। খিলেন বানাবার বিদ্যা তখন জানা ছিলো না বলে পাথরের ছাদ সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যে বিদ্যার জোরে এই সকল গুরুভার অতি প্রকাণ্ড পাথরগুলি যথাস্থানে বসানো হয়েছিল সে বিদ্যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো বা এইদিক থেকেই রাজমিস্ত্রী গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্যে সুরঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।



পার্সিপোলিসে রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক হর্টজ্‌ফেল্‌ট্

ডাক্তার বললেন, আলেকজাণ্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্ত্তি-অসহিষ্ণু ঈর্ষাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজণ্ডার একিমীনিয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।



পার্সিপলিসে রবীন্দ্রনাথ

এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্ম্মপত্রে রূপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম্ম এর কাছে বর্ব্বরতা। আলেকজান্দার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। এখানে দেয়ালে খোদিত মূর্ত্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দরিয়ুস আছেন রাজছত্র তলে, আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্য বহন করে আনচে। পরবর্ত্তী-কালে ইস্ফাহানের কোনো উজীর এই শিলালেখ্য ভেঙে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ করে দিয়েচে।

পারস্যে আর এক জায়গা খনন করে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিষ পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারি একটি নক্সা-কাটা ডিমের খোলার পাত্র আমাকে দেখালেন। বললেন মহেঞ্জদারোয় যে রকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার অরেল ষ্টাইন মধ্য এসিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিষ পেয়েছেন মহেঞ্জদারোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এই রকম বহুদূর বিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্ব্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার করে অন্তর্ধান করেচে।

অধ্যাপক এই ভগ্নশেষের এক অংশ সংস্কার করে নিজের বাসা করে নিয়েচেন। ঘরের চারিদিকে লাইব্রেরি, এবং নানাবিধ সংগ্রহ। দরিয়ুস জারাক্সিস এবং আর্টাজারাক্সিস এই তিন পুরুষবাহী সম্রাটের লুপ্তশেষ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে অধ্যাপক নিভৃতে খুব আনন্দে আছেন।

এদেশে আসবামাত্র সবচেয়ে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব্ব এসিয়ার সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ করে মেসোপোটেমিয়া হয়ে আরব্য পর্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব্ব এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদবর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেচে এবং অবরুদ্ধ করেচে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্ব্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ বলেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে এরা বাহন পেয়েচে উট এবং ঘোড়া, আর জীবিকার জন্যে পালন করেচে ভেড়ার পাল। এই জীবিকার অনুসরণ করে এখানকার মানুষকে নিরন্তর সচল হয়ে থাকতে হোলো। এই পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বারে বারে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেচে—তার মূল প্রেরণা পেয়েচে এখানকার ভূমির কঠোরতা থেকে, যা তাদের বাইরে ঠেলে বের করে দেয়। তারা প্রকৃতির অযাচিত আতিথ্য পায় নি, তাদের কেড়ে খেতে হয়েচে পরের অন্ন, আহার সংগ্রহ করতে হয়েচে নূতন নূতন ক্ষেত্রে এগিয়ে এগিয়ে।

এখানে পল্লির চেয়ে প্রাধান্য দুর্গরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরের। কত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসশেষ পাশ্চাত্য এশিয়ার ধূলি-পরিকীর্ণ। কৃষিজীবীদের স্থান পল্লী, সেখানে ধন স্বহস্তে উৎপাদন করতে হয়। নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েচে জয়জীবী যোদ্ধৃদের প্রতাপের উপরে। সেখানে সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণ না করলে পরাভব। ভারতবর্ষে কৃষিজীবিকার সহায় গোরু, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় জয়জীবিকার সহায় ঘোড়া। পৃথিবীতে কী মানুষের, কী বাহনের, কী অস্ত্রের ত্বরিত গতিই জয়সাধনের প্রধান উপায়। তাই



পার্সিপোলিস

একদিন মধ্যএশিয়ার মরুবাহী অশ্বপালক মোগল বর্ব্বরেরা বহুদূর পৃথিবীতে ভীষণ জয়ের সর্ব্বনাশ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিরচলিষ্ণুতাই তাদের করে তুলেছিল দুর্দ্ধর্ষ। অন্ন-সঙ্কোচের জন্যেই এরা এক একটি জ্ঞাতি-জাতিতে বিভক্ত—এই জ্ঞাতি জাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য। যে কারণেই হোক তাদের এই ঐক্য যখন বহু শাখাধারার সম্মিলিত ঐক্যে স্ফীত হয়েচে তখন তাদের জয়বেগকে কিছুতে ঠেকাতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরবীয় মরুবাসী জ্ঞাতিজাতিরা যখন এক অখণ্ড ধর্ম্মের ঐক্যে এক দেবতার নামে মিলে-

ছিল তখন অচিরকালের মধ্যেই তাদের জয়পতাকা উড়েছিল কালবৈশাখীর রক্তরাগরঞ্জিত মেঘের মতো দূর পশ্চিমদিগন্ত থেকে দূর পূর্ব্বদিক্ প্রান্ত পর্য্যন্ত।

একদা আর্য্যজাতির এক শাখা পর্ব্বতবিকীর্ণ মরুবেষ্টিত পারস্যের উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিলে। তখন কোনো এক অজ্ঞাতনামা সভ্যজাতি ছিল এখানে। তাদের রচিত যে সকল কারুদ্রব্যের চিহ্নশেষ পাওয়া যায় তার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক। বোধ করি বলা যেতে পারে মহেঞ্জদারো যুগের মানুষ। তাদের সঙ্গে এদের হাতের কাজের মিল আছে। এই মিল এসিয়ায় বহুদূর বিস্তৃত। মহেঞ্জদারোর স্মৃতিচিহ্নের সাহায্যে তৎকালীন ধর্ম্মের যে চেহারা দেখতে পাই অনুমান করা যায় সে বৃষভ-বাহন শিবের ধর্ম্ম। রাবণ ছিলেন শিবপূজক, রাম ভেঙেছিলেন শিবের ধনু। রাবণ যে জাতের মানুষ সে জাতি না ছিল অরণ্যচর না ছিল পশুপালক। রামায়ণগত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায় সে জাতি পরাভূত দেশ থেকে ঐশ্বর্য্যসংগ্রহ করে নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেচে, এবং অনেকদিন বাহুবলে উপেক্ষা করতে পেরেচে আর্য্যদেবতা ইন্দ্রকে। সে জাতি নগরবাসী। মহেঞ্জদারোর সভ্যতাও নাগরিক। ভারতের আদিম আরণ্যক বর্ব্বরতর জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্য্যেরা এই সভ্যতা নষ্ট করে। সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে; একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক, আজও হিন্দুরা সে উপাখ্যান পাঠ করে ভক্তির সঙ্গে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের কাছে বৈদিক দেবতার খর্ব্বতার কথা গৌরবের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতে আখ্যাত হয়ে থাকে।



পার্সিপোলিস

খৃষ্টজন্মের দেড়হাজার বছর পূর্ব্বে ইরাণী আর্য্যরা পারস্যে এসেছিলেন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত। তাঁদের হোমাগ্নির জয় হোলো। ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্ব্বর, জনসঙ্কুল। সেখানকার আদিমজাতের নানাধর্ম্ম, নানারীতি। তার সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈদিক ধর্ম্ম আচ্ছন্ন, পরিবর্ত্তিত ও অনেক অংশে পরিবর্জ্জিত হোলো, বহুবিধ, এমন কি, পরস্পর বিরুদ্ধ হোলো তার আচার, নানা দেবদেবী নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভ্যাগত হওয়াতে ভারতবর্ষে ধর্ম্মজটিলতার অন্ত রইল না। পারস্যে এবং মোটের উপর পাশ্চাত্য এসিয়ার সর্ব্বত্রই বাস যোগ্য স্থান সঙ্কীর্ণ, এবং সেখানে অন্নক্ষেত্রের পরিধি পরিমিত। সেই ছোট জায়গায় যে আর্য্যেরা বাসপত্তন করলেন, তাঁদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইল, অনার্য্যজনতার প্রভাবে তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম বহু জটিল ও বিকৃত হোল না। এসিয়ার এই বিভাগে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির বসতি ছিল তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে আছে—কিন্তু ইরাণীয়দের আর্য্যত্বকে তারা অভিভূত করতে পারে নি।

পারস্যের ইতিহাস যখন শাহ্‌নামার পুরাণকথা থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন পারস্যে আর্য্যদের

আগমন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তখন দেখি আর্য্যজাতির দুইশাখা পারস্য ইতিহাসের আরম্ভকালকে অধিকার করে আছে,—মীদিয় এবং পারসিক। মীদিয়েরা প্রথমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে তারপরে পারসিক। এই পারসিকদের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম অনুসারে এই জাতি গ্রীকভাষায় আকেমেনিড (Achaemenid) আখ্যা পায়। খৃষ্টজন্মের সাড়ে পাঁচশো বছর পূর্ব্বে আকেমেনীয় পারসিকেরা মীদিয়দের শাসন থেকে সমস্ত পারস্যকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে একচ্ছত্র করে। সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয় সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্দা। ভারতীয় আর্য্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধুকর্ম্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্য্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।



পার্সিপোলিস

তখনকার কালের সেমেটিক জাতীয়দের যুদ্ধে দয়াদাক্ষিণ্য ছিল না। দেশজোড়া হত্যা, লুঠ, বিধ্বংসন, বন্ধন, নির্ব্বাসন এই ছিল রীতি। কিন্তু সাইরস ও তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাটদের রাষ্ট্রনীতি ছিল তার বিপরীত। তাঁরা বিজিত দেশে ন্যায় বিচার, সুব্যবস্থা ও শান্তি স্থাপন করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, পারসিক রাজারা যুদ্ধ করেছেন মিতাচারিতার সঙ্গে, বিজিত জাতিদের প্রতি অনিন্দ্য হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্ম্মে, তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের স্বাদেশিক দলনায়কদের স্বপদে রক্ষা করেছেন। তার প্রধান কারণ, কি যুদ্ধে কি দেশজয়ে তাঁদের ধর্ম্মনীতিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। ব্যাবিলোনিয়ায় আসীরিয়ায় পূজার ব্যবহারে ছিল দেবমূর্ত্তি। বিজেতারা বিজিত জাতির এই সব মূর্ত্তি নিয়ে যেত লুঠ করে। সাইরসের ব্যবহার ছিল তার বিপরীত। এই রকম লুঠ করা মূর্ত্তি তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সেগুলি সব তাদের আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর অনতিকাল পরে তাঁরই জ্ঞাতিবংশীয় দরিয়ুস সাম্রাজ্যকে শত্রু হস্ত থেকে উদ্ধার করে আরো বহুদূর প্রসারিত করেন। পার্সিপোলিসের স্থাপনা এঁরই সময় হতে। এই যুগের আসীরিয়া ব্যাবিলন ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশে বহুকীর্ত্তি প্রধানত দেবমন্দির আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু

আকেমেনীয় রাজত্বে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। শক্রজয়ের বিবরণ-চিত্র যে-যেখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত সেখানেই জরথুস্ট্রীয়দের বরণীয় দেবতা আহুরমজ্‌দার ছবি শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধিলাভ যে তাঁরই প্রসাদে এই কথাটি তার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু মন্দিরে মূর্তিস্থাপন করে পূজা হোত তার প্রমাণ নেই। প্রতীক-রূপে অগ্নিস্থাপনার চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম আরম্ভ হতেই এক-দেবতার সরল পূজাপদ্ধতি পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দেবার সহায়তা করেচে তাতে সন্দেহ নেই।

বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলি তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয় বিশেষত চারিদিকে যেখানে প্রতিকূল শক্তি। এই রকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চারিদিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা টিঁকে থাকতেই পারে না। কেননা সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক—যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই—জবরদস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহুবিস্তৃত সীমানা বহুবিচিত্র বিবাদের সংস্রবে আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরু-ভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজান্দারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেক-জান্দার নয়। অতি বৃহদাকার প্রতাপের দুর্ভর ভার বাহকেরা একদিন নিশ্চিত বর্জন করতে বাধ্য—ভগ্ন-উরু ধূলিশায়ী মৃত দুর্যোধনের মতো ভগ্নাবশিষ্ট পার্সিপোলিস এই তত্ত্ব আজ বহন করচে। আলেকজান্দারের জোড়াতাড়া দেওয়া সাম্রাজ্যও অল্পকালের আয়ু নিয়েই সেই তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে কথা সুবিদিত।



পারস্য-সম্রাটের রাজপথে শোভাযাত্রা



পার্সিপোলিস

এখান থেকে আর এক ঘণ্টা পথ দিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে



পার্সিপোলিসে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত ইরাণী

পথের দুইধারে ঘন সংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডানপাশে মাটি ছেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় করে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হোলো। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।

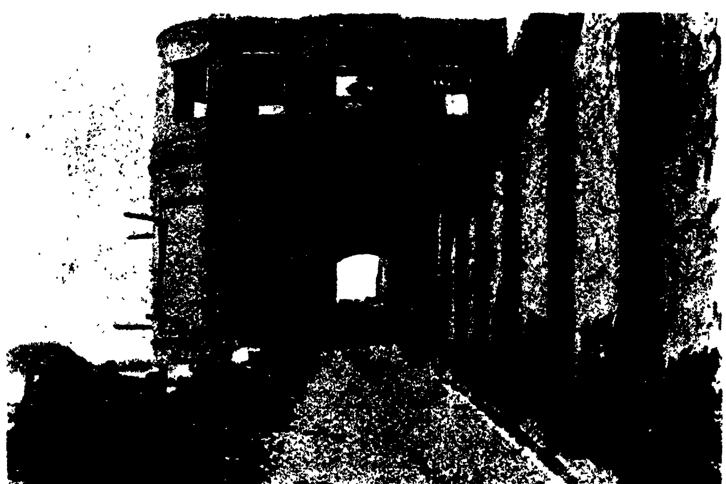
আকাশে মেঘ জমে আস্‌চে। এখান থেকে নব্বই মাইল পরে আবাদে নামক ছোটো সহর, সেখানে রাত্রিযাপনের কথা। দূরে দেখা যাচ্চে তুষাররেখার তিলককাটা গিরিশিখর। দেহ্‌বিদ গ্রাম ছাড়িয়ে সর্মাকে পৌঁছলুম। পথের মধ্যে

সেখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী অভ্যর্থনা জানিয়ে আগে চলে গেলেন। বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছলুম পুর্‌প্রাসাদে। কাল ভোরের বেলা রওনা হয়ে ইস্ফাহানে পৌঁছব দ্বিপ্রহরে।

যারা খাঁটি ভ্রমণকারী তারা জাতই আলাদা। একদিকে তাদের শরীর মন চিরচলিষ্ণু, আর একদিকে অনভ্যস্তের মধ্যে তাদের সহজ বিহার। যারা শরীরটাকে স্তব্ধ রেখে মনটাকে চালায় তারা অন্য শ্রেণীর লোক। অথচ রেলগাড়ি মোটর গাড়ির মধ্যস্থতায় এই দুই জাতের পংক্তিভেদ রইল না। কখনো মানুষের ভ্রমণ আপন কোণ থেকে আপন কোণেই আসবার জন্যে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভাষায় যাদের বলে কনিষ্ঠ অধিকারী। তারা বাঁধা রাস্তায় সস্তায় টিকিট কেনে, মনে করে মুক্তিপথে ভ্রমণ সারা হোলো, কিন্তু ঘটা করে ফিরে আসে সেই আপন সঙ্কীর্ণ আড্ডায়, লাভের মধ্যে হয় তো সংগ্রহ করে অহঙ্কার।

ভ্রমণের সাধনা আমার ধাতে নেই, অন্তত এই বয়সে। সাধক যারা, দুর্গমতার কৃচ্ছ্র-সাধনে তাদের স্বভাবের আনন্দ, পথ খুঁজে বের করবার মহৎ ভার তাদের উপর। তারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, ভ্রমণের চরম ফল তারাই পায়। আমি আপাতত মোটরে চড়ে চললেম ইস্ফাহানে।

সকালবেলা মেঘাচ্ছন্ন, কাল বিকেল থেকেই তার আয়োজন। আজ শীত পড়েচে রীতিমতো। একপথে

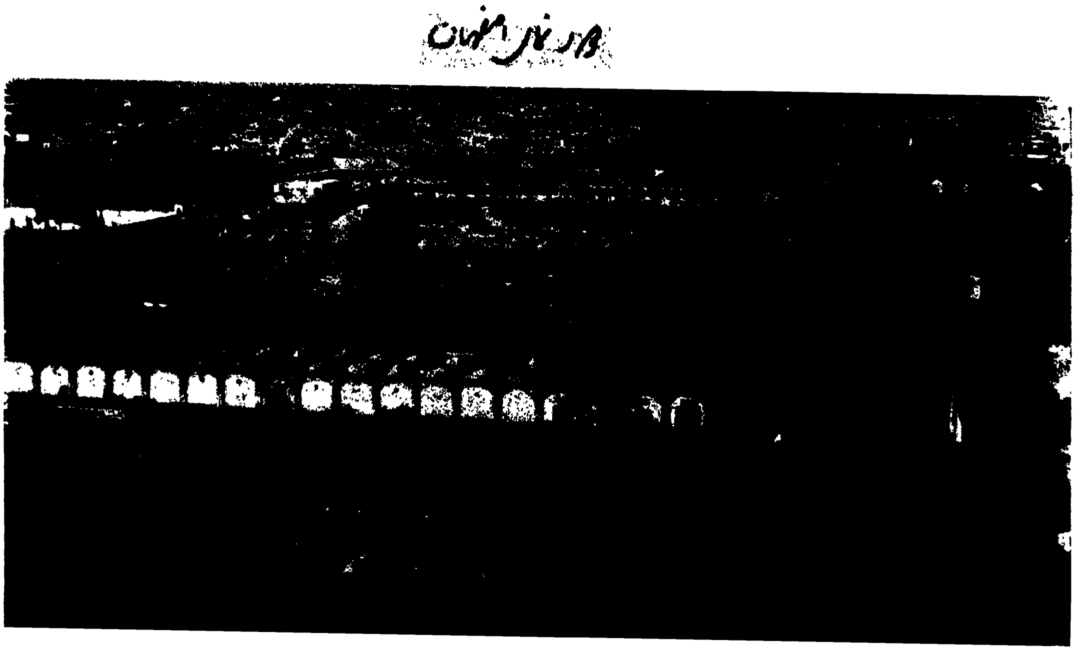


শূন্যপ্রায় প্রান্তরে আসন্ন বৃষ্টির ছায়া বিস্তীর্ণ। দিগন্ত বেষ্টন করে যে গিরিমালা, নীলাভ অস্পষ্টতায় সে অবগুণ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেচি অন্তহীন, আলের চিহ্নহীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়? চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না? হাটের দিনে হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের ক্ষেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায়, ঐ দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও মানুষের নানা দ্বন্দ্ববিঘট্টিত সংসারযাত্রা চলেচে। মাঠে কোথাও বা ফসল, কোথাও বা বহুদূর ধরে আগাছা, তাতে ঊর্দ্ধপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোট নদী, কিন্তু তাতে আঁকড়ে নেই গ্রাম, মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরুবাছুর জল খায় না, নির্জ্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলে-ঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই, আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেচে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্যে কাঠের তক্তা-ফেলা সঙ্কীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজ্‌দিখস্ত্‌।

দুপ'র বেজেচে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন করে মোটর রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। সেই কাব্যটির ইংরেজি তর্জ্জমা এইখানে লিখে দিই :—

The caravans of India always carry sugar, but this time it has the perfume of the muse.



ইস্ফাহানের পুরাতন সহরতলী

O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee like the butterflies which burn around the flame of candles.

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi will come to life in his tomb.

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the future holds,

Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus an august descendant of whom today fortunately wears the crown of Persia.

পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্‌, পপ্‌লার, অলিভ ও তুঁত-গাছের শ্রেণী। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূর-প্রসারিত ইস্ফাহান সহর।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



৪ঠা আশ্বিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করচে। এমন সর্ব্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরমশোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেচে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক্ না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেচে কত বিদেশী কত বার। মাটিতে রোপন করেচে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটা-বেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্ত্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায় তখনই ইঁট কাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্ত্তির আবর্জ্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে' দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েচেন চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেচেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করচেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্ত্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেচেন, এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিষ নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয় তবে তা যথোচিতভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বল্‌চেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আরেক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেচে কিন্তু তবু বল্‌ব এটা অমানুষিক। তাই দাস-নির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয় প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘনায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখ পথে পদক্ষেপের বাধা।

তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষখেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেচি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েচি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো পীড়িত অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভাবে দুরূহ করচে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেচি সমাজের বৃহৎ একদলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্ব্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এতদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তি-সাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। যারা ছোট হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বর্ত্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে যখনি পিছিয়ে রাখা যায় তখনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনি অপমান বিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটল সেই-খানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েচে। তার ভিতের গাঁথুনি আলগা, আঘাত পাবামাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েচে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে সমাজরীতির দোহাই দিয়ে স্থায়ী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্চে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্ম্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠচে ততই সমাজ টলমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্চে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করেচেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েচি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েচে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেই জন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেচে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ

ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তার দেহের অবসান ঘটতেও পারে কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্য সাধনার অবমানা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানিনে, আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বল্‌ব। দেখতে পাচ্চি মহাত্মাজির এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারচেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্চে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি—আয়র্লাণ্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্ত্তি তো কারো কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক্‌, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্চে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্ত্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েচে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সঙ্কটের ঝড় বইয়ে দিয়েচেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েচে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেচেন। এ-কথা বুঝতে পারেন নি রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয়পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট্‌ ও রোমান্‌-ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সঙ্কটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেচে মাত্র। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেচে, সে জন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংসনীতি এতকাল প্রচার করেচেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করিনে।

শান্তিনিকেতন
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাত্মাজির শেষ ব্রত

(শান্তিনিকেতনে আহূত গ্রামবাসীদের প্রতি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই, কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি, দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করচি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেচেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্ব্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেচে, যাঁরা সকলের বড়ো, তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেচি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেইজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল, যে, এবার বুঝেচি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেচেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেচি, তাঁকে জেনেচি। সকলে বুঝেচে, তিনি আমাদের। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চনীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেচেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেচেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেচেন শুধু কথায় নয়, বলেচেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েচেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেচেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেচে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েচেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনো, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েচেন। শত্রুরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে ধৈর্য্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েচেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বোঝা ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েচেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেচ কি না জানি না। কারো কারো হয়ত তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেচে। কিন্তু তাঁকে জানো সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জানো, সমস্ত ভারতবর্ষ কি রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েচে, একটি নাম দিয়েচে—মহাত্মা। আশ্চর্য্য, কেমন করে চিন্‌লে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েচে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি, ঘর-সংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ, যিনি আপনার করে নিয়েচেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেচি যে তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেচেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি, তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেচেন, ফিরে গেলেন, শেষপর্য্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃষ্টানশাস্ত্রে পড়েচি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যীশু খৃষ্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়? সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করেচেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না? আমাদের ছোটো মনের সঙ্কোচ, ভীরুতা আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্ম্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না? গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সঙ্কোচ, এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেচেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেচেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাক্‌বে না। তিনি আজ মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করেচেন, ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত। তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্ব্বনাশ আর কী হতে পারে?

আমরা এই কথাই বলে থাকি, যে বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করচে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের জন্য শক্তি পাঠিয়ে দিয়েচেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয়

হরণ করতে এসেচেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব ? এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেচেন, তিনি আমাদের সাবধান করেচেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েচি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েচি শত শত নত মস্তকের উপরে, তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত দুর্ব্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারচিনে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেচি,—আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্চে তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েচে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সঙ্কল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেচেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন ? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেচি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেচে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেচি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেচে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে অপমান করতে কারো মনে ভয় নেই বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্দ্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্ত্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েচেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ্ ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিন্‌তে পেরেও মান্‌তে পারিনে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেকদিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেচেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চির মিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেচি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েচেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেচেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করচি, সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়। মান্‌ব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মান্‌ব না সেই মিথ্যাকে। বলো আজ সমস্ত

হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের ? তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যু-ভয়কে জয় করেচেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোক-ভয়, রাজভয়, সমাজ-ভয় কিছুতেই যেন সঙ্কুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্ত্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেবনা তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে, যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করচে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে যদি আমাদের উপরে কোন ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যদি সবাই বল্‌তে পারি, জয় হোক্ তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর এক পারে, সকলে বল্‌বে, সত্যের বাণী অমোঘ, ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়, তাকে তোমরা ভয়ে যদি মানো তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক্ সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্ত্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবান্‌কে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।

আমি কীইবা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায় ? তিনি যে ভাষায় বলচেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার, মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েচি ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো, —অপরাধের অবসান হোক্, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক্। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯।



শিল্প-পরিচয়*

(প্রথম অধ্যায়)

শ্রীনন্দলাল বসু

সাধারণত আমরা তিন ধরণের ছবি দেখতে পাই—(১) অনুকারক, (২) ব্যঞ্জক, (৩) ছান্দসিক। প্রথম ধরণের ছবিতে হুবহু নকল করার চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টাতে যে ছবির জন্ম তাকে 'ফটোগ্রাফিক আর্ট' বলা যায়। যখন ফটোগ্রাফি ছিল না, তখন হুবহু নকলের কৌশলটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

পূর্ব্বে চিত্রশিল্পীরা যখন চোখে দেখা কোনো বস্তুর ছবি একটা চেপ্টা জমির উপর এঁকে, ঐ ছবিতে সেই আসল বস্তুটির ভ্রম জন্মাবার চেষ্টা করলেন, তখনই পারিপেক্ষিক (perspective) বিজ্ঞান, বর্ণলেপ (colour pigment) বিজ্ঞান, জীব, জন্তু ও মনুষ্যদেহের অস্থি ও পেশী সংস্থান (anatomy) বিজ্ঞান, এবং সূর্য্যরশ্মি বিজ্ঞান শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করল। আর শিল্পীরাও এমন ছবি আঁকলেন চোখে দেখা বস্তুর সঙ্গে যার হুবহু মিল, যা দেখে আসল বস্তুর ভ্রম জন্মায়। তার পর যখন ফটোগ্রাফির যন্ত্র আবিষ্কার হ'ল তখন হ'তে এরূপ পদ্ধতিতে আঁকা কমে এল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানগুলি শিল্পীদের শেখবার বস্তু হ'য়ে রইল।

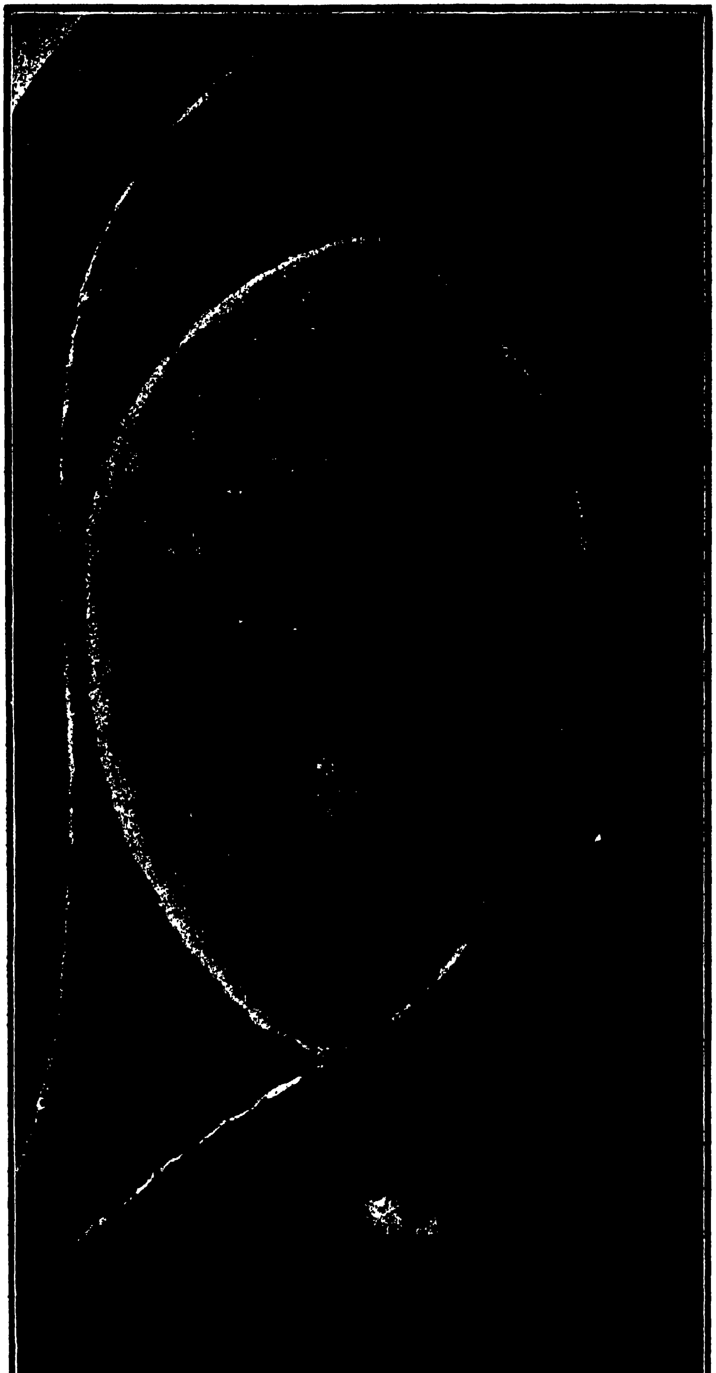


অনুকারক

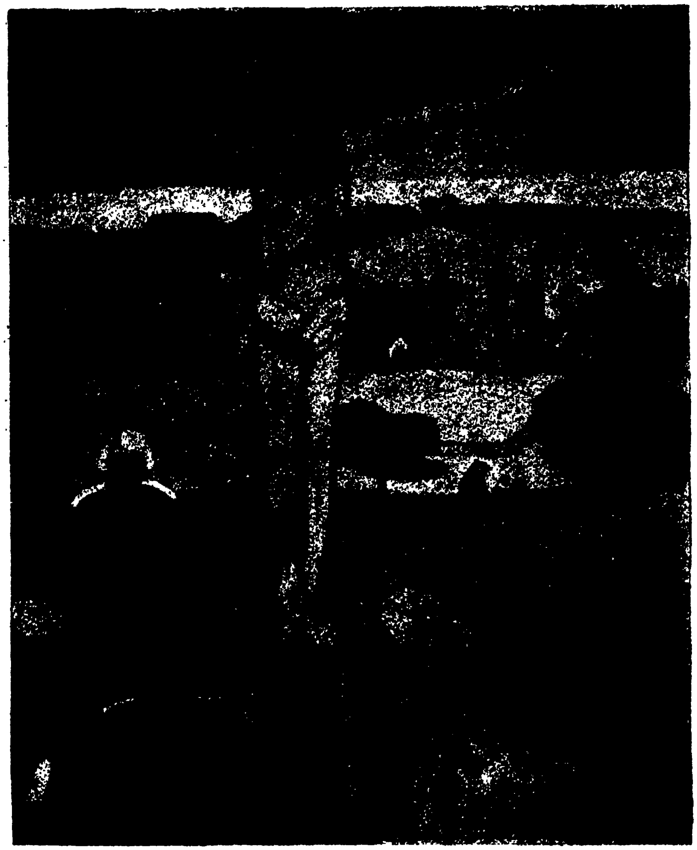
(Photographic)

সঙ্কেতে বা ঠারে ঠোরে যে-ছবি আঁকা হয়, তাকে ব্যঞ্জনা-প্রধান (suggestive) ছবি বলা যায়। এরকম ছবিতে কেবল চোখে দেখার কথা রইল না, মনের দেখার কথাও এসে পড়ল। প্রকৃতিতে সব বস্তু চোখ মেলে দেখ্‌লেও মন দিয়ে না দেখলে দেখা যায় না। আবার মনের যোগে কোনো বস্তু দেখ্‌লে সেই বস্তু

* শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-পরিচয় সভার চতুর্থ বার্ষিক তৃতীয় অধিবেশনে শিল্প-পরিচয়-বিষয়ক প্রথম বক্তৃতা। ছায়াচিত্র সংযোগে ইহা প্রদত্ত হয়।

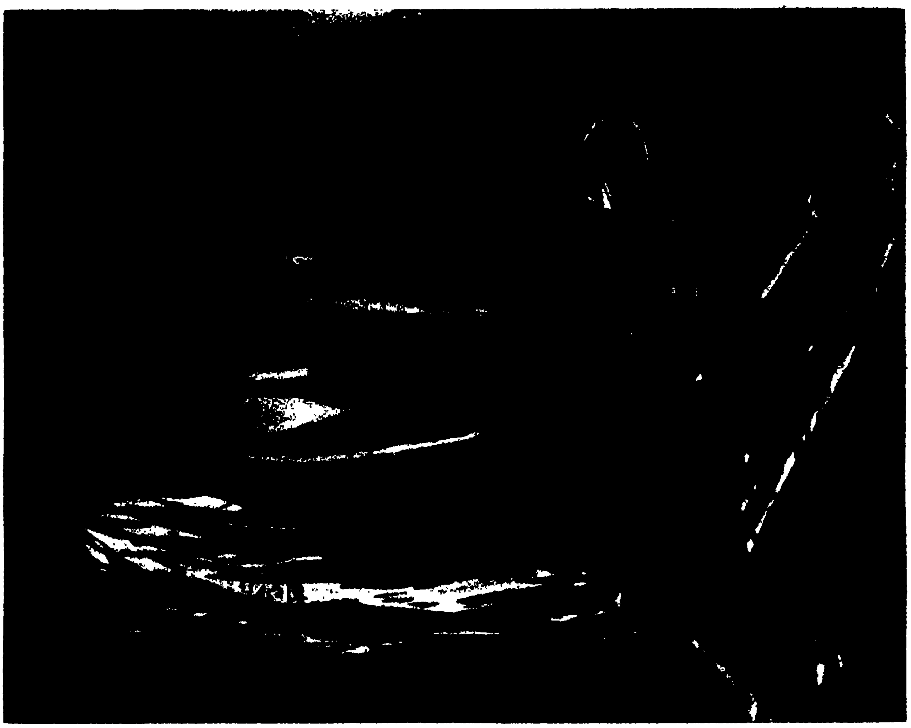


—ব্যঞ্জক—
(Suggestive)

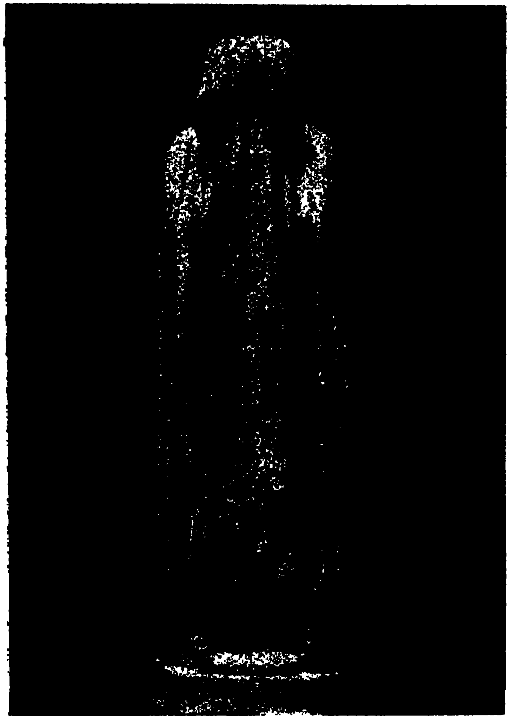


ব্যঞ্জক
(Suggestive)

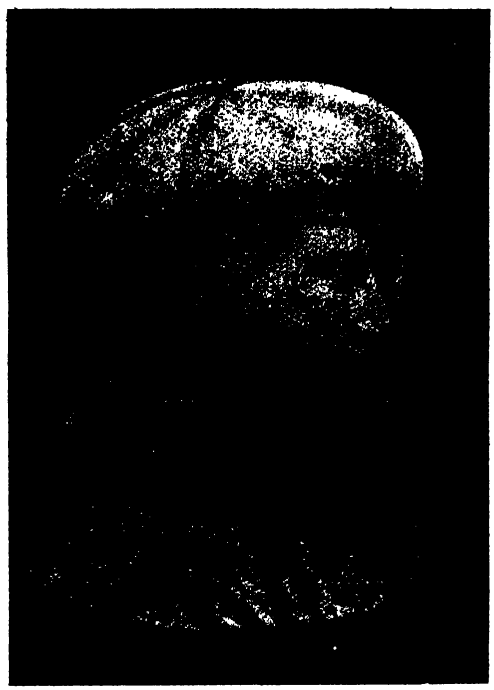
আঁকবার সময় শিল্পীর মনের অবস্থার ছাপ সেই আঁকা বস্তুর রূপের সঙ্গে যোগ হ'য়ে যায়। মন আবার কোনো বস্তুকে আংশিক ভাবে, আবার কোনো বস্তুকে অতিকৃত করে দেখে। সেই জন্য এইরূপ ব্যঞ্জনা প্রধান ছবি কোনো বস্তুর হুবহু নকল হ'তেই পারে না। ইহাতে আসল বস্তুর রূপের সঙ্গে আঁকা বস্তুর রূপের ইতরবিশেষ হ'বেই। এখানে মনে রাখ্‌তে হ'বে, এইরূপ মনগড়া ব্যঞ্জনা প্রধান (suggestive) ছবির সঙ্গে অন্তত শিল্পীর ভুল আঁকা ছবির আকাশ পাতাল তফাৎ। একজন পটু শিল্পী শিল্প-সৃষ্টি-কৌশল ও শিল্পবিজ্ঞান সব জানা সত্ত্বেও, দেখা



ব্যঞ্জক
(Suggestive)

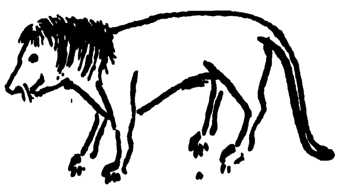


— ব্যঞ্জক —
(Suggestive)

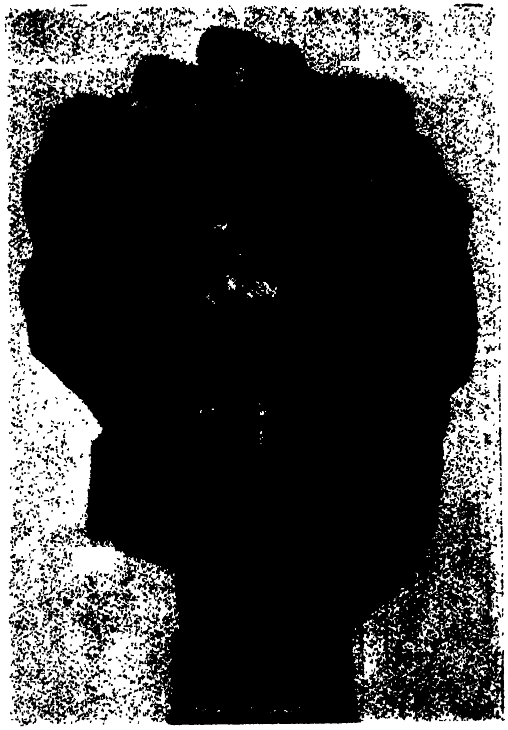


আংশিক

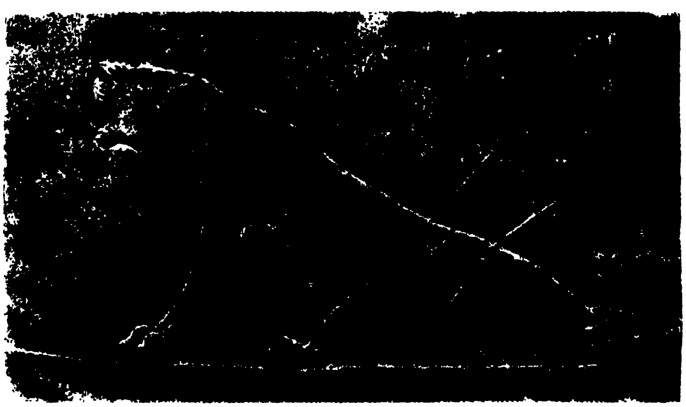
বস্তুর সঙ্গে ছবিতে আঁকা বস্তুর রূপের তফাৎ করেন; এই তফাৎ কখনো তিনি জেনে করেন, কখনো না জেনেও করেন।



অন্ধ শিল্পীর কাজ



অতিকৃতি



পটু শিল্পীর কাজ

ছান্দসিক (Decorative) ছবিকে তিন ভাগ করা যেতে পারে—

১। ছন্দ প্রধান।

২। অলঙ্করণ মূলক।

৩। আভাস মূলক।



ছন্দ প্রধান



স্বগত ছন্দ, শ্রেণীগত ছন্দ ও সাধারণ ছন্দের নমুনা।

ছন্দ-প্রধান বলতে সেই ছবিকেই বোঝা যায়, যে-ছবিতে সাধারণ ছন্দের উপর বেশি ঝোঁক থাকে। রবীন্দ্রনাথের বেশি ভাগ ছবিই এই শ্রেণীর।

ছন্দকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১। স্বগত ছন্দ।

২। শ্রেণীগত ছন্দ।

৩। সাধারণ ছন্দ।

বাঁশ গাছ একটি নির্দ্দিষ্ট গাছ, বাঁশ গাছের স্বগত রূপ নিয়েই তার বিশেষত্ব; সে-জন্য বাঁশ গাছে ও ঘাসে তফাৎ বোঝা যায়। কিন্তু বাঁশ-গাছে ও ঘাসে শ্রেণীগত সম্বন্ধ আছে। যার জন্য এই দুটি গাছ এক পর্য্যায়ের। সেই জন্য ও-দুটি এক শ্রেণীগত ছন্দে বাঁধা। কিন্তু ঐ দুটো বস্তু হ'তে যদি ঐ ছন্দটি অবিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করা যায়



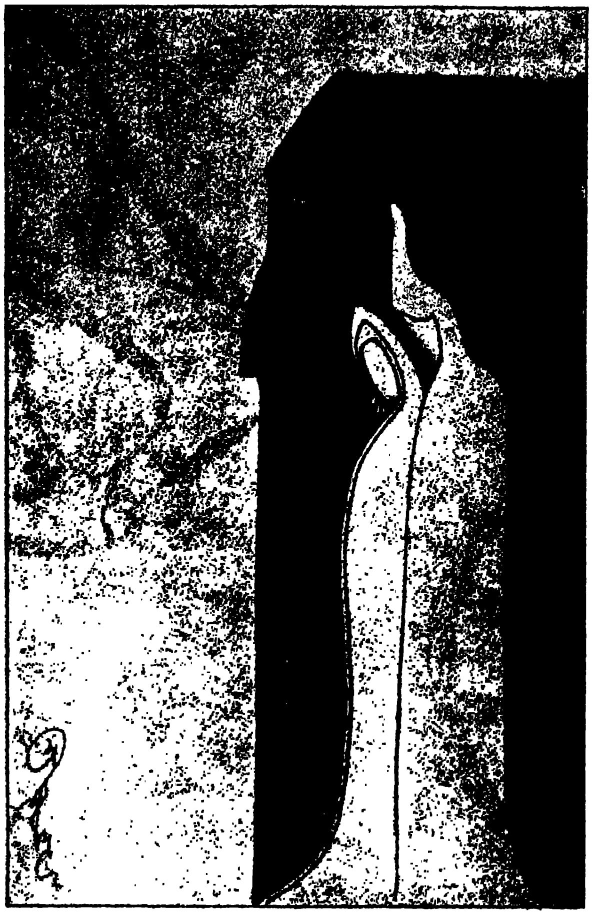
ছন্দ-প্রধান



ছন্দ-প্রধান

তবে বিশেষ করে বলা চল্‌বে না যে সেটা বাঁশ গাছ কি ঘাস কি ফোয়ারা। এই ফোয়ারার মত দোলায়িত গতিবিশিষ্ট রেখাগুলি ঐ কটা বস্তুরই সাধারণ ছন্দ।

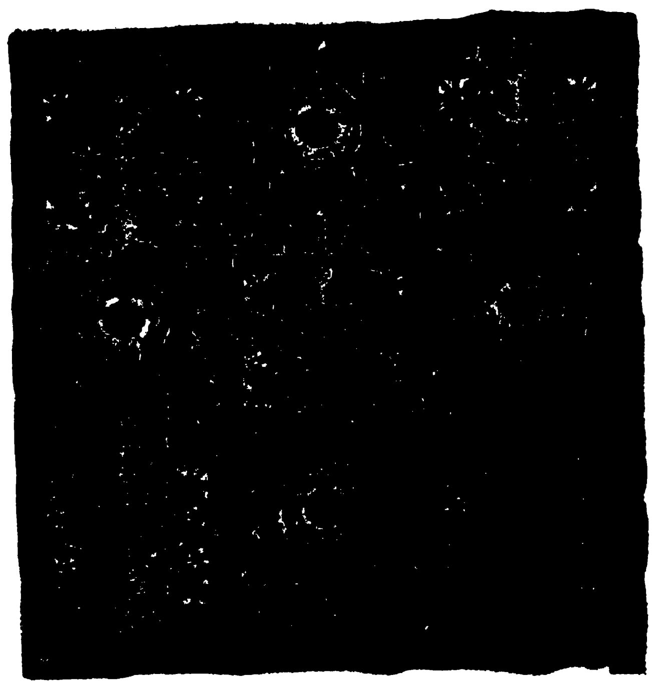
অলঙ্করণ-শিল্প সেই ধরণের ছবিকেই বলে, যাতে কেবল সাধারণ ছন্দেরই খেলা শোভা সাধনেরই জন্য, যেমন কার্পেট, নানারূপ জালিকাজ আল্‌পনা।



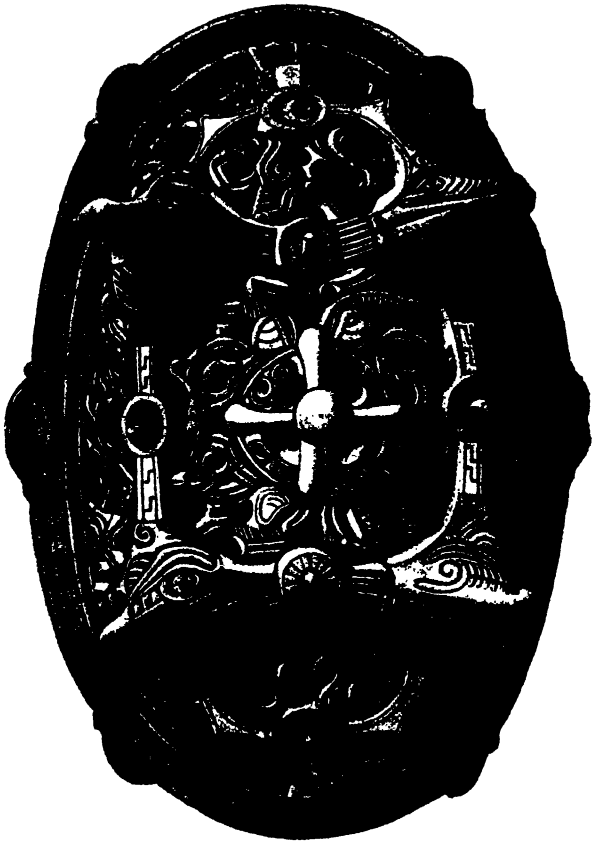
ছন্দ-প্রধান



ছন্দ-প্রধান

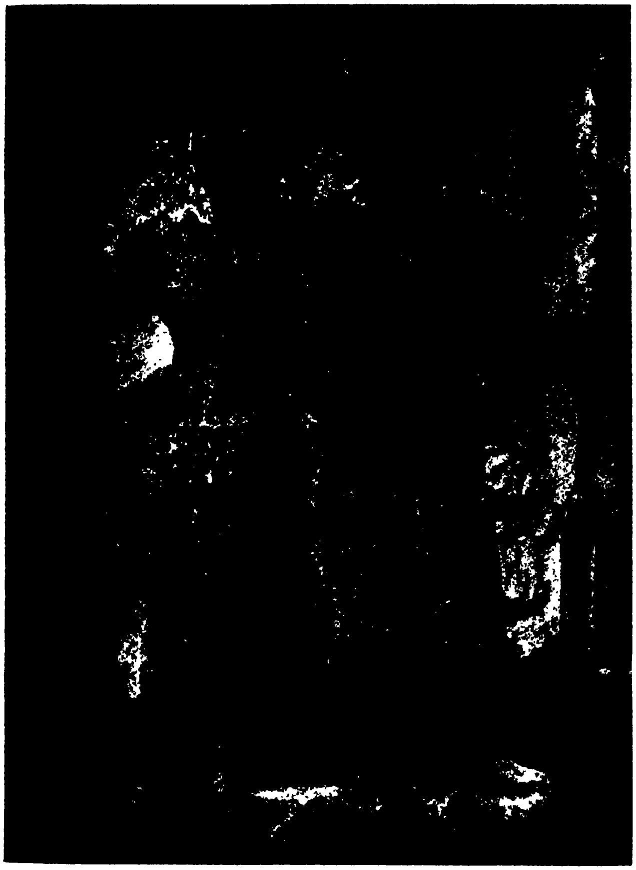


অলঙ্করণ-শিল্প



অলঙ্করণ-শিল্প

আভাষ-মূলক শিল্পে প্রকৃতির একটি বস্তুর আকার, রঙ বা গতির সঙ্গে আর একটি বস্তুর আকার, রঙ বা গতির তুলনা আভাসে দেওয়া হয়। তুলনার বস্তুগুলি মানুষের নিম্নজাতির বস্তুর আকার রঙ বা গতি হ'তে নেওয়া হয়, যেমন পদ্মার পাপ্‌ড়ির সঙ্গে মানুষের চোখের, গজের গমনের সঙ্গে স্ত্রীলোকের চলনের, বিম্বের রঙের সঙ্গে ওষ্ঠের রঙের। নিম্নশ্রেণীর বস্তুর আকার ইত্যাদির সঙ্গে তুলনার কারণ, তাদের



আভাস-মূলক ছবি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "Artistic Anatomy" বই থেকে আরো অনেক আভাস মূলক ছবির উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে।



পট

আকৃতি, ভঙ্গী, রঙ চিরকালই স্থির আছে। সেইজন্য ঐ সব বস্তুর আকার, রঙ ও ভঙ্গী সৌন্দর্য্যের ধ্রুব মান হিসেবে ব্যবহার হয়। এই সব ধ্রুব মানগুলি (Standard) শিল্পীরা প্রকৃতি হ'তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে ধার্য্য করেছেন।

বহুদিন ধরে একই বস্তুকে কোনো বিশেষ বস্তুর সঙ্গে অভ্যস্তভাবে তুলনা করার জন্য ছবির মধ্যে একটি দোষ

দাঁড়ায়। আবার বাধা ছবি বা পট তাকেই বলে যে ছবি এই দোষে দুষ্ট হয়। কালে কালে জাতির রুচি অনুযায়ী এর বদল হওয়া চাই, কিম্বা উহা শিল্পীকে নিজে নূতন করে আবিষ্কার করা চাই।

যে-সব ছবির ভাগের কথা বলা হ'ল, উহা সকল দেশের ছবির ভিতরেই পাওয়া যায়। তবে কেহ কেহ এক একটি ধরণের উপর বেশি ঝোঁক দেন।

নন্দলাল বসু



বিলাতী পট

ভ্রম সংশোধন ঃ— এই প্রবন্ধের ৪৭১ পৃষ্ঠার প্রথম ছবির নীচে 'অঙ্ক'র স্থলে অনুগ্রহ করিয়া 'অজ্ঞ' পড়িবেন।

সাগরিকা

(সনেট)

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

১

মনে কি পড়িল আজি, হে আমার কবি,
অতীত জীবন কথা, যৌবন স্বপন,
আবেগ-ব্যথিত কণ্ঠে প্রেম নিবেদন,
দুকূল-ভাসানো মোর সে রূপের ছবি –
জাগর-বিস্মিত আঁখি প্রভাতের রবি,
চন্দ্রমার লাজ দিঠি, গুণ্ঠিত আনন,
নাহি গণি'—দোঁহাকার নিবিড় মিলন—
অব্যক্ত ছিলনা কিছু, অগোপন সবি।

মনে নাই ? এলে তবে কোন্ প্রেরণায়—
বাজেনি আহ্বান সুর রুগ্নশয্যা 'পরে
অবাঞ্ছিত বিদায়ের মূক বেদনায় ?

একদিন দিয়েছ যা' অকৃপণ করে,
ভাবি আজ—পারিব কি ফিরে দিতে তায়—
তবু ভালো, এলে তুমি এতদিন পরে।

২

আমি শুনেছিনু তব আকুল আহ্বান
দিগন্তের পার হ'তে বিদায় বেলায় ;
স্তিমিত আশার দীপ—আয়ুর সন্ধ্যায়
কর্ণে পশেছিল নব জীবনের গান—
কবে কোন্ জন্মান্তরে দীর্ঘ দিনমান
কেটেছিল যৌবনের অলস খেলায়,
যে স্মৃতিমূর্চ্ছনা আজি ফিরালো আমায়
পথে শুনি' নবসুরে পুরানো আহ্বান।

আকুল কুন্তলে আজি ঢাকি' লও মোরে,
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক স্নিগ্ধ দিঠির পরশ,
নিঃশ্বাস বীজন মোর ক্লান্ত মুখ'পরে।

নাহি আজ যৌবনের চঞ্চল হরষ—
কি বা ক্ষতি তায়—শুধু স্বপ্নে দাও ভ'রে
মিলন সায়াহ্ন এই নিবিড়, সরস।

কিশোরী

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি' ফাল্গুনের কোন্ গীতপালা
        ধ্বনিতেছে হে কিশোরী বালা !
নিশান্তে সুন্দর ভোরে ভৈরবীর সুরমায়া সম
আনন্দ চাঞ্চল্য তব প্রাণলীলাময়ী মনোরম !
        ক্ষুদ্র তনুলতাখানি অনাগত বসন্তের লাগি'
        যেন কোন্ অপার্থিব শোভাস্বপ্নে উঠিতেছে জাগি'
উদ্বেলিত পুষ্পোচ্ছ্বাসে অপরূপ রূপে দিবে দেখা
আসন্ন-যৌবন ; তারি আগমের আলিম্পন রেখা
অকথিত সুখাবেশ অকারণ পুলকের রূপে
        কে যেন অঙ্কিছে চুপে চুপে !

একদা কমলকলি আঁখি মেলি' ধীরে ধীরে ধীরে
        জাগে যথা সরোবর-নীরে !
কোরক-বরস যাপি' পরিণত কৈশোরের দল
মেলিয়া ধরিতে চাহে কুসুমের ঐশ্বর্য্য উচ্ছল।
        মরমের অন্তঃপুরে অন্তহীন কী বৈভবরাশি
        সঞ্চিয়া উঠিছে স্বতঃ, সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে উদ্ভাসি' !
আপনারে বিকশিতে প্রকাশিতে চাহে যেন প্রাণ !
দাক্ষিণ্য আবেগে চিত্ত পরিপূর্ণ, পুলকায়মান।
        মহার্ঘ্য মাহেন্দ্রক্ষণ পরমমঙ্গল-লগ্ন যেন
                অতি সন্নিকট,—মানি হেন।

অস্ফুট কুসুমজাগে আধস্বপ্ন আধমায়া ঘোরে
        আধ আলোছায়া মুগ্ধ ভোরে !
উচ্ছ্বসিছে প্রাণধারা স্বতোৎসার আনন্দের বেগে
অন্তর বাহির হ'তে ; যেন উষসীর ছোঁয়া লেগে
        জাগিছে প্রভাত নব আলোকের দীপ্ত জয়রোলে।
        শীতান্তে আম্রের কুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ গন্ধঘন-বোলে
মূক—মর্ম্মোল্লাস যথা বিচ্ছুরয় ঋতুরাজ লাগি !
        —তারি সম উঠিছ কি জাগি ?

অপূর্ব্ব মোহনভঙ্গী অঙ্গে অঙ্গে ফুটিতেছে কম' !
        ছন্দোময়ী কবিতারি সম।
নয়নে বচনে হাস্যে লীলালাস্যে জীবনহিল্লোল
সঞ্চরি' উঠিছে ধীরে, কোন্ দিব্য রহস্যে বিভোল !
        কী বাণী ধ্বনিয়া ওঠে চিত্তবীণে নিত্য আপনার,
        হে মুগ্ধে! আজিও নিজে পারোনা পড়িতে ভাষা তার।
অনাগত তারুণ্যের মন্দমন্দ পদধ্বনি বাজে
তোমার তনুর তটে, মৃদুবক্ষোস্পন্দনের মাঝে।
        আপনারে হেরি তুমি আপনি বিস্ময়মগ্না তাই,—
                নিজেরে বিশ্বেরে চেন' নাই।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

—ওগো, ওঠো? কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও,—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হলো,—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই তো সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি বেহায়া তুমি। সারারাত কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে, বরঞ্চ, আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা। ওঠো বল্‌চি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা, সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্ত্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার-ঘাটে উড়ে পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরণে নূতন রাঙা বারাণসী শাড়ী, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা-হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূতটির নিচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি যেন উজ্জ্বল আবেগে ঝল্‌মল্ করিতেছে,—চাহিয়া আজও যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অতো দেখ্‌চো বলো ত?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অতো দেখ্‌চি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু দেখ্‌তে ভাল কি না, কমল-লতা দেখ্‌তে ভালো কি না—না?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগেনা সে এমনিই বলা যায়। অতো কোরে দেখ্‌তে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে থাক্‌গে। কিন্তু গুণে?

—গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা' মানতেই হবে।

—গুণের মধ্যে তো শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

—হাঁ, চমৎকার।

—চমৎকার তা' তুমি বুঝলে কি কোরে?

—বাঃ—তা' আর বুঝিনে? তাল, লয়, সুর শুদ্ধ—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা' তোমার পিঠে পড়তো। মনে নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামোকা তোমায় ভীতু বলে অসম্মান করেছি

বই ত নয়, কিন্তু কমল-লতা শুধু তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনেনি বুঝি ?

—না, আত্ম-প্রশংসা নিজে করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই।

—আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে ? সেই যে পাঠশালার ছুটি হলে তুমি গাইতে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্য্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়তো, —মানুষ তো কোন্ ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি মা, তৈরি হতে দেরি হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরি কোরোনা ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন ক্ষেপে যাবে। ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস্ রতন ?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যিই বড় ভালবাসে।

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

—হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিশোধ ? ও বললে, রতন নেমক-হারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্ম্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেবো। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা বোলো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবার সে-ও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁ গো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করোগে,—করতে তো ?

—না।

—না বই কি। তোমরা সব পারো।

—না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দুচোখ ছলছল্ কোরে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে না, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারবো না,—আমি নিজে নিয়ে যাবো হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে লাভ কি বাবা ? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েছে আমি জানিনে, মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মা-তীরের তলা ক্ষয়ে গেছে,—গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর নিয়ে কখন্ যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই, মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারবো না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিও, সে বর্ত্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপ্তে কি সেয়ানা !

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি কোরো না যাও।

দুপুর-বেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম

কাল পরণে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে, বারাণসী শাড়ীর সমারোহ কেন বলোত?

—তুমি বলোত কেন?

—আমি জানিনে।

—নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিন্‌তে পারো?

—তা' পারি। বর্ম্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম তুমি কাছে না এলে কখনো পরবোনা।

বলিলাম, সে তো হয়েছে, এখন ছাড়োগে?

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখ্‌নি না কি কালীঘাটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এখ্‌নি? সে কি কোরে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে তো ছুটি পাবো।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বল্‌ছিলো তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়ে ছিলে, আবার আজ থেকে স্বরু হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখবো, যা খুসি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা'হলে তো বাঁচি গো। খাই দাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেই জন্যেই আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশাদের যেমন কেনা-বাঁদী থাক্‌তো তার বেশি তোমার কাছে চাইবোনা।

—এতো বিনয় কেন বলোত?

—বিনয় তো নয়, সত্যি। আপনার ওজন বুঝে চলিনি, তোমাকে মানিনি, তাই অপরাধের পরে অপরাধ কোরে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই,—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্যে হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসিগে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বল্‌লে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেছো,—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

—না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখেচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়। কতদিন হোলো ঠাকুর-দেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারনি,—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা কোরো না,—যাবার হুকুম দাও।

—তবে চলো, দুজনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুর দেবতাকে তাচ্ছল্য করবে না তো?

বলিলাম, শপথ করতে পারবো না, বরঞ্চ, তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিও।

—কি বর চাইবো বলো?

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সে কথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তুমি বলোত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইবো আয়ু, চাইবো স্বাস্থ্য, আর চাইবো আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পারো। প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্ব্বনাশ করো। করতেই তো বসেছিলে।

—লক্ষ্মী, এ হলো তোমার অভিমানের কথা।

—অভিমান তো আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারবো!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা' বলে এ-ও আমার সয়না। কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু এ কাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবেনা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি? আরও খাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শান্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

—তবে পথটা কি ঠাওরালে?

—ঠাওরাতে পারিনি, খুঁজে বেড়াচ্চি।

—আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয়?

—হয় গো হয়,—খুব হয়।

—কখ্খনো হয় না,—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই তো। কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ গোঁসাই। কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমল-লতা। কেবল ওগো হাঁ গো ক'রে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকবো নতুন-গোঁসাইজি বলে।

—স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচম্কা কখনো কমল-লতা বলে ভুল হবে,—তাতেও স্বস্তি পাবে। বলো, ঠিক না?

হাসিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো ম'লেও যায় না। বাদসাহী-আমলের কেনা-বাঁদীদের মতো কথাই হচ্চে বটে! এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিতো।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্টু, যে কোন জল্লাদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎ-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল,—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে! দুধ কই? মাথা খাও, উঠে পড়োনা যেন। বলিতে বলিতে দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ আর সেই কমল-লতা!

মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে সে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হতো, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বস্‌লোনা, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গয়না খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হলো বলে। এক আপদ তুমি,—সে-ও বিদায় হলো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামেনা। ইষ্ট-মন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুর-দেবতা করলে অন্তর্ধান, বুক উঠ্‌লো শুকিয়ে, ভয় হলো এ-ই যদি ধর্ম্মের সাধনা তবে এ সব হচ্চে কি! শেষে পাগল হবো না কি!

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান। টিকে থাক্‌লে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েছি।

—কোথায় পেলে?

—এখানে। এই বাড়ীতে।

—অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

—প্রমাণ দিতে যাবো তোমার কাছে? আমার বয়ে গেছে।

—কিন্তু ক্রীত-দাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করেনা।

—ত্যাখো রাগিয়োনা বল্‌চি। একশোবার ক্রীত-দাসী ক্রীত-দাসী করো ত ভালো-হবেনা।

—আচ্ছা খালাস, দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কতো এবার তা' হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে-কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সন্তর্পণে রেখে আমি উঠে বস্‌লুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে,—আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল কোরে,—তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিরুতে পারলুমনা। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম এ যদি

পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম্ম তবে থাক্‌গে আমার ধর্ম্ম-চর্চ্চা,—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম এঁকে কার কথায়? ও কি, খাচ্চোনা যে? সব দুধই পড়ে রইলো যে।

—আর পারিনে।

—তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

—না, তাও না।

—কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে!

—যদি হয়েও থাকি সে অনেকদিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাবো।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবেনা। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলবোনা। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙেনা নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি। তারপরে দরওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম,—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ী এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখ্‌তে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজোর মন্ত্র, এসেছেন আমার ইষ্ট-দেবতা, গুরুদেব,—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত-নেঙ্‌ড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপ্‌চে-ওঠা ঝরণার ধারা,—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। আনিনে দুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমাকে খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

—যাও।

রাজলক্ষ্মী তেম্‌নি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ আর সেই কমল-লতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দুজনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি নয়টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া সহজ মানুষের মতো কাছে আসিয়া বসিল। বলিলাম, রাজ-পোষাক গেছে,—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজ-পোষাকই বটে। কিন্তু রাজার দেওয়া যে! যখন ম'রবো ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে বোলো।

—তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে? এইবার কিছু খাও।

—খাই।

—রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক্।

—এইখানে? বেশ যাহোক্। তোমার সাম্‌নে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখোচো খেতে?

—দেখিনি, কিন্তু দেখ্‌লে দোষ কি?

—তা কি হয়। মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখ্‌তেই বা দেবো কেন?

—ও ফন্দি আজ খাট্‌বে না লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবোনা। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা কবোনা।

—নাই বা কইলে।

—আমিও খাবোনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবেনা।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নাম মাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাইনে, কিন্তু কি কোরে খাবো বলোত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আস্‌তো আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুমনা

পাছে সে বলে দেখা হয়েছে কিন্তু বাবু এলেননা। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বল্‌বার তো কিছু নেই।

—বলবার দরকার তো নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

—কে তেলাপোকা,—তুমি ?

—তাই তো জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে ?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ, তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

—এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা, লোক-দেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন-কিছুতে তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বল্‌লে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে ?

বলিলাম, একটু ভুল হলো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে,—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বল্‌তে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারি শ্রীকান্তর এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারোনি।

হাতটা ধুয়ে আসিগে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ব্ববিধ কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমল-লতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি, সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল-বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

—ওর দোষ কিসে ?

—দোষ বই কি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই তো কমল-লতা ডেকেছিলো সকলের আগে আত্ম-হত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেলো। এমনিই হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই,—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত গিয়ে পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচলো, কিন্তু মলো তার স্নেহের ধন।

—যুক্তিটা ভালো বোঝা গেলনা লক্ষ্মী।

—তুমি বুঝ্‌বে কি ক'রে ? বুঝেছে কমল-লতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

—ওঃ—এই ?

—এই বই কি। আমার বাঁচা কতটুকু বলোত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে ?

— কিন্তু কালই যে বল্‌লে তোমার মনের সব কালী মুছে গেছে,—আর কোন গ্লানি নেই,—সে কি তবে মিছে ?

—মিছেই তো। কালী মুছবে ম'লে,—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েছি, কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্যে।

—তা' জানি। কিন্তু এ নিয়ে বারবার যদি ব্যথা দাও আমি এমনি নিরুদ্দেশ হবো কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবেনা।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনোনা। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

—এমন কথা আর বল্‌বেনা বলো ?

—না।

—ভাব্‌বেনা বলো ?

—তুমি বলো পায়ে ঠেলে কখনো যাবেনা ?

—আমি তো কখনো যাইনে, লক্ষ্মী, তুমিই ঠেলে ফেলেছো। যখনি দূরে গেছি,—তুমি চাওনি বলে।

—সে তোমার লক্ষ্মী নয়,—সে আর কেউ। তার শাস্তির কথা তো জানো ?

—জানি। কিন্তু সেই আর-কেউকেই আজও ভয় করি লক্ষ্মী।

—না, তাকে আর ভয় করোনা, সে রাক্ষুসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাকেই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাচ-ছয় এই ভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্যকথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্ম্মায় যাবে ?

—সত্যিই যাবো।

—কি করবে গিয়ে,—চাক্‌রি ? কিন্তু আমরা তো দুজন, —কতটুকুতেই বা আমাদের দরকার ?

—কিন্তু সেটুকুও তো চাই।

—সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবেনা, ও তোমার ধাতে পোষাবেনা।

—না পোষালে চলে আস্‌বো।

—আসবেই জানি। শুধু আড়ি কোরে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

—কষ্ট না করলেই পারো।

রাজলক্ষ্মী একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল,—যাও, চালাকি কোরোনা।

বলিলাম, চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাঁধা-বাড়া, বাসন-মাজা, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকররা করবে কি ?

—কোথায় ঝি-চাকর ? তার টাকা কৈ ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক্। কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবোই।

—চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পূজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসৎ।

—তা' হোক্‌গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি ?

—করোনা সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দুদিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

—তাতেই বা ভয় কিসের ? সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনবো। রেখে আসতে হবে না তো। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট বাড়ীতে শুধু তুমি আর আমি,—যা খেতে দেবো তাই খাবে, যা পরতে দেবো তাই পরবে,—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইবো না।

সহসা আমার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

—কি ভাবচো ?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল, আমরা কবে যাবো ?

বলিলাম, এই বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করে নাও তার পরে যেদিন ইচ্ছে, চলো যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোক বুজিল।

—আবার কি ভাবচো ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না ?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা দিয়ে আসবো তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

—তবে চলো কালই দুজনে যাই।

—তুমি যাবে?

—কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমল-লতা আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহর দাদা। এ হয়েছে ভালো।

—এ সব কে তোমাকে বললে?

—তুমিই বলেছো।

—না আমি বলিনি।

হাঁ, তুমিই বলেছো, শুধু জানোনা কখন বলেছো।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

—কেন নয়?

—সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রুকুঞ্চিত করিল, কুপিত কণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েছো তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও তো মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসবো।

—কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চলো যাই।

—হাঁ চলো, কাল সকালের গাড়ীতেই বেরিয়ে পড়বো দুজনে,—তোমার কোন ভাবনা নেই,—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করবো না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে,—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, —ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না,—কিছু তো নয়।

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমন ধারা লাগিল!

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র



শরৎ-বন্দনা

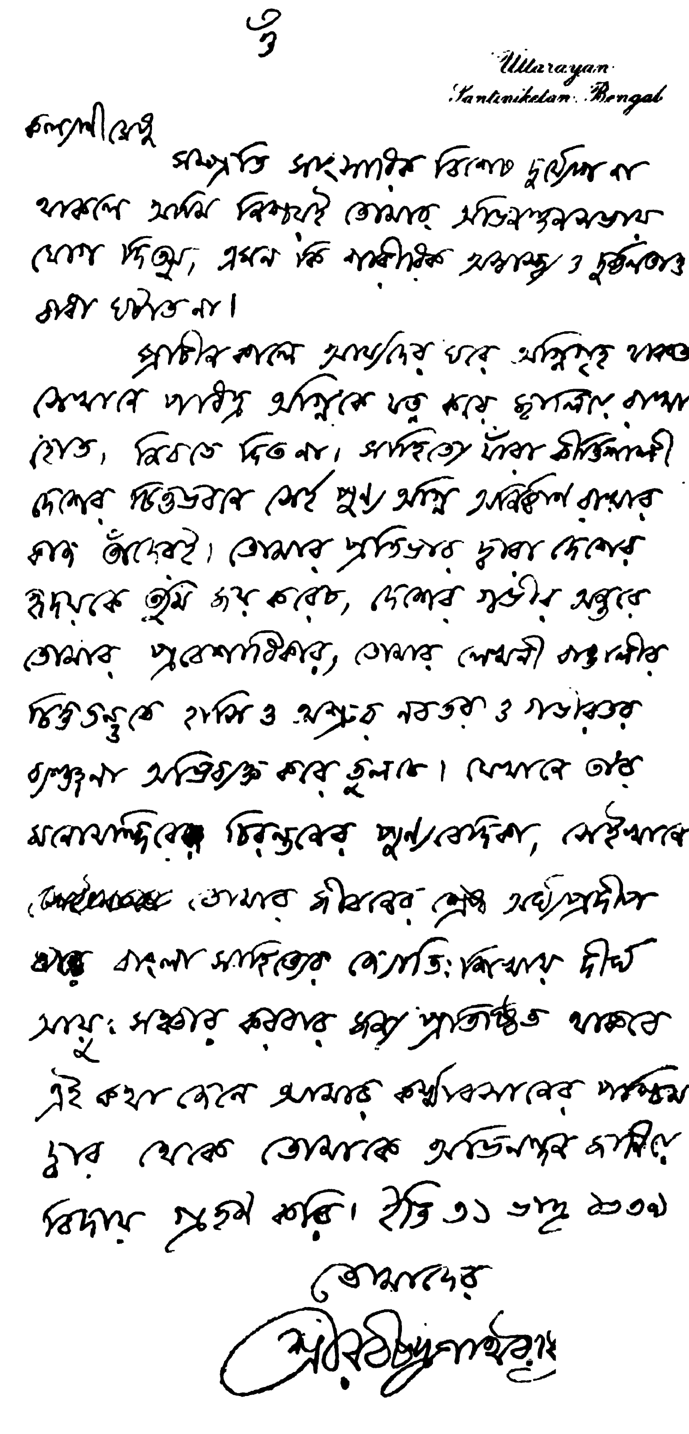


শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩

সূচী

শরৎ-বন্দনা



ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দনসভায় যোগ দিতুম, এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীন কালে আর্য্যদের ঘরে অগ্নিকুণ্ড থাকত সেখানে গার্হস্থ্য অগ্নিকে রক্ষা করে চলাই ধর্ম্ম হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা চিরজীবী দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি সংরক্ষণ কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেছ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্তপটে হাসি ও অশ্রুর নতুন ও গভীরতর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্যবেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ থেকে বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃ বিস্তার করে দীর্ঘ আয়ুঃ সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই কথা জেনে আমার কর্ম্মাবসানের পশ্চিম দ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রকে তাঁহার সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মদিবসে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ-লিপি

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ

'উত্তরায়ণ'
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল।

কল্যাণীয়েষু

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা-সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষে পত্র যোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম্মসাধনার অন্তিমপর্ব্বে আমি পৌঁচেছি। কর্ত্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তনমাত্র। এই কারণেই অল্প দিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমালা। সে দিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরমপ্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়, একথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এদান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নর নারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার বরেণ্য শিল্পী শরৎচন্দ্রের করকমলে

বাংলার সাহিত্যাকাশ যে দিন ধরণীর সর্ব্বোজ্জ্বল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত, সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহনক্ষত্রের আলোকরেখা যে দিন পরিম্লান,—সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতিস্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিক্‌চক্রবালে যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকলজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র! তুমিই সেই জ্যোতিষ্মান্,—আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্নাপ্লাবনেরই মত তোমার কথা-সাহিত্যের কনক-কৌমুদী এদেশের নরনারীর মধ্যে সুগভীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে। তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাংলার কথা সাহিত্যের অসামান্য শিল্পি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুর-চারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দ-বেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল দুঃখ সুখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি, বিচিত্র মানব-চরিত্রের অতল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারী-চিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারী-চরিত্রের নিবিড়-রহস্যজ্ঞাতা! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

সর্ব্ববিধ আত্মাবমাননা সর্ব্ববিধ হীনতর অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ-প্রকৃতিজাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের সকল কালের সকল সমাজে বর্ত্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌন ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্য্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

আজ তোমার এই সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অভিনন্দন বাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমরা আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই, তবুও, আজিকার এই বিশেষ দিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি, তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত গ্রহণ কর। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি। তোমার এই শুভ জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান বাংলার গৃহে গৃহে বর্ষে বর্ষে যোগ্য সমারোহে প্রতিপালিত হউক। তোমার যশ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য চির-অব্যাহত থাকুক। তোমার জীবন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে হেমবিমণ্ডিত হউক—অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনা লইয়া হে নারী-হৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

তোমার

স্বদেশ-বাসিনিগণ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে

হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র !

তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে সমবেত স্বদেশবাসীর বন্দনা গ্রহণ কর। আমরা আজ আমাদের হৃদয়ের পাত্রে যে প্রগাঢ় প্রীতির অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছি, তোমার নিরভিমান স্নেহসিঞ্চিত প্রসন্ন-দৃষ্টিপাতে তাহা সার্থক কর।

বঙ্গসাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়-ক্ষণে বাঙ্গালী-হৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মলিন মূর্ত্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্য্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহিয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ; তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পি! অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ,—কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই নহে, তাহা সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব কালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে। মানব-মহত্ত্বের তুমি মহিয়ান উদ্গাতা, তোমার দুর্লভ দান কেবল প্রসাদ-লব্ধ লঘু চিত্তের শূন্য অহঙ্কারের জন্য উৎসর্গিত নয়; ইহাকে শুধু অবসরের বিলাস বস্তুরূপে ব্যবহার করিলে আত্ম-বঞ্চনাই হইবে। অতএব তোমার সৃষ্টির যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধির দ্বারা আমরা যেন বল লাভ করি, ফল লাভ করি—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া হে শক্তিমান স্রষ্টা! তুমি তোমার স্বদেশবাসীর প্রীতি-উৎসারিত বন্দনা গ্রহণ কর।

শরৎ-বন্দনা-সমিতি
৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯

তোমার গুণমুগ্ধ
স্বদেশবাসিগণ

শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ

৩১শে ভাদ্র আমার জন্ম-দিনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের আহ্বান আমার স্বদেশের আপন-জনের কাছ থেকে প্রতি বৎসরেই আসে, আমি শ্রদ্ধানত শিরে এসে দাঁড়াই, অঞ্জলি ভরে আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাড়ী যাই,—সে আমার সারা বছরের পাথেয়। আবার আসে ৩১শে ভাদ্র ফিরে, আবার আসে আমার ডাক, আবার এসে আমি আপনাদের কাছে দাঁড়াই। এমনি ক'রে এ-জীবনের অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এগিয়ে এলো।

এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে কিন্তু একদিন আমি আর আসবো না। সে দিনে একথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না। এ-ই হয়, এমনি করেই জগৎ চলে।

কেবল প্রার্থনা করি সেদিনও যেন এমনি ধারা স্নেহের আয়োজন থেমে না যায়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, বাণীর মন্দিরে যাঁরা নবীন সেবক তাঁরা যেন এম্‌নি সভাতলে দাঁড়িয়ে আপনাদের দক্ষিণ হস্তের এম্‌নি অকুণ্ঠিত দানে হৃদয় পূর্ণ করে নিয়ে গৃহে যেতে পারেন।

আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম,—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশি।

আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি শুধু আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের কাছেই?

সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন, কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলেনা। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলোনা। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি শ্রুতি-মধুর শব্দ-রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এমনি আরও অনেক কিছুই এ জীবনে যাদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে তাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।

আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। প্রতি সাহিত্য সাধকের অন্তরেই পাশাপাশি বাস করে দুজনে,—তার একজন হলো লেখক, সে করে সৃষ্টি, আর অন্য জন হলো তার সমালোচক, সে করে বিচার। অল্প বয়সে লেখকই থাকে প্রবলপক্ষ,—অপরকে সে মানতে চায় না। একজন পদে পদে যতই হাত চেপে ধরতে চায়, কানে কানে বলতে থাকে,—পাগলের মতো লিখে যাচ্চো কি, থামো একটুখানি,—প্রবল পক্ষ ততই সবলে হাত দুটো তার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চালিয়ে যায় তার নিরঙ্কুশ রচনা। বলে আজ তো আমার থামবার দিন নয়,—আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের গতি-বেগে ছুটে চলার দিন। সেদিন খাতার পাতায় পুঁজি হয় বেশি, স্পর্দ্ধা হয়ে ওঠে অভ্রভেদী। সেদিন ভিৎ থাকে কাঁচা, কল্পনা হয় অসংযত উদ্দাম,—মোটা গলায় চেঁচিয়ে বলাটাকেই সেদিন যুক্তি বলে ভ্রম হয়। সেদিন বইয়ে-পড়া ভালো-লাগা-চরিত্রের পরিস্ফীত বিকৃতিকেই সদম্ভে প্রকাশ করাকে মনে হয় যেন নিজেরই অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি।

হয়ত, সাহিত্য-সাধনার এইটিই হচ্চে স্বাভাবিক বিধি, কিন্তু উত্তরকালে এর জন্যই যে লজ্জা রাখার ঠাঁই মেলেনা এ-ও বোধ করি এর এমনিই অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমার প্রথম-যৌবনের কত রচনাকেই না এই পর্য্যায়ে ফেলা যায়।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, ভুল আমার আপনার কাছেই ধরা পড়ে। আমি সভয়ে নীরব হয়ে যাই। তারপরে দীর্ঘ দিন নিঃশব্দে কাটে। কেমন কোরে কাটে সে বিবরণ অবান্তর। কিন্তু বাণীর মন্দির-দ্বারে আবার যখন ফিরিয়ে এনে আত্মীয় বন্ধুরা দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন যৌবন গেছে শেষ হয়ে, ঝড় এসেছে থেমে, তখন জানতে বাকী নেই সংসারে সংঘটিত ঘটনাই কেবল সাহিত্যে সত্য নয়, এবং সত্য বলেই তা সাহিত্যের উপাদানও নয়। ওরা শুধু ভিত্তি এবং ভিত্তি বলেই থাকে মাটির নীচে সংগোপনে,—থাকে অন্তরালে।

তখন আমার আপন বিচারক বসেছে তার সুনির্দ্দিষ্ট আসনে, আমার যে-আমি লেখক সে নিয়েছে তার শাসন মেনে। এদের বিবাদের হয়েছে অবসান।

এমনি দিনে একজন মনীষীকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি, তিনি স্বর্গীয় পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই এক পথের ধারে। ডেকে বল্লেন, শরৎ তোমার লেখা আমি পড়িনি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলো ভালোই হচ্চে। একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েছি, আমার আদেশ রইলো যা' সত্যিই জানোনা তা' কখনো লিখোনা। যাকে যথার্থ উপলব্ধি করোনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন ক'রে পাওনি, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হতে চেয়োনা। কেননা এ ফাঁকি কেউ-না-কেউ একদিন ধরবেই, তখন লজ্জার অবধি থাকবে না। আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা। এ ভুল যে করেনা

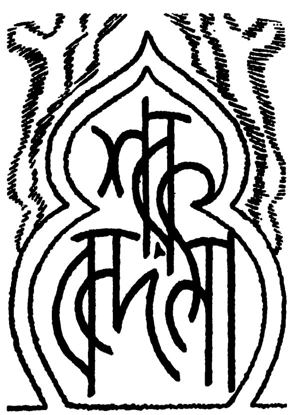
তার আর যে দুর্গতিই হোক্ তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়না। অর্থাৎ বোধ হয় তিনি একথাই বল্‌তে চেয়েছিলেন যে, পেটের দায়ে যদিবা কখনও ধার করো, ধার করে কখনো বাবুয়ানি করোনা।

সেদিন তাঁকে জানিয়েছিলাম তাই হবে।

আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্পপরিধি-বিশিষ্ট। হয়ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এই আমার সম্পদ,--আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার সত্য অধিকার। হয়ত আপনাদের মনের কোণে এই কথাটা আছে,--এর শক্তি কম, তা হোক, কিন্তু এ কখনো অনেক জানার ভান কোরে আমাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।

এমনি একটা জন্ম-দিন উপলক্ষে বলেছিলাম চিরজীবী হবার আশা আমি করিনে। কারণ, সংসারে অনেক-কিছুর মতো মানব মনেরও পরিবর্ত্তন আছে, সুতরাং আজ যা বড়ো আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেদিন আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতর অবহেলায় ডুবে যায় আমি ক্ষোভ করবোনা। শুধু, মনে এই আশা রেখে যাবো অনেক কিছু বাদ দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে সেটুকু আমার থাক্‌বে। সে আমার ক্ষয় পাবেনা। ধনীর অজস্র ঐশ্বর্য্য নাই বা হলো, বাক্‌দেবীর অর্ঘ-সম্ভারে ঐ স্বল্প-সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা। দিনের শেষে এই আনন্দ মনে নিয়ে খুসি হয়ে বিদায় নেবো,--ভেবে যাবো আমি ধন্য, জীবন আমার বৃথায় যায়নি।

উপসংহারে একটা প্রচলিত রীতি হচ্চে শুভানুধ্যায়ী প্রীতিভাজন বন্ধুজনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো। কিন্তু এ প্রকাশ করার আমি ভাষা খুঁজে পেলাম না। তাই শুধু জানাই আপনাদের কাছে আজ আমি সত্যই বড় কৃতজ্ঞ।



আমাদের সাময়িক সাহিত্য

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সাময়িক পত্রিকাগুলি বর্ত্তমানকালের সাহিত্যের বাহন। সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে তাহা সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইতে পারে। সাহিত্যের শক্তি ও লেখকদিগের সৃষ্টিপ্রতিভার সহিত, সাধারণ পাঠকের রুচি ও জ্ঞানের পরিমাপও অনেকটা ইহার সাহায্যে করা যাইবে।

আমাদের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলির কথা ধরিলে দেখা যাইবে যে, এখানে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জিনিসের মিশ্রণ একটু বিস্ময়কর। সাহিত্যের কতকগুলি বিভাগে উৎকৃষ্ট লেখা আশানুরূপ পরিমাণে না হইলেও, কিছু কিছু বাহির হয়; অথচ, অপর কতকগুলি বিভাগে যে শ্রেণীর লেখা বাহির হয়, তাহা পত্রিকাগুলির মর্য্যাদার অনুরূপ নহে। লেখক এবং পত্রিকা-পরিচালকবর্গের ইহাতে যে দায়িত্ব নাই, এমন নহে; তবুও, দেশের শিক্ষার অবস্থা এবং সাধারণ পাঠকদেরই এজন্য বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। বাংলাদেশে এখনও যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার হয় নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরও বই কিনিয়া পড়িবার অভ্যাস নাই, সামর্থ্যেরও অভাব আছে। তাহার পর পুস্তক যাহা আমরা ক্রয় করি, তাহারও অধিকাংশ আবার ইংরাজী। জ্ঞানার্জ্জনের সত্যস্পৃহা হইতে কতকটা বাধ্য হইয়া এবং ফ্যাসনের খাতিরে কতকটা ইচ্ছা করিয়া, বাঙ্গালী পাঠকেরা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করেন। কাজেই, বাংলাপুস্তক ও পত্রিকার পাঠকসংখ্যা নিতান্ত অল্প, খরিদ্দার তদপেক্ষা আরও অল্প। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত বিভিন্ন পাঠকমণ্ডলী এত ছোট যে, কোনও একটা বিশেষ বিদ্যা বা বিষয়মূলক পত্রিকা চালান প্রায় অসম্ভব। তাহা হইলেও বর্ত্তমানে এরূপ কয়েকখানি পত্রিকা চলিতেছে বা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

আমাদের নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আরও অল্প। যাঁহাদের শিক্ষা এবং পাঠের স্পৃহা আছে, তাঁহাদেরও সবক্ষেত্রে আর্থিক স্বাধীনতা না থাকায়, ইচ্ছামত পত্রিকাদি ক্রয়, সব সময় তাঁহারা করিতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সাহিত্যের পাঠক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমন নহে যাহাতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে পারেন। পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয়ের সময় প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হয়, যাহাতে সেখানা পরিবারস্থ সকলেরই অল্পবিস্তর কাজে লাগে। এসকল অসুবিধা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন পত্রিকাও আমাদের আছে। এই প্রকার পত্রিকার সংখ্যা ও প্রচলন বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন আরও এই জন্য যে, আমাদের শিক্ষিত পরিবারগুলির খুব বেশীর ভাগ মেয়ের যে সামান্য শিক্ষা আছে, তাহাকে বাড়াইবার এবং পরিবার ও তাঁহাদের নিজেদের কাজে লাগিবার মত করিবার পক্ষে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সুলভ ও আনন্দদায়ক উপায়।

শিশুদের ও বালকদের উপযোগী সাহিত্যেরও আমাদের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। সকলকাজেই আমাদের উদ্যমের অভাব এবং মৌলিক ও নূতন পন্থা অপেক্ষা গতানুগতিকতার প্রতি অনুরক্তি অধিক দেখা যায়। আমাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারেও এই একই দোষ ঘটিয়াছে। তাহাদের মনে ঔৎসুক্য জাগাইবার, কল্পনাকে উত্তেজিত ও শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করিবার চেষ্টা আমাদের নাই। কাজেই, শিশুদের উপযোগী ভাল পত্রিকা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবুও, শিশুদের জন্য ২।১খানি পত্রিকা যদিও বা আছে, কিশোরদের পড়িবার মত কোনও ভাল পত্রিকাই আমাদের

নাই। একেবারে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে লিখিত লেখাগুলি পড়িয়া কিশোরদের ঔৎসুক্য জাগে না অথবা মানসিক পুষ্টিও হয় না। আবার অন্যদিকে নানা দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ অথবা উচ্চ শ্রেণীর রসসাহিত্য সম্বলিত পত্রিকাগুলিও ইহাঁদের পক্ষে সহজ বোধ্য নহে। আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য, তথ্য সম্বলিত সরস ভ্রমণ কাহিনী, দেশবিদেশের কথা, পৃথিবীর নানাজাতির লোকের আকৃতি প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার এবং ছাত্রসমাজের আদর্শ স্থানীয় গুণগুলির কথা, ইহাঁদের শিক্ষণীয় নানাদেশের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সাময়িক ঘটনার কথা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, চরিত্রগঠনমূলক আলোচনা প্রভৃতি সহজ ও সরল ভাষায় বালকদিগের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষার অনুকূল করিয়া ইহাঁদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। বিশেষ, যাহাতে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের প্রেরণা দিতে পারে, আমাদের হীনস্বাস্থ্য, ক্ষীণ কর্ম্মশক্তি, অলস অভ্যাস ও বিশ্বাসপ্রবণ প্রকৃতি দূর করিতে পারে, জ্ঞানলাভের স্পৃহা জাগাইতে পারে, এমন রচনায় সমৃদ্ধ সাময়িক পত্রিকাদ্বারা এই শিক্ষার কার্য্য ভালভাবেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরাজীতে পরিচালিত হয় বলিয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে বালকদিগের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকায়, তাহাদের শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য এই প্রকার পত্রিকার প্রয়োজন আরও অনেক অধিক। কিন্তু, আমাদের অভাবের জন্যই হউক, মনোযোগের অভাবেই হউক, অথবা শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা আজও আমরা দিতে শিখি নাই বলিয়াই হউক, এ ব্যাপারে আমাদের ঔদাসীন্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই সকল কারণে আমাদের প্রধান পত্রিকাগুলি সবই অনেকটা একই ধরণের এবং সকলকেই ছেলেদের ও সাধারণ লোকের উপযোগী রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের লেখা প্রকাশ করিতে হয়। কাজেই, লেখক এবং পত্রিকা-পরিচালকগণ অপেক্ষা দেশের শিক্ষার অবস্থা এবং পাঠক ও খরিদ্দারের অভাবই এই অবস্থার জন্য অধিকতর দায়ী বলিয়া মনে হয়।

গল্প এবং উপন্যাস আমাদের সাময়িক সাহিত্যের একটি অতিপ্রধান অংশ, অনেকটা প্রাণস্বরূপ বলিলেই হয়। কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সাহিত্যের এই বিভাগটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য, ইহার সাধারণ সুরই অনেকটা উচ্চগ্রামে বাঁধা হইয়া গিয়াছে। আমাদের সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে যে সকল ছোট গল্প বা ধারাবাহিক উপন্যাস বাহির হয়, তাহার অনেকগুলিই লেখকদিগের সৃষ্টিকুশলতার পরিচায়ক। রুচির মার্জ্জনায়, ঘটনার বিন্যাসে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, সুমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ পরিহাস-পটুতায়, সহানুভূতিপূর্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ইহার অনেকগুলি নিঃসন্দেহ প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমরা অনেকদিনের সভ্যজাতি। বহুযুগ ধরিয়া সভ্যতার আওতায় বাস করিয়া আমাদের মনের কোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলি, বিকাশ লাভের দীর্ঘ অবসর পাইয়াছিল। বিধিবদ্ধ সমাজের ধর্ম্মমূলক সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের বিপুল ধর্ম্ম সাহিত্য, মানব-মনের বহু উচ্চভাবের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়াছিল। ইহার রূপ পুরাতন হইলেও, আধুনিকতার সহিত ইহার কোনও বিরোধ ছিল না, এবং আধুনিক রূপ গ্রহণ করিতেও ইহার অধিক সময় ব্যয় বা কষ্টস্বীকার করিতে হয় নাই। আমাদের মনের যুক্তিহীন বিশ্বাসপ্রবণভাব অনেকদিন ধরিয়া ইহাকে শিথিল ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলেও, আধুনিক ইউরোপের সংস্পর্শ ইহাকে শাণিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই এত সহজে বাংলার কথা-সাহিত্যের এতখানি উৎকর্ষ সম্ভব হইয়াছে। আমাদের কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে এই কথা আরও অধিকতর সত্য। কবিতার সুর আমাদের প্রাণের সহিত মিশিয়া আছে। ভাবপ্রবণ জাতি বলিয়া বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর একটা অখ্যাতি আছে। বাঙ্গালী চরিত্রের এ অপবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যাহা কিছু বাঙ্গালী চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, তাহার মনুষ্যত্বের মহত্তম বিকাশকে সম্ভব করিয়াছে, তাহার মধ্যে এই ভাবপ্রবণতাই প্রধান।

বাংলার কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষ বাঙ্গালী চরিত্রের এই বিশেষ গুণটির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আমাদের গদ্য সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে নিতান্ত আধুনিক কালে। ইহার পূর্ব্বে আমাদের সব কাজের জন্যই কবিতার উপর নির্ভর

করিতে হইত। কিছু প্রচার করিতে হইলে তাহাকে কবিতায় গাঁথিতে হইত। সভাসমিতিতে কিছু বলিতে হইলে, ছড়া এবং শ্লোকের আশ্রয় লইতে হইত এবং তখনকার দিনে যাঁহারা কবিতা লিখিতেন তাঁহারা সমাজে বিশেষভাবে আদৃতও হইতেন। আমাদের পল্লীগাথায়, মেয়েদের ব্রতকথায়, ছেলেদের ছড়াগানে সর্ব্বত্রই কবিতার ছড়াছড়ি। কাশীদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে, একদিন ধরিয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত হইয়া আসিয়াছে, গল্পের জন্য কৌতূহল অথবা মনের ধর্ম্মভাব অপেক্ষা ইহার মধ্যে কাব্যের যে অনবদ্য সুরটি আছে, ছন্দের যে লীলায়িত ভঙ্গী ও সরল সঙ্গীতমুখর ধ্বনি আছে, তাহাই বাঙ্গালীর মনকে অনেক বেশী জোরে আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের কাব্যসাহিত্যের উন্নতির মূল এখানেই। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের যে 'গীতাঞ্জলী' বিশ্বসভায় বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছে, তাহার সুরও বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। আমাদের পল্লীগাথাগুলির ভিতরও যে উচ্চস্তরের সরল কাব্যরস নিহিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে স্বীকৃত হইতেছে।

অবশ্য, এই সকল জিনিসের বেশীর ভাগই, কোনও প্রকারের সাহিত্যিক মূল্য বর্জ্জিত ছিল। বাঙ্গালীর জীবনে সুরের প্রাধান্য যে কত অধিক ছিল, ইহার মধ্যে তাহারই স্তূপীকৃত প্রমাণ রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে ইহার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেমনই আমাদের কাব্যসাহিত্যকে আধুনিক পর্য্যায়ে আনিয়াছেন, এবং ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টি-প্রতিভার স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যে আভিজাত্য দান করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠকের রুচিকে এতখানি মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া দিয়াছে যে, নিতান্ত নিম্নস্তরের কবিতার পক্ষে, বাংলাসাহিত্যে স্থান লাভ বা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আদর লাভ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ রবীন্দ্রানুবর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণও বাংলা কবিতার এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই, আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ এমন উন্নত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ভূমি পাইয়াছেন, যেখান হইতে নিম্নে নামিয়া আসা সহজ ও স্বাভাবিক নহে। কিন্তু, বাঙ্গালীর জীবনে সুরের প্রাধান্যই ইহার আকস্মিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে।

আমাদের সাময়িক সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত এবং তাহাদের অন্যতম প্রধান অংশ কবিতার অধিকাংশ এই জন্য অপকৃষ্ট নহে এবং কতকগুলি উচ্চ ভাবোদ্দীপক এবং দূরপ্রসারী কল্পনার পরিচায়ক। যে অনির্ব্বচনীয়তা ভাল কবিতার প্রাণ স্বরূপ, তাহার সাক্ষাৎ অনেক সাময়িক কবিতাতেই পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে যে কাব্য এবং কথা-সাহিত্যের বিষয় বলা হইল, এক হিসাবে, তাহা অনেকটা এক পর্য্যায়ভুক্ত। এ উভয়েরই আশ্রয় প্রধানতঃ হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নহে। তাই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের পঙ্গুত্বের ছায়া ইহাকে বিশেষভাবে মলিন করিতে পারে নাই। আমাদের শিক্ষার পশ্চাতে যে, আশানুরূপ জ্ঞান নাই, বিদ্যাকে গভীর এবং পূর্ণরূপে অধিগত করিবার জন্য যে কঠোর সাধনা নাই, লব্ধবিদ্যাকে সমাজ ও দেশের উপকারে লাগাইবার মত উদ্যম ও অধ্যবসায় নাই, তাহার জন্য এই রসসাহিত্যের উন্নতি কিছু বাধাগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয় নাই। ইহার জন্য মনের যে প্রসারতা, যে সৌন্দর্য্যবোধ ও সূক্ষ্মতার প্রয়োজন, তাহার ক্ষেত্র আমাদের পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু, তাহা হইলেও, একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাইবে। ছোট ভাল গল্প যে পরিমাণে বাহির হয়, তাহার তুলনায় ভাল উপন্যাসের সংখ্যা কম। বাঙ্গালী জীবনের সংকীর্ণ পরিধি ও বৈচিত্র্যহীন আবেষ্টন, ইহার একটা কারণ হইতে পারে। অন্যপক্ষে উপন্যাসে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, সুশৃঙ্খল কল্পনা, যুক্তি-তর্কের অবতারণা এবং অনেকক্ষেত্রে তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাধান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই পারদর্শিতার অভাবও আমাদের অক্ষমতার জন্য নিঃসন্দেহ অনেকটা দায়ী। আমরা অনেক বড় গল্পকে উপন্যাস বলিয়া থাকি। আমাদের অনেকগুলি ভাল উপন্যাস এই শ্রেণীভুক্ত।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। আমাদের সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে ২।১ জন এমন

লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশিষ্ট প্রতিভার ছাপ আছে। তখন আশা হয়, এই প্রতিভা একদিন বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধতর করিবে। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, সেই প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কবিতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রতিভাকে শানিত করিবার জন্য নিষ্ঠার সহিত বিদ্যার্জ্জনের প্রয়োজন হয়, প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করিতে হয়। অনেকস্থলেই, ইহার অভাবে প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না।

আবার, আমাদের প্রথমশ্রেণীর পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে যেরূপ উৎকৃষ্ট গল্প ও কবিতা বাহির হয়, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ মাঝারি ধরণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের লেখা সেগুলিতে স্থান পাইবে না। কিন্তু, এ ব্যাপারে পাঠকের আশাভঙ্গ প্রায়ই ঘটে। ইহার প্রধান কারণ, পত্রিকার পরিচালকেরা প্রয়োজনানুরূপ যোগান পান না।

আমাদের সাহিত্যে ভাল সাময়িক পত্রিকা মাত্র কয়েকখানি। যাহাকিছু ভাল কবিতা বা গল্প বাহির হয়, তাহা এই কয়খানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের অধিকাংশ কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের বই পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে, মাসিক কাগজগুলিতে বাহির হয়। অথচ, ইঁহারাই যখন যথেষ্ট ভাল লেখা পান না, তখন বুঝিতে হইবে, ভাল জিনিসের সৃষ্টি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। খুব ভাল লেখার অনুপাতে মাঝারি লেখার পরিমাণ নিতান্তই কম।

এ ব্যাপারেও, লেখক অপেক্ষা পাঠকের দায়িত্ব কম নহে। খুব ভাল লেখা যে, মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মধ্যে প্রতিভাবান লেখকের অভাব নাই। সেই প্রতিভার যে যথোচিত বিকাশ সম্ভব হয় না, অথবা যে সকল মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক, সাময়িক সাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে এখানে স্থান পান না, তাহার প্রধান কারণ, সাহিত্য সেবাকে জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ আমাদের দেশে নাই।

একেই ত আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কম। এই অল্প সংখ্যার মধ্যেও বিদ্যার চর্চ্চা ভালভাবে থাকিলে, যে ফল পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। কারণ, ইঁহাদের মধ্যে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞানলাভের স্পৃহা জাগ্রত করিবার কোনও ধারাবাহিক চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত হয় নাই। বড় সহরগুলির কথা বাদ দিলে, সাধারণ পাঠাগার এদেশে নাই বলিলেই হয়। যে নিতান্ত-স্বল্প-সংখ্যক লোক পত্রিকাদির পাঠক, তাঁহাদেরও অধিকাংশের কিনিয়া পড়িবার সামর্থ্য এবং অভ্যাস নাই। এই সকল কারণে আমাদের সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তকের বিক্রয়ের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারেন, এমন আর্থিক সঙ্গতি তাঁহাদের নাই। আমাদের পত্রিকাগুলির দারিদ্র্যের আর একটা কারণ, বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জাতি নহে। ওদেশে পত্রিকাগুলির প্রধান নির্ভর বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন দিবার লোকেরই অভাব। কাজেই, অধিকাংশ লেখকের পক্ষে লেখাটা, চিত্তবিনোদনের ও অবসর কাটাইবার উপায় মাত্র। এরূপ অবস্থায় বেশীরভাগ লেখার পশ্চাতে সাধনা থাকে না।

কবিতা ও গল্পের উৎকর্ষের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যের কথা বলা হইল, সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ আলোচনাদি সম্বন্ধে তাহা আরও শোচনীয়ভাবে সত্য। শিক্ষাপ্রদ, তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত প্রবন্ধের নিতান্তই অভাব। যে সকল পত্রিকায় প্রথম শ্রেণীর গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই অসার, গতানুগতিক, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যহীন; মানবকে নূতন চিন্তা বা কোনও কঠিন সমস্যার কোনও নবতন সমাধানের ইঙ্গিত দিতে অক্ষম। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ যশস্বী এবং খ্যাতিমান লেখকের লেখা একান্ত বিরল। ২।১টি প্রবন্ধ ব্যতীত সব প্রবন্ধই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। কাব্য ও কথা-সাহিত্যের আলোচনার সময়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, প্রবন্ধ ও আলোচনাসাহিত্যের ক্ষীণতা সম্পর্কেও সে সকল কথা সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু, এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথাও রহিয়াছে।

যে বিষয়েই কিছু বলা যাক, সেই উক্তির পশ্চাতে যদি গভীর পাণ্ডিত্য, দেশকাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না থাকে, তবে, তাহা কখনও মূল্যবান হইতে পারে না অথবা পাঠকের চিত্তাকর্ষণেও সমর্থ হয় না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষে, আমাদের চিন্তাশীলতা, গভীর জ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা প্রভৃতি গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না। এই জন্য, জাতীয় জীবনে আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রটা অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর হইয়া রহিয়াছে। অন্যপক্ষে আবার প্রবন্ধ লেখকের বুদ্ধি এবং বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের শক্তির উপর, প্রবন্ধের উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিলেও, ইহা বিশেষভাবে অনুশীলন-মাজ্জিত বিদ্যা সাপেক্ষ। আমাদের বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও অনেকেরই এই অনুশীলনের সুযোগ নাই। কাজেই, অবসর বা সুবিধামত গল্প বা কবিতা লেখা যদিও বা সম্ভব হয়, ভাল প্রবন্ধ লেখা কখনই সম্ভব নহে।

আমাদের লেখক সমাজের মধ্যে, যাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ পান, সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতি কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার, যাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে, তাঁহারা নিতান্তই সংখ্যান্যূন। ইঁহারাও সকলেই আবার মাতৃভাষার সেবক নহেন। বাধ্য হইয়া অনেককেই বক্তব্য বিষয় সমূহ ইংরাজীতে লিখিতে হয়। ইহার একটা প্রধান কারণ, লেখকের স্বতঃই ইচ্ছা হয় যে, বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোককে শুনাইবেন এবং রসজ্ঞ পাঠকের নিকট নিবেদন জানাইবেন। কিন্তু, প্রথমতঃ বাঙ্গালী পাঠকের মোট সংখ্যাই কম। তাহার পর শিক্ষার যে ত্রুটির জন্য ভাল লেখকের সংখ্যা কম, সেই একই কারণে বিদ্বান পাঠকের সংখ্যা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। চিন্তা-উদ্দীপক গভীর বিষয়ের পাঠক জোটা ভার।

অন্যদিকে, কোনও উৎকৃষ্ট জিনিস কিছু লেখা হইলে, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য, বাহিরে যাচাই আবশ্যক। বাঙ্গালী বিদ্বান সমাজের মর্য্যাদা বা মতামতের মূল্য বিদেশে এখনও এত অধিক হয় নাই যে, তাহাদের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া, বিদেশীরা কোনও জিনিসকে মূল্য দিতে রাজী হইবে। আমাদেরও জাতীয় চরিত্রে আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মর্য্যাদাবোধের যথেষ্ট অভাব আছে এবং মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িলেও, এখনও ইহার সহিত এতখানি কৃপামিশ্রিত আছে যে, একমাত্র ইংরাজী লেখা বা বলাকেই, আজও আমরা বিদ্যার নিদর্শন বলিয়া মনে করি। বাংলায় লিখিত বিষয়ের মধ্যে যে গভীর পাণ্ডিত্য বা মূল্যবান সারবস্তু থাকিতে পারে, আমাদের শিক্ষিত পাঠক সমাজের এমন ধারণা নাই। বাংলায় লিখিত অধিকাংশ জিনিসই উৎকৃষ্ট না হওয়াও অবশ্য এরূপ ধারণা হইবার অন্যতম কারণ। অনেক সময় আবার আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। যে সকল লেখক বা গ্রন্থকর্ত্তা, ইংরাজী ভাষায় সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ আলোচনা, পরিমিত মাপাজোঁকা কথায় যৌক্তিকতার সহিত করেন, তাহারাই বাংলা লিখিবার সময় এই আভিজাত্য রক্ষা করেন না। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী পাঠকের অপকৃষ্ট শিক্ষার কথা মনে করিয়া, তাঁহাদের বুঝিবার মত করিয়া লিখিবার চেষ্টায়, এই সকল লেখক, তাঁহাদের দুই ভাষার লেখার মধ্যে এই প্রকারের পার্থক্য রক্ষা করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, এই সকল কারণে, যাঁহারা ভাল কিছু লিখিবার ইচ্ছা বা আশা রাখেন, অনাদৃত হইবার ভয়ে তাঁহারা বাংলায় লিখিতে চাহেন না।

আরও একটা কথা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরাজীতে পরিচালিত হয় বলিয়া আমাদের সকল শিক্ষিত লোকই ইংরাজী জানেন। ইংরাজীর তথ্যমূলক পুস্তক, আলোচনাদির সহিত বংলার সমশ্রেণী লেখার, কি উৎকর্ষে, কি পরিমাণে, কোনও তুলনাই চলে না। ইংরাজীতে সর্ব্ব-বিষয়ক উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের সংখ্যা অগণ্য। তাহার পত্রিকাগুলিও এই প্রকার প্রবন্ধসম্ভারে সজ্জিত থাকে। এই সকল কারণে রস-সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনও বিষয় পড়িবার প্রয়োজন হইলে, ইংরাজী-জানা পাঠক ইংরাজীতেই পড়েন। লেখকেরাও এই কারণেই, তাঁহাদের ভাল লেখা-গুলি ইংরাজীতে লিখিতে চাহেন।

ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকদের অধিকাংশক্ষেত্রে মনের দাবী স্বল্প, এবং স্বল্প বলিয়াই সম্ভবতঃ পত্রিকা পরিচালকেরা এ বিষয়ে কতকটা উদাসীন হইতে পারেন। আমাদের শিক্ষিতেরা মানসিক পুষ্টির জন্য কতক পরিমাণেও যদি বাংলার উপর নির্ভর করিতেন, তবে, অবস্থা সম্ভবতঃ অন্য প্রকার হইত। ভাল খাদ্যের গুণে, ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক-দেরও মানসিক ক্ষুধা বাড়িয়া যাইত এবং তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইত।

এই সকল নানাকারণে, ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত

ইংরাজী পত্রিকাগুলিও, বাংলা পত্রিকা হইতে উৎকৃষ্টতর। ইংরাজী-শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির অতিসৌভাগ্যের কথা না বলাই ভাল।

আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য কতকটা অপকৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ, এদেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছাড়িবার সাথে সাথেই বিদ্যাচর্চ্চাও শেষ হয়। এক অধ্যাপনা এবং সংবাদপত্র পরিচালন ব্যতীত জ্ঞানচর্চ্চার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত থাকিবার অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালীরা বিদ্যানুযায়ী এমন উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত হন না, যেখানে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা বা উদ্ভাবনীশক্তি উপযুক্ত এবং অনুকূল প্রয়োগক্ষেত্র পাইতে পারে। আমাদের হাতে এমন কল-কারখানা বা ব্যবসা বাণিজ্য নাই, গবেষণার এমন বিস্তৃত সুযোগ নাই, যেখানে আমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিশীলন হইতে পারে। আমরা পরাধীন বলিয়া, দেশের রাষ্ট্রনীতিক দায়িত্ব অথবা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা সামরিক বিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ আমাদের নাই। অন্য কোনও স্বাধীন দেশের সহিতও আমাদের এ সকল বিষয়ে কারবার করিতে হয় না। এজন্য আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা অভিজ্ঞতাপুষ্ট হইয়া কখনও স্বকীয় হইয়া উঠিতে না পারায়, চিরদিনই অগভীর থাকিয়া যায়। কাজেই, বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধলেখক একান্তই দুর্লভ। আমাদের জাতীয় জীবনের বহু প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বন্ধে এই জন্য বিশেষ কোনও ভাল লেখা কদাচিৎ দেখা যায়। আমাদের আর্থিক অবস্থার স্বরূপ কি, আমাদের আর্থিক দুর্গতির আপাতদৃষ্ট কারণগুলির পশ্চাতে কোনও জটিল কারণ আছে কি না, বিদেশীরা বাংলায় অন্ন করিয়া খাইতেছে, অথচ, বাংলার কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মিস্ত্রী, তাঁতি, চাষী, মজুর প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমিকেরা না খাইয়া মরিতেছে; বাঙ্গালীর এই উদ্যমহীনতার পশ্চাতে কুলসংক্রমিত কোনও দুর্ব্বলতা আছে কিনা; বর্দ্ধনশীল মুসলমানের পাশে হিন্দু কেন ক্ষয় পাইতেছে; বাঙ্গালী চাষীদের কতকগুলি সম্প্রদায়ের আকৃতি দীর্ঘ ও বীরোচিত, শরীর পেশীবহুল ও বলিষ্ঠ, আবার তাঁহাদেরই পাশে সমব্যবসায়ী অপর কতকগুলি সম্প্রদায় ক্ষীণজীবী, ভীরু প্রকৃতির এবং ক্ষয়িষ্ণু কেন; দেশের নদীগুলি কেন মরিয়া যাইতেছে; ম্যালেরিয়া ধ্বংসের কি কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা যায়; বাংলার গোজাতির অবনতির কারণ ও প্রতীকার কি প্রভৃতি সংখ্যাতীত সমস্যা যে আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ শঙ্কাজনকভাবে দেখা দিয়াছে, আমাদের সাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা উল্টাইলে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা কিছু অল্প লেখা, এ সকল বিষয় সম্বন্ধে বাহির হয়, তাহারও অধিকাংশ উচ্ছ্বাস-পূর্ণ, শুধুমাত্র লেখকের হৃদয়ের বেদনার পরিচায়ক; পাণ্ডিত্য, গবেষণা বিজ্ঞান অথবা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

রাজনীতি আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের প্রধান চর্চ্চার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, এ বিষয়ে আমাদের পাঠক সাধারণের জ্ঞান যে খুব গভীর, তাহা বলা যায় না। একটা দেশের শাসনযন্ত্র কি ভাবে পরিচালিত হয়; আমলা-তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের পার্থক্য কোথায়; আমাদের নেতারা স্বরাজ বলিতে কি বুঝিতেছেন, অন্যান্য দেশের শাসনপদ্ধতি কি কি প্রকারের এবং তাহার ফলে, ঐ সকল দেশের কি কি সুবিধা, অসুবিধা হইয়াছে; আমাদের দেশে কি প্রকারে শাসনপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়েরও বিশদ আলোচনা কদাচিৎ হয়। আমাদের মুদ্রা-বিনিময়-নীতি সহসা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ব্যাপারটা অধিকাংশ লোকেই তলাইয়া বুঝিতে পারিল না। দৈনিক কাগজগুলি বড় বড় অক্ষরে ইহার সংবাদ বাহির করিল, অর্থনীতি বিশারদ দিগের মতামতও পাঠকদের জানাইল এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বা টিপ্পনি করিয়াই ক্ষান্ত দিল। আমাদের দেশের মুদ্রানীতির ইতিহাস, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমাদের সুবিধা অসুবিধা এবং তাহার প্রত্যাশিত পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা মাসিকগুলিতে বাহির হইবে, লোকে এরূপ আশা করিয়াছিল। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন অভিজ্ঞ লেখক নানাদিক দিয়া ইহার আলোচনা করিলে, পাঠকেরা এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে বাংলায় কোনও উল্লেখযোগ্য পুস্তক বা পুস্তিকা লেখা হইয়াছে বলিয়াও শুনি নাই।

বিদেশেরও জ্ঞাতব্য, শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা সম্বন্ধে আমরা বরাবর অজ্ঞ থাকিয়া যাই। রাশিয়া, মানবের অধুনা পর্য্যন্ত জ্ঞাত ও পরীক্ষিত সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে।

অথচ, সে সম্বন্ধে বাংলায় যেটুকু আলোচনা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। সংস্কার, আচার এবং পৌরোহিত্য জর্জ্জরিত ধর্ম্মান্ধ তুরস্ক কি করিয়া সমস্ত আবর্জ্জনা একদিনে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, তাহার আলোচনায় আমাদের, বিশেষ করিয়া, এদেশের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের উপকার হইতে পারিত। আমাদের ঘরের কাছে চীন জাপানে বিবাদ বাধিয়া উঠিল এবং সে সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গেরও যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু, এই উভয় দেশের সর্ব্ববিধ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় অল্পই। বিবাদের দূর এবং নিকট কারণ; ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও গুরুত্ব; কোন্ পক্ষের জয়-পরাজয়ের কি ফল হইতে পারে; আমাদের উপর তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও আলোচনা আমাদের পত্রিকাগুলিতে হইল না। এ সব সম্বন্ধে বাংলায় এমন কোনও বইও নাই, যাহা পড়িয়া ইংরাজী না-জানা বাঙ্গালী পাঠকেরা প্রয়োজনানুরূপ জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন।

প্রবন্ধ লেখককে, সকল সময়েই পাঠকের কথা, লিখিত বিষয়ে সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা এবং ঐ ধরণের অন্যান্য আলোচনার কথা মনে রাখিতে হয়। দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রভৃতি কোনও বিষয়েই বাংলায় ধারাবাহিক ভাল বই নাই বা থাকিলেও, একান্তই বিরল। বাঙ্গালী পাঠক সমাজেও এসম্বন্ধে এজন্য জ্ঞান খুবই কম। কাজেই, এ সকল বিষয়ের কোনওটি সম্বন্ধে লেখক যখন কিছু লিখিতে যান, তখন তাঁহাকে একেবারে প্রাথমিক কথা লইয়াই আলোচনা করিতে হয়। ছেলেদের পত্রিকায় যে সকল লেখার স্থান হওয়া উচিৎ, বাধ্য হইয়া সেগুলিকে আমাদের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় স্থান দিতে হয়। অনেক স্থলে লেখাগুলি এতই নিকৃষ্ট হয় যে, মনে হইতে পারে, তাহা কোনও ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। হয়ত, লেখা উচ্চস্তরের হইলে, সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য হইত এবং এমন বাংলা বইও, তাঁহারা পাইতেন না, যাহা পড়িয়া একটু উঁচু দরণের লেখা বুঝিবার মত প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেন।

সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক লেখা মাসিক পত্রিকাগুলিতে বাহির হয়। ইহার মধ্যে ২।১টি আলোচনায় রসজ্ঞতার এবং লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় থাকিলেও, অধিকাংশ লেখা পড়িয়া মনে হয়, লেখকের বলিবার মত স্পষ্ট কোনও মতামত নাই। অনেকটা যেন লিখিবার তাগিদেই লিখিতেছেন। আলোচ্য লেখার উৎকর্ষ, সৌন্দর্য্য এবং রস পাঠককে বুঝাইবার অথবা তাহার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার চেষ্টা তেমন থাকে না। কবিতা আলোচনায় অনেক সময় দেখা যায়, আলোচ্য কবিতাটি হইতেই প্যারার পর প্যারা উদ্ধৃত করা হইতেছে, কিন্তু, এমন কোনও মন্তব্য করা হইতেছে না, বা এমন ভূমিকা দেওয়া হইতেছে না, যাহাতে পাঠকের পক্ষে কবিতাটি বুঝিবার বা তাহার রসগ্রহণ করিবার সুবিধা হইতে পারে। যখন কোনও কবিতা বা তাহার কোনও একটু সুর কোনও পাঠকচিত্তকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে এবং তিনি তাঁহার এই উপলব্ধিকে লোকসমক্ষে ধরিতে চান, অথবা যদি কেহ মনে করেন, কোনও কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সাধারণের নিকট ততটা স্পষ্ট নহে এবং তিনি সেই ভাবটিকে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে পারেন; অথবা কেহ কোনও কবিতাকে নূতন চোখে দেখিয়া তাহার নূতন ব্যাখ্যাদান করিতে চান, তাহা হইলেই আলোচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়। অধিকাংশ লেখায়, কিন্তু এই সকল গুণ দৃষ্ট হয় না।

লেখকের নিজস্ব মতামতের অভাব, শুধু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্য্যাদাবোধের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে, আমরা সাহস করিয়া সহসা কোনও জিনিসকে ভাল বা মন্দ বলিতে পারি না। অনেক সময় যাহা বলি, তাহার পশ্চাতে বিচারপ্রসূত নিরপেক্ষ মত অপেক্ষা, উচ্ছ্বাসের পরিমাণই অধিক থাকে। অধিকাংশক্ষেত্রে লেখকেরা দেশী বা বিদেশী পণ্ডিতগণের লেখা হইতে উপযোগী কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া, তাহারই মাপে আলোচ্য বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চা'ন। এরূপ করা যে, সব সময়েই দোষের তাহা নহে, এবং অনেকস্থলেই লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কিন্তু, লেখা চিত্তাকর্ষক হইবার পক্ষে, লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকা একান্তই প্রয়োজন। শুধুমাত্র প্রাচীন বা সমসাময়িক পণ্ডিতদের মতামত দিয়া কোনও বিষয়ের বিচার করিলে

বা অন্য লোকের দৃষ্টি দিয়া কোনও জিনিস দেখিলেই চলিবে না। পাঠকেরা লেখকদের নিকট হইতে যুক্তিগর্ভ সিদ্ধান্ত, নূতন ব্যাখ্যা এবং বিচারের নূতন মাপকাঠি প্রত্যাশা করেন।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের ইতিহাসের অনেক প্রধান ঘটনা আজও সম্পূর্ণ এবং সঠিকভাবে জানা যায় নাই। অনেক ঘটনা, বিদেশী ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিকৃত ভাবে লেখা হইয়াছে। জাতীয় উন্নতির জন্য, অতীত গৌরব কাহিনীর দ্বারা জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য, অতীতে যে সকল ভুল ক্রটি হইয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহা এড়াইয়া চলিবার জন্য, আমাদের অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের উদ্ধারসাধন নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিক আলোচনা পড়িবার বা বুঝিবার জন্য, পাঠকেরও পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের বিশেষ দরকার হয় না। এই কারণে পাঠকসমাজে ঐতিহাসিক আলোচনা সমাদৃত হয়; এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই, সব সময় মৌলিক না হইলেও অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক আলোচনা আমাদের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বাহিরও হয়। কিন্তু, আমাদের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতার কথা মনে করিলে, বলিতে হয়, এই সব আলোচনা আরও ধারাবাহিক, পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত এবং উদ্দেশ্যমূলক হওয়া আবশ্যক।

ভ্রমণ এবং নানাদেশ বিদেশের কাহিনী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। বাঙ্গালীর দেশ বিদেশে ভ্রমণ নিতান্তই অল্প। কারণ, বাঙ্গালীর বাণিজ্য নাই, সাম্রাজ্য নাই, ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠান নাই, ঔপনিবেশিক ঝোঁক নাই। দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহ নাই বলিয়া, সভ্য-মানুষের অজানা বা স্বল্প-জানা দুর্গম এবং অসভ্যজাতিগণ অধ্যুষিত ভূভাগে আমাদের গমনাগমন একেবারেই নাই। কাজেই, আমাদের সাহিত্যের এই দিকটা নিতান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অল্প স্বল্প ভ্রমণ-কাহিনী যাহা বাহির হয়, অথবা অন্যান্য দেশের বা জাতির যে সব বিবরণ নানা প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ইংরাজী বই বা পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হয়, তাহাও অনেক সময় লিখিবার দোষে চিত্তাকর্ষক হয় না।

মানুষের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। আমরা যখন অন্যদেশ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই, তখন শুধুমাত্র সেই দেশের ইতিহাস, রীতি নীতি, দ্রষ্টব্যস্থান প্রভৃতির বিবরণেই আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না। আমরা সেই সকল দেশের লোকের অন্তরের পরিচয় চাই। এই পরিচয় কোনও বর্ণনা বা কাহিনীর মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। এই সকল দেশের লোকের সহিত লেখক যে সকল ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসেন, তাহারই নানা ঘটনা এবং সেই সময়ের নানা ছোট খাট কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহাতেই কথিত জাতির বুদ্ধি, শিক্ষা, মনের ঝোঁক, সর্ব্বোপরি তাহাদের মানব-হৃদয়টি আমাদের নিকট বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এমন কাহিনী বাংলায় বিরল।

অন্য জাতির বিবরণে, তাহাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, পুষ্টি, বাঙ্গালীর শরীরের সহিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কথা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এসকল বিষয়ে বাঙ্গালীর ঔৎসুক্যই নিতান্ত কম।

আমাদের জাতীয় জীবন আজ নানাদিকে বাধাগ্রস্ত। দুর্গতির ছায়া আমাদের সাহিত্যকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। এই মালিন্য দূর করিতে হইলে, আমাদিগকে অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। বিদেশী এবং ভারতীয় পত্রিকা-গুলি হইতে নানাবিষয়ক ভাল ভাল প্রবন্ধ, আলোচনা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া, অনেকস্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, পাঠকদিগকে একই সঙ্গে শিক্ষা এবং আনন্দদান করা হইবে। ভারতীয় অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলিতে পরিচালিত পত্রিকা হইতে এই প্রকার অনুবাদ দিতে পারিলে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ঐক্যও দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে। সম্ভব হইলে এবং সামর্থ্য থাকিলে, ইউরোপ এবং এসিয়ার প্রধান ভাষাগুলি হইতেও এরূপ অনুবাদের কার্য্য চালান যাইতে পারে। বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থগুলিরও অনুবাদ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য তাহা অধিকতর শ্রম, নিষ্ঠা, এবং প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খল চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু, সাময়িক সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করা মাসিক গুলির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। আমাদের দেড়শত পৃষ্ঠার মাসিক-গুলির কোনও কোনটি, ছোট অক্ষরে মুদ্রিত ১৫।২০ পৃষ্ঠা যদি অনুবাদ বিভাগের জন্য রাখিয়া দেন, তাহা হইলে পাঠকদের বহু জিনিসই তাঁহারা এই অল্প পরিসরের মধ্যে দিতে পারেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাময়িক পত্রিকাগুলি আমাদের ভাব ও পরিশীলন-সম্পদের এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সর্ব্ব প্রধান নিদর্শন; আমাদের গৃহের শিক্ষা ও বাহিরের মর্য্যাদা বৃদ্ধির বিশিষ্ট সহায়, এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে ঐক্যের ধারাকে গ্রথিত ও দৃঢ়তর করিবার অন্যতম প্রধান উপায়। ইহার আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য পাঠক, ক্রেতা লেখক এবং পরিচালক, সকলেরই সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। নিজেদের নিকট, সাহিত্যের নিকট, জাতির ভবিষ্যতের নিকট, আমাদের এই ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। *

সুশীলকুমার বসু।

* পাঞ্জিয়া সারস্বত পরিষদে পঠিত।

দ্বন্দ্ব

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু এম্‌-এ

এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর একটি 'লাইনার' এডেন হইতে আরব সাগর পাড়ি দিয়া বম্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। জাহাজখানা বিলাত হইতে আগত, সেদিন দীর্ঘ যাত্রার শেষ দিন, পরদিন বেলা দশটায় বম্বে পৌছিবে।

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকের উপর রেলিং-এ ভর দিয়া দুইজন ভারতীয় যুবক বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। উভয়েরই পরিধানে খাঁটি ইংলিশ পোষাক। যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার গায়ের রং ফর্সা, ইংলণ্ডে বাস হেতু মুখে গোলাপি আভা দেখা দিয়াছে। তাহার কটা চোখের নীচে নাকটী সোজা, খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। ঠোঁটদুটি অতিশয় পাতলা; সে যখন কথা না বলে তখন দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। অপর যুবকটীর রং ময়লা, তবে ঠিক কালো নয়। তাহার মুখমণ্ডলে সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য করিবার বিষয় গাঢ় বাদামি রংয়ের বড় দুটি চোখ, আলস্য ভরা, যেন একটু বাসনা-মাখা। মুখখানি ভারি কোমল, প্রথম তারুণ্যের স্নিগ্ধতা ভরা, পরিপূর্ণ ক্ষৌরকার্য্যের দরুণ তাহাতে যেন বালকের কচি-কচি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উভয়ের মধ্যে নিভৃত আলাপ চলিতেছিল। তাহাদের চেহারায় না হইলেও উভয়ের ইংরেজী উচ্চারণের ভঙ্গীতে সহজেই ধরা পড়িত যে প্রথমোক্ত যুবকটি পাঞ্জাবী এবং দ্বিতীয়টি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী যুবকটি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল। তাহার ভাবার্থ এই—

পূরব সে তো পূরব ভাই, পশ্চিম পশ্চিম !
দুয়ের মাঝে মিলন, তা'ও কখন হ'তে পারে ?
যাবৎ না এ জমিন আস্‌মান্‌ হারিয়ে ফেলে সব ব্যবধান
দুনিয়ার সে শেষ দিনেতে, খোদার দরবারে। *

পাঞ্জাবী যুবকটি স্মিতমুখে বলিল, "আপনি একথা বিশ্বাস করেন, মিঃ দাস ?"

দাস গম্ভীরভাবে বলিল, "বিশ্বাস করি আবার কেমন, এ বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই তো আমার গত দুই বছরের জীবন গড়ে উঠেচে, মিঃ সিং।"

সিং লণ্ডন হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া আসিয়াছে। তাই সে ভিত্তি কথাটার অতি মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মানে ? আপনি কি বল্‌তে চান আপনি যে পূর্ব্বদেশের লোক একথা বিলাতের সমাজ কখনো ভুল্‌তে পারে নি ? আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরূপ।"

বিলাতে তাহাদের পরিচয় ছিল না, তাহা আরম্ভ হয় জাহাজে উঠিয়া। তাহাও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে পোর্ট সৈয়দ ছাড়াইবার পর। পোর্ট সৈয়দে উভয়ে এক সময়ে তীরে উঠিয়াছিল, তখন নানা কথা বলিতে বলিতে তাহারা আবিষ্কার করিল যে লণ্ডনে দাস যে বাড়ীতে বাস করিত সে যাইবার ছয় মাস পূর্ব্বে সিং-ও সেখানে ছিল। তারপর হইতে উভয়ে সে বাড়ীটার কথা, ল্যাণ্ডল্যাডি মিসেস গিসিং আর তাহার ছেলেপিলের কথা, বিশেষ করিয়া মিসেস গিসিং-এর দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট হাস্যকর ঘটনার কথা উভয়ে পরম কৌতুকের সহিত আলোচনা করিত।

দাস সিং-এর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আমি তা' বল্‌তে চাই নে। আমার বিলাতের অভিজ্ঞতা আমাকে একথা বলে না আমি বিলাতের সমাজের পর, বরং জোর করে বল্‌তে পারি, সে সমাজ আমাকে অতি অন্তরঙ্গ ভাবেই গ্রহণ করেচে।"

সিং বলিয়া উঠিল, "তবে ?"

দাস বলিল, "কিন্তু আমি কখনো ভুলতে পারিনি, আমি পূর্ব্ব দেশের,—ভুল্‌তে পারি নি, যে-পর্য্যন্ত আমি পোষাকে-

* কিপ্লিং।

পরিচ্ছদে, চালচলতিতে, ভাবে-ধারণায় প্রাচ্য থাক্‌ব, সে পর্য্যন্ত পশ্চিমের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থাক্‌বে। আমি যদি পশ্চিমের সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকি, তবে তার কারণ এই, আমি নিজের মধ্যে প্রাচ্য যা কিছু তা' ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে পাশ্চাত্য হ'তে চেষ্টা করেচি।"

দাস খুব প্রাণের সহিত কথাগুলি বলিতেছিল, কিন্তু সিং নেহাৎই হাল্কাভাবে বলিয়া ফেলিল, "তা' হ'লে আপনাকে খুবই মেহানৎ করতে হয়েচে, মিঃ দাস। আমার দ্বারা কিন্তু ওসব হ'য়ে ওঠেনি। এখন পর্য্যন্ত টেবল্ ম্যানার্সে দত্তসাহেবের ছোট্ট মেয়ে নরনার কাছে আমার হার মান্‌তে হয়। আর ওসব শিখেই বা কি লাভ, দুদিন পরে তো দেশে ফিরে যেতে হ'বেই।"

দাস পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গম্ভীরভাবে বলিল, "মিঃ সিং, আমি দেশে ফিরে যাচ্চি বটে, কিন্তু আমার মন ঐ সুদূর ইংলণ্ডের উপকূলে পড়ে আছে। যদি আমার বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করে না দিতেন, অথবা যদি ওখানে ব্যারিষ্টারিতে পসার করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাক্‌ত, তবে কোনোদিন পশ্চিম ছেড়ে' পূবে ফিরে যেতাম না।"

সিং হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌চি ইংলণ্ড আপনাকে ভয়ানক রকম মুগ্ধ করে ফেলেচে।" তারপর তাহার তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে কি শুধু ইংলণ্ড, না মিস্ ইংলণ্ড?"

বিষয়টা উপহাসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া দাস একটু ক্ষুণ্ণ হইল। সিংএর প্রশ্নের উত্তরে শুধু মৃদু হাসিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া সিং বলিতে লাগিল, "আচ্ছা মিঃ দাস, আপনি পূর্ব্ব পশ্চিমে যে মিল হ'বে না কবিতার সে লাইনই বল্‌লেন, কিন্তু তারপরে যা' আছে, তা' তো বল্‌লেন না।" বলিয়া পরের লাইনের চার পাচটা শব্দ আবৃত্তি করিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল।

তখন দাস তাহার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া পরের লাইন কয়টা আবৃত্তি করিল।

কিন্তু কোথায় থাকে বল পূরব ও পশ্চিম,
কোথায় থাকে জাত, কুল, সীমানা,
যেথায় দুজন সবল পুরুষ দাঁড়ায় মুখোমুখি,
হোক দুনিয়ার দুধারে ঠিকানা।

সিং বলিল, "এ তো অতি সহজ কথা, সকলেই মেনে নেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় আর একটা সত্য আছে যা' কবির চোখে ঠেকেনি।"

দাস বলিল, "কি সে সত্য?"

সিং দাসের কথাগুলিকেই ঈষৎ বদলাইয়া আবৃত্তি করিয়া গেল :—

কিন্তু কোথায় থাকে বল পূরব ও পশ্চিম,
কোথায় থাকে জাত কুল সীমানা,
যেথায় তরুণ পুরুষ দাঁড়ায় তরুণ নারীর পাশে,
হোক দুনিয়ার দুধারে ঠিকানা।

দাস বলিল, "এটা আপনার শুধু মত, না নিজ অভিজ্ঞতার থেকে বলচেন?"

সিং বলিল, "মিঃ দাস, আপনি ব্যারিষ্টার মানুষ, ভেবে চিন্তে, অথবা বই ঘেঁটে মত ব্যক্ত করে থাকেন; কিন্তু আমি প্র্যাক্‌টিকাল লোক, নিজ অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো কথা বলিনে।"

দাস বিস্মিত হইয়া সিংএর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা' হ'লে আপনার ভিতরও রোমান্স আছে। তা' কিন্তু শোনাতে হ'বে, মিঃ সিং, যদিও সময় বেশি নেই।"

সিং হাতের ঘড়ি দেখিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল, "মিঃ দাস, আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমরা ভারতবর্ষে পৌছব।" তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া গানের সুরে বলিয়া উঠিল,

'মেরে সোনেকা হিন্দুস্থান।'

বলিতে বলিতে বিহ্বল ভাবে পূর্ব্বদিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর সিং পূর্ব্বকথা ভুলিয়া বলিতে লাগিল, "মিঃ দাস, উর্দ্দু কি মিষ্টি ভাষা, এর কাছে ইংরেজী ফরাসী লাগে না। কি বলেন? আপনাদের বাংলা ভাষা কেমন জানি নে।"

দাস বলিল, "নিজের ভাষাকে সকলেই সব চেয়ে মিষ্টি মনে করে। তবে আমার সম্বন্ধে যদি বলি, তবে একথা নিশ্চয়ই বল্‌তে হ'বে যে আমি ইংরেজীকেই ভালো বেসেচি, এবং ইংরেজী ভাষাকেই নিজ ভাষা করবার ইচ্ছা রাখি।"

সিং সহাস্তমুখে বলিল, 'তা' খুব ঠিক হ'ত যদি সঙ্গে করে একটি ইংরেজ স্ত্রী নিয়ে আস্‌তেন। আপনার ও চোস্ত ইংরেজীর মর্ম্মগ্রহণ করবে কে? আপনি কি মনে করেন এ ভারতবর্ষে ইংরেজেরা আপনার সঙ্গে কখনো মিশ্‌তে আস্‌বে? আমাদের লাহোরে তো আসবে না, আপনাদের কল্‌কাতার কথা বল্‌তে পারি নে।"

দাস ধীরে ধীরে বলিল, "দেখুন, ভারতবর্ষের সীমাই আমার জীবনের পরিধি নয়, আর ভারতবর্ষে যে ইংরেজ বাস করে তারাই একমাত্র ইংরেজ নয়। যে ভাবেই হোক্ আমার জীবনের ধারা একটু বিস্তৃত হ'য়ে বইতে আরম্ভ করেচে।"

সিং উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আপনি একজন ইণ্টারন্যাশন্যালিষ্ট,—বিশ্ব-প্রেমিক?"

দাস বলিল, "তা' বল্‌লে অনেক বেশি বলা হয়। মোট কথা, প্রাচীর সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি নেই। আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্চি, কিন্তু সেখানে আমাকে বিদেশীর মত বাস করতে হ'বে। ভারতবর্ষ কখনো আমার অন্তরাত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। হ্যাঁ পারত, যদি ভারতবর্ষ তুর্কীর মত পাশ্চাত্য হ'য়ে যেত।"

বিকালে চায়ের পর আবার দুজনে ডেকের উপর পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া ধূমপানে ও আলাপে মগ্ন হইল। প্রথম শ্রেণীতে ভারতীয়ের, বিশেষতঃ যুবকের, সংখ্যা খুব কম, তাই সে আলাপের কোনও ব্যাঘাত জন্মিল না।

দাস বলিতেছিল, "মিঃ সিং, এবার আপনার নারী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা কি বলুন।"

সিং হাসিয়া বলিল, "মিঃ দাস, কে বলেচে আপনাকে আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটা? একটা ঘটনা হ'তে generalise করা (সমস্ত সম্বন্ধে মত গঠন করা) যে কত বড় অন্যায় তা' আপনি জানেন না?"

দাস বলিল, "ঠাট্টা রেখে দিন। আসল কথা যা' তা' সত্যি করে বলুন। তবে আমি কথা দিচ্চি, আপনার কথা শেষ হ'লে আমিও আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবো। তা' হ'লে আপনার আর আপত্তির কারণ থাক্‌বে না।"

সিং আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া বলিল, "ওহো! তাইত! আপনারও অভিজ্ঞতা আছে! আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম, ইংলণ্ডের জমিন আস্‌মানে আর একটা তরুণ হৃদয়কে ওরকম করে মুগ্ধ করতে পারে না, তা'তে নিশ্চয়ই একটা তরুণীর যোগ থাক্‌বে! বলুন, আপনার কথাই প্রথম বলুন।"

দাস লজ্জিতভাবে মাথা নোয়াইল। সিং উৎসাহ দিয়া বলিল, "তা' হ'লে মিস্ ইংলণ্ডই আপনাকে ওরকম ভাবে আকৃষ্ট করেচে?"

দাস একটু অপ্রতিভভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আপনি ঠিকই বলেচেন, মিঃ সিং! এত ঠিক যা' হয়ত কল্পনা করতে পার্চ্ছেন না।" তার পর একটু উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল, "আপনার 'মিস্ ইংলণ্ড' কথাটা অতি সুন্দর ভাবে বিষয়টাকে প্রকাশ করে। বল্‌তে কি, মিঃ সিং, একটা প্রেমময়ী ইংরেজ তরুণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত ইংলণ্ড আমার কাছে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে রয়েচে। তা'কে ভালোবেসেচি বলেই আমি ইংলণ্ডকে ভালোবাসি।"

সিং আনন্দিত হইয়া বলিল, "কি দুঃখের কথা, এমন চমৎকার রোমান্স থেকে এতদিন এক জাহাজে চলেও বঞ্চিত রয়েচি!" তারপর বলিল, "আরম্ভটা কিরূপে হ'ল বলুন, এ নিশ্চয়ই Love at first sight—দৃষ্টিমাত্রে প্রেম; I came, I saw, I conquered,—আসা, দেখা, তারপর জয় করা, নয় কি?—কিন্তু আগে বলুন বিষয়টা ট্রাজেডি হ'য়ে দাঁড়ায় নি তো? তা' হ'লে আমি শুনব না। ওসব ট্রাজেডি আমার ধাতে সয় না।"

সিংএর প্রশ্নের পর প্রশ্নে দাস একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ট্রাজেডি হয় নি। আমি বড় আশা নিয়েই ইংলণ্ড ছেড়ে এসেচি।"

সিং বলিল, "ব্যস্, তবে আর কথা কি? এখন বল্‌তে আরম্ভ করুন্।"

সে প্রেমের কাহিনী কোথা হইতে আরম্ভ করিবে দাস তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

সিং তাহার ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা প্রথম বলুন, সে খাঁটি ইংলিশ,—না স্কচ্ না ওয়েল্‌স্ না আইরিশ?"

দাস মৃদু হাসিয়া একটু গর্ব্বভরে বলিল, "সে খাঁটি ইংরেজ।"

সিং বলিল, "খাঁটি ইংরেজ,—বেশ। তবে লণ্ডন-বাসিনী, না পাড়াগেঁয়ে?"

"লণ্ডনবাসিনী।"

"বটে? আচ্ছা, আপনার কাহিনী এবার সুরু করুন্।"

দাস একটু আবেগের সহিত বলিল, "সে ভারতবর্ষকে ভালোবাসে।"

দাস তখন ভাবরাজ্যে ছিল। ধীরে ধীরে সে বলিয়া গেল, "মিঃ সিং, প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা হয় একটা সামাজিক সম্মিলনে।"

সিং বলিল, "তারপর?"

"সে ক্ষণেকের পরিচয়। তারপর দুজনে একদিন এক বাসে করে শহরে যাই। আর একদিন টিউবে এক ট্রেনে পাড়ায় ফিরি। তারপর"—বলিয়া দাস একটু বেশী ধীরে বলিল,—"তার সঙ্গে দেখা হয় কেনসিংটন গার্ডেনে।"

"তা' নিশ্চয়ই by appointment (পূর্ব্বে ঠিক করে) হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোবাসাকে প্রথম নিবেদন করলে, সে না আপনি?"

দাস হাসিয়া বলিল, "সে ভালোবাসা নিবেদন করে নি, তবে আমাকে দিয়ে করিয়েচে।" তারপর আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে যে কি রকম তা' আমি আপনাকে ভাষা দিয়ে বলে উঠ্‌তে পারব না। যাকে বলে eternal feminine চিরন্তনী নারী। কেমন প্রহেলিকা-পূর্ণ। সে চিরকালই আমার কাছে একটা গভীর রহস্য হ'য়ে থাক্‌বে।"

সিং হাসিয়া বলিল, "তার কারণ আপনি একজন মস্ত কবি, নয় কি?"

দাস বলিতে লাগিল, "তার সঙ্গে আমার ভালোবাসা গভীর হয়ে ওঠে যখন দুজনে মিলে week endএ (সপ্তাহ-শেষে) countryতে (গ্রামে) বেড়াতে যাই।"

সিং কৌতূহলী হইয়া বলিল, "বলুন্, বলুন্, কোথায় গিয়েছিলেন—স্কট্‌ল্যাণ্ডে, ওয়েলস্, কেণ্ট?"

দাস বলিল, "ইয়র্কশেয়রে। রেল ষ্টেশন ছেড়ে' অনেক দূরে। ছোট একটি ঝরণা আমাদের পেরিয়ে যেতে হয়েছিল,—পায়ে হেঁটে। How funny!"

"বটে? বটে? দুজনেই একেবারে পার হ'লেন বুঝি? জুতা খুল্‌তে হয়েছিল?"

"আমি জুতা খুলেছিলাম বৈ কি! তবে তা'কে, মানে—"

"তার নাম না-ই বল্‌লেন। এ গল্পের জন্যে না হয় একটা নামকরণ করে ফেলুন্।"

দাস একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা তা'কে বল্‌ব সাইকি (Psyche)।"

"আপনি তো দেখ্‌চি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, মিঃ দাস! তারপর কি হ'ল বলুন।"

"সে—সাইকি—অমন সেজেগুজে গেছে, তার জুতা খোলাটা কত বড় ক্লেশের ব্যাপার—"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা'তে করে আপনার Chivalry র-ও পরীক্ষা হ'ল, নয় কি?"

"হ্যাঁ। আমি তা'কে দু'হাতে করে বয়ে নিলাম। সাইকি বল্লে, এমন সুন্দর দৃশ্যটা বৃথা যাবে, কি আফ্‌শোষ!"

"বৃথা যাবে মানে?"

"আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, কিন্তু ফোটো তুল্‌বার লোক ছিল না। একটু এগিয়ে একটা ছেলেকে পাওয়া গেল, সে মাঠের ওপরে কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে, ক্যামেরাটা ঠিকমত বসিয়ে, কি করে সুতো টান্‌তে হয় শিখিয়ে দিলাম। তারপর আমরা জলে গেলাম, তাকে ইসারা করাতে সে সুতো টান্‌ল। কিন্তু একটা প্লেটের ওপর নির্ভর করা চলে না, তাই তাকে দিয়ে আবার ফোটো নেওয়ালাম। সাইকিকে নিয়ে আমার চারবার আসা যাওয়া করতে হ'ল।"

"দুবার যে হ'ল, চারবার কেন?"

"প্রথম তো অমনি গিয়ে ফিরে এলাম। তারপর দুবার ফোটো তোলা হ'ল। তারপর ক্যামেরা আন্‌তে গেলাম।"

"ক্যামেরা তো আপনি একাও আন্‌তে পারতেন?"

"সাইকি বল্লে, সে হাতে করে নেবে। ছেলেটা ছ' পেনি পেয়েই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।"

"তা' তো হ'বেই, তারপর?"

"তারপর সবুজ ঘাসে ভরা একটা টিলার একপাশে গিয়ে

বস্‌লাম। দু'জনে মিলে কত কথা হ'ল।—তখনি আমি তার কাছে আমার প্রেম নিবেদন করি।"

"সে নিশ্চয়ই তা' গ্রহণ করলে।"

"হ্যাঁ। তবে বল্‌লে বাবাকে, মাকে জিজ্ঞেস করতে হ'বে। ছেলে-মানুষ কিনা!"

সিং হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তা'রপর বিয়েটা বাদ রইল কেন? না গোপনে হ'য়েচে?"

"প্রাণের গোপনে হয়েচে বৈ কি! সে ছাড়া এ জগতে আমার ভালবাসা আর কোনো নারী পাবে না। আর আমি জানি, আমি ছাড়াও তার হৃদয়ে অপর কোনও পুরুষের স্থান হ'বে না।"

সিং আবার হাসিল। তাহার শ্যেন-নাসিকাটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সে বলিল, "আপনি ভারি স্বার্থপর লোক, মিঃ দাস।"

"কেন?"

"আপনার ইচ্ছা সে সেই একটি লোকের স্মৃতি নিয়ে বছরের পর বছর বসে থাক্‌বে, কখন ভারতবর্ষ হ'তে ডাক আস্‌বে, সে আশায়?"

দাস বলিল, "যদি থাকে?"

সিং বক্রভাবে হাসিয়া বলিল, "সে নিশ্চয়ই আস্‌বার সময় আপনাকে see-off করতে এসেছিল?"

"আপনি ঠিকই ভেবেছেন। তাইতো বল্‌ছিলাম, আমার কাছে ইংলণ্ডের স্মৃতি মানে ঐ সুন্দরী তরুণীর কোমল ব্যথা-স্নিগ্ধ চাহনিটি! আজ এমা,—I am sorry—সাইকি ইংলণ্ড, ইংলণ্ড সাইকি।"

"এমা?" বলিয়া সিং চোক তুলিয়া চাহিল।

দাস মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভুল হয়েচে সাইকি!"

রাত্রি আহারের পর দাস স্যুটকেস খুলিয়া অতি সযত্নে রক্ষিত কয়েকখানা ফোটো বাহির করিল এবং সেগুলির মধ্য হইতে একখানা ছবি বাছিয়া তুলিল। সেই ছবিখানা তাহাতে সে নালার জলের মধ্যে দুই বাহুর উপর এক ইংরেজ তরুণীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের মুখে আনন্দের দীপ্তি। হয়ত সদ্যঃশিক্ষিত ফোটোগ্রাফার, সরলপ্রাণ ইয়র্ক-সেয়ারের যুবকটির উপস্থিতিও তাহাদের কৌতুকের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

সে রাত্রে দাসের ভাল করিয়া ঘুম হইল না। মাথার ভিতর দিয়া বহু রকম স্মৃতি আনাগোনা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে চায়ের পর দাস সে ছবিখানা পকেটে লইয়া সিংএর সন্ধানে গেল। সিং অপর দুইজন ভারতীয়ের সঙ্গে দুরবীণের সাহায্যে ভারত উপকূলের সন্ধান খুঁজিতে-ছিল। দাসকে দেখিয়া, তাহার হাতে দুরবীণটা দিয়া, পরম উৎসাহের সহিত বলিল, "দেখুন, দেখুন!" স্বদেশের সান্নিধ্যে আসিয়া সিং আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই বন্ধু পুনরায় একা পাশাপাশি বসিয়া রহিল। সিংএর চোখের উপর দুরবীণ ছিল, সে ব্যগ্রভাবে দিগন্তের কোণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। করিতে করিতে বলিল, "বাড়ী যাওয়া খুব আনন্দের ব্যাপার; না, মিঃ দাস?"

দাস বিশেষ উৎসাহ না দেখাইয়া বলিল, "তা'ত বটেই। তবে সে আনন্দের মধ্যে অনেকটা ভাব-প্রবণতাও আছে।"

"আপনি মাত্র দু'বছর দেশের বাইরে রয়েচেন কিনা, তাই আপনার ওরকম মনে হয়, আমি যে পাঁচ বছরের ওপর দেশছাড়া।"

দুজনে আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর দাস বলিতে লাগিল, "জানেন, ভারতবর্ষে গেলে আমাদের জীবনবীমার চাঁদার রেট বেড়ে যাবে?"

সিং বলিল, "হ্যাঁ, আর ইউরোপীয়দেরে আমাদের খুব সমীহ করে চল্‌তে হ'বে; হয়ত সব ইউরোপীয় হোটেলে থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না। হয়ত মিসেস গিসিং-এর ছেলে জর্জ্জের মত লোক আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করবে, পিঠ চাপড়ালে নিজকে অপমানিত মনে করবে।"

দাস সে কথাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, লণ্ডনের সেই থিয়েটার, অপেরা, সেই পার্ক, সেই অজস্র জনতা, সেই কর্ম্মব্যস্ততা এসবের স্মৃতি মনে পড়ে আপনার মন কেমন করবে না, মিঃ সিং?"

"হয়ত করবে, তবে ভারতের নির্ম্মল নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক, আর সব আপনার জনদেরে দেখে হয়ত সে সব ভুলে যাব।"

দাস একটু বিচলিতকণ্ঠে বলিল, "আমি কিন্তু ভুল্‌তে পারব না, মিঃ সিং।"

সিং তাহার খাড়া নাকটি দাসের চোখের সোজাসুজি রাখিয়া একটু কঠিনভাবে প্রশ্ন করিল, "আপনার সেই সাইকির জন্যে? আপনি এতই ভাল বেসেচেন সে ইংরেজমেয়েকে?"

"সে ভালোবাসার যোগ্য বলেই তো তা'কে এত ভালো বেসেচি। হয়ত আপনি দেখ্‌লে আপনিও বাস্‌তেন। এই দেখুন তার ছবি!" বলিয়া পকেট হইতে ফোটো খানা বাহির করিয়া সিংএর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। সে নিজেও ছবিটির দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার কোমল অনুভূতিপ্রবণ অধরটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল।

সিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ছবিখানা নিরীক্ষণ করিল। তারপর ফোটোর নীচে কার্ড বোর্ডে লেখা ফোটোগ্রাফারের দোকানের নাম পড়িল। তারপর মুহূর্ত্তকাল ঠোঁটের উপর ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই আপনার সাইকি?"

দাস একটু আবেগের সহিত বলিল, "সে বাস্তবিকই সুন্দরী নয়, মিঃ সিং? ঠিক করে, নিরপেক্ষভাবে বলুন।"

সিং একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল, "সুন্দরী বই কি!" বলিয়া আবার চোখের উপর দূরবীন তুলিয়া ভারত উপকূলের দিকে চাহিতে লাগিল।

দাস বলিল, "মিঃ সিং, এবার আপনার পালা, আমাকে আপনার প্রেমের কাহিনী বল্‌তে হ'বে। সময় কম, আমরা শিগ্‌গিরই বম্বে পৌছব, সুতরাং অবিলম্বে বলে ফেলুন।"

সিং "আচ্ছা বসুন, আমি আস্‌চি," বলিয়া নিজ ক্যাবিনে চলিয়া গেল এবং দশ মিনিট পরে আসিয়া পকেট হইতে একখানা ফোটো বাহির করিয়া দাসের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল, "এই আমার সাইকি!"

দাস হাসিমুখে সে ছবি খানা হাতে লইল। তারপর সূক্ষ্মভাবে তাহা দেখিতে লাগিল। দেখিল, এখানাও ঠিক তাহার ছবিখানার মতই, একজন তরুণীকে বাহুর উপর লইয়া এক যুবক ঝরণার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল এ তাহার ছবির প্রতিলিপি নয় তো? তাহা হইলে সিং মস্ত বড় একটা চাল দিয়া নিল! কিন্তু হঠাৎ তাহার বিশাল আলস্যভরা চোখ দুটি চকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল যে যুবক তরুণীকে বহিয়া নিতেছে সে সে নয়, তাহার লম্বা মুখ খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট,—সে সিং; কিন্তু সে হাস্যময়ী তরুণী একই,—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই টোল-পড়া গাল, ঠোঁট দুটি রংয়ে চট্‌চটে—"

দাস বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বলিল, "এ যে এমা!"

সিং চক্ষু ঘুরাইয়া, কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এমা আপনার সাইকি, সে আমারও সাইকি ছিল। তা'কে দেখে কে না ভালোবাসে?"

দাস অবাক হইয়া বলিল, "তার মানে? আপনি বল্‌তে চান আপনিও এমাকে ও রকম করে ধরে ঝরণা পার হয়েছিলেন?"

সিং শান্ত ভাবে বলিল, "তা' ছাড়া আর কি বলা যায়? দেখতে পাচ্চেন না এ ফোটো, চিত্র নয়।"

দাস বিস্মিত দুইটি চক্ষু সঙ্গীর দিকে তুলিয়া বলিল, "কি বল্‌চেন আপনি, মিঃ সিং?"

সিং উপহাসের সুরে বলিল, "দেখা যাচ্চে আপনার এমাটি এ বিষয়ে খুব specialise (বৈশিষ্ট-অর্জ্জন) করেচে, নয় কি? সেই ক্রিস্‌মাসে মিসেস গিসিংএর বাড়ীতে অতিথি হয়ে আস্‌ত, গাধার টুপী পরে আমোদ করত, মিস্‌লটোর নীচে গিয়ে দাঁড়াত,—সে মেয়েটি নয় কি?" দাস স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। সিং জোরে হাসিয়া বলিল, "ভাব্‌বেন না শুধু আপনি আমিই তার সঙ্গে ও রকম করে ফোটো তুলেচি, আমাদের আগে ও পরে অন্যেরাও তা' করে থাক্‌বে।"

একথায় দাসের মুখ হইতে বালক সুলভ কোমলতা অন্তর্হিত হইল। ওষ্ঠাধরের মৃদু ভাব দূর হইল। সমস্ত মুখ একটা পুরুষোচিত কাঠিন্যে ঢাকিয়া গেল। সে দৃঢ়-চক্ষে সিংএর চোখে চোখে চাহিয়া বলিল, "মিঃ সিং, আপনি জানেন আপনি যা' বলচেন তা' কখনই নয়।"

সিংএর মুখের হাসি সহসা মিলাইয়া গেল। সেও কঠোর ভাবে বলিল, "আপনি মিথ্যাকে আকড়ে' ধরে খুসী হ'য়ে থাকবেন জান্‌লে আমি ককৃখনো আপনাকে আমার ছবি দেখাতাম না।"

দাসের অন্তর ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হইতেছিল। সে আবার পকেট হইতে নিজের ছবিখানা বাহির করিয়া সিংএর ছবিটার পাশাপাশি ধরিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ও এমা কি?"

তখন উভয়ে স্থির দৃষ্টিতে ছবি দুইটির দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহারা দেখিল উভয় ছবিতেই সেই তরুণী ইংরেজ নারী, সেই টোল-পড়া গাল, রংয়ে চটুচটে ঠোঁট, তরল হাসিতে ঢল-ঢল মুখখানি। গলার নীচের হারটা কতক ভাসিয়া আছে। ডান হাতটা দুই ছবিতে একই রকমে সম্মুখের দিকে ঝুলিয়া আছে, আঙুলগুলি একই রকমে বাঁকিয়া পড়িয়াছে। পায়ে একই ধরণের জুতা, গায়ের জামার স্কার্টের একই রকমের দৈর্ঘ্য, হাঁটুর ঈষৎ উপরে উঠিয়া আছে।

ছবি হইতে চোখ তুলিয়া দাস গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ সিং, ওর সঙ্গে আপনি ইয়র্কশেরে গিয়েছিলেন ?"

সিং বলিল, "ওরকম ঝরণা ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই আছে। আপনাকে ফোটো তুলবার জন্যে ছ'পেনি খরচ করতে হয়েছিল, আমার তা' হয় নি, কেননা আমার সঙ্গে অটোম্যাটিক ক্যামেরা ছিল।"

দাস তিক্ত স্বরে বলিল, "এই আপনার বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ?"

সিং মৃদু হাসিল।

দাস রুক্ষভাবে বলিল, "মিঃ সিং, আপনি দুটি জীবনের কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করেচেন, তা' জানেন কি ?"

সিং একটু আহত হইয়া বলিল, 'আপনি যে বাজে বক্‌চেন মিঃ দাস,—you're talking nonsense" বলিয়া তাহার ছবিখানা টানিয়া নিজ হাতে নিল।

দাস বলিয়া গেল, "মিঃ সিং, আপনি যদি আপনার ঐ কলুষিত হৃদয় নিয়ে তার জীবনে না আস্‌তেন, তবে জানেন সে জীবনটার কি পরিণতি হ'ত ? আপনি এমার ও আমার প্রতি কত বড় অন্যায় করেচেন তা উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন ?"

সিংএর মুখ আরক্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু শেষ কথাটায় সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অন্যায়টা আমার না আপনার ? এই দেখুন আমার ছবির তারিখ আপনার ছবির আটমাস আগেকার। আমি বলতে পারি আমার প্রেমিকাকে আপনি কলুষিত হস্তে স্পর্শ করেচেন।"

দাস সিংএর হাত হইতে ছবিখানা ছিনাইয়া লইয়া তারিখ দেখিল।

সিং হাসিমুখেই বলিল, "দেখ্‌বেন, আমার ছবিতে সে একটু বেশী তরুণী। দেখুন্ না মিলিয়ে ছবি দুটো !"

দাস নিজের ছবিটি আবার বাহির করিয়া তারিখ ও চেহারা মিলাইতে লাগিল।

সিং বলিয়া গেল, "দেখুন, সব দেশেই একদল মেয়েমানুষ আছে তারা বিদেশীর ভক্ত। আমাদের ভারতবর্ষে বিশেষতঃ আপনাদের বাঙ্গলা দেশে কলিকাতায়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দিনে কত দেশী মেয়ে বিদেশী ইংরেজের সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। সব দেশেই সে রকম মেয়ে আছে। আপনার মত ভাবুক লোকেই তাদেরে চিন্‌তে পারে না।"

দাস সিংএর ছবিখানা ডেক চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পরুষ-কণ্ঠে বলিল, Mr Sing, dont add insult to injury (মিঃ সিং, অন্যায় তো করেচেন, তার ওপর অপমান করবেন না)। জেনে রাখ্‌বেন জগতে সব লোক আপনার মত cynic (মানব-বিদ্বেষী) নয়,—আপনার মত selfish (স্বার্থপর) নয়।"

সিং-ও দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "যা' তা' বক্‌বেন না, মিঃ দাস। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।"

দাস বলিল, "আপনি আমাকে বহুপূর্ব্বেই সে সীমায় নিয়ে পৌঁছিয়েচেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য রোষোদ্দীপ্ত নয়নে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিল। তারপর তাহারা স্ব স্ব ক্যাবিনে চলিয়া গেল।

তখন দূরে ভারতের উপকূল মনোরম হইয়া ভাসিয়া উঠিল। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তালগাছের গুচ্ছ প্রত্যেক ভারতীয় যাত্রীর প্রাণে এক অপরূপ আনন্দ সঞ্চারিত করিল।

দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রতলে বম্বে শহর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ব্যালার্ড পিয়ারে নামিয়া ট্যাক্সিতে উঠিবার সময় সিং দেখিল একটু দূরেই দাসও আর একটা ট্যাক্সির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় দুজনেই ট্রেণযোগে ভারতের দুই প্রান্তে চলিয়া গেল, কিন্তু প্রত্যেকের মনেই গাঁথা রহিল, আটশত মাইল দূরে একজন লোক আছে যে তাহার ঘোর শত্রু।

অবিনাশ চন্দ্র বসু

শিবাজীর প্রথম জীবন

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজীর অভ্যুদয় বিদ্যুতের মতন আকস্মিক। শিবাজীর প্রথম পরিচয় আমরা যখন পেলাম, তখন শক্তিতে অর্থে এবং জনবলে শিবাজী দাক্ষিণাত্যে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং বিজাপুর ও মোগলের সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য্য। কিন্তু তার পূর্ব্বকার ইতিহাস আমাদের কাছে ম্লান এবং অস্পষ্ট। যে মেঘ পরে দিল্লীর সিংহাসনের উপর বজ্রবর্ষণ করেছিল সে কখন শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং ক্রমশঃ আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে, সে কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। বিজাপুর রাজ্যের একজন জায়গীরদারের পুত্রের কথা সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনায় স্থান না পাওয়াই স্বাভাবিক; এবং পরে যে সব মারাঠি লেখকেরা শিবাজীর পরিণত বয়সের কথা লিখেছিলেন তাঁরা তাঁর বালককালেই এমন দেবত্ব এবং অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ করেছেন যে অতবেশী অলৌকিক ঘটনা আধুনিক পাঠকদের বিশ্বাস করা কঠিন।

শিবাজীর প্রথম বয়সের কাহিনীর জন্য আমাদের দেশী এবং বিদেশী এই দুইরকম গ্রন্থকারদের লেখার উপর নির্ভর করতে হয়। সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য রচনা সভাসদবখর, রাজারামের রাজত্বকালে লেখা। এর পরে যথাক্রমে চট্‌নিসবখর এবং শিবদিগ্বীজয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'শিবভারত' বলে কবি পরমানন্দ রচিত একটি সংস্কৃত কাব্য আছে। এর সময়ের হিসাব নির্ভূল, এবং এই রচনাটি নাকি এত বিশ্বাসযোগ্য যে শ্রীযুক্ত পট্টবর্দ্ধনের মতে one regrets that it is incomplete। কিন্তু এ সত্ত্বেও শিবভারতের প্রধান দোষ তার উপমার বাহুল্য। মহাকাব্যের ধরণে লেখা বলে এর অলঙ্কারের ঝঙ্কারই প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ঐতিহাসিক তথ্য গিয়েছে চাপা পড়ে। এবং শিবভারতের গ্রন্থকার মারাঠি লেখকদের এই ধারণা থেকে মুক্ত নন যে শিবাজী প্রকৃতপক্ষে মহাদেবেরই অবতার। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে তিনি জানতেন শিবাজী এবং মহাদেব অভিন্ন এবং মহাদেবই পরমানন্দকে বলেছিলেন যে "এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়ে আমি যে সব কাজ করেছি এবং করছি, তুমি তার কথা রচনা কর।" (শিবভারত) বিদেশী লেখকের লেখা সব সময়ে বিশ্বাস করা চলেনা, কেননা তাঁরা যখন লিখেছিলেন তখন শিবাজীর বালককাল বহুদিন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এবং সে সময়ে যা প্রচলিত গল্প শুনেছেন, তাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একখানা ফরাসী গ্রন্থে শিবাজীকে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজবংশের বংশধর এবং মোগল সম্রাটের আত্মীয় বলে প্রচার করা হয়েছে। বিদেশীদের মধ্যে কস্‌মা-ডা-গরেডা এবং থিভেনো শিবাজীর জীবনী লিখ্‌তে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিবাজীর প্রথম বয়স সম্বন্ধে এঁদের লেখায় হাস্যকর সব ভুল আছে। গারডা শিবাজীর জন্মস্থান বলেছেন বিদর্ভে, এবং তাঁর মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে শিবাজী আসলে পোর্টুগীজ। "The village of Virar near the city of Bacayne in the territories of the Portuguese crown was the birthplace of Seragy. The lord of the village was Dom Manoel de Menezes. and the people were not wanting who said that Sevagy was his son. May truth prevail. But at all events he has been known as the youngest of twelve sons of Sagy, a captain of Idalcao........."

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন কৃত অনুবাদ]

থিগেনোও বেসিনকে শিবাজীর জন্মস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। এই সব ত্রুটি এবং প্রচলিত গল্পের ভিতর

থেকে প্রকৃত শিবাজীকে উদ্ধার করা খুব সহজ নয়; অথচ এই সব গল্প বাদ দিলে শিবাজীর বালককাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না।

শিবাজীর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে রাণাডে বলেছিলেন শাহজী পিতা এবং মাতা জীজাবাই, এর চাইতে বড় পরিচয় শিবাজীর দরকার নেই। অবশ্য শিবাজীর স্বয়ং এবং ও-বংশের আর সকলের ধারণা ছিল অন্য রকম; এবং তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে ভোঁসলারা উদয়পুরের রাণার বংশধর। শিবাজীও তাঁর অভিষেকের সময় নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করেছিলেন। শিবভারতের গ্রন্থকার বলেছেন, "দাক্ষিণাত্যে সূর্য্যবংশে রাজশ্রেষ্ঠ মালোজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তেজে সূর্য্যের মতন"। এই মালোজি ছিলেন শিবাজীর পিতামহ। তাঁর রাজত্ব এবং তেজের কথা আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। বরং এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে, যে তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সামান্য চাষী ছিলেন। তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান এবং তাঁর রাজত্ব সম্বন্ধেও। শোনা যায় একরাত্রে বনের মধ্যে দেবী পার্ব্বতী তাঁকে দর্শন দিয়ে মাটির নীচে প্রোথিত গুপ্তধনের সংবাদ বলে দিয়ে ছিলেন। এই টাকার জোরে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে তিনি ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠ্‌লেন। তখন সাতারা জেলার মহাদেব পর্ব্বতের মন্দিরে চৈত্র মাসে খুব বড় মেলা হত। অথচ কাছে কোথাও জলের ব্যবস্থা ছিল না। মালোজী নিজের টাকায় সেখানে প্রকাণ্ড জলাশয় তৈরি করে দিলেন। সভাসদ বলেছেন যে, এই ঘটনার পরে মালোজী স্বপ্ন দেখলেন মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে বলছেন—"তোমার বংশে আমি অবতীর্ণ হব, দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের আমি রক্ষা করব এবং ম্লেচ্ছদের নিধন করব। তোমার বংশে দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্য আমি অর্পণ করলাম"। মালোজীর পুত্র শাহজীর সঙ্গে লুকজি যাদব রাওয়ের কন্যা জীজাবাইয়ের বিবাহ হয়। যাদবরাও ছিলেন আহ্‌মেদ নগরের সেনাপতি এবং মালোজী তাঁর অধীনে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। শিবভারতে বলা হয়েছে যে কুবেরের মতন ঐশ্বর্য্যশালী যাদবরাও শাহজীর যুদ্ধনিপুণতা, দয়া এবং দাক্ষিণ্য দেখে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ে 'কমলাক্ষী, জীজাবাই'য়ের বিবাহ দিলেন। এই কাহিনীতে অবশ্য বিশ্বাস করা চলে না, কেন না, শিশু শাহজী কি করে তাঁর যুদ্ধনিপুণতায় যাদবরাওকে মুগ্ধ করেছিলেন, তা অনুমান করা সহজ নয়। এ সম্বন্ধে যা প্রকৃত ঘটনা বলে মনে হয়, উদ্ধৃত করছি—"যাদব রাও ভোঁস্‌লাদের মত জাতে মারাঠা। মালোজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন। * * * * একদিন হোলীর সময় যাদব রাও নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধব অনুচরগণকে লইয়া নাচ-গান উপভোগ করিতেছিলেন। পাঁচ বৎসরের বালক শাহজীকে এক কোলে এবং নিজের তিন বছরের কন্যা জীজাবাইকে অপর কোলে বসাইয়া, তাহাদের হাতে আবীর দিলেন এবং শিশু দুটির হোলীখেলা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বিধি মেয়েটিকে কি সুন্দর করিয়াই গড়িয়াছেন, আর শাহজীও রূপে ইহারই সামিল। ঈশ্বর যেন যোগ্যে যোগ্যে মিলন ঘটান।'

"যাদব রাও হাসির ভাবে এ কথা বলিলেন, কিন্তু মালোজী অমনি দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন"—আপনারা সকলে সাক্ষী যাদব রাও আজ তাঁহার কন্যাকে আমার ছেলের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা করিলেন"......[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার] এ কথা অবশ্য যাদবরাওয়ের পক্ষে প্রীতিকর হয় নি। কিন্তু তিনি যদি বা এ কথা ভুলে যেতে পারতেন, তাঁর স্ত্রী এ কথা সহ্য করলেন না; এবং পরদিন মালোজীকে বিদায় দেওয়া হল। পরে অবশ্য যখন মালোজী মাটির নীচে গুপ্তধন পেয়ে, নিজের অবস্থার উন্নতি করলেন, তখন দুইবংশে বিবাহে বাধা রইল না, এবং শাহজী জীজাবাইকে বিবাহ করলেন।

শিবাজীর জন্মের সময় নিয়েও গোল আছে। গ্রাণ্টডাফ মানকরকে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর মতে শিবাজীর জন্মকাল ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের 'মে' মাস। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিশ্বাসও তাই। সভাসদ এ বিষয়ে একেবারে নিস্তব্ধ। কিন্তু "যেধে শকাবলি" অনুসারে শিবাজীর জন্মকাল ১৬৩০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। শিবভারতের রচনাকারও ১৬৩০ সালই শিবাজীর জন্মের বৎসর বলে মনে করেছেন। জন্মের কয়েকবৎসর পরে শিবাজী যখন শিশু, তখনই তিনি পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যান। যাদব রাও

যে "যোগ্যে যোগ্যে মিলনের" স্বপ্ন দেখেছিলেন তা স্থায়ী হয় নি। শাহজী তুকাবাই মোহিতে বলে একটি মহিলাকে বিবাহ করেন, এবং ক্রমশঃ জীজাবাই স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। বালক শিবাজী তাঁর মাতার সঙ্গে পুণায় বাস করতেন। এই শিশুকালেই তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। শিবদিগ্বীজয়ের গ্রন্থকার বলেছেন যে শিবাজী এই বয়েস থেকেই ধর্ম্মপ্রাণতার নানাবিধ পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি গোহত্যা বন্ধ করবার বহু চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই অপরাধে একজন মুসলমান কসাইকে খুব কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। শিবদিগ্বীজয়ের লেখক আরও বলেছেন যে এই সময়েই নাকি শিবাজী প্রচার করতে থাকেন যে তিনি কখনও যবনকে সেলাম করবেন না, এবং যবনের দাসত্ব করে আহার্য্য সংস্থানও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। উক্ত গ্রন্থকার এই কথা লিখে যে পরিমাণ আত্মপ্রসাদ লাভ করুন না কেন, এই ঘটনা তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে এ সময় শিবাজীর বয়স দশ বৎসরেরও কম; এবং দশ বৎসরের বালকের পক্ষে এ সব কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে যাই হোক চিট্‌নিস্ বখর এবং শিবদিগ্বীজয় এই দুই গ্রন্থেই আছে যে বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর কথা শুনে তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। সেখানে শিবাজী নাকি মুসলমান সুলতানকে সেলাম করতে অস্বীকার করেন এবং শাহজী বেগতিক দেখে তাঁকে পুণায় পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে সুলতানের হুকুমে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। শিবাজীর এই স্ত্রীর নাম সরবা বাই,—এবং তিনি শির্কেবংশের মেয়ে ছিলেন।

পুণায় ফিরে আসবার পর শিবাজীর প্রকৃত জীবন আরম্ভ হল। পিতৃপরিত্যক্ত এই বালকের মনে জীজাবাইয়ের ধর্ম্মপ্রাণতার এবং দাদাজি কোণ্ডদেবের প্রখর বুদ্ধির ছাপ পড়েছিল। তার ফলে শিবাজীচরিত্রে আশ্চর্য্য পরস্পরবিরোধী ধার্ম্মিকতা এবং সাংসারিক বুদ্ধির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। আজকাল অবশ্য অন্যমতও মারাঠি লেখকদের কাছে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্য না হলেও দুঃখের কারণ নেই, কেননা লিখতে পড়তে না জানলেও তাঁর মনে বৈদগ্ধ্যের অভাব ছিল না। লেখা-পড়ার অভাবেও তাঁর রসবোধ, গুণগ্রাহিতা এবং প্রখর বুদ্ধি কোনও দিন ম্লান দেখা যায় নি। তাঁর রসবোধ সম্বন্ধে কবিভূষণের নামে প্রচলিত গল্পই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এক সময়ে মনে করা হত যে শিবাজীর মুসলমান বিদ্বেষের মূলে ছিলেন তাঁর শিক্ষক দাদাজি কোণ্ডদেব। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই, কেননা দাদাজি ছিলেন রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী। তিনি সৈনিক ছিলেন না, এবং তাঁর রাজনৈতিক মতামত স্পষ্ট করে জানবার সুযোগ আমাদের হয় নি। বরং এ কথা সত্যি যে শিবাজীর মতি পরিবর্ত্তন করার জন্য দাদাজি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে কালের লোক তাতে শাহজী যে জীবন নির্ব্বাহ করতেন তাই ছিল আদর্শ এবং শিবাজীর যা ইচ্ছা তা অসম্ভব বলেই লোকের ধারণা ছিল। ভীমসেন বলে একজন বুন্দেলা কর্ম্মচারী লিখেছেন যে দাদাজি কোণ্ডদেব আত্মহত্যা করেছিলেন এই ভেবে, যে তিনি বেঁচে থাকলে লোকে বলবে যে শিবাজীর বিদ্রোহে তিনিই ছিলেন মন্ত্রণা-দাতা। স্কট ওয়ারিঙয়ের বই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তিনিও বলেছেন যে দাদাজি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই কাহিনী খুব সম্ভব কোনও জনশ্রুতি অবলম্বন করে লিখিত, কেননা দাদাজি যে বিষপান করেছিলেন, সে কথা প্রায় সমসাময়িক কোনও মারাঠা ইতিহাসকারের রচনায় পাওয়া যায় না। এই সময় দাদাজির বৃদ্ধ বয়েস, এবং কঠোর পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় তার মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়।

দাদাজীর জীবিত অবস্থাতেই শিবাজী চারিদিকে লুঠপাট এবং বিজাপুরের দুর্গ আক্রমণ আরম্ভ করেছিলেন। "পুণা জেলার পশ্চিম প্রান্তে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গা বাহিয়া * * * * * যে ভূমিখণ্ড আছে তাহার নাম 'মাবল' * * * * * * এই অঞ্চলটি অত্যন্ত অসমান, অধিত্যকার পর অধিত্যকা, আর তাহাদের ধারগুলি খাড়া হইয়া নামিয়াছে: নীচে আঁকা-বাঁকা গভীর উপত্যকা। এই নীচের সমভূমি হইতে ছোটবড় অনেক পাহাড় স্তরে স্তরে উঠিয়াছে,

তাহাদের উঁচু গায়ে কাল কষ্টিপাথরের বড় বড় "বোল্ডার" ছড়ানো। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্র বনে আবৃত, গাছের তলায় ঘন গাছড়া ও লতাপাতা চলিবার পথ বন্ধ করিয়াছে।

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কৃত বম্বে গেজেটিয়ারের অনুবাদ]

এই মাবলদেশের অধিবাসী 'মাবলী'দের সাহায্যে শিবাজী তাঁর রাজ্যস্থাপন আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম অধিকৃত দুর্গ খুব সম্ভব চন্দনগড়। কিন্তু সভাসদ্ চন্দনগড়ের নামও উল্লেখ করেন নি এবং সভাসদবখর অনুসারে শিবাজী সর্ব্বপ্রথমে তোরণা অধিকার করেছিলেন। তোরণা থেকে দক্ষিণপূর্ব্বে তৃণবিরল মোরবাদ পর্ব্বত। শিবাজী এর উপরে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করলেন, এবং তার নাম দিলেন রাজগড়। সভাসদের মতে রাজগড়ের নির্ম্মাণকাল আরও কয়েক বৎসর পরে। এরপর শিবাজীর বিমাতার ভাই বাজি মোহিতের অধীন "সুপা" পরগণার উপর শিবাজীর নজর পড়ল। শিবাজী কি করে সুপা অধিকার করলেন সেকথা তেমন স্পষ্ট নয়। শোনা যায় উৎসবের ছুতা করে শিবাজী সুপায় প্রবেশ করে বাজী মোহিতেকে বন্দী করেছিলেন। [সভাসদ] কোনও কোনও লেখক বলেছেন যে শিবাজী সহসা গভীর রাত্রিতে সুপা আক্রমণ করেছিলেন, এবং অতর্কিত অবস্থায় বাজী মোহিতেকে বন্দী করে কর্ণাটকে পাঠিয়ে দেন। 'যেধে শকাবলি' অনুসারে সুপা অধিকার শিবাজী এ বয়সে করেন নি, যখন করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স অন্ততঃ ছাব্বিশ বৎসর। পুণা থেকে কিছু পূর্ব্বে 'চাকণ'দুর্গ। এই দুর্গ থেকে পুণা এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর নজর চলে। ফিরঙ্গজি নরসালা এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, এবং পরে শিবাজীর জন্মস্থান শিবনার তাঁকে জয় করে দিয়েছিলেন। পুণার কাছেই বিজাপুরের কোণ্ডানা দুর্গ; শিবাজীর তখন এমন অবস্থা নয় যে বিজাপুরের কাছ থেকে এই সুরক্ষিত স্থান অধিকার করেন। যুদ্ধ যখন অসম্ভব, তখন শিবাজী অপেক্ষাকৃত সহজ পথ অবলম্বন করলেন। এই দুর্গের মুসলমান সেনাপতিকে টাকা দিয়ে বশীভূত করে কোণ্ডানা অধিকার করা হল। শিবাজী দুর্গের আগাগোড়া সংস্কার করলেন এবং তার নাম দিলেন সিংহগড়। এর পর পুরন্দর জয় শিবাজীর জীবনে বড় ঘটনা। পুরন্দরের প্রকৃত ঘটনা কী বলা কঠিন। দাদাজির মৃত্যুর অল্প দিন পরে পুরন্দরের অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ হৈবত রাও মারা যান, এবং তার পরেই তাঁর পুত্রেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করলেন। এই কলহ শিবাজীর পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কেমন করে তিনি পুরন্দর জয় করলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। চিট্‌নিস্ বখর অনুসারে নীলকণ্ঠের পুত্রেরাই শিবাজীকে মধ্যস্থ মেনেছিলেন, এবং পুরন্দর জয় করার এ সুযোগ শিবাজী পরিত্যাগ করেন নি। শিবদিগ্বিজয়ের কাহিনী একটু অন্যরকম। এই লেখকের মতে শিবাজী প্রচার করলেন যে তিনি ফল্‌টনের নিম্বল্‌করদের দমন করতে চলেছেন। পথে পুরন্দরের কেল্লা। দেওয়ালীর রাত্রে শিবাজী এই দুর্গে আতিথ্য গ্রহণ করলেন, এবং পরদিন সকালে উঠে নীলকণ্ঠের পুত্র শঙ্করজি এবং পিলাজিকে সঙ্গে করে নদীতে স্নান করতে গেলেন, মধ্যাহ্নে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সৈন্যরা দুর্গ অধিকার করেছে। পুরন্দরের পরে শিবাজী রোহিরা রাজমচী এবং লোহাগড় দখল করেন। আবাজি সোণদেব বলে তাঁর একটি অনুচর কল্যাণ জয় করলেন, এবং শীঘ্র ভিণ্ডিও শিবাজীর অধিকারে এলো। সভাসদের মতে রাজগড়ও এই সময় নির্ম্মিত হয়।

এই সময় শিবাজীর জীবনের প্রথম অঙ্কের অবসান। শিবাজী খবর পেলেন, শাহজীকে ছল করে বন্দী করে বিজাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিতার মুক্তির জন্য শিবাজী সম্রাটের প্রতিনিধির কাছে আবেদন করলেন এবং পিতার যদি প্রাণদণ্ড হয় এই ভয়ে চুপ করে ছিলেন। শাহজী যখন মুক্তি পেলেন, তখন শিবাজীর জীবনে প্রথম অঙ্কের শেষ এবং দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ হয়েছে। শাহজীর বন্দীজীবন সেই দুই অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা কালের নীরবতা। এর পরে যখন এই অপূর্ব্ব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হল, তখন দৃশ্যপট গেছে পরিবর্ত্তিত হয়ে। পুণার চারপাশের ছোট ছোট গ্রামের পরিবর্ত্তে, জাওলি এবং উত্তরের জনবহুল লোকালয় আমাদের চোখের সম্মুখে প্রকাশ হবে। সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের দ্বারা বিদীর্ণ আকাশের তলায়, মুঠা এবং মুলা নদীর তীরে, নির্জ্জন গিরিশিখরে আমরা যে মারাঠা বালককে দেখেছি, তার কাছ থেকে বিদায়। এই জীবন-প্রবাহকে আমাদের আর প্রায়ান্ধকার সময়ের মাঝে খুঁজে বেড়াতে হবে না, এখন থেকে স্বদেশী এবং বিদেশী ইতিহাস শিবাজী সম্বন্ধে স্তুতি এবং নিন্দায় মুখর। এই সময় শিবাজীর পথরেখা আর অস্পষ্ট নয়, তাঁর জীবন মহত্তর সাধনার সিংহদ্বার অতিক্রম করে ভাবী কালে যাত্রা করেছে।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

দিদি

শ্রীঅমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলের ছাত্র; নাম কানু—জাতিতে রাজবংশী। বড়োই গরীব, বাড়ীতে শুধু এক বিধবা মা। জাতব্যবসা চালাবার কেউ নেই। মা বাড়ী বাড়ী খেটে দুটি বেলার অন্নসংস্থান কোনোরূপে করে, ছেলেটিকে গ্রামের পাঠশালায় প'ড়্তে দিয়েচে—বহু কষ্টে খরচ চলে।

একটি পাত্‌লা কোট্ আর সেলাই করা একখানি কাপড় এই প'রে ক্লাশে ঢোকে, নিত্যিই এই পোষাক। পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে বই, দোয়াত, কলম জোগাড় ক'রেচে। পড়াশোনায় কিন্তু ভালো।

গ্রামের জমিদারের ছেলে অশোকও পড়ে এই শ্রেণীতেই। ছেলে মানুষ—এখনো বাবা মায়ের কাছে থাক্‌তেই ভালোবাসে, তাই গ্রামের স্কুলেই প'ড়্চে, পাশ ক'র্লে সামনের বছরে যাবে ক'ল্‌কাতা।

অশোকের অন্য বেশ। একেই ফুট্‌ ফুটে চেহারা, তারপরে আসে মিহি খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী প'রে, পরণে সরু জরী-পেড়ে খদ্দর, পায়ে দামী স্যাণ্ডেল—দেখা যায় রাজপুত্রের মতন্।

হাসিখুশী ছেলে অশোক। রোজ ক্লাশে এসে সবাইকে ডেকে গল্প করে। অশোকদের বাড়ীতে হরেক রকম পত্রিকা আসে, খবরের কাগজ আসে—আলমারী ভরা ভরা বই। তার এক মামা থাকেন পাট্‌না, এক মামা থাকেন জব্বলপুর, আরেক কাকা থাকেন ঢাকা। তাঁরা ছবির বই পাঠিয়ে দেন্, এখানে এলে নানা জিনিষ কিনে নিয়ে আসেন ওকে উপহার দিতে—আর ছোট বোন্ মিনুর জন্যে আসে কত রকমের পুতুল, রবারের বেলুন্, এটা, ওটা, সেটা···কত কি! আর ওর এক্‌লার নামেই দুটো পত্রিকা আসে, তা'র মধ্যে কত গল্প, দেশ বিদেশের কথা, নতুন ধাঁধা! এবারে ওর বড় মাসিমার ছেলে সীতেশদা লিখেচে আস্‌চে ছুটিতে সে যাবে দার্জ্জিলিঙ্ বেড়াতে, ওকেও নিয়ে যাবে। আর খুব ভালো ক'রে ম্যাট্রিক পাশ ক'রতে পার্‌লে মা দিতে চেয়েচে একটা হাতে বাঁধা ঘড়ি। আর দিদি ব'লেচে একটা ফটো তুল্‌বার ক্যামেরা দেবে।

এই সময়ে ছেলেরা ব'লে ওঠে, আচ্ছা ভাই অশোক, ততদিনে কি আমাদের কথা তোর মনে থাক্‌বে? যদি থাকে তবে আমাদের কিন্তু ফটো তুলে দিতে হবে।

অশোকের এতো সব গল্পের মধ্যে যখন তার দিদির কথা বলে, তখনি কানুর সব চেয়ে ভালো লাগে। অশোকের দিদিকে কানু কোনো দিনই দেখেনি, আর দেখ্‌লেও তা' তার কিছুমাত্র মনে নেই। সে বহুদিন আগে যে এসে গিয়েছিল, তার পরে আর বাড়ী আসেনি। অশোকের কাছ থেকেই শুনেচে শুধু যে সেই দিদির নাম বীণা, ক'ল্‌কাতায় কলেজে পড়ে।

কানুর ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়! কলেজে পড়ে! খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অশোকের কাছ থেকে অনেক কথা বা'র করে। বীণার সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের যেন অবধি নাই!

কানু বলে, যাবি ভাই অশোক, ওই গাছ তলাটায়? আর কেউ নয়, শুধু আমি আর তুই। তোর কাছে ব'সে গল্প শুনিগে।

টিফিনের ঘণ্টায় দুজনে গিয়ে স্কুল থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় ব'সে। অশোক বলে সীতেশদা লিখেচে দার্জ্জিলিং এ নাকি······

কিন্তু কানু বলে, আচ্ছা অশোক, তোর দিদি এতদিন বাড়ী আসেন না কেন রে? আস্‌বেন্ না?

অশোক বল্‌ল, হ্যাঁ, দিদি অনেক দিনই আসেনা বটে। সেকেণ্ড ক্লাশে প'ড়্‌বার সময়ে এসেছিল, আর এবারে বি, এ,

পরীক্ষা দেবে—পাঁচ ছয় বছর তো হ'ল। সেবারে দিদি এসেই বেজায় ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল কাজেই ভয়ে আর আস্‌তে চায়না। ছুটিতে প্রায়ই বেড়াতে যায় ছোট মাসিমার কাছে হাজারিবাগে।

কিন্তু তোর কি দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় না, তোর দিদিকে? আর তিনিও বাবা, মাকে দেখ্‌তে চান্‌ না? কানু বল্‌ল।

কেন, বাবা তো মাঝে মাঝে প্রায়ই কল্‌কাতা যান্‌, মাও আমাকে নিয়ে দু'তিন বার গেচেন। তখনি ত' দিদির সাথে দেখা হ'য়েচে। তা' ছাড়া সেবারে আমরা প্রায় আড়াই মাস গিয়ে গিরিডিতে ছিলুম—তখন গরমের সারা ছুটিটা দিদি ওখানেই কাটিয়েছিল।

এই টুকু ব'লেই অশোক ব'ল্‌ল, জানিস কানু, গিরিডিতে যা' মজা হ'ত! গরমের চোটে রাত্তিরে তো আস্‌তোনা ভালো ক'রে ঘুম—ভোর বেলা উঠেই একদল বেরিয়ে প'ড়তুম। বাসার কিছু দূরেই ছিল একটা পাথরের ঢিপি চারিদিকে শাল বন। সেই বনের ভেতর গিয়ে সবাইমিলে বসতুম পাথরের ঢিবিটার ওপর। খানিক পরে দিদি ধ'রে দিত গান, আর আমরা আরম্ভ ক'রতুন এই হুটোপুটি! দুপুরে পাশের একটা বাড়ীতে আড্ডা দিতুম। সেই বাড়ীর রমা ব'লে একটা মেয়ে ছিল দিদির বন্ধু। দিদি, রমাদি, আরো কে কে সব ওরা মিলে লাগিয়ে দিত গল্প গুজোব—আর আমরা ছোটরা মিলে যে কত কাণ্ডই ক'র্‌তুম্‌ সে কি আর ব'লে শেষ করা যায়? সন্ধ্যেবেলা আবার বেরুতুম হয়তো আরেক দিকে। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি সে যা' সুরু হ'ত—ফির্‌তে ফির্‌তে রোজি হ'য়ে যেত রাত্‌ সাড়ে আটটা নয়টা!

কানু একটু হেসে বল্‌ল, আচ্ছা অশোক, তোর দিদিকে দেনা লিখে এবারে আস্‌তে এখানে পরীক্ষা দিয়ে। আমার ভাই তাঁকে দেখ্‌তে ভারি ইচ্ছে করে।

ব'লেই যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌ল, মানে তোর কাছে তাঁর কথা এত শুনি কিনা, তাই।

অশোক বল্‌ল, হ্যাঁরে, মাও ব'লেচে এবারে দিদিকে আস্‌তে লিখ্‌বে। আমিও শীগ্‌গীরই দিদির কাছে চিঠি দেব যাতে নিশ্চয় আসে।

একটু পরেই অশোক আবার বল্‌ল, শোন্‌ শোন্‌, একদিন কিন্তু যা' ভয় পেয়েছিলুম গিরিডিতে! ওরে বাবা এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মনে ক'র্‌লে! সেই অত ভোরে অনেকেই জাগে নাই, শুধু আমি আর দিদি বেড়াতে বেরিয়েচি। খানিক দূরে গিয়ে একটা জায়গায় দেখি বালির ওপর মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে আছে এই মোটা একটা মরা সাঁওতালী—আর কি বিশ্রী গন্ধ বেরিয়েচে···

কিন্তু টিফিনের ঘণ্টা শেষ হ'য়ে গেল। কানু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল সে আবার কিরে—কি হ'য়েছিলরে? বল্‌ ভাই, ও মেয়েমানুষটা······

অশোক বল্‌ল, আজকে নয়, কাল বল্‌ব। শুনিস্‌।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন স্কুলে এসেই অশোক ব্যগ্রভাবে কানুকে ডাক দিল। বল্‌ল, 'কানু, দিদি আস্‌চেরে—আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই তা'র পরীক্ষা টা শেষ হ'লেই। চিঠি দিয়েচে, দেখ্‌বি চিঠি?

বীণা লিখেচে—স্নেহের অশোক, তোমার চিঠি পেয়েচি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি পরীক্ষা হ'লেই এবারে দেশে যাবো। জ্বর টর এখন দেশে নেই ত? তোমার কথা সব সময় আমার মনে পড়ে, মিনুটা বুঝি ভারি দুষ্টু হ'য়েচে? তাকে আমার একটা চিম্‌টি আর একটা চুমু দিও। গোলাপ গাছটা ম'রে গেছে শুনে বড় দুঃখিত হ'লুম—মস্ত এক একটা ফুল ফুট্‌তো ওটাতে, আর গন্ধও ছিল চমৎকার। যাক্‌, আবার ডাল লাগানো যাবে। হাঁসগুলো আছে তো? 'বর্ণ চোরা' আম গাছটায় যে দোলা বেঁধেচো, ঠিক ক'রে রেখো কিন্তু, ছিঁড়ে ফেলোনা। গিয়ে খুব দোল খাওয়া যাবে। হ্যাঁ অশোক, গ্রামের কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, কিছু ব'ল্‌বে না তো? ব্যাড্‌মিন্টন্‌ নিয়ে যাবো, বাড়ীর ভেতরেই খেলা যাবে। তুমি আমার স্নেহ জেনো।

তোমার দিদি।

পুনঃ—এর পরের চিঠিতেই লিখ্‌বো কবে আস্‌চি। ষ্টেশনে আস্‌বে তো?

সেদিন কানু মনে মনে একটা মধুর স্বপ্ন রচনা করে। বীণা যেন তারো দিদি। কানু ভাবে এবারে এলেই অশোককে

ব'লে বীণার সাথে আলাপ ক'রে নেবো। বীণা তা'কে কোনোদিন দেখেনি বা চেনা শোনা নেই, তাই। নইলে তা'কেও সে ছোটভাই ব'লেই ভাব্‌তো, অশোকের মতন্‌ই ভালো বাস্‌তো। আচ্ছা বীণাদির চেহারাটা কেমন? সে কি আর ওই পুঁটি, পাঁচী, ক্ষেন্তীর মতন্? ও পাড়ার ওই পাঁচীদের অবস্থা তো একেবারে মন্দ নয়, কিন্তু কি বিশ্রী নোংরা! কাপড় খানা থেকে চিমটি দিলে মাটি ওঠে, তামাকের গুঁড়োর চোটে দাঁতগুলি কি বিকট দেখা যায়! আর জানে খালি ঝগ্‌ড়া—অতি তুচ্ছ কারণে, অতি সামান্য বিষয় নিয়ে চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় ক'রে তোলে, ছোট লোকের মতন্ গাল্ পাড়ে। আর বীণাদি? কল্পনায় কানু দেখে বীণাদি যেন ব'সে আছে ক'লকাতার একটা তেতলার ছাতের ওপর একখানা চেয়ারে। পূর্ণিমার রাত্রি, বীণাদির মুখের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো এসে প'ড়েচে। বীণাদি নাকি কবিতা লিখ্‌তে পারে, অশোক বলে। বোধ হয় একটা কবিতা লিখ্‌চে। কানু কবিতা লিখ্‌তে জানেনা তবে একটা ভূতের এবং একটা বাঘের, এই দুটো গল্প সে লিখেচে। বীণাদি এলে দেখাতে হবে। বড় রাস্তার ধার দিয়ে ট্রামগাড়ী, মোটর বেগে ছুটে চ'লেচে—রাস্তার দুধার দিয়ে আলোর সারি। তারি দিকে তাকিয়ে বীণাদি হয়তো একবার গ্রামের কথা ভাব্‌ছে—অশোকের কথা, মিনুর কথা···

আচ্ছা বীণাদি কি কানুর কথাও কখনো ভাবে না? কানুও তো তার ভাই! এই সময়ে কানু নিজের মনে হাসে—বাঃ কি যে সব ভাব্‌চে, বীণাদির সাথে দেখা হবে আলাপ হবে, তবে তো? এখনো তো কানুর কথা বীণাদি জানেও না। আচ্ছা অশোক কি তার কথা বীণাদিকে কক্ষণো লেখেনা? একথাটা অশোককে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কিন্তু একটু ক্ষণ পরেই কানু একটু বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। বীণাদি বড়লোক, কল্‌কাতায় থাকে, কতো তার বন্ধুবান্ধব, কতো লেখাপড়া শিখেছে! আর সে? ছেঁড়া জামা কাপড়—বাড়ীতে একখানি খড়ের ঘর। মা বাড়ী বাড়ী কাজ করে। বীণাদি কি······

আবার ভাবে, নাঃ, দিদি তো জান্‌বেই তারা গরীব। তাই ব'লে তা'কে কি আর ভালোবাস্‌বে না? সত্যি, বীণাদি যদি তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌তো—কত যত্ন করে চিঠিখানা সে রেখে দিত! কানুর মনটা ভারি হ'য়ে আসে।

ভূগোলখানা প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে পাশে সরিয়ে রাখে। কি ভেবে হাতের লেখার খাতাখানার একটা সাদা পৃষ্ঠা খুলে লিখ্‌তে বস্‌ল :—

শ্রীচরণকমলেষু—

বীণাদি, আপনার কথা অশোকের কাছ থেকে যে কতো শুনেচি—আর অশোককে যে কতো জিজ্ঞেস ক'রেচি, তা' আপনাকে আর কি লিখ্‌ব। বীণাদি, আপনাকে আমার এতো ভালো লাগে যে তা' ব'ল্‌তে আমি পারি না। আপনি কি আমার কথা কোনদিনই অশোকের চিঠিতে শোনেন্ নাই? আপনাকে কিন্তু আমার ভারি দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। এবারে এসে কিন্তু আমাকে অনেক গল্প বল্‌তে হবে। বীণাদি, আমাদের অবস্থা ভালোনা। কিন্তু তবুও জানি আপনি আমাকে ভালোবাস্‌বেন। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি আপনার স্নেহের ভাই—কানু

চিঠিটা শেষ ক'রে মনে মনে সেখানা কম ক'রেও পাঁচ ছয় বার প'ড়্‌ল। হাতে ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল, তারপরে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলে দিল।

দিন পাঁচেক পরেই বীণা আবার চিঠি দিল—যেদিন চিঠি পৌছবে ঐ দিনই বিকেলের গাড়ীতে সে আস্‌চে। অশোকের কাছে খবর পেয়ে কানু ব'ল্‌ল, অশোক আমিও কিন্তু ভাই ষ্টেশনে যাবো দিদিকে আন্‌তে।

ষ্টেশনের পথটুকু চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে কানু যে কত কথাই ভাব্‌ল তা'র ঠিক নেই। কেবলি তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, সত্যিই আজ বীণাদি আস্‌চে·····সত্যি? তা'কে দেখে কি জিজ্ঞেস ক'র্‌বে বীণাদি? ট্রেণ পনর মিনিট্ লেট্ ছিল—সময়টা কাট্‌তে চায়না যেন!

খানিক বাদেই ট্রেণ ঝড়ের বেগে এসে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াল—সাথে সাথে চারিদিকে চ্যাঁচামেচী, হট্টগোল! কোন্ গাড়ীর মধ্যে দিদি আছে ঠিক ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই হঠাৎ কে যেন অশোকের কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ডাক দিল, অশোক!

এই নাকি বীণাদি! কানু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। পায়ে নাগ্‌রাই জুতো, হাতে রিষ্ট্ ওয়াচ—পরণে দামী কাপড়! আর কি সুন্দর চেহারা বীণাদির! পথের কষ্টে চোক্ মুখ শুক্‌নো শুক্‌নো, চুলগুলিও একটু রুক্ষ, কতকগুলি চুল মুখের ওপর এসে প'ড়েছিল। কিন্তু তাতেও কী চমৎকার দেখাচ্চে!

অশোকের গলার ওপর হাত রেখে বীণা চল্‌তে লাগ্‌লো, জিনিস পত্রগুলি উঠ্‌লো কুলির মাথায়। পেছনে কানু যেন কেমন মূঢ়ের মতন্ চল্‌তে লাগ্‌লো।

কুলিটার মাথায় ছিল একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বেডিং, একহাতে সেটা ধ'রে রেখেছিল, আর একহাতে ঝুল্‌ছিল একটা বাস্কেট ও একটা সুটকেশ। একহাতে এই দুটোকে সে ভালো ক'রে সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। তাই দেখে কানু আস্তে আস্তে বল্‌ল, এই, তোর যদি অসুবিধা হয়, তবে সুটকেশটা না হয় দে আমার হাতে।

কুলিটা দ্বিরুক্তি না ক'রে সুটকেশটা কানুর হাতে দিল, বীণা একবার পিছন ফিরে চাইল, কিছু ব'ল্‌ল না।

অশোক আর বীণা হাত ধরাধরি ক'রে চ'লেচে—অশোক একটা কথা বল্‌চে বীণা হাস্‌চে, বীণা একটা কথা বল্‌চে অশোক হাস্‌চে। অশোক একেবারে দিদি দিদি ব'লে পাগল বীণাও অশোককে পেয়ে অস্থির। এতদিন পরে বীণা এসেচে, কত কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌চে, কত কথা বল্‌চে।

ষ্টেশন থেকে বাড়ী এক মাইল। বাড়ী এসে পৌছ্‌তেই চারিদিকে এমন একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল বীণাকে নিয়ে, যে অশোক পর্য্যন্ত কানুকে ভুলে গেল। অশোক দৌড়ে চ'লে গেল বাড়ীর ভেতর। বীণা কুলিকে আট্ আনার পয়সা দিল, কানুকেও দেবার জন্যে একটা সিকি বে'র ক'র্‌ল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়ে কানু বল্‌ল, না, না, আমাকে পয়সা দেবেন্ না, আমি আর অশোক এক ক্লাশে পড়ি। তা'র সাথে ষ্টেশনে গিয়েছিলুম······

কেমন ক'রে যে কি ব'ল্‌বে, কানু যেন ঠিক গুছিয়েই উঠ্‌তে পার্‌লোনা। বীণা শুধু তাই নাকি, ওঃ' ব'লে সিকিটা ব্যাগের ভেতর রেখে ব্যস্তপায়ে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কানু আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেচে। মা তখনো পাড়া থেকে ফিরে আসেনি। কানু ঘরের ভেতর মাটির প্রদীপটি জ্বালালো। তার পরে মেঝের ওপরে পাতা ছেঁড়া একটা মাদুরের ওপরে গিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে প'ড়্‌ল।

মা ফিরে এসে ডাক দিল, কানু, আজ মুখুজ্যেদের বাড়ী থেকে ভাত, ডাল, তরকারী দিয়েচে, খাবি আয়।

কানু ভারি গলায় উত্তর ক'র্‌ল, না, মা, আমি খাবো না, ভালো লাগ্‌চেনা।

মা ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌ল, কেনরে? অসুখ ক'রেচে নাকি?

চোখের জলে তখন কানুর ছিন্ন, অপরিষ্কার বালিশটির একটি ধার ভিজে গেচে।

অশোক রোজ বলে, দিদি এবারে তা'র জন্যে কি কি এনেচে, পাশ ক'র্‌তে পার্‌লে কোথায় যাবে এবং কি ক'র্‌বে,···

আরো একটি কথা নাকি দিদি অশোকের কাচে ব'লেচে, এর আগের বারে ঝুমকা গিয়ে অমল বাবু ব'লে একজনের সাথে নাকি তা'র ভারি ভাব হ'য়ে গেচে—আর অশোক খ্যাপায় দিদি, অমল বাবু তোর বর······

কানু ম্লান মুখে একটু হাসে।

বীণা আর অশোক তাদের বাড়ীর পাশে একটা বড় পুরাণো দীঘি, তারি ধার দিয়ে বেড়াচ্ছিল। বীণার কোলে মিনু। মিনু অল্প অল্প কথা শিখেচে—হঠাৎ বীণার চুলে একটা টান দিয়ে পুকুরের দিকে ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে ব'লে উঠ্‌লো, উ-ই যে লাণ্ডা ফু! আমি লাণ্ডা ফু নেবো!

জলের মধ্যে অল্প একটু দূরে কয়েকটা সাপ্‌লার ফুল ফুটে আছে—তাই নেবার জন্যে মিনু কান্না জুড়ে দিল।

জলে না নাব্‌লে ফুল আনা সহজ ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে অশোক দেখ্‌তে পেলো কানু আস্‌চে ওদের দিকেই। কানু কাছে এলে অশোক জিজ্ঞেস ক'র্‌ল কিরে কানু কোথায় যাচ্চিস্!

কানু সঙ্কুচিত ভাবে একটু হেসে বল্‌ল, ওপাড়ার দিকে যাচ্ছিলুম, তোকে দেখে এলুম।

বীণাকে অশোক ব'ল্‌ল, দিদি, কানু ষ্টেশনে গিয়েছিল তুমি যেদিন আস। মনে আছে না?

বীণা বল্‌ল, ওঃ, এই ছেলেটাই বুঝি? এই কানাই, তুই এই ফুলটা এনে দিতে পারিস্ আমাকে?

কানুর বুকটা আনন্দে দুলে উঠ্‌লো, হেসে ঘাড় কা'ত ক'রে ব'ল্‌ল, হ্যাঁ, খুব পারি। এনে দিচ্ছি।

ব'লেই আর কোনো কথার অপেক্ষা না রেখেই জলে নেবে প'ড়্‌ল। কাপড় ভিজে গেল, কাঁটা শ্যাওলায় ডান কনুয়ের পাশটা একটু ছিঁড়ে গেল, কিন্তু কানু গ্রাহ্যও ক'র্‌ল না। দিদি ফুল চেয়েচে তা'র কাছে······

ফুলটা তুলে এনে বীণার হাতে দিল। একটা গভীর তৃপ্তির ছায়া কানুর চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌লো।

ফুল হাতে পেয়ে মিনু শান্ত হ'ল। বীণা অশোককে ব'ল্‌ল, চল্ অশোক, ঐ দিক্‌টা দিয়ে ঘুরে বাড়ী যাই।

অশোক বীণার হাত ধরে চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌ল, আর কানু স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে ওদের দিকে তাকিয়ে।

এক দিন নয়, দু'দিন নয়, সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় কানু অশোকদের বাড়ীর কাছে ঘোরে। আর কিছুই নয়, শুধু বীণাদিকে একটু দেখ্‌বার আশায়! কখনো দেখে বীণাদি এঘর থেকে ওঘরে চ'লে গেল, কখনো জানালার ভেতর দিয়ে দোতলায় দেখা যায় বীণা খেলা করচে অশোক আর মিনুর সাথে। বীণা ও অশোকের হাসাহাসি শোনা যায়, কানুর মনটা কেমন ক'রে ওঠে। অশোকও যেন দিদিকে পেয়ে কেমন হ'য়ে গেচে, ওর সাথে তেমন আর মেশে না। দিদির সাথে বেড়াতে বে'র হয়; হঠাৎ যদি দেখা হয় শুধু হয়তো একবার জিজ্ঞেস ক'রে কিরে কোথায় যাচ্চিস্?···এই পর্য্যন্ত। বীণাদিও কি একটু তা'কে ডেকে তা'র সাথে আলাপ ক'র্‌তে পারেন্ না? কানুর কচি প্রাণটা মুষ্‌ড়ে পড়ে।

অশোক ক্লাশে এসে বলে, দিদি নাকি রোজ সন্ধ্যের সময়ে বাইরের দালানের রোয়াকে ব'সে ওদের কাছে গল্প করে।

সেদিন কানু সাহস করে' গিয়ে উপস্থিত হ'ল বীণাদের বাড়ীতে ঠিক সন্ধ্যের পরেই। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে দেখ্‌তে পেল সত্যিই বারাণ্ডার ওপরে বীণা একটা বালিশে হেলান দিয়ে কাত্ হ'য়ে কথা ব'ল্‌চে, তা'র কোলের কাছে ব'সে অশোক শুন্‌চে।

কানু ধীরে ধীরে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। বীণা কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, অশোকের বন্ধু বুঝি? এই ছোঁড়া, তোর পড়াশোনা নেই, এখন সন্ধ্যে বেলা কি ক'র্‌তে এসেছিস্ রে? যা' যা' বাড়ী যা···

গ্রামের গরীব একটা জেলের ছেলের অশোকের সাথে অত মেশামিশি বীণা পছন্দ ক'র্‌ছিল না। স্কুলে গিয়ে অশোকের চাল্‌চলন ছোটলোকের ছেলেদের সাথে মিশে খারাপ না হ'য়ে যায়—এ সবের দিকে লক্ষ রাখ্‌তে বীণা তা'র মা'কে প্রায়ই লিখ্‌তো।

অশোক বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইল, কানু যেমন এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

ক্লাশের ছেলেরা ঠাট্টা ক'রে বলে, আমাদের কানুবাবুর হ'ল কি? মুখখানা যে সব সময়েই প্যাঁচার মতন্ ক'রে থাকেন!

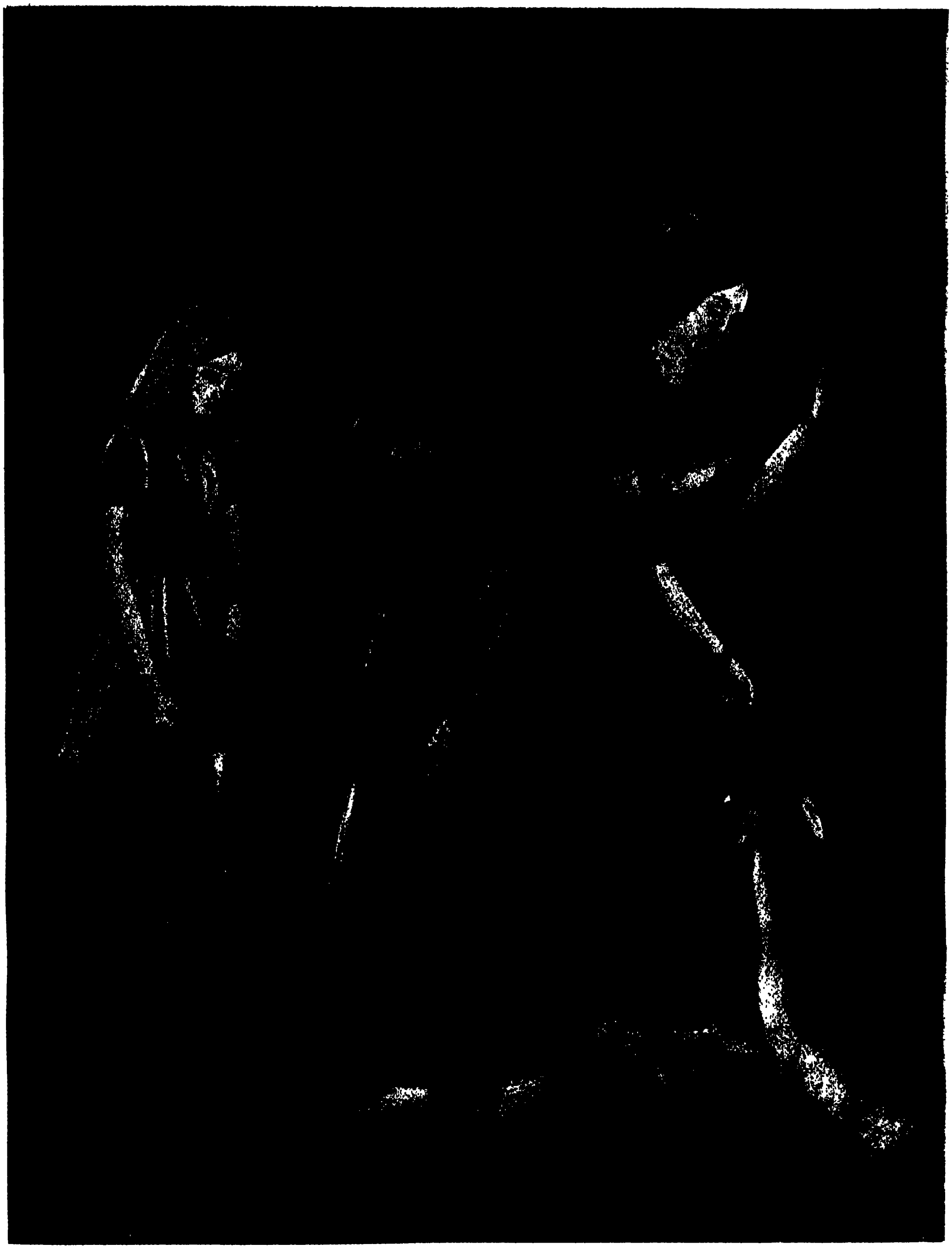
সত্যিই তাই, কানু বুঝ্‌তেই পারেনা যে তা'র হ'ল কি! কারো সাথে কথা ব'ল্‌তে ভালো লাগেনা, খেল্‌তে ইচ্ছে করেনা, সকলে ঠাট্টা করে, খ্যাপায়, সে সবও যেন কানে যায় না! মা গায়ে হাত দিয়ে বলে, কানাই, তোর কি জ্বর টর হ'চ্চে? কেমন ক'রে ঘুরে বেড়াস্। ভালো ক'রে খাস্‌না, হ'ল কি তোর?

রাত্রে পড়্'তে বসে; কিন্তু পড়ায় মন লাগে না।

সেদিনকার মতন্ আজ্‌কে আবার হাতের লেখার পাতাখানি খুলে কানু লিখ্‌তে বস্‌ল :—

বীণাদি,

আপনার কাছে একটু যাই, কিন্তু আপনি রাগ করেন। আমার মনে যে কত কষ্ট লাগে তা' আপনি একটুও বুঝ্‌তে পারেন্ না। আমার দিদি নাই, তাই আপনাকে দিদি ব'লে আমার ডাক্‌তে ইচ্ছা করে, আপনার সাথে একটু বেড়াতে ইচ্ছে করে। যাক্, কি আর ক'র্‌ব।



বিচিত্রা

শকুন্তলা

কার্ত্তিক, ১৩৩৯

শিল্পী—শ্রীমতী লীলা মিত্র

আমি ছোটলোক, গরীব। আমি বুঝেছি আপনি আমার সাথে কথা ব'ল্‌বেন্ না। কানাই—

চিঠিখানা দু'তিন বার প'ড়ল আবার সেদিনকার মতনই সেখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

বীণা অশোককে নিয়ে রোজই দীঘির ধারে বেড়াতে যায়। কানু ভাবে আর কখনো ওদিকে যাব না। কি হবে মিছামিছি গিয়ে? বীণাদি তো আর তা'কে দেখতে পারেন্ না!

তবুও যায়। এতো দৃঢ় সঙ্কল্প—তাও যায় ভেঙে। কিসের দুরাশায় বীণাদির কাছে ওর মন ছুটে গেল, তা'ও নিজেই জানে না। কি জানি বীণাদি যদিই একটা ডাক দেয়! তা' হলে…

ওর সমস্ত শিশু-হৃদয়টি একটা অজানা আনন্দে কেঁপে ওঠে।

রোজকার মতনই বীণা আর অশোক বের হয়েছিল। কানুর ইচ্ছে হ'চ্ছিল অশোককে ডাক দেয়, কিন্তু যদি বীণাদি কিছু বলেন, সেই ভয়ে পিছন পিছনেই একটু দূরে স'রে স'রে চল্‌তে লাগ্‌লো।

পুরাণো দীঘি। জল কমে খারাপ হ'য়ে যায়, তাই প্রত্যেক বর্ষায় দীঘির একটা কোণে সরু নালা ক'রে বাইরে মাঠের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, সেই নালা দিয়ে বর্ষার নতুন জল এসে দীঘি ভ'রে ফেলে। বীণা অশোক নালা পার হ'য়ে চলে গেল।

কানু চ'লেছিল অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে। কি ভাব্‌ছিল সেই জানে। হয়তো বা বীণাদিরই কথা। নালার মুখের কাছে এসেও নালাটার কথা ওর মনে হ'ল না। খেয়ালও ক'রল না। এক পা বাড়াতেই একেবারে ঝুপ্ ক'রে প'ড়ে গেল নালার ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বীণা পিছন ফিরে চাইল।

বীণা বল্‌ল, অশোক চল্‌তো ফিরে—আমার যেন মনে হ'ল কে নালার মধ্যে প'ড়ে গেচে!

নালার মুখে এসেই উঁকি দিয়ে অশোক অবাক হ'য়ে ব'ল্‌ল সে কিরে কানাই, তুই এর মধ্যে পড়ে গেলি কেমন ক'রে?

ততক্ষণে কানু উঠে দাঁড়িয়েচে। নালার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো—কাপড়ে গায়ে মাথায় কাদা লেগে অদ্ভুত চেহারা হয়েচে!

বীণা ব'ল্‌লে, কিরে, কথা বল্‌চিস্ না যে? ওমা, এর ভেতরে প'ড়্‌লি কি ক'রে? আস্‌চিলি কোত্থেকে?

বীণা হেসে খুন!

অশোকও হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, যাচ্চিস্ কোথায়, আর তুই এই নালার ভেতরেই বা… ..

কানু লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাচ্চিল। মুখ নীচু ক'রে কোনো মতে অশোকের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে বল্‌ল, তোর কাছেই এসেচিলুম, তোর ব্যাকরণ খানা একটু নিতে। তোর পেছন পেছনই আস্‌চিলুম, ভাব্‌লুম তুই বুঝি বাড়ীর দিকেই যাচ্চিস্। তুই কি এখন যাবি বাড়ীর দিকে, আর ব্যাকরণ খানা দিবি আমায় একটু?

ব্যাকরণ নিতে আসার কথাটা কানুর মিথ্যা কথা।

বীণা হাস্‌তে হাস্‌তে অস্থির!……ব্যাকরণ পড়ার চোট্ ত' কম নয় দেখ্‌তে পাচ্ছি—এত বড় বুড়ো ছেলে একেবারে খানার ভেতরে……হি-হি-হি-হি……আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ ভাব্‌তে ভাব্‌তেই……হি-হি-হি……

অশোকও হাসি সাম্‌লাতে পার্‌ছিলনা। কানাইটার সত্যি হ'ল কি? কিছু দিন ধ'রে এ আবার কেমন এক ঘুঁৎঘুঁতে ভাব!

বীণা বল্‌ল, এখন বাড়ী গিয়ে হাত পা মুছে ফেল্‌বি ত? কা'ল সকালে এসে নিয়ে যাস্ তোর ব্যা……হি-হি……চেহারাটা যা' ক'রেচিস্, ঠিক যেন একটি……হি-হি—হি-হি—হি……

সে রাত্রে কানু কিছুই খেলনা, মায়ের সাথে একটি কথাও ব'ল্‌ল না। যতক্ষণ জেগে থাক্‌লো খালি বারে বারে চোক্ মুছ্‌তে লাগ্‌লো।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। অশোকদের বাড়ীর দিকে কানু আর যায় না। অশোকের কাছ থেকে ক্লাশের

ছেলেরা তা'র দিনে দুপুরে নালার ভেতরে প'ড়ে সং সাজবার খবরটা জেনে ফেলেচে। ক্লাশে ঢুক্‌লেই চারিদিক থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ······মুখ বুজে এক কোণে ব'সে থাকে। ছুটি হবামাত্র বেরিয়ে চ'লে আসে—কারো দিকে তাকায় না। আবার পাছে বীণার সাথে দেখা হ'য়ে যায়—তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়।

এম্নি ক'রেই কয়েকদিন কেটে যায়। কিন্তু বীণার স্নেহের কাঙাল এই অবোধ বালকটির মন আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

একদিন রাত্রে কানু স্বপ্ন দেখ্‌ল, তার যেন বড়ো অসুখ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। অত্যন্ত তৃষ্ণা, হাত বাড়িয়ে যেন জল চাইল। যে জল এনে দিল, গভীর বিস্ময়ে কানু তাকিয়ে দেখ্‌ল সে যেন বীণাদি! বীণা যেন আস্তে আস্তে শিয়রে ব'সে ওর গায়ের ওপর হাতখানা রেখে বল্‌ল, লক্ষীটি ভাই, এই যে আমি তোমার কাছে ব'সে রয়েচি, তুমি ঘুমোও।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল একটা কিসের শব্দে। জেগে দেখ্‌ল বেড়ালে শিকের ওপর থেকে একটা মেটে হাঁড়ি ফেলে দিয়েচে, সেটা নীচে গড়াগড়ি যাচ্চে একেবারে ভেঙে চুরমার হ'য়ে।

সে রাত্রে কানুর আর ঘুম হ'লনা। স্বপ্নের ভিতর-কার বীণাদির হাতের ছোঁয়াটুকুকে বার বার ভাবে, ওর শরীর আনন্দে অবশ হ'য়ে আসে।

পরের দিন কানু কিছুতেই ঠিক থাকতে পর্‌লোনা।

ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা শেষ হ'য়ে গেচে। মা রান্না ঘরে গেচেন রাঁধ্‌তে। রাত্রির আঁধারে গা ঢেকে কানু বীণাদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

কাছাকাছি এসেই শুন্‌তে পেল বীণা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ক'র্‌চে। সত্যি, বীণাদির এমন চমৎকার গলা! কানু গান ভালোবাসে। বীণাদির গান আর সে শোনে নি। খিড়কির পথ দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা থামের আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

গান শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু কানু নড়্‌লনা। যদি বীণাদি আরো একটা গায়······

মিনিট খানেকও যায় নি, এর মধ্যে কে যেন হঠাৎ কানুর গলা জোরে চেপে ধ'রে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, কে রে?

ভয়-চকিত কানু পিছন ফিরে দেখ্‌ল—বাড়ীর চাকর হরিলাল।

হরিলাল অত্যন্ত জোরে ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি মেরে জিজ্ঞেস কর্‌'ল, বল্‌ শীগ্‌গির হারামজাদা, এখানে কি কর্‌তে এসেচিলি তুই! কি নাম তোর, বল্‌······

বাড়ীর ভিতরে অশোকের বাবার কানেও হরিলালের চীৎকার গিয়ে পৌছল, তিনি জিজ্ঞেস কর্‌লেন, কি হ'য়েচে রে হরিলাল?

হরিলাল চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—চোর······বাবু চোর······ চোর! মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীর সবাই লাফিয়ে খিড়কির দরজায় এসে উপস্থিত হ'ল।

ততটুকু সময়ের মধ্যেই হরিলাল কানুর কচি গাল দুটি চড়িয়ে ফুলিয়ে দিয়েচে।

কিন্তু কানু কাঁদ্‌ল না।

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌ল, আমি চুরি ক'র্‌তে আসিনি······

চুরি কর্‌তে আসনি······পাজি......হরিলাল ওর চুলের মুঠি ধ'রে ব'ল্‌ল, বাবু, ঠিক এই ছোক্‌রাকে আমি পাঁচ ছয় দিন সন্ধ্যের সময়ে বাড়ীর চারি পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি কর্‌'তে দেখেচি। সন্দেহ তখন থেকেই আমার হ'য়েচিল, ক'দিন ধ'রেই আমি তাকে তাকে আছি। শুয়ারের বাচ্চা আজ এখানে ঘাঁটি পেতেছিল!

অশোকের মা বল্লেন, ওমা, এতটুকুন্‌ ছেলে এতো বড় বদ্‌মায়েস্‌······

হরিলাল বল্‌ল, বেশী কিই বা আর কর'ত, হয়তো ঘটি বাটি বা কাপড়টা গামছাটা নিয়ে······

বীণা কাছে এসে ব'ল্‌ল—আরে এ সেই কানাই যে! ওরে ও অশোক, বেশ বন্ধু জুটেচিল তো তোর! দে হরিলাল, শক্ত মতন্‌ দু'চার কান মলা লাগিয়ে ছেড়ে দে······

যা দিয়েচি মা, সেই ঢের। এখনো ছোট আছে, আজ্‌কের কথা মনে থাক্‌লে শুধ্‌রে যাবে······

হরিলাল কানুকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে খিড়কী পার ক'রে দিয়ে এলো।

আজ্‌কের এই অবিচারে কানুর মন একেবারেই পড়্‌ল ভেঙে। হরিলালের মারে শরীরে যে বেদনা পেয়েচে, সে তো কিছুই নয়, কিন্তু সবার সাম্নে বিনাদোষে তার এই অপমান!

চোকে জল নেই, তার বদলে কানুর চোক্ মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটে বেরুচ্ছিল। নিঃশব্দে বাড়ীতে ফিরে এসে ছুটি ভাত খেয়ে তেমনি নিঃশব্দে আপনার মলিন শয্যাটির ওপর এসে একটুক্ষণ বসল, ধীরে ধীরে আবার উঠ্‌লো।

ঘরের এক কোণে একখানা লম্বা তক্তা টাঙানো, তারি প'রে ওর কাগজ, খাতা বই, দোয়াত কলম, সব সাজানো থাকে। মায়ের বাস্কের চাবিটাও তারি ওপরে ছিল। চাবিটা নিয়ে বাস্ক খুল্‌ল, কোণে হাত ঢুকিয়ে বের কর্‌ল চক্‌চকে একখানা কাঠের হাণ্ডেলওয়ালা লম্বা ছুরি। গ্রামে দশহরার মেলা হয়, গত বছর সাধ ক'রে এই ছুরিখানা মেলা থেকে কিনেছিল।

ছুরিখানা বালিশের তলায় রাখ্‌ল, ছুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে ব'সে আবারো যেন কি একটু ভাব্‌লো, তার পরে শুয়ে পড়্‌ল।

নিজের মনের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে ক্ষত বিক্ষত এই শিশুটি কি সংকল্প ক'রে শুয়ে পড়্‌ল সেই জানে।

পূবে সামান্য ফর্সা হ'য়ে এসেচে, সেই সময়ে কানু উঠ্‌লো। তক্তার ওপর থেকে হাতের লেখার খাতাটা নিয়ে একখানা কাগজ ছিঁড়ে পেন্সিল দিয়ে লিখ্‌ল:—

বীণাদি, কোনো দোষই আমি করিনি কিন্তু তোমরা কিছু না জেনেই আমার সাথে অমন ব্যবহার কর্‌লে। দিনের বেলায় যখন সকলের সাম্নে বে'র হবো, যখন ইস্কুলে গিয়ে ব'স্‌ব, তখন আমাকে আর কেউ আস্ত রাখ্‌বেনা। রাত্রের ঘটনা রটতে বেশী দেরী হবে না—সবাই জান্‌বে যে আমি চুরি ক'রতে—

আমি তা' কিছুতেই সহ্য কর'তে পার্‌বোনা। বীণাদি, তুমি আমায় ভালোবাসোনা; কিন্তু আমি তোমায় অনেক ভালোবাসি। বেঁচে থাক্‌তে আমার আর একটুও ইচ্ছে হ'চ্চেনা—একটুও না। এ জন্মের মত আমি চ'ল্লাম, পরের জন্মে আমি জানি তুমি আমারই দিদি হবে, আমি তোমার ছোট ভাই হবো। আমি ভগবানেকে রাত্রে অনেকক্ষণ ডেকেচি। বীণাদি, তুমি মা'কে ব'লো সে যেন আমার জন্যে কাঁদেনা।

তোমার কানু।

চিঠি খানা লিখে একবার প'ড়্‌ল। ম্লান মুখে একটু হেসে আগের ছু'দিনের মতনই সেখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেল্‌ল,।

*

* *

কানাইয়ের মায়ের কান্না ও চীৎকারে যখন গ্রামের লোক ছুটে এলো, তখন সব শেষ হ'য়ে গেচে। দলে দলে লোক এসে কানাইয়ের মায়ের বাড়ীর ওপরে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

বীণাও এসে দেখ্‌ল রক্তাক্ত বিছানার ওপরে কানু প'ড়ে আছে, বুকে তখনও ছুরি খানা আমূল বেঁধানো ছিল, মুখে যন্ত্রণার বীভৎস বিকৃতি। বীণা শিউরে উঠ্‌ল।

বিকেলে অশোক জিজ্ঞেস কর্‌'ল, দিদি, আজ যে ব্যাড্‌মিণ্টন খেল্‌তে চেয়েচিলি?

বীণা উত্তর দিল, ওরে বাবা, আজ আর ব্যাড্‌মিণ্টন ফিণ্টন্ খেল্‌তে পার্‌বোনা। কানাই ছোঁড়াটার সেই রক্ত-মাখা ভয়ানক চেহারাটার কথা মনে হ'তেই হাত পা একেবারে গুটিয়ে আস্‌চে। বাবাগো, আজ রাত্রে ঘুম আর আস্‌চেনা আমার কিছুতেই……

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

পঞ্চভূতের সাহিত্য চর্চ্চা

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ

ব্যোম আমাকে কহিল—"দেখ, আমি তাহাকেই সাহিত্য বলিব যাহা মনকে শুধুই আনন্দ দেয় না, শিক্ষাও দেয়।"

ক্ষিতি কহিয়া উঠিল—"দিব্য চুপ করিয়া বসিয়া বর্ষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম, তুমি আবার ফ্যাসাদ বাধাইলে।—কোথায় এখন মেঘদূত পড়িয়া রসাস্বাদন করিব, তাহা নহে তোমার গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শুরু হইল।"

ব্যোম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—"আনন্দ এবং শিক্ষার স্বরূপ প্রথমে বুঝিলে আমার কথাটা অতি সহজেই বুঝা যাইবে।"

সমীর এতক্ষণ আমার পুস্তকাগারে পঠনযোগ্য উপন্যাস খুঁজিতেছিল; সে এইবার একটি ভয়াবহ রূপে স্থূলকায় ও বৃহৎ অভিধান হাতে লইয়া বলিল,—"এই বইখানি তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলে আমরা আনন্দ পাইব এবং তুমিও প্রচুর শিক্ষা লাভ করিবে।"

ব্যোম তাহার এই পরোপকারেচ্ছার প্রতি নিতান্ত অমনোযোগ দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"এখানে আনন্দ বলিতে আমি নিছক আনন্দের কথা বলিতেছিনা; সাহিত্য পাঠে মনে যে অপূর্ব্ব রসের অবতারণা হয় তাহা কেবল মনের বিশিষ্ট কেন্দ্রে তৃপ্তি সঞ্চার করিয়াই শেষ হইয়া যায় না। তাহা মনের আরও একটি সুপ্ত বৃত্তিকে জাগাইয়া তুলে—তাহা গ্রন্থকারের মনের সহিত সহানুভূতি। এই তৃপ্তির ভাব ও সহানুভূতিকেই আমি আনন্দ বলিব। সাহিত্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া থাকে—তাহা শিক্ষা। শিক্ষা বলিতেও আমি ভাল এবং মন্দের তারতম্যজ্ঞান অথবা 'ইহা করিও,' 'ইহা করিওনা,' 'ইহা করা ভাল' এইরূপ উপদেশাবলীর সংগ্রহ বলিতেছি না। যাহা মনকে জগতের অভিজ্ঞতার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় এবং উপযুক্তরূপে পরিণত হইতে সাহায্য করে আমার মতে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আর এই আনন্দ এবং শিক্ষা যাহাতে থাকে তাহাই সাহিত্য।"

ক্ষিতি কহিল,—"তাহা হইলে তোমার মতে যে পুস্তক মনকে তৃপ্ত করে এবং গ্রন্থকারের মনের ভাবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া মনকে অভিজ্ঞ ও পরিণত হইতে সাহায্য করে তাহাই সাহিত্য?"

সমীর বলিল—"এবং ইহা হইতে আমরা এই ধারণা করিতে পারিনা কি যে, যে-পুস্তক উহা করেনা অথবা উহাদের একটা করে তাহা সাহিত্য নহে? সুতরাং দেখিতেছি ব্যোমের থিওরির ভিতর আরও একটি থিওরি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আনন্দ এবং সহানুভূতি সরবরাহ করিয়া একই সময়ে মনকে অভিজ্ঞ ও পরিণত করা—ইহাই হইল ব্যোমের মতে সাহিত্যের মানদণ্ড। আমার নিরতিশয় আশঙ্কা এই যে এই মানদণ্ডে হিসাব করিলে বহু পুস্তকই সাহিত্যের আসনচ্যুত হইয়া পড়িবে, কারণ সবগুলি পুস্তকই Pilgrim's Progress বা মোহমুদ্গর নহে। কেহবা নিছক আনন্দ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়, কেহবা শুধু উপদেশেই পর্য্যবসিত, আবার কেহবা ও দুইয়েরি' বাহির, তাহাদের কাজ অন্য কোনও রূপে মনকে আকৃষ্ট করা। অথচ তাহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের আসর জম্‌কাইয়া আছে। তাহাদের সম্বন্ধে ব্যোম কি বলিবেন?"

ব্যোম বলিল—"তুমি মনকে তৃপ্ত করা কথাটাকে শুধু ঔদরিকের উদর পরিপূর্ত্তির তৃপ্তি অথবা প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের তৃপ্তির পর্য্যায়ে ফেলিয়া নিরস্ত হইতেছ কেন? মনের কোনও একটি বিশেষ অবস্থার রসদ জোগানোর যে তৃপ্তি, তাহার কথাইত' আমি বলিয়াছি, তোমরাত' আমার কথাটা শেষ করিতেই দিলে না। মন যাহা চায় সাহিত্য

তাহাই জুগাইয়া চলে। প্রেম, লজ্জা, আনন্দ, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদির মধ্যে মন যাহা চায় সাহিত্য তাহাই সরবরাহ করিয়া মনকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, এবং সাহিত্যের এই জোগাইবার কৌশলপূর্ণ চেষ্টাই সাহিত্য-স্রষ্টার প্রতি মনকে সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তোলে। মনকে খুসী রাখিলে মনও বলে আহা!—আর এই মনকে তৃপ্ত করিবার জন্য সাহিত্যে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয় তাহাই মনকে অভিজ্ঞতা এবং পরিণতি দান করে। সুতরাং এই কার্য্য গুলির প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং অবিচ্ছিন্ন। কাজেই কোনও সাহিত্য ইহার একটি উদ্দেশ্য লইয়া তৈয়ারি হইতে পারে না,—ইহার সকল গুলিই তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহাই আমার বক্তব্য।"

ক্ষিতি কহিল,—"যদি অভয় পাই তবে আমিও সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা খাড়া করিতে পারি; তবে আমি তাহার ব্যাখাকার হইতে পারিবনা। আমার মনে হয় যাহা রসের সন্ধান দেয় তাহাই সাহিত্য। এই রসের সন্ধান দেয় বলিয়াই মন সাহিত্য হইতে আনন্দ গ্রহণ করিতে পারে এবং এই রসের সন্ধান পাইয়াই মন অভিজ্ঞতাও লাভ করে। স্রষ্টা তাঁহার আশ্চর্য্য কলানৈপুণ্য কল্পনা এবং বাস্তব মিশাইয়া রস সৃষ্টি করেন। সন্ধানী মন সেই রস গ্রহণ করে এবং তাহা নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া অভিজ্ঞতার মৌচাক নির্ম্মাণ করে। রস-সৃষ্টির নামই সাহিত্য এবং ইহাই প্রধান প্রতিপাদ্য। আনন্দ গ্রহণ এবং অভিজ্ঞতা লাভ ত' কেবল তাহার উপপাদ্য মাত্র। অতএব আমার মনে হয়—"

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ হইতে না হইতেই অধীরকণ্ঠে কহিল "তোমারা যদি এমন করিয়া সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে থাক তাহা হইলে ত' তাহার সীমা থাকেনা! আসলে তোমরা কেহই ঠিক সংজ্ঞাটি দিতে পারিতেছ না, কেবল সাহিত্যের কতকগুলি ধর্ম্মেরই কথা উল্লেখ করিতেছ। তোমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছ তাহা ত' সাহিতের কয়েকটি বিশেষত্ব মাত্র,—অল্পকথায় সাহিত্যের একটি ধারণা দিতে পারিলে কই?"

সমীর মাথা নাড়িয়া কহিল—"দীপ্তি যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য, তোমরা সাহিত্যের সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে পারিলে কই? তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা তোমাদের ব্যক্তিগত মত;—ইহাতে আমাদেরই বা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? আমার ত' মনে হয় সাহিত্য একটি সম্পূর্ণ অন্য জগৎ, আমরা ইহার সম্বন্ধে কোনও সংক্ষিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ধারণা করিতেই পারি না। গল্পের শিশুর মত আমরা ইহার দরজা খোলা পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ি এবং ইহার ভিতরের অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাক্যহারা হইয়া যাই, ইহার ভিতর নিজেকে হারাইয়া ফেলি। শুধু খাওয়া পরা এবং ঘুমান ছাড়া জীবনের আরও একটা দিক আছে—যাহার বিহনে জীবন চলিতে পারে বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—সেটা হইল মনের জীবনের দিক। তাহার জন্যই সাহিত্য। শরীরের জন্য যেমন খাওয়া পরা প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যের প্রয়োজন সেইরূপ মনের জন্যও সাহিত্যের প্রয়োজন। আর ইহা এমনই চির অভিনব, বিস্তৃত এবং বহুধা বিভক্ত যে ইহার সম্বন্ধে সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা করাও দুরূহ।"

আমি কহিলাম—"হইতে পারে সাহিত্য-জগৎ ওইরূপ, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য কি সে সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা উচিত। মনকে রসের সন্ধান তথা আনন্দের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করা সাহিত্যের ধর্ম্ম হইতে পারে বটে কিন্তু আসলে সাহিত্যটা কি? আমার মনে হয়, যে ধারা-বাহিক ভাবস্রোত ভাষায় প্রকাশ পাইয়া মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে তাহাই সাহিত্য। তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিতে পার ত' আমার কথাটার তাৎপর্য্য শুনাইয়া দিই।"

ক্ষিতি কহিল "তোমার তাৎপর্য্য ত' চলিতে থাকুক, তাহার পরে না হয় অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।"

আমি বলিতে সুরু করিলাম—"সৃষ্টির আদি হইতে মানব আপনার মনের ভাব অন্যকে প্রকাশ করিবার জন্য অদম্য চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টাই ভাষার জন্ম দিয়াছে, এবং ভাষা ক্রমে সাহিত্যের জন্ম দিয়াছে। মানুষ যাহা বলিতে চায় তাহা সোজাসুজি জানাইয়া আর ক্ষান্ত হইতে পারিল না, তাহার উপর একটু কারিকুরি করিয়া একটু সুন্দর করিয়া লইয়া জানাইল। এই সুন্দর করিয়া বলিবার ভঙ্গী অবশেষে

সাহিত্যে পরিণত হইল। সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাসই এই নিজের বক্তব্যকে সুন্দর করিয়া, গুছাইয়া, ধারাবাহিক-ভাবে বলার চেষ্টা। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ দেখিল শুধু বলিয়া গেলেই ত' চলে না, অন্যের মনে তাহার বক্তব্য যে ছায়াপাত করে না। সেই জন্য সে তাহার ভিতর তাহার হৃদয় নিঙ্‌ড়াইয়া ঢালিয়া দিল যাহাতে তাহা অন্যের হৃদয়েও আঘাত করে। ঘনছায়া-সমাচ্ছন্ন বিটপীতলে অন্ধকার গুহাপার্শ্বে নির্ঝরিণীর কূলে একদিন আদিম মানব আদিম মানবীকে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইতে আসিয়া জানাইয়া ফেলিল সে তাহার **মন**কে ভালোবাসে, দেহকে না;—কিন্তু এ কথাত' সে আগে বুঝিতে পারে নাই! ওই কালো গাছের ছায়া, ওই নৃত্যচটুল ঝরণা, ওই খণ্ড খণ্ড মেঘময় আকাশ আজ কিরূপ তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, আজ তাহার মনে হইতেছে সে যদি প্রণয়িনীর মনটুকু পায় তাহা হইলে সে আর কিছু চাহে না।—সে দেহ না পাইলেও ক্ষুব্ধ নহে, সে ত' জানে আসল জিনিষই তাহার! সে ওই দূরের ঘন পাতায় ভরা পুরাণো গাছটির আড়ালে বসিয়া বসিয়া দেখিবে সকালবেলা কেমন করিয়া তাহার প্রিয়া জল লইতে যাইতেছে! কেমন তাহার চলন ভঙ্গী,—দ্বিপ্রহরে সে দেখিবে কেমন করিয়া তাহার প্রিয়া কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত! সন্ধ্যা হইলে সে ওই পাহাড়টার বড় চূড়ার অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহার প্রিয়ার সুখনীড়টুকুর দিকে চাহিয়া। তাহার প্রিয়ার মতই সুন্দর আকাশের চাঁদটি সহসা ঠিক তাহার মাথার উপর উঠিবে, সে একবার উপরের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে তাহার গুহায় চলিয়া যাইবে!—সেইদিন প্রথম মানব-সাহিত্য রচিত হইয়া গেল—ইতিহাসের অন্ধকার পাতায়!

এই তো' গেল সাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস। কিন্তু এটুকুতেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি সাহিত্য কি। স্রষ্টার দিক দিয়া দেখিলে দেখি সে ধারাবাহিক ভাবে, পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাবধারা ভোক্তাকে উপহার দেয়। ভোক্তা সেই ভাবধারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, যাহাতে তাহা তাহার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারে;—এবং এই নাড়া দেওয়ার জন্যই সে সেই সাহিত্যের রসবস্তু সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। এই রসবস্তুর সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলেই তাহার মনও অভিজ্ঞতা লাভ করে। এইটুকুই সংক্ষেপে হইল সাহিত্যের কার্য্যক্ষেত্র বা scope, এবং এইটুকু বুঝিলে সাহিত্যের পরিচয়-সংজ্ঞা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

অতএব দেখা গেল মনকে আনন্দ দেওয়া এবং শিক্ষা তথা অভিজ্ঞতা প্রদান করা ও রসের সন্ধান দেওয়া একটা বিশেষ কেন্দ্রের উপর স্থাপিত—সেই কেন্দ্রটি হইতেছে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়া মনকে সচেতন করা। ইহাই সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম এবং পরিচয়।

এপ্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলিতে চাহি, আমার কাছে সাহিত্যের কোনও শ্রেণী বিভাগ নাই। সৎসাহিত্য বা অসৎসাহিত্য বলিয়া আমি কিছু মানিনা; কারণ সকলের মন বা উপভোগের ক্ষমতা সমান নহে। আমি খুব ভাল একখানি বই পড়িয়া প্রীতিলাভ করিব, কিন্তু একজন সামান্য হিন্দুস্থানী দ্বারবানের কাছে তুলসীদাসের রামায়ণের মূল্য হয়ত তাহার অপেক্ষাও অধিক। আমার মনে সেই পুস্তকটি যে পরিমাণ অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবে, দ্বারবানটির মনে তুলসীদাসও হয়ত ঠিক সেই পরিমাণই অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবে। অনুভূতির প্রেরণাই যদি ভাল মন্দ সমালোচনার তুলাদণ্ড হয় তবে সে ত' ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি এই বই খানি আমার ভালো লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি উপসংহার করিতে পারিনা অতএব এই বইখানি সৎসাহিত্য, অন্যগুলি সাহিত্য নয়।"

স্রোতস্বিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা আমার বড় মনে জাগিতেছে। আমার মনে হয় সাহিত্য-বিচারের একটা সাধারণ মানদণ্ড থাকা উচিত—কোনটা সাহিত্য এবং কোনটা সাহিত্য নয় জানিবার জন্য। তুমিও ইহা স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু একটু অন্য ভাবে।—সূক্ষ্ম অনুভূতির উদ্রেক যাহারা করে তাহারাই তোমার মতে সাহিত্য,—এই মাপকাটি ত' তুমি তোমার অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিয়া ফেলিলে। আমিও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমস্ত মানুষই ভালোবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যু সকলেরই আছে। বেদনা এবং আনন্দও ত'

কাহারও একচেটিয়া নয়। যিনি সত্যকারের স্রষ্টা তিনি যেমন তোমার মনের অনুভূতিগুলিকে সচেতন করিবেন, তেমন আমার মনের অনুভূতিগুলিকেও করিবেন, রাম শ্যাম যদুরও করিবেন। সমগ্র মানবজাতি একই প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে চলে। যাহা তোমার ভাল লাগিয়াছে তাহা আমারও ভাল লাগিবে, রামেরও লাগিবে, শ্যামেরও লাগিবে, কারণ মনের সাধারণ অনুভূতিগুলিত' সকলেরই সমান।"

আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম—"ব্যোম মনের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন। আমিত' আগেই বলিয়াছি, সাহিত্য মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে সচেতন করিয়া রসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত করে।—এই রসের সন্ধানই পরিশেষে আমাদের সত্যের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেয়। সেই রসের সন্ধান হইতে সত্যের উপলব্ধি পর্য্যন্ত পথটি নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ, এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াই মনের অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়। মন সেই ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যে অবস্থায় পরিণত হইয়া সত্যের উপলব্ধিতে সমর্থ হয় তাহাই তাহার অভিজ্ঞতার চরম সমাপ্তি। সুতরাং সাহিত্যের ধর্ম্ম বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে সাহিত্য প্রথমে আমাদের সত্ত্বাকে জাগরিত করিয়া রসমুখী করিয়া তোলে, এবং এই রসের সন্ধান-সমাপ্তিতে জীবনের চরম সত্যের বিকাশ হয়।"

স্রোতস্বিনী ইহাতে কহিলেন,—"কে জানে, আমি অত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে পারি না। আমি সোজাসুজি তাহাকেই সাহিত্য বলিতে চাহি যাহা আমাদের সাহিত্য-স্রষ্টার মনের ভিতর দিয়া জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়—যাহাতে জগতের সুখে আমরাও সুখী হইতে পারি, জগতের দুঃখে আমরাও দুঃখিত হইতে পারি। গ্রন্থকার তাঁহার নিগূঢ়তম অন্তর আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দেন, আমরা তাহা হইতে মণিরত্ন আহরণ করিয়া নিজের মনের দীপ্তি বাড়াই। সমীর যে বলিয়াছেন সাহিত্য ব্যতীত মানবের জীবন সৌন্দর্য্যহীন হইয়া যায়, সে কথা খুবই সত্য। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে একটি কথা বলিয়াছেন যাহার আমি প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি;—আমি বলি মানবের জীবন হইতে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সাহিত্য জগৎ সাধারণ জগৎ হইতে পৃথক হইয়া নহে, সাধারণ জগতের ভিতরই আর একটা জগৎ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহই সাহিত্য ছাড়া বাঁচিতে পারে না। আমি ভাল ভাল বই পড়িয়া যে আনন্দ পাই, ওই নিরক্ষর বেহারাটি তাহার গ্রাম্য গানেও ঠিক সেইরূপে আনন্দ পায়। তাহাই তাহার মনের উৎকর্ষ সম্পাদন করে। শিশুর রূপকথা, চাষার গান, অর্দ্ধশিক্ষিতের রামায়ণ মহাভারত এবং উচ্চশিক্ষিতের আধুনিক মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণপূর্ণ উপন্যাস,—সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত, সকলেই মনের খোরাক জোগাইতে ব্যস্ত;—সে হিসাবে ইহাদের সকলগুলিই সাহিত্য। সাহিত্যের একটা অভিজ্ঞান আমি মানি যাহার দ্বারা সাহিত্যকে অতি-সাধারণ জিনিষ হইতে পৃথক করা যায় এবং যাহার দ্বারা তাহাকে সাহিত্য বলিয়া চেনা যায়। তাহা তুমি যাহা এই-মাত্র বলিলে, মনের সূক্ষ্ম ভাবতন্ত্রীগুলিতে আঘাত দিয়া রস ও সত্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়া। সমালোচক এই মাপকাঠি দিয়াই সাহিত্যের বিচার করিবেন, যাহাতে এই বিশ্ব-ভাবুকতার চিহ্ন দেখিতে পাইবেন তাহাকেই সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমাদের সকলকে চঞ্চল দেখিয়া ব্যোম একটা দেহ ও আত্মা ঘটিত আলোচনা সুরু করিয়া আমাদের চমৎকৃত করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় সহসা স্রোতস্বিনীর নানা খাদ্যসম্ভার সহ গৃহে প্রবেশ ঘটিতেই তাহার উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। স্রোতস্বিনী সেই সুখাদ্যগুলি যথা-স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিনয়-নম্রবচনে আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও তাঁহার এই সৌজন্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করা অনাবশ্যক বোধে মনের খোরাক ফেলিয়া দেহের খোরাক জোগাইতে ব্যস্ত হইলাম। ইহারই মধ্যে কোন এক সময় ভোজনরত সমীর মন্তব্য প্রকাশ করিল—শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা যেরূপ সচেতন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তিনিই কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার আসন পাইবার অধিকারিণী। ইহাতে স্রোতস্বিনী তাহার সলজ্জ প্রতিবাদ করিলেন এবং সমীরকে আরও দুইখানি কচুরি ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়া আমাদের ঈর্ষার সঞ্চার করিয়া দিলেন।

মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অদৃশ্য শত্রু

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

হঠাৎ সোমেশ শুন্‌তে পেলো, বাথরুমে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে, তা'র চিন্তার প্রবাহে লাগ্‌লো রূঢ় আঘাত; ভুলে গেলো, এইমাত্র সে কী লিখ্‌তে যাচ্ছিলো। কাগজের মুখের ওপর, আঙুলের মধ্যে তা'র কলম যেমন ছিলো, তেম্‌নি ধরা রইলো; তেম্‌নি, কাগজের ওপর মুখ নীচু করে' নিজকে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতে দিলে। ছপ্‌ ছপ্‌, ছপ্‌ছপ্‌। প্রত্যেকটি শব্দ হাতুড়ির বাড়ির মত তা'র বুকে এসে লাগছিলো। সুধা কাপড় কাচছে। রান্না শেষ করে', এখন সে ঢুকেছে বাথরুমে—কাপড় কাচ্‌তে। বাথরুমটা ছোট, অসম্ভবরকম ছোট; অজস্র জল-নিঃসরণে সাঁৎসেঁতে; বাথরুমটা অন্ধকার; তা'র ওপর, শীতকালে কোন্‌খান দিয়ে যেন ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া এসে ঢোকে সেই ঘরটার মধ্যে, যেন তা'কে আঘাত দেবার জন্যেই। সুধা···ছপ্‌ছপ্‌! যেন শারীরিক যন্ত্রণায় সোমেশের একবার চোখের পলক পড়্‌লো। সুধার কোনোরকম কষ্ট হচ্ছে, মুহূর্ত্তের জন্যও এতটুকু কষ্ট হচ্ছে, এই চিন্তা, এই কল্পনাও সোমেশের পক্ষে অসহ্য। পাছে সুধার কিছু হয়—এবং এই 'কিছু'র ভয়ানকতার সীমা নেই—এই আশঙ্কা ইস্পাতের কঠিন হাত দিয়ে তা'র বুকের ভিতরটা আঁকড়ে রয়েছে; সামান্য কারণেই এমন হয়, যেন তা'র হৃৎপিণ্ড গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। কারণ, সুধার জন্য তা'র ভালোবাসা—তা একটা ব্যাধির মত, বিরামহীন উত্তেজনার মত, মস্তিষ্কের উন্মাদনার মত। এত ভালোবাসা, তাই এত ভয়। একান্ত করে' কাছে পেয়েছে, হারাবার আশঙ্কা, তাই, স্থায়ী, অদৃশ্য একটা ক্ষতের মত। এ-ভালোবাসায় আনন্দই যন্ত্রণা দেয়; মিলনের পরিপূর্ণতম মুহূর্ত্ত আনে বিচ্ছেদের দুর্ব্বিষহ উপলব্ধি; হৃৎশব্দের তালে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হ'তে থাকে: 'যদি, যদি—!' হে ঈশ্বর, যদি কখনো, কখনো এর শেষ হয়! কা'র কাছে প্রার্থনা কর্‌ছো? কে শুন্‌বে তোমার প্রার্থনা? সময় বয়ে' যাচ্ছে; অনিবার্য্য, ক্লান্তিহীন, সময়ের অফুরন্ত জল গড়িয়ে যাচ্ছে; মুহূর্ত্তের সংযোজনায় চির-বর্দ্ধমান শৃঙ্খলের মত চিরকাল; সেই শৃঙ্খলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কতদূর চল্‌তে পার্‌বে তোমার জীবন, তোমার এই ভালোবাসা? মরণের কারাগারে বন্দী হ'য়ে আমরা জন্মেছি; আমাদের পক্ষে ভালোবাসা? মানেই এই ভয়—যদি হারাই, তা'রে যদি হারাই! ভালোবাসা যত গভীর হ'বে, পারস্পরিক আত্ম-দানে যত সম্পূর্ণ হ'বে, ততই ভয়, ততই বেশি ভয়। এত ভালো, এত বেশি ভালো—এ কি কখনো স্থায়ী হ'তে পারে? 'Do not die, Phene!' যে-রাত্রে তা'দের বিয়ে হয়, সোমেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানায় যেতে পারে নি; শায়িতা সুধার সঙ্গে কথা বল্‌তে, তা'র দিকে দৃষ্টি-পাত কর্‌তেও সোমেশ পেরে উঠ্‌ছিলো না: নিঃশব্দ, নিস্পন্দ একটা চেয়ারে বসে' মনে মনে বার বার আবৃত্তি কর্‌ছিলো:

'Do not die, Phene! I am yours now, you
Are mine now, let fare reach me how
she likes,
If you'll not die—so, never die!'

সুধা কি ঘুমিয়েছে? বোঝ্‌বার উপায় নেই। বিছানা থেকে কোনোরকম শব্দ আস্‌ছে না—না চুড়ির ঠুংঠাং, না শাড়ির খস্‌খস্‌, না ঘুমন্ত লোকের গভীর নিঃশ্বাস-পাত। চারিদিকে মধ্য-রাত্রির স্তব্ধতা। নিজের মনে-মনে, নিঃশ্বাসের স্বরে সোমেশ বার-বার বল্‌ছিলো: সুধা, সুধা। সুধা, সুধা, সুধা। মরে' যেয়ো না মরে' যেয়োনা। রাত্রির গভীরতার মাঝখানে সুধা এই ঘরে শুয়ে' আছে, শুয়ে'—তা'রি জন্যে অপেক্ষা

করছে—আশ্চর্য্য! এত আশ্চর্য্য যে একে ঠিক বিশ্বাস করে' ওঠা যায় না। এত সুন্দর, এই পৃথিবীতে তা কী করে' সম্ভব হ'লো? যে-নির্ব্বিচার, নির্ব্বিকার নিয়তির দ্বারা এই পৃথিবী পরিচালিত, তা'র সঙ্গে সম্পূর্ণ মানিয়ে যায় যদি—যদি এই মুহূর্ত্তে সুধা মরে' যায়। মরে' যেয়ো না, সুধা। আমি এখন তোমার। আমাকে ভালোবাস্‌তে দাও। চেয়ারে বসে' সোমেশ রাত্রি প্রায় ভোর করে' দিয়েছিলো। সেই ভয়, সেই প্রার্থনা, উদ্দাম হৃদয়-স্পন্দন—দু' বছরের বিচ্ছেদহীন বিবাহিত জীবনেও তা'দের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে নি; এখনো, সোমেশ সুধাতে অভ্যস্ত-হ'য়ে ওঠে নি; এখনো সুধা তা'র কাছে অন্ধকারে অরণ্যের মত রহস্যময়—অনেকটা অবিশ্বাস্য, অনেকটা স্বপ্ন।

ইতিমধ্যে, বাথরুম থেকে ছপাছপ শব্দ আস্‌ছেই। উঃ, সুধা আজ কাপড় কেচেই দিন কাটিয়ে দেবে নাকি? কেন, কেন ও আদৌ ও-সব কাজ করে? সুধাকে কোনো শরীরের কাজ করতে দেখ্‌তে সোমেশ সহ্য করতে পারে না। ও যখন কয়লার উনুনের সাম্‌নে বসে' রান্না করে বা নীচু হ'য়ে ঘর ঝাঁট ছায়, বা পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মশারিটাকে যথেষ্ট উঁচু করে' খাটায়—যখনি তা'র এ-সব চোখে পড়ে, সে হয়-তো চোখ ফিরিয়েই নিতো, যদি না তা'তে সুধার শরীরের নানা সুন্দর ভঙ্গী থেকে তা'র চোখ বঞ্চিত হ'তো। মোট কথা, সুধাকে যে এ-সব কষ্টের কাজ (যে যাই বলুক, ঘর ঝাঁট দিতে পিঠ ব্যথা হয়ই, গন্‌গনে কয়লার আঁচে শরীর খারাপ না হ'য়েই পারে না) করতে হয়, এই ব্যাপারকে সোমেশ কিছুতেই স্বীকার করে' নিতে পারে না, সব সময় মনের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করে। কিন্তু এর গত্যন্তরই বা কী আছে, সোমেশ ভেবে পায় না। চাকর অবিশ্যি একজন আছে, কিন্তু তা'কে তা'র নির্দ্দিষ্ট কাজের বাইরে কিছু করতে বল্‌লেই সে প্যান্‌প্যান্‌ করতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া, সুধারও আবার বাড়াবাড়ি আছে; এমন অনেক কাজ, যা তার নিজের হাতে না করলেও চলে তা-ও তার করা চাই; একই কাজ অনাবশ্যকভাবে (অন্তত সোমেশের তাই মনে হয়) দু'বার ক'রে করা চাই। সে যদি কিছু বল্‌তে যায়, সুধা একটু হেসে চুপ করে' থাকে। তার এ-সব বলা যে কত বৃথা, সোমেশও তা বুঝ্‌তে পারে। ও-সব কাজ সুসম্পন্ন না হ'লে অসুখী হ'বে সে-ই নিজে। কতগুলো জিনিষ না হ'লে তা'র চলে না। একটু খারাপ রান্না হ'লে তা'রি পেট ভরে' খাওয়া হয় না; মশারিটা যথেষ্ট উঁচু না হ'লে দম আটুকে আসে তা'রি, ঘরটা একটু নোঙ্‌রা থাক্‌লে ছটফট্‌ করে সে-ই। সত্যি কথাটা যদি স্বীকার করতেই হ'বে, তা'রি জন্যে তো সুধাকে অত কষ্ট করতে হয়। নিজের ওপর সোমেশ ভয়ানক চটে' ওঠে; স্বার্থপর বলে' নিজেকে গালাগাল ছায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তা'র মনে হয় যে তা'র অভ্যেস সে বদ্‌লাতে পার্‌বে না; তা'র অতি তুচ্ছ সুখের জন্য সুধাকে কষ্ট করতে তা'কে চোখের ওপর দেখ্‌তে হ'বে। দ্বিধায়, সংশয়ে, নিজের অক্ষমতার চেতনায় মনের যন্ত্রণা আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে।

এক-এক সময় তা'র মনে হয়, এই আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিয়ে করা বোধ হয় তা'র ভুল হয়েছে। গল্প লিখে সে সংসার চালায়; খ্যাতির অনুপাতে তা'র উপার্জ্জন অতি সামান্য। তা'র কোনো ছোক্‌রা অ্যাড্‌মায়ারার যখন অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তা'র কাছে আসে, সে হয়তো তখন ভাব্‌ছে, কাল্‌কের মধ্যে কিছু টাকা না পেলে গেলে বাজার খরচ নিয়েই মুস্কিল হ'বে। অবিশ্যি এমন নয় যে তা'কে অসাধারণ কোনো কষ্ট করতে হয়; একা হ'লে সে বেশ খুসি মতই খরচ করতে পার্‌তো। তা না-হয় না-ই পার্‌লো, কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে সুধাকে এনে সে—কষ্ট দিচ্ছে না তো? সুধা যদি কষ্ট মনে না-ও করে, এ তা'র নিজেরি কষ্ট, তা'র কষ্টই বেশি। সমস্ত আকাশ যদি তা'র হ'তো, সে সূর্য্য-চন্দ্র উপহার দিতো সুধার দুই হাতে, মুঠি মুঠি তারা ছিটিয়ে দিতো ওর চুলে। কিন্তু দরিদ্র সে, সে কী দিতে পারে ওকে, শুধু তা'র স্বপ্ন ছাড়া, যেখানে রাণীর মত ওর গৌরব, সমস্ত আকাশের মত ওর ঐশ্বর্য্য? 'Tread softly because you tread on my dreams.' আমি দরিদ্র, স্বপ্ন ছাড়া আমার আর-কিছু নেই; আমার স্বপ্ন তোমার পায়ের নীচে পেতে দিলাম।

এতক্ষণে সোমেশের খেয়াল হ'লো, হাত থেকে কলমটা

নাবিয়ে রাখ্‌তে। উঠে' সে ঘরের মধ্যে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লো। বিয়ে করা কি তার অন্যায় হ'য়েছে? কিন্তু সে কি নিজেই জান্‌তো যে এত শীগ্‌গির সে বিয়ে করে' ফেল্‌বে? সুধাকে যে সে বিয়েই কর্‌বে, তা-ও কি এই সেদিনও সে ভাব্‌তে পেরেছিলো! কিন্তু কী করে' যে কী হ'য়ে গেলো! যেন নিজ থেকেই বিয়েটা হ'য়ে গেলো; কোনো পক্ষ থেকে কিছু বল্‌তে হ'লো না। শুধু মনে পড়ে গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা: আকাশ মেঘে-মেঘে রুদ্ধশ্বাস; পৃথিবীর গর্ভলীন উত্তাপ নির্গমন-কামনায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে; সমস্ত প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক, অসহনীয় স্থৈর্য্য। সৃষ্টি চিরকাল ধরে' চলে' এসে হঠাৎ যেন মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিকে লক্ষ্য কর্‌বার সময় ওদের ছিলো না—সোমেশের আর সুধার; কারণ, ওরা ছিলো আলাপে মগ্ন, পরস্পরের উপস্থিতিতে বহির্বিস্মৃত, আত্মবিস্মৃত। মেঘের আর উত্তাপের চাপে দিনের আলো অনেকক্ষণ ধরে'ই মরে' ছিলো; এইবার সেই মৃতদেহের বিগলন-ক্রিয়া আরম্ভ হ'লো; মরা আলো অন্ধকারের কবরে প্রবেশ কর্‌ছে। হঠাৎ ছুট্‌লো হাওয়া, পৃথিবীর অন্তর্বাষ্প-সংযোগে উত্তপ্ত; যে-মেঘের রঙ্‌ এতক্ষণ ছিলো ফ্যাকাশে, সে-মেঘ গাঢ় নীল হ'য়ে উঠ্‌লো; বিতাড়িত ধুলোয় বায়ুমণ্ডল ঘোলাটে। তারপর যেন সেই ধুলোর মিছিলকে তাড়া করে' ছুটে' এলো বৃষ্টি—প্রথমে বড়-বড়, উষ্ণ ফোঁটা—অবান্তর, সংযোজনাহীন; দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে ফোঁটাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বর্ষণে পরিণত হ'লো; পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে বিশাল দীর্ঘশ্বাসের মত মুক্ত হ'লো উত্তাপ।"

কী-একটা কথার মাঝখানে সোমেশ গেলো চুপ করে'। সুধা চোখ তুলে' তাকালো; মুহূর্ত্ত পরেই চোখ নিলে নাবিয়ে। আর-কোনো কথা হ'লো না। বাইরে বৃষ্টি; ঘরের ভেতর তৃতীয় ব্যক্তির মত অন্ধকার জেগে উঠ্‌ছে। মাথা নীচু করে' সুধা শাড়ির আঁচলের বিচ্যুত অংশ বার-বার আঙুলে জড়াচ্ছে; সোমেশ তা'র মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছে না, শুধু তা'র শরীরের বহিঃরেখা লঘু হাতে আঁকা একরঙা ছবির মত তা'র চোখে এসে লাগ্‌ছে। সেই মুহূর্ত্তে, সেই স্তব্ধ, অন্ধকারায়মান সন্ধ্যায় সোমেশ, জীবনে প্রথমবার, সুধাকে উপলব্ধি কর্‌লো। চার বছর ধরে' সে তা'কে জেনে আস্‌ছে, অন্তরঙ্গ ভাবে জেনে আস্‌ছে; সোমেশের জীবনের স্রোতে সুধা, আরো অনেক লোক, অনেক জিনিষের সঙ্গে সুধাও ভেসে এসেছে। সেই পরিচয়, অন্তরঙ্গতা—সেটাই ছিলো একটা আচ্ছাদন; সমস্ত চার বছর ধরে' সোমেশ সুধাকে দেখ্‌লো, সুধাকে স্পষ্ট করে' দেখ্‌তে পেলো না। হঠাৎ, সেই আচ্ছাদন হ'লো অপসৃত; সোমেশের জীবন-স্রোত একটা মোড় ফের্‌বার আগে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হ'য়ে সুধাকে আবর্ত্ত থেকে উৎক্ষিপ্ত করে' দিলো: সুধাকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, সেই মুহূর্ত্তে সোমেশ প্রত্যক্ষ কর্‌লো। সুধা স্বতন্ত্র, সুধা একমাত্র, সুধা তা'র নিজস্বতার জ্যোতিতে উজ্জ্বল। সুধা সুধা। দু'জনে স্তব্ধ বসে'; ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির পর এই নব-জাত পারস্পরিক চেতনা জেগে উঠ্‌লো। তারপর···কী করে' যে কী হ'য়ে গেলো! খানিক পরে অমলের সঙ্গে যখন দেখা হ'লো, অমল কি তা'র চোখ দেখে বুঝ্‌তে পেরেছিলো—? অমল হয়-তো গোড়া থেকেই জান্‌তো—? এখানটায় আবছায়া। তারপর—সুধার শাদা কপাল সিঁদুরে লাল হ'লো, যজ্ঞের ধোঁয়ায় লাল তা'র চোখ, আঙুলে হলদে সুতো বাঁধা তা'র বাঁ হাত সোমেশের হাতের ওপর। স্বপ্ন।

স্বপ্ন। সোমেশ ফিরে' তা'র চেয়ারে এসে বস্‌লো। সেই স্বপ্নের মোহ এখনো কাট্‌লো না। সুধাকে প্রথম উপলব্ধির বিস্ময়, সেই রোমাঞ্চ—সোমেশের অস্তিত্বকে এখনো তা পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে; বরং সোমেশের জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় অবিশ্রান্ত চলেছে, কখনো তা'র শেষ খুঁজে' পাওয়া যাবে না। সোমেশের চোখে, সুধার রহস্য এখনো অপরিসীম। সুধা তার মনোরাজ্যের আমেরিকা—নব-আবিষ্কৃত মহাদেশ: দিনের পর দিন চারদিকে জল, জল; তারপর হঠাৎ—ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঐ তো দেখা যাচ্ছে নীল বনরেখা। ঝাঁপিয়ে পড়ো সেই উপকূলে: অজানিত, বিচিত্র ঐশ্বর্য্য-নিহিত সুধার শরীরের তটভূমি; বানর-ঘন, নীল অরণ্যের মত রহস্য-সমাকীর্ণ তা'র চুল।

অন্বেষণ করো, যত পারো সন্ধান করে' ঢাখো; কিন্তু এই বিশাল মহাদেশের সমস্ত সীমা নির্ণয় কে কর্‌বে? হাওয়ার মুখে তুলে' ধরা মশালের মত জ্বল্‌ছে সোমেশের ভালোবাসা; সে-আলোয় কতটুকু আর ধরা পড়ে! তা'র ছায়াপাতে বরং, রহস্য ওঠে আরো গভীর হ'য়ে। এখন পর্য্যন্ত সুধাকে তা'র ঠিক সয়ে' যায়নি; সুধা-সম্বন্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে সে সচেতন—তীব্রভাবে, অসহ্যভাবে সচেতন। সুধা ঘরে এসে টেবিল গুছিয়ে রাখ্‌ছে; আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পর্‌ছে; মুগ্ধ চোখে সোমেশ তাকিয়ে থাকে, সুধার প্রতিটি ছোট অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে তা'র দৃষ্টি ডু'বে যায়। সমস্ত সময় সুধার উপস্থিতি, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা—সোমেশের পক্ষে তা অপরূপ এক অভিজ্ঞতার মত, হৃদয়ের গভীরতায় সৌন্দর্য্যের অনুভূতির মত। সুধার সঙ্গে কথা বল্‌তে-বল্‌তে কাগজের ওপর সে আঁকিবুঁকি কাটছে—হঠাৎ নিজের অজান্তে হয়তো লিখে' ফেলে: 'তুমি আমার জীবনের আনন্দ।'

'ক'টা বাজ্‌লো, খেয়াল আছে?'

চম্‌কে, সোমেশ মুখ তুলে' তাকালো। সুধার শাড়ি-শেমিজ এখানে-ওখানে ভেজা; জল লেগে-লেগে আঙুল-গুলো একটু শিটিয়ে গেছে। তা'র মুখ ক্লান্ত, ম্লান; চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো। 'আছে বই কি,' একটু হেসে সোমেশ বল্‌লে, 'বারোটাও বাজে নি।'

'বা রে, আজ বুঝি আর চান-টান কর্‌তে হ'বে না?'

সোমেশ বল্‌লে, 'বোসো, কথা আছে।'

'বুঝেছি—পরে হ'বে ও-সব। এখন ওঠো তো। শীতকালে কি এত দেরিতে নাওয়া খাওয়া কর্‌লে চলে?'

'এখন এ-কথা বল্‌ছো তো? আবার গ্রীষ্মকালে বল্‌বে—"দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আজকাল রোদ চড়ে' যায়, একটু সকাল-সকাল খেয়ে নিলে কী দোষ হয়?" বল্‌তে পারো, কোন্ সময়ে দেরি করে' খাওয়া বিধেয়?'

'খেতে-খেতে রোজই তো সেই একটা-দেড়টা বাজাও—খামকাই আমি বকে' মরি।'

'বক্‌তে তোমার ভালো লাগে, বকে' যাও।'

'না, সত্যি। ওঠো। কখন রান্না হয়েছে—সব বুঝি ঠাণ্ডাও হ'য়ে গেলো। আজ আবার দাড়ি-কামানো আছে নাকি?'

একবার গালে হাত ঘষে' সোমেশ বল্‌লে, 'না।—তুমি যাও না আগে।—শোনো, তোমার রোজ এত কাপড় কাচ্‌বার কী দায় পড়ে?'

'কেন, বারণ কর্‌ছো কাচ্‌তে?'

সুধার হাস্যময় স্বরে সোমেশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌লো; তবু সে জোর করে' বল্‌লে, 'কর্‌ছিই তো। কেন তুমি কাপড় কাচ্‌বে?'

'বেশ, না কাচ্‌লাম। তিন বেলা আমার কাছে ফর্সা নিমা চেয়ো না—মনে থাকে যেন।'

'ধোপাকে দিলে কী দোষ?'

'থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। যে-সব জিনিষ বোঝো না, তা নিয়ে কেন কথা বলো? ওঠো এখন। ও কী—এখন আবার সিগ্রেট ধরাবার কী হ'লো? নাঃ!'

'এই এক্ষুণি—সিগ্রেটটা শেষ ক'রেই যাচ্ছি। সত্যি বল্‌ছি, কাপড় কাচ্‌তে তুমি আর পার্‌বে না।'

'তোমার কি ধারণা মাঝে-মাঝে দু'একটা কাপড় কাচ্‌লে মানুষ মরে' যায়?'

'ঠাট্টা করতে পারো; কিন্তু আমার ও-সব জিনিষ ভালো লাগে না।' নীরবে, যেন এই প্রসঙ্গে শেষ কথা সে বলে' দিয়েছে, সোমেশ খানিকক্ষণ সিগ্রেট টান্‌লে।

'এই শোনো,' সুধা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'ব্যানার্জি ব্রাদার্সের আজ তোমাকে টাকা দেবার কথা নয়?'

'হু,' অন্যমনস্কভাবে সোমেশ জবাব দিলে।

'আজ ঠিক দেবে তো? ওদের তো আবার কথার ঠিক নেই।'

'দেখি তো গিয়ে।—উঃ,' হঠাৎ যেন সোমেশের চমক ভাঙ্‌লো, 'এক্ষুণি আমাকে খেয়ে-দেয়ে বেরুতে হ'বে। এক্ষুণি, এক্ষুণি। মুহূর্ত্ত সময় নেই।' একলাফে সে চেয়ার থেকে উঠে' দাঁড়ালো, 'সুধা, আমার তোয়ালেটা কী হ'লো? তোয়ালে?'

২

সোমেশ তাড়াহুড়ো করে' স্নানাহার শেষ করে' বেরিয়ে পড়্‌লো ; কিন্তু ব্যানার্জি ব্রাদার্সে'র বড় বাবুকে পাওয়া গেলো না ; ছোটবাবু বল্‌লেন : 'ও-বেলা আস্‌বেন, আপনার চেক নিশ্চয়ই লিখিয়ে রাখ্‌বো।' দ্বিরুক্তি না করে', সোমেশ বেরিয়ে এলো। তা'র মনটা বিরক্ত লাগ্‌ছিলো : এতগুলো সময় নষ্ট হ'লো, বাড়ি ফিরে'ও এখন আর লেখ্‌বার সময় কি মনের অবস্থা থাক্‌বে না ; বাড়ি থাক্‌লে সমস্তটা দুপুর সে কাজে লাগাতে পার্‌তো। আশ্চর্য্য, অন্যের সময় নষ্ট কর্‌তে এ-দেশের ব্যবসায়ীদের এতটুকু কুণ্ঠা নেই ! এদের মনোভাব এই যে যে-টাকা দিতেই হ'বে, তা যত দেরি করে' এবং যত আস্তে আস্তে দেয়া যায়, ততই লাভ। এ-রকম আচরণে সোমেশ অভ্যস্ত ; তবু আজকে দ্বিতীয়বার আস্‌তে না হ'লেই সে খুসি হ'তো। আজ শনিবার ; সন্ধ্যের সময় অমল আস্‌বে। শনিবার সন্ধ্যেটা নিয়মিতরূপে সে বাড়ি বসে' কাটায় : সপ্তাহের কাজ আর ঝঞ্ঝাটের শেষে একটু শান্তি ; জীবনের একমাত্র অবিমিশ্র সুখ—যা হচ্ছে গিয়ে সম-মনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ। অমল আর সুধা আর সে—কোনো-কোনোদিন আরো দু' একজন বন্ধু আসেন ; গল্প কর্‌তে-কর্‌তে শীতের রাতেরও এগারোটা বেজে যায়। আজ সন্ধ্যেয় চেক পাওয়া যে-কথা, সোমবার পাওয়াও তা-ই ; তবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাওয়াই ভালো ; নইলে সোমবার গিয়ে হয়-তো শুন্‌বে : 'এইমাত্র একটা হেভি পেমেণ্ট কর্‌তে হ'লো ; দু' চারদিন পরে না হ'লে তো হচ্ছে না।' তা ছাড়া, সুধার কথার সুরে একটু যেন দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিলো ; ওকেও নিশ্চিন্ত করা দরকার।

যে-উপন্যাসটা সে লিখ্‌ছে, তা'তে একটা প্যাঁচ লেগেছে ; এর পরে গল্পের গতি ঠিক কী ভাবে কোন্‌দিকে এগোবে, বুঝে' উঠ্‌তে পার্‌ছে না। বাস্‌-এ বসে', সে প্যাঁচটা ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌লো ; কিন্তু মনের ব্যবহার অদ্ভুত ; পারার মত সে দ্রুত ও ঠকানো ; তা'কে ধর্‌তে গেলে সে পালিয়ে যায়, ফস্‌কে যায় ; তা'কে যখন কোনো নির্দিষ্ট, জরুরি বিষয়ে ভাবতে বলা হয়, ঠিক তখনই যত তুচ্ছ, অবান্তর জিনিষের মধ্যে নিজকে সে ছড়িয়ে দেয় গল্পের সমস্যা যেমন ছিলো, তেমনই রইলো ; বাস্‌-এর জানালা দিয়ে সোমেশ রইলো শীতের রোদ্রে উজ্জ্বল বাইরের দিকে তাকিয়ে। এই রাস্তা দিয়ে সহস্রাধিকবার সে যাতায়াত করেছে—এক-এক সময় এমন একঘেয়ে, পুরোনো মনে হয়। তবু তা'র চোখ আর মন সেই রাস্তাতেই সন্নিবিষ্ট হ'লো ; এখানে যে একটা চায়ের দোকান আছে, এ তো কখনো তা'র চোখে পড়ে নি ; ঐ দালানটার তেতলায় যে একটা মলিন সাইনবোর্ড কায়স্থ-সমাজকে ঘোষণা কর্‌ছে, তা-ও সে আজকেই প্রথম লক্ষ্য কর্‌লো। সহস্রাধিকবার এই রাস্তায় সে যাতায়াত করেছে ; তবু, কেউ যদি তা'কে জিজ্ঞেস করে, বিশ্ব-ভারতীর উল্টো দিকে কোন্‌ দোকান, সে চট্‌ করে' তা'র জবাব দিতে পারবে না। কত ছোট ছোট গলি সে রোজ চোখে দেখ্‌ছে ; তা'দের নাম জানে না ; যদি কোনো উপলক্ষ্যে কোনো-এক গলি খুঁজে' বা'র কর্‌তে হয়, অবাক হ'য়ে যাবে : 'ওমা, এই ! এই গলির নাম— !'···দুর ছাই, এখনো সে দোকানের আর গলির নাম নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছে ; এই ফাঁকে, উপন্যাসের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদটা কী ভাবে আরম্ভ কর্‌বে, ভেবে রাখ্‌লে কাজে দিতো না ? মনকে সে ঘাড়ে ধরে' পথে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লো ; কিন্তু পারার মত পালানো তা'র মন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে' গিয়ে পড়্‌লো বৌবাজারের মোড়ে একটা জীর্ণদর্শন বাড়ীর ওপর, যে-বাড়ি মডার্ণ্‌ ক্লিনিক বলে' সগর্ব্বে নিজকে ঘোষণা কর্‌ছে। বিরক্ত, ক্লান্ত, তা'র গল্পের সমস্যাকে সে একেবারে ভুলে' থাক্‌বার চেষ্টা কর্‌লো ; কিন্তু যতই তার মন বাইরে বাইরে ভেসে বেড়াক্‌, ভেতরে সেই চিন্তার খোঁচা রয়েছেই। ও-বিষয়ে সে কিছুতেই ভাব্‌তে পার্‌ছে না ; অথচ, ভাবা যে তা'র উচিত, তা-ও ভুল্‌তে পার্‌ছে না। বিশ্রী।

বাড়ি ফিরে' এসে সে ভাব্‌লে, জোর করে' একটু লিখ্‌বে কিনা। থাক্‌ গে—তাড়া কর্‌তে গিয়ে নষ্ট করে' লাভ নেই। আজ রাত্তিরেও আর বস্‌বে না ; পর-পর কয়েকটা রাত সে কম ঘুমোচ্ছে। মনটা কেমন যেন ঘোলাটে হ'য়ে আছে ; আজকের রাতটা ভালো করে' ঘুমিয়ে নিয়ে কাল সকালে স্বচ্ছ মন নিয়ে আবার আরম্ভ

করা যাবে। ঘণ্টাখানেক সময় সে কাটালো বই পড়ে'। তারপর চা খেয়ে তা'র তৈরি হ'য়ে নিতে-নিতে শীতের সোনালি বিকেল হঠাৎ সন্ধ্যার ধূসরতায় গলে' গেলো। 'আমি এই এলাম বলে', বেরুবার সময় সুধাকে সে বল্‌লে। ধোঁয়াটা আজকে যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশি; এই ধোঁয়ার মধ্যে বাস্‌-এ চড়্‌বার কথা ভাব্‌তেও সোমেশের আতঙ্ক হ'লো। এখন যদি তা'র না বেরুলে চল্‌তো! গিয়েই চেকটা পেলে হয়—নিতান্ত প্রয়োজনের বাইরে এক মুহূর্ত্ত সে দেরি করতে চায় না। যে-বাস্‌টায় উঠ্‌লো, সেটা আবার ভর্ত্তি; একেবারে সাম্‌নে একটা বেঞ্চি খালি দেখে সোমেশ সেখানেই গিয়ে বস্‌লো। ধোঁয়ায় রাস্তার আলো-গুলো অস্পষ্ট; একটা ভূতুড়ে শহর। কতক্ষণে সে বাড়ি ফির্‌বে! এখানটায় বসা ভুল হয়েছে; এঞ্জিনের শব্দ আর পেট্রোলের গন্ধে তা'র মাথা ভারি হ'য়ে গেলো। পা-টা একটু ছড়াবার উপায় নেই; এঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপে। এম্‌নিতেই রুদ্ধ বাতাস বাস্‌-এর ভেতরে এত লোকের নিঃশ্বাসে কলুষিত হ'য়ে উঠেছে—নিঃশ্বাস ফেল্‌তেও যেন কষ্ট হয়।

এক যুগ পরে—সোমেশের তা-ই মনে হ'লো—বাস্‌টা তা'র গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলো। সোমেশ উঠে' দাঁড়িয়ে দড়ি টান্‌লো। আর-একজন ওখানে নাব্‌বে, সে আগেই গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছে। সে লোকটি নেবে যেতেই বাস্‌-এর স্পীড হঠাৎ বেড়ে গেলো—আর একটু হ'লেই সোমেশ পড়েছিলো আর কি। কোনো-এক দিন বাস্‌ থেকে নাব্‌তে গিয়ে সে এক কাণ্ড কর্‌বে, কোনো সন্দেহ নেই। যাক্…

এবার যা হোক, তা'র চেক্ তৈরিই ছিলো; সেটা পকেটে রেখে সে তাড়াতাড়ি চলে' যাচ্ছিলো, বড়বাবু বল্‌লেন, 'একটা লিখে' দিয়ে গেলেন না?' তা-ও তো বটে! সোমেশ ফিরে' দাঁড়ালো—নাঃ, হাঙামের আর শেষ নেই। টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজ আর কলম নিয়ে ঘষ্‌ঘষ্ করে' সে বাঁধা গৎ লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো: 'I do hereby'...'দিন্ একটা ষ্ট্যাম্প্।'

বড়বাবু কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বল্‌লেন, 'বইয়ের নামই তো লিখ্‌লেন না।'

'দিন্, বসিয়ে দিচ্ছি।' উঃ, কোনো রকমে সে একবার বেরুতে পার্‌লে বাঁচে। বইয়ের নামটা ঢুকিয়ে দিয়ে টিকিটের ওপর একটা সই করে' তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এলো।

যাক্, একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেলো; এ-মাসটা স্বচ্ছন্দভাবে কাটানো যাবো। প্রথম কথা, গোটা কয়েক বই কিন্‌তে হ'বে কতদিন সে নতুন কোনো বই কেনেনি। সাম্‌নের সপ্তাহে নিউ এম্পায়ারে একটা লজ্ঞ্‌ডেইল-কমেডি আছে—সেটা দেখা যেতে পারে; সুধা আবার টম ওয়াল্‌স্‌কে খুব পছন্দ করে। সুধা একদিন কয়েকটা কুশান্ কেন্‌বার কথা বল্‌ছিলো; সে নিজে, ভালো একটা চায়ের সেট্ কেন্‌বার ইচ্ছা মাসের পর মাস শুধু স্থগিত রাখ্‌ছে।… সারাটা রাস্তা থেকে-থেকে সোমেশের এ-সব কথা মনে হ'তে লাগ্‌লো। এস্‌প্লানেড্ পার হ'য়ে এসে হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, এক টিন সিগ্রেট কিন্‌লে হয়। তাঁর সঙ্গে দুটো টাকা ছিলো—অনেকদিন থেকে জমিয়ে জমিয়ে রাখ্‌ছে; আজ তা খরচ করা যায়। এক টিন টার্কিশ—অমলটা যে টার্কিশখোর! মনে হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই বাস্ থেকে সে নেবে পড়্‌লো। সিগ্রেটের টিন নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তেই দেখ্‌লো, সেই বাস্‌টাই এইমাত্র স্টার্ট দিচ্ছে। দেরি করে' লাভ নেই—এটাই ধর্‌বে। সোমেশ দৌড়তে গেলো; হঠাৎ পা পিছ্‌লে একেবারে উপুড় হ'য়ে ফুট-পাথের ওপর পড়ে' গেলো। পর মুহূর্ত্তেই সে উঠে দাঁড়ালো; তা'র হাত থেকে সিগ্রেটের টিনটা খসে' একটু দূরে গড়িয়ে গিয়েছিলো, সেটা কুড়িয়ে নিলে। কিন্তু সে যেন ভালো করে' দাঁড়াতে পার্‌ছিলো না; দু'তিন সেকেণ্ড ধরে' চৌরঙ্গী আর ময়দান তা'র চারদিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো; কানের কাছে অনেক পোকার গুঞ্জনের মত একটা অস্ফুট শব্দ। তা'র মনে হ'লো, এক্ষুণি সে পড়ে' যাবে। হাত বাড়িয়ে সে একটা ল্যাম্পপোস্ট্ ধর্‌তে গেলো; তা'র দরকার হ'লো না, এম্‌নিই সে ঠিক হ'য়ে গেলো। কী বিশ্রী! সে যে কখনো ফুটপাথের ওপর আছাড় খেয়ে পড়্‌বে, ভাবা যায় না। বাঁ হাতের কনুইয়ে একটু লেগেছে মনে হচ্ছে, এ নিয়ে আবার না ভোগালে হয়। আর-একটা বাস্ এসে দাঁড়ালো; সোমেশ উঠে' বস্‌লো। যাক্, হয় তো ভালোই হ'লো; হয় তো এই চোটটা লাগাতে তা'র মাথা পরিষ্কার

হ'য়ে যাবে—কাল থেকে সে ভালো ক'রে লিখ্‌তে পারবে। হাতটা কেমন-যেন লাগ্‌ছে; পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে, হাত বুলিয়ে, হাতটাকে সে নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌লে—না, ঠিকই আছে। বড় জোর দিন দুই হয় তো একটু ব্যথা থাক্‌বে। সে তার গল্পের কথা ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লো—পরবর্ত্তীর পরিচ্ছেদের আরম্ভটা হঠাৎ তা'র মনে এসে গেলো। রাস্তার দিকে সে তাকালো: সারি-সারি আলো-ঝলমল্‌ সব দোকান, ফির্‌পোর রেস্তোরাঁ, পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে গোল্ড্‌ স্লেইকের ঘড়ি সব তা'র চোখে অস্পষ্ট ঠেক্‌ছে, যেন ও-সব জিনিষের অর্দ্ধেক অস্তিত্ব ছায়াময়। তা'র মাথাটা এখনো একটু-একটু ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে। কী বিশ্রী!

অমল তার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলো; সোমেশ ঘরে ঢুক্‌তেই তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো। 'কী হয়েছে, সোমেশ?'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে সোমেশ বল্‌লে, 'কখন এলে?'

'এই তো মিনিট দশ।'

'যাক্‌, আমার বেশি দেরি হয় নি।' একটা চেয়ারে বসে' সোমেশ সিগ্রেটের টিনটা খুল্‌তে গেলো; ডালাটা ঘোরাতে যেতে চাপ লেগে বাঁ হাতটা একটু ব্যথা করে' উঠ্‌লো। 'এই নাও,' অমলের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে, 'তোমার ফেভ্‌রিট ব্র্যাণ্ড্‌ এনেছি। খোলো তো।'

'পার্‌লে না তো!' অমল হেসে উঠ্‌লো।

'হঠাৎ রাস্তায় পড়ে' গিয়েছিলাম বাঁ হাতটায় একটু লেগেছে।'

'পড়ে' গিয়েছিলে।' সুধা বলে' উঠ্‌লো।

'কী করে' পড়্‌লে?' অমল জিজ্ঞেস কর্‌লো। সংক্ষেপে, সোমেশ তা'র পদস্খলনের বিবরণ বল্‌লে। মুহূর্ত্তের জন্য, সুধার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে' গেলো, তা'র হৃৎপিণ্ড গেলো স্তব্ধ হ'য়ে। সোমেশের মুখ দেখেই তা'র মনে হচ্ছিলো, ভয় হচ্ছিলো—কিছু একটা হয়েছে। কী আবার হ'বে? নিজের মনকেই সে আবার বোঝাচ্ছিলো। যা ভয় করেছিলো, তা-ই। চেষ্টায়, মুখের চেহারা স্বাভাবিক করে' অনেকটা লঘু ধরণে সে বল্‌লে, 'তারপর—তুমি সোজা বাস্‌-এ উঠে' বাড়ি চলে' এলে তো?'

তা ছাড়া কী আর কর্‌তে পার্‌তাম?'

'এক পয়সার বরফ কিনে'ও তো লাগাতে পার্‌তে। সে যাক্‌ গে, এখন তুমি একটু ত্যাখো তো, দাদা—'

'এমন কিছু হয় নি যে দেখ্‌তে হ'বে,' প্রফুল্ল, সাহসীভাবে সোমেশ বল্‌লে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা'র নিজেরও ভয় হচ্ছিলো—যদিই বা কিছু হ'য়ে থাকে। অমল যখন দেখ্‌তে চাইলো' সে, তাই, খুব বেশি আপত্তি কর্‌লো না। অমল ডাক্তার নয়; তা'র সাধারণ চোখে বিশেষ কিছু ধরা পড়্‌লো না। খানিকটা জায়গা অল্প-একটু ফুলেছে—এই যা। 'আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে,' একটু পরে অমল বল্‌লে।

সুধা বল্‌লে, 'যদি কিছু হ'য়ে থাকে, এক্ষুণি ব্যবস্থা করা দরকার। একজন ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না?'

এইবার সোমেশ তীব্র প্রতিবাদ করে' উঠ্‌লো: 'পাগল! এই সামান্য ব্যাপারের জন্য ডাক্তার!' তর্ক ও আলোচনায় অনেক সময় গেলো; ডাক্তার ডাকা হ'লো না। এক পয়সার বরফ আনিয়ে সুধা ফোলা যায়গার ওপর অনেকক্ষণ ধরে' ঘষে' দিলে। তারপর—সমস্ত বাঙালী পরিবার যে-একমাত্র ওষুধের সঙ্গে নিঃসংশয়ে পরিচিত তা-ই লাগানো হ'লো—টিঞ্চার আয়োডিন। এর পরে—সোমেশের মনে হ'লো—তা'র রীতিমত ভালো বোধ করা উচিত। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌লো ভালো বোধ কর্‌তে। অন্যান্য আলাপে প্রবৃত্ত হ'লো অমলের সঙ্গে। সুধা, ইতিমধ্যে, চা তৈরী করে' নিয়ে এলো। সোমেশ ভাব্‌লো, চা-টা খেলেই সে জীইয়ে উঠ্‌বে। চা-টা তা'র মুখে তত ভালো লাগ্‌লো না। এবং, যতই সে তা'র স্বাভাবিক প্রফুল্লতার ভাব বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করুক, মনে-মনে সে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিলো, তা'র শরীরটা ঠিক ভালো লাগ্‌ছে না। সে নানারকম কথা বল্‌ছিলো, হাস্‌ছিলো, কিন্তু সে নিজে দেখ্‌তে পাচ্ছিলো না, তা'র—মুখ কী-রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। কিন্তু আলাপ ঠিক জম্‌ছিলো না; একটু পর পরই তা'র মনে হচ্ছিলো হাতের

কথা ; ডান হাত দিয়ে আহত জায়গাটা অনুভব করছিলো। ভেঙে-টেঙে যায় নি তো ? কী ভয়ানক, ভাবতেই রক্ত শুকিয়ে যায়। না, না ; ভাঙলে কি আর সে এখনো শান্তভাবে বসে' থাকতে পারছে ? জোর করে' সে-চিন্তা মন থেকে সে তাড়িয়ে দেয়—তখনকার মত। একটু পরেই তা ফিরে আসে ; ঠিক সেই মুহূর্তে অমল মধ্য আফ্রিকার অসভ্যদের সম্বন্ধে যে-সব তথ্য বলছিলো, তা সে শুনতে পায় না। নিজের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে লজ্জিত, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে অমলকে অনুধাবন করতে বলে ; কিন্তু নৃতত্ত্ব-সংক্রান্ত অমলের অমন চমৎকার সব গবেষণা তা'কে যেন যথেষ্ট আকর্ষণ করতে পারে না ; নিজেরি অজ্ঞাতে সে ভাবতে থাকে, কেনই বা এটা হ'লো, কেন সে সিগ্রেট কেনবার জন্য নাবতে গিয়েছিলো, এ-বেলা বাড়ি থেকে না বেরোলেই তো চলতো। এত অনিচ্ছায় কিছু করতে নেই ; কোনো-না কোনো-ভাবে তা'র ফল অশুভ হ'তে বাধ্য। ঠিক যে-মুহূর্তে সে পড়ে' গিয়েছিলো, মনে-মনে তা'কে আবার রচনা করে ; ইস্, এক সেকেণ্ড আগেও যদি জানতো, সাবধান হ'তে পারতো। ব্যানার্জি ব্রাদার্সের ওপর মনে-মনে তা'র রাগ হয় ; ওরা যদি ও-বেলাই চেকটা দিয়ে দিতো, তা হ'লেই তো আর এ ব্যাপারটা ঘটতো না। তা হ'লে এখন স্বপ্নেও সে বেরোবার কথা ভাবতো না।···হঠাৎ খেয়াল হয়, অমলের কথা এক বর্ণও তা'র কানে ঢুকছে না। তাড়াতাড়ি যা-হোক্ একটা মন্তব্য করে' নিজের কাছেই সে মুখ-রক্ষা করলে। এ-সব আলোচনায় সাধারণত সে একেবারে ডুবে' যায়, নিজকে হারিয়ে ফেলে ; আর আজ—কোথায় তা'র সামান্য কী চোট লেগেছে, তা ছাড়া আর-কোনো কথা সে ভাবতেই পারছে না। আশ্চর্য্য !

অমলও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলো না ; ন'টা বাজতেই বললে, 'এবার উঠি।' সোমেশ একবার শুধু বললে, 'এখনই !'

'হ্যাঁ, যাই ; কেমন থাকো, একটা খবর দিয়ো।'

সুধা বললে, 'কাল সকালে একবার এসো না, দাদা।'

'আচ্ছা, আসবো। আজ আর বেশি রাত-টাত জেগো না, সোমেশ।'

রাত সোমেশ এমনিও জাগতো না ; আজ তা'র বিশ্রামের পালা। তাড়াতাড়ি সে খাওয়া সেরে নিলে। খেয়ে সে মোটেও সুখ পেলে না ; বাঁ হাত দিয়ে জলের গ্লাশ মুখে তুলতে রীতিমত লাগলো। মুখে সে কিছু বললে না ; প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে আশা করলে কিছু হয় নি ; কাল সকালে উঠে'ই দেখবে, সেরে গেছে। কাল সকালেই সে আবার লিখতে আরম্ভ করবে।—না, না ; পাগল—এত সহজেই হাড় ভাঙে ! খেয়ে উঠে' সে বেশি দেরি করলে না ; তা'র পক্ষে অসম্ভব রকম সকাল-সকাল শুতে গেলো। ব্যথাটা আছেই —একটা ছোট বালিশের ওপর সে হাতটা রাখলো। ব্যথাটা এখনো আছে ; কিন্তু কাল সকালে আর থাকবে না। কালকের প্রভাত আনবে নতুন জীবন।

৩

শেষরাত্রের দিকে সোমেশের ঘুম ভেঙে গেলো ! তীব্র, তীব্র যন্ত্রণা। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য তলোয়ারের চোখা মুখ তা'র হাতের ভেতর ঢুকে' যাচ্ছে ; সমস্ত হাতখানা পাথরের মত, শিষের পাতের মত ভারি। বালিশ থেকে সে হাতটা একটু তুলতে চেষ্টা করলো—অসম্ভব। এ-হাত যেন আর তা'র নয় ; একটা ব্যাধিগ্রস্ত, বিষাক্ত মৃত অঙ্গ কেউ যেন তা'র শরীরের সঙ্গে জুড়ে' দিয়েছে। আঙুলগুলো সব বেঁকে গেছে ; সোজা করবার লেশমাত্র চেষ্টাতেই থরথর্ করে' কেঁপে উঠলো। ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে অত্যন্ত মৃদুভাবে সে একটা আঙুলকে স্পর্শ করলে—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হাত দিয়ে যেন একটা বিষ-বিদ্যুৎ-স্রোত তর্তর্ করে' নেমে গেলো। চোখ বুজে, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে', স্নায়ুগুলোকে তীব্র, কঠিন করে' তুলে' সে সহ্য করবার চেষ্টা করলো। সমস্ত হাতটা টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে' পড়ছে। চোখ মেলে', অন্ধকারে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। পাশ ফেরবার উপায় নেই, উঠে' বসবার উপায় নেই—ঠায় একভাবে শুয়ে' থাকা। স্তব্ধ, সে ঘুমন্ত সুধার গভীর নিঃশ্বাস-পাত শুনতে লাগলো। কী আশ্চর্য্য; সে মরে' যাচ্ছে যন্ত্রণায়, আর সুধা কিনা এখনো

নিশ্চিন্ত, শান্তমনে ঘুমোচ্ছে। আড়চোখে তাকিয়ে, সুধার শোবার ভঙ্গীটি সোমেশ দেখে নিলে। এক হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশের ওপর; অন্য হাত অলসভাবে পাশে পড়ে' আছে। সুধার তো কিছু হয় নি—সে যেমনভাবে খুসি শুতে পারে। আর তার একটা হাত প্রতি মুহূর্ত্তে ফেটে পড়ছে, ছিঁড়ে' যাচ্ছে। সে আর সহ্য করতে পারলো না; ডাকলে, 'সুধা।' সুধার ঘুম ভাঙলো না। ডান হাতে সুধাকে ধাক্কা দিয়ে সোমেশ আবার ডাকলে, 'সুধা।'

'উ?' চমকে, সুধা চোখ মেলে' তাকালো। 'ডাকছিলে?'

সোমেশ শুধু বললে, 'উঃ!'

'ব্যথাটা বেড়েছে নাকি?'

সোমেশ বললে, 'মরে' যাচ্ছি।'

বিছানা থেকে নেবে সুধা আলো জ্বালালে। দেখা গেলো, সমস্ত হাতটা ফুলে' দ্বিগুণ হ'য়ে গেছে; ছোঁবার উপায় নেই; যে-কোনো জায়গায় আলগোছে একটুখানি হাত রাখলেও সোমেশ উঃ করে' ওঠে।

কী করবে? সুধা কী করবে? কী করতে পারে সে? ঘড়িতে চারটে বেজেছে; ভোর না হ'লে, অমল না এলে কিছু করবার উপায় নেই। ভাগ্যিস সে দাদাকে আসতে বলে' দিয়েছিলো। তা-ও দাদা কখন্ আসেন, ঠিক কী? দাদা যেন বেশি দেরি না করেন, দেরি না করেন। সম্প্রতি, রাত ভোর হ'লেই বাঁচা যায়।

আলো নিবিয়ে দিয়ে সুধা বিছানায় সোমেশের পাশে এসে বসলো। সোমেশ মৃদুস্বরে গোঙাচ্ছিলো; হঠাৎ, লাথি মেরে গা থেকে লেপ সরিয়ে দিয়ে বললে, 'গরম লাগছে—উঃ!'

'হাওয়া করবো?' সুধা একটা হাত-পাখা নিয়ে এসে আস্তে তা'র মাথায় হাওয়া করতে লাগলো। একটু পরেই সোমেশ বলে' উঠলো, 'থামো—শীত করছে।' পা দিয়ে সে লেপটা ফের গায়ে তোলবার চেষ্টা করলো; সুধা সেটা তা'র গলা পর্য্যন্ত টেনে দিলে। 'হাঁপর-হাঁপর করছে।' সুধা লেপটা তা'র কোমর পর্য্যন্ত নাবিয়ে দিলে। 'হাওয়া করো।' সোমেশের পাশে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায়, সুধা এক হাতে পাখা চালাতে ও অন্য হাতে তার চুলের ভেতর বিলি কাটতে লাগলো। বললে, 'ঘুমোতে চেষ্টা করো।' সোমেশ শুধু বললে 'মরে' যাবো।' ঘুম, ঘুম; জীবনে সে আর ঘুমোবে না। ঘুমে তা'র চোখ ভেঙে আসছে; কিন্তু একটু যদি চোখ লেগে আসে, অমনি কে যেন চাবুক মেরে তা'কে জাগিয়ে দেয়। এক হিংস্র পশুর খর্পরে সে পড়েছে: প্রতি মুহূর্ত্তে সে তা'র মাংসের মধ্যে ধারালো দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে; উৎকট উল্লাসে নখ দিয়ে ছিঁড়ছে তা'কে মাঝে-মাঝে বিরাম যা আসে, তা-ও প্রবলতরো আক্রমণের প্রস্তাবনা মাত্র। উঃ, মানুষের শরীরে এত যন্ত্রণা সম্ভব! সুধার সমস্ত স্নেহার্দ্র আদর, রুদ্ধশ্বাস পরিচর্য্যা—সব নিষ্ফল হ'লো: এত ভালোবাসা নিয়ে সুধার ক্ষমতা নেই, মুহূর্ত্তের এক শতাংশের জন্য সোমেশকে তা'র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। অকপটভাবে, নির্লজ্জভাবে সোমেশ চীৎকার করতে আরম্ভ করলো। যন্ত্রণার পরমানন্দে আত্মহারা হ'য়ে থেকে-থেকে সে কবিতা আবৃত্তি করে' উঠতে লাগলো। স্তব্ধ, সুধা বসে' রইলো ভোরের প্রতীক্ষায়। এমন যে দীর্ঘ শীতের রাত, তা-ও একসময় ভোর হ'বে। হ'তে লাগলো। ঘরের অন্ধকার পাৎলা হ'য়ে আসছে। দ্রুত, উজ্জ্বল, সুন্দর দিন। আলো আর উত্তাপ; আশ্বাসের উৎস। সব যন্ত্রণারই উপশম আনে প্রভাত; ভোরের দিকে—দুই ঘণ্টা অবিশ্রান্ত চীৎকারের পর সোমেশও ঘুমিয়ে পড়লো।

চোখ যখন মেললো, পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। রোজ সকালে সুধা চা তৈরি করে' টেবিলের ওপর রেখে তা'র ঘুম ভাঙায়। আজ না ডাকতেই সে জেগে উঠেছে—নিজেই সে অবাক হ'য়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে, তা'র মনে পড়লো; একটা অস্ফুট গোঙানি শব্দ করে' সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বাঁ হাতের নৈষ্কর্ম্য তা'র সমস্ত শরীরের কর্ম্মক্ষমতা স্থগিত করেছে; সে এখন একেবারে অসহায়, আর-এক-জনের সাহায্য ছাড়া তুচ্ছতম কাজও সে করতে পারে না। সুধা এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালো; জিজ্ঞেস করলে,

'এখন চা নিয়ে আস্‌বো ?' 'হু।' সুধার কাঁধের ওপর ডান হাতের ভর দিয়ে কষ্টে, সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে' সে বেতের ইজি-চেয়ারটায় গিয়ে বস্‌লো। চেয়ারের হাতলের ওপর বাঁ হাতটাকে আল্‌গোছে ছেড়ে দিলে; নড়্‌তে-চড়্‌তেও ভয় করে—পাছে লাগে। টেবিলের ওপর খবরের কাগজ—কী আর হ'বে খবরের কাগজ দিয়ে? দু'হাত দিয়েই সে কোনোকালে গুছিয়ে কাগজ পড়্‌তে পারে নি। তবু, এক হাতে যদ্দুর সম্ভব, ভাঁজ খুলে' সে একটা-একটা করে' পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলোবার চেষ্টা কর্‌লো। সুবিধে লাগে না। সে কোলের কাছে কাগজটাকে টান্‌তে গেলো; এলোমেলো হ'য়ে কয়েকটা পাতা পড়ে' গেলো মেঝেয়। থাক্ গে। বিরক্ত হ'য়ে সে চেয়ারে হেলান দিলে।

চা। এত কষ্টেও খিদে ঠিক আছে—আশ্চর্য্য! বরং অন্যান্য দিনের চাইতে যেন বেশিই পেয়েছে। কাল রাত্তিরে তা'র ভালো করে' খাওয়া হয় নি। সাগ্রহে, চায়ে চুমুক দিয়ে সে ডিমটা শেষ করতে প্রস্তুত হ'লো। তবু ভাগ্যিস ডান হাতটার কিছু হয় নি; খাওয়া একরকম করে' যায়। মেঝে থেকে কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সুধা তা'র উল্টো দিকে বস্‌লো। নিজের পেয়ালায় চা ঢেলে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'এখন ভালো লাগ্‌ছে একটু?'

'একটু,' ক্ষীণস্বরে সোমেশ বল্‌লে, 'হাতটা বোধ হয় ভেঙেই গেছে, সুধা।'

'ও-বাড়ির বিকাশকে ডাক্তারের জন্য পাঠাবো?'—ইস্, কাল্‌কেই যদি তা'দের ডাক্তার ডাকাবার খেয়াল হ'তো! সমস্তটা রাত গেলো—কিছু প্রতিবিধান হ'লো না—'ল্যান্স্‌-ডাউন রোডের মহিম গাঙ্গুলি বেশ নাম-করা সার্জন।'

'এক্ষুণি?' আতঙ্কে সোমেশের রক্ত জল হ'য়ে যাচ্ছিলো; ডাক্তার এসে না জানি কী কাণ্ডই করবে! একবার, ইস্কুলে খেলা কর্‌তে-কর্‌তে সোমেশের এক মামাতো বোনের কী যেন হয়েছিলো; ডাক্তার এসে হাতটাকে ধরে' এমন টান দেয়—! সে দৈবাৎ উপস্থিত ছিলো সেখানে; ডাক্তারের কথা-মত আর-একটা হাত খুব জোর করে', শক্ত করে' তা'কেই ধর্‌তে হয়—ইস্, মেয়েটা কী চেঁচিয়েছিলো! সেই কথা এতদিন পরে সোমেশের আজ মনে পড়্‌লো—নিদারুণ ভয়াবহতায়। সে তো তখন পরমানন্দে হাতটা ধরে' ছিলো—চীৎকার শুনে' লুকিয়ে হেসেছিলো পর্য্যন্ত। কী ভয়ানক! এমন হৃদয়হীন কী করে' সে হ'তে পেরেছিলো? সেই হাসির প্রতিশোধ আজ তা'কে ভোগ কর্‌তে হচ্ছে; না জানি তা'র কপালে কী ভয়ানক সব কষ্টই আছে। ভাব্‌তেই যেন তা'র শ্বাস-রোধ হ'বার উপক্রম হ'লো।

'যত শীগ্‌গির হয়, ততই তো ভালো। এতক্ষণ ফেলে' রাখাই অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।'

'হুঁ।'

'তা হ'লে ডেকে পাঠাবো বিকাশকে?'

'না, না, এখন থাক্,' সোমেশ তা'র কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা গোপন কর্‌তে পার্‌লে না, 'অমল আসুক্।' তবু—যতটা পেছনে ঠেলা যায়। তাড়াতাড়ি, সে অন্য কথা পাড়্‌লে, 'আর-একটু চা দাও।' একটা সিগ্রেট নিয়ে সে মুখে দিলে, কিন্তু দেশ্‌লাই জ্বালানো এক হ্যাঙাম। সুধা একটা কাঠি ধরিয়ে তা'র মুখের সাম্‌নে ধর্‌লে। আঃ!

ভাসা-ভাসাভাবে সুধা খবরের কাগজটা দেখে যাচ্ছিলো। মাঝে-মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে সোমেশ তা'র দিকে তাকাচ্ছিলো; তা'র দু' হাতের মধ্যে সুবিস্তৃতভাবে কাগজটা কেমন বশ মেনেছে। একবার সুধার চোখ তা'কে ধরে' ফেল্‌লো। 'চাই কাগজটা? নাও না—আদ্ধেক তো পড়ে'ই রয়েছে।'

সুধা এমনভাবে কথা বল্‌ছে, যেন সে ইচ্ছে কর্‌লেই স্বচ্ছন্দে কাগজ পড়্‌তে পারে। সত্যি, মানুষ কি শুধু এক-জনের কথাই ভাব্‌তে পারে, আর সেই একজন সে নিজে? সোমেশ কোনো কথা বল্‌লে না।

'কোন্ শীট্ পড়্‌বে, বলো,' সুধা বল্‌লে, 'ছোট করে' ভাঁজ করে' দিচ্ছি; কোনো অসুবিধে হ'বে না। না কি পড়ে' শোনাবো?'

এইবার সোমেশ বল্‌লে 'না, থাক্।' বয়ে' গেছে তা'র—আজকের খবর যদি সে কিছু না-ও জানে, তবু তা'র শরীরের অবস্থা যা আছে, তা-ই থাক্‌বে। কোথায় ডুব্‌লো জাহাজ, কোথাকার ব্যাঙ্কের হার কমে' গেলো; ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে লণ্ডন থেকে আর কী নতুন উক্তি বহির্গত হ'লো—কী আসে যায় তা'র এ-সব ব্যাপারে? কী আসে যায়, যতক্ষণ অঙ্গহীন, স্থবির এই চেয়ারে সে বসে' আছে, যতক্ষণ তা'র শরীর, তা'র মাংস প্রতি মুহূর্ত্তে তা'কে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে? ও-সমস্ত জিনিষ এখন কী অপরিমেয়রূপে দূরে, কী সীমাহীন-রূপে অর্থহীন। ভারতবর্ষ যদি আজ স্বাধীনও হ'য়ে যায়, তবু তো তা'র ভাঙা হাড় এই মুহূর্ত্তে জোড়া লাগ্‌বে না। চুলোয় যাক্ ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাক্। যদি শুধু সে একটু লিখ্‌তে পার্‌তো! বইটা যখন অদ্ধেকের বেশি লেখা হ'য়ে গেছে, তখন কিনা এই বাধা! আজ সকালে বস্‌তে পার্‌লে সে ঠিক লিখে' যেতে পার্‌তো, কোনোখানে আট্‌কাতো না। কিন্তু—আজ না-হয় গেলোই—কবে যে সে আবার লিখ্‌তে পার্‌বে! হতাশায়, অনির্ব্বচনীয় তিক্ততায় সোমেশের চোখে প্রায় জল এসে পড়্‌লো।

৪

প্রায় দশটার সময় অমল এলো; ব্যাপার শুনে' বল্‌লে, 'চলো এক্ষুণি তোমাকে শম্ভুনাথে নিয়ে যাই।'

'পাগল! হাঁসপাতালে আমি কিছুতেই যাবো না।' সোমেশ বলে' বস্‌লো। হাঁসপাতাল সম্বন্ধে তার মনে ভয়ানক একটা আতঙ্ক ছিলো; পারতপক্ষে সে হাঁসপাতালের ছায়া মাড়ায় না। কখনো, কোনো উপলক্ষ্যে হাঁসপাতালে ঢোকবার কথা ভাবলেও তার গা শির্‌শির্ করে। অত ব্যাধি আর যন্ত্রণা আর কুশ্রীতা একসঙ্গে—মাগো! একটা ঘরের মধ্যে সারি-সারি বিছানায় নানা রকমের একশো রোগী—মাংসময় অমঙ্গলের মধ্যে লোলুপ মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। সেই আবহাওয়ায় সুস্থ শরীরই অবশ, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। না—অসম্ভব। 'মহিম ডাক্তারকে একটা কল দিলেই তো হয়—'

'খামকা কেন টাকাগুলো খরচ করবে? ওখানে যা করবে, মহিম ডাক্তার তো তার বেশি কিছু করবে না; বরং হাঁসপাতালে জিনিষপত্তর সব হাতের কাছেই আছে—কত সুবিধে।'

'ব্যাপার এমন তো কিছু নয়', সুধা বল্‌লে, 'শুধু একটা ব্যাণ্ডেজ করে' দেয়া। সে-জন্যে তুমি অত ঘাবড়াচ্ছো কেন? যাও না।'

সোমেশের প্রতিবাদ টিক্‌লো না; উপায় যখন নেই—মনকে সে যথাসম্ভব শক্ত করে' নিলে। যে-ব্যাপারটাকে সে এখন এত ভয় কর্‌ছে, সেটা খানিক পরেই অতীতের অংশীভূত হ'য়ে যাবে—এই যা সান্ত্বনা। হয়-তো খুবই লাগবে; তার মামাতো বোনের যতটা লেগেছিলো, তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি। উপায় নেই, সহ্য করতেই হ'বে। শেষ হ'য়ে গেলেই সেটা আর থাকবে না; যতক্ষণ না হয়ে যায়, ততক্ষণই অসহ্য। কঠোর সঙ্কল্পে নিজেকে সে প্রস্তুত কর্‌লে। একটা ফীটন ডাকা হ'লো; কোনো রকমে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে অমলের সাহায্যে সে গাড়ীতে উঠে বসলো। রাস্তার চেহারা ঠিক তেম্‌নিই আছে; বহির্জ্জগত তেম্‌নি চঞ্চল; পার্কে ছোট ছেলেরা ফুটবল খেল্‌ছে—তা'দের উল্লাসের চীৎকার অসুস্থ আনন্দ নিয়ে সে যতক্ষণ সম্ভব কান পেতে শুন্‌লো। সে অচল হ'য়ে পড়েছে বলে' কোনোখানে কিছু থেমে নেই—মানুষের কাজ আর আনন্দের স্রোত সমানে ছুটে চলেছে। কালকেও এই স্রোতের সে একটা ঘনিষ্ট অংশ ছিলো; যেন তারি জন্যে এই শহরের দ্রুত, কর্ম্ম-মুখর ব্যস্ততা। আজ সে স্খলিত হ'য়ে পড়েছে—সেই শহরেরই এমন ভাব, যেন সে কোনোকালেও ছিলো না; রাস্তাগুলো যেন তা'কে চিন্‌তে পার্‌ছে না। রাস্তা দিয়ে এত যে লোক অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আজ আর তা'র কোনো যোগাযোগ নেই। এমন নয় যে তা'র এই দুর্ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে বহির্জ্জগতের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। সবি ঠিক আছে; সে-ই বেসুর।

হাঁসপাতালের বারান্দায় এক নবীন ডাক্তার পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুখ থেকে এক মোটা চুরুট ঝুলিয়ে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পৃষ্ঠা ঘাঁটছিলেন; অমল তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌লে, 'দেখুন, এঁর হাতটা ভেঙ্গে গেছে—'

মুখ থেকে চুরুট না নাবিয়ে ডাক্তার বল্‌লেন, 'কী হয়েছে?'

'ভেঙে গেছে।'

'হুঁ', সোমেশের দিকে তিনি একবার তাকালেনও না, 'ঐ ঘরটায় গিয়ে বসুন।' বলেই তিনি অন্তর্হিত হ'লেন।

নির্দ্দিষ্ট ঘরে একটা মস্ত, গোলটেবিল ঘিরে' কয়েকটা চেয়ার, দু'জনে সেখানে গিয়ে বস্‌লো। সোমেশ তাকিয়ে দেখ্‌লো, ঘরের অন্য দিকে কয়েকটা উঁচু খাটের ওপর বিছানা পাতা, আশে-পাশে অদ্ভুতদর্শন সব যন্ত্রপাতি। ওরি একটা খাটে হয়-তো তা'কে শুতে হবে—তারপর সেই চুরুট-মুখো ডাক্তার এসে তা'র হাতটা নিয়ে যথেচ্ছ টানা-হেঁচড়া কর্‌বে। ইস্—কেন, কেন, কেন সে এলো? বাড়ীতে ডাক্তার ডাক্‌লে সে নিশ্চয়ই অনেকটা যত্ন নেবে; হাজার হোক্, অর্থব্যয় করবার একটা সার্থকতা আছেই। হঠাৎ সে বল্‌লে, 'অমল, ফিরে যাই চলো।'

'কী যে বলো। একটু বোসো না—দু' মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

দু' মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট হয়ে গেলো—কারো দেখাই নেই। বারান্দা দিয়ে কত লোক আসা-যাওয়া কর্‌ছে—তাদের দিকে কেউ তাকায়ই না। সোমেশ বল্‌লে, 'এই তো তোমাদের স্বদেশী হাঁসপাতালের নমুনা!'

অমল উঠে' দাঁড়ালো।—'এখন তো এদের ওপর রাগ করে কিছু লাভ নেই; বরং দেখি, একটা ডাক্তার যদি খুঁজে' বার কর্‌তে পারি।'

'দরকার নেই; বাড়ি ফিরে যাই, চলো।'

'কী করতে এলাম তা হ'লে?'

'তুমিই জানো। আমি তো আসতে চাই-ই নি। আমার মাথা ঘুরছে, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে: এখানে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌ছি নে।' সোমেশ দরজার দিকে পা বাড়ালো।

'কী মুস্কিল!'

'মুস্কিল-টুস্কিল বুঝি নে; মোট কথা, চলো।' হাঁসপাতাল থেকে বেরুতে পার্‌বে, এই সম্ভাবনায় সোমেশের কণ্ঠস্বরে উৎসাহ ফিরে' এলো।

'আচ্ছা, চলো, outdoor wardটা একবার দেখে আসি।' অমলও নাছোড়বান্দা।

আসল দালান থেকে অনেকটা দূরে হচ্ছে outdoor ward; নিম্নশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে ভর্ত্তি। তাঁদের মধ্যে শাদা এপ্রণ-পরা এক বাস্তবাগীশ ডাক্তার আধ মিনিট করে' এক-এক জনকে পরীক্ষা কর্‌ছেন আর চার্টে কী লিখ্‌ছেন। ভদ্রলোকের চোখে সোনার চশমা, গালে তিন দিনের দাড়ি; চেহারাটা সোমেশের একটু পছন্দ হ'লো না। অমল আরম্ভ করলে, এই ভদ্রলোকের হাতটা—'

'বসুন।' জীর্ণ কয়েকটা চেয়ার ছিলো; এত নোংরা যে বস্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। ওরা দাঁড়িয়েই রইলো।

কুলি আর রিক্‌শাওলার ভিড় কম্‌লে সোমেশের পালা এলো। বাইরে থেকে একটু দেখে ডাক্তার বল্‌লেন, 'আসুন্ এ-ঘরে।' 'এ-ঘর' মানে অত্যন্ত নোংরা একটা পর্দ্দার পেছনে একটা খুপ্‌রি; তা'র একমাত্র আসবাব অত্যন্ত নোংরা খড়-বেরিয়ে-পড়া একটা কাউচ্। 'শুয়ে পড়ুন্।'

ঘরটার মধ্যে ঢুকে'ই তা'র গা-বমি-বমি কর্‌ছিলো, তা'র ওপর আবার ঐ নোংরা কাউচে শোয়া! হাত ভেঙে সে এমন-কিছু অপরাধ করে নি। 'না শুলে চলে না?'

'না শুলে দেখ্‌বো কী করে'?' কী কর্কশ লোকটার কথা বলার ধরণ।

'একটু বোসো না, যাও,' অমল বল্‌লে।

অগত্যা, ঘৃণার ভাবটা যথাসাধ্য চেপে, সোমেশকে বস্‌তে হ'লো। 'হবে?'

'আচ্ছা, দেখি।' ডাক্তার হাত দিতেই সোমেশ চীৎকার করে' উঠ্‌লো।

অমল বল্‌লে, 'অমন কর্‌লে কী চলে!'

'ভীষণ লেগেছিলো।'

ডাক্তার একটু হাস্‌লেন, 'আপনারা indoor-এ যান্ না; সেখানেই তো সুবিধে।'

'সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে' এলুম; কাউকে পাওয়া গেলো না।'

'আজ রোব্‌বার কিনা—ডাক্তাররা অনেকেই আসেন নি। বড্ড rush, মশাই, কাজের; এক মিনিট সময় পাওয়া যায় না। তবু তো এ-সময়টায় কোনো এপিডেমিক থাকে না বলে' রক্ষে। কল্‌কাতায় আরো কয়েকটা হাঁসপাতাল

হওয়া নিতান্ত দরকার—তা সেদিকে কি কারো খেয়াল আছে!…আচ্ছা, আপনারা গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন্, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।'

কিন্তু সোমেশকে কিছুতেই আর অপেক্ষা করতে রাজি করানো গেলো না; যা হ'বার হোক্, বাড়ি সে এখন ফিরবেই। বাঁচ্‌লো সে—ঐ ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ কর্‌লেই হয়েছিলো আর কি! হাঁসপাতালের বাইরে এসে সে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস টান্‌লো। উঃ—ঐ লোকটা কিনা বল্‌ছিলো, কল্‌কাতায় আরো কয়েকটা হাঁসপাতাল হওয়া দরকার!

সোমেশকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে অমল বেরুলো মহিম গাঙ্গুলিকে ডাক্‌তে। এই কাজটাই আগে কর্‌লেই হ'তো—বেলা দুপুর হ'তে চল্‌লো, এখন পর্য্যন্ত কিছু হ'লো না। কাজের সময় কী রকম যেন মাথা গুলিয়ে যায়। সোমেশ যে রকম ছেলে—ওকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছে। গাঙ্গুলি বাড়ি ছিলেন না; অমলকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো। ঘণ্টাখানেক পর সোমেশের বাড়ির সাম্‌নে গাঙ্গুলির মোটার এসে দাঁড়ালো।

নধর, পরিপুষ্ট, গোলগাল চেহারা; গ্রে ট্রাউজার্সের ওপর নীল ব্লেইজার কোট; গলায় একটা বিচিত্র নক্সার উলের মাফ্‌লার জড়ানো। মুখের ভাব অত্যন্ত আত্ম-প্রসন্ন; চটপটে, টগ্‌বগে, কথা বলেন একটু তাড়াতাড়ি। ঘরে ঢুকে' মহিলা দেখে মহিম গাঙ্গুলি বিলিতি ধরণে বাউ করে' এগিয়ে এলেন। 'দেখি, কী হয়েছে?' তাঁর কণ্ঠস্বর তিনি এমন কোমল করে' ফেল্‌লেন, যেন কোনো শিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হচ্ছে। 'ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই; একটুও লাগ্‌বে না।' বাস্তবিক, ব্যথা না দিয়েই তিনি পরীক্ষা শেষ কর্‌লেন।

'কী হয়েছে?' সোমেশ জান্‌তে চাইলো।

'কী হয়েছে? দেখি এক টুক্‌রো কাগজ

সোমেশ একটু অবাক হ'লো: কাগজ দিয়ে কী হ'বে? সুধা একটা প্যাড এনে দিলে। পকেট থেকে কলম বা'র করে' ডাক্তার গাঙ্গুলি একটা হাতের কঙ্কালের নক্সা আঁক্‌লেন। 'এই যে দেখ্‌ছেন elbow-joint—তাঁর ঠিক নীচে ছোট্ট একটা হাড় আছে; আপনি যখন পড়ে' যান্, আপনার হাতটা যায় বেঁকে; এমন ভাবে পড়েন যে শরীরের চাপ পড়ে সেই হাড়ের ওপর—'

'সে তো ফল দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি।'

সোমেশের কথা ডাক্তার গাঙ্গুলি গ্রাহ্যই কর্‌লেন না। 'Result: fracture of the oberanon. Simple fracture. বুঝ্‌তে পার্‌লেন? সেই ছোট হাড়টা ভেঙে গেছে। বুঝেছেন?'

'তাই তো মনে হ'চ্ছে। কী কর্‌তে হ'বে এখন?'

'হচ্ছে—সবি হচ্ছে। কেউ একজন এখানটা একটু ধরুন তো।' অমল সাহায্য কর্‌লো। 'পাউডার আছে?'

সুধা তা'র মুখে মাখ্‌বার পাউডারের কৌটো এনে দিলে। 'ওতে হ'বে?'

'হ'বে।' ডাক্তার সমস্ত হাতটায় পাউডার ছিটিয়ে দিলেন, 'একটু আরাম লাগ্‌ছে তো? তুলোটা কোথায়—এই যে। It's nothing; শুধু ব্যাণ্ডেজ করে' রাখ্‌তে হ'বে—আর কিছু নয়। এ-সব ব্যাপারে হচ্ছে Nature's cure। এখন থেকেই আপনার হাড়ের fibrous union আরম্ভ হ'য়েছে—শক্ত হ'তে যে-ক'দিন সময় নেয়। হাতটা সোজা করুন্, সোজা করুন—যতটা পারেন। ঠিক আছে। এইবার splinth; আপনি ঠিক ধরে' থাক্‌বেন কিন্তু—সরে' না যায়। এমন সব জিনিষ খাবেন, যা'তে ক্যাল্‌শিয়ম বেশি আছে। ডিম, মাংস, দুধ। ওষুধ? না, এর আর ওষুধ কী? কয়েকদিন পর-পর ব্যাণ্ডেজটা বদ্‌লাবেন—That's all……এই তো হ'য়ে গেলো।' ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গাঙ্গুলি সরে' দাঁড়ালেন। তাঁর কোটে পাউডার লেগে গিয়েছিলো; বল্‌লেন, 'একটা ব্রাশ্ দেখি।'

সুধা কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে, 'আমার ব্রাশ্ তো নেই।'

'That'll do' আঙুলের ডগা দিয়ে গাঙ্গুলি পাউডার ঝেড়ে ফেল্‌লেন। তাঁর বুকের ওপর, সোনার ভারি ঘড়ি-চেইনের নীচে লকেটটা একটু দুলে' উঠ্‌লো। সোমেশ ভদ্রতা করে' তাঁকে সিগ্রেটের কৌটো এগিয়ে দিলে। 'Thanks. No intoxicants' সোমেশ মনে মনে বল্‌লে, 'সিগ্রেট intoxicant নয়।'

'Excuse me—আপনি কী করেন?'

'গল্প লিখি।'

'গল্প —? কী-রকম—?'

সোমেশ বিপন্নভাবে বল্‌লে, 'এই গল্প আর কি—লোকে যা পড়ে—'

'ও, হ্যাঁ। মাসিকপত্রের গল্প। বুঝেছি। কিন্তু কী করেন?'

'আর-কিছু করি নে।'

'উম্‌।' ডাক্তার গাঙ্গুলি একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন। বেশ বোঝা গেলো, সোমেশের কার্য্যকলাপে তিনি মোটেও আস্থাবান হ'তে পারলেন না। 'যে দিনকাল পড়েছে,' পিঠচাপড়ানো সহানুভূতির স্বরে তিনি বল্‌তে লাগলেন, 'আমরাই যদি কয়েকটা বছর আগে কলেজ থেকে না বেরোতাম, কী উপায় হ'তো বলা যায় না। অবিশ্যি কর্ণেল ম্যাডক্স্‌—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?—সব সময় আমাকে বল্‌তেন, "I'm sure you have a brilliant future, Ganguly"; কিন্তু শুধু qualification দিয়ে কি আর আজকাল কিছু হ'বার উপায় আছে! কর্ণেল ম্যাডক্স্‌ আমাকে বড্ড ভালোবাস্‌তেন; আমি যখন ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে, তাঁর সব বড়-বড় operation-case গুলোয় আমাকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে'। সার্জ্জারিতে আমি আগাগোড়া ফার্স্ট্‌ হয়েছিলাম কিনা; ফাইনেল পরীক্ষা দিয়ে সার্জ্জারির মেডেল পেয়েছিলাম; কর্ণেল ম্যাডক্স্‌ বল্‌তেন—thank you' ভিজিটের টাকাটা তুলে' নিয়ে তিনি উঠে' দাঁড়ালেন।

'ক'দিনে সার্‌বে, বল্‌তে পারেন?'

'Three weeks.'

দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হ'য়ে গেলো; এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, প্রতিবাদ করে' লাভ নেই; জীবন থেকে সে নির্ব্বাসিত—অন্তত তিন সপ্তাহের মত।

৫

তিন সপ্তাহ! কঠিন দণ্ডাজ্ঞার মত কথাটা তা'র মনের ওপর পড়লো; ভারি শব্দ করে' কারাগৃহের দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেলো—তিন সপ্তাহের মত সে বন্দী। এতক্ষণ, সব বিরোধী লক্ষণ সত্ত্বেও সে মনকে চোখ ঠার্‌ছিলো; হতাশ-ভাবে, মনের সমস্ত একত্রীভূত শক্তি দিয়ে আশা কর্‌ছিলো যে শেষ পর্য্যন্ত হয়-তো দেখা যাবে, বিশেষ কিছু হয় নি; দু' একদিনের মধ্যেই হয়তো ভালো হ'য়ে যাবে। সমস্ত ব্যাপারটা একটা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত তা'র কাছে ঠেক্‌ছিলো; এমন হাস্যকর, অসম্ভব ঘটনা যে তা'র কখনো ঘট্‌তে পারে, তা ভাবা যায় না। ভাবা যায় না, কিন্তু তা-ই এখন সত্য হ'য়ে উঠ্‌লো, অনস্বীকার্য্য সত্য। এখন শান্ত-ভাবে নিয়তিকে মেনে নেয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়; ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে তিন সপ্তাহ সময় সে হারালো; এই সময়টা নির্জীবতা, নিষ্ক্রিয়তার কাছে উৎসর্গীকৃত; এই সময়ের জন্য তা'র অস্তিত্ব নেই। সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারলে এরি মধ্যে মন সান্ত্বনা খুঁজে' বা'র করে, আংশিক শান্তি অন্তত পায়।' কিন্তু মাঝে-মাঝে তা'র মন বিদ্রোহের তীব্রতায় অস্থির হ'য়ে ওঠে—কেন, কেন, কেন এমন হ'লো! এই স্থবিরতা, রুদ্ধতাকে কী করে' স্বীকার করে' নেয়া যায়? তা'র বুদ্ধি, তা'র সমস্ত সূক্ষ্ম চেতনাবোধ তো তেমনি জাগ্রত, সক্রিয় আছে, তা'দের মন্ত্রণা-অনুসারে বেশ সে বাঁচ্‌তে পার্‌বে না, কেন শরীরের একটা তুচ্ছ, দৈব বিকলতার কাছে তা'কে দাসবৃত্তি কর্‌তে হ'বে? যে-মনের এত ক্ষমতা, এত দীপ্তি, শরীরের প্রত্যাদেশের কাছে সে কিনা এমন অসহায়। কী সম্পূর্ণরকম নিষ্ফল, বাহুল্য হ'য়ে গেছে এখন তা'র মনের সব দীপ্তি আর ক্ষমতা—তা'র শ্রেষ্ঠ অংশ, তা'র গৌরব! আত্ম-অবমাননায়, ব্যর্থতা বোধে, সোমেশের দেয়ালে কপাল ঠুক্‌তে ইচ্ছে করে, হাত কাম্‌ড়াতে ইচ্ছে করে, চীৎকার কর্‌তে ইচ্ছে করে।

কয়েকটা রাত্রি নরকের ভেতর দিয়ে কাট্‌লো। সোমেশ জান্‌লো, শরীরের কষ্ট কত ভয়াবহ হ'তে পারে। জীবনের সব অমঙ্গলের মধ্যে, শারীরিক কষ্টকেই সে সব চেয়ে ভয় করে' এসেছে; আর, কপালগুণে, তা'কে এ-পর্য্যন্ত কখনো তা জান্‌তেও হয় নি। ইনফ্লুয়েঞ্জার গা-ব্যথা ও-বিষয়ে তা'র চরম অভিজ্ঞতা। এইবার, একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব জগত তা'র কাছে আত্মপ্রকাশ কর্‌লো: সে-জগতে যন্ত্রণা আর ব্যাধি, ভীতি আর চীৎকার। এই জগতের অস্তিত্ব সরকারীভাবে, থিওরি-হিসেবে সে জান্‌তো; যেমন সে জানে জ্যাপ্ল্যাণ্ড্‌

গ্রামে একটা দেশ আছে। কিন্তু তা'র মনের মানচিত্রে ল্যাপল্যাণ্ডের ছবি নেই; ল্যাপল্যাণ্ড তা'র পৃথিবীর সীমা-রেখার বাইরে। তেম্‌নি, তা'র পক্ষে সেই যন্ত্রণার জগতের কখনো অস্তিত্ব ছিলো না। কে ভাব্‌তে পেরেছিলো যে তা এত সত্য; সৃষ্টির আকৃতিহীন কাঠামোর এমন বাস্তব একটা অংশ!

শোয়া ব্যাপারটাই এক যন্ত্রণা; বালিশে মাথা রাখবার সঙ্গে-সঙ্গে সোমেশের গোঙানি আরম্ভ হয়। সুধা হয়-তো জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাগছে?' বৃথা প্রশ্ন! কী করে সে বোঝাবে, কেমন লাগছে? কোনো-একটা শব্দ উচ্চারণ করলে একটু আরাম লাগে; ক্লান্তস্বরে বার বার সে ডাকে, 'সুধা, সুধা।' সুধা তা'র মুখের ওপর ঝুঁকে' পড়ে: 'কী? কী?' তার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দেয়: 'একটু চোখ বুজে থাকো না, ঘুম আসবে।' তার ডান হাতটা সুধা তার বুকের কাছে টেনে নেয়, তা'র গালের ওপর একবার চেপে ধরে। 'মা, মাগো—' সোমেশের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে দুঃখের, সান্ত্বনার শেষ কথা নিঃসৃত হয়—'আর পারি নে, মা।' সুধা তার চুলগুলো নিয়ে আদর করতে-করতে বলে, 'একটু যদি ঘুমোতে পারো, ছাখো।' 'তোমার মনে আছে, সুধা,' সোমেশ অবান্তর কথা তুলে' অন্যমনস্ক হ'বার চেষ্টা করে, 'সেবার যে আমরা দার্জ্জিলিঙ গিয়েছিলাম, গাড়ি থেকে কী চমৎকার সব লাল ফুল দেখেছিলাম?' কিম্বা: 'জানো সুধা, সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিলো, তিনি বল্‌ছিলেন, "গল্প তো সবাই লিখতে পারে—ওতে আর কী আছে? তবে পদ্য—হ্যাঁ, মিল দেয়া সকলের কাজ নয়।" ব'লে' জোরে—একটু বেশি জোরে—হেসে ওঠে। সুধাও সে-হাসিতে যোগ দেয়; তা'র সাধ্যমত আলাপ চালিয়ে নেয়। কিন্তু বেশি দূর পারে না—সারাদিনের শ্রান্তির পর ঘুমে সে অবশ হ'য়ে পড়ে; তবু, আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের ওপর রীতিমত অত্যাচার করে' যতক্ষণ সম্ভব নিজকে জাগিয়ে রাখে; ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে, অর্দ্ধ-অচেতনতায় সোমেশের কথা শোনে; শুনে' জবাব দেয়।

আস্তে-আস্তে, সোমেশের ঘুমের ওষুধও কাজ করতে আরম্ভ করে, সে নীরব হ'য়ে যায়। চট করে' তবু ঘুম আসে না; চোখ বুজে' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ব্যাধির আর যন্ত্রণার যে-জগত এতকাল তা'র কাছে অনাবিষ্কৃত ছিলো, তা'র দৃষ্টের পরে ভয়াবহ দৃশ্য উদ্ঘাটিত হ'তে থাকে।

রাত্রির এম্‌নি নীরব সময়ে একটা হাঁসপাতাল। ম্লান হলদে আলোয় অর্দ্ধ-উদ্ভাসিত প্রকাণ্ড এক ঘর; নগ্ন, শাদা দেয়ালগুলো একটা ভৌতিক উপস্থিতির মত। রুগ্নের, মুমূর্ষুর কষ্টকর নিঃশ্বাস অবিশ্রান্ত নিজেদের পুনরাবৃত্তি করছে। নীরবতাও ঠিক যেন নীরব নয়: অমিতাহারীর দুঃস্বপ্ন-জড়িত ঘুমের মত তা ভাঙা-ভাঙা, অসম্পূর্ণ। হঠাৎ সমস্ত ঘরের প্রান্ত থেকে প্রান্ত দীর্ণ করে' এক তীব্র, দীর্ঘ, অমানুষিক চীৎকার। ছুটে' এলো নার্স; তিন-শো সতেরো নম্বর রোগী বালিশের ওপর কনুইর ভর দিয়ে কাৎ হ'য়ে উঠে' বসেছে; তা'র গলা সাম্‌নের দিকে বাড়ানো গর্ত্ত থেকে চোখ প্রায় বেরিয়ে এসেছে। নার্স কাছে আসতেই উন্মাদের মত সে চীৎকার করে' উঠলো: 'নিয়ে যাও, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও!' সে আরো খাড়া হ'য়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিলো, দু'জন নার্স তাড়াতাড়ি তাকে দু'দিক থেকে ধরলে। দুর্ব্বলভাবে একটু ছটফট করে, সে হার মান্‌লো। কিন্তু তীব্র, আরো তীব্র হ'য়ে মাঝে-মাঝে তা'র চীৎকার দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছেই: 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাও।' হঠাৎ তা'র মনে পড়ে' গেছে যে কাল সকাল ন'টার সময় তা'র একটা পা কেটে ফেলা হ'বে। এদিকে বাইরে, হাঁসপাতালের দরজায় একটা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে; সেখান থেকে নাবানো হ'লো একটা—জিনিষ, হ্যাঁ, জিনিষ বলাই ভালো। সমস্ত শরীরটা থেৎলে গেছে, পিষে, গুঁড়ো হ'য়ে গেছে, শুধু, এক আশ্চর্য্য উপায়ে, চোখ দুটোয় প্রাণ আছে। লিফ্‌টের নীচে চাপা পড়েছিলো। ডাক্তার বল্‌ছেন, 'এখনো যে বেঁচে আছে, এটাই মির‍্যাক্‌ল্‌...'। সমস্ত বহির্গামী প্রাণ যেখানে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেই চোখ দুটোয় একবার পাতা পড়্‌লো।

তখনো ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয়নি। নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্র খবর দিচ্ছে: কাল অমুক হাঁসপাতালে অমুক ডাক্তার এক আশ্চর্য্য অপারেশন করেছেন। ষোলো বছরের

এক ছেলের [illegible] পা'র অ্যাম্পুটেশন। ছেলের বাবা আগাগোড়া তাকে কোলে করে' বসে ছিলেন। ছেলেকে অ্যানিস্থেটিক দেয়া হয়েছিলো মাঝে-মাঝে এক ডোজ হুইস্কি। প্রথমে, মাংস-কাটা ছুরির মত একাণ্ড এক ছুরি দিয়ে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে কাটেন। ছেলেটা অবিশ্রান্ত চীৎকার করে। পরে, ডাক্তার যখন করাতের পোঁচ দিতে আরম্ভ করেন, অজ্ঞান হ'য়ে যায়। সেই সময়ে তা'র বাবার চোখ দিয়েও ঝর্‌ঝর্ করে' জল পড়তে থাকে। অপারেশন শেষ হ'তে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

শোঁ—ও—ও—ও। এইমাত্র একদল মানুষ ছিলো; এখন টুক্‌রো-টুক্‌রো কতগুলো হাত-পা মুহূর্ত্তের জন্য শূন্যে লাফিয়ে উঠে গড়িয়ে মিলিয়ে গেলো। একটা লোকের নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে; সে চেষ্টা কর্‌ছে এক হাত দিয়ে সেগুলো ফের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে, কিছুতেই পার্‌ছে না। তা'র গায়ের সঙ্গে আর-একটা লোক লেপ্‌টে রয়েছে। একটা লোক দৌড়িয়ে গেলো; তা'র মাথা নেই, গলা দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত পড়্‌ছে। দু'পা গিয়েই সেই সচল শব থুব্‌ড়ে পড়্‌লো।

পেছনে পঞ্চাশটা এরোপ্লেন তাড়া করেছে—পালাও, যত শীগ্‌গির পারো, পালাও। লক্ষ-লক্ষ মক্ষিকা একসঙ্গে গুঞ্জন করে' উঠ্‌লো, কিন্তু অতিকায় জাহাজটার বেগ বাড়্‌ছে না। ফেলে' দাও—যা-কিছু জিনিষ-পত্র অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি আছে, সব ফেলে' দাও। তবু যথেষ্ট দ্রুতগতি হচ্ছে না; এরোপ্লেনগুলো ক্রমশই কাছে আস্‌ছে। শত্রুর হাতে ধরা পড়া—কখনো নয়, কখনো নয়। জেপেলিন চালাবার জন্য এত লোকের দরকার নেই। আরো ভার কমাও। ক্যাপ্টেনের আদেশে একজনের পর একজন এসে দাঁড়ালো। জীবনের শেষ সীমা, পৃথিবীর প্রান্তদেশ। এক পা পরেই···। চোখ বুজে মুহূর্ত্তের জন্য কে জানে কোন্ মহান, কোন্ তুচ্ছ চিন্তা করা, সেই পা ফেলা, তারপর মহা-শূন্যের আলিঙ্গন।

নীচে নীল সমুদ্র। ঘণ্টায় দেড় শো মাইল নীল আকাশ পার হ'য়ে আস্‌ছে। আর দেড় ঘণ্টা পরেই নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক। ঝড় না? হ্যাঁ, ছোট একটা স্থানীয় ঝড় বলে'ই তো মনে হচ্ছে। হোক্ ঝড়···—ওকে নীচে ফেলে দিতে কতক্ষণ। কিন্তু এ কী! এরোপ্লেন যে আর ওপরে উঠ্‌ছে না। কী হ'লো? যন্ত্রের গোলমাল? ওপরে, ওপরে, ওপরে ওঠো। কোথায়? ঝড়ের ভেতরে যে ঢুকে' গেলো, যে-দিকে তাকায়, খালি কুয়াশা—আর কী হাওয়া, ঈশ্বর, কী হাওয়া! ঈশ্বর, ঈশ্বর, নীরব প্রার্থনায় ঠোঁট নড়্‌ছে, ঈশ্বর! ধরে' থাকো, ধরে' থাকো। মৃত্যুর আতঙ্কের দৃষ্টি চোখে! ভীষণ এক বাতাসের ঝটকা এলো, তারপর—ঈশ্বর!—(একবারের বেশি মনে কর্‌বার সময় ছিলো না) এরোপ্লেন গেলো উল্টিয়ে। ডিগ্‌বাজি খেতে-খেতে···

যা-কিছু সোমেশ শুনেছে, বইয়ে পড়েছে বা ছবিতে দেখেছে, অসহনীয় স্পষ্টতায় সব তা'র মনে ফুটে' ওঠে। কত বিচিত্র বীভৎসতায়, যন্ত্রণার কী অপরিমেয়তায়—রক্ত-ক্ষরণে, নাড়ি উদ্গীরণে, পারস্পরিক অঙ্গ-স্খলনে, ক্রমশ বিলীয়মান চৈতন্যে আর্ত্ত ত্রাসে, রুদ্ধশ্বাসে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপূর্ণ তৃষ্ণায়—কত ভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু, মৃত্যু। হঠাৎ, অদৃশ্য, কিন্তু জীবন্ত একটা সত্তার মত অত্যন্ত নিকটভাবে মৃত্যুকে সে অনুভব করে। হঠাৎ মনে হয়, তা'রো তো একদিন মৃত্যু হ'বে। অসম্ভব; বিশ্বাস করা যায় না; শুন্‌লে হাসি পায়। সে নেই, এ অবস্থাটা কল্পনা করা অসম্ভব। তবু, এ-ও ঠিক...। কী-রকম, তা'র জন্যে কী-রকম মৃত্যু অপেক্ষা কর্‌ছে? ঠিক মৃত্যুর মুহূর্ত্তটা সে মনে-মনে রচনা কর্‌বার চেষ্টা করে: সে আছে—খুট—সে নেই। মধ্যবর্ত্তী এই যে একটা মুহূর্ত্ত, এটা কেমন? সেই মুহূর্ত্ত, অনিবার্য্য, মমতাহীন, একদিন আস্‌বেই। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিঃশ্বাস-পাতের সঙ্গে, নিশ্চিত, নির্ভুল, সেই মুহূর্ত্তের দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে। সোমেশের সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হ'য়ে যায়। খানিকক্ষণ, নিঃশ্বাস ফেল্‌তে তা'র কষ্ট হয়। নিজের অস্তিত্বের নিঃসংশয়তা অনুভব কর্‌বার জন্য তা'র মন সুধার সংলগ্ন শরীর থেকে ব্যাকুল আগ্রহে উত্তাপ শোষণ করে।

ভোরের দিকে হিপ্‌নটিকের প্রভাব কেটে যায়; তা'র কষ্টের কারাগৃহে সে জেগে ওঠে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা তা'র হাত লৌহ-দণ্ডের মত কঠিন, নিশ্চল; তা'র মধ্যে সমস্ত রক্ত তরল আগুন হ'য়ে গেছে। সে আর পারে না, আর পারে না। কখন্ ভোর হ'বে? জীবনের পরিচিত শব্দের জন্য সে কান পেতে থাকে; কত রাত্রে লিখ্‌তে-লিখ্‌তে রাস্তায় জল দেয়ার শব্দে সে চম্‌কে উঠেছে; একটা অসাময়িক ট্যাক্সির খট্‌খট্‌খট্‌ স্থূল, যান্ত্রিক হাসির মত নিশীথের আত্ম-জল্পনাকে আঘাত করে' গেছে। কিন্তু এখন, যেন তা'র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে' সব গেছে স্তব্ধ হ'য়ে; শীত-প্রত্যূষের প্রশান্তি একটা হিংসা-পরায়ণ জন্তুর মত তা'র বুকের ওপর চেপে বসেছে। মুখ ফিরিয়ে সুধার দিকে সে তাকায়: শান্ত, সুন্দরভাবে অচেতন, সুধা ঘুমুচ্ছে: তা'র শরীরের নরম সব রেখা ঘুমের এলায়িতত্বে আরো নরম—শরতের আকাশে মেঘ-ছবির ছাঁচের মত, অনেকদিন আগে দেখা কোনো মধুর স্বপ্নের স্মৃতির মত। যেন কোনো দুর্বোধ্য, আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌ছে, মুগ্ধচোখে সোমেশ তাকিয়ে থাকে। এ-ই সুধা, দু' বছর ধরে' যা'কে সে জেনে আস্‌ছে—যা'কে সে ভালোবাসে, যে তা'কে ভালোবাসে। ভালোবাসে...? ভালবাসে···? গান শেষ হ'য়ে যাবার পর রেকর্ডের ওপর পিনের অবিশ্রান্ত, অর্থহীন খোঁচার মত এই প্রশ্ন বার-বার তা'র মনে ঘা দিয়ে যায়; কথাটার অর্থ যেন ঠিক তা'র হৃদয়ঙ্গম হয় না। হ্যাঁ, ভালোবাসে; কিন্তু এত ভালোবাসাও সুধার ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লো না; সুধার এই মুহূর্ত্তের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পার্‌বে না। এত ভালোবাসা—তবু তা'র দুঃখময় বিনিদ্রতা সম্বন্ধে সুধা সম্পূর্ণ নিশ্চেতন। তা'র কষ্টের পাষাণময় কারাগৃহে সে অন্ধ; সেখানে সে একা, সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন: সেখান থেকে সুধা কী নিঃসীম, কী নিঃসহায়রূপে দূরে! সুধা যদি তা'র দেয়ালে কপাল ঠুকে মরে'ও যায়, তবু মুহূর্ত্তের জন্য সেই কারাগৃহের দরজা এতটুকু ফাঁক হ'বে না; তা'র সমস্ত ভালোবাসার শক্তি নেই, সেই কারান্ধকারের লেশমাত্র আভাস তা'কে দিতে পারে। একা, একা; অপরিসীম, অসহায় একাকীত্ব। এক মোহহীন মুহূর্ত্তে মানুষের মূলগত, অপার নিঃসঙ্গতা সোমেশ উপলব্ধি করে; যে-নিঃসঙ্গতা সুখের সময়ে, আনন্দের উদার উষ্ণতায় আমরা ভুলে' থাকি, কিন্তু দুঃখ যা'কে নির্ম্মমরূপে পরিস্ফুট করে' তোলে, যা'র ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবধানের চিরন্তন দুস্তরতা সম্বন্ধে আমরা অসহনীয়রূপে সচেতন হ'য়ে উঠি। উপলব্ধি করে, কেন দু'জন মানুষ বছরের পর বছর, সমস্ত জীবন অন্তরঙ্গতম সম্বন্ধে যাপন কর্‌লেও পরস্পরের অপরিচিত থেকে যায়; কেন, বাসনার সমস্ত প্রবলতা দিয়ে তপস্যা কর্‌লেও কখনো, কখনো একজন আর-একজনের নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে না।

৬

সুধার, এদিকে, মুহূর্ত্তের বিশ্রাম নেই। যেন একটা নেশার ঝোঁকে, সোমেশের পরিচর্য্যায় সমস্ত দিন তা'র কেটে যায়। সোমেশ এখন শিশুর মত অসহায়, প্রতি ছোট কাজে তা'কে সাহায্য কর্‌তে হয়; সুধা সব সময় তা'র কাছে বসে' থাক্‌বে, সোমেশ যেন তা-ই আশা করে। বসে' থাক্‌তে সুধার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু অন্যদিকে মন না দিলেও চলে না; বিশেষ করে,' সোমেশের আহারের বিস্তৃত আয়োজন অনেকটা সময় নিয়ে নেয়। হাত-ভাঙার পর থেকে সোমেশের খাদ্যে রুচি ও ক্ষুধা-বোধ দু'ই বেড়ে গেছে; সে-বিষয়ে একবেলা একটু ত্রুটি হলেও সে তা অলক্ষিত, অমন্তব্যিত যেতে দেয় না। এবং কখনো-কখনো সে-মন্তব্যের ভাষা, হ'তে পারে, তা'র নিজেরি অজ্ঞাতে, রূঢ় হ'য়ে পড়ে। লজ্জিত, অনুতপ্ত, পরের দিন সুধা অতিরিক্ত আধ ঘণ্টা উনুনের ধারে যাপন করে; ফল যা হয়, সোমেশের মুখ তা'তে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। (প্রসঙ্গক্রমে, প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ম-প্রধান দ্রব্য-ভক্ষণ ও পরিপূর্ণ বিশ্রামের ফলে কয়েকদিনের মধ্যে সোমেশের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেলো।) রোজ সন্ধ্যায়, অমল আপিস থেকে সোজা চলে' আসে; কোনোদিন তা'র একটু দেরি হ'লে সোমেশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বিকলতায় অভ্যস্ত, বহির্জ্জগত-সম্বন্ধে সোমেশ আবার কৌতূহলী, উৎসাহী; লিখ্‌তে কি পড়্‌তে অক্ষম, গল্প করাই তা'র মনের একমাত্র খোরাক। অমলকে সে

সহজে ছাড়তে চায় না: কথা, কথার পর কথা, কথার শেষ নেই। যদি সমস্ত দিন এ-ভাবে কাটতো! রাত্তিরে বিছানায় গিয়ে সুধা আর চোখ মেলে' রাখতে পারে না; কিন্তু সোমেশ ঠেলা মেরে-মেরে তা'কে জাগিয়ে রাখে; বাধ্য করে তা'কে কথা বল্‌তে; যদি কখনো তা'র চোখ লেগে আসে, সে চুপ করে' যায়, সোমেশ ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলে' ওঠে, 'কথা বলো না, সুধা! গল্প করো, গল্প করো।' সাধ্যমত, তা-ই সুধা করে।

(তবু এরি মধ্যে এক-একটা সময় আসে যখন সুধার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে অসহ্য, অসহ্যরূপে সচেতন হ'য়ে উঠে। পরিপূর্ণ, তৃপ্তিকর আহারের পর পান চিবোতে-চিবোতে সে যখন সিগ্রেট ধরায়, সুধার ক্লান্ত, মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তা'র মন যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে সচকিত হ'য়ে ওঠে; সেই মুহূর্ত্তে, সুধার জন্য ভালোবাসা এক সদ্যোমুক্ত জলস্রোতের মত তা'কে বিপর্য্যস্ত, আবিষ্ট, অভিভূত করে' দেয়; টন্ টন্ করে' ওঠে তা'র হৃৎপিণ্ড; এত ভালোবাসা—মরে' যেতে পার্‌লে সে যেন বাঁচে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে' মনে-মনে সে বলে, 'ঈশ্বর! ঈশ্বর!' আকাশের তারাদের কোন্ চক্রান্ত সুধাকে তা'র কাছে এনে দিয়েছিলো—কোন্ বিস্মৃত অতীতে, সুধার যোগ্য হ'বার কোন্ কঠোর তপস্যা সে করেছিলো! এত সহজে, এমন নির্ব্বিঘ্ন অনায়াসে কি রাজকুমারীকে পাওয়া যায়? তা'র জন্য কি কোনো নিষ্ঠুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয় না? কবে সে ছায়ার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য-ভেদ কর্‌লো, শিবের ধনুক ভাঙলে কবে? মনে পড়ে না। যা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে সুধার ক্লান্ত, মলিন মুখ। হঠাৎ সোমেশ লক্ষ্য করে, সুধার চোখের নীচে কালি পড়েছে, ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে তা'র গালের স্বাভাবিক রক্তিমা ব্যথায়, অনুশোচনায় সোমেশের মন টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে' যেতে চায়। স্বার্থপর! স্বার্থপর! কী অধিকার আছে তা'র সুধাকে এমন যথেচ্ছ ব্যবহার কর্‌বার? তা'র সুখের জন্য সুধা এখন একটা যন্ত্র; তা'র তুচ্ছতম আরামের জন্য সুধার অবিশ্রান্ত দাসত্ব—এই স্তূপীকৃত ঋণ নিয়ে স্থী করে' সে বাকি জীবন কাটাবে? পরমুহূর্ত্তেই মনে হয়, ভালোবাসার জন্য স্বেচ্ছায়, সানন্দে এই আত্ম-বিসর্জ্জন—এর নাম সৌন্দর্য্য, এর নাম গৌরব, সে কে এতে বাধা দেবার? দীন, দীনচিত্তে, নতজানু হ'য়ে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে একে গ্রহণ করা ছাড়া ক আর উপায় আছে? শুধু এই তা'র প্রার্থনা, জীবনে কখনো, কখনো যেন সুধার জন্য এম্‌নি আত্মত্যাগ কর্‌বার সুযোগ সে পায়, ভীষণ দুঃখের ভিতর দিয়ে যেন বাঁচ্‌তে হয় তার জন্য। সুধার শরীর একটু খারাপ হ'য়ে পড়েছে, দেখেই বোঝা যায়। আশ্চর্য্য নয়—এত পরিশ্রম! এতটা কি ওর না কর্‌লেই নয়? কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। এক-বার সেরে উঠ্‌লেই হয়; তারপর, যেমন করে' হোক্, সুধাকে সে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবে।)

রাত্রে পরিপূর্ণ ঘুম হয় না; দুপুরে সুধা হয়-তো একটু শুয়েছে, সোমেশ ডাক দেয়। 'একটা-কিছু পড়ো না, শুনি।' সুধা তৎক্ষণাৎ উঠে' সোমেশের কাছে একটা চেয়ারে এসে বসে। 'কী পড়্‌বো?' উঃ, একটু যদি লিখ্‌তে পার্‌তাম!' হঠাৎ সোমেশের পুরোনো শোক উথ্‌লে ওঠে, 'কবে আমি ভালো হ'বো, কবে বইটা শেষ হ'বে।' 'মুখে বলে' যাও না—আমি বসে' লিখ্‌ছি।' 'না, না; নিজ হাতে না লিখ্‌লে আমার কখনো লেখা হয় না। কবে যে আবার লিখ্‌তে পার্‌বো!' ভারি একটা বই হাতে নিয়ে পড়্‌তেও তা'র অসুবিধে হয়; হাত থেকে বইটা খসে' যায়; ভাঙা হাতটাকে ঠিক অবস্থায় রেখে এমন অদ্ভুতভাবে বস্‌তে হয় যে দু' মিনিটেই ঘাড় আর পিঠ ব্যথা কর্‌তে থাকে। স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে, আছে প্রচুর সময়; অথচ একটা বই পর্য্যন্ত পড়া যায় না, এমন যন্ত্রণার কথা কে কবে শুনেছে! কতদিন সে কবিতা পড়ে না সময়ই হয় না। কবিতা পড়্‌বার সব দিক দিয়ে এমন উপযুক্ত সময় শীগ্‌গির তা'র জীবনে আসে নি। 'রিং অ্যাণ্ড দি বুক্‌টা নিয়ে এসো।' 'কোন্ খানটা পড়্‌বো?' 'পম্পিলিয়ার কথা—যেখানে সে প্রথম টের পেলো সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে; সঙ্গে-সঙ্গে গিদোর বাড়ি থেকে পালিয়ে রোমে যাবার সংকল্প করছে।' পাতা উল্টিয়ে সুধা নির্দ্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজে বা'র করে। অনেকগুলো

কুশানের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে নিবিষ্টমনে সোমেশ শোনে :

It had got half through April. I arose
One vivid daybreak,—who had gone to bed
In the old way my wont those last three years,
Careless until, the cup drained, I should die.
... ... —my sole thought
Being still, as night came, 'Done, another day !
'How good to sleep and so get nearer death !'—
When, what, first thing at daybreak, pierced the sleep
With a summons to me ? Up I sprang alive,
Light in me, light without me, every where
Change ! A broad yellow sun-beam was let fall
From heaven to earth,—a sudden drawbridge lay—
... ... I stepped forth,
Stood on the terrace,—o'er the roofs, such sky !
My heart sang, 'I too am to go away,
'I too have something I must care about,
'Carry away with me to Rome, to Rome !...
'I have my purpose and my motive too,
'My march to Rome like any bird or fly !
'Had I been dead ! How right to be alive !...
'My life is charmed, and will last till I reach Rome !
'Yesterday, but for the sin,—ah, nameless be
'The deed I could have dared against myself !
'Now—see if I will touch an unripe fruit,
'And risk the health I want to have and use !...'

সুধা পড়ে' চলে, কিন্তু সোমেশ আর শুনতে পায় না। কবিতার ছন্দোবদ্ধ কথা অবোধ্য ভাষায় এক মৃদু সঙ্গীতের মত তার মনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। 'How right to be alive !' তা'র জীবন, তা'র শরীর। তা'র শরীরের অগণ্য কোষে জীবন স্পন্দিত হচ্ছে ; অসংখ্য শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ, ঐশ্বর্য্যময় জীবন। 'I have my purpose and my motive too! পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্য্যন্ত সোনার সেতু এই সূর্য্যালোকরেখা ; গুঞ্জিত-পাখা মক্ষিকার ছোট, নীল, শরীরের ওপর রোদের ঝিলিমিলি ; পাখী এলো মুখে খড় নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এইখানে, দালানের এই কোণে বাসা বাঁধবে বলে' ; ঐ মাছির মত, পাখীর মত আমিও আজ প্রাণ-চঞ্চল। 'To Rome, to Rome !' বাঁচবো, আমিও আজ বাঁচবো। যে-আমি কাল ভেবেছিলাম—থাক্, সেই পাপ অনুচ্চারিত থাক্। আমি বেঁচে আছি। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল বিশ্বের মধ্যে, মৃত নক্ষত্রস্তূপের মধ্যে আমার এই প্রাণ—কী আশ্চর্য্য ! আমি আজ বাঁচবো, তা'র জন্য অতীতে কত মানুষের বংশ মরে' গেলো : আমার অগণিত পূর্ব্বপুরুষ গেলো ছাই হ'য়ে ; তবু তা'দের অমর প্রাণ-বীজ লক্ষ-লক্ষ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে-হ'য়ে আজ আমাকে গড়ে' তুলেছে—আমার এই আশ্চর্য্য, এই অপার রহস্যময় শরীরকে, এই শরীরের চেয়েও যে বেশি, সেই আমাকে। ম্যামথ, ডায়নেসার, টেরোড্যাক্‌টিল লুপ্ত হ'য়ে গেলো আজ আমি বাঁচ্‌বো বলে' ; অরণ্যের পর অরণ্য গেলো ফর্সা হ'য়ে ; পৃথিবী উপঢৌকন দিলে স্বর্ণ আর শস্য। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ! 'How right to be alive !' মহাকাশে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে যে-প্রকৃতি তা'র রাজত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে, জীবনের জন্য তা'র মমতা নেই ; তবু কী করে,' দূর, দূর অতীতের অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় অন্ধকারে, ফুটন্ত মহাসমুদ্রের উপকূলে—কী করে' একদিন প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হ'লো ; তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী সব বাধা অতিক্রম করে', বিশ্বপ্রকৃতির ঔদাসীন্য পরাস্ত করে' চলে' এসেছে অজেয় প্রাণ-স্রোত ; তৃণে আর বনস্পতিতে, পাতায়, পোকায়, পাখীতে, বিচিত্র সব পশুর দীর্ঘ শোভাযাত্রায় চির-বর্দ্ধমান চির-পরিবর্ত্তমান প্রাণ : বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান স্তরে আমি ; স্মরণাতীত সেই অতীতের সঙ্গে রক্তের সূত্রে আমি জড়িত। আমি বেঁচে আছি ; কী আনন্দ বাঁচ্‌বার।

Oh, wild joys of living, the leaping from rock to rock—
The strong rending of boughs from the fir-tree—
The cool silver shock.
Of the plunge in a pool's living water— ... ...
How good is man's life, the mere living !
how fit to employ
All the heart and the soul and the senses,
for ever in joy !

শরীরের সৌন্দর্য্য ; প্রতি অঙ্গের অবাধ, সাবলীল গতি ; রেখার সঙ্গে রেখার সমাবেশ, দৃঢ় পেশীর সৌষ্ঠব। 'Oh, the wild joys of living' ! স্বাস্থ্যের উষ্ণ দীপ্তি। আমার প্রতি রোমকূপে অদম্য প্রাণ কথা কয়ে' উঠ্‌ছে। 'How right to be alive !' 'How good is

man's life, the mere living!' বাঁচ্‌বার আনন্দ, বাঁচ্‌বার উদ্দাম আনন্দ।

৭

রোজ সকালে উঠে' সোমেশ একবার ভাবে: 'আর-একটা দিন গেলো; একদিনের অনুপাতে আমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌লাম।' কিন্তু প্রকৃতির কাজ মন্থর; অসহ্যরকম মন্থর; দিন থেকে দিন কোনো পরিবর্ত্তনই অনুভূত হয় না। ডাক্তার নিতান্ত ভদ্রতা করে' একুশ দিন বলেছিলেন; সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে উঠ্‌তে-উঠ্‌তে প্রায় দু'মাস কেটে গেলো। আস্তে—উঃ, কী ভয়ানক আস্তে!—হাতটা আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে' আস্‌তে লাগ্‌লো। একদিন সে বাঁ হাতে জলের গ্লাস মুখে তুল্‌তে পার্‌লো; আর একদিন দু' হাতের সাহায্যে চুল আঁচড়াতে পার্‌লো, সত্যি-সত্যি নিজ হাতে গায়ে সাবান মেখে স্নান কর্‌তে পার্‌লো। একদিন দেখা গেলো—ওঃ, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—সে যথারীতি কাৎ হ'য়ে শুতে পার্‌ছে, এমন কি, একটু সাবধানে, বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে উপুড় হ'য়েও শু'তে পারে। নতুন আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে হাতটাকে নানা কাজে সে প্রয়োগ করে; এই সুস্থ অঙ্গ যেন অমূল্য একটা সম্পত্তি, বুঝে' উঠতে পারে না, কী কর্‌লে এর যথাযোগ্য ব্যবহার হ'বে। সে কখনো ভাবে নি, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ সব কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করায় এত আনন্দ। তা'র জীবনের চাকাগুলো আবার মসৃণভাবে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। হাতটা এখনও দুর্ব্বল; অনেকদিন পর্য্যন্ত সাবধান থাকা দরকার, কিন্তু এখন সে রাস্তায় বেরোতে পারে। অমলের সঙ্গে একদিন ট্রামে চড়ে' সে চৌরঙ্গী থেকে ঘুরে' এলো। আশ্চর্য্য, শহরটা যা ছিলো, তা-ই আছে। এতদিন, এতদিন সে ঘরে আবদ্ধ ছিলো; এর মধ্যে কী না ঘট্‌তে পার্‌তো? কিন্তু—কালও যেন সে এ-সব জায়গা ঘুরে' গেছে! এমন কি, লুব্ধ, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দু' দিকে তাকাচ্ছিলো, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংগুলোয় যেখানে যে-পোস্টার ছিলো, এখনো তা-ই রয়েছে। সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে খরস্রোত প্রাণ তেম্‌নি প্রবহমান। সোমেশ দেখলো, শুন্‌লো, শুঁক্‌লো। আ, এ-কথা ভাব্‌তে কী তৃপ্তি যে এই প্রাণ-স্রোতের আমি একটা তুচ্ছ, তুচ্ছ অংশ—সেই তুচ্ছতাতেই তো মজা! আমি তুচ্ছ একটা অংশ, কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করেই জীবনের ঘূর্ণী বয়ে' চলেছে; আমি মগ্ন হ'য়ে আছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার চৈতন্যের একটা জাগ্রত অংশ দিয়ে লক্ষ্য কর্‌ছি, উপভোগ কর্‌ছি, পারিপার্শ্বিক বিক্ষিপ্ত জীবনকে খাদে বইয়ে নিজের মধ্যে টেনে আন্‌ছি।

এতদিনে সোমেশ তা'র উপন্যাস শেষ কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'তে পার্‌লো। এইবার সে ভূতের মত খাটবে; এত সময় অপব্যয়িত, অথচ এত কর্‌বার ছিলো! এইবার সে তা'র শোধ তুল্‌বে। সারাদিন বসে' সে লেখে; মধুর ক্লান্তি, চারটের সময় মধুরতরো চা। তার পর সন্ধ্যে হ'লে সুধাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়; জনবিরল, স্নিগ্ধ সবুজ গ্যাসে অর্দ্ধ-আলোকিত হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে বেরিয়ে ক্যাথিড্রেল পর্য্যন্ত হেঁটে যায়; ভিক্‌টোরিয়া মেমরিয়েলের বৃহদায়তনের স্থূল, অতি-স্থূল পার্থিবতার বিরুদ্ধে মানবাত্মার উর্দ্ধগামী অভীপ্সার মত সেন্ট্‌ পল্‌স্‌-এর দীর্ঘ চূড়া কী শান্ত—অথচ কী তীব্র প্রতিবাদ, তা কল্পনা করে' সোমেশ মুগ্ধ হ'য়ে যায়। এতদিন সে কল্‌কাতায় আছে, অথচ এর আগে সে কখনো এই রাস্তায়, ঠিক এইখানে এসে দাঁড়ায় নি। কোনোদিন বা বাস্‌-এ করে' পার্কস্ট্রীট্‌ পর্য্যন্ত আসে; তারপর ময়দান ভেতরের লাল, ছায়া-নিবিড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। দিন থেকে দিন; একটা সিম্ফনির বিভিন্ন গতি; সবগুলো মিলিয়ে একটা বৃহত্তরো পরিপূর্ণতরো সার্থকতার দিকে ইঙ্গিত কর্‌ছে।

একদিন সোমেশ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তা'র উপন্যাস নিয়ে খাট্‌লো; তারপর এত ক্লান্ত বোধ কর্‌লো যে আর বেরুতে ইচ্ছে কর্‌লো না। ভাব্‌লো, একেবারে রাত্তিরের খাওয়ার পরেই বেরুবে। সুধাকে সে-কথা বল্‌তে, 'তুমিই যাও', সুধা বল্‌লে।

'তুমিও চলো না।'

'আমার শরীরটা ভালো লাগ্‌ছে না।'

'কী হয়েছে?'

'হ'বে আবার কী'! এর বেশি সুধা বল্‌লে না।

'কিছুই হয় নি', সোৎসাহে, সোমেশ তা'র কথার প্রতিধ্বনি কর্‌লে, 'চলো।'

মনে-মনে সোমেশ একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো, মুখে কিছু বল্‌লে না। কিন্তু সে-রাত্রে সোমেশ একাই খেলো; সুধা বল্‌লে, 'একবেলা উপোস দিয়ে দেখি।' 'তোমাদের হিন্দু-ডাক্তারি অনুসারে; 'ঠাট্টা করে' সোমেশ বল্‌লে, 'উপোসই তো হচ্ছে সর্ব্বজ্বর গজসিংহ।' সেই মুহূর্ত্তে, রোগের প্রতিষেধক হিসেবে উপবাসে সে একটুও আস্থা অনুভব কর্‌ছিলো না; তা'র রীতিমত খিদে পেয়ে গিয়েছিলো, কাজের তাড়ায় বিকেলে বিশেষ-কিছু খাওয়া হয় নি!

সারাদিন ঘরে আবদ্ধ, সোমেশ রাস্তায় বেরিয়েই এক নতুন জগতে এসে পড়্‌লো। অস্পষ্টভাবে সে অনুভব কর্‌লো, তা'র চারদিকে কী যেন এক চক্রান্ত চলেছে। ছায়া আর গুঞ্জরণ। অস্ফুট মর্ম্মরে পৃথিবী ছেয়ে গেছে; তা'র কানের কাছে, মনের কাছে কে যেন অবিশ্রান্ত একটা কথা কয়ে' যাচ্ছে, সে ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। ব্যাপার কী? ব্যাপার কী? বহুকাল পর সে বাস্-এর ওপরে চড়্‌লো। রাত্রির আকাশে মেয়েলোকের ঘন চুলের মত নরম, কালো মেঘের টুক্‌রো একটা গোপন কথা লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করে' পার্‌ছে না; মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল তারায়-তারায় তা বেরিয়ে পড়্‌ছে। ব্যাপার কী? সবাকার অলক্ষিতে, অথচ নিশ্চিত, সৃষ্টির মূলে যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটে' গেছে। গতি আর হাওয়ার প্রভাবে তা'র মাথা ঝিম্‌ঝিম করে' উঠ্‌লো; শান্ত, সে খানিকক্ষণ সমস্ত স্নায়ু দিয়ে গতির চেতনা অনুভব কর্‌লে।

এস্‌প্লানেডের কাছে এসে সে নাব্‌লো। রাত প্রায় দশটা; চৌরঙ্গী অপেক্ষাকৃত শান্ত। হোটেলগুলো থেকে মাঝে-মাঝে শুধু দু' একদল late-diner বেরিয়ে আস্‌ছে। বেশির ভাগ দোকানের আলো গেছে নিবে। বণিক্‌বৃত্তির কেন্দ্রস্থল চৌরঙ্গী হঠাৎ যেন এক যাদুতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে; ছায়ায় আর নীরবতায় তা ত[redacted]; কবিতার মত তা'র অন্ধকার শক্তির ঐশ্বর্য্য। 'সুন্দর', বাস্ থেকে রাস্তায় পা দিয়েই সোমেশের মন বলে' উঠ্‌লো, 'কী সুন্দর!' একটা সিগ্রেট ধরিয়ে' ময়দানের দিকের ফুটপাথ ধরে' সে খানিকক্ষণ হাঁট্‌লো। ঝির্‌ঝির্, শির্‌শির্—গাছগুলের ডালপালা সুরের বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলিত হচ্ছে। ময়দানের আলোগুলো তা'র বিস্তৃত অন্ধকারকে আরো পরিস্ফুট করে' তুলছে। কী দরকার আলোর? এমন রাত্রে অন্ধকারই দীপ্ত। কী সুন্দর, সোমেশের মন বার-বার বল্‌তে লাগ্‌লো, কী সুন্দর এই চৌরঙ্গী, এই কল্‌কাতা। সমস্ত পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা আর নেই। আজকের এই রাত্রি—তা শুধু, পৃথিবীর আহ্নিক গতির একটা অনিবার্য্য ফল নয়, একটা অনুভাব্য উপস্থিতি, জীবন্ত, স্বতন্ত্র একটা সত্তা। এত উন্মাদনা আজ কোত্থেকে এলো? হঠাৎ, সচকিত আনন্দে, রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে, সোমেশ উপলব্ধি কর্‌লো। আরে, বসন্ত যে! শীত কেটে গেছে, হাওয়া বইছে দক্ষিণ দিক থেকে। এ-ই সেই অস্পষ্ট-অনুভূত চক্রান্ত—আত্ম-প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য জীবনের ক্লান্তিহীন, কঠিন চক্রান্ত। বসন্ত এসেছে; গাছের শিকড়ে-শিকড়ে মাটি থেকে রস ঠেলে' উঠ্‌ছে; ফেটে বেরুচ্ছে সবুজ অগ্নিশিখায়; যে-বর্ণ আর গন্ধ এতদিন মাটির নীচে চাপা পড়ে' ছিলো, উদ্ধত বিদ্রোহে তা আজ আকাশের অভিমুখে নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। নব-জন্ম-সম্ভাবনার বীজ-বহনে বাতাস সুরভিত, বাতাস মদির। কাছাকাছি একটা বেঞ্চি পেয়ে সোমেশ বসে' পড়্‌লো। সমস্ত আকাশে রাত্রি তা'র উষ্ণ, নরম শরীর ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রবল বৈদ্যুতিক স্পর্শের মত বসন্তে বায়ুমণ্ডল আক্রান্ত। বসন্ত তা'র রক্তে। ভূগর্ভের অন্ধকারে সংগ্রামশীল, উৎসুক বীজ থেকে ছড়ানো মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে জ্বলন্ত তারা পর্য্যন্ত—আকাশ থেকে পৃথিবী-কেন্দ্রে, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে' এক অখণ্ড প্রাণস্রোত বয়ে' চলেছে; চিরকাল ধরে' তা'র সুর অব্যাহত, সেই সুর এখন সোমেশের রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে। বেঁচে-থাকা—তা যে শুধু ভালো, তা নয়, অসহ্যরকম প্রগাঢ়, সেইজন্য কষ্টসাধ্য; এমন কি, সময়-সময় তারা-ভরা শূন্যের অন্তহীন বিস্তৃতির মত ভয়াবহ। আমি শুধু আমি নই; বিশ্বের প্রাণ-স্রোত অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় আমার মধ্যে এসে সম্মিলিত হয়েছে—কী অভিভূতকারী, কী ভয়ঙ্কর চিন্তা! সোমেশের মেরুদণ্ড দিয়ে হঠাৎ একটা উষ্ণ স্রোত নেবে গেলো।

অনেকক্ষণ সে ঐ বেঞ্চিতে বসে' রইলো—স্তব্ধ, আত্ম-বিস্মৃত। সে, অন্তত সচেতনভাবে কিছুই ভাব্‌ছিলো না; তা'র সমস্ত মন নিযুক্ত ছিলো তা'র রক্তে বসন্তের অনুভূতিতে। বসে' থাক্‌তে-থাক্‌তে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তা'র ঘুম পেয়ে গেলো। সে ঝিমিয়ে পড়্‌ছিলো; চম্‌কে উঠে' বাস্ ধর্‌বার জন্ম আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হ'তে লাগ্‌লো।

বাড়ি ফিরে' দেখ্‌লো, সুধা লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে' আছে। মোটে তো এগারোটা বাজ্‌লো—এরি মধ্যে ওর ঘুম পেয়ে গেলো! সোমেশ ওর শিয়রের কাছে গিয়ে একবার ডাক্‌লো, 'সুধা।'

'উঁ।'

'হঠাৎ তোমার এতই শীত লাগ্‌লো? প্রফুল্লস্বরে সোমেশ বল্‌লে, 'আজ তো রীতিমত গরম।'

'আমার জ্বর হয়েছে।' কম্পিত, অস্পষ্ট স্বরে সুধা বল্‌লে।

'জ্বর হয়েছে!' সোমেশ চম্‌কে উঠ্‌লো।

'হুঁ।'

সোমেশ ওর কপালে হাত রাখ্‌লো। পুড়ে' যাচ্ছে। 'কখন্ এলো?'

'এই তো—'

'টেম্প্‌রেচার নিয়েছিলে—?'

সুধা একবার শুধু হাত নাড়্‌লে। কথা বল্‌তে তা'র রীতিমত কষ্ট হচ্ছিলো।

'কেমন লাগ্‌ছে?' উদ্বিগ্ন, স্নেহশীল, সোমেশ জিজ্ঞেস কর্‌লে।

উত্তরে, সুধা তা'র একখানা হাত নিয়ে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধর্‌লো। সুধার সমস্ত শরীর ব্যথায় ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছিলো; এত তীব্র ব্যথা যে একটা মোহের মত তা'কে আচ্ছন্ন করে' আছে। নিঃসাড়, নিঃশব্দ, সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে' সোমেশ আস্তে তা'র হাত সরিয়ে নিলে। সুধার স্খলিত মুঠি বিছানার চাদরকে আঁকড়ে ধর্‌লো।

কী মুস্কিল, জামা খুল্‌তে-খুল্‌তে সোমেশ ভাব্‌তে লাগ্‌লো, সুধা জ্বর হ'বার আর সময় পায় নি! সুধার তো কখনো অসুখ-বিসুখ করে না; এতদিন থাক্‌তে আজ কেন কর্‌লো? আজকের মত রাত্রিতে কি সুধার অসুখ করা উচিত ছিলো? সুধা যদি একবার বাইরে যেতো, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌তো। টেবিলের ওপর যথাস্থিত কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে একটু জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বসন্ত তা'র রক্তে, বসন্ত তা'র রক্তে। আজ আর লেখা হ'লো না—ঘুম পেয়ে গেছে। না-ই বা হ'লো; সারাদিনে সে ঢের লিখেছে। সুধা জান্‌তেও পার্‌লো না কী একটা রাত্রি মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত তা'র জানালার বাইরে ঝরে' যাচ্ছে। কি অন্যায়! তা'র একবার ইচ্ছে হ'লো, ওকে ডেকে তোলে। থাক্ গে, বেশ তো ও শান্তিতে ঘুমোচ্ছে—হয়-তো কষ্ট হ'বে। তা ছাড়া, সে নিজেও আর এখন বিছানায় না গিয়ে পার্‌ছে না।

বুদ্ধদেব বসু



শুধু তুমি আর আমি

শ্রীমতী নীলিমা দাস

মনে আছে প্রিয় ? ভোলো নাই আজো সেই
সেদিনের কথা ?—
প্রথম যেদিন লেগেছিল ভালো পল্লীর নীরবতা ?
আর কেহ নয়, দু'জনে একেলা—শুধু তুমি আর আমি,
পল্লী-মায়ের অঞ্চল-ছায়ে ক্ষণিক দাঁড়ানু থামি' !
আঁকা-বাঁকা পথ,—ছায়া মুড়ি দিয়ে সুদূরে হ'য়েছে হারা,
দুই কিনারেতে 'বেতস্-বরুণ' গলাগলি আছে খাড়া ।
মাঁদার গাছের ফাঁক্ দিয়ে যেথা কালো সে ডোবার জল,—
আপনার মনে ঘুরিয়া বেড়ায় ডাহুক-ডাহুকীদল !
হাতে হাত ধরি' চলিনু আমরা যখন পূবের মুখে,
আমর খোঁপার দোপাটি খুলিয়া তুমি তো পরিলে বুকে !

দোয়েলারা দূরে ঝোপে-ঝাড়ে বসি' দিতেছিল শুধু শীষ,
টুন্‌টুনি আর শালিকেরা মিলে' ক'রেছিল ফিস্‌ফিস্ !
হিঙুল শিমুলফুলের সিঁদুর মাঠের কপালে আঁকা,
তারি সে আভায় আকাশ হ'য়েছে রঙের আবীর-মাখা !
তালের গাছের ডগায় ঝুলিয়া বাবুই খেলিছে দোল্,
বাঁশ-ঝাড়ে-ঝাড়ে কাকের পাড়ায় বেঁধেছে হট্টগোল !
একটি পুকুর, টল্‌টলে তার নিতল শীতল জলে
ভরা-দুপুরের বুকে একখানি সুনীল ফটিক ঝলে !
শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িনু যখন পথের ভুঁয়ে,
চূর্ণ অলক সরাইয়া দিলে হাসিয়া কপোল ছুঁয়ে !

মনে আছে প্রিয় ?—বরষার দিনে একটি তরীতে করি'
তুমি আর আমি চলেছিনু ধীরে আঁকা-বাঁকা খাল ধরি' !
দু'ধারে তাহার 'ইকরের' বন, 'নল-ছোবা' বাঁকে বাঁকে,
'নলটুনি' লতা জড়াইয়া আছে ফুলের পসরা কাঁখে !
শুভ্র-পালক মাঠে শত বক সবুজ ধানের ক্ষেতে,
কাশের কানন শাঙন-বাতাসে থাকি' থাকি' ওঠে মেতে !
আকাশের তারা ভেসে বুঝি যায় !—অথবা মোদের ভুল,—
ঝরিয়া পড়িছে টুপ্‌টাপ্ করি' রাঙা হিজলের ফুল !
দাড় ফেলে' তুমি এলে কাছে মোর, ভিজা দু'টি হাত মেলে',
আমার দু'খানি হাত নিয়ে শুধু বসে' র'লে অবহেলে !

জলে জলে সেথা স্নেহমধুরস উজ্জ্বল ঢল ঢল,
স্তন-অমৃত যেন তরঙ্গে উছলিছে কলকল!
হাসি-হাসি-মুখ রাশি-রাশি ফোটে কুমুদ সকল থানে,
মৃদু সুমধুর গন্ধ তাহার স্মৃতি-ব্যথা বয়ে' আনে!
পল্লীর যত শিউলি-শাখার পাতায়-পাতায় মরি,
স্বরগের ফুল—আকাশের তারা পড়িয়াছে ঝরি' ঝরি'!
সমীর লুটিছে সৌরভ তার, সুধা-ভার অলিদলে,—
ঝরা-ফুলদল লুটিছে বালিকা ছুটি' ছুটি' তার তলে!
আজি মনে পড়ে কতরূপে মোর পল্লী-মায়ের স্মৃতি,
ভুলে' গেছ তুমি সকলি কি প্রিয়?—তার সেই স্নেহ-প্রীতি?

শীতের প্রভাতে পল্লীর পথে একদা আসিনু নামি',
কবেকার কথা, মনে আছে প্রিয়?—শুধু তুমি আর আমি!
গেঁয়ো-বালা এক ঠাকুর-পূজার দূর্ব্বা তুলিছে নিজে,
পিছনে তাহার সুনীল শাড়িটি ঘাসের শিশিরে ভিজে!
টুপ্ টুপ্ ক'রে ঝরে' পড়ে পিঠে সজ্‌নে গাছের জল,
দূর্ব্বার গোছা হাতে করি' বালা টানে পিঠে অঞ্চল!
বুড়া-'বরুণের' কোটরে বসিয়া ডাকে 'জোকারিয়া'-পাখী,
গেঁয়ো-পথখানি সচকিয়া ওঠে তারি সুরে থাকি' থাকি'!
আজি মনে পড়ে সে-পথখানির মধুময় স্মৃতি কত,
মনে পড়ে মোর, পড়ে না কি তব?—স্বপন-ছায়ার মত?

গোময়-লিপ্ত চক্‌চকে প্রতি স্নিগ্ধ আঙিনা ভরি',
মেয়েরা সকালে মানকচু-পাতে বানায় ডালের বড়ি।
এক ফালি রোদ উঠানের কোণে যখন ছড়ায়ে পড়ে,
ছেলেমেয়েগুলি দলে দলে এসে কাঁপে ঠক্‌ঠক্ ক'রে!
বনের আকাশ ভরিয়া উঠেছে নতুন আমের বোলে,
হলুদ শরিষাফুলের ভারেতে মাঠের আঁচল দোলে!
তুলসী-তলায় জায়গা লেপিছে রাঙা এক গেঁয়োবালা,
দাড়িমফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া কালো কেশ হ'লো আলা!
উত্তরী-বায়ু হী-হী ক'রে আসে উত্তর-জানালায়,
হরীতকী-পাতা ঝরে' পড়ে আর ঝাউবন শিহরায়!

নব-বসন্তে বনে-বনে জাগে নব কিশলয়রাজি,
সবুজ-হরিৎ-আবীরের রঙে চারিদিক ওঠে সাজি'!
ধরণীরে বসি' সাজায় কে যেন ললাটিকা আঁকি ভালে,—
হোলি-খেলা করে পিচ্‌কারী ছুঁড়ি' কৃষ্ণচূড়ার ডালে!
গাবের শাখায় কচি কচি পাতা তির্ তির্ ক'রে নাচে,
নরম তাদের রাঙা-রাঙা গায়ে জোর-বায় লাগে পাছে!
লতার সূতায় বন-কুসুমের কোটি অপরূপ মালা
গাঁথিয়া যতনে বনে-বনে যত দাঁড়ায়েছে বন-বালা!
আজো কি সেকথা জাগে না তোমার মনের গোপন-গেহে?—
তুমি আর আমি বাঁধা পড়েছিনু পল্লী-মায়ের স্নেহে?

নীলিমা দাস

তাজমহল

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

তাজমহল রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ইহা তাজমহলের ন্যায়ই অপূর্ব্ব। সম্রাট শা-জাহান পার্থিব যাবতীয় বস্তুর নশ্বরতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও কেন যে এই পৃথিবীর বুকে বহুমূল্য এক মর্ম্মর-হর্ম্ম্য উত্তোলন করিলেন তাহারই ইঙ্গিত করিয়া কবি এই কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব মনোবিশ্লেষণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কবি শা-জাহান মূর্ত্তিমতী কবিতা-তাজমহল সৃষ্টি করিলেন তাহার মূলে এমন এক বস্তু বিরাজ করিতেছে যাহার কখনও ধ্বংস নাই। তাই কবির মনে এ-সন্দেহ কখনও জাগে নাই যে, শা-জাহান জাগতিক ব্যাপারের নশ্বরতা-সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রথমেই বলিয়াছেন :—

"এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান
কাল-স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।"

তবে? তবে, বজ্র-সুকঠিন রাজ-শক্তি, হীরামুক্তো-মাণিক্যের ছটা সব লীন হইয়া যাউক, লুপ্ত হইয়া যাউক,

"শুধু থাক—
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ-তাজমহল।"

এ ত গেল তাজমহলের সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা। তাজমহল সৃষ্টও হইল। কিন্তু কেন হইল? এই 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়া কবি মানব হৃদয়ের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, যৌবনের স্বভাবজ আনন্দ-বিলাসের কথা বলিয়াছেন। অতি স্নেহের সহিত লালিত পালিত করিয়া একটি বস্তুকে, বিদায়ের সময় কত সহজভাবে ফেলিয়া যাইতে হয়, কারণ সময় নাই—এ কথা বড় করুণ ভাবেই কবি গাহিয়াছেন।

"দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।"

মানুষের এক জীবনেই বিভিন্ন বস্তুকে বিদায়-দেওয়ার পালা বহুবার আসে। সঙ্গে লইয়া আসে দৈন্য, কাতরতা ও ব্যথা। তাহাও আবার ভুলিয়া যাইতে হয়; কারণ সময় যে নাই। আবার জীবনের নূতনতর বৈচিত্র্য আছে, তার আনন্দ আছে—তার উপভোগ আছে—"আবার শিশির রাত্রে তাই—

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলে নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা সাজি।"

এ-ও আবার ফেলিয়া যাইতে হয়, কারণ "নাই নাই, নাই যে সময়"।

এই অতি সত্য অথচ অতি স্থূল জাগতিক দৃশ্য কবি শা-জাহানের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তবুও তাঁর হৃদয়ের এক অদম্য দুর্ব্বলতা কবির কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—

"তাই তব সঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিলো করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।"

শা-জাহান জানিতেন একদিন সব ফেলিয়া যাইতে হইবেই—সময়কে কোনরূপেই ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। তাই এই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টির দ্বারাই সৌন্দর্য্যের স্মৃতি-রক্ষার অনন্ত চেষ্টা। এইখানে তিনি কালকে ফাঁকি দিতে চাহিয়াছেন। সময় মানুষকে ছলনা করে, উঠিতে বসিতে

পদে পদে ভ্রুকুটি করে, কটাক্ষ করে, ব্যঙ্গ করে—মানুষের জীবনে এমন অনেক করুণ বৈচিত্র্য আনিয়া দেয় যাহাতে নীরবে অশ্রু-মোচন ব্যতীত মানুষের দ্বিতীয় উপায় থাকে না। কিন্তু শুধু তাহা-ই হইলে আর সময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কিছু ছিল না। সময় মানুষকে ছলনা করে—তার দৌরাত্ম্যে মানুষের অধিকক্ষণ নিরুপদ্রবে অশ্রু-ত্যাগ করিবারও উপায় নাই—আবার এক অভিনব বৈচিত্র্য আনিয়া হাজির করিবে—কোন কিছুরই সময় নাই—

"রহে না যে বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশ্রান্ত ক্রন্দনে
চির মৌন-জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।"

তাজমহলের সৌন্দর্য্য একটা দেখিবার মত সামগ্রী। কিন্তু তাহার বাহিরের রূপটাই সব নয়। ইহার চেয়ে মূল্যবান্—মূল্যবান কেন—অমূল্য সম্পদ ঐ দেখিতে-পাওয়ার অন্তরালে বাস করিতেছে—যাহা কবির চক্ষেই সর্ব্বাগ্রে পড়িয়াছে—শা-জাহানের অনন্ত প্রেম। সম্রাট তাঁহার জীবনের নিবেদিত অনিবেদিত সমগ্র প্রেমকে একত্রীভূত করিয়া ঐ পাষাণ স্তূপে মূর্ত্তিদান করিয়াছেন—

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"

সম্রাট-প্রিয়া ঠিক যে কোথায় আছেন তাহা কবি বলিতে পারেন না—তাহা ভাষার অতীত। তবুও, মমতাজ সুন্দর, তার প্রেম সুন্দর—তাই পৃথিবীর যাহা-কিছু সুন্দর সেই খানেই কবি মমতাজের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। আর তাঁর বিদায়ের বেহাগ খুব করুণ সুরেই বাজিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর যাহা-কিছু করুণ তাহার মধ্যেই মমতাজের প্রেম অর্থাৎ মমতাজ বিরাজ করিতেছেন—ইহাই কবির কল্পনা।

"ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যে'থা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।"

সময় সমস্তই ভুলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সম্রাট এইখানে সময়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এ-চেষ্টা অনেকটা সার্থক—

"তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্য হারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

সম্রাট চলিয়া গিয়াছেন—তাঁর রাজ্য গিয়াছে, সিংহাসন গিয়াছে, সৈন্যদল গিয়াছে, বন্দীদের গান আর শ্রুত হয় না, যমুনা-কল্লোল সাথে নহবতের তান আর মিলিত হয় না অর্থাৎ এক কথায়, আর কিছুই নাই - আছে শুধু রাজ্য-ভাঙাগড়া তুচ্ছ করিয়া, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া তুচ্ছ করিয়া চির ক্লান্তি শ্রান্তিহীন তোমার অমলিন দূত দাঁড়াইয়া।—

"যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'"

তাজমহল একটি স্মৃতিমন্দির ছাড়া ত আর কিছুই নয়? প্রিয়তমা পত্নীকে কখনও-না-ভোলাই সম্রাটের এই প্রাসাদ তুলিবার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইহা ব্যতীত ইহার মূলে ত আর কিছুই নাই! তাই শা-জাহানের প্রতিনিধি হইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া।" কিন্তু পরক্ষণেই নিজের উক্তির যাথার্থ্যহীনতা উপলব্ধি করিয়া কবি সুর পাল্টাইলেন—

"মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার?"—ইত্যাদি।

সত্যই ত! প্রিয়তমাকে মনে রাখিবার এই-যে প্রাণপণ অক্লান্ত চেষ্টা—ইহাও ত শেষ হইল! অতীতের কোনও স্মৃতিই ত তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। এই-যে চির-মরণ তাহার কৃষ্ণ-যবনিকার দুর্ভেদ্য আবরণ টানিয়া আনিয়া তোমার দেহ ও মনের উপর বিছাইয়া দিয়া গেল, তাহা কি আর কোন দিন কোন উপলক্ষ্যে খুলিবে? এই-যে মনের অনন্ত ক্রিয়াকে অস্বীকার করিয়া, ভোলা,

না-ভোলা, দেখা, না-দেখা,—সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়া মৃত্যুই সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিল, তোমার প্রিয়ার কথা মনে রাখিবার এতটুকু অবকাশ রাখিল কি? হে সম্রাট, তোমার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হইতে চলিল না? নিশ্চল স্থাবর অট্টালিকাকে পৃথিবী চিরকাল ধরিয়া রাখিলেও রাখিতে পারে কিন্তু জীবনকেও ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই! তবে, তুমি ভোলো নাই—একথা বলিতে পার না, কারণ মানুষের জীবন—

"স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন বিহীন।"

তবুও তোমার উদ্দেশ্য আংশিক সার্থক। তুমি ভুলিয়াছ কালের অনিবার্য্য শাসনে। কিন্তু মানুষ তোমার মমতাজকে কখনও ভুলিবে না।

হে সম্রাট, এ-বিশ্ব তোমাকে মহারাজ্য দিয়াও বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। পৃথিবী কখনও কাহাকেও তাহা পারেও না। আমরা কবির চক্ষে দেখিলাম, তুমি অতি বিরাট,

"তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।"

তারপর, আমরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে যাহা আশা করিতে পারি, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা—

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।"

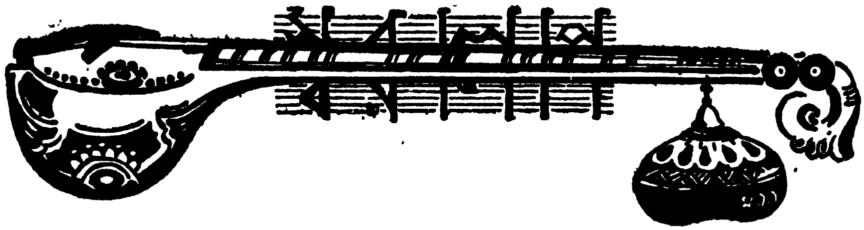
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাজমহল কবিতা রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম এবং এই তাজমহলের মধ্যে আবার এই ছন্দটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ ভাবেন নাই যে, মানুষের কীর্ত্তি হ'তে মানুষ বড়। এত বড় সার্থক কথা আর বলা যায় না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। মানুষের কীর্ত্তির চেয়ে মানুষ বড় বলিয়াই সে তাহার পিছনে একটি কেন—অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে। নির্ম্মিত বস্তু অপেক্ষা নির্ম্মাণ-কর্ত্তার মূল্য অনেক বেশী।

যাহাই হউক, শা-জাহানের জীবনের রথ যে-পথে চলিয়াছে, সে-পথে বাধা নাই, বিধি নাই, নিষেধ নাই—অবারিত অনন্ত গতি—স্মৃতি-মুক্ত, রাত্রির আহ্বানে, নক্ষত্রের গানে প্রভাতের সিংহদ্বার পানে ছুটিয়াছে।

গোপালচন্দ্র দাস





শরৎ—বন্দনা

শ্রাবণের ধারা ঝরিয়া গিয়াছে—
বন্দনা করে শিউলী বন !
নীলাকাশ তলে কী আলো উথলে !
কাশ ফুলে রচে আলিম্পন !
সোনার ধরণী শ্যাম মরকতে
বেদী রচিয়াছে বরিতে শরতে,
আকাশে বাতাসে ঐ ভেসে আসে
আজি শরতের আমন্ত্রণ !

এমনি সে কোন্ শুভ-সুলগন !
বাণীর কমল-কানন হ'তে –
এলে, নেমে এলে শরৎ-চন্দ্র
শারদ-জ্যোস্না অমিয়া-স্রোতে !
সেই হ'তে এই আমাদের দেশে
প্রাতে রবি, রাতে শশী ওঠে হেসে,
মোদের ভারতী, কিরণ-ধারায়
নিয়ত করেন সন্তরণ !

বাঙ্লার নভে শরতের চাঁদ,—
তুলনা তাহার কোথাও নাই !
দীর্ঘ বরষ ব্যাপিয়া, তোমায়
মোরা যেন এই গগনে পাই !
পূর্ণিমা রাতি আসে আর যায়—
এই 'কোজাগর' যেন না পোহায় !
বাঙ্লার ছেলে, বাণীর দুলালে,
এক হয়ে আজ ভুলালে মন !

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত বি এস্ সি, এম-বি

কথা—শ্রীরামেন্দু দত্ত বি-এ

মিশ্রবাহার—দাদ্‌রা

\+ • + • • + •
II ধা না র্সা । র্রা না র্সা I ণা ধণা পা । পা পা মা I মপা ধা পা॰ । মা মজ্ঞা মা I
শ্রা ব্ ণে র ধা রা ঝ রি য়া গি য়া ছে ব • ন্দ না ক রে

ণা ধা না I র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা I র্রা র্রা র্বা I র্রর্মা র্জ্ঞা র্মা I র্রা র্সা র্সা I
শি উ লি ব ন • নী লা কা শ ত লে কী আ লো উ থ লে

\+ • + •
মা ণা ণা । ধা না র্সা I র্সা র্সা র্রা । না র্সা র্সা II
কা শ্ ফু লে র চে আ লি • ম্প ন্ •

\+ • + • + •
II মা মা মা । ণা ণা ধা I না না র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্রা । র্রর্জ্ঞা না র্সা I
সো না র ধ র ণী শ্যা ম ম র ক তে বে দী র চি য়া ছে

\+ • + • + •
না র্সা র্রর্সনর্সা । ণা ণা ধা I র্সা র্গা র্গা । র্গা র্মা র্গা I র্সর্রা র্গর্মা র্রা । র্জ্ঞর্রা নর্সা র্সা I
ব রি তে • শ র তে আ কা শে বা তা সে ঐ • ভে সে আ সে

\+ • + •
সা মা মা । মা ণা ধা I না র্সা র্রা । না র্সা র্সা II
আ জি শ র তে র্ আ ম ন্ ত্র

\+ • + • + •
II সা মা মা । মা মা মা I মা ধা পা । মা জ্ঞা জ্ঞা I মা ধা ধা । ধা ধা ধা I
এ ম নি সে কো ন শু ভ মু ল গ ন বা ণী র ক ম ল
বা ঙ্ লা র ন ভে শ র তে র চাঁ দ তু ল না তা হা র

\+ • + • + •
পধা পধা র্সণা । ধা ধা ধা I ধা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I না না না । ধা পা মা I
কা ন ন হ' তে • এলে • নে মে এ সে শ র ৎ চ •
কো থা ও না ই • দী • র্ঘ ব র ষ ব্যা পি য়া তো মা

সা গা গা । গা গা মা I রগা রগা পা । মা মা মা II
শা র দ্ জ্যোৎ • স্না অ মি য়া স্রো তে •
জো য়া যে ন এ ই গ গ নে পা ই • •

\+ • + • + •
II মা মা মা । ণা ণা ধা I না না র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্রা । র্জ্ঞা না র্সা I

সে ই হ তে এ ই আ মা দে র দে শে প্রা তে র বি রা তে
পূ • র্ণি মা রা তি আ সে আ র যা য় এ ই কো জা গ র

\+ • + • + •
না র্সা র্রর্সর্রর্সা । ণা ণা ধা I র্সা র্গা র্গা I র্গা র্মা র্গা । র্সর্রা র্গর্মা র্রা I র্জ্ঞর্রা নর্সা র্সা I

শ শী ও ঠে হে সে মো দে র ভা র তী কির • ণ ধা রা য়
যে ন না পো হা য় বা ঙ্ লা র ছে লে বা ণী র ছু লা লে

\+ • + •
সা মা মা । মা ণা ধা I না র্সা র্রা । না র্সা র্সা II

নি য় ত ক রে ন্ স • ঞ্চ র ণ
এ ক হ য়ে আ জ ভু লা লে ম ন



বড়বাড়ীর কথা

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার এম্‌-এ

চৈত্রমাসে একদিন ভোর-সকালে চাঁদনগরের লোক ঘুম ভেঙে উঠে অবাক হয়ে দেখে কোথা থেকে তাদের গাঁয়ে একটা অদ্ভুত ধরণের লোক এসেছে! গেরুয়া রঙের কাপড় আর পিরাণ, তার ওপর জড়িয়ে নিয়েছে একটা নীলরঙের ভাঁজ-করা চাদর। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে, ডান বগলের নীচ দিয়ে বাঁধা; গেরুয়া কাপড়ের একটা থলি পিঠের ওপর উঁচু হয়ে আছে—তার ভিতর কি যে আছে আর কি যে নেই তা কেউ জানে না। পায়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নাগরা জুতো—তার এক একখানা যেন এক একটা নৌকা! মাথার চুল ঘাড় অবধি এসে পড়েছে; মুখের দাড়ি দেখে হিন্দু কি মুসলমান চেন্‌বার উপায় নেই। আর তার চোখ দুটো! দুষ্টু ছেলের মত মিট্‌মিট্‌ করছে—যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ভারী একটা মজা হয়েছে—সে কথা ঐ লোকটাই জানে, কিন্তু এখন বল্‌বে না।

উঃ, চাঁদনগরে কদিন ধ'রে কি গুমোট্‌টাই গিয়েছে! একটুও হাওয়া নেই—নিশ্বেস নিতেও লোকের কষ্ট হয়। আজ যেন ঐ লোকটার সঙ্গেই কোথা থেকে এক রাশ হাওয়া এসে গ্রাম জুড়ে মহা হৈ চৈ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে! গাছের পাতা, ঘরের চাল, ধানের ক্ষেত—সব একেবার ওলটপালট্‌ ক'রে দিচ্ছে। কাজকর্ম্মের মহা অসুবিধে। আশু মোক্তার দাওয়ায় ব'সে লেখাপড়ার কাজ করতে পারে না—অর্দ্ধেক কাগজপত্র উড়ে গিয়ে পুকুরে পড়লো! মেয়েরা রোদে চুল মেলে বস্‌তে পায় না—চুলগুলো কেবলি উড়ে এসে মুখের ওপর পড়ে। গতিক দেখে নবীন চাষীর উঠোনে ধান-ঝাড়া' বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা গাল দিতে আরম্ভ করেছে—এমন কি যাঁরা একান্ত নিরীহ লোক তারাও গাল ফুলিয়ে বল্‌ছে—এত কি রে বাপু! হাওয়া নেই তো নেই—আর উঠলো' তো একেবারে—হুঁঃ!

আবার তার সঙ্গে জুটেছে ঐ লোকটা! ওর হাতে আছে ওর নিজের হাতে গড়া একটা অদ্ভুত তারের যন্ত্র—সেটাকে এস্রাজও বলা চলে না, সারেঙ্গীও বলা চলে না; অথচ অনেকটা সেই রকমই বাজে। আশু মোক্তারের রাগ হবারই কথা। একে হাওয়ায় উদ্ব্যস্ত করে মারছে, তার ওপর কোথা থেকে একটা সং এসে হাত পা নেড়ে মহা উৎসাহে গান জুড়ে দিল! দাঁত খিঁচিয়ে গলাটা যথাসম্ভব ঝাঁঝালো ক'রে সে বল্‌লে—কে হে বাপু তুমি? চেহারা, কাপড়চোপড় তো সব বেশ বাগিয়েছে। অথচ ভিক্ষে করারও সাধ আছে দেখ্‌ছি।

লোকটা হা হা ক'রে হাস্‌তে লাগলো—যেন অতিশয় মজা হয়েছে।

আশু মোক্তার বেজায় চ'টে গিয়ে হাঁক দিলে—ওরে, কে আছিস্‌! এই পাগ্‌লাটাকে ঘাড় ধ'রে গাঁয়ের বার ক'রে দিয়ে আয় তো।

লোকটা গলা নীচু ক'রে চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে, আমার নাম জীবনদাস। তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে—ঘরে আম আছে? আমি আবার কাঁচা আম খুব ভালবাসি কি না।

এর উত্তরে আশু মোক্তার কি যে বলতে যাচ্ছিল তা আন্দাজ করাও শক্ত। কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ তার সাত বছরের ছেলে ঝুমকি এসে বল্‌লে—আর একটা গান গাও না গো, মা বল্‌লে।

জীবনদাস ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—সেই কথাই ভাবছিলুম। কিসের গান গাই বল তো?

ঝুমকি চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বল্‌লে—খু—ব ভালো গান। মজার গান।

জীবনদাস হো হো ক'রে হেসেই অস্থির। বলে—কি

মজাই হয়েছে—এবার আমায় মজার গান গাইতে হবে। আচ্ছা, শোন—

আমি মজা পেয়ে গিছি রে ভাই
মজা পেয়ে গিছি
ভাখো গলা ছেড়ে সমানে তাই
চেঁচাই মিছিমিছি!
আমার ঘুম নেই রে চোখে
আমি গেলাম ব'কে ব'কে!
ওরে তাইতো সকল লোকে আমায়
সদাই করে ছি ছি!
আমি সকালবেলা যেই দেখেছি
অরুণ-আলোর ধ্বজা!
ও ভাই অমনি আমার মনে হল
হয়েছে খুব মজা।
ওরে রাখবো কি রে চেপে
এ যে উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে
তাই যাবো এবার ক্ষেপে—এই
মনস্থ করিছি!

ইতিমধ্যে সেখানে গাঁয়ের সব লোক এসে জড় হয়েছে। তারা কেউ পয়সা দিতে চায়; কেউ বলে—পাগল নাকি? জীবনদাস পয়সা নেবে না! ঝুম্‌কিকে বলে—যাও তো ভাই, চট্ ক'রে দুটো আম নিয়ে এসো তো—এর পর আর সময় পাবো না।

সারাদিনটা লোকটার এইভাবে কাট্‌লো। সমস্ত গাঁটায় চক্কর দিয়ে বেড়াতে লাগলো। আর ওর পিছন পিছন চল্‌লো—একপাল ঘর-পালানো ছেলে আর একটা রোগা নড়্‌নড়ে কুকুর। তাকে বুঝি ও কি একটু খেতে দিয়েছিল।

চাঁদনগর গ্রামটি কি সুন্দর! সোনালি খড়ের চালওলা মন-জুড়ানো মাটির-দেয়াল-দেওয়া কুঁড়ে ঘরগুলি আঁকা-বাঁকা ঘাস-গজানো সরু পথগুলোর পাশে পাশে! আর দুপুরবেলা হাওয়ার সঙ্গে ধুলো উড়ছিল! আর এক জায়গায় একটা কাঁটা বন মত ছিল—তার মধ্যে একটা ছাগল ঢুকেছে! ডাঙার ওপর যে ময়লা কালিঝুলি মাখা হাঁস-গুলো চরছিল—তাদের ভয় পাওয়া দেখলে এমন হাসি পায়! এখন হয়েছে কি—না, একটি বউ, দুপুরবেলা কেউ কোথাও নেই ভেবে, মাথার ঘোম্‌টা খুলে এক পাঁজা বাসন নিয়ে ঘাটের দিকে চলেছে। এমন সময়—পথের মোড় ফিরতেই—একেবারে সাম্‌নে আমাদের জীবন দাস! বউটি এতখানি জিভ কেটে যে ক'রে এক হাত্তে ঘোম্‌টাটা মাথায় তুলে দিলে!

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। জীবনদাস গাঁয়ের দুএকজন লোককে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ গো, রাতটা কোথায় থাকি বল তো? কেউ হেসে উঠলো, কেউ বল্‌লে—আমি কি জানি? কেউ বল্‌লে—কেন গাছতলায়। শুধু একটা বোকা চাষী বল্‌লে—তা ভাই, তুমি যদি আমার দাওয়ায় শুয়ে থাক্‌তে পারো তাহলে নয় একটা মাদুর আর একটা বালিশ আমি দিতে পারি।

জীবনদাস তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্‌লে—আরে, কি হয়েছে জান? আমি তো গাছতলাতে, মাঠে ঘাটেই শুয়ে থাকি। কিন্তু আজ বিষ্টি আস্‌বে কি না। তা ভাই, তোমার দাওয়ায় তো আমি শুতে পারবো না। চালটা অতটা ঝুঁকে পড়েছে—ও যে দম আট্‌কে আস্‌বে। খুব বড় ফাঁকা বাড়ী না হলে আমার আবার ঘুম হয় না।

সেই পথ দিয়ে গাঁয়ের সব চেয়ে পাজী দুজন লোক যাচ্ছিল। নিজে নিজে তারা বলাবলি করলে, ওঃ, বেটা নবাব খাঞ্জাখাঁর পুত্তুর এসেছে। বড়, ফাঁকা বাড়ী চাই। আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি।

জীবনদাসকে ডেকে তারা বল্‌লে—ওহে শোনো। বড়-বাড়ী খুঁজছ? তা এক কাজ কর না। ঐ যে পুবদিকে একটা কালো বন মত দেখা যাচ্ছে, ওর ভেতর প্রকাণ্ড একখানা ঘর আছে—এখানকার রাজা অতিথ-সেবার জন্যে ক'রে দিয়েছেন। যাও না সেখানে—

বোকা চাষীটা কি বল্‌তে যাচ্ছিল—দুষ্ট, লোক দুটো তার দিকে এমন কটমট্ ক'রে চাইলে যে সে ভয়ে চুপ ক'রে গেল।

জীবনদাস তো মহা খুসী হয়ে সেইদিকে চল্‌লো। পথে আশু মোক্তারের সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি হে, সারাদিন গাঁয়ের লোককে জ্বালিয়ে এখন চল্‌লে কোথা?

আশু মোক্তার কি যেন ভাবলে। তারপর বল্‌লে—

নাঃ, পাগল হও আর যাই হও, তুমি খারাপ লোক নও। তোমার অনিষ্ট যাতে না হয়, তাই করা উচিত। ওখানে যেও না হে—কেন মিছে প্রাণটা দেবে?

জীবনদাস অবাক হ'য়ে বল্‌লে—কেন, কি হ'য়েছে?

আশু মোক্তার ব'লে যেতে লাগ্‌লো—ওটা ছিল আমাদের রাজা রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ী। রাণীকে নিয়ে প্রতি পূর্ণিমা রাতে তিনি ঐখানে গিয়ে থাকতেন। হঠাৎ একবার কি যে হ'ল—সকালে ওখান থেকে ফিরে এসেই রাণী গেলেন মারা—আর রাজাও সেই থেকে এখনো পর্য্যন্ত একভাবে ভুগছেন! কি অসুখ—তা রাজ্যের কোনো কবিরাজ বল্‌তে পারে না। আর কি যে হয়েছিল তাও জান্‌বার উপায় নেই। রাজা দিনরাত জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে শুধু 'আকাশি' 'আকাশি' ক'রে ডেকে ওঠেন। আকাশি যে কে তাও ছাই বোঝা যায় না। কিছুদিন আগে গাঁয়ে ঐ নামে একটা ভিখিরীর মেয়ে ছিল বটে—কিন্তু তাকেই বা রাজা ডাকতে যাবেন কেন? আর মুস্কিল হচ্ছে এই যে—আকাশি ব'লে সেই মেয়েটাকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে আশু মোক্তার বল্‌লে—সেই থেকে ও বাড়ীটা হানাবাড়ী হয়ে প'ড়ে আছে—কেউ যায় না। বাড়ীর মালীটা সন্ধ্যের আগেই পালিয়ে আসে। সে বলে, একদিন সন্ধ্যের সময় বাড়ীর ভেতর স্পষ্ট কান্নার আওয়াজ শুনে এসেছে! এক সাহসী ছোকরা বাহাদুরি ক'রে গিয়েছিলেন—পরদিন দেখা গেল—মরে পড়ে আছে! অবিশ্যি রাজার বাড়ী—ভয়ে কেউ ভূতের কথা বল্‌তে পারে না। কাজেই প্রচার হয়েছে, ঐ বাড়ীটা বনদেবীরা এসে দখল করেছেন। ব'লে আশু মোক্তার জিভ দিয়ে একটা অবিশ্বাসের আওয়াজ প্রকাশ করলে।

জীবনদাস এতক্ষণ চুপ ক'রে শুন্‌ছিল, হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলো—য়্যাঁ, বল কি? বনদেবী!—ব'লেই গান—

ওরে বনদেবী না রয় যদি
কেমনতর বন
তবে কিসের তরে নিরবধি
ফুলের আয়োজন!
তবে হাল্‌কা খুসীর মজায়
কেন সবুজ তৃণ গজায়,
কেন ঝুম্‌কো-লতার ডগায় লাগে
গুপ্ত শিহরণ!
ওরে ঝাক্‌ড়া বটের তলে তলে
লম্বা শেকড় ঝোলে,
সে ঐ বন্‌-বধূরা দলে দলে
দোলন খাবে ব'লে!
ওরে যদি সুযোগ জুটে
আমি যাব যে এক ছুটে
যেথায় আঁকছে তারা জ্যোছনা-রাতের
ছায়ার আলিম্পন!

গানটা শেষ হতে না হতেই—অত বয়েস হয়েছে লোকটার—সে বাস্তবিক দৌড়লো। ব্যাপার দেখে আমাদের আশু মোক্তার হাস্‌বে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারলে না।

সেই রাত্রে। যে বাড়ীটায় জীবনদাস এসে উঠেছে তার আছে শুধু একখানা ঘর—প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মত; এ কোণ থেকে ও কোণ দেখা যায় না। আর ছাদটা যে কত উঁচু! অনেক চেষ্টা ক'রে তবে বোঝা যায় যে ছাদের কড়ি কাঠের ফাঁকে ফাঁকে অগুণতি পায়রা ব'সে আছে! তারা মাঝে মাঝে নড়ছে—শব্দ করছে—আর কি রকম অদ্ভুত লাগছে! দেয়ালের ওপর কত কি কাজ করা ছিল—সব ময়লায় আর শ্যাওলায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারটে জান্‌লা আছে—বুনোলতার রাশি জড় হয়ে যেন সেগুলোর ওপর সবুজ পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছে! তার মধ্যে দিয়ে আবার সমুদ্রের হাওয়ায় ছিটানো ঢেউএর মত চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তাতে ঘরটা আলো হয় নি মোটেই—ঘরের একাকার অন্ধকারটা ভাগ হয়ে গিয়ে কতকগুলো আলাদা আলাদা অদ্ভুত আকারের মূর্ত্তি নানা ভঙ্গিতে ঘরের চারিধারে ব'সে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ভিতরে ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে যেন কি রকম একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

জানলার ধারে আব্‌ছা চাঁদের আলোয় জীবনদাস এসে

বসেছে। তার নিশ্বেস জোরে জোরে পড়ছে। তার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে যেন কিসের অপেক্ষা করছে—যেন এইবার কিছু একটা হবে!

যেন একটা পাখার আওয়াজ! আরও একটা—আরও একটা!

খুসী হয়ে জীবনদাস বলে—কে, কে?

দেখে- পায়রা!

খানিকক্ষণ সব চুপ।

ওরে, ও কি রে! য়্যাঁ, সত্যি সত্যি! ঐ যে দূরে ঘরের কোণে আলোর মত—ছায়ার মত—ঝলক-লাগা শাড়ীর মত—চমক-দেওয়া পাড়ের মত!

যন্ত্রে একটা ঝঙ্কার দিয়ে জীবনদাস বলে—ভয় নেই, ভয় নেই—আমি।

তবুও কই পালায়নি। পা টিপে টিপে জীবনদাস এগিয়ে গেল।

দেখে, চাঁদের আলো স'রে স'রে দেয়ালের শেওলার ওপর পড়েছে।

জীবনদাস হেসে বলে—আমিও যেমন, আমার অত আগ্রহে দরকার কি? আস্‌তে হয়, তারা নিজের খুসীতে আস্‌বে।

ব'লে ঘরের চারধারে ঘুরতে লাগলো। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি এক ধারের দেয়ালে দেখে, এক বিরাট অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি—একই মূর্ত্তির অর্দ্ধেকটা শিব, অর্দ্ধেকটা দুর্গা! মহারাজ রুদ্রনারায়ণের প্রশংসা করতে হয়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে জীবনদাসের ঘুম পেল। জান্‌লার কাছটিতে গিয়ে সে শুয়ে পড়লো।

তখন প্রায় শেষ রাত। হঠাৎ কি একটা শব্দে জীবনদাসের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে কিছুই বুঝতে পারলে না—কি হচ্ছে। খুব যেন শব্দ—কে যেন কাঁদছে—অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন বিপদ ঘটছে!

আর কিছু না—ঝড় আর জল! কিন্তু, কাঁদছে কে—ঘরের মধ্যেই?

জীবনদাস স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো। পাতালপুরীর মত অন্ধকার ঘর—চল্‌বার উপায় নেই।

সেই অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তিটার দিক থেকেই যেন কান্নাটা আস্‌ছে! সেইদিকে জীবনদাস খুব তীক্ষ্ণভাবে চাইতে লাগলো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ।

চকিতে জীবনদাস দেখে নিলে—একটি মেয়ে, মূর্ত্তিটার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে!

আর ভুল নেই—এ পায়রাও নয়, দেওয়ালের শেওলাও নয়।

সেই অন্ধকারেই জীবনদাস এগিয়ে চল্‌লো। আন্দাজে খুব কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, নিশ্বেস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো—কি হয়।

হঠাৎ শুনলে মেয়েটি কান্নায় ভিজে গলায় বলছে—ওগো ঠাকুর, কি দোষে আমার এই শাস্তি? কেন আমার কেউ নেই? আমার গাঁয়ের একজন লোকও আমায় দেখতে পারে না। সবাই বলে—দূর্ দূর্, দূর্ দূর্! আমি যে একলা!—আমি কি ক'রে বাঁচি ঠাকুর, তুমি আমায় তাই ব'লে দাও—। মেয়েটি কান্নার আবেগে ভুঁয়ে মাথা লোটাতে লাগলো।

কান্নায় ফুলে ফুলে আবার সে বললে—তুমি তো সব পারো ঠাকুর! তবে এতদিনেও কেন আমার ওপর কারুর মমতা হচ্ছে না? এতবড় পৃথিবীতে একজন—শুধু একজন লোকও কি আমায় ভালোবাস্‌বে না?

জীবনদাসের মাথায় এক দুষ্টুমির বুদ্ধি এল। যন্ত্রটাতে আস্তে আস্তে আওয়াজ করলে—টিং। আবার আওয়াজ—ঝিনিনি ঝিনিনি ঝিন্! এবং তারপরেই গান—

পাবি রে পাবি রে পাবি
ভালোবাসা
মিটিবে প্রাণের দাবি—
ভীরু আশা!
কাতরে কেন রে কাঁদো
অভিমানী
গোপনে আশাতে বাঁধো
হিয়াখানি!
বারতা গিয়েছে র'টে
দিক্ ছাবি'

উদয়ের ঢেউ ওঠে—
পাবি, পাবি!
আমার লগন লাগে
মোহ ধারা;
প্রেমের দেবতা জাগে—
শুক তারা!

মেয়েটি ভয় পেয়ে ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি?

জীবনদাস বল্লে—আমি ভবঘুরে!

—যেই হও—আমার দুঃখু নিয়ে ঠাট্টা করবে কেন?

—ঠাট্টা? যদি ক'রেই থাকি, তোমায় করিনি তোমার দুঃখুকে করেছি—কারণ সে দূর হয়েছে।

—কি যে বলে! আমার দুঃখু অত সহজ দুঃখু নয়। তুমি তার কি বুঝবে—তুমি তো শুধু বানিয়ে বানিয়ে কথা বল।

জীবনদাসের মহা উৎসাহ—বলিই তো। তুমি যে-কোনো কথা বল্বে তাই থেকে এক্ষুণি আমি গান বানিয়ে দেবো।

—না না, আর গান বানিয়ে দরকার নেই। আমি নিজের দুঃখে নিজে মরি। আর অত মিথ্যে কথা বল্বারই বা দরকার কি?

—মিথ্যে আবার কি বললুম?

—ওই যে, 'পাবি রে পাবি' 'মিটিবে'—না কি সব বল্লে।

—ওঃ, আসল কথাটাই বলা হয়নি। জান না—ওসব হচ্ছে দেবতার কথা। সত্যি না হয়ে পারে!

—সত্যি? তাহলে কখন হবে?

—কখন কি আবার; হয়ে গিয়েছে। আমার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছো না! আমি যে তোমায় ভালবাসি।

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ! তারপর—যাঃ, তা কি ক'রে হবে, আমায় তুমি দেখোনি পর্য্যন্ত।

জীবনদাস হেসেই আকুল—আরে, তুমিই কি ছাই আমায় দেখেছ? অথচ, তুমিই কি ভাব্ছ যে তুমি আমায় কিছু কম ভালোবাসো? তোমার গলার স্বরেই ধরা প'ড়ে গিয়েছ কি না!

অন্ধকারে দুজনে কাছাকাছি এল।

জীবনদাস বল্লে—আমি জীবনদাস। আমার একমুখ দাড়ি, একমাথা চুল! একটা খাসা নীলরঙের চাদর আছে—এই যে, এইখানে হাতটা দাও—বুঝতে পারবে। আবার দেখেছ, একটা ঝুলি—হাঃ হাঃ হাঃ। আর যন্তরটা তো আগেই ধরা প'ড়ে গেছে। তোমার তো দেখছি উস্কো-খুস্কো রুক্ষু চুল—কি রং?

—আমার মা বল্তেন, সোনালি।

—বাঃ বাঃ, বেশ! খুব বড় বড় চোখ যে—একথা এতক্ষণ বলনি? আঁচলটা ছেঁড়া না? বাঃ বাঃ! জান, আমারও কাপড়ে একটা ছেঁড়া আছে—লুকিয়ে রাখি! বাঁচা গেল—তুমিও তাহলে বেশ গরীব। নাম কি তোমার?

—আকাশি।

—ভিখিরীর মেয়ে আকাশি? কি আশ্চর্য্য! রাজার সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল বল তো?

আকাশি একে একে সব ব'লে যেতে লাগ্লো। তার জীবনের ইতিহাস! সকলের অপ্রিয় সে, গ্রামের অন্য ভিখিরীগুলো পর্য্যন্ত তাকে দেখ্তে পারতো না। একদিন বিনা কারণে তারা তাকে গ্রাম থেকে দূর ক'রে দিলে। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সে এই বনে এল। প্রথমে ভেবেছিল মৃত্যু হলেই তার সকল জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল রাজার বাগানবাড়ীতে এক বহু পুরাতন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আছেন।—ভারী জাগ্রত দেবতা—তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে কেউ কখনো বিফল হয়নি। সে এই বাড়ীটার কাছে ছুটে এসে দেখে দোর বন্ধ। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। রাজা আর রাণী এই ঘরের মধ্যেই ছিলেন। রাজা দোর খুলতে সে শুধু একটিবার ঠাকুরের কাছে যেতে চাইলে কিন্তু রাজা ভয়ানক ধমক দিয়ে তাকে চ'লে যেতে বল্লেন! রাণীমার পা জড়িয়ে ধরলে—তিনি তাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলেন।—বল্তে বল্তে আকাশির চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু যখন সে শুনলে, রাণীমা মারা গিয়েছেন আর রাজা অসুখে মরণাপন্ন—জীবনদাসকে টেনে নিয়ে এসে সে ঐ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির

পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। জোড় হাতে বল্‌লে—আমি তো রাগ করিনি। তবে কেন ওদের এ শাস্তি দিলে ঠাকুর? তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, রাজাকে বাঁচিয়ে দাও···

ঝড়জল থেমে গিয়ে আকাশে যে শুকতারা ফুটে উঠেছিল সেটা ক্রমে সকালের আলোয় মিশে গেল। গ্রাম ভেঙ্গে লোক এসেছে—জীবনদাসের কি হয়েছে দেখবার জন্যে। সবাই অবাক হয়ে দেখলে—ঘর থেকে সুস্থ শরীরে হাসি মুখে জীবনদাস বেরিয়ে এল। একসঙ্গে হাজার লোক জিজ্ঞাসা করলে—কি হে, রাত্তিরে কিছু দেখো নি?

জীবনদাস একগাল হেসে বল্‌লে—দেখেছি, বনদেবী। ভাই সব, শিগগীর কিছু ফুল জোগাড় ক'রে ফেলো দেখি। বড় মজাই হয়েছে! বনদেবীর সঙ্গে আমার বিয়ে কি না!

সুনীলচন্দ্র সরকার

এই পথে

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এই পথে বার বার,—
আসি যাই কেন বলিতেছি ভাই, সব ইতিহাস তা'র।
বলিতেছি সব চুপি চুপি তোমা,'—শুধায়োনা আর কা'রে,
এ কাহিনী যেন তুমি ছাড়া কেহ দ্বিতীয় জানিতে না'রে!

শোন' তবে বলি: সে এক মানুষ বক্ষে বিরাট ক্ষুধা,
মানুষের কাছে ভিখ্ মাগিয়াছে প্রাণ ধারণের সুধা।
আমি সে ভিখিরী মানুষ-পথিক পৃথিবী পথের শেষে,
ক্ষ্যাপা বাউলের মত ঘুরিতেছি তোমারই উদ্দেশে।
তোমারই উদ্দেশে,—
প্রাণ-সিন্ধুর কিনারে কিনারে চলিতেছি আজো ভেসে।
দু'টো কথা আরো বলি,—

সঁপেছি তোমারে প্রাণ-পুষ্পের গন্ধের অঞ্জলি।
ঘরে ও বাহিরে তিষ্ঠিতে না'রি কোথাও কোনও মতে,
ঘরের উদাসী ঘর ছেড়ে তাই চলি তোমাদের পথে।
সন্ধ্যা সকাল বন্ধু তোমার কল্পনা ক'রে কাটে,
—কল্পনা সে তো ফেনার ফানুস বস্তু-বায়ুতে ফাটে!
শয়নে স্মরণ ক'রে ক'রে তোমা স্বপ্নে হয় তো পাই,
স্বপ্ন যে তাহা,-ভোর হ'য়ে গেলে পুন কেঁদে মরি ভাই।
কেঁদে কেঁদে মরি ভাই,—
তোমাদের পথে যাতায়াতে যদি আবার তোমারে পাই!

শরতে প্রবাস ব্যথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব

মাগো আমার, মাগো আমার,
কোন দেশে, মা, কোন দেশে,—
তোমার বুকে জনম লভি',——
আজ্‌কে মোরা কোন দেশে,—
শ্যামল বরণ অঙ্গ তোমার ছিল যে মা সোনায় মোড়া,
অন্নাভাবে ছেলেরা তোর আজ কে মা তোর চরণ ছাড়া,—
ভিক্ষাঝুলি, স্কন্ধে তুলি, মরছে ঘুরে দূর প্রবাসে,
দুঃখে সুখে তাদের, মাগো, চিত্তে তোমার আনন ভাসে।

২

দিনের শেষে, এই প্রবাসে, নদীর কূলে দাঁড়িয়ে থাকি,
সাঝেঁর হাওয়া, শীতল পরশ অঙ্গ'পরে যায় মা রাখি,
শুধাই তারে, ওরে হাওয়া,
শুধুই কি তোর আসা যাওয়া,
কালকে যখন আস্‌বি, মায়ের
চরণ ধূলা আসিস মাখি—

৩

নদীর বুকে ছোট বড়ো কতোই জলযানের মেলা,
সব মুছে যায়, থাকে শুধু ছল-ছল জলের খেলা,
সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে হাতে লয়ে তারার ডালা,
স্বপ্নে ভাসে নীল আকাশ আর নীল সায়রের উর্ম্মিমালা,—
ওমা, ওমা, এই জলইতো ছুয়েঁছে তোর চরণতলা!

*　　　*　　　*　　　*

ধ্যান ভেঙ্গে যায়, কানে আসে শহর পথের পথিকচলা।

৪

শরৎ আসে বারে বারে অমল তোমার আকাশ ভরে
পরের মুনের গোলাম মোরা, দেখবো তোমায় কেমন করে,
শিউলি ফুল আর রক্তজবা—সেতো, মা, আজ স্বপন গাথা,
আঙ্গিনায় আর ফোটে না, মা, অতসী আর অপরাজিতা।
তারার কুচি দিয়ে গড়া ছায়া পথের অপর পারে,
সজল তোমার নয়ন মাগো শিশিরভরা অশ্রুভারে,
সেই নয়নের লবণধারায় সাগর বারি উঠ্‌ছে ফুলে,
মোদের বুকের ব্যথার শ্বাসে সাগর বারি উঠ্‌ছে দুলে,—
কবে আবার বাজ্‌বে মাগো শঙ্খ তোমার মিলন সুরে—
নির্ব্বাসনের ক'দিন বাকী, জীবনের এই মরণপুরে।

"অপরাজিত"

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

'পথের পাঁচালী' বার হবার পর বিভূতিবাবুর যা খ্যাতি লাভ হয়েছে, তা অভাবনীয়। এর থেকে মনে হয় বাঙলা দেশের পাঠক সমাজের সাহিত্য বোধ আছে এবং সত্যকার সাহিত্য ও সাহিত্যিকের আদর আমাদের দেশ জানে।

'অপরাজিত' বইটিতেও বিভূতি বাবুর সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে, এ কথা বল্‌তে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।

বইখানি নিয়ে বন্ধু সমাজে একটু আধটু সমালোচনা আমার যা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে, অপরাজিত সম্বন্ধে কারো কারো মনে কিছু কিছু আপত্তি উঠেছে। এর থেকে মনে হয়, যারা এই বইখানা পড়েছেন, তারা পড়েই যান্‌নি, সমালোচনার মানদণ্ড দিয়ে বইখানার মূল্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন।

এইটাই হওয়া দরকার। সাহিত্যালোচনায় নিছক অর্থহীন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অথবা ঈর্ষাপ্রসূত নিন্দার কোনো মূল্য নেই। তেমনি অর্থহীন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' দুয়েরই হয়েছে। তেমন প্রশংসার কোনো মূল্য নেই। ঠিক, তেমনি তাঁর বইয়ের অর্থহীন ঈর্ষাপ্রসূত নিন্দাও হয়েছে—তারও এতটুকু মূল্য নেই।

ক

(১) 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত' নিয়ে আপত্তি যে সব উঠেছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, অপুর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, সে অপরাজিত নয়, অপরিণত—তার চরিত্র পরিণতি লাভ করে নি, তার চরিত্র-চিত্রণের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব আদর্শ বিভ্রাট ইত্যাদি নেই, এবং বাইরেও তার যে দ্বন্দ্ব তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই।

এ আপত্তি আমার মনেও এক সময়ে জেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, এর মূলে প্রমাণ খুব বেশি নেই। অপুর জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব কি? সেই নিশ্চিন্দিপুরের জীবন থেকে আরম্ভ করে তার জীবন কত বিচিত্র অবস্থা, বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে তো ক্রমে উত্তীর্ণ হলো—একটি অবস্থার সঙ্গে, একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একটি অবস্থা আর একটি অভিজ্ঞতার মিল কোথায়? আমরা যে যুগে বাস করি, জানি এ যুগে প্রশ্ন উঠবে—পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর অপুর বয়স হলো, অপুর sex-life এর কোনো পরিচয় আমরা পেলাম না! এ প্রশ্ন করা অন্যায়—অপু লাজুক, মুখচোরা, বড় হয়েও এ দোষ তার যায়নি—তার প্রকৃতিই romantic, আদর্শপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী। তার natureকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারিনে, তা নিয়ে ঝগড়া করতে পারিনে—এটাকে আগে স্বীকার ক'রে নিতে হবে, কারণ এটা আমাদের data, premise—তার প্রকৃতি অন্যভাবে গড়ে' উঠলো না কেন, অন্য রকম হলো না কেন, এ তর্ক মিথ্যা—সাহিত্য বিচারের তর্ক এ নয়। তাছাড়া অপু যে আবেষ্টনের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছে, যে আবেষ্টনে বড় হয়েছে, সে আবেষ্টন একটা সদা-জাগ্রত conscious sex-life বর্দ্ধিত করার পক্ষে অনুকূল নয়! গ্রন্থকার অন্য রকম আবেষ্টনের সৃষ্টি করে' অপুকে অন্য রকম করে' গড়ে' তুল্‌লেন না কেন—এ প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না।—এইমাত্র আমি বল্‌লুম, গ্রন্থকারের dataকে premiseকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। তিনি যে data আমাদের দিয়েছেন, যে আবেষ্টন ও অবস্থা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে অপুর জীবন যেভাবে পরিণতি লাভ করেছে সেটা logical কিনা, সঙ্গত কিনা এটাই বিচার্য্য। তারপর, অপুর sex life এর পরিচয় আমরা যে কিছু পাইনি, তার কারণও আছে। ছেলে-বেলায় এবং পরে বড় হয়ে অপুর সঙ্গে যে সব মেয়েদের পরিচয় হয়েছে তারা

সকলেই একটি বিশেষ ধরণের মেয়ে। বিভূতিবাবুর কথাতেই বলি—

"অপু এই মঙ্গলারূপিনী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী প্রেমময়ী করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দুদিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখদুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্ম্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী বধূ—সবই তাই। তাই যদি হয়, অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া-বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশি মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতাকে আবিষ্কার করিবার সখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।"
— অপরাজিত, ৬০২ পৃষ্ঠা।

সুতরাং, যা সে পায়নি, তার জন্যে আমরা, গ্রন্থকারের সৃষ্টিকে দোষী করতে পারিনে—যা সে পেয়েছে তার মধ্যে sex life পরিণতি লাভ করা সম্ভব কিনা, এটাই দেখবার কথা।

(২) অপুর চরিত্র পরিণতি লাভ করেনি, এ আপত্তিও করা চলে না। 'পথের পাঁচালীর' অপু শিশু—তারপর 'অপরাজিতর' অপু ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে। কিন্তু যৌবনোন্মেষের মধ্যে যে-অপুর পরিচয় সে-অপুর মধ্যে একটা শিশু মন বরাবরই রয়েছে—এটাও অপুর প্রকৃতিগত। এদিক দিয়ে অবশ্য বলা যায় অপুর চরিত্র পরিণতি লাভ করেনি, অপু অপরিণত—কিন্তু এই বিচার নিতান্তই বাইরের বিচার ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা। যে মনকে বল্লুম্ শিশুমন, সেটাকে শিশু মনের চেয়েও বলা উচিত বোধ হয় চিরন্তন মন, যে মন প্রকৃতির প্রত্যেক ভাষা ও ইঙ্গিতে সাড়া দেয়, কি শৈশবে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে—যে মন আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হয়, যে মন কল্পনায় নৃত্য করে—সেই primitive unsophisticated mind। অপুর এই যে শিশুচৈতন্য এ তো কোনো বয়সের মধ্যে আবদ্ধ নয়—সে নিত্যকালের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করেছে। পঁয়ত্রিশ বছরের অপু সে নিজেই বলে—

"অন্য কিছুই চাইনে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায় অবোধ, উদগ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি——তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?"—অপরাজিত, ৬১২ পৃষ্ঠা।

এদিক দিয়ে অপু সত্যই শিশু। কিন্তু তা বলে' একথা বলা চল্‌বে না যে অপুর চরিত্র পরিণতি লাভ করেনি; অপু অপরিণত। জীবন সম্বন্ধে অপুর যা philosophy, যা idealism সেটাকে যদি আমরা স্বীকার করি, তা হলে একথা আমরা বল্‌তে পারিনে। অপু বলে—

"আজ একথা বুঝি ভাই, যে সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স--বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না—ভাবতুম লাফালাফি করে' বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হ'য়ে গেল—তা নয় দেখলুম ভাই।"—অপরাজিত, ৫৯৭ পৃষ্ঠা।

অপু অপরিণত হবে কেন?—যদি তাই হবে তাহলে তো সে বরাবর নিশ্চিন্দিপুরে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করে' তার সেই রাণুদি, লীলাদির মতন অপরিণত মন নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। নিশ্চিন্দিপুর আর মনসাপোতার অপু তো এক নয়--মনসাপোতার সেই পুরুতগিরি তার মনকে তো বাঁধতে পারেনি। ছুটে এলো স্কুলে পড়তে, সেখান থেকে কলকাতায় কলেজে—মন ক্রমে বড় হচ্ছে, তার স্বপ্নের পরিধি ক্রমে বাড়ছে, এখন সে সমস্ত পৃথিবীকে তার কল্পনার মধ্যে বেঁধেছে। এ কি অপরিণত মন? মন তার পরিণতি লাভ করেছে বলেই, সেই শিশু অপু আর নেই বলেই তো ৩৫ বছর বয়সে অপু যখন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এলো তখন—

"সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে, সে অপূর্ব্ব আনন্দ আর পাইবে না। এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের

সহিত আর অপুর কোনো দিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথায়ও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমিজমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাহাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।···কোনো দিক হইতেই অপুর আর কোনো যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই।” —অপরাজিত, ৫৯০ পৃষ্ঠা।

অপরিণত যার মন, সে এত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না, এত বড় আদর্শের পিছনে পাগল হয়ে ছুটতে পারে না; সে জীবনকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে তারই আনন্দে নিজকে মজিয়ে রাখে। কিন্তু যে অজানা অচেনা রহস্যের পিছনে নিশ্চিততর বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যায়-তার মনকে অপরিণত বল্‌বো কি করে?

“আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্র পারে যায়,—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ দুঃখ দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ দুঃখ দিয়া সে বাহিরকে অর্জ্জন করিয়াছে।” —অপরাজিত, ৫৯১ পৃষ্ঠা।

তুচ্ছ জিনিসকে আঁকড়ে ধরে' সে থাকে না, কোনো কিছুতেই পরাজয় মানে না—এই অপু কি অপরিণত? একটা আদর্শপ্রবণতা, একটা নিত্যকাতর অথচ স্পর্শকাতর শিশু মন, একটা সহজ, সরল স্বচ্ছন্দ মন ও বিশ্বাস তার আছে বলেই, আমরা যখন বলি সে অপরিণত, তখন আমরা কেবল আমাদেরই জীবনের পরিপ্রেক্ষণার পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিই; পরিণত জীবন সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান যুগের ধারণা দিয়েই অপুর বিচার করি। কিন্তু তা কি ঠিক? অপুরই জীবনকে দেখার ভঙ্গি দিয়ে অপুর বিচার করতে হবে। অপুর নিজস্ব যে প্রকৃতি, তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—সেদিক দিয়ে সে পরিণতি লাভ করেছে কিনা সেটাই বিচার্য্য। আমার তো মনে হয় সেদিক দিয়ে অপুর চরিত্র যথাসম্ভব পরিণতি লাভ করেছে। তার মন, তার দৃষ্টি কোথাও নিশ্চল হয়ে নেই—তার পরিধি দিনের পর দিন বড় হয়ে হয়ে আজ সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করেছে। তবে এই যে পরিণতি, এটা একেবারেই চমক-লাগানো নয়—কোথাও তার প্রকাশ খুব নিবিড় হ'য়ে, চমক লাগিয়ে পাঠকের চিত্তকে অধিকার করে না, খুব gripping interest তার মধ্যে নেই। তার একটা কারণ অপুর আদর্শবিহারী অসীম শিশু মন, তার romantic idealism—যার মধ্যে স্বভাবতঃই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অপুর চরিত্র অপরিণত। এ দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি নয়, এ অভিযোগ মিথ্যা তবে অপুর চরিত্রের পরিণতি, একটু একঘেয়ে, একথা আমার মনে হয়েছে।

(৩) আর এক আপত্তি এই যে অপুর চরিত্র চিত্রণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, আদর্শ বিভ্রাট নেই, এবং বাইরেও যা দ্বন্দ্ব তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই—সেই জন্যে তার চরিত্রে বৈচিত্র্য নেই।

এ অভিযোগ সত্য বলে আমার মনে হয় না।

অপুর জীবনের যা idealism তা নিয়ে দ্বন্দ্ব, আদর্শ বিভ্রাট তার জীবনে অনেকবারই ঘটেছে দ্বন্দ্ব শুধু তার দারিদ্র্যের সঙ্গেই নয়, সে অভিজ্ঞতাই তার একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। সেই যে অপর্ণার মৃত্যুর পর কোথায় এক গ্রামে নিতান্ত ইতর এক সমাজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল স্কুল মাষ্টার হয়ে—সেখানে তার আত্মার, তার আদর্শের চরম মৃত্যু ও অপমান যা হয়েছিল—কি যে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আদর্শের সঙ্গে বিরোধ, সেখান থেকে তো নিজেই নিজকে সে উদ্ধার করলো। তারপর সেই যে একবার কোথায় ষ্ট্রাইকের সময় চাকরী নিয়েছিল নিতান্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে'—তারপর যখন মনে হলো সে একজনের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে তার মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে আদর্শের সঙ্গে বিরোধ জেগেছিল বই কি! এ রকম টুক্‌রো টাক্‌রা ঘটনার তো অভাবই নেই। আর অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাই যদি বল্‌তে হয়, তাহলে সব চেয়ে যা বড় দুঃখ, বড় দ্বন্দ্ব, বড় অভাব—সেই যে অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতা—বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আপনার বল্‌তে কেউ নেই, তার আদর্শের সমর্থক নেই, সহায়ক নেই—এই যে

ভীষণ একাকীত্ব-বোধ, এর দুঃখকষ্ট যে দারিদ্র্যের চেয়েও ভীষণ, এবং এই অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতার দুঃখ তাকে যে কি রকম পীড়ন করেছে, এবং তার অভিজ্ঞতা অপুর যে কি নিদারুণ তা যদি কারুর উপলব্ধিকে, সহানুভূতিকে স্পর্শ করে' না থাকে, তবে তার সাহিত্যালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এর চেয়ে নিষ্করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কি আছে?

খ

যে দু একটা আপত্তি উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত জবাব আমি দিতে চেষ্টা করলুম। এইবার আমি আমার নিজের দুএকটা আপত্তির কথা বল্‌বো—অতি সংক্ষেপে।

(১) প্রথমতঃ, যে দুতিনবার আমি 'পথের পাচালী' ও 'অপরাজিত' পড়েছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, দুটি বইতেই প্রাকৃতিক বর্ণনার পুনরুক্তি একটু আধটু আছে। যেখানেই গ্রামের বর্ণনা আছে—সেখানেই বর্ণনার ভাষা ও imagery প্রায় সর্ব্বত্রই কতকটা একই প্রকার। খানিকটা পুনরুক্তি হয়ত অবশ্যম্ভাবী কারণ, একই গ্রামের নানা অবস্থার বর্ণনা নানা সময় করতে হয়েছে। কিন্তু, তবু মনে হয়, কতকটা ব্যতিক্রম হয়ত করা যেতো। তাছাড়া, সেই দূর অজানা রহস্যময় ভবিষ্যতের কথাও বিভূতিবাবু যেখানে যেখানে তাঁর অপূর্ব্ব মোহময় সৌন্দর্য্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন, সেখানেও imagery ও কল্পনার বর্ণনা কতকটা এক প্রকারের। এই দুটি বইতেই প্রাকৃতিক বর্ণনা যত জায়গায় আছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য কম—প্রায় দুটো categoryতে সব বর্ণনাগুলো ভাগ করা যায়—এক গ্রামের বর্ণনা, আর সেই বনজঙ্গলের বর্ণনা, যদিও সেই অমরকণ্টকের বনের সেই যে বর্ণনা তা classical, তার আর কোনো তুলনা নেই—কোনো সাহিত্যে নেই।

(২) আমার দ্বিতীয় আপত্তি—পথের পাঁচালী ও অপরাজিত দুই বইতেই অপুর জন্যে অন্য সব চরিত্রগুলির প্রতি কতকটা অবহেলা করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের অবতারণা বিভূতিবাবু করেছেন কিন্তু তাদের অত্যন্ত নির্ম্মম-ভাবে একে একে গল্পের মালাটি থেকে বিচ্যুত করেছেন—তারা সুন্দর সুস্পষ্ট হয়ে ফোটবার আগেই। এর জবাব দেওয়া যেতে পারে যে অপুকে প্রকাশ করবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তাদের ছিল, সেটুকু শেষ হবার পর তাদের বর্জ্জন না করে' আর উপায় কি? এমন যে ইন্দ্রনাথ, সে চরিত্রকেও তো শরৎচন্দ্র sacrifice করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, আমার মনে হয়, সবগুলো গৌণ চরিত্রকে অবহেলা করাতে অপুর চরিত্রের interest কতকটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে—অপুর পাশে পাশে আরো দুতিনটে চরিত্রকে বাড়তে দিয়ে তাদের সঙ্গে অপুকে জড়িত করে' দিলে অপুর চরিত্রের interest আরো নিবিড় হতে পারতো।

ঠিক এই কারণেই আমার মনে হয়, লীলা-অধ্যায়টার সম্ভাব্যতার মধ্যে আরো একটু তলিয়ে যেতে পারলে গল্পের interest আরো বাড়তে পারতো। অপুর জন্যেই এটা করা দরকার ছিল। অপুর নিজের কথা থেকেই মনে হয়, লীলা তার জীবনে খুব একটা বড় স্থান অধিকার করেছে—কিন্তু তা অনেকটা হয়েছে আখ্যান ভাগ যতটুকু আমরা পেলাম তার আড়ালে। দুটি মাত্র দৃশ্যে লীলাকে যা দেখলাম তাতে সমস্ত অধ্যায়টা উদ্‌ঘাটিত হলো না বলে' একটু আক্ষেপ থেকে যায়।

(৩) আমার তৃতীয় আপত্তি—পথের পাঁচালী ও অপরাজিতে এতগুলো মৃত্যু সম্বন্ধে। একটি জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এতগুলো আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু হয় না একথা আমি বলি না। আমার মাঝে মাঝে এই সন্দেহটা মনে জাগে; এই যে এতগুলো মৃত্যু হলো অপুর জীবনে, এটা বিভূতিবাবুর bid-out plot—একটা কৌশল। একথা মনে হয়, এদের মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের, idealism-এর জয় হতো না; এক একটা জীবন যেন তার আদর্শের পথে বাধা, এক একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হলো, সুগম হলো। গ্রন্থকার যেন ইচ্ছে করেই এক একটি করে' সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে' দিলেন, নইলে অপু অপরাজিত হতে পারে না! সর্ব্বজয়া তাকে পিছনে টানে—সর্ব্বজয়ার মৃত্যু হলো; অপর্ণা জীবিত থাকলে তার সেই চঞ্চল বিশ্ববিহারী মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—অপর্ণাও মারা গেল। লীলার সঙ্গে তার জীবন একটা নূতন ও সুনিবিড়

আকর্ষণে ক্রমে জড়িত হচ্ছিল—সেই লীলাও বেঁচে রইলো না। এ প্রশ্ন মনে জাগে, অপর্ণাকে, লীলাকে বাঁচিয়ে রেখে, লীলার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে এতটা নিরাসক্ত না করে, সে সম্বন্ধের সম্ভাবনাটাকে আরো এগুতে দিয়ে অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না ?

গ

আমার আপত্তি যা দু'একটা এরই সম্বন্ধে আছে, তা বললুম। কিন্তু যে জন্যে আমি পথের পাঁচালী ও অপরাজিতকে বিভূতিবাবুর একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলে মনে করি, সে কথাটা বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করবো।

'পথের পাচালী' ও 'অপরাজিত' সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—এই বই দুখানির মধ্যে পাই আমরা একটা sense of space, একটা উদার উন্মুক্ত বিশালতার আভাস। কি দেশের, কি বিদেশের—আজকাল এই যুগের গল্প উপন্যাসগুলি যখন পড়ি, তার চতুরতায়, লিপিকৌশলে, মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণে আমরা মুগ্ধ হই—কিন্তু যতক্ষণ এসব বই পড়ি, সর্ব্বক্ষণই যেন মনে হয় চাপা বদ্ধ গলি, lanes and alleys এর মধ্যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, কেবল যেন হাঁফাচ্ছি, কোনো দিক থেকে কোনো হাওয়া পাওয়া যায় না, মুক্তির আলো কোনো দিক দিয়েই যেন দেখা যায় না, দু'দিকে উঁচু বাড়ীর দেয়ালে চাপা সেই গলির মধ্যে স্বস্তি ও মুক্তির নিশ্বাস যেন নেওয়া যায় না। বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালী ও অপরাজিত যখন পড়লুম, মনে হলো গলিখন্দ পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এলুম—চারিদিক থেকে মুক্ত স্বচ্ছন্দ বাতাস গায়ে এসে লাগলো। আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়ে সমস্ত দেহে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এলো —মনে হলো যেন এইবার হাত পা ছড়ানো যায়। উপন্যাসের ভাবের আদর্শের ও আখ্যানের মধ্যে যে এই বিশালতা, এই বিরাটত্বের আভাস, এই creative freedom, এটা বিভূতিবাবুর একটা খুব বড় সৃষ্টি। অন্য সাহিত্যের জ্ঞান আমার খুব বেশি নেই—কিন্তু বাঙলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের যতটুকু পরিচয় আমার আছে কোথাও এই রকম 'অপরিমাণ প্রেমের' বিরাট উপলব্ধি আমি পাইনি। বৃহতের জন্যে, বিরাটের জন্যে, উদার স্বচ্ছন্দ মুক্তির জন্যে, মানুষের মনের চিরন্তন আকুতি, এই আকুতির ও পিপাসার অনেকখানি শান্তি বিভূতিবাবুর উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। মানব চরিত্রের বিচিত্র জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়ত এতে নেই, হয়ত বিভূতিবাবু তার চেষ্টাও করেন নি—তিনি মানুষকে বুঝেছেন ও জেনেছেন, যেখানে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ, যেখানে সে একটা সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে নিজকে মুক্ত করে' দিয়েছে, যেখানে সে অসীম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সীমাহীন প্রকৃতির সে আত্মীয়, এবং আদিঅন্তহীন শাশ্বত কালের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে' অনুভব করেছে। এই উপলব্ধির কোনো সীমা নেই—নিশ্চিন্দিপুরের সীমার মধ্যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের বনের মধ্যে তা আবদ্ধ হয়ে নেই। অপু তো আমাদের এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিন্দা করেছে—আমরা বৃহত্তর জীবন সৃষ্টির আর্ট জানিনে—সত্যিই জানিনে। সে তো মনে করে—

"ছ'হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ইজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্র ঘরের মা বোন্ বাপ ভাই বন্ধু বান্ধবের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটিয়া গিয়াছে··· আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্কওক, বার্চ ও বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সাথীদের দলে···হাজার বছর পরে আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে...তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা ?···কিংবা কে জানে আর হয়ত এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারাটি ওদের জগতে অজানা জীবনধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম !—কতবার যেন সে আসিয়াছে···জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া বহু বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত—সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল··· কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার

সে কি অপরূপ অভিযান…শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।…এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনা-বিলাস, এ যে হয় না তা কে জানে? বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্ত্তিত হয় কে জানে?…হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যারা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে দুঃখে উত্থান পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্ত্তনের জীব তাঁর অচিন্ত্যনীয় কলাকুশল তাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এরকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে?…

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই তাহাকে…তার মনে হইল, সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক।… অপরাজিত, ৬১০ পৃষ্ঠা।

শুধু এই বর্ণনার মধ্যে নয়—বইটির সমস্ত atmosphere এর মধ্যে এই যে spaceএর আভাস, এই creative freedomএর আভাস শুধু অপুর জীবনের আদর্শের মধ্যে নয়, উন্মুক্ত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে নয়, অপুর জীবন-কাব্যের মধ্যে নয়—বিভূতিবাবুর নিজস্ব যে লিপিকৌশল, যে technique তার মধ্যেও এর পরিচয় আছে। তিনি জানেন স্মৃতির সাহায্যে কল্পনার সাহায্যে কি করে বর্ত্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিসর্পিত করে, আদিঅন্তহীন কালের সঙ্গে যুক্ত করে একটা চিরন্তনের বিশালতার আভাস সৃষ্টি করা যায়।

অপু তো একটি জীবনস্রোত—সে স্রোত হয়ত কোথাও পদ্মার মত দুর্ব্বার দুর্ম্মদ নয়, কিন্তু পদ্মার প্রশান্ত ব্যাপ্তি ও অতল গভীরতা তার মধ্যে আছে। বিচিত্র দেশ, গ্রাম, বন প্রান্তরের ভিতর দিয়ে সে চলেছে—সে তার জীবনকে একটা আদর্শের স্বপ্নের মধ্যে সফলতা দান করবে। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত একটি জীবন-কাব্য। খণ্ড জীবনের খণ্ড কাহিনী নিয়ে এর দেহ ও প্রাণ গড়ে' ওঠে নি। আমরা এই বর্ত্তমান যুগে জীবনকে অত্যন্ত খণ্ড খণ্ড করেই দেখি—খণ্ড জীবনের জটিলতাকে জটিলতর করে' নিজেদের কল্পনা ও বুদ্ধিকে তার মধ্যেই বিহার করতে দিই—সমগ্রতার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি মুক্তি পায় না; জীবনকে আমরা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টাও করিনে। বিভূতিবাবু এই সমগ্রদৃষ্টিতে একটি জীবনকে দেখতে চেষ্টা করেছেন—সৃষ্টির যাবতীয় বিচিত্রতার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে' দেখতে চেষ্টা করেছেন, এবং তাতে সফল হয়েছেন। বিভূতিবাবুর কল্পনা কিছু বাসদ্বারা ব্যাহত হয়নি। এমন সমগ্রভাবে এমন বিরাট ভাবনা—এত বড় করে' চিন্তা ও কল্পনা করবার ক্ষমতা, সৃষ্টি করবার শক্তি খুব বেশি লেখকের আছে বলে মনে হয় না। এই সমগ্রভাবে দেখা—এটাই সত্যকার দৃষ্টি; এই creative vision—এই দৃষ্টি না থাকলে মানুষ সুবৃহৎ সৃষ্টি করতে পারে না। যাঁরা epic লিখেছেন, যাঁরা সুবিশাল কক্ষের দেয়ালের পর দেয়াল জুড়ে বড় বড় frescoes এঁকেছেন—মনের জগতে বিভূতিবাবু তাঁদের আত্মীয়। বিভূতিবাবু এই বৃহৎ করে' ভাবতে পেরেছেন এবং তাঁকে রূপ দেবার সাহস তাঁর আছে। খণ্ড জীবনের মধ্যে তার কৌতূহল আবদ্ধ হয়ে নেই—সেইজন্য জীবনের অতি সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে বিভূতি বাবুর দৃষ্টি ও কল্পনা প্রসারিত হয়নি—কিন্তু জীবন যেখানে বৃহৎ ও সুবিস্তৃত, তার সমগ্রতা তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং তিনি তাঁকে একটা খুব বড় পটভূমির ওপর ফেলে বড় বড়

তুলির টানে ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন। সেই যে নরওয়ের অজ্ঞাতনামা আর্টিষ্ট Gustare Vigeland যার Tree of life—ভাস্কর্য্যজগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, দিনে দিনে যা গড়ে উঠ্‌ছে এবং একদিন যা পৃথিবীকে চমৎকৃত করবে, বিভূতিবাবু তার পাশে আসন পেতে পারেন—Tree of life এর পরিকল্পনা, অপুর জীবনের মতোই একটা পরিকল্পনা, একটা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবার চেষ্টা একটা epic in sculpture—অপুর Tree of life আমাদের চোখের সামনে বেড়ে উঠলো। বিভূতিবাবু যে এত বড় করে', এত বিরাট করে', এমন সমগ্রভাবে একটা জীবনকে সৃষ্টি করতে পারলেন, তার ছবি আঁকতে পারলেন, এই জন্যই বিভূতিবাবু অভিনন্দনের যোগ্য। তিনি বড় বই লিখেছেন একথা নিতান্তই অবান্তর—তিনি বড় স্রষ্টা, creative vision তাঁর আছে, এইটেই বড় কথা। কোনো কারণেই এ কথাটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে।

নীহাররঞ্জন রায়



শরৎ-রবির যাদু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ

রূপের পূজারী—কখনো কবিতা লেখে, কখনো তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসে যায়। বয়েস বাইশ, পড়ে কলেজে, সংসারের ঝক্কি কিছু নেই। মাসে মাসে নিয়মিত টাকা আসে বিধবা মা'র সিন্দুক থেকে; নিশ্চিন্ত মনে শরদিন্দু কল্‌কাতার মেসের এক নিরালা ঘরে কলেজীশিক্ষার আঁচ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিরিবিলি বসে দিন কাটায়, কখন তুলি হাতে, কখন কলম নিয়ে।

মেসের পাশেই দোতালা ভাড়া বাড়ীটাতে কোথাকার চারজন শিখ এসে জুড়ে বসে আছে। নীচের কোঠা দুটোয় তারা হোটেল খুলেছে, উপরের দুটোয় শোয়। শুধু পুরুষের সংসার নাকি দুঃসহ, তাই দিন কতক হ'ল তারা সুদূর পঞ্জাব দেশ থেকে বছর কুড়ি বয়সের এক শিখ-যুবতীকে আনিয়ে নিয়েছে। শিখ-রমণীর আগমনের তিন দিন পরেই শরদিন্দু তার ঘরের সেদিককার জানালাটা সেই যে বন্ধ করেছে বন্ধু-বান্ধব এসে বার বার অনুরোধ করলেও আর খোলে না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও বাড়ীর নির্লজ্জ কুৎসিৎ লীলা চোখে পড়লে তার গা রিরি করে। দিবারাত্র যে রকম স্ফূর্ত্তির উৎসব চলছে বেশীদিন ওদের হোটেল টিকবে না, দেখে নিও।

শরদিন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। আজ সাতদিন হ'ল শিখচতুষ্টয় বাড়ীওয়ালার তিন মাসের ভাড়ার বদলে গোটা কয়েক ভাঙাচোরা বাসন ও অর্দ্ধছিন্ন দড়ির খাটিয়া ফেলে' রেখে' তাদের দুর্লভ নারী-রত্ন-সহ উধাও হয়েছে। বাঙালীর মত তারা নিছক ঠকাতে জানে না, তাই এতটা অনুগ্রহ। বাড়ীওয়ালা মেসে খোঁজ নিতে এসেছিল, বলে গেল—আর টাকার লোভে ভিনদেশীয় কাছে বাড়ী দেবে না। খুব ঠকিয়ে গেছে যাহোক। শরদিন্দু বলে, শিখ-পুঙ্গবেরাই ঠকেছে বেশী। চারজনেই ভাবে রমণী তার, কিন্তু নারী-হৃদয়ে চারজনের স্থান কোথা? শেষটা খুনোখুনী না দাঁড়ায়!

কাল রাত্রে নূতন ভাড়াটে এসেছে। বাঙালী নিশ্চয়; বাড়ীওয়ালার কি লজ্জা নেই! ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতেই কৌতুহল-দৃষ্টিতে খোলা জানালাটার ধারে যেতেই দেখ্‌লে এক কিশোরী তন্বী ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাদেরই মেসের দিকে মুখ করে'। শরৎ-রবির কাঁচা রোদ্দুরের এক ঝলক মেয়েটার কাঁচা মুখের উপরটায় পড়ে তাকে সুর-লোক-বাসিনী উর্ব্বশী বলেই মনে হয়। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে আপন মনে শরদিন্দু বলে উঠ্‌ল—

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল।"

ছাদ-বিহারিণী উর্ব্বশী স্তুতিবাদ শুনে' মৃদুমধুর হেসে লীলায়িত ভঙ্গিমায় সরে গেল।

শরদিন্দু কৃতার্থ। তার কল্প-লোকের সুর-সুন্দরী এতদিন পরে মর্ত্ত্য-লোকে প্রতিবেশিনী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমটা তুলির টানে ছবি আঁকতে বসে যায়, কিন্তু কিছুতেই মনের মত রঙ্ খোলে না। আচ্ছা, রেখা দিয়ে তোমার নাগাল না পাই, লেখায় তোমায় ছুঁয়ে যাব। শরদিন্দু লিখ্‌তে সুরু করে—

হে মোর মানসী, আজি ছাদে আসি'
অপরূপ সাজে দাঁড়ালে;
সুমধুর হাসি' সন্দেহ নাশি'
পিপাসা আমার বাড়ালে।

কবিতায় শরদিন্দু মগ্ন, মিল খুঁজে খুঁজে হয়রান্। হঠাৎ পিছন থেকে রামবাবু উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন কিগো, বাবাজি, কি হচ্চে? চারিদিকে দেখি রঙ্, তুলি, ছবি, এ যে রীতিমত 'আর্ট ষ্টুডিও' বানিয়ে নিয়েচ! খেঁদী কিন্তু ছাদ থেকে তোমাকে দেখেই চিনেচে। শুনে শরদিন্দু বিহ্বল হ'য়ে রামবাবুর দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে—ধেত্তোর, সেই খেঁদী! তাকেই দেখ্‌লাম না কি ছাই!

এই খেঁদীর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে' শরদিন্দুর মা মাস ছয়েক থেকে ঝুলোঝুলি করছে। ছেলের পছন্দ হবে কেন? নাম খেঁদী, রঙ্ ময়লা!

যতীন্দ্রনাথ গুহ

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রাজনীতিক বঙ্গের সীমা

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সীমা বাঙ্গালীরা সন্তোষজনক মনে করেন না। প্রদেশ বিভাগের মূল ভিত্তি যে ভাষা হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরা সকলেই এক মত। দেশের অনেক প্রধান ব্যক্তি ও শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; নেহেরু-প্রতিবেদনেও এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সরকার পক্ষেও অনেক দায়িত্বশীল লোক এবং কমিসন প্রভৃতি ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সীমানার পুনর্নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একাধিকবার আশ্বাস পাওয়া গেলেও, কার্য্যতঃ সেদিকে কোনও উদ্যোগ আজও দেখা যায় নাই।

বঙ্গবিভাগের সময় বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করায় বাঙ্গালীরা যে, এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বাঙ্গালীর অখণ্ড একত্ববোধে বাধা জন্মিবে এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে। এই ব্যবস্থায় দুই বিভিন্ন স্থানে প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষার সহিত প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষার শক্তির অনেকটা অপব্যয় হইবার আশঙ্কা ছিল। বিভক্ত বাংলাকে অনেকটা সংযুক্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, পূর্ব্বের অবস্থা এখনও আংশিক-ভাবে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। বাংলার বাহিরে আসামে প্রায় ৪০ লক্ষ বাঙ্গালীর বাস এবং বাংলার সীমান্তবর্ত্তী বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি জেলার সম্পূর্ণ বা কতকাংশ, ভাষা, জাতি, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতির দিক দিয়া প্রকৃতপক্ষে বাংলার অংশ। কৃত্রিম রাজনীতিক বিভাগ অনুসারে ইহারা বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

এইরূপে যে সকল বাঙ্গালীকে জোর করিয়া মাতৃভূমি হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের এমন সব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, যাহাতে, তাহাদের নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং পূর্ণ আত্ম-বিকাশের সুযোগ নানাদিক দিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অনেকটা ক্ষতির সম্ভাবনাও এদিক দিয়া রহিয়াছে।

বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের বাঙ্গালীরা ঐ প্রদেশের মোট লোকসংখ্যার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। এই প্রদেশে ইঁহাদের সংখ্যাল্পতা বশতঃ, নিজেদের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শিক্ষার জন্য, সুযোগের জন্য এবং স্বার্থের জন্য গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন না। লোকমতের চাপ দেওয়া এই জন্য আরও অসুবিধা হয় যে, প্রধান অধীবাসীদের স্বার্থ অনেক সময় ইঁহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে থাকে এবং তাঁহারা ইঁহাদের বিপক্ষতা করেন। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং কর্ম্ম-জীবনে তাহা ব্যবহার করিবার সুবিধা ইঁহাদের থাকে না; চাকরীর জন্য, কাজ চালাইবার জন্য ঐ প্রদেশের প্রধান ভাষা অতিরিক্তভাবে ভাল করিয়া শিখিবার প্রয়োজন হয়। ফলে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ কমিয়া যায় এবং কালক্রমে অনেকে বাংলা ভুলিয়া যান। এইরূপে ইঁহাদের কতকাংশ কিছু পরিমাণে, মূলজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা। কাজেই, এই সকলস্থান যত শীঘ্র বাংলার সহিত যুক্ত হয়, এই সকলস্থানের অধিবাসীদের এবং গোটা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ততই লাভ।

শ্রীহট্টকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার আন্দোলন, অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আসামের সমগ্র বঙ্গভাষী উপত্যকাকে বঙ্গভুক্ত করিবার কথাও হইয়াছে। সমগ্র বাংলাভাষী ভূখণ্ডকে এক প্রদেশভুক্ত করিবার প্রস্তাব ন্যায়

ও যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু, ইহার আর একটা দিকেও কিছু ভাবিবার বিষয় আছে। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের বাঙ্গালীদের সহিত আসামের বাঙ্গালীদের একটা বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। আসামে বাঙ্গালীরা সংখ্যাল্প সম্প্রদায় নহেন। ইঁহারা আসামের মোট লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক এবং আসামী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের অপেক্ষা ইঁহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ; ইঁহারাই আসামের সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়। এখানে ইঁহাদের স্বার্থরক্ষার, ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির পুরিপুষ্টির অসুবিধা হইবে না। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইবে: এখনই অনেক বাঙ্গালী মুসলমান কৃষক এখানে যাইয়া বাস করিতেছেন এবং এখানকার বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিলে, অন্য শ্রেণীর হিন্দুরাও ক্রমে এখামে যাইয়া বাস করিতে পারেন এবং ক্রমে ইহা বাঙ্গালীদের একটি উপনিবেশে পরিণত হইতে পারে।

বাঙ্গালীদের প্রভাব বাংলা ব্যতীত আর একটি প্রদেশেও যদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহাতে আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতির কারণ কি হইবে? আসামের প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, সেদিক দিয়াও বাঙ্গালীরা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র এবং বর্দ্ধিত সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। অন্যপক্ষে আসামের কতকাংশকে যদি বাংলার সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সেখানকার অবশিষ্ট বাঙ্গালীরা, বিহার-উড়িষ্যার বাঙ্গালীদের ন্যায় অসুবিধায় পড়িবেন। কাজেই, বিহার-উড়িষ্যার বাঙ্গালী প্রধান স্থানগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা যেমন আমাদিগকে করিতে হইবে, তেমনই আসাম সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

স্কুলে প্রবেশাধিকার

কউন্সিলের প্রশ্নোত্তরের বিবরণ হইতে জানা গেল, কলিকাতার হিন্দু স্কুলে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রের প্রবেশাধিকার নাই। অনেকটা ইহার কারণ স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, গোড়া হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দানেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা এই সর্ত্তেই দান করিয়াছিলেন যে, স্কুলটিতে মাত্র তাঁহাদের ছেলেরাই পড়িবে এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা পড়িবে না; অর্থাৎ তাঁহাদের ছেলেদের শুচিতা (?) পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিবে। শেষোক্ত কথাগুলি স্পষ্টভাবে বলা না হইলেও প্রশ্নোত্তর হইতে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কথা হইতেছে, ইচ্ছা করিলে এবং গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা দিলেই, গবর্ণমেণ্ট এমন কোনও প্রতিষ্ঠান কাহারও পক্ষ হইয়া চালাইতে পারেন কিনা যাহা জনসাধারণ বা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে ক্ষতিকর বা অপমানজনক। ন্যায়ত গবর্ণমেণ্টের তাহা পারা উচিত নহে; অপর কাহাকেও এরূপ জিনিস চালাইতে দেওয়া উচিত নহে।

কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিদ্যালয়কে সীমাবদ্ধ রাখায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যা'ক কোনও স্থানে ৫০০ পরিবারের বাস; তাহার ৩০০ ঘর লোক কোনও বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত এবং ধনী; অপর ২০০ ঘর লোক দরিদ্র এবং অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমোক্ত ৩০০ ঘর লোক যদি এমন কোনও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের বালকদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে না এবং অপর ২০০ ঘর লোকের পক্ষে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মাত্র তাঁহাদিগের বালকদের দ্বারা চালান অসম্ভব হয় তবে, প্রথমোক্ত লোকেরা শেষোক্তদের বিদ্যা হইতে বঞ্চিত রাখিবার সুযোগ পাইলেন। কাজেই, এরূপ অধিকার কাহারও থাকা উচিত নহে। কলিকাতায় এরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হইলেও, অত্যন্ত মন্দ আদর্শের সৃষ্টি করে বলিয়া, সর্ব্বস্থানেই ইহা বর্জ্জনীয় হওয়া উচিত। এই প্রকারের অন্য যে সকল বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা ব্যতীত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আরও গুরুতর বাধা আছে। এই প্রকার ব্যবস্থায় তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের এমন একটি নিন্দনীয় মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইতেছে যাহা কতকগুলি লোকের আত্ম-সম্মানজ্ঞানকে বিশেষভাবে আঘাত করিতে পারে এবং সমাজের মধ্যে নানা বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। প্রত্যেক হিন্দুরই

এজন্য লজ্জিত হওয়া, এবং যাহাতে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন হয়, তাহার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন

সাম্প্রদায়িক মীমাংসা দ্বারা হিন্দুসমাজকে যে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে মহাত্মাজী, অবস্থান্তর বা মৃত্যু না ঘটা পর্য্যন্ত, উপবাস করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। তিনি ফাঁকা কথার মানুষ নহেন; কাহাকেও ভীতি প্রদর্শন করা, অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলা অথবা অকারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা তাঁহার স্বভাব নহে। ধ্যানরত, শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে, অনেকদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে, তিনি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন পণেও প্রস্তুত থাকেন। এইজন্য আশঙ্কা হয়, তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে কেহ বিচলিত করিতে পারিবে না। তাঁহার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা কি প্রকার অবস্থা-সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর এবং সর্ব্বমতের লোকেরাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন; ভারতের বাহিরেও এজন্য কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার এই কাজের ভাল মন্দ কোনও প্রকারের সমালোচনা করাই সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া তিনি কোনও কাজ করেন না, তাঁহার সকল কাজের পশ্চাতে, তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ মনের সুগভীর ভালবাসা থাকে। তাঁহার এই সম্পর্কিত পত্রগুলির মধ্যে এমন একটি শান্ত, সংযত অথচ অপরিমেয় শক্তির আভাষ আছে যাহা, প্রত্যেকের চিত্তকেই স্পর্শ করে।

হিন্দুদের ভিতরে অনেকে মনে করিতেন, হিন্দুদের স্বার্থ সম্বন্ধে মহাত্মাজী তাদৃশ মনোযোগী নহেন। হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে কত গভীর তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন।

চাপ কাহার উপর পড়িবে।

মহাত্মাজীর এই দারুণ সঙ্কল্পের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর যেটুকু চাপ পড়িবে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর উপর চাপ তাহার চেয়ে অনেক অধিক পড়িবে। কার্য্যতঃও ইহা কিছু দেখা যাইতেছে। নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে এবং অনেক মন্দিরের দ্বারও সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিন্দুসমাজকে যে দ্বিধা বিভক্ত করা সম্ভব হইল, তাহার পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই। জাতিভেদ প্রথা যদি বর্ত্তমান গ্লানিকর অবস্থায় উপনীত না হইত এবং একশ্রেণীর লোকের মন ইহার বিরুদ্ধে নিতান্ত বিষাক্ত হইয়া না উঠিত তাহা হইলে হিন্দুসমাজের ভিতরেরই একদল লোক, কিছু আপাত লাভের আশায় এই নীতি সমর্থন করিতে পারিত না।

অন্য পক্ষেরও কিছু ভাবিবার কথা

বর্ত্তমানে কিছু লাভের আশা সাধারণতঃ মানুষকে বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া ফেলে। হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের নামে কতকগুলি লোককে দুইবার ভোট দিবার অধিকার দেওয়ায়, এই লোকগুলিকে সমগ্র হিন্দু সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখা সহজ হইবে। এই সুবিধা স্থায়ী করিবার জন্য কতকগুলি লোক চিরদিনই হিন্দু সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এবং হিন্দু সমাজ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট পরস্পর বিরোধী স্বার্থের আঘাতে শক্তিহীন হইয়া পড়িতে পারে।

বর্ত্তমানে, যাঁহারা এই লাভের আশায় বিশেষ উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু সমাজের উত্থান পতনের সহিত তাঁহাদেরও উত্থান পতন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক শক্তি ও গুরুত্বও তাঁহারা হিন্দু সমাজের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যায় জেদের জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুরা যদি শক্তিহীন হইয়া পড়েন তবে, তাঁহারাও সেই পতন হইতে রক্ষা পাইবেন না। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সুশীলকুমার বসু

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৪

দাদা কলেজে ভর্ত্তি হবার কিছুদিন পরেই এক রবিবার আমাকে বল্লে "চল্ বাইরে মাদুর নিয়ে, আমায় আজ একটা ভাল গল্প বল্‌বি।" বাইরে এসে দুজনে বস্‌লাম। দাদাকে বল্লুম 'আনার-কলি'র গল্প পড়েছ কখন, আমি সেই গল্প বল্‌বো, পড়তে পড়তে জল পড়ে চোখ দিয়ে।" আমি গল্প বলে যেতে লাগলাম, শেষ হয়ে গেলে দাদা বল্লে "আর একবার বল্।" আমি আবার বল্লুম, দাদা বল্লে আমায় "একটা খাতা আর পেন্‌সিল দিয়ে এখন যা' একটু পরে আসিস্।" আমি চলে গেলাম। খানিকটা বাদে যেতে দাদা বল্লে "বোস্"। আমি দেখলাম দাদা একটা বাইশ তেইশ লাইনের কবিতা লিখেছে, দাদা কবিতাটা নিজে পড়ে শোনালে। একটু আগে আমি যে গল্প করেছিলাম সেই 'আনার-কলি'কে ছন্দে বেঁধে দাদা অপরূপ রূপ দিয়েছে। দাদার কবিতা শুনছি বলে তখন মনে হয়নি, মনে হচ্ছিল বহুদিন আগে যে সুরের রেখা আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছিল এতদিন পরে সেই যেন কবিতার মাঝে তার পদ্মাসন পেতেছে।

প্রায় ছ'সাত মাস পরে আমাদের মুখে শুনে বাবা সেই কবিতাটা শুনতে চাইলেন। দাদার কাছে খোঁজ করাতে দাদা বল্লে "আমি সব কবিতা পুড়িয়ে ফেলেছি। কেবল একখানা খাতা প্র— কেড়ে নিয়ে তার কাছে রেখে দিয়েছে, বলেছে আর দেবে না।" আমরা বল্লুম "বেশ খাতাখানা আমাদের একবার এনে দিও আমরা টুকে নিয়ে ফেরৎ দেবো।" দাদা প্রথমে রাজি হয়নি, শেষে বলেছিল "আচ্ছা তোমাদের নাম করে চেয়ে আনবো।" কিন্তু সে খাতা আমরা পাইনি। দাদা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেল, পরদিনই সে খাতা প্র— তা'র সঙ্গে দিয়ে দিল। আরো অনেক কবিতা কোথায় যে ছড়িয়ে পড়্‌ল, কিছুই খোঁজ পাওয়া গেলনা। ফুল ঝরে গেলেও গন্ধ তা'র কিছুক্ষণ থাকে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ফুল ঝরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গন্ধও তার মিলিয়ে গেল।

মামার বাড়ীতে কিছুদিন থাক্‌বার পর দাদা বল্লে "বাবা, আমি হোষ্টেলে থাক্‌ব, এখানে ভারি গোলমাল, পড়ার অসুবিধে হয়।" বঙ্গবাসীর এক কলেজমেসে থাক্‌বে ঠিক হোল। আমি বল্লুম "দাদা তুমি এক্‌লা এক ঘরে কি করে থাক্‌বে মন কেমন করবে না?" দাদা বল্লে "অভ্যেস হ'য়ে যাবে।" আমি বল্লুম "আচ্ছা তা' যেন হোল, কিন্তু তোমার বিছানা ঝাড়া, মশারি ফেলা, আরো অনেক কাজ এসব কে করবে, তুমি তো কিচ্ছু জান না।" দাদা বল্লে, 'তুই কি ভাবিস্ তোরা না করলে আমি কিচ্ছু পারি না, তোরা করিস্ বলে আমি করি না।" আমি বল্লুম "কাজ যেন তুমি করলে কিন্তু হোষ্টেলে মাংস, পেঁয়াজ, ডিম, আরো কত কি রান্না বারোমাসই হয়, তুমি কি করবে দাদা, ওসব তো খেতে পারবে না।" দাদা বল্লে "তা' আর কি করা যাবে, না খেলেই হবে।" "কিন্তু ছোঁয়া?" মা আমায় ধমক্ দিয়ে বল্লেন "থাম্ থাম্ অত পণ্ডিতি করতে গেলে চলেনা, এই যে তোর দিদিদের শ্বশুর বাড়ীতে খায়, ওদের ছোঁয়া খেতে হয় না?"

দাদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম "দাদা তুমি এখন সব বাঙলা বই পড়?" দাদা বল্লে "হাঁ এখন আমি সব বই পড়ি মা পড়তে বলেছে।" আমি বল্‌লাম "মা আমি তাহলে সব বই পড়ব।" মা বল্লেন "তুমি আবার কো

বই বাকি রেখেছ শুনি?" আমি একটু কৃত্রিম রাগ করে বল্লাম "বাঃ বেশ, আমি বুঝি সব বই পড়ি, না পড়েও যদি পড়া হয় তবে এবার থেকে পড়াই ভাল।" দাদা বল্লে "তুমি এখনো আমার মত বড় হওনি, কাজেই তুমি এখন পড়তে পারবে না।" আমি এইবার সত্যি সত্যি রেগে বল্লাম "কখনো না।"—দিদি ছোটদি' বল্লে 'মা আমাদের বেলায় কি রকম শক্ত ছিলে একখানাও বাজে বই পড়তে দিতে না, আর ওর বেলায় মা মোটে কিছু বলেন না যেখানে যা পা'বে তাই পড়বে।" মা হাস্‌লেন বল্লেন 'তোরা যে আমার কথা শুনতিস্, প্রকৃতি যে শোনে না।" দিদি বল্লে "না শোনেনা আবার, তুমি তেমন করে বল বুঝি।"

১৫

আবার বেনারসে গেলাম।

আর বছরে যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম এবারও সেই বাড়ী ভাড়া হ'য়েছিল। দশটার সময় আমরা বেনারসে পৌঁছালুম। আমি আর দাদা পিসীমার বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে আগেই আমাদের বাড়ী এলুম। দিদি, বাবা, মা, পিসীমার বাড়ীতে তখন রইলেন। দাদা বল্লে "আয় প্রকৃতি, ওরা সবাই আসবার আগে আমরা জিনিষ পত্র গুছিয়ে ফেলি।" আমি বল্লুম "থাক্‌গে বাপু, আমার ভাল লাগছে না, ঘুম পাচ্ছে বড্ড।" দাদা বল্লে "না এখন ঘুমোস্‌নি, দেখ্ ঘরগুছিয়ে রাখ্‌লে মা এসে কি রকম অবাক হ'য়ে যাবে দেখিস্, আমি কিন্তু এবারে চার তলার ঘরে থাক্‌বো।" দাদার অনুরোধে আমি অপ্রসন্ন মুখে দাদার সঙ্গে ঘরগুছিয়ে রাখলাম। দাদা এক ঘটি জল এনে রেখে দিয়ে বল্লে "থাক্, বাবা পা ধোবেন এসে।" আমি জলটা ফেলে দিয়ে বল্লাম "তোমার দেওয়া জলে তো বাবা পা ধোবেন না, দাদা।" দাদা দুঃখিত হ'য়ে বল্লে "তোরা কেমন বাবার পায়ে হাত দিস্, প্রণাম করিস্, আর বাবা আমায় কিছু করতে দেন্ না। আচ্ছা প্রকৃতি, তুই নিশ্চয়ই জানিস্ কেন এসব করতে দেন্ না। আমাকে আজ বলতে হ'বে বাবা আমায় কেন পায়ে হাত দিতে দেন্ না।' লক্ষীটি, বল্ আমি কাউকে বোলবোনা।" আমি

ভারি বিপদে পড়লাম, কি করি! একদিকে যদি বলি 'বোল্‌বনা' তবে দাদা বড় রেগে যাবে। আর একদিকে বল্‌তে বারণ। অবশ্য, 'জানি না' বল্‌তে পারি, কিন্তু সে যে মিথ্যে কথা। দাদা কেবলি শোনবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিল। ঠিক করলুম, দাদার কল্যাণের জন্য আমি সব পারি, মিথ্যে কথাই বল্লুম, "আমি তো জানি না দাদা।" দাদা বিশ্বাস করলে, শুধু একবার বল্লে "সত্যি জানিস না।" আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লাম 'আমার ঘুম এসেছে বড্ড, এইবার ঘুমোই।' আমি যে ভাবে দাদাকে কথাগুলো বলেছিলাম অন্য কেউ হোলে খুব সহজেই বুঝতে পারতো কিন্তু দাদা ছিল অত্যন্ত সরল! মানুষকে অতি সহজেই বিশ্বাস করতো।

এবছরেও আমরা খুব বেড়াতাম, সব দিন দাদা সঙ্গে থাকতো না। আমার এক সম্পর্কে মামা কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনে থাকতেন তিনি খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হ'য়ে যান। দাদা প্রায় রামকৃষ্ণ মিশনে যেতো, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা খুব ভালবাসতো। মহাষ্টমীর দিন আমরা সকলে মিশনে গেলুম।

একটু পরে আরতি আরম্ভ হোল, কতদিন পরে এই আরতি দেখ্‌ছি ভারি সুন্দর লাগছিল। আরতির শেষে একজন ব্রহ্মচারী স্তব পাঠ করলেন, অনেক লোক হ'য়েছিল কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ! বাজনার শব্দ নেই, কেবল ব্রহ্মচারীর গম্ভীর মধুরকণ্ঠ আকাশে, বাতাসে, ও নীরব মঠের চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল!

ছোটদি'র ছেলে ধ্রুবর জন্য মা গোটাকতক কাঠের বল্‌ কিনেছিলেন, দাদা তাই দেখে বল্‌লে "মা তুমি সকলকে কত কি দিচ্ছ কিন্তু আমায় তুমি কিছু দাওনা।" মা বল্লেন "তুমিতো কিছুই চাওনা বাবা, আচ্ছা তোর কি চাই বল্‌।" দাদা বল্লে "আমায় তিনটে কাঠের বল্‌ দিতে হ'বে।" মা শুনে অবাক হ'য়ে বল্লেন 'বল্‌ নিয়ে তুই কি করবি অচু?' দাদা প্রথমে চুপ করে রইল তারপর একটু লজ্জিতমুখে বল্লো "আমি খেল্‌ব মা।" মা বল্লেন "তুই হোষ্টেলে থাকিস্‌, সেখানে খেল্‌লে ছেলেরা যে তোকে ক্ষেপাবে।" দাদা বল্লে "আমি ঘরে দরজা দিয়ে খেলব।" বিকেলবেলা দাদা বল্‌ পেয়ে ভারি খুসী, খানিকক্ষণ বল্‌ নিয়ে লোফালুফি করে মাকে বল্লে "মা এখন তুলে রেখে দাও, যখন কলকাতায় যাব নিয়ে যাব!" আমি দাদার কাণ্ড দেখে ভাবলুম দাদা এখন কি রকম ছেলে মানুষ।

আমাদের কলকাতায় ফের্‌বার আগের দিন সূর্য্যগ্রহণ ছিল। বিকেলবেলা মা, দিদি, আর পিসীমার বাড়ীর সবাই গঙ্গাস্নান করে এল। বাবা, আমি, আর দাদা, স্নান করলুম না, বল্লুম "তোমরা বেশী করে পুণ্য সঞ্চয় করো তাহ'লেই আমাদের হবে, আমরা কাল ভোরে মুক্ত হ'ব।" পরদিন খুব ভোরে উঠে বাবার সঙ্গে আমি আর দাদা গঙ্গায় গেলুম। যখন স্নান করছি তখন সবে পূর্ব্বদিক্‌ অল্প অল্প লাল হ'য়েছে চারদিক আধো আলো আধো আঁধারে ঢাকা, নির্জ্জন ঘাটে অন্য কেউ ছিলনা, শুধু আমরা তিনজন।

১৬

আমরা তিনবোনেই দাদাকে প্রাণভরে ভালবাসতাম, কিন্তু ছোটদি আর আমি দাদা যদি কোন অন্যায় করতো কি আমাদের রাগ করে কিছু বলতো তাহলে আমরা কিছুতেই তা' সহ্য করতাম না। দাদা যা বল্‌তো আমরা তার চেয়ে বেশী শুনিয়ে দিতাম। দিদি ছিল আমাদের ঠিক উল্টো। দাদা দিদির উপর যত রাগ করুক না কেন দিদি দাদাকে একটী কথাও বল্‌তোনা। দাদার ফাই ফরমাস্‌ দিদিই বেশী শুন্‌তো। 'ছোটদি' আর আমার সঙ্গে দাদা ঝগড়া করলে, আমরা আগে কিছুতেই কথা কইতাম না, দাদাই আগে কইতো। একদিন দাদা আমাদের তিনজনের ওপর খুব রাগ করলে, ছোটদি আর আমার সঙ্গে সেদিন দাদার ঝগড়া হ'য়ে গেল। আমরা বল্লুম "আমাদের সঙ্গে তুমি আর কথা বোলনা—আমাদের নাহ'লে যা'র চলেনা সে আবার আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে—।" দাদা বল্লে "আচ্ছা দেখ আমি যদি এবারে তোমাদের সঙ্গে আগে কথা বলিতো কি বলেছি।" কিছুক্ষণ-যাবার পর দাদা আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে "এই দেওয়াল আমায় মাদুর পেতে দিবি চল্‌।" আমি পাছে হেসে ফেলি বলে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দাদা অনেক রকমে আমাদের হাসাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল কিন্তু

পারলেনা। ছোট্‌দিকে লক্ষ করে বল্‌ল "খুঁটী আমার কেমেষ্ট্রীর বই খানা নিয়ে এসতো।" আমরা দুজনেই নির্ব্বিকার! শেষে দাদা মাকে বল্‌ল "মা ওদের বল না আমার যা দরকার তাই দিতে।" দিদি বল্লে "আমি দেবো অচু?" দাদা বল্লে "না তোমার দিতে হ'বে না", মা আমাদের দিতে বল্লেন। আমি বল্লুম "কেন আমরা দেবো কেন খুঁটী, দেওয়াল, ওরা দিক্‌না, আমাদের দায় পড়েছে দেবার জন্যে, আমরা তো দাদাকে 'বয়কট্‌' করেছি।" দাদা বল্লে "আমার যখন যা' কাজ পড়বে তখন তাই করে দিস্‌ তা'হলে আমি কথা বল্‌বোনা।" আমি দাদার যা' দরকার সব দিয়ে এলুম। একটু পরে পিয়ন এসে দাদার কাছে দিয়ে গেল। আমি চিঠির খোঁজে বাইরে যেতেই দাদা একখানা খাম তুলে ধরে দেখিয়ে বল্লে "এই দেখ্‌ কথা না কইলে দিচ্ছি না।" চিঠিখানা ছোট জামাইবাবুর। ছোট্‌দিকে বল্‌তে ছোটদি বল্লে "না দিক চিঠি কিছুতেই কথা কোস্‌না।" আমরা চিঠি চাইলুম না দেখে দাদা ভারি মুস্কিলে পড়ল্‌, মাকে গিয়ে বল্লে "মা ওদের কথা বল্‌তে বলোনা, আমি হার মেনেছি।" দিদি বল্লে "তোরা কি নিষ্ঠুর রে, অচু তুই কথা বলিস্‌না ওদের সঙ্গে।" দাদা কিন্তু কিছুই শুনলেনা আমরা যা'তে কথা বলি সেইজন্য মা'র কাছে বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল। অনেক বলার পর সেদিন আমরা কথা বলেছিলাম।

পূজোর পর আমাদের দিন একইভাবে কাট্‌তে লাগল। দাদা প্রত্যেক শনিবার আসে, সোমবার সকালে চলে যায়। আমি একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা দাদা, সেখানে আমাদের জন্য তোমার মন কেমন করেনা?" দাদা বল্লে "হ্যাঁ প্রথম প্রথম বড্ড বেশী করতো এখন অভ্যাস হ'য়ে আস্‌ছে, তবে শুক্রবার হোলে পড়ায় আর মন বসাতে পারিনা।"

দাদার কাছ থেকে বাবা কখন টাকার হিসেব চাইতেন না। মা একবার বাবাকে বলেছিলেন "অচু ছেলেমানুষ কি খরচ করতে কি করে বসবে একটা হিসেব রাখ্‌লে ভাল হোতনা?" বাবা বল্লেন "না ওর কাছে হিসেব নেবার দরকার হ'বেনা, অচু কখন কোন অন্যায় খরচ করবে না।"

সত্যিই দাদা কোন অন্যায় খরচ করতোনা। বাবা হিসেব না চাইলেও দাদা মা'র কাছে আপনা থেকেই হিসেব দিতো। টাকা কড়ি সব মা'র কাছেই থাকতো, বাবা কখনো নিজের কাছে একটি পয়সাও রাখতেন না। মা'র হাতে সব ছিল বটে কিন্তু মা বাবাকে না জানিয়ে একটি পয়সা খরচ করতেন না।

দাদা গরীবদের পয়সা দিতে বড় ভালবাসতো। অনেক সময় বলত 'বড় হ'য়ে আমি যদি রোজগার করি তবে আগে গরীবদের দিয়ে অন্যলোক্‌কে দেবো।' একবার দাদা মা'র কাছে সব টাকার হিসাব দিল কিন্তু দশ টাকার হিসেব দিলনা। মা দু' একবার জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু দাদা কিছু বল্লেনা। আমরা দাদার আগের কথায় বুঝতে পেরেছিলাম যে দাদা টাকা কাউকে দান করেছে। মা সেখান থেকে সরে যেতে আমরা চেপে ধরলাম, জানতাম দাদা কখনো কথা চেপে রাখতে পারবে না। দাদা বল্লে "দশ টাকা আমি একজন গরীব লোককে দিয়েছি, তোমরা যেন মা'কে কি বাবাকে বোলনা।"

এবারে কংগ্রেসে অধিবেশনের সময় বড় এক্‌জিবিশন হলো, তা' দেখতে দেশ বিদেশ থেকে লোক আসছিল। দাদাকে বল্লাম "দাদা তুমি দেখতে যেও, আমাদের যাওয়ার সুবিধে হ'বে না।" দাদা বল্লে "নাঃ আমি যাব না, গিয়ে কি হ'বে?" আমরা অনেক করে বললাম কিন্তু কিছুতেই হোল না, দাদার সেই এককথা "দেখে কি হ'বে।" শেষে বাবা অনেক বলাতে রাজি হোল। মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে যে প্রোসেশান্ হয়, অনেকের মুখে তা'র গল্প শুনলাম। দাদা সেদিন কলকাতায় ছিল, ডায়মণ্ডহারবারে এলে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম্ "দাদা প্রসেশান্ কি রকম দেখলে।" দাদা বল্লে "আমি তো দেখিনি।' আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম "সেকি কেন দেখ্‌লে না, কি করছিলে তখন, ভীড় বলে যাওনি?" দাদা বল্লে "না সেজন্য না, আমাদের মেসের বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যেতো খুব ভাল রকম, অন্য ছেলেরা দেখেছিল আমায় ধরে খুব টানাটানি করেছিল কিন্তু দেখিনি, ঘরে বসে বই পড়ছিলাম। প্রথমে একটু ইচ্ছে হ'য়েছিল তারপর ভাবলাম কি হ'বে দেখে।" দাদার অদ্ভুত খেয়াল দেখে আমার একটু রাগ হ'য়েছিল, কিন্তু দাদার নিজেকে সংযত করবার ক্ষমতা দেখে বেশ একটু আত্ম-প্রসাদও অনুভব করলাম। (ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

আরত্তি—কবিতার বই—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক এন্, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আজকাল যে সকল কবিতার বই বাহির হয় তন্মধ্যে ভাষা ভাব ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে এমন একখানিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তাহার চিহ্ন যে সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট তাহা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রপ্রভাব যুক্ত হইলেও কবির কিছু নিজস্ব আছে। ভাষার প্রবাহ, ভাবের আবেশ নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, বিচিত্র মনস্তত্ত্বের বিকাশ, কবির স্বকীয় শক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য কাব্য গ্রন্থ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) দেবতা বিষয়ক (২) নারী বিষয়ক ও (৩) বহির্জ্জগত বিষয়ক।

সর্ব্বপ্রথম কবিতা "মুক্তি"র আরম্ভটি সুন্দর

"বন্ধ ছিলে খাতার পাতায়
অন্ধকারের অন্ধ কায়ায়,
আজ তোমাদের মুক্তি দিলেম
হাজার লোকের চোখের তারায়।"

'সদানন্দ' নামক দ্বিতীয় কবিতাটি হিন্দুর দেব দেব মহাদেবের বন্দনা। বিষয়বস্তু খাঁটি পৌরাণিক ঘটনাবলীর ইঙ্গিতে কবিতাটি একটি সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা একাধারে সরল ও মনোরম। তবে শিবের গীতে 'ডম্বরু'র স্থলে 'মন্দিরা'র প্রয়োগ বোধ হয় 'মন্দিরে'র অনুপ্রাসের মোহবশতঃ ঘটিয়াছে। কবির এ ত্রুটী লক্ষ্য করা উচিত ছিল। তৃতীয় কবিতা 'বন্দনা'য় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'সারথি' কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য আছে। ভাব পুরাতন হইলেও সনাতন এবং প্রকাশ-ভঙ্গীও নূতন। একটু নমুনা লউন।

"সারথি আমার সারথি
জীবন দ্বারের মহাসংগ্রামে
বিমুখ যখন ঘুমাই আরামে
জাগিতে আমারে নিয়ত এখানে
ঘোষিয়াছে তব ভারতী।"

এইবার নারীবিষয়ক কবিতাগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। "রমণী" কবিতাটিতে পুরুষের জীবন সংগ্রামে নারীর প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য যোগ না থাকিলেও অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর ন্যায়, অন্তরের সহানুভূতির ধারা প্রবাহিত হয়, কবি তাহা বেশ দক্ষতা ও শ্রদ্ধা সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। 'চরমমান' বেশ সরস প্রকাশভঙ্গীও চমৎকার। কল্পনা চক্ষুতে জয়-পরাজয়ের একটি মনোজ্ঞ চিত্র।

"আমার মানবী" ভাবে ভাষায় ও বর্ণনায় অনবদ্য সুন্দর। তৃতীয় বা শেষ বিভাগের কবিতামালায় "রবীন্দ্রনাথ" "চিত্তরঞ্জন" প্রভৃতি কবিতাগুলি বেশ সরস ছন্দোবদ্ধ, মধুর এবং বিপুল শিল্পীর পরিকল্পনা এগুলিতে বিদ্যমান। "নৌকা বাহন" ও "যা হয় কিছু"তে কবির কল্পনা ও প্রকাশ সহজ বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী। "অধিকন্তু ন দোষায়" "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" প্রভৃতি কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের "কণিকা"র অনুকরণে রচিত হইলেও সুখপাঠ্য। "সাগর দোলা" কবিতা কবির বিশেষত্বের পরিচায়ক। "শারদীয়া" শীর্ষক কবিতাপুঞ্জে কবির প্রকৃতিদর্শনে সূক্ষ্ম, অন্তর্দৃষ্টির শক্তি এবং সুকৌশল বর্ণণাক্ষমতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানিতে, অনুসন্ধান করিলে, সামান্য সামান্য দোষ ত্রুটী উদ্ধার করা যায় না এমন নহে, কিন্তু সমগ্রভাবে পুস্তকখানি আলোচনা করিলে বইখানি পাঠকদিগের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইবে একথা অসংশয়ে বলা যায়। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, দামও সুলভ।

শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

সরল ক্রিয়াকৌমুদী—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি সম্পাদিত। ১৬ পেঃ ডঃ ক্রাঃ—৭৫৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা বি-এল, ১৯এ স্কট লেন কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আর্য্য হিন্দুগণের ধর্ম্মক্রিয়াদি শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সম্পাদন করিবার পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি এই পুস্তকটিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; ১ম ভাগ পূজাপদ্ধতি, ২য় ভাগ দশসংস্কার ও ৩য় বিভাগ শ্রাদ্ধপদ্ধতি। প্রত্যেক বিভাগের পূর্ব্বে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ একটি করিয়া অবতরণিকা লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকটির একটি বৈশিষ্ট্য--বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে যতগুলি বৈদিক এবং পৌরাণিক মন্ত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছে (সংখ্যায় প্রায় ৬০০ হইবে) প্রত্যেকটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষক। সুতরাং এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে মন্ত্রাদির অর্থবোধের দ্বারা ক্রিয়াকর্ম্ম সুখ-সম্পাদ্য হইবে, দুর্ব্বোধ্য এবং দুরুচ্চার্য্য মন্ত্র আওড়াইয়া যাইবার গ্লানি হইতে ক্রিয়াকারী অব্যাহতি লাভ করিবেন।

কোনো কোনো কর্ম্মের ক্রিয়াপদ্ধতি সাধারণ লোকের পক্ষে একটু সংক্ষিপ্ত এবং অবিশদ বলিয়া বোধ হইল, তবে সাধারণতঃ সে কর্ম্মগুলি কর্ম্মতৎপর তন্ত্রধারক অথবা পুরোহিতের সাহায্যেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। বইখানির কলেবর যাহাতে অপরিমিত ভাবে বাড়িয়া গিয়া অসুবিধা না ঘটায় তদুদ্দেশ্যে একই মন্ত্র বারম্বার না ছাপাইয়া প্রথম প্রয়োজনের স্থলে একবারমাত্র ছাপানো হইয়াছে এবং পরে অন্য জায়গায় প্রয়োজন হইলে মন্ত্রের মাত্র প্রথম কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে;—একটি বর্ণানুক্রমিক মন্ত্র-সূচির সাহায্যে সমগ্র মন্ত্রটি বাহির করিয়া লইতে হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে এ প্রণালী হয়ত একটু বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে কিন্তু এ পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে বই-খানির কলেবর অতিশয় বাড়িয়া যাইত এবং মূল্য এত অল্প করা সম্ভব হইত না। উপযোগিতা এবং কলেবরের হিসাবে বইখানির দাম যথেষ্ট অল্প করা হইয়াছে। ছাপা একেবারে ঝরঝরে,--শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের সুনামের পরিচায়ক।

বইখানিতে সম্পাদকের পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম এবং বিচার-বোধশক্তি সুপরিস্ফুট—পড়িয়া আমরা সত্যই সুখী হইয়াছি।

বিষ্ণু শর্ম্মা

অজয়কুমার—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত। ১৪১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এ বইখানি একটি উপন্যাস—কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লিখিত। লেখক বাঙলা সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ সাহিত্যিক—তাঁহার হাত দিয়া বাঙলা দেশের তরুণ পাঠক সমাজ এই বইখানিতে একটি অতি উপাদেয় উপহার লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু তরুণেরাই নহে, তাঁহাদের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ অভিভাবকগণও এ বইখানি সাগ্রহে পড়িয়া আনন্দিত হইবেন—এমনই চিত্তাকর্ষক এ বইখানির বিষয়বস্তু এবং লিখনভঙ্গী।

অজয়কুমার একটি ষোল সতের বৎসরের বালক, গৌরবর্ণ পাতলা ছিপ্‌ছিপে, যেন আগুনের ফোয়ারা; চোখদুটি জলজলে, বুদ্ধিতে ভরা, হয়ত একটু দুষ্টামী বুদ্ধিতেও। এই ছেলেটি তার অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়া নিজের উন্নতির উদ্দেশ্যে কি প্রকারে একটি জার্ম্মাণ জাহাজে লুকাইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল এবং বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া এরোপ্লেনে চড়িয়া জার্ম্মানীতে পৌছিল এবং অবশেষে তথায় এরোপ্লেন চড়া শিখিবার স্কুলে ভর্ত্তি হইল—এ উপন্যাসখানি তাহারই একটি বিবরণ—বহু-বিচিত্র ঘটনায় কৌতুক এবং কৌতূহল-পূর্ণ। পরিশেষে অজয়কুমারের পত্রে বেলুন, জেপ্‌লিন ও এরোপ্লেনের একটি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। উপন্যাসখানির মধ্যে জার্ম্মান জাহাজের কাপ্তেন-পত্নী ফ্রাউ মায়ার, এরোপ্লেন্‌ চালক ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌, ক্লারা-দিদি প্রভৃতি চরিত্রগুলি উজ্জ্বল এবং মনোরম। এই বইখানি বাংলা দেশের কিশোর কিশোরীদের শুধু আনন্দই দিবে না, তাহাদের বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করিবে—কল্পনার খোরাক যোগাইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা। প্রকাশক—আর্য্য পাবলিশিং কোং—২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিগত দশ বার বৎসরের মধ্যে সাহিত্য এবং 'স্বদেশ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন অথবা পাঠ করিয়াছেন সেগুলি (সংখ্যায় কুড়িটি হইবে) একত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে এই পুস্তকখানিতে। নারীর মূল্যের পরই বোধহয় এ বইখানি শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ-পুস্তক। বইখানি বাঙলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ হইল। উপস্থিত আমরা এ বইখানির মাত্র উল্লেখ করিলাম—ভবিষ্যতে বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিষ্ণু শর্ম্মা

মেঘ-আবাহন

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় বি,এ

তুমি অপরূপে সাজালে হৃদয়
সাজালে গৃহের কোণ, ওগো বর্ষণ মেঘ;
গাছে গাছে তাই জাগে কিসলয়
ঘাসে জাগে ফুলমন, ওগো বর্ষণ মেঘ।
মেল তব পাখা, ছেয়ে যাক্ সব
কল্পে মধুর ঘোর, মেল বর্ষণ মেঘ।
কালো রঙে যত বরণ নীরব,
স্বপনের বাঁধ ডোর, বাঁধ বর্ষণ মেঘ।
ঘরে যায় যারা, জানালা ভেজায়,
তাদের বন্ধ ভাঙো ওগো নির্ম্মম মেঘ।
হিমেল পবনে তরাস দে' যায়
নয়নে আঁজন হানো, ওগো নির্ম্মম মেঘ!
বিদ্যুতে তুমি ঝলসিয়া চোখে,
বজ্রে চমক্ লাগাও, ওগো সুন্দর মেঘ।
বুক চিরে চিরে উন্মাদ শোকে
আকাশ জগৎ জাগাও, ওগো সুন্দর মেঘ।
চেয়ে চেয়ে আজ তোমায় আমার
নয়নে লেগেছে ঘোর, আশু বর্ষণ মেঘ।
যেন সারা প্রাণে ঢেলে দেছ তার
অঝোরা অজানা লোর, প্রেম বর্ষণ মেঘ।
বুঝিবা হারায়ে গিয়াছে পরাণ
তোমার অতলরূপে, ওগো জলভরা মেঘ;
ওগো কালো সলিলে করেছি যে স্নান
সন্ধ্যা নিভৃত চুপে ওগো মনোহরা মেঘ।
আজিকে ফুরায়ে গেল সব কাজ
চাহিয়া তোমার পানে, ওগো সুন্দর মেঘ!
জীবনের পাওয়া, শূন্যতা, লাজ
সকল ভরিল গানে, স্নেহে মন্থর বেগ—
দাঁড়াও ক্ষণেক নয়নে নয়নে
তোমারে বাঁধিয়া লই, ওগো বন্ধুর মেঘ;
সফল স্বপনে জাগিব শয়নে
কেতকীর মত ওই, ওগো ব্যথাতুর মেঘ;
আমার নয়নে আঁজন লেপিয়া
কি খেলা খেলিয়া গেলে, প্রেম পণ্ডিত মেঘ;
জগতের রূপ দিলে শ্যামলিয়া
মাটীতে পাথরে মেলে, নীল মণ্ডিত মেঘ;
আমি দিয়াছি তোমায় পরাণ সঁপিয়া
সকল অশ্রু ঢেলে, তবু কেন শঙ্কিত মেঘ!

মাখনলাল মুখোপাধ্যায়

নানা কথা

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন

বহু শতাব্দীর সঞ্চিত যে-পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মহাত্মাজী আত্ম-নিপীড়ন আরম্ভ করেছেন—ভারতবাসী যদি একটা মৃতজাতি না হয়,—তবে এইবার সেই পাপ সমূলে উৎপাটিত হ'বে। মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে আমরা যে অপরাধ করে এসেছি,—আজ যদি তার প্রতীকার করে আমরা মহাত্মাজীর মুখে অন্ন তুলে না দিই,—তবে ধিক আমাদের! এ কী বেদনা—মনুষ্যত্বের জন্যে মহাত্মাজী বহন করছেন! আর সেই বেদনাকে এ কী ভাষা তিনি দিলেন! মহাত্মাকে যদি এই মৃত্যু থেকে আমরা বাঁচাতে না পারি,—তবে ভারতবর্ষকেও পারব না,—ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ,—সকল দেশবাসীরই যেন এ কথাটি স্মরণে আসে। এখনি দূর হোক সকল ভেদ,—এই দণ্ডেই যেন সকল মানুষের সঙ্গে আমরা সহজ ভাবে মিলিত হ'তে পারি—এই উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা প্রযুক্ত হোক্।

দেশের এই সঙ্কটের সময় প্রত্যেক দেশবাসীর কি কর্ত্তব্য,—তা মহাত্মাজী তাঁর প্রয়োপবেশনের দ্বারা স্পষ্টতম ভাষায় বলে দিয়েছেন। শুধুই হিন্দুজাতির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নয়,—সমগ্র মনুষ্যত্বের মধ্যে যা' কিছু অপবিত্রতা, কলঙ্ক, গ্লানি আছে, সকলেরই বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর এই সংগ্রাম।

এ সম্বন্ধে কোনো দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই,—প্রয়োজন আছে কর্ম্মের, দৃষ্টান্তের। এ বিষয়ে আমাদের এবং সকল দেশবাসীর অনুভূতিকে ভাষা দিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তৃতাগুচ্ছটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোল। আমরা সমস্ত দেশবাসীকে তাঁর উপদেশ অনুসরণ করতে আহ্বান করি।

শুধু উপদেশ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হ'ন নি। সমস্ত আশ্রমবাসী এবং পাশাপাশি গ্রামগুলির অধিবাসীদের একত্রিত করে ঘোষণা করে দিয়েছেন,—অস্পৃশ্য আর কেউ রইল না,—আর তার চিহ্নস্বরূপ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিদের আহ্বান করে তাদের ললাটে চন্দন-তিলক লেপন করে তাদের মাল্যদান করেছেন। আমরা আশা করি আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে আর কোথাও কোনো রকম অস্পৃশ্যতার আচার নেই। যদি এখনো থাকে ত এই মুহূর্ত্তে তাঁরা তা পরিহার করবেন কি?

শরৎ-বন্দনা

গত ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের বয়স সাতান্ন পূর্ণ হ'য়েছে। এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর তরফ থেকে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করার যে-আয়োজন হ'য়েছিল, তার সঙ্গে আমাদের যোগটা সাধারণের চেয়ে একটু ঘনিষ্ঠতর ছিল। তার কারণ শুধু এই নয় যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'বিচিত্রা'র একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; তার প্রকৃত কারণ এই যে, যে ক্ষণজন্মা পুরুষের লেখনীতে একটি জাতির সুখ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা ভাষা পেয়েছে,—তাঁকে অভিনন্দন দেওয়ার মধ্যে সেই জাতির চেতনা-উদ্বোধনের একটা সুযোগ থাকে বলে, আমরা এই রকম অভিনন্দনের পক্ষপাতী। তাই যখন শরৎ-বন্দনা-সমিতি আমাদের স্বল্পপরিসর বিচিত্রা-নিকেতনের কিয়দংশ তাঁদের কার্য্যালয়ের জন্য ব্যবহার করবার অনুমতি চেয়েছিলেন, আমরা সানন্দচিত্তে সেই অনুমতি দিয়েছিলাম, এবং আমাদের সামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। এই সুযোগে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা যে কতখানি তা' সাক্ষাৎ উপলব্ধি করার একটু অবকাশ পেয়েছিলাম; যে-দিন অভিনন্দন সভার প্রবেশ-পত্র বিতরণ করা হ'বে বলে ঘোষণা করা হ'য়েছিল,—সেদিন আমাদের কার্য্যালয়ে লোক-সমাগমে

ও টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনিতে আমাদের কাজের যতই অসুবিধা হোক, দেশবাসীর মধ্যে শরৎ প্রীতির প্রসার ও গভীরতা দেখে বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছিলাম। শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবি হো'ন,—এই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা এই সংখ্যায় শরৎচন্দ্রকে যে অভিনন্দন দেওয়া হ'য়েছিল, ও তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন,—তার প্রতিলিপি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এই উপলক্ষ্যে যে দু'খানি চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রতিলিপি প্রকাশ করলাম।

কবিগুরুর চিঠি দু'খানির মধ্যে একখানি অভিনন্দন সভায় পঠিত হ'য়েছিল; দ্বিতীয়খানি ৩১শে ভাদ্র অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মদিনেই লেখা; সেখানি কবির হস্তাক্ষরেই আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। শরৎ-বন্দনায় কবিগুরুর এই যে আন্তরিক যোগ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে এর মধ্যে একটা নিগূঢ় অভিপ্রায়ের সূচনা আছে। দ্বিতীয় চিঠিখানিতে কবি দেশের তরফ থেকে শরৎচন্দ্রের নিকট যে দাবি জানিয়েছেন, তা' যেমনি কঠিন,—তেমনি তা' শরৎচন্দ্রেরই উপযুক্ত। অর্দ্ধশতাব্দী ধরে "দেশের চিত্তভবনে" যে "পূণ্য অগ্নি" কবিগুরু জ্বালিয়ে রেখেছেন, তা "অনির্ব্বাণ" রাখার ভার শরৎচন্দ্রের উপর দিয়ে তিনি বিদায় প্রার্থনা করেছেন! কবির বিদায় নেবার বয়স হ'য়ে থাকতে পারে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না,—কিন্তু বিদায় লগ্ন ত মানুষের ইচ্ছা অনুসারে আসে না তা বিধাতার হাতে। আশা করি, কবির বিদায় নেবার দিন আসতে এখনো বহু বিলম্ব আছে, কিন্তু যখন সে দিন আসবে, তখন যেন শরৎচন্দ্রের "জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদীপ" বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃসঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে," কবির এই কামনা দেশের কামনা। দেশবাসীর এই কামনাই শরৎচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়গান। আজ শরৎ-বন্দনা উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রকে আমাদের এই নিবেদনই জানাতে চাই তিনি যেন তাঁর প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তিতে কবিগুরুর জ্বালানো আলোক শিখা নব নব অর্ঘ্যপ্রদীপের বিচিত্র উজ্জ্বলতায় অম্লান রাখেন; দেশবাসীর অভিনন্দন নিয়ে এখনি যেন বিদায়-লগ্নকে আহ্বান না করেন। কবিগুরুর এই দান বড় কঠিন

দান,—আমরা আশা করি অক্লান্ত সাধনায় অম্লান রেখেই শরৎচন্দ্র তাঁর স্বদেশবাসীকে তা' অর্পণ করে যাবেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রচার

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার মন্তব্য প্রকাশ করেছি। যে-জ্ঞান ও রসের ধারা রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে নিঃসারিত হ'য়েছে,—বিশ্বের দরবারে তার জন্য আমাদের গৌরব বৃদ্ধির আত্মপ্রসাদটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকাটা ঠিক সুস্থ প্রাণবান্ জাতির লক্ষণ নয়; সেটা হ'চ্চে কতকটা সেই কৃপণের অবস্থার মত যিনি তাঁর অতুল ধনৈশ্বর্য্য সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে আপনাকে সহস্রদিকে বঞ্চিত করেও একটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। সময় এসেছে,—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবধারায় সমস্ত দেশের চিত্তক্ষেত্রকে সিক্ত করে তাকে সর্ব্বদিকে উর্ব্বর করে তোলবার চেষ্টা করার। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় প্রতিমাসেই কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশ করে আমরা এই দিকে সামান্য কিছু উদ্যম করে থাকি, তা' আমাদের পাঠক-পাঠিকারা জানেন,—কিন্তু বলাই বাহুল্য একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার পক্ষে এই সামান্য উদ্যম অতীব অকিঞ্চিৎকর। তাই আমরা আমাদের জনৈক পাঠকের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে একটা গঠন-মূলক পরিকল্পনা সমেত যে চিঠিখানি পেয়েছি,—সেটি এখানে আদ্যোপান্ত মুদ্রিত করলাম। আমরা আশা করি, আমাদের দেশবাসীরা এই পরিকল্পনাটিকে আগ্রহ সহকারে বিবেচনা করবেন। যথাশীঘ্র যথোপযুক্ত প্রণালীতে সহায়তা করার জন্য আমরা আনন্দের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাদের অন্যান্য পাঠকদের আলোচনা প্রকাশ করব। জনকয়েক উৎসাহশীল যুবক এ বিষয়ে মন দিলে অতি সত্বরই কর্ম্মোপযোগী একটা পরিকল্পনা খাড়া করে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,

রবীন্দ্রনাথ জগতে যে জ্ঞান ও রসের ধারা বিতরণ করিয়াছেন, বাঙালীর গর্ব্বের বিষয়, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার প্রথম প্রকাশ। "প্রথম প্রভাতের উদয়ের" মতো বিশ্ব-সমুজ্জ্বলকারী রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম উদয়কে বরণ করিয়া লইবার সুযোগ বাঙালী-জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। সহজে যা পাওয়া যায়, এমন সৌভাগ্যের অনেক সময় সহজ অবহেলাতেই হারাইবার ভয় থাকে। দেখা যাক্, আমরা আমাদের এই জাতীয় সৌভাগ্য-রবির অবদান কী উপায়ে গ্রহণ করিয়া জাতীয়জীবনের এই শুভমুহূর্ত্ত সার্থক করিতে পারি।

বিগত সপ্ততিতম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে দেশবাসী কবিকে যে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন, তাহাতে কর্ত্তব্যের এক অঙ্গমাত্র সম্পাদিত হইয়াছে। সময় আসিয়াছে,—তাঁহার বিপুল সাহিত্যের প্রচার এবং মর্ম্মগ্রাহী বিস্তৃত আলোচনার। জয়ন্তী উৎসবের সময় দেশবাসীর মধ্য হইতে কাগজে কাগজে এইরূপ একটি সদিচ্ছার উদ্ভবও দেখা গিয়াছে। অনেকের অভিযোগ এই যে, কবির গ্রন্থগুলি এত মহার্ঘ্য যে, এই আর্থিক দুর্গতির দিনে দরিদ্র বাঙালী জনসাধারণ তাহা কিনিয়া পড়িতে অক্ষম। বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগকে তাঁহারা দায়ী করেন এবং দাম কমাইবার জন্য অনুরোধ করেন।

কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কাগজ, ছাপা, এবং আকার অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বই অন্য কোনো আধুনিক বাঙালী লেখকের বইয়ের চেয়ে দামে বেশি নয়। বাজারে বহুলচিত্রিত কবিতার বই—যেমন কাব্যদীপালি বা ওমর-খৈয়াম ইত্যাদির কথা না হয় বাদই রহিল। তাহা ছাড়া আরো একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার দরকার আছে।

বিশ্বভারতী একটি সর্ব্ব-জন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আবাসিক নীতিতে এখানকার শিক্ষা, ছাত্রসংখ্যা পরিমিত, সেদিকে ইহার আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ। সর্ব্বসাধারণের বদান্যতাই ইহার প্রধান আর্থিক ভিত্তি। কবি তাঁহার গ্রন্থস্বত্ব ইহাকে দান করিয়াছেন। এই একটিমাত্র স্বল্প আয়ের স্বাধীনপন্থা ইহার একান্ত অবলম্বন। দাম অত্যন্ত কমাইয়া সাহিত্য প্রচারে তৎপর হইয়া এই দুর্দ্দিনে, ক্রেতার স্বল্পসংখ্যকতার জন্য শেষে বিশ্বভারতীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ইহাও কাহারো বাঞ্ছনীয় নহে। তবে দেশের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রচারের সুগঠিত

ব্যাপক অনুষ্ঠান যদি সক্রিয় থাকে, আশা করা যায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রন্থের বহুল বিক্রয় দ্বারা বিশ্বভারতীর সেই ক্ষতির আশঙ্কা দূর হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে অভিযোগ ও অনুরোধ শুনা গিয়াছে, এজন্য সুনির্দ্দিষ্ট কোনো কর্ম্মপন্থা দেখা যায় নাই। একথা ভাবিয়া, আমরা একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে চাই, সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হইয়া উন্নত প্রণালীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রসার হইলে আমরা সুখী হইব।

১। দেশের নানাস্থানে এ যাবৎ যত রবীন্দ্র-অনুশীলনী এবং রবীন্দ্র অনুরাগী অনুষ্ঠান আছে, সকলগুলি একটি **কেন্দ্রীয় যোগে** যুক্ত হইবে। এবং বাংলার প্রতি সহরে এবং সমৃদ্ধ পল্লীতে কবির অনুরাগী অনুষ্ঠান বাড়ানো হইবে।

২। অতঃপর, একটি **সমবায়-ক্রেতা-সমাজ** স্থাপিত হইবে। ধরা যাক্, তাহার মূলধন লক্ষ টাকা। ৫০৲ পঞ্চাশটাকা হারে ২০০০ দু' হাজার অংশে সভ্য চাঁদা ভাগ করা হইল। ২৲ রহিল প্রবেশিকা। পরে ২৲ দু' টাকা মাস-কিস্তি ধার্য্য করিয়া ৬ ছ'মাসের কিস্তি আগাম লওয়া যাক্। রবীন্দ্রপরিষদ্ সমূহের চেষ্টায় সমিতির সভ্য-সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। মূলধনের এক চতুর্থাংশ টাকা অর্থাৎ ২৮০০০৲ আটাশ হাজার টাকা হাতে আসিলে কবির সমগ্র গদ্য ও পদ্য রচনার সস্তা-সংস্করণের একটি বিশেষ সংগ্রহ ২৪ খণ্ড প্রকাশের কাজ সুরু হইবে।

৩। একটি **বিশেষজ্ঞ সমিতির** হাতে এই সংগ্রহের সম্পাদন ভার থাকিবে। প্রতিমাসে মোটামুটি ৪।৫ চার পাঁচখানা বইর সমাবেশে উহার এক এক খণ্ড বাহির হইবে। সভ্যগণ কিস্তির চাঁদা অতঃপর ১।৷০ দেড় টাকা হিসাবে দিয়া প্রতিমাসে ভিঃ পিঃ রাখিবেন। এইভাবে ব্যবস্থা করিলে আশা করা যায় কি যে দুই বৎসরে মাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা স্বল্পব্যয়ে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য সাধারণ্যে সুলভ হইয়া পড়িবে।

৪। বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি **ভ্রাম্যমান গ্রন্থালয়** ও একজন **প্রচারক** থাকিলে ভাল হয়। ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেখিলেই, দেখা যায়,

পণ্য সামগ্রীর যাথার্থ বুঝিয়া ক্রেতার ভিড় জমে। প্রচারক মহাশয় নানাস্থানে ঘুরিয়া বিভিন্ন পরিষদে বক্তৃতাপ্রদান এবং বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ, সভ্য ও ছাত্রসংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারেন। গ্রন্থালয়টি প্রচারকের সঙ্গে থাকিবে। প্রচারক যেখানে যাইবেন, পক্ষকাল সেইখানকার সর্ব্বজন অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় পারিপার্শ্বিক জনসমাজে গ্রন্থগুলি পাঠ করাইতে পারেন, সে সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা দ্বারাও রবীন্দ্রসাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি করিতে পারেন।

৫। প্রতিবৎসর বাংলা মাসিক সমূহে রবীন্দ্রঅনুশীলন-মূলক যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইবে, তাহাদের (প্রথম, দ্বিতীয় ও কিশোর শ্রেণীর) মধ্যে **শ্রেষ্ঠ রচনা-লেখকদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা** থাকিলে আলোচনার প্রসার দ্বারা গ্রন্থের চাহিদা বাড়িবে।

৬। এইজন্য সময়ে সময়ে পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রকাশ, সভ্যসংগ্রহের জন্য সমিতির প্রতিনিধিদের দস্তুরি, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থালয় ও প্রচারকের খরচ এবং রচনাকারকদের পুরস্কারের অর্থ ক্রেতাসমিতির লভ্যাংশ হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে

উপরের অঙ্কগুলি হয়তো যথার্থ নহে, কেবলমাত্র উহার সাহায্যে কর্ম্মপন্থারই একটা আভাষ দেওয়া রহিল। এ সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

ভবদীয়
জনৈক পাঠক।

পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ

পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদের একটি বিবরণ ঐ পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুধীর মিত্র আমাদের পাঠিয়েছেন। যে আদর্শে এই পরিষদ অনুপ্রাণিত, তার বহুল প্রচার দেশের পক্ষে কল্যাণকর, এই বিবেচনায় বিবরণটি আদ্যোপান্ত পাঠকবর্গের গোচর করা গেল :--

পাঁজিয়া যশোহরের একটি প্রাচীন জনবহুল গ্রাম। অতীতে শিক্ষা, সভ্যতা এবং সম্পদের জন্য ইহার খ্যাতি ছিল। এখানকার লোকের ঐশ্বর্য্য ও দান সম্বন্ধে এ অঞ্চলে অনেক গল্প আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু সব প্রাচীন পল্লীর ন্যায় পাঁজিয়াও তাহার অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে আশার কথা, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যুবকদের মধ্যে পল্লীর উন্নতিকল্পে নানাবিধ প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে।

আমাদের সমস্ত দুর্গতির মূলে শিক্ষার অভাব রহিয়াছে— ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া পাঁজিয়ার কয়েকজন উৎসাহী যুবক "সারস্বত পরিষদ" নাম দিয়া শিক্ষার প্রসার এবং বিদ্যানুশীলনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করেন। ইহাঁদের চেষ্টা ও তৎপরতায় এই প্রতিষ্ঠানটি চারিপাশের গ্রামগুলির মধ্যে একটি প্রধান মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং নানামুখী কর্ম্মের জন্য ইহার খ্যাতিও বহুদূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর ইহার জন্য বাংলো ধরণের একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার ভিতর লাইব্রেরী ঘরটি ব্যতীত প্রায় পাঁচ শত লোকের বসিবার মত স্থান আছে। বর্ত্তমানে পরিষদের নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত বিভাগগুলির সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে।

(১) সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাপ্রসার

শিক্ষাপ্রসার ও সাহিত্যসেবা, পরিষদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে গ প্রবন্ধাদি পাঠ, নানা বিখ্যাত পুস্তক (ইংরাজী ও বাংলা) ও লোক সম্বন্ধে আলোচনা এবং দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তর্ক ও বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের শিক্ষক ছাত্র এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা যোগদান করিয়া থাকেন। ইহার সংলগ্ন একটি অবৈতনিক পাঠাগার আছে।

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহারা একটি অবৈতনিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য নানাউপায়ে চেষ্টা করিতেছেন।

(২) সমাজসেবা

প্রথম হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ সমাজ হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কর্ম্মীগণ মধ্যে মধ্যে দূর ও নিকটবর্ত্তী কৃষকপল্লী সমূহে গমন করিয়া

কৃষকদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করা, শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দান করা, নানা সামাজিক দুর্নীতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সজাগ করিয়া তুলা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁদের চেষ্টায় এ অঞ্চলে কতকগুলি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। যশোহরের কয়েকটি অপহৃতা নারী উদ্ধারে ইহাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু, হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশা অত্যন্ত ব্যাপক ও কোনও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহার প্রতিবিধান নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া ইহাঁরা সমগ্র সদর মহকুমার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন। এই ধরণের কাজ বর্ত্তমানে তাহার মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইতেছে।

(৩) তরুণ বিভাগ

গ্রামের ছাত্র এবং অন্যান্য যুবকদের লইয়া এই বিভাগটি গঠিত। পরিষদ চত্বরের মধ্যে ইহাঁদের পরিচালনায় একটি ভাল ব্যায়ামাগার আছে। এখানে তার উত্তোলন, কৃত্রিম মুষ্টিযুদ্ধ ও ছোরা খেলা এবং নানাবিধ দেশী ও বিদেশী ব্যায়াম প্রণালীর সাহায্যে শরীর-চর্চ্চা করা হয়। এই তরুণ বিভাগের মধ্যে একটি সেবামণ্ডলী আছে। চাউল পয়সাদি সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র পরিবার সকলকে গোপনে সাহায্য করা এবং রোগীর সেবা শুশ্রূষাদি করা ইহাঁদের প্রধান কার্য্য।

(৪) মহিলা বিভাগ

ইহার অন্তর্গত নারীমঙ্গল সমিতি, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পরের মেলামেশাদ্বারা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন, অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ সাধন প্রভৃতির জন্য সচেষ্ট আছেন।

(৫) চারুচন্দ্র পাঠাগার

এ অঞ্চলে একটি ভাল লাইব্রেরীর অভাব—অনেকদিন ধরিয়া অনুভূত হইতেছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য পরিষদের পাঠাগারটির সংস্কার সাধন করিয়া একটি ভাল লাইব্রেরী স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বহু পুস্তক ক্রীত ও সংগৃহীত হইয়াছে—এবং কয়েকজন বিশিষ্টলোক এতজ্জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী পূজায় ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

গ্রামের সুধীসন্তান অকালে পরলোকগত ৺চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামানুসারে লাইব্রেরীটির নাম "চারুচন্দ্র পাঠাগার" হইবে। চারুবাবু তাঁহার স্বল্প জীবনকালের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য উন্নতিকর কার্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

শ্রীসুধীর মিত্র
সম্পাদক

শারদীয় উপহার

কলিকাতার-উপহার-পত্র শিল্পী ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিয়ো বিলাতী ক্রিস্‌মাস ও নিউইয়ার কার্ডের অনুরূপ শারদীয় উপহার কার্ড প্রকাশ করেছেন। নয় জন লেখকের লেখা এবং চিত্রসহ নয় রকমের স্বতন্ত্র কার্ড—যদিও বিভিন্ন কার্ডগুলির পরিকল্পনা সমস্তই এক। উপহার-লিপির প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ রকম রঙে মুদ্রিত একটি মনোরম প্রচ্ছদ পরিকল্পনা; দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখকের রচনা এবং চিত্র; তৃতীয় পৃষ্ঠায় সাতটি বিভিন্ন রঙে মুদ্রিত একটি কিশোরী মূর্ত্তি; হাতে কাশফুল এবং পদ্ম; এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় উপহার লিপি লেখবার ব্যবস্থা আছে। কার্ডগুলির মুদ্রণ কৌশল সত্যই উপভোগ্য। আগামী শারদীয় উৎসবের সময়ে আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এই কার্ডগুলির বিনিময় হৃদ্যতা বিনিময়ের একটি মনোরম উপায় হবে।

শারদীয়া পূজা

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে পাঠকবর্গকে আমাদের সপ্রীতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ১৯শে আশ্বিন থেকে ২রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১৫ দিন আমরা এই সময়ে অবসর নিলাম। ইতিমধ্যে যে-সব চিঠিপত্র আসবে, ৩রা কার্ত্তিক আমাদের কার্য্যালয় খোলার পর তার ব্যবস্থা করা হ'বে।



Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



জল প্রবাহ

বিচিত্রা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

ফটো—শ্রীললিতমোহন সেন এ-আর্-সি-এ

বিচিত্রা
ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

দুইবোন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শর্ম্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেচি।

একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব্বদেহে মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্ম্মিলা মায়ের জাত।

বড়োবড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণ রেখা; সাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্ত দেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েচে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্য্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর পরে। স্নানে যাবার পূর্ব্বে হাত-ঘড়িটা কোথায় ফেলেচে শশাঙ্ক হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না,

স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের্ দু জোড়া মোজার এক এক পাটি এক এক পায়ে পরে' বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজী মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথি-সমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে উঠেচে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আরতো পারিনে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবেনা!" যদি শিক্ষা হোত তবে শর্ম্মিলার দিনগুলো হোতো অনাবাদী ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হোলো, দুপুর হোলো, ব্রিজ খেলা চল্‌চে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠ্‌ল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।"

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন। মা ঠাকরুণ খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে? মা ঠাকরুণের ভয় পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্য্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা অতিরিক্ত লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, "আহা একা অরক্ষিত পুরুষ মানুষ।" বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গীতে। শর্ম্মিলা চুপ করে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কি করবে, পারেনা থাকতে। যত প্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেচে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোট ছোট চিরকুট আসচে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, "দোহাই তোমার, চক্রবর্ত্তীবাড়ির গিন্নির মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্ব্বল!"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "হায়, হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা!"

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলঙ্কার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্ম্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনিই আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে? চুপ করে মেনে যেতে হোলো। শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোর বেলায় অল্প একটু যেন সর্দ্দির আভাস দেখা দিয়েছে শর্ম্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনীন খেতে হোলো দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্ব্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনীন্ খায়নি, জ্বরও হয়েছিল এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্ম্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়চে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ করা। জংসনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দ্দিপরা দুর্জ্জন মূর্ত্তি ওদের বেদখল করবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত। ষ্টেশনমাষ্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বল্‌লে কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েচে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করচে, হেনকালে শর্ম্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বল্‌লে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারী কর্ম্মচারী, উপরওয়ালার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চল্‌তে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে "আহা, কাজ কি, আরো তো গাড়ি আছে,"—শর্ম্মিলা কানই দেয় না। অবশেষে জেনেরাল সাহেব রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আহার সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্ত্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জানো কত বড়ো লোকটা।" স্ত্রী বল্‌লে, "জানবার গরজ নেই। যে গাড়িটা আমাদের, সে গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, "যদি অপমান করত।"

শর্ম্মিলা জবাব দিলে, "তুমি আছ কী করতে।"

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্ম্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্ম্মম দৃষ্টি সে হচ্চে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়ো সাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারী পদে যখন এক্‌টিনি করচে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উল্‌টো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফ-রেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্ত্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্ত্তার সম্পর্ক ও সুপারিস বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েচে এই অর্ব্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তর থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্ত্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বল্‌লে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন্ লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিট্‌খিট্ সুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিস ঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হোলো চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে রঙটা ও দু চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাঁড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়চে বলে, তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নতুন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালো না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তাহলে চাকুরির জালটাতে আরো একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে,—হয়তো বা স্বয়ং কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হৌসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররাগুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্কেরই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেচে।

শশাঙ্কের পদ-লাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেচে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগে নি। কন্‌ষ্টিট্যুশনাল এজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বল্‌লে, "আর নয়, এখনি কাজ ছেড়ে দাও।"

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিম দিগন্তে পেন্সনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম্‌-এস্‌-সি ডিগ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্ম্মে বিলম্ব করেন নি—শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্ম্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরীতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারাম বাবু জামাতার ভাবী স্বচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্য্যন্ত অনুভব করেনি তার অবস্থান্তর ঘটেচে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয় বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্ম্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েচে। স্বামীর সমস্ত উপার্জ্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপুর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবী অসঙ্গত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনোদিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বল্‌লে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারি।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্‌ পাড়ায়?"

"সে পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বলো তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বে-লুচিস্থান মরুপ্রদেশের ওপারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই করো না।"

"সর্ব্বনাশ! সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরবে কে? অতবড়ো দুরবীন পাই কোন্‌ বাজারে?"

"মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতায় বড়ো কণ্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

"ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এপক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে সরিকি করতে গেলে পদমর্য্যাদা থাকবে না।"

"এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়চে। সরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।"

"সে কি হয়? ও টাকা যে তোমার।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্ম্মিলা স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে বল্‌লে, "আমিও যে তোমারি।"

তারপর বল্‌লে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউণ্টেনপেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।"

"আমারো শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন পত্র।

পরদিনেই শর্ম্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠ্‌ল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বল্‌লে, "একদিনো তো বোনের খবর নাও না।" মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, "তুমিও তো নাও না।" পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগালো না। অপরাধ মেনে নিলে। বল্‌লে, "নিঃশ্বেস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কিনা তাই ভুল হয়ে যায়। আর তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুসী হলুম। তখনি মনে হোলো মথুর দাদাকে নিজে গিয়ে কন্‌গ্র্যাচুলেট করে আসি।"

"একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।"

ব্যাপারখানা এই ঃ—নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হোলো যে-রকম সর্ত্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিব্‌ড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্ম্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বল্‌লে, "এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফস্‌কে গেলে ভারী অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বলো তুমি।"

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হোলো না; মথুর দাদার হৃদয়ও বিগলিত হোলো।

ব্যবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেচে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবী এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই

প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবী এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তারপরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট্ পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা সুকতলাওয়ালা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙীন চষমা,—শশাঙ্ক উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এলো, তখনো ইষ্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেচে গরম হ'য়ে।

ইতিপূর্ব্বে সংসারে আয় ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হোলো দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর একটা ঘরের দিকে। শর্ম্মিলার বরাদ্দ পূর্ব্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনা পাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্ম্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গ বিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যাবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, "বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।" কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য্য এই, শরীরও ভাঙচেনা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সকাল বেলায় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটর গাড়ির সঙ্গে আর কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হোলো জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্ম্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বল্‌লে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "পরের হাতের আপদও একই জাতের দুষ্‌মন।"

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাক-বাক্সর পেরেক, হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টঙ্কারের টীকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্ম্মিলা, বললে, "কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বল্‌লে "কাজ।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "কিন্তু"—এবার বিনা বাক্যেই ব্যাণ্ডেজ সুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েচে। যুক্তিতর্ক কাকুতি মিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা, "কাজ আছে।" শর্ম্মিলা অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরী হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেচে। রোদ্দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের—স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখ্‌তে দেখ্‌তে রোদে পোড়া, খট্‌খটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্ত্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্ম্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে চেষ্টা করে। ষ্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্ব্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন্ স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে "চল্‌লুম, ফিরতে দেরি হবে।" মোটর গাড়িতে গোছ্‌নো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টীনের বাক্সে শুক্‌নো জাতের খাবার। একটা ওডিকলোনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচর-রূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয়নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চারদিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আন্‌তে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরণে, সেও চল্‌তে চল্‌তে পিছু ডাক্‌তে ডাক্‌তে, বল্‌তে বল্‌তে, "ওগো শুনে যাও কথাটা।" ওদের ব্যবসার মধ্যে শর্ম্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েচে মাপ-জোখ করা হিসেবে, দস্তুরমতো রসিদ নিয়ে। শর্ম্মিলা বলে, "বাসরে, ভালবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেই খানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।"

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেচে ভবানীপুরে। ওর সখের জিনিষ। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসচে মাথায়। শর্ম্মিলাকে আশ্চর্য্য করবার চেষ্টা। শর্ম্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেচে, শর্ম্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বল্‌লে, "কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দ্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বজ্ঞান-বাহনকে বুঝিনে।" আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বল্‌লে, "আলুর দম তৈরি করবার বারো আনা দুঃখ যাবে কেটে।" পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেচে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্ম্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে ইঁটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য্য অটল। গোছানো গাছানো সাজানো গোজানোর মহোদ্যমে দুই দুই জন বেহারা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলচে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানা ঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না তবু তারি ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের; ফুলদানি একটা আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওয়ালা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনও ছুটোছাঁটা কাজ

কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলচে। মোটা গদিওয়ালা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটি জোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাৎলা সিল্কের পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি। আপিস ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতিকালে ঝাড়ন হাতে শর্ম্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জ্জনীয় বস্তু ব্যূহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত

শর্ম্মিলা সেবা করচে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্ম-নিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে, এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে,—বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওয়াড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানীতে।

নিজের অর্ঘ্যকে বেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হোলো, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েচে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েচে। সেদিন উনত্রিশে কার্ত্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্ম্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হোলো, ঘর দুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কি ব্যাপার? পুতুলের বিয়ে না কি?"

"হায়রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বলো বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।"

"বিজনেস্ মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।"

"আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেচি।"

"দেখ শর্ম্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না" এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্ম্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে' খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্নে লোকজন এলো। বিজনেসের সর্ব্বোচ্চ দাবী তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হোত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজনেস্! আমোদ প্রমোদ যথেষ্ট হোলো। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্ম্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজনেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হোলো তবু শর্ম্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারো খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষ মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্ম্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্ম্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়

সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসন জালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহুবন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্ম্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বই কি। এই নির্ম্মমতাকে শর্ম্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা, আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিত মনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে, দৃষ্টি রেখো, যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

ঊর্ম্মিমালা

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে-সময়টাতে ছুটে চলেচে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে, সেই সময়েই শর্ম্মিলাকে ধরল দুর্ব্বোধ কোন্ এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্ম্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারী। তা ছাড়া জাহাজ তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায় একালের সুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চ্চেন্ট অফ্ ভেনিস, জুলিয়াস্ সিজার্,' হ্যামলেট থেকে দুচার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন, মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্য্যন্ত। মধ্য বয়সে মদ এবং নিষিদ্ধভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষ বয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজ্‌লিষি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে না বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজার্চ্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্য্যাদা প্রকাশ পেত, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে; ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ কর্‌চেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব্ব হবে। গবর্মেণ্টহৌসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্ত্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রী পূজায় শ্যাম্পেন প্রসাদ ভূরি পরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্ম্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটমেয়ে ঊর্ম্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন, দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েচে পরীক্ষামানের ঊর্দ্ধতম মার্কা পর্য্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য

তার চারদিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্ম্মন শেখা সুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিম্বা শরীরের কোন্ যন্ত্রে কি একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হোলো তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান সুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত হোলো, সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজেনি কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখীর মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম্মশোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন পাসকরা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তাকাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে ভুল হচ্চে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে ঊর্ম্মির অকস্মাৎ মনে হোলো, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বল্‌লে, "দেখো তো বাবা, অল্প বয়েস অথচ নিজের পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস, আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসঙ্কুচিত সাহস।"

বাবা বল্‌লেন, "ডাক্তারিবিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারো কারো মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখচি তাই।"

এদের ভক্তির সুরু হোলো একটা ছোট প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়, তারপরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বল্‌লেন, "দেখ, ঊর্ম্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলি ডাকচে, বল্‌চে মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো। স্থির করেচি তার নামে একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।"

ঊর্ম্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে, "খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাঁসপাতালের ভার নিতে পারি।"

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগ্‌ল। বল্‌লেন, "ঐ হাঁসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েৎ। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস্‌, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠ্‌বে।" বনেদী ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হোলো না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্ম্মের মধ্যে বুঝেচেন। তাঁর ছেলে বাঁচেনি কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বল্‌লেন, "এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তারপরে য়ুরোপে।"

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুক্‌রো। যত দেখচেন ততই লাগচে চমৎকার। পাস করেচে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারি বিদ্যের সাতসমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্চে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতে টলে না মন। হালের যত কিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করচে উল্‌টে পাল্‌টে, পরীক্ষা করচে, আর ক্ষতি করচে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করচে তাদের যাদের পসার জমেছে। বল্‌ত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্যব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেচে কোনো একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম ঊর্ম্মিকে বল্‌লেন, "ভেবে দেখ্‌লুম, আমাদের হাঁসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়?"

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বল্‌ত মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্ব্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনি করুন অভিরুচি যেমনি থাক হেমন্তের পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হোলো।

নীরদ মুখুজ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল্‌, অর্থাৎ প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বল্‌লে সে বল্‌ত ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তর সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্ম্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচে কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ, এক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে আলাপ করতে জানেনা। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি বা থাকে তার আলোটা নেই। এই জন্যেই, যে সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই সকল কারণে ওকে ঊর্ম্মির উমেদার শ্রেণীতে গণ্য করতে

কেউ সাহস করেনি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্ত্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর পরে উর্ম্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় এনে টেনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বল্‌লেন, যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুসি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেই সঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে' বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বল্‌লেন, "সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয়নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগস্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি, এই দুর্য্যোগ কথঞ্চিৎ উপশমের উপায় স্বরূপে সর্ত্ত রইল যে পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ উর্ম্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নীরূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ উর্ম্মিকে বল্‌লে "পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েচে তৈরি জিনিষ। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।"

উর্ম্মি নম্রভাবে বল্‌লে, "আচ্ছা পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।" নীরদ বল্‌লে, "তোমার মধ্যে শক্তি যথেষ্ট আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারিদিকে। তাহলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠ্‌বে, ডাইনামিক্ হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল্ অর্গানিজম্।"

উর্ম্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে, ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর কেউ বল্‌লে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরণ আছে নীরদের। সে যাই বলুক উর্ম্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য তাৎপর্য্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম এই উপলক্ষ্যে ওর বড়ো জামাইকেও ডাক্‌লেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্ম্মিলাকে বলে, "ছেলেটা অসহ্য জ্যাঠা, ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে।"

শর্ম্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়?" শর্ম্মিলা বলে, "তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচো, আমার কথা আলাদা।"

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠ্‌চে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে "ওতো মজুর, ওকি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই?"

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, "এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এলো।"

"ইংরেজি মতে ?"

"না বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে। ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থ টার সঙ্গে পরিচয় আছে এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।"

মনে মনে বলে, "সত্যি ঐ নামটাই এ'কে ঠিক মানায় বটে।" ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। "হায়রে, এত বড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে!"—কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হোলো। উর্ম্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্র মনে তার পরিণতি সাধনের ভার নিলে।

উর্ম্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্‌ করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন, সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট! বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাডমিণ্টন খেলায় ওস্তাদ। এসব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণীলতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে সাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢিল দিয়ে আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সঙ্গীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করচে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সঙ্গত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গ দান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকার হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে উর্ম্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। উর্ম্মি জানে ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েচে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই।

তাইতো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশকোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েচে। সে বলত, "আমার যখন সময় আসবে, তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোবো।" সময় হোলো না, কিন্তু উর্ম্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

*

মুস্কিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। উর্ম্মির জন্যে পাঠ্য পর্য্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বল্‌লে, "দেখো উর্ম্মি, মনটাকে পথে চল্‌তে চল্‌তে কেবলি চল্‌কিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কি?"

বলত "তুমি প্রজাপতির মতো, চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আনো না। হতে হবে মৌমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।"

নীরদ সম্প্রতি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেচে, তাতে এই রকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেন না, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। উর্ম্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়, নিজেকে কেবলি লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের; কী আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকল প্রকার আমোদ আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। উর্ম্মির টেবিলে গল্প কিম্বা হাল্কা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনি সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেল বেলায় উর্ম্মির তদারক করতে এসে শুন্‌লে সে গেছে ইংরাজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেতো না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীরসুরে ইংরেজী ভাষায় বলেছিল, "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েচ তুমি। এরি মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেচ?"

শুনে উর্ম্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, "এ মানুষটার কি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি! শোক-স্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আস্‌চে—আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে!" সতর্ক হতে লাগল, কাপড় চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্য্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হোলো মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্ত্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজী, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী হয় তার বাহন। নীরদের সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে উর্ম্মি তার দিদির ওখানে যায়।

শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে উর্ম্মির যে আত্মীয় সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন উর্ম্মিকে বল্‌লে, "দেখ উর্ম্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে তাই কর্ত্তব্য বোধে অপ্রিয় কথা বল্‌তে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্ব্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্র গঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উর্ম্মির চরিত্র বল্‌লে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল ওরি সিন্ধুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে উর্ম্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেচে। উর্ম্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণ-শোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মত নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেচে, বিজ্ঞান তপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা উর্ম্মির একরকম করে সয়ে আসচে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্ব্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন? এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে,—এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য্য পূর্ণ বিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্ত্তব্য নির্জ্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয় যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেচে, যেন দেরী নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনি ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বল্‌তে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব্ব করে। বলে সেন্টিমেন্টালি করা আমার কর্ম্ম নয়। উর্ম্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে এ'কেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্ব্বল মনকে তখন নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্ত্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল, কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছা দুর্ব্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেচে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, "দেখো উর্ম্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেবো তা এই সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশী মূল্যবান।"

উর্ম্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না?

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্নের আলো ধূসর হয়ে আসে। সহরের উঁচু নীচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে

জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানারঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্ত-সীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জ্জের শিখরের ঊর্দ্ধে; অনতিস্ফুট আলোতে সহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস! হঠাৎ মনটা ক্ষেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বল্‌তে, আমি কিচ্ছু মানিনে!

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ব্বেই বলে রেখেছিলুম, আমি সম্মাননা চাইনে, আমাকে যেন একটি নিভৃত জায়গায় যথাসম্ভব শান্তিতে রাখা হয়। উপর থেকে সেইরকম হুকুম এসেছে। তাই এসেছি একটি বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়ি বললে একে খাটো করা হয়। এ একটি মস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। যিনি গবর্ণর তিনি ধীর সুগম্ভীর, শান্ত তাঁর সৌজন্য, এঁর মধ্যে প্রাচ্য প্রকৃতির মিতভাষী অচঞ্চল আভিজাত্য।

শুনতে পাই এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমাদের দেশের সেকেলে কোনো কোনো ডাকাতে জমীদারদের মতো ছিলেন। একদা এখানে সশস্ত্রে সসৈন্যে অনেক দৌরাত্ম্য করেছেন। এখন অস্ত্র সৈন্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তেহেরানে রাখা হয়েছে, কারাবন্দীরূপে নয়, নজরবন্দীরূপে। তাঁর ছেলেদের য়ুরোপে শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির সঙ্গে কিছু প্রভেদ দেখ্‌চি। মোহ্‌মেরার শেখ, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করাতে রাজা সৈন্য নিয়ে তাকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তখন শেখ সন্ধির প্রার্থনা করতেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো। এখন তিনি তেহেরানে বাসা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি নজর রাখা হয়েছে কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁস বা হাতে শিকল চড়েনি।



ইস্পাহানের বিখ্যাত ময়দান-ই-শাহ্‌

অপরাহ্ণে যখন সহরে প্রবেশ করেছিলুম তখন ক্লান্ত দৃষ্টি শ্রান্ত মন ভালো করে কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। আজ

সকালে নির্ম্মল আকাশ, স্নিগ্ধ রৌদ্র। দোতলায় একটি কোণের বারান্দায় বসেছি। নীচের বাগানে এল্‌ম্ পপ্‌লার উইলো গাছে বেষ্টিত ছোটো জলাশয় ও ফোয়ারা। দূরে গাছপালার মধ্যে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্চে, যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, সুচিক্কণ নীল পারসিক টালি দিয়ে তৈরী, এই সকালবেলাকার পাৎলা মেঘে ছোঁওয়া আকাশের চেয়ে ঘনতর নীল। সাম্‌নেকার কাঁকর-বিছানো রাস্তায় সৈনিক প্রহরী পায়চারি করচে।

এ পর্য্যন্ত সমস্ত পারস্যে দেখে আসচি এরা বাগানকে কী ভালোই না বাসে। এখানে চারিদিকে সবুজ রঙের দুর্ভিক্ষ, তাই চোখের ক্ষুধা মেটাবার এই আয়োজন। বাবর ভারতবর্ষে বাগানের অভাব দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মরুপ্রদেশ থেকে, বাগান তাঁদের পক্ষে শুধু কেবল বিলাসের জিনিষ ছিল না, ছিল অত্যাবশ্যক। তাকে বহুসাধনায় পেতে হয়েচে বলে এত ভালোবাসা। বাংলা দেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার স্বাড়িতে রঙের সাধনা করেনা, চারিদিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই কাঁথায় রঙ ফলে ওঠেনি, লতাপাতার রঙিন ছাপ-ওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রং লাগায় মাড়োয়ারি, বাঙালী লাগায় না।

আজ সকালবেলায় স্নান করবার অবকাশ রইল না। একে একে এখানকার ম্যুনিসিপালিটি, মিলিটারি বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বণিকসভা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন।

বেলা তিনটের পর সহর পরিক্রমণে বেরলুম। ইস্পাহানের একটি বিশেষত্ব আছে সে আমার চোখে সুন্দর লাগ্‌ল। মানুষের বাসা প্রকৃতিকে একঘরে' করে রাখেনি, গাছের প্রতি তার ঘনিষ্ঠ আনন্দ সহরের সর্ব্বত্রই প্রকাশমান। সারি বাঁধা গাছের তলা দিয়ে দিয়ে জলের ধারা চলেচে, সে যেন মানুষেরই দরদের প্রবাহ। গাছপালার সঙ্গে নিবিড় মিলনে নগরটিকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ বলে চোখে ঠেকে। সাধারণত উড়ো জাহাজে চড়ে সহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্ম্মরোগ।



ইস্পাহান—আলি কাপি
(এই গৃহের কক্ষে কক্ষে বিখ্যাত প্রাচীন চিত্র ফ্রেস্কো করা আছে)

মানুষের নিজের হাতের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে এই সহরের মাঝখানে, একটি বৃহৎ ময়দান ঘিরে। এর নাম ময়দান-ই-শা, অর্থাৎ বাদশাহের ময়দান। এখানে এককালে বাদশাহের পোলো খেলবার জায়গা ছিল। এই চত্বরের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মস্‌জিদ্-ই-শা। প্রথম শা আব্বাসের আমলে এর নির্ম্মাণ আরম্ভ, আর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শা আব্বাসের সময়ে তার সমাপ্তি। এখন এখানে ভজনার কাজ হয় না। বর্ত্তমান বাদশাহের আমলে বহু-কালের ধুলো ধুয়ে একে সাফ করা হচ্চে। এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সমত্ন-সুন্দর, এর কারুকার্য্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্ত্তী

আর একটি মসজিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগ-এ প্রবেশ করলুম। একদিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় এ সুমগান, যেন স্তবমন্ত্র, আর একদিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণ-সঙ্গতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিবাক্য। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণ, সেখানে প্রাচীন চেনার গাছ এবং তুঁত, দক্ষিণধারে অত্যুচ্চ গুম্বজওয়ালা সুপ্রশস্ত ভজনাগৃহ। যে টালিতে ভিত্তি মণ্ডিত তার কোথাও কোথাও চিক্কণ পাংলা বর্ণপ্রলেপ ক্ষয়-প্রাপ্ত, কোথাও বা পরবর্ত্তীকালে টালি বদল করতে হয়েচে, কিন্তু নূতন যোজনাটা খাপ খায় নি। আগেকার কালের সেই আশ্চর্য্য নীল রঙের প্রলেপ একালে অসম্ভব। এই ভজনা-



আলি কাপির অভ্যন্তরে সঙ্গীত-প্রকোষ্ঠের দৃশ্য

লয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্চে এর সুনির্ম্মল সমুদার গাম্ভীর্য্য। অনাদর অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন কোথাও নেই। সর্ব্বত্র একটি সসম্ভ্রম সম্মান যথার্থ শুচিতা রক্ষা করে বিরাজ করচে।

এই মসজিদের প্রাঙ্গণে যাদের দেখ্‌লেম, তাদের মোল্লার বেশ। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, হয় তো মনে মনে প্রসন্ন হয় নি। শুনলুম আর দশবছর আগে এখানে আমাদের প্রবেশ সম্ভবপর হোত না। শুনে আমি যে বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ আর বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।

সহরের মাঝখান দিয়ে বালুশয্যার মধ্যে বিভক্ত-ধারা একটি নদী চলে গেছে। তার নাম জই আন্দেরু, অর্থাৎ জন্মদায়িনী। এই নদীর তলদেশে যেখানে খোঁড়া যায় সেখান থেকেই উৎস ওঠে তাই এর এই নাম—উৎসজননী। কলকাতার ধারে গঙ্গা যে রকম ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খল-জর্জ্জর, এ সে রকম নয়। গঙ্গাকে কলকাতা কিঙ্করী করেছে, সখী করেনি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য। এখানকার এই পুরবাসিনী নদী গঙ্গার তুলনায় অগভীর ও অপ্রশস্ত বটে কিন্তু এর সুস্থ সৌন্দর্য্য নগরের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে আনন্দ বহন করে।

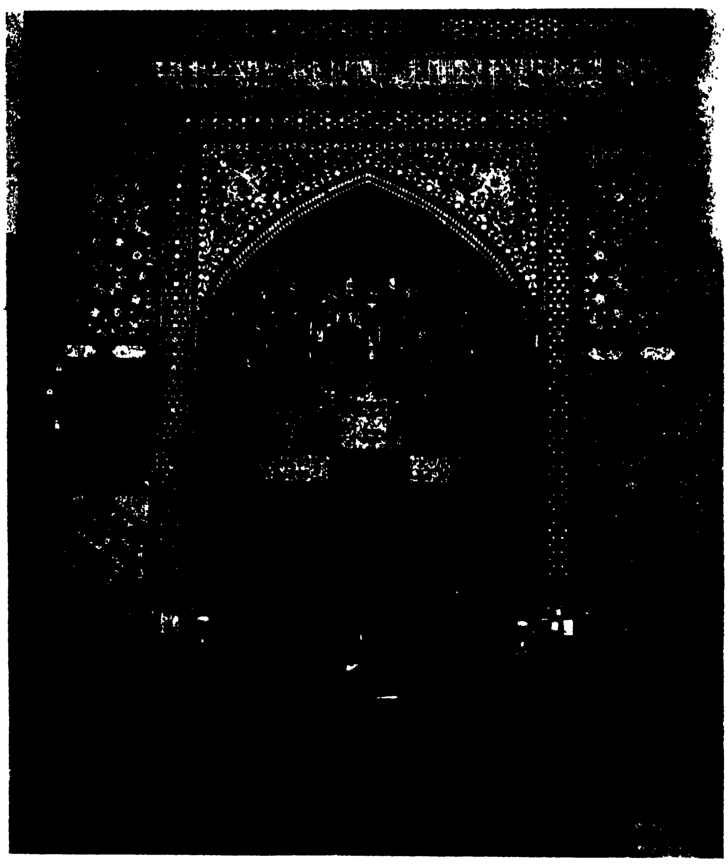
এই নদীর উপরকার একটি ব্রিজ দেখ্‌তে এলুম, তার নাম আলিবর্দ্দীখাঁর পুল। আলিবর্দ্দী শা আব্বাসের সেনাপতি, বাদশার হুকুমে এই পুল তৈরী করে-ছিলেন। পৃথিবীতে আধুনিক ও প্রাচীন অনেক ব্রিজ আছে তার মধ্যে এই কীর্ত্তিটি অসাধারণ। বহুখিলানওয়ালা তিনতলা এই পুল; শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে বলে এ তৈরি হয় নি,—অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ্য নয় এও স্বয়ং লক্ষ্য। এ সেই দিলদরিয়া যুগের রচনা যা আপনার কাজের তাড়াতেও আপন মর্য্যাদা ভুলত না।

ব্রিজ পার হয়ে গেলুম এখানকার আর্ম্মানি গির্জ্জায়। গির্জ্জার বাহিরে ও অঙ্গনে ভিড় জমেছে।

ভিতরে গেলেম। প্রাচীন গির্জ্জা। উপাসনা ঘরের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত অলঙ্কৃত। দেয়ালের নীচের দিকটায় সুন্দর পারসিক টালির কাজ, বাকি অংশটায় বাইবল্-বর্ণিত পৌরাণিক ছবি আঁকা। জনশ্রুতি এই যে, কোনো ইটালিয়ন চিত্রকর ভ্রমণ করতে এসে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

তিন শো বছর হয়ে গেল শা আব্বাস রুশিয়া থেকে বহু সহস্র আর্ম্মানি আনিয়ে ইস্পাহানে বাস করান। তারা কারিগর ছিল ভালো। তখনকার দেশবিজয়ী রাজারা শিল্প-দ্রব্যের সঙ্গে শিল্পীদেরও লুঠ করতে ছাড়তেন না। শা আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ হোলো। অবশেষে নাদির শাহের আমলে উপদ্রব এত অসহ্য হয়ে উঠল যে টিঁকতে পারলে না। সেই সময়েই আর্ম্মানীরা প্রথম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। বর্ত্তমান বাদশাহের আমলে তাদের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু সেকালে কারুনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাদের যে খ্যাতি ছিল এখন তার আর কিছু বাকি আছে বলে বোধ হল না।

বাজারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। আজ কি একটা পরবে দোকানের দরজা সব বন্ধ। এখানকার সুদীর্ঘ চিনার বীথিকায় গিয়ে পড়লুম। বাদশাহের আমলে এই রাস্তার মাঝখান দিয়ে টালি-বাঁধানো নালায় জল বইত, মাঝে মাঝে খেলত ফোয়ারা, আর ছিল ফুলের কেয়ারি। দরকারের জিনিষকে করেছিল আদরের জিনিষ, পথেরও ছিল আমন্ত্রণ, আতিথ্য।



ইস্পাহান—মসজিদ-ই-শার্ অভ্যন্তর

ইস্পাহানের ময়দানের চারিদিকে যে সব অত্যাশ্চর্য্য মসজিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরচে। এই রচনা যে-যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয় মানুষের মনের পরিমাপে। তখন এক একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি। ভূতল সৃষ্টির আদিকালে ভূমিকম্পের বেগে যেমন বড়ো পাহাড় উঠে পড়েছিল তেমনি। এই পাহাড়কে সংস্কৃত ভাষায় বলে ভূধর, অর্থাৎ সমস্ত ভূমিকে এই এক একটা উচ্চচূড়া দৃঢ় করে ধারণ করে এই রকম বিশ্বাস। তেমনি মানব সমাজের আদিকালে এক একজন গণপতি সমস্ত মানুষের বল আপনার মধ্যে সংহত করে জনসাধারণকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করেচেন। তাতে সর্ব্ব-সাধারণ আপনার সার্থকতা দেখে আনন্দ পেত। তাঁরা একলাই যেমন সর্ব্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেমনি তাঁদেরই মধ্যে সর্ব্বজনের গৌরব, বহু-জনের কাছে বহু কালের কাছে তাঁদের জবাবদিহী। তাঁদের কীর্ত্তিতে কোনো অংশে দারিদ্র্য থাকলে সেই অমর্য্যাদা বহুলোকের বহুকালের। এই জন্যে তখনকার মহৎ ব্যক্তির কীর্ত্তিতে দুঃসাধ্য সাধন হয়েছে। সেই কীর্ত্তি একদিকে যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যে বড়ো তেমনি সর্ব্বজনীনতায়। মানুষ আপন প্রকাশে বৃহতের যে কল্পনা করতে ভালোবাসে তাকে আকার দেওয়া সাধারণ লোকের

সাধ্যের মধ্যে নয়। এইজন্য তাকে উপযুক্ত আকারে প্রকাশ দেবার ভার ছিল নরোত্তমের, নরপতির। রাজা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে, কিন্তু বস্তুত সে প্রাসাদ সমস্ত প্রজার—রাজার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রজা সেই প্রাসাদের অধিকারী। এই জন্যে রাজাকে অবলম্বন করে প্রাচীন-কালে মহাকায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। পার্সিপোলিসে দরিয়ুস রাজার রাজগৃহে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেটা দেখে মনে হয় কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারের পক্ষে সে নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুত একটা বৃহৎ যুগ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল—সে যুগে সমস্ত মানুষ এক একটি মানুষে অভিব্যক্ত।

পার্সিপোলিসের যে কীর্ত্তি আজ ভেঙে পড়েছে তাতে প্রকাশ পায় সেই যুগ গেছে ভেঙে। এ রকম কীর্ত্তির আর পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব। যে প্রান্তরে আজকের যুগ চাষ করচে, পশু চরাচ্চে, যে পথ দিয়ে আজকের যুগ তার পণ্য বহন করে চলেচে, সেই প্রান্তরের ধারে সেই পথের প্রান্তে এই অতিকায় স্তম্ভগুলো আপন সার্থকতা হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

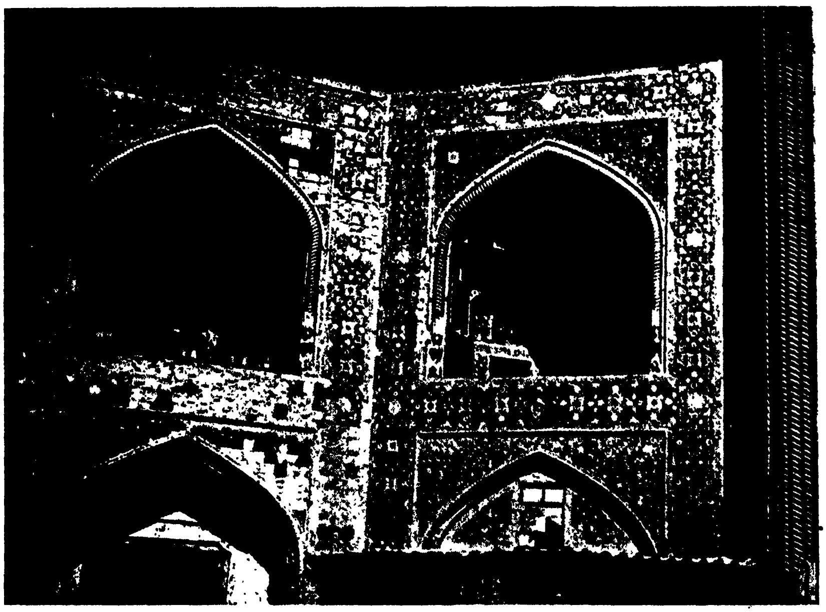

ইস্পাহানের মসজিদ্‌-ই-শার অঙ্গনে
রবীন্দ্রনাথ ও বোম্বাইয়ের পারসিক কন্‌সাল শ্রীকেইহান

তবু মনে হয় দৈবাৎ যদি না ভেঙে যেত, তবু আজকেকার সংসারের মাঝখানে থাকতে পেত না, যেমন আছে অজন্তার গুহা, আছে তবু নেই। ঐ ভাঙা থামগুলো সেকালের একটা সঙ্কেতমাত্র নিয়ে আছে ব্যতিব্যস্ত বর্ত্তমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে—সেই সঙ্কেতের সমস্ত সুমহৎ তাৎপর্য্য অতীতের দিকে। নীচের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ইতরের মতো গর্জ্জন করে চলেছে মোটর রথ। তাকেও অবজ্ঞা করা যায় না তার মধ্যেও মানব-মহিমা আছে—কিন্তু এরা দুই পৃথক্ জাত—সগোত্র নয়। একটাতে আছে সর্ব্বজনের সুযোগ, আর একটাতে আছে সর্ব্বজনের আত্মশ্লাঘা। এই শ্লাঘার প্রকাশে আমরা দেখ্‌তে পেলুম সেই অতীতকালে মানুষ কেমন করে প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এক একটি বিরাট আকারে আপনাকে দেখতে চেয়েচে। প্রয়োজনের পরিমাপে সে আকারের মূল্য নয়, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিকেই বলে ঐশ্বর্য্য—সেই ঐশ্বর্য্যকে তার অসামান্যরূপে মানুষ দেখতে পায় না যদি কোনো প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপন শক্তিকে উৎসৃষ্ট করে এই ঐশ্বর্য্যকে ব্যক্ত করা না হয়। নিজের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিদিন খরচ হয়ে যায়, সেই দিনযাত্রা প্রয়োজনের অতীত মাহাত্ম্যকে বাধতে পারে না। সেই ঐশ্বর্য্য যুগ, যে ঐশ্বর্য্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত এখন চলে গেছে। তার সাজসজ্জা সমারোহ-ভার এখনকার কাল বহন করতে অস্বীকার করে। অতএব সেই যুগের কীর্ত্তি এখনকার চলতি কালকে যদি চেপে বসে তবে এইকালের অভিব্যক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মানুষের প্রতিভা নবনবোন্মেষে, কোনো একটামাত্র আবির্ভাবকেই দীর্ঘায়িত করার দ্বারা নয়, সে আবির্ভাব যতই সুন্দর যতই মহৎ হোক। মাদুরার মন্দির ইস্পাহানের মসজিদ প্রাচীন কালের অস্তিত্বের দলিল—এখনকার কালকে যদি সে দখল করে তবে তাকে জবরদখল বলব। তারা

যে সজীব নয় তার প্রমাণ এই যে আপন ধারাকে আর তারা চালনা করতে পারচে না। বাইরে থেকে তাদের হয় তো নকল করা যেতে পারে কিন্তু নিজের ভিতরে তাদের নূতন সৃষ্টির আবেগ ফুরিয়ে গেছে।

এদের কৈফিয়ৎ এই যে, এরা যে-ধর্ম্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে সমস্ত ইঁট কাঠ নিয়ে সেই সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্যকালের অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্ত্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়চে—অথচ চিরকালের মতো বাঁধা মতের ধর্ম্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা ভয়ের দ্বারা লোভের দ্বারা মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে রেখে দেবে এ আর চল্‌বে না। এই



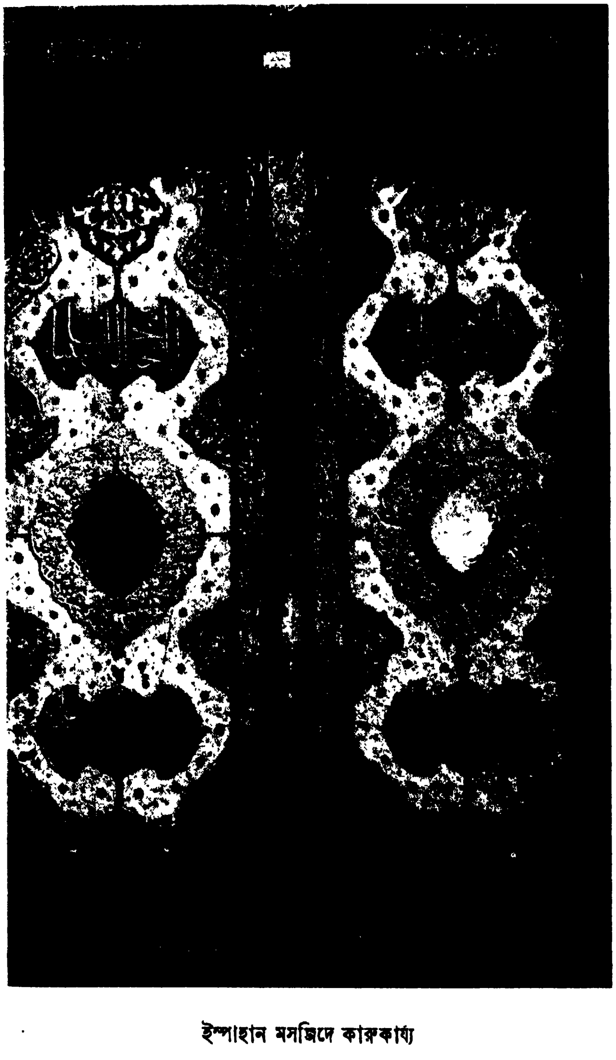
ইস্পাহানের মস্‌জিদ

আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এককালের ইতিহাসকে অন্যকালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম জিনিষটাই সাবেককালের জিনিষ। পুরাকালের কোনো একটা বাঁধামত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে এই হচ্চে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিত-শক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেচে। উভয়েই জনসাধারণের আত্মশাসন ভার চিন্তার ভার পূজার ভার তাদের স্বাধীন শক্তির থেকে হরণ করে কারণে এই রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যা কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে, বয়স উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মত অপদার্থ হয়ে থাকবে।

প্রাচীন কীর্ত্তি টিঁকে থাকবে না এমন কথা বলিনে। থাক্ কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহনরূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যাণ্ডিনেবিয় সাগা, তাকে কাব্য বলে স্বীকার করব, ধর্ম্মগ্রন্থ বলে ব্যবহার করব না। যেমন

আছে প্যারাডাইস্ লষ্ট্, তাকে ভোগ করবার জন্যে, মানবার জন্যে নয়। য়ুরোপে পুরাতন ক্যাথীড্রাল আছে অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যযুগীয় যে ধর্ম্মবোধ থেকে তার উদ্ভব ভিতরে ভিতরে তার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। ঘাট আছে, জল গেছে



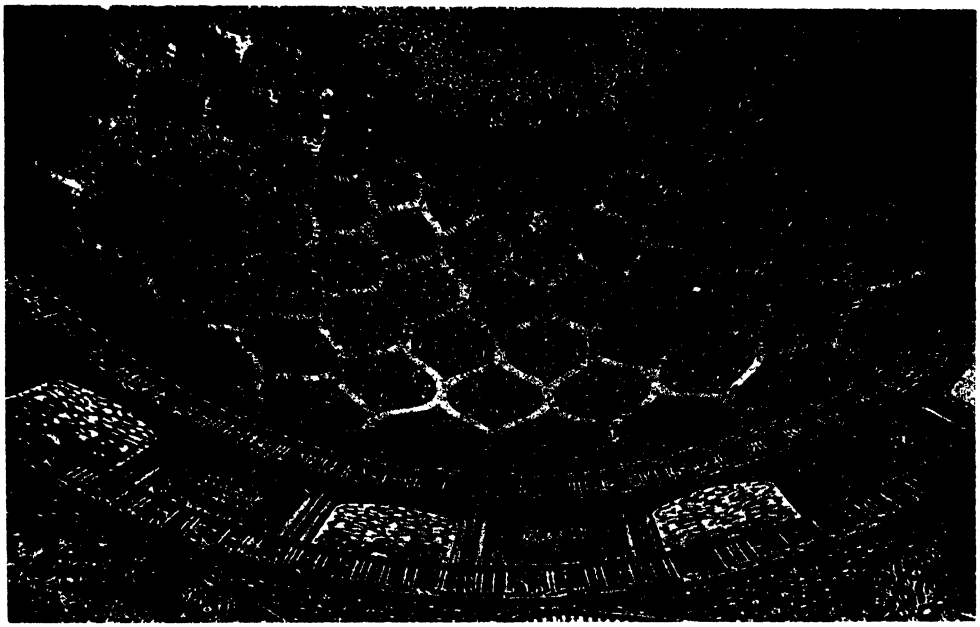
ইস্পাহান মসজিদে কারুকার্য্য

সরে। সে ঘাটে নৌকো বেঁধে রাখতে বাধা নেই কিন্তু সে নৌকোয় খেয়া চলবে না। যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্ত্তন চলচেই, মানুষের মন সেই সঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্ম্মকে শোধন করে না নেয় তাহলে ধর্ম্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এই জন্যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেচে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয় ধর্ম্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট, অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে, আর তার সর্ব্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয়।

এ সঙ্গে এ কথাও আমার মনে এসেচে যে মনুর পরামর্শ ছিল ভালো। সংসারের ধর্ম্মই হচ্চে সে সরে সরে যায়, অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে সরতে পারে না সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত—যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্ত্তি সব। যদি তারা নিজের যুগকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে তবে তাদের মূল্য আছে কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ একটা জায়গায় স্থিরত্বে ঠেকেছে বলেই তাকে দিয়ে আমরা পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছলতা কতদূর উঠ্‌ল সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমরা বুঝতে পারি—কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনি মানুষের কীর্ত্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা আমাদের অন্য কোনো কাজ না হোক আদর্শ রচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না, শক্তির মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতনকালের বৃদ্ধ যদি সেই আদর্শের কাজে লাগে তাহলে নূতনকালেও সে সার্থক। কিন্তু যদি সে নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্ত্তিত করবে বলে পণ করে বসে তবে সে আবর্জ্জনা সৃষ্টি করবে।

অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো

মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ চিন্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফুলের বা ফলের পালা যখন ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তাকে বর্জ্জন করতে চেষ্টা করে কিন্তু তবু সে যদি বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান। এই জন্যেই মনুর কথা মানি, পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। স্বাধীন শক্তিতে চিন্তা করা প্রশ্ন করা পরীক্ষা করার দ্বারাই মানুষের মনোবৃত্তি সুস্থ ও বীর্য্যবান থাকে। যারা সত্যই জরায়-পাওয়া তারা সমাজের সেই নূতন অধ্যবসায়ী



ইস্পাহান মসজিদে কারুকার্য্য

পরীক্ষাপরায়ণ প্রশ্নরত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে নষ্ট না করুক বাধা না দিক মনুর এই ছিল অভিপ্রায়। পৃথিবীতে যে-সমাজ তরুণ বৃদ্ধ বা প্রবীণ বৃদ্ধের অধিকৃত সে সমাজ পঙ্গু; বৃদ্ধের কর্ম্মশক্তি অস্বাভাবিক অতএব সে কর্ম্ম স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের মনের সক্রিয়তা স্বভাবের নিয়মে বাইরের দিক থেকে সরে এসে অন্তরের দিকে পরিণত হতে থাকে তাই তাদের নিজের সার্থকতার জন্যেও অভিভাবকের পদে ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে নিভৃতে যাওয়াই কর্ত্তব্য—তাতে ক্ষতি হবে একথা মনে করা অহঙ্কার মাত্র।

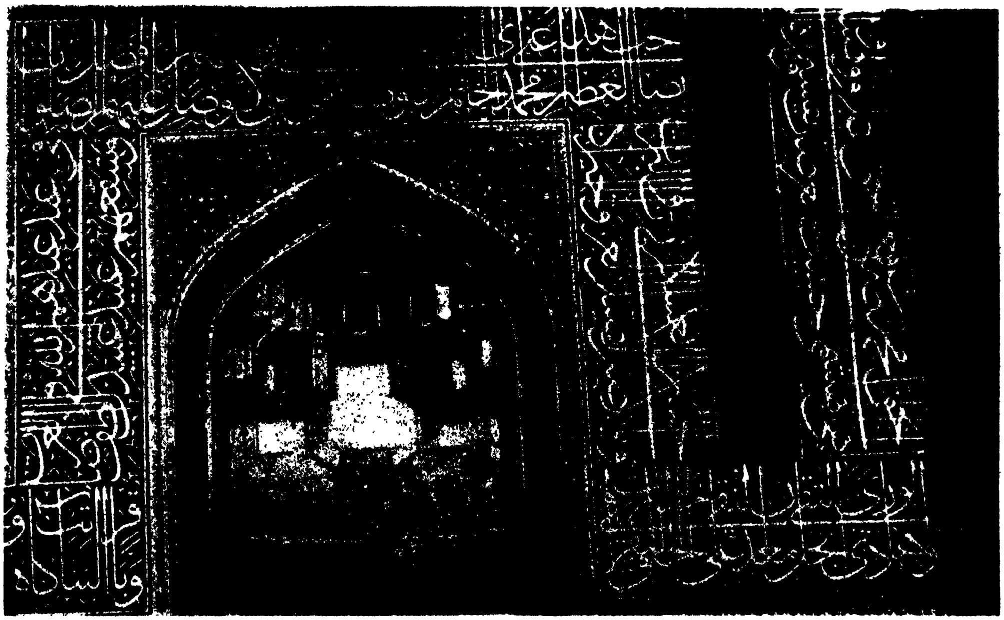
আজ ছাব্বিশে। পনেরো দিন মাত্র দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্চে যেন অনেকদিন হয়ে গেল। ভেবে দেখলুম, তার কারণ এ নয় যে, অনভ্যস্ত প্রবাসবাসের দুঃখ সময়কে চিরায়মান করেচে। আসল কথা এই যে, দেশে থাকি নিজের সঙ্গে নিতান্ত নিকটে আবদ্ধ বহু খুচ্‌রো কাজের ছোট ছোট সময় নিয়ে। এখানে অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ও নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি। ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত উর্দ্ধে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায় তেমনি নিজের সুখদুঃখের জালে বদ্ধ প্রয়োজনের স্তূপে আচ্ছন্ন সময় থেকে দূরে এলে অনেকখানি সময়কে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তখন যেন দিনকে দেখিনে যুগকে দেখি—দেখি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে নয়।

গবর্ণরের ব্যবস্থায় এ দুইদিন রাত্রির আহারের পর ঘণ্টাখানেক ধরে এখানকার সঙ্গীত শুনতে পাই। বেশ লাগে। টার বলে যে তারের যন্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মৃদুধ্বনি থেকে প্রবল ঝঙ্কার পর্য্যন্ত তার গতিবিধি। তাল দেবার যন্ত্রটাকে

বলে ডম্বক, তার বোলের আওয়াজে আমাদের বাঁয়াতবলার চেয়ে বৈচিত্র্য আছে।

ইস্পাহানে আজ আমার শেষদিন, অপরাহ্ণে পুরসভার তরফ থেকে আমার অভ্যর্থনা। যে প্রাসাদে আমার আমন্ত্রণ সে শা আব্বাসের আমলে, নাম চিহিল সতুন। সমুচ্চ পাথরের স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত এর অলিন্দ, পিছনে সভামণ্ডপ, তার পিছনে প্রশস্ত একটি ঘর, দেয়ালে বিচিত্র ছবি আঁকা। এক সময়ে কোন এক কতূৎসাহী রাজবংশীয় সুলতান মহম্মদের মাদ্রাসা ও সমাধির সম্মুখে তখন একটি প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি পড়ে ছিল। কোনো একজন সুলতান ভারতবর্ষ থেকে এটি এনেছিলেন। তার ওজন ছিল প্রায় হাজার মণ।

দশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শা আব্বাস আর্দাবিল থেকে তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাফাবি বংশীয় এই শা আব্বাস পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি।



ইস্পাহান মস্‌জিদে কারুকার্য্য

শাসনকর্ত্তা চুনকাম করে সমস্তটা ঢেকে দিয়েছিলেন। হাল আমলে ছবিগুলিকে আবার প্রকাশ করা হচ্চে।

এখানকার কাজ শেষ হল।

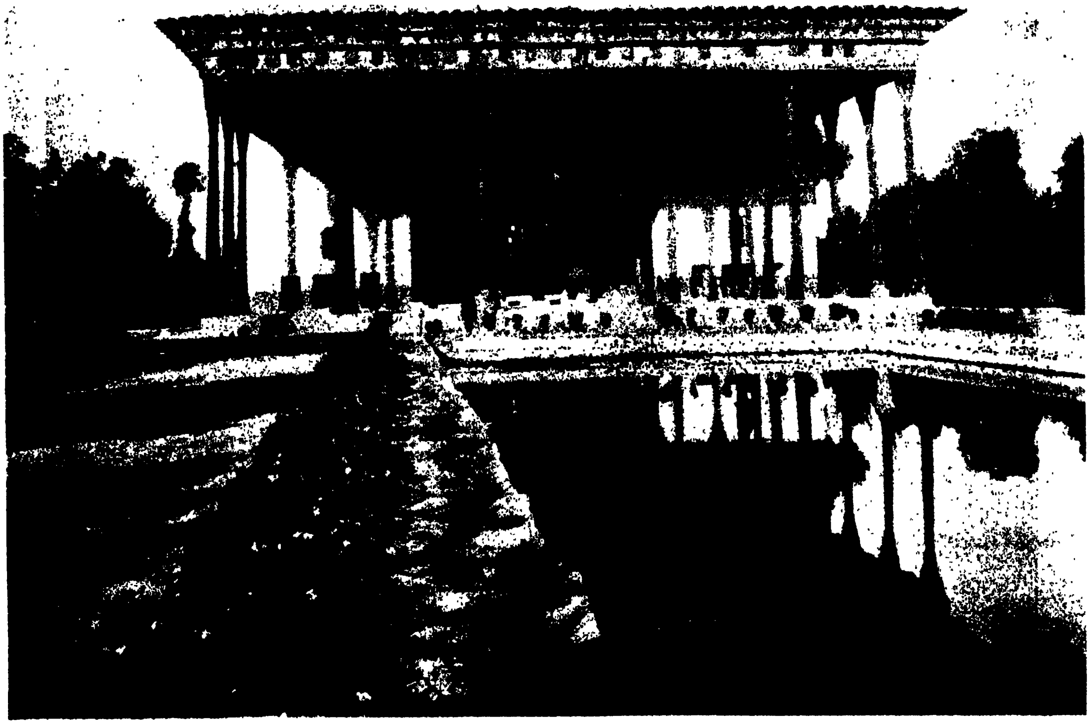
দৈবাৎ এক একটি সহর দেখতে পাওয়া যায় যার স্বরূপটি সুস্পষ্ট, প্রতি মুহূর্ত্তে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইস্পাহান সেই রকম সহর। এটি পারস্য দেশের একটি পীঠস্থান। এর মধ্যে বহুযুগের, শুধু শক্তি নয়, প্রেম সজীব হয়ে আছে।

ইস্পাহান পারস্যের একটি অতি প্রাচীন সহর। একজন প্রাচীন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় সেলজুক

তিনি যখন সিংহাসনে উঠলেন তখন তাঁর বয়স ষোলো, যাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। যুদ্ধ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ। সমস্ত পারস্যকে একীকরণ এঁর মহৎকীর্ত্তি। ন্যায়বিচারে, দাক্ষিণ্যে, ঐশ্বর্য্যে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর ঔদার্য্য ছিল অনেকটা দিল্লীশ্বর আকবরের মতো। তাঁরা এক সময়ের লোকও ছিলেন। তাঁর রাজত্বে পরধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন ছিল না। কেবল শাসননীতি নয়, তাঁর সময়ে পারস্যে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্ব্বোচ্চসীমায় উঠেছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মহিমার অবসান। অবশেষে একদা তাঁর শেষ বংশধর শা সুলতান হোসেন পারস্যবিজয়ী সুলতান মামুদের আসনতলে প্রণতি করে বললেন, "পুত্র, যেহেতু জগদীশ্বর আমার রাজত্ব আর ইচ্ছা করেন না অতএব আমার সাম্রাজ্য এই তোমার হাতে সমর্পণ করি।"

লুটের মাল ও ময়ূরতক্ত সিংহাসন। শেষ বয়সে তাঁর মেজাজ গেল বিগ্‌ড়ে, আপন বড়ো ছেলের চোখ উপড়িয়ে ফেল্‌লেন। মাথায় খুন চড়ল। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে প্রাণ দিলেন তাঁর কোনো এক অনুচরের ছুরির ঘায়ে; শেষ হয়ে গেল বিজয়ী রাজমহিমা অখ্যাত মৃত্যুশয্যায়।



ইস্পাহান—চিহিল সতুন

(এইখানে ইস্পাহান মিউনিসিপ্যালিটি হইতে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল।)

এর পরে আফগান রাজত্ব। শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে হত্যা ও গুপ্তহত্যা এগিয়ে চলল। চারিদিকে লুঠপাট ভাঙাচোরা। অত্যাচারে জর্জ্জরিত হোলো ইস্পাহান।

অবশেষে এলেন নাদির শা, বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, অবশেষে একদিন ভাগ্যের চক্রান্তে আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রাখাল চড়ে বসলেন শা আব্বাসের সিংহাসনে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্য্যন্ত উড়ল। স্বরাজ্যে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন বহুকোটি টাকা দামের

তারপরে অর্দ্ধশতাব্দী ধরে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখ-ওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্ত্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়। কোথা থেকে এল খাজার বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। খুন করে লুঠ করে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করে আপন পাশবিকতার চূড়ো তুললে কর্ম্মাণ শহরে, নগরবাসীর সত্তর হাজার উৎপাটিত চোখ হিসাব করে গণে নিলে। মহম্মদখাঁর দস্যুবৃত্তির চরমকীর্ত্তি রইল খোরাসানে, সেখানে নাদির

শাহের হতভাগ্য অন্ধ পুত্র শা রুখ ছিল রাজা। হিন্দুস্থান থেকে নাদির শাহের বহুমূল্য লুঠের মাল গুপ্ত রাজকোষ থেকে উদ্গীর্ণ করে নেবার জন্যে দস্যুশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শা রুখকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। অবশেষে একদিন শা রুখের মুণ্ড ঘিরে একটা মুখোষ পরিয়ে তার মধ্যে শিষে গালিয়ে ঢেলে দিলে। এমনি করে শা রুখের প্রাণ এবং ঔরঙ্গজেবের ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্ব্বল হাতের রাজদণ্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে।

এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা। পারস্যের জীর্ণ জর্জ্জর রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বত্র আজ উজ্জ্বল নবীন হয়ে উঠ্‌চে। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্পাহানকে দেখচি তার উপর থেকে অনেকদিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে।



ইস্পাহানে ব্রাসিয়ের কার্পেট প্রভৃতির কারখানায় রবীন্দ্রনাথের পথসঙ্গীগণ
উপবিষ্ট—বামে সব শেষে মিস্ ইরাণী ; মধ্যে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর পার্শ্বে মিসেস্ ইরাণী
দণ্ডায়মান—মধ্য সারি, বাম হইতে দ্বিতীয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় মিষ্টার ইরাণী, পঞ্চম শ্রীমাসানি,
ষষ্ঠ ডাক্তার মেহেরম্ জি, কেদারবাবুর উপরে শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চুনি তার হস্তগত হোলো। তারপরে এসিয়ায় ক্রমে এসে পড়ল য়ুরোপের বণিকদল, ইতিহাসের আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হোলো পূর্ব্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠ্‌ছিল তখন ঐ খাজার বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীর ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে দেখা যায় এতকালের দুর্য্যোগে ইস্পাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে, পারস্য বারবার দলিত হয়েছে তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃ পুনঃ নিজেকে প্রকাশ

করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ একেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েচে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয় কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকত তাহলে য়ুরোপের আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হতে দেরি হত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না, অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে পারস্য এক।

পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। একেমেনীয় যুগে পারস্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য উদ্ভাবিত হোলো তার মধ্যে এসীরিয়, ব্যাবিলোনীয়, ইজিপ্‌টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন কি তখনকার প্রাসাদনির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুল সাম্রাজ্যভুক্ত নানাদেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাববিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের দ্বারা। রজার ফ্রাই এ সম্বন্ধে যে কথা বলেচেন এখানে উদ্ধৃত করি—

This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art. * * * We tend, perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an ort ; we admire in it the expression of an independent and self-contained people, forgetting that originality may arise from a want of flexibility in the artist's make-up as well as from a new imaginative outlook.

নানা প্রভাব চারিদিক থেকে আসে, জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত করে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েচে।

পারস্যের ইতিহাস ক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটল। একথা মনে রাখা দরকার যে বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম দীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করে নি। আরব শাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয়নি। পারস্যে ইসলাম ধর্ম্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর পূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্ম্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্ম্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্ত্তন করাতে রেখালঙ্কার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তারপরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেই সঙ্গে তাদের বহুতর কীর্ত্তি লণ্ডভণ্ড করে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই সকল কীর্ত্তিনাশার দল প্রথমে যতই উৎপাত করুক ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয়, সাসানীয়, আরবীয়, সেলজুক, মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্ব্বে পর্ব্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে, তবু লুপ্ত হয়নি, এ রকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর কোনো দেশে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হার

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে
"আমার সঙ্গে লড়াই করে
কক্‌খনো কি পারো,
বারে বারেই হারো।"
আমি বললেম, "মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়"
এই বলে সে যেমনি টানলে হাত,
দাদামশায় তখখনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে
চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাৎ।

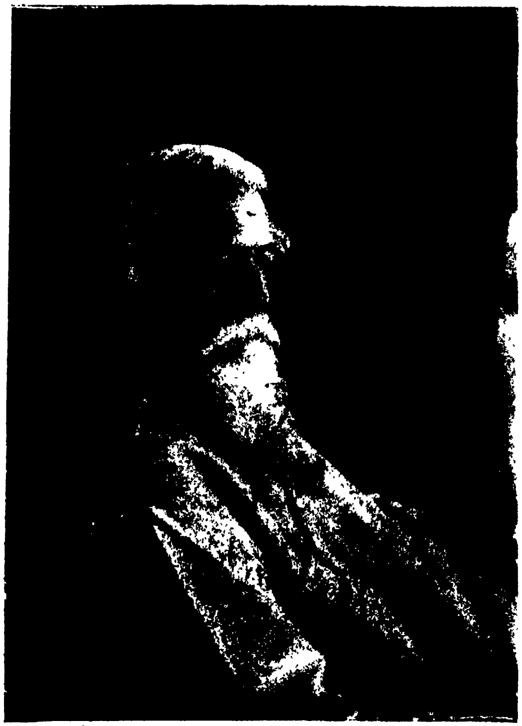
বারে বারে শুধোয় আমায় —
"বলো, তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি বললেম, "বলতে হবে তা কি?
ধুলোয় যখন নিলেম শরণ
প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি?
এই কথা কি জানো,
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মানো
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত
তোমার হোলো জিৎ !!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণা ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গভীর উদ্বেগের মধ্যে মনে আশা নিয়ে পুণা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘপথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো ষ্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন—উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলচে মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁছেচে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘকালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেচে। Apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখচি দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেওয়া বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেচেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্ব্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেচেন, এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করচে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না, কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উর্ম্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়ীতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্ব্বে এসে পৌঁছেচেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটর-গাড়ীতে চড়ে পুণার পথে চললেম।

পুণার পার্ব্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেচে—অনেকগুলি armoured car, machine gun এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ী থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলাম গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

বিলাত হতে তখনও খবর আসেনি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিলনা পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেচে। কিন্তু জনরব সত্য কিনা তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহুঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ী আটকা পড়ল—ইংরেজ সৈনিক বললে কোন গাড়ী এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ীর চতুর্দ্দিকে নানালোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত—জেল প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয় পুলিশ কোথাও আমাদের গাড়ী আটকেচে, যদিও তার কোন সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উচু দেওয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা লাইন করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিষের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেচে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌছন গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে দরজা পেরিয়ে দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম।

দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোট আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন—অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেচি এজন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা।

বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে—রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেচে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্ত্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণসঙ্কট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নাই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্ম্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই দশটার সময় খবর পুণায় এসেছিল।

চতুর্দ্দিকে বন্ধুরা রয়েচেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলাম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতঃই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠেচে তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্চে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌছেচে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত প্রায়োপবেশনের পূর্ব্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েচে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেচে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবী তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোন চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটেনি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্ত্তি দেখে আশ্চর্য্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌছল মৃত্যুর বেদীতলশায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারলনা; দূরত্বের বাধা, ইটকাঠপাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা, বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হোলো।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতিদ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেচি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় ক'রে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে ক'রে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করচি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্ণের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েচে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দুচারজন শুভ্র খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্তভাবে আলোচনা করচেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে—জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেচেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্য্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায় ভারতের স্বরাজ্য সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাক্‌লেন। শুনলাম তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার, তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা একপাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখান পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্র-বুদ্ধির রচনা, সাবধানে লিখিত সাবধানেই পড়তে হয়, বুঝলেম মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদযাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দ্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector General of Prisons—যিনি গবর্ণমেণ্টের পত্র নিয়ে এসেচেন—অনুরোধ করলেন রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাই নিজের হাতে। মহাদেব বললেন—"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো"—এই গীতাঞ্জলীর গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হলো। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাইয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে "বৈষ্ণব জন কো" গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল—সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্ত্তি একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে, মালব্যজীও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজীকেই সভাপতি করে, আমি সামান্য দুচার কথা লিখে পড়ব এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্ব্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজি মন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হোলো, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজী উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায়, যে অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দুচারটি কথা

বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজীর পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্ণের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্টকণ্ঠে পড়ে গেলেন এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্ব্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজ-গোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরে ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল সকলের মনে আজকের বাণী পৌচেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এমন দুরূহ সঙ্কল্পে এত সহস্রলোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হোলো। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল নানাবিষয়ে আলোচনা হোলো। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেচেন, কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসচেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইচেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসচে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলচে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্ব্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র।

মুক্তি-সাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়, রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে সেই দিন আজ সমাগত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১

পরদিন আমারই অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না, কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেলনা, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলেনা, কিন্তু রান্না-ঘরের দাসী লালুর-মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিস-পত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়ীতে রওনা হইয়া গেছে, সেখানকার ষ্টেসনে নামিয়া সে খানদুই ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোট-ঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বস-বাস করতে চল্‌লে নাকি ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু-একদিন থাক্‌বোনা ? দেশের বন-জঙ্গল, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই ? আমার দেখ্‌তে সাধ যায়না ?

—তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিস-পত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধু হাতে যেতে বলো ? আর তোমাকে তো বইতে হবেনা, তোমার ভাবনা কিসের ?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে ? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে কিন্তু মুখে তুলিবেনা। কি জানি, সেখানে গিয়া কোন-একটা ছলে উপবাস সুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্রমন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে পারেনা। যদিবা এসব কিছু করে, হাসি-মুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবেনা।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থার বাহুল্য তার কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটিকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজ-সজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার-ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার সযত্ন-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে, পরণে তেম্‌নি নানা ফুলে-ফলে-লতায়-পাতায় চিত্রিত খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ী, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের পরে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা,—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা দুই লম্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আসিয়াছে, আজ যাবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ দুটা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্না-বসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি-যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল বাড়ীতে

সে জামা অথবা সেমিজ পরিতনা। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানিই হয়ত অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অতো পারিনে বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে দিনরাত বিবিয়ানা আমার সয়না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশি বাঁধাবাঁধি শুচি-বায়ুগ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর। আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছো? এবার বারে বারে কি আমাকে এতো দেখো বলোত? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম, বিধাতাকে ফরমাস দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার? আমার পাঁচ-ছ বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিলে,—মনে নেই বুঝি?

—না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—চালান দেবার সময় কানে-কানে তিনিই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হলো চা খাওয়া? দেরি করলে যে আজও যাওয়া হবেনা।

—না-ই বা হলো।

—কেন বলোত?

—সেখানে ভিড়ের মধ্যে হয়ত তোমাকে খুঁজে পাবোনা।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমিই তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সে-ও তো ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না, সে হবেনা। লক্ষ্মীটি, চলো। শুনেচি, নতুন-গোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙে রেখে দেবো। ভয় নেই, খুঁজতে হবেনা,—দাসীকে এম্‌নিই পাবে।

—তবে, চলো।

আমরা মঠে গিয়ে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্নকালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুসি হইল বলিতে পারিনা। বড়-গোঁসাই আশ্রমে নাই গুরুদেবকে দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমল-লতা, পদ্মা, লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া আমাদের মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল, কমল-লতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুন-গোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল যেন কত কালের চেনা। বলিল, কমল-লতা দিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন কেবল আমার জন্যেই ঘটে ওঠেনি। ওটা আমারি দোষে।

কমল-লতার মুখ ক্ষণকালের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশ-ভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তাহা সবাই বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায়না, বলিল, কমল-লতা দিদি, আমাকে চিনতে পারচোনা?

কমল-লতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

—বৃন্দাবনে দেখোনি কখনো?

কমল-লতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে তো পড়চেনা ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এ দেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের ধারেও যাইনি, বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দুজনে এক গাঁয়ে এক গুরু-মশায়ের পাঠশালায় পড়তুম,—দুটিতে যেন ভাই-বোন এম্‌নি ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাক্‌তুম,—বোনের মতো আমাকে কি ভালোই বাস্‌তেন। পায়ে কখনো হাতটি পর্য্যন্ত দেননি।

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, যা' বল্‌চি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুসি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক এক রকম দেখ্‌তে। দুজনেই লম্বা ছিপ্‌ছিপে—শুধু তুমি ফর্সা আর নতুন-গোঁসাই কালো। তোমাদের দেখ্‌লেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, যাবেই তো ভাই। আমাদের ঠিক একরকম না হয়ে কি কোন উপায় আছে, পদ্মা?

—ওমা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখ্‌চি। নতুন-গোঁসাই বলেছে বুঝি?

—বলেছে বলেই তো তোমাদের দেখ্‌তে এলুম। বল্লুম, সেখানে একলা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে তো আমার ভয় নেই,—একসঙ্গে দেখ্‌লে কেউ কলঙ্কও রটাবেনা। আর, রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠর গলাতেই বিষ লেগে থাক্‌বে উদরস্থ হবেনা।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলামনা, মেয়েদের এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাসা কোরচ বলোত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মতো বলিল, সত্যি তামাসাটা কি তুমিই না হয় বলে দাও? যা' জানি সরল মনে বল্‌চি তোমার রাগ কেন?

তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম,—সরল মনে বল্‌চি! কমল-লতা, এত বড় শয়তান, ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবেনা। এর কি একটা মৎলব আছে, কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস করোনা।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে করো গোঁসাই? তাহলে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার মনেই কোন মৎলব আছে।

—আছেই তো।

—কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

—হাঁ, যুধিষ্ঠির!

কমল-লতাও হাসিল কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গীতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিলনা, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ, সেদিনও আমি তো কোন রমণীর সম্বন্ধেই নিজের কোন আভাস দিই নাই। আর দিবই বা কি করিয়া? দিবার সেদিন ছিলই বা কি!

কমল-লতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, তোমার নামটি কি?

—আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুন গোঁসাই বলিয়া ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল,—আমি বুঝেচি।

কমল-লতা তাহাকে ধমক্ দিল,—পোড়ামুখীর ভারি বুদ্ধি। কি বুঝেচিস্ বল্‌তো?

—নিশ্চয় বুঝেচি। বল্‌বো?

—বল্‌তে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায়-কথায় বেলা বাড়চে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসোনি জানি,—চলো, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাবো। তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনেমনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান। খাওয়া-ছোঁয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যর প্রশ্নই অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়,—এ তাহার স্বভাব। এ ছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সেকথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি, যে-রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়ো। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

তাহার যত-কিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ, অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ, হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অতো কষ্ট করার। এ-কালে অতো বাছতে গেলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানিনা সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভয়ঙ্কর একটা-কিছু

না ঘটিলেই সে খুসি। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কথনো বা সে নিজের দুইকান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কথনো বা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হলে? তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেলো।

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জ্জন মঠে যে কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্ব্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ-শ্রদ্ধায় বিতরণ করে, এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অবমানিত করে নাই। কিন্তু এই অপ্রীতিকর কার্য্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় তো পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমল-লতা মুখে কিছুই বলিবে না, কাহাকে বলিতেও দিবে না,—হয়ত বা শুদ্ধমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্ব্বাক অভিযোগের জবাব যে কি এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম। এম্‌নি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুন-গোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাত-মুখ ধুয়েছো?

—না।

—তবে এসো আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্চে।

—প্রসাদটা কি হলো আজ?

—আজ হলো ঠাকুরের অন্ন-ভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে তো সম্বাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল ঠাকুর-ঘরের বারান্দায়। বাবাজী-মশায়দের সঙ্গে তুমি বস্‌বে, আমরা মেয়েরা খাবো পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি নিজে।

—সে খাবে না?

—না। সে তো আমাদের মত বোষ্টম নয়,—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

—তোমার কমল-লতা দিদি রাগ করলে না?

—রাগ করবে কেন, বরঞ্চ, হাস্‌তে লাগলো। রাজলক্ষ্মী দিদিকে বল্‌লে, পরজন্মে আমরা দু-বোনে গিয়ে জন্মাবো এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাবো আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু বোনে এক পাতায় বসে খাবো। তখন কিন্তু জাত যাবে বল্‌লে মা তোমার কাণ মলে দেবে।

শুনিয়া খুসি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কথনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মী দিদিও শুনে হাসতে লাগলো, বল্‌লে, মা কেন দিদি, তখন বড়-বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে। ছোটর আস্পর্দ্ধা কিছুতে সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমল-লতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমল-লতা সে কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ, এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দুজনের ভারি একটি মিল হইয়া গেছে।

বিকালের গাড়ীতে বড়-গোঁসাই দ্বারিকা দাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জন-কয়েক বাবাজী। সর্ব্বাঙ্গের ছাপ-ছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইঁহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়া বড়-গোঁসাই খুসি হইলেন, কিন্তু পার্শ্বদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ, শুনা গেল ইঁহাদের একজন নাম-জাদা কীর্ত্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা-নদী ও সেই বন-বাদাড়। বেণু ও বেতস-কুঞ্জ চারিদিকে,—গায়ের চামড়া বাঁচানো দায়। আসন্ন সূর্য্যাস্ত-

কালে তট-প্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধকরি কচু-জাতীয় 'আঁধার-মাণিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংস-পচা গন্ধে তিষ্টিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম কবিরা ফুল এত ভালোবাসেন কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসেনা কেন! সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুর-ঘর সাজানো হইতেছে, আরতির পরে কীর্ত্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুন গোঁসাই, কেত্তন শুন্‌তে তুমি ভালোবাসো, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুন্‌লে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ, বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মতো মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্ত্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাক্‌তে পারতাম না। বুঝি না-বুঝি তবু শেষ পর্য্যন্ত বসে থাক্‌তাম। কমল-লতা, তুমি গাইবেনা আজ?

কমল-লতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার তো তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তাছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনিই ধরে আছে, এখনো সারেনি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুন্‌তেই এসেছে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমল-লতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে স্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন-মুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাবো। আমাকে বলিল, তুমি কীর্ত্তন শুনতে এত ভালোবাসো, কই, আমাকে তো সেকথা কখনো বলোনি?

উত্তর দিলাম—কেন বল্‌বো তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুর বেলাটা কাট্‌তো শুক্‌নো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাট্‌তে চাইতোনা—

রাজলক্ষ্মী চট্ করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। তারপরে নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমল-লতা দিদি, বলে এসো ত ভাই তোমাদের বড়-গোসাইজিকে আজ বাবাজী-মশায়ের কীর্ত্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাবো।

কমল-লতা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁত্-খুঁতে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা' হোক্‌গে, ভগবানের নাম তো হবে। বিগ্রহ মূর্ত্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুসি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও ততো ভাবিনে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্ব্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হলে কিন্তু বক্‌সিস্ পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সুমুখে যেন বক্‌সিস্ দিতে এসোনা। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুসি হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি!

কমল-লতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—দূর হ পোড়ামুখী,—চুপ কর্। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বস্‌বে।

—

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্ত্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলা। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণব সমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানাস্থান হইতে কীর্ত্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্ব্বপ্রকার বাদ্য-যন্ত্রই মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলা হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবিগণ—

সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাত কুলশীল অনেকগুলি বৈরাগীমূর্ত্তি। নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহরদাস ও তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলীকার একজন ছোক্‌রা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়মে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে কে-একজন সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে,—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্তশালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, অসিয়াছে বহুবিধ খাদ্য-সম্ভার, আর আসিয়াছে কে-এক নূতন-গোঁসাই,—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।

মনোহর দাসের কীর্ত্তনের ভূমিকা ও গৌর-চন্দ্রিকার মাঝামাঝি এক সময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমল-লতার কাছে বসিল। হঠাৎ, বাবাজী-মশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল, এবং মৃদঙ্গের বোল্‌টা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীলরঙের জামা। আর সবই তেম্‌নি আছে। কেবল সকালের উড়ে-পাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপ-ছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে,—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ, নীল-আকাশে কখন্ মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্ট-শান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না,—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল সে সে-ই জানে। কিম্বা আমারও ভুল হইতে পারে,—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজী-মশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলার অধীরতায়। দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না তো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহরদাসও মনে মনে কিছু বিস্ময় বোধ করিল। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান সুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই,—নিঃসংশয় কণ্ঠ অবাধ জল-স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা, কিন্তু বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত! শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর-দুর্ব্বাসা,—কাহাকে বেশি প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খালনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি এ কথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কিনা!

সে গাহিতেছিল,—

> একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর-জর ভেল,
> তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু চিরদুখ অব্‌ দূরে গেল।
> তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়লু গৃহ-সুখ আশ,
> পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলু, কহতঁহি গোবিন্দ দাস।

বড়-গোঁসাইজির চোখে ধারা বহিতেছিল, তিনি আবেগ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয় ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি-চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইলো,

বক্‌সিসের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও-মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ী ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুর-বাড়ীতে পরে ফেল্‌লে আর খুলতে পার্‌বে না—এই বুঝি ভয়?

—না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা' দান কোরতাম।

—উঃ—কি দাতা! সে তো তোমারি থাকতো গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

—কেন বলোত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে গুণে রসে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্নেহে সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী,—তোমার কাছে সত্যিই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যিই আমি রাগ করবো।

—তা কোরো। ভাবি, এ ঐশ্বর্য্য আমি রাখবো কোথায়?

—কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

—না, সে মানুষ তো চোখে দেখ্‌তে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মতো এতবড় যায়গাই বা সে-বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিলনা, হাতটা আমার টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল, তারপরে বলিল, এমন ক'রে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়,—যায়গা তো নেই?

—না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

—তা' কাটবে, কিন্তু শরীর তো ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে।

—তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি তো সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে, কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যাহোক দুটী খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক, লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিলনা। সেরাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁত্‌-খুঁত্‌ করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিলনা।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশিকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্ত্তে কমল-লতা আজ রাজলক্ষ্মীকেই সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জ্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানিনা, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারি তৃপ্তিলাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দুজনে,—তাহারা কত কালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায়না এই লইয়া কমল-লতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবোনা গোঁসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আস্‌চে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওর দুটি কান ভালো করে মলে দেবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা সত্ত্ব করিয়ে নিয়েছি গোঁসাই। যদি মরি, ওঁকে বোষ্টুম-গিরিতে ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাবো না সে খুব জানি, তখন ভূত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপবো—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মতো—কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বো।

কমল-লতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমল-লতা আসিয়া বলিল, বেশি দেরি কোরোনা গোঁসাই, আর, তাকেও সঙ্গে করে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেছি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোঙরা, তেমনি কুঁড়ে। রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাক্‌বে উপবাসী।

কমল-লতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা বলোনা গোঁসাই, সে কাণে শুনলে এখানে আর জল-গ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশঘণ্টাও কাটেনি কমল-লতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সে-ও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই চিনেছি। শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমি ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ী নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে, নবীন জানাইল সে দেশে কি-এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলে-পুলে লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সম্বাদ নাই,—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্যু চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ঘর-সংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়া বসে! চক্কোত্তি মশাইকে দিন-রাত সাধ্‌চি ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ' টাকা দেবো আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটুলে বামুন নড়লেনা। কিন্তু এ-ও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াবো, তারপর সেই আগুনে নিজে মরবো আত্মহত্যা করে। অত বড়ো নেমক-হারামকে আমি জ্যান্ত রাখবোনা।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁ থানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ এক টেরে, ইষ্টিসান থেকে অনেক দূর যেতে হয় গরুর-গাড়ীতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বল্‌তে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠি-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে সকল হইতে কোন হদিস্ মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে মাস দুই পূর্ব্বেও বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্ত্তী শ' দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই,—এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়েনা।

নবীন বলিল, বাবু মলেই ওর ভালো,—একেবারে নিঃঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে।

অসম্ভব নয়।

গেলাম দুজনে চক্রবর্ত্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী পর-দুঃখকাতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমন কি জেলার নাম পর্য্যন্ত না। বহু চেষ্টায় একটা টাইম-টেব্‌ল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত রেল-ষ্টেসন একে একে পড়িয়া গেলাম কিন্তু ষ্টেসনের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত-কি জিনিস-পত্র টাকা-কড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনেও করতে পারিনে আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি, মাথার ওপর ধর্ম্ম আছেন তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না গর্জ্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন কোরব আমি।

চক্রবর্ত্তী স্নেহার্দ্র মধুর কণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস্ কেন দাদা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে,

পারলে কি আর এটুকু করিনে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে সব আমি জানিনে, তোমাকে শেষ-বারের মতো বল্‌চি বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে তো চলো, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাবো সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্ত্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস!

অতএব, পুনরায় দুজনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্ত্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম চক্রবর্ত্তী পোড়া কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পুনরায় তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সম্বাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, বাবাজীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ, সুপ্রচুর প্রসাদ সেবার পরিশ্রমে নির্জ্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর এক দফা লড়িতে হইবে তাহার বল-সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক, পাঁজি পুথি, খড়ি, শেলেট পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাঁহার কাছে। আমার প্রতি সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুন-গোঁসাই এয়েছে।

কমল-লতা বলিল, তখনি জানি গহর-গোঁসাই তোমাকে অম্‌নি ছেড়ে দেবেন না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—থাক্ দিদি, ও আর জিজ্ঞেসা কোরোনা।

কমল-লতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধুলো-বালি উঠেচে মাথায়—স্নান টান হয়েছে তো?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁননা, হলেও তো বোঝা যাবেনা দিদি।

অবশ্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণক-ঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে আমি রাজ-রাণী হবো।

—কি দিলে?

পদ্মা বলিয়া দিল,—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মী দিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বল্‌তে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাঙলা বলিতে পারে—বাঙালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত' আমি আর দেখিনি। দেখ্‌বেন, আমার হাত-দেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুল ফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুল-ফুলই সই। আমি এর থেকেই বলে দেবো আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি পাতিয়া মিনিট দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

—কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মাম্‌লা-মকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

—খবরটা বলতে পারো ঠাকুর?

—পারি। খবর ভালো, দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম, এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুসি হইয়া বলিল, দেখ্‌লে তো? আমি

বলচি ইনি খুব ভালো গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না,—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমল-লতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুন-গোঁসাই দেখাওতো ভাই, তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার তো দেখি মস্তবড় ফাঁড়া—

—ফাঁড়া? কবে?

—খুব শীঘ্র। মরণ-বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই,—ভয়ে শাদা হইয়া গেছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

—না। আমার আর হাত দেখ্‌তে হবেনা,—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি তো দর্পণ মাত্র মা, ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে,—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে,—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

—তুমি আমাদের কলকাতার বাড়ীতে যেতে পারো?

—কেন পারবোনা মা, নিয়ে গেলেই পারি।

—আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পূরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমল-লতা বলিল, চলো গোঁসাই তোমার চা তৈরী ক'রে দিইগে,—খাবার সময় হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার যায়গাটা একটু ঠিক করে দাওগে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার যো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখ-হাত ধোয়ার জল আনিয়া দিল,—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয় বলিত, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়,—আমার।

কমল-লতা নীচে বারান্দায় বসিয়া সহরের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারি, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, ছাখো, তোমাকে একশোবার বলেচি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাত-জোড় করচি কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরী করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল। 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমল-লতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বনে-জঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন্ গেলো?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই?

আমি বলিলাম, ও দেখেনি, ওর অনুমান। গণক ব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেলো।

শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি? সে যা দেখ্‌বে তাইতো বল্‌বে? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? কারও কখনো ঘটে না নাকি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমল-লতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে, সেও চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করামাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অম্‌নি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসিনে?

বলিলাম, না।

—না কেন? না ছাড়া হাঁ বল্‌তে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ দুটো অতো রাঙা দেখাচ্চে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসোনি ত?

—না, স্নানই আজ করিনি।

—কি খেলে সেখানে ?

—খাইনি কিছুই। ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেছি ঠিক তাই। কমল-দিদি, দেখো ত এঁর গাটা,—গরম বোধ হচ্চেনা ?

কমল-লতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হলোই বা একটু গরম রাজু,—ভয় কি ?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি।

কমল-লতা কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোমরা জলে এসে তো পড়োনি ? এসেছো আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করবো ভাই,—তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্ত-কণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল, সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে এখানে ডাক্তার বদ্যি নেই, তাতে বারবার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হলে সহজে সারে না,—ভারি ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণক্কার পোড়ামুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

—দেখালেই বা।

—না, ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমল-লতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এ ক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয়নি, তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েছে,—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর-মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুন-ঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমল-লতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমল-লতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেলনা বটে কিন্তু দু'একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমল-লতা টের পাইল, এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়-গোঁসাইজি নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমল-লতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই ? নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমল-লতা হাসিমুখে কহিল, এ কি রকম কথা যে একজনের মনে রইলো আর একজনের রইলো না ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয়নি।

—কিন্তু উনিই যে বয়সে বড়ো রে রাজু ?

—ইঃ ভারি বড়ো! মোটে পাঁচ-ছ বছরের। আমার বয়েস তখন আট ন' বচ্ছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হলে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষণি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমল-লতা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি কোরে ?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচি ফলের মালা। সে যাকে দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমল-লতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে সুরু হলো আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেয়োনা দিদি,—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না,—তারা কত-কি-ই না ভাবে! তারপরে অনেক দিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালুম খুঁজে খুঁজে,—তখন ঠাকুরের দয়া হলো,—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন

কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে-হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমল-লতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়-গোঁসাই দিয়েছেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দুজনকে দুজনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও-আদেশ কোরো না। আমার ছেলেবেলার সেই রাঙা-মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখ্‌তে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সে-ই মালাই চিরদিন থাক্ দিদি।

বলিলাম,— কিন্তু সে-মালা তো খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল,—হাঁ গো রাক্ষস,—এইবার আমাকে শুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটীতে সব কয়টা আঙুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি-একটা গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই বোসো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই গোঁসাই। অনেক উপদ্রব করেছি, যাবার আগে তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরিগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারবো না ভাই। কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বলো ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমল-লতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই,—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো জ্বলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়-গোঁসাই বলিলেন, গানে আনন্দে হাসিতে কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে,—এমন আর কখনো দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমল-লতা তোমার নাম দিয়েছে নতুন-গোঁসাই, আর, আমি ওর নাম দিলাম আজ আনন্দময়ী—

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়-গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই তোমাদের চোখে লাগ্‌লো, কিন্তু তার কড়্ কড়্ ধ্বনি যাদের দিবারাত্র কর্ণরন্ধ্রে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা করো? আনন্দময়ীর সম্বন্ধে অন্ততঃ, রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনোনা গোঁসাই, ওরা দিনরাত আমার হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসবো আমি একলা আসবো। এই রোগা-পট্‌কা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসবো,—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়-গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারবো। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই যেন আমি শীগ্‌গীর মরি।

বড়-গোঁসাই বলিলেন, এ-ইচ্ছে তো বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ি, কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাবো, তারা কানু-সেবার কি বা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য-প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বইত নয়! কিন্তু তুমি জানতে পেরেছো ভাই। তাই বলি তুমি যেদিন এ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ি—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্ব্বাদ কোরো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ, আশীর্ব্বাদ করো এম্‌নি হেসে-খেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।

কমল-লতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়-গোঁসাই তোমার ভালোবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্ত ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস,—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে তো এই শরীর, তাতে একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে,—একগুঁয়ে লোক কারও কথা শুনতে চান্‌না,—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাবো কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। যাবার সময়ে কথায়-কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি, আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে-মর্ম্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি-একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতোই কেননা লোকের কাছে আমার রোগা-দেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচিনে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্‌ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিন সত্যি করো! বলো এ কথা কখনো মিথ্যে হবে না! বলিতে বলিতেই উদ্গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপ্‌চাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া রহিল। তখন, লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ পোড়ারমুখো গোণক্কারটা মিছিমিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না, এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটাদুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে-একে বিদায় লওয়া হইল। বড়-গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন। এবং, পদ্মা কখনো সহর দেখে নাই সেও সঙ্গে যাইবে।

ষ্টেসনে পৌছাইয়া সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ার-মুখো গোণক্কার' লোকটাকে। প্ল্যাটফর্মে কম্বল পাতিয়া, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশে পাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর এক দিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম, না, ও যাবে না।

—কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু তো হবে না। আসুক না সঙ্গে?

বলিলাম, না। ভালো মন্দ যাই হোক ও আসবে না। ওকে যা' দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহ শান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

—তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানিনা, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

"সাধারণ মেয়ে"

মাসিক পত্রের সম্পাদক আমি,
আমার দুঃখ বুঝবে নাক তুমি শরৎবাবু।
জয় হোক তোমার লেখা "বাসিফুলের মালা"র,
মাসে মাসে আমার এই 'নানাফুলের ডালা'
কত দুঃখে ভরাই আমি তা-কি তুমি জানো ?
কত কবির গানে গানে, কত ছবির রঙে,
কত কথা কাহিনীর বিবিধ আখ্যানে
কত কষ্টে কত শ্রমে করি যে বিচিত্র
সে দুঃখ কি বোঝো ?

পঞ্চত্রিংশা তোমার এলোকেশীর
জয়ধ্বনি করি,
তাই ব'লে যে ঊনবিংশা মালতীরে তুমি করবে অবহেলা
যুক্তি তার নেইক কিছু জেনো।
অতল প্রাণের গভীর ব্যথা জানালো সে তোমায়
বাংলা দেশের কবিবরের মুখে,
সে কথারে যদি
হাজার-দলা পদ্মসম অপূর্ব্ব আখ্যানে
ফুটিয়ে না তোলো,
তোমার যশস্-শরচ্চন্দ্রে ধ্রুব জেনো তুমি
পড়বে একটি কলঙ্কেরি রেখা।

আমার কথা শোনো।
যে প্রাণটি পেলে তুমি কবিবরের হাতে
দেহ তাহার রচো, একটি যেন লতা,
সঞ্চারিণী পল্লবিনী ফুলে ফুলে ভরা,

বাংলা দেশের সাধারণ মেয়ে মালতীকে তুমি
পলে পলে কেটে কেটে চক্‌চকিয়ে তোলো
কমল হীরে মতো
বিচ্ছুরিত চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুর আলো,
বিজয়িনীর কণ্ঠে দোলাও ইন্দিবরের মালা।

তাহার পরে চুপে চুপে অতি সঙ্গোপনে
পাঠাও তারে আমার কাছে,
আমি তারে হাতে ধরে
নিয়ে যাব বাঙলা দেশের সুরসভাতলে,
হাজার আঁখি মুগ্ধ হবে অপরূপার রূপে !

তা যদি না করো,
দণ্ড তোমায় দিব আমি
নিজ হাতে বিরচিয়া মালতীর কথা।
সে কাহিনী শুনে
—থাক্‌বে না ত' তাহার মাঝে
অসাধারণ কিছু,
নরেশ সেন হয়ত' তেমন জব্দই হবে নাক—
স্তব্ধ হয়ে থাক্‌বে মালতী
নৈরাশ্যেরি দুখে,
সমীরণে মুক্তি পাবে একটি দীর্ঘশ্বাস
ছল্‌ছলিয়ে আস্‌বে দুটি চোখ।
সে বেদনার করুণতা থাক্‌বে বহুকাল
বঙ্গ-সাহিত্যতে
তোমার নামে বিজড়িত হ'য়ে,
অভিশপ্ত করবে তোমায়
বাঙলা দেশে যতগুলি আছে
সাধারণা মেয়ে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু

বিচিত্রার চিত্রশালাতে শ্রীমান নন্দলাল বসুর এই যে ছবিগুলি, এর মধ্যে চার পাঁচখানি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই তাঁর ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে যখন তিনি বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে ভারত শিল্প-চর্চ্চার পথ উন্মুক্ত করছেন নতুন নতুন দিকে, নতুন নতুন রস ও ভাবের পন্থা ধরে—সেই কালের কাজের নমুনা।

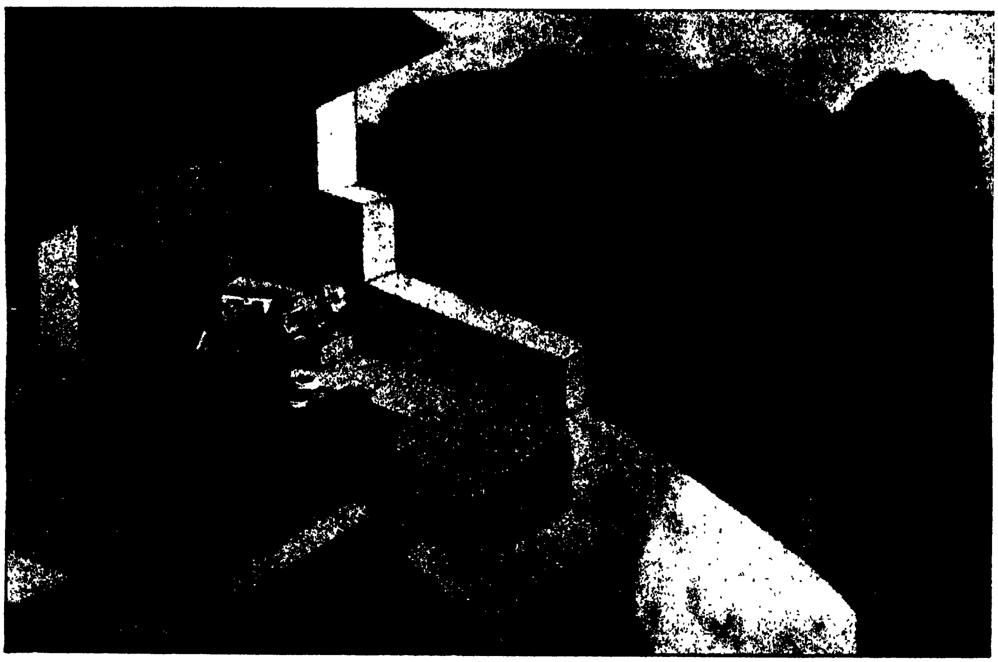
এই চিত্রগুলি থেকে আজকের বাংলার প্রধান চিত্রকরের বাল্য কৈশোর এবং যৌবনাবস্থার চিত্র রচনা পদ্ধতির একটুখানি আভাস পাবেন বিচিত্রার পাঠকগণ এবং বাংলার শিল্পীরা যে বহুসহস্র বৎসরের অজন্তা চিত্রাবলীর ব্যর্থ অনুকরণ করে চলেছে সে ভ্রমও দূর হবে সাধারণ দর্শকের মন থেকে।

এ দেশের শিল্পীরা পূর্ব্বকালে আশপাশের ঘটনা কালের প্রভাব ইত্যাদি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেবল ধ্যানস্তিমিত অবস্থাতে বসে ছবি মূর্ত্তি ইত্যাদি রচনা করে গেল একথা যেমন মিথ্যা, আজকের বাংলার শিল্পীর দল আমরাও সেই ভাবে কাজ করে চলেছি এ কথাও তেমনি মিথ্যা, এটা প্রমাণ হবে যে এই ছবিগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখবে তারি কাছে।

শ্রীমান নন্দলাল বাল্যাবস্থায় যে দিন আমার কাছে এসেছিলেন সেইদিন থেকেই তাঁকে শিল্প-রসিক বলে আমি ধরেছিলেম। তখন তিনি বালক আমি যুবা; আজ আমি বৃদ্ধ তিনি এখনো আমার কাছে সেই যৌবনের প্রতিভাদীপ্ত প্রিয় এবং প্রধান শিষ্যই আছেন। তাঁর ছবির তারিফ লিখে আমি তাঁর কাজের মানপত্র দিতে অগ্রসর হই নি কেননা ওরূপ করাতে শিল্পীতে শিল্পীতে উচ্চ নীচ ভেদ যে নাই সেটা অপ্রমাণ হয়ে যায়, অতএব বিচিত্রার এই চিত্রগুলি দেখে আমার আনন্দ হ'ল এইটুকুই জানাই বিচিত্রার সম্পাদককে আর চিত্রকরকে শুধু আশীর্ব্বাদ দিই জীবতু শতং জীবতু। ইতি

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্রা



দ্বিপ্রহর

চিত্রশালা

শ্রীনন্দলাল বসুর
চিত্রাবলী

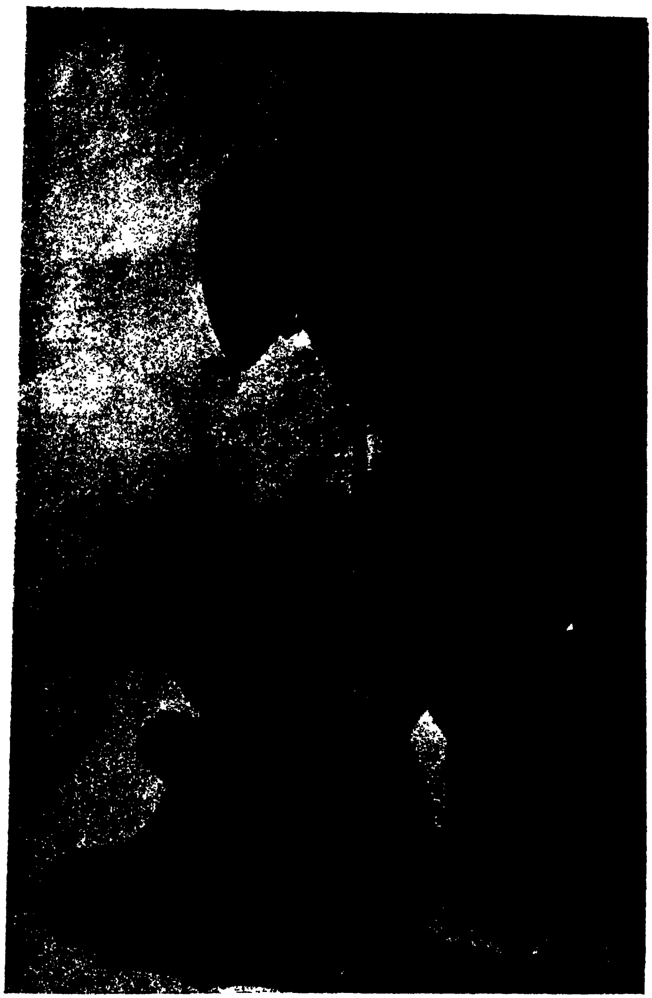


নিশীথে

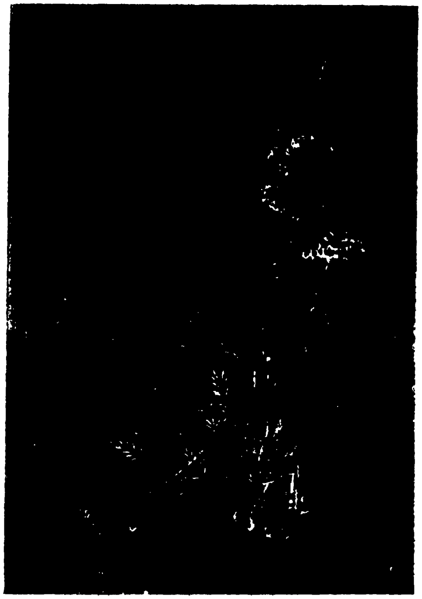


নটীর পূজা

(গঠিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি)



কুণাল



দখিন হাওয়া



পঞ্চনল



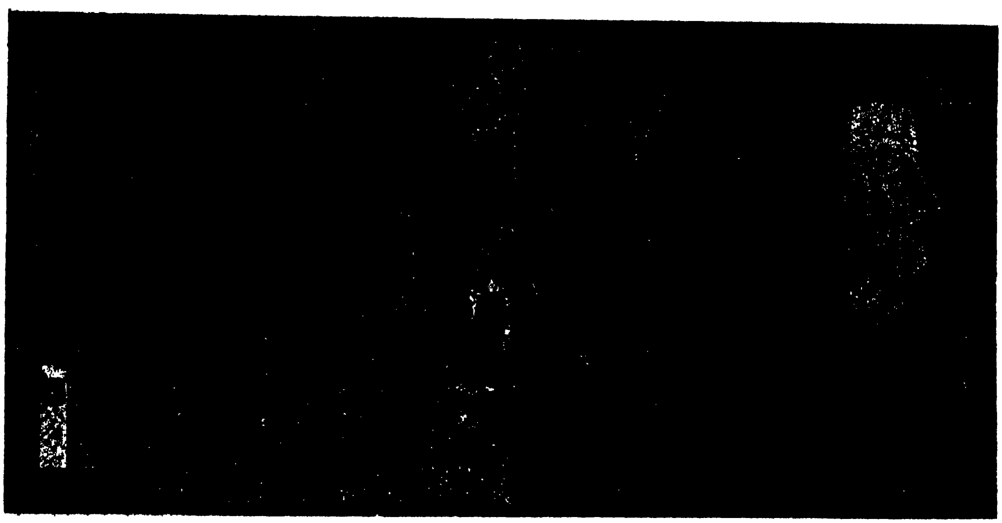
কুরুপাণ্ডবের অস্ত্র-শিক্ষা



তারা



গোকুল ব্রত



বৈশাখী পূর্ণিমা

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রিকা

শ্রীবিনায়ক সান্যাল এম্-এ

হেমবর্ণ ধরি হরি জগতে করুণা করি
অবতীর্ণ হইলা কলিযুগে।
উন্নত উজ্জ্বল রস, যেই প্রেমভক্তিরস,
সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতিতলে।
বহুকালে অনর্পিতা যেই নিজভক্তিনীতা
প্রকাশিলা করুণা করিয়া।
শচীসুত গৌরচন্দ্র সকল আনন্দ সান্দ্র
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর হিয়া॥

মহাপ্রভুর জীবনকথা অমৃতের ন্যায় মধুর। যে সেই সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর আস্বাদ পাইয়াছে তাহারই জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। যখন বাঙ্গলার অদ্বিতীয় বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ শুষ্ক জ্ঞানসাধকের তত্ত্বময় নির্বেদ ও বামাচারী তান্ত্রিকের বীভৎস রসোল্লাসে যুগপৎ মথিত ও ব্যথিত হইতেছিল, বাঙ্গলার ভাগ্যগগনের সেই চরমতম দুর্দ্দশার দিনে প্রেম-ভক্তির অমৃত-পাত্র লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যুগাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। তাঁহার প্রেমনির্ম্মল চিত্তদর্পণে প্রতিভাত হইয়াছিল অলোকের অক্ষয় আলোক;—লীলাময়ের মণিনূপুরের মধুর নিক্কণ প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়-প্রাঙ্গণে। নিখিল সৃষ্টির অণুতে অণুতে সুন্দরের যে অভিরাম নর্ত্তনছন্দ অবিরাম তরঙ্গায়িত হইয়া আছে,—এই দৃশ্যমান্ বিশ্বের রহস্যময় নেপথ্যে থাকিয়া শাশ্বত-রস-শিল্পী তাঁহার অতুল তুলিকায় যে অপরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ্যের রঙ্গমঞ্চে নিত্য নিয়ত পাঠাইয়া দিতেছেন—মাধুর্য্যের সেই অবারিত, অনাহত উৎস আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল তাঁহার আবেগ-ব্যাকুল চিত্ততটে। অকৈতব প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন তিনি; শুষ্ক তত্ত্বের নিরসন করিয়া অশ্রু-কোমল অনাবিল প্রেমধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন এই শাখা-পাদপহীন মহামরুতে—তন্ত্রাচারের ব্যভিচারের পঙ্কিল পল্বলে ফুটাইয়াছিলেন শুদ্ধা ভক্তির শোভন শতদল। কেমন করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইল সেই কথাই এইবার বলিব।

অনুমান ১৪৮৫ খৃঃঅব্দে নবদ্বীপের এক নিভৃত পল্লীভবনে শচী মাতার কোল আলো করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই দেবশিশু। অপরূপ গৌরকান্তি. ঢলঢল আয়ত নেত্র; মুখে চক্ষুতে—দেহের সর্ব্ব অবয়বে দিব্য প্রতিভার এক অপার্থিব দ্যুতি। যে দেখিল, সেই মোহিত হইল—একবার বক্ষে চাপিয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচী দেবী এমন কোল-আলো-করা ছেলে পাইয়া নিখিল ভুলিয়া গেলেন। যে দেখিল সেই ভাবিল, এ শিশু সামান্য নহে। সংবাদ শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বুঝিলেন তাঁহার জীবনসাধনা আজ সফল হইয়াছে,—তাঁহার আকুল আহ্বানে তৃষিত আর্ত্ত নরনারীকে প্রেমামৃত পরিবেষণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ গোলোক ত্যাগ করিয়া নররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

পরিণত বয়সে পুত্র লাভ করিয়া মাতাপিতা আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি করিবেন তাঁহারা যেন ভাবিয়া পাইতেন না। মাতাপিতা ও নিখিল নদীয়ার নয়নানন্দ এই অপূর্ব্ব বালক দিনে দিনে পরম আদরে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। গুরুগৃহে প্রথমে ব্যাকরণ ও পরে ন্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করিলেন এবং অতি তরুণ বয়সে স্বয়ং অধ্যাপকরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অচিরে দিকে দিকে তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি রটিয়া গেল; দলে দলে ব্রতী ছাত্রগণ আসিয়া এই কুশাগ্রধী, দিব্যকান্তি নবীন অধ্যাপকের পাদমূলে বসিয়া পাঠ লইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। তাঁহার দ্বারা তর্কে আহূত ও

পরাভূত হইবার আশঙ্কায় খ্যাতনামা প্রবীণ আচার্য্যগণও সে পথ দিয়া গতায়াত বন্ধ করিলেন। লোকোত্তর প্রতিভা লইয়া যে জন্মিয়াছে— বিশ্বজয়ের গৌরবটীকা জন্মক্ষণেই যাহার ললাটে দীপ্তাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে বাগ্‌বিতণ্ডায় কে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিবে? অচিরকালের মধ্যেই কিন্তু উদ্ভিন্ন যৌবনের এই উদ্ধত পাণ্ডিত্য—নবজাগ্রত মনীষার এই বিদ্যুদ্বিকাশ কোথায় মিলাইয়া গেল! সহসা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব অনুভূতি—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখরদীপ্তি ইহাতে নাই—উন্মুখযৌবনের উদ্দীপ্ত বংশীমুখে বিশ্বজয়ের দীপক রাগ ইহা নহে; ইহা জ্যোৎস্নাধৌত শারদশর্ব্বরীর সুধাময় রশ্মির শীতল প্রলেপ। এই কিরণ প্রেমের কিরণ—ইহার পেলব স্পর্শে হৃদয় শান্ত হয়—জীবন উন্নত হয়—চিত্ত হইতে জিগীষার শেষ অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া যায়। এই প্রেমমকরন্দের কণামাত্র যে লাভ করে সে ব্রহ্মপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

সে অমৃতের এককণ কর্ণ চকোর জীবন
কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরণে পিয়াসে॥

এ প্রেম "নিকষিত হেম" কামগন্ধশূন্য, নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন। এ প্রেমের স্বরূপ "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা", আত্মেন্দ্রিয় লিপ্সা ইহাকে অণুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। কামের তাৎপর্য্য কেবল স্বার্থভোগ, কিন্তু কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যহেতু প্রেম মহাশক্তি সম্পন্ন। এই শাশ্বত ও অবিনশ্বর প্রেমের ধ্বংস নাই—ধ্বংসের সহস্র কারণ (থাকা) সত্ত্বেও কিছুতেই ইহার ক্ষয় বা অপচয় হয় না। পূর্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়ে, তাঁহার করুণা-কিরণসম্পাতে এই প্রেমাম্বুধি সময়ে সময়ে উদ্বেলিত হয় সত্য, কিন্তু অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ইহার নিত্যরূপের বিনাশ নাই।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ

এই যে বিশুদ্ধ প্রেম, জীবজীবনে ইহার আবির্ভাব বাস্তবিকই একটি অসাধারণ ও অপ্রাকৃত ঘটনা। উদয়-দিগন্ত হইতে এই অমরপ্রেমের অরুণাভাস আসিয়া তদীয় জীবনে নবীনা উষার উদ্‌বোধন সূচনা করিল। উদ্ধত নৈয়ায়িক নিমাই পণ্ডিত এ কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে একনিমেষেই তৃণাদপি সুনীচ, অকিঞ্চন "প্রেমের ঠাকুরে" পরিণত হইলেন? প্রেমের যাদু এমনই যে, যে একবার ইহার পরশ পাইয়াছে, সেই নির্ম্মল হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টির সম্মুখ হইতে রাগদ্বেষ, আত্মাভিমান প্রভৃতি অবিদ্যার আবরণ অবারিত হইয়া তাহাকে নিত্যবস্তুর আস্বাদের অধিকারী করিয়াছে। সেই প্রেমের আবেশে বিশ্বম্ভরের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শুষ্ক জ্ঞান নীরস-তর্কে আর রুচি হইল না। অমৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও যে আস্বাদন করিয়াছে, পঙ্কপল্বলের সমল সলিলে সে কি আর তৃপ্ত হইতে পারে? পূর্ণইন্দুর রজতরুচি যাহার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, ক্ষীণশিখ প্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাহার পিপাসা মিটিবে কেমন করিয়া? গৃহসংসার, আত্মীয়-বান্ধব তাঁহার বিষবৎ মনে হইল। করুণাময়ী জননীর স্নেহের আকর্ষণ, উদ্‌ভিন্নযৌবনা সাধ্বী পত্নীর অশ্রু-কোমল নলিন-নয়নের নীরব মিনতি কিছুই তাঁহাকে টানিয়া রাখিতে পারিল না; প্রেমাবেশে অধীর গোরা নদীয়া অন্ধকার করিয়া কোথায় চলিলেন? রভসরোমাঞ্চিত সেই দীর্ঘ কৃশ গৌর-তনু যে দেখিল, সেই নিস্পন্দনেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর নয়নাশ্রু-ধারায় ধরণীতল আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিহি গড়ায়ল রূপরাশি, সুধুই সুধার হেন বাসি।
মুখ চাঁদ নিগাড়িয়া গড়ে, লাবণি অবনী বাহি পড়ে।
ভাবভরে মিলাইছে তনু, কাঁচা সোনা চরকায় জনু।
খেনে রাধা রাধা বলি কাঁদে, নিজতনু দুই ভুজে বাঁধে।
ভুবন ভরল ঐ রসে, এ যদুনন্দন রসে ভাসে॥

মুণ্ডিতশির চীরধারী সন্ন্যাসী এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে ও কাঁদাইতে কাঁদাইতে পুণ্যতীর্থ নীলাচলে উপনীত হইলেন। এইস্থানে অবস্থানকালেই তাঁহার উদ্বেলিত প্রেমধারা ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে লাগিল। ব্যাকুলতা ও আর্ত্তির আর সীমা রহিল না—দিব্যোন্মাদের সে অতীন্দ্রিয় অবস্থা বর্ণনা করা দূরে থাক্, কল্পনা করাও আমার ন্যায় প্রেমদরিদ্র মানবের

পক্ষে সম্ভবপর নহে। মধ্যে মধ্যে ভাবসমাধির অবস্থা—অন্যথায় দুঃসহ বিরহের অরুন্তুদ আক্ষেপ। এই দিব্যোন্মত্ত পুরুষপ্রবরের সংস্পর্শে যেই আসিল, সেই লোকললাম, রমণীয় দেবরূপ যেই দেখিল সেই স্তম্ভিত ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র একবার দর্শনাভিলাষে অসীম ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার অমেয় পাণ্ডিত্য ও অনন্যসুলভ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে জ্ঞানমার্গ পরিহারপূর্ব্বক মধুময় প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কাশীর স্বনামধন্য মনীষী বেদাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী তর্কযুদ্ধে পরাভূত হইয়া এই অকিঞ্চন তরুণ সন্ন্যাসীর নিকট প্রেমরসের আকিঞ্চন করিলেন। বাদশাহ হুসেন শাহের শাসন-পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ রূপসনাতনও তাঁহার ভক্তি-রসোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

প্রেমভক্তির একান্ত আশ্রয় লওয়ার পর হইতে গৌরহরি বাক্যালাপ করিবার অথবা উপদেশ দিবার অবসর পাইয়াছেন খুব কমই। সর্ব্বদাই আবেশময় অতীন্দ্রিয় আনন্দ-লোকেই বিচরণ করিতেন। তর্ক তো সাধ্যপক্ষে করেনই নাই। একমন্ত্র তিনি শিখাইয়াছিলেন "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" কেবল প্রকাশানন্দ ও সার্ব্বভৌমকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার সময় তাঁহাকে সুদূরপ্রসারী, বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের লীলাচমক দেখাইতে হইয়াছিল। সে সকল আলোচনার কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার স্থল ইহা নহে। আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ করে উড়িষ্যা রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রেমবিষয়ক বার্ত্তালাপ। উহা এতই রসসিক্ত ও মনোগ্রাহী যে এস্থলে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য।

প্রথম সাক্ষাতেই মহাপ্রভু রামানন্দকে কহিলেন, "রায়, তুমি পরম ভাগবত, তোমার নিকট প্রেমধর্ম্মের বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।" রামানন্দ কহিলেন, "এ অকিঞ্চনের মুখ দিয়া তুমি নিতান্তই কিছু বলাইবে দেখিতেছি। আমি মূর্খ, তুমি যেমন বলাইবে, আমি তেমনই বলিব। শুন।" এই বলিয়া অন্যান্য দু'একটি কথার পর তিনি বলিলেন, "সকল ভক্তির সার প্রেমভক্তি। প্রেম আরাধ্যকে একান্ত আপনার করিয়া দেখে—আবেগের তীব্রতায় ভগবানকে ভক্তের হৃদয়তীর্থে আমন্ত্রণ করিয়া আনে। ইহার তুলনা নাই। ভগবানের এমনই লীলা যে উহা উগ্রতপা বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসীর হৃদয়ের অহেতুকী ভক্তির বান ডাকিয়া আনে—ঊষর মরুতে ও প্রেমের নির্ঝর উৎসারিত করিয়া দেয়।

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতু নম্নু ভক্ষ্যপেয়ে॥

আমরা ভক্ষ্যপেয়ে ততক্ষণই তৃপ্তিলাভ করি যতক্ষণ আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে। সেইরূপ ভক্ত আর্ত্ত-বন্ধুকে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া তৃপ্ত হন না—তাঁহার চরিতার্থতা ভগবচ্চরণে প্রেমের অনঘ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া।" প্রভু কহিলেন, "ইহ বাহ্য, আগে কহ আর।" তদুত্তরে রায় একে একে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি প্রেমের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিলেন, "কৃষ্ণলাভের উপায় নানা, ইহার মধ্যে যেটিতে যিনি অনু-প্রাণনা পান তাঁহার পক্ষে সেই পথই প্রশস্ত।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়।
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম।

বাস্তবিক, প্রেম সম্বন্ধের মধ্য দিয়া ভক্ত যেমন নিবিড় ভাবে ভগবানকে পান এমন আর কিছুতেই নহে। ভক্ত ভুলিয়া যান যে কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবান্; প্রেমের আতিশয্যে তিনি মনে করেন, কৃষ্ণ তাঁহার একান্ত আপনার। তাই অনুরাগী বৈষ্ণবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!"

রস দানা বাঁধিয়া উঠে। সখা অর্জ্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন সেই বিশাল দৃশ্য দর্শনে বিহ্বল হইয়া গেলেন; সভয়ে ভাবিলেন, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণকে সখারূপে কল্পনা করিয়া, না জানি, কি অপরাধই করিয়াছি! সেই মুহূর্ত্তে তিনি প্রিয়তম সখার সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া গেলেন। বিশ্বাস রহিল, একাত্মতা চলিয়া গেল। এই আতঙ্কমিশ্র ভালবাসার মধ্যে ভক্ত কখনই হৃদয়ের পূর্ণ নিবৃত্তির সন্ধান পান না। নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার বস্তুই রহিয়া যায়, আমাদের অনুভূতির উদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে কোনদিনই পরমাত্মীয়রূপে ধরা দেয় না। প্রেমের আদিতে শান্তরস—ইহাতে আছে চিন্ময়চরণে ভাবমুগ্ধ ভক্তের একান্ত আত্মসমর্পণ, "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার" মূলোচ্ছেদ। বলা বাহুল্য, এই ঐকান্তিক নির্ভরতার ভাব পরবর্ত্তী সকল শ্রেণীর ভক্তেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ কোন ভাবসম্বন্ধের উপর স্থাপিত না হওয়ায় শান্ত-ভক্তের আবেগের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প। দাসভক্ত আত্মসমর্পণ ব্যতীত ভগবৎসেবার আনন্দলাভ করিয়া ধন্য হন। সখাভক্ত, দাসের প্রভুর প্রতি যে সমীহার ভাব, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; সুতরাং প্রেমের বিনিময় এখানে অবাধ ও প্রচুর। বাৎসল্যরস আরও একস্তর উর্দ্ধে,—যেহেতু ইহার সহিত একটি অনির্ব্বচনীয় সমতার ভাব বিজড়িত,—ক্ষেমময়ী জননীর সন্তানের প্রতি সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কান্তাপ্রেম বা মধুররস প্রেমের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, কারণ ইহার মধ্যে দেহ ও মনের সম্পূর্ণ সমাধি। কেবলা প্রীতি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, সে চায় তাঁহাকে নানালৌকিক প্রেমসম্বন্ধের মধ্য দিয়া নিবিড় ও মধুর করিয়া ধরিতে। এমন সুধাস্যন্দিনী বাণী কে কোথায় শুনিয়াছে—এমন তৃষাহরা পীযূষপ্রসাদ পিপাসিতের অধর-সম্মুখে কে কবে বহন করিয়া আনিয়াছে? "আমিই সেই" বা অদ্বয়তত্ত্ব ইহা নহে—নিগুর্ণ ব্রহ্মের সাধনায় বৈষ্ণবের মন ভরে না। ধ্বংসশীল হইলেও সংসার মায়া নহে, সত্য; এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় বিশাল বিশ্ব তাঁহারই আনন্দ হইতে উদ্ভূত, তাঁহার দ্বারা বিধৃত এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইবে। শ্রুতি ভগবানের হস্তপদাদি বহিরঙ্গের অস্বীকার করিয়াও তাঁহাতে বিশেষধর্ম্মের আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক, তাহার চিচ্ছক্তির ষড়ৈশ্বর্য্যময় বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহাকে নিগুর্ণ কেমন করিয়া বলি—এই নিখিল বিশ্বরচনার মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাইয়াও তাঁহাকে রূপহীন বলি কিরূপে? সৃষ্টিকে স্রষ্টার সহিত নিরবচ্ছিন্ন এক করি কোন্ দুরাশায়? বৈষ্ণব জ্ঞান চাহেন না, শক্তি চাহেন না, সাধ্যের সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন হইবার দুরাকাঙ্ক্ষাও রাখেন না; তিনি চান অকৈতব ভক্তি, অকৃত্রিম প্রেম; তাঁহার নিকট মুক্তিপদও তুচ্ছ।

"চাইনে মোরা শক্তি ওগো ভক্তিভরে ডাকবো তাঁরে,
প্রণয়ী সে রাখালরাজা দূরে কি আর থাক্‌তে পারে?
মগ্ন র'ব সেরূপ ধ্যানে মনে মনে গাঁথবো মালা,
আস্‌বে হৃদয়কুঞ্জে ওগো, আস্‌বে ফিরে চিকণকালা!"

এই যে প্রেমধর্ম্ম যাহা মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া লোককে শিখাইয়া গিয়াছেন, এই যে অমৃত তিনি স্বয়ং আস্বাদ করিয়া আচণ্ডালে বিলাইয়া গিয়াছেন; বাক্য নয়, উপদেশ নয়, জীবনসিন্ধুমন্থনকরা এই যে সুধাসেবধি লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকুল তৃষ্ণা মিটাইয়াছে, ইহার কি তুলনা আছে? আরাধ্যকে তিনি পাইয়াছেন সুচিরবিরহের কণ্টকাকীর্ণ সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া। এই যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, এই যে বিরহের বুকফাটা ক্রন্দন, সাধ্য ও সাধকের এই যে ব্যবধান ও ভেদ, ইহাই তো বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলকথা। বিরহ আছে বলিয়াই মিলন এমন নিবিড় হয়—ভেদের পরে তবেই না অভেদ এমন পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে? তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

"এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে
একত্রমিলন॥"

যাহাকে চাই, অনায়াসে তাহাকে পাই না,—তাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই দুর্ব্বার হইয়া উঠে, তাহার বিরহে জীবন শূন্য হইয়া যায়। এই নিদারুণ অতৃপ্তি, এই জীবনব্যাপী বেদনাও ভক্ত হাস্যমুখে বরণ করেন মিলনের একটি অমৃতময় সান্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য। বাস্তবিকই এ "মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।"

আর পুঁথি বাড়াইব না। মহাপ্রভুর প্রভাবে তৎপরবর্ত্তী যুগে যে সুবিশাল ও সুমধুর কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এইবার সেই কথা বলিয়াই শেষ করিব। গৌরহরির পুণ্যময় চরিত্রপ্রভাবে ধর্ম্মজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেও একটা উদ্বোধনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, কবি কর্ণপুর প্রভৃতি সুধীভক্ত ও প্রেমিক কবিগণ লুপ্ত-স্রোত সংস্কৃতসাহিত্যের "মরা গাঙে" আবার অভিনব ভাবের ও নবজীবনের জোয়ার আনিলেন। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, রসশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়ক গ্রন্থে সংস্কৃতভারতীর ভাণ্ডার আবার সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত, ভাষাসাহিত্যের আদর ও প্রসার আশাতীতরূপে বাড়িয়া গেল। বাঙ্গলার চিরবরেণ্য কবিকুল, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি, মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অলৌকিক লীলাবর্ণন করিয়াছেন—শতবন্ধনের মধ্যেও আনন্দের যে নন্দন রচনা করিয়াছেন—শাশ্বত সত্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যসঙ্গমে মানবাত্মার অভিসারের যে চিরমধুময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনুপম ও অনির্ব্বচনীয়। তাঁহাদের সেই মিলিতমুরলীঝঙ্কার "কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া" আমাদের মর্ম্মকুহরে আনন্দ-চৈতন্যময় এক অননুভূতপূর্ব্ব আবেশের সঞ্চার করে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে-সুরে বীণা বাঁধিয়াছিলেন, সেই রসঘন, অপার্থিব রাগিণীতেই আর এক পর্দ্দা সুর চড়াইয়া তান ধরিয়াছিলেন বৈষ্ণবযুগের এই কবিকুল। বঙ্গদেশের ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জীবনই ভক্তিপবিত্র একটি সকরুণ সঙ্গীতের মত। ইহার ছত্রে ছত্রে রসমূর্চ্ছনা, ছন্দে ছন্দে ভাবহিল্লোল, যতিতে যতিতে নিয়মিত গতিভঙ্গিমা, অধ্যায়ে অধ্যায়ে অশ্রুজলের অজস্র উচ্ছ্বাস! সেই মহাযুগের ভাবপ্রাচুর্য্যের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন এই কবিগণ—তাই তাঁহাদের অমৃতময় লেখনী-মুখে কল্পিত হইয়াছে সেই অপ্রাকৃত যুগের একখানি অবিকৃত চারুচিত্র। তাহার মধ্যে কষ্টকল্পনা নাই, আছে সাধনার জাগ্রদনুভূতি; অকারণ অলঙ্কারবিন্যাসে অঙ্গসজ্জার হাস্যকর প্রয়াস কোথাও নাই; আছে স্রঙ্মাল্যের সুপ্রযুক্ত সৌষ্ঠবে স্বভাবসুন্দরীর অপার্থিব লাবণ্যহিল্লোল! গতিবেগচঞ্চল, ক্রমবর্দ্ধনশীল, প্রাণবান্ জাতির পক্ষে ছিন্নমাল্যের এই ভ্রষ্টকুসুমচয়নের চেষ্টা অস্বাভাবিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রিক্ত, মুমূর্ষু জাতির পক্ষে, এই অশ্রুধারানিষিক্ত বেদনার সঙ্গীতই একমাত্র সম্বল, ইহাই তাহার পরম পাথেয়! জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে হৃদয়দ্রাবী করুণার ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, সেই মায়াময়ী গীতির অচপল প্রতিধ্বনিতে বাঙ্গলার আকাশ অনুধ্যাত হইয়া রহিয়াছে। অধুনাতন দিনেও বাঙ্গালী কবির সপ্তস্বরার প্রেমোচ্ছল কলতানে বিশ্বের কবিকুঞ্জে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাহাহউক, এই অনবদ্য পদাবলী একাধারে কাব্য ও বাঙ্গলার নিজস্ব সঙ্গীত। আজিও ইহা কীর্ত্তনানন্দে লক্ষ লক্ষ অনুরক্ত ভক্তের চিত্ত-বিনোদন ও পুলকময় আবেশের সঞ্চার করিতেছে। ধন্য সেই ভাববীর, ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে যাঁহার পাবন আবির্ভাবে ও অযাচিত করুণায় বাঙ্গলার মহামরুপ্রান্তরে প্রেমের বৈকুণ্ঠ নামিয়া আসিয়াছে!

বিনায়ক সান্যাল



কর্নেল মাদেক

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্,

রেনে মারী মাদেক (Madec) প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। ইঁহার সম্বন্ধে সাধারণ গ্রন্থাদিতে অনেক ভুল বিবরণ দেখা যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের লেখায় ইঁহার নাম মেডক বা ম্যাডক (Medoc or Madoc) দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন মেডক সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, কিছুকাল জলপথে দস্যুবৃত্তি করার পর সে ভারতবর্ষে আসিয়া একদল ভৃতিভুক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করে এবং একার্য্যে প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে; তথায় কিছুকাল পরে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে নিহত হইয়াছিল।* ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে প্রথম জীবনে মাদেক নিজদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শত্রুজাতির বাণিজ্যজাহাজ অধিকার বা লুণ্ঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বেসরকারী জাহাজে নাবিকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেদের দেশের বাণিজ্য জাহাজগুলিকে এ প্রকার অধিকার দিতেন, ইহাদিগকে privateer বলা হইত। Privateer ও pyrate এক জিনিস নয়। মাদেক নিরক্ষর মোটেই ছিলেন না; তাঁহার রোজনামচা এবং লিখিত পত্রাদি হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে Emile Barbe নামক জনৈক ফরাসীলেখক তাঁহার জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। উহাই মাদেকের প্রকৃত ইতিহাস। তখনকার দিনে কিঞ্চিৎ প্রতিভাসম্পন্ন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের পক্ষে এদেশে কিরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব ছিল, মাদেকের জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সহায়সম্পদহীন সাধারণ সৈনিকরূপে মাদেক এদেশে আসিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল কখনও ফরাসী, কখনও ইংরাজ, কখনও বা একাধিক দেশীয় রাজার পতকাতলে সেনা পরিচালন করিয়া তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর ফরাসীরাজ কর্ত্তৃক উচ্চ রাজসম্মানে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট জীবনকাল সম্ভ্রান্তভাবে শান্তিসুখে কাটাইয়া তিনি দেহ ত্যাগ করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যুর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মাদেকের সমসাময়িক ও সমব্যবসায়ী আর একজন ফরাসী সৈনিকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম ছিল Madoc বা Medoc। নাম সাদৃশ্যবশতঃ এই উভয়ব্যক্তিকে এক করিয়া ফেলিয়া লেখকগণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নায়কের নামে ও চরিত্রে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশের অন্তর্গত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কুইম্পার কোরেণ্টিন নামক স্থানে এক দরিদ্র পরিবারে মাদেকের জন্ম হয়। তাহার পিতা মাতা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন, একারণ অতি অল্পবয়সেই তাহাকে উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসরের বালক এক জাহাজে কর্ম্ম লইয়া সাগরযাত্রা করিল। তখনকার দিনে জাহাজগুলি একসঙ্গে অনেক কাজই করিত। বাণিজ্য জাহাজ হইলেও প্রত্যেকটিতে কিছু সৈন্য ও গুটিকয়েক কামান থাকিত। সুতরাং বাণিজ্য, সুবিধামত ক্রীতদাসব্যবসায় এবং সুযোগানুসারে শত্রুজাতির পোতলুণ্ঠন এই তিন কার্য্যেই এযুগের বণিজ্যপোতগুলি এক সঙ্গে রত থাকিত। মাদেক এই সময় একাধিক জাহাজে কর্ম্ম লইয়া অনেকবার সাগর যাত্রা করিয়াছিলেন। মাদেকের আত্মচরিতে এই সময়ে

* *Compton*—European Military Adventurers in Hindusthan.
Keene—Hindusthan under Free Lances.

সংঘটিত কয়েকটি জলযুদ্ধের কথা আছে। তন্মধ্যে সমবৃত্তিশালী এবং সমশক্তিসম্পন্ন এক ইংরাজপোতের সহিত অষ্টঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের কথাই উল্লেখযোগ্য, উহাতে উভয়জাহাজই ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; ফরাসী জাহাজের অর্দ্ধেক মাল বিনষ্ট অর্থাৎ আফ্রিকায় সংগৃহীত ক্রীতদাস সমূহের অর্দ্ধেকাংশ নিহত হইয়াছিল।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যজাহাজে কর্ম্ম লইয়া মাদেক প্রথম পণ্ডিচেরী আগমন করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে ডুপ্লের ফরাসীপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সংঘটিত দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪) চলিতেছিল; ফলে সমরনিরত ফরাসী সৈনিকগণের হস্তে স্বপ্নাতীত অর্থাগম হইতেছিল। নিতান্ত নিম্নপদস্থ অফিসরগণের ভাগেও লুণ্ঠনের অংশ হিসাবে বিশ হাজার টাকা পড়িয়াছিল। সাধারণ সৈনিকরাও সেই হারে যাহা পাইয়াছিল তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। দেখিয়া শুনিয়া মাদেকের জল হইতে স্থলে আসিবার বাসনা হইল। কিন্তু তখনকার মত সে চেষ্টা সফল হইল না। তাঁহার জাহাজ ফ্রান্সে ফিরিয়া গেল, সেই সঙ্গে তাঁহাকেও যাইতে হইল। পর বৎসর মাদেক আবার এদেশে আসিলেন এবং নৌবহর হইতে গোলন্দাজদলে কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীতে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার অনেকগুলিতে মাদেক উপস্থিত ছিলেন। তাহার কতক কতক বিবরণ তিনি নিজ রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অনন্তর যুদ্ধ নিবৃত্তির পর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন মানসে মাদেক আবার জাহাজে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহার আর ফ্রান্স যাওয়া হয় নাই। কারণ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিল। মাদেকের জাহাজ মরিশসদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া জলপথে বলবত্তর শত্রুর আক্রমণভয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লালীর নেতৃত্বে সাহায্যকারী সেনাদল পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা মরিশসে আসিয়া উপনীত হইলে মাদেক আবার তাহাদের সহিত ফিরিয়া চলিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কাউণ্ট লালী সদলবলে করমণ্ডল উপকূলে আসিয়া দেখা দিলেন। মাদেকের রোজনামচায় এই সময়ে উত্তরপক্ষীয় নৌবহরে যে সকল জলযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার সত্যবাদিতার প্রশংসা করিতে হয়, কারণ স্বজাতির অগৌরবকর কোন কথাই তিনি গোপন করিবার প্রয়াস পান নাই। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে ফরাসী জাহাজগুলি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আডমিরাল কাউণ্ট দি আসী লালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেরামতের জন্য নিজ রণপোতমালা লইয়া মরিশসদ্বীপে চলিয়া গেলেন। মাদেকের তখন এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না। এক অন্ধকার রাত্রে নিজের যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ লইয়া তিনি গোপনে যুদ্ধজাহাজ পরিত্যাগ করিলেন এবং দীর্ঘ চারি মাইল সমুদ্র সন্তরণ করিয়া কূলে গিয়া উঠিলেন। পরদিন প্রভাতে নৌবাহিনী চলিয়া যাইবার পর মাদেক পন্দিচেরী গিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের করে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন ফরাসী সেনাদলে লোকাভাব। সেইজন্যও বটে এবং তাঁহার পূর্ব্বের কৃতিত্ব স্মরণে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং পদাতিক সেনাদলে সার্জ্জেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। রোগশয্যা হইতে উত্থিত অথবা জলপথে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ বলিয়া নৌবহর হইতে পরিত্যক্ত লোক লইয়া ঐ দল গঠিত হইয়াছিল।

তৃতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধের অনেক রণক্ষেত্রেই মাদেক উপস্থিত ছিলেন। সে সকলের দীর্ঘ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। লালীর মান্দ্রাজ অভিযানে মাদেকও গিয়াছিলেন। তাঁহার রোজনামচায় এই অভিযানের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন যে ফরাসীবাহিনীর অন্তর্ভূত পাঁচ হাজার ইউরোপীয় সৈনিকের মধ্যে দেড় হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত বা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আরও অনেকে নিয়মিত বেতন না পাইয়া অথবা লালীর কঠোর ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

সে যাহা হউক লালীর মান্দ্রাজ অধিকারের চেষ্টা সফল হইল না। তাঁহার সেনাদল বিফল মনোরথ হইয়া পন্দিচেরী ফিরিল। অতঃপর ইংরাজেরা মসলিপত্তন অবরোধে প্রবৃত্ত হইলে পন্দিচেরী হইতে একদল সৈন্য উক্তস্থানের উদ্ধারকল্পে প্রেরিত হইল। মার্টিন এবং বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

ক্ল্যদ মার্টিন উভয়েই এই দলের অন্তর্ভূত ছিলেন। ইউরোপীয় সৈনিকবর্গের মধ্যে আশীজন ছিল ইংরাজ জাতীয়। এ কথায় অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু তথনকার দিনে এ ধরণের ঘটনা নিতান্তই সাধারণ ছিল। শত্রুহস্তে বন্দী হইলে দুঃসহ কারাযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা তাহাদের সেনাদলে যোগ দিয়া প্রয়োজন হইলে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইত না! বলা বাহুল্য এ ধরণের সৈন্যের উপর নির্ভর করা চলিত না, কারণ বিপদে ঠেকিলে সর্ব্বাগ্রেই রণে ভঙ্গ দিত এই বিদেশী সৈনিকের দল। মাদেক এবং মার্টিন উভয়েই পরে ইংরাজের হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাস্থানে সে কথার উল্লেখ করা যাইবে।

মসলিপত্তনের নিকটে আসিয়া ফরাসীরা দেখিল যে তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। তথন তাহারা পন্দিচেরী অভিমুখে না ফিরিয়া উত্তরে গঞ্জামের দিকে গমন করিল (১৬ই এপ্রিল ১৭৫৯)। সেখানে ফরাসীদের একটি ছোট কুঠি ছিল; এবং নিকটেই ছিলেন ফরাসীদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন একজন রাজা। ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্যলাভই ছিল মার্টিন ও মাদেকের অভিপ্রায়। কিন্তু ফরাসীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত রাজার বিদেশীর হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হইবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার নিকটে সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সকল ফরাসী সৈনিক গিয়াছিল অতর্কিত আক্রমণে তিনি তাহাদের কয়েকজনের প্রাণসংহার করিলেন। অবশিষ্ট ফরাসীদল তথন পুরাতন কুঠীতে আশ্রয় লইল এবং প্রায় ছয়মাস কাল চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে লুণ্ঠন করিয়া আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া প্রাণধারণ করিয়া রহিল। দলস্থ ইংরাজগণ এবং কয়েকজন সিপাহী এই সময়ের মধ্যে গোপনে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আগমন করে। দীর্ঘকাল পরে কোনস্থান হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা নাই বুঝিয়া ফরাসীসৈন্যগণ অবশেষে জলপথে পন্দিচেরী প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিল। এতদুদ্দেশ্যে দুইখানি দেশীয় জলযান সংগৃহীত হইল এবং অশ্বারোহীসৈন্যগণের ঘোড়াগুলিকে বধ করিয়া পথিমধ্যে খাইবার জন্য তাহাদের মাংস বোঝাই করা হইল। অনন্তর একদিন অনুকূল বায়ু দেখিয়া তাহারা যাত্রারম্ভ করিল। পথিমধ্যে কোকনদ নামক স্থানে তাহারা আসিয়া পঁহুছিল। তথন এইস্থান ওলন্দাজদের অধিকারে, ফরাসীরা আশা করিয়াছিল এখানে আসিয়া খাদ্য ও সাহায্য মিলিবে। ওলন্দাজদের সহিত সর্ত্তনিরূপণ চলিতেছে, এমন সময় বঙ্গোপসাগর হইতে ভীষণ ঝটিকা উঠিল। তথন বাধ্য হইয়া একখানি পোত নোঙ্গর তুলিয়া দূরসমুদ্রে গমন করিল, অপরখানি বাত্যাতাড়িত হইয়া চড়ায় ধাক্কা লাগিয়া খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। প্রায় ত্রিশজন ফরাসী ও দুইশতজন সিপাহী বহু আয়াসে রক্ষা পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ কূলে অবতরণ করিল, মার্টিন ও মাদেক উভয়েই এইদলে ছিলেন।

অতঃপর ফরাসীরা বলপূর্ব্বক ওলন্দাজদুর্গ অধিকার করিল। ওলন্দাজরা কোনমতেই তাহাদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ না হইয়া ইংরাজদের সাহায্যার্থে আহ্বান করিল। এ ধরণের আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে ইংরাজ অভ্যস্ত ছিলেন না। অষ্টাহকাল পরেই একদল ইংরাজ-সৈন্য কোকনদে আসিয়া পঁহুছিল। তথন সম্মিলিত ওলন্দাজ ও ইংরাজবাহিনী একযোগে ফরাসীদের আক্রমণ করিল। বীরবিক্রমে আত্মরক্ষার পর পরিশেষে ফরাসীরা সংখ্যার অল্পতাবশতঃ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল এবং অতঃপর তাহারা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমগ্রদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মার্টিন ও মাদেকের দলে আর চারজন ফরাসী ও বারজন সিপাহী ছিল। সকলে পদব্রজে পন্দিচেরী অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু পথিমধ্যে একে একে সকলেই সরিয়া পড়িল; পরিশেষে প্রায় ৭০ দিন ব্যাপী দীর্ঘ পর্য্যটনের পর শ্রান্তক্লান্ত দেহে বন্ধুযুগল ২৩শে জানুয়ারী ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নিশাকালে পন্দিচেরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথন ফরাসীদের ঘোর বিপদ। দুই দিন পূর্ব্বে বন্দীবাসের ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজসেনানী সার আয়ার কূটের হস্তে ফরাসীবল চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, বিজয়োন্মত্ত ইংরাজসৈন্যকর্তৃক পন্দিচেরী অবরুদ্ধ, ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী-শক্তি বিলুপ্তপ্রায়। ইংরাজসৈন্য কর্তৃক পন্দিচেরীনগরী পরিবেষ্টিত হইলেও শত্রুপক্ষের প্রহরী সেনাদলের দৃষ্টি

অতিক্রম করিয়া বন্ধুদ্বয় নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল এবং উভয়েই নগররক্ষা কার্য্যে অশ্বারোহীদলে নিযুক্ত হইল। কিছুকাল পরে অশ্বের খাদ্য অপ্রতুল হওয়ায় অশ্বারোহী সৈন্যগণকে বিদায় দেওয়া হইল; তাহাদের প্রতি শত্রুপক্ষের রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের ব্যতিব্যস্ত রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই কার্য্যে মাদেক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অতঃপর মাদেকের সেনাদল গিঞ্জি বা জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লয় এবং প্রবল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল অসমসাহসে দুর্গরক্ষা করিয়া পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহারাই যুদ্ধের শেষ বন্দী।

ফরাসী বন্দীগণকে, সংখ্যায় প্রায় দুই সহস্র হইবে, মান্দ্রাজ আনয়ন করা হয়। তথায় উহাদের মধ্যে অনেকে কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের জন্য ইংরাজ সেনাদলে কর্ম্ম গ্রহণ করিল। তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজ-ফরাসীর সমরের নিবৃত্তি হয় নাই। আরও দুই বৎসরকাল পরে পারীনগরের সন্ধির ফলে সপ্তবৎসরের সমরের অবসান হইল। ইংরাজের কর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে মাদেক নিজে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"১৭৬১ খৃষ্টাব্দে গিঞ্জির পতনের পর আমি ইংরাজ হস্তে বন্দী হই; আমি এবং আমার সহকর্ম্মীগণ বন্দীদশায় নিতান্ত কুব্যবহার পাইতাম, ক্রমে তাহা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে যখন ইংরাজেরা আমাদের তাহাদের সেনাদলে প্রবেশ করিবার কথা বলিল এবং জানাইল যে আমাদের সুধু বঙ্গদেশে এবং এতদ্দেশীয়দের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে হইবে, (হায়, তখন বঙ্গদেশে ফ্রান্সের সকল আশা ভরসার অবসান হইয়াছিল), সুতরাং স্বদেশপ্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমরা ইংরাজের কর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি, তখন আমি আমার কয়েকজন সঙ্গীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম; আমি বলিলাম আমাদের শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার ও প্রথম সুযোগেই মুক্তি পাইবার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই একমাত্র পথ। আমরা স্থির করিলাম যে গ্রহবৈগুণ্যে বাধ্য হইয়া প্রয়োজন বশতঃ আমরা যে শৃঙ্খল ধারণ করিলাম প্রথম সুযোগেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" *

* Emile Barbe—Le Nabob Rene Madec, p 27.

সর্ব্বসমেত প্রায় সার্দ্ধতিনশতজন ফরাসী সৈনিক ইংরাজের কর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাদিগকে তিনটি কোম্পানীতে বিভক্ত করা হয়; প্রথম দলে ছিল ১০৯ জন সৈনিক, ক্লড মার্টিন ছিলেন এই দলে একজন লেফটেনাণ্ট বা অধস্তন সেনানায়ক; দ্বিতীয় কোম্পানীতে ছিল মোট ১০৫ জন সৈন্য; মাদেক ছিলেন এই দলের একজন সার্জ্জেণ্ট। ক্রমে ক্রমে ফরাসী সৈন্যদের বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হইল। প্রথম আসিল মার্টিনের কোম্পানী। উহাদের জাহাজ পামিরা অন্তরীপ বা গোদাবরী পয়েণ্টের অদূরে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছিল। ক্লড মার্টিন এবং একজন বাদ্যকর ব্যতীত অপর সকলে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। মার্টিনের সাহসে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য জাহাজের অনেকেই রক্ষা পাইয়া কলিকাতায় আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল (সেপ্টেম্বর ১৭৬১) বলিয়া এক্ষণে জানা গিয়াছে। পর বৎসর "নরফোক" জাহাজে মাদেকের দলও কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মীর কাসিমের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে আর পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। ফরাসী সৈনিকগণ ইংরাজবাহিনীর অন্তর্ভূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পাটনা অধিকার পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধ ও অভিযানেই তাহারা সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। উধুয়ানালার যুদ্ধে সার্জ্জেণ্ট-মেজর মাদেক তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী ও সাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী সমরুর সেনাদলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টচক্র শীঘ্রই তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলার সেনাদল মধ্যে সমরুর পার্শ্বে আনিয়া ফেলিল এবং তাহার সহকর্ম্মীরূপে মাদেক বক্সারের ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেই ইংরাজ সেনাপতি বিহার ও অযোধ্যারাজ্যের সীমানারূপে প্রবাহিত কর্ম্মনাশা নদীতীরে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দল বিদ্রোহ করিল। নবাব

মীরজাফর খাঁ তাঁহার জামাতাকে পরাজিত করিলে সৈন্যদের বহু অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে টাকা সৈন্তেরা তখনও পায় নাই। তাহারা অগ্রসর হইতে অসম্মতি জানাইয়া স্পষ্টই বলিল অর্থ আদায়ের জন্য তাহারা পাটনায় ফিরিয়া যাইবে। ইংরাজ সেনাদলে ফরাসী ও জর্ম্মণজাতীয় অনেক সৈনিক ছিল। সুজাউদ্দৌলার চরগণ ইহাদের ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া নবাবের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিত। ফরাসী কোম্পানীর সৈন্যগণ পূর্ব্বাবধি পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এক্ষণে অপরাপর শ্বেতকায় সৈন্যগণের মধ্যেও অসন্তোষের সৃষ্টি দেখিয়া তাহারা উল্লসিত হইল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমগ্র শ্বেতকায় সৈনিকের দল একযোগে বিদ্রোহী হইয়া শিবির ত্যাগ করিল। তাহাদিগকে বুঝাইয়া অথবা ভয় দেখাইয়া ফিরাইবার অফিসরগণের সকল প্রয়াস বৃথা হইল। কিছুকাল পরে ইংরাজজাতীয় সৈনিকগণ বুঝিতে পারিল যে ফরাসীরা শত্রুর সেনাদলে যোগ দিবার অভিপ্রায়ে চলিয়াছে। তখন আর তাহাদের ভয়ের সীমা রহিল না। কর্তৃপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধ করাই ছিল তাহাদের অভিপ্রায়। শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার তাহাদের কোন ইচ্ছা ছিল না। তাহারা সকলেই শিবিরে ফিরিল, জর্ম্মণ সৈনিকরাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ফিরিল না শুধু ফরাসী সৈন্যগণ; উহারা তখন সংখ্যায় দেড় শতের অধিক ছিল। দুইজন ইংরাজ সৈনিকও ইহাদের সহগামী হইল। মাদেককে নিজেদের নায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া সকলে মিলিয়া এলাহাবাদে সুজাউদ্দৌলা সমীপে গমন করিল। বলা বাহুল্য তিনি উহাদের পরম সমাদরেই গ্রহণ করিলেন। মাদেককে তিনি এক ব্রিগেডসেনার নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। ফরাসী সৈনিকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অফিসরের পদ লাভ করিল। তিন কোম্পানী পদাতিক সিপাহী এবং পঞ্চাশজন ফরাসী গোলন্দাজ পরিচালিত আটটী কামান ইহাই হইল মাদেকের সম্বল।

মাদেকের সাহায্য লাভ করিয়া সুজাউদ্দৌলার আর আনন্দের অবধি রহিল না। নামসর্ব্বস্ব বাদসাহ সাহ আলম তাঁহার আশ্রয়ে এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন। বাঙ্গালার পলাতক নবাব মীরকাসিমও তাঁহার সাহায্য লাভ আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার আশ্রয় লইলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইবার দুর্জ্জয় বাসনা সুজার অনেক কাল হইতেই মনে ছিল। এক্ষণে শুভাবসর সমাগতপ্রায় বুঝিয়া তিনি মীরকাসিম ও সাহ আলম সমভিব্যাহারে ইংরাজ-বিতাড়নে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেনাদল বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পাটনা পর্য্যন্ত জনপদ অধিকার করিল। কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তিনি পাটনা দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না (৩রা মে ১৭৬৪)। শুনা যায় মীরকাসিমের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের জন্যই নবাবী ফৌজ পরাজিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য যুদ্ধে আহত সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর নবাব বক্সারে আসিয়া সসৈন্যে বর্ষাবাস করিলেন। বর্ষাপগমের পর ইংরাজ সেনানী সার হেক্টর মনরো যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ২৩শে অক্টোবর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার বাহিনীর দক্ষিণপ্রান্ত সমরু ও মাদেক পরিচালিত করিয়াছিল। মাদেকের রোজ-নামচায় যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। নবাবী পক্ষে এই যুদ্ধে ত্রিশহাজার সৈন্য ও ১৩০টী তোপ ছিল, তন্মধ্যে যুদ্ধে ছয় হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং সমগ্র তোপখানা ও প্রচুর পরিমাণ সামরিক সম্ভার ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া মাদেক লিখিয়াছিলেন। মনরোর পক্ষে ৮৫৭ জন গোরা সৈন্য, ৫২৯৭ জন সিপাহী পদাতিক, ৯১৮ জন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য ও ২০টি কামান ছিল এবং তাঁহার ৮৪৭ জন সৈনিক হতাহত হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথমেই মাদেক গুরুতরভাবে আহত হইলেও পরাজয়ের পর রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর মাদেক চুনার দুর্গে আশ্রয় লন; শত্রুসৈন্য দুর্গ অবরোধ করিলে তাঁহার সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া নবাবী সিপাহী অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়া দুর্গরক্ষা করিয়াছিল।

সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলে সমরুর ন্যায় মাদেককেও অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে

যাইতে হইয়াছিল। দেশে তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শক্তির অভাব ছিল না এবং তাহাদের আত্মকলহ ও নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাজনিত যুদ্ধ বিবাদেরও অভাব ছিল না। সুতরাং মাদেকেরও নূতন কর্ম্মক্ষেত্র জুটিতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমে একটি সামন্ত রাজার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্য ৪০০ সিপাহী সম্বলিত একটি সেনাদল গঠন করেন। কালক্রমে মাদেকের দল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে দশ সহস্র সৈন্য ও ত্রিশটী কামান লইয়া গঠিত বিশাল এক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। নিজের সুবিধামত মাদেক তাঁহার ব্রিগেড লইয়া রোহিলা, জাঠ, মোগল, মারাঠা প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন এবং পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ বৎসর কাল জয় ও পরাজয়, সম্পদ ও দারিদ্র্য নানা অবস্থা বিপর্যায়ের মধ্যে যাপন করেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদেক আগ্রাতে মেরী এন বার্ব্বেৎ নামক একটি ফরাসী জাতীয়া মহিলাকে বিবাহ করেন। বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বার্ব্বেৎ বংশ এদেশে আসিয়া বাস আরম্ভ করিয়াছিল এবং কালক্রমে দরবারে তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভও ঘটিয়াছিল। দীর্ঘকাল মোগলসাহচর্য্যে থাকার ফলে এই ফরাসীবংশ রীতি নীতি আচার-ব্যবহারে অনেকটাই মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মাদেকের লেখায় বিবাহকালীন উৎসবাদির অনেক বিবরণ দেখা যায়। অপ্রাসঙ্গিক বোধে এখানে আর তাহা দেওয়া হইল না। সম্ভ্রান্ত আমীরী ধরণের ও সব উৎসব ব্যাপার মাদেকের নিকট আশ্চর্য্যের বস্তু হইলেও ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। বিবাহোপলক্ষ্যে সর্ব্বসমেত দেড় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাদেকের নিজস্ব তহবিল হইতে প্রদত্ত হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে অত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও ভাগ্যান্বেষী সৈনিক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গুছাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই 'তনখা' লইয়া রোহিলাদের সহিত মাদেকের বিরোধ বাধিল; তখন তিনি নিজ সেনাদল লইয়া ভরতপুরের জাঠরাজা জাহির সিংহের আশ্রয়ে গমন করিলেন (জুন ১৭৬৭)।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে যে সকল রাজন্যবৃন্দ নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে যাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল, ভরতপুরের জাঠরাজা চূড়ামণ এবং তাঁহার পৌত্র সূর্য্যমল্ল তাঁহাদের অন্যতম। মাৎস্যন্যায়ের যুগে সূর্য্যমল্ল নানাদিকে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; আধুনিক ভরতপুর রাজ্য বাদে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার কতকাংশ,—অর্থাৎ বর্ত্তমান আগ্রা, আলিগড়, ইটা, মথুরা, মীরাট, মৈনপুরী, হাটরাস, ফরুখাবাদ, রেওয়ারী, গুরগাঁও জেলা এবং ঢোলপুর রাজ্য তখন জাঠহস্তে ছিল। পাশ্চত্য সমরবিদ্যার উৎকর্ষ দেখিয়া সূর্য্যমল্ল ইউরোপীয় সেনানী সাহায্যে নিজ বাহিনী গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা তখন সফল হয় নাই, কারণ উত্তরা পথে তখন পর্য্যন্ত তাদৃশ ইউরোপীয় সমাগম হয় নাই। বাদসাহ সাহ আলমের পক্ষভূত পূর্ব্ববর্ণিত "মুশির লাস" সাহেবের দল ভিন্ন অপর কেহ তখনও কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাই সূর্য্যমল্ল ইহাদের ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুশিরলাসের আত্মচরিত হইতে জানা যায় যে ২৩শে মার্চ্চ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা যখন আত্রৌলী পরগণায় কালিন্দী নদী তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তখন রাও দুর্জ্জনসিংহ নামক সূর্য্যমল্লের এক আত্মীয় দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ তাঁহাদের আক্রমণ করিয়াছিল। দলস্থ ইউরোপীয়গণকে বন্দী করিয়া জাঠরাজার নিকটে পাঠানই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।* কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু কয়েক বর্ষ পরে মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার পরাজয়ের পর তাঁহাদের কর্ম্মচ্যুত ইউরোপীয় সৈনিকের দল আশ্রয়লাভার্থ যখন হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল তখন আর সূর্য্যমল্লের পুত্র জাহির সিংহের পাশ্চাত্যপদ্ধতিতে পরিচালিত সেনাদলের অভাব রহিল না। সমরু (১৭৬৫) ও মাদেক (১৭৬৭) উভয়েই একে একে তাঁহার কর্ম্মগ্রহণ করিয়া দুই স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করিতে লাগিলেন।

* Jean Law—Memoire, p. 33.

তখনকার দিনে বাধ্য না হইলে কেহই রাজকর প্রদান করা কর্ত্তব্য বোধ করিত না। ফৌজ পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক গ্রামবাসীদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইত। কাজেই ঐ কার্য্যে রীতিমত অভিযান, যুদ্ধ, অবরোধ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড হইত। রাজকর আদায়ের জন্য প্রেরিত এই ধরণের কয়েকটি অভিযানে মাদেক নায়কত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ অর্থাগম হইত; কারণ সংগৃহীত অর্থ সবটাই রাজসরকারে জমা দেওয়া হইল কিনা তাহা দেখা সম্ভব ছিল না এবং প্রদত্ত অর্থের শতকরা একটা অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে সংগ্রাহকের প্রাপ্য ছিল। এইরূপে মাদেক বহু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে সেনাদলের ব্যয় বাবদ 'তন্‌খা' পাইতে বিলম্ব হইলেও মাদেক নিজের তহবিল হইতে সৈন্যগণের বেতন মিটাইয়া দিতে কখনও বিলম্ব করিতেন না, কারণ তাঁহার সকল সম্পদ ও প্রতিপত্তি যে উহাদের সন্তোষের উপরই নির্ভর করিতেছে একথা তাঁহার ভালরূপেই জানা ছিল।

জাঠপক্ষে থাকিয়া মাদেক যে-সকল যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত ছিলেন, তাহার আন্তন্ত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। সুধু প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির কথা বলা যাইতেছে। জয়পুরের রাজা মধুসিংহের সহিত জাহির সিংহের বিরোধ ছিল। এককালে জয়পুরাধিপতিগণ ভরতপুরের রাজাদের খুব বন্ধু, কতকটা অভিভাবক, ছিলেন। জয়পুরের সাহায্য ব্যতিরেকে সূর্য্যমল্লের পক্ষে স্বাধীনতালাভ করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সংসারের নিয়মই এই যে মানুষ সম্পদের দিনে দুর্দ্দিনের মিত্রকে মনে রাখা ত দূরের কথা, তাহার অপকার করিতে সমুদ্যত হয়। জাহিরসিংহ মধুসিংহের সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারে তাঁহাকে খর্ব্ব করিবেন তজ্জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, মাদেকের সেনা সাহায্যলাভের অনতিকাল পরেই, তিনি মহাসমারোহে পুষ্করতীর্থ দর্শনে চলিলেন। হিন্দুর পক্ষে তীর্থদর্শনে যাইতে কোন বাধা নাই, জাঠরাজ যদি সাধারণ তীর্থযাত্রীভাবে যাইতেন কাহারও বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি তীর্থযাত্রার নামে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশাল বাহিনী সহ তিনি জয়পুররাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহ উৎসাদিত করিতে করিতে চলিলেন। সমরু ও মাদেক উভয়েই নিজ নিজ ব্রিগেড সহ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।

এ অপমানে জয়পুরের সকলেই কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র জাঠের এত তেজ, এত অহঙ্কার! জয়পুরের সাহায্য না পাইলে যাহার পূর্ব্বপুরুষগণের একদিন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিত না, তাহার আজ এই ব্যবহার! কচ্ছবহগণ জাঠরাজকে তাঁহার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইল। বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ঠাকুর দলিলসিংহ জাহিরসিংহের প্রত্যাবর্ত্তন পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে জাহিরসিংহ পুষ্করে উপনীত হইয়া পবিত্র তীর্থধামে যথাবিধি স্নান পূজাদানধ্যানাদি করিলেন। রাজপুতরা তাঁহার ফিরিবার পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে চরমুখে সংবাদ পাইয়া তিনি অন্যপথে নিজ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিশালবাহিনীর ভয়ে রাজপুতরা সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া সুবিধামত স্থানে জাহির সিংহকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবে স্থির করিল। ১৪ই ডিসেম্বর জাঠরা যখন একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিতেছিল তখন রাজপুত সেনা সহসা তাহাদের আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ মাওন্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত। উভয়পক্ষ বিজয়লাভের দাবী করিলেও যুদ্ধে জাঠরাই যে পরাজিত হইয়াছিল সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মাদেক নিজেদের পরাজয়ের কাহিনী গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হয়েন নাই; তদ্ভিন্ন অন্যান্য লেখকরা স্পষ্টই জাঠরা পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"জয়পুররাজ ১৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া জাঠদের অনুসরণ করিতেছিলেন। জাঠদের একটি গিরিপথ পার হইতে হইয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে নিরাপদে ঐ পথ অতিক্রম করিতে পারিবে। কিন্তু জাঠসেনা ঐ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথের অর্দ্ধেকমাত্র অগ্রসর হইয়াছে এমন

সময়ে রাজপুতরা সহসা তাহাদের আক্রমণ করিল। সঙ্কীর্ণ পথে আক্রান্ত সেনাদলের পক্ষে ঘুরিয়া শত্রুকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রথম আক্রমণেই জাঠ অশ্বারোহী সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জাঠদের রসদাদি কতকটা আগে চলিয়া গিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ তাহা লুটিয়া লইল। শুধু মাদেক এবং জর্ম্মণ সমরুর ফৌজ অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়া ও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়া স্রোতের গতি ফিরাইল এবং জয়পুররাজকে পরাস্ত করিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রায় দশহাজার লোকক্ষয় হইয়াছিল, রাজপুতদের প্রায় সকল প্রধান প্রধান সেনানায়ক অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়াছিলেন। বিজেতাদের রসদ ও সমরসম্ভার হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছিল। দুর্গম পথের জন্য তোপখানার কতকাংশও তাহারা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"* অর্থাৎ অপর এক লেখকের ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলিতে "জাঠরা পর্য্যুদস্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া কোন মতে দেশে ফিরিল; জাহির সিংহের সমগ্র তোপখানা অর্থাৎ সত্তরটী কামান, প্রচুর রসদ ও শিবিরাদি সবই শত্রুর হস্তগত হইল।"*

রাজপুত চারণ গান বাঁধিলেন,—

"তাবৎ ছত্র অরু তোপ কোস লুট্টে কচ্ছবাহন।
ভরতনের গয়ে জট্ট মারবায় সিপাহন॥
জিতে কুরম জোধ নাগ জট্টন গিলি নাহব।
সমরু বেহনুজু সংগজায় পকরে হি জবাহর॥"

—অর্থাৎ কচ্ছবাহগণ ছত্র, তোপ এবং কোষ অধিকার করিল। সৈন্যগণ নিহত হইলে জাঠ ভরতপুর গমন করিল। কূর্ম্ম (অর্থাৎ কচ্ছবহ) জয়লাভ করিল। সমরু না থাকিলে জাহির সিংহ নিশ্চয়ই ধৃত হইতেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* Le Nabob Rene Madec. pp. 49-50.

* Father Wendel.

শেষ ডাক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা

শুনেছ বন্ধু
শুনেছ খবর?
বড়ই চমৎকার—
দুনিয়ার মাঝে
ছিল যে শত্রু
মৃত্যু খবর তা'র—
এনেছে ভৃত্য
সন্ধ্যায় আজ!
আরামের শ্বাস ফেলি
এস সখা! এস
করি মোরা আজ
নির্ভয়ে কোলাকুলি!

* * * * *

একি এ বন্ধু!
কম্পিত কেন!
স্পন্দিত কেন হিয়া?
মূর্চ্ছিত কেন
অন্তর তব!
হানিল কে বাজ্ দিয়া?
সান্ত্বনা লভি
কহিল বন্ধু
"দুনিয়া মালিক ভাই—
"আমাদের কবে
ডাকিয়া লইবে
ভাবিতেছি শুধু তাই!"

মানুষের জয়

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

গ্রামে গ্রামে সেট্‌ল্‌মেণ্ট আস্‌ছে। আমরা কানুনগোর দল তাই চলেছি নিজেদের তল্পীতাল্পা বেঁধে মন্থর গোযানে। রেল ত এদেশে নেই, পাকা রাস্তাও নেই। ছোট্ট মার্টিন্ কোম্পানীর রেল ওপারে খানিকদূর এসে থেমে গেছে, তার পরেই রয়েছে বিরাট দামোদর নদ তার বালির জটা মেলে। কোন নিয়মকে এ গ্রাহ্য করে না, আইন ভাঙাতেই এর আনন্দ। কিছুমাত্র নোটিশ না দিয়ে এ একদিন সহসা উগ্রমূর্ত্তি ধরে। বানের তোড়ে বাঁধ ভাসিয়ে অতর্কিতে গ্রামে গ্রামে তেড়ে আসে; মাঠে মাঠে প্লাবন জাগিয়ে এর ঘোর লাল জল নাচে, 'তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ'। কত শতাব্দী ধরে কত রাজশক্তি একে বশ করবার চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু এ দুর্য্যোধনের মত পণ করেছে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও ছেড়ে দেবে না। মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন, কিন্তু একে জয় করতে পারেন নি। এর পশ্চিম তট হতে যে রাস্তা বরাবর কাশী পর্য্যন্ত চলে গেছে তাকে এর কবল হতে বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ কোম্পানীর সে কী আগ্রহ, কিন্তু হঠতে হয়েছে এর কাছে। শেষে মানুষের সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি নিরুপায় হয়ে এর পূবপারের ঘাটে এসে থেমে গেছে, একে নমস্কার করে বলেছে, তোমার কাছে পরাভব মানলুম। কাজেই দামোদরের পশ্চিম পারে যে দেশ সে হল পরাজিত বিধ্বস্ত মানব সভ্যতার দেশ। সে তার অজস্র খাল বিল, অসংখ্য নদী-নালা বালিয়াড়ি নিয়ে মানুষের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ে আছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অতি আদিম কাল হতে মানুষের যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল তার ফলে প্রকৃতিকে অনেক জায়গায় পরাভব মানতে হয়েছে; মানুষ বন কেটে সহর বসিয়েছে, পাহাড় ফুঁড়ে পথ বার করেছে, নদীর কোমরে সেতুর নীবীবন্ধ বেঁধে তাকে সভ্য করেছে। কিন্তু মানুষ যেখানে হেরেছে প্রকৃতি সেখানে অতি উগ্র মূর্ত্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। এই দেশ সেই প্রকৃতির প্রতিহিংসা নেবার দেশ। মানুষ চাষ ক'রে ফসল ফলায়, এর নদী এসে তাকে ডুবিয়ে পচিয়ে মারে। মানুষ বন কেটে আবাদ করে, বন্যা এসে বালির চাপ দিয়ে সে আবাদের গলা টিপে দেয়। বন্যাকে আটকাবার জন্যে মানুষ বাঁধ তোলে, তারই আড়ালে ক্ষেতে ফসল ফলায়;—সম্পন্ন হয়, সচ্ছল হয়, সন্তান সন্ততি বাড়ায়। প্রকৃতি পরিশোধ নেয়, ঐ বদ্ধজলে মশার ডিম ফুটিয়ে।

বানের স্রোত যদি বা কমল', ত ব্যাধির স্রোত এসে গ্রাম দিল ভাসিয়ে। তারই ফলে গ্রাম যখন জনবিরল হল, দুর্ব্বল হল, তখন আবার একদিন উগ্রমূর্ত্তি ধরে ওধার হতে রূপনারায়ণ এধার হতে দামোদর এসে ঐ বাঁধকে দিল ভেঙে। এমনি করে প্রকৃতির প্রতিহিংসা এই হতভাগা দেশের ওপর দিয়ে চলেছে, কতদিনে শেষ হবে কে জানে। মানুষের শরীরের জোর কমে এলেও সে বেঁচে থাকতে পারে যদি বুকের জোর না কমে। কিন্তু এই হতভাগা দেশে বর্ত্তমান ত নেইই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এখানে মানুষের অবস্থা যেমন ভয়াবহ, এমন আর বোধ হয় কোথাও নেই। কিন্তু এরা নিজেরা ত তা ভাবে না। আমি ত দেখেছি মস্ত মস্ত এদের উদর সতত বর্দ্ধমান প্লীহা যকৃতে ভরপুর, চোখ হলুদ হয়ে এসেছে, কাঠি কাঠি হাত পা, খোনা খোনা কথা। মনে হয় এদের মধ্যদেশ এখনি বেলুনের মত ফুলে উঠে হাতপা গুলোকে নিয়ে আকাশে উড়ে যাবে, হাতপা গুলো প্যারাসুটের মত ঝুলতে থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা মামলা করে, নেশা খায়, বিয়ে করে, সন্তান হয়। আমার মনে হয় ভগবান অনুকম্পা করে এদের মনকে মগ্নচেতন করে রেখেছেন। অতি নিদারুণ যন্ত্রণা

হলে মানুষ অসাড় হয়ে যায়। ছুরীতে হাত কাটলে বাজে, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে হাত উড়ে গেলে বাজে না। এদেরও সেই দশা।

গোযান চলেছে। সমুদ্রের মত ঢেউ খেলানো রাস্তা। পরিসর পাঁচ হাতের বেশী নয়, গভীরতা বোধ করি তার চেয়েও বেশী। দুপাশে ধান হয়েছে, কোথাও বা বেনা বন। তল্‌তলে দইএর মতন কাদা, তার মধ্যে গাড়ীর চাকা দুটো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ধরিত্রীর বুকের ওপর চাকা দুটো যেন কোনও এক বন্য জন্তুর মত ধারালো নখ দিয়ে আঁচড় কেটে দিচ্ছে, কি লিখছে ঐ আঁচড়ে কে জানে – বোধ হয় লিখছে—"আমি গোযান, আমি আছি, সেইটে বোঝো। শুধু কি আছি ?—বহুকাল ছিলাম আবার বহুকাল থাকব। রামচন্দ্র যখন তাঁর ধনুক নিয়ে পঞ্চবটীর অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতেন তখনও ছিলাম, এখনও আছি। ট্রেণ হ'ল, মোটর হ'ল, এরোপ্লেন হ'ল, কিন্তু তবু আমি তাদের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ—আমি বেঁচে আছি; আবার হয়ত ট্রেণ যাবে, এরোপ্লেন ধ্বংস হবে, মোটর রচনা মানুষ ভুলে যাবে,—তখনও আমি থাকব।"—এই জরাজীর্ণ অস্তিত্বের উল্লাসে গোযান খানির সে কী ঘন ঘন কম্পন,—তার রেড়ীর তেল ও আলকাতরা সিক্ত ধুরোদুটির কী 'ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর' কলরব !

সন্ধ্যা নামে আর কি। গাঁয়ের লোক হাট থেকে ফিরছে। তাদের গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে সহজে জবাব দেবে না। বলে, 'মশায়ের নাম কি, বাড়ী কোথা, কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, কবে ফিরবেন।' অর্থাৎ আগে তাদের পঞ্চাশ কথার জবাব দাও, তবে তারা তোমার এক কথার জবাব দেবে। অজানা কোনও লোক গেলে তাদের স্বভাব ভিড় ক'রে দাঁড়ানো। 'কিউরিঅসিটি' জিনিষটা তাদের খুব বেশী। অনেক আগন্তুক এতে চ'টে যায়, ঘৃণা দেবার প্রলোভনও ছাড়তে পারে না। মারের ভয় দেখালে এরা 'বাবারে-মারে' বলে ছুটে পালায়, কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হয় না। মার খেতেই ত এদের জন্ম। জন্মাবার আগেই এরা খেয়েছে এদের বাপ মায়ের মার, যার ফলে এদের জন্ম। তারপর এদের মেরেছে পাঠশালার পণ্ডিত, কাছারির গোমস্তা, আদালতের আইন। শাস্ত্রকাররা বিধান দিয়ে দিয়ে এদের মেরে রেখে গেছে বহুশতাব্দী আগে। সমাজ এদের মারছে কুকুরের মত। উকীল মোক্তার এদের ধনে প্রাণে মারছে। তার ওপর প্রকৃতি এদের মারছে পিছা-মোড়া করে বেঁধে, চোখে ঠুলি পরিয়ে,—বন্যা দিয়ে মারছে, ব্যাধি দিয়ে মারছে। ভগবানের চোখের জল এদের জন্যে ঝরে কিনা জানি না, হয়ত ঝরে, কিন্তু এমন হতভাগা এরা যে স্বয়ং ভগবানও এদের কিছু করতে পারেন না।

'কিউরিঅসিটি' জিনিষটা এদের প্রবল, তার কারণ শিক্ষা ত এদের চোখের সামনের ছানি কাটিয়ে দেয় নি; এরা আভাসে জানে যে এদের গাঁয়ের, এদের পঞ্চায়েতের বাইরে একটা মস্ত জগৎ আছে যেখানে একটা গাভীর তিনটে বাচ্ছা হওয়া থেকে সুরু করে মস্ত মস্ত আজগুবি ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে যার বিবরণ সপ্তাহে একবার ক'রে বাঙলা খবরের কাগজ থেকে গাঁয়ের চক্রবর্ত্তী মশাই এদের পড়ে শোনান। তাই বাইরের লোক এলে এরা দৌড়ে যায়—জগতের আজগুবি খবর শোনবার জন্যে।

আঁধার নেমে এলো। গাড়োয়ানেরা গাঁয়ের শেষে ঝুরি নামা বৃদ্ধবটের তলে গাড়ী থামালো, গরু খুললো, জাব দিলো, আমাদের বললো রান্না খাওয়া ক'রে ঠাণ্ডা হতে। বটতলায় গাড়োয়ানের মেলা। এ অঞ্চলের এই বটতলাই হ'ল মোগলসরাই জংশন, কেলনারের রেষ্টুরেঁা, খোলা হাওয়ার ওয়েটিং রুম। মাটীতে গর্ত্ত কেটে উনান করে সবাই রান্না চড়িয়েছে,—মোটা লাল চালের ভাত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, তাতে ছেড়ে দিয়েছে একটা কাপড়ে বাঁধা কিছু মসুর দাল, গোটা দুয়েক আলু আর পিঁয়াজ। জলন্ত কাঠের আর ফুটন্ত ভাতের সুগন্ধে বাতাস ভরে আছে।

তারপর দিন সন্ধ্যায় আমরা এলাম যেখানে সার্কল্ ক্যাম্প হয়েছে;—এখানে পড়বে সার্কল্ অফিসারের তাঁবু, আমরা কানুনগোর দল কালপ্রাতে যে যার নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ছ'সাত মাইল দূরে চলে যাবো। গাড়োয়ানরা কোলাহল করে কাগজ পত্তর নামাচ্ছে, ক্যাম্পের পেস্কার সমস্ত দেখছে শুনছে। পাশেই একটা চালা তোলা হয়েছে—তার মধ্যে একধারে পেস্কারের রসুই হবে আর একধারে আস্তাবল। আমাদের

জীর্ণ দুর্ব্বল ঘোড়াগুলোকে তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে, বর্ষা এখনও শেষ হয়নি, বলা যায় না, এখনই আবার জল আসতে পারে। অসহ্য গুমোট গরম। আমরা বারান্দায় ভাঙা মেঝের ওপর মাদুর কম্বল বিছিয়ে বসে আছি। কালথেকে আপন আপন ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম সুরু হবে, তার আগে এই মোট একটি সন্ধ্যা। 'কানন-গো'—আমাদের এনাম কে দিয়েছিল জানি না। কিন্তু নাম যেই দিক, তার নামকরণের বেশ একটা ক্ষমতা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কাননে যেতে হয় তাই কানন গো। অর্থাৎ বনবাসই হ'ল আমাদের চাকরী। কোনও এক যক্ষকে তার মনিব একবছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, তারই দুঃখে কালিদাস লিখে ফেল্লেন অতবড় একটা মহাকাব্য। আর আমাদের এই যে নিরন্তর বনবাস এতে কই কোনও কবির সুনিদ্রার যে ব্যাঘাত ঘটেছে তাত জানা নেই। আসল কথা হ'ল দুনিয়াটাই খোসামুদে। কিন্তু দুঃখ এই, হায় বাগ্দেবি, তুমিও এই কলঙ্কের ভাগী হলে? হ'তাম যদি রাজার ছেলে তাহ'লে আজ এই বনবাসের সূত্রপাতে আসন্ন বিরহের ম্লানচ্ছায়া এই সন্ধ্যার ওপর কত কবিই না কত মহাকাব্য লিখে ফেলতেন। ইংলণ্ডের প্রিমিয়ার প্লাস্‌ফোর্স পরে গল্ফষ্টিক্ তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, তার ছবি আদর ক'রে কাগজে কাগজে ছাপাচ্ছে; প্রেসিডেণ্ট হুভার ট্রেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মাথা বার ক'রে টুপি তুলে বিদায় জানাচ্ছেন, তার ছবি দৈনিকে মাসিকে আর ধরে না।—কিন্তু এই যে আমি শ্রীনটবর পাল গোযান-যাত্রার কালে তিনদিনের পরিপুষ্ট খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ নিয়ে—আমার জীর্ণ কম্বলে বসে আজকের এই একটি অন্তিম সন্ধ্যার কথা ভাবছি, এর ছবি তুলতে কই কারো ত মাথাব্যথা দেখছি নে। যদি লিখিয়ে হতাম তাহলে বীণাপাণির এই আভিজাত্য গৌরব চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেখানে খাঁটি বল্‌শেভিজ্‌মের ঝড় বহিয়ে দিয়ে যেতাম,—কিন্তু হায়, এমনি দেবীর একচোখোমি, লিখতে বসলে কলম থেকে হুক্কা নোট্ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না।

এই সব ভাবছি, এমন সময় আমাদেরই নবীন আট নম্বর হুক্কার কামুন গো হুঁকাতে দুটা টান দিয়ে বললে, "নাঃ, তামাকটা ভাল লাগছে না, বোধ হয় জ্বর এল।"

ম্যালেরিয়ার এই একটি গুণ যে সে কলেরা বা প্লেগের মতন ঝাঁ ক'রে আসে না, তার আগমন-ধ্বনি আগে হতেই অনুভব করা যায়। তামাকটা বিস্বাদ লাগা হল ঐ একটি আগমন-ধ্বনি। আরও আছে। গ্রামের শেয়াল-গুলো সব বিকট ডেকে উঠল। কাছেই এক শ্মশান থেকে 'হরিবোল, হরিবোল্' শোনা গেল। আমরা হিন্দু মায়াবাদী, বিশ্বাস করি সকলই মায়া। তাই কেউ যখন মরে তাকে নিয়ে দস্তুর মতন হৈ হৈ করি, চুপি চুপি সারি নে। কারণ মরাটা হ'ল মায়াবাদের একটা অকাট্য প্রমাণ,—জীবন অনিত্য। তাই আমরা যখন মড়া পোড়াতে যাই, তার আগে বেশ করে একছিলিম গাঁজা খেয়ে নিই, সারাপথ চেঁচাতে চেঁচাতে যাই, যেন যাবতীয় জীবিত লোকের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। হাটতলায় গেলে দুশোবার চেঁচাই—"বল হরি হরিবোল।"—নিশুতি রাত হলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শ্মশানযাত্রার পথের দুপাশের লোকজনের ঘুম বেশ সুনিশ্চিত ভাবে ভাঙে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে যাই—"হরিবোল, হরিবোল।"

আমাদের নবীন বল্লে—'দেখ আমার গান পাচ্ছে',—এই বলে সে একটা গান গেয়ে উঠলো। ম্যালেরিয়ার আর এক অভ্রান্ত আগমনধ্বনি হ'ল এই গান পাওয়া। বড় বড় বক্তারা সভায় যেমন বক্তৃতার একটা urge পান, ম্যালেরিয়া রোগীও তেমনি গান ও বক্তৃতার একটা urge পায়। এই যে অকালস্থায়ী urge—এর ওষুধ হচ্ছে ফিভার মিক্‌শ্চার,—কিন্তু ঐ যে বাগ্মীদের স্থায়ী urgeএর কথা বললুম ওর ওষুধ নেই। ওর একটা ওষুধ থাক্‌লে আমাদের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হতে আর কোনও ভদ্রসন্তানের আপত্তি থাকত না।

•

পুরাদমে সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ চলছে। মাঠ ঘাট নদী নালা খাল বিলের নক্‌সা তৈরী হয়ে গেছে। নক্‌সা করছে আমিনরা, আর আমরা করছি তদারক্। দুনিয়ার

যত রকম কষ্টসহিষ্ণু জীব আছে, আমিন হল তাদের সেরা। নীচে জল, ওপরে রোদ, এই অবস্থায় তারা মাপছে চেন লাইন, হাঁকছে দুনল দশ, আর ছুঁচালো পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে টেনে জমির নক্‌সা তৈরী করে যাচ্ছে। কখনও পায়ের তলায় কেউটে সাপ ফোঁস্ করে উঠছে, কখনও মাথার ওপর হাকিম এসে ফোঁস্ করছেন, আর গাল দিচ্ছেন ন ভূত ন ভবিষ্যতি। জর ত লেগেই আছে। তবু এরা দমে না। আলেক্‌জাণ্ডার বেরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে, কিন্তু পঞ্চনদে এসেই থেমে গেলেন। আমার মনে হয় তাঁর যদি একদল সেট্‌লমেণ্টের আমিন কানুনগো সহায় থাকত তাহলে তিনি ভারত কেন সমগ্র পৃথিবী জয় করে ফেলতে পারতেন।

খানাপুরি আরম্ভ হয়ে গেল। ধানকাটা শেষ হয়েছে, মাঠের জল শুখিয়ে এসেছে। বড় বড় বিলের মধ্যে এখন বেশ হেঁটে যাওয়া যায়। অসুখ বিসুখ কমে এসেছে। গ্রামে গ্রামে আবার হাসি ফুটে উঠছে। আমি রোজ ভোরে বার হই, ছোট্ট আমার বেতো ঘোড়ায় চড়ে। বেতো বললাম কারণ ঐ জাতীয় ঘোড়ার আর দ্বিতীয় নাম নেই। কিন্তু কার্য্যক্ষম কম না। ঠিক যেন বাঙালী কেরাণী,—সমস্ত দিন মুখ বুজে খাটে। অনেকদিন আছে কিনা, আর এই কাজই করছে, মাঠের মাঝখানে কোথায় আমিন আছে তা এ পশুসুলভ বুদ্ধিতে টের পায়, তারপর দৌড় দেয় আমিনের টেবিলের দিকে। জানে, ঐ হ'ল ওর নঙর ফেলবার বন্দর। সেখানে ও ছাড়া পায়, মাঠের ঘাস আর ডোবার জল প্রাণভরে খায়, কাছে কাছেই চরে, মারলেও নড়ে না। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি মোজার গোড়ালিটা ছিঁড়ে গেছে, নিকষকৃষ্ণ পায়ের রঙ জুতার পিছন থেকে উঁকি মার্চ্ছে, খাকীর আধাপাৎলুনের ডাইনে বাঁয়ে হাজারবার হাত মোছার ছাপ, সবুজকালি সছিদ্র ফাউণ্টেন পেন থেকে পড়ে তারই অনেকজায়গা দেগে দিয়েছে। মোজা জামাটায় তালি দেওয়া দরকার, কোটের বোতাম দুটো ছিঁড়ে গেছে—কিন্তু সারে কে? এ সব ত আর পুরুষ মানুষের কাজ নয়।—মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। তবু ভাবি, হিন্দু বলে আমরা কী রক্ষেই না পেয়ে গেছি। নইলে এই নির্ব্বাসনের চাকরীতে পতিব্রতারা ডেজার্‌সানের অপরাধে কোন্ কালে তালাক দিয়ে দিতেন। স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়েছি এক মক্কম লোহা,—ও থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। আগে বোধকরি বিবাহিতাদের হাতে হাতকড়া পরাবার রীতি ছিল। নাক ফুঁড়ে দিতাম নথ, কান ফুঁড়ে মাকড়ি—দুই হাতে হাতকড়ি, দুই পায়ে মলের বেড়ি। কিন্তু মেয়েদের কয়েদ করলেও আমাদের যে সিভাল্‌রি নেই একথা বলে কে? খাঁটি সংস্কৃত শ্লোকে মেয়েদের সম্মানও ত দিয়েছি বিস্তর, যদিও কয়েদ করেছি কোসে। পাখীকে খাঁচায় পুরে তার ওপর কবিতা লিখেছি। জেলখানায় থেকে থেকে তারা জেলকেই ভেবেছে গৃহ, বাহিরকে ভেবেছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, এখন তাদের মুক্তির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তারাই, তাদের পীড়নের প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে তারাই,—পুরুষরা নয়। পরাধীন জাতিরা নিজের থেকেই যদি স্বাধীনতা না চায়, যদি নিজেদের ভেতরেই মারামারি ক'রে মরে,—সেইটাই হল সাম্রাজ্যবাদিদের চরম গৌরব। ডিপ্লোম্যাসিতে হিন্দুশাস্ত্রকাররাও বড় কম ছিলেন না।

বাড়ী থেকে খবর এসেছে সেজ ছেলেটার জর, ছোটটার রিকেট্‌স্ হয়েছে। মেজ মেয়েটার বিয়ের চেষ্টা বিশেষ করেই করা দরকার, বড়ছেলের টিউসানি গেছে এখন বেকার বসে খাচ্ছে। আমাদের কানুনগোদের ওপর ষষ্ঠীর কৃপা খুবই—।

খবর দিল সাহেব আসবেন ইন্‌স্‌পেক্‌সানে। যতদূর সম্ভব সব ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেছি। এই কাজে চুল পাকালুম ভুলচুক ঢাকবার মারপ্যাঁচ কি আর জানা নেই ভেবেছেন? সাহেবের আসবার পথে পথে যেখানেই কাজের একটু গোঁজামিল ছিল সেখান থেকে আমিনদের সরিয়ে দিয়েছি অনেক দূরে,—আর তাদের জায়গায় বেছে বেছে ভাল ভাল আমিন বসিয়েছি। নক্‌সার ওপর যেখানে যেখানে তেলকালির দাগ পড়েছিল সেখানে কোসে পাঁউরুটি ঘসিয়ে মেজে সাদা করে রেখেছি। নক্‌সাগুলো ধোপদস্ত ডিনার সার্টের মতন চকচক্ করছে।

সাহেব এলেন, পরীক্ষা করলেন, ফল ভালই হ'ল। হবারই কথা। এখন আর কিছু গণ্ডগোল না হলেই বাঁচি। উৎপাত কোথা থেকে কখন এসে পড়ে তাকি বলা যায়? মর্ম্মাহত হ'লাম সাহেবের কথা শুনে,—"হ্যালো কানাংগো, তোমার সব কটি ভাল আমিনই ত আমার পথের ধারে বসিয়ে রেখেছ, কিন্তু খারাপ আমিন গুলি কোথায়? আমি নবী বক্সকে দেখতে চাই।" ফ্যাসাদে পড়লাম। নবীমিঞা আমিনের বয়েস হয়েছে, কাজে বেজায় ভুল করে। তবে আমার ফাই-ফর্মাসটা খাটে, আগে গিয়ে বাসাটাসা ঠিক করে রাখে, তাকে একটু স্নেহ করি। কেবলই ভাবি তাকে ছাড়িয়ে দেব, কিন্তু উপকার পাই বলে ছাড়াতে মন ওঠে না। তাকে দিয়ে ছিলাম অনেক দূরে সরিয়ে, কিন্তু সাহেব তাকে না দেখে ছাড়লেন না।

নবী আভূমিপ্রণত সেলাম করে বললে—'আদাব'। কিন্তু কাজে বেরোল বেজায় ভুল। সাহেব বল্লেন—'তুমি এই নক্সা তৈরী করেছ?'

নবী মাথা চুলকে বললো—'ছার।'

সাহেব বল্লেন,—'কই, পয়েন্ট বসাও দেখি আমার সাম্‌নে,—লাইন তিনশো পঞ্চান্ন, অফ্‌সেট পঞ্চান্ন।'

নবী ডিভাইডার বাগিয়ে ধরলো, কিন্তু ঠক্ ঠক্ করে তার হাত কাঁপতে লাগল। সাহেব এটা লক্ষ্য করলেন, বললেন, 'তোমার হাত কাঁপে কেন?'

নবী মাথা চুলকে শুধু বল্‌লো—'ছার'।

সাহেব বল্লেন—'তুমি হোপ্‌লেস্‌লি বুড়ো হয়ে গেছ, তাই তোমার হাত কাঁপে।'

নবী চুপি চুপি আমাকে বললো যে সাহেবকে দেখে তার ভয় হয়েছে, তাই তার হাত কাঁপছে। আমি একথা জানালুম। তিনি বল্‌লেন, "কুছ পরোয়া নেই। আমি এই টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। তুমি এইবার পয়েন্ট বসাও।" এই বলে টেবিলের তলায় ঢুকে চুপ করে বসে রইলেন। নবী পয়েন্ট বসাল, সাহেব তাঁর নিজের যন্তর পাতি বার করে পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন, 'পয়েন্ট ভুল।' এই বলে নবীর ম্যাপ দিলেন রবার দিয়ে মুছে, আর আমাকে বলে দিলেন ওর হাতের কাজ শেষ হলেই যেন ওকে বিদায় করে দেওয়া হয়।

কিন্তু নবী দমবার পাত্র নয়, সে সাহেবের যন্ত্রের সঙ্গে নিজের যন্ত্র মেলাচ্ছিল, এখন কাঁদতে কাঁদতে বললো,—"এই দেখুন ছার। আমার এই আইভারি স্কেল খারাপ, সার্কেল কেম্প থেকে স্কেল দিয়েছে, তাতেই আমার কাজ ভুল হয়েছে, আমি কি করব ছার!"—এই বলে আবার হাপুস নয়নে কান্না।

সাহেব নবীর হাত থেকে তার স্কেলটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর দস্তুর মত দমে গিয়ে আম্‌তা আমতা করে বললেন—"তাইতো তাইতো, নবীর কথাই ত ঠিক।" আমারও নবীর ওপর দয়া হ'ল। আহা বেচারা বিনা কারণেই দোষী সাব্যস্ত হল। ওর ত দোষ নেই, দোষ ঐ যন্ত্রের, এবং সে যন্ত্র আমরাই ওকে দিয়েছি। সাহেব খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বল্লেন, "এস ত আমিন তোমার পকেট দেখি।' পকেট হাত্‌ড়ে আর একটা আইভারি স্কেল বেরোল, সেটা একেবারে নির্ভুল। সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন—'স্কাউণ্ড্রেল!' অর্থাৎ ব্যাপারটা এই, নবী জান্‌ত নক্সটা তার হয়েছে ভুল। কিন্তু তার ত একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। তাই সে আগে থেকে একটা খারাপ স্কেল সংগ্রহ করে রেখেছিল, ভুল ধরা পড়লে সে ঐ খারাপ স্কেলের দোহাই দেবে। কিন্তু সাহেব তা ধরলেন কি করে? সাহেব বল্‌লেন প্রথমে তাঁর একটু ধোঁকা লেগেছিল, কিন্তু পরে এই কথা ভাবলেন যে সব আমিনেই আগে যন্ত্রপাতি ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে নেয় ঠিক আছে কিনা, নইলে তাদের কাজে ভুল হবে। নবী নিশ্চয়ই জানত প্রথম স্কেলটা ভুল, জেনে শুনেই সে কি ঐ ভুল স্কেলে কাজ করবে? বল্‌লেই ত বদলে পেত। কাজেই বোধ হ'ল তার কাছে একটা ভাল স্কেল আছে। তৎক্ষণাৎ নবীর চাকরী গেল।

ইন্‌স্‌পেক্‌সান্ পর্ব্ব শেষ হলে সাহেব বললেন ঐ যে দামোদরের এক খাল দিয়ে স্বচ্ছ জল কুলকুল করে চলেছে ঐ খানে স্নান করবেন। আমি লোকজন সরিয়ে দিলাম। সাহেব পোষাক ছাড়তে লাগলেন। আমি বললাম, এমন দুর্গম জায়গা আর দেখিনি। ইংরেজ রাজত্বে কোল্‌কাতার এত কাছে এমন জায়গা যে থাকতে পারে তা চোখে না

দেখলে বিশ্বাস হয় না। সাহেব বল্লেন, 'ইংরাজ রাজত্বের দোষ দিও না বাপু। এখানে আছে কি যে এখানে পয়সা খরচ করে রাস্তা বানাতে যাবে? নইলে যদি সোনা পাওয়া যেত ত এ অঞ্চল ত ছার ইংরেজ চন্দ্র গ্রহে যাবারও পথ বার করত। কোল্ ডিষ্ট্রীক্টে কখনও গেছ—? দেখবে সেখানে কত দুর্গম পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে রাস্তা ও রেল রাস্তা বানানো হয়েছে। সেখানেও এই দামোদর আছে, তার ওপর কি চমৎকার পোল, দেখেছ? তুমি জাননা বোধ হয় সে পোল আমারই পিতামহের কীর্ত্তি।'

এ কথা জানতাম না। ওই যে বিরাট দামোদর নদ ওর পরাভব ঘটেছে এঁরই পিতামহের হাতে। দামোদর কি একথা জানে? আমরা অবিশ্বাসী, নদীর আত্মা আছে বিশ্বাস করিনে। তবু এই দামোদরের স্ফীত উদ্দাম মূর্ত্তি আমি দেখেছি, এর ক্রুদ্ধ হিংস্র গর্জ্জন আমি শুনেছি। তখন মনে হয়েছে এ যেন এর পরাভবের গ্লানিতে ক্ষিপ্ত, এর অবমাননাকারী মানুষকে দ'লে পিষে ডুবিয়ে পচিয়ে মারতে যবন সেনার মত এ যেন হৈ হৈ করে ছুটে চলেছে।

সাহেবকে স্নানের অবসর দিয়ে—আমি খালের পার দিয়ে উত্তর দিকে চল্লাম নিকটের এক গ্রামে কাজ দেখতে। গ্রামে ঢুকতেই একজন লোকের মুখে শুনলাম এ অঞ্চলে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে, মৃতদেহ পোড়াবার পর্য্যন্ত লোক নেই। এই একটু আগেই দুটো কলেরার মড়া এইখানে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম। দক্ষিণের দিকে চেয়ে দেখি দূরে খালে সাহেব স্নান করছেন, আর তাঁরই কাছে ঐ দুটো কালো কালো—ও কী!—মড়াইত! সর্ব্বনাশ, কলেরার মড়া, জলের ওপর, অত কাছে। প্রাণপণে ছুটলাম চেঁচাতে চেঁচাতে—"উঠুন উঠুন, এখনি উঠে পড়ুন।"

বেলা তিনটে হতে সাহেবের ভেদবমি সুরু হ'ল। পাগলের মত সাইক্লে ছুটেছেন, মাঝে মাঝে নামছেন, বমি করছেন, আবার উঠ্ছেন—আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সে কী লড়াই। চোখদুটো বেরিয়ে আসছে, হাতদুটো প্রাণপণ বলে সাইক্লের গ্রিপ্ ধরে আছে, থেকে থেকে কেবল জিগেস কর্চ্চেন—'আর কতদূর আর কতদূর।' নিকটতম রেলষ্টেশন যেখান থেকে মার্টিন কোম্পানীর রেল সুরু হয়েছে—সে হল এখনও ষোল মাইল, কিন্তু তা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, মিছে করে বলছি, 'আর চার মাইল, এই এসে গেল ব'লে।' তাঁর পা আর চলে না, বললাম পাল্কীতে চলুন। পাল্কীতে চড়বেন না, বড় আস্তে চলে। আর একবার বমি করবার জন্তে সেই যে নামলেন আর উঠলেন না, হাতপায়ে খিল্ ধরতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে পাল্কী ডেকে নিয়ে এলাম, তাঁকে তাতে তুলে বেয়ারাদের বললাম, 'চল্ যত জোরে পারিস। মূল্যবান প্রাণ বাঁচিয়ে দে। এমন বক্শিষ পাবি যা জীবনে প্রত্যাশাও করতে পারতিস না।' পাল্কী বেয়ারারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

এই কি দামোদরের প্রতিশোধ! এখানকার আব্ হাওয়াও বিষাক্ত ব'লে বোধ হ'তে লাগল। সেই বেনা বন, সেই বাসিয়াড়ি, সেই খাল বিল জঙ্গল, আমাদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করছে। বুনো ভাঁটফুল তার ঘৃণিত সাদা সাদা কেশর দুলিয়ে নাচতে লাগল। শেয়ালগুলো চিৎকার করতে লাগল অসভ্য হোটেনটট্দের মানুষ খাবার বিজয়োল্লাসের মত। বিকট হেঁদালগাছের দল তাদের জটা দুলিয়ে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াতে লাগল, অন্ধকার বাঁশবনে সে কী চাপা হাসির ফিস্ ফিস্ শব্দ! কানানদীর খাত দিয়ে চলবার সময় গভীর বালি আমাদের পায়ে দিল বেড়ি পরিয়ে। বিছুটির বন মারল শপাৎ শপাৎ করে চাবুক। আজ সমস্ত প্রকৃতি যেন একসাথে রুখে দাঁড়িয়েছে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্তে।

দু'টি মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল কেবল চলার দিকে। মন থেকে আর সব অনুভূতি মুছে গেছে, শরীর ক্লান্ত, স্বেদসিক্ত,—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই খালি একমাত্র কথা—'চল্ চল্'। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে চলে, কক্ষচ্যুত তারা যেমন মহাশূন্যে চলে, আর কোনও ধ্বনি নেই, ছন্দ নেই, কেবলই চলা। মনে কোনও স্মৃতি নেই, সম্বিৎ নেই, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে,—কেন যে চলেছি তাও যেন ভুলে গেছি। হঠাৎ পাল্কী বেহারাদের কথায় চমকে উ'ঠ দেখি ষ্টেশনে এসে পৌছেছি। পাল্কীর ভেতর ঝুঁকে দেখি…প্রকৃতি তার বলিদান আদায় করতে ছাড়ে নি, আরোহীর দেহ অসাড় নিস্পন্দ, হাত মুষ্টিবদ্ধ,

চোখ দুটা বেরিয়ে এসেছে, দাঁত দুপাটি কামড়াতে আসছে··· আমরা দুটি মানুষ যেন চাবুক খেয়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কিন্তু যে মানুষের ধারা সৃষ্টির আদিম কাল থেকে বিশ্বকে জয় করতে বেরিয়েছে সে মানুষ চাবুক খেয়ে দম্‌বে না। তার যে অস্থিমাংসের শরীর তাকে লাগে, কিন্তু তার যে আত্মা সে আঘাতেও দুর্দ্দম, পরাজয়েও অনমনীয়। যেখানে বাধা এসে তার পথ আটক করে, সেখান থেকেই তার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ খোলা সুরু হয়,—যেখানেই সমস্যা এসে বাঁধ তুলে দাঁড়ায় তারই তলে তলে তার চিন্তার ধারা তরঙ্গায়িত হয়ে ফুলে ওঠে একদিন ঐ বাঁধ চূর্ণ করবার জন্যে। যেখানেই মৃত্যু এসে ভয় দেখায় সেখানেই জন্ম হয় অফুরন্ত প্রাণের। চেয়ে দেখলাম দামোদরের বিকট বালু হল্‌দে ছ্যাত্‌লা দাঁত বার ক'রে হা হা করে হাসছে। আজকে এই ম্লানচ্ছায়া প্রদোষে এই যে দু'টি মানুষের নিদারুণ পরাজয় ঘটল,—ঠিক জানি এ ব্যর্থ হবে না।—এরই বার্ত্তা যাবে বাংলাদেশের মানব সত্তার দ্বারে দ্বারে—ডেকে আনবে অপরাজেয় নির্ভীক অন্তহীন মানুষের ধারাকে, যারা মৃত্যুনাগিনীর ফণায় চড়ে নাচবে, যারা আপন অদম্য শক্তির তেজে চূর্ণ করে দেবে প্রকৃতির এই নিষ্ফল আড়ম্বরকে। তাদের কুঠারের ঘায়ে মহাদ্রুম খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে যাবে, বনভূমি জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে,—তারা এসে এই হতভাগা দেশের হতভাগা অধিবাসিদের ঘোচাবে বন্ধন,—যেপথে আমরা আজ বাধা পেলুম, আঘাত পেলুম—সেই পথ দিয়ে ছুটবে তীর বেগে মানুষের রথ—এই বন্যাক্রান্ত দেশের দিকে দিকে উঠবে মানুষের জয়ের গান। সেই অনাগত বিজয় বারতা হয়ত আমার কানে পশবে না, আমি হয়ত চলে যাবো এই পরাজয়ের কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে—কিন্তু তবুও বলি,—জয় মানুষের জয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

আসার আশে

কুমারী অর্চ্চনা রায়

রিমি ঝিমি ঝিমি বাদল সন্ধ্যা আসে,
বাতায়নে আমি তোমারি আসার আশে।
সারাটা আকাশ ভরেছে নিবিড় মেঘে,
ঝর ঝর জল ঝরে অবিরল বেগে ;
হৃদয়-গগন কালো মেঘে গেছে ছেয়ে,
অশ্রু-নিঝর ঝরে' পড়ে আঁখি বেয়ে ;
উদ্দাম হাওয়া নেচে নেচে বয়ে যায়,
তপ্ত বুকের নিশ্বাস ছাড়ি তায় !

আঁধারের কোলে লুকালো সকল দিশি,
দূরের আঁধারে পথখানি গেল মিশি ;
এলেনা এখনো,—আসিবে না কভু জানি,
বসে' আছি তবু আঁধারে দৃষ্টি হানি' !

* * *

চির অপূর্ণ আশাটি ধরিয়া বুকে,
সকল বেদনা বরিয়া নিতেছি সুখে !

প্রাগ্ ইস্‌লামিক যুগের আরব কবি

মৌলভি কাদের নওয়াজ বি-এ, বি-টি

বিশ্ব-সাহিত্যের মসনদে আরবী সাহিত্যের স্থান যে কত উঁচুতে আর তার কবির সংখ্যা যে কত বেশী, তা ঠিক ক'রে বলা খুবই শক্ত। বিভিন্ন সময়ে ও যুগে এই সাহিত্যে কবির আবির্ভাব হয়েচে অসংখ্য, তাঁদের কবিত্ববিভায় আরবের সাহিত্য-গগন গিয়েছিল উজ্জল হ'য়ে আর তাঁদের যশ-সৌরভে সে দেশের বাতাস উঠেছিল মদির হ'য়ে। বাংলার কবি লিখেচেন—

"উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে"। আরব দেশের মরুভূমিতে কেকা না থাক্‌লেও তার মরুস্থানের কুঞ্জেকুঞ্জে শুনা যায় কলকণ্ঠ নাইটিঙ্গেলের গান। কাঁটার ঘায়ে যত ক্ষতবিক্ষত হয় এই নাইটিঙ্গেল্ পাখী তার গানও তত হ'য়ে উঠে মধুর।

আরব-কবিদের অবস্থাও ঠিক তাই। যত বেশী ব্যথা ও বেদনা তাঁরা পেয়েচেন্ তাঁদের কবিতাও হয়ে উঠেচে তত বেশী হৃদয়গ্রাহী ও উপাদেয়।

"মোর সকল কাঁটা ধন্য করি
ফুটবে রে ফুল ফুটবে,
মোর সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষায় তাঁদের বাণীই প্রকাশ পেয়েছে।

সেরেফ্ জীবন-কাল ব'লে নয়, মরার পরেও আরব-কবিদের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ দেশান্তরে প্রায় সব সময়েই। এমন কি আজো তাঁরা অমর হ'য়ে রয়েচেন সারা দুনিয়ার সুনাম ও সুখ্যাতির গৌরবে। যেখানে কবিতার কথা, যেখানে কবিত্বের কথা, যেখানে প্রতিভার কথা, সেইখানেই তাঁদের নাম শুনা যায় সবার আগে। আরবী সাহিত্যে সাধারণ ভাবেও যার কিছু মাত্র জ্ঞান আছে সেই ব'লে দিতে পারে অবাধে, এই সাহিত্যের অনেকগুলা কবির নাম; আর সেই সাথে সে সহজেই উল্লেখ করতে পারে এই সাহিত্যের দুদশ গণ্ডা বড় বড় কাব্যেরও নাম।

আরবী সাহিত্যের পানে অধুনা প্রায় সবাই উদাসীন, কিন্তু তবুও আরবী বইয়ের যে কোন দোকানে গিয়ে খোঁজ নিলে এখনও আরবী কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় অসংখ্য। আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধু বহুকাল কাটিয়ে এসেছিলেন মিশরের "জামে আজ্ হার" বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বলেন— সেরেফ্ আরবী কাব্যের সংখ্যাই প্রায় এক লাখ্ হবে "আজ্ হার" লাইব্রেরীতে! এই থেকে কত বিস্তৃত যে এই আরবী সাহিত্য আর তার কবির সংখ্যাই যে কত অধিক তা সহজেই ধারণা করা যায়।

আরবী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা সময়ের আগু পিছু হিসাবে তাঁদের কবিদের ভাগ করেচেন মোটামুটি চার ভাগে, যথা—

(১) খাঁটী প্রাগ্ ইস্‌লামিক যুগের।

এই যুগ "আইয়ামেজাহেলিয়াৎ" বা অজ্ঞতার যুগ ব'লে পরিকীর্ত্তিত, ইস্‌লামিক আরবী পরিভাষায়।

(২) প্রাগ্ ইস্‌লামিক ও ইস্‌লামিক এই দুই যুগই পেয়েছিলেন যাঁরা।

(৩) ইস্‌লামিক যুগের প্রথম ভাগের।

(৪) পরবর্ত্তী যুগের।

এই চার শ্রেণীর কবিদের নিয়ে বহু আলোচনা ও আন্দোলন করেছেন, সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা।

আমরা কিন্তু এখানে নাম উল্লেখ ক'রব প্রাগ্ ইস্‌লামিক যুগের জনকয়েক বিখ্যাত কবির; আর তাঁদের ভিতর সকলের সেরা কবি ইম্‌রাউল্ কায়েস ও তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করব সংক্ষেপে।

প্রাগইস্‌লামিক যুগের আরব-কবি—

(১) এম্‌রাউল কায়েস্ (২) আল্‌কমা (৩) মহল্‌হল্ (৪) জহীর১ (৫) তোর্‌ফা (৬) আন্‌তরা (৭) হাতেম (৮) বশর (৯) নাবেগা (১০) আল্‌আ'শা (১১) জহীর২ (১২) ওবেদ (১৩) ওয়ার্‌কা (১৪) লকীত্ (১৫) আল্‌-মুস্‌তাওয়ার (১৬) জরীর (১৭) জোজায়মা।
এঁরা সবাই ছিলেন সেই খাঁটি প্রাগ্‌ইস্‌লামিক যুগের কবি, আর এঁরাই ছিলেন সেই বেদুঈন দলের লোক যাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন—

"ইহার চেয়ে হ'তেম্ যদি আরব বেদুঈন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

ব'ল্‌তে কি এই বেদুঈন দলই ছিল প্রকৃতির নন্দদুলালের দল। শাওনের বৃষ্টি পড়ার শব্দে, ভিজে মাটির ভুর্‌ভুরে গন্ধে, তর্‌তর্ ক'রে ঝর্ণানাচার ছন্দে, পাখীর কূজনে, ভোম্‌রার গুঞ্জনে যে চির রহস্য লুকিয়ে আছে তা জেনে ছিল শুধু এই মরুর দুগান ভবঘুরে বেদুঈন দল।

যে প্রকৃতি সুন্দরীর কথা শুন্‌তে কবি-হিয়া চিরদিনই হ'য়ে আছে আকুল, আর যে বিশ্ব প্রকৃতিকে কথা বলাবার জন্য ললিত গাথায় লিখেচেন স্বয়ং বিশ্ব-কবিই—

"কথা কও কথা কও!
যুগ যুগান্তর, অনাদি অতীত
কেন মিছে চেয়ে রও"

আবার যে প্রকৃতি রাণীর দেখা না পেয়ে কবি গেয়ে উঠেচেন মনের দুঃখে—

"হায় কুহকি! শুধুই ফাঁকি
তোমার দেখাই রইল বাকি"

সেই প্রকৃতি-রাণীর, সেই বিশ্ব-সুন্দরীর সেই কলালক্ষীর দেখা পেয়েচে—শুধু দেখা নয় তাকে কথাও কইয়েচে—সেই আরব-মরুর চিরচঞ্চল বেদুঈন দল।

এঁদের কারো স্থায়ী ঘর বাড়ী ছিল না কোনখানে। এক একটি দল বেঁধে আজ এখানে কাল সেখানে এইভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ানই ছিল এঁদের কাজ। উট, ছাগল, মেষ, প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুগুলিই ছিল এঁদের সম্বল। আর এই সব জন্তুর দুধ ও শিকার করা জীব জন্তুর মাংসই ছিল এঁদের প্রধান খাদ্য। পানীয় জলের ছিল যেখানে সুবিধা, মখ্‌মলের মত সবুজঘাস ছিল যেখানে প্রচুর, মধুর গান শুনা যেত যেখানে বুল্‌বুলের, এক কথায় প্রকৃতির রম্যনিকেতন ব'লে মনে হ'ত যে ঠাঁইকে, সেইখানেই তাঁরা তাঁবু ফেল্‌তেন দল-বল নিয়ে। এক দলের দেখাদেখি আন্‌-দলও এসে জুটে যেত সেখানে। এম্‌নি ক'রে তাঁরা বিভিন্ন দলের সাথে মিলে মিশে এক একটি বেছে নেওয়া জায়গায় কিছুকাল কাটিয়ে দিতেন। এই সময় তাঁদের তরুণ তরুণীর প্রাণ নেচে উঠ্‌ত প্রেমের মলয় হাওয়ার দোদুল দোলায়। প্রেম্‌নিবেদন, প্রেমিক প্রেমিকার মিলন, নায়ক নায়িকার প্রেম্‌-পরিহাস, সুখের অভিলাষ, ভালবাসার ব্যাপার, আঁখির অভিসার প্রভৃতি বহু ঘটনাই ঘটে যেত সেখানে, কিন্তু হায়, সে শুধু—

"দুদিনেরি খেলা,
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা"

ঠিকই তাই, কিছুদিন পরে দল্‌বল্ নিয়ে কে কোথায় স'রে প'ড়্‌ত তারা কোন খোঁজই পাওয়া যেত না কারো। জীবনে অনেকের সাথে তাদের আর হয়ত দেখাই হ'ত না। প্রেমিক প্রেমিকার মাঝ্‌খানে প'ড়ে যেত বিচ্ছেদের এক কালো-পর্দ্দা। এই সব প্রেম-প্রীতি, মিলন ও বিচ্ছেদের ব্যাপার নিয়েই কবিতা লিখ্‌তেন সে সময়ের কবিরা।

সেকালে মক্কার কোরেশরাই উচু আসন লাভ করেছিলেন সাহিত্য-জগতে। সাহিত্যের আসরে তাঁরাই ছিলেন সেরা সমঝদার। তাই বছরের এক নির্দ্দিষ্ট দিনে মক্কাতে জড়ো হতেন যত দেশ বিদেশের বিখ্যাত আরব কবি, আর শুনাতেন তাঁরা কোরেশ-প্রধান-দিগকে তাঁদের আপনাপন কবিতা প'ড়ে। সবারই কবিতা শুনে যার কবিতা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বলে তাঁরা রায় দিতেন সেই কবিরই যশ-দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ত দেশময়, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিনন্দিত হ'তেন সাহিত্য জগতে।

কবি ইম্‌রাউল কায়েস

ইস্‌লামিক্ যুগের ৮০ বছর (৪০ বছর মতান্তরে) আগে আবির্ভাব হয়েছিল আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ইম্‌রাউল্

কায়েসের। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। ঝর্ণাধারার মতই নেচে চল্‌ত তাঁর কবিতার ছন্দ; আর তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মোটামুটি বল্‌তে হয় Keatsএর ভাষায়—"His poems used to come as naturally as leaves and flowers in a tree." এই "ইম্‌রাউল-কায়েস্‌" নামের ১৫ জন কবির নাম পাওয়া যায় প্রাগ্‌-ইস্‌লামিক্‌ যুগে। তাঁদের মধ্যে যে কবির বিষয় আলোচনা আজ আমরা ক'রচি, এক-যোগে সব সাহিত্যিক ও সমালোচক তাঁকে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে মত দিয়েচেন। তাঁর ঠিক নাম হচ্চে ইম্‌রাউল্‌-কায়েস্‌ বিন্‌ হাজ্‌রিল্‌ কন্দী। আর একটি নাম তাঁর মালেকুজ্‌ জিল্লিল্‌; কিন্তু ইম্‌রাউল কায়েস্‌ ব'লেই তিনি সুপরিচিত সাধারণ্যে। তিনিও ছিলেন বেদুঈন দল-ভুক্ত। কোন স্থায়ী ঘর বাড়ী ছিল না তাঁর। আজ এখানে, কাল সেখানে করেই কেটে গিয়েচে তাঁর সারা জীবন। সবাই তাঁকে জানে প্রেমের কবি, সৌন্দর্য্যের কবি, বা আরো একটু এগিয়ে Realistic Artএর কবি ব'লে। আদিরসে তিনি হারিয়ে দিয়েচেন্‌ এমন কি ফ্রয়েড্‌কেও। প্রেমের বেসাতী ক'রেই কেটে গিয়েচে তাঁর জীবন-কাল। সুন্দরী তরুণী দেখ্‌লেই তিনি তার প্রেমে প'ড়ে যেতেন। বিশেষ ক'রে তাঁর পিতৃব্য-কন্যা ওনায়জাকে ভালবাস্‌তেন তিনি প্রাণ দিয়ে। তার প্রেমে কবি মাতোয়ারা হয়ে ছিলেন সারাজীবন। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাতেই বর্ণিত হ'য়েচে "ওনায়জা" ও তার প্রেম-প্রীতির বিষয়। কবির অনেক কবিতাতেই আছে কুরুচি আর অশ্লীলতা এক রকম "ভ'র্‌-পেয়ালা" বা পুরামাত্রায়। আজকাল Art for Art's sakeএর দোহাই দিয়ে যে সব তরুণ, সাহিত্যে অশ্লীলতা ব'লে কিছু মান্‌তে চান্‌না তাঁদিকেও হার মান্‌তে হবে কবি ইম্‌রাউল কায়েসের কাছে।

একবার কবিবর ইম্‌রাউল কায়েস্‌ আর- আর কবিদের সাথে এসেছিলেন মক্কার কোরেশ প্রধানদের সাম্‌নে তাঁর কবিতা শুনাতে। সব শেষে তিনি পড়তে আরম্ভ ক'রলেন তাঁর কবিতা। কবিতা শুনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দল ত মুষড়ে পড়্‌ল হতাশ হ'য়ে; বিচারকের দলও তাঁর কবিতার ছন্দের লালিত্য ও রস-মাধুর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'ল। তারা একযোগে বলে উঠ্‌ল—"আরবের অনেক নাম-জাদা কবির কবিতা আমরা শুনেচি এর আগে, সে সব কবিতা পছন্দও হ'য়েছে আমাদের খুব বেশী কিন্তু আজকার মত এমন কবিতা আমরা কখনও শুনিনি। কবিতা যে এত মধুর ও সরস হতে পারে তা স্বপ্নেও ভেবে উঠ্‌তে পারিনি' আমরা কেউ।" আরব দেশ তখন ভরে উঠল তাঁর কবিতার প্রশংসায়। এক যোগে সব কবি ও সাহিত্যিকের দল ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল তাঁকে। এই সময় কোরেশ-দলপতিরা একযোগে পরামর্শ ক'রে তাঁরা ইম্‌রাউল কায়েসের এই কবিতাগুলি সোনার হরফে লিখে ঝুলিয়ে দিলেন "কাবা"-ঘরের দেওয়ালে, প্রকাশ্য জায়গায়। শুধু তাই নয়, সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি যাঁরা তাঁদিগকেও তাঁরা আহ্বান ক'রলেন ইম্‌রাউল কায়েসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবার জন্য। ইম্‌রাউলের এই কবিতাগুলির সংখ্যা ৮১। নাম-জাদা আরব-কবি তখন ছিল অসংখ্য, কিন্তু মাত্র ৬ জন ছাড়া কেউ সাহস ক'রলনা কোরেশদের এ ডাকে সাড়া দিয়ে ইম্‌রাউল কায়েসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। যে ছয় জন কবি তাঁদের কবিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের কবিতাও কোরেশ বিচারপতিদের কাছে বেশ আদৃত হ'য়েছিল। ফলে সেগুলিও (৬টি) ইম্‌রাউল কায়েসের কবিতার পাশে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল কাবা-ঘরের দেয়ালে। কাবাঘরের দেয়ালে বিলম্বিত এই ৭ জন কবির কবিতাগুলি অভিহিত হ'য়ে আস্‌চে সেই থেকে "সব্‌য়ে মোয়ল্লিকা" বা সাতটি বিলম্বিত কবিতা নামে। তবে এ কথা সত্যি যে, এদের ভিতর "ইম্‌রাউল কায়েসের" কবিতাই টাঙ্গানো হয়েচে সব কবিতার শীর্ষদেশে।

কবিদের নাম—

(১) ইম্‌রাউল কায়েস (২) জহীর (৩) নাবেগা (৪) আল্‌-আ'শা (৫) তোর্‌ফা (৬) লবীদ্‌ (৭) আম্‌র

এই সাত জনের ভিতর লবীদ ও আম্‌র পেয়েছিলেন ইসলামিক ও প্রাগ্‌-ইস্‌লামিক দুই যুগই। বাকী ৫ জন ছিলেন খাঁটী প্রাগ্‌ইস্‌লামিক যুগের কবি।

"সব্‌য়েমোয়ল্লিকো" বই আকারে বের হয়েচে ও পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়ে আস্‌চে বহুদিন থেকে। এর আবার টীকা

টিপ্পনীও দেখ্‌তে পাওয়া যায় অনেক, প্রাচীন ও আধুনিক দুইই। এই কবিতাগুলি সেই থেকে আদৃত হ'য়ে আস্‌চে আরবী সাহিত্যে সুধীসমাজে প্রায় ১৪শ বছর সমানভাবে। এগুলির সাথে কোন কবির কবিতাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি আজ পর্য্যন্ত। আমরা কিন্তু আজ বিচিত্রায় সেরেফ্‌ ইম্‌রাউল্‌ কায়েসের মোয়াল্লায়ে উল্লা (পয়্‌লা বিলম্বিত) কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটী কবিতানুবাদ দিয়ে হাজির হচ্চি সাহিত্যরসিকদের খেদমতে। অনুদিত কবিতাগুলির ভিতর যদি সত্যিকারের কিছু রস, দরদ, আকুতি ও কবিত্ব নিহিত থাকে তবে তার সবটুকু কৃতিত্বই কবি ইম্‌রাউল কায়েসের, আর যদি তার অভাব বা অন্যথা হয় তবে সবটুকুই দোষ বা অক্ষমতা অনুবাদকের।

আশারে১ ইম্‌রাউল কায়েস্‌

মূল আর্‌বী

কেফা-নাব্‌কে মিন্‌ জিক্‌রা—
—হাবিবিঁও, ওমানজেলী
বেসিক্‌ তিল নেওয়া বায়্‌নাদ্‌ দ'খুলে
ফাহাওমেলী। (২)

(অনুবাদ)

দাঁড়াও সখা একটু দাঁড়াও,
এদিক্‌ পানে নয়ন ফিরাও,
এই বালুচর পেরিয়ে রাজে, "দখুল" ও "হাওমেলের" মাঝে
মোর প্রেয়সীর বাসভূমি, হায় থাক্‌ত যেথা সে,
পিয়া ও তার বাস্তুভিটার উদ্দেশে আজ অশ্রু ব্যথার
ক্ষণিকতরে আমরা এস ফেল্‌ব হতাশে।

মূল আর্‌বী

ফাতুজেহা ফাল্‌মক্‌রাতে—
—লাম্‌ইয়াফোরস্‌মোহা
লেমানাসাজাৎহা মিন্‌ জোনুবিঁও—
—ওশাম্‌আলী।

(অনুবাদ)

পিয়ার গেহের চতুঃসীমার আগেই দুদিক চলেছি ভাই
বাকী তাহার দুই দিকে রয় "মকরাৎ" "তুজে" এই দুটী ঠাঁই।
উত্তরীবায় উড়িয়ে বালু পিয়ার গেহের চিহ্নগুলি,
যেম্‌নি ঢাকে, দক্ষিণাবায় হঠাৎ আসি দেয়্‌ যে খুলি!
ভিন্নমুখী দুই বাতাসে মাতামাতি ক'রছে বলি
লুপ্ত আজো হয়নি আমার পিয়ার গেহের চিহ্নগুলি।

মূল আরবী

তারা বা'রাল্‌ আরামে ফি-আরাসাতেহা
ওকী আনেহা কা আন্নাহু হাবো ফিল্‌ ফিলী।

(অনুবাদ)

হায় গো হায়!
সেই আঙ্গিনায়,
যেখানে মোর দিল্‌ পিয়ারীর,—
লাগ্‌ত ঝিলিক্‌ রূপের জ্যোতির,
'গোল্‌-মরীচে'র মতই কালো
বিষ্ঠা আজি শ্বেত হরিণীর।

মূল আরবী

কা আন্নীগদাতাল্‌ বায়্‌নে ইয়াওমা তা হাম্মালু
লাদা সামারাতিল্‌ হাইয়ে নাকে ফো হান্‌জলী।

(অনুবাদ)

যে দলে মোর পীতম্‌ ছিল
সে দল যেদিন গেল ভাগি'
বাব্‌লা গাছের তলায় বসি'
কাঁদনু আমি পিয়ার লাগি।

মূল আর্‌বী

ওকুফান্‌ বেহাসহ্‌বী আলাইয়ামাতি ইয়োহুম্‌
ইয়াকুলুনা লা তাহ্‌লিক্‌ আসান্‌ ও তাজাম্মলী।

(অনুবাদ)

মোর প্রেয়সীর বিচ্ছেদে হায়'
কাঁদতে ছিলুম্‌ ব্যথায় যখন,
বন্ধুরা মোর আপন আপন
অশ্বে চড়ি' ব'ল্ল তখন,—

(১) আশার্‌—কবিতাবলী
(২) দখুল ও হাওমেল্‌—দুটী জায়গার নাম।



বরণের কুলা

বিচিত্রা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক যশোহর হইতে সংগৃহীত

"সবুর কর সান্ত্বনা লও
বিদায় বেলায় ধৈর্য্য ধর,
নিরাশ হ'য়ে নিজেরে আজ
কিসের লাগি হত্যা কর!

মূল আরবী

ও ইন্না শেফায়ী আব্‌রাতুল্‌ মুহ্‌রা কাতুন্‌
ফা হাল ইন্দা রাসমিন্‌ দারোসিম্‌ মিন্‌ মোয়াও ওলী।

(অনুবাদ)

কইনু—"যখন মোর ব্যাধি হায়
সারবে ঢাসি অশ্রু অঝোর,
কান্না থামাই তোদের কথায়
কেমন ক'রে বন্ধুরা মোর!
পিয়ার গেহের বিলুপ্তবৎ
চিহ্নগুলির পার্শ্বে বসি',
কাঁদছি তবু দরদী কেউ
হয় না সহায় হেথায় পশি।"

মূল আরবী

কাদাবেকা মিন্‌ উম্মিল্‌ হুয়ার্‌রাসে কাব্‌লা হা
ওজারাতেহা উম্মির্‌ রাবাবে বেমাসালী।

(অনুবাদ)

এম্‌নি ধারাই স্বভাব যে তোর
শোন্‌রে "কায়েস্‌ ইম্‌রাউল্‌"!
প্রেমে পড়ি এর আগে তুই
দুই রূপসীর ডুবালি কুল।
এক উম্মিল্‌ হুয়ার্‌রাস্‌ (৩)
আর অন্যটী উম্মির্‌রাবাব্‌ (৪)
তাদের লাগি তখনও তোর
থাক্‌ত যে মন এম্‌নি খারাব।

প্রেমিকা যুগলের (উম্মিল্‌ হুয়ার্‌রাস্‌ ও উম্মির্‌রাবাব্‌) রূপ বর্ণন মানসে কবি নীচের কবিতায় বলচেন—

মূল আরবী

এজা কামাতো তাজাও ওয়াল্‌ মিস্‌কোমিন্‌ হুমা
নাসিমাস্‌সাবা জায়াৎ বেরাইয়াল্‌ কা বান্‌ ফোলী।

(৩) উম্মিল্‌ হুয়ার্‌রাস—কবির প্রেমিকার মধ্যে একজন। (৪) উম্মির্‌রাবাব্‌—কবির আর একজন প্রিয়া।

(অনুবাদ)

যখন তারা দাঁড়ায় আসি
ছড়িয়ে পড়ে দোঁহার দেহের কস্তুরীবৎ সুবাস রাশি।
ঠিক্‌ মনে হয় যেন তখন—
লবঙ্গেরি ফুল্‌ ছুঁয়ে বয়, গন্ধ বিধুর ভোরের পবন।

উল্লিখিত প্রিয়াদের উদ্দেশে—

মূল আরবী

কাফাজাৎ দোমূওল্‌ আয়্‌নে মিন্নি সাবাবাতান্‌
আলান্‌ নহরে হাত্তা বাল্লাদামায়ী মেহ্‌মালী।

(অনুবাদ)

বুক ভেসেছে চোখের জলে তাদের লাগি আকুল দিঠি
সেই সাথে হায় ভিজেছে মোর নীবীর অসির বন্ধনীটি।

মূল আরবী

আলারুব্বাইয়া ও মিন্‌ কানামিন্‌ হুন্না সালেহিন্‌
ওলা সাইয়েমা ইয়াওমিন্‌ বেদারাতেজুল্‌জুলি

(অনুবাদ)

চিরদিন কি ছিল এমন?
কতই সুখের দিন গেছে মোর
ভাব্‌তে কাঁদে পরাণ এখন,
"দার্‌ জুল্‌ জুল্‌" পুকুর ঘাটে
ঘট্‌ল যেদিন সেই ঘটনা *
সুখের সেদিন মোর ললাটে।

মূল আরবী

ও ইয়াওমা আকার্‌তোলিন্‌ আজারা মাতিয়া হুম্‌
ফাইয়া আজা বা মিন্‌কুরেহাল্‌ মোতাহাম্মালী।

(অনুবাদ)

আরো সুদিন গিয়েছে ভাই
সুন্দরীদের খাদ্য লাগি' উট্‌কে যেদিন করি 'জবাই' (১)
সেই কুমারী তরুণীদল,
তুললো তাদের উটের পিঠে যা ছিল মোর দ্রব্য সকল।

* ঘটনাটি—দারজুল্‌জুল্‌পুকুরে আর আর তরুণীদের সাথে 'ওনায়জা'ও স্নান কর'তে এসেছিল। কবি অলক্ষ্যে তাদের বসনগুলি চুরি করেন।

জবাই (১) ঈশ্বরের নাম করিয়া হত্যা করা।

মূল আরবী

ফাজাল্লাল্ আজারা ইয়ার তামিনা বেলাহাসে হা
ও সাহ্মিন্ কাহুদাবেদ্ দেমাক সিল্ মুফাত্তালী।

(অনুবাদ)

সেদিন ছিল সুখ যে অতুল
মাংস এবং চর্ব্বি উটের ছুঁড়ল যে-দিন সুন্দরীরাকুল্
ঠিক্ রেশমের ঝালর সম
চর্ব্বিগুলো চিক্‌চিকিয়ে হান্‌ল ঝিলিক্ চক্ষে মম।

দার জুল্ জুল্ পুকুরের তরুণীরা অনেকক্ষণ পরে কবির কাছ থেকে বসন উদ্ধার করে। বেলা অনেক হয়েছিল, তাই তারা ক্ষুধিত দেখে কবি নিজের একটি উট জবাই ক'রে তাদের দেন, তারা মাংস রেঁধে খেয়ে তৃপ্ত হয়। এই সময় তারা উটের চর্ব্বি নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি ক'রতে থাকে। তারপর ওনায়জাকে নিয়ে কবি এক উটের পিঠে একই হাওদায় চ'ড়ে চ'লে যান। সে ঘটনাটি কবি পরের কবিতায় স্মরণ ক'রেছেন।

মূল আরবী

ও ইয়াওমা দাখাল্ তুল্ খিদ্‌রা, খিদ্‌রা ওনায় জাতিন্
ফাকালাৎ লাকাল্ ওয়ায়লা তো ইন্নাকামুর্জ্জেলী।

(অনুবাদ)

সেদিনও সুখ চরম জানি,
যে দিনে মোর দিল্-পিয়ারী ওনায় জারেই বক্ষে টানি'
বসেছিলাম একই উটের হাওদাতে হায় মনের সুখে,
"ছন্নছাড়া" বলি' পীতম্ সেদিন মোরে কইল রুখে—
"যেম্‌নি ধারা ব্যাপার তুমি ক'রছ সুরু আমায় ল'য়ে
পারবে না আর সইতে যে ভার উট্‌টী তখন বাধ্য হ'য়ে
প'ড়্‌বে শুয়ে পথের রজে,
কাজেই মোরে তোমার জ্বালায় চ'ল্‌তে হবে পদব্রজে।

মূল আরবী

তাকুলো ওকাদ্ মালান্ গবি তো বেনা মায়ান্
আকার্ তো বায়িরী ইয়াম্ বায়াল্ কায়্সে ফান্‌জালী।

(অনুবাদ)

আয়ো পিয়া ব'ল্ল মোরে,
উট্‌টি মোদের দোঁহারি ভার সইবে বল কেমন ক'রে?
জ্বালিয়ো না আর তাহারে,
যাও নেমে যাও হাওদা উটের প'ড়্‌ছে ঝুঁকে একটি ধারে।

মূল আরবী

ফাকুল্ তো লাহা সিরী ও আরখী জেমামাহু
ওলাতুব্‌য়ে দীনী মিন্ জানা কিল্ মোয়াল্লালী।

(অনুবাদ)

উত্তরে তার কইনু আমি "গোল ক'রনা সুন্দরী আজ
যাচ্ছ যেমন তেম্‌নি চলো কিসের তরে এতই বা লাজ?
বরং উটের বল্গা মুখের, দাও শিথিলি' ফুল্ল মনে,
কিন্তু শুন—"চুম্বন আর বাহুর বাঁধন তোমার সনে
বারংবারি সাধ মিটিয়ে
পাচ্ছি যা আজ, তা থেকে না বঞ্চিত হই পরাণপ্রিয়ে।

মূল আরবী

এজামাস্ সুরাইয়া ফিস্ সামায়া তেয়ার্‌রাজাৎ
তায়োরা জাল্ আস্‌নায়েল্ ভিশাহিল্—মুফাস্‌সালী।

(অনুবাদ)

গভীর রাতে গেলাম যখন
গোপনে মোর পিয়ার ঘরে,
চেয়ে দেখি দীপ্ত উজল
স্তব্ধ নিঝুম আকাশ' পরে—
জ্বল্‌ছে "সুরাই" তারকা এক
জ্যোতির জালে ভুবন ভরি'
বেষ্টিত সে হাজার তারায়
মণ্ডলাকার ধারণ করি।
মনে হ'ল কে যেন এক
মুকুতা-হার হস্তে ধরি'
গেঁথেছে তায় সোনার দানা
মাঝে মাঝে একটি করি'।

কাদের নওয়াজ্

মায়া

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু এম-এ

"কোমিল্লা! কোমিল্লা! সে কোথায়?"

এক মনোরম জ্যোৎস্না রাতে কলেজ ষ্ট্রীটের একটি ছাত্রাবাসের চতুর্থতলার ছাতের কোণে চারিজন ছাত্র গভীর আলাপে মগ্ন ছিল। তাহাদের একজন উক্ত প্রশ্ন করিল।

আর এক জন উত্তর দিল, "আসামে।"

আর এক জন বলিল, "দুৎ! তোর তো খুব বিদ্যে দেখ্‌চি। কোমিল্লা হ'লো চিটাগং জেলায়।"

চতুর্থ ছাত্রটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কোমিল্লা আসামেও নয়, চিটাগং-এও নয়, কোমিল্লা ত্রিপুরা জেলায় এ, বি রেলওয়ের ওপর। আর 'কোমিল্লা' হ'লো ইংরেজী উচ্চারণ, বাংলায় তা'কে 'কুমিল্লা' বলা হয়।"

এ কথায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা দুইজন একটু দমিয়া গেল। দ্বিতীয়টি বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই তা' ভুগোলে পড়েচ, বিনয়?"

বিনয় অতিশয় বিদ্বান ছেলে, আই এ তে বৃত্তি পাইয়াছে এবং বি এ তে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইবার আশা রাখে। তাহার জ্ঞানের উপর অপর তিন জনেরই বিশেষ রকম আস্থা আছে।

বিনয় বলিল, "না; আমি একবার সেখানে গেছলুম।"

প্রথমোক্ত ছেলেটি বলিল, "তুমি গেছ্‌লে কুমিল্লায়?"

কথাটা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক বোধ হইল, কেন না বিনয়কে তাহারা "কেতাব-কীট' বলিয়াই জানে, এবং তাহার গতির পরিধি যে জন্মস্থান বরা'নগর ছাড়াইয়া যাইতে পারে তাহা কেহ কল্পনা করে নাই।

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ। তখন আমাদের আই এ পরীক্ষা হয়ে গেচে। আমার মামাতো ভাই ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরি করতেন, পরীক্ষার পর তাঁর সঙ্গে আগরতলা বেড়াতে গেছ্‌লুম।"

"আগরতলা? সে আবার কোথায়?" একজন ছেলে বলিয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "আগরতলা ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী, কুমিল্লা হ'তে মাইল ত্রিশেক উত্তরে। সেখানে যাবার পথে, ঘটনা চক্রে, আমাকে কুমিল্লা যেতে হয়েছিল।"

প্রথম ছেলেটি বলিল, "তুমি দাদার সঙ্গে যাচ্ছিলে, তোমাকে আবার কি ঘটনা চক্রে পেলে?"

"সেটা একটু অসাধারণ রকমের, সন্দেহ নেই। তোমরা শুন্‌লে বল্‌বে, খুব রোম্যান্টিক।"

"রোম্যান্টিক! বটে? বটে?"

তিনটি ছেলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিনয়কে তাহারা অতি শান্ত. অধ্যয়নরত ছেলে বলিয়াই জানিত। তাহার মধ্যে আবার রোমান্স? একজন বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার খানা কি হয়েছিল, বলে ফেল শিগ্‌গির।"

বিনয় আবার মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে মস্ত কাহিনী, বল্‌তে সময় লাগ্‌বে, আর তোমাদের শুনেই বা কি লাভ হ'বে?"

প্রথম ছাত্রটি বলিল, "লাভ লোকসানের বিচার তোমায় করতে হ'বে না। কি হয়েছিল আগে বল।"

দ্বিতীয়টি বলিল, "আজ রাতের বাকী প্রোগ্রাম ওই। তোমাকে আর পড়তে দিচ্চি নে।"

তৃতীয়টি বলিল, "খবরদার, কেটে ছেঁটে বল্‌তে পারবে না কিন্তু!"

বিনয়ের মুখখানা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ম্মল জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর একটু সলজ্জভাবে মুখ নোয়াইয়া বলিল, "তোমরা একান্তই শুন্‌তে চাও?"

তিনজনে সমস্বরে বলিল, "নিশ্চয়!"

তৃতীয়টি অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "আর সময় নষ্ট না করে বল্‌তে আরম্ভ করে দাও, বিনয় !"

বিনয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,

"কলকাতা হ'তে আগরতলা যেতে হ'লে প্রথম রেলে গোয়ালন্দ যেতে হয়, তার পর ষ্টীমারে বড় বড় নদী পেরিয়ে চাঁদপুরে গিয়ে নাম্‌তে হয়, সেখান থেকে আবার রেল গাড়ীতে চড়তে হয়।

"দাদা, নব বিবাহিতা বৌদি, আর আমি, তিনজনে যাচ্ছিলুম। আমাদের ইণ্টারের টিকিট ছিল। ষ্টীমারে বৌদি মেয়েদের ইণ্টারে বসেছিলেন, আমরা তার পাশেই পুরুষদের ইণ্টারে ছিলুম।

"গোয়ালন্দ হ'তে ষ্টীমার ছাড়লে সব যাত্রীরাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। সারাদিনের গরমের পর জোলো হাওয়াটা ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল।

"বৌদিকে জল, পাখা ইত্যাদি যোগানো আমার কর্ত্তব্য ছিল। আমি বার বার তাঁদের ঘরটার সাম্‌নে গিয়ে তাঁর দরকারের কথা জিজ্ঞেস করতুম। প্রত্যেক বারই একটু আধটু রসিকতা করতেন, আমিও তার জবাব দেবার চেষ্টা করতুম, তা'তে করে একটু হাসির সৃষ্টি হ'ত। সে হাসির ভাগ নিত বৌদির পাশে বসা একটি মেয়ে, বয়সে বৌদির চেয়ে বেশি ছোট নয়, তবে কুমারী বলে এবং হয়ত নব্যধরণের বলে তার মধ্যে তত সঙ্কোচের ভাব ছিল না। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে' সেও মুখ টিপে হাস্‌ত। তার চেহারাটি ছিল বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সুশ্রী। বিকাল বেলাকার সেই মুক্ত আকাশ আর বিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝখানে তার হাসিটি ভারি সুন্দর দেখাত।

সে মাঝে মাঝে আমাদের সুমুখ দিয়ে তার সঙ্গের ভদ্রলোকের কাছে আসা যাওয়া করত। তিনি আমার দাদার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে তুলেছিলেন। দাদা মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ও তাঁর বোন, ঢাকায় বোর্ডিং স্কুলে পড়ে, ছুটিতে কল্‌কাতা বেড়াতে গিয়েছিল, এখন বাড়ী ফিরচে।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে এল, তখন চাঁদপুরের উজ্জ্বল আলোগুলি দেখা গেল। ষ্টীমার ঘাটে লাগলে জানা গেল, কতকটা দেরী করে এসেচে, মেল ট্রেণ ছাড়বার অতি সামান্য সময় বাকী। দাদা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কুলীর জোগাড় করতে লাগলেন, কুলী ডেকে এনে তাদের মাথায় মাল বোঝাই করে দিলেন, ও দিকে আমি বৌদিকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। সে মেয়েটিও তাঁর সঙ্গ নিল, এতক্ষণে উভয়ের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার দাদা কুলী পেয়ে উঠ্‌লেন না। কুলীর দল হল্লা করে ডেকের ওপর ছুটে এসেছিল, তারপর চারদিক হ'তে 'কুলী, কুলী' চীৎকার হতে লাগ্‌ল, কে কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই। ভদ্রলোক ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার বৌদির সঙ্গে তাঁর বোনকে দেখে বল্‌লেন, "বেশ, তুমি এঁদের সঙ্গে চলে যাও, আমি মালগুলি নিয়ে আস্‌চি।" তারপর আমার দাদার দিকে ফিরে বললেন, "আমার বোন্‌টি আপনাদের সঙ্গে যাচ্চে, আমি একটু পরেই আসচি।"

"মেল ট্রেণ ধরবার জন্যে যাত্রীদের মধ্যে একরকম উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। দাদা কুলীদের হাঁকিয়ে আগে আগে চল্‌লেন, মাঝখানে বৌদি তাঁর সাথীটির হাতে ধরে যেতে লাগলেন, পেছন হ'তে আমি ভিড় ঠেলে রাখ্‌তে লাগ্‌লুম। দুজনার হাতে ধরাধরি দেখে আমি ভাবছিলুম, খানিক পরেই তো এ বন্ধুত্বের অবসান হ'বে !

"ওভার ব্রীজ পেরিয়ে আমরা প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর এসে দাঁড়ালুম। তখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। যাত্রীরা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। কুলীরা কে কোথায় ছুটচে তার ঠিক নেই। দাদা কোনো রকমে নিজের মালগুলো ইণ্টার ক্লাসের কামরাটায় নিয়ে টেনে উঠালেন। তারপর আমাদের কাছে ছুটে এসে বৌদিকে বল্‌লেন, 'এসো !' আমার দিকে চেয়ে তাঁর সঙ্গিনীকে দেখিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন, "দেখ বিনয়, ওরা মিক্‌স্‌ট্‌ ট্রেণে যাবে, তুমি একে নিয়ে পুলের সিঁড়িটার কাছে দাঁড়াও, তার দাদা এক্ষুণি আস্‌বেন।" বলে বৌদিকে এক রকম টেনে নিয়েই নিজের কামরার দিকে দ্রুতপদে চলে গেলেন। আমি ও মেয়েটি ওভার-ব্রীজের সিঁড়ির কাছে এলুম, এবং একটা গ্যাসপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর দাদার অপেক্ষা করতে লাগ্‌লুম।

"প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর তখন তাণ্ডব-লীলা চল্‌ছিল। ওভার

ব্রীজের সিঁড়ি বেয়ে বিপুল জনস্রোত প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর ছুটে পড়চে; কেউ কুলী, কুলী বলে চেচাচ্চে; কেউ সঙ্গের লোকদেরে ডাকচে; কেউ বাইরে থেকে গাড়ীর দরজা টান্‌চে, ভিতরের লোক তা' খুল্‌তে দিচ্চে না, তা' নিয়ে ভয়ানক বচসা চল্‌চে; কোথাও কুলী আর যাত্রীর মধ্যে ভাড়া নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা হচ্চে; আর তারই মধ্যে নানা রকম ফেরিওয়ালারা নিজের নিজের জিনিষ হেঁকে বেড়াচ্চে। এ কোলাহলের এক পাশে আমরা দুটি প্রাণী একটা লোকের অপেক্ষায় অধীরভাবে সিঁড়ির পানে চেয়ে আছি!

"ক্রমে ক্রমে জনস্রোত ক্ষীণ হ'য়ে এল, কলরব কমে গেল, কিন্তু তার দাদার দেখা পাওয়া গেল না। মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, ষ্টীমারের সে মিষ্টি হাসি নেই, একটা তীব্র উৎকণ্ঠার কালো ছায়া পড়ে' মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে।

"এতক্ষণ আমার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি। এখন সে আমার দিকে ফিরে, একটু কম্পিত কণ্ঠে, ধীরে ধীরে বল্‌লে, 'আমার দাদাকে ডেকে নিয়ে আসুন।'

"আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম, 'কোনো ভয় নেই, আপনার দাদা এক্ষুণি আসবেন।' তাকে ওখানে একা ফেলে যাওয়া মোটেই ঠিক নয় ভেবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

"কিন্তু তার মুখের কালো ছায়াটা আরো গাঢ় হ'য়ে পড়ল। অগত্যা আমাকে যেতে হ'ল। বললুম, 'আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান, আমি দেখে আস্‌চি।' আমি সিঁড়ির দিকে চললুম, কিন্তু দু এক পা গিয়েই ফিরে আস্‌তে হ'ল। সে উৎকণ্ঠার সহিত আমার পানে চাইলে। আমি বললুম, 'আপনার দাদার নাম কি?' সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'দেবেন্দ্র কুমার চৌধুরী।'

"আমি আস্তে আস্তে পুলের ওপর উঠ্‌তে লাগলুম। কিন্তু মনে হ'ল কাজটা ঠিক হচ্চে না। দু এক পা ফেলেই পেছন ফিরে দেখ্‌তে লাগলুম। মেয়েটি গ্যাসপোষ্টের নীচের আবছায় মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, চারদিকে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল গ্যাসের আলো ধব্‌ধব্‌ কচ্ছিল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে' আমি ডাকলুম, 'দেবেন বাবু! দেবেন বাবু!' জানতুম সে ডাক বেশি দূর পৌছবে না। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া গেল না। এ অচেনা জায়গায় রাত্রিবেলা তাকে একা ফেলে এসেচি এ চিন্তাটা যেন আমার পা আকড়ে ধরে রাখতে লাগল।

"আমি যখন ফিরে নীচের দিকে নামতে লাগলুম, তখন দেখলুম, সেই গ্যাস পোষ্টের পাশে মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে খালি প্লাটফর্ম্মটা গ্যাসের আলোকে ঝল্‌সে উঠ্‌চে। তার মুখখানি পুলের দিকে ফিরে আছে, —আমি জানতুম, কত বড় উৎকণ্ঠায়!

"তার কাছে না পৌছুতেই সে ব্যগ্রভাবে বলে উঠ্‌ল, 'কোথায় আমার দাদা?' আমি বললুম, 'তাঁকে তো খুঁজে পেলুম না। তবে আর একটু অপেক্ষা করলেই তিনি এসে পড়বেন।'

"তার মুখটা ছাইয়ের মত হয়ে গেল। আমার প্রাণে খুব লাগ্‌ল, কিন্তু কি করব, ভেবে পাচ্ছিলুম না।

"এমন সময় মেল ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। পেছন থেকে হঠাৎ দাদা আমাদের কাছে এসে বল্‌লেন, 'দেবেন বাবু এখনো আসেন নি? আমি তো মিকৃষ্ট ট্রেণ খুঁজে হয়রান।"

"আমি বল্‌লুম, 'না।'

"তখন গাড়ী ছাড়বার সিটি পড়ল। দাদা তাড়াতাড়ি আমার হাতে আমার টিকেটখানা দিয়ে বল্‌লেন, 'তুইও সে ট্রেণেই আসিস্‌। সকালে ষ্টেশনে লোক থাক্‌বে।' মেয়েটিকে বললেন, 'কোনো ভয় নেই, তোমার দাদা এক্ষুণি এসে যাবেন, তোমাদের গাড়ীর ঢের সময় আছে।"

"দাদা ছুটে গিয়ে নিজের কামরায় উঠ্‌লেন। মেল ট্রেণখানা বেরিয়ে গেল। আমি বিষণ্ণভাবে মেয়েটির দিকে চাইলুম, সে তদধিক বিষণ্ণভাবে আমার দিকে চাইলে। তার দাদা এলেন না কেন, আমি তা'কে নিয়ে এখন কোথায় যাই, এ চিন্তা আমায় ব্যাকুল করে তুলল।

"আমরা দুজনে কিছুক্ষণ সেই গ্যাসের আলোর মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। শুধু আমার অন্তরের ভিতর আমার অসহায় সঙ্গিনীটির জন্যে গভীর সহানুভূতি অনুভব কর্চ্ছিলুম।

"কিছুক্ষণ পরে দেখলুম ষ্টেশনের পেছন দিকের প্লাট-ফর্ম্মে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং তা'তে লোকজন

উঠ্তে লাগ্ল। জিজ্ঞেস করে জানলুম ওটাই মিক্স্ট ট্রেণ। মেয়েটিকে বললুম, 'চলুন, আমরা ঐ প্ল্যাটফর্ম্মটাতে যাই, আপনার দাদা ওভার-ব্রীজ দিয়ে না এসে লাইন পেরিয়েও সেখানে এসে যেতে পারেন।"

"দুজনে সুমুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে সে প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে পৌছুলুম। কিন্তু মেয়ের দাদা বা তাঁদের মালের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেল্ল। ভাবলুম, কোনো কামরায় ভদ্রমহিলা দেখতে পেলে সেখানে মেয়েটিকে রেখে আমি তার দাদার খোঁজে ষ্টীমারে যাব।

"দুজনে প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর হেঁটে হেঁটে গাড়ীর লোক দেখ্তে লাগলুম। মেয়েটি অবশ্যই তার দাদার খোঁজই কচ্ছিল; আমি দেখলুম, মহিলা কেন, কোনো মেয়েমানুষই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে মেয়েদের থার্ড ক্লাসের কাছে এলুম, সেখানে কৃষক শ্রেণীর দুটি স্ত্রীলোক বসে ছিল। কিন্তু তাদের কাছে রেখে যেতে মোটেই ইচ্ছে হ'ল না। অবশেষে সেকেণ্ড ক্লাসের সাম্নে এসে দেখ্লুম, একজন বয়স্কা মেম বসে আছে, দরজার কার্ডের ওপর তার নাম লেখাছিল মিস ম্যাক্-কি-একটা। বোধ হয় মিশনরি মেম ছিল। কার্ডে অন্য নাম না দেখে সে কামরাটাই পছন্দ করলুম।

"মেয়েটিকে উঠে বস্তে বললুম। সে বল্লে, 'সেকেণ্ড ক্লাস কেন, আমরা তো ইণ্টারে যাবো।' আমি বললুম, "আমি ষ্টীমারে যাচ্চি, ততক্ষণ বসুন। সেও আমার সঙ্গে আস্তে চাইল। আমি বল্লুম, 'তার দরকার কি? আমি পাঁচ মিনিটেই দাদার খবর নিয়ে আসচি।'

"অগত্যা সে উঠে বস্ল। দেখে সুখী হলুম মেমের সঙ্গে তার আলাপ চল্তে লাগ্ল। আমি ষ্টীমার ঘাটের দিকে চললুম।

"সেখানে গিয়ে দেখি ভারি গোলযোগ। একদল পুলিসের সঙ্গে দেবেন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, সাম্নে তাঁর ট্রাঙ্ক, বিছানা বাক্স সব খোলা পড়ে রয়েচে, আর দুতিন জন পুলিসের কর্ম্মচারী তার মধ্যে খানাতল্লাস করচে। একজন ষ্টীমারের কেরাণীকে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারখানা কি?' সে বল্লে, গোয়ালন্দ হ'তে তার পেয়ে এখানকার পুলিস এ খানাতল্লাস করচে। এবং খানাতল্লাসে কিছু সন্দেহজনক জিনিষও পাওয়া গেচে।

"দেখলুম, গুরুতর ব্যাপার। এখন দেবেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে যদি তার সঙ্গী বলে আমিও পুলিসের কবলে পড়ে যাই, তবেই হ'ল আর কি!'

"কিন্তু তা' না করেও উপায় নেই। মেয়েটির টিকিট নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আছে, তা' চেয়ে নিতেই হ'বে। আমার টাকার ব্যাগ ছিল বৌদির ট্রাঙ্কে, সঙ্গে মাত্র কয়েক আনার পয়সা ছিল, তা দিয়ে নতুন করে টিকিট কেনা অসম্ভব ছিল।

"চারদিকে লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, আমি তাদের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে দেবেনবাবুর পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি আমাকে দেখেই ঘাড় নুইয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়া কোথায়?' আমি বল্লুম, 'গাড়ীতে বসে আছে।'

"তিনি বল্লেন, 'আপনারা মেল ধরতে পারেন নি?' আমি সেকথার উত্তর না দিয়ে বল্লুম, 'মায়ার টিকিটখানা দিন।' দেবেন বাবু পকেট হ'তে এক মুঠো টাকা তুলে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'টিকিট কিন্তে হ'বে,—কুমিল্লার। তাকে পৌছে দিয়ে যাবেন।' হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লেন, 'সরে পড়ুন।' কিন্তু তক্ষুণি আবার আমার হাতটা টেনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'মায়ার আজ খাওয়া হয় নি, সেজন্যেই মিক্স্টে যাচ্ছিলুম, তাকে খাইয়ে নেবেন।' বলে আমার কাছ হ'তে সরে দাঁড়ালেন।

"আমি আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলুম। তারপর ষ্টেশনে গিয়ে ভাড়ার খবর নিয়ে দেখলুম, দেবেন বাবুর দেওয়া টাকাতে মায়ার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ও খাওয়া দুইই হয় না। তবে আমার ইণ্টার টিকিটখানাকে যদি কুমিল্লা পর্য্যন্ত সেকেণ্ড ক্লাস করে নেই, তবে দুইই হ'য়ে আরো কিছু হাতে থাকে।

"মায়ার কাছে সোজা না গিয়ে ইণ্টার কামরাটা দেখলুম। ছোট্ট, ব্রেক ভ্যানের সঙ্গে জোড়া, তা'তে কোনো লোকজন নেই, খালি পড়ে আছে।

"আমি মায়ার কামরাটার কতকদূরে থাকতেই সে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি, খোঁজ পেলেন?' তার স্বর কাঁপছিল। আমি বললুম, 'হ্যাঁ, মায়া!'

"তার নাম করাতে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল, তার দাদার দেখা পেয়েচি। নাম ধরে ডাকতে গিয়ে বাধ্য হ'য়ে তাকে 'তুমি' বল্‌তে হ'ল। কেননা, পুরুষদের নামের সঙ্গে 'বাবু' যোগ করে 'আপনি' বলা যায়, মেয়েদের সম্বন্ধে তেমন কিছু নেই। তবে সে ইস্কুলে পড়ত, বয়সে আমার চেয়ে অন্ততঃ দুবছরের ছোট ছিল, সুতরাং 'তুমি' বলাটা অস্বাভাবিক মনে হয় নি।

"আমি নাম ধরে ডাকাতে সে হেসে ফেল্‌লে,—সেই মিষ্টি হাসি যা' ষ্টীমারে দেখেছিলুম।

"কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমাকে সে হাসির আভাটি নিবিয়ে দিতে হ'ল। আমি আস্তে আস্তে সব খবর দিলুম, সে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে শুন্‌লে। তার মুখখানা আবার কালিমায় ছেয়ে গেল। চোখদুটি ছলছল করে উঠল। আমি তার হাতের ওপর হাত রেখে বললুম, 'মায়া, তুমি মন খারাপ করো না। তোমার দাদার কিছু হ'বে না, তিনি এ গাড়ীতে আস্‌তে পার্চ্ছেন না, এই পর্য্যন্ত।'

"হঠাৎ কোত্থেকে আমার হাতের ওপর এক ফোঁটা গরম জল এসে পড়ল। মুহূর্ত্ত পরে মনে হ'ল, এ তার চোখের জল। বললুম, 'এ কি মায়া?'

"সে কিছু বল্‌লে না, তবে তার হাতটি আমার হাতের নীচেই ছিল, তা' সরিয়ে নিলে না।

"আমি আস্তে আস্তে আমার হাতটি তুলে নিলুম। তারপর ষ্টেশনে গেলুম, এবং টিকিট ও খাবার কিনে মায়ার কাছে ফিরে এলুম। সেকেণ্ড ক্লাসের অতিরিক্ত ভাড়ার কাগজটা দেখে মায়া বললে, 'আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেন? আমি তো ইণ্টারেই যাই।'

"আমি বললুম, 'সঙ্গে বিছানা নেই, ইণ্টারে সুবিধে হ'বে না। তোমার দাদাই টাকা দিয়েচেন।'

"মায়া বল্‌লে, 'আপনিও তা'হ'লে এখানে আসুন।' শিশুর মত সরল, স্নিগ্ধ সে কণ্ঠস্বর!

"আমি বল্‌লুম, 'মেয়েদের গাড়ীতে আমি কি ক'রে আস্‌ব?' বলেই বল্লুম, 'ছাড়বার সময় হ'ল, খাবারগুলো খেয়ে ফেল, আমি জল এনে দিচ্ছি।'

"সে এক রকম জোর করেই খাবারের আদ্ধেকের বেশি আমাকে দিয়ে ফেললে।

"খাওয়া শেষ হ'লে আমি তার বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে সঙ্গে যে পয়সা ছিল তার প্রায় সব দিয়ে কুমিল্লায় একখানা এক্‌সপ্রেস্ তার করলুম।

"তারপর এসে বললুম, 'গাড়ী কুমিল্লা ভোর চারটায় পৌঁছুবে, তার আগের ষ্টেশনে এসে তোমাকে ডেকে তুলব।"

"যাবার পূর্ব্বে সে জানালার ওপর ঝুঁকে আবার বল্‌ল, 'আপনি এখানে এলেই ভালো হ'ত। এ কামরা তো আর মেয়েদের জন্যে রিজার্ভ করা নয়!'

"নুড়ি ছড়ানো প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা থার্ড ক্লাসের কামরায় উঠে' বসলুম। গাড়ী ছাড়ল।

"এ কামরার যাত্রীরা প্রায় সবেই সে অঞ্চলের কৃষক শ্রেণীর মুসলমান ছিল। তারা ঢুলঢুলে চোখে বসে তামাক খাচ্ছিল,—তিন চার জনের মধ্যেই একটা করে হুঁকো ছিল,—আর মামলা মোকদ্দমার কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল। সেই প্রথম আমি এতগুলো লোকে মিলে পূর্ব্ব দেশী ভাষা বল্‌তে শুন্‌লুম। তারাও কুমিল্লা যাচ্ছিল। (তারা কুমিল্লাকে বলছিল, 'কুমুল্যা')। আমি সেখানে যাব শুনে তারা আমাকে সেখানকার উকিলদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল! আমার ভাষা লক্ষ্য করে একজনে বল্‌লে, 'আপনার বাড়ী বুঝি কলিকাতায়?' কুমিল্লার বিষয়ে আমার কাছে থেকে সন্তোষজনক কোনো উত্তর না পেয়ে তারা আবার নিজের নিজের আলাপে মশগুল হয়ে পড়ল। আমি জানালা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলুম।

"আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছিল। সে জ্যোৎস্নার নীচে বন জঙ্গল গুলো কেমন একটা প্রহেলিকায় ভরে গিয়েছিল। সেগুলোর সঙ্গে,—কেমন করে জানি না,—মায়ার সে স্নিগ্ধ হাসির আভাটুকু জড়িয়ে আস্‌ছিল। হয়ত মাঝে মাঝে চোখ ঘুমে ঢুলে পড়ছিল বলে তা' হয়ে থাক্‌বে।

"জেগে থেকেও মায়ার কথাই শুধু মনে পড়ছিল। ভাব্‌ছিলুম, কি সরল-প্রাণ মেয়েটি! সে সরলতা কি সে কুমারী বলে, না পূর্ব্বদেশী মেয়ে বলে, তা' ঠিক করে উঠতে পারছিলুম না।

"মধ্যরাত্র পেরিয়ে গাড়ী একটা জংসনে এসে দাঁড়াল। আমি নেবে মায়ার গাড়ীর কাছে গেলুম। দেখলুম আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে, খড়খড়ি নাবিয়ে, তারা ঘুমুচ্চে। সে ষ্টেশনে দুচার জন যাত্রী মাত্র ওঠা-নামা করল। বোধ হয় এ গাড়ীর সঙ্গে অন্য লাইনের গাড়ীর যোগ ছিল না। আমি প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর পায়চারি করতে লাগ্‌লুম। ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটা ভারি ভালো লাগ্‌ছিল। ইণ্টার ক্লাসের ছোট্ট গাড়ীখানা খালিই আছে দেখ্‌তে পেলুম। হঠাৎ মনে একটু স্বার্থপরতা জাগ্‌ল; ভাবলুম, আমার টিকিটখানা থাক্‌লে সে কামরায় সটান শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতুম্।

"তার এক ষ্টেশন পরেই কুমিল্লা। মাঝের ষ্টেশনে গাড়ী এলে আবার নেবে পড়লুম। অসম্ভব রকম ছোট্ট সে ষ্টেশনটি, আর কি অদ্ভুত নাম, 'লাল-মাঈ'! হঠাৎ দেখে অবাক হলুম, পশ্চিম দিকে একটা পাহাড়, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার মধ্যে কালো হ'য়ে, আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

সেকেণ্ড ক্লাসের দরজায় গিয়ে মায়াকে ডেকে উঠোলুম। সে একটা খড়খড়ি ফেলে দিয়ে জানালার ধারে বসল। আলুথালু চুল, হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেচে। আমি বললুম, 'পরের ষ্টেশনই কুমিল্লা, তোমাদের বাড়ীর লোক এলে চিনে নিয়ো।' সে বল্‌লে, 'আচ্ছা।' বলে জানালার পাশেই বসে রইল। হয়ত সঙ্গিনীর ঘুম ভাঙ্‌বে বলে আলো জ্বালায়নি। সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোতে জানালার ফ্রেমের ভিতর তার চেহারাটা একটা রহস্যময় চিত্রের মত দেখাচ্ছিল। কতকটা রবীন্দ্রনাথের আঁকা মেয়ে মানুষের ছবির মত,—স্পষ্ট বোঝা যায় না, অথচ চাইলে বুকের ভিতরটা ঢিব্‌ ঢিব্‌ করে ওঠে!

"আমি নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে সেই পাহাড়টা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। সমতল ভূমির ওপর হঠাৎ চূড়াগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে। জ্যোৎস্নার মধ্যে সেগুলো এক একবার অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণের ভিতর কোত্থেকে একটা নেশার আমেজ এল; আমি কুমিল্লা পর্য্যন্ত চুপ করে বসে রইলুম।

"সেখানে গাড়ী থামলে মায়ার কাছে গেলুম। তাদের বাড়ীর লোক কেউ আসে নি। সে মেমকে ভিতর হ'তে গাড়ীর দরজা বন্ধ করতে বলে নেবে এল। মেম নিদ্রা-জড়িত স্বরে বল্‌লে, 'গুড্‌ নাইট্‌'। মায়া আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লে, 'এখন গুড্‌ মর্ণিং যে!' দেখলুম কুমিল্লায় এসে তার মনটি খুসী হয়ে উঠেচে।

"প্ল্যাটফর্ম্মে আমরা কিছুক্ষণ লোকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। কোনো লোক দেখা গেল না। মায়া বল্‌লে, 'চলুন আমরা গাড়ী করে বাড়ী চলে যাই।' প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হ'ল না, কেননা শেষরাত্রে ডাকাডাকি করে লোকের ঘুম ভাঙানো, ভারি বিশ্রি ব্যাপার হ'বে,—বিশেষতঃ আমি যখন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তা' যাতে না করতে হয় তারই জন্যে আমি শেষ সম্বল পর্য্যন্ত খরচ করে তার করেছিলুম।

"যা' হোক দুজনেই ফটকের দিকে অগ্রসর হ'লুম। মায়া ক্ষীণ জনতার মধ্যে বৃথাই বাড়ীর লোকের খোঁজ কচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম, লোক এল না কেন? এক্‌স্‌-প্রেস তার না পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। যদি এখন গাড়ী করে যাই, আর কোনো কারণে বাড়ী খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে ভারি অসুবিধায় পড়তে হ'বে। এ সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ষ্টেশনের বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, গাড়ী দাঁড়াবার স্থানটা শূন্য করে শেষ গাড়ীখানা চলে যাচ্চে। মায়াকে বল্লুম, 'সব ক'খানা গাড়ীই চলে গেল?'

"মায়া ব্যাকুল ভাবে বল্‌লে, 'তাইত! ভারি মুস্কিলে পড়া গেল তো! এখন কি করা যায়?'

"আমি বল্লুম, 'আমার মনে হয় এ ট্রেনের সময়ে খুব কম গাড়ীই ষ্টেশনে আসে। গাড়ীর জন্য আমাদের সকাল হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।'

"মায়া বিষণ্ণমুখে বল্‌লে, 'আজ পদে পদেই বিপদ।'

"আমি বললুম, 'আর ঘণ্টাখানেক পরেই ভোর হ'বে, ততক্ষণ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করা যাবে। বাড়ী তো

এসেইচ, আর এক ঘণ্টায় কি এসে যাবে?' তার উত্তরে মায়া শুধু সলজ্জভাবে আমার দিকে চাইলে।

"ওয়েটিং রুমটা খালিই পড়েছিল, ষ্টেশনের লোককে বলে তার আলোটা জালিয়ে নেওয়া হ'ল। মায়াকে বল্লুম, 'তুমি ঈজিচেয়ারটাতে গিয়ে বস এবং একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর, আমি হঠাৎ তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েচি। ভোর হ'লে ডেকে দোবো।'

"সে তা'তে বস্‌লে। বললে, 'আপনিও বসুন।'

"আমি টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে বসলুম। তার বাবার কথা, বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলুম। কথা বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল, সে ঈজি চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ল।

"আমি বারান্দায় পাইচারি করতে লাগলুম। অসময় বলে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা সকলেই কোনোরকমে কাজ সেরে চলে গেছে। কুলিরাও বারান্দায় পড়ে' ঘুমুচ্চে। সব নীরব, শুধু তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুম থেকে গুণগুণ আওয়াজ ভেসে আসচে। এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, চাঁদপুরের সেই মুসলমানেরা তামাক খাচ্চে, আর নিদ্রালু চক্ষে ধীরে ধীরে আলাপ কর্চ্ছে।

বারান্দা হ'তে নেমে বাগানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পাইচারি করতে লাগলুম। ক্ষীণ জ্যোৎস্না ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে মাঠের মাঝখানের সাদা রাস্তাটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল।

"আমি চল্‌তে চল্‌তে বাগান হতে এক একটা ফুল তুলে নিতে লাগলুম।

"ধীরে ধীরে পূবদিকে রক্তিম আভা দেখা দিল। জ্যোৎস্না নিবে গেল। প্রত্যুষের সে শিশির ভেজা অস্পষ্ট আলো যেন আকাশ পৃথিবীকে একটা অসীম নির্ম্মলতায় ভরে দিল।

ক্রমে আকাশ লাল হয়ে উঠ্‌ল। এ সূর্য্যোদয় বহুদিনের পরিশ্রমের পর সফলতার মত অতি স্নিগ্ধ বোধ হ'ল। খেয়ালের বশে হাতের ফুলগুলিকে লতা দিয়ে বেঁধে একটা ছোট্ট তোড়া করলুম।

"যাবার সময় হ'য়ে এল, তাই মায়াকে ডাক্‌তে গেলুম

"ঘরে গিয়েই অবাক হ'য়ে দাঁড়ালুম। ঊষার সোনালি আভা সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়া ঈজি চেয়ারের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। ঊষারই মত সুন্দর উজ্জ্বল, পবিত্র তার মুখখানি। ফুলের মত স্নিগ্ধ, কোমল তার দেহ। ঘুমে ঢলে পড়া হাতদুটি কোলের ওপর শিথিলভাবে পড়ে রয়েছিল।—তারই দেহের ছটা যেন ঐ মসৃণ দেয়ালের ওপর রাঙিয়ে উঠেছিল। তারই নিঃশ্বাসে যেন ঘরের বাতাস সৌরভে ভরে গিয়েছিল।—আমি ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হ'ল জীবনে ওরকম সুন্দর একখানি মুখ, ও রকম কমনীয় একটি দেহ আর দেখিনি।—

"ধীরে ধীরে ডাক্‌লুম, 'মায়া!' সে সাড়া দিলে না। ধীরে ধীরে হাতের ফুলের তোড়াটি দিয়ে তার হাত দুটিতে কোমল আঘাত করলুম। শিশির-ভেজা ফুলের শীতল স্পর্শে তার ঘুম ভাঙ্‌ল। চোখ মেলে মুহূর্ত্তকাল সে আমার দিকে বিহ্বলভাবে চেয়ে রইল। সরল, মাধুর্য্য-ভরা সে দৃষ্টি।—যেন কোন দূর স্বপ্নলোকের!

"দেখতে দেখতে ঊষার সোনালি আলোতে ঘরখানা ভরে গেল। আমি বললুম, 'মায়া, এবার যাবার সময় হ'ল।'

"সে চকিতে উঠে দাঁড়াল। আমি বল্লুম, 'না, এত তাড়াতাড়ি করতে হ'বে না। তুমি বোসো, আমি গাড়ী নিয়ে আসচি।' তারপর একটু সংকোচের সহিত ফুলের তোড়াটা দিয়ে বল্লুম, 'এই নাও।'

"সে সলজ্জ হাসির সহিত তোড়াটা নিল।

"আমি বাইরে এসে একজন কুলীকে গাড়ী আন্‌তে পাঠালুম। দেখলুম, যারা প্রভাতের অপেক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে বসেছিল, তারা এখন সহরের দিকে রওনা হয়েচে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট পুঁটলি, অনেকেরই হাতে হুঁকো, সেই আমার গাড়ীর সহযাত্রীরা!

"মায়ার কাছে ফিরে গেলে সে জিজ্ঞেস করলে, 'গাড়ী এসেছে?' আমি বল্লুম, 'এক্ষুণি আসবে, আর একটু বোসো।'

"সে বল্‌লে, 'বসে বসে আমি খুব ঘুমিয়েচি! আপনি কোথায় ছিলেন? এ ফুল কোথায় পেলেন? বেশ মিষ্টি গন্ধ তো!'

"তার উৎসাহ দেখে আমার আনন্দ হ'ল। বললুম, 'মায়া, আর একটু পরেই তো বাড়ী পৌঁছে যাবে!' সে তার সুন্দর চোখদুটি তুলে আমার পানে স্থিরভাবে চাইলে, তারপর যেন লজ্জায় চোখ আবার নামিয়ে নিলে। একটু থেমে বললে, 'আমার জন্যে আপনার খুব কষ্ট পেতে হয়েচে, না?'

"আমি বললুম, 'মোটেই নয়।'

"আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর সে বললে, 'দাদার জন্যে ভারি চিন্তা হচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁকে স্বপ্নে দেখ্‌ছিলুম।'

"তার মনটা পাতলা করবার জন্যে বললুম, 'কি স্বপ্ন দেখছিলে, মায়া?'

"সে সঙ্কোচ এড়িয়ে কতকটা সহজভাবে বললে, 'যেন আপনার সঙ্গে আমি তাঁর খোঁজে যাচ্চি। পথে একটা বড় নদী, তার পাড়ে মেমটা দাঁড়িয়ে আছে। বল্লে পেরিয়ে যাও, ওপারে দাদা আছে। আমরা দুজনেই জলে নেবে পড়লুম, মাঝখানটায় গেলে বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ল, তারই একটা ঢেউ হঠাৎ আমার গায়ে এসে লাগল, আমি জেগে উঠলুম।'

"আমি একটু হেসে বললুম, 'তোমার মনের ভাবনা থেকে ও-স্বপ্ন হয়েচে। তোমার দাদা হয়ত আজই এসে পৌঁছে যাবেন।' তারপর বললুম, 'মেম তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?'

"সে বললে, 'হ্যাঁ, পড়াশোনার কথা। তবে আমার সঙ্গে বিছানা নাই দেখে অবাক হয়েছিল। গরমের দিনে গাড়ীতে চল্‌তে আমরা বিছানা নিয়ে চলি নে, একথাটা বিশ্বাস কর্চ্ছিল না।' তার পরে একটু হেসে বললে, 'মেমটা ভেবেছিল—', বলে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল, এমন সময় কুলী এসে খবর দিল গাড়ী এসেচে।

"আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। মায়া গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বললে। সঙ্গে মাল নাই দেখে কুলী বেচারীও ভারি অবাক হ'ল।

"দুদিকে সারি সারি গাছ, মাঝখানে লাল ইটের রাস্তা, তার ওপর দিয়ে গাড়ীখানা চল্‌ছিল। গাড়ীতে উঠে দুজনে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। তারপর আমি বললুম, 'মায়া, তোমাদের বাড়ীর কেউ যে আমায় চিন্‌বে না!'

"সে মৃদু হেসে বললে, 'আমি চিনিয়ে দোবো।' তার চোখে আনন্দের দীপ্তি! বহুদিন পরে নিজেদের শহর দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

"আমার দিকে ফিরে বললে, 'আপনি আর কুমিল্লা এসেচেন?'

আমি বললুম, 'না, এই প্রথম।'

"সে বললে, 'আপনার বুঝি পশ্চিম বাংলায় বাড়ী?'

"সেই রেলগাড়ীর প্রশ্নটা তার মুখে আবার শুনে ভারি অবাক হ'লুম।

"তারপর সে আমার পড়া শোনার কথা জিজ্ঞেস করলে। কলেজে পড়ি জেনে তার চোখ দুটি সম্ভ্রমে বিস্ফারিত হয়ে পড়ল। বললে, 'আমার এখনো ম্যাট্রিক দিতে দু'বছর বাকী!'

"আমি বললুম, 'মায়া আজ ন'টার গাড়ীতেই আমায় যেতে হ'বে।' সে একটু আবেগের সহিত বললে, 'তা' অসম্ভব। আপনি দু'একদিন থেকে আমাদের শহরটা দেখে যাবেন। বড় বড় দিঘী আছে, নদী আছে, শহরের বাইরে গেলে ধানের ক্ষেত দেখ্‌তে পাবেন। খুব সুন্দর!'

"আমি বললুম, 'মায়া আমি চলে গেলে আমার কথা মনে থাকবে তোমার?'

"হঠাৎ তার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে পড়ল। সে মাথা নুইয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'চিরকাল মনে থাকবে।'

"তার পর একটু মৃদু হেসে, ঈষৎ সলজ্জভাবে বললে, 'আমায় আপনি মনে রাখবেন তো?' বলে তার সুন্দর চোখের পাতাগুলি তু'লে আমার দিকে উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

"আমি কি বলব খুঁজছিলাম, এমন সময় গাড়ীর গতি কমে এল। মায়া পাশের দিকে চেয়ে উল্লাসের সহিত বলে উঠ্‌ল, 'ঐ দেখুন, আমাদের 'বাসা' দেখা যাচ্চে।'

"গাড়ী আর একটু এগুলে দেখলুম, সুন্দর ছোট্ট একটি বাড়ী, সুমুখে বাগান। তখন লক্ষ্য করলুম, সে বাড়ী হতে খাকি পোষাক পরা একজন টেলিগ্রাফ পিয়ন বেরিয়ে আসচে।

"গাড়ী থাম্‌লে দুজনে নাব্‌লুম। মায়া আগে আগে গেল। সুমুখের ঘরে ঢুকেই জোরে কথাবার্ত্তা হচ্চে শুনতে পেলুম। মায়ার বাবা পাশের ঘরে দুখানা টেলিগ্রাম হাতে করে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখেই থমকে গেলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লেন, 'এই যে মায়া এসেছিস্। আপনার নামই ধীরেনবাবু?' আমি বললুম, 'তিনি আমার দাদা।' ভদ্রলোক বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'এক্‌স্প্রেস্ তার, তবু সময়মত আস্‌বে না। আপনাদেরে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েচে। দেবেনের কি হয়েছিল বলুন তো?'

"দেখলুম দেবেন বাবু আর একখানি তার করেচেন, তাতে আমাদের সঙ্গে মায়ার আসার কথা এবং নিজের বিপত্তির কথা লেখা ছিল। মায়ার বাবার কাছে বসে ধীরে আমি সব কথা বললুম। শুনলুম, মায়াও ভিতরে সমস্ত কাহিনী বল্‌চে। অবাক হ'লুম, মায়া খাঁটি পূর্ব্বদেশী ভাষায় কথা বল্‌চে। গাড়ীতে সে রকম কথা শুনে বড্ড খারাপ লেগেছিল, এখন কিন্তু একটুকুও লাগ্‌ল না।

"মায়ার বাবা আমাকে স্নেহে ও সহৃদয়তায় অভিভূত করে ফেল্‌লেন। অন্ততঃ সেদিনটা সেখানে থেকে যেতে বিশেষ অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমি ন'টার গাড়ীতেই যাওয়া স্থির করলুম, কেননা দাদা বৌদি আমার জন্তে চিন্তিত হবেন। তবে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে আগরতলা হ'তে কলকাতা ফিরবার পথে আমি কুমিল্লা হ'য়ে যাব এবং তাঁদের বাড়ীতে দু একদিন থাক্‌ব।

"আমি যখন খাওয়া দাওয়া সেরে চলে আস্‌তে প্রস্তুত হলুম, তখন মায়ার বাবা তাকে ডেকে বল্‌লেন, 'মায়া, এ ভদ্রলোক তোকে এত কষ্ট করে এনে পৌছিয়ে দিয়ে গেলেন, তুই তাঁকে কিছু বল্লিনে?' মায়া পাশের ঘরের পর্দ্দার আড়ালে দাড়িয়ে ছিল, এখন সঙ্কুচিতভাবে এসে বাপের পাশে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, 'আপনার টিকিটখানা নিলুম। সেকেণ্ড ক্লাসের অতিরিক্ত ভাড়ার লাল রসিদটি দিয়ে তা' মোড়ানো ছিল, কুমিল্লা ষ্টেশনে তা' দেওয়া হয় নি। দেখলুম, রসীদের কাগজটা কতক ভেজা; মায়া নিশ্চয়ই সারারাত সেটাকে গায়ের জামার ভিতর রেখেছিল।

"মায়া তার কোমল চোখদুটি তুলে আমার পানে চাইলে। আমি 'তবে আসি এখন' বলে, তার পানে চেয়ে একটু মুচকি হেসে, তার বাবাকে প্রণাম করে, বেরিয়ে পড়লুম।

"আমাকে ষ্টেশনে নেবার জন্তে প্রভাতের উজ্জ্বল রৌদ্র-ভরা লাল রাস্তাটার ওপর একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তা'তে উঠবার আগে একবার বাড়ীটার দিকে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখলুম বাগানের দিকটার জানালার শিক ধরে মায়া দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম, তার সুন্দর, কোমল মুখখানি ছাইয়ের মত হ'য়ে গেচে।

"ঠিক সময় মত ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলুম, এবং বিকেলে আগরতলা গিয়ে পৌছুলুম।

"আগরতলা হ'তে কলকাতা ফিরবার পথে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্তে আবার কুমিল্লা নেবেছিলুম। আগে কোনো চিঠিপত্র লেখালেখি হয় নি বলে ষ্টেশনে মালটা রেখে নিলুম। কিন্তু মায়াদের বাড়ী গিয়ে দেখলুম, দরজায় তালা। পাশের বাড়ীতে খোঁজ করে জানলুম, ওরা দেশের বাড়ীতে চলে গেচে।

"ষ্টেশনে ফিরবার পথে মনে হ'ল মায়া বলেছিল, 'আমাদের শহরটা দেখে যাবেন, বড় বড় দিঘী আছে, নদী আছে, খুব সুন্দর।' গাড়ী বিদায় করে দিয়ে হেঁটেই চল্লুম। সোজা রাস্তা ছেড়ে কতকটা ডান দিকে এগিয়ে গেলুম। খানিক পরে দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা দিঘী, চারদিকে খোলা মাঠ, তার ধারে, দিঘীর পাড়ে দুচারটা বাড়ী, বাগান-ঘেরা। বাস্তবিকই সুন্দর! দিঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে একটা লাল রাস্তা গেচে, তার এক কোণে বড় দুটা বটগাছ. গোড়াতে ছোটখাট পাহাড়ের মত মাটির ঢিবি। একটা গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে বাকী দিনটা কাটালুম। এক একবার মনে হচ্ছিল, আবার মায়াদের বাড়ী যাই, হয়ত সেখানে দেখ্‌তে পাব মায়া বাগানের পাশের দোরটার শিক ধরে, আমার পথপানে চেয়ে, ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা হ'লে ষ্টেশনে ফিরে গাড়ী ধরে কলকাতায় চলে এলুম।

বিনয় থামিলে তাহার শ্রোতা তিনজন অসহিষ্ণুভাবে বলিল, 'তারপর? তারপর?"

বিনয় বলিল, "তারপর আর কলকাতা ছাড়িনি।"

প্রথম ছাত্রটি বলিল, "তার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না?"

বিনয় বলিল, "না। বাকী জীবনে হ'বে বলেও মনে করি নে।"

দ্বিতীয়টি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কেন, তুমি আবার কুমিল্লা গেলেই পার?"

বিনয় বলিল, "পাগল না কি? দুবছর হ'য়ে গেচে, এখন তাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?"

তৃতীয়টি বলিল, "তা'কে তোমার আবার দেখতে ইচ্ছে হয় না, বিনয়?"

বিনয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হ'লই বা! জগতে কি সব ইচ্ছাই পূর্ণ হয়?"

এ কঠোর কথাটা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রাণে আঘাত করিল।

সেই গভীর রাত্রে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মধ্যে, কলেজ ষ্ট্রীটের পাঁচতলা বাড়ীটির চতুর্থ তলার ছাতের কোণে, চারিটি তরুণ যুবক বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল।

অবিনাশচন্দ্র বসু

দুইটী পর্ত্তুগীজ সনেট্ *

শ্রীকালীপদ হাজরা

১

বন্ধু তাহার প্রথম চুমাখানি
সোহাগভরে রাখ্‌লো আমার হাতে,
সেই দিনেতেই রূপের দেশের বাণী
শোনালো কে যেন গভীর রাতে।
তা'রি দেয়া সবুজ অঙ্গুরীয়
লজ্জা করে হস্তে পরিবারে,
তবু তা' মোর প্রাণের অধিক প্রিয়,
প্রথম চুমার চেয়ে বুঝি তা'রে।
দ্বিতীয় চুম দিয়ে কপোল'পরে
মলিন পরাণ নিল অমল ক'রে।
শেষে বঁধু আমার প্রেমে গলি'
অধরে চুম দিল সুধাধার,
তখন থেকে গর্ব্বভরেই বলি,
"ওগো প্রিয়, আমার আপনার।"

২

হে রাজ গায়ক, মোদের মাঝে কতই ব্যবধান,
সমান নহে ভাগ্য মোদের, সমান নহে মান।
ভেবে দেখ, রাজার সভায় পরম সমারোহে
সুরের জালে সৃষ্টি কর কতই মায়ামোহে।
কত উজল আঁখি তোমার চক্ষে চেয়ে রহে,—
—অশ্রুভরা আমার আঁখি উজলতর নহে।
"বন্ধু" তোমায় ব'লতে ডরি ওহে গায়করাজ;
কত যোজন তফাৎ ওহে তোমার আমার মাঝে।
উজল আলোক হ'তে তুমি দেখ্‌বে কিহে চেয়ে
দীন এ বাউল অন্ধকারে ফেরে হে গান গেয়ে;—
গাঁয়ের ধারে, নদীর তীরে, বন ও উপবনে
কতই কি যে গেয়ে গেয়ে চলে আপন মনে।
আমার মাথায় ঘর্ম্ম ঝরে, তোমার মাথায় তাজ;—
মৃত্যুতে সব সমান হবে, প্রভেদ শুধু আজ।

* এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং এর সংগ্রহ হইতে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম্-এ

জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে বাইবেলে Salts of the Earth বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। লবণ যেমন কোন খাদ্যদ্রব্যকে কালের কবল হইতে রক্ষা করে, শীঘ্র পচিতে দেয় না, সেইরূপ মহাপুরুষগণও জগৎকে নষ্ট হইতে দেন না। গীতার যদাযদাহি ধর্ম্মস্য শ্লোকেও ঐ এক কথাই বলা হইয়াছে। জগতের উন্নতি চক্রের আকারেই চলে, কখনও উন্নতি কখনও অবনতি। জগতের চরম উন্নতি যে আমরা বিস্মৃত কোন এক সুদূর অতীতে ফেলিয়া আসিয়াছি, এবং ক্রমশই অধোগতির পথেই চলিয়াছি, ইহাও যেমন বিশ্বাস হয় না, সেইরূপ ডারউইনের আইনমত জগৎ ক্রমশই উন্নতির পথে চলিয়াছে বিগত যুগ হইতে অধুনাতন যুগ সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেয় ইহাও সেইরূপ বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের এই সর্বদাধিকৃত কলিযুগ সত্যযুগের মতই ভালোয় মন্দয় মিশানো; পাপী ও ধার্ম্মিক যেমন তখনও ছিল সেইরূপ এখনও আছে। সত্যযুগেও একদিকে দেখি রাবণের দল জগৎকে টানিয়া নরকে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল আবার অন্যদিকে রামের মত ব্যক্তি আপনার আত্মার পুণ্য প্রভাব দ্বারা পৃথিবীকে সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেন নাই। আমাদিগের এই কলিযুগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই,—জগতে যেমন পাপীর অভাব কোন সময়েই হয় নাই, সেইরূপ এমন দুএকটি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও কখনই অভাব হয় নাই যাঁহারা জগতের সেই নরকমুখী গতির পথরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের গোড়ার কথাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে জগতের অতি শিশু অবস্থায়, যীশুর Ten Commandments যীশুর সময়েই কিছু নূতন আবিষ্কার হয় নাই—কিন্তু সেগুলির পালন যীশুর সময়েও যেমন বহুলোক করিতে পারে নাই—আজও সেইরূপ বহুলোক করিতে পারে না। সাধারণ মানুষ কেবলই সেগুলি ভুলিতে চায় - কিন্তু দুএকজন ব্যক্তি আপনাদের জীবন দিয়া সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখেন, আমাদের ভুলিতে দেন না। আমরা সাধারণের দল তাঁহাদের কথা শুনিতে চাই না। উল্টে তাঁহাদের লাঞ্ছনা করি এমন কি তাঁহাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করি। অবশেষে তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে Canonise করি, দেবতাজ্ঞানে পূজা করি। যীশু জোরয়াস্তার, শ্রীকৃষ্ণ মহম্মদ, বুদ্ধ শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, ইঁহারা কখনই সংখ্যায় বেশি ছিলেন না। তাঁহারা নীলকণ্ঠ, জগতের সমস্ত বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া জগৎকে কেবলই বিষমুক্ত করিতেছেন। কিন্তু জগৎ কখনই নির্বিষ হইতেছে না, পুনরায় বিষ সঞ্চিত হইতেছে, আবার পরিষ্কৃত হইতেছে। জগতের ইহাই গতি,—কচুরী পানার মত কখনই পাপের গোড়া মরে না, হয়ত মরা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ পরমহংসদেব বলিতেন সকলেই যদি বুড়ী ছুঁইয়া বসে তবে খেলা চলে না, পাপের নিঃশেষ হইলে জগৎ অচল হইয়া যায়।

কথা হইতেছে,—এই যে জগৎকে সঞ্চিত বিষ হইতে কেবলই মুক্তি দিতেছেন, ইঁহারা কাহারা? এই প্রশ্নের উপর অনেক তর্কের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের ভক্তেরা আপনাপন গুরুদেবকে মানুষ বলিতে চান না। নিক্তির সূক্ষ্ম বিচারে কাহাকেও আখ্যা দেওয়া হয় অংশাবতার, কাহাকেও পূর্ণাবতার, কাহাকেও বা পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ। যাঁহারা মহাপুরুষদিগের এইরূপ ভগ্নাংশগত স্থানবিধান করিয়া আনন্দ পান তাঁহাদের মনে বেদনা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; যাঁহারা তাঁহাদিগকে স্রেফ মানুষ বলিয়াই পূজা করিতে চান তাঁহাদের তরফের দু'একটা কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে এবং নবীনচন্দ্র তাঁহার প্রভাস

রামকৃষ্ণ বর্ষস্মৃতি সভায় ফরিদপুর টাউন হলে পঠিত।

রৈবতক কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে মানুষ ভাবেই দেখিয়া পূজা করিলেন। শিশিরকুমার অমিয়-নিমাই-চরিতে নিমাইকে মানুষ দেখিলেন বলিয়াই কি নাস্তিক! কি জানি কেন জগতের যত মহাপুরুষদিগকে মানুষ ভাবিবার একটা গূঢ় সার্থকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি। একেত আমরা মানুষ ছাড়িয়া কিছু ভাবিতেই পারি না। তাই প্রতিমায় আমাদের দেবতাদিগকে মানুষেরই আকার দিই। বাইবেলে আছে ভগবান মানুষ গড়িলেন after his own image, আপনার মত করিয়াই, কিন্তু কথাটা উল্টাইয়া বলিলেই যেন ঠিক বলা হয়, আমরাই ভগবানকে গড়ি আপনাদের আকার দিয়া। মানুষ স্বভাবতই anthropomorphic—আমরা পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না—ইহা আমাদের psychic necessity এবং পূজা করি সকল গুণের আদর্শ কোন এক মানুষকেই। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বে সেই কথাই বলেন, নীটশের অতিমানববাদও তাই বলে। বঙ্কিমচন্দ্র নীটশের সহিত আমাদের তফাৎ এই যে তাঁহারা পূজা করেন মানুষকে মানুষ ভাবিয়াই, আমরা তাঁহাদিগকে দেবতার আখ্যা দিয়া তবে পূজা করি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র চৈতন্য বুদ্ধ ইঁহাদিগকে মানুষ ভাবিতে পারিলেই ত মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হয় বেশি, আমরা গর্ব্বের সহিত ভাবিতে পারি মানুষ কত মহৎ হইতে পারে। আমরা ভগবানকেই মানুষ ভাবিয়া পূজা করিয়া যদি আনন্দ পাই, তবে কেন মানুষকে ভগবান ভাবিয়া দূরে ঠেলিয়া পর করিয়া দিব? মানবত্বের সেরা নমুনাগুলিকেই যদি আমার মানবের পর্য্যায় হইতে সরাইয়া দিব, তাহা হইলে মানুষ আমরা কাহাদের লইয়া। তাই বলিতেছি, যদি কেহ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বুদ্ধ যীশু প্রভৃতিকে পূর্ণাবতার না ভাবিয়া পূর্ণ মানুষই ভাবেন তাহা হইলে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহাদিগকে মানুষ ভাবিতে পারিলে মানবত্বকেই গৌরবান্বিত করা হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লইয়াও কোথাও কোথাও ঐ অবতারগত তর্ক উঠিয়া থাকে,—আমি বলি তিনি পূর্ণ মানুষ।

জগতের দুইটা দিক, একটা মন জগৎ (mind) একটা বস্তুজগৎ (matter)। দুইটাই আদিঅন্তবিহীন। এই মনও বস্তুর মধ্যে যে তফাৎ সেইটেকে আশ্রয় করিয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে একটা স্বকীয় বিশেষত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। বহুপূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম দৃশ্যমান জগৎকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে,—আর পূর্ব্ব মনোজগতের বা অধ্যাত্মজগতের দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু মন ও আত্মা লইয়া যাঁহাদের কারবার, আমরা বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাধনালব্ধ সব কিছু রহস্য বেশ বুঝিতে পারি না এবং বুঝিতে পারি না বলিয়াই সব কিছু যেন বিশ্বাস করিতে পারিনা। অধ্যাত্মজগতের রহস্য esoteric রহিয়াই গিয়াছে, Experiment দিয়া চক্ষুর সামনে ইহাদের ধরিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই নিউটন, কেপ্লার, ফ্যারাডে প্রভৃতির জীবনের আলোচনা ও ভারতবর্ষের এই ঋষিমহাপুরুষদিগের জীবন আলোচনা একবস্তু নয়। এই সকল ঋষি মহাপুরুষদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা লক্ষিত হয় যাহা সাধারণের অভিজ্ঞতা হইতে এতই ভিন্ন যে সে সকল বিশ্বাস করিবার উপায় থাকে না। তাই রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ-প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিবার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যৌগিক প্রথা ও তাহার ফল সম্বন্ধে যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহারা যোগলব্ধ নানারূপ বিভূতি বিশ্বাস করিবেন না। এবং তাঁহাদিগের নিকট সেই সকল বলিতে গেলে শ্রীমন্ত সদাগরের দশাপ্রাপ্তি না হইলেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে নিঃসন্দেহ। রমা রলাঁ রামকৃষ্ণ-চরিত আলোচনা করিতে গিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, যে ইউরোপীয় শিক্ষা লইয়া তিনি রামকৃষ্ণের অতিলৌকিক কাহিনীগুলি বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশ্বাস করিতে না পারার অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দেখিয়া শুনিয়া বিচার করা,—জ্ঞানলাভের ইহাই একমাত্র পন্থা বলিয়াই আমরা সাধারণতঃ জানি। কিন্তু আমাদিগের বহু পূর্ব্বের কোন এক ঋষি বলিয়া গিয়াছেন,—আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানিতে পারিলেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড করস্থিত আমলকিবৎ প্রত্যক্ষ হয় এবং এই আত্মদর্শনই যোগ। ইহাই জ্ঞানের শেষ স্তর। এ জ্ঞান বই পড়িয়া হয় না, বিচার দ্বারা হয় না, হয় ত্যাগের দ্বারা ভক্তির দ্বারা, পবিত্র জীবন যাপনের দ্বারা। গীতায় আছে ধূমে আবৃত আয়না যেমন হঠাৎ

পরিষ্কার হইয়া গেলে সমস্ত জগৎ তাহাতে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আত্মাও তাহার বহুজীবনের সঞ্চিত ক্লেদ ত্যাগ করিয়া যখন হঠাৎ একদিন নির্ম্মল হইয়া উঠে, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই আর অজানা থাকে না। তাই নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক সকল বিশিষ্ট জ্ঞানীরাই তাঁহার কাছে গিয়া মাথা নোয়াইয়া আসিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল একেবারেই অন্তরউদ্ভূত, তাঁহার কথার মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার এতটুকুও আভাস ছিল না। আপনার মন হইতে স্বতঃ উত্থিত ছোট ছোট গল্পের দ্বারা যে সকল গভীর তত্ত্বের তিনি উদ্ঘাটন করিতেন তাহা কেবলই আমাদের যীশুর অমূল্য parables এর কথা মনে করাইয়া দেয়।

রামকৃষ্ণের জীবনের অতিলৌকিক ঘটনাগুলি বিশ্বাস করিতে না পারিলেও তাঁহার মহত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। জগতের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় তাঁর সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন। তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন না, তাঁহার ধর্ম্ম ছিল সম্পূর্ণ Catholic। তিনি বলিতেন আত্মোপলব্ধিই মানুষের চরম লক্ষ্য, ইহা কোন ধর্ম্মেরই একচেটিয়া নয়। ভগবান যে এক, মাত্র নামেই ভিন্ন—ইহা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, তাঁহার প্রতি রক্তকণার বদ্ধ বিশ্বাস ছিল এই। প্রকৃতভাবে যে কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই আমাদের চরমকার্য্য মুক্তি পাওয়া যায়। শুনা যায় তিনি নিজের জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মুসলমান ও ক্রিশ্চানধর্ম্ম আচরণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম যেন সর্ব্ব ধর্ম্মের গোমুখীতীর্থ, সেখানে বিরোধ নাই, সংঘাত নাই, আছে কণ্ঠলগ্নতা, হৃদ্যতা। তাঁহার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানিক নয়, তাঁর মূলমন্ত্র হইতেছে আসক্তিত্যাগ। তিনি বলিতেন তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারে কাজে হাত দিতে হয়। এই আসক্তিই হইতেছে জীবনের কারণ, এবং এই আসক্তিই সুখ দুঃখ টানিয়া আনে। রামকৃষ্ণের আসক্তি অদ্ভুত,—এই জীবন, এই দেহ যে একটা বিকারমাত্র তাহা তাঁহার সহজাত বিশ্বাস ছিল, কেবলই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া সমাধি হইত, এবং তাহা ফিরাইয়া আনিবার জন্য দুএকটি ছোটখাট আসক্তির বশীভূত হইতে হইত জোর করিয়াই। অহমিকা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না, "আমি" "আমার" কথা তিনি কদাচ মুখে আনিতেন না। এমন কি নিজের দেহটাকেও প্রথম পুরুষ (third person) এ উল্লেখ করিতেন। তারপর তাঁর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা সর্ব্বজনবিদিত। মোট কথা তাঁহার জীবন ছিল গীতার জীবন্ত ভাষ্য, সমস্ত জীবন দিয়া তিনি গীতার বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় অপরাপর বহু মহাপুরুষের ন্যায় রামকৃষ্ণের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। বহু দেশমান্য শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং বহু সন্দিগ্ধ চক্ষুর সজাগ দৃষ্টির সামনে তাঁহাকে চলা ফেরা করিতে হইত। শিষ্যদিগের সন্দেহের তিনি প্রশ্রয় দিতেন, গুরুকে সর্ব্বপ্রকারে পরখ করিয়া লইতে তাঁহাদের উপদেশ দিতেন। ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী এমন শত সহস্র ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি গৌরব ঐ অর্দ্ধশিক্ষিত পুরোহিতের অসীম জ্ঞানের সম্মুখে ধূলিসাৎ হইয়াছিল। তাহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই—এবং সেইজন্যই আজ আবার হিন্দু আপনার সত্যতা ও ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে।

রামকৃষ্ণ কর্ম্মী ছিলেন না যে তাঁহার কর্ম্মতালিকা দিয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিব, তবে তিনি ছিলেন কর্ম্মের উৎস। তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহার প্রধান শিষ্য জগৎবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যীশু দেহত্যাগের সময় পীটারকে বলেন, "পীটার তোমার নামের অর্থ প্রস্তর, সেই দৃঢ় প্রস্তরের উপর আমার নবধর্ম্মের গীর্জ্জা প্রস্তুত হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার প্রাণপ্রিয়শিষ্য নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের উপর তাঁহার নরসেবাধর্ম্মের মন্দির রচনা করিয়াছেন। যে শক্তি চীকাগোর ধর্ম্মসভায় এক দ্বাবিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবককে আশ্রয় করিয়া সমবেত জ্ঞানীদিগকে নতমস্তক করিয়াছিল, সেই শক্তির প্রভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের মন্দির সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হউক।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তু।

রাইমোহন সামন্ত

বালবিধবা

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

গ্রামের আকাশে ফুটেছে তারকা স্বপন পরীর মত ;
তার পানে চেয়ে চাঁদের নয়ন হয়েছে তন্দ্রানত !
ঝাউ বনে বনে আলো আর ছায়া করে বিনিময় প্রাণ ;
শ্যামলের বুকে শিশির শুনেছে প্রণয়ের আহ্বান !

সহসা কান্না শুনি

সারা প্রকৃতির অন্তরে বহে দুঃখের ফাল্গুনী !
সম্মুখে চলে প্রাণহীন শব মরণ চিহ্ন আঁকি ;
খাঁচা পড়ে আছে উড়ে চলে গেছে কলরব করা পাখী !
শুভ্র বসনে আবৃত তার নিষ্প্রাণ তনুখানি
শতেক কান্না ফিরাতে পারে না পলাতক প্রাণ-বাণী !

এলোকেশী কিশোরী সে

জমাট দুখে সেও যেন গেছে মৃত্যুর সাথে মিশে !
যে অধর সেই পুরাণো ফাগুনে কেঁপে ছিল শিহরণে ;
তার দেবতার ব্যগ্র বাহুর সুনিবিড় বন্ধনে !
সে যেন হয়েছে নীরব নিথর ম্লান ক্ষীণ পাণ্ডুর ;
কালিমা আসিয়া গ্রাস করিয়াছে রক্তিমা সুমধুর !
একদিন যেই আঁখি পল্লবে শরৎ উঠেছে হাঁসি
চল চঞ্চল মৃদু ভ্রূভঙ্গী সুগোপনে উচ্ছ্বাসি !
সে আজি হয়েছে দুঃখ গভীর যেন গো ঝড়ের পরে
নীড়হারা কোন বিহগী আজিকে বিহগের লাগি মরে !
যে কর একদা ব্যাকুল হয়েছে গাঁথিতে মিলন মালা
আঙুলে তাহার জলে ওঠে আজ মহা চিতানল-জ্বালা !

নিশ্বাসে হ'ল যে নাসা মদির সে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ;
বৈশাখী ঝড়ে সে আজি মিলায় আপনার উচ্ছ্বাস !
যে রাঙা কপোলে ফুটিয়া উঠিত রক্তকমল খানি
বিবর্ণতার নিঠুর প্রহারে সেথা ঝরিবার গ্লানি !
যে মুখ ললাটে শোভিত সিঁদুর আকাশে পুষ্প সম ;
সে আজি তারে যে উপহাস করে নির্দ্দয় নির্ম্মম !

যেই নীল অম্বরি

তাহার তনুর সুরভি ঘিরিয়া আবেশে উঠিত ভরি !
নীরবে নীরবে সে আজি উঠেছে গুমরি গুমরি কেঁদে
অযত্ন ম্লান ও ক্ষীণ তনুরে কি করে লইবে বেঁধে !
যে চরণে দুলে উঠিত নূপুর শতেক বীণার গানে
গুরুদেহ ভার বহিয়া সে আর যেন না চলিতে জানে !

জীবনে এমনি হয়

শুধুই একের অভাবে সকল সোনার স্বপ্ন লয় !
আকাশে তাহার আলো নাই তার আঁধারে সে বিরহিনী ;
দেবতা হারায়ে চলিল যে দেবী আমি কবি তারে চিনি !

ওর সাথে মোর সুনিবিড় পরিচয় ;
আমারো অশ্রু ঐ কালো চোখে হ'য়ে গেছে আজি লয়।

কর্ম্মযোগী রায়

দ্বিজ পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল'

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ

সাহিত্য পরিষৎপত্রিকার দশমভাগ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (পৃঃ ১৬৯) মুন্‌শী আবদুল করিম মহাশয় দ্বিজ পরশুরাম রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি খণ্ডিত পুঁথি হইতে কেবল আরম্ভ, শেষ ও একটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'এর প্রথমভাগে (১৯১৪ খৃঃ) ৮৯৭—৯০৭ পৃষ্ঠায় এই রচনার খানিকটা অংশ ছাপিয়াছেন। দীনেশ বাবুর অনুমানে, পরশুরাম ১৭শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এ অনুমানের কারণ তিনি ব্যক্ত করেন নাই। বোধ হয় সেটা ভাষা-বিচার।

১৩৩৩ সালের মাঘের সংখ্যা অধুনা-লুপ্ত মাসিক 'বঙ্গবাণী'তে (পৃঃ ৬১৩—১৮) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিপ্র পরশুরাম' নামধেয় এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ইহাতে মুখোপাধ্যায়মহাশয় একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন, এই গ্রন্থের সমস্তটা তিনি উদ্ধার করিতে পারেন নাই, আর সেজন্য দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (পৃঃ ৫৩) তাঁহারই লেখা অপর প্রবন্ধে পাইতেছি, "দ্বিজ পরশুরামের একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে, এ গ্রন্থখানিও প্রকাণ্ড, এবং ইহাও গায়কেরা গান করিয়া থাকেন।" পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়, বোধ করি, বঙ্গবাণী-ধৃত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের ও স্বীকারোক্তির কথা অবগত ছিলেন না, সেইজন্যই তিনি মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রাপ্তি সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাণীতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন, "……পুরাণো পুঁথি খুজিতে যে কোনো গ্রামে গিয়াছি, পরশুরামের এক আধ টুক্‌রা পুঁথি পাওয়া যায় নাই, এমন খুব কমই দেখিয়াছি।" পরলোকগত কবির সৌভাগ্য, কিন্তু মুখোপাধ্যায়মহাশয়কে প্রশ্ন করি, এত সুযোগই যদি ঘটিয়াছিল, প্রতি গ্রামের টুক্‌রাগুলি সংগ্রহ বা নকল করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁথিটা উদ্ধার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন কেন? এমন ত আর হইতে পারে না, হইলেই বা লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে কেন যে, যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই টুক্‌রাগুলি সমগ্র পুঁথির মাত্র খানিকটা নির্দ্দিষ্ট অংশ বিশেষের।

মুখোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার প্রাপ্ত পুঁথির অসম্পূর্ণতার কথা একাধিকবার জ্ঞাপন করিলেও, প্রতিবারেই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, উহার কোথায় খণ্ডিত, বা উহা কোন স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। পর বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গবানীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে কিন্তু এরূপ ভুল হয় নাই, কারণ বগুড়া অঞ্চল হইতে ভট্টশালীমহাশয় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের যে পুঁথিখানি পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন, "আমার প্রাপ্ত পুঁথি ১০৯ পাতায়, তুলসীপত্র বিনিময়ে সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে।" গ্রন্থের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, "পরে আর বোধ হয় বেশী ছিল না। প্রথমে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ও শুকদেবের ভাগবত কথন, এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যানে গ্রন্থের আরম্ভ,—পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও ব্রজলীলা, পরে মথুরালীলা, এবং সর্ব্বশেষ দ্বারকায় রাজত্ব প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমাপ্তি।" বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ পুঁথি না দেখিয়া গ্রন্থ কোথায় আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহা আন্দাজ করা অতি দুরূহ। এরূপ আন্দাজ করিবার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায়, সমজাতীয় অন্যান্য

গ্রন্থগুলির এবং মূল পুরাণখানির সহিত আলোচ্য পুঁথির তুলনা করা। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমানের কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না, কারণ অন্যান্য সমুদয় বা কোনও কোনও কৃষ্ণমঙ্গলে বা ঐ জাতীয় গ্রন্থে অন্তঃপুর-লীলায় গ্রন্থ পরিসমাপ্তির নজীর পাওয়া যায় নাই, অথবা ভাগবতেও দ্বারকায় রাজত্ব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অবসান ঘটে নাই।

এ যাবৎ কষ্টেসৃষ্টে আমি পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের মোটে দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। তন্মধ্যে একখানি, ১২½×৪½ ইঞ্চি মাপের ১৭৩ পৃষ্ঠায়, তুলসীপত্র বিনিময়ে সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধার প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত ষষ্টিতম অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন প্রসঙ্গের প্রারম্ভে আসিয়া খণ্ডিত হইয়াছে। অপরখানি সম্পূর্ণ; প্রায় ঐ মাপেরই মোট পত্রসংখ্যা ২১২।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে সর্ব্বসমেত নব্বইটি অধ্যায় আছে। উহার উননব্বই অধ্যায়টি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগানুসারে সরস্বতীতীরে যজ্ঞসম্পাদনকালে ঋষিদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে প্রধান, এই লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন; এবং দ্বিতীয় ভাগানুসারে, দ্বারকার জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত সন্তানগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরমেষ্টিপতি পুরুষোত্তমের নিকট হইতে উদ্ধার ও পুনর্জ্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। নব্বই অধ্যায়ে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নীর সহিত লীলা ও তাঁহার পুত্রগণের কথা বর্ণিত। একাদশ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায়, শেষ অধ্যায়ে—শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমনের কথা পাই। পরশুরাম তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলের দশম স্কন্ধের উননব্বই অধ্যায়োক্ত প্রথম ভাগের বিবরণ প্রদান করিয়া, সমগ্র একাদশ স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত লাইন কয়টি মন্থন করিয়া পুঁথি সাঙ্গ করিয়াছেন :—

"লবরাম (বলরাম) সঙ্গে করি দৈবকী কুমার।
কৌতুকে করিলা নষ্ট প্রর্থিবির ভার॥
কুরু পাণ্ডবের রণে কথো নষ্ট হইল।
রাজযুই জজ্ঞেত আর কথোগুলা মৈল॥
যেহিরূপে প্রীথিবির ভার হইল ক্ষয়।
জদু বংস নাসিতে কৃষ্ণ ভাবেন নিশ্চয়॥
ব্রহ্ম সাপে জদুবংস করিয়া বিনাশ।
তারপর বৈকুণ্ঠে চলিলা শ্রীনিবাশ॥"
ইতি দষম স্কন্ধ সমাপ্ত॥

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের প্রথমাংশ অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের প্রথমাংশের সহিত তুলনা করিলে একটা গুরুতর বিশেষত্ব চোখে না পড়িয়া পারে না। অপরাপর কৃষ্ণমঙ্গলগুলি হয় সমগ্র ভাগবতের, না হয় দশম-একাদশ স্কন্ধের, না হয় কেবল দশম স্কন্ধের অনুবাদ। কিন্তু পরশুরাম যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অন্যবিধ। দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রথম স্কন্ধের শেষ দুই (১৮—১৯) অধ্যায় অবলম্বনে পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবত কীর্ত্তনের কথা বিবৃত করিয়া, যথাক্রমে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্কন্ধ হইতে ধ্রুবচরিত্র, অজামিল-প্রসঙ্গ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, গজেন্দ্র মোক্ষণ ও রামায়ণ-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৬ হইতে ৭০ অধ্যায়ের প্রসঙ্গগুলি (পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজ বধ, দ্বিবিদ বধ, বলদেব-বিজয়, মায়াবিভূতি বর্ণন, ও শ্রীকৃষ্ণ সমীপে জরাসন্ধ-পীড়িত রাজগণ প্রেরিত দূতের আগমন) পরশুরাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভাগবত-বহির্ভূত উপাখ্যানগুলির মধ্যে তথা-কথিত 'দানখণ্ড', নৌকাখণ্ড' ও 'পারিজাত-হরণ' উল্লেখযোগ্য। ভাগবত পুরাণের কবিও অবশ্য পারিজাত-হরণের কথা জানিতেন ও উল্লেখ করিয়াছেন (১০।৫৯), কিন্তু সে অতি সংক্ষিপ্তাকারে। পরশুরাম এমন সুন্দর উপাখ্যানটীর ঐটুকু অনুবাদে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহাকে হরিবংশ অবলম্বনে ঐ উপাখ্যানের এক বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু ভাগবত গাহিতে গাহিতে হরিবংশে হাত দিয়া ফেলায় পরশুরাম নিজেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিয়াছেন,—

"পারিজাত হরণ কথা যুন য়েক চিত্তে। সংক্ষেপে কহিয়ে

কিছু ভাগবত মোতে॥ তারপর কহি কিছু হরিবংস মোত। এক চিত্তে শুন ভাই ভক্ত'গণ জতো॥" শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়ের পুঁথিতে বোধ করি এই অংশ নাই, সেইজন্যই তাঁহাকে তাঁহার নিজের গবেষণার কথা একাধিকবার স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে,—পারিজাত-হরণ উপাখ্যানটি হরিবংশ হইতে গৃহীত।

ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় 'সুদামচরিত্র' উপাখ্যানটি পরশুরামের স্বতন্ত্র রচনা বলিয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অধ্যায় বিশেষ অবলম্বনে লিখিত এই উপাখ্যানটি কবির কৃষ্ণমঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত।

পরশুরাম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার গ্রন্থের বন্দনায়, যথা:—"চৈতন্য নিত্যাইর পদ করিয়া স্মরণ। দ্বিজ পরূসরামে গায়ে কৃষ্ণ পদে মোন।" "সচির উদরে জর্ম্ম, লভিলা পরম ব্রহ্ম', হরিভক্তি করিতে প্রচার।" "তরিতে সংসার নদি, ভজতু গৌরাঙ্গ নিধি, তাহা বহি উপায় নাহি আর।" "বন্দো গোরাচান্দ্র, কেবল ভক্তের তন্ত্র, গোলক সম্বদ শ্রীনিবাস।" "বৈষ্ণব চরণারবিন্দ ভাবিয়া হৃদয়। এক ভাবে বন্দ সোনাতন মহাশয়ে।" ইত্যাদি। কতকগুলি ভণিতায়ও আছে, "চৈতন্য চরণাশ্রত করিয়া ধেয়ান। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরূসরামে গান।"

কৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনাভাগ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত—প্রথম গণেশ-বন্দনা, দ্বিতীয় চৈতন্য-বন্দনা, তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা, তন্মধ্যে দ্বিতীয় অংশের দুইটী শ্লোক উল্লেখ যোগ্য।

"চৈতন্য অগ্রজ প্রভু নাম নিত্যানন্দ।
ভাইয়া অভিরাম বলি জাহার আনন্দ॥
ভাইয়া অভিরাম বলি সঘনে ফুকরে।
প্রেমের আবেশে ভাইয়া চলিতে না পারে॥"

কোনও কোনও পুঁথিতে বন্দনার প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বন্দনার দ্বিতীয়াংশের গুরুত্ব সমধিক, ইহাতে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, সনাতন গোস্বামী, দামোদর (স্বরূপ দামোদর), হরিদাস (?) ঠাকুর, ও নরহরি সরকারের নামোল্লেখ আছে, পরবর্ত্তী, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর, আচার্য্যগণের নাই।

কৃষ্ণমঙ্গলে কবির অপর পরিচয়ের মধ্যে কেবল দেখা যায়, তাঁহার উপাধি ছিল 'চক্রবর্ত্তী'। বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাবী করিয়াছেন, তিনি পরশুরামের গোটা ইতিহাসটা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তবে কৃষ্ণমঙ্গল হইতে নয়, 'ইঁহার' লেখা 'মাধব-সঙ্গীত' নামক অপর একখানি গ্রন্থ হইতে। মাধব-সঙ্গীতের নাম তৎপূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহার দ্বিতীয় পুঁথি দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, উহা এতই দুর্ল'ভ। মাধব-সঙ্গীত হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে পারিয়াছেন, কবি ব্রাহ্মণ, কিন্তু জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহন্ত কিশোর দাসের অগ্রজ মনোহর দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব কবির বয়স তিনশত সাড়ে তিন শত বৎসর হইবে; শ্যামশিখর নামক জনৈক নৃপতি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কবি ঐ নৃপতির দেশে (দ্বাদশ কল্য গ্রাম) বসিয়া মাধব-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কবির ঊর্দ্ধতন ছয় সাত পুরুষের নিবাস ছিল কস্মিংশ্চিৎ চম্পকনগরী গ্রামে, কবির পিতার নাম মধুসূদন, পিতামহ সুবুদ্ধিরায়, প্রপিতামহ হরি রায়, ইত্যাদি।

কিন্তু ভট্টশালী মহাশয় এই দুই কবির অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহের মোটামুটী হেতু, উভয় গ্রন্থের বিষয় এক, এবং দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণমঙ্গল হইতে তাঁহার নিজের উদ্ধৃত ভণিতা কয়টীর নমুনা ও মাধব-সঙ্গীত হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত দুইটী ভণিতার নমুনা এক প্রকারের নহে। একই কবি একই বিষয়ে দুইখানি পুঁথি লিখিতে পারেন, এরূপ নীতিতে ভট্টশালী মহাশয়ের আস্থা কম। কিন্তু 'বিষয়' শব্দের একটা ব্যাখ্যা দিয়া তবে তাঁহার সংশয়পীড়িত হওয়া উচিত ছিল। কৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতের অনুবাদ বা মুখ্যতঃ ভাগবত অবলম্বনে লিখিত; মাধব-সঙ্গীত আর যাহাই হউক, ভাগবতের অনুবাদ নয়। তত্রাচ উভয় কাব্যের 'বিষয়' এক বলিয়া গৃহীত হইলে, রূপ গোস্বামীর নাটক দুইখানির ও দূত-কাব্যদ্বয়ের বিষয়ও এক, যে সকল অপরাপর বৈষ্ণব গ্রন্থকার রাধা-কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেকেরই

বিষয় এক, যে সকল বৈষ্ণব কবি গৌরাঙ্গ-লীলা উপলক্ষ্য করিয়া একাধিক পুস্তক লিখিয়াছেন (যথা, কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও 'চৈতন্য চরিতামৃত'। চৈতন্ত-মঙ্গল'-কার লোচন দাসেরও 'চৈতন্যপ্রেম বিলাস' নামে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে।) তাঁহাদেরও প্রত্যেকেরই বিষয় এক, এরূপ 'বিষয়' এক হওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব কি? অত কথায় কাজ কি, 'চণ্ডীদাস' সম্পর্কে ভট্টশালী নিজেই তর্ক তুলিয়াছেন, 'বড়ু', 'দ্বিজ' ও 'দীন' চণ্ডীদাস কিছুতেই পৃথক ব্যক্তি নয়, অথচ এই তিনের ভাষায় প্রভেদ, ভাবে প্রভেদ, কিন্তু 'বিষয়ে' কত ঐক্য। অতএব তাঁহার সন্দেহের প্রথম হেতুটী কৃত্রিম, উহা দ্বারা কৃষ্ণমঙ্গলের ও মাধব-সঙ্গীতের লেখকের ভিন্নতা প্রমাণিত হইতেছেনা। সন্দেহের দ্বিতীয়াংশে ভণিতার কথা। ভট্টশালী মহাশয় এতদ্‌সম্পর্কে বলেন, "ভণিতাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, কবি গোপালের উপাসক ছিলেন। মাধব সঙ্গীতের যে দুইটী ভণিতা হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, কবি "গুরুপদ আশ" করিতেন। এই দুই নমুনায় ভণিতা একই কবির কিনা সন্দেহ হইতেছে।" কে জানে, হয়ত কোনও গোপালের উপাসককে অন্যত্র 'গুরুপদ আশ' করিতে নাই। কিন্তু এক কৃষ্ণমঙ্গলেই যে কবির গুরুর চরণ বন্দনা ও গোপালের উপাসকত্বের যুগপৎ সন্ধান মিলে, আর সেকথা যে পুঁথির একেবারে গোড়াতেই আছে,—"শিক্ষাগুরুর দীক্ষাগুরুর চরণ বন্দিয়া। গাইব কৃষ্ণের গুণ গোপাল ভাবিয়া"। তাছাড়া, ভণিতার মূল্যই বা কি? ভট্টশালী মহাশয় নিজেই বলেন "(শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন বসু) নানা কাব্য হইতে কবিগণের ভণিতা দিবার রীতি লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে প্রত্যেক কবিরই ভণিতা দিবার একটা বিশিষ্ট রীতি ছিল" (ভারতবর্ষ, ১৩৩৪, পৃঃ ৫১০)। যখন এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলেনা, তখন ভট্টশালী মহাশয়ের সন্দেহের দ্বিতীয় হেতুটীও মোটেই টেঁকেনা।

যাহা হউক, বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমঙ্গলের কবির পক্ষে মাধব-সঙ্গীত হইতে লব্ধ ইতিহাসের এক ফোঁটা মূল্য নাই, যতক্ষণ না এই দুই কবির অভিন্নতা উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে বুঝাইয়া দিতে হইবে, একই কবির একখানি গ্রন্থের টুক্‌রা যত্র তত্র পাওয়া যায়, অপরখানি কেন এত দুর্ল্লভ। দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ করিতে হইবে, কৃষ্ণমঙ্গল মাধব-সঙ্গীতের পরে রচিত হইয়াছিল, নতুবা মাধব-সঙ্গীতে এত ইতিহাসের ছড়াছড়ি,—কবি উহাতে কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, কোন রাজার আশ্রিত, কোথায় বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন, কোথায় আদি-নিবাস, কোন কুলে জন্ম, এমন কি গুরুর অনুজ প্রভৃতির নাম, সর্ব্বোপরি গুরুর গোপ্য নামটা—এ সমস্তই একে একে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, অথচ সেই কবির অপর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা থাকিলে তাহার কোনও উল্লেখ নাই কেন, এ সমস্যার সমাধান হয়না। কৃষ্ণমঙ্গলে কৃষ্ণের সখা দাবী করিয়া কবি বিস্তর ভনিতা দিয়াছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব হইলেও তিনি সখ্য-ভাবের ভক্ত ছিলেন; মাধব-সঙ্গীত হইতে উদ্ধৃতাংশে পাইতেছি, "তুমি সে করুণাসিন্ধু অনাথজনার বন্ধু মোরা সভে চরণ কিঙ্করি" অর্থাৎ মনোহর দাসের শিষ্য-মহাশয় সখীভাব বা মঞ্জরী-ভাবলিপ্সু হইয়া রাগানুগা ভক্তিসাধন করিতেন; সুতরাং ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে, কিরূপে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করা যায়। আরও পাইতেছি, মাধব-সঙ্গীতের কবির পিতামহ সুবুদ্ধি রায়, প্রপিতামহ হরি রায়, অতএব আরও প্রমাণ করিতে হইবে 'রায়' ইঁহাদের প্রকৃত নামেরই অঙ্গ, উপাধি নয়, নতুবা হরি রায় ও সুবুদ্ধি রায়ের প্রপৌত্র ও পৌত্র পরশুরাম 'চক্রবর্ত্তী' হওয়া অসম্ভব। মাধব-সঙ্গীতের কবি নানাগ্রন্থ হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া সংস্কৃতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, ব্রজভাষায় পদ রচনা করিয়া পুস্তকে জুড়িয়া দিয়াছেন, কৃষ্ণমঙ্গলে এসকলের আত্যন্তিক অভাব, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এসকল ছোটখাট কথারও একটা সদর্থ খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে।

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের 'দানখণ্ডে' একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে,—'চন্দ্রাবলী' রাধারই নামান্তর। পরশুরাম বড়ু চণ্ডীদাসের 'দানখণ্ডে'র নকল বা চুরি করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার সময় পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' দেশে প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা-তত্ত্বে যাঁহারা অনুরাগী, অর্থগুপ্ত পুঁথিখানি হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত কয়টি তাঁহাদের উপকারে আসিবে, 'হেন বুদ্ধি কে দিল তোকে কৃষ্ণ ভজিবারে।' 'প্রলাদেক (প্রহ্লাদেক) কাটিয়া করহ খান খান।' 'কেলে (কোলে) হইতে প্রহ্লাদেক আছাড়িয়া ফেলে।' 'কি পাট (পাঠ) পড়াল্যা পুত্রেক হেদেরে ব্রাহ্মণ।' 'সবংশে রাবণ মারি বিভিসোনেক রাজা করি সিতা উদ্ধারিলা নারায়ণ।' 'তোমার পুত্রেক রক্ষা কৈল নারায়ণ।' ইত্যাদি। মজা এই, পুঁথিখানির নকলের তারিখ মাত্র ১২১৫ সন

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত

পঞ্চমে

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

দশমাস চলিতেছে। সকলেরই মুখে একটা সশঙ্ক আনন্দ; একটা আয়োজন একটা প্রতীক্ষা। বাড়ীটার আকাশ বাতাস ঘিরিয়া একটি অনাগত আনন্দের হিল্লোল আশার দক্ষিণা বাতাস।

চার কন্যা হইয়াছে। বড়টি পুত্রবতী, মায়ের সেবার জন্য শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে দুই মাসের ছুটিতে। দ্বিতীয়টি অর্দ্ধস্ফুট। আর পরের দুটি প্রথম ভাগ ও পুতুল খেলার।

সকলেই ভাবে এবার একটি ছেলে যদি·········পরপর চারটি ····· আর কত?

মা স্মৃতির তলে ডুব দিয়া অতীতকে আলোড়িত করিয়া দেখেন। কই এমন ত কোন অন্যায়, কোন অবিচার কখনো করেন নাই, যাহাতে—। জীবনের ত্রিশ বছরের এই পনের বছর স্বামীর সঙ্গে একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখ স্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। কোন অন্যায়ের অবসরও ত সেখানে ছিল না। তবে কেন? ভগবান কি এবারও মুখ তুলিয়া চাহিবেন না!

ওঁর কল্পনায় কত ছবি ভাসিতে থাকে। একটি ছেলে নরম নরম হাত পা, তুলতুলে দুটি গাল। কালো কোঁকড়ান চুল। ছোট্ট একটি খাকী প্যাণ্ট সার্ট একখানি ট্রাই সাইকেল। উঠানে তাই নিয়ে ঘোরাফেরা, হৈ চৈ। তারপর বড় হলে যাবে স্কুলে আরও বড় হলে কলেজে। তারপরে একটি টুকটুকে বউ··· একটি ছেলে।

বড় মেয়ে তাঁর প্রবাসী স্বামীর কাছে লিখিয়াছে যে এবার তাঁহার ভাই হবে নিশ্চয়।—একটা ট্রাইসাইকেলের দাম জিজ্ঞেস করিয়া রাখিও তো; আর কিছু খাকী কাপড়, গোটা কয়েক সার্ট পাঞ্জাবী। স্বামী উত্তর দিয়াছিল যে ও দুটো জিনিষ সামনের দুবছরের ভিতর আর কলিকাতার বাজারে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। উত্তরটা প্রথমে ও বুঝিতে পারে নাই। পরে বোধগম্য হওয়াতে নিজের ব্যগ্রতার জন্য লজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে স্বামীকে মিষ্ট তিরস্কার করিতে ছাড়ে নাই, সেজন্য।

দ্বিতীয় মেয়ে ছোট্ট ছোট্ট গোটাচার সার্ট পাঞ্জাবী করিয়া রাখিয়াছে, দুখানা রুমাল-ও।

মা বলেন কী পাগলামী আরম্ভ করেছিস পুঁটি, ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই ঢোক গিলিয়া থামিয়া যান। তেমন জোরের সঙ্গে নিষেধ করিতে পারেন না। মেয়ে বলে—মা তুমি দেখো। এবার তোমার ছেলে হবে নিশ্চয়। এই ছোট্ট পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে প্যাণ্টটি পরে কেমন ঘুর ঘুর করে বেড়াবে মা, উঠানময়। সে বেশ হবে।' ওঁর সকল অঙ্গ যেন বলিতে বলিতে আনন্দে করতালি দিয়া ওঠে।

মা শুনিয়া প্রথমটায় লজ্জায় লাল হইয়া যান। তারপর মুখের উপর নামিয়া আসে একটা আশা-আনন্দের মেঘ। চোখের উপর নাচিয়া বেড়ায় একটি দুষ্ট চঞ্চল মুখর শিশুর ছবি।

মেয়ে সংশোধন করিয়া বলে—মা এবার আমার ভাই হলে কী নাম রাখব জান? স্বপন – খোকার নাম হবে স্বপনকুমার রায়। 'কেমন হবে মা, বল।

মারও ইচ্ছা করে ছেলের উপযোগী কিছু করিয়া রাখেন। যদি ভগবান দয়া করেন। যদি। কিন্তু তেমন ভরসা করিতেও সাহস হয় না, যে দুর্ভাগ্য কপাল, তারপর বড় দু'মেয়ে সামনে। লজ্জা—।

ছোট ছোট ছেলেরা হাতকাটা সার্ট গায় দিয়া, প্যাণ্ট পরিয়া ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলিয়া স্কুলে যায়। মা জানালা দিয়া অতৃপ্ত চক্ষে তাই দেখেন।

তারপরে একদিন সময় হয়। ব্যাথায় না হোক হৃদয়ে বহুকাল পোষা একটা আশায় আসন্ন ভাগ্য নির্দ্দেশের সম্ভাবনায় তাঁহার মুখ সশঙ্ক বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল।

যথা সময়ে নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল। সুখদুঃখ পূর্ণ পৃথিবীতে নবাগতের হয়তো অনিচ্ছা প্রবেশের অভিযোগ। পাশের ঘরে পিতা চমকিয়া উঠিলেন। এখনই হয়ত কেউ আসিয়া বলিয়া যাইবে ওর দীর্ঘকালের আশার ফলাফল।....এক মিনিট—দু—তিন—ওঃ মিনিটের কাঁটাটা যেন ঘণ্টার কাঁটায় পরিণত হইয়াছে, মহাকালের চাকা যেন আর তেমন জোরে ঘুরিতেছে না। কিন্তু এখনও কেউ আসে না কেন? ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন দশ মিনিট হইয়া গিয়াছে। আরও পাঁচ মিনিট চলিয়া যাইতেও যখন ওঁকে কেউ কিছু জানাইয়া গেল না তখন ওঁর বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না যে এবারেও—। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা উচ্ছ্বসিত মনোভাব গোপন করিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা মৃদু তিরস্কার করিলেন। মার তখন জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। বহুকাল সঞ্চিত প্রিয়তম আশাটির ভঙ্গজনিত নিদারুণ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা যেন তাঁহার ছিল না।

এগারোদিন পরে মা স্নান করিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিছু পিছু সদ্যোজাত কন্যা ক্রোড়ে লইয়া ঢুকিয়াছিল তাঁহার বড় মেয়ে, মেয়েকে কোলে নিয়া ঘরে ঢুকিতে মা অস্বীকার করিয়াছিলেন। মায়ের এই ব্যবহারে প্রথমা ও দ্বিতীয়া নবজাত বোনটির ভবিষ্যত ভাবিয়া একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। খুব যে বেশী শঙ্কিত তাহা নহে কারণ এই মেয়েটির আগমনে দুঃখের রেখা ছাড়া হাসির রেখা কাহারো মুখে ফোটে নাই। তাই দ্বিতীয়া প্রথমাকে বলিল, "তুমি ভেবনা দিদি। তুমি চলে গেলে আমিই ওকে দেখব।" দিদি চঞ্চলা ও অস্থিরচিত্তা বোনটির কথায় খুব বেশী নির্ভর করিতে পারে নাই। তবু—। ঘরে ঢুকিয়া মা বড়মেয়ের নিদ্রিত পুত্রকে চুমা খাইলেন। প্রথমার মন ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। স্বামী একবার মাত্র নবজাত কন্যার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নিয়া চোখ ফিরাইলেন।

দিন যায়। মা নবজাতার উপর যতটা সম্ভব তাচ্ছিল্য করেন। একান্ত যাহা না করিলে নয় শুধু তাহাই করেন। মুখে [illegible] সময় এমন অনিচ্ছার ভাব ফুটিয়া ওঠে যে তাহার কিশোরী মেয়ের চোখেও তাহা ধরা পড়ে। কাছে থাকিলে, পাছে কান্নাকাটিতে আদর সোহাগ করিতে হয়, তাই সব সময়ে নিজেকে মেয়ের কাছ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন। বড় মেয়ে নিজের ছেলেটির প্রতি অবহেলা করিয়াও বোনটীকে বুকে তুলিয়া নেয়; ওর নব মাতৃহৃদয় শিশুর ক্ষুধাতুর কান্নায় ব্যথা পায়।

তারপরে একদিন বড় মেয়েরও 'ছুটী' ফুরাইয়া যায়, শ্বশুর বাড়ী প্রত্যাগমনের সময় হয়। যাইবার সময়ে বলিয়া যায় মা খুকীর নাম আমি রেখে গেলাম "মায়া"। আমরা ওকে সাদর অভ্যর্থনা করিনি, তবুও আমাদের সবাইকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখবে, দেখো। কেমন বড় বড় চোখ, পাপড়ির মত ঠোঁট, তুলতুলে গাল, দেখেছ মা?' বলিয়া ও বোনের গাল দুটি টিপিয়া দিল। মা ক্ষণেক চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। তারপরে প্রথমা দ্বিতীয়াকে একটী ঘরে চুপি চুপি ডাকিয়া নিয়া বলে—'দেখিস্ কিন্তু খুকীকে। ওর প্রতি মা'র যদি এমনি ধারা ব্যবহার থাকে, আর তুই-ও যদি ওকে না দেখিস তবে আর এ মেয়ের বেশী দিন নেই। ওর ঠোঁট দুটিতে ব্যথার ছায়া পড়ে।

প্রথম প্রথম দ্বিতীয়া মেয়ে বোনকে খুবই যত্ন করে। স্নান করানো, খাওয়ান, ঘুম পাড়ানো, পোষাক পরানো, সব ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিকমত করিয়া যাইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রী একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। নিজেরা না করিলেও মেয়ে বা অন্য কেউ উহাকে যত্ন করুক ইহা তাঁহাদের অনিচ্ছা নয়। কিন্তু এ-যত্ন আদর বেশীদিন টিকিল না। দ্বিতীয়া মেয়ের অপরকে যত্ন করিবার বয়স এখন নহে। শৈশবে ও বাল্যে মা'র যত্নে লালিত হইয়া এখন নিজের প্রতি যত্ন করিবারই ওর বয়স। ও চায় দুপুর বেলায় একটু ঘুমাইয়া বৈকালের জন্য শরীরকে একটু সতেজ সরস করিয়া নিতে। মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে সে সময়ে ওর ভাল লাগে না। বিকেল বেলা ওঁর ইচ্ছা করে মুখ হাত সাবান দিয়া ধুইয়া একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়া ছাদে বেড়াইতে নয়তো পাড়ার কোন সখীর বাড়ীতে ভ্রমণে। তখন বোনকে খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে ওঁর ভাল লাগেনা। তাই মেয়ের অযত্ন হইতে আরম্ভ হইল। মা মনে মনে ব্যথা পান,

কিন্তু আদর যত্ন করিয়া বুকে তুলিয়া নিতেও ইচ্ছা হয় না। স্বামী একদিন মেয়ের প্রতি অবহেলার জন্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। যদিও নিজে মেয়ের প্রতি পিতৃস্নেহের পরিচয় এতদিনে এতটুকুও দেখান নাই। তা হইলে-ও মায়ের হৃদয় বেশীদিন আর মেয়ের অনাদর অযত্ন সহ্য করিতে পারে না। তাই একবার ইচ্ছা করে বুকে তুলিয়া নেন কিন্তু তখনই মনে পড়ে এ-মেয়েটা ভগবানের দান নয়, তাঁর অভিশাপ। মেয়ের প্রতি এই বিরুদ্ধ ও তিক্ত মন লইয়া দিনের পর দিন, কতদিন আর তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে! যদি মরিয়া যায়—ভাবিতে মন আচম্বিত চমকাইয়া ওঠে। 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া মেয়ের সমস্ত গায়ে স্নেহ কোমল হস্ত বুলাইয়া দেন। মা'র বুকে মেয়ে একটু স্থান পায়। এমনি করিয়া দিন কাটে। মেয়ের সঙ্গে মা'র সম্বন্ধ এখনও সাদর সহজ হইয়া ওঠে না, স্নেহ-মিশ্রিত অনুকম্পা যোগে কর্ত্তব্যের খাতিরে যাহা হয় করেন। যায় দিন আরো, মেয়ে বড় হয়। খল খল করিয়া এমনি তীব্র সুমিষ্টস্বরে মেয়ে হাসে যে হঠাৎ শুনিয়া মা চমকিত হইয়া যান। শত কোকিলের মধুর স্বর যেন একত্র করিয়া ভগবান তাঁর ঐ ছোট্ট মেয়েটির গলায় ঢালিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়া মেয়ে একটি শোলার সুন্দর সপক্ষী খাঁচা বোনকে আনিয়া দিয়াছে। মেয়ে তাই দেখিয়া শুইয়া শুইয়া হাসে। পঠনরত স্বামী সাময়িক খুসী হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলেন—ওগো এ চমৎকার হাসে তো; পরে উঠিয়া আসিয়া কন্যার গালে ও কপালে দু'টা মৃদু টোকা মারেন হয়তো। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ছোট্ট ছোট্ট হাত পা আকাশে ছুড়িয়া মেয়ে কলকল করিয়া হাসে, খেলে। মা সানুকম্প দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। ইচ্ছা যায় নিবিড়-ভাবে জড়াইয়া মেয়েটাকে একটু আদর করেন। কিন্তু তখন-ই আবার অন্য কথা মনে পড়িয়া মন ফিরিয়া যায়, স্বামীর কাছে নিজের উচ্ছ্বাস ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়-ও আছে। দৃষ্টি দিয়া কি আদর করা যায় না? তাই করেন। মেয়ের সমস্ত গায়ে নিজের সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া দেন।

দিন গড়ায়। মেয়ে বেশ বড় হয়, টলিয়া টলিয়া হাঁটে। ঘাড়টি দোলাইয়া দোলাইয়া, ছোট্ট ছোট্ট পা দুটি ফেলিয়া হাঁটে। সরু ঘাড়ের উপরে ওর সুন্দর মাথাটি ঝ্যাতাহত জলপদ্মের মত দোলে, মা চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। ইচ্ছাকৃত বয়ককঠিন হৃদয় স্নেহের উত্তাপে আপনি গলে। চুড়ির একটু মৃদুশব্দ করিয়া হাত দুটি নিজের অজ্ঞাতসারে মেয়ের দিকে বাড়াইয়া দেন। প্রসারিত সেই বাহুতে ঝাঁপ দিবার জন্ত মেয়ে ছুটিয়া আসিতে পড়িয়া যায়। মা গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লন, সস্নেহে স্তনটি মেয়ের মুখে দিয়া বলেন—ষাট্ ষাট্। তারপর লজ্জায় মুষড়াইয়া যান। এতটা আদর করা যেন ওঁর ইচ্ছা ছিল না, মেয়েটা যেন তাঁর যোগ্য নয়।

ক্রমে মেয়ে বড় দুষ্ট হইয়া ওঠে। কোন জিনিষ কোন খানে ঠিক করিয়া রাখিবার যো নাই। এখানকার জিনিষ সেখানে, সেখানকার জিনিষ এখানে, মেয়ে সমস্ত ওছ্‌নছ্‌ করিয়া রাখে। একদিন বাবার পড়িবার টেবিল দোয়াতের কালি দিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। একদিন কোর্টে যাইবার সময় স্বামী দেখিতে পান তাঁহার একপাটি জুতা অদৃশ্য। নিশ্চয় দুষ্ট মেয়ের কাণ্ড। খোঁজ খোঁজ, কোথায়ও পাওয়া যায় না। ওদিক কোর্টের সময় হইয়া যায়। তিনি স্ত্রীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন, মেয়েকে দিলেন ধমক। মেয়েটা যেন বুঝিতে পারে যে, কিসের জন্য এই হৈ চৈ। মাকে টানিয়া নিয়া বলে—মা এছ্‌ ছ। মা পিছু পিছু যান। রান্না ঘরের পিছনে গিয়া দেখেন সেই হারাণো জুতার পাটি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ভিতর গুটি দুই পুতুল-ও দাঁড়াইয়া। মেয়ে দেখাইয়া বলে-মা মতল, ভোঁ ভোঁ। চতুর্থী কন্যা বলে এই তো আমাল পুতুল, ছকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিনা। আমাল পুতুল চুলী কলে নিয়ে এসে মোটল গালী খেলা হচ্ছে দুষ্টু মেয়ে বলিয়া ও ওর পুতুল নিয়া চলিয়া যায়। মা জুতার পাটিটা হাতে করিয়া নিয়া আসিয়া বলেন—ওগো মেয়েকে এবার একটা মোটর গাড়ী না কিনে দিলে দেখছি আর চল্‌ছে না। কদ্দিন আর জুতো নিয়ে মোটর মোটর খেলবে, বল। বলিয়া মা হাসেন। স্বামী মেয়ের প্রতি স্ত্রীর এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবে অনেকটা আশ্চর্য্য হন।

মেয়ের আজকাল আরও প্রমোশন হইয়াছে, জলের গ্লাশ উল্টাইয়া, তেলের বাটী ফেলিয়া, পানের বাটা ছড়াইয়া মেয়ে মাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আনন্দ মিশ্রিত বিরক্তিতে

তিনি ভাবেন তাঁহার কোন মেয়ে-ই তো এমন দুষ্টু ছিল না। প্রথমা দ্বিতীয়া মেয়ে ইত্যাদি সকলেরই শৈশবের কথা তিনি ভাবিয়া দেখেন। কই? তাঁহার কোন মেয়েই তো এমন দুরন্ত ছিল না। খেলা দিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন, খাবার সময়ে খাওয়াইছেন, ব্যাস। কিন্তু এমন দুষ্টু তিনি যে তাঁহার জীবনে দেখেন নাই। তারপর ভাবেন ভগবান যেন এই মেয়েটার প্রতি তাচ্ছিল্য, অবহেলা হইবে জানিয়াই মাতৃহৃদয় জয় করিবার জন্য উহাকে সমস্ত গুণসম্পন্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নইলে এমন সুন্দর মুখ—কই তাঁর কোন মেয়েতো এর মত এত সুন্দর নয়, এমন মিষ্টহাসি, এমন বুদ্ধি, দুষ্টুমি। মেয়ের প্রতি ওঁর মন অনুকম্পায় ভরিয়া যায়।

ইহার পর একদিন মা দেখেন, মেয়ে দিব্য পানের বাটা মেলিয়া পান সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। একটা পান মেঝের উপর পাতিয়া তাহার উপর পরপর সুপারি চূণ, খয়ের, মসলা কোনটা দিতেই ভুল করিল না, এতটুকু। তারপর পানটী উঠাইয়া খিলি বানাইবার চেষ্টাতেই যত মুস্কিল। মা'র মতন কিছুতেই হয় না তখন—'মা'। সত্যিই আর ও মাকে ডাকিতে যায় নাই। কিন্তু পিছন ফিরিয়া যখন দেখিল সত্যিই মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন পানটি হাতে করিয়া মায়ের কাছে আসিয়া—মা পান ছাজ বাবা খাব্‌বে।

মা মারিতে যাইবেন কি মেয়ের আত্মরক্ষার ফন্দিতে হাসিয়া ফেলিলেন। স্বামী কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—ওগো এবার আর তোমার কোন দুঃখ থাক্‌বে না। তোমার ছোট মেয়েই এবার থেকে তোমার সব করে দেবে, বলিয়া পান সাজিবার ইতিহাস বলিলেন পরে যোগ করিলেন 'যেই পিছন ফিরে দেখলে আমি দাঁড়িয়ে আছি, অমনি বলে কিনা, মা পান ছাজ বাবা খাব্‌বে। মানে বাবার জন্যেই মেয়ে এতক্ষণ কষ্টকরে পান সাজছিলেন।'

স্ত্রী জুতার ফিতা খুলিতে স্বামী বলেন সত্যি ভারী দুষ্টু হয়েছে তো। শাস্তির দরকার—বলিয়া নীচু হইয়া মেয়ের অপরাধে মা'র গালে শাস্তি দিয়া দেন।

আর একদিন বিকালে মেয়েকে প্রসাধনরতাবস্থায় আবিষ্কার করা গেল। ঘরে কেহ ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া দিদির আয়না টেবিল এবং তাহার উপরকার প্রসাধন সামগ্রী আক্রমণ করিল।

পাউডার পমেটম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া ফিনিসিং টাচ্‌ স্বরূপ গালে আলতা লাগাইতে যাইবে এমন সময় মেজদিদির সচীৎকার প্রবেশ।—মাগো দেখসে বলিয়া আত্ম বিস্মৃত ভাবে ও এক অদ্ভুত চীৎকার করিয়া বসিল। স্বামী-স্ত্রী তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আসিয়া মেয়ের এই অদ্ভুত প্রসাধন দেখিয়া হাসিতে থাকেন, প্রবলভাবে।

দ্বিতীয় মেয়ে বলে—তুমি হাস্‌ছ কী মা, দেখে আমার শরীর রাগে জ্বলে যাচ্ছে। টেবিল ক্লথ্‌টা কি করেছে, দেখেছ। উঃ পাউডার পমেটম সব—।

বোনকে গোটাদুই চড় লাগাইয়া দিয়া পরে সেই লণ্ডভণ্ড পাউডার পমেটমের কৌটা প্রভৃতি গুছাইতে লাগিয়া যায়। ছোট মেয়েটী কাঁদিতে থাকে।

মা উষ্ণ হইয়া বলেন—মার ওকে একেবারে মেরে খুন করে দে। তারপর বিড় বিড় করিয়া বলেন "কালকে টাকা দেব, তুই কিনে আনিস, তোর ও যা ভেঙ্গেছে। দ্বিতীয়া গালে হাত দিয়া বলে—'ওমা আমি বুঝি তাই বল্‌লাম।"

কিছুক্ষণ থামিয়া বলে—'হু', তোমার মেয়েকে মেরেছি বলে তোমার রাগ হয়েছে। এতগুলি জিনিষ যে আমার নষ্ট করে দিলে সে আর দেখলে না। তুমি ওকে বড্ড 'নাই' দিতে আরম্ভ করেছ, মা'।

মা উত্তরে মেয়েকে বকিতে যান, স্বামী থামাইয়া দেন। দ্বিতীয়া বলে 'হু ভারীতো মেয়ে তাঁর আবার মা বলেন—'কেন' ও তোদের কারু চেয়ে কম সুন্দর নাকি? দেখিস্‌ ওর—। কন্যা কোলে করিয়া তিনি চলিয়া যান। পিতাপুত্রী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। স্বামী ভাবেন যাক বোঝা গেল মেয়ে মাকে ভুলাইয়াছে। দ্বিতীয়া মেয়ের মনে হয়ত একটু ঈর্ষা উঁকি দেয়।

তারপরে একদিন মেয়ের হইল অসুখ। জ্বর, ভীষণ জ্বর, কিছুতেই আর কমেনা। সহরে বড় বড় ডাক্তার, সিভিল সার্জন সব আসিয়া দেখিতেছে। কলিকাতা হইতে ফল আসে নিত্য। জলের মত টাকা খরচ হইতেছে। মা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আহার নিদ্রা প্রায় ছাড়িয়াছেন। বড়মেয়ে

অসুখের কথা শুনিয়া এবং বোনের প্রতি মা'র অবহেলার কথা স্মরণ করিয়া আশঙ্কায় চলিয়া আসে। আসিয়া মা'র অবস্থা দেখিয়া—চব্বিশ ঘণ্টা মেয়ের পাশে বসিয়া থাকেন। মেয়ের মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া তিনি দেখেন মেয়ের সুন্দর মুখখানি শুষ্ক গোলাপের মত বিবর্ণ, রং মলিন হইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের ও গালের লালিমা পলাতক। ভ্রু এবং চোখের পাতা গ্রীষ্মকালের লতাপাতার মত হইয়া গিয়াছে রুক্ষ ও নীরস। মা'র চোখে জল আসিয়া পড়ে, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলেন; পাছে কেউ দেখে, পাছে মেয়ের অমঙ্গল হয়। মেয়ের অযত্ন অবহেলার কথা মনে পড়ে। কেন তিনি তখন মেয়েকে এমন অযত্ন অবহেলা করিয়াছেন!…এ জ্বর যদি না সারে—তিনি ভাবিতে পারেন না। বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকেন।

* * * *

তারপর ক্রমে ক্রমে জ্বরের বেগ মন্দীভূত হয়। আরো ২।৪ দিন পরে জ্বর একেবারেই থাকে না। ডাক্তাররা ভাতের ব্যবস্থা দেন।

যেদিন ভাত দেওয়া হইবে সেদিন অতিপ্রত্যুষে স্নান সারিয়া মা বহুদিন পরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। অতি যত্ন করিয়া পরিপাটীরূপে মেয়েকে সরুচালের ভাত আর মাছের ঝোল রাঁধিয়া দেন। সেই দিনই বিকেল বেলা কলিকাতায় জামাইয়ের কাছে তিনশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন, একটা খেলনা মোটর ও অন্যান্য খেলনা কিনিয়া পাঠাইবার জন্য।

সাত আটদিন পরে জিনিষগুলি আসিল। মেয়ে মোটর দেখিয়া বলিল—মা জুতা, মোতল।

দ্বিতীয়া মেয়ে ঠোঁটের কোণ কোঁচকাইয়া গাল ফুলাইয়া বলিল—নাও, এখন আর মটর গাড়ী খেলতে জুতা লাগবে না, এবার আসল গাড়ীই এসেছে।

মা মেয়েকে উঠানে গাড়ীতে বসাইয়া চাকরকে বলিয়া দিলেন উহাকে গাড়ী চালানো শিখাইয়া দিতে। চাকর শিখাইয়া দিতে মেয়ে সানন্দ কলরবে উঠানময় গাড়ী চালাইয়া ঘুরিতে লাগিল। দালানের সিঁড়িতে বসিয়া মা অতৃপ্ত নয়নে তাই দেখিতেছিলেন। বড় দুই মেয়ে তখন অদূরে দাঁড়াইয়া হয়ত নিজেদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে পঞ্চমার সমৃদ্ধির তুলনা করিতেছিল।

হৃষীকেশ মৌলিক



কারেন্সি-রহস্য

শ্রীপ্রভাকর মিত্র বি-এ, বি-কম্ (বম্বে)

পৃথিবীর সদাগর চলেছিল বহুদূর। কত কড়ির পাহাড়, শঙ্খের স্তূপ, কত তেপান্তরের মাঠ পার হ'য়ে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে' অবশেষে পাতালপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। অনেক মেহনত স্বীকার করে' অনেক কসরত দেখিয়ে পাতালপুরী প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে' দেখেন, সোনার খাটে এক সোনার পরী আর রূপার খাটে এক রূপার পরী শুয়ে' ঘুমোচ্ছে। পরশকাঠি ছুঁয়াতে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। অনেক ফন্দি খাটিয়ে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে' এনে সদাগর তাদের হাতে পৃথিবীর ভাঁড়ার সঁপে' দিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে' গেল। ঘরে ঘরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠল। সদাগর প্রচার করলেন—আর ভয় নেই; এবার সোনা রূপার মায়াজালে লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। হ'ল ও তাই। দেশে দেশে ভরা ডিঙ্গা পাল তুলে' সাগরে ভেসে চলল। অবাধ বিনিময় আর অজস্র গতাগতি হ'তে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে দেশ বিদেশের বণিক দেশদেশান্তরে পাড়ি দিলে। পৃথিবীর লোক ভাবলে দুঃখের অবসান হ'ল। সত্যই বুঝি, সোনার রথে রূপার হাঁস চালিয়ে, লক্ষ্মী নেমে এলেন।

এরকম কিছুদিন যাবার পর সোনারূপা দুইটী পরীর মধ্যে গরমিল দেখা দিলে। একজনের মান রাখতে অপরের মান যায়। যখন কমলা মুগ্ধ হ'য়ে সোনার পরীর পানে তাকান, অমনি রূপার পরীর মুখ ভারি হ'য়ে উঠে। আবার যখন রূপার পরীর চটুল ব্যবহারে কমলা আন্‌চান্ করেন, তখনি সোনা অভিমানে লাল হয়। রূপার চপলতা আসর মস্‌গুল রাখে; সোনার পরী তখন লজ্জা পেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর সদাগর দেখেন, ভারী মুস্কিল, দুজনের কাজে সামঞ্জস্য থাকে না। একজন নিজেকে সস্তা করে' বিলিয়ে দিতে চায়; অপরের আবার দর্শন মেলাই ভার। যেমন করেই হোক, এ গরমিল মিটাতেই হবে, দুজনের সমান অধিকার থাকা সম্ভব নয়। তখন অনেক ভেবে চিন্তে তিনি রূপাকে ছোটখাটো হালকা কাজ দিলেন; আর অন্দরের ভার রইল সোনার উপর। পৃথিবীর লোক ভাবলে, এই ঠিক বিচার হয়েছে। সোনা উঁচুদরের রাশ্‌ভারি মেয়ে, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, তার হাতে ভারী কাজই মানায়। আর রূপা বড় চঞ্চল, বড় সস্তা, তার হালকা কাজই ভাল। তবে তাকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, তা হলে সোনা সব দিক একা সামলাইতে পারবে না। তখন থেকেই সোনার হাতে রইল ভাঁড়ারের চাবী, আর রূপার হাতে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য।

এরূপে অনেক দিন নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, ভাবলে এতদিনে তারা আসল জিনিষের সন্ধান পেয়েছে, আর ভয় নেই; সোনারূপার মধ্যে গরমিল ঘুচল। এবার থেকে যে যার আপন কাজ করবে। সোনার কাজ, সবার উপর একচেটে দাবীর কাজ, ভাঁড়ারের কাজ; রূপা তার সহচরী ছোটখাটো খুটিনাটি কাজ নিয়েই থাকে। দেশ বিদেশ হ'তে সোনার আমন্ত্রণ লিপি আসে। যাবার সময় হয় না; পত্র বিনিময়েই কাজ সারে। বিশেষ অনুরোধে অতি সঙ্গোপনে বাহির হয়। রূপার পরী তাই দেখে আর ভাবে সোনার পরীর ইন্দ্রজালে দুনিয়াটা জড়িয়ে গেছে; কোন দিন বা রসাতলে যায়!

অভিশাপ ব্যর্থ গেল না। হঠাৎ পশ্চিম আকাশে ঘোরতর মেঘ দেখা দিলে। পৃথিবীর লোক আতঙ্কে শিউরে উঠল, কি জানি কোথায় বা বাজ পড়ে! ঝড় উঠল; পশ্চিমে তাণ্ডবলীলা সুরু হ'ল। সোনার ভাঁড়ারে টান পড়ল; চারিধারে "যায় যায়" শব্দ। সদাগর ব্যাকুল হ'য়ে

সিদ্ধিদাতা গজাননের পূজা দিলেন। গণেশের দপ্তর থেকে দিস্তা দিস্তা কাগজ এনে মুষিক খালি ভাঁড়ার ভর্ত্তি করে দিলে। সদাগরের ভাবনা গেল; ভাঁড়ার ভর্ত্তি হ'ল। কিন্তু মানুষের মনে সন্দেহ জন্মালো, সোনার ভাঁড়ারে আসলে কি আছে; লোকের চোখে সোনা অনেকখানি নেমে গেল। সদাগর চোখ মুদে' ধ্যানে বসলেন। কমলা স্বপ্নে দেখা দিলেন, বাণী হ'ল, "ভয় নেই; সোনার সেবায় আমি প্রসন্ন; সোনার ক-দর আবার বাড়বে।" সদাগর দিকে দিকে ঘোষণা করে' দিলেন, সোনার গিন্নীপনাই নিষ্কলঙ্ক। ধীরে ধীরে আবার পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাই সত্য বলে' মেনে নিলে। ভাঁড়ারের চাবী সোনার হাতেই গচ্ছিত রইল। সোনার পরীরই জয় হ'ল।

এ রকম যায় কতক দিন। আবার অঘটন ঘটল। এবার সোনা তাল সামলাতে পারলে না; বেতাল হ'য়ে গেল। লোকে ভারে ভারে দ্রব্যসম্ভার এনে সোনার ভাঁড়ারে ঢালে; পারিতোষিক নিয়ে ঘর যায়। এবার কিন্তু দ্রব্যসম্ভারের পরিমাণ বেশী হ'য়ে গেল; ভাড়ারে কুলায় না। বেগতিক দেখে সদাগর মুষিকদত্ত সেই দপ্তর ভাঁড়ার থেকে টেনে বার করে' দিলেন, তবুও স্থান হয় না। লোকে তখন বাধ্য হয়ে' দ্রব্যসম্ভার যে যার ঘরে ফিরে' এনে মজুত করলে: সোনার উপর তাদের বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। আদান প্রদান লৌকিকতায় সোনার পরী অপারগ। অভিমানে সোনা ঘরের কোণ নিলে; একরকম দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠল। সদাগর অনেক স্তবস্তুতি করলেন; কোন ফলই হ'লনা, সোনা অভি-মানে উর্দ্ধমুখী হয়ে মুখ ঢাকলে। পূর্ব্বে নিজেকে সে খেলো করেছে; নিজের ক-দর কমিয়েছে; এবার সে আর বাইরে মুখ দেখাবে না এই তার পণ। পৃথিবীশুদ্ধ লোক হা হা করে' উঠল, দেশে দেশে মজলিস বসল, দেশে দেশে বৈঠক পাতা হ'ল, কেমন করে' সোনার মান কমিয়ে তাকে সহজ সবল করা যায়। উচুদরের সমজদার হ'য়েও যদি সে তার ভাঁড়ারের বিলিবন্দোবস্ত না করে, তবে তার একলার হাতে চাবী সঁপে' দিয়ে মানুষ ক'দিন বিশ্বাস করবে? এই অনটনের দিনে সোনা যদি সহজভাবে চলাফেরা না করে, তবে পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কষ্টের একশেষ হবে; ভাঁড়ার রক্ষা করবে কে? সদাগর ভয়ে ভয়ে দিন গুণছে, যদি কোন ফিকিরে সোনাকে বশে আনতে পারি, তবেই মঙ্গল—তা না হ'লে অমঙ্গলের বড় বাজ আগে তার মাথায়ই পড়বে। আকাশে আবার খণ্ড খণ্ড মেঘও দেখা দিয়েছে। গতিক মোটেই ভাল নয়। পৃথিবীর মানুষ ভাবছে এ দুর্যোগ কাটলে তবেই নূতন প্রভাত। সে প্রভাতে সদাগরের দর্শন যে মিলবে তাও অনেকে সন্দেহ করে। বিধাতার এ কী বিড়ম্বনা! সোনার পরীর অভিমানে শেষে কি সদাগরী ভাঁড়ার তচনচ হবে?

প্রভাকর মিত্র



বিবর্ত্তন

শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ বি-এ

১

অনেক সময় নিতান্ত অকারণেই মানুষের মন খারাপ হইয়া পড়ে। কারণ অনুসন্ধান করিলে কোথাও যে হেতু মিলিবে না এমন কথা হলপ করিয়া বলিতে না পারিলেও সে নিমিত্ত এত তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর, যে তাহা লইয়া দুশ্চিন্তা করিতে লজ্জা বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে, এই অস্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন্‌খান দিয়া অনায়াসে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আজিও কেহ স্থির করিতে পারে নাই। কারণ স্থির না হইলেও কার্য্যে ব্যাঘাত হইল না। রমেশের ব্যাপারটাও তাই।

সকাল হইতেই তাহার মন খারাপ এবং সেই অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়ার ফলে সকাল হইতে বেলা বারোটা অবধি, বাড়ীর চাকর দাসী হইতে কর্ত্তা গৃহিণী পর্য্যন্ত, কোন না কোন বিষয়ে রমেশের মেজাজের ঝাঁজ অনুভব করিয়াছেন। ফলে যে কারণটা হয়ত এক পেয়ালা গরম চা পেটে পড়িলেই দূর হইতে পারিত, সেই তুচ্ছ হেতুই এই ঘণ্টা কয়েকের অনুকূল বাতাসে পাইল তোলা নৌকার মত অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়া, বেশ কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আজ যে কোন মতেই তাহাকে বশে আনা যাইবে না, ইহা সে বাড়ীর প্রায় সকলেই জানিতেন; কিন্তু জানিত না একজন। সে প্রাণীটী এই সংসারে নূতন প্রবেশ করিয়াছে—গৃহের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি কোন্ গুণের গুণী তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাই স্নান আহারের অনুরোধ করিতে আসিয়া মনোরমা একেবারে অথৈ পাথারে পড়িল। পালাইয়া যে আত্মরক্ষা করিবে সে পথ নাই; কারণ পথ আগুলিয়া রমেশ তখন পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত "পত্নীকে পতিব্রতা রমণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাছা বাছা শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনোরমা বিবাহের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে। একালের হইলেও দাম্পত্য জীবনের প্রভাতেই স্বামীর মুখ হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে দাঁড়াইয়া উপদেশ শুনিবার মত সৎসাহস তাহার এখনও হয় নাই। সুতরাং স্বামীর এই অসময়ের উপদেশের উচ্চ ধ্বনি পাছে কেহ শুনিতে পায়, এই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্বামীকে স্নান করিতে যাইতে বলার মত সাহস তাহার লোপ পাইয়াছে। নিতান্ত বালিকা না হইলেও নব বধূর স্বভাব-সুলভ লজ্জা এবং একান্ত অনভ্যস্ত পথে—আকস্মিক এই উপদেশ শুনিয়া, মনোরমা হতবুদ্ধির মত রমেশের গম্ভীর মুখের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল, আর তাহার বুকের মধ্যে, কি যেন একটা রুদ্ধবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া ঠেলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিলো নতুন বৌ—বলিয়া সাড়া দিয়া রমেশের বড় বৌদিদি সেখানে উপস্থিত না হইলে, এই দাম্পত্যশিক্ষা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। মনোরমা বড় জায়ের মুখের দিকে অসহায়ের মত চাহিতেই তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন "আর কিছু না হোক লজ্জা সরমও কি একটু থাকতে নেই ঠাকুরপো!"

রমেশ পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহার গাম্ভীর্য্য কিছুমাত্র কমিল না। সে কহিল "আমি ত আর চুরি করছি না যে লজ্জা করতে হবে। যার সঙ্গে কথা বলছি তার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে এবং তাতে লজ্জা করবার কিছু আমি দেখতে পাই না।"

"তুই যাবি না উপদেশ শুনবি নতুন বৌ—আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।"

মনোরমা ত্বরিতে আসিয়া বড় জায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, রমেশ একটা বিষদৃষ্টি তাহার দিকে হানিয়া বলিল

"লজ্জায় একেবারে—যত সব—" কথাটা গুছাইয়া বলিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়, - বিশেষত এই বৌদিদিটিকে তাহার বেশী ভয়।—রমেশের মনের কথা বুঝিতে এই লোকটি একেবারে সিদ্ধ হস্ত। আজ যে কি গভীর কারণে সকাল হইতেই তাহার মন অসুস্থ হইয়াছে, তাহা আর কেহ না বুঝিলেও বৌদিদি যে বুঝিয়াছেন এবং এই বোঝার ফলে তাহাকে যে কত রকমে নাকাল হইতে হইবে তাহা চিন্তা করিয়া রমেশের ভাঙ্গা মন আরও চঞ্চলা হইয়া পড়িল। তা'বলিয়া সে তাহার গোঁ ছাড়িল না। মুখভার করিয়া যেমন এতক্ষণ বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

'আজ তাহ'লে নাওয়া খাওয়ার দরকার নেই কি বল? আচ্ছা ঠাকুপো, বিয়ে কি তুমি একলাই করেছ না দুনিয়াশুদ্ধ সবাই করে?" রমেশ পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া জবাব দিল "সে কথায় আমার দরকার নেই।"

"তা থাকবে কেন তুমি হলে সৃষ্টিছাড়া, কি বল?"

"নিজের স্ত্রীকে দুটো কথা বলা যদি তোমাদের মতে সৃষ্টিছাড়ার কাজ হয়, ত সৃষ্টিছাড়া না হয়ে উপায় কি বল?"

"উপায় আর কি, নিজের স্ত্রী বলে যখন তখন যেখানে সেখানে তোমার খেয়াল মত কাজ করবে, কেমন?"

"তা কেন, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেও পাঁজি দেখে দিন ক্ষণ স্থির করতে হবে।"

না ভাই তা কেন, দিন নেই রাত নেই পথ নেই ঘাট নেই তোমার খেয়াল হলো আর তুমি দাঁড়িয়ে গেলে লেকচার দিতে। বেশ তাই দিও, বেচারী ছেলে মানুষ, এসেছে নূতন জায়গায় তোমার উপদেশ শুনে বুঝবার মত তৈরী হয়নি—একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখ, কথা বলবার ঢের সময় মিলবে। যাও, লক্ষ্মী ভাই আমার, নেয়ে খেয়ে নেওগে—শরীর তাজা হবে মনটাও সুস্থ হবে তারপর সমস্ত রাত যত পার উপদেশ দিও আমরা কথা বলতে আসব না।

রমেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল দুইটা বাজিতে পাঁচ মিনিট্‌। এতক্ষণ না খাইয়া থাকা জীবনে আর কোনদিন ঘটে নাই। সুতরাং ক্ষুধা বেশ মালুম হইতেছিল। সে কহিল "আমার আজকের দিনটাই তোমরা সবাই মিলে মাটি করে দিলে। কিন্তু আমি বলে রাখছি এরকম বেয়াদবী আমি সহ্য করব না আর কোনদিন।"

"কার বেয়াদবী—আমার না নতুন বৌয়ের।"

"কার তা টের পাবে—যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব" বলিয়া সাবান তোয়ালে লইয়া রমেশ প্রস্থান করিল।

ব্যাপারটা যে কি বৌদিদি তাহা কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে বাস্তবিক কতখানি, এবং সেই অংশে অপরাধ কাহার কি পরিমাণ, তাহা তাহার জানা ছিল না। নিজেদের এই সময়কার জীবনের তুচ্ছ বিবাদ বিসংবাদ মনে পড়িয়া আজ এই যৌবন-মধ্যাহ্নে তাহার সুন্দর মুখখানি সরমে রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নবদম্পতীর তুচ্ছ ব্যাপারটার পরিপূর্ণ বিবৃতি শুনিবার কৌতূহলও তাহার দুর্নিবার হইয়া উঠিল। মনোরমা তখনও জায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া, নিজের আরক্তিম মুখখানি তাঁহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল; ভরসা এই যে দিদি তাহাকে লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর দিদিরা যে কৌতুহল বশে নিজ কন্যাকে লজ্জায় ফেলিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না; সদ্য বিবাহিতা মনোরমার এই সত্য জানা ছিল না।

তাই তাহার মুখখানি পরমস্নেহে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া দুই কৌতুহলী চক্ষের দুষ্ট চাহনি তাহার উপর মেলিয়া ধরিতেই সে জোর করিয়া জায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল "যাও তুমি ভারী দুষ্টু।"

"তুমি মিথ্যে লোকের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করবে আর সে অন্যায় ধরে ফেলে আমি দুষ্টু হলাম। তুই ঠাকুরপোকে রাগাতে গেলি কেন?"

মনোরমা ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া বলিল "আমিত রাগাইনি দিদি—সকাল থেকে আমি আর একবারও এঘরে আসিনি। এই তোমার গা ছুয়ে বলছি।"

মনোরমার অকপট সুন্দর মুখখানির ভীতভাব অজস্র-চুম্বনে মুছিয়া লইয়া বড় যা বলিল—আজ যে ক'রে পারিস তার রাগ ভাঙ্গাবি কিন্তু।"

"আমি কি করে রাগ ভাঙ্গাব—আমি জানি কিছু?"

"জানবার দরকার হবে না লো—সে সময় আপনি মাথায় আসবে' খন।"

"যাও সে আমি পারব না—আমার ভারী লজ্জা করে।"

লজ্জা করে……কচিখুকী তুমি। তোমার দোষে তোমার বর রাগ করে থাকবে, আর আমরা যাব সালিসী কর্ত্তে, না?

"তা কি করব সকালে ওঁর ঘুম না ভাঙতে আমি উঠে এসেছি এই আমার দোষ—জাগলে না কেন ও।"

"তুই কেন জাগলিনে?"

"তা'হলে উঠে আসতে দেয় না যে—ও সব ভারী ইয়ে।"

"কি করে? ধরে রাখে?"

মনোরমা জবাব দিতে যাইয়া জায়ের মুখের দিকে চাহিতেই সে লজ্জায় লাল হইয়া ছুটিয়া পলাইল। বৌদিদি রমেশের শুকনা কাপড় ও ফতুয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া—খাবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন মনোরমা রমেশের খাবার প্রস্তুত করিতেছে আর তাহার এই কাজ কাহারও চোখে পড়িল কিনা তাহা দেখিতে ইতস্ততঃ ভয়চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ত্রস্তে সেখান হইতে সরিয়া যাইয়া বলিল "আমার কি দোষ দিদি, মা যে বল্লেন" বড়ধা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "তুই পারবি নতুন বৌ ঠাকুরপোকে কাবু করতে, আর ভাবনা নেই।"

মনোরমা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল "তুমি এমন দুষ্টু দিদি।"

"যে আমার সব কাজ তুমি টের পাও, কেমন?" বলিয়া বড় যা হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় মায়ের সহিত রমেশকে আসিতে দেখিয়া মনোরমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—বড় বৌ আর একবার হাসিয়া রমেশের খাবার গুছাইতে লাগিল।

২

অনেক রাত্রিতে শুইতে আসিয়া মনোরমা দেখিল রমেশ তখনও ঘুমায় নাই। সারাদিন তাহাদের স্বামী স্ত্রীর কাণ্ড আত্মীয়মহলে যে রকম ঘটা হইয়াছে, তাহাতে বড় যায়ের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কি করিয়া স্বামীর সহিত এই মিথ্যা কলহের একটা মিটমাট করিবে, তাহাই ছিল মনোরমার প্রধান সমস্যা। তাই যাই যাই করিয়া দেরী করিতে করিতে সে যখন ঘরে আসিল—তাহার বড় আশা ছিল রমেশ এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমাইয়াছে;—আজ রাত্রিতে আর তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে না। কিন্তু বিবাহিত জীবনে মোটে যার হাতে খড়ি, সে কেমন করিয়া জানিবে যে একটুখানি শাড়ীর আঁচল, কাঁকণ চুড়ির একটুখানি মধুর ঝঙ্কার, আচলের চাবির গোছার সামান্যমাত্র শব্দ শুনিবার আশায়, এই স্বামী নামক জীবটী অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষায় কাটাইতে পারে। সুতরাং আজিকার রাত্রি যে তাহার একটানা অনিদ্রায় কাটিবে, এবং শাস্ত্রজ্ঞ রমেশ যে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে পুরাদস্তুর পতিব্রতা না বানাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না ইহা সুনিশ্চিত। অবশ্য এই বিনিদ্র রজনী যাপন যে সেও সমস্ত মন প্রাণ দিয়া প্রতি নিয়ত কামনা করিয়াছে, তাহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ দিনমানের কোন্দল লইয়া এখন যে স্বামীর সহিত আলোচনা—অর্থাৎ ঝগড়া জুড়িয়া দেওয়া, তা'ও ত কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এমন কি পূর্ব্বের মত বিনা আহ্বানে আপনা হইতে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ, সেও যেন নিতান্ত বেহায়াপনা।

মনোরমা কেমন করিয়া যে শয্যায় যাইয়া বিনিদ্র স্বামীর পাশে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানটি গ্রহণ করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রমেশ বেশ গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "সারা রাত ঐ দোর গোড়াতেই কাটবে নাকি?"

মনোরমা বাঁচিয়া গেল। তাহাকে যে এই অবস্থায় প্রথম কথা বলিতে হয় নাই, ইহাতে সে হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থ হইল। এখন যতক্ষণে হউক রমেশের গাম্ভীর্য্য তরল হইয়া আসিবে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রমেশ উঠিয়া বসিল এবং কিছুকাল পত্নীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কথাটা কাণে গেল না বুঝি?" মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল কথা তাহার কাণে গিয়াছে।

"তা'হলে আধ ঘণ্টা ধরে ঠায় ঐখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে শুনি?"

"কি আবার হবে—দাঁড়িয়ে আছি আমার ইচ্ছে।"

"বাঃ এই যে দিব্যি কথা বেরিয়েছে দেখছি।"

"কথা বেরুবে না, আমি কি বোবা?"

"আর তোমায় বোবা বলে কার সাধ্য—তা' ছাড়া কথায় বেশ ধারও আছে দেখছি।"

"তোমার কাছে আরও কত দোষ বেরুবে, মোটেত এই আরম্ভ।"

কথাটা রমেশের ভাল লাগিল না। সে বলিল—"থাক্ আর ওরকম বিশ্রী করে কথা কাটতে হবে না—কোন মুখে যে এত বড় বড় কথা বলছ বুঝতে পারি না।"

"সেও কি আমার দোষ নাকি?"

"রামচন্দ্র, তোমার দোষ কেন হবে, তুমি হলে……"

"কি? তোমার কি আমি করেছি যে সারাদিন আমায় অমন লোকের কাছে অপদস্থ করলে? কি দোষ করেছিলুম আমি?" বলিতে বলিতে সে রমেশের অতি নিকটে আসিয়া একেবারে তাহার মুখের কাছে মুখখানা তুলিয়া ধরিল। রমেশ দেখিল মনোরমার চোখে জল টল টল করিতেছে—এখনি হয়ত কাঁদিয়া ফেলিবে। আর তাহার এই কান্নার কথা কোন রকমে যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এবাড়ীতে রমেশের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিবে না। তা'ছাড়া মুখখানিতে হাসি দেখিলে রাগ যদি বা সম্ভব হয় কান্না দেখিলে নিজেরই চোখ ভিজিয়া উঠে। এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। বিশেষ উনিশকুড়ি বৎসর বয়সের স্বামীর পক্ষে প্রায় সমবয়সী নববধূর চোখে জল দেখা একেবারে দুঃসহ।

রমেশের তেজ গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি স্বামিত্বের লক্ষণ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। ইহার পর ঠিক কিভাবে কোনখান হইতে আরম্ভ করিতে হইবে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে পত্নীর সজল আঁখি দুইটীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মনোরমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"বল না। কি দোষ করেছিলুম আমি?" তাহার চোখ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল রমেশের পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

রমেশের প্রাণ তখন উড়িয়া গিয়াছে—গলার আস্বাদ লবণাক্ত ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছে—বেচারী মনোরমাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কোঁচার খুটে তাহার চোখের কোণ মুছাইতে মুছাইতে ধরা গলায় বলিল "ছিঃ কাঁদে না—তুমি কিছু করনি!"

"তবে সারাদিন আজ আমাকে অমন জ্বালালে কেন?"

"তোমার সঙ্গে একটু রহস্য কচ্ছিলুম—আমি কি জানি তুমি তাতেই কেঁদে ফেল্‌বে?"

"আমার যে সারাদিন মন খারাপ হয়েছিল—তাতে কান্না পায় না বুঝি?"

"আর কখনো রহস্য করব না।"

"ঠিক বলছ করবে না?"

"না"

"কোনদিন না?"

"কোনদিন না"

"তাহলে এবার তুমি ঘুমুতে পার।"

"আর তুমি?"

"আমিও ঘুমবো।"

রমেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাহলে আগে—।"

মনোরমা হাসিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল "যাও তুমি ভারী চালাক।"

"কেন, চালাকি কি করলুম্?"

"চালাকি নয়? আমি ভাবলাম্ তুমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে গেছ আজ আর রাগ ভাঙাতে মাথা খুঁড়তে হবে না,—তা নয় দিব্বি জেগে বসে—ভাল মানুষ সেজে বলা হচ্চে তাহলে আগে—। ওসব চালাকি চলবে না—আমি আগে দেখব—তুমি কথা রাখছ—তারপর। তার আগে ও কথাই নয়।"

"আমি কথা রাখিনা কে বল্লে তোমাকে? কতদিন তোমার কথা রাখতে কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছি বলত?"

"আমি সে কথা রাখার কথা বলিনি গো মশাই—আজ যে প্রতিজ্ঞা করলে না সেই কথা রাখার কথা বলেছি।"

"ও— —সেই কথা! আচ্ছা সেওত আজ এই মুহূর্ত্তে নয়

এখন—সে কথা না তোলাই ভাল—কেননা রাগ আমার যা ছিল তা অনেকক্ষণ জল হয়ে গেছে। এর পরে যদি আমার কথনও হয় তথন সে বিষয় আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে হবে, অমন চট্ করে চোখ দুটো থেকে জল কিন্তু আর কথনও ফেলো না যেন।"

"কেন—তাতে কি হয়েছে ?"

"কিছু হয় নি বিশেষ, শুধু এই খানটায় কি যেন একটা গোলযোগ বেঁধে গেছে, এই দেখ" বলিয়া মনোরমার হাতখানা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল।

মনোরমা ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে বিবর্ণ মুখে বলিল—"কি হয়েছে বুকে য়্যাঁঃ ?"

রমেশ কোন কথা কহিল না মনোরমার হাতখানা আরো জোরে বুকের ওপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল।

মনোরমা ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বলিল "তাহলে মাকে ডাকি। না, তোমার নিশ্চয় অসুখ করেছে।"

রমেশ দেখিল ব্যাপার গুরুতর—এই গভীর রাত্রিতে মনোরমা যদি ডাকাডাকি করিয়া গোল বাধায় তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না।

সে কাতরভাবে বলিল "না না সে সব তোমায় কিছু করতে হবে না ও সেরে যাবে—এমন কিছু নয়।"

"না গো বুকের অসুখ কথাটা ভাল নয়—আমি এক্ষুণি মাকে ডাকি।" মনোরমার এক সখীর দাদার বুকের অসুখের কথা সে শুনিয়াছিল। কোন ডাক্তার তাহাকে ভাল করিতে পারে নাই এখন সে প্রায় মুমূর্ষু।

রমেশ হিতে বিপরীত হয় দেখিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি ভারী ছেলে মানুষ, ঠাট্টাও বোঝ না—বুকে আমার কিছুই হয়নি। শুধু দেখছিলাম তুমি কি কর।"

মনোরমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন একটা গুরুতর বিষয় লইয়া কি করিয়া যে মানুষ রসিকতা করিতে পারে তাহা সে কোনমতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—বেচারীর জানা নাই যে দাম্পত্য জীবনে যে সমস্ত গুরুতর রসিকতার স্থান আছে তাহার তুলনায় এ ত সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ।

রমেশ প্রমাদ গণিল—মনোরমার চোখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে কাঁদিয়া ফেলা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আর যদি সে কাঁদিয়াই ফেলে তাহা হইলে তাহার নিজের পক্ষেও সামলাইয়া থাকা আর সম্ভব হইবে না। অথচ স্ত্রীর উদ্যত অশ্রু প্রতিরোধ করিবার কি উপায় থাকিতে পারে ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বৌদিদি ডাকিলেন "আজ উঠবিনে নতুন বৌ বেলা যে আট্টা বাজতে চল্ল।"

রমেশ নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল আর মনোরমা যে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আলো নিভাইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

সে দিন রমেশ কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল, মনোরমা কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, বোধ করি গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছে। বয়সের গুণেই হোক, আর অভ্যস্ত-বিষয়ে কোন প্রকার বৈচিত্র্য না থাকাতেই হোক, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্ব্বের সে ভাব আর নাই। তা বলিয়া তাহাদের দাম্পত্য জীবনে যে কোনরূপ অসঙ্গতির স্থান হইয়াছে তাহা নয়। সেই তুচ্ছ কলহ, অকারণ অভিমান—অনাবশ্যক মিলনে তাহার পরিসমাপ্তি হাস্য পরিহাস কোন কিছুরই অভাব হয় নাই। স্বামী স্ত্রীতে এখনও দীর্ঘ রজনী বিনিদ্রই যাপন করে। কিন্তু কি জানি কেন ইহাতে আর তেমন মাধুর্য্য নাই। সে সময় কলহ বিবাদ হইত কিন্তু তাতে একটা মাদকতা ছিল। মান অভিমানের কারণ না থাকিলেও তাহার একটা রমনীয় আকর্ষণ ছিল—মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ ছিল। দীর্ঘনিশা অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত কিন্তু তাহা কোনখান দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝা যাইত না। আর আজ কলহ হয় সাংসারিক বিষয় লইয়া; অথচ যেমন তুচ্ছ কারণে বিবাদ হয়, ততোধিক তুচ্ছ উপলক্ষে বিবাদ মিটিয়া যায়। বিবাদ হয় বিবাদ মিটে কিন্তু কিছুতেই যেন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। অভিমান হয় তাহা মিটেও; কিন্তু এই অভিমানে বুক ভাঙ্গিয়া যায় না, মিটিলেও তৃপ্তি নাই। মিল ঘটে আবশ্যক মিটাইতে,

তাহাতে আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়—কিন্তু তাহা কাটে অনিদ্রায় ঘুম আসে না বলিয়া; জাগরণের সুখে জোর করিয়া ঘুম দূর করিতে হয় না। তখন জাগিত জাগরণের আনন্দে এখন জাগে ঘুমাইবার আশায়। তখন রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইত টের পাওয়া যাইতনা; এখন রাত্রি যেন আর কাটিতে চাহে না।

রমেশ অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কেন এমন হইয়া গেল—তাহা সে বুঝিতে পারে না। দুঃখ হয়, কত সময় দুঃখে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয় কিন্তু সে দিনের সেই মোহ-মাদর কার্য্যকলাপ আজ আর কোন মতেই ফিরাইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহা পাইতে হইলে রমেশকে মনোরমার কাছে নাকাল হইতে হইত আজ হয়ত তাহা চাহিতেও হয় না তবুও তাহাতে তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই—উল্লাস নাই। পূর্ব্বে ছিল উৎসব এখন হইয়াছে নিত্যক্রিয়া।

মনোরমার যে-রূপে রমেশ পাগল হইত, সেই পাগল করা রূপের তার এতটুকু অপচয় ঘটে নাই বরং যৌবন-মধ্যাহ্নে তাহা পরিপূর্ণ হইয়া শতদলে সহস্রদল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে ডাকিলে কাছে পাওয়া যাইত না আজ সে আপনি স্বেচ্ছায় ধরা দেয়—অথচ রমেশের মনে হয় মনোরমাকে আর সে আগেকার মত নিবিড় ভাবে একান্ত ভাবে পায় না। যে মনোরমা সে সময় শত গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততায়ও একমাত্র তাহারই ছিল আজ সে হইয়াছে অনেকের—তাহার প্রিয়তমা আজ গৃহিণী হইয়া, যেন তাহার কাছ হইতে অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার সবখানি যেন আজ মাতৃত্বে উচ্চ স্তরে উঠিয়া রমেশের স্পর্শের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার সাজ পোষাক আর ব্যস্ততা দেখিয়া রমেশের মন খারাপ হইয়া গেল। একমাত্র কর্ত্তব্যের খোরাক জোগান ছাড়া আর কিছুই কি তাহার কাছ হইতে সে পাইবে না?

তাহাকে দেখিয়া মনোরমা কহিল "এই যে তুমি এসেছ, ছেলেগুলো রইল—সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দিদির ঝঞ্ঝাট বাড়াব না।"

"না আমি ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না—ও সব সঙ্গে নিয়ে যাও।" রমেশের কথায় এমন একটা বিরক্তি প্রকাশ পাইল যে মনোরমার সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল "বুঝতে পাচ্ছি তোমার কষ্ট হবে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেলে ওদেরই দুর্গতি হবে বেশি একটু কষ্ট তোমায় আজ করতেই হবে।"

এই কথার জবাবে রমেশ কিছু বলিলনা দেখিয়া – মনোরমা মনে মনে চটিল। কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিয়া কোন কটু কথা বলা তাহার স্বভাব নয়। সে বলিল—

"একটা বেলা বৈ ত নয়—একটু না হয়—দেখলেই ওদের।"

"আমার আর কাজ কর্ম্ম নেই বুঝি?"

"তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন আমি আগলাতে পারি—তুমি আর এক বেলা একটু কষ্ট করতে পারবে না?"

এ কথার জবাব নাই। অথচ মনোরমা যে এখন কোথাও যায় এ ইচ্ছাও তাহার নাই। কিন্তু বাধা দিতে গেলে অনর্থ বাধিবে এ দিকে গাড়ীও নীচে হইতে বার বার হর্ণ বাজাইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। রমেশ নিতান্ত বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করিল "কোথায় যাওয়া হবে শুনি?"

"হাওয়া খেতে—বুঝলে মশাই তোমার কাঁধে ছেলে মেয়ের ভার দিয়ে হাওয়া খেতে চলেছি।"

এমন ভাবে মনোরমা যে তাহারই মুখের উপর মনের তিক্ততা প্রকাশ করিবে, রমেশের এই সাত আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে ইহার দ্বিতীয় নজির নাই। রমেশ আজ অকস্মাৎ এই রূঢ় উত্তর শুনিয়া, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

মনোরমা তাহার কোলের ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া বলিল "একে আমি নিয়ে গেলাম আর সব রইল দেখতে হয় দেখবে, না হয় তাদের কপালে যা থাকে হবে। আমি দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে পারি না।"

মনোরমা একটা অপরূপ রূপের লহর তুলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল—আর রমেশ হতবুদ্ধির মত কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কলেজের পোষাক বদলাইতে চলিয়া গেল। কিন্তু যে গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার

বুক চিরিয়া বাহির হইল তাহা দমন করিতে গেলে যেটুকু মনের স্থিরতা মানুষের মনে থাকা দরকার আজ আর তার কণামাত্রও তাহাতে অবশিষ্ট নাই।

ছেলে তাহাকে আগলাইতে হইল না—ইতিপূর্ব্বেও কোন দিন হয় নাই—অথচ এই একটা অতি তুচ্ছ কর্ত্তব্য লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অনর্থক একটা কলহ হইয়া গেল ইহার কি আবশ্যক ছিল? আজকাল অতি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া এই ধরণের মনোমালিন্য ঘটে—অথচ—না সেই বিগত দিনের সরস দিনগুলির স্বপনস্মৃতিকে মনে টানিয়া আনিয়া আর কি হইবে। রমেশ অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল।

বড়বৌদিদি আসিয়া জল খাইতে অনুরোধ করিলে রমেশ জানাইল তাহার ক্ষুধা নাই একেবারে সন্ধ্যার পরেই আহার করিবে এখন একটু বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হওয়াই তাহার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু বৌদিদি লোকটি সহজ নয়। কি কারণে যে আজ রমেশের অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত তাহা বুঝিয়া বলিলেন "সন্ধ্যার পর নতুন বৌ ফিরে এলে তখন পেট পূরে খেয়ো এখন যাহোক করে এইটুকু মুখে ফেলে শুয়ে না হয় সেই সুসময়ের স্বপ্ন দেখে তখনকার জন্যে ক্ষিদে করে রাখ।"

এই লোকটির কাছে জীবনের প্রথম হইতেই রমেশের পরাজয় ঘটিয়াছে এমন কি মায়ের কথায় রমেশের দ্বারা যে কাজ না হয় বৌদিদির কথায় তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছে। তা ছাড়া লোকটি এমনই নাছোড় যে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রমেশকে ইহার আদেশ পালন ও অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছে এবং হয়। আজও তাহাই হইল।

বৌদিদি কাছে দাঁড়াইয়া থালাখানি শূন্য করাইয়া রমেশকে রেহাই দিলেন। রমেশ কিছুকালের জন্য সমস্ত ভুলিয়া বোধ করি এই কথাই ভাবিতে লাগিল যে দুঃখের কারণ যদি বা থাকে—তাহার মধ্যে এই ধরণের অনাবিল আনন্দের উৎসও ত রহিয়াছে তখন আর বৃথা দুঃখ করিয়া ফল কি?

পান মুখে দিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল "আজকাল খাওয়ার মত হাওয়া কোথায় বইছে বৌদি?"

কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে রমেশের মুখের দিকে চাহিতেই রমেশ বলিল "হাওয়া খেতে কোথায় যাওয়া হল আজ?"

"নতুন বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস কর্চ্ছ?"

"ধরেছ ঠিক—কিন্তু তুমি গেলে না যে?"

"সে গেল তার দিদির বাড়ী, হাওয়া খেতে আবার কখন গেল?"

"তা জানি না—কিন্তু বলে গেল হাওয়া খেতে যাচ্ছি।"

"তাকে রাগিয়েছিলে বুঝি—তা নইলে মিথ্যে কথা ত সে বলে না ভাই।"

"ছেলে আগলাতে পারব না বলাতে জানিয়ে দিলেন তিনি হাওয়া খেতে যাচ্ছেন—আগলাতে পারি ভাল না হয় তাদের কপালে যা আছে তাই হবে।"

"তাই বলে গেল বুঝি? আচ্ছা মেয়ে ত।"

"আমিও দেখছি তাই, দিন দিন দেহের অনুপাতে বুদ্ধি বেশ সরু হয়ে চলেছে—কিন্তু দিদির ওখানে ব্যাপার কি আজকে।"

"সে ব্যাপারে তোমার দরকার নেই, তুমি এখন চুপ করে শুয়ে থাক না হয় তার হয়ে একটু খোলা বাতাসে ঘুরে এস গিয়ে।"

"কিন্তু কথাটা আমায় জানালে……"

"জানাবার হলে অবশ্য জানাত—সব কথাই যে তোমাদের বলতে হবে তার মানে আছে কিছু?"

"তা হলে স্বাধীন কি বল?"

"যা হয় আছে তোমার কোন কাজের কথা থাকে ত বল না হয় আমার অনেক কাজ বাকী।"

রমেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যাকে ধরে রাখবার অধিকার আছে তাকেই রাখতে পারলুম না—তোমায় নিয়ে টানাটানি করে আর কি হবে—তুমি যাও।"

বৌদিদি চলিয়া গেলেন—রমেশ আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

স্বামীর সহিত অকারণে কলহ করিয়া আসিয়া মনোরমার মনটাও ভাল ছিল না—অথচ দিদির বাড়ী হইতে একটু

সকাল সকাল ফিরিয়া যে তাহার শেষ করিবার চেষ্টা করিবে এমন সুবিধাও কাজের চাপে করিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় তাহার শূন্যমনের পরিচয় পাইয়া দিদি এবং রসিকা বৌদিদিদের বিদ্রুপের খোঁচা সহ্য করিয়া সে যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি গভীর। স্বামী যে এই রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া নাই তাহা সে জানিত, এবং আবশ্যক হইলে এই রকমের নিদ্রা হইতে স্বামীকে যে সে কোনদিন জাগায় না এমনও নয়—তাই একান্ত ঔৎসুক্য এবং গুরুতর উদ্বেগ বুকে লইয়া স্বামীর কাছে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যে দুইটী ছেলেকে রমেশের খপর-দারিতে রাখিবার নামে শাশুড়ীর ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছিল তাহারা তাহাকে পাইয়া বসিল। ফলে ছেলে লইয়া সে রাত্রি তাহাকে এমনই বিব্রত হইতে হইল যে ছেলের বাপের কথা ভাবিবার আর অবসর হইল না।

কিছু পরে ছেলে এবং মা এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ চেষ্টায় রমেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সে যেন স্বগত উক্তি ছলে বলিয়া উঠিল—"নাঃ শুয়ে যে একটু ঘুমুব এদের জ্বালায় সে আশাও আমার নেই।"

কথাটা কাণে যাইতেই মনোরমা ছেলেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে মাকে পাইয়া তাহারা দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে সংযত করিবে কে? সমস্তদিনের যত খুটিনাটী একটি একটি করিয়া মায়ের কাছে জানাইবার আনন্দে উচ্চৈস্বরে সেই সকলেরই কীর্ত্তন অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। আর রমেশ একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করিয়া পুত্রদ্বয়ের এই অনাবশ্যক ইতিহাস-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিল।

মনোরমা শুধু হুঁ দিয়া পুত্রের বর্ণনায় সাড়া দিতেছিল—কিন্তু তাহার প্রত্যেক 'হুঁ' রমেশের বুকে বিষাক্ত শরের মত বিঁধিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল।

এমন সময় মনোরমাই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল 'থাম বাবা, একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।'

রমেশ খোচা দিয়া বলিল—"না না চলুক না থামবে কেন—বেশ হচ্চে।"

কথাটা মনোরমার ভাল লাগিল না, সে বলিল—"তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি—ছেলেরা ওরকম করেই থাকে।"

"মায়ের অস্কারা পেলে আরও অনেক কিছু করে।" বলিয়া রমেশ উঠিয়া শয্যার উপর বসিল।

"আবার চল্লে কোথায় শুনি?"

দেখি ছাদে কি আর কোথাও যদি একটু নিরালা পাই। তোমাদের মা বেটার আলাপ শুনে—রাত জাগলে ত আর আমার চলবে না, আর রাত্রির ঘুম দিনে পুষিয়ে নেবার অবসরও নেই।"

কথাটা যে মনোরমার দিবা নিদ্রার উল্লেখ করিয়া বলা হইল তাহা বুঝিতে মনোরমার বাকী রহিল না।

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল "তোমার অবসর নেই কেন, দিনে ঘুমুতে তোমাকে কে আটকাচ্ছে। তোমার সময় নেই সে দোষ আমার নয়।"

কথাটার মধ্যে মিথ্যার স্পর্শ নাই বলিয়াই আঘাতটা রমেশকে বিঁধিল। সে বলিল তোমার দোষ নয়—কিন্তু চাকরী আমি আমার একলার জন্যে করি না—

"তার মানে—তোমার সেই রোজগারের টাকায় আমরা খেয়ে বাঁচি কেমন এই কথাই তো তুমি বলতে চাও?"

কথাটা ঠিক এভাবে বলিবার ইচ্ছা রমেশের ছিল না—কিন্তু অন্তরের বিক্ষোভের চাপে তাহা যেকালে ওষ্ঠের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে আর বাধা দিবার উপায় নাই। তাছাড়া কথার পর কথা পড়িয়া আলোচনাটা এমন এক-স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার গতি ফিরান আর চলে না। রমেশ এবারেও বলিয়া বসিল-"কথাটা অন্যায় বলেছি বলেত বোধ হয় না। তোমার হয়ত তা হতে পারে।"

মনোরমা আগুন হইয়া বলিল "স্ত্রীপুত্রকে খেতে দেওয়ার খোটা দিতে তোমার লজ্জা করল না একটু—একাজটা তুমিই একলা কর্চ্ছ না—দুনিয়া শুদ্ধ সবাই করে থাকে?"

"দুনিয়ার সকলের কথা জানি না—তবে বোধ হয় এইটাই সর্ব্বত্র চলে আসছে।" রমেশ উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিল। মনোরমা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একাড়ী এইঘর এবং এখানকার যা কিছু সব তোমার কেমন?"

"না, এ সমস্ত আমার বাবার।"

"তিনি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"নিশ্চয়।"

"প্রফেসারীতে তুমি যা পাও তার একপয়সা তুমি তাঁকে দিয়ে থাক ?"

"দেবার দরকার হয় না।"

"তা হলে আজ অবধি তোমার নিজের খাওয়া পরাও তোমার পয়সায় চলে না ?"

"না চলে না—কিন্তু এসব কথা কেন ?"

"আমার ও আমার বাছাদের খাওয়া পরার জন্তে তুমি হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটছ কিনা তাই।"

কথাটা যেমনি সত্য তেমনি মর্ম্মান্তিক। স্ত্রীর মুখ হইতে এ ধরণের কঠোর সত্য শুনিয়া পত্নীপ্রেমের অবতারের পক্ষেও নীরবে সহ্য করা দুঃসাধ্য—তায় আবার রমেশের মন গোড়া হইতেই নানা কারণে অস্থির হইয়া রহিয়াছে। সে কিছুকাল মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিল এই মনোরমাই তাহার মনোরমা কিনা —তারপর তাহার মুখ হইতে বোধ হয় অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া গেল—"তা'হলে আমার কাছ থেকে তুমি বা তোমার ছেলেরা এমন কিছু পাও নি যার জন্ম ঋণ স্বীকার চলে ?"

"মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলে সে কথা তুমি নিজেই অনায়াসে বুঝতে পারবে। আর ছেলেরা আমার, তোমার তা'রা কেউ নয়, কি বল ?"

"স্ত্রী পুত্রকে খেতে দেবার ক্ষমতা যার নেই তাকে ওকথা বলে লজ্জা দেওয়া কেন ?"

মনের জ্বালা তখনও মনোরমার পূরা মাত্রায় রহিয়াছে সে ঠিক তেমনি ঝাঁজের সহিত বলিল "একশবার যার মুখ দিয়ে তোমার ছেলে কথাটা বেরোয় তাকে লজ্জা দেবার ভাষা আমার নেই। ছাদে গিয়ে আর কাজ নেই—রাতও শেষ হয়ে এল এইখানেই কোন রকমে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবার চেষ্টা কর। আমার মুখ থেকে বা ছেলেদের মুখ থেকে কথা বেরিয়ে যাতে তোমার শান্তি ভঙ্গ না হয়, এর পর সেই ব্যবস্থাই করা যাবে।"

মনোরমা সত্ত নিদ্রিত ছেলেটিকে বুকে টানিয়া লইয়া রমেশের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল। আর রমেশ বোধ হয় জবাবে একটা কিছু বলিবার জন্ত ক্ষণিক অপেক্ষা করিল, পরে কোন কথা খুজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বাহিরে বেশী কাল রমেশ থাকিতে পারিল না। নিজের দুঃখটাই সে এতকাল বড় করিয়া দেখিয়াছে, কি সেই দুঃখের পিছনে যে আরও কতগুলি প্রাণীর প্রাণের আগুন নিরন্তর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে তাহার সংবাদ এতকাল সে রাখে নাই। আজিকার এই নিষ্ঠুর বিসংবাদে মনোরমার মনের যে পরিচয় সে পাইল এবং নিজের মনেরও যে কদর্য্য দিকটা মনোরমার কাছে ধরাইয়া দিল তাহার পর কোন ক্রমেই আর এই নিতান্ত জোর করা সম্বন্ধের দাবীতে তাহার ও মনোরমার পরস্পর যোগ যে একেবারেই অসম্ভব। সে ভাবিয়া পাইল না এই ধরণের মন লইয়া তাহারা দুইজনে এত দিনে কেমন করিয়া প্রেমের অভিনয় করিয়াছে।

রমেশ একবার ব্যাপারটার শেষ মীমাংসার চেষ্টা দেখিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

মনোরমা সেই ভাবে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মাতৃত্বের পরম পবিত্র একটি উজ্জ্বল শ্রী তাহার নিদ্রিত মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমেশ দেখিল— এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট বুঝিল ঐ মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সেই মুখের অধিকারিণীর অন্তরে রমেশের স্থান নাই বলিলেই সত্য বলা হয়।

রমেশ আসিয়াছিল বুঝা পড়া করিতে, কিন্তু কথা কহিয়া, বা যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিবার সেখানে যে কিছুই নাই তাহা বুঝিতে রমেশের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না।

অতি দুঃখে বুক ভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রমেশ পুনরায় পরিত্যক্ত শয্যা গ্রহণ করিল।

৫

আরও কয়েক বৎসর গড়াইয়া গেল। মনে প্রাণে তারুণ্য লইয়া রমেশ বয়সে যেখানটায় আসিয়া পৌছিল সেখান হইতে মনোরমার ব্যবধান এত অধিক যে তাহার নাগাল পাওয়া একালে অসম্ভব।

কলহ বিবাদ আর হয় না বলিলেই চলে কারণও ঘটে না কিছু। যদিবা কখনও ঘটে তাহা এমনই অকারণ লইয়া যে তাহা লইয়া মনে মনে কাব্যরচনা একেবারেই অসম্ভব।

যদিবা কোন দিন মনের খেদে রমেশ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, মনোরমা তাহাতে এমন হাসিয়া উঠে যে রমেশের লজ্জা গোপন করিতে দুই তিন দিন পালাইয়া ফিরিতে হয়। না হয় ত বলে "ছেলেরা রয়েছে কি যে সব বাজে বক তার ঠিক নেই।"

রমেশ খুজিয়া পায় না দশ বৎসর পূর্ব্বে যে কথা জীবনের সব চেয়ে বড় কথা, আজ তাহা একেবারে বাজে হইয়া দাড়াইল কোন পাপে।

অথচ ইহা যে বাজে হইয়া গিয়াছে, ইহা জীবনে একমাত্র খাওয়া পরার খপরদারী করার বাহিরে আর কোন বিষয়ে যে তাহার ও মনোরমার মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই, একথা এত সুস্পষ্ট যে তাহাকে কোন যুক্তি দিয়াই প্রাণের কাছ বরাবর আনিয়া দাঁড় করান আর চলে না।

এমনই একটা মারাত্মক চিন্তা লইয়া রমেশ সেদিন প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, মনোরমা আসিয়া বলিল "আজ যদি বালিগঞ্জের সেই পাত্রটির খোজ না কর তাহলে তোমার মেয়ে নিয়ে তুমি থাক আমি একদিকে চলে যাই।" মেয়ে যে বড় হইয়া উঠিয়াছে সমাজে থাকিয়া তাহার বিবাহ না দিলে যে বিপদ আছে সে কথা রমেশ জানে অথচ ইহার জন্য যে একটা চেষ্টার প্রয়োজন সে খেয়াল তাহার এতদিন হয় নাই। সে এসব পারেও না। কোথায় সে নরনারীর চির মিলনের মনস্তত্ত্বের মধ্যে তাহার ও মনোরমার এই গর-মিলনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে ব্যস্ত, না কন্যার জন্য পাত্র খুজিয়া আনিতে হইবে।

রমেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। সে বুঝিয়া পাইল না দাম্পত্য জীবনের নিবিড় সংশয়ের মধ্যে এসব অবান্তর বিষয়ের স্থান কোথায়।

"কিগো কথা 'কওনা যে?" বলিয়া মনোরমা আর একবার স্বামীর চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করিতেই রমেশ বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি কাজের ফরমাস ছাড়া আর কিছু বলিবার নেই?"

"আবার কি বলব? তোমার মত আকাশপানে তাকিয়ে হাহুতাশ করবার বয়েসও নেই সময়ও নেই। তা'ছাড়া নিরর্থক কতগুলো……"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল "থাক্, তোমার মুখ থেকে কোন বিষয়ের অপব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তার চাইতে বরং বালিগঞ্জের খোজে যাই।"

"তাহলে আমার বরং দিন ঘুনিয়ে এসেছে।"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া রমেশ প্রশ্ন করিল "মানে?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল—"এখন থাক্ শুনোখন পরে।"

রমেশের মনটা কেমন যেন হইয়া গেল—কিন্তু এখন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বালিগঞ্জ যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। রাগে অভিমানে গজ্ গজ্ করিতে করিতে রমেশ পথে বাহির হইল।

মনোরমার এসব ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইত। কর্ত্তব্যের পথে যাহার কোন সার্থকতা নাই, একমাত্র আলস্যের জের টানিতেই যে কল্পনা আপনা হইতেই নিরাশায় শেষ হইয়া যায়—তাহা লইয়া এই লোকটা এমনভাবে মাতিয়া থাকে কিসের লোভে, মনোরমা কিছুতেই ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। বিশেষতঃ রমেশ এই সব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া যখন রাগারাগি করে মনোরমার তখন হাসি পায়। তাই রমেশ নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে বাহির হইয়া গেলে মনোরমার হাসি পাইল—কিন্তু সেই সঙ্গে রমেশের প্রতি একটু মমতার আভাষও যেন মনের কোণে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল। হয়ত বা বছর দশেক পূর্ব্বেকার তাহাদের দাম্পত্য জীবনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া বুকখানাকে বেশ একটু নাড়া দিয়া জানাইয়া দিল যাহা এই সেদিনও জীবনে একান্ত আবশ্যক ছিল আজ তাহার একেবারে অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই।

কথাটা মনে হইতেই এই একান্ত নির্জ্জন গৃহেও মনোরমার মুখের উপর বেশ একটু লালসার আভা ফুটিয়া উঠিল।

পাছে ছেলেরা কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে বোধ করি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

গভীর রাত্রিতে সারামনে বিষম বিরক্তি লইয়া রমেশ যখন শুইবার ঘরে গেল মনোরমা বোধ করি তখনও

সংসারের খুটিনাটি লইয়াই ব্যস্ত। ইহার পরে সে যখন শুইতে আসিবে তখন বা কিছু পরেই হয়ত করপোরেশনের ময়লা গাড়ীর বিকট শব্দ বিনিদ্র রজনীর অবসাদকে তিক্ততর করিয়া জানাইয়া দিবে—ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই।

এতক্ষণ যে-সমস্ত কটু এবং রূঢ় শব্দ মনোরমার প্রতি প্রয়োগ করিবে বলিয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল, সেইগুলি আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল। কিন্তু বাধা পাইল মনোরমার আগমনে।

সারামুখে হাসির রক্তিমতা ছড়াইয়া সে যখন রমেশের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, রমেশের বুকটা কেমন যেন একটা দোল খাইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—"কটা বাজল বলতে পার ?"

এ প্রশ্নের মূলে যে কি মনোরমা তাহা জানে—সে বলিল—"সাড়ে বারটা—কিন্তু কেন বল দেখি ?"

"না—কিছু নয়—অমনি জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস বোধ করি একটু বড় হইয়াই বাহির হইল।

মনোরমা স্বামীর কোলের উপর শুইয়া পড়িয়া হাত দুইখানি দিয়া রমেশের কণ্ঠ বেষ্টন করিতেই রমেশ জল হইয়া গেল। এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান বুঝিবা আজ নিঃশেষ হইয়া যায়।

মনোরমা রমেশের মুখখানা আরও কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"রোজ রোজ অমন মুখভার করে থাক কেন বলত ?"

"তা নইলে কি আজ এই আনন্দটুক পাওয়া যেত ?"

"বয়েসটা বাড়ছে না কমছে ?"

রমেশ মনোরমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার না আমার ?"

"দুজনেরই—"

না হয় বাড়ছেই তাবলে যতদিন……

কথাটা আর শেষ হইতে পাইল না তৃতীয় পুত্রটী সটান মায়ের কাছে আসিয়া বোধ করি কোন অভিযোগ প্রকাশ করিতেই মাকে ধরিয়া টানিতেছে, মনোরমা ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল—রমেশ পাশবালিশটা আকড়াইয়া বোধ করি ঘুমের চেষ্টাই করিতে লাগিল।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

আবির্ভাব

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

আমার যৌবন-লোকে সুন্দরের আবির্ভাব হো'লো
হে বিমুগ্ধ চক্ষু মোর দৃষ্টি তব প্রজ্জলিয়া তোলো
বরণের দীপালোকে ; কি বিচিত্র ভাবের আবেগে
অন্তরের স্বপ্ন-পদ্ম রসাবেশে উঠিতেছে জেগে
অতনুর আশীর্ব্বাদে ; পুষ্পল অধর প্রান্তে মম
কম্পনের কুঁড়ি ফোটে আরক্তিম রক্তজবা সম !
দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর রাজপুত্র আসিয়াছে দ্বারে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তার হারায়ে ফেলেছি আপনারে,
অসহায় ; তার দৃষ্টি নয়নের সজল অঞ্জলি
যে অমৃত-মধু স্পর্শে উঠিয়াছে আজিকে চঞ্চলি !
যে অমৃত নেমে এলো বাসবের দেহ-গন্ধ হ'তে
আমার এ দেবতার বাহু বন্ধ-শিহরণ-স্রোতে !
বিহ্বল এ মর্ম্মে মোর তারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থকতা
স্বপ্ন মোর সত্য হোলো ; বাক্যহীন অন্তরের কথা !

য়ুরোপীয়ানা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পয়লা আগষ্ট—ব্যাঙ্ক্ হলিডে। লণ্ডনের নরনারী চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে। যাত্রাটা সূর্য্যদেবের মুখ দেখে সুরু হ'লেও অনেকের পক্ষে শুভ হয়নি। সে কথা পরে বলছি।

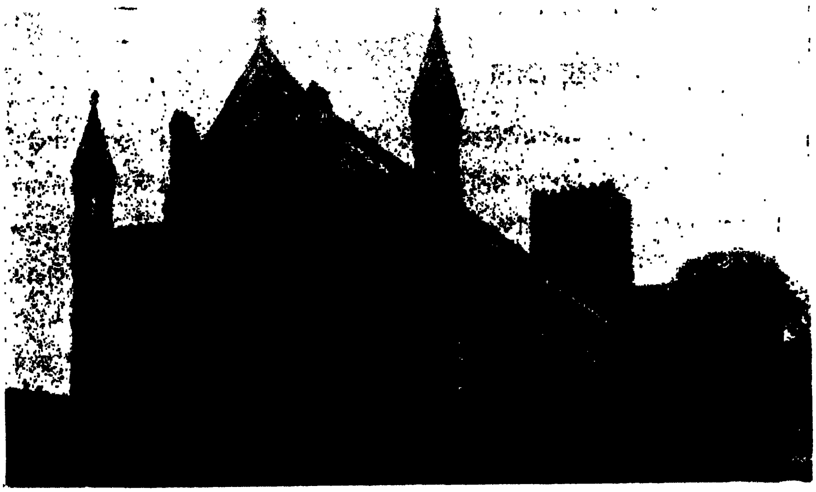
রেজি ব'ললে, যেখানেই যাও দেখবে সেই মামুলি অ্যারি এবং অ্যারিয়েট্, যদিও আজকাল তাদের চেনা একটু দুষ্কর যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে—বিশেষ ক'রে 'Arrietকে। স্কার্ট এখন ইংরেজ মেয়ে পুরুষকে পেয়ে ব'সেছে। হাফ্ প্যাণ্ট্, খোলা শার্ট এবং পিঠে একটা বোঝা; এই হ'ল hikersদের পোষাক—উপকরণ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এবং এই সম্বলে তাঁরা পথে বেরিয়ে পড়েন, পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তরে যাবার জন্যে। তবে ঈডিথের মত হাইকার্সদের সঙ্গে গাড়ী থাকা চাই, বন্ধুরা পালা ক্রমে মোটর হাঁকাবেন এবং পালাক্রমে পথ হাঁট্‌বেন- পথে যত খাল বিল আছে সেখানে হবে স্নান



সেণ্ট্ য়্যালব্যান্স্—YE OLD FIGHTING COCKS—ইংলণ্ডের প্রাচীনতম সরাই (inn)

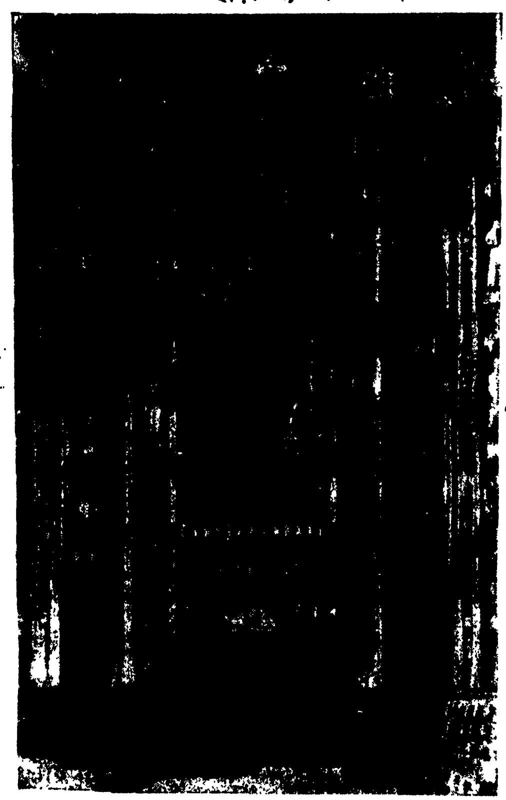
ছোট অতএব সস্তা এবং আর্ট্ সিল্কের মোজার সঙ্গে আসল জিনিসের তফাৎ দর্শনীতে যতটা দর্শনে ততটা নয়। রেজির মনটা ডেমক্র্যাটিক হ'লেও রুচি এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ব'ললে, চল সেণ্ট্ অলব্যান্সে, সেখানে ইতরের ভিড় নেই আর ঈডিথের হাইকার্স (Hikers) দলকে ধরাও যাবে এবং ফেরবার সময় নিজেদের গাড়ীতেই ফেরা যাবে। শুনলুম ঈডিথ্ ভোরবেলা নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়েছে hiking ক'রতে। এই hikingএর খেয়ালটা এবং যতগুলো সরাইখানা আছে সেখানে হবে পানভোজন— এই হ'ল রেজির ব্যাখ্যান। মেয়েদের একটা কিছু উপসর্গ থাকা চাই—হয় লাভার্, নয় হিষ্টিরিয়া, নয়ত এই রকম একটা কোন হুজুগ—এই হ'ল রেজির মন্তব্য। রেজির মনটা তিক্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কেন না বেশীদূর পায়ে হাঁটা ওর পক্ষে নিতান্তই বিরক্তিকর এবং তার বোনের হাইকিং-এর দরুণ ইদানিং তার গাড়ী পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে উঠেছে।

গোল্‌ডার্স্‌ গ্রীন্‌ থেকে বাসের মাথায় চ'ড়ে আমরা দুজনে St. Albans-এ যাত্রা ক'রলুম। সহরতলীর দূর-



সেণ্ট্‌ য়্যালবান্স য়্যাবে—পশ্চিম দিক

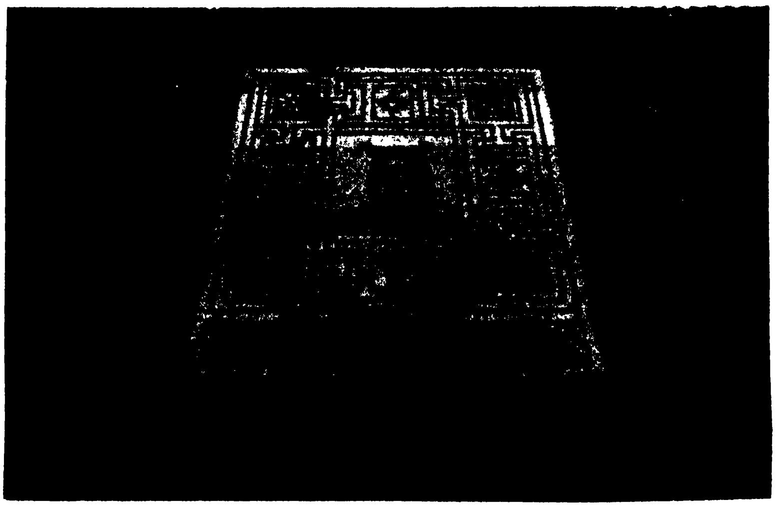
প্রান্তে বার্ণেট ছাড়িয়েই উচু নীচু পথ চ'লল একেবারে পাড়াগাঁর মধ্য দিয়ে। পথের দুধারে কর্ষিত-শস্য মাঠের উপর ছড়ানো রয়েছে বন্য পপির (poppy) সিন্দুরাভা, ঈষদ্দৃষ্ট গ্রামপ্রান্তে বর্দ্ধিষ্ণু কৃষকের গোলাবাড়ী, চারণরত সুপুষ্ট গাভী, লাঙ্গলবাহী রোমশপদ অশ্ব, ক্রোশেক অন্তর-অন্তর গ্রাম্য সরাইখানা—ঘাসের উপর বিস্তৃত চায়ের মেজ কন্টিনেণ্টাল ধরণে ছত্র আচ্ছাদিত, ক্লান্তপদ হাইকার (hiker) নরনারী, বিশ্রামরত পেশাদার ট্রাম্প্‌ (tramp)—এই সব দেখতে দেখতে সেণ্ট্‌ অলব্যান্‌সে পৌঁছানো গেল। গ্রীষ্মকালের রৌদ্র যে আদৌ মিষ্ট হ'তে পারে তা' ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলে না এলে বোঝা যায় না। রৌদ্র স্নাত অথচ ছায়া শীতল ছোট্ট সহরটী সত্যই অতিথিকে একেবারে অভিভূত ক'রে দেয়। ইংরাজ জাতের পানভোজনের বন্দোবস্ত সব জায়গায়, এখানেও অপ্রতুল নয়। ইংলণ্ডের সব চেয়ে পুরাতন সরাইখানা Ye Old Fighting Cocks, এই পুরাতন ছোট সহরে এখনও সশরীরে বিরাজমান—নীচু, স্বল্প পরিসর ঘর, কড়িকাঠ মাথায় ঠ্যাকে,—সেখানে ব'সে অন্ততঃ একপাত্র home brewed ale পান ক'রে সহরের মর্য্যাদা রাখা অভ্যাগতের কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়। পান ভোজনের বিষয়ে ইংরাজজাত চিরকালই সজাগ, তবে এখন দৃষ্টিটা একটু অন্তর্মুখী হ'য়েছে—কতকটা বৈজ্ঞানিক প্রভাবে, কতকটা কালধর্ম্মে এবং অনেকটা যুদ্ধোত্তর আর্থিক সমস্যায় প'ড়ে। স্বচ্ছল মধ্যবিৎ ভদ্রপরিবারে শাকসব্‌জী ফলমূলের চলন এখন খুব বেশী এবং মাংসের ব্যবহার সেই পরিমাণে কম হয়ে এসেছে। পান সম্বন্ধেও এদের এখন অত্যন্ত অবহিত দৃষ্টি—দোকানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু আগে-পিছে মদ্য পাওয়া দুর্ল্লভ, অধিকাংশ ভোজনালয়ে পানের লাইসেন্স নাই এবং বাড়ীতে বিশেষ-বিশেষ দিন ছাড়া চা, কফি এবং জল ব্যতীত



সেণ্ট্‌ য়্যালবান্‌স্‌ কেথিড্রালে পর্দ্দা (Screen

অন্ন পানীয়ের ব্যবস্থা নাই। খুব বড় লোকদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ ইতর লোকদের মধ্যেও মাতলামির পরিমাণ খুব ক'মে এসেছে যুদ্ধের পর থেকে—নীতিবাগীসদের বক্তৃতার ফলে নয়। ব্যাপারটার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা অনেকটা পরিমাণে জড়িত।

St. Albans সহরটী ছোট হ'লেও ইতিহাস-বিশ্রুত। দুহাজার বৎসর আগে এখানে বিজয়ী রোমানদের একটা বড় রকমের আড্ডা ছিল। তারা এর নামকরণ করেছিল



VERULAMIUM—রোমান মোজেয়িক কার্য্য—জলদেবতার মুণ্ড

—Verulamium। পরে এর বর্ত্তমান নামকরণ হয় এক খৃষ্টধর্ম্মী রোমানের স্মৃতিকল্পে। এই দুটো নামই মনীষী বেকনের (Bacon) উপাধি-সংজ্ঞাপক। তাঁর সমাধি এখনও এখানে বর্ত্তমান।

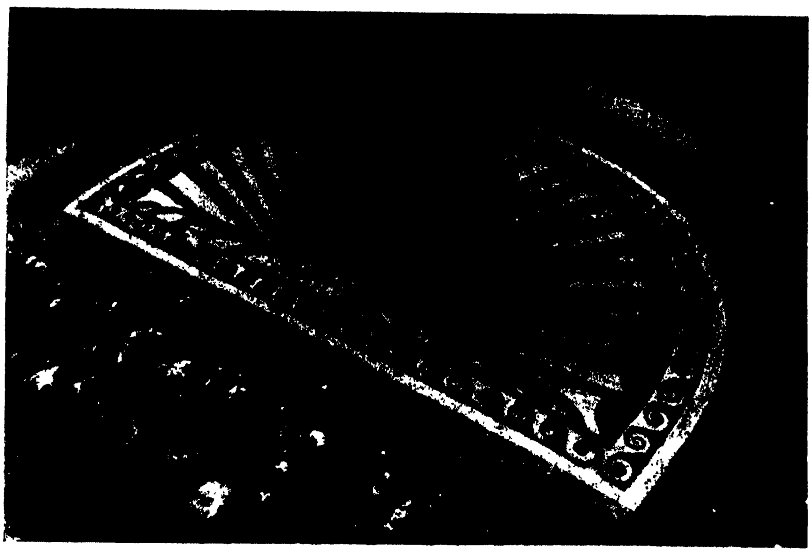
রেজি ব'ললে, তোমাকে এখানে আনবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে তোমার আত্মপ্রসাদ পুষ্ট মনটিকে একটু নাড়াচাড়া দেওয়া। রোম্যানদের পুরোনো কীর্ত্তি আমরা মাটি খুঁড়ে বার করছি—তা' দেখবার জন্যে নয়, সে তুমি রোমে গিয়ে ভাল ক'রেই দেখবে। কিন্তু এই যে আমাদের গির্জ্জা যা' তৈরী হ'য়েছিল তোমাদের কোনারকের মন্দির তৈরী হবার প্রায় সমকালেই—আমাদের সব চেয়ে পুরাতন বড় গির্জ্জা—তার অন্তর্বাহ্য—দুটো দৃশ্য দেখেই কি মনে হয় না যে আমরাও এককালে সভ্য ছিলুম—অন্ততঃ শিল্পকলা সম্পর্কে? বাস্তবিক

St. Albans গির্জ্জা বাহিরে দেখতে যেমন বিশাল তার ভিতরের কারুকার্য্যও তেমনি সেকালের ইংরাজ শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচায়ক। পাথরের কাজ এবং বিশেষ ক'রে কাঠের উপর সচল ভাব পরিচায়ক মূর্ত্তি খোদাইয়ের কাজ সত্যই শ্রদ্ধা উদ্দীপক। তবে দেয়ালের গায়ে যে সব চিত্র আঁকা হয়েছিল—ইতালীয় গির্জ্জার অনুকরণে—সেগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু কৃতিত্বের আভাষ পাওয়া যায় না—যদিও ঠিক এই কারণেই অষ্টম হেনরি যে এগুলোর উপর চূণাবলেপনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তা' নয়। এই বহুপত্নীক নৃপতির পোপের সঙ্গে ঝগড়াই হচ্ছে তার মূল কারণ। গত সত্তর বৎসরের মধ্যে এই চিত্রগুলি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে এবং চিত্রশিল্পের দিক থেকে মনে হয়, এগুলি অনাবিষ্কৃত থাকলে বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না।

এ-কথা রেজিকেও মানতে হ'য়েছে আমাদের দেশের পুরাতন ফ্রেস্কোর (Fresco) নিদর্শন দেখবার পর। এখানে ভিক্টোরিয়া-অ্যাণ্ড্-অ্যালবার্ট ম্যুসিয়মের ভারতীয় বিভাগে অজন্তার কতকগুলি গুহাচিত্রের প্রতিলিপি প্রায় স্বাভাবিক আকারে রক্ষিত আছে। রেজি সেগুলো দেখে এবং তাদের বয়স শুনে স্তম্ভিত হ'য়েছিল। এখানে দেখছি, আমাদের দেশের চিত্রকলা—যা' অনেক সময় ভারতীয় মনকে আকৃষ্ট ক'রতে পারেনা—তা' দেখে এখানকার শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি ভদ্রলোক একেবারে প্রশংসায় শতমুখ হয়। গত বৎসর গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণের সম্মানার্থে ব্রিটিশ ম্যুসিয়মে বিশেষ ক'রে একটি ভারতীয় শিল্পকলা বিভাগ খোলা হয়। সেটা এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। লরেন্স্ বিনিয়নের (Laurence Binyon) আমন্ত্রণে সেটা দেখতে গিয়েছিলুম রেজিকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে খানকতক বাঘ

গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল রক্ষিত আছে—প্রতিলিপি নন্দলাল এবং অসিতকুমারের। কিন্তু এ-গুলিতে রং ফলানোর দরুণ ছবিগুলির মর্য্যাদা অনেকটা লাঘব হ'য়েছে। অন্ততঃ রং ফলানোই যদি বাঞ্ছনীয় মনে হ'য়েছিল তো সে কাজটা নন্দলাল-অসিতকুমারের দ্বারাই হওয়া উচিত ছিল। কতকগুলি বাছাই-করা মোগল, রাজপুত এবং কাংড়া পদ্ধতিতে আঁকা পুরাতন ছবি এবং হাল আমলের শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং সুরেন্দ্র করের আঁকা কতকগুলি চিত্র বিদেশী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেজির কাছে এ এক নূতন জগৎ। তারপর যখন রেজি যেতে পারবে না—তখন এই চিত্র সম্পদ আমাদের গর্ব্বের বিষয় হবে কি তোমাদের—সে তর্ক এখন ক'রে লাভ নেই। আপাততঃ এ গর্ব্ব যে আমাদের নয়, এটা ঠিক।

রেজির উদারতা তার মুহ্যমান অবস্থার সঙ্গে ঠিক মানায়নি, অতএব তার সঙ্গে রয়্যাল অ্যাকাডেমির গ্রীষ্ম প্রদর্শনীতে যাওয়াই ঠিক ক'রলুম। এখানে প্রদর্শিত বিশেষ বিশেষ চিত্র সম্বন্ধে ভাল-লাগা মন্দ-লাগা ছাড়া আর বেশী কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। মোটের উপর ভালই লাগ্‌ল, কিন্তু খান কয়েক চিত্র—বিশেষ করে সম্রাটের একখানি অদ্ভুত তৈলাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি—কি ক'রে যে এখানে



VERULAMIUM—রোমান মোজেয়িক—২য় খৃষ্টাব্দ

ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত গালার কাজকরা কাঠের উপর অসিতকুমারের আঁকা মানলীলা, দানলীলা, রাসলীলা প্রভৃতির চিত্র দেখবার সুযোগ পেলে, তখন আমাকে রয়্যাল অ্যাকাডেমির গ্রীষ্ম প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার উৎসাহ তার একেবারে নিবে গেল। এই ইণ্ডিয়া হাউসের ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ র'য়েছে বাঙ্গালী শিল্পী চতুষ্টয়ের কীর্ত্তি—যে গুলোর প্রতিলিপির সঙ্গে বিচিত্রার পাঠকবর্গের ইতিমধ্যেই পরিচয় হ'য়েছে। রেজি ব'ললে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যখন ছিন্ন হ'য়ে যাবে, তখন এ বাড়ীটাতো আর উঠিয়ে নিয়ে প্রদর্শিত হবার জন্যে নির্ব্বাচিত হ'ল, তা' রেজিও ভেবে ঠিক করতে পারলেনা। আর পরিপ্রেক্ষণ জিনিসটা যে কতটা বেয়াড়া রকমের ঠিক হ'তে পারে এবং তা'হলে যে কতটা দৃষ্টিকটু হয়, তার পরিচয় পাওয়া গেল এক শিল্পির দুখানি গৃহাভ্যন্তরীণ দৃশ্য-চিত্রে। রেজি ব'ললে, এখনো হ'য়েছে কি, এইতো কলির সন্ধ্যা, decadence যুগের সুরুপত্তন, এখনও অনেক বাকী। সে যাই হোক্, এই ইংরাজ যুবকের আর দুখানি ছবির সম্পর্কে দৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকতে পারিনি। ছোট দুখানি ছবি—জলের রঙে

আঁকা, কিন্তু তাদের রেখা-ভঙ্গীর সৌকুমার্য্য যে অসিতকুমারের তুলিকাকে মনে করিয়ে দেয়, তা' রেজির নজর এড়ায়নি—অথচ তার অসিতকুমারের শিল্পভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় ইণ্ডিয়া হাউসের ওই কখানি চিত্র দেখে। ছবি দুখানি এক মহিলার অঙ্কিত, তাঁর নাম ও ঠিকানা রেজি তালিকা দেখে বার্ করে একটু ক্ষুন্ন হ'ল কেননা মহিলাটী তার সঙ্গে পরিচিত অথচ তিনি কাউকে কোন দিন জানতে দেননি যে তিনি শিল্প চর্চ্চা করেন। যাইহোক্, রেজি আমায় আশ্বাস দিয়েছে যে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় জানাবে, তাঁর রেখাভঙ্গীর অনুপ্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন।

সেই দিনই রেজি নিয়ে গেল আর এক মহিলা শিল্পীর বাড়ীতে। এঁর কবিখ্যাতিও আছে। এঁর আঁকা অন্ততঃ একখানি তৈলচিত্র কলিকাতায় আছে—আর্মেনিয়ান কলেজ গৃহে। গত শেক্সপীয়র স্মৃতি-উৎসবে দুজন কবির লেখা কবিতা পঠিত হ'য়েছিল, তার মধ্যে ইনি একজন, অপর জন টম্যাস্ হার্ডি। এখানকার কয়েকটি বিখ্যাত মাসিকে এঁর লেখা শিল্প বিষয়ক সমালোচন প্রবন্ধ রেজি আমায় আগেই পড়িয়েছিল—সে গুলোর ইঙ্গিত এঁর ছবি বোঝাবার পক্ষে একটু প্রয়োজনীয় কেননা এঁর ছবি কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেনা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের অপূর্ব্ব মিশ্রন। ইনি কুমারী, বয়সে প্রৌঢ়া, জাতিতে মূলে আর্মেনিয় হ'লেও শিক্ষা দীক্ষায় ইংরাজ। ইনি এক আশ্চর্য্য মহিলা—এঁর কথা বিস্তারিতভাবে পরে লিখ্ব।

রেজির সঙ্গে ছবির গ্যালারি গুলো এবং আরও দু'একটা মুসিয়ম দেখতে যাবার কথা আছে, কিন্তু রেজির এখন সে বিষয়ে ব্যস্ততা নেই, আমারওনেই। ইতি মধ্যে (Hampton court) হ্যাম্পটন কোর্ট এবং (Warwick castle) ওয়রিক ক্যাস্‌লের পুরাতন চিত্র সংগ্রহ দেখে এসেছি—রেজিরই উৎসাহে। এ সংগ্রহের মধ্যে আসল নকল দুই-ই আছে। বিশেষ কিছু দেখবার নেই, অতএব বলবারও নেই।

কিন্তু চিত্রপ্রসঙ্গে সেণ্ট অলব্যান্স থেকে অনেক দূরে এসে প'ড়েছি। মোটর গাড়ীর সঙ্গে হাইকিং-এর সংমিশ্রন অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈডিথের এই খেয়ালের প্রসাদে আমরা সে যাত্রা ফেরবার পথে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলুম। ছুটীর অপরাহ্নটা অধিকাংশের ভাগ্যেই প্রীতিকর হয়নি দুর্য্যোগের দরুণ। সন্ধ্যার কাগজে দেখলুম নিজ লণ্ডন সহরে বজ্রপাত অবধি হ'য়ে গেছে—অথচ আমরা সহরতলী থেকে তার কোন আওয়াজও পাইনি। কবিগুরুর বহুকাল আগেকার এক লেখায় যেন পড়িছিলুম—বিলাতে বজ্রপাত শুনতে হ'লে কানে দূরবীন্ কস্‌তে হয়। সেটা সত্যি; কিন্তু এটাও সত্যি, যে সেদিন বিকালে বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারজন্যে গুটিকতক হতভাগ্যের জীবনলীলা সাঙ্গ হ'য়েছিল।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ



দীপালী মহোৎসবে

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ

আজি দীপালী মহোৎসবে
দেউলে দেউলে লক্ষ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল যবে,
বধূরা আসিছে বাতায়ন পরে হাতে জ্বলে দীপশিখা,
অমারজনীর আকাশ ঘিরিয়া রাতের কুজ্ঝটিকা
নিমেষে কখন আলোকের বুকে লভিল সে নির্‌বান্ ;
অযুতকণ্ঠে উঠিল আজিকে আলোকের জয়গান।
রাতের বাতাস ফেনাইয়া উঠে উন্মাদ কলরবে
আজি দীপালী মহোৎসবে।

কবে সে একদা ফিরেছিল কোন বিজয়ী সেনার দল
প্রতি ঘরে ঘরে জননী বোনেরা জ্বালিল দীপ সকল,
রাজপথ পরে উঠিল সেদিন তাহাদেরই জয়গান
বিজয়োল্লাসে মাতিল সবার প্রাণ।
সেদিনের স্মৃতি মনে করে আজো দীপ জ্বালি প্রতি ঘরে
বিজয়ী সেনার আগমনী গান গাহি রাজপথ 'পরে।
তারই লাগি আজি ঘরে ঘরে এই হাসি গান কলরব,
এই দীপ জ্বালা—তারি লাগি বুঝি আজিকার এই
দীপালী মহোৎসব।

হাজার প্রদীপ জ্বালা ;
হাসি—গানে আজি তোমাদের গৃহে মহোৎসবের পালা।
রাখ তার সন্ধান ?
আজি কত গৃহে হবে দীপ নির্ব্বাণ ?
কত গৃহ শুধু আঁধারে পড়িয়া রবে ;
আজিকার এই দীপালী মহোৎসবে ?
একথা জানিও খাঁটি ;
সকলের হাসি, উৎসব বিনা মহা-উৎসব মাটি।
কারও ঘরে যদি দীপ নাহি জ্বলে—বুকে বাজে কারও ব্যথা
এত উৎসব এত আয়োজন সকলি হইবে বৃথা ;
এত গান গাওয়া—এত দীপ জ্বালা সকলি মিথ্যা হবে ;
আজি দীপালী মহোৎসবে।

জ্বালো জ্বালো দীপ ; গাহ সবে জয়গান
বিজয়োল্লাসে মাতিয়া উঠুক আজি সবাকার প্রাণ।
আলোকে আলোকে ভরিয়া উঠুক আজিকে সবার গেহ
প্রাণে প্রাণে তোলো আলোকের গান আঁধারে রবেনা কেহ।
দীপ জ্বালো প্রাণে, প্রাণে,
উৎসব-রাতি হাসিয়া উঠুক সকলের হাসি গানে।
সার্থক হবে এই দীপ জ্বালা—হাসি, গান, কলরব
—দীপালী মহোৎসব।

জীবনের চলতি পথে

শ্রীরাজেন মিত্র

সহরে বাড়ী খালি পড়ে থাকে না।

...একতলার ছোট ঘরে আবার ভাড়াটে এল বটে, কিন্তু গরুর গাড়ী থেকে মাল নাবাবার সোরগোল, জিনিষ-পত্র গোছাবার সাড়াশব্দ, চাকরের অশান্ত চীৎকার কিছুই শোনা গেল না। নিঃশব্দে এল ২০৷২২ বছরের একটি ছেলে। সঙ্গে আর কেউ ছিল না—একটা চাকরও নয়। বাড়ীতে একজন নতুন ভাড়াটে এল—আর সব ভাড়াটেরা কেউ জানলো, কেউ জানলো না। ক্রমে অজয়ের নিত্য-নিয়মিত জীবনযাত্রা সুরু হলো। অজয় ছোট আফিসের, ছোট কেরাণী। মাইনে টাকা ত্রিশ পায়। অভাব আছে অনাটন নেই। একাই সংসার পাতে। কখনো বা ঘরটাকে সাজায় মনের মত করে—কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব আবার ওলট্ পালট্ হ'য়ে যায়। নিয়মিত ঝাঁট অভাবে মেঝেতে একরাশ ধূলো জমে—টেবিলের ওপর বইগুলো আপন মনে ছড়িয়ে পড়ে—ষ্টোভের পাশে চায়ের কেটলি, এলুমিনিয়মের হাঁড়ি এলো-মেলো হ'য়ে ছড়িয়ে থাকে।

সমস্তদিন আফিসেই কাটে। অজয় আফিসের ছুটির পর মাঠে ভবঘুরের মত খানিকটা বেড়ায়—কোনো দিন বা বায়স্কোপ দেখতে যায়। বাড়ী আসবার তাড়াও নেই। বাইরে থাকতেই তার ভাল লাগে। রাত করে যখন বাড়ী ফেরে শরীর তখন ক্লান্ত—সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পর চোখ দু'টো ঢুলে আসে। কোনো রকমে জামা জুতো খুলেই এলোমেলো বিছানার ওপরেই শুয়ে পড়ে। বিছানা ভাল করে পাতবারও তর সয় না। কোনদিন বাইরে থেকেই খেয়ে আসে, নয়তো মোড়ের দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খায়। জীবনের সব তারই যেন এক সুরে বাঁধা।

এমনি ভাবে নিঃসঙ্গ দিনের যাত্রা চলতে থাকে।

*

* *

দোতলার ভাড়াটে মন্দা আর তার স্বামী প্রেমেন। স্বামী ইস্কুলে মাষ্টারী করে। বয়স খুব বেশী নয়। ভারী রসিক লোক। প্রথম দিনেই অজয়ের সাথে বেশ ভাব হ'য়ে গেল।

বড় বাড়ী। তেতলায় আরও দু'ঘর ভাড়াটে ছিল। তেতলার ভাড়াটে—মনটা তাদের তেতলার চোরা কুঠরীর মধ্যেই বদ্ধ,...একতলায় তাদের দৃষ্টি এসে পৌছয় না। তেতলার সাথে একতলার কোন সম্বন্ধই নেই।

প্রেমেন দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে থাকে। মন্দাকে নীচে নামতেও হয় না—কেবল দু'বেলা দু'কলসী খাবার জল তুলতে নীচে আসে। রান্না ওপরেই হয়। গৃহস্থের ঘর সংসার হলেও—মন্দার নিপুণ হাতের গুণে বেশ গোছানো, পরিপাটি।

মন্দার বয়স বেশী নয়। ঢুলঢুলে দু'টি চোখ—আলগোছা মাথার খোঁপা; মাথায় ডব্‌ডবে একটা সিঁদুরের রেখা, আলতা-রাঙা পা।

প্রেমেন আর মন্দার দাম্পত্য-জীবনে চমৎকার একটা ছন্দ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অজয় যখন আলো নিবিয়ে ঘরের কোণে বিছানায় পড়ে থাকে তখন ওপরে স্বামী-স্ত্রীর দু'এক টুকরো গল্প, একটু হাসি যা অজয়ের কাণে ছিটকে আসে, তাই নিয়ে সে মনের কোণে মালা গাঁথে। ...স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান রীতিমত চলে।

অজয় মাথার শিয়রের ছোট্ট জানলা দিয়ে সামনের আলোয় ঘেরা ছোট্ট মাঠটির দিকে চেয়ে থাকে। মাঠের বুকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফাগুন হাওয়ায় সর্‌সর্ করে কাঁপে...মাঝে মাঝে দু'একটা ফুল ঝরে পড়ে। সংসারের শূন্য আঙিনায় তার মন কোন এক স্নেহময়ীর জন্য কেঁদে ওঠে। ওপরের ঘর থেকে ভেসে-আসা হাসি-তামাসা শুনে তার জীবন-বীণার সব তারই যেন পরস্পরের মধ্যে

জড়িয়ে যায়। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

*

* *

সকালে ভিজে কাপড় মেলে দেবার জন্য মন্দা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। সামনেই অজয়ের ঘর। দেখে, অজয় ষ্টোভে রান্না করচে। আধসেদ্ধ অবস্থায় ভাত তুলে দেখে সেদ্ধ হ'য়েছে কী না;...ষ্টোভের চারপাশে হয়তো রান্না ডাল ছিটকে পড়েচে...আশেপাশে আলুর খোসা ছড়িয়ে পড়ে থাকে। মন্দা প্রতিদিনই কাজকর্ম্মের অবসরে দাঁড়িয়ে দেখে। মন্দার তরুণী-প্রাণ অজয়ের জন্য কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করে, ওর পরিচয় নিতে—দরদ দেখাতে—তাকে স্নেহ করতে।...আহা এত কষ্ট...ওর এইটুকু জীবনে এমন কী ব্যথা যার জন্য ও নিজের জীবনকে এত অবহেলা করে।...

অজয় বারাণ্ডার দিকে চেয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নেয়। মন্দা যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেচে এমনি ভাবে জড়সড় হ'য়ে মাথায় ঘোমটা টেনে চলে যায়।

স্বামীকে এসে হয়তো বলে—"ওর কি কেউ নেই ?... বিয়ে করে না কেন ?...কী বিশৃঙ্খল জীবন বাপু !...পুরুষের রান্নার কি ছিরি ! · আমার কিন্তু ভারী কষ্ট হয়।...চোখের সামনে দিনে দিনে পলে পলে এমনভাবে আত্মহত্যা করতে দেখলে কার না কষ্ট হয় !"...

—"অজয়বাবু কখন কি করে না করে সবই দেখচি তুমি লক্ষ্য করো ;...তোমার চুরি বিদ্যে একদিন তার কাছে ধরিয়ে দিতে হ'বে তো !"...

—"না, না, অজয়বাবু এদিকে ভারী ভাল ;...... কলতলায় জল নিতে যেয়ে এক একদিন সামনে পড়ে যাই, কখনো মুখের দিকে চায়ও না, নিজেই সরে যায়।"

প্রেমেন হেসে মন্দার একটা হাত ধরে বলে—"অতটা সুখ্যাতি করো না, আমার কিন্তু হিংসে হয়।"

"যাও, তুমি যে কী"...বলে মন্দা স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল পুরে হাত বুলিয়ে দেয়।

—"বাস্তবিক লোকটা যে কী রকম কিছুই বুঝতে পারি না।...নেশা-টেশা করে না কি ?"...

—"না না, নেশা করতে যাবে কেন !... শরীরের যত্ন হয় না, তাই ও রকম উচ্ছৃঙ্খল চেহারা।"

অজয়কে নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ রকম আলোচনা প্রায়ই হয়।

*

* *

গ্রীষ্মের দু'পুর। রবিবার। আফিসের ছুটি। পচাগরমের দুপুর আর কাটতে চায় না। অজয়ের ছুটির দিনগুলো এক ঘেয়ে নীরস মনে হয়। আফিস করতেই ওর ভাল লাগে—সময় বেশ কেটে যায়। বিছানায় পড়ে থাকে। একটা নভেল খুলে পড়বার চেষ্টা করে—দূর ছাই ভাল লাগে না, এক ঘেয়ে প্রেমের কথা !...বইটা আবার পাশে রেখে দেয়। কখনো জেগে কখনো 'আধেক্ ঘুমে' হারান প্রেমের স্বপ্ন দেখে। ঐটুকুই ওর ভাল লাগে। মন্দা আর প্রেমেন ভাবে—ও সব সময় পড়ে পড়ে ঘুমোয় কেন। মন্দা বলে—"ভারী কুড়ে।"

সেদিন দু'পুরেও ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে অজয় শুয়েছিল। বাইরে অসহ্য গরম। রোদের দিকে চাওয়া যায় না—চোখ ঝলসে যায়। এমন সময় প্রেমেন "ভায়া ঘুমচ্চ নাকি" বলতে বলতে ভেজানো দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো।

অজয় ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে ব'সে বল্‌লে—"এম্‌নি শুয়ে ছিলুম।"...

প্রেমেনের পেছনে চোখ পড়ায় অজয় দেখলে—দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মন্দা। শুধু তার পা দু'খানি আর বসান পাড় কাপড়ের আঁচল দেখা যাচ্ছে।

প্রেমেন বল্‌লে—"তোমার জন্য ইনি সরবৎ এনেচেন, শুধু আমি এলে ত সেদিনের মত ফিরিয়ে দিতে ;...তাই ইনি স্বয়ং এসে হাজির ;...(হেসে) এবার কেমন ফেরাবে ফেরাও।"

প্রেমেন মন্দার হাত থেকে সরবতের গেলাস টেবিলের ওপর রেখে দিল।

অজয় অপ্রস্তুতের একশেষ। কী বলবে কিছুই ভেবে পায় না। সেদিন প্রেমেনকে ফিরিয়ে দিয়েছিল বটে !...

—"কেন আপনারা আমার জন্য এতটা করেন!…আমি একলা থাকি বটে, কিন্তু এ জন্য তো আমার কোন কষ্ট হয় না. এসব আমার স'য়ে গেচে।"

মন্দা দরজার আড়াল থেকেই বল্লে—"না, আপনি খেয়ে নিন্;…আমাদের সরবৎ হ'য়েছিল তাই দিয়েচি;… আমি ওপরে থাকতে আপনি নীচের ঘরে এমনি ভাবে কষ্ট করে দিন কাটাবেন তা আমাদের ভাল লাগে না।

—"বৌদি, দু'দিনের সুখ দিয়ে…আরও কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিও না;…আমার এই জীবনই ভাল লাগে।"

"বৌদি" আর "তুমি" সম্বোধনে মন্দার নারী-হৃদয় ভিজে গেল। অজয়ের "বৌদি" ডাকটুকু মন্দার মর্ম্মে গিয়ে বাজলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার অজয় বল্লে—"আমায় যখন এতখানি আপনার করেই নিলে, তখন অমন ক'রে আড়ালে না থেকে সামনে এসে সরবৎ দাও, আমি খাবো।"

মন্দা হাসতে হাসতে দরজার আড়াল থেকে সামনে বেরিয়ে এল;—"তা বেশ, তুমি যখন বৌদি সম্বন্ধ পাতালে, আমি তোমাকে অমন ক'রে কষ্ট করতে দেবো না, তোমার ছোটখাটো কাজের ভার আমাকে দিতে হ'বে।"

প্রেমেন পাশ থেকে বলে উঠলো—"তোমার বৌদি যেচে তোমার ভার নিতে যখন প্রস্তুত, এ সুযোগ ছেড়ো না, পরে পস্তাতে হ'বে।"

অজয় সরবৎ খেতে খেতে বলল, "পরে পস্তাতে হবার ভয়েই ত' সুযোগে সহজে ভিড়ছিলাম না।"

সকলেই হাসে।

*

* *

কয়েকদিন পরে…।

কোনো রকমে মুখে দু'টো ভাত গুঁজে অজয় আফিস যাচ্ছিল। এমন সময় বারাণ্ডা থেকে মন্দা বল্লে—" তোমার চাবিটা, যদি দিয়ে যাও…ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতুম।"

—"অত করে বেঁধো না, বৌদি, হতভাগার জীবনে এতটা সহ্য হ'বে না।"

অজয় চাবি দিয়ে চলে গেল। মন্দা সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবে, অজয়ের জীবনে এত কী দুঃখ!…

দু'পুরে মন্দা অজয়ের ঘরে ঢুকে শিউরে উঠলো।…ইস্, মানুষ এর ভেতর থাকে কী করে!…টেবিলের তলায় খাটের পাশে পোড়া বিড়ি, দেশলায়ের খোল—ঘরের মেঝেয় একরাশ্ ধুলো জমে একাকার হয়ে আছে। রাত্রে দোকান থেকে খাবার এনে খেয়েচে…কিন্তু তার পাতাটিও ফেলবার ফুরসৎ ঘটেনি, ঘরের এক কোণেই জমা করে রেখেচে।

মন্দা প্রত্যেকটি জিনিষ নেড়েচেড়ে পরিষ্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন অজয় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী এল। ঘর-দোরের চেহারা দেখে সে বলে উঠলো—"বৌদি, একী করেচো?… তোমার হাতের স্পর্শে এমন একটা শ্রীহীন ঘরে এতখানি শ্রী ফোটালে কেমন করে?"

—"ভাই, তোমার ঘরে শ্রীকে তো আর স্থান দাওনি, দিলে বুঝতে পারবে কেমন ক'রে সে শ্রী ফোটায়।"

অজয় ভাবে ঠিকই তো, ঘরই আছে, নারীতো নেই;… কেই বা দরদ দিয়ে ঘর গোছায়!…

মন্দা বল্লে—"তুমি কাপড় ছেড়ে ওপরে এস, আমি চা করচি…উনি তোমার জন্য ব'সে আছেন।"

অজয়ের বিকেলে জল খাওয়ার অভ্যাস বহুদিনই চলে গেচে। আফিসে টিফিনের সময় যা হয় দু'চার পয়সার কিছু কিনে খায়। কিন্তু মন্দার হাতে পড়ে বিকেলে আবার জল খাবার অভ্যাস হলো। সেজন্য ও মন্দাকে কত বলে— মন্দা কিছুতেই শোনে না।

মন্দা বলে—"ভাই, তোমাদের খাইয়ে আমার কত আনন্দ হয় তাতো জানো না! আমি পরিশ্রমের পুরস্কার পাই।"

মন্দার সাহচর্য্যে অজয়ের দিন কাটে।

* *

*

সন্ধ্যায় ঘরে শুয়ে অজয় একটা বই পড়ছিল। এমন সময় মন্দা ঘরে ঢুকে বল্লে—"আজ রান্না করবে না?"

—"রাত্রে রান্না তো কোনদিনই করি না;…বাজারের খাবার কিনে এনে খাই…"।

—(বিস্ময়ে) "এতদিনতো একথা আমায় বলনি।··· তা' হ'বে না, আমি ভাত রান্না করচি তুমি আমার কাছে খাবে। আমার কাছে খেতে যদি এতই আপত্তি, এবার থেকে রাতে আমিই তোমার দু'টো রান্না করে দিয়ে যাবো।"

অজয় চুপ করে এক দৃষ্টিতে মন্দার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হাওয়ায় ওর চুলগুলো মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েচে।

মন্দা হাতে করে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললে—"মুখের দিকে চেয়ে ভাবচো কী?···এবার তোমায় বিয়ে করতে হ'বে।···আচ্ছা, তোমার কেউ নেই?···"

—"না; মা ছিলেন, বছরদুই হলো মারা গেছেন।"

—"এতদিন বিয়ে করনি কেন?···এবার তোমার বিয়ে দেবো; তোমাকে এরকম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেবো না। একজনকে নিয়ে এস যে তোমায় দেখা শোনা করবে। তুমি বাজার করে আনবে, সে হাত থেকে এগিয়ে নেবে, তুমি রোজগার করবে, সে টাকার হিসেব রাখবে, তুমি আফিস থেকে ফিরবে, সে পথ পানে চেয়ে দরজার কপাট ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকবে;···তাতো আর করবে না!···আমার কিন্তু তোমার এরকম লক্ষীছাড়া জীবন ভাল লাগে না।"

অজয় একটু হাসলো;—"বৌদি, আমার জীবন যেরকম হ'লে তুমি সুখী হ'তে, ঠিক সেই জীবন আমার কাছ হ'তে এখন বহুদূরে; তা' যদি হতো তা'হলে এতদিন সে জীবনের আরম্ভ হয়ে যেতো;···বন্ধনবিহীন এই উদাস জীবন আমার স'য়ে গেচে···যাকে চেয়েছিলুম তাকে যখন পাওয়া যায়নি···"

অজানিত ভাবে অজয়ের মনের দুর্ব্বল স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেচে ভেবে মন্দা নিজেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে—"রান্না হ'লেই আমি ডাকবো, খেতে এস কিন্তু।" বলেই চলে গেল।

অজয় নিঃশব্দেই শুয়েছিল; ভাবছিল মন্দার কথা ও হারানো আর একটি মেয়ের কথা। প্রতিমা, যে একদিন তার জীবন-বীণার প্রত্যেক তারের সাথে জড়িত ছিল। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত তার জীবনে কত আশা আকাঙ্ক্ষাই ছিল।··· প্রতিমাকে নিয়ে স্বপ্ন-রাজ্যে জগৎ গড়ে কত জল্পনা-কল্পনাই না করেচে!···প্রতিমাকে আগে কিছুই বোঝেনি—চিরদিন প্রতিমা তার কাছে ভালবাসার অভিনয়ই করে এসেচে; অন্তরের স্পর্শ তাতে ছিল না—একথা সে জানলে যে দিন, সেদিন প্রতিমাকে নিজের মনে অনেকটা জড়িয়ে ফেলেচে; মন থেকে টেনে ছিঁড়ে সরিয়ে দিতে গেলে নিজের মনের গোপন তলে বেদনা লাগে। মন্দা যা চায়, সেও তো ঐরকম ছোট একটি ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। সেই ঘরে, হোক তা কুঁড়ে—দারিদ্র্যের জাল দিয়ে ঘেরা থাকুক সে ভয় করে না, তারা থাকবে দু'জনে। কিন্তু প্রতিমাই ভুল ভেঙে দিয়ে তার জীবনকে এমনি ওলট্ পালট্ করে দিলে।···যদি তাকে আজ পেতো তবে জীবনের গতি সোজা দিকেই চলতো। তাই ভাবছিল। প্রতিমাকে যদি পেতো, সবার চেয়ে বেশী আদর করতো, সেবা করতো তাকে। ভাবছিল, যদি সে কোনদিন অপকৃষ্ট প্রতিপন্ন হতো তবু তাকে ছাড়তো না—কোনদিনই না।···যৌবনের রঙীন দিনগুলো কী আনন্দেই কেটে গেচে;··এই ভেবেই সুখ পেয়েচে—"ও শুধু আমার—আমার।" কিন্তু আজ তার জীবনকে রিক্ত করে দিয়ে সে চলে গেচে আর এক জনের কাছে। ভাবছিল, এমনিভাবেই তাকে চলতে হ'বে—প্রতি পলে পলে জীবন তার উচ্ছৃঙ্খল পথেই চলবে—একদিন সত্যই হয়তো তার জীবন ভেঙে চুরে ছারখার হ'য়ে যাবে, সংযমের কোন বাঁধনই হয়তো থাকবে না;···তা হোক;···তবু তো একদিন সে জানবে যে তার জন্যই ওর জীবনটা এমনি নষ্ট হলো!···

অজয় এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমের তলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেচে জানে না। মন্দার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল;—"বেশ তো, ঘুমিয়ে পড়েচো···খাবে চলো।"

* *
*

দু'বছর কেটে গেল।

মন্দা অজয়কে নিজের ছোট ভায়ের মত নিজের ছোট্ট সংসারে টেনে নিয়েছিল। অজয়ের দিনগুলো মন্দার স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে কাটছিলও মন্দ নয়।

কিন্তু অজয়ের এ জীবনেরও শেষ হলো। মন্দার স্বামী বদলি হলো আসামের কোন এক ইস্কুলে। যারা পরের

চাকরী করে আর ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, তাদের এরকম ওঠাউঠি করতেই হয়—নতুনত্ব কিছু নেই। অজয়ের মনে হলো—মন্দার না গেলেই যেন ভাল ছিল।

যাবার দিন···।

সকাল থেকে দু'টি প্রাণীর যাবার আয়োজন চলছিল। বাক্স-বিছানা বাঁধবার তাড়া পড়ে গেচে; দরকার মত অজয় মন্দাকে সাহায্য করছিল।

আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় ঘরগুলো কেমন যেন করুণ হ'য়ে উঠেচে। এতদিন বাসের পর ঘর-দোরের সাথেও যেন একটা আত্মীয়তা হ'য়ে গেচে। ঘরের কড়িকাঠের ওপর ব'সে চড়ুই পাখীগুলো কিচির-মিচির শব্দ তুলে গোলমাল আরম্ভ করে দিয়েচে। দালানের এক কোণে মন্দার আদরের বেড়াল থাবা মেরে বসে আছে। একদৃষ্টিতে দেখচে মন্দাকে। মন্দা বিছানা বাঁধচে; বাক্স বন্ধ ক'রে আবার খুলচে, কী ভুলো মন ··আমার কাপড়গুলো তুলতে ভুলে গেছি।" এমনি ভাবে মন্দা যাবার আয়োজন করে চলেচে। বেড়ালের দিকে চোখ পড়ায় মন্দা বললে—"দেখ ঠাকুরপো, মুখপুড়ি আমার দিকে কেমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছে।" মন্দা ওকে কোলে নিয়ে খানিকটা আদর করলে।

ক্রমে যাবার সময় ঘণিয়ে এল।

যাবার বেলায় অজয় ইচ্ছে করেই সামনে এল না। গোধূলির রঙ তখনো আকাশে মুছে যায়নি। দোরে একটা ছ্যাকড়া গাড়ী এসে দাঁড়ালো। মালপত্তর ছাদে তোলবার জন্ত গাড়োয়ান নেমে এল।

মন্দা অজয়ের ঘরে ঢুকে বললে—'ভাই, তুমি যাবার সময় এমনি যদি দূরে দূরে থাকো—"

অজয় ম্লান মৃদু হেসে বল্লে, "না, দূরে দূরে নয়। যাবার সময় হ'ল না—কি?"

বিষণ্ণ মুখে মন্দা বললে, "হ্যাঁ, চল্লুম ভাই;···আর দেখা হ'বে কী না তাও জানি না!···যাবার সময় তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইচি;···দেবে?"

—"কী"।

—"একজনকে বিয়ে করে তোমার জীবনের রিক্ত অংশ পূর্ণ করবে?"

শুনে অজয় নীরব হ'য়ে রইল।

—'উত্তর দেবে না?"

—"বৌদি, যাবার সময় এমনি ভাবে আমার জীবনের সব সঙ্কল্প চূর্ণ করে দিয়ে যেও না।"

—(অজয়ের একটা হাত ধরে) লক্ষ্মীটি বল;···কখনো তোমার কাছে তো কিছু চাইনি। শুধু এইটুকু চাইচি;··· দেবে না?"

—"আচ্ছা"।

—"পারতো সেদিন একটা খবর দিও; আমি আসবো। যাবার সময় একটি মাত্র কথা দিয়ে বাঁচালে ভাই। অনেক কষ্ট দিয়েছি—কিছু মনে করো না। তোমার মার সাথেই আমাকে মনে রেখো।

এমন সময় প্রেমেন এসে বল্লে—"তাড়াতাড়ি এস, না হ'লে ট্রেণ ফেল হ'বে।"

মন্দা চলে যেতে যেতে বল্লে—"নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিও· আচ্ছা ভাই তাহলে চলি···"।

মন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অজয় পিছনে পিছনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। প্রেমেন অজয়ের সাথে দু'একটা কথা বলে মন্দাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো।

অজয় ছ্যাকরা গাড়ীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ী চলে গেল। অজয়ের মনে হলো মন্দাও গাড়ীর ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে।

এই দু'বছরের স্মৃতির মধ্য দিয়ে মন্দা অপরিমিত ব্যথা এবং সুখ দুইই দিয়ে গেল···।

রাজেন মিত্র

বাংলার রসকলা প্রতিভা

শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালী জাতিকে "একটি আত্মবিস্মৃত জাতি" আখ্যা দিয়েছিলেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর এই আত্মবিস্মৃতির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে আজ পর্য্যন্ত একটা উৎকট আত্ম-হেয়তা-বিশ্বাস ব্যাধিতে প্রপীড়িত ও অবসন্ন তাহাও নিঃসন্দেহ। বাংলা দেশের যে কোনো মানুষ অথবা যে কোন জিনিস যত ছিলই না,—এখনও যা কিছু হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক-জাণ্ডার পুরুরাজকে পরাস্ত করার পর তৎকালীন প্রচণ্ড বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্যের বিবরণ শুনিয়া যে পূর্ব্ব-ভারতবর্ষ জয় করবার আশা ত্যাগ করে পুনরায় নিজের দেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন



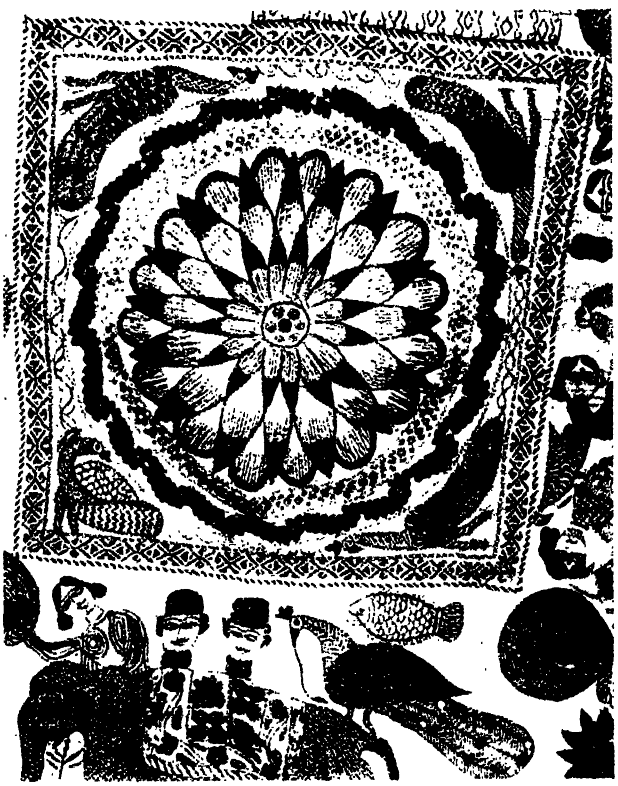
কাঁথা-শিল্প—খুলনা হইতে শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

দিন না বাংলার বাহির থেকে প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠার ছাপ পেয়েছে ততদিন আধুনিক বাঙ্গালীর তাকে প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা দিবার কথাই মনে হয় না। কিন্তু কোন জিনিস যখনই বাইরের আদর বা প্রশংসা পায় অথবা যা কিছু বাইরে থেকে আসে তাকে নিয়ে হৈ চৈ করা আমাদের জাতিগত অভ্যাস হয়ে পড়েছে।

আমাদের নাটক নভেলগুলি বাংলার বাইরের রাজপুতনা মারাঠা ইত্যাদি দেশের লোকের বীরপণার কাহিনীতে ভরপুর; কিন্তু বাংলার নিজস্ব ইতিহাসের খবর আমরা কমই রাখি এবং বাংলার ইতিহাস খুঁজলেও যে শৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী টের পাওয়া যায় তার উপলব্ধি আমাদের এক সময়েত আর তখনকার এই "গঙ্গা-রাঢ়ীয়" বাঙ্গালীদের সমরে বীর্য্যবত্তার কথা যে রোমক কবি ভার্জিল পর্য্যন্ত তাঁর কবিতায় গেয়ে গিয়েছেন তা আজকাল কয়জন বাঙ্গালী বা বাংলার স্কুলের কয়জন ছেলেমেয়ে কি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা জানে? ইহার পরবর্ত্তী পাল যুগে, সেন যুগে ও মুসলমান যুগে সমর-কৌশলে, সাহসিকতায়, বাণিজ্যে ও শিল্প-প্রতিভায় বাঙ্গালীর ও বাংলার স্থান যে কোথায় ছিল তার খবরও আমরা খুব কমই রাখি। সাহিত্যে দর্শনে ও কলাবিদ্যায় বাংলার প্রকৃত স্থান যে কোথায় তার প্রকৃত ধারণাও আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড্ যেমন রাজস্থানের ইতিহাস লিখে যে

দেশের কীর্ত্তিকে জগতের সামনে সমুজ্জ্বল করে ধরেছিলেন, বাংলায় সত্যরূপের সে রকম ইতিহাস যেদিন কেউ লিখ্‌তে পারবে তখনই বাঙ্গালীর আত্মা ও প্রাণ প্রকৃতি আবার তার পরিপূর্ণ শক্তির সন্ধান ও অনুভূতি পেয়ে সম্যক্ আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা লাভ করতে পারবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশের নৈসর্গিক আবহাওয়ার ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট ভাবে রক্ষিত



কাঁথার মধ্য-পদ্ম—খুলনা হইতে শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত

হয়নি; কিন্তু যা কিছু রক্ষিত হয়েছে তাকেও যতদিন তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতের রূপদান করে প্রকটিত করা না হবে ততদিন বাংলার আত্মশক্তি দীর্ঘকালের নিরুদ্ধতা পরিহার করে মুক্তিলাভ করতে পারবে না।

অতীত ইতিহাসের লুপ্ত স্মৃতির কথা ছেড়ে দিলেও এখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্টে যে কত সম্পদ্ রয়েছে তাকে চিনবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখককে কিছুদিন আগে একখানা চিঠিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখে বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তির বর্ণনা করেছিলেন:— "আমরা গ্রন্থকীট; দেশের গভীর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নাই। আমরা ইংরাজী স্কুলের 'স্কুল বয়'—সেইজন্য পুঁথির নজির অনুসরণ করে বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ; কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি।"

বাংলার প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধরগণ যে আমাদের মূঢ়তা বশতঃ ছদ্মবেশে ভিখারীর রূপে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল তা আমরা এতদিন চিনতে পারিনি—এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কথাটি লিখেছিলেন। জীবনের অন্যান্য বিভাগের কথা এখন ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে রসবোধের কথা উল্লেখ করেছেন সেদিক দিয়েই আমরা এখন আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার একটু পর্য্যালোচনা করব। বাংলাদেশ থেকে যে জিনিস বেরিয়েছে অথবা বাংলায় এখনও যে জিনিস আছে, ললিত কলার দিক থেকে তার মূল্য কম, আর বাইরে থেকে যা আসে তার মূল্য বেশী, এরূপ ধারণা আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মনে এখনও বদ্ধমূল। এর একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবার রায়বেঁশের কথাটাই একটু উল্লেখ করব। বাংলার নিজস্ব এই যে রায়বেঁশে নৃত্য এই সম্বন্ধে একটি উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আমার আলাপ হয়। তিনি রায়বেঁশে নৃত্যের প্রশংসা করার পর বললেন "এই জিনিসটি বেশ, এবং সামরিক প্রকৃতির ও সাহসিকতার ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এ খুবই চমৎকার কিন্তু 'আর্ট' (ললিতকলা) হিসাবে মালাবারের অভিনয় নৃত্য আরও উঁচুদরের।" বাউল ও কীর্ত্তন নৃত্যের ত কথাই নাই। নৃত্য অথবা রসকলা হিসাবে এগুলির যে কোন মূল্য আছে তা কয়েক মাস আগে আমাদের দেশের শিক্ষিত

সমাজের ধারণাও ছিল না। এমন কি বাংলাদেশে যে উল্লেখযোগ্য কোন নৃত্য নাই কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাসিক পত্রিকায় এরকম মতামত-সূচক প্রবন্ধের ছড়াছড়ি দেখা গিয়েছে। মেয়েদের নৃত্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অসভ্য সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্য ছাড়া বাংলাদেশে যে কোন মেয়েলী নৃত্য ছিল অথবা আছে অথবা ললিতকলা হিসাবে তার যে কোন মূল্য আছে এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে খুব কম লোকেরই জ্ঞান ছিল এবং এই নিয়ে অনেক উচ্চ-



লক্ষ্মীর সরা (উপরে রাধাকৃষ্ণ—নীচে লক্ষ্মী, শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্তৃক ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত

শিক্ষিত বাঙ্গালা বন্ধুর সঙ্গে আমাকে অনেক তর্ক বিতর্ক করতে হয়েছে। গুজরাটি গর্‌বা নৃত্য ইত্যাদির প্রচলন কর্‌বার প্রবল ধূয়া কয়েকমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে চল্‌ছিল। ইতিমধ্যে আমার প্রমাণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে যে বাংলার পল্লীতে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যেও যে সকল ব্রত-নৃত্য ও উৎসব নৃত্যের প্রথা এখনও কোথাও কোথাও বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়েছে সেগুলি ললিতকলার দিক দিয়ে খুব উঁচুদরের জিনিস।

আসল কথা "আর্ট" অথবা রসকলার (ললিত কলার) বাস্তবিক প্রকৃতি যে কি সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোকের মনে একটা শোচনীয় আদর্শ-বিকৃতি ঘটেছে এবং তার ফলে বাংলাদেশে যে সকল উচ্চাঙ্গের রসকলা এখনও পল্লীগ্রামের কোথাও কোথাও ধ্বংসাবশিষ্ট ভাবে বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়েছে তাকে চিনবার অথবা তার যথাযোগ্য মূল্য নির্দ্ধারণ করবার মত অনুভূতি বা ক্ষমতা আমাদের নাই। "আর্ট" অথবা রসকলা বলতে আমরা আজকাল বুঝে থাকি এমন একটা জিনিস যাতে আছে বিলাসিতার ইঙ্গিত ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক রূপের সমাবেশ, যাতে আছে রং চং এর বাহার অথবা যাতে আছে আভিজাত্যের আদব কায়দার ও ভঙ্গিমার ছাপ অথবা যা প্রাচীন মন্দিরে খোদিত মূর্ত্তির বা গুহায় অঙ্কিত অথবা প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত রূপাবলীর অনুকরণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়ই আবার বলি যে আমাদের "সেই রংবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারে।" অর্থাৎ বাংলার পল্লীগ্রামের নরনারীর জীবন-যাত্রার সঙ্গে যে সকল উচ্চাঙ্গের রসকলা প্রণালী এখনও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে সেগুলিকে আমরা চিন্‌তেই পারি না।

বিগত ২৫।৩০ বৎসর থেকে বাংলাদেশের বড় বড় সহরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে রসকলা চর্চ্চার যে একটা প্রচেষ্টা এসেছে তা নিয়ে আমরা খুব বড়াই করি; এবং তাতে যে বাঙ্গালীর হাত দিয়ে সৌন্দর্য্যের প্রভূত রূপাবলীর পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে তাও ঠিক্। কিন্তু এই যে একটা নবজীবনের পুলকময় সঞ্চালন বাংলাদেশের নাগরিক শিল্পীদের মধ্যে এসেছে তার অনুপ্রেরণা প্রথমে এসেছিল ইউরোপ থেকে; আর এখন আসচে—হয় প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে নিবদ্ধ রূপা-

বলীর বিধান থেকে অথবা অজন্তা ও ইলোরার গুহার এবং রাজপুত ও মোগল রাজসভার ধ্বংসাবশেষ থেকে; মোট কথা, ললিত কলার আদর্শ নাগরিক বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাংলার বাইরে থেকেই নিচ্ছে। বাংলার ভিতরে ললিত কলার যা কিছু ক্রম-চর্য্যা (tradition) এখনও বেঁচে আছে তার দিকে তারা হয় চেয়েও দেখেনি নয় তাকে অতিতুচ্ছ ও নগণ্য বলে অবজ্ঞা করেই এসেছে।

ইহা যে কত বড় মূঢ়তা তা আমরা টের পাব যখন বুঝতে পারব যে যতদিন বাঙ্গালী বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি-প্রসূত রসকলার ধারা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত না হবে ততদিন বাংলাদেশের রসকলা প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।

সর্ব্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণিপাকে মোহান্ধ হয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজকাল বাংলাদেশের যা কিছু প্রাচীন ক্রম-চর্য্যা (Tradition) তাকেই ভেঙ্গে চুরে বাইরে থেকে তার জায়গায় নূতন জিনিস এনে বসাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু ললিত কলার ক্ষেত্রে জাতির প্রাচীন ক্রম-চর্য্যার, বিশেষতঃ জীবন্ত ক্রমচর্য্যার, মূল্য যে কত বড় তা আমাদের আধুনিক শিক্ষাজনিত মূঢ়তা বশতঃ আমরা এখনও বুঝতে পারি নি।

আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এবং আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক বস্তুতান্ত্রিক ও পণ্যতান্ত্রিক সভ্যতার এই মূঢ়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই মূঢ়তাপ্রসূত অবজ্ঞার ফলে বাংলার জীবন্ত রসকলার ধারাগুলি লোপ পেতে বসেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি যদি অবিলম্বে এই দিকে আকৃষ্ট না হয় তা হলে এগুলি ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই একেবারে লোপ পেয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর রসকলা প্রতিভাক্ষেত্রে পুনর্জ্জীবনের আশাও যে খালি লোপ পাবে তা নয়, বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য জাতীয় ধর্ম্মভাব ও জাতীয় সৃজনী প্রতিভাও লোপ পেয়ে জাতিকে দেউলিয়া ক'রে তুলবে।


বিবাহের মঙ্গল-ঘট—শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক বীরভূম হইতে সংগৃহীত

তাই এখন জোর গলায় ঘোষণা করবার সময় হয়েছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আলো হাওয়া আহরণ করবার আগে আধুনিক বাঙ্গালীকে তার আত্মার ও প্রকৃতির শিকড় প্রোথিত করতে হবে— বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির গভীর তলদেশে এবং সেখান থেকে প্রতিনিয়ত রস আহরণ ক'রে জাতীয় জীবনের প্রতিভার অঙ্কুরকে সংগঠন করে তোলার পর অন্যান্য প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করবার সময় হবে।

আমাদের নাগরিক শিল্পীগণ বাঙ্গালীর জাতীয় কলা-প্রতিভা-ক্ষেত্রের তলদেশে তাদের প্রতিভার শিকড় প্রোথিত করেন নি বলেই আমাদের বাংলার শিল্প আজকাল শিকড় বিহীন ও বেখাপ্পা হয়ে পড়েছে এবং জাতির নাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। এই বাইরের অনুকরণ-মূলক কলাশিল্প জাতির প্রতিভাকে এবং চারত্রকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দিয়ে জাতির জীবনকে একটা কৃত্রিমতার দিকে বিলাসিতার দিকে ও আধ্যাত্মিক অন্তঃসারহীনতা ও অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৭ রসকলার ক্ষেত্রে আমাদের আত্ম-হেয়তা-বিশ্বাস দূর করতে

হবে এটা শুধু একটা ফাঁকা ভাবোচ্ছাসতার কথা নয়; বাস্তবিক পক্ষে আজকাল পাশ্চাত্যজগতের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী রসশিল্পবিৎ পণ্ডিতগণ রসকলার সত্যপ্রকৃতির যে ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করেছেন বা করছেন সেই বিচারপদ্ধতির



মনসার ঘট—শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক বাগের হাট, খুলনা হইতে সংগৃহীত

দিক দিয়েও বাংলার পল্লীতে বাংলার প্রাচীন রসকলা-প্রতিভার যে সকল জীবন্ত নিদর্শন ও ক্রমচর্য্যা এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলির মূল্য যে খুব বড় এটা আমাদের এখন চিনে নিতে হবে।

আমাদের সহুরে মনোভাবের ফলে আমরা আজকাল বাংলার পল্লীগ্রামের যে সকল সহজাত শিল্পধারাকে অবজ্ঞা করে থাকি সেগুলি যে আমাদের নাগরিকশিল্পের চেয়েও উঁচুদরের এই অনুভূতি আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

জাতির স্বাভাবিক জীবনের এবং তার আত্মার উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের যে আত্মপ্রকাশ রেখা, রং, আকার, সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফুরিত হয়ে উঠে, তার নামই "আর্ট" অথবা রসকলা। রসকলার আরও একটি সত্যলক্ষণ এই যে ইহা মানুষের প্রাণকে অতীন্দ্রিয় লোকের দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। যে শিল্পে বা কলায় মানুষের কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বিন্দুমাত্রও ভাব জাগায় সেটা যে বাস্তবিক Fine Art অথবা রসকলা নয় এটা আজকাল পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞানীদের মধ্যে একটা স্বত-সিদ্ধের মতই স্বীকার্য্য হয়ে পড়েছে;—অথচ আমাদের দেশে এখনও নাগরিক শিল্পীদের সৃষ্ট রূপাবলীতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-মূলক রূপ-সৃষ্টির প্রচলনই বেশী এবং এগুলিই দেশে "আর্ট" অথবা ললিতকলার আখ্যা লাভ করছে। প্রকৃত রসকলার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সহরের studio অথবা কারখানা-গুলিতে তৈরী হয় না ইহার স্বতস্ফূর্ত্ত প্রকাশ হয় জাতির ও ব্যক্তির গভীর আধ্যাত্মিক জীবন প্রণালীর ভিতর থেকে।

যে জাতি দুই চারটি নামজাদা রসশিল্পী তৈরী করে তার বড়াই করে বা তাতেই তৃপ্তি পায় সে জাতি বাস্তবিকই অনুকম্পার পাত্র; কিন্তু যে জাতির সাধারণ নরনারীর মধ্যে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির প্রতিভা বহুব্যাপকভাবে বিস্তৃত সেই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিই বাস্তবিক প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট।

উপরোক্ত মাপকাঠির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও যে সকল রসকলাচর্য্যার ধারা আজও বর্ত্তমান, সেগুলি যে আমাদের সহুরে শিল্পীদের রসকলা থেকে বাস্তবিকই উচ্চস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিত্রকলা ও বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে আমার এর আলোচনা বিশেষ করে করব।

(আগামী বারে সমাপ্য)

গুরুসদয় দত্ত

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭

বড়দিনের সময় দাদা এসে বল্লে "প্রকৃতি আয় তোকে বোটানির ফুল-ফলের নাম শেখাব।" আমি প্রথম দিন যাহোক করে চুপচাপ শিখ্‌তে বসলাম। অদ্ভুত অদ্ভুত নাম শুনে আমোদও হচ্ছিল বেশ একটু। কিন্তু অতক্ষণ ধরে চুপ করে বসে থাকা আমার ধাতে সহ্য হয় না, কাজেই পরদিন দাদাকে বল্লাম "দাদা আমার ও শিখে কি হবে, এখন যা পড়ছি তাই পড়ি তোমার পড়া শেষ হ'লে আমি তোমার কাছ থেকে পরে শিখ্‌ব।"

দাদা বলেছিল আমি যখন ছুটিতে আসব তখন তোকে পড়াবো। কিন্তু দাদার নিজের পড়া করে মোটে সময় থাক্‌তো না। যেদিন দাদার পড়ে একটু সময় থাকতো আমাদের সঙ্গে গল্প করে খেলা করে সময় কাটাতো। দাদার খেয়ালের অন্ত ছিল না। কখন বল্‌তো "আমি পৃথিবীর নানা ভাষা শিখ্‌ব, ল' পড়ে রাখব কিন্তু প্র্যাক্‌টিশ্‌ করবো না চাক্‌রিও করবনা প্রফেসারি কিম্বা মাষ্টারি করবো, মনের মত করে ছেলেদের গড়ে তুলব।" আবার মাঝে মাঝে বল্‌তো "আমার ডাক্তারিটাও দিতে ইচ্ছে হয়। ডাক্তারের যে কত দায়িত্ব যারা আজকাল পাশ করছে তারা বোঝে না, টেনে কসে যারা পাশ হয় তাদের ডাক্তারি করা উচিৎ নয় কেননা মানুষের জীবন মরণ ডাক্তারের উপর নির্ভর করে।" শেষে বলতো "আমার সব শিখতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সময় কই? দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীবন যে ফুরিয়ে যায়।" দাদার ছোট্ট জীবনে সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বটে তবুও ছুটি ইচ্ছা তার পূর্ণ করেছিল। ইংরাজি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ছাড়া সে লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জারমান্ শিখেছিল; হিন্দিও অল্প অল্প শিখেছিল।

একদিন দাদার সঙ্গে গল্প করছিলাম, একথা সেকথার পর দাদা বল্লে "আমার থাইসিস্‌এ মরতে ইচ্ছে হয়, থাইসিস্ হ'লে মনের অবস্থা কি রকম হয়, শরীরে কিরকম যন্ত্রণা হয় সব নিজে অনুভব করতে আমার বড় ইচ্ছে হয়।" আমি বল্লুম "মাগো কিসব অদ্ভুত খেয়াল তোমার, থাইসিস্ হ'লে কেউ কাছে আস্‌তে চায়না।" দাদা বল্লে "নাই বা কেউ কাছে এল তাতে কি হয়েছে, আমি বড় হ'য়ে ঐ রোগের বীজানু আমার শরীরে নেবো।" আমি ভয় পেলুম, বল্লুম "না দাদা ওসব খেয়াল কোরনা ভাই।" আবার মাঝে মাঝে বল্‌তো "আমায় যদি কেউ কিছু না বল্‌তো তা'হলে আমি গাঢ় অন্ধকার রাত্রে রাস্তায় বেড়াতাম ঐ সময়ে মনে এমন চমৎকার ভাব আসে।" আমি বল্লুম 'হ্যাঁ অমনি করে দেখনা একবার, পুলিশে চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে।' এই রকম কত ধরণের খেয়াল যে দাদার মাথায় খেলতো তার ঠিক ছিল না। দুপুর রোদের ঝাঁঝে মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারে না, দাদা সেই রোদে বেড়াতে বেরুবে, ছাতি না নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। খুব বৃষ্টি পড়ছে হয়তো, গ্রাহ্য নেই, সেই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজতে চললো, বল্লে বল্‌তো "আমার ভিজতে ভাল লাগে।" আমাদের কাছে এলে ভেজা কি রোদে বেড়ানো বেশী হোতনা, সর্ব্বদাই ওর উপর আমরা দৃষ্টি রাখতাম। কলকাতায় গেলে দাদার খেয়াল বাড়তো। আবার নিজেই এসে সে সব কথা আমাদের বল্‌তো। অন্য ছেলেরা দাদাকে বুঝতে পারতো না; দাদার কথা শুনে তারা পাগল ভাবতো। যারা দাদার সঙ্গে সাধারণ ভাবে মিশেছে তারা দাদাকে বুঝতে পারেনি।

১৮

মাঘমাস—! বেলা বারোটার সময় আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে গল্প কর্‌ছি, বাবা আদালতে চলে গেছেন, এমন সময় সদর দরজায় কে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল। মা বল্লেন "দেখ্‌ তোরে কে এল।" আমি বল্লুম 'এঠিক দাদা

এসেছে, দেখছনা কড়া নাড়ার ধরণ ?" মা বল্লেন "তার এখন কলেজ খোলা সে কি জন্যে আস্‌বে।" আমি দরজা খুলে দিয়ে দেখি দাদা এসেছে। "ঠিক বলেছি দাদা এসেছে" বলে দাদার দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল হয়েছে, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে, মা কাছে আস্‌তে মার বুকের উপর অসাড় ভাবে পড়ে রইল, আস্তে আস্তে মা বিছানায় শুইয়ে দিলেন। দাদার গায়ে তখন এত উত্তাপ যে গায়ে হাত দেওয়া যায় না। দাদার মুখে শুনলাম—'কাল থেকে জ্বর হয়েছে, বাড়ী আসবে বলে বেলেঘাটা ষ্টেশনে এসে আর উঠ্‌তে পারে না, কলেজের একটি ছেলের এই দিকে বাড়ী, সে সঙ্গে করে এখানের ষ্টেশান অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে—।'

বিকেল বেলা বাবা এসে দেখে বল্‌লেন "বোধ হয় বসন্ত বেরুবে।" বাবা ওষুধ দিলেন। পরদিন জ্বর কমল আর বসন্তের বদলে হাম বেরুল। দাদার অসুখ হ'লে একজন বসে গল্প বল্‌বে নয় বই পড়ে শোনাবে এই নিয়ম দাদার বরাবর ছিল। আমি দাদার কাছে বসে কথা বল্‌ছিলাম। দাদা বল্লে "দেখ্ প্রকৃতি, অসুখ হ'লে বেশ মজা হয়, নয়রে ?" আমি বল্লুম "মজা কিরকম ? অসুখ হ'লে ভাত খেতে দেয়না, বই পড়তে কি বেড়াতে দেয়না, কেবল চুপ করে পড়ে থাক। কাল যখন তুমি জরের জ্বালায় অস্থির হচ্ছিলে তখন তোমার মজা লাগেনি ?" দাদা বল্লে "আমি সেভাবে বলিনি। আচ্ছা তুই 'চয়নিকা' আর 'গীতাঞ্জলি' খানা আন।" আমি বই এনে খানিকটা পড়বার পর দাদা বল্লে "আচ্ছা এই কবিতাটা কার লেখা বল্ দেখি।" দাদা কবিতাটা মুখস্থ বল্‌তে লাগল।

"মরণ নৃত্যে জাগেনা চিত্ত
জীবন দোলে দেয়না সাড়া
দিন গিয়াছে রাত আসেনি
সে যে গো মোর সাঁঝের বাড়া
মরণ যবে ঘনায়ে আসে
জীবন আলোর পরে
সজল শ্যাম মেঘের পাশে
তোমার কিরণ ঝরে—
আবেগ ভরা-ব্যাকুল করা
তোমার দু'টী নয়ন তারা
ভুলায়ে মোরে মোহের ঘোরে
আপন হারা পাগল পারা।"

আমি মিছামিছি একটু ভেবে বল্লাম "তোমার লেখা।" দাদা বল্লে "কি করে জান্‌লি।" আমি একটু ভয়ে ভয়ে বল্লাম "তোমার বাঙ্‌লা বইয়ের মলাটের পর যে সাদা কাগজ তাইতে লেখা দেখেছি।" সেদিন বসে বসে কেবল কবিতা পড়া হ'য়েছিল।

দাদার হাম সারবার পর যেদিন দাদা কলকাতায় চলে গেল সেইদিনই আমার অসুখ হোল। মা বল্লেন 'যা ভেবেছি তাই, অচুর অসুখ হলে ওর অসুখ হ'বেই।"

*　　*　　*　　*

গ্রীষ্মের ছুটী হ'য়েছে—দাদা বাড়ী এসেছে। আমায় একদিন বল্লে "প্রকৃতি তোকে একটা খুব ভাল গল্প পড়ে শোনাব, ছুটে আয়।" আমি গল্পের লোভে দৌড়ে দাদার কাছে গিয়ে বসলুম, জিজ্ঞেস করলাম "কি গল্প দাদা ?" দাদা বল্লে "জর্জ্জ ইলিয়টের একখানা বই, দুটী ভাই বোনের গল্প, আমার এমন চমৎকার লাগছে।" দিনের পর দিন দাদা আমায় বইখানা একটু একটু করে বাঙ্‌লায় বল্লে। গল্প শোনা হ'য়ে গেলে আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে গল্পটার কথা ভাব্‌ছি, হঠাৎ দাদা একটু হেসে আমায় ডাক্‌লে "ম্যাগ্‌সি" (টম্ আদর করে ম্যাগীকে 'ম্যাগসি' বলে ডাক্‌তো) আমি খুব খুসী হয়ে বল্লাম "তাহ'লে তুমি টম্।" দাদা হাস্‌লে, কিছু বল্লে না, একটু পরে বল্লে, "আচ্ছা বল্ দেখি টম্ বেশী ম্যাগীকে ভালোবাসতো না ম্যাগি টম্‌কে বেশী ভালবাসতো ?" আমি বিনা দ্বিধায় বল্লুম "ম্যাগী বেশী ভালবাস্‌তো।" দাদা বল্লে "না কথখনো না, টম্ বেশী ভালবাস্‌তো।" আমি বল্লুম "টম্ বড্ড কঠোর, একটু সামান্য কারণে বোনের সঙ্গে আলাদা হ'য়ে গেল, একবারও দেখ্‌লে না যে বোনের সত্যি সত্যি দোষ হয়েছে কি না।" দাদা বল্লে, "ম্যাগির ওপর টম্ মাঝে মাঝে রাগ করতো কেন জানিস্, পাছে তার বোনকে কেউ খারাপ বলে! ম্যাগিকে কেউ খারাপ বল্লে টমের মনে বড্ড কষ্ট হোত।" আমি বুঝলাম দাদা নিজের

ভাবে একথা বল্‌ছে পাছে দাদা মনে কষ্ট পায় সেজন্যে আমি বল্লুম "হ্যাঁ তুমি যা' বলেছ তাই, টমই বেশী ভালোবাস্‌তো।" দাদা আবার বল্লে "ম্যাগীও টম্‌কে খুব ভালবাস্‌তো, দুজনেই প্রায় সমান ভালবাস্‌তো। আচ্ছা গল্পটার মধ্যে কোন জায়গাটা বেশী ভাল লেগেছে তোর।" আমি বল্লুম "বহুদিনের পর যখন মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে, টম্ ডাক্‌ল "ম্যাগ্‌সি" ম্যাগি ডাক্‌ল "টম্।" এইখানটা বড় সুন্দর লাগে আমার।"

সেদিন আমি কতকগুলো মিষ্টি বিস্কুট্ তৈরি করে নিজের জন্য খানকতক রেখে দাদাকে খানকয়েক দিলুম। দাদা সেগুলো খেয়ে বল্লে "বেশ হয়েছে খেতে, তোর কাছে আর আছে?" আমি আমার কাছে যা ছিল সবকটাই দাদাকে দিয়ে দিলুম। দাদা বল্লে "সব দিলি কেন তোর জন্যে রাখ্ আমি তো সব চাইনি।" আমি বল্লুম "তা হোক্ তুমি খাও দাদা আমি তোমার জন্যেই তো করেছিলাম। আমি খাব না তুমি খাও তা হলেই আমি সুখী হ'ব।" দাদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাবার কাছে গিয়ে বল্লে "বাবা, মেয়েরা কেমন সহজে নিজের জিনিষ অপরকে দিয়ে দেয়, কি করে? আমরা তো সব সময়ে পারি না।" বাবা হাস্‌লেন, বল্লেন "এই জন্যেই মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বড়, সামান্য খাবারে তুমি এত অবাক হয়ে যাচ্ছ ওর চেয়ে কত বড় বড় ত্যাগ মেয়েরা করে।" আমি দাদাকে বল্লাম "দাদা তুমি এখন কি রকম ছেলেমানুষ, একটুতেই ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাও।"

লেখা পড়া ছাড়া দাদার আর কোন বিষয়ে স্পৃহা ছিল না। দাদা বল্‌তো "মা আমি রাত জাগ্‌তে পারি না, তুমি আমায় এমন জিনিষ দেবে বল যে যার লোভে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।" মা বল্লেন "তুই কি চাস্ বল্ আমি এক্ষুণি কিনতে দেবো।" দাদা বল্লে "আমি? আমি তো কিচ্ছু মনে করতে পারছিনা তোমরা বা'র কর।" আমি বল্লুম "একটা খুব দামী ফাউন্‌টেন্‌পেন?" "দাদা বল্লে "নাঃ ও ইচ্ছে হয় না।" মা বল্লেন "ক্যামেরা?" দাদা একটু ভেবে বল্লে "না মা ওতেও লোভ আস্‌ছে না যে কি করি?" আমি বল্লুম "সাইকেল, কি রিষ্ট্‌ওয়াচ?" যত রকমের নাম করি দাদা প্রত্যেকবার একটু ভেবে বলে "নাঃ ইচ্ছে হচ্ছে না।" শেষে বল্ল "নাঃ তোমরা কিছু কাজের নও আমায় একটা কিছু দিতে পারলে না।" মা বল্লেন "কি করবো বাবা আমাদের যা মনে এল বল্লুম তোমার কিছুতেই ইচ্ছে না এলে আমার আর হাত নেই।" দাদা বল্লে "মা কি করে রাত্রে পড়তে পারি বলতো, আমি সরষের তেল রেখে দিয়েছি ঘুম এলে চোখে দিই।" মা বল্লেন "অত কষ্ট করে তোমার রাত্রিতে পড়তে হবে না, দিনে যতটুক্ পার পড়বে।"

[ক্রমশঃ]

প্রকৃতি ঘোষ



সমর্পণ যোগ

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত বি, এ

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের একটা আত্মদানের ফল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ জানিয়াছিলেন, যজ্ঞের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এক ভগবান বহু হইয়াছেন। ভগবান নিজ মায়া বা শক্তির সাহায্যে লীলার জন্য বহু জীবের রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভগবান সচ্চিদানন্দময়। সৎ সেই অব্যক্ত ভগবানের উদাসীন পিতৃভাব, চিৎ মহাশক্তি মাতৃভাব আর আনন্দ হইতেছে তাহাই যাহা হইতে এই জগৎ চরাচর প্রসূত হইয়াছে—"আনন্দাৎ এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সুতরাং মায়ার কুক্ষিগত জীবভূত ভগবানকে আবার আপন বিরাটত্বে, স্বস্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইলে আত্মোৎসর্গ রূপ একটা অনুরূপ যজ্ঞের সাহায্যেই স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই উর্দ্ধমুখী যজ্ঞ বা তপস্যার নামই সাধনা। ফলতঃ জীব মাত্রেই দ্বিবিধ যজ্ঞের একটা বা অপরটাতে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত লিপ্ত আছেই। যজ্ঞের একটা ক্ষেত্র হইতেছে তাহার নিম্ন বা অপরা প্রকৃতি—(Lower Hemisphere)—অপরটা হইতেছে তাহার উর্দ্ধ বা পরাপ্রকৃতি (Higher Hemisphere) মনপ্রাণ দেহাত্মক চেতনার মধ্যে মানুষ সক্রিয় আবার অতি-মানস স্তরে, তাহার উর্দ্ধপ্রকৃতিতে আরোহণ করিতেও সে সচেষ্ট। নিম্নপ্রকৃতির যজ্ঞেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সচেতন ও সক্রিয়। মানুষ ইচ্ছা করিলে মনপ্রাণদেহাত্মক প্রকৃতির সেবায় সারা জীবন নিযুক্ত থাকিতে পারে, জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহারই যজ্ঞে সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিতে পারে—ইহা হইল সাধারণ পন্থা। যোগপন্থা হইতেছে নিম্নপ্রকৃতির যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিয়া উর্দ্ধ-প্রকৃতির দিকে উন্মুখ হওয়া—পরাপ্রকৃতির কাছেই নিজেকে আহুতি বা বলি দেওয়া। উর্দ্ধের কাছে এই আত্মাহুতি উর্দ্ধের ধর্মপ্রাপ্তির (Conversion) জন্য একান্ত দরকার। কারণ আমরা যে ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাই, ক্রমে তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম লাভ করি। জন্মান্তরীণ কর্ম্মসংস্কার বলে, ইহজন্মের শিক্ষা ও আবেষ্টনের প্রভাবে নিম্নপ্রকৃতির (Lower Nature) যন্ত্রগুলি (অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, হৃদয়, মন প্রভৃতি) নিম্নমুখী হইয়াই রহিয়াছে। এই নিম্ন মুখটাকে (Lower Mouth) প্রথমতঃ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহা দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে না যে মনের চিন্তা, হৃদয়ের আবেগ বা দৈহিক ক্রিয়াগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই সব সূক্ষ্ম বা স্থূল কাজগুলি সম্পাদিত হইবে একটা উর্দ্ধ-চেতনা হইতে। এই যন্ত্রগুলিকে যতই উপরের চেতনা ও শক্তির বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারা যাইবে সমর্পণের মধ্য দিয়া, ততই মনের এলোমেলো চিন্তাপুঞ্জের পরিবর্ত্তে আমরা পাইব অতি-মানস জ্ঞানের প্রবাহ, হৃদয়ের চঞ্চল আবেগ পরিণত হইবে স্থির আনন্দে, প্রাণের বাসনা রূপান্তরিত হইবে ঐশী ইচ্ছায়, দেহও ধারণ করিবে একটা দিব্য রূপ ও ধর্ম্ম।···আমাদের যে প্রকৃতি, যে স্বভাব আমাদের একান্ত পরিচিত—যাহার সঙ্গে বহুজন্মের পরিচয়ের ফলে আমরা একরকম একাত্ম হইয়া গিয়াছি—তাহাকে প্রথমত অস্বীকার করিতে চেষ্টা করা একটা মস্ত বড় অন্তর্বিপ্লব বটে। কিন্তু এই বিপ্লব সংঘটন না করিয়া উপায় নাই যদি এখানে এই অপরা প্রকৃতির রাজ্যে আমরা পরাপ্রকৃতির দিব্য লীলার প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হই।

এই যে দ্বিবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইল ইহার একটিতে না একটীতে এই সংসারের সব মানুষই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপৃত আছে। ব্যক্তিগত হিসাবে নিম্নের এই যজ্ঞের যাহা ফল তাহাতে অতৃপ্তির ফলে উর্দ্ধতর যজ্ঞের দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। অতীতের দৃষ্টান্তের দ্বারা, বিবেকের অনু-শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া, জগদ্ব্যাপারের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ-জাত জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া, অন্তর্লোকের বাণী বা অতি-

প্রাকৃত অন্য কোন ব্যাপারের দ্বারা অভিভূত হইয়া মানুষ উর্দ্ধপ্রকৃতিকে আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হয়। সাধক ও সাধনার ইতিহাস মন্থন করিয়া আমরা ঐ সব কাহিনী জানিতে পারি।

ভারতের যত যোগপন্থা সবগুলি যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে ঐ উপরে উঠিয়া যাইবার দিকে—শ্রেষ্ঠতর যজ্ঞের দিকে সকলের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে তাহারা। বাস্তবিক জাগতিক ব্যাপারেও যেখানে দ্বিত্বের ভাব—দ্বন্দ্ব যেখানে—সেখানে একদিকে আমাদের মন ঝুঁকিয়া পড়ে। মনের ধর্ম্মই যেন ইহা। সমগ্রকে সে দেখিতে পায় না বলিয়া একটাকে গ্রহণ ও অন্যটাকে বর্জ্জন করিতে সে বাধ্য হয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আমাদিগকে কত নিগূঢ়ভাবেই না এই দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, শীত ও গ্রীষ্ম, মৈত্রী ও বৈরিতা, উত্থান ও পতন, গতি ও স্থিতি, উৎসাহ ও অবসাদ, সংহার ও সৃজন, ক্রোধ ও ক্ষমা প্রভৃতি দ্বৈত অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হইয়াই চলিয়াছি আমরা। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি যেমন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি এই দ্বৈতের যে চির দ্বন্দ্ব তাহা দ্বারা অভিভূত হইতেছে প্রতিক্ষণে। শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বন আমাদের করিতে হয়। দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বুঝিয়াছি শুধু প্রেয়—নিম্নপ্রকৃতির যজ্ঞের যাহা নিকটতম ফল—মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না। কারণ তাহা ক্ষণভঙ্গুর, অবসাদকর এবং স্থায়ী ফলপ্রদানে অসমর্থ। সুতরাং যুগে যুগে মানুষ এই নিম্নপ্রকৃতির যজ্ঞের দিকে একটা বিরতি, অস্বস্তি ও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের পুরাতন যোগপন্থায় ইহা হইতে অমুত্রের দিকে—জগৎ হইতে ব্রহ্মের দিকে তাই এতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে। এখানে বিচারক হইয়াছে মানুষের মন। অতি-মন (বা ভাগবত মন) ইহের মধ্যে জগতের মধ্যে কি ফুটাইয়া তুলিতে চাহে সে দিক হইতে দৃষ্টি উঠিয়া আসিয়াছে।

মানুষ যতদিন নীচের যজ্ঞে ব্যাপৃত ততদিন 'আমি করিতেছি' এই বোধ লইয়াই সে চলে। এই 'আমিত্ব' কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো বা একইরূপ অভিজ্ঞতার চক্রনেমীতে আরূঢ় হইয়া (Vicious circleএ) চলিতে থাকে। তারপর উর্দ্ধের অতি-প্রাকৃত সত্তায় যখন সে আরূঢ় হইতে চেষ্টা করে তখনো সে ঐ আমিত্বকে সঙ্গে লইয়াই সংকল্প সাধনে ব্রতী হয়। আগে এই অহং বোধের অনুভূতির ক্ষেত্র ছিল (Field of Experience) মনপ্রাণদেহাত্মক অপরা প্রকৃতির জগৎ; এখন ঐ অহংএর দৃষ্টি উর্দ্ধের দিকে ফিরিয়া যায়, উর্দ্ধের পরিচয় পাইতে পাইতে অহংকার হয়তো ক্ষীণ হইয়া আসে; কিন্তু শেষ অবধি একটা সাত্ত্বিক অহংকার থাকিয়াই যায়। সমস্ত যোগপন্থা—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ—সবগুলি সম্বন্ধে এই কথা খাটে। কারণ মানুষের কর্ম্মবৃত্তি (Desire), হৃদয়বৃত্তি (Emotion) বা জ্ঞানবৃত্তি (Knowledge) অহং—নিরপেক্ষ নয়। আমি ইচ্ছা করি, আমি আনন্দ অনুভব করি বা আমি জানিতে পারি এই প্রকার ভাব ঐ ঐ যোগপন্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু সমর্পণ যোগের পন্থা একেবারেই ভিন্ন। এখানে সাধক স্বয়ং ভগবান বা আরো খাঁটীভাবে বলিতে গেলে ভগবদ্শক্তি স্বয়ং। সুতরাং অহংকারের শক্তি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় (Passive) না হইলে সমর্পণযোগের উত্তমরহস্যের উপলব্ধি অসম্ভব। ভোগের অহং থাকা যেমন সম্ভব, ত্যাগের অহং থাকাও হয়তো ঠিক ততখানিই সম্ভব কিন্তু সমর্পণের কোন অহং নাই। কারণ 'অহং' যেখানে বিদ্যমান, সমর্পণ সেখানে নাই। আমি নিজেকে ভগবানের পরাপ্রকৃতির কাছে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি—অতএব ভগবান আমায় সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিবেন ইত্যাকার কোন আশা পোষণ করা সমর্পণযোগের নীতি-বিরুদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে এই যোগের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন নাই। কেবল অকপট আত্মদান আর আত্মদান (Sincere Self-giving)—কোন চাওয়া (Demand) নাই—ফাঁকি (Pretence) নাই। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ভগবানের উপর শ্রদ্ধা আর ভগবদ্শক্তির উপর এই পরিপূর্ণ নির্ভর—ইহাই সমর্পণযোগের প্রাণ। সমর্পিত জীবনে (শুদ্ধ) ভোগের আরতি হইবে কি ত্যাগের শিখা জ্বলিবে তাহা নির্ভর করে সমর্পিত জীবনরূপ বাঁশী যাঁহার হাতে বাজিবে তাঁহারই ইচ্ছা ও আনন্দের উপর।

এই সমর্পণ যোগ যে শ্রেষ্ঠ যোগ তাহা গীতাপাঠে আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তৎকালে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন যোগপন্থাগুলির সমাহার করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষে এই সমর্পণ যোগেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন অর্জ্জুনের কাছে। উপযুক্ত আর্য্যযোদ্ধা বা সাধকের সমক্ষে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের ঐক্য ও সামঞ্জস্য নিজেরই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার জন্য সর্ব্বশেষে সমর্পণযোগের ভেরী নিনাদিত হইল। এই সমর্পণযোগই গীতার "উত্তমং রহস্যং"। ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্র-সমূহের সারভূত তথ্য ও তত্ত্ব। ভগবানকে যদি সম্পূর্ণভাবে জানিতে হয়—সমগ্রং মাং জ্ঞাতুং—তাহা হইলে অভাগবত ভোগধর্ম্মের দ্বারা তাহা যতখানি অসম্ভব, ভোগভীত ত্যাগপন্থার দ্বারাও তাহা ততখানি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কারণ ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ ভোগও ভগবানের, ধর্ম্মমুখী ত্যাগও তাঁহারই। সমর্পণরূপ মধ্যপন্থায় তাহা সাধককে নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এমন মানুষকেই আমরা ভগবানের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই মধ্যপন্থা অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্র কথিত মধ্যপন্থা নয়। এই মধ্যপন্থা "মুরারীর (ভগবানের) তৃতীয় পন্থা।" এই মধ্যপথ ত্যাগ ও ভোগ উভয়কেই অতিক্রম (Surpassing) আবার উভয়কেই আলিঙ্গন (embracing) করিয়া আছে। অন্যান্য যোগপন্থার আদেশ উপরে উঠিয়া যাওয়ার দিকে (Ascent) সমর্পণযোগে আরোহণ এবং অবরোহণ (Descent) উভয় দিকে থাকে সমান লক্ষ্য। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবীয় শক্তির অতীত ভাগবতী শক্তিই এই যোগের নিয়ন্ত্রী।

ভোগের জলদজাল যখন সাধক ও ভগবানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায় তখন সাধক স্বরূপবিস্মৃত হইয়া পড়ে—উর্দ্ধের কথা ভুলিয়া যায়—ক্ষুদ্র মায়াচ্ছন্ন অহংকে পাথেয় করিয়া অপরা বা নিম্নপ্রকৃতির যজ্ঞে সে থাকে ব্যাপৃত। আবার নিম্ন ভোগে যখন দ্বন্দ্বের হাহাকার জাগিয়া উঠে তখন ইহবিমুখ হইয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সাধক মনে করে শুধু উপরই সত্য, নীচ হেয়, অতিমানস স্তরই শুধু সত্য, মনের কোন প্রয়োজন নাই, সূর্য্যই শ্রদ্ধেয়চন্দ্র অশ্রদ্ধেয়, শুধু ব্রহ্মই সত্য—এ জগৎ মিথ্যা! ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য—ক্ষেত্র বিজ্ঞানভূমিকে বিস্মৃত হইবার ফলেই ভারতবর্ষে মায়াবাদের জন্ম ও ভারতের অবনতি। কারণ বিজ্ঞানের ধর্ম্মে রূপান্তরিত মন-প্রাণ-দেহ না পাইলে ব্রহ্ম ও জগতের ব্যবধান কখনো ঘোচে না। ভারতেতিহাস ভোগ ও ত্যাগ সম্পর্কে যে অপূর্ব্ব শিক্ষা দিয়াছে তাহা জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ভোগের পঙ্কিল সাগরে আকণ্ঠ মজ্জমান হইয়া, সত্যশিবসুন্দরের প্রকৃত পথ বিস্মৃত হইয়া ভারতের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল—তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহবিমুখতা, ভোগবিমুখতার শিক্ষা হইতে সেরূপ ভারত পার্থিব প্রতিযোগিতায় আধুনিক জগতের প্রাণবান জাতিদিগের নিকট হটিয়া যাইতেছে। সমর্পণ অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য বলিয়া ত্যাগ হইয়াছিল একদা ভারতের জাতীয় আদর্শ—ফলে পাইয়াছিলাম আমরা গৈরিক। কিন্তু ত্যাগ বা গৈরিক কখনো ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ হইতে পারে না। আছে বটে "ত্যাগেন একেন অমৃতত্বমানশুঃ।" আত্মার অমৃত আনন্দ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছুটিয়াই যাইতে হয় আত্মার নিজ নিকেতনে; কিন্তু মুস্কিল এইখানে যে আত্মা বা ভগবান জগদতীত হইয়াও আবার জগতের প্রতিবস্তুতে অনুস্যূত আছেন।—সুতরাং ভগবানের এই জগৎরূপ দেহধারণের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। তাই বৃহত্তর আদর্শ হইতেছে "ঈশা বাস্যং ইদং সর্ব্বং" ও "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" সাধারণতঃ ভোগ চায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা আর ত্যাগের লক্ষ্য হয় অতীন্দ্রিয় অপার্থিব আলো। সমর্পণে ত্যাগধর্ম্মের যাহা কিছু ভাল তৎসমস্ত তো আছেই তাহা ছাড়াও আছে রূপান্তরিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের দিব্যভোগ। তাই এই আত্মসমর্পণ যোগেই একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম। কারণ ইহাতেই শুধু ভগবান জগতে যাহা চাহেন তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। সমর্পণ-যোগীর বাণী ভগবানেরই বাণী—তাঁহার কর্ম্মোদ্যম ভগবানেরই লীলাবিলাস আবার তাঁহার কর্ম্মবিরতি ভগবানেরই আত্মগুপ্তি।

বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত সবাই ত্যাগের উপরই জোর দিয়াছেন। ভগবদনুভূতির (God-realization) তাঁহারা অনন্যসাধারণ উদাহরণ। ভগবদ্

প্রকাশের (God-manifestation) দিকে তাঁহারা তেমন জোর দেন নাই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে মায়ের উপর সমর্পণের চাবিকাঠি আমরা পাইয়াছি। আর আজ শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই সমর্পণের মধ্য দিয়া মানুষ কিরূপে ভগবান হইতে পারে তাহারই মর্ম্মবাণী শুনিবার জন্ম জগৎ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আছে। বৈদিক যুগ ছিল সমর্পণের এক স্বর্ণযুগ। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে শ্রেষ্ঠতর স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইবে। মানুষ চিন্তার সরলতা, ভাবের অকপটতা, অনুভূতির অকৃত্রিম ঋজুতা আবার ফিরিয়া পাইবে। নিছক ত্যাগবাদ বা প্রাকৃত ভোগবাদ ভারতকে সবদিক দিয়া বড় করিয়া তুলিতে—"স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। আজ সময় আসিয়াছে জাতিকে একটা সার্ব্বজনীন সংস্কারমুক্ত পরম উদার ধর্ম্মের সন্ধান দিবার—সে ধর্ম্ম হইতেছে "সমর্পণ"। সমর্পণে জাতির প্রত্যেকে অন্তরদেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আত্মবিকাশের মহান পথেই চলিতে থাকিবে। তাহা হইলেই এ ভারতজাতি ঐক্য ও বীর্য্যে, প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যে, সৃষ্টি ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় যাহা কিছু হইয়া উঠিবে বা গড়িয়া তুলিবে তাহা হইবে মানবজাতিরই অক্ষয় অমর দৈবী সম্পদ।

মোহিনীমোহন দত্ত

গান (ভাটিয়ালী)

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

মরা গাঙে বান ডেকেছে চোখের জলে ভরি।
উজান হাওয়ায় বাইবো বলে ভাসিয়েছিলাম তরী॥
সারা জনম বাইনু তরী মনের মানুষ খুঁজি
আগলে আছি ভাঙা বুকে ভালোবাসার পুঁজি,
ওরে, নদীর বাঁকে তারই ডাকে ব্যাকুল হ'য়ে মরি॥
জ্যোছনা যখন ঘুমায় চরে বালুর বুকে হেসে,
ভুল হয়ে যায় হাসিটি তার, ঘুমের চোখে ভেসে,
জাগায় মোরে নানান্ কথা, ডাকি নামটি ধরি'॥

ওপার থেকে ডাকি যখন এপারে তার সাড়া
এপার-ওপার করে আমি হলেম পাগলপারা,
(ওরে এযে,) নদীর চরের মতো ভাসে ডোবে পরাণ
আকুল করি॥
এবার থেকে ছাড়্লাম আশা ভাঙলাম বাসারে,
ভাসিয়ে দিলাম বানের জলে ভালোবাসারে,—
তবু ছাড়তে নারি এমন জনে রোগের ধম্বন্তরী॥

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

হিন্দুরা দ্বিধাবিভক্ত হইলে হিন্দুদের কি ক্ষতি হইত।

সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি কোনো জাতি বা ক্ষুদ্রতর লোক সমষ্টির পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য্য। ছোট ছোট দলের ভিতরকার ঐক্য দৃঢ়তর করা অপেক্ষা এই চেষ্টা সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে পরিচালিত করিয়া তাহাকে একত্বের দিকে লইয়া যাইতে পারিলে তাহা দেশের পক্ষে অনেক অধিক কল্যাণকর, কিন্তু এই দলগঠন যদি আবার কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার ভিত্তি কৃত্রিম হয় বলিয়া, এই দলের এই কৃত্রিম সীমা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হয় এবং এইরূপ কোনও দলের পরিচালকদের ধীরতা বা সহিষ্ণুতার সামান্য অভাব ঘটিলে এই সচেষ্টতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণ হইয়া উঠে।

হিন্দুরা কখনও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মমূলক দলাদলিকে প্রশ্রয় দেন নাই এবং কোনও বিশেষ সুবিধা বা অধিকারের দাবী করেন নাই। যেখানেই তাঁহাদিগকে এরূপ কাজ করিতে হইয়াছে, সেখানেই দেখা যাইবে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাহা করিতে হইয়াছে।

মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাহেন। খ্রীষ্টানেরাও দলবদ্ধ সম্প্রদায়। যাঁহারা এই প্রকার কোনও দলভুক্ত নহেন, তাঁহারাই "সাধারণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই 'সাধারণ' পর্য্যায়ের লোকেরা নিজেদের হিন্দু বলিয়া থাকেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সংঘবদ্ধ একীভূত সাম্প্রদায়িক শক্তিদ্বারা রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া হিন্দুদের পক্ষেও ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্ম্মগত দলাদলি যদি নাও থাকিত, অথচ, ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সকল বা অনেক ক্ষেত্রে দলবদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলেও হিন্দুদের হিন্দুহিসাবে সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে হইত। কারণ, রাজনীতিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্রও যদি কোনও প্রবল দল থাকে তবে, সেই দলের লোকেরা ইচ্ছা করিলে নানাভাবে অন্যদের স্বার্থগ্রাস করিতে পারেন। প্রথমতঃ দেশে এই প্রকার কোনও প্রবল দল থাকিলে, তাঁহারা রাজনীতিকে প্রভাবিত করিবেনই। কারণ, কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কাজেই, ইঁহারা এমন সকল সুবিধা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য রাজসরকারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন, যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন অন্যেরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইবেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য স্বভাবতঃই ইঁহারা কতকটা শক্তির অধিকারী হইবেন এবং এই শক্তির অপব্যবহার হইবার আশঙ্কাও থাকিবে। অপব্যবহার হইলে, শক্তিশালী অপক্ষপাতী শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান থাকিতেও অন্যদের পক্ষে নির্য্যাতিত হওয়া যে কতকটা অপরিহার্য্য হইবে, আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। দুর্ব্বল পক্ষীয়দের ধর্ম্মগত অধিকারও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাজসরকারের ব্যবস্থা ব্যতীত এই প্রকারের কোনও সম্প্রদায় নিজেদের জন্য এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যবস্থাও করিতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে এইরূপে তাঁহাদের দলের বহির্ভূত লোকদিগের অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্ত্তীতার কারণ হইতে পারেন।

রাজনীতিক-স্বার্থের যে স্বাভাবিক বিভাগ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজনীতি ক্ষেত্রের বাহিরের সম্প্রদায়িক বুদ্ধি তাহাকেও বিচলিত করিতে পারে। দুই একটি উদাহরণের

সাহায্য গ্রহণ করা যাক। বাংলার কৃষকেরা নিরক্ষর, তাহাদের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা সকল রাজসরকারেরই প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু, কথাটিকে অন্যদিক দিয়াও দেখা যাইতে পারে। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান কৃষক এবং সেই জন্যই এই নিরক্ষর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবিশিষ্ট মুসলমানেরা এই কথা বলিতে পারেন যে, যেহেতু তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, সেহেতু তাঁহাদের জন্য শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা হউক। একথা আপাতযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু, যে কথাকে নিরপেক্ষভাবে সমগ্র কৃষকসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বলা যাইত, তাহার প্রয়োগক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকিল। অন্য দিকে হিন্দুরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না থাকেন তবে, নিজ সম্প্রদায়ের কৃষকদের পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তাঁহারা শক্তিশালী লোকমতের চাপ দিতে পারিবেন না। আবার হিন্দুকৃষকেরাও সংখ্যায় ন্যূন বলিয়া সরকারের উপর মুসলমানদিগের ন্যায় প্রবল চাপ দিতে পারিবেন না।

পাট বাংলাদেশের, অবশ্য প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির একটি প্রধান ফসল। এই সকল স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, পাটের চাষ অনেকটা মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক জনমত, পাটে যাহাতে অধিক অর্থাগম হয়, সে বিষয়ে সজাগ হইয়া সরকারকে এদিকে যতটা মনোযোগী হইতে বাধ্য করিতে পারিবেন, হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন থাকিলে হিন্দুকৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে সরকার ততটা উদাসীন থাকিতে সমর্থ হইবেন।

আরও, যাতায়াতের সুবিধা রাস্তা, নদী খাল প্রভৃতির সংস্কার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যগুলি মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে যেমন হইবে, অন্যত্র তেমন না হইতে পারে। এই প্রকার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কথাগুলি অবশ্য, কাহারও প্রতি কোনও উদ্দেশ্য আরোপ না করিয়া, শুধুমাত্র মীমাংসায় পৌঁছাইবার জন্য বলা হইল।

কাজেই দেখা যাইতেছে রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও পক্ষ যদি সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দেন তবে, অপর পক্ষের লোকদেরও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই কার্য্যে তাঁহারা যদি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের রাজনীতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং তজ্জনিত অসুবিধা ভোগ সুনিশ্চিত। ইহাও দেখা গেল, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোনও সাম্প্রদায়িক বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে না থাকিয়াও যদি দেশের মধ্যে এইরূপ কোনও প্রবল দলের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও অন্যদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সমানই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ অবসানের কোনও সম্ভাবনাই নাই। ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্র হইতে আমরা সাম্প্রদায়িকতা যখন দুর করিতে পারিব, তাহারও বহুদিন পরপর্য্যন্ত দেশের মধ্যে এইরূপ দলের অস্তিত্ব থাকিবে।

এখনই, হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও সংহতির অভাব আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এবং একযোগে কাজ করিবার পক্ষে প্রবল বাধা হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুদের রাজনীতিক শক্তিও কতকটা খর্ব্ব করিয়াছে। এই বিবাদ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে দুর হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল এবং সমাজহিতৈষী হিন্দু অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় বাহিরের কোনও ব্যবস্থাদ্বারা হিন্দুসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করা সম্ভব হইলে, সকল দিক দিয়া হিন্দুদের যে ক্ষতি হইত, অন্য কোনও প্রকার লাভের দ্বারা তাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

হিন্দু সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার চেষ্টাকে মহাত্মাজী জীবনপণে বাধা প্রদান করায়, অনেকে তাঁহার এই কার্য্যকে লঘু কাজের জন্য গুরু ব্যবস্থা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু, ঐ প্রকার বিভাগের ফল যে কতদুর প্রসারী হইত এবং হিন্দু সমাজের ক্ষতির পরিমাণ কত ভয়ানক হইত, তাহা বিবেচনা করিলে মহাত্মাজীর এই দৃঢ় পণকে বিবেচনা এবং হিন্দু সমাজের প্রতি গভীর প্রীতি প্রসূত বলিয়াই মনে হইবে।

কংগ্রেস-নেতা হিসাবে মহাত্মাজীর এই কাজ সমর্থন-যোগ্য কিনা

কেহ কেহ (বিশেষ করিয়া বিদেশ হইতে) এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নেতা ও তাহার প্রাণস্বরূপ; কংগ্রেস কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে; কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না মানাই কংগ্রেসের নীতি; এরূপ অবস্থায় শুধুমাত্র হিন্দুদের স্বার্থের জন্য তাঁহার এই কার্য্য কি প্রকারে সমর্থন করা যায়। মহাত্মাজী নিজের দিক দিয়া ইহার উত্তরও দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলা যায়।

কংগ্রেস জাতির মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিভাগ চাহেন না। তবুও, আপাতত কয়েকটি বিভাগকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। হিন্দু এবং মুসলমানেরাই ইহার মধ্যে প্রধান। এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে এবং বিলম্বে বা অবিলম্বে হউক একদিন এই মিলন প্রচেষ্টা সফল হইবে বলিয়া সকলে আশাও করিতেছেন। ইহার মধ্যে আরও খণ্ড-স্বার্থের সৃষ্টি হইয়া ব্যাপারটি জটিলতর হইয়া উঠিলে ঐক্য বিধানের আশা সুদূরপরাহত হইবে বলিয়া প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির পক্ষেই হিন্দুদিগকে বিভক্ত করিবার চেষ্টাকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত।

হিন্দুরা ভারতীয় মহাজাতির এক প্রধান শক্তিশালী অংশ। তাঁহারা কোনও কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সমগ্র জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। কাজেই, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই এরূপ সম্ভাবনাকে বাধা দিতে পারিতেন।

সর্ব্বোপরি মহাত্মাজী হিন্দুসমাজের লোক এবং হিন্দু সমাজের প্রতিও তাঁহার একটা কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যও আবার কংগ্রেসের স্বার্থের বিরোধী নহে। এরূপ অবস্থায় সেই কর্ত্তব্য পালন করিলে কংগ্রেসের দিক দিয়াও তাঁহার কার্য্যকে নিন্দা করা যায় না।

মীমাংসায় লাভ কতটুকু হইল।

পুণাচুক্তি অনুসারে হিন্দুদের মধ্যে যে মীমাংসা হইয়া গেল, তাহাতে আমাদের লাভ কতটুকু হইল এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থা অপেক্ষা তাহা কিসে ভাল, তাহা দেখা দরকার।

নূতন ব্যবস্থানুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভ্রাতাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের এবং তাঁহাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। উন্নত সম্প্রদায়ের অনেক নেতা বলিয়াছিলেন, অবনত সম্প্রদায়ের লোকেরাও, তাঁহাদেরই ন্যায় হিন্দু এবং ইহাদের হাতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর স্বার্থ সমানই নিরাপদ থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

কিন্তু, বর্ত্তমান ব্যবস্থাকেও অনেকেই আদর্শস্থানীয় বলিয়া এইজন্য মনে করেন নাই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের যে বিভাগকে দূর করিবার জন্য এত করা হইল, ইহাতে তাহা সম্পূর্ণভাবে দূর হইল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে এখনও দুই দলই রহিয়া গেল এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যত সংখ্যক প্রতিনিধি পদ রক্ষিত থাকিল, তাহার প্রাথমিক নির্ব্বাচনের ভার একমাত্র তাঁহাদের হাতেই থাকিল। তবুও, পূর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যবস্থা অনেক গুণে ভাল হইয়াছে—তাহাও নিঃসন্দেহ সত্য। পূর্ব্ব ব্যবস্থায় ইহাঁদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির উপর সাধারণ হিন্দুদের কোনও প্রকার অধিকার থাকিত না। বর্ত্তমানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ তাঁহাদের জন্য রক্ষিত প্রতিটি সদস্যপদের জন্য চারিজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন এবং ইহাঁদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ভোটদাতাগণের নিকট হইতে অধিকতম সংখ্যক ভোট পাইবেন, তিনিই সদস্যপদের অধিকারী হইবেন। কাজেই, ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর স্বার্থ সম্বন্ধে মনোযোগী নহেন, এরূপ লোকের নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা আংশিক কমিল এবং যাঁহারা সদস্য পদ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা সমগ্র-হিন্দু সমাজের স্বার্থ-বিরোধী কোনও কাজ করিতে অপেক্ষাকৃত কম সাহসী হইবেন।

কিন্তু, বর্ত্তমান ব্যবস্থার সব চেয়ে ভাল ফল যাহা লাভ হইয়াছে তাহা একটু পরোক্ষ এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিত। হিন্দুসমাজের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস এবং প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ইহাকে দ্রুত একত্বের দিকে

লইয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে, শতাব্দিব্যাপী চেষ্টায় যাহা সম্ভব হয় নাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা যেন কোন্ যাদুকরের মন্ত্রবলে সম্ভব হইতে চলিল।

শ্যাম ও ভারতের মধ্যে কৃষ্টিগত সম্পর্ক

অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা, ভারতের নিকট প্রতিবাসী উন্নতিশীল শ্যামরাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্কক সহর হইতে জানাইয়াছেন যে, স্বামী সত্যানন্দ পুরী নামক জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত সহরের চুলালঙ্করু বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার ইণ্ডিয়া বুরো এবং বৃহত্তর ভারত পরিষদের প্রতিনিধিরূপে এখানে গিয়াছেন। শ্যামদেশের রাজা ও রাণী এই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং ভারত ও শ্যামের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বক্তার আবেদন সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। স্বামীজির বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে রাজ-দম্পতি এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইঁহার সহিত কর মর্দ্দন করিয়া প্রীতি জ্ঞাপন করেন। কদাচিৎ কেহ এই বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসী রাজপরিবারের সহিত বহুক্ষণ আলাপ আলোচনাদি করেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইঁহাদের ভুলধারণা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। ভারতীয় চিন্তাধারা প্রচারের জন্য ইনি ভারতের অবস্থা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন।

স্বামীজী খুব অল্পদিন পূর্ব্বে এই দেশে গেলেও, এখানকার ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন এবং শীঘ্রই এই ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিবেন।

স্বামীজীর চেষ্টায় শ্যাম ও বঙ্গদেশের কৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এখানকার বাঙ্গালীদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্বোধন সভায়, শ্যাম, জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি নানাদেশের বহুলোকের সম্মুখে 'স্বামীজী' বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

এখানে অনেক বাঙ্গালী বর্ণসঙ্কর আছে; স্বামীজী ইহাদিগকে বাংলার সভ্যতার আওতায় আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখানে ভারতবাসীরা সাধারণতঃ দ্বারোয়ান এবং ফিরিওয়ালার কাজ করে। কাজেই ভারতবাসীদের সম্বন্ধে লোকে বড়ই হীনধারণা পোষণ করে। কিন্তু, স্বামীজীর শক্তিশালী লেখা ও বক্তৃতায় এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। স্বামীজী আরও কিছুকাল এখানে থাকিলে, নিঃসন্দেহ শ্যাম ও ভারতের কৃষ্টিগত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখান হইতে কাম্বোডিয়া, চীন এবং জাপান হইয়া স্বামীজী আমেরিকায় যাইবেন।

বাঙ্গালীমাত্রেই এই সংবাদে আনন্দ এবং গৌরব বোধ করিবেন।

লোকে শক্তিকে শ্রদ্ধা করুক বা না করুক, আদর যে অন্য সকল গুণের অপেক্ষা বেশী করে, তাহা নিঃসন্দেহ সত্য। ভারতবর্ষ পরাধীন এবং শক্তিহীন বলিয়া, বাহিরের লোকের, তাহার সম্বন্ধে এত কম ঔৎসুক্য এবং এত অধিক অজ্ঞতা থাকা সম্ভব হইয়াছে। কাজেই, নিজেদের চেষ্টার দ্বারা জগতের শ্রদ্ধা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার দায়িত্ব আমাদের রহিয়াছে। বাহিরে আমাদের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি প্রদর্শনের, মানসিক শক্তি ও সম্পদের পরিচয় প্রদানের এবং জগৎকে আমাদেরও যে কিছু দিবার আছে এই বিশ্বাস উৎপাদনের দ্বারা আমাদিগকে এই চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলার সাহিত্য এবং শিল্পকলার মধ্য দিয়া যে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত জগতের পরিচয় ঘটাইতে হইবে।

বাহিরে প্রচারের চেষ্টা অল্প যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ইউরোপ এবং আমেরিকায়। কিন্তু, এসিয়ায় এক জাপান ব্যতীত অন্য দেশগুলি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সজাগ হই নাই। অথচ, ইহারাই আমাদের নিকটতর প্রতিবাসী এবং সকলেই দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। একদিন ইহাদের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; এখনও অল্প চেষ্টায় তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিশেষতঃ এই সকল দেশে জীবিকার্জ্জনের জন্য যে সব ভারতবাসী যান, তাঁহারা সমাজের উচ্চ স্তরের লোক নহেন। কাজেই ভারত-

বাসীর শিক্ষা, চরিত্র এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে এই সকল দেশের লোকের উচ্চ ধারণা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিয়া পড়িয়াছে। যে সকল বাঙ্গালী অন্যদেশে যাইয়া সেখানে বিবাহাদি করিয়াছেন এবং সেই সকল দেশের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যাহাতে বাংলা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়েন, বাংলার ভাষা, সাহিত্য এবং সভ্যতার সহিত যাহাতে তাঁহাদের পরিচয় ও সম্পর্ক থাকে সেজন্য বাঙ্গালীদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর প্রচেষ্টার বিশেষভাবে প্রশংসা করি।

পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও তাহাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ

কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দুমিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ সংবাদ-পত্রে একটি আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল, বাংলা, বিহার এবং সাঁওতাল পরগণার ওরায়ন, সাঁওতাল, মুণ্ডা, গারো, হাড়ি, হাজঙ্গ, তীরন্দাজ পাহাড়ী এবং অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং অনাহার ও তজ্জনিত কষ্টের বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা বিশেষ তৎপরতার সহিত এই দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন এবং বহুলোকে পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম জিনিসটাকে লোকে পবিত্রতার সহিত যুক্ত করিয়া থাকে। ক্ষুধার জালায় ধর্ম্মান্তরে দীক্ষা গ্রহণ লজ্জাকর, কিন্তু, এরূপ অবস্থাকে দীক্ষা প্রদানের সুযোগ করিয়া তুলা আরও অনেক অধিক লজ্জাকর।

হিন্দুমিশনের কর্ম্মীরা অর্থের অভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বহু শতাব্দি ধরিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম এই সকল জাতির উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ফল একদিনেই সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এই সকল আদিম অধিবাসীরা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় না দিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহরা হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের বহু আচার অনুষ্ঠান ইহারা পালন করিয়া থাকে, এবং হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের সহিত ইহাদের পার্থক্যও খুবই কম। হিন্দুরা সামান্য চেষ্টা করিলেই ইহারা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত হইতে পারে।

এরূপ অবস্থায় যদি আমাদের অবহেলায়, অভাবের পীড়নে ইহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তবে তাহার চেয়ে আমাদের পক্ষে ক্ষোভের কথা আর কি হইতে পারে।

অন্যান্য ধর্ম্মের লোকেরা, বিশেষ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কি প্রকার চেষ্টা ও কি প্রকার প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। আর আমরা নিশ্চেষ্টভাবে সহজেই নিজের লোককে পর করিয়া দিই। ইহারাই অবশ্য পরে আমাদিগকে আঘাত করে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

রাজা রামমোহন রায়

এখন হইতে এক কম শত (৯৯) বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বর্গারোহণ করেন। সকল দিক দিয়া তাঁহার ন্যায় শক্তিমান মনীষী এবং হৃদয়বান সংস্কারক আধুনিক ভারতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দূর-দৃষ্টি দিয়া শতাব্দিকাল পূর্ব্বে তিনি যে ভবিষ্যৎকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য চারিপাশে সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার শক্তির পূর্ণ পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে আজ অসম্ভব।

মহৎ কাজ বা বরেণ্য লোক সম্বন্ধে বাঙ্গালীর স্মৃতি বড়ই দুর্ব্বল। দেহ মনে আমরা এমন নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছি যে, সকল জিনিসকেই আমরা মনের একটা শায়িত অলস অবস্থায় গ্রহণ করি। যখন কোনও লোকের খ্যাতি আমাদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে তখন আমরা তাঁহাকে বড়লোক বলিয়া মানিয়া লই এবং তাঁহার তিরোভাবের সহিত তাঁহার কথা অতি সহজেই বিস্মৃত হই। তাঁহার সমগ্র সাধনাকে উপলব্ধি এবং শ্রদ্ধা করিবার মত জ্ঞান একাগ্রতা অথবা উদ্যম আমাদের নাই। তাই আমরা, আধুনিককালের বাঙ্গালীরা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। অথচ তিনিই আধুনিক কালের

পথে আমাদের যাত্রা আরম্ভ করাইয়া দেন। শিক্ষা, রাজনীতি সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম এবং সংবাদ-পত্র পরিচালনা প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার চেষ্টা পরিচালিত হইয়াছিল। বাংলা গদ্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঠিক প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়া না গেলেও, এই হিসাবেই তাঁহাকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় যে, তিনি নানাদিক দিয়া যে বিপ্লব ও নূতন চিন্তা ধারার সৃষ্টি করিয়া যান, তাহাই পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম আন্দোলন না বলিয়া হিন্দু-সমাজের একটি সংস্কার প্রচেষ্টা বলিলেই ঠিক বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা হিন্দুসমাজের জড়তা ও অন্ধ সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে আঘাত করিয়াছে। আমাদের সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টার এই গোড়ার কথাটা ভুলিলে চলিবে না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটে নাই দেখিয়া অনেকে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। কিন্তু, অন্যদিকে আশাতীত-রূপে ইহার বিস্তৃতি ঘটায়, সংখ্যাবর্দ্ধনের প্রয়োজনই আর ইহার ছিল না। ইহাঁদের আদর্শ, চিন্তা এবং নীতি হিন্দু-সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে এবং সমগ্র হিন্দুসমাজই ইহাঁদের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।

কাজেই, এইদিক দিয়া রামমোহনের দান যে কত মূল্যবান, সমাজকে ইহা কত গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যে-কোনও দেশের, যে-কোনও যুগের মহত্তম ব্যক্তিদের সমস্থানীয়।

সুশীলকুমার বসু

পথ

শ্রীকরুণাময় বসু

ওগো পথ, তব বক্ষে লক্ষ লক্ষ মানবের দৈনন্দিন হাসি অশ্রু আঁকা।
প্রেমের চরণ চিহ্নে, সুগভীর বিচ্ছেদের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসে ঢাকা।
উদয়ের সিংহদ্বার হ'তে তব গতি রেখা প্রশ্নপূর্ণ মৃত্যু-সীমানায়
টানিয়াছে প্রগতির বাণী, 'চঞ্চলিত যৌবন-পথিক', এই তো জানায়।
ওগো পথ, পন্থাহারা তব বার্ত্তা ঘরছাড়া লক্ষ লক্ষ স্বাধীন আত্মারে
টানিয়াছে কণ্টকিত মুক্তিপথে ঝঞ্ঝাপূর্ণ বজ্রদীর্ণ ঘনিষ্ঠ আঁধারে।
প্রচ্ছন্ন আদিমপ্রাতে বেদমন্ত্রে উৎসারিত ওগো পথ জাগিলে আপনি।
আজিও যুগান্তপরে বাণী তব চিরস্থির, অনন্তের তুমি স্পর্শমণি।
মনে পড়ে বহু আগে স্বর্গ হ'তে এসেছিল শাপভ্রষ্টা বালিকা পথিক,
প্রেমের প্রদীপ আলো জ্বেলেছিল প্রাণে প্রাণে, তারপরে ভুল করি' দিক
চলে গেছে ঊর্দ্ধপথে। জগতের আজ এই ঈর্ষাপূর্ণ বিষাক্ত হৃদয়ে
কে জ্বালে অমৃতশিখা ? কোন পথ লয়ে যাবে ধ্রুবসত্য অমর আলয়ে।
মর্ম্ম কক্ষে কাঁদিতেছে অভিশপ্ত সভ্যতার ধ্যানমগ্ন আদিম বৈরাগী,
মানুষের স্থূল লক্ষ্য ভ্রান্ত হ'ল, চিরসত্য ওগো পথ তুমি আছ জাগি'।

নানা কথা

বেকার সমস্যা

আমাদের দেশের বেকার সমস্যা দিনদিনই গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌ছে,—অথচ এতদিন পর্য্যন্ত কি গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, কি জনসাধারণের তরফ থেকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য নিয়মিত চেষ্টা দেখা যায় নি। এতদিন পরে ইন্‌ডষ্ট্রি-বিভাগের সুযোগ্য মন্ত্রী নবাব শ্রীযুক্ত কে-জি-এম্ ফারোকি এই সমস্যা সমাধানের যে প্রথম প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তনা করলেন,—তার জন্য তিনি দেশের লোকের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। বিশেষতঃ এই অর্থ সঙ্কট ও চারিদিকে ব্যয়-সঙ্কোচের সময়ে রাজকোষ থেকে এজন্য লক্ষটাকা সংগ্রহ করা বিশেষ সহৃদয়তা ও দক্ষতার পরিচায়ক।

কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত এন্-কে-বসু আমাদের তরুণ উৎসাহী ইনডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের সাহায্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য একটা অনাড়ম্বর সহজ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টে এখন সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবার সঙ্কল্প করেছেন,—এটা বিশেষ আনন্দের কথা। ব্যবস্থাটি নিতান্তই সামান্য,—কাজেই আমাদের বেকার-সমস্যা যতখানি গভীর ও ব্যাপক, ব্যবস্থাটি ঠিক তার উপযোগী হয়-ত নয়; কিন্তু অল্প থেকে আরম্ভ করে ক্রমে তাকে বিস্তৃততর করে তোলাটা অসম্ভব নয়। ব্যবস্থাটির বিধান মত অল্প দিনের শিক্ষায় সামান্য মূলধনেই লভ্য যন্ত্রের দ্বারা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে, উৎপন্ন দ্রব্য সহজে বাজারে চালাবার আয়োজন করা হ'বে। এতে করে যে-সকল যুবকের আইন-ব্যবসা বা ডাক্তারী ব্যবসা ইত্যাদি আরম্ভ করবার সুযোগ হয় না, বা সুযোগ হ'লেও অর্থাগমের আশা কম, কোনো রকম চাকুরীও মেলে না,—তারা অনায়াসেই তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ উপযোগী অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করে নিতে পারবে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, যে সকল যুবক এই সকল শিল্পে নিযুক্ত হ'তে আস্‌বে,—তাদের যন্ত্রসংগ্রহ করবার জন্য সামান্য মূলধনও নেই। অতএব গত বৎসর যে State Aid to Industries Act নবাব শ্রীযুক্ত ফারোকির চেষ্টায় ব্যবস্থাপক সভা থেকে পাশ হ'য়েছিল,—সেই আইনের ধারাগুলোকে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করবার প্রয়োজন হ'বে। আশা করি গভর্ণমেণ্ট তাতে পশ্চাৎপদ হ'বেন না।

স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অসাধারণ মনীষা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আমাদের দেশে সংবাদপত্র পরিচালনার আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছিলেন ঘোষবংশের যে-চারজন প্রাতঃস্মরণীয় সুসন্তান, স্বর্গীয় গোলাপলাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁর তিরোভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোক-সন্তপ্ত। আমাদের অতিপ্রিয় সমসাময়িক দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা"খানি প্রতিদিন প্রাতে হাতে নিলেই একবার করে উপলব্ধি করি,—দেশের মঙ্গলকল্পে তার মধ্যে কতখানি সাধনা রয়েছে। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র এই বিপুল কল্যাণশক্তির আদি উৎস মহাত্মা শিশির কুমার মতিলালের সঙ্গে গোলাপলালের ক্ষীণ দেহযষ্টির মধ্যে এতদিন যেন আমাদের একটা প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এখন সেই প্রত্যক্ষ যোগ হারালাম। এ অভাব "অমৃতবাজার পত্রিকা"র বর্ত্তমান সুযোগ্য তরুণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি যে কতখানি অনুভব করবেন তা' আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। অবশ্য যে অনুপ্রেরণা গোলাপলাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা দিয়ে গেছেন,—তা' মৃত্যুহীন; তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সেই প্রাণশক্তিতে কখনো ভাঁটা পড়বে না,—জানি; তবুও এতদিন যা' ছিল প্রত্যক্ষ এখন তা হোলো পরোক্ষ; এরই ক্ষতিতে ও বেদনায় "অমৃত-

বাজার পত্রিকা"র বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ও স্বর্গীয় গোলাপলালের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি নিবেদন করছি।

আমরা গোলাপলালের আত্মার শান্তি কামনা করি। এ জগতে তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতি দেশবিদেশের লোকের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। আমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতিকথা এইখানে লিপিবদ্ধ করলাম।



স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা কল্‌কাতায় এসে বাংলা সাপ্তাহিক "অমৃতবাজার পত্রিকা"কে প্রথমে ইংরেজি সাপ্তাহিকে পরে ইংরেজি-দৈনিকে পরিণত করলেন তখন ১১ বৎসরের গোলাপলাল অগ্রজদের সেই কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে তাঁর জন্ম, পিতামাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁকে স্কুলে দেওয়া হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে "পত্রিকা"র কাজও তিনি করতেন। যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ

করে তিনি কলেজে ঢুকলেন, কিন্তু তাঁর বি-এ পরীক্ষার মাত্র তিনমাস পূর্ব্বে পত্রিকার তাঁকে এমনই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল,—যে তাঁর আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হ'ল না; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রজদের নির্দ্দেশ ক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন। তারপর চল্লিশ বছরের অক্লান্ত সাধনা। 'পত্রিকা'ই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান; আর কিছু তিনি জীবনে চান নি; যশ চান নি, অর্থ চান নি, মান চান নি; চেয়েছিলেন যা' তা' পেয়েছিলেন,—পত্রিকা এখন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে।

ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত বিষয়েই তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। অগ্রজদের প্রতি যেমন ছিল তাঁর অচলা ভক্তি, (যার পরিচয় তিনি শৈশবেই দিয়েছিলেন), তেমনি গভীর ছিল তাঁর সন্তান-স্নেহ, তেমনি একনিষ্ঠ ছিল তাঁর পত্নীপ্রেম, তেমনি খাঁটি ছিলেন তাঁর নিজের প্রতি। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি নিমেষের জন্যও সত্যের পথ থেকে বিচলিত হ'ন নি। অসহযোগ আন্দোলন যখন কলিকাতা কংগ্রেসে প্রথম গৃহীত হোলো, তখন তার কার্য্যতালিকার সমস্ত দফাগুলোই তিনি দেশের পক্ষে কল্যাণজনক মনে করতে পারলেন না; বাধ্য হ'লেন অমৃতবাজার পত্রিকায় তার প্রতিবাদ করতে; জন-সাধারণের অপ্রিয় হবার আশঙ্কা তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্যপথ থেকে বিরত করতে পারে নি।

তিনি ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ। শৈশবেই ওস্তাদের নিকট তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, ও কীর্ত্তন সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অনেক সন্ধ্যা কীর্ত্তনগানে অতিবাহিত করতেন। পারত্রিকতাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। জীবনের অনেকটা সময় তিনি পারলৌকিক চর্চ্চায় ব্যয় করেছিলেন।

স্বর্গীয় সার আলি ইমাম

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে সার আলি ইমামের মত একজন মনীষী ও কর্ম্মীকে হারানো যে কী ভীষণ ক্ষতি,—তা' উল্লেখ মাত্রই অনুভব করা যায়। শীর্ষস্থানীয় দেশনেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি যে মুসলমান ছিলেন,—এটা ছিল তাঁর গৌণ পরিচয়,—তাঁর মুখ্য পরিচয়,—তিনি ছিলেন মানুষ ও ভারতীয়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিধানে তিনি প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। ঠিক যখন সেই ঐক্য সংঘটনের শক্তির পূর্ণ বিকাশের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'চ্ছিল,—যখন জনমত ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলিত ভাবে সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সংগঠিত হ'চ্ছিল,—ঠিক সেই সময়ে সার আলি ইমামের তিরোভাব দেশের সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করবেন।

আধুনিক বিহার তাঁরই সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে বিহারের চেয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের,—তথা সমগ্র ভারতবর্ষের কম ক্ষতি হয় নি। তাঁর মৃত্যু এতই আকস্মিক যে তার বেদনা দুঃসহ। আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। পাটনা হাইকোর্টে তিনি একটি মামলায় নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ালির ছুটিতে মামলা দিনকয়েক মুলতুবি ছিল,—তিনি গিয়েছিলেন রাঁচিতে একটু বিশ্রামের জন্য। সেখানে অকস্মাৎ তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া গেল বন্ধ হ'য়ে,—তাঁর কণ্ঠ চিরতরে নীরব হোলো,—সহসা এ মর্ম্মান্তিক সংবাদ যেন বিশ্বাস করাই কঠিন।

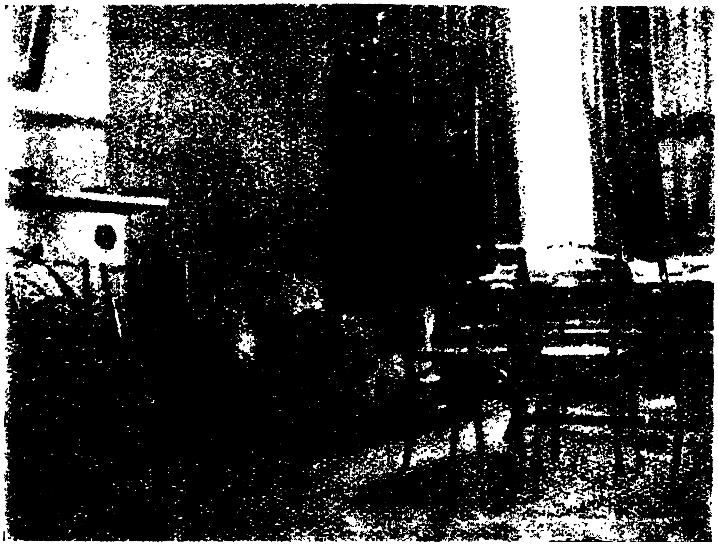
কর্ম্মে, চিন্তায়, ব্যবহারে সার আলি ইমাম এমন একটা উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাকে সম্ভ্রম না করে উপায় ছিল না। হিন্দু মুসলমান, ইংরেজ ভারতীয়, সরকার জনসাধারণ সকলের নিকট থেকেই তিনি সমান শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি।

প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র সংঘ

য়ুরোপের প্রায় সব জায়গায় আজকাল দেখা যায় যে সে দেশের ছাত্রেরা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বা সংঘ নিজেরাই গড়ে তোলে এবং বাইরের লোকের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই তা' চালায়।

ভারতীয় ছাত্রদের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান য়ুরোপে আছে, কিন্তু ইহাদের কোনটাই ছাত্র-প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত

হয় না। যেমন, লণ্ডনে ক্রমওয়েল রোডের প্রতিষ্ঠান একেবারেই সরকারী ব্যাপার এবং গাওয়ার ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান্ ষ্টুডেন্টস্ য়ুনিয়ন Y. M. C. A.-র অঙ্গ। এই অভাব



"ইস্কার" পাঠাগার

দূর করেছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান্ ষ্টুডেন্ট্স্ সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন (Indian Students Central Association) যেটা এখন বিলাতে "ইস্কা" (I. S. C. A.) এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত।

এই সংঘ প্রথম স্থাপিত হয় ১২ই অক্টোবর ১৯২৯ সালে। স্থাপনার সময়ে অধ্যাপক রমন, স্যার হরি সিং গৌর, স্যার অ্যালবিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সাপুরজী সকলতওয়ালা প্রভৃতি উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উৎসাহ এবং পরামর্শ দান করেন। ২নং বৌফোর্ট গার্ডনস্ 2 Beaufort Gardens) ঠিকানায় এক প্রশস্ত চতুস্তল অট্টালিকা এই সমিতির কর্ম্মস্থল রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার মহাশয় ১৯৩০ সালের ২রা মে তারিখে ইহার গৃহদ্বার উন্মোচন করেন।

সংঘের সমস্ত প্রচার কার্য্য ছাত্র-সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধির দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রতি বৎসরে একজন কর্ম্মসচিব, একজন অর্থসচিব কর্ম্ম-সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মী নিযুক্ত করা হয়। বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই ছাত্র ও অবৈতনিক। সঙ্ঘের হিসাব প্রতি-বৎসরে নিয়মিত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া এই দেশে স্থায়ী বাসিন্দা অছাত্র ভারতীয়দের মধ্য হ'তে তিনজন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে একজন কোষাধ্যক্ষের কার্য্য গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ২৬০।

২নং বৌফোর্ট গার্ডেন্স্-এ ১২ জনের থাকবার স্থান, নির্জ্জন পাঠাগার, বৈঠকখানা ও পিং পং, বিলিয়ার্ড ইত্যাদি খেলবার ব্যবস্থা আছে। একটী পুস্তকাগারও গ'ড়ে তুলবার



"ইস্কা"র শয়ন কক্ষ

চেষ্টা চলছে। ভারতীয় প্রায় সমস্ত প্রদেশের মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা ছাড়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাপ্রকার পত্রিকা এখানে রক্ষিত হয়। গত দুই বৎসর ধ'রে একটী ভোজনশালাও এই সংঘ সুসম্পন্নভাবে চালিয়ে আসছে। এই ভোজন শালায় খিচুড়ি পোলাও থেকে পরঠা রসগোল্লা দই ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। নিরামিষাশীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লাভ করবার জন্য ইহা স্থাপন করা হয় নি বলে, খাদ্যাদির মূল্যও খুব অল্প।



"ইন্ধা"র ক্রীড়াগার

প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের মনোরঞ্জনের জন্য একটী সাপ্তাহিক কার্য্যহার করা হয়। কোনও দিন বক্তৃতা, কোনও দিন তর্ক-বিতর্ক, গানের মজলিশ ও সান্ধ্যভোজন ইত্যাদি। বক্তাদের মধ্যে আর্ল্ বীচাম্, স্যর পেট্রীক গেডিস্, স্যর ন্যার্থবাথনর্টথেন্, আইলমর মড্, শ্রীমতি পল্ রোবসন্, শ্রীযুত ভিঠলভাই পাটেল, পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীমতি নায়ডুর নাম উল্লেখ যোগ্য।

সংঘের তরফ থেকে প্রকাশ্য সভায় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে মান পত্র প্রদান করা হয়। কবিগুরু গতবার বিলাতে অবস্থান কালে এই সংঘ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করবার আয়োজন করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কবিগুরু সে সময় কোনও প্রকাশ্য সভায় যোগদান ক'রতে অপারগ ছিলেন। তবে তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলা সংঘগৃহে পদধূলি দান করেন এবং সমিতির সভ্যদের ভোজে যোগ দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করেন। অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট অতিথি যেমন, মহারাজা ও মহারাণী গায়কোয়ার, স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু, স্যর নৃপেন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুডালিয়ার, স্যর পদমজী জিনওয়ালা, স্যর পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, শ্রীযুক্ত জিন্না, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই সংঘের আতিথ্যে পরিপুষ্ট হ'য়ে সর্ব্বরূপে সাহায্য ক'রতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই সংঘ কতকগুলি বিশিষ্ট শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে একটী শাখায় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা হয়। ইহার আমন্ত্রণে লণ্ডনে নবাগত কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ একটী সান্ধ্য মজলিশে বাংলা কাব্যের আলোচনা করেন এবং তাঁর আবৃত্তি দ্বারা সভ্যগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সংঘের প্রকাশ্য ভোজে যোগদান ক'রে তিনি তাঁর পরিতৃপ্তি জ্ঞাপন করেন।

অন্য একটী শাখার সম্পর্কে ভারতীয়দের জন্য এক ফুটবল ক্লাব স্থাপিত হ'য়েছে এবং ইংরাজদের মধ্যে হাডুডুডু খেলা প্রচলনের চেষ্টা চ'লছে।

এই সংঘ গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিদেশস্থ সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের এক মহা সভা আহ্বান করেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ছাত্রগণের প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ ক'রে ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করবার জন্য একটী Federation of Indian Students (Abroad) স্থাপন করবার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।

এ বৎসর মুনিকে (Munich) ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে—সেখানে এই Federation স্থাপনার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হ'বে। এই মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মহাশয়।

নবাগত ছাত্রদের জন্য এই সংঘে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশন থেকে ছাত্রদের নিয়ে আসা, সুলভে বাসস্থান ঠিক



"ইস্কা"র ভোজনশালা

ক'রে দেওয়া এবং কলেজ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হয়। ছাত্রাছাত্র নির্ব্বিশেষে ভ্রাম্যমান ভারতীয়দের জন্য অন্যান্য দেশে ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে পরিচয়-পত্র দেবার ব্যবস্থা আছে। সস্তায় য়ুরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা ও টিকিট ক্রয়ের ব্যবস্থাও সংঘ গ্রহণ ক'রেছেন। সংঘের অনুরোধে কয়েকজন স্থানীয় বিখ্যাত চিকিৎসক ভারতীয় ছাত্রদের অসুখের সময় বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা ক'রতে রাজী হ'য়েছেন। এ ছাড়া সংঘ ভারতীয় ছাত্রদের সকল প্রকার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের উপর কোথাও কোন অবিচার যাতে না হ'তে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিদেশে পাঠ সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর ও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কর্ম্মসচিবের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ সরকার। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. এবং I. S. C. A.-র সাফল্যের সঙ্গে এই উৎসাহী যুবকের অদমনীয় প্রচেষ্টা বিশেষভাবে জড়িত। ইনি আগামী জানুয়ারী মাসে এই সংঘের প্রতিনিধি হ'য়ে দেশে আসছেন যাতে তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত আলাপে য়ুরোপে শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্ত খবর দেশবাসী পেতে পারেন এই উদ্দেশ্যে।

এই সংঘটীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা এবং প্রভাব বেশী। সরকারী বা বেসরকারী কোনরূপ সাহায্য না পেয়ে এই সংঘটীকে আমাদের ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টায় এবং অর্থে এতদিন পরিচালনা ক'রে এসেছে—অনেক প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে। এর প্রতি আমাদের দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার সময় এসেছে—তাঁরা যেন দেখেন যে এই ছাত্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটী অর্থ এবং সহানুভূতির অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয়। ইহার ঠিকানা:—
Indian Students Central Association,
2 Beaufort Gardens, London, S. W. 3.

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী ও শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

শিল্পী শ্রীপ্রভাত নিয়োগী ও শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির কিছুদিন হ'তে নৈনিতাল পাহাড়ে অবস্থান করছেন। এঁরা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান জায়গা গুলিতে কিছুদিন ক'রে থেকে সে সব দেশের পুরাতন শিল্পধারা নৈসর্গিক দৃশ্য আচার ব্যবহার ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে চিত্র-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছেন।

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী ২২শে জুলাই ১৯৩১ সালে কলকাতা পরিত্যাগ ক'রে এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী ও রাওলপিণ্ডী

হ'য়ে কাশ্মীরে যান। উত্তরভারতের দর্শনীয় সহরগুলি পরিদর্শন ক'রে—ইনি বোম্বাই যান। অজন্তা ইলোরা ইত্যাদি ভারতীয় কলা-শিল্পের প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শন করে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে কিছুদিন অতিবাহিত ক'রেছিলেন। তারপর নৈনিতালে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির ১৯২৯ সালে শান্তিনিকেতন কলা-ভবনে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছে শিক্ষা শেষ ক'রে অন্ধ্রদেশের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে মাদ্রাজ যান। সেখানে ১৯৩০ সালে Fine Art Society Exhibitionএ ভাস্কর্য্যে প্রথম পুরস্কার পান। দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে সিংহল দ্বীপে যান। সেখানে অনুরাধাপুর, পোলোনেরুয়া ড্যাম্বুলা, সিগিরিয়া ইত্যাদি দেখে মাদ্রাজ হ'য়ে কলকাতা আসেন।



শ্রীপ্রভাত নিয়োগী * শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে কলকাতা থেকে তিনি আবার রওনা হন। এলাহাবাদ হ'য়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে লক্ষ্ণৌ School of Arts & craftsএ ভাস্কর শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরীর (A. R. C. A.) নিকট ভাস্কর্য্যের উচ্চ-শিক্ষার জন্য বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু U. P.তে domiciled নন্ ব'লে School of Arts & craftsএ তাঁর কাজ করা সম্ভব হয় না। অগত্যা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি নৈনিতালে উপস্থিত হন।

ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশের শিক্ষার্থী যদি অন্য প্রদেশের শিক্ষালয়ে প্রবেশ পথ না পায় তা হ'লে সুদূর বিদেশের কাছ থেকে আমরা এ বিষয়ে উদারতা কেমন ক'রে দাবী করতে পারি। ভৌগোলিক সীমানার বাধা অতিক্রম ক'রে জগতের সমস্ত শিক্ষাগারের দ্বার জগতের সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্যে একদিন উন্মুক্ত হবে না কি?

শ্রী এ, সি, দে

Bengal Association of the Master Printers and Allied Industries প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এ, সি, দে মহাশয় Asiatic Society of Bengalএর সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে তাঁদের বিজ্ঞাপনের সারাংশ আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে মুদ্রিত করলাম।

আপনারা বোধহয় অবগত আছেন যে গত বৎসর বড়দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দশম অধিবেশন প্রয়াগে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোগিগণের অনুরোধে তাহা সেই সময়ে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ঐ স্থগিত দশম অধিবেশন আগামী বড়দিনের অবকাশে অনুষ্ঠিত হইবে। মাননীয় বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয় কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রক্ষা করিবার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত, ভাববিনিময় দ্বারা পরস্পরের উন্নতি সাধনকল্পে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সাহিত্যের এই মহামিলনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভাবের আদানপ্রদান করিয়া আমাদের প্রবাস-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করুন।

অধিবেশনের সাফল্যসাধন প্রবাসী বাঙ্গালী-সাধারণের কার্য্য। আপনাদের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মিলনের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গীনসুন্দর হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব আপনারা সমবেত হইয়া সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস শিল্প সঙ্গীত প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও আমাদের প্রবাস-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া এবং শিল্পকলা ও কারুকার্য্যের নিদর্শন দেখাইয়া অধিবেশনের পূর্ণতা সাধনে সচেষ্ট হউন।

অধিবেশনের দিন—আপাততঃ ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ (ইং ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর) এবং স্থান—এ্যাঙ্গলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থির করা হইয়াছে। অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় যত শীঘ্র সম্ভব জ্ঞাপন করা হইবে।

মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ও মহিলাসম্মিলনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীবীরেশ্বর বসু
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন।

স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ

ইনি খ্যাতির উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি; কিন্তু নীরবে দেশের সেবা করতেন। গত ২৩শে জুন এঁর মৃত্যু হ'য়েছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন প্রকৃত কর্ম্মী ও অকৃত্রিম দেশ-সেবক হারালো।



স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ

চন্দ্রমাধববাবু সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির একজন সহযোগী সম্পাদক, কাঁকনাড়া শ্রমিক সমিতির সহকারী সভাপতি এবং কলিকাতা কেরাণী-সমিতি ও ল্যান্সডাউন পাটকল শ্রমিক সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি ছিলেন। বহু শ্রমিক সঙ্ঘের তিনি ছিলেন অবৈতনিক আইন-পরামর্শদাতা। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির সহযোগী সম্পাদক হিসেবে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত সমিতির সাহায্যকল্পে

কলিকাতায় যে বিরাট প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল, তা তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে সাফল্য লাভ করেছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমিতির সদস্য ও অন্যান্য মহিলা সদস্যেরা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি "নিখিল ভারত ব্যবসা সঙ্ঘে"র প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকরী সভার সদস্যরূপে ভারতীয় শ্রমিকদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। সেজন্য শ্রমিকরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯২৯ সালে নাগপুরে যে নিখিল ভারত ব্যবসা সঙ্ঘের অধিবেশন হ'য়েছিল সেখানে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তিনি Communistদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন।

খেলা ও ব্যায়ামে তিনি ছিলেন পারদর্শী। মণপ্রভৃতি ভীষণ ভারী জিনিষ দাঁতে করে তুলতে পারতেন।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির সদস্যগণ তাঁর স্মৃতি রক্ষা কল্পে তাঁদের সমিতি-গৃহে তাঁর একটি তৈল চিত্র ও তাহার নিম্নে একটি প্রস্তর ফলক স্থাপন করার জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাছাড়া সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ের দুইজন ছাত্রীকে তাঁহার নামে দুইটি অবৈতনিক বৃত্তি দেওয়া হ'বে,—এবং প্রতি বৎসর তাঁর নামে একটি স্বর্ণপদক বা অন্য কোনোরকম পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। তাঁর এই স্মৃতি-ভাণ্ডারে তাঁর বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে যদি কেউ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন ত "সরোজ-নলিনী কার্য্যালয় ৬০ বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় পাঠালে তা উপযুক্ত রসিদ দিয়ে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করা হ'বে।

শোক সংবাদ

আমরা শুনে মর্ম্মাহত হ'লাম যে 'বিচিত্রা'র অন্যতম হিতৈষী ও লেখক আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র তরুণকুমার মাত্র ৮ বৎসর বয়সে মাতাপিতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। মন্মথবাবু সম্প্রতি দিল্লীতে বদলি হ'য়েছিলেন; তাঁর মায়ের দুরারোগ্য পীড়ার জন্য তাঁর পরিবারবর্গকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি,—একাই প্রবাস-ক্লেশ ভোগ করছিলেন। গত পূজার ছুটির সময় দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসে তিন কন্যা সহ পুত্রটিকে নিয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে তিন দিনের মধ্যেই তরুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং গত কালীপূজার দিন প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়।



তরুণকুমার ঘোষ

পুত্রশোক সকল বাপ মায়ের বুকেই নিদারুণ ভাবে বাজে, প্রবাসে আরো বেশি করে বাজে,—মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করা ছাড়া এর আর কোনো সান্ত্বনা নেই। বিশেষতঃ তরুণকুমার অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়ে বাপমায়ের অন্তরে তার ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল আশা সঞ্চার করেছিল। পাঁচ বৎসর বয়সেই সে শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র ও গল্পের বই অবলীলাক্রমে পড়ত

—এবং বাড়ীর যাবতীয় কাজে,—এমন কি ইলেক্‌ট্রিকের কাজে, ছুঁতোরের কাজে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করত।

ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পিতামাতার হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন,—ইহাই প্রার্থনা করি।

ভারতে জীবন-বীমার প্রসার ও ইউনাইটেড্ এসিওরেন্স লিঃ

সুখের কথা, দেশের লোক উত্তরোত্তর জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে এবং দেশের জীবনবীমা ব্যবসায় ক্রমেই বিদেশীয়দের নিকট থেকে দেশীয়দের নিকট হস্তান্তরিত হ'চ্চে, সুপরিচালিত হ'চ্চে, এবং দিন দিন প্রসার লাভ করছে। সম্প্রতি আমরা ইউনাইটেড্ এসিওরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শুনে বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হ'য়েছি। আজকালকার মন্দা বাজারেও এঁরা অনেক নূতন কাজ সংগ্রহ করেছেন,—এইটেই বেশ আশা ও আনন্দের কথা,—তা ছাড়া অনেক আধুনিক বীমা-প্রণালী এঁদের প্রস্পেক্‌টসের মধ্যে স্থান পেয়েছে,—যথা আকাস্মক দুর্ঘটনা, বিশিষ্ট পলিসির পুনরুদ্ধার, বর্দ্ধিতকাল জীবনবীমা, চির-অক্ষমতার সুবিধা ইত্যাদি। বর্দ্ধিত জীবন বীমা প্রণালীটি দেশী কোম্পানীদের মধ্যে এখনো বেশী প্রচলন লাভ করে নি। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের অবধারণের জন্য এইখানে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া গেল।

যে-কোনো চল্‌তি বীমার প্রথম তিন বৎসর অতিবাহিত হ'লে তখনো যদি বীমা চল্‌তি থাকে এবং কোনো রকম দায়গ্রস্ত না হ'য়ে পড়ে, তবে ভবিষ্যৎ প্রিমিয়ম প্রদানে অসমর্থ বীমাকারী ইচ্ছা করলে তাঁর বীমা-সর্ত্ত সমর্পণ করে অন্য একটা লাভ-বিহীন প্রিমিয়ম-শোধ নির্দ্দিষ্ট জীবনবীমা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর আর্জ্জিতে ঐ বর্দ্ধিতকাল বীমার সময়টা নির্দ্দেশ করে দিতে হ'বে,—এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর উত্তরাধিকারী অবিলম্বে সেই বীমার সমস্ত টাকাটাই পেতে পারবেন। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে যে-সকল বীমাকারী প্রিমিয়ম দিতে অসমর্থ হ'য়ে পড়েন, তাঁদের পক্ষে এ ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক বলে মনে হয়।

এঁরা জীবনবীমার তহবিলকে অন্যান্য তহবিল থেকে পৃথক রাখার বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেছেন। পরিচালনা কার্য্যেও সর্ব্ববিষয়ে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে থাকেন। প্রিমিয়মের হারও বেশ পরিমিত ও ন্যায়-সঙ্গত। বীমার সর্ত্তগুলিও বীমা-কারীদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। ডিরেক্টর সঙ্ঘের সংগঠনেও বীমাকারীদের মধ্যে একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা আছে। ৫০০০৲ বা ততোধিক টাকার বীমাকারীদের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হওয়ার অধিকার এবং ২০০০ বা ততোধিক টাকার বীমাকারীদের নির্ব্বাচন করবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছে।

এঁদের আর একটা বিশেষত্ব এই যে যাঁরা জীবনবীমার কাজ শিখ্‌তে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য এঁরা একটা শিক্ষা-বিভাগ খুলেছেন। দেশের উৎসাহী ও উদ্যোগী যুবক-বৃন্দ এই বিভাগ থেকে শিক্ষালাভ করে একটা লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'বার সুযোগ পাবেন। এই বিভাগটি কেমন চলে জান্‌বার জন্যে আমরা উৎসুক রইলাম।

আমরা এই সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠানটির প্রবর্ত্তন ও পরিচালনার জন্য পরিচালকবর্গকে ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ইউ-এন্ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ইউনিটি কন্‌ফারেন্স্

সম্প্রতি কিছুকাল থেকে এলাহাবাদে ইউনিটি কন্‌ফারেন্সের যে বৈঠক চলেছে তার পরিণতি কিরূপ দাঁড়ায় তা দেখ্‌বার জন্যে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। ঔৎসুক্য না বলে উৎকণ্ঠা বল্‌লাম এই জন্যে যে, যে মিলন-প্রচেষ্টার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসমূহ জটিলভাবে জড়িত সে প্রচেষ্টা যদি শুধু নিষ্ফলই না হয়ে এমন ফল প্রসব করে যার মধ্যে মধুর রসের চেয়ে কটু রসেরই আধিক্য, তা হ'লে পরিতাপের অন্ত থাকবে না। মিলনের নামাঙ্কিত ক'রে যে জিনিসটিকে ঘটাবার চেষ্টা করা হচ্চে প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রিক শক্তি এবং

অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা। অতি অল্প সময়ের আয়োজনে এই ভাগবাটোয়ারার ভার গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা। এই কার্য্যটি সম্পন্ন করবার আগ্রহাতিশয্যে মান-যন্ত্রের দাঁড়িটি সমান করতে গিয়ে পাছে তাঁদের একটি পাল্লায় বেশি সোনা এবং অপর পাল্লায় বেশি লোহা চড়াতে হয়—এই আশঙ্কা দেশের জনমনকে বিচলিত করেছে। কারণ, দাঁড়ির মোহ আজকে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করলেও একদিন সে পাল্লার হিসেব করবেই, এবং সে দিন আবার নূতন ক'রে বিরোধের সূত্রপাত হবে। আপাত মিলনের কর্ষিত ভূমিতে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজটি নিহিত রেখে কোনো মঙ্গল নেই। ভাগবাটোয়ারার দ্বারা মিলন সংঘটিত করতে হ'লে শুধু আদানের মনটি জাগ্রত রাখলেই হবে না প্রদানের মনটিও জাগ্রত রাখতে হবে। দাবীর অধিক আদায় করলে অথবা দান করলে দাবীকে অগ্রাহ্য করাই হয়। তাতে দাতা এবং গ্রহীতা কারও মঙ্গল নেই। গঙ্গা যমুনার পবিত্র মিলনক্ষেত্র প্রয়াগে যে মহামিলনের উদ্যম সূচিত হয়েচে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তার সাফল্য কামনা করি,—কিন্তু তা যেন প্রকৃতপক্ষে মিলনই হয় এবং তা ক্রয় করবার নির্বন্ধে কোনো পক্ষকে যেন দেউলে হয়ে যেতে না হয়।

ছাত্রদের প্রফুল্ল জয়ন্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে বাংলা দেশের ছাত্র এবং ছাত্রীগণ আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখ থেকে ৩১শে তারিখ পর্য্যন্ত একটি সপ্তদিবসব্যাপী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত করবেন। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ক'রে আচার্য্য রায় সমগ্র জগতের নিকট যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তা এখন তাঁর অপরিমেয় দেশহিতৈষণার মহত্ত্বে নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে। স্বদেশের হিতসাধনে উৎসৃষ্টপ্রাণ আর্ত্তপীড়িতের পরম বন্ধু এই ঋষিকল্প মহানুভব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলে কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ মোচন হয়। বাংলা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ত্তব্য পালনের এই সদনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হোক —এ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

এই জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনুরুদ্ধ হয়েচেন এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণে শরৎচন্দ্র স্বীকৃত হয়েচেন।

৺সুকুমার সরকার

কয়েকদিন হ'ল কবি সুকুমার সরকার পরলোক গমন করেছেন। বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট তিনি অপরিচিত ছিলেন না, তাঁর কয়েকটি কবিতা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েচে। সুকুমার বাবুর কবিতাগুলির মধ্যে যে কবিশক্তির প্রকাশ ছিল তা'তে ভবিষ্যতে তিনি কবিখ্যাতি অর্জ্জন করবেন ব'লে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম। যৌবনের প্রাক্কালে তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হয়েচি।

শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্

আমরা শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ তৈল উপহার পেয়ে ব্যবহার ক'রে দেখে প্রীত হয়েচি। তেলটির গন্ধ মনোমুগ্ধকর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। শিরোরোগে উপকারী ব'লেও তেলটির খ্যাতি আছে।

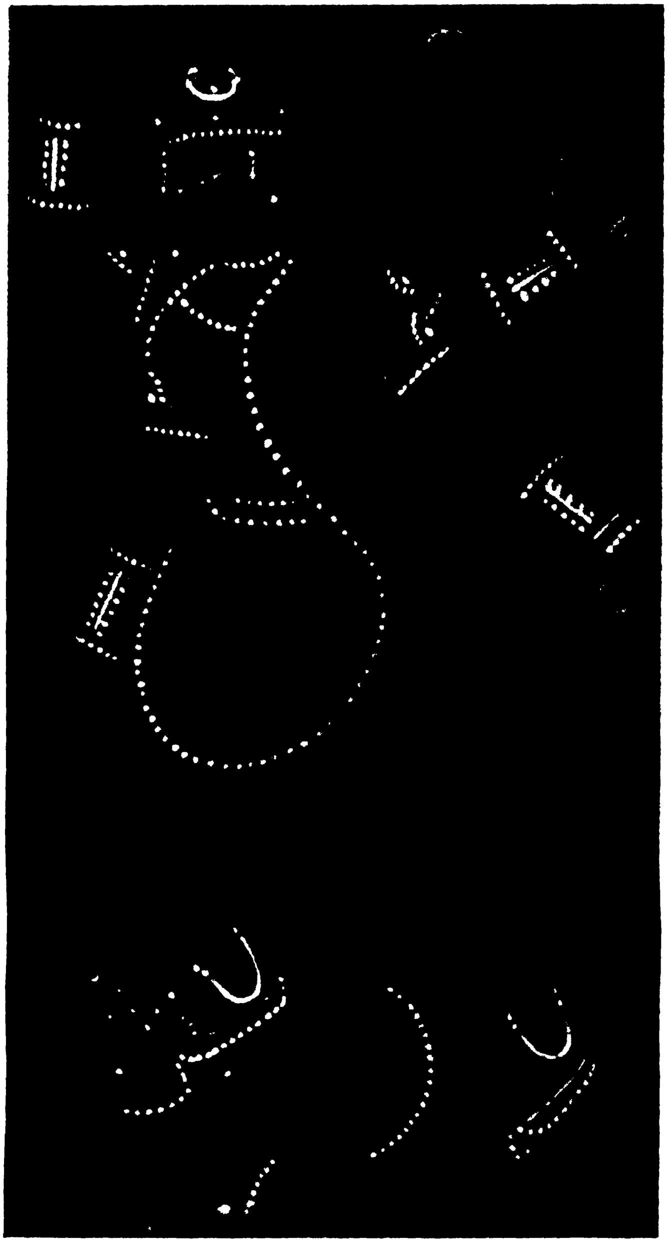
পরলোকগত নিখিলনাথ রায়

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ কাহিনী পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা নিখিলনাথ রায় মহাশয় বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর হয়েছিল। নিখিলনাথ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী একই সঙ্গে পীড়িত হন এবং নিখিলনাথের মৃত্যুর আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু ঘটে। মাত্র কয়েক মিনিটের বৈধব্য! নিখিল বাবুর মৃত্যুতে বাঙলা ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

৺যদুনাথ মজুমদার

বিগত ২৪শে অক্টোবর যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ জন-নায়ক দেশভক্ত পণ্ডিত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি সি, আই-ই মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। যদুনাথের সমস্ত জীবনটি বাঙলা দেশের, বিশেষতঃ যশোহর জেলার, সেবায় নিযুক্ত ছিল। দেশের সমস্ত জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর প্রগাঢ় যোগ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন তার কৃতী সন্তান হারালো তাতে সন্দেহ নেই। যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works



কালী

বিচিত্রা

পৌষ, ১৩৩৯

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

বিচিত্রা
ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৩৯

দুইবোন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊর্ম্মিমালা

নীরদ রিসর্চ্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হোলো। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিক সমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুট্‌লো,—স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হোলো না। কেবল এই কথাটাই বার বার করে বল্‌লে, যে, "আমি চলে যাচ্চি, এখন তোমার কর্ত্তব্য সাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।" ঊর্ম্মি বল্‌লে, "কোনো ভয় করবেন না।" নীরদ বল্‌লে,—"কি রকম ভাবে চল্‌তে হবে, পড়াশুনো করতে হবে তার একটা বিস্তারিত নোট দিয়ে যাচ্চি।"

ঊর্ম্মি বল্‌লে, "আমি ঠিক সেই অনুসারেই চল্‌বো।"

"তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।"

"নিয়ে যান" বলে ঊর্ম্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেমে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্ত্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বল্‌তে হোলো, "আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে তা হলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্ব্বল হয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না, আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ে ও-রকম উৎসাহ ও-রকম বুদ্ধি কম বাঙালীর মধ্যেই দেখেচি। ওঁর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলচি ওঁর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।"

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠ্‌ল এবং যে সব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ভাবনার কথা নীরদ

চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক্, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো উর্ম্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। উর্ম্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

উর্ম্মি বল্‌লে, "আপনি কেন এত বেশি উদ্বিগ্ন হচ্চেন?"

"কেন হচ্চি শুন্‌বে? রাগ করবে না?"

"সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েচি। জানি সহজ নয় তবু সহ্য করতে পারি।"

"তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে এ আমি লক্ষ্য করে দেখেচি। তাঁর মনটা একেবারে হাল্কা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কিনা বল?"

উর্ম্মি ভাবে, লোকটা সর্ব্বজ্ঞ না কি? ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে উর্ম্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের সাড়ি।

উর্ম্মি বল্‌লে, "হাঁ, আমার ভালো লাগে, সে কথা সত্যি।" নীরদ বল্‌লে, "শর্ম্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্যকর্ম্ম, কখনো কর্ত্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারি প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেইদিনই ওঁর যেন মুখোষ খসে পড়ে, তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেধে যায়, চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আলমারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার সখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।"

উর্ম্মিকে মনে মনে মানতেই হোলো যে শশাঙ্কদা এই রকম দৌরাত্ম্য করেন বলেই তাঁকে ওর এত ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বল্‌লে, "যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশ্রয় না পায় সেখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকতনা, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষে করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা এ আমার দ্বারা কখনোই হতে পারতনা।"

উর্ম্মি মাথা নীচু করে বল্‌লে, "আপনার কথা আমি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখব।"

নীরদ বল্‌লে, "আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্চি। তার যে সব চ্যাপ্টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগ্‌বে।"

উর্ম্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলি সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।

নীরদের দাগ দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজান পথে।

নীরদ চলে গেলে উর্ম্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে সুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বদ্ধ করে রাখে। সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার করে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায় তবু হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার দূরবর্ত্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলি ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদলের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয়নি কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন মনে গান গাইত গুন্ গুন্ করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হলে বাজাত সেতার। আজকাল এক একদিন সন্ধ্যেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরচে এমন কোনোদিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যেদিনকে যেমানুষকে পূর্ব্বে সে কখনই বিশেষভাবে আমল দেয় নি। এমন কি, সে মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্চে। প্রজাপতির ক্ষণিক হাল্‌কা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে তজই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেচে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে। মনে মনে কেবলি জপ করে, কি প্রতিভা, কি তপস্যা, কি নির্ম্মল চরিত্র, কি আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য।

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে উর্ম্মির বিবাহের সম্বন্ধ হোলে শশাঙ্ক এবং সন্মিলনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট। ওর আইডিয়ালিজম যে গোপনে ডিম পাড়চে উর্ম্মির টাকার থলির মধ্যে, এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস্ করেছে বই কি, কিন্তু যে-দেবতার কাছে, তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি

শ্বশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তারপরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জ্জমা করবেন শ্বশুরের চেক-বইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এই রকম কথাবার্ত্তা অপরিহার্য্য। ঊর্ম্মিকে বল্‌লে, আমার বিয়ে করার একটা সর্ত্ত আছে; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জ্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে। শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হোলো না। সেজন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতেও হোলো। রাজারামবাবুকে জানিয়েছিল, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে আপনি যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাঁসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।

এই একান্ত নিস্পৃহতা দেখে ওর পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হোলো, আর ঊর্ম্মি খুব গর্ব্ব অনুভব করলে। এই গর্ব্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্ম্মিলার মন নীরদের পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। বল্‌লে, "ঈস্, দেখব দেমাক কতদিন টেঁকে!" তারপর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমতো অত্যন্ত গভীর-ভাবে কথা কইত শর্ম্মিলা আলাপের মাঝখানে উঠে পড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছুদূর পর্য্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। ঊর্ম্মির খাতিরে কিছু বলত না কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট ভাব-প্রকাশক ছিল।

প্রথম প্রথম নীরদ প্রতিমেলে চিঠিপত্রে চারপাঁচ পাতা ধরে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেচে। কিছুদিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরী দাবী, অধ্যয়নের প্রয়োজনে। যে গর্ব্ব এতদিন ঊর্ম্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগ্‌ল বটে কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলে। যতদিন যায়, এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে, ততই ঊর্ম্মির পূর্ব্ব স্বভাবটা কর্ত্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানাছলে ফাঁকিও দেয় অনুতাপও করে। এই রকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনাজনক।

ঊর্ম্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসঙ্কোচে বলে, "কাকাবাবু, টাকাটা—"

ম্যানেজারবাবু বলেন, "ধাঁধা লাগচে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ওপক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।" ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

ঊর্ম্মি বলে, "কিন্তু বিদেশে—" কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, "এদেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদ্‌লে যেতে পারে সে জানি—কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কি করে?"

ঊর্ম্মি বললে, "টাকাটা না [illegible] বিপদে পড়তে পারেন।"

"আচ্ছা বেশ পাঠাচ্চি মা, তুমি বেশি ভেবো না। বলে রাখচি এই সুরু হোলো কিন্তু এই শেষ নয়।"

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হোলো। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বল্‌লেন "শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।"

ঊর্ম্মি শশব্যস্ত হয়ে বল্‌লে, "আর যাই করো দিদিরা এখবরটা যেন না পান।"

"একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগ্‌চে না।"

"একদিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।"

"পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।"

"কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথাতো ভাবতে হবে।"

"অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারচিনে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেজের ব্যবস্থা করে পাঠানো যাক।"

ফেরবার প্রস্তাবে ঊর্ম্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বল্‌লেন, "এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্চি কিন্তু মনে হচ্চে এতে ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।"

রাধাগোবিন্দ ঊর্ম্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাকার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজ্‌ল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগ্‌ল, "দিদিকে হয়তো বল্‌তে হবে।" এদিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বারবার প্রশ্ন করচে, "যথোচিত দুঃখ হচ্চে না কেন?"

এই সময়ে শর্ম্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়। নানাডাক্তার লাগ্‌লো নানাদিক থেকে ব্যাধির আবাস-গুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্ম্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বল্‌লে "সি, আই, ডিদের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বল্‌লে, "দেহটার খানাতল্লাসি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।"

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গারধারে পাটকলে, আর একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারদের নতুন বাগানবাড়ীতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিনমাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলেরও কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসুৎ ছিল না। শর্ম্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয় অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এতদিন ওদের বিবাহ হয়েচে কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্ম্মিলার হয়নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো বিশেষ করে ভাবতে হয়েচে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্বেগে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করচে ওর মন। কাজ কামাই করে' ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ। তখনি শর্ম্মিলা উত্তর দেয়, "তুমি মিথ্যে ভেবোনা, আমি ভালোই আছি।" সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বল্‌লে, "ঢেঙ্কানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যতশীঘ্র পারি ফিরে আসব ডাক্তার আসবার আগেই।"

শর্ম্মিলা অনুযোগ করে বল্‌লে, "আমার মাথার দিব্যি রইল তাড়াতাড়ি করে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারচি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।"

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য্য গড়ে তোলবার সঙ্কল্প দিনরাত জাগচে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্য্যে নয়, বড়ত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ জিনিষটাকে তুচ্ছ বলে' অবজ্ঞা করা চলে তখনি, যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনি সর্ব্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার বড়ত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্ত্তি। শর্ম্মিলার শিয়রে বসে শশাঙ্কর মনে যখন উদ্বেগ চল্‌চে সেই মুহূর্ত্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটচে কোন্‌খানে। শর্ম্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্দ্ধে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্ম্মিলা গৌরবান্বিত। তাই স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হলেও ভালোই লাগে না। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এদিকে নিজের কর্ত্তব্য নিয়ে শর্ম্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুরচাকররা কী কাণ্ড করচে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্চে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরমজল দিতে ভুলেচে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দ্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়চে না। ওদিকে ধোবারবাড়ির কাপড় ফর্দ্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কি রকম উলটপালট হয় সে তো জানা আছে। থাক্‌তে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না, একী হোলো।

অবশেষে ঊর্ম্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বল্‌লে, "কিছুদিন তোর কলেজ থাক্‌, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর্ বোন্। নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পার্‌চিনে।"

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়চেন এই জায়গাটাতে এসে মুচ্‌কে হেসে বল্‌বেন, বুঝেচি। বুঝতে অত্যন্ত বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তা-ই ঘটে, আর তা-ই যথেষ্ট। এমনো মনে করবার হেতু নেই গ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন করে,' শর্ম্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

দিদির সেবা করতে চলেচি বলে ঊর্ম্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হোলো। এই কর্ত্তব্যের খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখ্‌তেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবী-কালের ডাক্তারী কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেচে।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এই জন্যে স্থির করলে দিদির রোগসম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম্, এস্, সি পরীক্ষার একটা বিষয় শারীরতত্ত্ব, এই জন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ দিদির সেবার উপলক্ষ্যে ওর কর্ত্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে নিয়ে ওর পড়বার বই ও খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলো। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্বসম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

ঊর্ম্মি ভাবলে, সে শাসনকর্ত্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বল্‌লে, "ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চল্‌তে হবে আমি তোমাকে বলে রাখচি।"

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, "তাইতো, হঠাৎ এত গম্ভীর হতে শিখ্‌লি কার কাছে? নতুন দীক্ষা বলেই এত বেশি উৎসাহ। আমারই কথা মেনে চলবি বলেই তোকে আমি ডেকেচি। তোর হাঁসপাতাল তো এখনো তৈরি হয়নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক্।"

রোগশয্যার কাছ থেকে ঊর্ম্মিকে জোর করেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটচে, আশু তার প্রতি-বিধান চাই। এ সংসারের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করচেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটোবড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্ব্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্ম্মণ্য এই সংস্কার কোনোমতেই শর্ম্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায় অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েচে অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েচে বাইরে ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থৈ থৈ করচে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্ম্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোণাটাতে প্রতিদিন জলেস্থলে একটা পঙ্কিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধাকে জটিল করে তুল্‌তেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা ষ্টোভ বানিয়ে বসল। তার এদিকে দরজা, ওদিকে দরজা, এদিকে একটা চোঙ ওদিকে আরেকটা, একদিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর একদিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপাতন—তারপরে

সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ করবার জল গরমের নানা আকারের খোপখাপ গুহাগহ্বর কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গীতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্ভাবরক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা। বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্চে, মুখে ওদের মতে সায় দেওয়া এবং কাজে নিজের মতে চলা। এই স্বামীপালনের দায় এতদিন আনন্দে বহন করে এসেচে শর্ম্মিলা।

এতকাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জ্জিত করে শশাঙ্কের জগৎকে শর্ম্মিলা কল্পনাই করতে পারেনা। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝিবা। এমন কি ওর আশঙ্কা যে মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্ম্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে উর্ম্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম্ম চালিয়ে নিচ্চে। সে কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কি রকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই উর্ম্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর কোওয়াগুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার একপাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয় তখন শর্ম্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্ব্বদাই কাজের ফরমাস করচে,—

ওর সিগারেট কেসটা ভরে দেনা উর্ম্মি;

দেখচিসনে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই;

ঐ দেখ্, জুতোটা সিমেণ্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েচে; বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁস নেই;

বালিশের ওয়াড়গুলো বদ্‌লে দেনা ভাই;

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে;

একবার আপিসঘরটা দেখে আসিস্ তো উর্ম্মি, আমি নিশ্চয় বলচি, ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন;

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হোলো মনে থাকে যেন;

মালীকে বলিস্ গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে;

ঐ দেখ্ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে;—এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না—উর্ম্মি, দে তো বোন, বুরুষ ক'রে।

উর্ম্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগচে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকচে। এই সংসারের

কর্ম্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্বেগ আছে সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই; সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর কাছে এই কাজগুলো খেলা, একরকম ছুটি, উদ্দেশ্য বিবর্জ্জিত উদ্যোগ। ও যেখানে এতদিন ছিল, এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ, এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জ্জনী তুলে নেই, অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহী নেই। যদি বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে, শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়, যেন উর্ম্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য্য চলে গেছে, ভুল চুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আল্‌গা অবস্থা ঘটেচে; এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্চে যেন পিক্‌নিক্ চল্‌চে। আর উর্ম্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্ম্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই, এমন কি, না হলেও বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে উর্ম্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখা গেল কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেকদিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেচে, সেই অভাবটা ঠিক যে কি তা নির্দ্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত উর্ম্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিনরাত্রিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্ম্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপরপক্ষে শশাঙ্ক উর্ম্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই উর্ম্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই উর্ম্মি পায়নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুসি করতে পারে এই তথ্যটি অনেকদিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়াপরা অভ্যাসমতো চল্‌চে কি না, ঠিকসময়ে ঠিক জিনিষের জোগান্ হোলো কি হোলো না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েচে আজ; অম্‌নিতেই অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্ম্মিলাকে সে বলে, "তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্চ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো অসুবিধে হয় না, সে তো ভালোই লাগে।"

শশাঙ্কর মনটা এখন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থমথমে হয়ে এসেচে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুস্কিল হবে লোকসান হবে এমনতরো উদ্বেগের কথা সদাসর্ব্বদা শোনা যায় না। সে রকম কিছু প্রকাশ হলে উর্ম্মি তার গাম্ভীর্য্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে,—

মুখের ভাবখানা দেখে বলে,—"আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি; সেই সবুজ পাগড়িপরা কোন্ দেশী দালাল—ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি?"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি তাকে জানলে কি করে?" "আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল। আমিই তাকে নানা কথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তার বাড়ি বিকানীয়রে, তার স্ত্রী মরেছে মশারীতে আগুন লেগে, আর একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।"

"তা হলে এখন থেকে হিসেব করে সে রোজ আসবে যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। যতদিন স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জম্‌বে।"

"আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।"

আজকাল শশাঙ্কর মুনফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এতকাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্ম্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্য্যন্ত যেতে হোলো, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিউ মার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্ম্মিলা মাঝে মাঝে মাছ মাংস ফলমূল শাক সব্‌জি কিন্‌তে সেখানে যেত। সে জানত এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করেনি ইচ্ছেও করেনি। কিন্তু ঊর্ম্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিষপত্র উল্‌টে পাল্‌টে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কর কাজের দরদ ঊর্ম্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কর কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। একদিকে ঊর্ম্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার অন্যদিকে অপরিহার্য্য কাজের তাড়া। তাই সঙ্কটে পড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ণ পেরলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ দেরি করে সেদিন ঊর্ম্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে। এই রুদ্ধ অশ্রুতে কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালো মানুষটির মতো বলে, "ঊর্ম্মি, কথা কইবে না এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, খেল্‌বে না এমন পণ তো ছিল না।" তারপরে টেনিস ব্যাট হাতে করে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই হারে। নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো একটা ছুটির দিনে বিকেলবেলায় শশাঙ্ক যখন ডানহাতে লাল নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উসকো খুসকো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে কোনো একটা

দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েচে, ঊর্ম্মি এসে বলে, "তোমার সেই দালালের সঙ্গে ঠিক করেচি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে। লক্ষ্মীটি!"

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।"

কাজের গুরুত্বে ঊর্ম্মি একটুও ভয় পায় না। বলে, "অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ পাগড়িধারীর হাতে সমর্পণ করে দিতে সঙ্কোচ নেই এই বুঝি তোমার শিভল্‌রি!"

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এই রকম উৎপাত চল্‌চে টের পেলে শর্ম্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা ওর মতে পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জ্জনীয় নয়। ঊর্ম্মিকে শর্ম্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেচে। আজো সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিস ঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই ঊর্ম্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ঊর্ম্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইসারা করে, ভাবখানা এই যে, "চলে এসো, আপিস ঘরে বসে তোমাকে পোকার্ খেলা শেখাব।" এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্রায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় ঊর্ম্মির মনে বেদনা লাগ্‌চে এটা তাকে যেন ঊর্ম্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয়, এমন কি, ঈষৎ তিরস্কার করে' কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত কিন্তু শর্ম্মিলা যে এই নিয়ে ঊর্ম্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্ম্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার এমন করে শুনলে চলবে কেন? সময় নেই, অসময় নেই তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধূলো না পেলে বাঁচবে কেন?"

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষী। ওদিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে, বুঝিয়ে দাও। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুসি হয়ে উঠে ওকে প্রব্লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট কোম্পানীর ষ্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে, আমিও যাব। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না। লাইন টানা আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেচে। ঊর্ম্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুতবেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এই খানটাতে শর্ম্মিলাকে রীতিমতো ধাক্কা দেয়। ঊর্ম্মির ছেলেমানুষীও সে বোঝে, তার গৃহিণী-পনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য্য

বলে মেনে নিয়েছিল সেখানে ঊর্ম্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্দ্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঊর্ম্মি, তোর কি ঐ সব আঁকাজোখা আঁককষা ট্রেস করা সত্যিই ভালো লাগে।"

"আমার ভারি ভালো লাগে দিদি।"

শর্ম্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বল্‌লে, "হাঁঃ, ভালো লাগে! ওকে খুসী করার জন্যেই দেখাস্‌ যেন ভালো লাগে।"

না হয় তাই হোলো। খাওয়ানো পরানো সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুসি করাটা তো শর্ম্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুসিটা ওর নিজের খুসির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বারবার ডেকে বলে, "ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করো কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ সব কী বুঝ্‌বে!"

শশাঙ্ক বলে, "আমার চেয়ে কম বোঝে না।"

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হোলো। নির্ব্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল, তখন শর্ম্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব্ব বোধ করত। তাই ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবী অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্ম্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নীচু হয়ে যায়। কেননা মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্য্যে ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্য্যেই সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সেকালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোতো। রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্ম্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্য সাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে অদৃশ্যে নেপথ্যে।

হায়রে, আজ ওর স্বামীর এ কি পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়চে। রোগশয্যা থেকে সব ও দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে সে যেন সর্ব্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই কদিনেই এত বড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্ম্ম-কঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে! আজ স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্ম্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজচে।

শশাঙ্কের আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্চে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর, সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্ত্তমান। তার কৈফিয়ৎ মেলে,

কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎকে এ সংসার এতদিন আমল দেয়নি। এ সব অনবধানতা ছিল অমার্জ্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য ; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এত বড়ো যুগান্তর ঘটেচে যে গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেব কাকে ? দিদির নির্দ্দেশমতো উর্ম্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক ঠাকরুণের পূর্ব্বজীবনের বিবরণগুলির পর্য্যালোচনাও চলচে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে,—"ও সব এখন থাক।"

"কেন, কী করতে হবে ?"

"আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

এত বড়ো প্রলোভনে কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিতে উর্ম্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্ম্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্দ্ধানে আহার্য্যের উৎকর্ষ সাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলঙ্কৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে, যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্চে, আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েচে খুসি।

এইদিক থেকে শর্ম্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এপাশ ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বারবার করে বল্‌চে, "মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম ; আর সবই করেচি, কেবল খুসি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম উর্ম্মিলার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে।" জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসচে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। উর্ম্মি তখন শশাঙ্কর সঙ্গে পিং পং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বল্‌লে, "উর্ম্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

উর্ম্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েচে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বল্‌লে, "ও সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি—

"আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসচি।"

দিদি ছুটি দিলে, সেই সঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বল্‌লে, "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডাজলের পটি।"

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

খড়দহ

কল্যাণীয়াসু—

অবাধ সন্তান-জননের যে দুঃখ দৈন্য অপমান কত, আমাদের চারদিকেই তা দেখ্‌তে পাই, প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে বেশি গবেষণার দরকার করে না। আমাদের মতো দেশে, যেখানে জীবিকার অন্ন নিতান্তই পরিমিত, সেখানে জীবিতের অতৃপ্ত ক্ষুধার দাবীর পরিমাণ থাক্‌বে না, এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর নেই। উপদেষ্টারা সংযমের পরামর্শ দেন, প্রত্যক্ষ দুঃখেও যাদের শিক্ষা দিতে পারে না, মুখের উপদেশে তাদের কী কর্‌তে পারে? এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্য শান্তি আত্মসম্মানের প্রতি অনেক সময়ে কি রকম অসহ্য পীড়ন করা হয়, তার বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁদের গ্রন্থে।

এই তো গেল ব্যক্তিগত জীবনের কথা, রাষ্ট্র-জাতিগত জীবনের সমস্যা আরো বড়ো, এই প্রসঙ্গে তাও আলোচ্য। আজকের দিনে পৃথিবীতে যত অশান্তি, যত যুদ্ধ, পররাষ্ট্রের প্রতি যত অন্যায়, তার মূল কারণ অতিপ্রজন। জাপান মারামারি করে' চীনের অধিকার থেকে ম্যাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিচ্চে। অন্যায়, সন্দেহ নেই, কিন্তু জাপানই বা করে কি? তার দ্বীপ কয়টির মধ্যে যতটুকু অন্নের ও বসতির সংস্থান আছে, তাতে জাপানের প্রজাদের আর কুলোয় না। যে সময়ে ইংলণ্ডের বহিঃসাম্রাজ্য ছিল না, তার তুলনায় এখন তার অন্নের প্রয়োজন প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে। ন্যায়ের দোহাই দিয়ে হাঁক পাড়চি যে, ভারতবর্ষ ছাড়ো, কিন্তু পেটের দোহাই তার চেয়ে প্রবল। এক সময়ে ভারতবর্ষ যে অন্নবস্ত্র উৎপাদন করেছে তাতে তার স্বচ্ছন্দ ভাবে চলে গেল, এখন সেদিনের চেয়ে প্রজাবৃদ্ধি অনেক বেশি হয়েছে; সুতরাং সেদিনকার হিসাব এখন আর খাটে না। দুর্ভিক্ষের দ্বারা অনশনের দ্বারা প্রজাক্ষয় হয়ে সাম্যরক্ষা হবে, একথা বলে নিশ্চেষ্ট থাকা কি মানুষের মতো জীবের কর্ত্তব্য? জন্ম দেবার দুঃখ, পালন করবার দুঃখকে কি অবসান কর্‌তে হবে অনশন অনারোগ্য অনাদর অপমানের মৃত্যুতে?

অপর পক্ষেও বল্‌বার কথা আছে, কিন্তু এখন সে আলোচনা নিষ্ফল। যে কালে বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত ও সহজলব্ধ হয় নি, সে কালে সকল দুঃখের উপরেও মানুষের প্রবৃত্তি প্রজাজননে

সহায়তা করেছে। এখন যদি উপায় আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তবে মানুষ সহজেই আপন ইচ্ছার কর্ত্তৃত্বের দ্বারাই প্রজাজনন নিয়ন্ত্রিত করবে। তাতে সংসারে যা কিছু পরিবর্ত্তন আনবে তা অনিবার্য্য। আমরা শুভবুদ্ধির দোহাই দিই; সেই শুভবুদ্ধিকে তো নির্ব্বাসন দিতে কেউ বলচে না। অর্থাৎ সন্তানজনন যখন প্রবৃত্তির অধীন ছিল, তখনও শুভবুদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, সন্তানজনন যখন ইচ্ছাধীন হবে তখনো সেই শুভবুদ্ধির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে একথা কেউ বলবে না। সকল অবস্থাতেই মানুষের বিচারবুদ্ধিই হবে শেষ নিয়ামক। সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-সংস্থানকে মানুষ আজ গড়েচে, অবস্থার পরিবর্ত্তন হলে তদনুসারে কালও গড়বে। ইতি ২রা নবেম্বর, ১৯৩২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী নীলিমা দাসকে লিখিত পত্র

শিলাইদা, নদিয়া।

কল্যাণবরেষু,

আজকাল আমার সময়ের এত অভাব যে তোদের চিঠির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তুই যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস্ বিস্তারিত করে না লিখ্‌লে তার ঠিক উত্তর দেওয়াই যায় না। এখন সে চেষ্টা করতে পারব না।

মোটামুটি এইটুকু তোকে বলে রাখ্‌ছি যে, পুরানো বিশ্বাসগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাক্‌লে কিম্বা নির্ব্বিচারে অন্ধভাবে স্থূলবস্তুকে অবলম্বন করে পূজার্চ্চনা করে গেলে তাতে যে কোনই লাভ নেই তা বলতে পারিনে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব ত একটা সঙ্কীর্ণ পদার্থ নয়। কেবল নিষ্ঠা করে পূজা করে গেলেই ত মানুষের সকল দিকের পূর্ণতা হয় না। শিশু ধূলোবালি নিয়ে খেলা করে, কেউ বলে না এতে সে আনন্দ পায় না, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের বিবিধ কাজকর্ম্ম ও ভাবনাচিন্তায় সেই আনন্দ নেই কিন্তু তাই বলে কেউ বলে না মানুষ চিরদিন মৃত্যু পর্য্যন্ত খোকা হয়ে থাক্‌লেই তারপক্ষে সবচেয়ে ভাল হয়। মানুষের ভিতরে যে বিচিত্র শক্তি আছে তাকে বিচিত্রভাবে পূর্ণ করে তুলতে হবেই, অতএব শিশুর সাদাসিধে ছেলে খেলায় মানুষের চিরকাল চলবে না। এই খেলা ভেঙ্গে দিয়ে তাকে দুঃখকষ্ট ভাবনাচিন্তা সমস্তই নিতে হবে—এমন কোন আরামকে সে বরণ করতে পারবে না যাতে নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্মকে খর্ব্ব করে নিজেকে সকল দিকে অপরিণত করে কেবলমাত্র সরল বিশ্বাসটি নিয়ে সে দিন কাটাতে পারে। মূঢ়তার মধ্যে একদিকে যত সুবিধা থাক্, অন্ধভক্তির মধ্যে একদিকে যত আরাম থাক্, তবু সেই মোহজালের মধ্যে জড়িয়ে থাক্‌লে অন্তরে বাহিরে আমাদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাক্‌বে না। সেই দুর্গতি চারদিকেই দেখা যাচ্ছে—আমাদের জড়তা, ভীরুতা, অকর্ম্মণ্যতার অবধি নেই—এমনি বিচ্ছিন্নতায়

আমরা পদে পদে বিভক্ত যে কোন মতেই কোন কাজেই আমরা একত্র হতে পারচি নে—সকল অনুষ্ঠানই পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে—হাজার রকমের অদ্ভুত অসঙ্গত মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে দুর্ব্বলতার শেষতলায় এসে ঠেকেছি, এখন কি হিসাব নিকাশের দিনে কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই খুসী থাক্‌বি যে আমাদের দেশের কোন স্ত্রীলোক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বিল্বগঙ্গাজলে শিবের পূজা করে থাকে ? এই কি আমাদের সমস্ত সম্পদ ? অন্যদিকে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তার পূরণ কি এইটুকুতেই হয়ে যাবে ? সমস্ত মনুষ্যত্বকে যে সব দিক দিয়েই জাগাতে হবে—শুধু কেবল গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলো নিয়ে অহোরাত্র খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়ে মালা ঘুরিয়ে বেলা কাটিয়ে দিলেই ত আমরা রক্ষা পাব না ! তুমি জিজ্ঞাসা করেছ এ সমস্তের কি কোনো মূল্যই নেই, থাক্‌তে পারে কিন্তু সে মূল্যে বড় জোর চিতার কাঠ কিন্‌তে পারবে বেঁচে থাক্‌বার সম্বল তাতে জুটবে না। ইতি ১৪ই ফাল্গুন, ১৩১৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



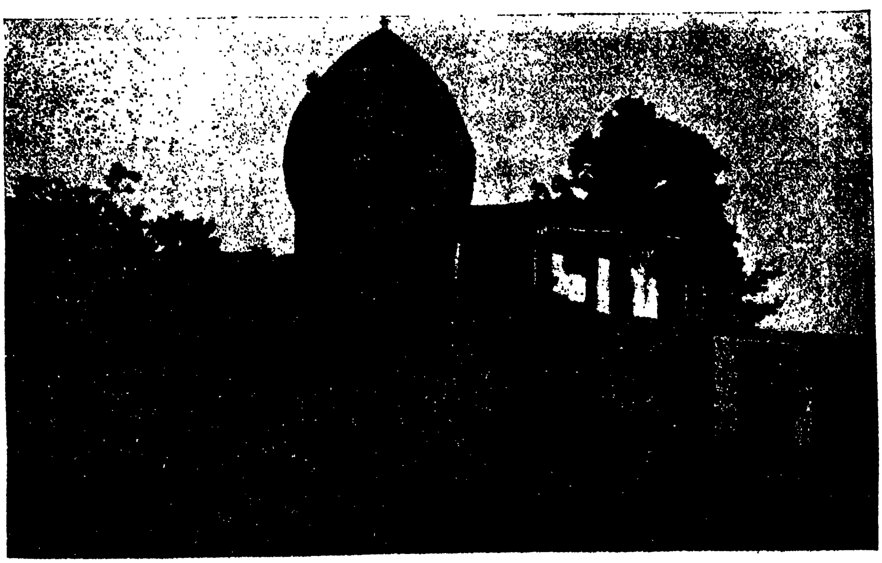
পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ এপ্রেল। ইস্ফাহান থেকে যাত্রা করা গেল তেহেরানের দিকে। নগরের বাহিরেও অনেকদূর পর্য্যন্ত সবুজ ক্ষেত, গাছপালা ও জলের ধারা। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোথাও বা তারা পরিত্যক্ত। মাটির প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি জীর্ণতার নানাভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, ভিতের উপরে ছাদ নেই। এক জায়গায় এই রকম ভাঙা শূন্য গ্রামের সামনেই পথের ধারে পড়ে আছে উটের কঙ্কাল। ঐ ভাঙা ঘরগুলো, আর ঐ প্রাণীটার বুকের পাঁজর একই কথা বলচে। প্রাণের ভারবাহী যে সব বাহন প্রাণহীন কিছুদিন তারাই থাকে বোবার মতো পড়ে, আর প্রাণ যায় চলে। এখানকার মাটির ঘর যেন মাটির তাঁবু,—উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা, তারপরে তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি, এই তো ভালো। গড়ে তোলাও সহজ, ফেলে যাওয়াও তাই। বাসার সঙ্গে নিজেকে ও অপরিচিত আগামী-কালকে বেঁধে রাখবার বিড়ম্বনা নেই। মানুষের কেবল যদি



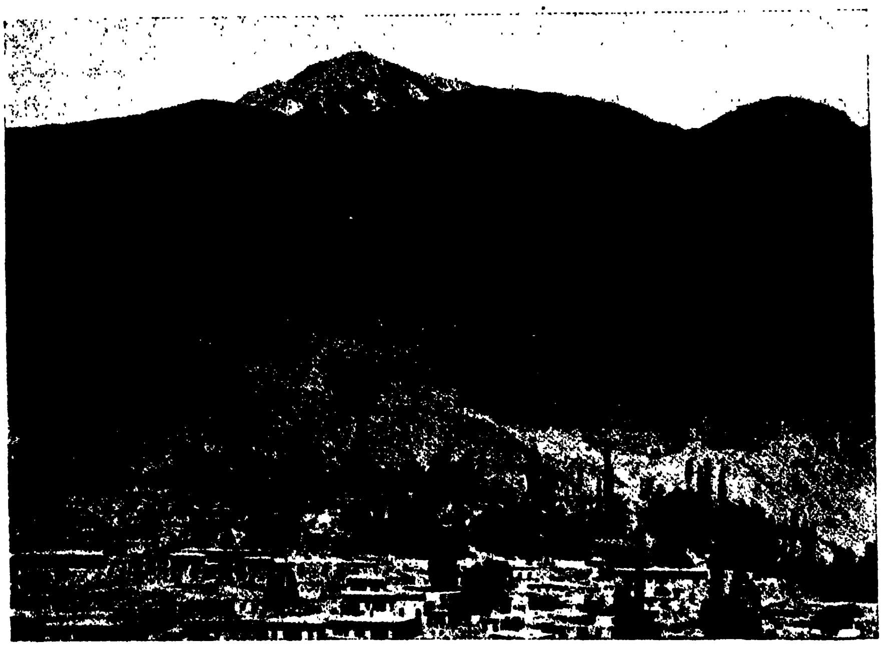
পারস্যের গিরিবর্ত্ম



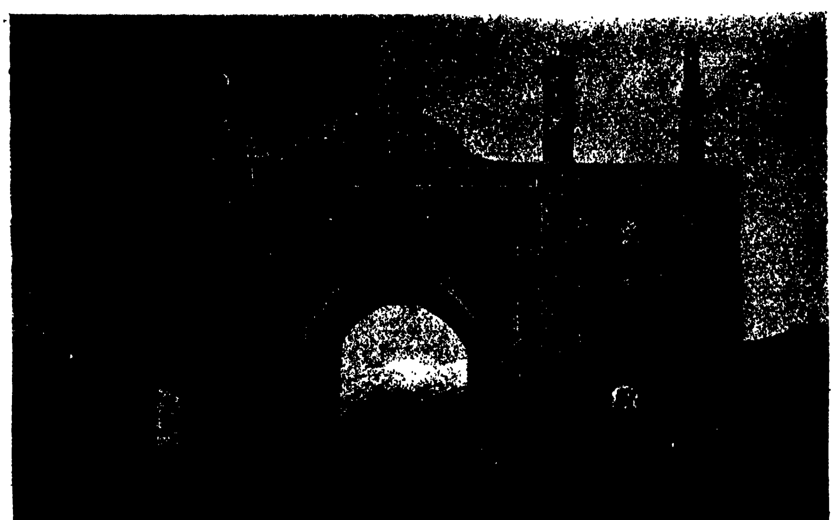
তেহেরানের পথে প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ

একটা মাত্র দেহ থাকত বংশানুক্রমে সকলের জন্তে, খুব মজবুত চতুর্দ্দন্ত হাতির হাড় আর গণ্ডারের সাতপুরু চামড়া দিয়ে খুব পাকা করে তৈরি, চোদ্দ পুরুষের একটা সরকারী দেহ, যেটা অনেকজনের পক্ষে মোটামুটিভাবে উপযোগী কিন্তু কোনো একজনের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে উপযুক্ত নয় নিশ্চয় সেই দেহ-দুর্গটা প্রাণপুরুষের পছন্দসই হোত না। আপন বসতবাড়িকে বংশানুক্রমে পাকা করে তোলবার চেষ্টা প্রাণধর্ম্মের বিরুদ্ধ। পুরানো বাড়ি আপন যুগ পেরতে না পেরতে পোড়ো বাড়ি হতে বাধ্য। পিতৃপুরুষের অপ-ব্যয়কে উপেক্ষা করে নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাসা করে। আশ্চর্য্য এই যে, সেও ভাবী ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি করবার জন্তে দশপুরুষের মাপে অচল ভিৎ বানাতে থাকে। অর্থাৎ মরে গিয়েও সে ভাবী কালকে জুড়ে আপন বাসায় বাস করবে এই কল্পনাতেই মুগ্ধ। আমার মনে হয়, যে সব ইমারৎ ব্যক্তিগত ব্যব-হারের জন্তে নয়, স্থায়িত্ব-কামী স্থাপত্য তাদেরই সাজে।

কিছুদূরে গিয়ে আবার সেই শূন্য শুষ্ক ধরণী, গেরুয়া চাদরে ঢাকা তার নিরলঙ্কৃত নিরাসক্তি। মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছলুম দেলিজান-এ। ইস্ফাহানের গবর্ণর এখানে তাঁবু



তেহেরানের নিকট হইতে প্রসিদ্ধ গিরিশিখর দেমাভেন্দ্



তেহেরানে প্রবেশের একটি তোরণ

ফেলে আমাদের জন্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। এই তাঁবুতে আমাদের আহার হোলো। কুমসহর এখান থেকে আরো কতকটা দূরে। তার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় স্বর্ণমণ্ডিত তার বিখ্যাত মসজিদের চূড়া।



তেহেরান—অদূরে এল্‌বুর্জ্‌ পাহাড়ের শ্রেণী

বেলা পাঁচটার সময় গাড়ি পৌঁছল তেহেরানের কাছকাছি। সুরু হোলো তার আদ্য পরিচয়। নগর প্রবেশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগের শৃঙ্গধ্বনিমুখর নকিবের মতো দেখা গেল একটা কারখানা ঘর,—এটা চিনির কারখানা। এরি সংলগ্ন বাড়িতে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনার জন্য নাবালেন। ক্লান্তদেহের খাতিরে দ্রুত ছুটি নিতে হোলো। তারপরে তেহেরানের পৌরজনদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্তে একটি বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করলেম। এখানকার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সভাপতি। এখানে চা খেয়ে স্বাগত সম্ভাষণের অনুষ্ঠান যখন শেষ হোলো সভাপতি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বৃহৎ বাগান বাড়িতে। নানা বর্ণ ফুলে খচিত তার তৃণ আস্তরণ। গোলাপের গন্ধমাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত তার বাতাস, মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ফোয়ারা এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুশ্রেণীর বিচিত্র সমাবেশ। যিনি আমাদের জন্তে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেছেন তাঁকে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব এমন সুযোগ পাইনি। তাঁরি একজন আত্মীয় আগা আসাদি আমাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। সেই নূয়র্কের কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, আমার সমস্ত ইংরেজি রচনার সঙ্গে সুপরিচিত। অভ্যাগত-বর্গের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সেতুস্বরূপ ছিলেন ইনি।

কয়েকদিন হোলো ইরাকের রাজা ফইসল এখানে এসেছেন।



তেহেরানের দৃশ্য

তাঁকে নিয়ে এখানকার সচিবেরা অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ অপরাহ্ণের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন বসে আছি ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজা বলে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা

করেন। আমি তাঁদের জানালেম, ভারতবর্ষে ফেরবার পথে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।

...রের সময় ...লোক এলেন, ...র কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সঙ্গীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন আমাদের ভৈরোঁ। রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাৎ নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ কিন্তু ব্যবসাদার নন। ব্যবসাদারীতে নৈপুণ্য বাড়ে কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়, ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্য্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার



তেহেরানে প্রাচীন সম্রাটের প্রাসাদ। বর্ত্তমান শা স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন



পাহ্লবী রাজ-পথ, তেহেরান

দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে মেতে ওঠে; তা হলে সেই আতিশয্যে



পারস্য সম্রাটবংশের ছুটি যুবক

বস্তু-গৌরব বাড়ে, রূপ-গৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সঙ্গীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেকস্থলেই সামান্য একটু আধটু হেরফের করা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাঘরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্দ্ধা তাকে মানায় না। এ রকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেচেন সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগ-রাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা,— সঙ্গীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইঁট কাঠ চুণ সুরকিকে কণ্ঠ কামানের মুখে সগর্জ্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্য্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে উভয়ের মধ্যে যদি বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুসি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্ত্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্ত্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালোলাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেষণকর্ত্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের, তা হোক গে, তবু সেই লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।



পারস্যের বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী

ইতিমধ্যে একজন সেকেলে ওস্তাদ এসে আমাকে বাজনা শুনিয়ে গেছেন তার থেকে বুঝলুম এখানেও গানের পথে সন্ধ্যা হয় এবং বাঘের ভয় ঘটে। এখানেও যে খুসি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।

আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হোলো। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বল্লেই হয়। রাজার গায়ে খাকীরঙের সৈনিক পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিন মাত্র হোলো অতি দ্রুত হস্তে পারস্যরাজত্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার করে ইনি তার হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহ দ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতি সহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার, না ছিল আভিজাত্যের দাবী তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হোলো। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েচেন কিন্তু সিংহাসনের চারিদিকে আশঙ্কা উদ্বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি। সেদিন অমিয় দেখে এসেচেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্চে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।



জনাবে ফরুঘি—
H. H. the Foreign Minister of Persia



একটি প্রাচীন পারসিক চিত্র

পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে উপহারস্বরূপে আমার নিজের কতকগুলি বই রেশমের আবরণে প্রস্তুত করা ছিল। সেই সঙ্গে নিজের রচিত একটি চিত্রপটে পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জ্জমাটি লিখে দিয়েছিলুম :—

আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।

I carry in my heart a golden lamp of remembrance of an illumination that is past. I keep it bright against the tarnishing touch of time. Thine is a fire of a new magnanimous life. Allow it, my brother, to kiss my lamp with its flame.



তেহেরানের একটি মসজিদ

তোমরা জ্বেলেচ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো,
এসেচি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো॥

ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হোলো। তাঁকে বললুম :—বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বল্লেন, যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাইনি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।



তেহেরাণ মস্‌জিদের দ্বারদেশে কারুকার্য্য

আমি যখন বল্লুম, পারস্যের বর্ত্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে। তিনি বল্লেন, রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর—এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল, কেননা আমরা জাতিতে ধর্ম্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্চে শাসন ব্যবস্থাকে নির্দ্দোষ এবং সম্যক উপযোগী করে তোলা।

আমি বল্লুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো বলে



পারসিক পণ্ডিত



পারস্যে গ্রাম্য নারী
চরকা কাটিতেছে

এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই
রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ হবে।[৩]

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্য-টাই আমাদের দেশে সব প্রথম ও সব চেয়ে বেশি চাই অথচ ঐক্যের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীত ধর্ম্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আরেকজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।

কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্ম্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দ্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে?



ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সমাগত পারসিক জনসাধারণ

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আলো পাব কী উপায়ে তাকে কেউ উত্তর দেয়, চকমকি ঠুকে, কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেক্ট্রিক্ আলো জ্বেলে। সেই সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি তারা বলে দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো এইটেই হোলো পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তন্ত্র এবং আচার-



১। আগা কৈহান, ২। আগা কাকশি (পারস্যের বিখ্যাত কবি,—Foreign Minister-এর ভ্রাতা)
৩। আগা আমাদি (ইহাদের পরিবারের একটি বাগানবাড়ি রবীন্দ্রনাথের তেহেরান বাসের জন্য রক্ষিত হয়,—এইখানে তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ কাল বাস করেন।)

বিচারের কড়াকড়ি, সেখানে ধার্ম্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে সুরু করে গলাকাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উত্তম ফুরোয় নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজ্ঞাতবাস

শ্রীলীলাময় রায়

৮

দিন দশেক পরে বাদল দিশা পেল। মেঘলা রাত্রের শেষে সূর্য্য উঠ্ল না, কিন্তু মেঘের ওপারের আলো এ পারে বিচ্ছুরিত হল। চোখ ঝল্সে দেবার মত নয়, অথচ পথ দেখিয়ে দেবার মত।

বাদল উপলব্ধি করল দুটো সত্য আছে। একটা to be; অন্যটা to have। একটার কথা 'আমি আছি,' অন্যটার কথা 'আমার আছে।' প্রথমটাকে নিয়ে কোনো গোলমাল নেই, আমি আছি, আমি থাক্ব। গোলমাল দ্বিতীয়টাকে নিয়ে। আমার দেহ আছে, মন আছে, স্মৃতি আছে, চেতনা আছে। আমার নাম আছে, রূপ আছে, বংশ আছে, বংশ পরম্পরা আছে। এতগুলো কি থাক্বে? যতদূর চোখ যায় একমাত্র বংশ পরম্পরা হয়ত থাক্বে। কিন্তু বাকী সমস্ত যাবে। খ্যাতিও। এককোটী বৎসর পরে হয়ত রক্তের চিহ্নও মুছে যাবে। মানবজাতি যে নির্ব্বংশ হবে না—ডাইনোসরের মত—তার নিশ্চয়তা কই? পৃথিবীর তাপহানির সঙ্গে প্রাণীমাত্রের প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে কি না জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ধাঁধার জবাব দিচ্ছেন একো জনা একো রকম। বাদলের বিশ্বাস একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অনুকূল শীতাতপ কয়েক কোটী বছর সম্ভব হয়েছে। যদি প্রাণীদের মধ্যে এ প্রকার বুদ্ধি ও উদ্যম অভিব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর টেম্পারেচারকে তারা স্ব ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত কর্তে পারে অথবা নিজেরা এ প্রকার বিবর্ত্তিত হয় যে নিরুত্তাপ পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খেতে পারে তবে সৌরজগতে যতকাল মাধ্যাকর্ষণ থাক্বে পৃথিবীতে ততদিন প্রাণী থাক্বে। কে জানে হয়ত প্রাণ নিজের পক্ষে অনুকূল অপর কোনো গ্রহে উপনিবেশ কর্বে। ধর, সূর্য্যের তাপ যদি কালক্রমে জুড়ায় ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে ছটকে বেরিয়ে যাওয়া যদি সাধ্য হয় তবে প্রাণের জয় জয়কার।

প্রাণের প্রতি -প্রাণী সমাজের প্রতি—বাদলের মমতা থাক্লেও সে এইবার জেনেছে প্রাণই অস্তিত্বের শেষ কথা নয়, সব কথা নয়। পৃথিবী যেমন জগৎ পারাবারের একটি তরঙ্গ মাত্র প্রাণও তেমনি অস্তিত্বের মহাকাশে একটি পারাবত। একটি বিশেষ টেম্পারেচার—একটি নাতি শীতোষ্ণ কুলায়—না পেলে সেই আরাম-লালিত পক্ষিসুত পিতৃগণকে পিণ্ডদান কর্তে জীবিত থাক্ত না। অস্তিত্বের কত শত রূপ, কত সহস্র প্রকাশ। প্রাণ তাদের অন্যতম এবং বোধ করি সৌখীনতম। এই কথাটা মেনে নিতে বাদলের মন বিষম বিমুখ হয়েছে ও চিত্তবৃত্তি একান্ত পীড়াবোধ করেছে। মাথার শিরা প্রশিরা গুলো অতিরিক্ত মোচড় খাওয়া সেতারের তারের মত চিড় চিড় কর্তে কর্তে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবার মত হয়েছে। কিন্তু মেনে নিতেই হল।

বাদলের দেহ মন স্মৃতি সংজ্ঞা জীবনের সঙ্গে যাবে। অবচেতনা পর্য্যন্ত পিছনে পড়ে থাক্বে না। মস্তিষ্কের অভাবে তার মনন হবে না, এইটে সবার বড় খেদ। মৃত্যু তার মনীষা হরণ কর্বে। বাদল একবার মৃত্যুর নির্ব্বর্ণ নিস্পন্দ নিঃসীম শূন্যতা অন্তরে অনুভব করে নিল। তার শারীরক্রিয়া শুদ্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে এল। তার বোধ হল সে যেন টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে অকূল সমুদ্রে ডুব্ছে, ডুব্ছে, ডুব্ছে। যেন উপরে উঠ্বার আশা ছেড়ে দিয়ে অনিবার্য্য ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে, ধীরে, ধীরে। মন পেছিয়ে পড়ল, চেতনা কিছুদূর এগিয়ে দিল, ফুস্ফুস্ স্থগিত গতি মোটর এঞ্জিনের মত ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক করতে করতে অবশেষে—চুপ।

মৃত্যুর অনুভূতি হচ্ছে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভূতি। অতি

প্রবল উদ্যমে সবেগে নিঃশ্বাস টেনে বাদল প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হল। প্রায় মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এল বল্‌তে হবে—লাজারাসের মত। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তার লেশমাত্র বিতৃষ্ণা জাগ্‌ল না। মৃত্যু ত তার মৃত্যু নয়, beingএর মৃত্যু নয়। মৃত্যু তার সম্পত্তির মৃত্যু, havingএর মৃত্যু। মৃত্যু তার পক্ষে নির্জ্জলা অস্তিত্ব। তার সম্পত্তির পক্ষে নিছক নাস্তিত্ব।

দশটা দিন বাদলের মাথার চুলকে বাতাসের মুখে ধোনা তুলোর মত উড়িয়ে নিয়ে গেল। উটের স্বদেহে সঞ্চিত মাংস যেমন অনশনের দিনে পাকস্থলীর প্রয়োজনে অন্তর্হিত হয় বাদলের গায়ে ও গালে সমুদ্রের হাওয়ার যোগে যেটুকু মাংস লেগেছিল সেটুকু গেল মিলিয়ে। চোখের কোলে কাল দাগ ত দেখা দিলই চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথ্‌লে পড়্‌তে থাক্‌ল। মাথা ব্যথা মাঝে একদিন এসে সেই যে সাথী হল আর যাবার নাম করে না। আহারে রুচি হয় না, মিসেস মেলভিল যে খাবার দিয়ে যায় তার সিকিও বাদল মুখ দেয় না। দেখে শুনে মিসেস মেলভিল স্বামীকে কিছু বল্ল না। স্বামীর আসুরিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে সে ভয় করত। সোজা টেলিফোন কর্‌ল ভেণ্ট্‌নরের এক ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে বাদলের জিব দেখ্‌ল, দাঁত দেখ্‌ল, নাড়ী টিপ্‌ল, বুকের শব্দ শুন্‌ল, পিঠের শব্দ শুন্‌ল, টেম্পারেচার নিল, নিঃশ্বাস পরীক্ষা কর্‌ল। সব জান্তা ডাক্তার। বাদলকে জেরা কর্‌ল।

বাদল বল্ল, "আমার অসুখ আর কিছু নয়। একটা প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ।"

ডাক্তার তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে পাগলা গারদ থেকে ফেরার হয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে। বুড়ীর কানে কানে বল্ল, "কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করুন।" বাকাটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল। কি একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে বুড়ীর হাতে দিয়ে বাদলের দিকে আর একবার কটাক্ষপাত কর্‌তে কর্‌তে ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাক্তার পুঙ্গব মিসেস মেল্‌ভিল্‌কে bow করে বেরিয়ে গেলেন ও নীচে নেমে গিয়ে সশব্দে মোটর গাড়ীর দরজা বন্ধ কর্‌লেন।

বাদল ভাব্‌ল, দেহটা থেকে আপদ ত কম নয়। এই সব প্যারাসাইট্‌কে কী জোগায় কে? আমাদেরই দেহ। আমার মুখের উপর প্রকারান্তরে আমাকে পাগল বলে গেল কি দেখে? আমার দেহ। কাজেই দেহটা থাকা খুব একটা সৌভাগ্য নয়। এটা গেলেও আমি থাক্‌ব। দেহের সঙ্গে মনও যাবে। তবু আমি থাক্‌ব। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব—তার মত মুক্তি কিছুতে নেই। what a relief! মাথাও থাক্‌বে না, মাথাব্যথাও না, চোখও থাক্‌বে না, চোখ দিয়ে জল ঝরাও না।

৯

পাছে বিক্ষেপ ঘটে তাই জানালার উপর পর্দা টেনে দিয়ে বাদল বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ হয়েছিল। তার নিজের চোখ খোলা, তার ঘরের চোখ বন্ধ।

ডাক্তার এসে টান মেরে পর্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে গেলে বাঁধ-ভাঙ্গা বেনো জলের প্লাবনের মত আকাশ-ভাঙা আলোর প্রবাহ তার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। সে আঘাত পেয়ে চোখ বুজ্‌ল; পরে চোখ মেলে দেখ্‌ল আলোর আর-এক রং। বসন্ত কোন কাল চলে গেছে, গ্রীষ্ম এসেছে তার স্থানে। পাখীর কলরব কান ঝালাপালা করে দেয়। যেদিকে দৃষ্টি ফিরান যায় সেদিকে এক ঝাঁক পাখী আছেই। চেরী ফুল ঝরে গেছে, কিন্তু গাছ তা বলে নেড়া হয়নি, নতুন পাতায় ভরে গেছে। বাদলের মত দৃষ্টি-কানা মানুষও লক্ষ্য না করে পার্‌ল না যে মাঠের কোল জুড়েছে লক্ষ লক্ষ ব্লুবেল, প্রিমরোজ, মার্গেরিট ফুল।

এর মধ্যে কখন ভ্রমণের হিড়িক আরম্ভ হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ সরাইয়ের সামনের রাস্তা ধরে মোটরে কিম্বা পদব্রজে চলেছে। তারা সকলে সরাইয়ের দিকে তাকায়, কেউ কেউ সরাইয়ের বাগানে চা খাবার জন্য থামে। তাদের জন্য মেলভিল Ye olde tea garden খুলেছে। সেখানে বেচারি মিসেস মেলভিল হাজিরা দিতে দিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

এতদিন পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত থাকার ফলে মানুষ দেখে বাদলের উত্তেজনার সঞ্চার হল। বিদেশ থেকে দেশে

ফিরলে যেমন হয়। তার জিজীবিষা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে যে বেঁচে আছে এই তার শ্রেষ্ঠ সুখ। সে বেঁচে থাকতেই চায়, মরতে চায় না। ওদেরই মত সে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে মোটর হাঁকাবে, চা বাগানে আসন নিয়ে লেমন স্কোয়াসের নল মুখে পূরে আধ ঘণ্টা কাটাবে, সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দিগ্‌বলয়ের সীমা নিরীক্ষণ করবে।

জীবনের প্রতি বাদলের প্রাক্তন অনুরাগ বহুগুণিত হয়ে ফিরল। বসতে হবে ঐ চা বাগানে, ঐ মুক্ত গগনের তলে, ঐ স্নিগ্ধ রৌদ্রে। বহুদিন মিসেস মেলভিল ভিন্ন অন্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়নি। ওখানে গিয়ে বসলে আলাপ অমনি জমবে। বাদল জিজ্ঞাসা করবে, "এ অঞ্চলটা লাগছে কেমন?" ওরা বলবে, "চমৎকার।" ওরা পাল্টা প্রশ্ন করবে, "আপনি এখানে কদিন আছেন?" বাদল বলবে, "মনে হচ্ছে যেন চিরকাল আছি। প্রকৃতপক্ষে দেড়মাস হবে।" তারপর বাদল ওদের খোঁজ খবর নেবে। ওরা কেউ লণ্ডন থেকে, কেউ বার্মিংহাম থেকে এসেছে। কেউ ভেণ্টনর দিয়ে এসেছে, কেউ ফ্রেস্‌ওয়াটার দিয়ে। কেউ রাইড্ কাউএস্ নিউপোর্ট ঘুরে এসেছে, ক্রা য়্যাবী দেখেছে; কেউ স্যানডাইন ও শ্যাঙ্কলিন হয়ে এসেছে, শ্যাঙ্কলিনের Chine দেখেছে। বাদল এতদিন আছে, কিন্তু Carisbrooke এর দুর্গ দেখেনি, সেখানে যে গাধাটি আজ তিনশো বছর কূয়া থেকে জল তুলছে তার গল্প শুনেছে কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করেনি।

সাধারণ মানুষের মত সামান্য বিষয়ে কৌতূহলী হতে বাদলের লজ্জা বোধ হল না। বরঞ্চ উৎসাহ বোধ হল। সে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নীচে নেবে যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু এতদিনের অনিদ্রা ও অনাহার। তার মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার পা টলছিল, গা কাঁপছিল, চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। সে বুদ্ধি খাটিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। বহুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকবার পরে যখন চোখের আলোর আমেজ পেল ততক্ষণে তার ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

শরীরকে নাই দিলে সে পেয়ে বসে। তার নালিশ অনন্ত। আবদার অজস্র। বাদল চুপ করে বিছানায় শুয়ে থেকে তার শরীরের উক্তির প্রতি কর্ণপাত করল। শরীর বলছে, তুমি ত ভারি মজার মানুষ হে। আমি যে আছি আর আমি যে তোমার, এ দুটি সরল সত্য তোমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিলেও তোমার বোধগম্য হয় না। এমনি স্থূল তোমার বুদ্ধি। দুনিয়ার ভাবনা ভেবে মরছ, ঘরের চুলায় হাঁড়ি উঠছে না সে খবর রাখ? তোমার হাতে পড়ে আমার অকাল বৈধব্য অনিবার্য্য। হায় হায়, না পেলুম ঘুমিয়ে আরাম, না করলুম খেলাধূলা। রয়ে সয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব তার সময় নেই, কোনটা সারবান খাদ্য কোনটা কেবলমাত্র মুখরোচক তার বিচার নেই। ঐ একঘেয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে ও তার তুমুল কোলাহল শুনতে শুনতে চোখে ও কানে মরচে ধরে গেল। আহা, অন্যের হাতে পড়ে থাকলে কি আনন্দেই দিন কাটাতুম! আকাশে এরোপ্লেন, মাটীতে মোটর, নদীতে বাচ—Speed is the word। মনের পক্ষে যেমন চিন্তা, দেহের পক্ষে তেমনি গতি—উভয়ের চাই Speed; উভয়েই হবে ধাবমান। এ কেমনতর মানুষ যে দেহে উদ্ভিদ্ থেকে মনের দ্বারা জগৎ পরিক্রমা করতে যায়। হয়েছেও তাই, ঘানি-গাছের চারদিকে ঘুরে মরছেন, একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে পাড়ি দিতে পারছেন না।

বাদল ভেবে দেখল, কথাটা খাঁটি। দেহটা হয়েছে মনের ঘানিগাছ। তাই চিন্তা কেবল একস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা তীরের মত সরল রেখায় ছুটতে পারে, যারা speed king, তাঁরাই জীবন মৃত্যুর লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তারাই জানে প্রাণের পরে কি আছে, অস্তিত্ব কি নাস্তিত্ব। তাদের জ্ঞান তাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকে। আমার জ্ঞান আনুমানিক। ওরা সত্যিই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়, মরতে মরতে বেঁচে আসে। আর আমি যে এই কয়েকদিন মৃত্যুর আস্বাদ নিলুম এটা কৃত্রিম। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব আমার পক্ষে থিওরী; ওদের পক্ষে প্র্যাক্টিস্।

বাদলের ইচ্ছা করল, ডাইনামাইট দিয়ে ঘর দ্বার গ্রাম

নগর বিচূর্ণ করে বিকীর্ণ করে দিতে। ওরা তাকে রুদ্ধগতি করেছে। ইচ্ছা করলে ডাইনামাইটের দ্বারা নিজেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যেতে। হাওয়ায় উড়্‌তে উড়্‌তে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে। হয়ত গ্রহান্তরের মাধ্যাকর্ষণ তার একাংশ অপহরণ করবে, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ করবে অপর একাংশকে ভস্ম, তবু তার বিক্ষিপ্ত শরীর জগৎ আচ্ছন্ন করবার মত বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম। সে যেন একখানা অদৃশ্য জাল, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত। তার শরীরে যত সেল্, যত মোলিকিউল, যত এটম, যত ইলেকট্রন আছে তাদের সংখ্যা হয়, কিন্তু কে জানে হয়ত ইলেকট্রনকেও ভাগ করা যায়, তাই তার ভাজক সংখ্যা অগণ্য। এই ভাজকগুলি যদি একবার ছাড়া পায় তবে হয়ত মাধ্যাকর্ষণের পক্ষে যার-পর-নাই লঘু হবে, অতএব জগতের সীমা যতদূর উড়্‌তে উড়্‌তে ততদূর যাবে।

অথবা যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সহসা নিষ্ক্রিয় হত। যদি দোতালা থেকে লাফ দিয়ে বাদল নীচের জমিতে পড়্‌ত না, পড়্‌ত ঊর্দ্ধে, পড়্‌তে পড়্‌তে চল্‌ত শূন্যে। তার সঙ্গে চল্‌ত বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়ন্ত পাখী, ঝরন্ত পাতা, খসে-পড়ন্ত ফুল। পৃথিবীর টান এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হলে পৃথিবীর কোল খালি হয়ে যেত।

১০

বাদলের বন্ধন বোধ কোনোদিন এমন তীব্র হয়নি। সে শুধু শয্যাশায়ী নয়, সে বন্দী। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার সর্ব্বাঙ্গে। সে আহার নিদ্রার দাস, শীতাতাপের অধীন, ব্যাধিবীজের কৃপাপাত্র। Free will? কোথায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা? এই ত আজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারল না, চা বাগানে বসে লেমনেড খেতে খেতে আলাপ জুড়্‌তে বাধা পেল। কে মালিক? সে, না তার না-খাওয়া খাদ্য, না-হওয়া ঘুম, না-করা কসরৎ? সে, না তার দুব্‌লা গড়ন, সরু সরু হাড়, বিশীর্ণ মাংসপেশী? কতক আবেষ্টন, কতক বংশানুক্রম, দুই মিলে বাদলের ইচ্ছার স্বাধীনতার পথ রাখে নি। Environments ও heredity, এরাই মালিক, বাদল নয়। ইংলণ্ডে এসে প্রথমটাকে এড়াতে পারেনি—এখানেও সেই মাধ্যাকর্ষণ মাটীর সঙ্গে পা'কে রেখেছে এঁটে, বাতাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের সম্বন্ধ সেই একই, দেহের ইঞ্জিন ইন্ধনের অভাবে তেমনি বিকল। আর দ্বিতীয়টা? বাদল প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায় এর অমোঘ অবিচল প্রভাব। কিন্তু ইংরাজের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সে সর্ব্বায়বে অনুভব করতে পারে কই। ভাষায় ইংরেজ হতে পারে, চিন্তাপ্রণালীতেও ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু অস্থি মাংস স্নায়ু শিরার আভ্যন্তরিক সংস্থান সঞ্চালন ও বৃদ্ধি মহিমচন্দ্র সেন ও শৈলবালা দেবী এবং তাঁদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতা মাতামহী প্রমাতামহী চিরকালের মত অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার তুলনায় কি! সেই সকল পরিত্যক্ত বিস্মৃত অজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষ—যাদেরকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করেছে—তারাই তার শরীরক্রিয়ার নিয়ন্তা। তার পূর্ব্বপুরুষ যদি জন্ স্মিথ্ ও মেরী জোন্স্ এবং তাঁদের পিতৃমাতৃকুল হতেন তবে সে এই ক'দিনের মধ্যে এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ত না, তার মাথা ঘুরত না, পা কাঁপ্‌ত না, গা বমি বমি করত না, সে শিশুর মত হামাগুড়ি দিত না, রোগীর মত দিনে দুপুরে বিছানায় পড়ে থাকৃত না।

কিন্তু সে যে বাদল, সে যে অতুলনীয়, সে যে নিখিল বিশ্বে এক এবং অদ্বিতীয় তার এ অনুভূতি কে ঘুচাবে? হতে পারে সে হেরিডিটির স্রোতোমুখে ভাসমান তৃণ, আবেষ্টনের অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক ক্রীড়াতাড়িত, আন্দোলিত ও মুক্তিভ্রমে ভ্রান্ত। হোক্ না সে নিরস্ত্র নিরন্ন ভাগ্যপীড়িত বন্দী, নাই থাক্ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা, পড়েই থাক্ সে অনীপ্সিত শয্যায়। অবান্তর ও তুচ্ছ তার ইংরেজ হওয়া না হওয়া; সে যে বাদল এই তার সত্য উপলব্ধি। তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা তার ব্যক্তিত্বে। হাজার পরাধীন হোক, সে আর কেউ নয়, সে সে। সমস্ত কাট ছাঁট দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, যা irreducible, যা অক্ষয়, তা হচ্ছে, তার স্বকীয়তা। সেই তার চিতোর দুর্গ, সেই দুর্গে সে স্বাধীন নরপতি। তার ইচ্ছা যখন আবেষ্টন ও বংশানুক্রমের রাজ্যে

পা বাড়ায় তখন তার পাস্‌পোর্টের দরকার হয়, তখন সে অসহায় ও অবমানিত। কিন্তু তার আপন দুর্গে সে অপরাজেয়। যেখানে সে ব্যক্তি সেখানে তার মুক্তি।

আমি আছি ও আমি আমি। রোগ-শয্যায় এর অন্যথা হয়নি, মরণে এর অন্যথা হবে না। মনে মনে এই তত্ত্ব জপ করতে করতে বাদল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখ্‌ল সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। নিকটে কোন গাছে ব্ল্যাক্‌বার্ডেরা তখনো ডাকাডাকি করছে। সমুদ্রের কলরোল সারাদিন অন্য সহস্র ধ্বনির নীচে চাপা পড়ে ফোঁসফোঁসাচ্ছিল, এইবার স্ফীত হয়ে মাটীর উপর ছোবল্‌ মারছে। মোটরকারের হর্ণ্‌ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচের তলায় অট্টহাসির হট্টগোল বাদলকে স্মরণ করিয়ে দিল যে বেঁচে থাকার ষোল আনা আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। বেড্‌ সুইচ্‌ টিপে আলো জেলে সে দেখ্‌ল টেব্‌লের উপর গোটা দুই তিন ওষুধের শিশি।

ইস্‌! ওষুধ! জীবনে অন্য কোনো জিনিষকে সে এত ঘৃণা করে না। মিষ্টি হোক তিক্ত হোক ওষুধ হচ্ছে এমন এক জাতের খাদ্য যার স্বাদ নিতে জিভে জল সঞ্চার হয় না, যার ঘ্রাণ পেলে ক্ষুধা এগিয়ে আসে না, যা গ্রহণ করে তৃপ্তি নেই। সাধ গেলে লোকে সন্দেশ বা চকোলেট খায়, কিন্তু বাধ্য না হলে কেউ ওষুধ খায় না। বাধ্যতাকেই বাদল ঘৃণা করে, ওষুধের উপকরণকে না, ওষুধ তার বন্দীদশার স্মারক, তার স্বাধীনতার প্রমাণ নয়। এই ওষুধ সকাল বেলার সেই অশ্রদ্ধাবান ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন যে বলেছিল বাদলের জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে। কাজেই বাদল এর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বোধ করল না। অমন ডাক্তারের উপর তার আস্থা নেই। সে হাত বাড়িয়ে শিশি-গুলোর গলা টিপে ধরল। তারপর রোগা হাতে যতটুকু জোর ততটুকু খাটিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তার মনে পড়্‌ল মেল্‌ভিলের আসুরিক চিকিৎসা। আহা মেলভিল লোকটা বড় ভাল। সেদিন যা পান করিয়েছিল স্বাধীন অনুভূতি জাগাতে অমন পদার্থ আর নেই। ওর এক আউন্স পেটে পড়্‌লে পৃথিবী বুড়ীর শিকল গলা থেকে খসে পড়ে, প্রাণটা বাচ্চা কুকুরের মত একবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে যায়, লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে, দুই পা সাম্‌নে মেলে দিয়ে ধরা দেবার ভাণ করে, কাছে গেলে অমনি পালায়। কেমন তামাসা! বাদলের হাসি পায়। মনে করতেই মনটা হালকা হয়ে আসে। গায়ে যেন খানিকটা জোরও জোটে। বাদল উঠে গিয়ে বেল্‌ টেপে।

যাকে চেয়েছিল ঠিক সেই। মেল্‌ভিল্‌ স্বয়ং। বাদল বল্ল, "বড্ড কাহিল বোধ করছি। একটু ব্রাণ্ডি কিম্বা—।" মেল্‌ভিল্‌ সকালবেলা ডাক্তার দেখে টের পেয়েছিল ব্যাপার সরল নয়। গম্ভীরমুখে বল্ল, "আপনি ত এখন আমার চিকিৎসাধীন নন্‌।" বাদল ক্ষ্যাপার মত হেসে উঠে বল্ল, "ঐ ডাক্তারটার চেয়ে আপনার চিকিৎসার উপর আমার ঢের বেশী আস্থা মিষ্টার মেল্‌ভিল্‌।"

স্বাধীন অনুভূতির চোটে বাদল সে রাত্রে মিসেস মেল্‌ভিল্‌ বুড়ীকে ঘুমতে দিল না। থাকে থাকে সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—"Free will or Determinism?"

(ক্রমশঃ)

লীলাময় রায়



বঙ্গ সাহিত্যে বাঙ্গাল

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ

বাঙ্গালী জাতির যতগুলি চরিত্রগত বিশেষত্ব আছে তন্মধ্যে তাহার হাসিবার ও হাসাইবার ক্ষমতা যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও বাঙ্গালী যেন চিরকালই বলিয়া আসিয়াছে 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস'।

আমাদের এই হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। হাস্য কৌতুক বঙ্গ সাহিত্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। আধুনিক সাহিত্যের ত কথাই নাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার অভাব লক্ষিত হয় না। দেবদেবী লইয়াই আমাদের যাহা কিছু প্রাচীন সাহিত্য। আর সে কালের কবিরা প্রধানতঃ এই সকল দেবদেবীদের অবলম্বন করিয়াই প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুর নিকট ইহা এক বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। দেবতাদের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপে যে আবার তাঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিতে পারা যায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শিব হিন্দুমাত্রেরই উপাস্য, কিন্তু রামেশ্বরের 'শিবায়ন' হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তিনি কৌতুক হাস্যের উপাদান স্বরূপ হইয়াছেন। হয়ত ইহার কারণ এই যে তাঁহারা উপাস্য-দেবতাগণকে এমনই অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহাদের সম্বন্ধে গার্হস্থ্য হাস্যকৌতুকের ভাব আরোপ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

সে যাহাই হউক সাহিত্যে হাস্যরসের উপাদান বিষয়ান্তর হইতেও গৃহীত হইয়াছে। কখনও কখনও ভাঁড়ু দত্তের ন্যায় অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কবি হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন; আবার কখনও বা দেববৈরির দুর্গতি ও লাঞ্ছনার চিত্র আঁকিয়া কবি ভক্তের মুখে হাসি ফুটাইয়াছেন। আবার শিব ঠাকুরের ন্যায় নিরীহ দেবতাটিকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ করিয়া ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় সকলের চোখে পড়ে, বিশেষতঃ আধুনিক সাহিত্যে। তাহা হইতেছে "বাঙ্গাল" নামক এক অদ্ভুত ও কাল্পনিক জীবের সৃষ্টি। কাল্পনিক বলিলাম এই জন্য যে সাহিত্যে বাঙ্গাল নামধেয় যে বস্তুটির সহিত আমরা সাক্ষাৎলাভ করি, তাহার বস্তুতন্ত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহা যেন লেখকদের নিছক কল্পনারই সামগ্রী; শুধু একটু হাস্যের রসান দেওয়া ছাড়া পূর্ব্ব বঙ্গ-বাসীদের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা এসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের যেন মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না।

এই বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে এই শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটু গবেষণা আবশ্যক। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী-দিগকে পশ্চিম বঙ্গের লোকে বাঙ্গাল বলিয়া থাকে; বোধ হয় তাঁহারাই আদিম ও প্রকৃত বাঙ্গালী বলিয়া। কারণ ঐতিহাসিকদের মত এই যে, পূর্ব্বকালে বঙ্গ বলিতে বিশেষ করিয়া আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত এবং আধুনিক পশ্চিম বঙ্গ গৌড় রাঢ় প্রভৃতি নামে খ্যাত প্রাচীন জনপদসমূহ লইয়া গঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীরাই ছিলেন আসল বাঙ্গালী। এবং এই বাঙ্গালী শব্দ কালক্রমে বাঙ্গালে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ইঁহারা নিজেরা আপনাদিগকে এই নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত তাহা জানি।

পশ্চিম বঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন রহস্যপ্রিয় তাঁহারা যখন দেখিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের পদ্মাপারের ভ্রাতাদিগকে বাঙ্গাল বলিলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন, তখন তাঁহারা একটা দুষ্ট আমোদ উপভোগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অপরকে রাগাইয়া কৌতুক বোধ করাটা যে ঠিক বিজ্ঞজনোচিত নয় তাহা স্বীকার

করিতে হানি নাই ; কিন্তু বিজ্ঞতম লোকের চরিত্রেও অনেক সময় বালকের রঙ্গপ্রিয়তা দেখা যায়।

সে যাহাই হউক শুধু যে তাঁহাদের ক্রোধ পরায়ণতাই তাঁহাদের লইয়া অবাঙ্গাল বাঙ্গালীদের রসিকতার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নয়। আরও কয়েকটি কারণে তাঁহারা ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ হইবার এমন সুযোগ অপরকে দিয়াছিলেন যাহা ত্যাগ করা হয়ত অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত বাঙ্গালীর স্বাভাবিক রহস্যপ্রবণতা পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বাঙ্গালীর চরিত্রে কম এবং পশ্চিম বঙ্গেই ইহার আধিক্য লক্ষিত হয়। চরিত্রগত এই তারতম্যের ফল যে পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয় নাই তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। কাজেও দেখি তাই। পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন কবি বা সাহিত্যিক হাস্যরসের ফোয়ারা একটু খুলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। পক্ষান্তরে দু একজন ব্যতিরেকে পশ্চিম বঙ্গীয় সাহিত্যিক মাত্রেই হাস্যরসের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ফলে তাঁহারা অরসিক পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদের লইয়াই অনেকস্থলে বিলক্ষণ রসিকতা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে তাঁহাদের ভাষার বিশেষত্ব। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এই ভাষা ও উচ্চারণগত পার্থক্যের অন্তরালে যে বাঙ্গালীজাতির এই দুইটি ভাগের মধ্যে একটা ভাবগত ব্যবধান বহুদিন হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে তাহা বোধ হয় তুচ্ছ করিবার নয়। এক্ষেত্রে পশ্চিমের কাছে পূর্ব্ব হারিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের ভাষাই বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়গুপ্ত হইতে আধুনিকতম দীনেশ সেন নরেশ সেনগুপ্ত অবধি পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত লেখকই পশ্চিম বঙ্গের ভাষাই গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা আবিষ্কৃত পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় অবশ্য খাঁটি পূর্ব্ব বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কথিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের দর্শন আমরা পাই। কিন্তু এই সকল গাথা অশিক্ষিত বা নিরক্ষর কবির রচনা; সুতরাং এগুলি সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। অনেক সময়ে আমার মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে যে ইংরাজি সাহিত্যে যেমন বার্ণস্ তাঁহার স্বদেশীয় ভাষায় অনিন্দ্যসুন্দর গান ও কবিতা লিখিয়া অমর হইয়াছেন, সার ওয়াল্টার স্কট্ যেমন তাঁহার অনেক উপন্যাসের কথোপকথনে স্কচ্ ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন এবং একটা গোটা গল্প (Wandering Willie's Tale) এই ভাষায় লিখিয়াছেন, আমাদের দেশেও তেমনই পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কেন তাঁহার দেশীয় ভাষায় সাহিত্যরচনা করিয়া যুগপৎ স্বদেশপ্রীতি ও সাহিত্যসেবার পরিচয় দেন নাই ? পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজেও সাধারণ কথাবার্ত্তায় যে ভাষা প্রচলিত তাহা যে ঠিক পশ্চিম বঙ্গের ভাষা নহে, এবং তাহার যে কতকগুলি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু কেহই এই ভাষার মর্য্যাদারক্ষায় যত্নবান হন নাই। এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি গোবিন্দদাস পর্য্যন্ত শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চিম বঙ্গের প্রভাবশূন্য হইয়াও পশ্চিমের ভাষাতেই তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ এককালে বাংলা ও মৈথিলির মিশ্রণধারা ব্রজবুলি নামক একটা নিছক কাব্যের ভাষা সৃষ্টি করিয়া যখন সুন্দর সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তখন 'বাঙ্গাল' ভাষায় গল্প উপন্যাস না হউক, অন্ততঃ হাস্যেতররসপূর্ণ কবিতা পর্য্যন্ত যে কেন রচিত হইতে পারে না তাহা বুঝি না। সম্প্রতি মাসিকের পৃষ্ঠায় নবীন কবি শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য এইরূপ কিছু চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি। কবি নিজে পূর্ব্ববঙ্গবাসী কিনা জানি না। না হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ টেনিসন যেমন প্রাদেশিক ভাষায় Northern Farmer, Northern Cobbler প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়া ইংরাজি সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের সাহিত্যেও যে বাঙ্গাল ভাষায় ভাল কবিতা রচিত হইতে পারে তাহারই উদাহরণস্বরূপ সুরেশানন্দ বাবুর কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর কবিতা হাস্যরসের উদ্রেক করে না। সুতরাং হাসাইবার জন্য শুধু বাঙ্গাল ভাষাই যথেষ্ট নহে। আরও কিছু মাল মসলা দরকার। হয়ত এই কল্পিত জীবটির মধ্যে নির্ব্বুদ্ধিতা বা দুষ্ট বুদ্ধি আরোপ করিতে হয়। কিংবা তাহার বাক্যে, ভাবে ও কার্য্যে একটা হাস্যকর অসঙ্গতি কল্পনা করিয়া লইতে হয়। বাঙ্গাল (?) কবি রজনী সেনের

কয়েকটি সুপরিচিত গান ইহার উদাহরণস্থল। বাঙ্গাল যখন ঘোর বৈরাগ্যের বশে গায়—

চারদিক থনে পাগলা ওরে ঘিরগ্যা ধরচে পাপে,
অ্যাহন, মইষের সিঙ্গে মারবে গুন্তা, বাচাইবো কোন্ বাপে?

তখন তাহার ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা এমন বিষদৃশ অসঙ্গতির পরিচয় পাই যাহার জন্য না হাসিয়া থাকিতে পারি না। আবার বুড়ো বাঙ্গাল যখন তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বলে—

বাজার হুন্দা কিন্তা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়
তোমার লাগ কেমতে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়।

তখন এই হতভাগ্য বৃদ্ধের প্রতি আমাদের সহানুভূতি হয় না, একটা হৃদয়হীন হাসির উচ্ছ্বাস আসিয়া আর সব ভাব ডুবাইয়া দেয়। বাঙ্গালের শ্যামা সঙ্গীত এবং বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো ও তার বাঙ্গাল চাকর এই একই কারণে হাস্যকর।

কিন্তু তাহা হইলেও শুধু বাঙ্গালের ভাষা ও উচ্চারণের জন্যই যে পশ্চিম বঙ্গবাসী বাঙ্গালীকে পরিহাস করিয়াছে তাহার কিছু কিছু ক্ষীণ নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত আছে। সকলে শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে এ সম্বন্ধে স্বয়ং চৈতন্য দেবই নাকি অগ্রণী ছিলেন অবশ্য যদি চৈতন্য ভাগবতের নজির সত্য বলিয়া মানিতে হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী হইলেও তিনি তরুণ বয়সে শ্রীহট্টীয়গণকে দেখিলেই বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত। শ্রীহট্টীয়গণও তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহিত না। তাঁহার ব্যঙ্গের উত্তরে—

শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয়॥

কিন্তু তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। তাহাদিগকে ভীষণরূপে না রাগাইয়া তিনি ছাড়িতেন না।

তাবৎ শ্রীহট্টিয়ারে চালেন ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাইয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের নৌকাডুবির সময় বাঙ্গাল মাঝিদের কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের মনে যে ভাবটির উদয় হয় তাহাকে করুণা বা সহানুভূতি বলা যায় না। তাহাদের ক্রন্দনের নমুনা একটু দিই—

বাঙ্গাল কাঁদেরে হুড়র বাপই বাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥

*　*　*

আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ।
হর্ব্বধন গেল মোর হকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ।
অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ॥
যুবতী যৌবনবতী ত্যজিলাম রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহ দোষে॥
ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥

কোন বাঙ্গাল কবি এই বিদ্রূপের প্রতিশোধ লইয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। তাঁহাদের উদারতা অসাধারণ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর এই উদারতার কোন ফল হয় নাই। কারণ প্রাচীন সাহিত্য ছাড়িয়া যখন আধুনিকে উপস্থিত হই তখন দেখি যে তাঁহাদের লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাত্রাটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। নাটকেই ইহার একটু বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অমৃত বসু, এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত কেহই বাঙ্গালকে বিদ্রূপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু এই বিদ্রূপ অবজ্ঞাপ্রসূত নয়, নির্ম্মল হাস্যরস বিতরণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী তদানীন্তন দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষিত সমাজের উপর তীব্র কশাঘাত; সুতরাং ইহার মধ্যে যদি বাঙ্গালীকেও তিনি টানিয়া থাকেন এবং তাহার ন্যায্য গণ্ডা তাহাকে দিয়া থাকেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কথা বলা চলে না যে তিনি বাঙ্গালদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সাদাসিধা লোক কলিকাতায় আসিয়া কিরূপ বিগড়াইয়া যাইত তাহাই রত্নমাণিক্যের চরিত্রে দেখানো হইয়াছে। কতকটা এইরূপ ব্যাপার

অমৃত বোসের রাজা বাহাদুরে দেখি। সকল দেশেই এমন কতকগুলি নির্বোধ লোক থাকে যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। রাজাবাহাদুরে এই শ্রেণীর মূর্খদিগকেই ব্যঙ্গবাণে জর্জ্জরিত করা হইয়াছে। নায়কটিকে বাঙ্গাল বানাইয়া কবি কেবল হাসির উপর হাসির ঢেউ তুলিয়াছেন। বাঙ্গাল মাত্রকেই ব্যঙ্গকরা কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ এই নাটকেই দেখি যে যে-কাণ্ডজ্ঞান এই নিরেট রাজাবাহাদুরটির নাই, তাহা তাহার পিতা, পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। কলিকাতা সহরই তার মাথা খাইয়াছে। তাই শেষ দৃশ্যে তার উপযুক্ত স্ত্রী তাকে বলিতেছে 'বিটাখাগীর বিটা, সহুরে আসে সিপুই অইছ।' তারপরে তার গলায় গামছা বাঁধিয়া বলিতে লাগিল—'চল্ তা চল্ হালারপুত দ্যাশে লয়ে যাই।' আর তার সঙ্গে যোগ দিয়া তার আত্মীয়গণ সুর ধরিল—

আতুর গায়ে দেদার ঝারু দুর দুর দুর।
আগুরির পুত বাদীর বিটা রাজা বাহাদুর॥

সর্ব্বত্রই বাঙ্গাল যে এই রাজাবাহাদুরটির ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে তাহা নহে। যদি তাহা হইত তবে অবজ্ঞার কথা উঠিতে পারিত। অমৃত বোসেরই অন্য প্রহসনে তেজস্বী, নির্ভীক, সত্যবাদী বাঙ্গালের সাক্ষাৎকার লাভ করি। 'কালাপাণি' নাটকে দেখি ধনী জমীদার দুলাল চাঁদ যখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে নিজ মনোমত ব্যবস্থাপত্র আদায় করিয়া লইলেন তখন শুধু—বাঙ্গাল হলধর তর্কনিধি কিছুতেই সেই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর দিলেন না। লোভ ও ভয় প্রদর্শন ব্যর্থ হইল। শেষে এই বাঙ্গাল পণ্ডিতটি দুলালচাঁদের মুখের উপর এই বলিয়া বিদায় লইল—'এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই। আমার বারি পূর্ব্ববঙ্গ। অত অর্থলোভ রাখিনা; লাঙ্গলত আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, দ্যাশে চাষ করে খাইমু। অর্থলোভ দেহায়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইয়ে রও।' ইহার পর আর কেহ বলিতে পারেন না যে বাঙ্গালদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছে। 'খাস দখলে'র আনন্দ-কবিরাজ পরশুরাম রচিত চিকিৎসা বিভ্রাটের সর্ব্বজন পরিচিত কবিরাজটির সমজাতীয়। তাঁর যথেষ্ট আত্মম্ভরিতা আছে, যদিও তিনি শেষোক্ত কবিরাজটির মতন নিজের ছিদ্রঢাকা করিয়া বলেন না—'অয় প্রাপ্তি পার না।'

গিরিশ ঘোষের কোন নাটকে বাঙ্গাল চরিত্র আছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না। শুধু 'কমলে কামিনী' নাটকে তিনি বাঙ্গাল মাঝিদের মুখে একটি গান দিয়াছেন। এই কমলে কামিনীর উপাখ্যান কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে গৃহীত হইলেও, প্রাচীন কবি বাঙ্গাল মাঝিদের যে দুর্গতি করিয়াছেন গিরিশ চন্দ্র তাহাদিগকে তাহা হইতে বাঁচাইয়াছেন। কবিকঙ্কণের মাঝিরা তুফানে পড়িয়া ভয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে, আর গিরিশ ঘোষের মাঝিরা ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে দেখিয়া ভয়শূন্য মনে বলিতেছে—

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে কর্ত্তিছে গোঁ গোঁ।
ঝড়ো মামা উম্যা করে আস্‌তিছে সোঁ সোঁ। ইত্যাদি

অবশ্য অবিলম্বে নৌকা ডুবিল। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের ভয়বিহ্বল কাতরোক্তি নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল একটিমাত্র প্রহসনে—'প্রায়শ্চিত্তে' বিনোদ চক্রবর্ত্তী নামক এক দুশ্চরিত্র গুলিখোর বাঙ্গালের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যখন এই সকল প্রহসন লিখিতেছিলেন তখন ছিলেন নিছক হাসির কবি। সুতরাং হাস্যরসের উপাদান যেখানে পাইয়াছেন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার জন্য বাঙ্গালভ্রাতাগণের দুঃখিত হইবার কারণ নাই।

উপন্যাসেও বাঙ্গাল একেবারে উপেক্ষিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা বাঙ্গালের দেখা পাই না বটে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গাল পোষ্টমাষ্টারকে আসরে নামাইয়াছেন। এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তদানীন্তন কলিকাতাবাসীর পূর্ব্ববঙ্গবাসী সম্বন্ধে সাধারণ মনোভাব বলিয়া মানিয়া লইবার সঙ্গত কারণ নাই। গল্পের যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পোষ্টমাষ্টারটির সৃষ্টি তাহার উপযোগী করিয়াই চরিত্রটি তৈরী হইয়াছে। ইহার বর্ণনা এইরূপ—'তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি।' ইহা হইতে যদি কেহ অনুমান করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা

হইলে বোধ হয় তাঁহার উপর অবিচার করা হইবে।

উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যদিও বাঙ্গালকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিক হাসি ঠাট্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও এই সব ব্যঙ্গকৌতুকের মূলে ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব ছিল না। স্থলবিশেষে যদিই বা এইরূপ মনোভাব কোথাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়া থাকে ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটকাদি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীনতর সাহিত্যের কথা ত ছাড়িয়াই দিই। সে সময়ে নানা কারণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে হৃদয়ের প্রীতি বা আত্মীয়তার একটা ঘনিষ্ঠযোগ বোধ হয় খুব বেশি ছিল না। অন্ততঃ গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনসূত্রে বাঙ্গালীর এই দুই বিপুল বিভাগ পরস্পরের যত নিকটে আসিয়াছে তৎপূর্ব্বে তাহারা তত নিকটে ছিল না, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তাই তখন হয়ত বাঙ্গালকে খোঁচা দিয়া একটু আমোদ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি একটু প্রবল ছিল। এখন যদিও কেহ কেহ এই প্রবৃত্তিটা সম্পূর্ণ দমন করিয়া থাকিতে না পারেন, যেমন 'ধ্রুবতারা'য় 'মিঃ চকরভার্ত্তি'র আবির্ভাব, তাহা হইলেও এসব ক্ষেত্রে অবজ্ঞার ইঙ্গিত আছে সে কথা বলা সঙ্গত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা মনে আসে। শেক্ষপীয়র কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। কিন্তু তিনিও তাঁহার Merry Wives of Windsor নামক হাস্যরসাত্মক নাটকে একটি নির্ব্বোধ ফরাসী ও একজন তদধিক নির্ব্বোধ ওয়েল্‌শ্‌ম্যান চিত্রিত করিয়া তদানীন্তন ও ভবিষৎকালের যাবতীয় রসিক সুজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কেহ তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেয় নাই। তবে পরবর্ত্তী সাহিত্যে এরূপ চিত্র আর নয়নগোচর হয় না। তাহার কারণ বোধ হয় ইংরাজ এখন স্কচ্‌ ও ওয়েল্‌শ্‌দের সর্ব্ববিষয়ে একীভূত, ইহাদের ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে সকল পার্থক্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আর আমরা এক জাতি হইয়াও এমনই একত্ববোধহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে শুধু পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ কেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্থানীয় গণ্ডী তৈরী করিয়া তাহারই মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্নবান ছিলাম। তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গাল চিরদিন বিরাজ করিবে। কারণ এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ একান্ত নির্দ্দোষ ছিল ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা যতই কেন কৈফিয়ত দিই না, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের নিকট ইহা কখনই প্রীতিকর হয় নাই। এবং যদি ইহা আমাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্দ স্থাপনের পথে একটুও অন্তরায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের লজ্জিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্য স্বীকৃত, হাস্যরসেও বোধহয় পশ্চিমের প্রাধান্য আছে; কিন্তু এই হাস্যের খাতিরে সেই জন্যও ভ্রাতৃভাবকে বলি দিলে চলিবে না। সাহিত্য ও স্বাজাত্যের উদার আকাশতলে ভাই ভাই এক ঠাঁই, এই মন্ত্র জপিতে জপিতে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এক সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে।*

* ভাগলপুর কলেজ অধ্যাপক সঙ্ঘে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত



বাঙলার রঙ ও রূপ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনিপুণ চিত্রকার শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের সুদক্ষ ছাত্র শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদারের লেখা ছবিগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহটিকে দিন রাত্রের বাঁশীর মতো করে লাগে আমার!

এই সংগ্রহের অধিকাংশ চিত্রই বাঙলাদেশের এবং বাঙালীর প্রতিদিনের ঘরের কথা নিয়ে রচনা করা। সে কালের একদল পোটো বাঙলার পট লিখে গেছে কিন্তু বাঙলাদেশ কিম্বা বাঙালীর ঘর কেমন, কোন সুখ দুঃখের সুর বাজছে সেখানে—নদীর জলে, আকাশের আলোয়, দিনে রাতে তার খবর সেকালের পটে ধরা নেই—রাম, রাবণ সব আছে, মকরবাহিনী মা গঙ্গাও আছেন, কিন্তু গাঁয়ের ধার দিয়ে যে নদী ঘরের মেয়েটির মতো কলধ্বনি করে চলেছে, সেকালের পটোদের স্বপ্নেও ধরা দেয়নি সে! বাঙলার রঙ ও রূপ আজকের এই নবীন পটোর কাছে থেকেই পেলাম আমি—এই জন্যেই শ্রীমান নলিনীকান্তকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারিনে। প্রাচীন বাঙলার পটে প্রাচীন বাঙলার পটো অনেকখানি কারিগরি করে গেছে কিন্তু তাদের কৌশল দিয়ে গেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ, আর এই যে আজকের লেখা বাঙালীর হাতে বাঙলার নানা ছোটখাটো ঘরাও ঘটনার ছবি এ কত তফাৎ সেই শিব, দুর্গা, রাম, রাবণ, কৃষ্ণ, রাধা কিম্বা শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া, খোল কর্ত্তালের ঝন্‌ঝনানীর মতো রঙ দিয়ে বানানো গাজীর পট প্রভৃতির সঙ্গে!

ছোটখাটো গুটিকতক বিষয় তাই নিয়ে লিখেছেন ছবি নলিনীকান্ত। কোন দেশ থেকে আস্‌ছে দুজনা কুলি—কাঁধে ছেলেটি, মাথায় পোঁট্‌লা, হাতে ঝুড়ি কোদাল। আসছে তারা কত মাঠ কত পথ ভেঙ্গে, জল ঝিক্‌মিক্ বালুচর, তারি তীরে আছে বাংলাদেশ, তারি স্বপ্নে যেন বিভোর দুই বিদেশী পথিকের চোখ কিন্তু মনের ভিতরে গুমরে উঠছে নিজের গাঁ ছেড়ে আসার দুঃখ! এমনি, ছোট্ট একটি ডোবা, নেমেছে তাতে স্নানে মেয়েরা, নৌকো নিয়ে চলেছে কোন দেশে তার ঠিক নেই, পথের মাঝে একটা সোনার সন্ধ্যায় ভীড়েছে হঠাৎ তরী বাঙলার একটা খালের ধারে—সেখানে হাঁসগুলো মনে পড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটিকে নিজের খেলা-ধূলোর দিনগুলির কথা! এই যে শুভদৃষ্টি হয়েছে আসল বাঙলার সঙ্গে বাঙালী শিল্পীর, এইটেই দেবে শুভ ফল; আর জোর করে তাকে দেড়শো দু'শো বছরের আগেকার চিত্র বিচিত্র করে নক্সা কাটা জোয়ালে জুতে দিয়ে চালাতে গেলে ফল হবে বিপরীত রকম চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ব্যাপার। এই বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার আজকের শিল্পীদের এবং যাঁরা বাঙলার শিল্পের অভ্যুদয় চান তাঁদেরও।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্ম্মা-আফিসের একজন বড়-দরের সাহেব ঘোড়-দৌড়ের খেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়াছিলেন। নিজেই সর্ত্ত করিয়াছিলেন শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্দ্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জ্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

—সেটা কতো?

—আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

—কতো শুনি?

—সাত আট হাজার।

—এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয়না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেননা,—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

—কি করবে?

—করবো আমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

—কিন্তু এটুকু মূলধনে চল্‌বে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পোনর দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবেনা। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে তেত্রিশকোটী দেব-দেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণ-পোষণ,—তাদের উপায় হবে কি?

—তাদের জন্যে ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবেনা। আমার নিজের ভরণ-পোষণের কথাই ভাব্‌চি। বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন-একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এইত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা' নয়। সে সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেবো এখন থেকে সে-ই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাবো না হয় উপোস করবো।

—তা'হলে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

—কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচো সামান্য কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ করো তা সত্যি নয়।

—এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

—বলিনি বিশ্বাস করবেনা বলে। আমার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁওনা, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এ সব কথা আজ কেন বলচো লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে কিন্তু এ যে আমার রাত্রি-দিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্ম্ম-পথের উপার্জ্জন দিয়ে আমি ঠাকুর-দেবতার সেবা করি? সে-অর্থের এক কণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস করো কই?

—বিশ্বাস করি ত।

—না, করোনা।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমল-লতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুদিনের তবু, তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচ্‌লো,—সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞেসা করলেনা কোন কথা, কখনো বল্‌লেনা লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বলো। কেন জিজ্ঞেসা করোনি? করোনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস করোনা আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারোনা আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞেসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু তো শুনেচো। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বল্‌বে নাকি?

—না, তা বলবোনা। কিন্তু তুমি কি কমল-লতার চেলা? সে যা করেছে তোমাকেও তাই করতে হবে?

—ও কথায় আমি ভুলবোনা। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

—এ তো বড় মুস্কিল। আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

—হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

—তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না সে হবেনা,—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি পুরুষ মানুষ তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে উচিত মনে হলে আমাকে দূর করে দিতে পারো?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্থ করচো লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ,—নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারবোনা, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়বো, এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব, এ সকল ভয়াবহ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী-রাজ-পুত্রের হাতে বিক্রী করে দিয়েছিলেন?

—হাঁ, আর এক রাজ-পুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেক কাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর তো শুনেছিলে?

—হাঁ, শুনেছিলাম।

—শুনে কি তুমি ভাব্‌লে?

—ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

—এই? আর কিছুনা?

—আরও ভাবলাম কাশীতে মরে তবু যাহোক একটা সদ্গতি হলো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবেনা। তুমি একটা 'আহা'ও বলোনি আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি। কই, আমাকে ছুঁয়ে বলোত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক্, কষ্ট করে অতদিনের পুরাণো কথা আর মনে ক'রে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাবোনা? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবেনা বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে-অন্তরে কতদিন, কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মন নীরবে কত মর্ম্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে তবু প্রকাশ করিতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমল-লতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্য্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মতো সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চায়,—অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমল-লতা। সংসারে একটি মাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারি একটি তৃপ্তি বোধ করিলাম।

উত্তরেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রী করার—

—এবার কার কাছে?

—অপর একটি রাজপুত্র,—তোমার সেই বন্ধু-রত্নটি,—যাঁর সঙ্গে শীকার করতে গিয়ে—কি হলো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা। কিন্তু তারপরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বল্‌লুম, মা তুমি বাড়ী যাও। মা বল্‌লেন হাজার টাকা নিয়েছি যে। বললুম সেই টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালীর টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ দেবো। বল্‌লুম আজ রাত্রির গাড়ীতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেবো আমি আপনাকে আপনি বিক্রী করে মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্চিনে। মা বিদায় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সম্বাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—আহা! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হ'লে তোমার মুখের সেই আহাটুকুই আমার ঢের। কিন্তু এবার যেদিন সত্যি-সত্যিই মরবো সেদিন কিন্তু দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বোলো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা বদ্‌ল করেছে তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র, পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালোবেসেছে এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে-কানে তখন বল্‌বে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।

—এ কি, তুমি কাঁদচো যে?

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলেমানুষের ওপর তার আত্মীয়-স্বজন যত অত্যাচার করেছে অন্তর্যামী ভগবান কি তা' দেখ্‌তে পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না,—চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মতো পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোন কালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা? কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার আমার তো সাপে-নেউলের সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি করে?

—চলে সাপে নেউলের মতোই। একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজনকে বধ করে না, নির্ম্মম হয়ে বিদায় করে দেয় যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্ম্ম-সাধনায় বিঘ্ন ঘটচে।

—তারপরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তারপরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে, নাক খত্ দিয়ে বলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, এ জীবনে এত বড় ভুল আর করবোনা, রইলো আমার জপ-তপ, গুরু-পুরুত,—আমাকে ক্ষমা করো।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল ক্ষমা পায় তো?

—পায়। কিন্তু তোমার গল্পের কি হলো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বল্‌চি। ক্ষণকাল নিস্পলক চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়ে ছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ। তাঁকে বলতুম আমি দাদামশাই,—আমাকে সত্যিই বড় ভালোবাসতেন। কেঁদে বল্‌লুম দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষে করো, এসব আর আমি পারবোনা। তিনি গরীব লোক হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বল্‌লুম আমার টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপরে কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত যায়গায় ঘুর্‌লুম —এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, মথুরা,—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্দ্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে আর অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ী কিনে, খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে দিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সেতো তুমি নিজের চোখেই দেখেচো।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয়না,—আর কেউ হলে মনে হতো মিথ্যে বানানো একটা গল্প শুন্‌চি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী কহিল, মিথ্যে বল্‌তে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পারো হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার বিশ্বাস।

—এ বিশ্বাস কেন?

—কেন? তোমার ভয় মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

—আমার মনের কথা তুমি জানলে কি করে?

—আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পারো কি করে?

—আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা' নয়।

—হলে খুসি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববেনা এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি,—সেই হাজার বছরের পুরণো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হতে পারি। এমনি যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ-যুগের মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবো? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখোনি কিম্বা, দেখেচো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাক্‌তে পারো? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাক-খত্ দিয়েছি ব'লে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খৎ!

—কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করচো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা' বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ সেখানেও যে আমাদের দশ-জোড়া চোখ খোলা।

—কিন্তু সে-দেখা দেখেচো রঙিন চসমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশ জোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বল্‌বো আমার হাত-পা বাঁধা নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুল্‌তেনা। কিন্তু সে থাক্ গে, আমি সে-যুগের মতো তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই হয় যেন আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেবোনা। সংসারে তোমার অনেক কাজ,—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক-কিছু গেছে,—আর নষ্ট করতে আমি দেবোনা।

বলিলাম, এই জন্যেই ত আমি যতশীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরিতে গিয়ে ভর্ত্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে তো দিতে পারবোনা।

—কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও তো আমি পেরে উঠবোনা।

—কেন পেরে উঠ্‌বেনা?

—প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকেনা, দ্বিতীয় কারণ, দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠা-লাঠি না বাধলে বাঁচি।

—তবে একটা কাপড়ের দোকান করো?

—তার চেয়ে একটা জ্যান্ত বাঘ-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা ক'রে কি শেষে ভগবান এম্‌নি একটা অকর্ম্মা মানুষ আমাকে দিলেন যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলেনা!

বলিলাম, আরাধনায় ত্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্ম্মঠ লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটে-খাটো যোয়ান, যাকে কেউ হারাতে কেউ ঠকাতে পারবেনা, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকা-কড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে ট্রেনে খবরদারি করতে হবেনা, ভিড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হাঁ ছাড়া যে না বলতে জানেনা—

রাজলক্ষ্মী নির্ব্বাক-মুখে আমার প্রতি চাহিয়া ছিল, অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল। বলিলাম, ও কি ও?

—না, কিছুনা।

—তবে শিউরে উঠ্‌লে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে-মুখে যে-ছবি তুমি আঁকলে তার অর্দ্ধেক সত্যি হলেও বোধহয় আমি ভয়ে মরে যাই।

—কিন্তু আমার মতো এমন অকর্ম্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করবো আর চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরবো। এজন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

—এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাওনা কেন?

—তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

—তাদের ফুল তুলে দেবো। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাক্‌বো, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুল-তলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জেলে, কখনো বা তার ভুল হবে,—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবেনা। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমল-লতা কোনদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথভুলে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌বে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুন-গোঁসাই। ঐযে একটু উঁচু—ঐ যে-খানটায় শুক্‌নো মল্লিকা-কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত-লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ ক'রে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হলোনা। সে বকুল-তলা ছেড়ে আর যাবেনা। গাছের ডালে-ডালে করবে পাখীরা কলরব,

গাইবে গান, করবে লড়াই,—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের-মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপরে সময় হলে ডেকে বল্‌বে কমল-লতা দিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, কোরো রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখোনা কোন নাম, রেখোনা কোন চিহ্ন,—কেউনা জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী তোমার ছবিটি যে হলো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ তো কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে। আমি পারবো কিন্তু তুমি পারবেনা! তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাক্‌বে

—কি করে জান্‌লে?

—জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। ঐ তো আমার পূজো, ঐ তো আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই ফুল? সে তো তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই চায়ের জল তৈরি হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এতো ভালোবাসো এখন থেকে তাই কেন করোনা?

—তাতে টাকা তো আসবেনা?

—কি হবে টাকায়? টাকা তো আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ-ঠাকুরপো আনবে বই কিনে আর আমি সাজিয়ে তুলবো আমার মনের মতো করে। ওর এক পাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্য পাশে হবে আমার ঠাকুর ঘর। এ-জন্মে রইলো আমার ত্রিভুবন,—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না। কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি করে? কবে আস্‌বে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারি মশাই, আনন্দ আসবে বলেচে খুব শীঘ্র। তারপরে সকলে মিলে যাবো গঙ্গামাটিতে,—থাক্‌বো সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে কিন্তু, তাদের কাছে গিয়ে এবারে তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিত-হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা তো কেউ জানেনা কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সঙ সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েছে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে। দাগটুকু পর্য্যন্ত নেই,—আর তুমি যে আছো সঙ্গে আমার সব অন্যায়, সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তারে দেবো একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা' দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পাল্লায় পড়ো—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ আমার কেটেচে। বাপ্‌রে বাপ্‌, এম্‌নি ধর্ম্ম-বুদ্ধি দিলে যে দিনে রাতে না পারি চোখের জল থামাতে না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যা-ই হোক্‌, অস্থির মনের লোক নয়। সে সত্যি বলে' একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, 'আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিচ্ছু চাইনে। এ যদি না ভগবানের নির্দেশ হয় তো আর কি হবে বলোত?

প্রতিদিন পুজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাই তো আনন্দ ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাজে এখন থেকে কিছু-কিছু সাহায্য করবো বলে।

বলিলাম, কোরো।

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, ছাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মতো এমন সৎ এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁঝ যতদিন না মরবে ততদিন ও-বিদ্যে কাজে লাগবে না।

—কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প তো নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মতো নেই,—আর সে কথাও আমি বলিনি। ও কত শ্লোক কত শাস্ত্র-কথা কত গল্প-উপাখ্যান জানে, ওর মুখে শুনে-শুনেইত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নয়, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে,—আর তাইতো বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই ছাখো, ওর বিদ্যের মধ্যে কোথায় মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকেও সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয়। কিন্তু ওর বড়-জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদা-মাটা মানুষ, লেখাপড়া জানেনা কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী-দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে,—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতিদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হলো সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হতো? তেজ দেখিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কক্ষণো না। সে করেছে ওর বড়-জা কেঁদে-কেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাশুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্র-শিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ফলাই মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারের কাউকে কল্যাণ দেবেনা তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম এ সব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাওনা কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা তো কেবল শেখা নয়, সত্যি ক'রে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে হয় এসব এলো কোথা থেকে। সে থাকগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড়-কুশারি গিন্নীর সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি এবার তার সংশোধন হবে। যাবে তো গঙ্গামাটীতে?

—কিন্তু বর্ম্মা? আমার চাকরি?

—আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেবো না।

—লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বলোনা কিছুই, চাওনা কিছুই, জোর করোনা কারো ওপর,—খাঁটি বৈষ্ণবি-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

—তাই বলে যার যা' খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ দুঃখ নেই না কি? তুমি নিজেই সব?

—ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া? সে প্লেগের ভয় করেনি, সে-দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ হয়ত আমাকে তুমি পেতেনা। আজ তাদের কি হলো একথা একবার ভাববেনা?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই বর্ম্মায়, গিয়ে তাঁদের ধরে আনিগে। কোন-একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা' হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবেনা।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেছো তাদের নিতে। দেখো, আমার কথা ভুল হবেনা।

—কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে তো ?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সে-ই আমার ভয়। হয়ত পারবোনা। কিন্তু তার আগে চলোনা গিয়ে দিনকতক থাকিগে গঙ্গামাটিতে।

—সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে ?

—আছে একটু। কুশারি মশাই খবর পেয়েছেন পাশের পোড়ামাটি গাঁটা তারা বিক্রী করবে। ওটা ভাব্‌চি কিনবো। সে বাড়ীটাও ভালো করে তৈরি করবো যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হতো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হতোনা, কষ্ট হতো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে,—বেশি দিন সহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয়না, তাইতো তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

—কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো মনে শান্তি পাবেনা লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ মূল্যবান, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকো হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ, এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই বিনা দোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবেনা। বলিলাম, সহরে আমি কোনকালেই থাকতে চাইনে। সেদিন রাঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছায় চলে আসিনি এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছো লক্ষ্মী।

—না গো না, ভুলিনি। সারা জীবনে কখনো ভুলবো না;—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হতো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবেনা। আর কেবল ঘর-বাড়ী থাকবার যায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদ্‌লাবো নিজেকে আর সবচেয়ে বদলে ভেঙে গড়ে তুল্‌বো নতুন করে তোমাকে। আমার নতুন গোঁসাইজীকে। কমল-লতা দিদি আর যেননা দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এই সব বুঝি ভেবে ভেবে স্থির করেছো ?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনা-মূল্যে অম্‌নি অম্‌নিই নেবো ;—তার ঋণ পরিশোধ কর্‌বোনা ? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাবোনা ? এম্‌নি নিষ্ফলা চলে যাবো ? কিছুতেই তা আমি হতে দেবোনা।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা,—সংসারে নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই, আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তি বিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহেনা। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে তো আমাকে আর চায়না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

—কিন্তু সে যে তোমার নিকট আত্মীয়,—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচো ?

—সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মান্‌বোনা। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

—কেন নয় ? অস্বীকার করবে কি করে ?

—অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমারও ছিলনা, এই

বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা, তুমিও জানোনা। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

—শুনেছিলাম লোকের মুখে। কিন্তু তখন তো আমি দেশে ছিলাম না।

—না ছিলেনা। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমরা দু'বোনে মামার বাড়ীতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

—আছে।

—তবে শোনো। বিনা দোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি কিন্তু মরণ হয়না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত হঠাৎ খবর জুটলো দত্তদের বামুন ঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতোই স্বভাব কুলীন। বয়স ষাটের কাছে, আমাদের দুবোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বল্‌লে এ সুযোগ হারালে আইবড় নাম আর ওদের খণ্ডাবেনা। সে চাইলে এক শ, মামা পাইকিরি দর হাঁকলেন পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে, একসঙ্গে,—মেহন্নত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে, বল্‌লে, মশাই, দু-দুটো ভাগ্নীকে কুলীনে পার করবেন এক জোড়া রামছাগলের দাম দেবেননা? ভোর-রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগেছিল কিন্তু আমাকে পুঁটুলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্যু করে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া সুরু হ'লো। মামা বল্‌লেন ধারে কুশণ্ডিকে হোক, সে বললে সে অতো হাবা নয়, এ সব কারবারে ধার-ধোর চলবেনা। সে গা ঢাকা দিলে, বোধহয় ভাবলে মামা খুঁজে-পেতে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায় দুদিন যায়, মা কাঁদা-কাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলোনা। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হলো, সেখানে সে যায়নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালি, কেউ বলে পোড়াকপালি—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয়না,—সেই ঘর থেকে ছমাস পরে বার করা হলো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এলো বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু তো সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বঁইচির মালা,—তাও কিনতে হয়নি,—বন থেকে সংগ্রহ হ'য়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও তো যে আমার মতো অমূল্য ধন পেয়েছে?

—তুমি বলো ত একি তোমার মনের সত্যি কথা?

—টের পাওনা?

—না গো না, পাইনে, সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে। কিন্তু সে কথা যাক্। আমাদের দু-বোনের মতো শাস্তি ভোগ এ দেশে কতশত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয় ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম একটা হলেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক, তাতেও আমার জবাব হতো কিন্তু সে আমি বলবোনা। আমি বলবো অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই সব বিধবাদের কাছে যাঁদের আমি অল্প-স্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষী দেবেন তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আত্মীয়-স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হতো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি-একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাবো।

—আমি দেখবোনা, চোখ বুজে থাক্‌বো।

—পারবেনা। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাবো আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবেনা। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্ব্ব কথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই তো এমনি অত্যাচার। যে-দেশে মেয়ের বিয়ে না হ'লে ধর্ম্ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারেনা—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সেদেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয় তো মরতোনা, আর আমি,—এ জন্মে এমন করে তোমাকে হয় ত পেতুমনা, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতেনা, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচে হইতে বালক কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

—ও-বাড়ীর মেজ বৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়ীটা দেখাইয়া সাড়া দিল,—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা।

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েচে মাসিমা।

—তা' পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোন দুর্ঘটনা না হয়।

—নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এষ্টিমেট করে দেবেন। বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এষ্টিমেট কিসের?

—বাড়ীটা মেরামত করতে হবেনা? তেতলার ঘরটা আধখানা করে তারা ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

—তা' হবে কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

—বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ীর লোক। কিন্তু আর না যাই,—তোমার খাবার তৈরির সময় হয়ে গেলো। এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র



শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রায় আমরা শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের অঙ্কিত সাতখানি উড্‌কট্ ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম। পূর্ব্বেও আমরা একবার এই শিল্পীর কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সুতরাং সুধাংশুকুমার বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অপরিচিত নন।

কিছুদিন হইতে বাঙলা দেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উড্‌কট্ ও লিনোকট্ ছবি আঁকিবার একটা আগ্রহ জাগিয়াছে এবং তাহার ফলে যে কয়জন শিল্পী এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন প্রতিভাবান শিল্পী সুধাংশুকুমার তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মাসুলিপত্তমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিখ্যাত শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট দুই বৎসর উড্‌কট প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট্‌সে যোগদান করেন। গ্রাম্য শিল্পসম্পদ সংগ্রহ ব্যাপারে শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া দেশী শিল্পের মূল ভঙ্গীটির পরিচয় পাইয়াও সুধাংশুকুমার তাঁহার চিত্রকলা সাধনায় সবিশেষ লাভবান হইয়াছেন।

ইতিমধ্যেই এই তরুণ শিল্পী গুণীসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটির শিল্প প্রদর্শনীতে ইনি উড্‌কট বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পান এবং ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে পর পর দুই বৎসর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের শিল্প প্রদর্শনীতে ঐ বিষয়ে প্রথম পুরস্কারের সুবর্ণপদক লাভ করেন।

বর্ত্তমান চিত্রশালার ছবিগুলির মধ্যে চারখানি প্রতিকৃতি ও তিনখানি নৈসর্গিক দৃশ্য। প্রতিকৃতি অঙ্কনে সুধাংশুকুমার সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। শিল্পী কাঠ খুদিয়া কেবল মানুষকেই দেখান নাই—মানুষের অন্তরটি পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথার্থ শিল্প-রসিকের নিকট ফটোগ্রাফী হইতে উড্‌কটের এই প্রতিকৃতি, যাহার মধ্যে আলোছায়ার সবল ও বিচিত্র সমাবেশ এমনভাবে সম্ভবপর, নিশ্চয়ই অধিকতর সমাদৃত হইবে। নৈসর্গিক দৃশ্যগুলির মধ্যে শহরের কঙ্কাল ছবিটিতে সৌধরাজির মধ্যে নিষ্পত্র বৃক্ষটিতে শহরের কঙ্কাল নগ্ন ও বীভৎসরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুধাংশুকুমারের অঙ্কিত উড্‌কট এবং লিনোকটের চিত্রাবলী হইতে নির্ব্বাচিত ১৫ খানি চিত্র লইয়া একটি অ্যালবাম শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ রসকার শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট্ এবং শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস। উড্‌কট ও লিনোকট চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে সুধাংশুকুমার কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের লেখা হইতে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইবে। বিচিত্রার পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য আমরা অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"In a remarkable series of Wood-cuts and Lino-cuts, some of which are assembed in this album, the young artist has shown great power of vision, and, of exacting and incisive craftsmanship. * * * In his portraits there is a *bravura* of characterisation and technique which is very srtiking. In his impressions of suburban scenes, there is a remarkable feeling for the essentials, marked by a rare sense of decoration which is truly wonderful."

সম্পাদক—



শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ



ছায়াবীথি

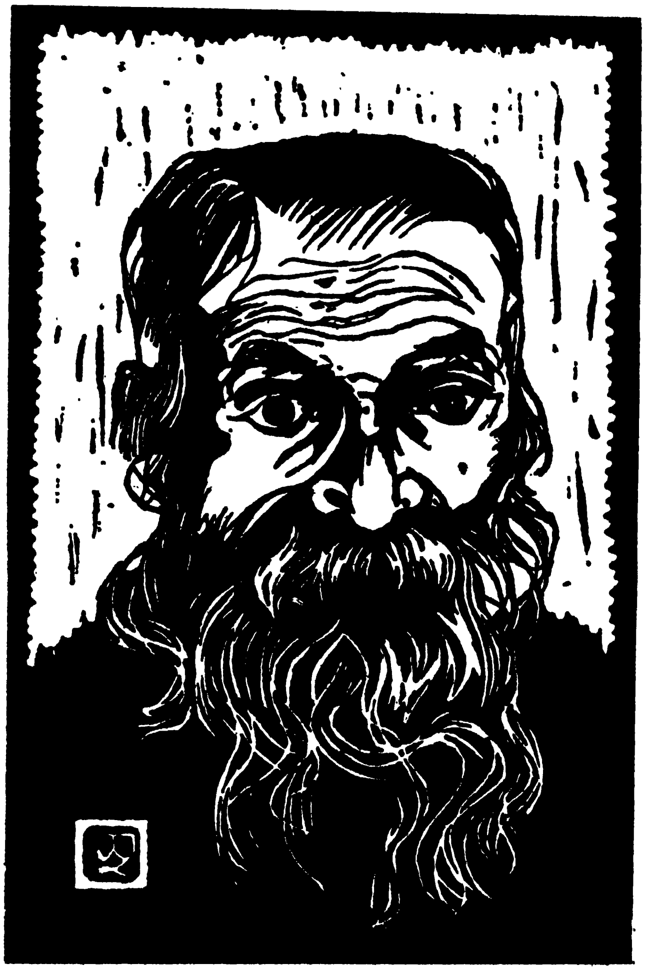
চিত্রশালা

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের

উড্‌কাট্‌ চিত্রাবলী



বৃক্ষ দেবতা



মনের ছাপ



গ্রাম বৃদ্ধ



চিন্তা



বাউল



শহরের কঙ্কাল

কাব্যে অস্পষ্টতা

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

মানব-মনের ক্রমঃবিকাশের সহিত কবিতা ক্লাশিকের যুগ ছাড়াইয়া রোমাণ্টিকের যুগে পৌছিয়াছে। চিন্তারাশি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া রোমাণ্টিকের নব রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। Classicism বা বুদ্ধিতন্ত্র সাহিত্যের শাসন-সংযত ভঙ্গীমাহীন আড়ষ্টরূপকে অপছন্দ করিয়া নবযুগের রূপকার তাহার অসীম অতৃপ্তি লইয়া Romantic মনের নব নব রংয়ের তুলিতে বৈচিত্র্যময় ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছেন। তাই অনুপ্রাসের রঙ্গ, যমকের ধাঁধা, বাছা বাছা শব্দের কারুকার্য্য বা তত্ত্বের পাণ্ডিত্য দ্বারা বুদ্ধির খেলা জমাইয়া তুলিতে কবির আর আনন্দ নাই। বুদ্ধিসাধ্যের স্থান আজ সঙ্গীত-গর্ভ গভীর-প্রাণ-রসে পরিপূর্ণ। কবির অনন্ত রংয়ে রঙীন মনের অর্দ্ধব্যক্ত আঁকুতি-ই আজ তাহার শিল্প। প্রাণের গভীর আবেগ যখন সঙ্গীতে আচ্ছন্ন হইয়া যায় তখন অসংখ্য সুর-সমারোহে এক অর্দ্ধস্ফুট অপরূপ রূপ লইয়া সে আপনাকে জ্ঞাপন করে। সন্ধ্যার জোনাকির ন্যায় অকথিত লক্ষ বাণী চারিদিক ভরিয়া ফুটিয়া ওঠে। এমনি অন্তহীন সুর-তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া কবির ভাবাবেগ চতুর্দ্দিকে যদি অনির্ব্বচনীয়তা সৃজন করিতে পারে, যদি অন্তরে অন্তরে রামধনুকের সপ্ত রং ছড়াইয়া দিতে পারে তবেই কবির সার্থকতা। কবিতা হইবে কবির চতুর্দ্দিকস্থ বিধাতার অনন্ত ইঙ্গিত-গড়া বিশ্ব-কাব্যেরই অনুরূপ। মনীষী এমার্সন বলেন—

God Himself does not speak prose; but communicate with us by hints, inference and dark resemblances in objects lying all round us.

সৌন্দর্য্য-রসের উৎস বিশ্বের মহাকবিও স্পষ্ট ভাষার পরিবর্ত্তে সৃষ্টির রোমে রোমে ইঙ্গিত রচনা দ্বারাই বিচিত্র মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ইঙ্গিত-হীনতা কেবলই নীরস গদ্য। বলার চেয়ে না-বলার হাজার ভাষায় থাকিবে কবির সৃষ্টি সমাচ্ছন্ন। সুতরাং কবির নিবিড় প্রাণের Babbling বা আধ-আধ বুলি-ই কাব্য। কাব্যে কবি Suggests much more than he says. There is no hint of finality—A. C. Hearn.

কাব্য-পাঠ যেন প্রজাপতির অন্তহীন ঝিল্‌মিল্ গতির পিছনে ছুটিয়া চলা, সেখানে শেষ নাই, বিরাম নাই, সম্মুখে নব নব সৌন্দর্য্যের ঢেউ। বুদ্ধির সচেতন গতি, বাঁধাধরা পথ এই Atmosphere of infinite suggestion গড়িয়া তুলিতে পারে না। তাহাতে সঙ্গীত নাই তাই প্রাণকে নাড়া দেয় না, স্বপ্নে স্বপ্নে নয়ন আচ্ছন্ন করে না, আমাদের দুঃখকে আরো দুঃখপূর্ণ, আনন্দকে আরো আনন্দপূর্ণ এবং জীবনকে আরো জীবন্ত করিয়া তোলে না। তাহার অনুভব সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া যায়। সেখানে চেতনা অব্যাহত তাই লীলা নাই হিন্দোল নাই। কিন্তু ভাবতান্ত্রিক কবি ভাবের আকুলতায় সুরের দোলে দোলে আত্মভোলা হইয়া কোন্ অজ্ঞাত চালকের চালনায় সৃষ্টি করিয়া করিয়া চলে। চলার আনন্দে চলিতে থাকে। চলিতে চলিতে কোথায় যাইয়া থামিবে নিজেই জানেনা। অতএব কবির স্বপ্ন বিশ্বপ্রকৃতির রচনার ছন্দ-সুরের মিলে মিলে স্বভাব-সুন্দরকেই মূর্ত্ত করিয়া তোলে। তাহাতে যাহা পাই তাহা অব্যক্ত অখণ্ড সৌন্দর্য্য।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র।" পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবনের মাঝে দাঁড়াইয়া আঁখি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যে পাইতেছি, কি যে উপভোগ করিতেছি তাহা যেন ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইতে পারি না কাব্যের উপভোগেও

তেমনি। রসস্বাদ "ব্রহ্মস্বাদ সহোদর," ব্রহ্মস্বাদেরই মতো।

গুঙ্গে মহা অমৃত রস্থ চাখি আ।
পুছে কহনু ন জাঈহো।

—রামদেব

যে বোবা অমৃত চাখিয়াছে তাহাকে অমৃত কেমন জিজ্ঞাসা করিলে সে যেমন বর্ণনা করিতে পারে না আমিও তেমনি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মস্বাদ সম্বন্ধে রামদেব এই যে উত্তর দিয়াছিলেন রসোবৈসঃ সেই রসস্বরূপের রসরূপ কাব্যের স্বাদ সম্বন্ধেও সেই একই জবাব। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"একটা কিছু বুঝাইবার জন্য কেহত কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন ব'লে বুঝিলাম না তখন বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেহ ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।"

কবির অন্তর এমনি গন্ধ হইয়াই কাব্যে প্রকাশিত হয়। অন্তর্জগতের অন্তর হইতে যে সঙ্গীত আসে তাহা নিখিলের সকল সুরের এক অখণ্ড রাগিণীতে বাজিয়া ওঠে। গভীরতার রাজ্যের রূপ বিশ্বের সকল রূপের এক অবিশ্লেষণীয় আকারে পরিমূর্ত্ত হয়। অস্পষ্টতা কবির স্বেচ্ছারচিত ধাঁধা নয়—যদিও এইরূপ রচনার জন্য কবি সময় সময় কঠোর তিরস্কার শুনিয়া থাকেন। সমালোচকের তীব্র খোঁচায় ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া সরলভাবে অথচ অভিমানমিশ্রিত ভাষায় কবি ব্রাউনিং জবাব দিয়াছিলেন—that my writing has been in the main too hard for many I should have been pleased to communicate with; but I never designedly tried to puzzle people, as some of my critics have supposed. On the other hand, I never pretended to offer such literature, as should be a substitute for a cigar or a game at dominoes to an idle man. So perhaps on the whole, I get my deserts and something over—not a crowd, but a few I value more"

সৌন্দর্য্যের প্রকাশে চেষ্টার স্থান নাই, তাই কবিতা হইয়াছে 'স্বয়মাগতা'। ফুলের মতো আপনার অজ্ঞাতে আপনি কবি ফুটিয়া ওঠে—কি হইতে কি হইল কিছুই জানে না, কেহ গন্ধ লইবে কিনা তাহাও ভাবিতে পারে না। John Stuart Mill বলেন All poetry is of the nature of soliloquy. কবি আপনার আনন্দে আপনার গান গাহিয়া যায়।

কাব্য লইয়া যাহারা সখ করিতে চায় কাব্য যে তাহাদের জন্য নয় ব্রাউনিং তাহাও শুনাইয়াছেন। সখ করিয়া অল্প মূল্যের চা, কাফি, সিগারেট বা চলার পথে এক খিলি পান খাওয়ার মত খেয়ালে ইহার স্বাদ গ্রহণ চলে না।

আসল কথা সৌন্দর্য্য-বোধে চাই সূক্ষ্ম অনুভূতি। কারণ সৌন্দর্য্য বস্তুর আত্মায়—রূপকারের আনন্দে। প্রাণের রূপ বুদ্ধির চক্ষুর আগোচর। অতীন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রিয়েরই সাহায্যে পাওয়া যায়। বুদ্ধি বড় হিসাবী—কেবল বস্তুকে, প্রয়োজনকেই খোঁজে। কবিতা অবস্তু, প্রয়োজনের অতীত কিছু। ইহার উপভোগের পথ আনন্দের পথ, আত্মার পথ। সুতরাং কাব্য-পাঠের মুহূর্ত্তে দরকার এই বস্তু-বুদ্ধিমুক্ত আত্মার।

আনন্দসমাহিত কবি জীবনব্যাপী সাধনার ফলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া যে অমৃত মন্থন করে, তাহা গয়লানীর হিসাব ও প্রতিবেশীর সীমানা ভাগের কলহকে মাথায় বোঝাই করিয়া এক নিশ্বাসে আস্বাদ করিতে যাইয়া যদি ব্যর্থ হই তবে তাহাতে অভিমান করিবার কি থাকিতে পারে?

অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

একদা তুমি প্রিয়ে

শ্রীধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ছোট্ট নদীর ধার, অ্যানিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে ব'লে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারি রাস্তার একধারে ঝাউ গাছের সার, অন্যধারে জলরেখার কিছু ওপরে কাসের বন। দীর্ঘ ঝাউগাছের গথিক্ উচ্চাভিলাষ, কাসগুচ্ছের সাদিক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষকম্পন, এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূলাকেতুর পুচ্ছ সম্মার্জ্জন বর্ত্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুর ভাবে সচেতন ক'রে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প ব'লতে হ'লে ভ্রমণরত বন্ধুযুগলকে কোন গাছের তলায় বসতে হয়। সে রকম উপযুক্ত স্থানও পাওয়া যায় না যে তা নয়। ঝাউগাছের শ্রেণী যেখানে বন্যার কৃপায় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তারই হাত কয়েক দূরে তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে বড়লোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার-তলায় বসে পড়লেন। একজন বল্লেন, "এ যেন সেই ছবির 'তিন বোন'- এঁরা তিনজনে এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে, শোন।"

অন্য বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না শোনবার কোন প্রেরণা পাচ্ছি না, বরঞ্চ আমি গান গাই, তুমি শোন। প্রেমের গল্প চলবে না।"

"বেশ তাই গাও। আমি সমালোচনা করব।"

গান সুরু হল। গানটি রবীন্দ্রনাথের—

"একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে,
বসেছ ফুলসাজে,...
সে কথা কি গেছ ভুলে?"

গায়কের কণ্ঠে মাধুর্য্য ছিল, কিন্তু সঙ্গীত রচনার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীনসত্তার প্রতি গায়কের কোন শ্রদ্ধার নিদর্শন ছিল না ব'লে গানটি বোধ হয় জমল না। গায়কও অন্তরার প্রথম চরণটি শেষ করলেন না। 'সেথা যে বহে নদী, নিরবধি, সে ভোলে নি...ইত্যাদি, ইত্যাদি' এই বলে উঠ্‌তে চাইলেন।

বন্ধু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, 'তোমার রবি ঠাকুরের গান হয় না। সে যাক্‌গে, আমি বলি রবি ঠাকুরের গান ভাল, তুমি বল খারাপ, এই নিয়ে এস তর্ক করি। সময় কাটাতে হবে ত?"

"তার চেয়ে, আমি বলি ভাল, তুমি বল খারাপ।"

"ভালই হোক্, আর খারাপই হোক্ এ কথা সুনিশ্চিত, তোমার মুখে এই গানটি খাপ্ খায় না।"

"কেন?"

"এ গানটার মধ্যে এমন একটা অভিমান ও আফ্‌শোষের সুর রয়েছে যেটা তোমার কণ্ঠে ধরা পড়বে না। ঐ গানটিতে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে একটা আদর্শবাদ ও সংযম, যাকে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দাম্ভিকতা বলতে পার। আফশোষ, অভিমান, ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান মিলে একটা মিশ্রসুর তৈরী হয়েছে। তুমি কি সেই মিশ্রসুরের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে পার?"

"কেন, পারি না? আমি কি এতই দুর্ব্বল?"

"না, তোমার প্রকৃতি ভিন্ন-ধরণের। তোমার প্রিয়া যদি তোমার কাছে ঐ রকমভাবে আত্মনিবেদন করতেন, তা হলে সে আত্মনিবেদনের স্মৃতি কেবল নৈসর্গিক-দৃশ্যের মধ্যে জাগরূক দেখে তুমি সান্ত্বনা পেতে না নিশ্চয়ই। তোমাকে অপমান করছি না। তোমার পুরুষকারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।"

"আর সে কাজ বুঝি তুমি পারতে?"

"আমাকে অত খেলো পাওনি যে নিজের স্বভাব কিংবা নিজের কাহিনী তোমার কাছে ব'লব! জোর, যার মুখে ঐ গানটি শোভা পায় তার স্বভাব আমি বর্ণনা করতে পারি। মানুষটা কাল্পনিক, ঘটনাগুলিও কাল্পনিক ভাবতে হবে, নচেৎ গানের তাৎপর্য্যটি ধরতে পারবে না। একটা গল্প তৈরী করি? শোন তা হলে মন দিয়ে। একটু কল্পনাশক্তিকে খাটাতে হবে।"

"আমাকে ত' জানই! ছেলেবয়সে, মহাষ্টমীর দিন পর্য্যন্ত রঙীন-জামা পরিছি মনে হয় না। বাবার ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতটা অত বড় হয়েছে তার একমাত্র কারণ তাদের পোষাকের বর্ণহীনতা; এবং তাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাদের মেয়েদের পোষাকে বর্ণ সম্বন্ধে দুর্ব্বল উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রমাণস্বরূপ পশুপক্ষী ও সাঁওতালদের বর্ণপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতেন। বাবার এই শিক্ষা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। কল্পনা আমার ধাতে আসে না। রবিঠাকুরের গান গাই, অন্যান্য ভদ্রলোকে ও ভদ্রমহিলারা যে কারণে গেয়ে থাকেন, হিন্দুস্থানী-গান জানি না ব'লে, এবং খানিকটা ফ্যাশানের জন্য। খানিকটা ভালও লাগে, কি রকম গা টা গুড়গুড়ি দিয়ে ওঠে। তুমি আমাকে কল্পনার সাহায্য নিতে বোলো না। বাস্তব, অর্থাৎ বোধগম্য উপায়ে গানটির উপযুক্ত গায়কের চরিত্র-বর্ণনা কর।"

"ফটোগ্রাফ্ তুলে তার ওপর রং লাগাতে বলছ! ও কাজটা অনেকেই করেন জানি। কিন্তু রবি ঠাকুর ও কাজ করেন না, তাইত' তাঁর কবিতা, বিশেষ ক'রে তাঁর ছবি অত উদ্ভটজনক। বেশ, সহজে বুঝতে চাও ত' তোমাকে আমাকে নিয়েই গল্প ফাঁদি? শেষে আপত্তি কোরো না যেন!"

"যতক্ষণ না কল্পনাকে খাটাতে বলছ, ততক্ষণ সব করতে রাজি। আরম্ভ কর।"

"ধর, তোমার বিবাহ হয়েছে একজন অর্দ্ধশিক্ষিতা ও বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে, এবং আমি অবিবাহিত। আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ।"

"দেখতে কেমন?"

"কি লোভী!"

"বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তা হলে বিবাহ দিও না।"

"দিতে হবে অনেক কারণে। অন্যতম কারণ, গল্পের গূঢ় অভিসন্ধি। বড়লোকের মেয়ে না হলে কোন বাঙ্গালী মহিলার মানসিক অবস্থা প্রেমে পড়বার উপযুক্ত হয় না। ভাল করে ঘি-দুধ খেয়ে দেহটাকে শ্রীযুক্তের ছবির মতন ক'রে তোলা চাই; অবসর উপভোগ ক'রে ক'রে সংসার-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওয়া চাই, তবেই প্রেম নামক সৌখীন-নেশাটা জমে। যাঁকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চার ধখল্ সইতে হয়ে, তিনি যদি কোন দুর্লভ অবসরে 'মহুয়ার' পাতাও ওল্টান্, তবুও তাঁর মন কারুর প্রতি দুর্ব্বল হয় না। জোর তাঁর মনে 'অপরাজিত'-এর অপর্ণার মতন স্বামীভক্তিই ফুটে উঠতে পারে। আর বিংশ শতাব্দীতে স্বামীর সঙ্গে প্রেম নিয়ে গল্প, মা'র ছবির ওপর কবিতা লেখার মতনই অচল, অতএব অসম্ভব। আমি তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়াতে চাই।"

"এমন উপযুক্ত লোক কোথায় তিনি পাবেন, আমিই বা কোথায় পাব! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, করুণাময় স্বামীর বন্ধু!"

"কি করে প্রেমে পড়েছেন জানতে এখন চেয়ো না। আগে তোমার স্ত্রীকে চেন। তোমার স্ত্রীর শ্রেণী যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন তাঁর চেহারা ও চরিত্রের অনেকটা বলা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর জীবনে বিদ্যাসাগরের ভাষায় প্রলোভন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভূমার সন্ধান, তরুণের ভাষায় বড়'র আহ্বান কিছুই আসে নি, এবং সেইজন্যেই তিনি তোমার ও তোমাদের সমাজের চক্ষে সতী সাধ্বী। অর্থাৎ, তিনি, তাঁরই পিতৃদত্ত মোটরে তোমার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যান, এসেই, বাড়ি ঢুকেই, অসহ্য গরমে তোমারই কষ্ট নিবারণের জন্য, পাখাটা পুরোপুরি খুলে দেন; খাবার সময় এক সঙ্গে না খেলেও—শ্বেত পাথরের মেজেতে থাবড়ী খেয়ে ব'সে বাপের বাড়ির বুড়ো ঝির অদ্ভুত বড়ি দেবার ক্ষমতার ইতিহাস বলেন, তারপর পান জর্দ্দা খেতে খেতে পান খেলে তোমার 'পাওরিয়া' হবে বলে তোমাকে মানা করেন। রাতে দাঁড়া-আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে তোমার মুখ থেকে, একবার মাত্র

একবারটি নিজের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা প্রত্যাশা করেন। ঘুৎসই ক'রে সুখ্যাতি না করতে পারলে সারারাত মান-অভিমান, সাধাসাধির পালা। সকালে উঠলেই মাথা ঘোরে ব'লে বিছানায় পার্সী বেড়ালের মতন শুয়ে থাকা, আটটার সময়, প্রসাধানান্তে, লুচি-হালুয়া ও ঠাণ্ডা চা, দশটার সময় তোমার খাবার কাছে বসা, বেলা বারটায় যৎসামান্য জলযোগের পর মাসিকপত্রের গল্প পাঠ করতে করতে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গের পর—উঃ, সেই সময়টায় ভারি কষ্ট, ক্লান্তি, অবসাদ, অতটা ঘুমের পর খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তোমার শ্বশুরের ইটের কল থেকে মোটরে না ফিরছ। এই সময়টাই দিবাস্বপ্ন দেখতে হয়, এই গল্পটার, ঐ নভেলটার নায়িকার অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হয়, নচেৎ কি করবেন তুমিই বল? কল থেকে একটু আগেই না হয় ফিরলে? তোমার কাজের মুখে ছাই পড়ুক। যার জন্য তোমার কাজ তাকে ভোলো কোন হিসেবে? যা হোক, দেরী করে যখন এসেইছ তখন সতীকে নিয়ে একবার বায়স্কোপ যাও। অনুগ্রহ করে বায়স্কোপ দেখতে দেখতে, কিংবা টকি শুনতে শুনতে যদি কেউ কাউকে চুমু খায় তা হলে হেঁসে ফেল না, কিংবা তাঁর ক'ড়ে আঙুলে চিমটি কেটো না, তোমার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধা হবেন্। তোমার মনের ভিতরকার ভাবটা ধরে ফেলবেন, আর লোকলজ্জায়, অর্থাৎ তাঁরই ভয়ে তুমি যে ভদ্র হয়ে চল একথা শুনতে হবে এই হল তোমার স্ত্রীর চরিত্র বর্ণনা। বুদ্ধি থাকলে বুঝবে।"

"সোজা ক'রে বল।"

"এইবার তোমার বন্ধুর চরিত্র আঁকছি। তোমার স্ত্রীটি বড় ভাল। অর্থাৎ তিনি ভালও হতে পারেন মন্দও হতে পারেন। তুমি যেমন তাঁর অবস্থার ক্রীতদাস, তেমনি তিনিও তাঁর বাপের অবস্থার ক্রীতদাসী। এ হেন স্ত্রীর স্বামীর একজন বন্ধু আছেন। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্যের অভাবে এই শ্রেণীর মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আশা করা যায়। কিন্তু যতটুকু পাওয়া উচিৎ, ততটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলের মনে অল্পবয়স থেকেই, গোটা কয়েক কুসংস্কার গেঁথে দেওয়া হয়, যেমন loyalty—কিনা বন্ধুবাৎসল্য, honour, যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই কর্ত্তব্য জ্ঞান বলতে পার, ও আদর্শবাদ অর্থাৎ idealism প্রভৃতি। এই সব সংস্কারগুলি তোমার বন্ধুর চরিত্রকে একেবারে বৈচিত্র্যহীন ক'রে তুলেছিল। সেজন্য তাকে নেহাৎ গোবেচারি মনে হত। আদর্শবাদই তার চরিত্রের মূলসূত্র। গোটা কয়েক উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। তার বিশ্বাস ছিল যে নারীজাতি পুরুষের দ্বারা চিরকাল ধর্ষিত হয়ে এসেছে। অতএব নারীজাগণের জন্য সে রাবণের উপায় গ্রহণ করতেও দ্বিধা করত না, 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'জয়শ্রী'তে তার বেনামী প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা ঢাকঢোলের আওয়াজ পাওয়া যেত। সে বিশ্বাস করেছিল যে ১৯২০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ পাব, যখন পেলাম না তখন কারণ দেখিয়েছিল মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের অনাস্থা। সে আমারিকান ম্যাগাজিন পড়ত; গ্যারিবল্ডির জীবনী, ভোল্শিভিজমের ইতিহাস, রুষের বিপ্লবকাহিনী, ম্যাকস্যুইনীর ও সুনইয়ৎসেনের জীবন-কথা তার কণ্ঠস্থ ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক আশ্রমকে অর্থসাহায্য করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য ছিল না বলে প্রায় সব সভাতেই তাকে যোগ দিতে হত। আর যেদিন হাতে কাজ থাকত না সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়ীতে বসে গ্রামোফোন ও রেডিওতে শ্রীআঙ্গুরবালার গান শুনত। কিন্তু তাই ব'লে দু চারখানা রবি ঠাকুরের, দশবিশটা অতুলপ্রসাদের, এবং বিশত্রিশটা কাজি নজরুলের গান শোনবার ক্ষমতা তার ছিল না একথা ভেবো না। সে তোমার স্ত্রীকে ঐ গানগুলোই শিখিয়েছিল।

এবার তার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদাহরণ শোন। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর যাবতীয় খবর জানা। তারপর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সাহায্যে সর্ব্বদেশের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হওয়া। বিকেলে মোহনবাগানের খেলা দেখা, ফেরবার পথে শ্রমিকসঙ্ঘের পথিক-সভায় কিংবা নৈশবিদ্যালয়ের মাসিক ভোজে যোগদান, প্রায় রোজই তোমাদের বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে গান শেখান, চীন-জাপানের যুদ্ধ-কথা। তরুণ-সাহিত্য, তরুণ-চিত্রকলা ও নাট্যকলা, তরুণের অভিযান, স্ত্রী-জাগরণের

বিবরণ শোনান—এ সব কাজ সে কর্ত্তব্য বোধেই করত। সেইজন্য তার মতামতে একটা একাগ্রতা, মননে একটা উচ্ছ্বাস ও বচনে একটা উন্মাদনা ছিল। এ গুণগুলির অস্তিত্ব তোমার স্ত্রী ভাল করে না হোক আব্ছা গোছের সন্দেহ করেছিলেন ভাবা যেতে পারে। অন্ততঃ এ ধারণাটুকু তাঁর ছিল যে কোথায় যেন তাঁর স্বামীর ও সেই স্বামীর বন্ধুর মধ্যে একটা পার্থক্য র'য়ে গেছে। তাঁর পার্থক্য-অনুভূতির খবরও বন্ধুটি জানত। তুমি জানতে কিংবা জানতে না, হয়ত জানাতে চাইতে না। সেইজন্য, তুমি যখন টাকার তাগিদ দিতে বিদেশ যেতে, তখন তোমার বন্ধুর চার্জ্জে তোমার স্ত্রীকে রেখে যাওয়াটা তাঁর বাপের বাড়ী প্যাঠান'র চেয়ে সমীচীন ভাব্তে। বন্ধুর প্রতি তোমার প্রগাঢ় বিশ্বাস এইটাই হ'ল তার কর্ত্তব্যবোধের সব চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র। বন্ধু-বাৎসল্য, গোটাকয়েক সনাতন বিশ্বাসে অল্প-আস্থা—এ সব সদ্‌গুণ তার চরিত্রে কত পরিমাণে ছিল গল্পের মধ্যেই পাবে।"

"এবার গল্প সুরু হোক্।"

"গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতেই গল্প তৈরী হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে না কি? গল্প এক রকম হ'য়েই গেছে। অর্থাৎ এখন থেকে যে ঘটনা বিবৃতি করব, সেগুলি এই তিনটি চরিত্রের সম্পর্কে হতে বাধ্য। আচ্ছা, আরও একটু বিশদ ক'রে বলি। তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার স্ত্রীর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের প্রতি বড়লোকের মেয়ের অনুকম্পা এবং কর্ম্মবীরের স্ত্রীর বাক্যবীরের প্রতি মোহ, এই দু'এর এক দৈব সংমিশ্রণ। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বন্ধুর মনোভাবটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মোহ ও হিংসার; হিংসাটা তুলে রাখা হয়েছিল খানিকটা তোমার জন্য, খানিকটা ধনী সম্প্রদায়ের জন্য। হিংসাটা ভাল ক'রে প্রকাশ পেত শ্রমিকসঙ্ঘের পাক্ষিক সভার বক্তৃতায়। এই মোহ, ধনী সম্প্রদায়ের ওপর এই রাগ ও তার এক অনুপযুক্ত প্রতিনিধির ওপর অভিমান চমৎকার মিশে গিয়েছিল তার আদর্শবাদের সঙ্গে। সে ভাবত, তোমার স্ত্রীর গহনা-গাঁটি - মোটর রেডিও থাকা সত্ত্বেও সে ভারী গরীব, একাকিনী, বন্ধুহীনা, নির্জ্জন পথের যাত্রী। কিন্তু তোমার চরিত্রের প্রশংসায় সে ছিল শতমুখ। এই সব কারণে তোমার স্ত্রী ও তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা আদর্শ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তোমার স্ত্রী যদি পুরুষ হতেন, তা হলে সে সম্বন্ধকে প্লেটনিক্ বলা চল্‌ত। বিধাতার ইচ্ছা যখন বিপরীত, তখন তাকে মধ্যযুগীয় বলতে বাধ্য।

"আর আমি! আমি কোথায় রইলাম?"

"আরে তোমাকে বাদ দিয়ে কি গল্প হয়! তুমিই ত গল্পের নায়ক! তবে এমন নায়ক নও যে সর্ব্বদাই রঙ্গমঞ্চের সবখানি যুড়ে আছ। তুমিই সব, তবে গোপনে, অলক্ষ্যে। চক্রের যেমন কেন্দ্র, এ বিশ্বের যেমন ব্রহ্ম, জুলিয়াস সীজার নাটকের শেষ অঙ্কগুলিতেও যেমন সীজার, ঘরে-বাইরের যেমন মাষ্টারমশাই, সুরের যেমন বাদী স্বর, রেমব্রাণ্টের ছবির কোন থেকে যেমন আলোর একটি রেখাপাত, তেমনি তুমি আমার গল্পের। লোকে ভাবছে তুমি নিষ্ক্রিয় অনাবশ্যকীর, অনুবাদী ইত্যাদি, তা নয়। তুমি ব্যাকরণের অব্যয়। অভিমান কোরো না।"

"ওটা আমার ধাতে নেই।"

"সেই জন্যই ত ঐ গানটা তোমার মুখে শোভা পায় না বল্‌ছি। আচ্ছা ধরাই যাক্, তোমার মনোভাব বলে কিছু নেই। ও সব বালাই নেই তোমার। খাঁটি বৈজ্ঞানিক তুমি, মন তোমার সুস্থ। এবার গল্প শোন। প্রথম ঘটনাটি ঘটে তোমারই সামনে। হয়ত তোমায় মনে নেই। রেডিও বন্ধ ক'রে তোমার স্ত্রীকে 'সেই' গানটি গাইতে ব'ল্‌লে। তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সামনে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধজনোচিত গোপন ইঙ্গিতটা তিনি পছন্দ না করে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। যে গানটি গাইলেন সেটি তোমার বন্ধুর কাছেই শেখা। কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান—'কেন কাঁদে পরাণ, কি বেদনা কারে কহি?' প্রথম লাইনটা শুনেই তুমি ঠাট্টা করলে, 'কাঁদবার প্রয়োজন নেই, আমার কান্না ভালও লাগে না। বেদনাটা কি আমাকে যদি না বল, ত এঁকেই বল না।'

তোমার বন্ধু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'না, না, আমাকে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কান্না ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু ওঁর যে বেদনা থাকতে পারে তোমার বোঝা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষের, বিশেষত, প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে একটা সৃজনী-শক্তি সুপ্ত থাকেই থাকে, তাকে জাগ্রত, তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কোন কর্ম্মে নিয়োজিত না করতে পারলে বেদনা বোধ করতেই হবে। অন্য বেদনার কথা বলছি না। তুমি লেডী ডাক্তারের কথা তুলে একটা সস্তা বদরসিকতা করাতে সেদিনের সভাভঙ্গ হয়। পরের দিন সকালেই তুমি বাইরে চলে যাও। বন্ধু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বৈঠকখানায় এসে অনেক ক'রে তোমার স্ত্রীর—তিঁনি তখন তোমার স্ত্রী নন্, সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতিভূ—মনোরঞ্জন করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর চেষ্টা সফল হল না। লাভের মধ্যে, বন্ধুকে গোটা কয়েক কটু কথা শুনতে হল—এই যেমন, 'আমাকে আর গান শেখাবেন না, আমি গাইতে জানি না, আমার গলা খারাপ, তাল আমার হয় না।' বন্ধু খুব জোরেই প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস আনতে পারলেন না। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেল্লেন—'বেদনাটা কি?' 'বেদনা, বেদনা ত কিছু নেই! আমি খুব সুখী, আমার মত সুখী কেউ নেই'। 'এ জগতে সুখ কারুর নেই, যতদিন পর্য্যন্ত একটা প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে ততদিন কারুর সুখের অধিকার পর্য্যন্ত নেই।'

'পরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না।'

'আমি জানি কাঁদে, খুবই কাঁদে। যদি নাও কাঁদে, নিজের জন্যও ত' কাঁদে? বাস্তবিক, তাই হওয়া চাই। যার নিজের জন্য প্রাণ কাঁদে না, তার পরের জন্য কি সহানুভূতি হতে পারে? আমি জানি আপনার হৃদয় কত কোমল। বেশী কোমল বলেই ত আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ পাই। দেখুন, আমারও আপনার অবস্থা, তবে আমার হাতে নাকি বিস্তর কাজ, তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকি, নিজেকে ভুলে থাকি। কিন্তু, যখন একলা থাকি তখন এমন একটা নিষ্ফলতা আমাকে আচ্ছন্ন করে যে আমার দমবন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই।'

'ও সব ভাববেন না, আমার মতন হয়ে যাবেন। কেন এখানে আসেন না? কিই বা দিতে পারি, তাও নয়।'

'একমাত্র এখানেই আসতে ইচ্ছে করে। আপনি কি দিতে পারেন? সে যাক্। কিন্তু আসা উচিৎ নয়।

'লোকে কি ভাববে? আপনাকে ত' সকলেই চেনে।'

'আচ্ছা, এবার থেকে সময় পেলেই আসব।'

'আসবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে গান শেখাবেন না।'

'কেন? গান গাইতে পারি না হয়ত, কিন্তু হয়ত শেখাতে পারি কিছু কিছু।'

'খুব পারেন আমার বিশ্বাস, তবু শেখাবেন না।'

'তবে কেন শেখাব না বলতেই হবে।'

'গান সকলে ভালবাসেন না।'

'ওঃ বুঝেছি।'

আদর্শবাদ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সংযম বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো কেমন তোমার বন্ধুর মনকে আচ্ছন্ন করেছে বুঝলে? ঐ ছোট্ট 'ওঃ বুঝেছি' কথাটা বড় গভীর।"

"সবই বুঝলাম। আমার মনে হয় দুজনই এক ছাঁচে ঢালা, অবস্থা ভিন্ন হলে কি হয়? দুজনেই কল্পনা ও ভাব-বিলাসী, দুজনেই silly sentimental।"

"এই সাংসারিক বুদ্ধির জন্যই তোমাকে খাতির করি। আজ যদি সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে রস-জ্ঞান না থেকে সামান্য সাংসারিক বুদ্ধিটুকুও থাকত, তাহলে সমালোচনা অত জোলো হত না। এবার অন্য একটা ঘটনা বলি শোন। এ ঘটনা ঘটে তোমার অনুপস্থিতিতে তুমি ডিহিরীতে না কোথায় ধর চুণ আনতে যাচ্ছিলে, যাবার মুখে, যখন তোমার স্ত্রী গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ধর তুমি ঠাট্টা করে বলেছিলে, "যাত্রার পূর্ব্বে বন্ধ্যার মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়।"

"আমি এ ধরণের ঠাট্টা করতেই পারি না।"

"আলবৎ করতে পার। এইটাই ত' ঘরজামাইএর প্রতিশোধ। শোন। তুমি ত' ডাক্ চলে গেলে, তারপর তোমার স্ত্রীর সামনে দুটি পথ খোলা রইল। একটি গোঁসা

ঘরের দিকে, অন্যটি নিরুদ্দেশে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে ভেসে পড়া। কোন পথে পাঠাই ঠিক্ করতে পারছি না।

"গোঁসা ঘরেই পাঠাও হে।"

ভালই বলেছ। রাস্তায় দাঁড়ানটা মুখোরোচক হলেও তোমার বন্ধুর চরিত্রের সঙ্গে অন্তত খাপ খায় না। তার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ও অন্যান্য কুসংস্কারে বাধে।

"গোঁসা-ঘরে কি হল?"

"বিষ-ভক্ষণ। বন্ধু খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ব্যাপার বেশী কিছু নয়, গোটা আষ্টেক্ জেনাস্পেরিণের বড়ি খেয়েছেন, বুক ধড়্ফড়্ ক'রে অজ্ঞান হয়েছেন। খানিক পরে জ্ঞান হল। সারাদিন তোমার বাড়িতে তোমার বন্ধু রইলেন, সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। রাত্রে পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হল। অনেক রাত পর্য্যন্ত, কারুর ঘুম আসে না, দুজনে চুপ করে সামনা সামনি বৈঠকখানায় বসে রইলেন। শুতে যাবার সময় বন্ধু তোমার স্ত্রীকে বল্লেন, 'প্রতিজ্ঞা করুন, এ ভীষণ কাজ আর করবেন না। যদি প্রতিজ্ঞা করেন, শপথ ক'রে বলেন 'করবেন না, তবেই আমি শোব, তবেই আমি ওকে ব'লব না, তবেই আমি আপনাদের বাড়ি আসব, নচেৎ আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম—আর কখ্খন আসব না।"

"আচ্ছা বলছি, চেষ্টা করব, খুব চেষ্টা করব, কিন্তু কতদূর পারব ব'লতে পারি না। আপনি না এলে আমি—'

'না এলে আপনি কি…?'

'আমার ভাল লাগবে না, আমি বাঁচব না। ও আমাকে যা অপমান করেছে, আপনিই শুধু…, আপনার জন্যই শুধু…' এর পর তোমার বন্ধুর কি অবস্থা হল বুঝতেই পার।"

"কি আবার হল! ও কথা শুনলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না।"

"তোমার বন্ধুও স্থির থাকতে পারলেন যে তা নয়। তবে তিনি তোমার মত কর্ম্মবীর নন, তাই রাতে ঘুম হল না—এই চাঞ্চল্যটুকু তাঁর হল। বন্ধু পরিষ্কার বুঝলেন যে তোমার স্ত্রী তাঁকে ভালবাসেন। যেই বোঝা, অমনি তাঁহার মনেও প্রেম উপজিল। প্রতিদানের কর্ত্তব্য-বোধটা, অতি শীঘ্রই, সমগ্র নারীজাতির প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে মিশে একটা খুব উঁচু ধরণের প্রেমে পরিণত হল। সাধারণতঃ এ রকম উন্নত প্রেমের বিবরণ পাওয়াই যায় না, কিন্তু বাংলাদেশে এর চল্‌তি ও কাট্‌তি দুইই খুব স্বাভাবিক। কোন স্ত্রীলোককে এই ভাবে দেখার সুবিধা কত ভাব! এর মধ্যে আমাদের মজ্জাগত আদর্শবাদের ক্রীড়া চলতে পারে, স্ত্রীজাতিকে নির্য্যাতনের বিষয়বস্তু ভেবে দেহের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই অ-বাস্তব ও অ-পার্থিব, অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রেমের মধ্যে নভেল নাটকের মূল তথ্য কিনা দ্বন্দ্ব রইল না ভেবো না। দ্বন্দ্ব তুল্‌লে কর্ত্তব্যবোধ ও বন্ধু-বাৎসল্য। যদিও তুমি লোকটি সুবিধের নও, তবুও তোমাকে বন্ধু বলে একবার যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেলেঙ্কারি ক'রে কিছু তোমার সেবার ত্রুটি ঘটান যায় না। তা হলে, logically, তোমার বন্ধুর সামনে মাত্র দুটি উপায় খোলা রয়েছে। (১) নিজেকে সরিয়ে নেওয়া—সেটা কি ক'রে সম্ভব বল? বন্ধুর ভাগ্যে প্রেম কখনও হয়নি, একবার ভগবানের কৃপায় যদি বা সিকে ছিঁড়ল, তখন অত বড় অভিজ্ঞতাকে কি করে পায়ে ঠেলে দেয় তুমিই বল। হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মে ঐ ধরণের আদিরসাত্মক অভিজ্ঞতার ওপর একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, জীবনের আহ্বান। তুমি বলবে, অন্যায়, আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার বন্ধুর বেলা সেই অন্যায় প্রবৃত্তি সংযত হল, যা হওয়া উচিৎ। হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিল হলেও তোমার বন্ধুর মনে সামাজিক কর্ত্তব্য-জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয়নি। সেইজন্য logically (২) দ্বিতীয় উপায় রইল তোমার স্ত্রীর মনকে সরিয়ে নিতে তাঁকেই শিক্ষা দেওয়া, তাঁকেই সংযত হতে অনুরোধ করা।"

"আচ্ছা এইটা শেখাতে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল বন্ধুকে?"

"বন্ধুর স্বরূপই হল সংযম জানি। স্বরূপ প্রকাশে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্ট হয় না। তাও বোধ হয়, হয়। তোমার বন্ধুটি আর্টিষ্ট না হলেও আর্টিষ্টিক্ ছিলেন ত' বটে। না হে

না, গম্ভীর হয়ে বলছি, খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। সে কষ্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাকে শোনাব। দেখ, স্ত্রীলোকদের মস্তিষ্কটা অনেকটা অধ্যাপকদের মতন। সেখানে সহজে কোন আইডিয়া প্রবেশ করে না, কিন্তু 'ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে', একবার প্রবেশ করলে আর তাড়ান যায় না। অনেকটা প্যারিসের শান্তি-সভায় লয়েডজর্জ্জ-উইলসনের সম্বাদের মতন ঘটল। তোমার প্রতি কর্ত্তব্য ও বাৎসল্যের তাগিদে বন্ধু এক চাল চাললে। সে তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন সুরু করল। সকাল সন্ধ্যে সেই এক ধুয়া তোমার স্ত্রীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগল—'তোমার মতন দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীর এ জগতে দুর্লভ, তোমার চরিত্র হয়ত মার্জ্জিত নয়, তাঁর পসন্দ-সই নয়, নিশ্চয়ই নয়, হতে পারেই না, কিন্তু তোমার চরিত্র এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিতান্ত উপযুক্ত। একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেছেন—সভ্যতা সম্বন্ধে জার্ম্মাণদের মতই সবচেয়ে সারবান—এ জগতের নায়ক ও আদর্শপুরুষ হল মোটর চালক, অর্থাৎ সোফেয়ারের মতনই কর্ম্মতৎপর। যেকালে তিনি বিংশ শতাব্দীরই মেয়ে, তখন এই যুগের নায়ককেই তাঁকে স্বীকার করতে হবে।' এ যুক্তিতে কিছু কাজ হল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। তখন তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধু নিবেদন করলেন, 'এই যান্ত্রিক-সভ্যতাকে যদি আপনি প্রাণবন্ত না করেন, কে করবে? এ যুগের একমাত্র আশা আপনারা। আপনাদেরই স্নেহ, মমতা, করুণা, প্রেম, নিঃস্বার্থপরতাই এ ধ্বংসোন্মুখী সভ্যতাকে বাঁচাবে। আপনাকে কল্পনা করেই রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী লেখেন। আপনিই নন্দিনী।" এই তুলনামূলক যুক্তি পূর্ব্বের যুক্তির অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হলেও তাঁর হৃদয়াবেগকে রহিত করতে পারলে না। নন্দিনী নামটি শুনে যখন চোখে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তখনই তোমার বন্ধু উপলব্ধি করলে যে যখন ঘোড়া উদ্দাম গতিতে ছুটতে চাইছে, তখন লাগাম ঢিল্ দেওয়াই ভাল। তাই দৈব-দুর্ব্বিপাকে সে বাধ্য হল স্বীকার করতে যে সেও ভালবাসে। এই স্বীকারোক্তিতে আশু ফল লাভ হল। খবরটি শুনে তোমার স্ত্রী গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। চোখের জল আর পড়ে না। বন্ধু তখন ব'লে যেতে লাগলেন—"সে অনেক কথা, যে সব নভেল পড় তাইতে অনেক পাবে।"

'কিন্তু—"

'তবে কিন্তু কেন?'

'কিন্তু এই জন্য যে আমাদের দুজনকেই সংযত হতে হবে। আমিও চিরকাল ভালবাসব, আপনিও ভালবাসবেন, এই রবে চিরকাল! দুটো পাখী পাশাপাশি দুটো খাঁচার মধ্যে থেকে সার্থক হতে পারে না কি?'

'না আপনিই বনের পাখী, আমিই সোনার খাঁচায় থাকি। বেশ, তাই হোক্, আপনি মুক্ত। আমার কপালে যা লেখা আছে, তাই হোক, আপনি মুক্ত। আপনি আর আসবেন না।

'না আসব, তবু। সেইজন্যই ত' আপনাকে দেবী মনে করে পূজো করি। আপনি মানুষ নন, আপনি দেবী।'

"সমগ্রজাতির প্রতিনিধি হয়ে, বিশ্ব-সভ্যতার উন্নতির ভার স্কন্ধে নিয়ে, দেবীত্বের দায়িত্বে তোমার স্ত্রী ঠিক্ সপ্তম দিনের মাথায় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।"

"আমার স্ত্রীকে না ভালবেসে থাকতে পারছিনে যে হে! মোটে সাতদিনে ঠিক্ হয়ে গেলেন।"

"হাঁ মোটে সাত দিন। ধন্য আর্য্য ঋষিরা!"

"কিন্তু, সীতা, সাবিত্রীর আদর্শ সামনে ধরলে না ত?"

"আজকাল ও ব্রহ্মাস্ত্র একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছে।"

"সে যাক্ গে। সেরে ত' গেলেন, তারপর কি হল বল?"

"সে তুমিই জান।"

"আমি কিছুই জানি না। সবই তোমার সৃষ্টি তুমিই বল।"

"তারপর, তোমার স্ত্রী তোমাকেই পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সেবা আরম্ভ হল। আলমারী থেকে গরদের লালপেড়ে সাড়ি বেরোল। ফলে পনের দিনেই তোমার ওজন-বৃদ্ধি। তুমি প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেলে। স্ত্রীজাতির চরিত্র একটু খামখেয়ালী ধরণের জানা থাকলেও তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে। ঠিক্ সন্ধ্যার সময় তুমি আর বাড়ি আস না, তোমার আসতে রাত হতে লাগল। হাতের কাছে নিশ্চিন্তের সন্ধান পেলে এক তোমার বন্ধু ছাড়া অতি বড় সাধুও বিগড়ে যায়। আচ্ছা, তোমাকে একটু দুশ্চরিত্র করব? গল্পটা জমে।"

"না, না, তা কোরো না। কি জানি, তুমি যদি ছাপিয়ে দাও। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কনট্র্যাক্ট পাব না।"

"সে ভয় নেই। বেশ, পূজা পেয়ে পেয়ে তোমার হৃদয় 'পূজারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সেই জন্যই হয়ত ডিহিরি কি কাটনীতে চূণের পাহাড় দেখাতে নিয়ে গেলে। সেখানে থেকে তোমাদের দুজনেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।

"যে দিন ফিরে এলে সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বন্ধু তোমার বাড়িতে হাজরে দিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তুমি অফিস থেকে ফিরলে। তোমার স্ত্রী বৈঠকখানায় এলেন। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে গল্প করতে ব'লে তুমি ভেতরে গেলে। এ-ক'টা মিনিট কি awkwardly কাট্‌ল তা ভগবানই জানেন। সোন নদ কতটা চওড়া, চূণ কি করে পোড়ান হয়, ও অঞ্চলে কি কি খাবার জিনিষ পাওয়া যায় না, যেগুলি যায় তার দাম কত বেশী, রাতে বাঘ এসে গ্রামের গরু বাছুর নিয়ে যায়—এসব কথা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলে, কিন্তু একবার যাদের মধ্যে প্রাণের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে একেবারেই অচল। তুমি যখন ঘরে এলে, তখন তোমার বন্ধু, একটু অনুযোগের স্বরে বল্লেন, 'বনে-জঙ্গলে কেমন রইলে একবার খবর দিতেও পারতে ত? ও অঞ্চলটা কখনও দেখিনি, শুনছি খুবই চমৎকার।' তুমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে ব'ল্লে 'আমারও ইচ্ছে হত, সময় পাই নি, ওঁরও সময় ছিল না, উনিও সারাদিন আমার সঙ্গে বেড়াতেন।'

'ওঃ সেই জন্যই বুঝি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে!'

'তা ছাড়া—হ্যাঁগা, যাবার সময় আমাকে কি স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলে তুমি, বলি?' তোমার স্ত্রী উঠে গেলেন। এমন সাহস হল না যে তোমাকে মুখের ওপর রাগ প্রকাশ করেন। তিনি চলে যাবার পর বন্ধুর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে একটু নীচু স্বরে তুমি বল্লে,—

'ওঁর ভাই আমাকে নিয়ে একটু বাই হয়েছে। যাবার সময় একটা খাম টিকিট চিঠির কাগজ পর্য্যন্ত নিয়ে গেল না হে, ওখানে কিছুই পাওয়া যায় না। এত ক'রে বল্লাম। উত্তর দিলে, আমরা দু'জন আলাদা থাকব, কেবল তুমি আর আমি, আমিও কাউকে লিখব না, তুমিও লিখবে না। আর, কাউকে আসতে বলে হাঙ্গামা বাধিও না, ওখানে খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। আদৎ ব্যাপার, আমি যেন কাউকে চিঠি না লিখি, ওঁরই কাছে কাছে থাকি। একেবারে জোঁক হে জোঁক হয়ে উঠেছে। কতদিন এ খেয়াল থাকে দেখি। তবে সেখানে যেটা মন্দ ঠেকেনি, এখানে তা ঠেক্‌বে না নিশ্চয়। এটা কাজের জগৎ। তুমি ভাই মাঝে মাঝে আগের মতনই এস। আমায় ত' খেটে খেতে হবে!'

"আচ্ছা, তখন তোমার বন্ধুর মনে কি হল বল ত?

"সে আমি কি জানি? চল, রাত হয়েছে!"

"তোমার বন্ধুর মনে যে ভাব হল তারই আভাস পাবে রবি ঠাকুরের গানটিতে—'একদা তুমি প্রিয়ে।' চ'ল, সঙ্গীত-সমালোচনা শেষ হল!"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



কর্ণেল মাদেক

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, পি-আর-এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জাহির সিংহের পরাজয়ে তাঁহার শত্রুগণ পরম উল্লসিত হইল। রাজপুত, মারাঠা, শিখ, রোহিলা, অযোধ্যার নবাব এবং এলাহাবাদ প্রবাসী মোগল সম্রাট সকলেই একযোগে তাঁহাকে আক্রমণে সমুদ্যত হইল। সকলেই বুঝিল এবার আর জাঠদের রক্ষা নাই। হিতৈষীর দল জাহির সিংহকে রাজপুতদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার উপদেশ দিল। কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি প্রাণপণে সম্মিলিত শত্রুগুষ্ঠীকে বাধা প্রদানে সচেষ্ট হইলেন। সাত লক্ষ টাকা পাইয়া শিখরা যুদ্ধে বিরত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। জাহির সিংহ সমরু ও মাদেকের অধীনে সেনাদল বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এজন্য মাদেকের মাসিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বেতন বৃদ্ধি করা হইল। জাহিরসিংহের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মিত্র ইংরাজগণ এই যুদ্ধের বিরোধী হইলেন এবং তাঁহাদের অনুগত সাহআলম ও সুজাউদ্দৌলাকে রণকণ্ডুতি হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন একে একে মিত্রদের সাহায্যলাভে নিরাশ হইয়া রাজপুতরাও স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

জাহিরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রতনসিংহ গদীতে বসিলেন (জুন ১৭৬৮)। ইনি নিতান্ত ভোগবিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যলাভের পরই রতনসিংহ চারি সহস্র নর্ত্তকী সমভিব্যাহারে কৃষ্ণলীলা করিতে মথুরা ও বৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ হইতেন এবং সহচরীগণ গোপিনী হইত! মাদেক এই যাত্রায় রাজার সহগামী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল, নিজের স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে তিনি অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বাহুল্যভয়ে এবং এতদ্দেশীয়ের নিকট সুপরিচিত কাহিনী বলিয়া তাহা আর এখানে প্রদত্ত হইল না।

রতনসিংহের কিন্তু বেশীদিন রাজ্যসুখভোগ করা হয় নাই, রূপানন্দ গোঁসাই নামক এক বৈরাগীর হস্তে অচিরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রণালী জানা আছে বলিয়া ঐ বৈরাগী রাজার সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে না পারিয়া নৃপতির কোপাশঙ্কায় গোঁসাইজী প্রমাদ গণিল এবং বিপদ হইতে উদ্ধারলাভার্থে এক সুযোগে রাজার অনুচরবর্গকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে একা পাইয়া ছুরিকাঘাতে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল! (৮ই এপ্রিল ১৭৬৯)

তখন তাঁহার পুত্র কেরীসিংহ বা খড়্গসিংহ দেড় বৎসরের শিশুমাত্র। সুতরাং রাজপ্রতিনিধির পদ লইয়া বালক রাজার দুই পিতৃব্য নবলসিংহ ও রণজিৎসিংহে বিরোধ বাধিল। সমরু ও মাদেক এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার পক্ষাবলম্বন করিলে কনিষ্ঠ রণজিৎ শিখদের সাহায্যপ্রার্থী হইল। মাদেকের সেনাদল কুম্ভের দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করিল। এ দিকে শিখসেনা তাঁহার সাহায্য কল্পে আসিয়া উপনীত হইল, তখন মাদেক অবরোধ ছাড়িয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংগ্রামে মাদেক সংখ্যায় বলীয়ান শত্রুহস্তে পর্য্যুদস্তপ্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু জাঠসেনা আসিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল। সুচতুর নবলসিংহ ইহার পর প্রচুর অর্থদানে শিখদের তুষ্ট করিলে তাহারা রণজিৎ সিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিল (মার্চ্চ ১৭৭০)। কিন্তু শীঘ্রই অপর এক ক্ষেত্র হইতে রণজিৎ সাহায্য লাভ করিলেন।

পাণিপথের শোচনীয় পরাজয়ের পর (১৭৬১ খৃষ্টাব্দ) কয়েক বৎসর মারাঠাদের মস্তকোত্তোলনের সামর্থ্য ছিল না।[১০] এই সময় তাহারা নিজেদের পূর্ব্বপরাক্রম কতকটা

পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়া নব বলে আবার বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেশবিদেশ অধিকারে ছুটিল (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে)। আবার পঙ্গপালের মত বার্গীর দল চম্বল নদী উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুস্থানের সমতলপ্রদেশে প্রবেশ করিল। তবে এক বিষয়ে সেবারকার মারাঠা আধিপত্য এবং এবারকার মারাঠা আধিপত্যে একটি গুরুতর পার্থক্য ছিল। তখন মারাঠাজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর ছিলেন পেশবা, উত্তরাপথ বিজয়ী মারাঠাবাহিনী ছিল পেশবার সেনাপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত; অপরাপর মারাঠা অধিনায়কবর্গ ছিলেন পেশবার কর্ম্মচারীমাত্র। তখন মারাঠা অধিকার পেশবার আধিপত্য সূচনা করিত। কিন্তু পাণিপথের পরাজয়ের পর পেশবা তাঁহার পূর্ব্বগৌরব অনেকটাই হারাইয়াছিলেন। এবারকার মারাঠা আধিপত্যের নায়ক ছিলেন সিন্ধিয়াকুলগৌরব মহাদজী। তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় আর্য্যাবর্ত্তে মারাঠাপ্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

জাঠরাজ্যে গৃহযুদ্ধের সুযোগে নিজেরা লাভবান হইবার অভিপ্রায়ে মারাঠারা রণজিতের পক্ষাবলম্বন করিল। ৫ই এপ্রিল ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে গোবর্দ্ধন নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরেই কাপুরুষ নবলসিংহ আত্মপ্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। জাঠসেনা মারাঠাদের নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইল। শুধু সমরু ও মাদেকের অসমসাহসের সহিত পলায়ন-পরায়ণ সেনাদলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করার জন্যই জাঠবাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হইল না, নচেৎ মারাঠাদের হস্ত হইতে এক প্রাণীও রক্ষা পাইত না। মাদেক নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে এই যুদ্ধে তাঁহার ১৪০০ জন সৈনিক হতাহত হইয়াছিল।

অতঃপর মারাঠারা এবং তাহাদের দেখাদেখি রোহিলারাও একটির পর একটি করিয়া জাঠদের অধিকৃত জনপদসমূহ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। সূর্য্যমল্লের বহু আয়াসে গঠিত রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নবলসিংহ মারাঠাদের সহিত হীনসন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাদের ৬৫ লক্ষ অর্থদণ্ড, বার্ষিক ১১ লক্ষ টাকা চৌথ এবং রণজিৎকে বিশ লক্ষ টাকার আয়ের জায়গীর দিবার অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন (সেপ্টেম্বর ১৭৭০)।

বিনষ্টপ্রায় ব্রিগেড পুনর্গঠনার্থে নবলসিংহ মাদেককে প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। অতঃপর মাদেক নিজ বাহিনী সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। নূতন সিপাহীদল ভর্ত্তি, তাহাদের শিক্ষাদান, আগ্রার কারখানায় নূতন তোপ ঢালাই এই সকল কার্য্যে ১৭৭১ সাল কাটিয়া গেল। পর বৎসরের প্রারম্ভে নবলসিংহ মাদেককে দোয়াব প্রদেশ হইতে রাজস্বসংগ্রহে পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানে মাদেক খুবই কৃতকার্য্য হইয়া অর্থাৎ প্রভুর এবং নিজের জন্যও যথেষ্ট অর্থ লইয়া ফিরিয়াছিল।

এদিকে মারাঠারা রাজধানী দিল্লী নগরী অধিকার করিয়াছিল। দূরদর্শী রাজনৈতিক সুচতুর মহাদজী জানিতেন যে মোগল সম্রাট নামসর্ব্বস্বে পরিণত হইলেও সে নামের প্রতাপ বা মোহ তখনও কাটে নাই। সুতরাং দিল্লীতে নিজে সাক্ষাৎভাবে আধিপত্য করা অপেক্ষা সাক্ষীগোপাল বাদসাহকে রাজপাটে বসাইয়া তাঁহার নামে আধিপত্য করায় সুবিধা অনেক। ইহা বুঝিয়া তিনি দিল্লী অধিকারের পর সাহ আলমকে তথায় আনিয়া পূর্ব্বপুরুষের তখতে উপবেশন করিতে আহ্বান করিলেন। সাহআলম ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতার শোচনীয় অপমৃত্যুর পর সেই যে দিল্লী ছাড়িয়াছিলেন, এ যাবৎ আর তথায় পদার্পণ করেন নাই। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর তিনি অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত-রূপে এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার সহিত মীরকাসিমের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ইংরাজদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরাজ কোম্পানীকে তৎকর্ত্তৃক বঙ্গবিহারউড়িষ্যার দেওয়ানীপ্রদান ঐতিহাসিকের নিকট সুপরিচিত কাহিনী (১২ আগষ্ট ১৭৬৫)। তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানী তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা নজরাণা দিতেন। এইভাবে ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া তিনি এলাহাবাদে ছয় বৎসরেরও অধিককাল অতিবাহিত করেন। তথাপি মনে মনে মোগলের মহাগৌরবময় তখতের মায়া তিনি কাটাতেই পারেন নাই, বরাবরই দিল্লীর পানে তাঁহার সতৃষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত থাকিত। কিন্তু বিপজ্জনক

রাজধানীতে গিয়া ততোধিক বিপজ্জনক মুকুট পরিবার মত সাহস তাঁহার ছিল না।

সাহআলম জানিতেন যে তাঁহার সুহৃদ ইংরাজ কখনই তাঁহাকে দিল্লীর তথ্‌তে বসিতে সাহায্য করিবেন না। সুতরাং সিন্ধিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ইংরাজের নিষেধ না মানিয়া তিনি মারাঠাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। মহাদজী সসৈন্যে এলাহাবাদ গমন করিলেন এবং তথা হইতে বাদসাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে বাদসাহের অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল।

শীঘ্রই কিন্তু মারাঠা ও মোগলে বিরোধ বাধিল। সাহআলম আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে নির্বিবাদে আধিপত্য ভোগ করিবার জন্য তথ্‌তে বসাইয়া দিয়া মারাঠারা দিল্লী ছাড়িয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু মারাঠাদের সেরূপ কোন ইচ্ছা থাকার লক্ষণ দেখা গেল না। তাহারা দোয়ারপ্রদেশ অধিকার করিয়া রহিল, উহাদের ঔদ্ধত্য ও অর্থগৃধ্নুতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। তখন উত্যক্ত বাদসাহ মারাঠাদের বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনানায়ক মীর্জ্জা নজফ খাঁ পরাজিত হইয়া ফিরিলেন। মারাঠাদের বাদসাহের সহিত বিবাদ দর্শনে নবলসিংহ উল্লসিত হইলেন। উহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে তিনি মাদেককে দিল্লী প্রেরণ করিলেন (অক্টোবর ১৭৭২)। দিল্লীতে আসিয়া মাদেক একেবারে বদলাইয়া গেলেন। জাঠপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাদসাহের কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

জাঠদের নিকট মাদেক বরাবরই ভাল ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা অসন্তোষের কারণ ছিল না। তথাপি কেন যে তিনি পক্ষপরিবর্ত্তন করিলেন তাহা বুঝিতে হইলে কিছু পূর্ব্বকথা বলা প্রয়োজন। কিছুকাল হইতে মাদেক স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে সমুৎসুক হইয়াছিলেন এবং সে কথা পন্ডিচেরীর গভর্ণরকে মধ্যে মধ্যে জানাইতেন, কারণ পন্ডিচেরী হইতেই তাঁহাকে ফ্রান্সগামী জাহাজে আরোহণ করিতে হইবে। মাদেক দেশে ফিরিতে চাহিলেই ফরাসীকর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বলিতেন যে ফরাসীজাতির স্বার্থকল্পে তাঁহার আরও কিছুকাল এদেশে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ তিনি ভারতবর্ষীয় রাজাদের নিকট থাকিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে "দেশের কাজ"ই করিতেছেন; তিনি এখন চলিয়া গেলে ফরাসীদের সমূহ ক্ষতি। দেশভক্ত সৈনিকপুরুষ এ কথা শুনিয়া নিরস্ত হইতেন। এই সময় চন্দননগরের গভর্ণর মসিয় শেভালিয়ে মোগল ও ফরাসীর সম্মিলিত চেষ্টায় ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ বিতাড়নের এক চমৎকার পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উহা যেমন অদ্ভুত তেমনই অসম্ভাব্য ছিল। তখন ভারতবর্ষে ফরাসী সেনানীবৃন্দ পরিচালিত চারিটী প্রধান বাহিনী ছিল, আর্য্যাবর্ত্তে সমরু ও মাদেক এবং দাক্ষিণাত্যে গার্দ্দে ও দুগেল। তদ্ভিন্ন অপরাপর রাজন্যবৃন্দের দরবারেও বহুসংখ্যক ফরাসীজাতীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে ইহাদের সকলকে সম্মিলিত করাই ছিল গভর্ণর মহাশয়ের পরিকল্পনার প্রথম অঙ্গ। পাশ্চাত্য রণবিদ্যায় শিক্ষিত আরও বহুসংখ্যক সেনাদল গড়িয়া তোলা ছিল উহার দ্বিতীয় অঙ্গ। তজ্জন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে ফরাসীরা বাদসাহের নিকট হইতে ঠাট্টাবন্দর ও ভক্করদুর্গ সমেত সিন্ধুদেশের কতকাংশ লইবে। তথায় মরিশসদ্বীপ হইতে দশ সহস্র ফরাসীসৈন্য প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রসমেত অবতরণ করিয়া দেশীয় সিপাহীদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবে। সমরু এবং মাদেক ইতোমধ্যে বাদসাহের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বাহিনীকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ করিয়া তুলিবে। তাহার পর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সকলে মিলিয়া একযোগে ইংরাজকে আক্রমণ করিবে। উত্তর ভারত হইতে সমরু ও মাদেক পরিচালিত বাদসাহী ফৌজ এবং দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্তে মহারাষ্ট্র হইতে দুগেলের সেনাদল অগ্রসর হইবে, উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবে পশ্চিমে মরিশস হইতে সমাগত ফরাসীরা; দক্ষিণে মহিশুর রাজ্য হইতে গার্দ্দের বাহিনী অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের সহযোগিতা করিবে পূর্ব্বদিকে উড়িষ্যার উপকূলে অবতীর্ণ আর একদল ফরাসীসেনা। এইরূপে সকলে মিলিয়া

অর্দ্ধচন্দ্রপ্রদানে ইংরাজকে ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশন করিবে। এই কার্য্যে যে সকল সৈনিকপুরুষ সহযোগিতা করিবে তাহাদের ফরাসীসেনাদলে উচ্চপদ প্রদান এবং অভিজাত-শ্রেণীতে উন্নয়ন করা হইবে। তদ্ভিন্ন প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা ত ছিলই। সমরুর নিকট এ প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে সে ব্যাপারটা অসম্ভাপর বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কিন্তু মাদেকের কথাটা মনে ধরিল। * এমন সময় নবলসিংহ তাঁহাকে দিল্লী পাঠাইলেন। সেখানকার সকল ব্যাপার দেখিয়া মাদেক "দেশের কাজে" আত্মনিয়োগ করাই স্থির করিলেন। ২৮শে অক্টোবর দরবারে তাঁহাকে বাদসাহের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বাদসাহের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু মাদেকের পরিবারবর্গ, ধনসম্পত্তি, সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সবই তখন জাঠরাজধানী দীগে ছিল। তিনি গোপনে ঐ সব লইয়া যাইবার জন্য দীগে আসিলেন। মাদেকের আচরণে জাঠদের মনে ইতিপূর্ব্বেই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পূর্ণভাবে সমর্থিত হইল। মাদেক পলায়ন করিতেছেন জানিতে পারিয়া জাঠরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। পথিমধ্যে গ্রামবাসীগণও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়িল না। এই অবস্থায় সম্মুখে ও পশ্চাতে যুগপৎ আত্মরক্ষা করিতে করিতে তিনি যেভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। চারিপাশে জলাভূমি, মধ্যে অপরিসর পথ; সম্মুখে ও পশ্চাতে শত্রুর দল। মালপত্র, ধনরত্ন, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা পূর্ণ গোশকটসমূহ, কেন্দ্রদেশে থাকিত, উহা পরিবেষ্টন করিয়া চলিত অশ্বারোহী ও পদাতিকের দল; সম্মুখে ও পশ্চাতে কামান লইয়া গোলন্দাজসেনা পথ পরিষ্কার করিয়া এবং পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে করিতে চলিত; এইভাবে ৩৬ ঘণ্টায় ৫৫ মাইল পথ যুদ্ধ করিতে করিতে মাদেক জয়পুর রাজ্যে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে তিনটী কামান এবং মাল বোঝাই কয়েকটি গরুর গাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ সিন্দুক বোঝাই একটী শকট জাঠেরা লুটিয়া লইয়াছিল। তাঁহার দুইশতেরও অধিক সিপাহী হতাহত হইয়াছিল এবং তাঁহার নিজের বামবাহুতে একটী গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। জয়পুর রাজ্যে আটদিন বিশ্রাম করিয়া মাদেক দিল্লী গমন করিলেন।

বাদসাহ মাদেককে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া খিলাৎ দিলেন—জরির কাজ করা মূল্যবান পোষাক, মণিময় উষ্ণীষ এবং রত্নখচিত তরবারী ও কোমরবন্ধ। তাঁহাকে দুই মাসের বেতনও অগ্রিম দেওয়া হইল। ইহা ব্যতীত বাদসাহের নিকট হইতে আর কোন অর্থ তিনি পান নাই। ডিসেম্বর মাসের শেষে সম্মিলিত জাঠ, মারাঠা ও রোহিলা সৈন্য, সংখ্যায় প্রায় দুইলক্ষ অশ্বারোহী, দিল্লী আক্রমণ করিল। ইহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহের সেনাপতি মীর্জ্জানজফ খাঁর ছিল মাত্র ৩৮০০০ মোগল অশ্বারোহী এবং সাত ব্যাটালিয়ন নিয়মিত পদাতিক, তন্মধ্যে পাঁচ ব্যাটালিয়ন ও কুড়িটী কামান ছিল মাদেকের। প্রথম আক্রমণেই মোগলরা পলায়ন করিল, কিন্তু মাদেকের শিক্ষিত সৈন্যগণ এরূপ পরাক্রমের সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিল যে বহু চেষ্টাতেও তাহাদের বিতাড়িত করিতে না পারিয়া শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তে সম্মত হইল। এইরূপে শত্রুহস্তে লুণ্ঠন হইতে নগর-রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ কৃতজ্ঞ বাদসাহ মাদেককে বার হাজারী মনসবদারী ও "সামস্-উদ-দৌলা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন। কুইম্পারে মাদেক বংশীয়দের নিকট উহার সনদপত্র এখনও রক্ষিত দেখা যায়।

কিন্তু শুষ্ক উপাধিতে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধৃবৃন্দের উদরপূর্ত্তি হয় না। মীর্জ্জা মাদেককে দুই মাসের বেতন ভিন্ন আর অর্থ দেন নাই। শেষটায় বেতন অভাবে সিপাহীগণ বিদ্রোহোন্মুখ হওয়ায় তিনি নিজ তহবিল হইতে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া সকলকে শান্ত করিয়াছিলেন। সে টাকাও ফেরৎ পাইবার আশা নাই দেখিয়া মাদেক অতঃপর মহাদজী সিন্ধিয়ার নিকট গমন করেন। কিছুকাল পরে নজফ খাঁর নিকট হইতে আবার তাঁহার ডাক আসিল। পূর্ব্বেকার সকল হিসাব পরিশোধ করিবেন বলায় মাদেক আবার মীর্জ্জার নিকটে ফিরিয়া গেলেন। জাঠরাজ্য দিয়া পূর্ব্বের

* সমরু জার্ম্মাণ এবং মাদেক ফরাসী ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

মতই আবার যুদ্ধ করিতে করিতে দিল্লী গিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই মাদেক আবার দেখিলেন যে নজফখাঁর টাকা দিবার কোনই ইচ্ছা নাই। তখন তিনি আবার মহাদজীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েক মাস তাঁহার কর্ম্ম করিবার পর গোহদের রাণার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই তিনি আবার নজফখাঁর নিকট গমন করিলেন। এবারে নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে মীর্জ্জা তাঁহাকে আগ্রার দক্ষিণে যমুনা ও চম্বলনদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ জনপদ জায়গীর দিয়াছিলেন। বারি নগরে নিজ শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অতঃপর মাদেক জায়গীরের শাসন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা, বিচারালয় প্রতিষ্ঠা দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন প্রভৃতি রাজ-ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক ব্যাপার সকল একে একে অনুষ্ঠিত হইল। বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব মাদেক অধস্তন ফরাসী সৈনিকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই সকল ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের মধ্যে অনেকেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; তন্মধ্যে কাউণ্ট দি মদাভ্র, শেভালিয়ে দি ক্রেসী, শেভালিয়ে দুদ্রেনেক, কর্ণেল পেত্র, ভিসাজ, ওগঁ এবং পয়লিয়ে এই কয়জনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মোদাভ নামক জনৈক ফরাসী পর্য্যটক মাদেকের জায়গীরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মাদেকের রাজ্যশাসন পদ্ধতি ও সামরিকবিভাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ফরাসী উপনিবেশগুলির বিধিব্যবস্থার সহিত তুলনায় ঐগুলি কোন অংশেই অপকৃষ্ট ছিল না।

এই সময়ে মারাঠা জগতে ঘোর বিপ্লব বাধিয়া উঠিয়াছিল। ১৮ই নবেম্বর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পেশবা মাধব রাও দেহত্যাগ করেন। পাণিপথের পরাজয় অপেক্ষা মাধবরাওয়ের অকাল বিয়োগ মারাঠাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছিল। সে সংবাদ হিন্দুস্থানে পৌছিলে মারাঠা নায়কবর্গের মধ্যে অনেকেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও অতঃপর গদীতে বসিলেন; কিন্তু শীঘ্রই ঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল (আগষ্ট ১৭৭৩) তখন পূর্ণভাবেই মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাধিয়া উঠিল। এক পক্ষ আশ্রয় করিল মৃত পেশবাদ্বয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা দাদাসাহেবকে এবং অপরপক্ষ নারায়ণরাওয়ের গর্ভবতী পত্নীর অজাত সন্তানের স্বার্থরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাঘব ইংরাজদের শরণ লইলেন (১৭৭৫ খৃঃ)। কলিকাতার ইংরাজগণ বঙ্গদেশের রাজগণের কলহবিবাদে লিপ্ত হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের ইংরাজগণও তথাকার দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উত্তর সরকার প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং কর্ণাটক প্রদেশের নবাব তাঁহাদের আশ্রিত মধ্যে পরিণত হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ইংরাজগণের অদৃষ্টে কিন্তু এ যাবৎ সে প্রকার কোন সুযোগ দেখা দেয় নাই। এক্ষণে প্রার্থিত বস্তুর সমুপস্থিতি দর্শনে তাঁহারা পরম উল্লসিত হইলেন এবং ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ বা কলিকাতার গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহারা রাঘবের পক্ষাবলম্বন করিলেন। যুদ্ধের প্রথমটায় কিন্তু তাঁহারা নিতান্তই অক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। মারাঠাদের নিকট পরাজিত হইয়া ওয়ার্গাওয়ের সন্ধি-সর্ত্তানুসারে তাঁহারা রাঘবের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

বোম্বাইয়ের ইংরাজগণ বিপদে ঠেকিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস মানিতে চাহিলেন না। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের এরূপ সন্ধি সর্ত্তে সম্মত হইবার ক্ষমতা নাই এই অজুহাত দেখাইয়া হেষ্টিংস ইংরাজের পক্ষে কলঙ্ককর উক্ত সন্ধিপত্র নাকচ করিয়া দিলেন। তখন আবার মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মহাদজীকে এই দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছিল, দূর হিন্দুস্থানের প্রতি আর তাঁহার লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া মীর্জ্জানজফ মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে নিরত হইলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদের প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন উজীর হসমুদ্দৌলাকে বিতাড়িত করিয়া দরবারে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন এবং দোয়াবপ্রদেশ মধ্যে যে সকল মারাঠা ছিল তাহাদের দূর

করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি জাঠদের কবল হইতে বারসাহের রাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন।* তাহার ফলে ৩১শে অক্টোবর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বারসানার যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সে কথা ইতিপূর্ব্বে সমরু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। চারিমাস পরে আগ্রার পতন হইল। কৃতজ্ঞ সম্রাট নফজ খাঁকে "আমীর-উল-ওমরা জুলফিকরউদ্দৌলা বাহাদুর" উপাধি অর্পণ করিলেন। আগষ্ট ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সমরুও নফজ খাঁর কর্ম্ম গ্রহণ করিল। সমরু ও মাদেকের শিক্ষিত ব্রিগেড লাভ করিয়া মির্জ্জা অতঃপর জাঠদের একেবারে চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুমুঘড়, দীগ, ভরতপুর প্রভৃতি সুদৃঢ় দুর্গসমূহ তিনি একে একে অবরোধ করিলেন। সুমুঘড় জয়পুর সীমানার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল, জয়পুর রাজ্যে কাম নামক স্থান হইতে দুর্গরক্ষীসেনাদল আহার্য্য সংগ্রহ করিত। অবরোধকারী মোগল সেনার অধিনায়ক মীর্জ্জার ধর্ম্মপুত্র নফজকুলিখাঁকে সমরু জানাইল যে অবরুদ্ধ সেনাদলের জয়পুররাজ্য হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ করিতে না পারিলে দুর্গাধিকার অসম্ভব। ইহাতে নফজকুলি কামের জয়পুরী তহসিলদারকে জাঠদের সাহায্য প্রেরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু সে আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই হঠকারী নজফকুলী জয়পুররাজ্যমধ্যে সেনা পরিচালন করিলেন এবং কামনগর অধিকার করিয়া সমরুকে তাহার শাসনভার সমর্পণ করিলেন। এবারে জয়পুরী রাজপুত প্রকাশ্যেই জাঠদের পক্ষে যোগ দিয়া অস্ত্রধারণ করিল।

মাদেকের ব্রিগেডও এই অবরোধে উপস্থিত ছিল। একদিন সংবাদ আসিল যে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে রোহিলারা তাঁহার জায়গীর আক্রমণ করিয়াছে। আর কাল-বিলম্বব্যতিরেকে মীর্জ্জার অনুমতিপ্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই মাদেক নিজ রাজ্যরক্ষায় ছুটিলেন। দ্বিতীয় দিন সায়াহ্নে দীর্ঘ ত্রিশমাইল পথ একটানা অতিক্রম করিয়া তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যগণ বিয়ানার পার্ব্বত্যপথে রাত্রির মত বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে ভীষণ 'আঁধি' আসিল। গোলমালে এবং তাড়াতাড়িতে শিবির হইতে দূরে প্রহরীসেনা রাখিতে ভুল হইয়া গেল। সহসা অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ চীৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া মুক্তকৃপাণ করে দুর্দ্দান্ত রোহিলার দল তাহাদের উপর নিপতিত হইল। মাদেকের সিপাহীরা আর অস্ত্রধারণ করিবার অবকাশ পাইল না, তাহাদের যুদ্ধ করিবার মত অবস্থাও ছিল না; বৃষ্টিতে বারুদ পলিতা সবই ভিজিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া রোহিলারা অনেকেরই প্রাণসংহার করিল। বারজন ইউরোপীয় অফিসার এই দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছিল বলিয়া মাদেক নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত তোপখানা ও রসদাদি রোহিলারা অধিকার করিল। পরাজিত মাদেক কোনমতে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। তথায় নূতন কামান ঢালাই করিয়া এবং নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তিনি আবার মীর্জ্জার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া দীগদুর্গ অবরোধ করিলেন (সেপ্টম্বর ১৭৭৫)।

দুর্ভেদ্য দীগদুর্গ সহজে অধিকার করা সম্ভব নহে বুঝিয়া মাদেক নজফখাঁকে নৈশ-আক্রমণের পরামর্শ দিলেন এবং স্বয়ং আক্রমণকারীদলের নেতৃত্ব করিবেন বলিলেন। স্থির হইল মীর্জ্জা নিজ অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া প্রস্তুত থাকিবেন, মাদেকের সিপাহীরা একযোগে বন্দুকের শব্দ করিলে তিনি অগ্রসর হইবেন। নৈশান্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আক্রমণকারীরা দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল; কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জনকয়েক সিপাহী বন্দুক ছুড়িয়া বসিল, তখনও সকলে প্রাচীরে উঠে নাই। বন্দুকের শব্দে দুর্গরক্ষী সেনাদল ছুটিয়া আসিল, প্রাচীরে শত্রুসেনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের আক্রমণ করিল এবং তাহারা বন্দুকে পুনরায় গুলি পুরিবার পূর্ব্বেই সকলকে বিনাশ করিল। এদিকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতমত মীর্জ্জাও অগ্রসর হইয়াছিলেন। মোগল অশ্বারোহীদলকে সমাগত দেখিয়া জাঠসেনা দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে

* মোগল জাঠ সমরের বিস্তৃত বিবরণ জন্য ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রণীত "History of the gats", vol. 1. pp. 250-270 দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রয়োজন।

বিতাড়িত করিল। এমন সময়ে সমরুর ব্রিগেড কামান লইয়া আসিয়া দেখা দিল, তখন জাঠরা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল।

দীর্ঘ অবরোধেও দীগের পতন হইল না। জাঠরা অসমসাহসে দুর্গরক্ষা করিতে থাকিল। এই যুদ্ধে নজফ খাঁ যেরূপ বীরোচিত সদয় ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ। খাদ্যাভাববশতঃ নগরবাসীগণ যখন দুর্দ্দশার চরমকষ্ট ভোগ করিতেছিল তখন মীর্জ্জা প্রচুর আহার্য্যবস্তু প্রদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহার উচ্চ্ত পতাকাতলে যে ব্যক্তি আশ্রয় লইবে তাহাকেই আহার্য্য দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য শত্রুজাতীয়ের প্রতি এ দয়া তাঁহার অনুচরবৃন্দের মনঃপূত হয় নাই। তাহারা সামরিক অসামরিক জাঠমাত্রকেই বধ করিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু মীর্জ্জার আদেশের অন্যথাচরণের সাহস কাহারও ছিল না। দীগনগর অধিকৃত হইলে পরে তিনি লুণ্ঠন নিবারণের আদেশ দিলেন এবং পরিত্যক্ত ভগ্ন বাটিগুলির সম্মুখেও উপযুক্ত প্রহরী সমাবেশ করিলেন। মোগল সেনা নগর অধিকার করিলেও দুর্গ মধ্যে জাঠরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ মীর্জ্জা আত্মসমর্পণ করিলে সকলকে নিজ নিজ পরিজন ও ধনসম্পত্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ যথেচ্ছাগমনে অনুমতি দিবেন একথা জানাইলেও তাহারা ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিল এবং সম্মুখ সমরে বীরের ন্যায় দেহপাতে সকলে প্রস্তুত হইল। তখন মীর্জ্জা সমরু ও মাদেককে গোলাবর্ষণে দুর্গ ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। আর কোন আশা নাই দেখিয়া জাঠরা স্বহস্তে আপন আপন পরিজনবর্গকে বধ করিল ও রক্তাক্ত তরবারী করে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখীন শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিল। একে একে সকলেই রণস্থলে দেহরক্ষা করিল, একপ্রাণীও ফিরিল না বা আত্মসমর্পণ করিল না। বিধ্বস্ত, শূন্য দীগদুর্গে মোগল সেনা প্রবেশ করিল।

জাঠশক্তির পতনে চারিদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। সকলেই মনে ভাবিল বুঝিবা আবার মোগলের গৌরবোজ্জ্বল দিন মীর্জ্জার চেষ্টায় ফিরিয়া আসিল। বাস্তবিক পক্ষে নজফখাঁই শেষ পরাক্রান্ত বাদসাহী উজীর। জাঠ, শিখ, রাজপুত, রোহিলা সকলকারই প্রতাপ তিনি খর্ব্ব করিয়া বশ্যতায় আনিয়াছিলেন। মারাঠারা নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ইংরাজের সহিত সংগ্রাম লইয়াই ব্যাপৃত ছিল, হিন্দুস্থানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাহাদের অবসর ছিল না। নজফ খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁহার বিশালবাহু মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথে দ্রুতগমনের বেগ কিছুকালের মত প্রতিরোধ করিয়াছিল। মোগলের এ পুনরুত্থান নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার নিভিবার পূর্ব্বেকার ক্ষণিকের উজ্জ্বল দীপ্তি। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মীর্জ্জার মৃত্যু হইল। প্রদীপ চিরদিনের মতই নিভিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সে কথার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে জেনারেল কাউণ্ট দি বইন প্রসঙ্গে সে ইতিহাস দেওয়া যাইবে। হিন্দুস্থানে মোগলের স্থলে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা মহাদজী সিন্ধিয়া তাঁহার এই বিখ্যাত বিদেশী সেনানায়কের সাহায্যেই করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দীগের পতনের পর মাদেক দিল্লী ফিরিয়া যান। এই সময়ে তাঁহার নিকট জনকয়েক ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সৈনিক আগমন করে। ইহারা এবং আরও অনেকে উত্তরাপথের বিভিন্ন নৃপতিবৃন্দের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। দেশ হইতে ফরাসী প্রভাব বিদূরিত করিবার জন্য ইংরাজেরা তাঁহাদের সহিত সখ্যতাসম্পন্ন রাজগণকে ফরাসীদের পরিবর্ত্তে নিজ নিজ কর্ম্মে ইংরাজজাতীয় সৈনিক নিযুক্ত করিতে বলিলেন। ফলে বহুসংখ্যক ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কর্ম্মচ্যুত হইল। অযোধ্যার দরবারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ফরাসী ছিল। কর্ম্মচ্যুত সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ প্রভাববর্জ্জিত রাজ্যে গমন করিল, কেহ কেহ সমরুর ব্রিগেডে কর্ম্ম লইল, পঞ্চাশজন সৈনিক মাদেকের নিকট আগমন করিল। কোনও প্রয়োজন থাকিলেও শুধু বিপন্ন স্বজাতীয়ের প্রতি অনুকম্পাবশে তিনি উহাদের মাসিক একশত টাকা বেতনে নিজ ব্রিগেডে কর্ম্ম দিলেন। কিন্তু উহাদের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না, মাদেকের বিরুদ্ধে তাহারা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তাঁহাকে হত্যা বা বন্দী করিয়া ব্রিগেডের কর্ত্তৃত্ব লাভ করাই

দুষ্টদের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহাদের দুরভিসন্ধি সফল হইল না। পূর্ব্বাহ্ণেই চক্রান্তের সংবাদ পাইয়া মাদেক সাবধান হইলেন। দলের নেতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল, কলহজনিত পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে কয়েকজন নিহত হইল, অতিরিক্ত মদ্যপানজাত রোগে জনকয়েক ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। তখন অবশিষ্ট যে কয়জন ছিল মাদেককে নিষ্কৃতি দিয়া অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গমন করিল! ইহা হইতে তখনকার দিনের অধিকাংশ ভাগ্যান্বেষীর স্বরূপ প্রকাশ হইবে।

যে আশা লইয়া দেশের ডাকে জাঠদের ছাড়িয়া তিনি বাদসাহের কর্ম্ম লইয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা যে সম্ভব নহে তাহা এতদিনে মাদেক বুঝিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ কাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থান এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গও হইয়াছিল। এ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসুখভোগের জন্য ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ লইয়া মাদেক গোহদের রাণাকে নিজ সেনাদল বিক্রয় করিয়া দিলেন (মার্চ্চ ১৭৭৭)।* তখন দলে এক সহস্রেরও উপর শিক্ষিত সিপাহী এবং কুড়িটা কামান ছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী মেজর ভিসাজ ব্রিগেডের নায়কত্ব লাভ করিলেন। মাদেকের হস্তচ্যুত হইবার পর তাঁহার ব্রিগেড আর খুব বেশীদিন টিঁকে নাই। তখনকার দিনে কেহই সৈন্যগণকে যথাসময়ে বেতন দিতেন না, রাণাও তাহার ব্যতিক্রম করিতেন না। কিন্তু মাদেকের নিকট হইতে নিয়মিত বেতনলাভে অভ্যস্ত সিপাহীদের ইহাতে অসন্তোষের সীমা থাকিত না। ক্রমেই দল ভাঙ্গিতে লাগিল, অনেকেই একে একে অন্যত্র প্রস্থান করিল। তাহার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহাদজীর সহিত যুদ্ধে রাণা ছত্রসিংহ পরাজিত ও বন্দী হইলে তাঁহার সেনাদল একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মেজর স্যাঙ্গষ্টার নামক একজন স্কচজাতীয় সৈনিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিল। পের঺, মাইকেল ফিলোজ, টমলেগীপ্রমুখ ভাগ্যান্বেষীর দল তখন অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে যাইতে বাধ্য হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধিয়ার সেনাদলে কর্ম্মগ্রহণ করিল।

ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের মারফতে নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিয়া মাদেক ইংরাজদের নিকট তাঁহাদের রাজ্যমধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কোম্পানীর সৈন্যদল হইতে পলায়ন এবং বক্সারের যুদ্ধে তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ প্রার্থিত অনুমতি দিলে মাদেক পন্দিচেরী আগমন করিলেন (অক্টোবর ১৭৭৭)। কিন্তু স্বদেশগামী কোন জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ায় তাঁহাকে এইখানে কিছুকাল থাকিতে হয়। শীঘ্রই ইংরাজ ফরাসীতে আবার যুদ্ধ বাধিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকদিগকে ফরাসীরা সাহায্য করায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন ও ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পন্দিচেরী অবরোধ করিল (ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮)। মাদেক তৎক্ষণাৎ সেনাবিভাগে যোগ দিলেন এবং কাপ্তেনের পদ পাইলেন। নগররক্ষায় মাদেক যে সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার ফলে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি একেবারে 'কর্ণেল' পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

পন্দিচেরীর পতনের পর মাদেক আরও জনকয়েক সেনানায়কের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া ইংরাজ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর পরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বদেশে পদার্পণ করিলেন। তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই ফরাসী রাজ ষোড়শলুই তাঁহাকে "bhevalier de la orare de st. Lous" নামক গৌরবজনক উপাধি এবং সেনাবিভাগে কর্ণেল পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনী লুই পরম আগ্রহে শুনিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

* মাদেক সম্বন্ধে ইংরাজী ইতিহাসে অনেক ভুল বিবরণ প্রদত্ত দেখা যায় সে কথা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মাদেক গোহদের রাণাকে সেনাদল বিক্রয় করেন এবং বিয়ানার পার্ব্বত্যপথে রোহিলাহস্তে তাঁহার পরাজয় তাহার পর সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সকল গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিপক্ষে তাঁহার পন্দিচেরী অবরোধে যুদ্ধ করার কথা কেহই লেখেন নাই। মাদেকের রোজ নামচা, লিখিত পত্রাবলী এবং ফরাসী সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে রচিত smile Barbe এর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মাদেক ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মাদেক নিজ জন্মস্থান কুইম্পারে ফিরিয়া গিয়া কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। এইখানে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে তাঁহার দেহান্ত হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যুর কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাচ্যদেশ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া সমাগত ব্যক্তিরা তখন ইউরোপে "নবাব" আখ্যা পাইত। সুতরাং মাদেক এবং তাঁহার স্ত্রী জনসমাজে নবাব ও বেগম নামে অভিহিত হইতেন। বেগম মাদেক স্বামীর দেহত্যাগের পর অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল জীবিত ছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল।

মাদেকের কয়েকটী পুত্রকন্যার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভরতপুরে তাঁহার এক শিশুপুত্র ও কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল। আগ্রার ক্যাথলিক চার্চ্চে ইহাদের কবর আজিও দেখা যায়। পুত্রটীর সমাধিলিপি এইরূপ,—"I. H. S. Ycy repose le corp de Augustin Rene Madec fili de Rene Madec decede a Barthovr le 27 May. 1771. Age de 2 annet 3 moys." ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সাত বৎসর বয়সে তাঁহার আর একটী কন্যার মৃত্যু হয়। মাদেকের আর একটি পুত্রের ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্ম হইয়াছিল এবং প্রায় শতবর্ষ বয়সে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কুইম্পারে তাহার দেহান্ত ঘটিয়াছিল। ইহার বংশধরগণ এখনও উক্তস্থানে বাস করিতেছে।

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ও কাল

শ্রীকরুণাময় বসু

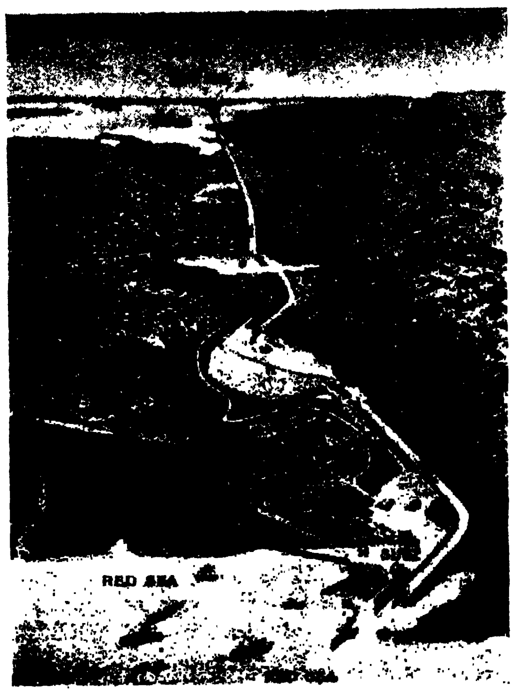
মুগ্ধ স্বপ্ন-স্মৃতি অঞ্জন করিয়া রেখেছ কি অশ্রুস্নাত নয়নের তলে?
জানি বন্ধু, একদিন মুছে যাবে ফাল্গুন রজনী শেষে কালো আঁখিজলে।
সেদিন রবেনা মনে বিস্মরণ ধুলি ঢাকা যেই স্বপ্ন আঁকা বালু চরে;
নূতন পলির স্মৃতি ভাদ্রের জোয়ারে এসে আচ্ছাদন দিবে চিরতরে।
যে রাত্রি আঁকিনু বন্ধু কোমল বালুর 'পরে নিদ্রাহারা চৈত্র-অভিসারে,
তাহার জ্যোৎস্নাখানি র'বে কি স্মরণে তব ছায়া গেলে বনান্তের পারে।
আজিকার তপ্তশ্বাস, ছায়াস্নিগ্ধ চোখে চোখে রচিত যে প্রগাঢ় কাহিনী,
কাল বসন্তের কানে ভুলে কভু বা যাবে না দূরবর্ত্তী স্মৃতির কিঙ্কিনী।
তার চেয়ে এসন্ধ্যায় কাছে ব'স মৃত্যু পারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন।
একটি মুহূর্ত্ত চাই, যেন আগে দেখ নাই সদ্যস্ফুট নক্ষত্র গোপন।
কবে যেন দেখিয়াছ বহু যুগান্তের আগে তন্দ্রালীন স্বপ্নের গুণ্ঠনে,
তখন চেননি মোরে, আজ মোরা মুখোমুখী পৃথিবীর একান্ত নির্জ্জনে।
কাল থেমে যাবে অরণ্য-মর্ম্মর, ভীরু-কাক-জ্যোৎস্নাস্নাত রজনী উতলা।
নিঃশব্দ রাত্রির কানে আজ বলো যে কথা কখনো আগে হয়নিক বলা।

সাগর বক্ষে

শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী

আসবার সময় কথা দিয়ে এসেছিলাম জাহাজ থেকে চিঠি লিখব, কিন্তু বোম্বাই ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের Tossing এবং Pitching এত বেশী সুরু হল যে চিঠি লেখা দূরে থাক তাড়াতাড়ি বিছানায় আশ্রয় নিলাম। প্রায় চারদিন বাদে কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, যার মুখের দিকে চাই তারি মুখে সেই শুষ্ক বিরস ভাব, সমুদ্র পীড়ার ছাপ রীতিমত দাগা বুলিয়ে গেছে।

মাদ্রাজী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, ট্যাস ফিরিঙ্গী, চেকোস্লোভাকিয়ান, ইটালিয়ান, ইংরেজ, ইহুদী প্রভৃতি আজগুবি পাঁচ মিশেলী জাতের যাত্রীতে জাহাজটা ঠাসা; মনে হয় League of Nationর Depot-এ পথ ভুল করে এসে পড়েছি। Smoking Roomএ খাবারের পর যখন সব জমা হয় তখনকার সমবেত মৃদু গুঞ্জন শুনতে লাগে Zooতে খাবার দেবার আগে যেরকম ঐক্যতান শোনা যায় প্রায় কতকটা সেই রকম। এর মধ্যে কয়েকটী পঞ্জাব আর মধ্যপ্রদেশবাসী ডেকের উপর পা ছড়িয়ে বসে হারমোনিয়াম যোগে রীতিমত কালোয়াতি সুর ভাঁজতে বসে গেছে,—তাল-বেতালের লড়াই মাঝে মাঝে এতই প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে, অপেক্ষাকৃত নিরালা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। কদিন সমুদ্র পীড়ায় সব মুষড়ে পড়ে ছিল, এখন পুরা দমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সুদের সুদ উশুল করে নিচ্ছে, মাত্রা জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।



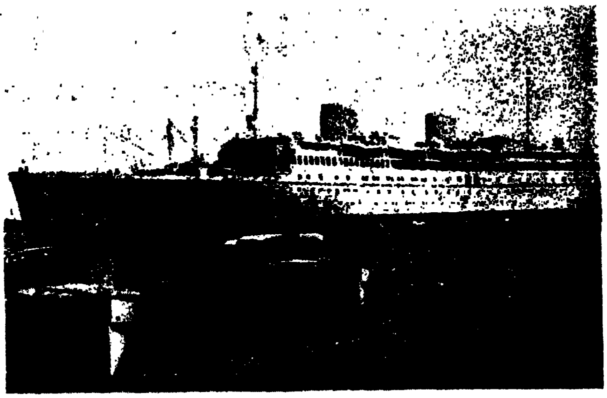
সমগ্র সুয়েজ প্রণালীর চিত্র

সব চাইতে দুর্ভোগ দেখতে পাচ্ছি ট্যাস ফিরিঙ্গীদের (Native Christian)। তাঁরা কালা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে লজ্জা বোধ করেন আর ওপাশে সাদা ইউরোপীয়ানরা ওঁদের দিকে ফিরে চায় না, বেচারীদের শ্যামও গেছে কুলও গেছে।

P. & O. Companyর জাহাজে যেরকম কালা-ধলার বিচার আছে ইটালিয়ান জাহাজে দেখ্‌ছি সে সব কোন বালাই নেই। জাহাজের কর্ম্মচারীরা খুব বিনয়ী ও ভদ্র, জাহাজে খেলা, ধুলা, সাঁতার, নাচ, ব্যাণ্ড প্রভৃতির বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ডেক চেয়ারে সারা দিন কেবল দিগন্ত-প্রসারিত নীল জল আর নীল আকাশ দেখছি। উপস্থিত Red Seaতে আমরা চলছি; এত গরম যে কেবিনের ভেতর ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার।

সহযাত্রীরা সব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন জাহাজ থেকে নেমে পড়বার জন্য। আমার কিন্তু লাগছে বেশ, কারণ Good

Italian food, Good Italian Wine আর Italian Classical music কটি ভাল জিনিষের যোগা যোগ



পোর্ট সৈদে আমাদের জাহাজ S. S. Victoria

ঘটেছে, সেজন্য আমার মন এখনও কিনারার জন্য উতলা হয়ে ওঠেনি বরং বেশ মৌজ করা যাচ্ছে। যেকটা দিন এই রকম অলস ভাবে দিবা স্বপ্ন দেখে কাটান যায় কাটান যাক্ না, বরাতে দুঃখ'ত আছেই, তার জন্যে তাড়া-হুড়ো করে লাভ কি ?

দেশে ফেরবার পথে সমুদ্রের উপর দোল পূর্ণিমার চাঁদের আলো উপভোগ করেছিলাম খুব। এবারেও দেখছি পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র আমাদের একেবারে বঞ্চিত করেননি। সন্ধ্যার পর সমুদ্রের গভীর নীল জলের উপর জ্যোৎস্নার রূপালি চিক চিকানির মরীচিকা নানা ছন্দে মায়ার জাল ছড়ায়। আমাদের ধবধবে সাদা জাহাজ খানা সাদা রাজ হাঁসের মত পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়ার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে দোদুল দোলার গতিতে চলেছে আপনা ভুলে। জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি নিপুনিকা চতুরিকা সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার আলো আঁধারে বেশ লুকোচুরি খেলা চালিয়েছে। খেলার ফলাফলের খপর রাখি না, তবে হুল্লোড়ের স্পন্দন মাঝে মাঝে অনুভব করি। সকালে প্রত্যহ খপর নিই রাত্রিবেলা কারো moon stroke হয়েছিল কি না। পাহারাওলা বা চোর ধরার কাজে অভ্যস্ত নই, কিন্তু জাহাজে শুক্লপক্ষের সাঁঝের আলোতে চোর ধরা মোটেই শক্ত নয় কারণ এখানে সবাই চোর। তবে এ চুরির বিচার করবে কে আর সাজাই বা কি হবে একটা চিন্তার কথা।

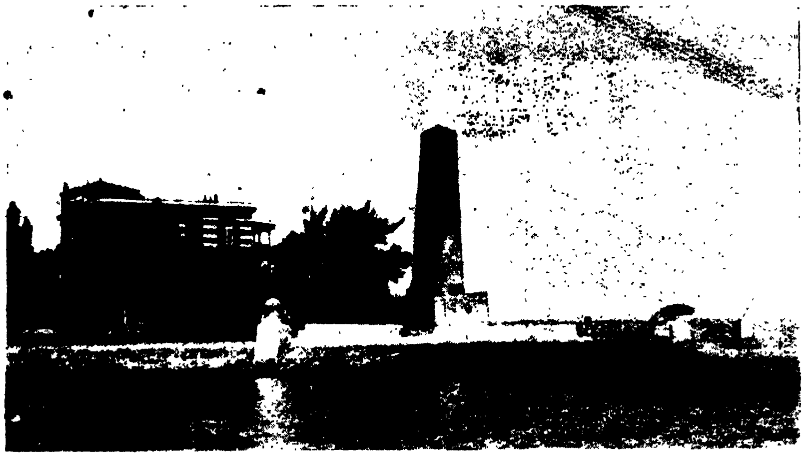
রাত্রির বেলা রাস্তার ধারে ল্যাম্প পোষ্টগুলো যেরকম চোর, ডাকাতদের কীর্ত্তি-কলাপ কেবল দেখে আর বোবার মতন চুপ করে থাকে, আমিও তেমনি অবাক হয়ে দেখি আর শুনি, গোলমাল করিনে রসভঙ্গ হবার ভয়ে। জাহাজে চাঁদের আলোতে রাতের জীবনে রস ও রহস্য প্রচুর, তবে অরসিক—বেদরদীদের কপালে কি ঘটে সে খপর বলতে পারি না।

সকালবেলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন Breakfast Table-এ সবাই একে একে হাজির হন, তখন ভাব ভঙ্গী গুলো এক রকমের। বড় জোর Good morning ছাড়া অন্য বাক্যালাপ শুনি না। সন্ধ্যার সেই নিবিড়



সুয়েজ প্রণালী—ইসমালিয়ার নিকট যুদ্ধের স্মারক-স্তম্ভ

ীভূত ভাব ঠিক কর্পূরের মতো উপে গেছে প্রভাতের বালার্ক কিরণে।



সুয়েজ-প্রণালী—পোর্ট টিউফিকে ভারতীয় সৈন্যের সম্মানে যুদ্ধের স্মারক-স্তম্ভ

সমুদ্রের আসনাই সমুদ্রের হাওয়ায় টেঁকে বেশ। সুনীল আকাশ ও প্রশস্ত নীল সমুদ্র এক স্বর্গ থেকে আর এক স্বর্গে নিয়ে যায় ঐ হুল্লোড়প্রিয় মত্ত মধুকরদের। জাহাজ তীরে ঠেকলেই এদের কল্পনা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়, মন তখন ছোটে প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাট বাজে কাজের বোঝা বইতে। চটুল নয়নের বক্রদৃষ্টি বঙ্কিম দেহের রূপ ও রেখার খাঁজ বুকের রক্তের মাঝে চনচনানি আনে না, এর জন্য দায়ী কে—বিংশ শতাব্দীর সহুরে জীবনের কলুষিত হাওয়া বোধ হয়।

সমুদ্র যাত্রার অলস জীবনে কল্পনায় এখন কেবল সুরপুরী—গন্ধর্ব্বপুরী—অলকায় মন বেড়াচ্ছে মন্থর গতিতে। এখানে পাওনাদারের বিল—পলিটিক্সের কচ্‌কচি—ফিরিওলার চীৎকার প্রভৃতি নানা রকম কঠোর বাস্তবতা প্রাণ মনকে মোটেই জ্বালাতন করে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জাহাজ কিনারায় ভীড়ব ভীড়ব করবে তখন রাজ্যের যত ভাবনা এসে বাসা বাঁধবে ছোট্ট মাথার ভিতর। Pass Port, Custom Duty, Railway Ticket, মালপত্র, কুলি, Telegram, Post Office, Bank, Exchange Rate, Hotel, Train Departure প্রভৃতির চিন্তা, যখন একের পর একটি এসে জগদ্দল পাথরের মত, মনের ভিতর ডলাই মলাই চালাবে, তখন সব কাব্য, রস, পুলক বস্তুতন্ত্র জগতের সীমানা ছেড়ে দৌড় দেবে সেই সমুদ্রের ধারে তেপান্তরের মাঠে একটু হাঁপিয়ে বাঁচবার জন্য।

পথের পথিক আমরা, চলতেই যখন হবে তখন অনুযোগ করে লাভ কি? নীলকণ্ঠের মতন ভাল মন্দ দুইই নীরবে গলাধঃকরণ করাই সব চাইতে শ্রেয়ঃ।

পোর্ট সৈদে জাহাজে নূতন অনেক যাত্রী উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন বাড়ীতে দুর্গোৎসব, চতুর্দ্দিকে হৈ-হৈ বাজনা বাদ্যি, নূতন রকমের জামা-কাপড়, সাজ গোজ



প্রজ্বলিত বিসুবিয়স্

হাসির হররা—খাবার ঘরে Butler, Steward, Stewardess দের ছুটো ছুটি যেন এক নূতন হাওয়া এনেছে। আসন্ন বিজয়ার ভাবনা যেমন মনকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে, আমার মন তেমনি খুঁত খুঁত করছে জাহাজ থেকে নামবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে তত।



বে অফ্ নেপ্‌ল্‌স্

Smoking Room-এ সকালবেলা Band কতকগুলো Sonata বাজাচ্ছিল—মনে হল যেন দল ছাড়া বন্দিনী এক Siren বুকফাটা কান্নার রোল তুলেছে ভূমধ্য সাগরের বুকের মাঝে। Violinএর সেই করুণ সুর এখনও যেন অশরীরী আত্মার মত জাহাজের চারিধারে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ঢেউ গুলোর মতন জাহাজের গায়ে আছাড় খেয়ে যেন বলতে চাচ্ছে—মুক্তি দাও। দিনের আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার করুণ সুরের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। Piano Chordএর কাঁপনগুলো এখন দমকা হাওয়ার মত কেবিন গুলোর ভিতর দিয়ে থেকে থেকে ছুটে চলেছে শোকাতুরা পাগলীর মত।···ভোরের আলোতে, সাঁঝের আঁধারে মূর্ত্তিমতী হয়ে এসুর কেঁদে বেড়াচ্ছে মানুষের মনের দ্বারে; কিন্তু বাস্ত জগতের লোক আমরা, এসব বাজে কান্নাকাটা শুনবার সময় কোথা?

ভূমধ্য সাগরের নীল জলের আভাতে আজ আকাশ পর্য্যন্ত নীলাভ হয়ে উঠেছে। চপল মেয়ের ওড়া আঁচলের মত ঢেউগুলো চলাক চলাক করে চলকাচ্ছে দমকা বাতাসের তালে তালে। এই সব ছেড়ে মন কি যেতে চায় London-এর ঘিঞ্জি আবহাওয়ার ভিতর যেখানে সব সময়ে fog, sleet, snow, drizlzing smoke-এর মড়ক লেগেই আছে। কিন্তু তবুও যেতে হবে।

জাহাজে যে সব যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে হয়ত সারা জীবনে এদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না, কিন্তু এই কদিন এক সঙ্গ খাওয়া গল্প ওঠা বসার সঙ্গ করে যেন ঘনিষ্ট আত্মীয় হয়ে উঠেছি। একটি ইটালিয়ান ভদ্রলোক পোর্ট সৈদে উঠেছেন জেনোয়াতে নেমে Tourin যাবেন। ইনি একটি বর্ণও ইংরাজী জানেন না, কিন্তু আশ্চর্য্য তাতে এঁর আমাদের সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ একটুও আটকাচ্ছে না— আমরা কি করি কোথায় যাচ্ছি এই সব কত রকম কথা ইসারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন এবং ঐ রকম করে নিজের মনের কথা ভাব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। অজানা দেশের কত অচিন লোকের সঙ্গে জাহাজে পাতান মিতালির যোগাযোগ জাহাজ



পম্পিআই—সাধারণের বাজার

থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হবে—এই চিন্তাটাই আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছে।—এই আসা যাওয়া বিদায়ের ঘটনা প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে সব জিনিষের ভেতর অভিনীত হচ্ছে,—আটকান কি যায় একে?

আজ আমাদের জাহাজ Strait of Messinaর ভিতর দিয়ে চলেছে। একপাশে সিসিলি (Sicily) দ্বীপ আর এক পাশে ইটালী। তীরে পাহাড় আর গাছ-পালার ছবি, সূর্য্যাস্তের সিঁদুরে রঙে আকাশ আর সমুদ্রের কাল জল



পম্পিয়াই—Temple of Dancing Faun

রঙীন হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন নৃত্যরত ঢেউগুলোর ভিতর, দক্ষিণে হাওয়ার দমকে আকাশের উড়ো সাদা মেঘগুলোতে কাঁপন লাগিয়াছে। সমুদ্রের পাড়ে পাহাড়ের তলায় ছোট ছোট ভিলার সন্ধ্যার প্রদীপগুলো দূরে দূরে টিপ টিপ করে জ্বলছে, মনে হয় যেন বিরহিণী বধূ দ্বার খুলে কার অপেক্ষায় বসে আছে আকুল হয়ে।

আজ সকালে Naples-এ নেমে গিয়েছিলাম Pompeii বেড়াতে। মোটারে প্রায় ৪৫ মিনিট লাগে। সমুদ্রের ধার দিয়ে ১৮ মাইল রাস্তা এঁকে বেঁকে ভিসুভিয়াস আগ্নেয় গিরির উপত্যকাতে ধ্বংসাবশেষ Pompeii সহরের পাদদেশে গিয়ে থেমেছে। রাস্তার দুপাশ আপেল, পিচ্, চেরী, জলপাই, কমলা, ভুট্টা ও নানান সব্জীর ক্ষেতে ভরা বাগানগুলোর ভিতর উঁচু পাইন গাছগুলোর তলায় ছড়ান ছুটা একটা ভিলা।

করবীগাছের avenueএর ভিতর দিয়ে সিঁড়ী ভেঙে উঠলাম Pompeiiর Marine Gateএ। এখান থেকে আমাদের guide সুরু করল দুহাজার বৎসর পূর্ব্বের সেই করুণ কাহিনী রাজপুতানার চারণদের মত। Forum, Temple of Apollo, Alter of Jupiter, Amphi theatre, Tragic Theatre (বিয়োগান্ত নাটক যেখানে অভিনয় হত) Court of Justice Temple of Isisi, (এখানে ভবিষ্যৎবাণী শুনবার জন্য সারা Pompeii বাসীর মন্দিরের ভিতর জমায়েত হত), Public Bath, শুঁড়ী পাড়া, বেশ্যাপল্লী, দু, একজন ধনী নাগরিকের বাড়ীর ছাদহীন ভাঙা দেওয়াল ও চকমিলান উঠানে থামের সারির ধ্বংসাবশিষ্টের ভিতর কয়েক ঘণ্টা সপ্নাবিষ্টের মতন কাটালাম।

ক্রুদ্ধ ভিষুবিয়াসের "লাভা" উদ্গারণে Pompeii প্রায় পঞ্চাশ ফিট মাটীর নীচে অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর চাপা ছিল। কত হাজার প্রাণী উষ্ণ গলিত লাভার স্রোতে ভেসে গিয়ে নেপলস উপসাগরে সমাধি লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতির এত নৃশংস ধ্বংস



পম্পাই—Temple of Jupiter

লীলার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় বোধ হয় আর কিছু নেই।

Forumএর ভিতর সকালে সন্ধ্যায় আর গ্রীক নাগরিকদের উৎসবের মেলা বসে না, Apollo মন্দিরে

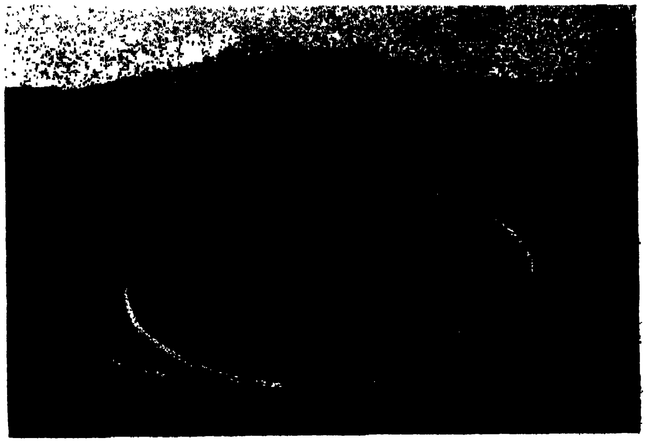


নাগরাজ

বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৩১

শিল্পী—শ্রীপূর্ণেন্দু দে ঘটক

সাঁঝের বেলায় Harp-এর ঝঙ্কার শুনবার জন্য সুর-রসিকদের ভীড় জমে না, Roman Bathগুলোতে ধারা যন্ত্র সব শুকিয়ে গেছে, Amphitheatre জঙ্গলাকীর্ণ, জুপিটারের মন্দির পাথর আর ইঁটের ভগ্ন স্তূপে পরিণত, ভাঙা দেওয়ালের ফাটার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বুনো পপির পাপড়িগুলো দুলছে, মনে হয় যেন কাদের বুকের তাজা রক্ত ধরার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে উঠেছে।



পম্পিয়াই—Amphitheatre

ব্রীড়াবনতা অর্ঘ্যবাহিনীর দল পূজোপোচার থালিতে সাজিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে বেদীর তলায় আর জমায়েৎ হয় না। এক ভীষণ মহাশ্মশানে, এক মহা সভ্যতা, মহা জাতি সমাধিস্থ হয়ে আছে। পাথরে বাঁধান রাস্তার উপর বা

জাহাজ ছাড়বার সময় হয়ে আসার জন্য আমাদের ফিরতে হ'ল সহরের দিকে, খুব ভাল করে Pompei দেখতে পারলাম না সেজন্য একটা আপশোষ রয়ে গেল।

সুধাংশুশেখর চৌধুরী

"অতীত" "আশা"

শ্রীঅনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বি, এ

অতীত-প্রাচীন, পুরাতন ব'লে
নাই তার অবসান,
প্রাচীনের বুকে নবীন সতত
গ'ড়ে তোলে তার স্থান!

আশা আনে সাথে কত যে মরম
কত নিরাশার বাণী;
তবু বাঁচে জীব বুকে ধরে শুধু
আশার আসনখানি।

যাত্রা বদল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাটপাড়াতে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলুম বড়দিনের ছুটীতে। সারাদিন বাড়ীতে বসে থেকে ভাল লাগ্‌ল না, বিকেলের দিকে নৈহাটী ষ্টেশনে বেড়াতে গেলুম। তখন দেশেই থাকি বিদেশে বেরুনো অভ্যেস নেই, এত বড় ষ্টেশন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ বড় একটা হয়নি। ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারে প্রকাণ্ড ইয়ার্ডটা মালের ওয়াগনে ভর্ত্তি, ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে যাত্রীরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে যাতায়াত করচে, নানা ধরণের লোকের ভিড়, নানা রকমের শব্দ—দুখানা পাইলট এঞ্জিন ইয়ার্ডের মধ্যে ওয়াগণের সারি টানাটানিতে ব্যস্ত···ওপারের গাড়ী একখানা ছেড়ে গেল, আর একখানা এখুনি আস্‌বে···বাজারের দিকে সাইডিং লাইনে দুখানা কেরোসিন তেলের ট্যাঙ্ক বসানো গাড়ী থেকে তেল নামাচ্চে।···এত মাছিও প্ল্যাটফর্ম্মে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার যো নেই, বসবার যো নেই, যেখানে যাই সেখানে মাছি ভন্ ভন্ করে। চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ষ্টলের অবস্থা দেখে সেখানে বসে কিছু খেতে প্রবৃত্তি হোল না। প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারে একটা ছোট ঘর, দোর বন্ধ, ঘরটার আশে পাশে পুরোণো স্লিপার ও ফিশ্‌-প্লেট্ পড়ে আছে রাশীকৃত· একটী ক্ষুদ্র কুলী-পরিবার সেখানে তেরপলের তাঁবু খাটিয়ে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েচে।

হঠাৎ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সবাই যেন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারে ঝুঁকে কলকাতার দিকে চেয়ে কি দেখবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল—একজন হিন্দুস্থানী যাত্রী প্ল্যাটফর্ম্মের নিতান্ত ধারে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে ব্যস্ত—ওপার থেকে একজন কুলী তাকে হেঁকে বল্লে—এ আঁখ্‌ পুছনেওয়ালা, হঠ যাইয়ে, ডাকগাড়ী আতা হায়—

কাছের একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে জিগ্যেস্ কর্ল্লুম—কোন্ ডাকগাড়ী মশাই?···

তিনি বল্লেন—দার্জ্জিলিং মেলের সময় হয়েচে—

একটু পরেই ধুলো কুটো উড়িয়ে একটা ছোটো খাটো ঘূর্ণী ঝড়ের সৃষ্টি করে ষ্টেশন কাঁপিয়ে দার্জ্জিলিং মেল বেরিয়ে গেল এবং সে শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে ডাউন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সশব্দে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে দেখি সে প্ল্যাটফর্ম্মে একটা গোলযোগ উঠেচে। অনেক লোক ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ছুটে যাচ্চে—সবাই যেন কি বল্‌চে—ট্রেনটা ছাড়তেও খানিকটা দেরী হোল। তারপরে ট্রেনখানা ছেড়ে গেলে দেখলুম প্ল্যাটফর্ম্মের এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড়, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কি যেন দেখচে।

ভিড় ঠেলে ঢুক্‌তে না পেরে একজনকে জিগ্যেস কর্ত্তে সে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই যে মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে এইখানে গাড়ী বদ্‌লাবার জন্যে নেমেছিলেন পশ্চিমের লাইনে যাবার জন্যে, তাঁর স্ত্রী প্লেটফর্ম্মে নেমেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, সম্প্রতি দেখা যাচ্চে অজ্ঞান নয়, তিনি মারাই গেছেন।

লোকের ভিড় পুলিস এসে সরিয়ে দিলে। তারপর একটা অতি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। গোটা দুই ষ্টীলের তোরঙ্গ, একটা ঝুড়ি, গোটা চারেক ছোট বড় পুঁটুলি—একটা মানকচু ও এক নাগরী খেজুরের গুড় এদিক ওদিকে অগোছালো ভাবে ছড়ানো—গৃহস্থালীর এই সব দ্রব্যাদির মধ্যে একটি পাড়াগাঁয়ের বৌয়ের মৃতদেহ, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি বাইশের বেশী নয়। বৌটীর মাথার কাছে একটি মধ্য বয়সী ভদ্রলোক, গায়ে কালো বুক খোলা কোট—কাঁধে একখানা জমকালো পাড় ও কল্কাদার সস্তা আলোয়ান, পায়ে ডার্ব্বি জুতো—পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোকের

পোষাক। তাঁর কোলে একটি বছর আড়াই বয়েসের ছোট ছেলে— মায়ের মত ফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, হাতে কি একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করচে ও একত্র করায় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সমাগত লোকের ভিড়ের দিকে চাইচে। মায়ের মৃতদেহের চেয়েও তার কাছে বেশী কৌতূহলের বিষয় হয়েচে চারিধারের এই গোলমাল ও অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকের ভিড়।

একটু পরে সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এলেন। বুঝতে দেরী হোল না যে ভদ্রলোকটি ডাক্তার—তিনি বৌটির নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখ্‌লেন, ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে কি কথা হোল তাঁর, স্বামীটির সঙ্গেও কি যেন বল্লেন তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

মৃত্যুই তা হোলে ঠিক!···

কৌতূহলী জনতা আরও খানিকক্ষণ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রৈল—মৃতা পল্লীবধূ, তার শোকস্তব্ধ স্বামী, অবোধ ক্ষুদ্র পুত্র ও তাদের ঘর গৃহস্থালীর সাধের দ্রব্যাদি। তারপর একে একে যে যার কাজে চলে গেল—আরও নতুন দল এল—তারাও খানিকটা থেকে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি কর্ত্তে কর্ত্তে ফিরে গেল। এবার এল রেলওয়ে পুলিসের লোক, তারা খানিকক্ষণ ধরে ভদ্রলোকটিকে কি সব প্রশ্ন কর্ল্লে, নোটবুকে কি টুকে নিলে—তারপর তারাও চলে গেল--কেবল একজন কনষ্টেবল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রৈল।

এ সবে কাটল প্রায় এক ঘণ্টা। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। ষ্টেশনের আলো জ্বালিয়েচে, আপ্‌ ডাউন দুদিকের সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সারি জ্বলচে; কিন্তু তখনও অন্ধকার হয় নি, সিগ্‌ন্যালের পাখা তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আপ্‌ লাইনের হোম ষ্টার্টার নামানো—বোধ হয় কোনো ট্রেণ আসচে।

যা হবার তা তো হয়ে গিয়েচে এখন সৎকারের কি ব্যবস্থা? এ ধরণের প্রশ্ন কেউ ভদ্রলোকটীকেও কর্ল্লে না—তিনিও কাউকে কর্ল্লেন না। এদিকে ভিড় ক্রমেই পাৎলা হয়ে এল—অনেকেই আপ্‌ ট্রেণের যাত্রী—কল্‌কাতার দিকে দুখানা সিগন্যাল নামানো দেখে তারা ওভার ব্রিজ দিয়ে উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটলো আপ্‌ প্লাটফর্ম্মের দিকে—এটা যে থ্রু ট্রেণ আস্‌চে, তা ভেবে তখন কে দেখে? ভিড়ের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল হিন্দুস্থানী কুলী খালাসীর দল, তারা খৈনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে নিজেদের কাজে চলে গেল।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম—ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই আকুল ভাবে বল্লেন—মশাই আপনি তো সবই দেখ্‌চেন, একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে। এখন কি করি আমার মাথামুণ্ডু, এই অচেনা দেশ, তাতে শীতের রাত। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দেহ শেষে কি অন্য জাতে ছোঁবে?...এই একটা বাচ্চা, এরই বা উপায় কি করি?

মুখে অবিশ্যি তাঁকে সাহস দিলুম। কিন্তু তারপর আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরেও সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই আমায় দিয়ে হয় উঠল না। না আমাকে এখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি—অধিকাংশ লোকই বলে তারা যাত্রী, এই ট্রেণেই তাদের অমুক জায়গায় যেতে হবে। কেউ কথা শোনে না। আকস্মিক ব্যাপারের উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পরে সবাই বুঝেচে বেশী ঘনিষ্টতা কর্ত্তে গেলে এই শীতের রাত্রে দুর্ভোগ আছে কপালে—কাজেই সবাই আমায় এড়িয়ে চল্‌তে চায়। অবশেষে একজন টিকিট কালেক্টারকে কথাটা বল্লুম। অনেক সাধ্য সাধনার পরে তাঁকে রাজীও করানো গেল। তিনি বল্লেন কিন্তু শুধু আমি আর আপনি এতে তো হবে না?···আপনি দাঁড়ান—আমি দেখে আসি।

একটু পরে একজন অতি কদর্য্য চেহারার ময়লা কাপড় পরা লোককে সঙ্গে করে তিনি ফিরে এলেন। আমায় বল্লেন—শুনুন মশাই, লোক যেতে চায় না কেউ এই শীতের রাতে। এই লোকটী ভাল বামুন, আমাদের ইষ্টিশানে পাউরুটীর ভেণ্ডার, এ যেতে রাজী হয়েচে, এ আরও দুজন লোক আন্‌তে রাজী আছে। কিন্তু—

টিকিট বাবু সুর নীচু করে বল্লেন—জানেন তো ছোট লোক—ওদের কিছু খাওয়াতে হবে নৈলে রাজি হবে না। একটু ইয়ে—মানে—বুঝলেন তো? ওরা নেশাখোর লোক, লেখাপড়া জানে না—সবই বুঝতে পারচেন। তার একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়—

আমি বল্লুম—সে কি রকম খরচ পড়বে না পড়বে আমায়

বলুন, আমি গিয়ে বল্‌চি। ঘাট খরচের হিসেবটাও ধরবেন—টিকিট বাবু টাকা পনেরোর এক ফর্দ্দ দাখিল করলেন। আমি ফিরে গিয়ে বলতেই ভদ্রলোক মনিব্যাগ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—এই নিন্—যা ব্যবস্থা করবার করুন, আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার করুন, বাঁচান আপনি— কথা শেষ না করেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধর্ত্তে এলেন—আর আমার এই খোকার একটা কিছু—ওকে তো এই ঠাণ্ডায় সেখানে নিয়ে যেতে পারিনে—তাহোলে ও কি বাঁচবে?…

আমি ফিরে এসে খোকার কথা তুলতেই তিনি বল্লেন—আমার তো ফ্যামিলি এখানে নেই, তা হোলে আর কি কথা ছিল? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি ছোট বাবুর বাসায়—

ছোট বাবুর বাসায় খোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বল্লুম দিন্ ওকে আমার কাছে। ছোট বাবুর বাসায় তাঁরা রাখবেন বলেচেন।

ভদ্রলোক বল্লেন—যাও খোকন বাবা, বাবুর কাছে যাও। তোমার মাসীমার বাড়ী নিয়ে যাবেন, যাও বাবা—

তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো। আমায় বল্লেন—অনেকক্ষণ কিছু খায় নি, রাণাঘাটে ওর মা গজা কিনে দিয়েছিল—একটু গরম দুধ যদি—

খোকা বেশ সপ্রতিভ। বেশ শান্ত ভাবেই আমার কাছে এল, হাসি হাসি মুখে। তাকে কোলে নিয়ে মনে হোল খোকার যত বয়স ভেবেছিলুম তার চেয়ে ছোট—এখনও তেমন কথা বল্‌তে পারে না। ছোট বাবুর বাসায় ঝি তাকে কোলে করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—আহা, এ যে একেবারে দুধের বাছা? এস এস সোনামণি—আহা! মাণিক আমার—

খোকা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি, বরং এত লোক তাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করাতে সে খুব খুসি।

একটু পরে আমরা কজনে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানের দিকে রওনা হলুম। আমি, পাঁউরুটী ভেণ্ডার, টিকিট বাবু ও পাঁউরুটী ভেণ্ডারের একজন বন্ধু। টিকিটবাবুর এক ভাইপো আমাদের সম্মিলিত গরম কোট ও আলোয়ানের পুঁটুলি হাতে ঝুলিয়ে পিছনে পিছনে আস্‌ছিল। সকলের পিছনে ভদ্রলোকটী; তাঁকে আমরা অবশ্য শব বহন কর্ত্তে দিইনি। ভদ্রলোকের জিনিষপত্র মৃতদেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েচে, কারুর বাসায় জায়গা দেবে না, সেগুলো ষ্টেশনের ক্লোক্‌রুমে জমা দেওয়া হোল। নৈহাটীর বাজার যেখানে প্রায় শেষ হয়েচে, সেখানটায় এসে ভদ্রলোক বল্লেন—একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, দাঁড়ান আমি সিঁদুর কিনে আনি ওর কপালে দিয়ে দিতে হবে।

শ্মশানঘাট নৈহাটী ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণে মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, সুমুখ জ্যোৎস্নারাত, সন্ধ্যার পরে মেঘশূন্য আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ফুটেচে, কন্‌কনে হাড়কাঁপানি শীত, মাঝে মাঝে পৌষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া বাধাশূন্য প্রান্তরে আমাদের শিরার উপশিরার রক্ত জমিয়ে দিচ্চে—তার ওপরে মুস্কিল আমন ধানের জমির ওপর দিয়ে পথ—ধান কাটা হয়ে গিয়েচে, শীতের ঘায়ে ধানের গোড়াগুলো পায়ে যেন কুশাঙ্কুরের মত বিঁধ ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মত আকুল সুরে কেঁদে উঠ্‌লেন। আমরা অবাক্ হয়ে ফিরে চাইলুম। টিকিট বাবু বল্লেন—ওকি মশাই, ওকি, অত ইয়ে হোলে চল্‌বে কেন—ছিঃ—আসুন এগিয়ে আসুন।

পুরুষ মানুষকে অমন অসহায় ভাবে কখনো কাঁদতে শুনিনি, তখন বয়েস ছিল অল্প, লোকটীর কান্না শুনে যেন আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠ্‌ল। তারপর তিনি চুপ কর্ল্লেন, আমরা সবাই আবার চুপ চাপ পথ চল্‌তে লাগলুম।

শ্মশানে যখন পৌঁছনো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে।

মৃতদেহ চিতায় উঠানো হোল। সেই সময় সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য কর্ল্লুম বধূটীর দুপায়ে আল্‌তা—কোথাও বেরুতে হোলে গ্রামের মেয়েরা পায়ে আল্‌তা পরে থাকে জানতুম, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আল্‌তা পরতে হয়েছিল? কপালে খানিকটা সিঁদুর ভদ্রলোকটী নিজেই দিয়ে

দিয়েছিলেন—বধূটীকে সর্ব্বপ্রথম এই ভাল করে দেখে মনে হোল সত্যই সুন্দরী। টানা টানা, জোড়া ভুরু, পাণ্ডুর বর্ণের গৌরমুখ, অনিন্দ্য দেহকান্তি মৃত্যুতেও যেন ম্লান হয়নি, মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে গোলমালে এখুনি ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে বুঝি।

জ্বলন্ত চিতার একটু দূরে বসলুম। পাশে একটু দূরে সেই পাঁউরুটীর ভেণ্ডার ও তার বন্ধু। পাঁউরুটী ভেণ্ডার আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেঁসে বল্লে—যাক্, আজ শীতের রাতটা কাটবে ভালো—কি বলেন? লালু চক্কোত্তির পরেটার দোকানে ভাজ্‌তে দিয়ে এসেচি। আমাদের শশী আচার্য্যকে বসিয়ে রেখে এসেচি, রাত বারোটার মধ্যে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে—গরম গরম বেশ—

তার বন্ধু বল্লে—মাংস কতটা? কুলুবে তো?

—বাঃ জোনাজাৎ দেড়পোয়া হিসেব করে দিয়ে এসেচি—মোট তিনসের—কজন আছি আমরা, তুমি, আমি, যতীন বাবু, যতীনবাবুর ভাইপো, লালু, শশী আচার্য্যি, (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) এই বাবু—

আমি বল্লুম—আমি খাবো না।

দুজনেই অশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমার কথা যেন বুঝ্‌তেই পাল্লে না কিংবা বুঝে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ল্লে না। পাঁউরুটী ভেণ্ডার বল্লে—খাবেন না কিছু? সে কি মশাই! এই হাড় কন্‌কনে পোষ মাসের রাত—খাবেন না তো এলেন কেন?...পাগল!...তার বন্ধু বল্লে—খাবেন না কেন? ভাল জিনিস মশাই, আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনিয়েচি—খাসা চর্ব্বিওয়ালা খাসি। লালু চক্কোত্তি নিজে রাঁধ্‌বে, অমন মাংস-রাঁধিয়ে গঙ্গার এপারে পাবেন না। ওই যে দেখ্‌চেন নৈহাটীর বাজারের চাটের দোকানখানা—শুধু ওর রান্নার গুণে আজ পনেরো বছর এক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েচে—দেখ্‌বেন খেয়ে—

এই সময় টিকিট বাবুর ইসারায় দুজনেই অন্যদিকে একটু দূরে কি জন্যে উঠে গেল এবং একটু পরেই আবার নিজেদের জায়গাটীতে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে এসে বস্‌ল। আমায় বল্লে—আপনার চলে না বুঝি?

আমি বল্লুম—কি?

—একটু আধটু...এই শীতের রাতে...নৈলে চলে কি করে বলুন...বেশ ভাল মাল...কেন এদের টিকিট বাবু ডেকেচে ও দিকে, তখন ব্যাপারটা বুঝ্‌লুম। ও আমার চলে না শুনে তারা আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এই শীতের রাতে শ্মশানে আস্‌বার স্বার্থটা যে আমার কি, এ তারা ভেবেই পেলে না। আমার দিকে আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে তারা নিজেদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লো। নৈহাটী ষ্টেশনে পাঁউরুটীর ব্যবসা করে আর কেউ কিছু কর্ত্তে পারবে না। রেল কোম্পানীর লাইসেন্সের দাম ক্রমেই বাড়চে, তার ওপরে শিখেরা এসে চায়ের ষ্টল্ খুলে ওদের অর্দ্ধেক ব্যবসা মাটী করেচে। খরচা ওঠাই দায়। দেশে সুবিধে নেই তাই ওরা পেটভাতায় এখানে পড়ে আছে। নইলে কাঁথিতে ওদের অমন চমৎকার দোকান ছিল—

পাঁউরুটী ভেণ্ডারটীর নাম বিনোদ বাঁড়ুয্যে। সে আর একবার উঠে গেল ওদিকে। আমি ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস্ কর্ল্লুম—খাবার টাবার কত খরচ হোল?

—তা প্রায় টাকা সাতেক ধরুন। কিছু মিষ্টিও আছে। তা ছাড়া দু'একটা—আপনার তো দেখ্‌চি ওসব চলে না।

বিনোদ ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আবার গল্প সুরু কর্ল্লে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গরম কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, নৈহাটীর প্লাট্‌ফর্ম্মে কিনেছিলুম সেই, কিন্তু খাওয়া হয় নি। টিকিট বাবুর ভাইপোকে ডেকে বল্লুম—আমার কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, দয়া করে আমার মুখে খানকতক ফেলে দিন্ না—আমি এই হাত আর ওতে দেবো না—

আমায় ওভাবে বিস্কুট খেতে দেখে টিকিটবাবু অবাক্ হোলেন। আমি শব ছুঁয়ে স্নান না করেই বিস্কুট খাচ্চি! আমায় বল্লেন—আপনার খুব খিদে পেয়েচে দেখ্‌চি—তা চলুন, নৈহাটীতে ফিরে খুব খাওয়াবো—

আমি বল্লুম আমি খাবো না কিছু। তাছাড়া, আমি ষ্টেশনের দিকেও যাবো না—এখান থেকে সোজা ভাটপাড়া চলে যাবো।

—খাবেন না আপনি সে কি মশাই? মা' না তাকি

হয় ?···অতটা মাংস···ওহে বিনোদ, কাঠ দাও ঠেলে—বসে বসে গল্পগুজব করবার জন্তে তোমাদের আনা হয় নি—

টিকিট-বাবু আমার দিকে চেয়ে আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই নিজের জায়গাটীতে গিয়ে বস্‌লুম।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে চিতায় কাঠ ঠেলে দিয়ে ফিরে এসেচে। দুই বন্ধুর মুখের বিরাম নেই। এবার তার কার বিয়ের কথা আলোচনা করচে—বোধ হোল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ভাইয়ের। বিনোদ এক পয়সা সাহায্য কর্ত্তে পারবে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বিনোদের বৌ ওর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল সে দুটো টাকা বাড়ীতে মনি অর্ডার করে দ্যায়।

—সোজা লিখে দিলাম দু'টাকার বেশী হবে না—এতে ভাই-দুতীয়েই করো—

বিনোদের বন্ধুটী বল্লে—আর বোন্‌দুতীয়েই করো—হিহি—কি বলো ?—

বিনোদ দুপাটী দাঁত বার ক'রে হেঁসে বল্লে—হ্যা, হ্যা—তাই বলি, বিয়ে কর্ল্লেই হয় না। তুলো দেখ্‌তে নরম, ধুনুতে লবেজান্‌—বিয়ে করে এই বাজারে সংসারটী চালানো—সে বড় ঠ্যালা।...

রাত অনেক বেশী—বোধ হয় এগারোটা। হালিসহর জুট মিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখী যেন জ্যোতির্ম্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়ে বেড়াচ্চে, একএকবার সেটা যেন জলের কাছাকাছি আস্‌চে, স্নিগ্ধ জ্যোঃতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠচে গঙ্গার বুকে...আবার যখন দূরে চলে যাচ্চে, তখন অল্প সময়ের জন্তে সে জায়গাটা অন্ধকার...আবার আলো ফুটে উঠ্‌ল আবার অন্ধকার।

এতক্ষণ ভদ্রলোকটী চিতার শিয়রের দিকে একটু দূরে চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার পাশে উঠে এলেন। বল্লেন—খোকা বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে—কি বলেন ?

—হ্যাঁ, এতক্ষণ নিশ্চয়ই।

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন—কাল সকালে নৈহাটীতে দুধ পাওয়া যাবে না মশাই ?

—অভাব কি ? সে জন্তে ভাব্‌বেন না। সে যোগাড় হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস্‌ কর্ল্লুম—আপনারা কোথায় যেতেন ? পশ্চিমে কোথাও বুঝি ?

ভদ্রলোক বল্লেন—পশ্চিমে বেশী দূর নয়—আমি যাচ্ছিলাম আসানসোলে। সেখানে চাকুরী করি। অনেক দিন চাকরী খুঁজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শেষে ওইটা জুটিয়েছিলাম। তা চাকুরীও করচি আজ এক বছর, এতদিন রেল বাবুদের মেসে খেতাম। আশ্বিন মাসে মেসে খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া গোছের দাঁড়ালো। এত ঝাল দ্যায়, মশাই অত ঝাল খাওয়া আমার অভ্যেস্‌ নেই। আমার স্ত্রী বল্লে—যা পাও, একটা বাসা করো, আমাদের দুজনের খুব চলে যাবে। তোমারও কষ্ট থাক্‌বে না, আমারও এখানে তোমায় বিদেশে ফেলে থাক্‌তে ভাল লাগে না। তাই এবার বাসা ঠিক করে বড়দিনের ছুটীতে একে আন্‌তে যাই শ্বশুর বাড়ীতে—সেখানেই বিয়ের পর আজ চার বছর পাঁচ বছর রেখেছিলাম। দেশে আমার বাড়ী ঘর সবই আছে, কিন্তু সেখানে মশাই সরিকী গোলমাল। সেখানে ওকে রাখার অনেক অসুবিধে—বার দুই নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই জানি।

আমি বল্লুম—ওঁর কি কোনো অসুখ ছিল—হঠাৎ এমন—

—অসুখের কথা তো কিছুই জানি নে। তবে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করতো বল্‌তে শুনেচি।

অসুখটা আমার বাড়ীতে যখন আনি আর বছর, তখন বড় বেড়েছিল। আমায় সে সময় নেই চাক্‌রী, হাতে পয়সা আর এদিকে বাড়ীতে আমার জ্যাঠ্‌তুতো ভাইয়ের স্ত্রী—তাঁর যৎপরোনাস্তি দুর্ব্ব্যবহার। এই সবে সংসারে শান্তি তো ছিল না একদণ্ড ?···ও আবার ছিল একটু ভাল মানুষ মতো—ওর ওপরই যত ঝক্কি।

খানিকটা আপন মনেই যেন বল্‌তে লাগলেন—কালও বিকেলে কত কথা বলেচে। বাসার কথা আমায় কত জিগ্যেস্‌ কর্ল্লে। বল্‌ছিল, সেখানে পাতকুয়ো না পুকুর ? আমি বল্লাম—দুইই আছে। তবে পুকুরে রেলের কুলী চাপরাশীরা নায় আর কাপড় কাচে—তার চেয়ে তুমি বাসার

পাতকুয়ার জলেই নেও। খাবার জন্যে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারে টিউবওয়েল আছে—নিকটেই—সেখান থেকে জল আনাবো। বাসায় পেঁপে গাছ আছে শুনে কত খুসি! বল্লে হ্যাঁগা ওদেশের পেঁপে নাকি খুব বড় বড়? কাল দুপুরের পর থেকে বাক্স গুচিয়েচে···মানকচু সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে বিকেলে বেছে বেছে বড় মানকচুটা ওর ভাইকে দিয়ে তোলালে।···রাত্রে ঘুমোয় না—কেবল বাসার গল্প করে··· এ করবো...ও করবো···আমায় বল্লে—পেতলের ডেক্‌চিতে খেয়ে খেয়ে তোমার অসুখ হয়েচে—তারা তো আর তেমন মাজে না?···অসুখের আর দোষ কি?···সেখানে মাটীর হাঁড়ি কুড়ি পাওয়া যাবে তো?···রাত অনেক হয়েছে দেখে আমি বল্লাম—শোও ঘুমোও, কাল আবার সারাদিন গাড়ীর কষ্ট হবে···রাত দুপুর হোল...ঘুমিয়ে পড়···কোথায় চলে গেল আজ...আর আমায় রেঁধে খাওয়াতে আসবে না···

হঠাৎ একটা গোলমাল ও বচসার আওয়াজে ভদ্রলোক ও আমি দুজনেই ফিরে চাইলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে ও তার বন্ধু টিকিটবাবুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এবং আমার মনে হোল তারা এমন সব কথা বল্‌চে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে সাহস কর্ত্তো না টিকিট বাবুকে। বিনোদ বাঁড়ুয্যে বল্‌চে যান্ যান্ মশাই অনেক দেখেছি ওরকম—আমরা গড়বাড়ীর বাঁড়ুয্যে—সুতো হাটা পরগণার মধ্যে যেখানে যাবেন—ওদিকে তমলুক এস্তেক —আমাদের এক ডাকে চেনে—ছোটনজর যেখানে দেখি সেখানে আমরা থাকিনে—এই শীতের রাতে কে আস্‌তো মশাই? আমাদের আগে খোলসা করে আপনার বলা উচিৎ ছিল তা হোলে দেখ্‌তাম নৈহাটীর বাজার থেকে কোন্ ব্যাটা পৈতেওলা বামুন আজ মড়া নিয়ে আস্‌তো ···মুর্দ্দফরাস দিয়ে না যদি······

ব্যাপার কি উঠে দেখ্‌তে গেলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে আমায় দেখে মধ্যস্থ মেনে বল্লে—এই তো এই ভদ্দর লোক রয়েচেন—আচ্ছা বলুন তো আপনি?···আমরা সকলের আগে বলে দিয়েচি আমাদের এই চাই · এই চাই···এখন আসলে হাত গুটোলে চল্‌বে কেন?···আপনিই বলুন তো? ···হ্যাঁ মানুষ বলি এই বাবুকে···কোনো লোভ নেই, উনি খাবেন না দাবেন না। কিছু করবেন না—উনি এসেচেন মড়া নিয়ে এই শীতে। উনি বলতে পারেন—ওঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিতে হয়—

ঝোঁকের মাথায় বিনোদ বাঁড়ুয্যে সত্যিই আমার পায়ে হাত দেবার জন্যে ছুটে এল। আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম—এদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ভাগ বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত কথার মধ্যে আমার থাক্‌বার দরকার কিসের?

মনে কেমন একটা দুঃখ। এই অভাগিনী পল্লী বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হোল না। মনে হোল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী, নক্ষত্র বিরল বিরাট আকাশ এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোট খাটো সাধ যাদের মেটেনি, এ রুদ্র আহ্বান তাঁদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখ্‌লে বিশ্বকর্ম্মার কাজের কি ক্ষতিটা হোত?···ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ীর দাওয়ায় মেয়েটী খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্চে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আলতা, কপালে টিপ্, খোপাটী বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত, পটভূমিতে—শ্মশানে মাতালের হুড়োহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি অশ্লীল···

রাত দুপুর।...

বিনোদ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ কি মনে করে আমার সাথে এসে বস্‌লো। সে আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠেচে·· আমি কি করি, কোথায় থাকি, বাড়ীতে কে কে আছে,— এই সব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে।

—আপনি মশাই এর মধ্যে মানুষ। মানুষ চিনি মশাই, আজ না হয় দেখ্‌চেন ইষ্টিসানে পাঁলরুটী ফিরি করি···আমরা গড়বাড়ীর বাঁড়ুয্যে···যান্ যদি কখনো ওদিকে, পায়ের ধুলো দিলেই বুঝ্‌তে পারবেন—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে—

সব শেষ হতে রাত একটা বাজ্‌লো। চাঁদ ঢলে পড়েচে।

চিতা ধুতে গিয়ে ভদ্রলোক আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন—আমরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পিসিমার বাড়ী চলে আসবো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। টিকিটবাবু

বল্লেন—আসুন, আসুন—অতটা মাংস খাবে কে? সব গরম গরম পাবেন—আমার বলে দেওয়া আছে—রাত বারোটার পরে তবে ময়দায় জল দেবে। গিয়েই গরম গরম···চলুন মশাই···

অতি কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে পিসিমার বাড়ী ফিরলুম। কিন্তু সকালে উঠেই খোকাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হোল। সাড়ে সাতটার ট্রেণে নৈহাটী গিয়ে ছোটবাবুর বাসায় হাজির। খোকা নাকি অনেকক্ষণ উঠেচে। ভোরবেলা থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্যে কাঁদ্‌ছিল, বাসার মেয়েরা অনেক কৌশলে থামিয়ে রেখেছেন।

ভদ্রলোকটীও এলেন। তিনি টিকিটবাবুর বাসায় রাত্রে শুয়েছিলেন—দেখে মনে হোল রাতে বেশ ঘুমিয়েচেন। খোকা এখন আর কাঁদচে না। বাসার মেয়েরা কমলালেবু দিয়েচে হাতে; তাই খেতে খেতে ঝিয়ের কোলে বাইরে এল। ঝি বল্লে—কাল ছোটবাবুর বৌ নিজের কোলের কাছে ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। জেগে উঠ্‌লেই মুখে মাই দিয়েচেন, রাতে ঘুমের ঘোরে ও ভেবেচে ওর মা। কিন্তু ভোরে উঠেই সে কি কান্নাটা! কেবল বলে 'মা যাবো' 'মা যাবো'—আহা, বাছা আমার, মাণিক আমার—

একটু পরে আমি ভদ্রলোককে ট্রেণে তুলে দিতে গেলুম, খোকাকে কোলে নিয়ে। তিনি এই ট্রেনে মুর্শিদাবাদে শ্বশুর বাড়ী ফিরে যাবেন। আমায় বল্লেন—কি ক'রে সেখানে ঢুকবো মশাই, ভেবে আমার হাত পা আস্‌চে না। তবে যেতেই হবে, খোকাকে ওর দিদিমার কাছে দিয়ে আস্‌বো—নইলে কে দেখ্‌বে আর ওকে?

তারপর পাগলের মত হাসি হেসে বল্লেন—যাত্রাটা বদলে আসি মশাই। কি বলেন?...হা—হা—

আমি বল্লুম—টিকিটবাবু কাল আপনাকে কিছু ফেরৎ দিয়েচেন?

—না, আমিও চাই নি। তবে আজ সকালে একটা ফর্দ্দ দেখাচ্ছিলেন, বল্লেন সব খরচ হয়ে গেছে।···সে ফর্দ্দ আমি দেখিও নি—যা উপকার করেচেন আপনারা, তার শোধ কি কখনো দিতে পারবো?···

ট্রেণ ছেড়ে চলে গেলো।···

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বিনোদ বাড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। আমায় একপাশে ডেকে মুখ ভার করে বল্লে—শুনেচেন টিকিটবাবুর আক্কেলটা? সাড়ে সাতটাকা হাতে ছিল কালকের দরুণ। কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বল্লাম—ভাগ করো। তা আমাদের দিলে একটাকা করে—দুজনকে দু'টাকা। নিজে নিলে সাড়ে পাঁচটাকা। বলে ওদের দুজনের ভাগ, ও আর ওর ভাইপো। আচ্ছা ভাইপো কি করেচে মশাই? শুধু কাপড়ের পুঁটুলিটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েচে বৈ তো নয়?···আর আমাদের কাঁধ যে···চামার...চামার...আমাদের অত ছোটনজর নেই···হাজার হোক্‌, কুলীন বামুনের ছেলে মশাই...না হয় পেটের দায়ে আজ পাঁউরুটী ফিরিই করি···

* * * *

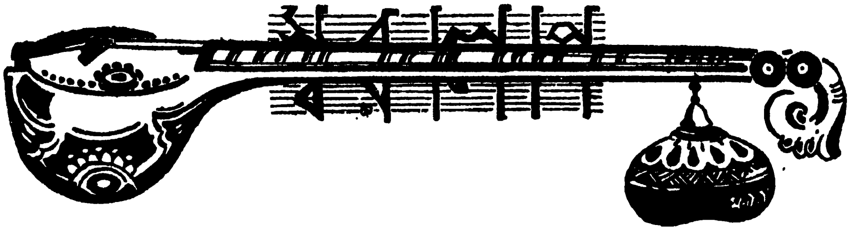
বছর চারেক পরে তখন কলকাতায় চাকরী করি—কি একটা ছুটীর দিনে জুগার্ডেনে বেড়াতে গিয়েচি। একজন ভদ্রলোক আমার আগে আগে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—সঙ্গে একটি তরুণী বধূ ও দু-আড়াই বছরের ছোট একটি ছেলে। মনে হ'ল যেন চিনি—কোথায় যেন দেখেছি। হঠাৎ আমার মনে পড়ল ইনি সেই ভদ্রলোকটি নৈহাটীতে যাঁর স্ত্রীর সৎকার করেছিলাম সেবার। এগিয়ে গিয়ে বল্লুম চিন্‌তে পারেন?

ভদ্রলোক চিনলেন, খুব খুসীও হলেন। বল্লেন আজকাল তিনি কলকাতাতেই থাকেন, বাগবাজারের পোষ্টাপিসে চাকুরী করেন। সঙ্গের বধূটি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—নিজেই পরিচয় দিলেন। ছেলেটি আমার দিকে চেয়ে ছিল, ভদ্রলোক তাকে দিয়ে আমার পায়ে একটা প্রণাম করিয়ে বল্লেন—এ-পক্ষের ছেলে, এই আড়াই বছরে পড়েছে—

আমি বল্লুম ও বেশ বেশ। আপনার বড় খোকাটি কোথায়?

—সে নেই। সে সেই বারই মারা যায় নিমোনিয়া হয়ে—ওর দিদিমার কাছেই—সেই বোশেখে। আচ্ছা আসি মশাই, নমস্কার।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু শান্তিসুধা দিও চিত্তচকোরে।
কাঁদিছে চিত 'নাথ নাথ' বলি'
সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি',
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি
দেখাও পথ অন্ধ তিমিরে।
মন্দ ভাল মম সব তুমি নিও,
দুঃখী-জন-হিত সাধিতে দিও,
হে নারায়ণ, দীনরূপে আসিও
বাঁধিও সবে মম প্রেম-ডোরে।

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

ভজন জৌনপুরী—ত্রিতাল

পা পদা II { পর্মা পা পা পর্সর্ণর্সা । র্ণদা -পা পদা মা । রমপদা মপা মজ্ঞা -া ।
চ র ণ ত ০ লে ০ স ০ দা রা ০ ০ ০ খি ০ ও ০

(-সরা -রমপা পা পা) } । -া -া রা সা I সরা -া -া -জ্ঞা । রসা -া -া -া ।
০০ ০০ মো রে } ০ ০ দী ন ব ন্ ০ ০ ধু ০ ০ ০

সা -া রা সণ্া । সা -া সা -া I সা -া সর্জ্ঞা -া । র্জ্ঞর্রা র্রা র্সা র্সা ।
ক ০ রু ণা সি ন্ ধু ০ ০ শা ন্ তি ০ সু ধা দি ও

র্সনা -র্সনা র্সনা র্সনা । নদা দপা পা পদা II
চি ০০ ত্ত ০ চ ০ কো রে - ত ব ০

II পমা -া পা -া । পদা -া দা দণা । র্সা -া র্সা র্সা । -া র্সা র্সা র্সা I
কাঁ • দি • ছে • চি ত না • থ না • থ ব লি

পদা -া দা দা । দর্সা -া র্সা সর্রা । র্সর্রা র্সজ্ঞা র্রা র্সা । সণা -র্রর্সা পদা -পা I
স ং সা র কা ন্ তা রে স্ব • •• প থ ভু • লি •

পা পদা পদা -ণা । দা দা পা পমা । পদা মপা সজ্ঞা রসা । সরা -জ্ঞা রসা -া I
তো মা • র • • অ ভ য় শ র • ণ • আ জি • মা • গি •

সা -া সজ্ঞা -া । র্রা জ্ঞর্রা র্রর্সা র্সা । সনা -র্সনা র্সনা র্সনা । নদা দপা পা পদা II
দে • খা • ও • প থ অন্ •• ধ • তি• মি রে ত ব •

II পমা -া পা পদা । -া দা দা দণা । র্সা -া র্সা র্সা । র্সা -া র্সা র্সা I
ম ন্ দ ভা • ল ম ম • স • ব তু মি • নি ও

পদা -া দা দা । দর্সা -া র্সা র্রা । র্সর্রা র্সজ্ঞা র্রা র্সা । সণা -র্রর্সা পদা -পা I
দুঃ • খী জ ন • হি ত সা• •• ধি তে দি • ও •

পা পদা পদা -ণা । দা পা পদা মা । মপদা মপা সজ্ঞা রসা । রা -জ্ঞা রসা -া I
হে না • রা • • য় ণ দী ন ব্র•• •• পে আ• সি • ও •

সা -া সজ্ঞা -া । র্রা জ্ঞর্রা র্রর্সা র্সা । সনা র্সনা র্সনা র্সনা । নদা দপা পা পদা II
বাঁ • ধি • ও • স বে ম ম • প্রে • ম • ডো রে ত ব •

যদিও অবিমিশ্র জৌনপুরীতে তীব্র নিখাদ ব্যবহার হয় না, তথাপি এ গানটিতে গীতিকবি অতি কৌশল সহকারে কোমল ও তীব্র নিখাদ প্রয়োগ করেছেন ;—ভজন গানে এরূপ বিবাদী স্বর ব্যবহার প্রচলিত আছে। এ গানটি শ্রীমতী কনক দাস গ্রামোফোনে গেয়েছেন।

হিমাংশুকুমার দত্ত

নীড়

শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

বুকের নীচে একটা বালিশ দিয়া জান্‌লার দিকে মুখ করিয়া একখানা বই লইয়া পড়িয়াছিল। পড়িয়াই ছিল, এক পাতাও পড়া হইতেছিল না। ওদিককার বাগানটায় কয়েক ঝাড় কলাগাছ, একটা পুষ্পিত রক্ত জবার গাছ, এখানে সেখানে আগাছার জঙ্গল,—চোখ পড়িয়াছিল সেই দিকে। ঝির্‌-ঝির্‌ করিয়া বাতাস আসিতেছিল। চোখ-গেল পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া ওঠে—গলাটা খাদ হইতে ক্রমশ উঁচু পর্দ্দার শেষ সীমায় চড়িয়া কখন থামিয়া যায়। কাঠ্‌-ঠোক্‌রা শব্দ করে—কট্‌র-কট্‌র।...

স্নান খাওয়া দাওয়া না করিয়া এমনি একটি দৃশ্য ও দ্বিপ্রহরের নিঃস্তব্ধ জগৎকে সামনে লইয়া পড়িয়া থাকায় আনন্দ মনের মধ্যে নানান রকমের সুরের জাল বুনিয়া চলে; বিক্ষিপ্ত চিন্তার টুকরাগুলিকে এক জায়গায় জড় করিয়া একটি একটি করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়া চাড়া করা যায়।

খোকা কোন্‌ সময় কি কৌশলে খাটের পায়া বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, মমতা টের পায় নাই। টের পাইল তখন, যখন আল্‌গা খোঁপাটা খুলিয়া ফেলিয়া সে খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। গ্রীবা হেলাইয়া দুষ্টু ছেলেটার কীর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া বিপুল স্নেহে মমতা তাহাকে বুকে টানিয়া ধরিল। চুমায় চুমায় খোকা যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই মুখের হাসির অনুকরণ করিয়া মমতা কহিল, আমি মরে' যাই খোকা ?—

খোকা কহিল, যা।...

চোখ বুজিয়া মমতা মরার অভিনয় করিল। খোকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মমতা মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটু খানি চাহিয়া দেখিল, খোকা নিষ্পলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সন্দেহ করিতেছে, মা সত্যই মরিয়া গেল কিনা। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া মায়ের মুদ্রিত চক্ষের পাতা দুই হাতের কোমল অঙ্গুলি দিয়া জোর করিয়া মেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মমতা তবুও চক্ষু মেলিবে না। বিশেষ চেষ্টাতেও যখন কিছু হইতেছে না, তখন ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই মমতা উঠিয়া বসিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে খোকাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল—সোনা আমার, মাণিক আমার···

বাড়ীর এই ভগ্ন প্রাচীন দিকটা! নাট-মন্দিরের স্তম্ভগুলি পড়িয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া আছে। কত রাজ্যের জঙ্গল জমিয়াছে ঐ খানটায়। দুপুরের রৌদ্র বাঁচাইতে মানুষের গরু, ছাগল এখন আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়।

খোকার হাতে কাঠের একটা খেল্‌না দিয়া মমতা মেজের দোর গোড়ার পাশে বসিয়া কার্পেটে একটা ময়ূর বুনিতেছিল। বড় খালি খালি ঠেকে, কেমন ভয় ভয় করে···। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম—দুপুরের ঘুমন্ত পুরী। শুধু রান্না ঘর হইতে 'ইন্দুর' রান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে।

কিন্তু এহেন নিদাঘে ঘুমায় না এমন সব দুরন্ত জীবও এ পৃথিবীতে কম নাই। একপাল ছেলের দল হল্লা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত।

—মম দি', আজ আমাদের চারটে নাগাদ খেলা। পালা পালা বলে' খালি বিরক্ত কর্‌তে পার্ব্বেনা বলে' দিচ্ছি।

মমতা তাহার দরজার পর্দ্দাটা সরাইয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

যেন তাদেরই বাড়ী ঘর,—জোর চলে। ওপাশের ঘরটায় একটা খালি তক্তপোষ পাতা ছিল, ছেলের দল সেখানে যাইয়া আসন করিয়া বসিল। পাশেই কাৎ করা

ক্যারম বোর্ডটা একজন ঠিক করিয়া লইল। কাঠের তাক্ হইতে টিনের একটা কৌটো নামাইয়া গুটি বাহির করিয়া ঢালিল ছর্ ছর্।...

মমতা এক মিনিট তাহার হাত বন্ধ রাখিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁরে বাদ্‌লা, সকাল বেলায় ইস্কুল হ'য়ে ভারী মজা হয়েছে, না? পড়া শোনা কিছু নেই, খালি খেলা; দাঁড়াও আমি বলে' দেব কুমুদ মাষ্টারকে সব কথা।

নিরঞ্জন হাত জোড় করিয়া বলিতে বারণ করিয়া বলিল, এক গ্লাশ জল খাওয়াবে মম দি', ভারী তেষ্টা পেয়েছে।

—হাত জোড় করেই আবার ফরমাস্! রোজ রোজ ওসব হেন খাওয়ান, তেন খাওয়ান চল্‌বে না বাঁদরের দল।

ভক্ত বলিল, মম দি' না থাক্‌লে কি আর এমন! বসোনা ওখানে মমদি'। পয়েন্টগুলো কেমন তড়াক্ তড়াক্ করে' নিয়ে নিচ্ছি দেখনা একবার!

—সুবল এসেছে বৌদি'?

ইন্দু বলিল এই এসে, আবার ও পাড়ায় তিমুর মার বাড়ী গেল। তুমি দুধের কথা বলে' দিয়েছ সেইটে আন্‌তে। মাছ পেয়েছে ভালই--দুটো আধসের-টাক জ্যান্ত ভেট্‌কি। তুমি কুটবে নাকি মাছ দুটো?

—আচ্ছা দাও বলিয়া মমতা ছিটালের পাশে বটি লইয়া বসিল।—নেড়ীর মার আজ আর বুঝি দেখা নেই! আজ একটু কাজ দেখেছে কিনা, আস্‌বে সেই সন্ধ্যের সময় একবার। পাঁচ টাকা করে' তুলে দেওয়া হয়, রেতে এসে শোবেন, বাস ফুরিয়ে গেল তার পরে! আমি বারণ করে' দোব, দরকার নেই অমন পাহারা গিরিতে আমাদের।

কাজ করিবার সময় মমতার মুখের একটী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। জিবটা একটুখানি বাহির করিয়া উপরের ঠোঁটের সঙ্গে চাপিয়া ধরে।—মুদ্রা দোষ। কিন্তু দেখিতে বেশ দেখায়। এই নিয়া তাহার শাশুড়ী এক সময়ে তাহাকে কত ঠাট্টা করিত।

দুপুর বেলায় ক'দিন ছেলেরা আসিতেছে, তাই বাড়ীটা একটু সরগরম থাকে। না হইলে খোকাকে লইয়া পড়িয়া থাকিয়া কার্পেট বুনিয়া দিন আর কাটেনা। সুবল, তাহাকে বাদ দেওয়া যায়। এই তাহার এগার বছর বয়সে সে এতখানি সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন আশী বছরের বুড়া। কথা কয়, যাহা না বলিলে নয়। একবার তাহার পিশে মশায়ের সাথে কলিকাতা হইতে এক বন্ধু বেড়াইতে আসিয়াছিল, বাড়ীর পুরাতন জীর্ণ বিষ্ণু মন্দির, তাহার স্থাপনের তারিখ, মুসলমানদের আমলের বাড়ীর চারিপাশ ঘিরিয়া দুর্গের মিলিত প্রায় খাদটা (এ বাড়ীটা নাকি এক সময়ে কোন মুসলমান নবাবের আমলের একটি দুর্গ ছিল। এই খাদটা, মাটী খুঁড়িলে যে সব কাঠে পোড়া পুরাতন ছোট ছোট ইট বাহির হয়, সে সব সেই কথারই সাক্ষ্য দেয়।) ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুটি নাটি করিয়া সে-ই তাহাকে দেখাইয়াছিল অত্যন্ত নিপুন কৌশলী গাইডের মত। পিশে মশায়ের বন্ধুটি ছোট পিসির ছেলেকে সারাদিন গাল টিপিয়া চুমা খাইয়া কত আদর করিল, তাহাকে ওসব কিছু করিল না। প্রথমটা খোকা কোলে যাইবে না, কিন্তু শেষকালে সুবলই নিয়া কোলে তুলিয়া দিল। তাহার নিজের জন্য সে এতটুকু উৎসুক নয়—বোঝেও না কিছু।

হাট করিতে হয়, বাজার করিতে হয়, দুলে বাগ্দীদের কাছ হইতে ধান চাল বুঝিয়া রাখে, স্কুলে যায়। ক্কচিৎ কখনও বাহিরের ঘরে ছেলেদের কাছে যাইয়া বসে, খেলেনা কিছু।

ইন্দু তাহাকে ভাল ছেলে করিয়া তুলিবে।

রান্না এবেলা বেশী কিছু নয়। ইন্দু কহিল, হ'য়ে গেছে ঠাকুর ঝি। মাছটা সাঁত্‌লে রাখি, তুমি' চান করে' নাও ততক্ষণ।

চৌবাচ্চার ধারটায় আড় হইয়া বসিয়া বুরুস দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে মমতা বাল্‌তিতে জলপড়া লক্ষ্য করিতেছিল। টিউবওয়েলের জল যেন অপরাজিতা ফুলের মত নীল! চান করে'—আঃ—গা যেন জুড়িয়ে যায়। ছটা দিন অন্তরই তো দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু এই কটা দিনের ব্যবধানই যেন মনের চারিপাশ ঘিরিয়া মধু চক্র রচনা করে। পরিপুষ্ট দেহের ভাঁজে ভাঁজে যে লীলায়িত লাবণ্য লুব্ধ আনন্দে

তাহারই দিকে চাহিয়া থাকে। আচ্ছা, আজ প্রথম কে কথা বলিবে?—হ্যাঁ, তাহার বহিয়া গিয়াছে। ছেলে কোলে নিতে আসিলে দিবে মাটীতে নামাইয়া। সকলের সামনে সে হাতে হাতে কোলে দিতে পারিবে না। ভারী চালাকী—না? বৌদি'র সামনে টানাটানি করিতে আসিলে দিবে দু'কথা শুনাইয়া—খালি দুষ্টামি!……

একটা কেওড়াদের মেয়ে আমতলা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কোঁচড়ে তাহার কি যেন, মমতা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এই নেড়ী, শুনে যা এদিকে।

মেয়েটা কাছে আসিলে মমতা তাহাকে দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, বুড়ো ধাড়ী মেয়ে, দুপুর বেলায় এগাছতলা, সে গাছতলা করে' বেড়ান হ'চ্ছে—লজ্জা করে না হারামজাদী!

নেড়ী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মমতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে তো কিছু অপরাধ করে নাই, সাহস করিয়া তবু বলিল, হারুদের সেই বড় গাছটার ফুল দিদিমণি, দেখ কেমন বড় বড়। নেবে চারটী'খানি?

মুঠি ভরিয়া সে তাহার কোঁচড় হইতে বড় বড় গাবের ফুল বাহির করিয়া দিদিমণিকে দেখাইয়া চৌবাচ্চার কিনারে রাখিয়া দিল।

খোকা বাবুকে মালা গেঁথে দিও,—লতা নেবে এট্টুখানি?

মমতার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু না হাসিয়া রাগ দেখাইয়া বলিল, তোর মা যে এলো না এবেলা, তার কি?

মা শুয়ে আছে দিদিমণি, বড্ড নাকি পেট কামড়াচ্ছে। আচ্ছা আমি বলে' পাঠিয়ে দেই গে যে তুমি এক্ষুণি ডেকেছ।

ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া একটা আমের কড়া দাঁত দিয়া কাটিতে কাটিতে নেড়ী চলিয়া গেল, মমতা তাহার গতিপথ ধরিয়া একটুখানি চাহিয়া রহিল,—তাহারও একদিন এমনি করিয়া ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া পথে পথে ঘুরিয়া কাটিয়াছে।……

বিকেল বেলায় মমতা বারান্দায় বৌদি'র কাছে চুল বাঁধিতে বসিল। আজ একটু সময় লাগিবে; বাটিতে যে তেলটুকু ছিল, ইন্দু নিঃশেষে তাহা হাতের চেটোতে ঢালিয়া লইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখাইয়া আঁচড়াইয়া, তার পরে বিনুনি তৈরী করিল। মমতা দুয়ারের পরে একটা ছোট অতসী ফুলের চারার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। খোকাকে ছেলের দল কখন আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

সুবল গোটা কয়েক ছোট ছোট পাকা পেঁপে পুব্‌দিক্‌কার বাগান হইতে পাড়িয়া আনিয়াছে, পিসিকে বলিল, কোথায় রাখ্‌বো পিসি?

মমতা বলিল, রাখ্ এইখানে। দেখ্‌গেতো আর দুটো একটা পাওয়া যায় কি না। তার পর হরার বাপ বেলা পড়্‌লে আস্‌বে বলেছিল, তার কি হ'ল? দুটো ডাব পেড়ে দেবে, তার জন্যে কতবার তো তেল লাগানো হ'ল দেখ্‌ছি। তোমরা তো একটা ছোট গাছেও উঠ্‌তে পার্‌বে না····

সুবল বলিল, উঠ্‌বো পিসি, 'হর্-হরা' গাছটায়?

—থাক্, তার আর দরকার নেই, তুমি হরার বাপ্‌কেই আর একবার ডেকে দেখ।

খোঁপাটা ঠাসিয়া ঠুসিয়া ঠিক করিয়া দিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল।

—গাটা ধুয়ে এসে তার পর তোমার উনুনে আঁচ দিচ্ছি; তুমি ততক্ষণ বিছানা-টিছানা গুলো যদি পারো ঠিক করে' রাখো। নিজের প্রতি ইন্দুর দৃষ্টি নাই। মমতা এজন্যে এক সময়ে তাহাকে দুই চারি কথা বলিয়াছে, এখন আর কিছু বলেনা।

দুপুর বেলাতেই বালিশের নূতন ওয়াড় পরান হইয়াছিল, এখন বাক্স খুলিয়া চাদর বাহির করিয়া মমতা পরিপাটী করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিল। চাদরে যেখানে একটু খানিও ভাঁজ ছিল, তাহা টানিয়া টানিয়া সটান নিভাঁজ করিয়া দিল। দু'পাশে একটি একটি করিয়া পাশ বালিশ, মাঝখানে ছোট একখানি তোষকের উপর এক টুক্‌রা লংক্লথ—এটি খোকা বাবুর বিছানা।

ও ঘরের শয্যার বিশেষ কোন বাহুল্য নাই। দাদা মোটা সোটা মানুষ, এই গরমের দিনে একটা মাদুর হইলেই তাহার চলিয়া যায়। সুবল ও বৌদির নিচেকার বিছানাটা মমতা একটুখানি ঠিক ঠাক করিয়া দিল।

ঘরের পিছনে যে ছোট ফুলের বাগানটা, সেখান হইতে মমতা গুটি কয়েক বেল ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছানার পাশে টেবিলের উপর ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিল। দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যার উপর এখানে সেখানে খানিকটা গন্ধ ছিটাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নজরে পড়িল ওপাশের দীঘির পাড় ঘুরিয়া সান্ত্বনা আসিতেছে। মমতা চঞ্চল হইয়া উঠিল! ক'দিন যে টিকি গাছটির দেখা নেই! তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া যাইয়া সান্ত্বনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কাছে আসিতেই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে সান্ত্ব, তারপর হঠাৎ কি মনে করে' ?

চালটা বজায় রাখিতে হইবে। সান্ত্বনা জবাব দিল, বিশেষ কিছু মনে করে' নয়, তোমাদের এখানে আজ একজন বন্ধুর আসবার কথা আছে, তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

মমতা কহিল ও! বিশেষ গোপনীয় কথা কি? আমরা কিছু শুনতে পাই ?

গম্ভীর মুখে সান্ত্বনা বলিল, নিশ্চয়ই না!

মমতা ফাটিয়া পড়িল।—বাপ্‌রে, তুই বাপু পারিস্ ব্যাটা ছেলের মত করে' বল্‌তে—আমার ছাই ও হয় না।

মমতা ওপাশে উঠিয়া গিয়া পানের বাটায় হাত দিয়া বলিল, পান খাবি আয় সান্ত্ব।

কিন্তু ততক্ষণে সান্ত্ব মমতার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে।

—তোর ছেলে কোথায় লো মমরাণী? ইস্! আজ বুঝি গন্ধ মেখেছিস্ বিছানায়;—বেশ তো গন্ধটা!......

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মমতা বলিল, ও আবার কি?—ব্যাটা ছেলের বিছানা, অমন করে' গড়িয়ে জট পাকিয়ে না দিলে কি হতো না? ফিট্‌ফাট না দেখ্‌লে ও কেমন রেগে যায়!...

—যায় নাকি? বলিয়া সান্ত্বনা ভাল করিয়া পা দুটা উপরে তুলিয়া লইল।

এক নিমিষে মমতা ওদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কঠিন বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, এসব আমি ভালবাসি না মোটে। কথা বল্‌বে এদিকে এসে বলো, তা না, ও সব কি! নামাও পা'।

—যদি না নামাই ?

না নামাই কি রকম! জোর নাকি? দেখ দেখি সব বিশ্রী একাকার করে' দিলে।......

মমতা সান্ত্বনার পা ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,—কৈ, কথা শুন্‌ছো না যে ?

সান্ত্বনা এতক্ষণও মনে করিতেছিল, ইহা সখীর আর এক প্রকার রসিকতা, কিন্তু এইবার ভাল করিয়া মমতার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভরসা তাহার উড়িয়া গেল। আস্তে নামিয়া পড়িয়া বলিল, বিছানাটা আমি ঠিক করে দিয়ে যাই।......

দুই ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা, একটু আগে মমতা সেটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন পেঁপে কাটিয়া রেকাবীতে সাজাইয়া রাখিল; পাশে পাশে গুটি কয়েক ক্ষীরের সন্দেশ। হরার বাপ ডাব পাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, নিজেই দা দিয়া দু'টো ডাবের মুখ কাটিয়া রাখিল। দু' গ্লাশ বেলের সরবৎ তৈরী করিয়া ইন্দুকে ডাকিয়া বলিল, এ সব নিয়ে যাও। দু'প্রস্থ জল খাবারের মধ্য হইতে ইন্দু একপ্রস্থ ওঘরে লইয়া গেল।

কাজ কর্ম্ম সারিয়া আসিয়া মমতা বারান্দায় বসিয়া ছেলেকে আদর করিতেছে, এমন সময় আমতলার পথে স্বামী ও দাদাকে দেখা গেল। দুই জনেরই হাতে ঝুলান দু'টি পুঁটুলি। কলিকাতা হইতে নানারূপ দরকারী জিনিস তাহারা লইয়া আসে—যাহা এখানে সব সময়ে মিলে না। মাঝে মাঝে ইলিশ মাছটা, কপিটা যে দিনের যে জিনিসটি, তাহাও অবশ্য আসে। খোকার জন্য নানারূপ খেলনা, লজেঞ্জ সে তো আছেই।

দাদা খোকার সাথে প্রাথমিক আলাপ করিয়া লইয়া বোন্‌কে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পরে নিজের পুঁটুলিটি খুলিল।

—খোকা বাবুর জন্যে এবার এই ময়না পাখী, কেমন কথা বল্‌বে,—"খোকা বাবু, ছাতু ভেজো, রুটি ভেজো"। খোকা বাবুর গাল টিপিয়া দিয়া, চুমা খাইয়া দাদা ওঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

বিজন এতক্ষণ ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর পা' তুলিয়া দিয়া পাখার বাতাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মমতাকে ঘরে

ঢুকিতে দেখিয়া পাখাটা তার দিকে আগাইয়া দিয়া চোখে মুখে হাসিয়া বলিল, মমীরাণীর খবর ভালো ?

মমতা মুখখানি ওদিকে একটু ফিরাইয়া নিয়া নিজেকে একটু মহার্ঘ করিল।

—দুষ্টামি খালি……

হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইতেই মমতা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া মধুর তিরস্কারের ধাঁচে বলিল নাঃ, এখন ওসব হবে না, কাপড় জামা ছাড়া নেই, কিচ্ছু নেই…

—ও !—এই কথা ! বলিয়া বিজন উচ্চ হাসিয়া উঠিল।

—তারপর তোমার ছেলের খবর কি ?

—কথার ছিরি দেখে আর বাঁচিনে, ছেলে বুঝি খালি একলা আমারই ! এতক্ষণ ধরে' এসেছে, একবার একটু কোলে করা হোলনা ! ভারী আমার……

—কি আমার বল্‌লে না মমী ?

—না, আমি বল্‌বো না।

গাল ও ঠোঁট দুটিকে ফুলাইয়া মমতা একরূপ মুখভঙ্গি করিল।

আবার একচোট হাসিয়া লইয়া বিজন খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল—খোকা বাপের গোঁপটা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—বা-ব্-বা !

বারুইপুর হইতে কিছু ফল আনা হইয়াছিল, সেইটে নিয়া নাড়া চাড়া হইতেছিল।

—ও ঘরে ক'টা দিয়ে এসো। আরও কিছু আন্‌তে পারতুম কিন্তু মুস্কিল বাধালে সেই ছেলেটা।……

মমতা মুখ তুলিয়া বিজনের দিকে চাহিল।

—আমাদের সেই মেসের ছেলেটা গো, তোমাকে একদিন বলেছিলাম। আসার সময় একখানা চিঠি এনে হাজির। তার মা দেশ থেকে লিখেছে। ক'দিন নাকি এক রকম না খেয়ে আছে, বাপটা তো মর্‌তেই বসেছে। কি করি, একেবারে কেঁদে পড়্‌লো—দিতেই হ'লো কিছু। কি রকম ছেলে কিছু বুঝি না। এদ্দিন ধরে' আছে, যেমন তেমন একটা চাকরী যোটাতে পারত ! ··কি সব ছিজি বিজি বসে' বসে' লেখে দিন রাত !···কিচ্ছু হ'বেনা ওর।

মমতা বলিল, কত দিলে ?

—তা একটা টাকা দিলাম। কি আর করি, যে-রকম করে' ধরলে !··

মমতা একটু খানি গম্ভীর হইয়া ফল বাছায় মনোনিবেশ করিল।

এবেলা রাঁধা বাড়া করিল মমতা। সকলকে খাওয়াইয়া দিয়া সে ও ইন্দু যখন খাইতে বসিয়াছে, ইন্দু বলিল, শুন্‌ছো ঠাকুরঝি, আজ নাকি লাইনে কে একজন কাটা পড়েছে, তোমার দাদা বল্‌লে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া থালার দিকে চোখ্ রাখিয়াই মমতা বলিল, কৈ, ওতো কিছু বল্‌লে না। তা' লাইনে কত লোকই তো কাটা পড়্‌ছে, নূতন আর এমন কথা কি।

অলক্ষিতে একবার শিহরিয়া উঠিয়া ইন্দু বলিল, সে কথা সত্যি। কিন্তু তোমার দাদা যেমন করে' বল্‌লে তা'তে তো মনে হয় লোকটা ওঁদেরই মত হপ্তার বাড়ী আস্‌ছিল—ভদ্রলোক। হাতে কি কি সব সওদা, একটা ইলিশ মাছ···

—কেমন করে' কাটা পড়্‌লো ?

—চলন্ত গাড়ীটা না কি ভাল করে' না থাম্‌তেই তাড়াতাড়ি নাব্‌তে গিয়েছিল,—পা পিছলে পড়ে' গিয়ে···

মমতা বলিল, সে দোষ তো আর গাড়ীর নয়, বোকার মত অমন সাত তাড়াতাড়ি নাব্‌তে গেলই বা কেন ?

ইন্দু মমতার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া মমতা একবার টেবিলের কাছে দাঁড়াইল।—ঐ যাঃ, ভুলে গেলাম, খাবার জলটা রাখা হয়নি আবার। ঘরের কোণ্ হইতে কুঁজো হইতে দু' গ্লাশ জল গড়াইয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। পানের বাটার কাছে বসিয়া গুটি কয়েক পান তৈরী করিয়া নিজে একটা মুখে পুরিয়া দিল, বাকীগুলি এক্‌টা ডিবা ভর্ত্তি করিল। পায়ের ধুলাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া

বিছানায় উঠিতে উঠিতে বলিল, ভারী যে নাক ডাকানো হচ্ছে, ওসব আর মানুষে বোঝে না কিনা।

পাশ ফিরিয়া বিজন হাসিয়া বলিল, রাত কত হয় তার খেয়াল আছে?

—তা হয়েছে কি, শুধু শুধু তো আর বসে' ছিলাম না, কাজই তো কচ্ছিলাম।

বিজন বলিল, তোমাদের কি, নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে তোমরা খুব পারো—যত দায় এই হতভাগাদের।

—ইস্, দায় আর ধরেনা যেন, পুরুষ মানুষের সব আমরা জানি। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে খুব ওস্তাদ।

তাই না কি? বলিয়া বিজন মমতাকে কাছে টানিয়া লইল।

—হ্যাঁগা, আজ না কি কে একজন গাড়ী চাপা পড়েছে, বৌদি' বল্‌ছিল।

বিজন বলিল, হ্যাঁ, ধব্‌ধবের ষ্টেষনে একটা বিশ্রী রক্তারক্তি কাণ্ড। অখিল ভট্‌চায্‌ না কি নাম, ওখানকারই লোক শুন্‌লাম। তা' লোকটা এমন ছট্‌ফটে,—এক মিনিট আর সবুর সচ্ছিল না। আমার কিন্তু খুব সবুর সয়, না মমতা?

বিজন দুষ্টামি ভরা চোখে মমতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিজনের গালের উপর ছোট্ট একটুখানি করাঘাত করিয়া মমতা কহিল—যাও!

করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

অভিসার

শ্রীকালিপদ সিংহ এম্-এ

দুরান্তের বনান্ত নীলিমা,—
যে কথা শুনাতে চায় ধূসর সন্ধ্যায়,
বন্দী তারে করিয়াছ অটুট শৃঙ্খলে
নিজ নীল নয়নের গম্ভীর অতলে।
তাই সখি, বেদনার রুদ্ধ মূক বাণী
নিয়ত উঠিছে ধ্বনি'
কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ অস্ফুট সঙ্গীতে;
ওই তব নয়নের নীরব ইঙ্গিতে॥

আত্মহারা মিলনের যে মৌন রাগিণী,
ঘুমন্ত বাঁশরী বক্ষে সঙ্গীতের মত,
নিঃশেষিয়া আপনারে ফেলেছে হারায়ে,
রজনীর স্তব্ধ মূঢ় কৃষ্ণ অন্তস্তলে,
তারে অন্তরের মুগ্ধ শান্ত অন্তরালে,
রাখিয়াছ নিজ চির গোপন আলয়ে।
এ যেন গো সীমান্তের বন্ধন প্রয়াস
অসীমেরে চিরন্তন মুক্তির শৃঙ্খলে॥

তাই সখি, তাই তব প্রতি অঙ্গ মাঝে-
নিয়ত উঠিছে বেজে
কি এক না-শোনা গান পরিচিত সুরে,
তব দেহ-মন্দিরের অস্ফুট দুয়ারে॥

তৃপ্তিহীন অভিসারে শ্রান্ত তনু লয়ে
মুগ্ধ আমি আসিতেছি যুগান্ত হইতে।
আজি মধুরাতে—
আসিয়াছি আপনা হারাতে,
ও অসীম তনিমার উন্মত্ত মিলনে,
মিটাইতে তৃষ্ণা মোর বাঞ্ছিত মরণে॥

রবীন্দ্রনাথের চিত্র শিল্প

ডাঃ সরসীলাল সরকার

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কবির অপূর্ব্ব চিত্রশিল্প পরিদর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে যে একটা অসাধারণত্ব আছে তাহা এই চিত্রগুলি কিছু মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই চিত্রগুলি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যে অন্যান্য চিত্রকরেরা যেভাবে চিত্রাঙ্কণ করে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া হয়ত রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণে তাহার কোনও বিশেষ প্রভেদ আছে। যেমন Psychical Research by W. F. Barret F. R. S. পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে অনেকে চেষ্টা করিয়া চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন না, কিন্তু অনেক সময় তাঁহাদের হাত দিয়া বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই সুন্দর ছবি আঁকা হইয়া থাকে।* Crystal vision এর ছবির বিবরণ অনেক পাশ্চাত্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এই crystal vision আমাদের দেশে নখদর্পণ বলে প্রচলিত। কোন একটি স্বচ্ছ পদার্থের প্রতি মন স্থির করিয়া দেখিতে দেখিতে যাহাদের crystal vision দেখিবার শক্তি আছে তাঁহারা আপনা হইতে উদ্ভূত চিত্র দেখিতে পান। এই crystal vision সম্বন্ধে একখানি পুস্তকে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পাদটিকায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

এই বর্ণনার মধ্যে লেখা রহিয়াছে যে crystal vision অর্থাৎ নখদর্পণের চিত্র যাহা দেখা যায় তাহা ছোট ছোট দৃশ্য যেমন অস্পষ্ট মুখ, এবং এইরূপ প্রকারের অনেক চিত্র। রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে অনেকগুলি এইরূপ ধরণের। যেমন ১৪২নং চিত্র আধখানি মুখ। ১২৩নং চিত্র মুখের মধ্যাংশ মাত্র। ৯৫নং চিত্র একটি সাদা ডিম্বাকার স্থান মুখটিকে ঈঙ্গিত করিতেছে। বাদ বাকীটি কাল কাপড়। ১৭০নং ১৯০নং প্রভৃতি কতকগুলি চিত্র এইরূপ।

যাঁহারা ভগবৎ সাধন ভজনের সহিত ধ্যান অভ্যাস করেন, তাঁহাদের দর্শন করিবার একরূপ শক্তি কখনো কখনো আপনা হইতে বিকশিত হয়। তাঁহাদের মানস পটে ধ্যানের সময় crystal visionএর মত অনেক অহৈতুক চিত্র উদয় হয়; সে সমস্ত চিত্রের একটা আধ্যাত্মিক শক্তি থাকে। ঐ সব চিত্র দর্শনের পর একটা মানসিক পবিত্রতা ও শান্তি আসে যাহাতে প্রবৃত্তির তেজ হ্রাস হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে এইরূপ

---

* I might quote many instances of automatic writing and drawing which have occurred more recently among my acquaintances, one, the wife of a late eminent colonial Lord chief justice had a strange experience: though in her normal state quite unable to draw, her hand when allowed to remain passive rapidly sketched in the twilight most exquisite faces which she completely failed to imitate by conscious volition.

Another the aged mother of a famous dramatic author, though also in her normal state quite incapable of drawing a line, involuntarily sketched fantastic and intricate foliage with a precision and skill possible only to a gifted artist

Phychical research by W. F, Banett F. R. S. page 222

* A remarkable form of mediumship is crystal-gazing where the pictures are actually visible to the eye of the setter, The author has only once encountered this under the mediumship of a lady from York-shire, The pictures were clear-cut and definite and succeeded each other with an interval of fog, They did not appear to be relevant to any past or future event, but consisted of small views, dim faces and other subjects of the kind.

History of Spiritualism by Arthur Canan Doyle page 210

একটি ভাব আছে তাহাও অনুভব হয়। যেমন ৪৮নং চিত্র; সমুদ্রের উপরের নৌকাতে একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে যাহার একটা চোখের দৃষ্টি বেশ একটা জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই দৃষ্টিটা দূরের একটি অস্পষ্ট রক্তিমাভামণ্ডিত মাতৃমূর্ত্তির উপর সংনিবদ্ধ রহিয়াছে। এই মুর্ত্তিটির অঙ্কনভঙ্গী দ্বারা বুঝা যায় যে এটি কোন রহস্যময় অপার্থিব ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। ধ্যানের এইরূপ ছবি ফুটিয়া উঠে।*

যাহা হউক এই সব চিত্র সম্বন্ধে আমি কবি-সম্রাটকে একখানি পত্র লিখি, তাহার উত্তর তিনি যাহা দিয়াছিলেন, তাহা এই বৎসরের বৈশাখ মাসের বিচিত্রাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের গোড়ায় ছিল,—

"ছবির কথা কিছুই বুঝিনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক ওদের ঝোঁক রঙীন নৃত্যে"

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন জানিয়া আমি ৭ই জুলাই একটি পুস্তক লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এই পুস্তকখানির নাম "The New Generation." ইহা ১৯৩০ খৃঃ অব্দে প্রথমে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় The creative Impulse in children নামক Florence cane নামক একজন বিদুষী মহিলার লিখিত একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে কতকগুলি চিত্র আছে যাহা অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা নিজের খেয়াল মত কাহারও কোনও সাহায্য না লইয়া অঙ্কিত করিয়াছে। ছবিগুলির অঙ্কনকারীদের বয়স ১৪ হইতে ১৬ বৎসর মাত্র।

ইহার প্রথম ছবিটির নাম Defiance অর্থাৎ স্পর্দ্ধা। এই ছবিটিতে একজন লাল ঘাগরা এবং জামা পরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির মত ইহার মস্তকটি outline দিয়া আঁকা। ইহাতে নাক মুখ চোখ অঙ্কন করা হয় নাই। হাত দুটিকে ডাঁটার মতন অঙ্কিত করিয়া মুষ্টি বদ্ধ ভাব বুঝান হইয়াছে, অঙ্গুলি গুলি অঙ্কন করা হয় নাই। তথাপি স্পর্দ্ধার ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ ভঙ্গীর মধ্যদিয়া ভাবপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২৩৯ চিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই চিত্রে মাতৃস্থানীয়া কেহ একজন শিশুর মাথার উপর নিজের গাল রাখিয়াছে। এই ভঙ্গীর ভিতর দিয়াই তাহার স্নেহ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মাতা কিম্বা ছেলের বাস্তবিক চেহারাটা কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য চিত্রকর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অঙ্কন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় চিত্রের নাম Abstract Design in coloured chalks; এই চিত্রের মধ্যে কেবল রংএর এবং রেখার খেলা দেখান হইয়াছে, কোনও মূর্ত্তি অঙ্কন করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর চিত্র বহু আছে এবং বোধ হয় তাহারা চিত্রজগতে একটা অভিনব স্থান লাভ করিবে।

আর একখানি ছবির নাম Simplicity and Sophistication অর্থাৎ সরলতা ও কুটিলতা। ইহাতে দুটি সাদাসিধাভাবে আঁকা চেহারাতে চোখের ভঙ্গীর মধ্যদিয়া সরলতা এবং কুটিলতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছাত্রী চিত্রকারিণীর চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দুইটি পাশাপাশি চিত্রের মধ্যদিয়া ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বহু চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। যেমন ৫৪নং ১১নং, ৮২নং ৬৬নং, ২১৩নং, ১৭৭নং ইত্যাদি। ইহা ছাড়া চোখের ভঙ্গীর মধ্যদিয়া অন্তরের ভাবপ্রকাশ করা রবীন্দ্রনাথের ছবির একটা বিশেষত্ব, যেমন ১৪২নং চিত্রে আধখানি মুখ ও একটিমাত্র চোখ আঁকা। কিন্তু চোখের কি কোমল দৃষ্টি! ২২৬ নং চিত্রে ছোট্ট একখানি মুখ, কিন্তু তাহার চোখের ভাব কি জীবন্ত!

কবিসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি বলিলাম "পত্রে চিত্রগুলিকে স্বপ্নের ঝাঁক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি unconscious mind (অবচেতন মন) হইতে উদ্ভূত চিত্রগুলির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি, যে আপনার চিত্র সম্বন্ধে এসব দিক দিয়া কোনও আলোকপাত হয় কিনা।" এই সঙ্গে আমি Psychical

---

* কলিকাতার Art schoolএ চিত্র-প্রদর্শনীর সময় এই চিত্রের নিম্নে লেখা ছিল যে এই চিত্রখানি হবিমল চাটার্জ্জিকে বিক্রয় করা হইয়াছে।

Research পুস্তকে যাহা পড়িয়াছিলাম এবং crystal vision প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিলাম।

কবি-সম্রাট হাসিয়া বলিলেন,—"আমি পত্রে কি লিখিয়াছিলাম তাহার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ? শুনতে বেশ মিষ্টি হয় এবং বেশ মানান সই করিয়া কবি মানুষেরা কথা বলেন। ঐ সব কথার মধ্যে বিশেষ কিছু seriousness থাকে না, একথা তুমি মনে করতে পারতে।"

তাহার পর আমি যে পুস্তকখানি লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে Florence bane লিখিত "The creative Impulse in children" নামক প্রবন্ধে যে ছবিগুলি আছে, তাহা কবি-সম্রাটকে দেখিতে দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে এই ছবিগুলির সহিত আপনার অঙ্কিত চিত্রগুলির কোন অংশে সাদৃশ্য আছে কি?

কবি-সম্রাট বলিলেন,—"হয়ত কিছু আছে, তবে বলা বড় শক্ত।"

তাহার পর কবি তাঁহার নিজের ছবির সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে,—'আমার ছবি যে শুদ্ধ unconscious mind হইতে উদ্ভূত একথা বলা চলে না। হয়ত গাছদের শুধু unconcious mind আছে, কিন্তু মানুষের মন দুইভাগে বিভক্ত, conscious এবং unconscious; সৃষ্টি যে হয় তাহা এই দুই মনের মিলিত কার্য্যের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ। এইটি বাহিরের উত্তেজনার জন্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু সমুদ্র আছে বলিয়াই ত হয়। সেইরূপ conscious mind দিয়া যখন unconscious mind এর উপর ক্রিয়া হয় তখনই সৃষ্টি হয়।

এক্ষণে আমার ছবি কিরূপে আঁকা হয় তাহা বলিতেছি।—মনে কর আমি মেঝের উপর কতকটা কালী ছিটাইয়া দিলাম। এই ছিটানর জন্য কতকগুলি figures আপনা হইতেই উদ্ভূত হইল। এই figures হইতে ideas এর suggestion পাইলাম। সেই suggestions ধরিয়াই আমি ছবি অঙ্কিত করি। এই কালী ছিটানর জন্য figures গুলিকে মনের unconscious হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। তাহা হইতে মনের মধ্যে যে suggestions আসে সে গুলিও unconscious নহে। হয়তঃ ইহাদের সঙ্গে universal consciousness এর যোগ আছে।

আমি বলিলাম যে "আপনি যথার্থতঃ মেঝেতে কালী ছিটাইয়া ছবি আঁকা আরম্ভ করেন না। কাগজে দাগ কাটিয়া অঙ্কন আরম্ভ করেন। এই সময় হয়তঃ আপনার unconscious mind এর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অর্থাৎ automatic writing এর মতন ছবিগুলি নিজ হইতেই আঁকা হইয়া যায়।"

কবি বলিলেন,—"কাগজে দাগ কাটিয়া ছবি আঁকা অনেক সময় কিরূপে হয় তাহা জান? হয়তঃ আমি একটা ফুল বা অমনি কিছু আঁকিয়া ফেলিলাম। তাহার পর এই ফুল আঁকিবার পর এই ফুলই আমার মনের মধ্যে অন্য ভাবের suggestion আনিয়া দিল, তখন ঐ ফুলটাকে বদলাইয়া অন্য একটা ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম। ঐ ছবিটি যে ফুল বদলাইয়া আঁকা হইয়াছে, তাহা আমিই জানিলাম, অপরে তাহা ধরিতে পারে না। অনেক সময় বাস্তবিক পক্ষে কাগজের উপর কালী ফেলিয়া সেই figure এর ভাব লইয়া অন্য ছবি আঁকা হয়। অনেক সময় পুরাণ বা মলিন কাগজের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ থাকে। সেই দাগের মধ্যে একরূপ ছবি থাকে, সেই ছবির suggestions লইয়া ছবি আঁকা হয়। এই সূক্ষ্ম দাগের ছবি যে আমিই দেখিতে পাই তাহা নহে। এ সব বিষয়ে যাহাদের চোখ আছে তাহারাও দেখিতে পায়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি শোন।

একবার নন্দলাল বাবুকে বলিলাম যে সম্মুখের দেয়ালের দাগের মধ্যে যে একটা ছবি রহিয়াছে তাহা কি দেখিতে পাইতেছেন? নন্দলালবাবু বলিলেন যে—হাঁ একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গরু চরাইতেছে। আমি বলিলাম আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া ছবি copy করা কষ্টকর হইবে, আপনিই ছবিটি copy করিয়া লউন। হয়তঃ নন্দলাল বাবুর পক্ষে ছবিটি copy করা হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক ইহা হইতে বোঝা যায় যে,—এইরূপ ছবি যাহা আমি

দেখি—অন্যলোক যাহাদের এ সব বিষয়ে চোখ আছে তাহারাও বুঝিতে পারে।

আমি যখন আমার লেখা সংশোধন করি তাহার মধ্যে যে কাটাকুটি থাকে সেগুলি আমাকে আঘাত করে। সেই জন্য আমি কাটাকুটি করিবার সময় প্রত্যেক কাটাকুটিটি এমন ভাবে করি যাহাতে তাহারা একটা figureএর মতন হয়। পরে এই কাটাকুটি figureগুলি এমন ভাবে যোগ করিয়া দিই, যাহাতে একটা ছবির মতন হয়। তখন যেন ইহার মধ্য হইতে একটা ভূত নামিয়া যায়। কাটাকুটিগুলি ছবির আকার ধারণ করিয়া একদিকে থাকে। আমার লেখাগুলি অন্য দিকে থাকে।

এক্ষণে তুমি বলিতে পার যে এই কাটাকুটিগুলি পরস্পরকে এই দিক দিয়া যোগ করিয়া এইরূপ figure করিতেছেন,—কেন, অন্য দিক দিয়া যোগ করিয়া এরূপ ত করা যায়। তাহা হইলে আমি বলিব যে আমার নিজস্ব একটা rhythm আছে। এই rhythmটি আমার লেখার মধ্যে আছে, আমার কথাবার্ত্তার মধ্যে আছে, আমার Dressএ আছে আমার চালচলনে আছে। আমার ছবির psychology এই rhythmএর মধ্যে।

ইহা ছাড়া অন্য কিছু যদি খোঁজ, যেমন আমার মনের মধ্যে কোন একটি গ্রন্থি আছে, কোন একটি complex আছে ইত্যাদি তাহা হইলে ভুল করিবে। জড়যন্ত্র দিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলে, কারণ যন্ত্রের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যখন তোমার মন দিয়া আর একজনের মন পরীক্ষা কর, তখন তোমার নিজের মন যে একভাবেই চলছে একথা কি বলতে পার। তুমি আমার মনের গোপন কথা যদি তোমার মনের দ্বারা ধরিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে ভাবতে হবে যে আমার মনের সব বিষয়ের সঙ্গে কি তোমার মনের একত্ব আছে? তোমার মনের কি আমার মনের সব বিষয় বুঝবার মতন শক্তি আছে। তোমার নিজের মনের মধ্যে কি complex নাই? তুমি কি মনে করতে পার না যে কবি অনেক বিষয়ে বড় হয়ে পড়েছেন তাহার উপর কতকগুলি complex লাগিয়ে দিয়ে তাঁহাকে ছোট করে দেওয়া যাউক? জড়বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু তাহারও কত সিদ্ধান্ত পরের গবেষণায় বদলাইয়া যাইতেছে। হয়ত তোমাদের মনোবিজ্ঞানে সামান্য কিছু সত্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা দ্বারা কি তোমরা এরূপ C, I, D, হয়েছ যে সকলের মনের গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলতে পার? যদি এরূপ মনে কর ত চেষ্টা করে দেখ।"

কবি-সম্রাটের কথাগুলি আমি অতি শ্রদ্ধার সহিত শুনিলাম। একটি জিনিস আমার মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল যে বিদুষী মহিলা Florence bane যিনি একাধারে মনস্তত্ত্ববিদ এবং চিত্রকর, যাঁহার প্রবন্ধ "The creative Impulse in children নামক প্রবন্ধ হইতে কবি-সম্রাটকে ছবি দেখাইয়াছিলাম, কবি সম্রাটের কথা তাঁহার লেখা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে সমর্থিত হইতেছে।

কবি-সম্রাট কালী ছিটাইয়া ছবি আঁকিবার কথা বলিয়াছিলেন। Florence bane তাঁহার প্রবন্ধে ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—

"The child begins by covering the paper with bright marks of crayon or pools of paint, just for the pleasure in the movement. Next the color excites his sensation; then the dabs and pools of accidental shapes excite his imagination. These forms in turn link with his own experiences and bring his emotions into play. Thus the whole child is functioning, the painting becomes a simple joyous form of self-expression as well as an integrating experience."

কালীর ছিটা সম্বন্ধে ছোট ছেলেদের কিরূপ ধারণা হয় সে সম্বন্ধে লেখিকা বলিয়াছেন,—

"At this time the word of imagination is more vivid than the perception of reality; for the child his symbols are adequate. A formless pool of paint in one picture he calls a house, a similar one in the next he calls a moon. The forms may have

purely subjective meaning to the child. One little girl of five was heard to say about her painting. "This looks just the way I feel inside.

কবি-সম্রাট rhythm এর কথাটা শেষ কথা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। Florence bane ও এই rhythmটিই creative impulse এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিষয় এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

The first manifestation then of the creative process is the satisfaction that comes from repetition. Repetition is the simplest form of rhythm. Rhythm may be described as energy in alteration, positive and negative. All the intricacies of form and design grow out of it. A rhythmic impulse in the child is inevitable. It is the basic formula of the world of which he is a unit. The universe is created in rhythmic measures of ordered time; the years, the seasons, the days. Life itself is born of positive and negative sex forces. The child unconsciously feels the rhythm of his breath, of his heart beat. The atom symbolizes this truth. The positive proton and negative electron to-gether form the third unit which is the atom. While the child is young and instinctive his art is unconscious, but as the instinct becomes cultivated and trained to be an active will, his art becomes conscious and as this happens the self becomes more integrated until the individual is born of the effort. Thus art becomes a means of developing human being, which is its true purpose and function. From this point of view it becomes clear that the instinct of creation may become the instinct of self-creation.

এই rhythm এর সম্বন্ধে আর একস্থলে বলিয়াছেন,—

He (i e the child) may have lost courage and self-confidence and become cramped in his efforts, may have lost the larger rhythm, limited his fantasy. The teacher's task at such time is to find ways of restoring the rhythm and the courage and releasing and channelling the emotion and bringing out unconsciously the problems he cannot solve in life.

মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কেননা বর্ত্তমানের মনস্তত্ত্ব শাস্ত্র যাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতেছে—মানুষের গভীরতম মনে সংগুপ্ত নীচ প্রবৃত্তি গুলিই তাহার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মানুষের গভীর মনে নীচ প্রবৃত্তি ছাড়া অতি উচ্চ প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাও থাকে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। যেমন calculating boys বলিয়া একশ্রেণীর লোক পৃথিবীতে মাঝে মাঝে জন্মায় যাহাদের অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে জন্মগত অসাধারণ ক্ষমতা থাকে। আমাদের বাংলা দেশেরই শ্রীযুক্ত সোমেশ বসু যে ভাবে অঙ্কের সমস্যা পূরণ করেন তাহাতে বুঝা যায় তাঁহাকে গুণভাগ কিছুই করিতে হয় না, আপনা হইতেই তাঁহার মনের মধ্যে উত্তরটি উঠে। যাহাকে আমরা unconscious mind বলি এটি তাহারই ক্রিয়া, কিন্তু বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব এ সমস্যার কোন মীমাংসাই করিতে পারে না।

বর্ত্তমান কালে আর্ট সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের দিক দিয়া যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা হয়, তাহারও সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের মনের মধ্যে যে সকল নীচ প্রবৃত্তি চাপা রহিয়াছে, সে গুলিকে কিরূপভাবে শিল্পকলার আবরণে সজ্জিত করিয়া একটা রসোপভোগের বস্তু করা যায়, সেই প্রচেষ্টা আর্টের মূলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এবং তাহা হইতেই আর্টের বিকাশ। এই সিদ্ধান্তে আংশিক সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহা আমরা স্বতঃই অনুভব করি।

কলাশিল্প হইতে মানুষ রস উপভোগ করে বটে, কিন্তু রসেরও প্রকারভেদ আছে, এবং মানুষের রস-তৃষ্ণা শুধু কেবল প্রবৃত্তিজাত রসেই পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা যদি হইত তাহা হইলে মানুষের 'মনুষ্যত্ব' বলিয়া কিছুই থাকিত না। সুতরাং নব মনস্তত্ত্বের যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহা এখন

পর্য্যন্ত প্রাথমিক ভাবে কতকগুলি বিষয়েই আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা স্বতঃই অনুভব করি যে সঙ্গীত কবিতা চিত্র ভাস্কর্য্য মানুষের প্রবৃত্তিজাত রসোপভোগ তৃষ্ণা পূরণেরই উপকরণ মাত্র নয়, তাহার মধ্যে এমন এক গভীরতম অপার্থিবতাও আছে, যাহা মানুষকে পার্থিবতার শত বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিতে পারে। কলাশিল্পের জগতে মানুষ সীমার মধ্যে অসীমের সুর শুনিয়াছে, নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে এবং অনন্ত জগতের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিয়াছে। এইরূপ শিল্পকলাগুলিকে Mystic বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা চলে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এই Mystic শ্রেণীর।

অবচেতন মনের কোন কোন উন্নত বৃত্তি আমরা শিশুদের মধ্যে দেখিতে পাই, যাহা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থলে লোপ পায়, যেমন calculating boysদের অঙ্কশাস্ত্রের গণনার ক্ষমতা, crystal visionএর ক্ষমতা। অল্পবয়স্ক যুবকদের মধ্যে নিজের মন হইতে সৃষ্টি করিয়া চিত্রাঙ্কনের মধ্যেও হয়ত এইরূপ Mystic ক্ষমতার আভাস আছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের মধ্যে এই Mystic ক্ষমতার পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, এইরূপ আমাদের ধারণা।

অবচেতন মনের যে শক্তি তাহা ভালই হোক বা মন্দই হোক্ স্বতঃ উৎসারিত ভাবে প্রকাশ পায়, সেইজন্য শিশুদের মধ্য দিয়া এই শক্তি অনেকস্থলে সহজে প্রকাশ হয়, বয়স্কদের মধ্যে নানা কারণে প্রকাশের বাধা সৃষ্টি হয়। যাঁহারা কবি শিল্পী ও অসাধারণ প্রতিভাবান, তাঁহাদেরও চেতন মন অপেক্ষা অবচেতন মন লইয়াই কারবার অধিক। সেই জন্য শিশুদের ভিতর অবচেতন মনের শক্তি যেভাবে প্রকাশ পায় তাহার সহিত তাঁহাদের শক্তি বিকাশেরও কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

সরসীলাল সরকার



উদযাপন

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাপ মাতাল—।

অপরিমিত সুরাপানের ফলে লিভারে অসহনীয় বেদনা। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া নিজের ভাগ্যকে গালি দেয়,—কখনও ভগবানকেও।

আবার হাঁপানিও আছে; মাঝে মাঝে গোটা পাঁচ ছয় বালিশ পিছনে দিয়া হাপরের মত নিশ্বাস টানে।

মা বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাত্‌রাইতে কাত্‌রাইতে বলে,—বাবা দেবু, এবার একটি বিয়ে থা' কর বাবা; আর 'না' করিস্‌ নি। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ মুনুষ ক'ল্লুম, আমাদেরও ত' একটা সাধ আহ্লাদ আছে; তা'রপর এই বুড়ো বয়েসে ভুগে ভুগে মর্‌ছি দুজনেই; উনি তাই বলছিলেন, শেষ বয়সে বো'য়ের হাতের সেবা···

দেবেন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলে,—কিন্তু মা, এই মাইনেতে···পাশের ঘর হইতে বাপের কথা শোনা যায়;—ওরে, সে আমি বুঝবো রে; আমি যদ্দিন আছি··· উঃ হু হু হু, ম'লুম রে বাবা, উঃ শালা লিভারের নিকুচি করেচে···

বাপের আশ্বাস শুনিয়া দেবেনের হাসি পায়।

কাবুলিওয়ালার ভয়ে যে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে না, তাহার মুখের আশ্বাস।

বাড়ীতে ঘটক ঘটকীর আনাগোনার আর বিরাম নাই।

ভাত খাইবার সময়ে মা পাখার বাতাস করিতে করিতে বলে,—আহা, বাছার আমার খেটে খেটে চেহারা কালি হ'য়ে যাচ্চে; এমন ক'রলে বাঁচ্‌বি কি করে' বাবা? দাঁড়া বাবা, আর দু'খানা মাছ এনে দি'।

পরে আবার পাখা হাতে লইয়া বসে; বলে,—কাল থেকে আমি খানিকটা ভাল দুধের বন্দোবস্ত ক'র্‌বো তোর জন্যে; না, না, থামো না র্‌বলে কি হয়? শরীরটা আগে।

দেবেন আপত্তি করিতে যায়,—এই মাইনেতে···

মা বাধা দিয়া বলে,—তুই থাম্‌ বাপু; তোর সব তাতেই ওই এক কথা; আমি কিন্তু বাপু, কোন কথা শুনবো না; আসছে আষাঢ়েই একটি ডাগর দেখে বউ ঘরে এনে তবে ছাড়বো, তা' বলে' রাখছি।

বাপ বাহির হইতে মাতাল হইয়া আসিয়া বমি করিতে করিতে বলে,—তা' বই কি, আমিও ছাড়বো না; বেশ একটি ডাগর দেখে, বুঝলে কিনা বাবা দেবু...

দিনকতক পরে।—

বাপ বলে,—বলি হাঁগা গিন্নী, শুনলাম নাকি, দেবুর চাকরি গেছে; জানি আমি, ও ছোঁড়ার দ্বারা কিছু হবে না। তা' বলি কি, দু'মাসের মাইনে যে শুনলাম তা'কে অফিস থেকে আগাম দিয়েচে, তা' কই, আমি ত'বাবা একটি পয়সারও মুখ দেখতে পেলাম না; এখন ছাড়ো দিকিন্‌···

মাহিনার অর্দ্ধেক যায় শুঁড়িখানায়, অর্দ্ধেক ডাক্তারখানায়।

সারাদিন রৌদ্রতপ্ত পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘরের মধ্যে বসিয়া দেবেন গালে হাত দিয়া ভাবে।

বাপ আসিয়া বলে,—কুঁড়েমি করে' ঘরে বসে' বসে' যে কেবল আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগারের টাকা ওড়াবে, সেটি চল্‌বে না বাপু, বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ; খাটো, খাও; আর নয় ত' সোজা পথ দেখ; আমার কাছে ওসব খাতির টাতির···

মা আসিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া বলে,—সত্যি বাপু, সোমত্থ পুরুষ মানুষ, ঘরে বসে থাকা কি আর ভাল দেখায়?

এ সকল কথার যৌক্তিকতা যেমন অকাট্য তেমনি অভ্রান্ত; ন্যায়সঙ্গতও বটে। কিন্তু তবু কে জানে কেন দেবেনের নিষ্প্রভ চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠে। সে আল্‌না হইতে পাঞ্জাবীটা টানিয়া লইয়া গা'য়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়ে।

বাড়ীর দরজা হইতে বাহির হইয়া পথে পড়ে, কিন্তু গন্তব্যস্থানের ঠিকানা মেলে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে যন্ত্রচালিতের মত হাঁটিতে থাকে।

অফিসের ছুটির পর, রাস্তা দিয়া জনস্রোত অবিশ্রাম চলিয়াছে, যেন কিসের আকর্ষণে। মুক্তির আনন্দে লোকগুলার মুখ উজ্জ্বল। বন্ধনের পর মুক্তি, দুঃসহ অধীনতার পর অবারিত স্বাধীনতা! দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে, দেবেনের চক্ষু দুইটা জ্বালা করিতে থাকে। মনে হয়, লোকগুলা মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। নির্ব্বোধের দল, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। সংসার মরুর দিগন্ত রেখাটা কাহার রুদ্রনয়নের অগ্নি দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; তবু তাহারা চলিয়াছে, শান্তির ব্যর্থ সন্ধানে; চলিয়াছেই···

ড্যালহৌসী স্কোয়ারে একটি খালি বেঞ্চি দেখিয়া বসিয়া পড়ে। চাকরী ত' পথে গড়াগড়ি যায় না, যে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইলেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু তবু বাড়ীর মধ্যে থাকা নিরাপদ নহে।

চব্বিশ ঘণ্টা পথে পথে ঘুরিয়া জামাকাপড়ের রঙ এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে তাহাদের আসল রঙ কি ছিল জানিতে হইলে রীতিমত গবেষণা করিতে হয়।

ছেঁড়া কাপড়খানা পরিবার কৌশলে মানাইয়া গিয়াছে, কিন্তু খদ্দর পাঞ্জাবীটার স্থানে স্থানে পিঁজিয়া গিয়াছে। রুক্ষ, তৈলহীন, একমাথা চুল যেন শজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া আছে। ধূলিমলিন জুতাজোড়াটাও যেন কোন বুভুক্ষু জীবের মত হাঁ করিয়া থাকে।

একটা ভিখারী কোথা হইতে আসিয়া লম্বা সেলাম দেয়; —রাজাবাবু, ভগবান আপ্‌কা ভালা করে; একঠো পোইসা···

দেবেনের মেজাজ হঠাৎ চটিয়া যায়;—তোর ভগবানের নিকুচি করেছে···রুখিয়া উঠিতেই, ভিখারীটা হতভম্ব হইয়া সরিয়া পড়ে।

দেবেন রক্তচক্ষু পাকাইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। বিড়বিড় করিয়া গালি দেয়; ভিখারীকে কি ভগবানকে ঠিক বোঝা যায় না।

ভিখারীটাও তাহাকে বিদ্রূপ করে! বিদ্রূপই বলিতে হইবে বই কি।

পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই, মা'র সম্মুখে পড়িয়া যায়। মা বলে,—কিরে, চাকরিবাকরির সন্ধান কিছু হ'ল? না···

দেবেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলে,—হ্যাঁ, একটু আশা হ'য়েছে, দেখি, কাল ত' সাহেব দেখা করতে বলেছে, তারপর···

তাহার গলার শব্দ পাইয়া বাপ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। দেবেনের শরীরের রক্ত যেন অর্দ্ধেক শুখাইয়া যায়, বুক ধড়ফড় করিতে থাকে। কোন্ অফিসে চাকরির আশা আছে, বাপ জিজ্ঞাসা করে। সে তাড়াতাড়ি যাহ'ক্ একটা নাম মনে করিয়া বলিয়া দেয়। বাপ আবার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে আশা-নিরাশা-বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিশানো একটা স্বরে বলে,—হুঁঃ।

অফিস-কোয়ার্টারে ঘুরিতে ঘুরিতে দেবেন মনস্থ করে সে একবার "এন্‌ডিওরেন্স ওয়াকিং কন্‌টেষ্টে" নাম দিয়া দেখিবে; পারিবে বোধ হয়। না পারিবার কারণ ত' কিছু নাই। এই ত' সে সারাদিন ধরিয়া একটানা হাঁটিতেছে, হিসাব করিলে কত মাইল হইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

রাস্তার কলে আকণ্ঠ জলপান করিয়া সে সম্মুখের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রকাণ্ড অফিস-বাড়ীটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া অনেকগুলা কাউন্টারের সম্মুখ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চেপে পড়িল, একটা

টিনের প্লেটে লেখা আছে, "নো ভেকান্সি।" তাহার হঠাৎ যেন মনে হইল, কথাটা তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই লেখা। যেন ইহারা জানিত ঠিক্ সেইদিন সেই সময়ে দেবেন বলিয়া একটি বেকার যুবক চাক্‌রির সন্ধানে ইহাদের অফিসে আসিবে। এখানকার সকলেই যেন সে কথা জানে; তাহারা বুঝি তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহারই দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লজ্জায়, অভিমানে, ব্যর্থ ক্রোধে দেবেনের তপ্ত শোণিত যেন ধমনীতে নৃত্য করিতে থাকে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। কেন? তাহার দেহে কি কোথাও লেখা আছে যে সে বেকার? একজন ভদ্রলোককে এরূপভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অকারণে অপমান করিবার কী অধিকার ইহাদের আছে, যে...

হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার সম্মুখের কাউণ্টারের বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কি আছে?

দেবেন অতর্কিত প্রশ্নে থতমত খাইয়া চট করিয়া বলিয়া ফেলিল,—একখানা প্রস্‌পেক্টাস্ পাওয়া যাবে কি? কুড়ি বচ্ছরের এন্‌ডাউমেণ্ট?

বাবুটি তাহাকে একখানা প্রস্‌পেক্টাস্ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কত টাকা কর্‌তে চান আপনি? আমাকে বললে আমি আপনাকে সাজেস্‌সন্ দিতে পারি।

দেবেনের অপমানিত চিত্ত এতক্ষণে ইহাদের একটু শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইল; ইহারা যাহাকে বেকার বলিয়া মনে করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে কি করিতে পারে ইহারা বুঝুক্।

মুরুব্বিয়ানা ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কত টাকা পর্য্যন্ত আপনারা করেন?

উত্তর হইল,—এক হাজার টাকার কম নয়।

দেবেন বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল,—না, না, সেকথা বলছি না। ম্যাক্‌সিমাম্ কত পর্য্যন্ত?...আশী হাজার?...এক লাখ?

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—ওঃ, এক্‌সকিউজ্ মি, আমি বুঝতে পারি নি স্যার, হ্যাঁ তা'ও হ'তে পারে: তবে বেশী টাকার বিষয়ে আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে' দেখতে পারেন।

দেবেনের দীন বেশভূষার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। মনে করিলেন, হইবেও বা; হয়'ত ব্যবসাদার লোক, পয়সাটাই চেনে ভাল, বিলাসব্যসনের ধার ধারে না। পরে একটু চুপি চুপি বলিলেন,—স্যার যদি করেন ত' আমার 'থ্রু' দিয়েই করবেন দয়া করে'; গরীব মানুষ, বড় উপকার হবে। আপনার এ্যাড্রেসটা যদি দিয়ে যান, অনুগ্রহ করে'......

দেবেনের ক্ষুব্ধ মন এতক্ষণে অনেকটা তৃপ্ত হইল। সে সদর্প পদক্ষেপে বুক ফুলাইয়া পথে বাহির হইয়া আর একবার সেই দৈত্যপুরীর মত সুবৃহৎ বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল। মনে হইল, বাড়ীটা যেন কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

পিছন ফিরিয়া বাড়ীটার দিকে দেখিতে দেখিতে রাস্তা পার হইতেছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কাহার কর্কশস্বরে চমকিয়া সরিয়া গেল।

খুব বাঁচিয়া গিয়াছে সে। বৃহৎ মটরকারখানা আর একটু হইলেই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল আর কি! ড্রাইভারটা গাড়ীর ব্রেক কষিয়া চোখ রাঙাইয়া গালি দেয়,—মরবে? কানা নাকি?

গাড়ীর মধ্যে বাঙালী তরুণ তরুণী; মনে হয় তাহাদের মুখেও যেন সকৌতুক হাসি। গাড়ীখানা চলিয়া যায়। দেবেন ফুটপাথে উঠিয়া তাহার গন্তিপথের দিকে সক্রোধে চাহিয়া থাকে। চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইতে থাকে; কিন্তু তাহাতে মোটর ভস্মীভূত হয় না।

মনে মনে অভিশাপ দেয়,—আচ্ছা যাও; ভারি দর্প হয়েছে; মনে করছো, কি যেন হ'য়েছি; মোটর চড়ে' ধরাকে সরা দেখছো, মানুষকে মানুষ বলেই মনে করছো না। কিন্তু এসা দিন নেহি রহে গা,......মোটর আমিও একদিন চড়বো, তখন দেখে নিও; এই বলে' দিলাম।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী মুখ গুঁজিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকে।

মা'র গলা শুনিতে পাওয়া যায়,—এলেন, ছাই ভস্ম গিলে এলেন; নাও, চল, আস্তে আস্তে এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে' আমার মাথা কিনবে চল।······দেখলে, দেখলে, একবার মিনসের কাণ্ডখানা দেখলে,······না বাপু, আমি আর পারিনে, আমার যে কান্না পায়। এই ভর সন্ধ্যে বেলায় দিলে গাময় বমি করে'; আমার এসব আর সহ্য হয় না।······কি বরাত করেই এসেছিলাম; হাড় ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল। যেমন সোয়ামী, তেম্‌নি পুত্তুর কিগা? কেউ ভাল নয়? সেই একজন বেরিয়েছেন, আড্ডা দিতে চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই।······কবে যে যমে আমায় নেবে, তাও জানিনি······

দেবেনের বুকের উপর যেন হাতুড়ি পড়িতে থাকে; লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে সে এতটুকু হইয়া যায়। মা'র পদশব্দ শুনিয়া, অপরাধীর মত নিজেকে লুকাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

মা লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকিয়া একটু চমকাইয়া উঠে;—কে? দেবু নাকি? কখন্ পা টিপে টিপে এসে এই ভর সন্ধ্যে বেলায় বুঝি ঘুম মারা হচ্চে? মাগো গো, কি কুঁড়ে হয়েছিস্ তুই!

দেবেন সহসা আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া একটু সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া, যথাসাধ্য করুণভাবে বলে,—আর একটু হ'লেই আজ মোটর চাপা পড়েছিলাম মা; বড্ড বেঁচে গিয়েছি; একেবারে ঘাড়ের ওপর······

মা বাধা দিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া বলে,—পড়লে না কেন চাপা? সব চুকে যেত, আমারো হাড়ে বাতাস লাগত।······তোমার মোটর চাপার গপ্প শুনতে ত' আমি আসি নি; বলি, চাক্‌রি বাকরির কি হ'ল তাই বল দিকিন; যা কাজের কথা।

বাপের ভাঙা ভাঙা কথার টুক্‌রা কানে আসে;—দূর করে' দাও, দূর করে দাও, ও হতভাগাকে; কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভাত মারবার গোঁসাই।

মা দ্রুতপদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। দেবেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

মা'র কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়;—আচ্ছা, আচ্ছা; তুমি মস্ত মদ্দ; আর চেঁচাতে হবে না। মস্ত মুরোদ কিনা তোমার, তাই তুমি ওকে দূর করবে। নিজে যেন কত কাজের কাজী; সংসারের ভাবনায় ছেলের ভাবনায় ওঁর ঘুম হচ্চে না।······ও সেদিনকার দুধের ছেলে, ও একা একা পথে পথে কোথায় ঘুরবে? চাক্‌রি ওকে দেবে কে? খবরদার তুমি ওকে উঠ্‌তে বসতে যখন তখন দূর দূর কোরো না. বলে দিচ্চি।

উত্তরে বাপের তুমুল অট্টহাসি শোনা যায়। দেবেনের চক্ষু দুইটা আজ অকারণে ছলছল করিতে থাকে।

পুলিশকোর্টের এক উকিল বাবুর কাছে অনেক ঘোরাঘুরি করে। এককালে সে তাঁহার বাড়ী প্রাইভেট্ টিউটর ছিল। কোন্ এক মার্চেন্ট অফিসের সাহেবের সহিত তাঁহার বেশ খাতির আছে। বহুদিন হাঁটাহাঁটির পর অবশেষে সত্যই একদিন তাঁহার সুপারিশে সেই অফিসে দেবেনের একটি কেরাণীর পদ জুটিল। কিন্তু উকিলবাবু বুদ্ধি বেচিয়া খান; নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা তাঁহার পেশা নহে। তাঁহার সহিত দেবেনের কড়ার হয়, সে তাঁহার দুইটি ছোট ছেলেকে প্রত্যহ সকালে দুই ঘণ্টা করিয়া বিনাবেতনে পড়াইবে। দেবেন হাতে যেন স্বর্গ পায়; সে সানন্দে ঐ কড়ারে রাজি হইয়া যায়। অফিসের চাকরিতে বেতন বেশী নহে; তবে ওভারটাইম খাটিলে, উপরি কিছু রোজগারের উপায় আছে।

চাকরি সে করে, কিন্তু বাড়ীতে কিছু বলে না। যেমন বাহিরে বাহিরে থাকিত, তেমনই থাকে; কেবল আহারের সময়ে একবার করিয়া বাড়ী আসে। আহার করিতে করিতে বাপের গালাগাল, মা'র তিরস্কারও হজম করে। কিন্তু তবু বাড়ীতে কিছু বলে না।

পয়লা তারিখে মাহিনার টাকাগুলা আনিয়া একেবারে মা'র হাতে দিয়া দিবে। অকস্মাৎ এতগুলা টাকা হাতে পাইয়া ও তাহার চাকরির কথা শুনিয়া মা বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইবেন; তাঁহার রৌদ্র-ম্লান কুসুমের মত বিষণ্ণ মুখ-খানি আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে ও পুত্রস্নেহে তাঁহার দুইটি

চক্ষে শিশিরের মত টলটল করিতে থাকিবে। অদূর ভবিষ্যতে মা'র সেই প্রফুল্ল মুখখানি কল্পনা করিয়া দেবেন বর্ত্তমানের সমস্ত তিরস্কার শান্তভাবে গ্রহণ করে। অদ্ভুত তাহার খেয়াল!

সকালে শয্যাত্যাগ করার পর হইতে রাত্রে পুনরায় শয্যাগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিরলসভাবে খাটিয়া যায়। রাত্রে আর একটা টিউশন যোগাড় হইয়াছে, অফিসের ছুটির পর সেইখানেই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যাইতে হয়; বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করিবার সময় পায়ও না, প্রয়োজনও বোধ করে না। এখন তাহার বিশ্বাস বিশ্রাম আলস্যের নামান্তর মাত্র। আলস্যে কাল কাটাইবার অবসর তাহার নাই, থাকা উচিতও নহে। তাহার একমাত্র লক্ষ্য মা'র মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলা, বাপের ঋণ পরিশোধ করা, সংসারের আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরাইয়া আনা।

ট্রামে যাইয়া বৃথা অর্থব্যয় সে করে না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনান্তে যখন মনে হয় ক্ষুধার প্রাবল্যে নাড়ীতে যেন পাক ধরিতেছে, তখন প্রাণ ভরিয়া জলপান করিয়া ক্ষুধাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। বুকে একটা ব্যথা মাঝে মাঝে ধরে; নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে, মনে হয় যেন কেহ একটা শলা দিয়া বুকের মধ্যে খুঁচাইতেছে। কিছুক্ষণ হাত দিয়া বুকটা চাপিয়া ধরে। তারপর ব্যথাটা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেলে সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের কার্য্যে মনঃসংযোগ করে।

কখনও মনে হয়, শরীরটা যেন বড় দুর্ব্বল; মাথার ভিতরটা যেন ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে? চক্ষের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া উঠে। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নহে; একটা কিছু শক্ত করিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া কিছুক্ষণ নতশিরে চুপ করিয়া থাকিলেই, আবার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসে। তখন সে আবার উকিল বাবুর বাড়ী হইতে অফিসে, অফিস হইতে টিউশনি করিতে ছুটিয়া চলে।

বহু আকাঙ্খিত সেই দিনটি অবশেষে সত্যই আসিল— মাসের পয়লা। রাত্রে দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় দেবেনের ভাল ঘুম হয় নাই। দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিবার পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে। শতবার শতরকম করিয়া মা'র দিকে আড়চোখে চাহিয়া থাকে। আজ যেন মা'কে তাহার সত্যই অত্যন্ত স্নেহময়ী বলিয়া মনে হয়; এমন কি মাতাল বাপকে দেখিয়াও যেন তাহার মায়া হয়।

অফিস হইতে মাহিনা পাইলে ছুটিয়া যায় ছেলে পড়াইতে; অথবা ছেলে পড়াইতে ঠিক্ নহে, সেখানেও যায় মাহিনা লইতেই। গৃহকর্ত্তা যখন তাহাকে মাহিনা দেন, অনন্যুভূত-পূর্ব্ব আনন্দে তাহার বুক যেন ধড়ফড় করে। সেদিন ছাত্রকে ভাল করিয়া পাঠ বলিয়া দেওয়া আর হয় না।

পকেটে টাকাগুলা লইয়া পথ চলে। খুসীর আনন্দে মন যেন নৃত্য করিতে থাকে। সে যেন হাঁটিয়া চলে না, উড়িয়া চলে। শীঘ্র বাড়ী যাওয়া যাইবে বলিয়া একটা ছোট গলির মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। আজ বাড়ীর পথটা যেন বড় দীর্ঘ মনে হইতেছে; যত শীঘ্র সে বাড়ী পৌছাইতে পারে ততই ভাল।

পথ চলিতে চলিতে গুণ গুণ করিয়া গান ধরে। গানের প্রথম কলি গাহিয়াই সচেতন হইয়া উঠে; নিজের কণ্ঠে গান শুনিয়া নিজেই বিস্মিত হয়। তাহার কণ্ঠ গান ত' ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ কতদিন পরে তাহার রুদ্ধকণ্ঠে বীণাধ্বনির মত হঠাৎ যেন গান বাজিয়া উঠিল।

আজ সমস্ত পৃথিবীটার সঙ্গে নূতন করিয়া যেন তাহার পরিচয় হয়; সারা দুনিয়াটাকে যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

একটা অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছিল; দেবেন পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া তাহাকে দেয়। তাহার অজস্র আনন্দের প্রাচুর্য্য সে আজ একা ভোগ করিবে না।

সরু গলিটার দুইধারে আধো-আলো-আধো-অন্ধকারে হতাশা-বিজড়িত দৃষ্টি মেলিয়া নারীরা দাঁড়াইয়া থাকে, দেহ-বিপনী সাজাইয়া। খরিদ্দার কিন্তু জোটে না। দিনের পর দিন তাহাদের চিত্তবিভ্রমকারী চটুল হাস্য-পরিহাস ব্যর্থ হইয়া গলিটার মধ্যে মাথা কুটিয়া মরে। তবু তাহাদের উহা ছাড়া আর গতি নাই।

একটি মেয়ের মুখে এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়া-

ছিল ; দেবেন চাহিয়া চাহিয়া দেখে। আশায় মেয়েটির মুখ উজ্জল হইয়া উঠে। দেবেন যেন তাহার চক্ষে এক নিতল নিগূঢ় বেদনার ছায়া দেখে। তাহার হাসি যেন রোদনের অপেক্ষা করুণ বলিয়া মনে হয়। সে ব্যথিত অন্তরে ভাবে কোন্ হৃদয়হীন লম্পটের নিমেষহারা প্রতীক্ষায় ইহারা অতন্দ্র রজনী পথের ধারে কাটাইয়া দেয়! চক্ষে তাহাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত হতাশার কী করুণ ম্লানতা!

দেবেন ক্ষণিকের জন্য বাড়ীর কথা ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার কথা বিস্মৃত হয়; পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া মেয়েটির হাতে দিয়া চলিয়া যায়। মেয়েটি অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে আয়ত নয়নের কৃতজ্ঞদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেয়; সে দৃষ্টিতে যেন আরতি-প্রদীপের স্নিগ্ধ দীপ্তি। পুরুষমানুষ যে তাহার মত রূপোপজীবিনী নারীকে নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতে পারে, এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে এই প্রথম। সে শুধু সাশ্রুনয়নে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কে জানে কাহার উদ্দেশ্যে দু'টি হাত তুলিয়া নমস্কার করে।

দেবেন যখন বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ঠিক্ সেই সময়ে তাহার বুকে হঠাৎ সেই পূর্ব্বেকার মত ব্যথা অনুভব করে। কোন প্রকারে বুক চাপিয়া ধরিয়া দ্রুতপদে গৃহে গিয়া ডাকে, —মা,···মাগো।

মা বিরক্তমুখে বাহির হইয়া আসে;—এই যে, সারা-দিনের পর এসে জুটেছো, ঠিক্ গেল্‌বার সময়টিতে;···তা' ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে মরছো কেন?

সে মা'র হাতে কোন প্রকারে সমস্ত টাকাগুলা দিয়া দুই হাতে মা'র পদধূলি লইয়া মাথায় স্পর্শ করে; পরে এক প্রকার গভীর রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলে,—আমি চাকরি আর টিউশনি করেছিলাম মা, গেলমাস থেকে;··· এ, তারই মাইনে,···তোমায় বলিনি'···

হঠাৎ তাহার চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে; বুক যেন যন্ত্রণায় ভাঙিয়া যায়। মাথা ঘুরিয়া সে সেইখানে টলিয়া পড়ে। মুখ দিয়া রক্তের স্রোত বহিতে থাকে।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

গজল

এম-আনোয়ারা বেগম

চিত্ত আমার নিতুই কাঁদে
কিসের তরে কেন কে জানে,
নয়ন-কোণে অশ্রু ঝরে
বুকের মাঝে বেদন হানে।
কোন্ অমরার অচিন পিয়া
স্বপন-মাঝে দেয় গো দেখা
নিঁদ ছুটিলে পাইনে তারে
নুপুর-নিকন বাজে কানে।
শাঙন-গগন আগুন পরে
নুইয়ে পড়ে ব্যথার ভারে
অশ্রু-বাদল সদাই ঝরে
দরদ কি তার কেউ না জানে।
অকূল পাথার উথ্‌লে ওঠে—
পাষাণ চিরে ঝরণা বহে
লজ্জাবতী লুকিয়ে কাঁদে,
কাঁদে নদী কুল্-কুল্ তানে।

কোকিল কাঁদে আমের শাখে
মলয়-বায়ু নিশ্বাস ফেলে
চকোর শুধুই চেয়ে থাকে
উদাস চোখে প্রাণের টানে।
বুলবুলি ওই বকুল ডালে
চমক ভেঙে ডুক্‌রে ওঠে
ভোম্‌রা বঁধু কেঁদে বেড়ায়
গুণ্‌গুণিয়ে আপন গানে।
কি যে বেদন কেন কাঁদন
ভাষা নাই যে ব্যক্ত করে,
গোপন-জ্বালা মৌন হয়ে
হিয়ার মাঝে বরজ হানে।
কবি তোমার সেতার বাজাও
চাঁদনি রাতে গগন-তলে;
চাওয়ার মাঝে আছে পাওয়া,
জীবন বাঁচে জীবন দানে।

বাংলা ছন্দ ও প্রবোধচন্দ্র

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের কাছে বাংলা ছন্দোবিৎদের ঋণ কম নয়। তাঁর মতন সূক্ষ্ম কান, ভূয়োদর্শন, অভিনিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছন্দের জটিল তত্ত্বাদির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করার ক্ষমতা যে-কোনো দেশের ছান্দসিকদের (prosodist) মধ্যেই বিরল বই কি। বাংলা ছন্দের কত ঝাপ্‌সা জিনিষ যে তিনি তাঁর সাফ্‌মাথা দিয়ে ভেবে ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের আলো ফেলে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন তা হয়ত আজকের দিনে সর্ব্ববাদিসম্মত হবে না কিন্তু দুদিন বাদে হবেই হবে। এক হিসেবে কিন্তু তাঁর আলোচনাদির বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদের সাড়া প'ড়ে যাওয়াটা ভালোই। পুরাতনের একটা জড়িমা—inertia—আছে—যা নিত্যই নূতন সত্য নূতন তত্ত্ব নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাণপণে বাধা দেয়। এই-ই তার ধর্ম্ম। কিন্তু এই বাধার বাঁধে প্রতিহত হ'য়েই আবার নূতনের বেগ, অনাগতের স্রোত শক্তিসঞ্চয় ক'রে থাকে। মনে হয় অনেকটা সেই জন্যেই বুঝি আজকের দিনে এ-সরল সত্যটিও অনেকের মেনে নিতে বাধ্‌ছে যে ছন্দের গোনাগুন্তির একটা বড় দিক্ আছেই আছে—এবং এ-দিক্‌টা শুধু জ্ঞানের তরফ থেকে না, রসগ্রহণের তরফ থেকেও অবান্তর নয়। একথা সত্য, যে কবি ছন্দ সৃষ্টি করেন শুনে—গুণে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে ছন্দোবিশ্লেষের ফলে রসবোধ সূক্ষ্মতর ও শুন্‌বার ক্ষমতা তীক্ষ্ণতর হয়। একথা অন্তত: আজকের দিনে সব দেশেই স্বীকৃত—যেজন্যে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন "The modern mind is analytic"; তবু এ-ধরণের প্ল্যাটিচিউডের পুনরবতারণা করতে হ'ল—কেন-না বর্ত্তমান সময়ে এই রকম একটা ধারণা হাওয়ায় খেলে বেড়াচ্ছে যেন—যে 'শুনিয়ে' ও 'গুণিয়ে'-র মধ্যে একটা অহি-নকুল গোছের সম্বন্ধ থাকতে বাধ্য। এ-ধারণা আরও প্রশ্রয় পেয়েছে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্ষয় উপমা-তূণীর থেকে শুনিয়েদের তরফ থেকে গুণিয়েদের উদ্দেশে চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ ক'রেছেন ব'লে। গত শ্রাবণ সংখ্যার "পরিচয়ে" তিনি যেন ঈষৎ বিরক্তিই প্রকাশ ক'রেছেন বেচারী গুণিয়ে প্রসডিষ্টদের পরে—যখন তিনি লিখেছেন (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৯)

"যদি কেউ বলেন যে 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি' ও 'রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি'—দুটোর একই ছন্দ, তাহ'লে এইটুকু ব'লে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিল্‌ল না কেননা আমি ছন্দ গুণিনে আমি ছন্দ শুনি।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনর্থক এ হাইপথেটিকাল (যদিমূলক) চ্যালেঞ্জ এনেছেন। কারণ ছন্দের কিছুও যিনি জানেন তিনিই মান্‌বেন এ দুটো ছন্দ এক হ'তেই পারে না। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি" বা "বউ কথা কও, বউ কথা কও যতই গায় সে পাখী" হচ্ছে স্বরবৃত্ত যাতে যুগ্মধ্বনির ওজন বরাবরই এক (সংশ্লিষ্ট), আর "রূপরসে ডুব দিনু" বা "কথা কহো কথা কহো পাখী যত ডাকে" হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত—যাতে যুগ্মধ্বনির ওজন দুই (বিশ্লিষ্ট)। কাজেই "পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকে মোটেই প্রমাণ হয় না যে "রূপসাগরে-"র ছন্দ তিনের, অথবা ওর ব্যষ্টি স্বর বা Syllable নয়, মাত্রাই।

অবশ্য তর্ক উঠ্‌তে পারে যে স্বরবৃত্ত ছন্দ যদি Syllabic-ই হয় তবে "রূপ রসে ডুব দিনু"···বা "কথা কহো কথা কহো"···স্বরবৃত্ত হবে না-ই বা কেন—যখন এখানেও প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে স্বরে ধ্বনি-সাম্য হচ্ছে? এর উত্তর শৈলেন্দ্রকুমার বাবু 'বিচিত্রা'য় সুন্দর ক'রেই দিয়েছেন—তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু

ব'লেই ক্ষান্ত হব (যে শৈলেন্দ্রবাবু বিশদ ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছেন) যে স্বরবৃত্তে স্বরসংখ্যা দিয়েই ধ্বনিসাম্য হয় একথা সত্য হ'লেও এর একটা মস্ত চরিত্রলক্ষণ (Characteristic) এই যে ওর এক পর্ব্বে চারটে অযুগ্মধ্বনি থাক্‌লে পাশের পর্ব্বেও চারটে অযুগ্মধ্বনি দেওয়া সমীচীন নয়; দিলে ছন্দ ভারি ঢিলে হ'য়ে যায়—এবং কোনো পর্ব্বেই যুগ্মধ্বনি একেবারেই না থাক্‌লে ওকে চেনাই যায় না স্বরবৃত্ত ব'লে, কারণ এ ছন্দটি গৌণত ছয় মাত্রারই, চার মাত্রার নয়। "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান" ও "বারি পড়ে টিপি টিপি নদী এলো বান" এ দুইয়ের তুলনা করলেই এটা বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই লিখেছেন যে "প্রাকৃত বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে" (অর্থাৎ যুগ্মধ্বনির) (পরিচয় শ্রাবণ '৩৯)। এবং এই জন্যেই ব'লেছি রবীন্দ্রনাথ যে-কথা কেউ বলে না তাই কল্পিত প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "পরিচয়ে।" এতে ক'রে মোটেই ছন্দ গোণার অসারবত্তা প্রমাণ হয় না। এ নিছক্ ভুল বোঝার দরুণ তর্ক—যাকে ইংরাজীতে বলে arguing at cross purposes।

কিন্তু এ ভুল বোঝার সৃষ্টি হ'ল কেন—এ সূত্রে এ প্রশ্ন স্বতই ওঠে। উঠেছে অনেক কারণে—সে-সব এ প্রবন্ধে লেখার স্থান নেই—তবে একটা কারণ নিশ্চয়ই প্রবোধচন্দ্রের প্রথমে অক্ষরবৃত্ত নামটি ব্যবহার করা। এতে ক'রে গোড়ার দিকে আমাদেরও ঠিক্ তাই মনে হ'য়েছিল যা প্রবোধচন্দ্র বল্‌তে চান নি একবারও। অর্থাৎ মনে হ'য়েছিল বুঝি প্রবোধচন্দ্র যৌগিক ছন্দকে অক্ষর অর্থাৎ হরফ দিয়েই গুণ্‌তে চাইছেন।

অথচ এই পদ্ধতির বিরুদ্ধেই তিনি প্রথম থেকে খড়্গহস্ত। বস্তুতঃ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, অমূল্যধন ও প্রবোধচন্দ্র তিনজনেই একমত যে হরফের আবেদন চোখের 'পরে হওয়ার দরুণ সে ছন্দের ভিত্তি হ'তেই পারে না। প্রবোধচন্দ্রও বারবারই ব'লেছিলেন এই কথা: যে, অভ্যাসবশে হরফই যৌগিক ছন্দের ব্যষ্টি (unit) হিসেবে বহুদিন স্বীকৃত হ'য়ে এলেও ভেবে দেখার সময় এসেছে কী ভাবে বিশ্লেষণ করলে যৌগিক ছন্দকে নিখুঁৎভাবে প্রতিভিত্তি করা যায়। একথা রবীন্দ্রনাথেরই মতের সমর্থক,

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝে ভাব্‌লেন প্রবোধচন্দ্র ব'লেছেন তিনি ধ্বনি চুরি ক'রে থাকেন হরফের আড়ালে। এই ভুল বোঝা দূর হ'লেই দেখা যাবে যে উভয়ের অন্ততঃ যৌগিক ছন্দ নিয়ে মতভেদ নেই—মুখ্যতঃ। কিন্তু গৌণতঃ একটু মতভেদ র'য়েছে ও আমি দেখাবার চেষ্টা পাব যে সেখানে প্রবোধচন্দ্রই ঠিক্ ব'লেছেন। মতভেদটা সংক্ষেপে এই নিয়ে:—

রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন: আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় নেই। প্রবোধচন্দ্র বল্‌লেন থাকা উচিত নয় বটে, কিন্তু বহুদিন ছিল, অর্থাৎ হরফ * গুণেই বহুদিন যাবৎ যৌগিকের ছন্দবিচার চ'লে এসেছে। এ তর্কে যে প্রবোধচন্দ্রই ঠিক ব'লেছেন সেটা মামুলি লঘু ত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী, নর্ত্তক ত্রিপদী, একাবলি, দিগক্ষরা প্রভৃতি যৌগিক ছন্দের কবিতার প্রতি চরণেই দৃষ্ট হবে। লঘু ত্রিপদীর সূত্রও এই:—

বার বর্ণ আগে লিখ দুই ভাগে
ছয়ে ছয়ে মিল হবে।
আটটি অক্ষর লিখ তার পর
অষ্টাদশে যতি রবে॥

এখানে দ্রষ্টব্য অক্ষর=বর্ণ=হরফ। আরও দ্রষ্টব্য—এটা তিনের ছন্দ যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন অসম ছন্দ। এতে উপরি উদ্ধৃত ধরণের কবিতা ভারি মনে হয়—আজকালকার কানে। কিন্তু আগে হ'ত না—কেন-না হরফের সংখ্যাসাম্যেই সে-সময়ে সকলে খুসি থাক্‌ত—ধ্বনির হিসেব চাইত না কেউই। এ সম্পর্কে নর্ত্তক ত্রিপদীর সূত্র আরও শিক্ষাপ্রদ ও যাকে বলে convincing:

একুশ বর্ণ আগে লিখিবে তিন ভাগে
সপ্তমে চতুর্দ্দশে তার
মিলন পরস্পর ত্র্যক্ষর শেষে ধর
নর্ত্তক ত্রিপদীতে আর॥

* আমি সুবিধার জন্য অক্ষর কথাটির প্রচলিত বাংলা অর্থে হরফ কথাটিই ব্যবহার করব বরাবর। কেননা অক্ষর বল্‌তে বড় ভুল বোঝার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃতে অক্ষর মানে 'স্বর' (=Syllable) কিন্তু বাংলায় অক্ষর বল্‌তে হরফই বোঝায়। অমূল্যধনবাবু তাঁর ছন্দালোচনায় অক্ষর বল্‌তে (সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে) Syllable-ই ধরেছেন। কিন্তু এতে প্রায়ই গোল বাধে—আলোচনা ambiguous হয়।

এ ছন্দ হচ্ছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন "বিষম" ছন্দ : সাত মাত্রার ছন্দ (=৩+৪ তেওরার তাল)। এতে আজকাল আমরা কেবল মাত্রাবৃত্তই পাংক্তেয় মনে করি যাতে যুগ্মধ্বনির ওজন দুমাত্রা। কিন্তু সাবেক কালে এছন্দেও যুগ্মধ্বনিকে একমাত্রার বেশি মর্য্যাদা দেওয়া হ'ত না। কেন? হরফের সংখ্যা সাম্য মেনে নিতে কারুর বাধ্‌ত না ব'লেই নয় কি? কারণ শুধু ধ্বনির ওজন প্রামাণ্য ধরলে কান আপত্তি করতই করত এরকম আড়ষ্ট ছন্দে। (বস্তুতঃ আজকালকার কান ঢের সূক্ষ্মতর হ'য়েছে—মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিকাশের পরে—একথা পরে যথাস্থানে বল্‌ব।)

কিন্তু ব'লেছি এ-ব্যাপারটা গৌণ, কাজেই খুব চিত্তাকর্ষক নয়। যেটা বেশি চিত্তাকর্ষক ও যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রকে ভুল বুঝেছিলেন তার একটু আলোচনা করায় বেশি লাভও আছে। কারণ সেখানে প্রবোধচন্দ্র কয়েকটি চিন্তনীয় কথা বলেছেন—যৌগিক ছন্দের ভিতরকার কয়েকটি শৈথিল্য দেখিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে সুরু করলে ব্যাপারটা বোধ হয় বোঝার একটু সুবিধে হবে।

সাবেক কালের কবিরা 'হইল-'কে "হৈল" লেখার সময়ে ওকে দুই ব্যষ্টি ধরতেন। হেমচন্দ্র হ'লে লিখ্‌তেন : "হৈল বড় জ্বালা যে রে কৃষ্ণ দে না এনে।" কিন্তু আমরা লিখ্‌ব : "হইল যে বড় ক্ষুধা গোল্লা দে না এনে।" যদি বেচারী দিলীপ রায় আজ "শৈল! বড় ক্ষুধা যেরে গোল্লা দে না এনে"-র নজীরে "হইল বড় ক্ষুধা যে রে গোল্লা দে না এনে" লেখেন তবে কি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ মহাশয় তার ছন্দের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা না ক'রে ছাড়বেন? অথচ ওখানে "হইল'-র যায়গায় ঠিক্ সমান ওজনের 'শৈল' বসালেই শ্রীযুক্ত সজনীকান্তও বিমর্ষ হ'য়ে বল্‌বেন : "দিলীপরায়ের ঔদরিক দুর্ব্বলতা কমুক বা না কমুক ছান্দিক দুর্ব্বলতা বেশ একটু ক'মেছে বই কি, উপায় কি?" কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা সব চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সেটা সজনীকান্তের দুঃখিত পাল্লা না—সেটা হচ্ছে এই যে "আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোন অদ্ভুত পদার্থ" যদি না-ই থাক্‌ত তবে "হইল বড় ক্ষিধে যেরে"—এতে ছন্দপতন হ'লে "শৈল বড় ক্ষিধে যেরে" এতেও ছন্দপতন ঘট্‌তই ঘট্‌ত। এই জন্যই প্রবোধচন্দ্র লিখেছিলেন যে যৌগিক ছন্দে ধ্বনিগত বৈষম্য হরফের সংখ্যাসাম্যের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে থাকার দরুণ অনেক সময়েই ধরা পড়ে না। চোখের কারসাজিতেই বই কি।

রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের এ-অনবদ্য যুক্তিকে ভুল বুঝে যা যা লিখ্‌লেন তার মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে এই :

(১) চোখ দিয়ে ছন্দোরচনা অসম্ভব ও একটা হাস্যকর ব্যাপার। (২) শোনার বা পড়ার রীতিভেদে একই ধ্বনির ওজনের তারতম্য হ'লে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে হরফের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ধ্বনিচুরিরূপ মনোমদ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন। (৩) ধ্বনির যদি বৈকল্পিক সঙ্কোচন ও সাম্প্রসারণ ছন্দে সমাদৃত হ'য়ে থাকে তবে তাথেকে প্রমাণ হয় শুধু এই কথা যে এ-বৈকল্পিকতার ইসারা বঙ্গবাণীই দিয়েছেন। (৪) এ ইসারাকে অন্যায় প্রশ্রয় বলা চলে না—কারণ ছন্দে যে-কোনো প্রশ্রয়ের কাম্যতার শেষ বিচারক কান; কাজেই যদি কান এ-ধরণের প্রশ্রয়ে রস পায় তবে তর্কালু মন নিয়মের ব্যারিকেড দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে গেলে সেটা হবে গোঁয়ার্ত্তুমি।

প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের (১) (২) ও (৩) বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নি। কেবল (৪) সম্বন্ধে বোধহয় মৃদুস্বরে এই আপত্তি করা চলে যে কোনো বিশেষ যুগে কেনো বিশেষ রকম প্রশ্রয় যদি কানে খারাপ না-ও লাগে তবে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে সে-ধরণের ধ্বনিসমাবেশের সংস্কার-সাধন ক'রে তাকে সুন্দরতর করা চলে না। তিন মাত্রার ছন্দে এক সময়ে যুগ্মধ্বনি একমাত্রার মর্য্যাদা পেত। তখনকার কান নিরাপত্তিতে পড়ত "অঙ্গের সৌরভে ভ্রমর ধাবয়ে ঝঙ্কার বেঢ়িয়া যায়" (চণ্ডীদাস)। * কিন্তু

---

* আজকালকার মাত্রাবৃত্তে এর সংস্কৃত (ও নিশ্চয়ই সুন্দরতর) রূপ হবে :

"দেহ সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে ঝঙ্কার বেঢ়ি যায়।" গত আশ্বিনের ভারতবর্ষে স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি গান বেরিয়েছে : "কে তুমি ওগো! কে তুমি! মম বিষন্ন শূন্য জীবনে।" এ বিষমপদী পঞ্চমাত্রপর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে "বিষন্ন শূন্য" পড়লেই কি মনে হয় না অদ্ভুতরত্নের দুঃখ : "ন বাধতে তথা স্কন্ধে যথা বাধতি বাধতে?" অথচ স্বর্ণকুমারী দেবীর মতন শিক্ষিতা

আজকালকার কাণ বলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ না করলে—অর্থাৎ 'অঙ্গের', বা 'সৌরভে' বা 'ঝঙ্কারে'-কে চার মাত্রা না ধ'রে তিন মাত্রা ধরে পড়লে—সে দুঃখে মুহ্যমান্ হ'য়ে পড়বে—সাবধান। রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রকে এই জন্যেই ব'লেছিলেন তাঁর "প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি" লাইনে ছন্দের দোষ ঘটেছে। তেম্‌নি যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধেও হয়ত বলা চলে যে আজকের দিনে "বোল্‌তা কহিল এসে ক্ষুদ্র মউ চাক" কান গ্রহণ করলেও ভবিষ্যতে কান আর একটু ঠাসবুনোনিই পছন্দ করবে। গত ভাদ্রের 'উত্তরা'য় প্রবোধচন্দ্র একথা লিখেছেন বিশদ ক'রে। লিখেছেন: "যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে এভাবে বিশ্লিষ্ট করলে ধ্বনিটা কিছু শিথিল হয়। 'মহাগর্ব্বে বোল্‌তা কহে মৌমাছিরে ডেকে'—এ লাইনটির সহিত উপরের লাইনটির তুলনা করলেই একথা প্রতীয়মান হবে"—এই তাঁর বক্তব্য। যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এ ধরণের আরও অনেক কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য আছে। সেসব এ প্রবন্ধে আলোচ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু বল্‌তে চাই যে প্রবোধবাবুর এসব মন্তব্য ও ভবিষ্যৎ বিকাশের ইঙ্গিতাদি সত্য হোক্ বা না হোক্—(কারণ ভবিষ্যৎ কালে ছন্দের ক্রমবিকাশে ঠিক্ যে কী ধরণের পরিণতি হবে আগে থাক্‌তে তার পূরো হদিশ পাওয়া একটু কঠিন বই কি)—কথাটা যে চিন্তনীয় ও মূল্যবান্ সন্দেহ নেই। এবং প্রবোধচন্দ্র যে যৌগিক ও অন্যান্য ছন্দকে এভাবে টেকনিকের দিক্ থেকে বিচার করবার অধিকারী এ-কথা বোধকরি কেউ-ই অস্বীকার করবেন না। তাছাড়া প্রতি ললিতকলার এ-ধরণের বিশ্লেষণ ও বিচার হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। গায়ক গান করেন সুরের প্রেরণায়—মানি। কিন্তু তাতে কি? তা ব'লে স্বরলিপিকার তাঁর রাগরাগিণীর গঠনপদ্ধতির বিচার করবেন না? স্বরলিপি যদি শিক্ষার্থীদের বহু মঙ্গল-সাধন ক'রে থাকে, তবে ছন্দোবিশ্লেষই বা ছন্দ-শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে না কেন? এ ক্ষেত্রে যেটা বিশেষ ক'রে স্মরণীয় সেটা হচ্ছে এই যে ছান্দসিক ও কবি, সুরকার ও স্বরলিপিকার, শিল্পী ও রসয়িতা, স্রষ্টা ও সমালোচক (প্রবোধচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, আবদুল করিম ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, অবনীন্দ্রনাথ ও অর্দ্ধেন্দুকুমার) পরস্পরকে পূর্ণতাই দান করেন—একজন অপরের বিরোধী ন'ন। (রবীন্দ্রনাথ ছন্দগোনা ও ছন্দ শোনার মধ্যে কি একটা ভয়াবহ বিরোধ কল্পনা ক'রে, অকারণ ব্যথিত হ'য়েছেন বলেই এত কথা বলার দরকার মনে করলাম। কারণ তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ ব'লে আমাদের কর্ত্তব্য বই কি তাঁকে বিনীত ভাবে বুঝিয়ে বলা যে তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে আমরা স্বীকার কর্‌তে না পারলেও তাঁর ছন্দপ্রতিভার গুণে আমাদের কান যে নিতাই সূক্ষ্মতর হ'য়েছে এ কথা সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করি। কেবল স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে বিরোধ না থাক্, গুরুতর মতভেদ আছে এ কথা সত্য। এবং এ মতভেদের ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্রই ঠিক বল্‌ছেন এ কথা মনে করার কারণ আছে যথেষ্ট। এ বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম—কিন্তু ভাদ্রের বিচিত্রায় প্রবোধচন্দ্র সে সবই তাঁর স্বাভাবিক প্রাঞ্জল নৈপুণ্যের সহিত ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কাজেই সে সব রেখে এ প্রবন্ধে স্বরবৃত্ত সম্বন্ধে মাত্র দু একটি কথা বল্‌ব যা প্রবোধচন্দ্র এ-যাবৎ বলেন নি। (এখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখি যে স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মতভেদ এই নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ বলেন এ-ছন্দও মুখ্যতঃ মাত্রিক: প্রবোধচন্দ্র বলেন, না, এছন্দ মুখ্যতঃ স্বারিক—syllabic, গৌণতঃ মাত্রিক।)

প্রথম কথা এই যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্ত্তিত স্বরমাত্রিক ছন্দ যে syllabic সে-সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায়ই সচেতন ছিলেন। কেননা ১৩২৫ এর ভারতীতে * তাঁর বিখ্যাত "ছন্দসরস্বতী"

কবিপ্রাণা মহিলার কানে ত বাধেনি এ-লাইন! কেন? এই জন্যেই নয় কি যে ছন্দের কানও বিকশিত হয়—এবং এ বিকাশের ফলে ছন্দ সম্বন্ধে আমাদের দাবীও সূক্ষ্মতর হ'তে বাধ্য? তাই আজকের যৌগিক ছন্দে অনেক শৈথিল্য চলে ব'লেই কিছু প্রমাণ হয় না ভবিষ্যতেও চল্‌বে। প্রবোধবাবু তাঁর এই ধরণের শৈথিল্য নিয়েই আলোচনা করেছেন।

* সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তোমার আমার | মাঝখানেতে | একটি বহে | নদী॥ দুই তটেরে | একই গান সে | শোনায় নিরবধি'—এতে "সকল পর্ব্বেই চার পাচ্ছি" (দ্রষ্টব্য ছয় বলেন নি)—"খালি 'দুই তটেরে' তে পাঁচ—এইখানে ছন্দপতন হয়েছে।" ওতে ছন্দময়ী বল্‌লেন: "দাঁড়াও, অত শীঘ্র ছন্দ পতন বোলো না—দুই শব্দের ইকার পুরো

প্রবন্ধে লিখেছেন "syllable" বা "শব্দ পাঁপড়ির" সংখ্যা-সাম্যের কথা। কাজেই যদি স্বরবৃত্তের স্বারিকত্ব-ই গোড়া থেকে নাকচ ক'রে দেওয়া যায় তবে তাঁর বহু ছন্দেরই ভিতরকার রসটি মিল্‌বে না, স্বরবৃত্তের আসল প্রকৃতিটিই ধরা যাবে না।

দ্বিতীয় কথা, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আলেখ্যতে স্বরবৃত্ত ছন্দকে syllabic-ই বল্‌তেন—অর্থাৎ ওর বাষ্টি ধরতেন স্বরকে (syllable) মাত্রাকে না। বিজয়চন্দ্রও এ ছন্দকে স্বারিক বলেন। আলেখ্যের ভূমিকায় তিনি একথা লিখেছেন ও আমাদের হাতে তাল দিয়ে দিয়ে বোঝাতেন কেমন ক'রে সিলেব্‌ল্ দিয়ে এ ছন্দ রচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই ওঠে অমূল্যধন বাবুর কথা। তিনি খুব জবড় গলা ক'রেই ব'লেছেন যে বাংলা ছন্দের সত্যেন্দ্রনাথ-নির্দ্দিষ্ট "ত্রিধারা" সত্যেন্দ্রনাথের ও প্রবোধচন্দ্রের স্বকপোল-কল্পিত ও "সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক।"

সুতরাং অমূল্যধন বাবুর মতামত নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্—কারণ তিনি ছন্দ নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছেন ও প'ড়েছেন ব'লে তাঁর মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে আমরা বাধ্য—মতে একদম না মিল্‌লেও। অমূল্যবাবুর তিনটি গোড়াকার সূত্রেই প্রথমে জোর ক'রেই আপত্তি করতে হচ্ছে।

(১) "বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়।"*

(২) "কোনোরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে না, বাংলাছন্দের এই ধাতুগত নিয়মটি ভুলিলে চলিবে না। *

(৩) "বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রা ছন্দ" * *

অমূল্যবাবুর প্রথম সূত্র যদি সত্য হয় তবে বল্‌তে হবে 'কোন্ দেশের গৌরবের কথায় ভরে ওঠে মোদের বুক', 'এ নহে মুখর বনমর্ম্মর গুঞ্জিত', 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি', 'সিন্দুরটিপ্ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ', 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা,' 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' এসবেই একভাবে মাত্রা গোনা এবং ধ্বনি-সাম্য হ'য়ে থাকে। একথা ভাব্‌তেও অবাক্ লাগে, এর প্রতিবাদ করব কি? আর | কোন দেশের গৌ | -পর্ব্বের সাতমাত্রা 'ভরে ওঠে'-র চারমাত্রার সঙ্গে কাঁধ মেলালো কী ক'রে যদি, বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রাছন্দ হয়? এ-সূত্রটির সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। "Carrying my own refutation."—এ-শ্রেণীর উক্তিরই লেবেল।

অমূল্যবাবুর দ্বিতীয় সূত্র আরও বিস্ময়কর। কারণ একথা যদি সত্য ব'লে মেনে নিতে হয় তবে শান্তির অনাবিল ছন্দবৈকুণ্ঠ একেবারেই মিলে যায়—ছন্দপতনের কোনো প্রশ্নই আর কখনো উঠ্‌তে পারে না। মানি ছন্দের পঠনের মধ্যে কমবেশি স্বাধীনতা থাকে—কিন্তু কোনো নিয়মই থাকে না? গায়কে গায়কে স্বরকম্পনের একটু আধটু তফাৎ থাক্‌তে পারে—কিন্তু একটা সীমানা নেই যাকে লঙ্ঘন করলেই সুর হয় বেসুরা—তাল বেতালা? তাহ'লে কি অমূল্য বাবু বল্‌তে চান ছন্দ সুর প্রভৃতি একান্তভাবেই কবি ও গায়কের ইচ্ছাধীন? এমার্সন কি একান্তই মাষ্টার মশায়ের মতন কথা ব'লেছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন—তাঁর বিখ্যাত Art প্রবন্ধে: "Nothing droll nothing whimsical will endure. Nature is ever interfering with art ..There is a quick bound set to your caprice...All powerful action is performed by bringing the forces of Nature to bear upon our caprice."

চিত্রে শিল্পে গানে কাব্যে প্রতিপদেই নিয়ম থাকে। মানুষ এক নিয়মকে লঙ্ঘন করে সত্য—কিন্তু সে কি শুধু সত্যতর সূক্ষ্মতর উদারতর নিয়মে পৌঁছতেই নয়? ছন্দে নানারকম ব্যতিক্রম থাকা মানে কি স্বৈরাচার—যাতে ক'রে সব ছন্দই কোনোমতে মিলিয়ে পড়াই লক্ষ্য? ছন্দের বাঁধা নিয়ম নেই?

উচ্চারণ হচ্ছে না, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল।" ব'লে ছন্দ সম্বন্ধে নানা কথা ব'লে দেবী বল্‌ছেন: "কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি' প্রভৃতি শত শত পদ…syllable বা শব্দ পাঁপড়ির সংখ্যা হিসাবে প্রায় নিখুঁত।" কাজেই সংশয়ের পথ নেই যে তিনি এ-ছন্দ চারের কদমেই পড়তেন—তিনের না।

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯, প্রথম সংখ্যা।

* * বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন অমূল্যবাবু ঠিক ওকথা বল্‌তে চান নি। প্রথমটায় আমারও তাই মনে হ'য়েছিল। কিন্তু অমূল্যবাবুর প্রবন্ধটি ভালো ক'রে পড়লে—বিশেষ ক'রে তাঁর উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত ও নজীর গুলি দেখলে—এ-সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না যে এ তাঁর জীবনের গভীরতম বিশ্বাসেরই একটি। নইলে তিনি "যম জামাই ভাগনা | তিন নয় আপ্‌না"—"ডাক দিয়ে কয় দেবীবর | নিষ্ফুল শোভাকর"—শ্রেণীর খুকুমণির ছড়ার লাইনকে প্রামাণ্য মনে ক'রে গম্ভীর ভাবে লেখেন: "আশা করি এই সমস্ত উদাহরণে যে বাংলা ছন্দের ধাত্‌ বজায় আছে তা প্রবোধবাবু অস্বীকার করিবেন না।"

কেন অস্বীকার কর্‌বেন না? না, (অমূল্যবাবুর যুক্তি) "বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।"

এ কি একটা যুক্তি? ছন্দের কান, তালের জ্ঞান, সুরের বোধ ক্রমশঃ বিকশিত হয় না? একদিন কোনো ছন্দ বা সুরের একটা প্রাথমিক (primitive) বা স্বল্পায়ত্ত ষ্টাণ্ডার্ডে মানুষের কান যদি তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকে তবে বরাবরই করতে হবে—বা বল্‌তে হবে যে ছন্দ সুর হিসেবে ওরা নিখুঁৎ! তবে দাশরথি রায়ের পাঁচালিই বা কী দোষ কর্‌ল?—তাঁর

"ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন
কেমনে হয় মা রক্ষে, আছি তোর অপিক্ষে
দে মা মুক্তি ভিক্ষে কটাক্ষেতে করি পার"—

পদের ভাবে অনুপ্রাশে ছন্দে পদ লালিত্যেও কি কত বাঙালীর কান সেদিন অবধিও তৃপ্তিলাভ করেনি? না, (এ যুক্তিবলে) বল্‌তে হবে এর ভাব সুন্দর, অনুপ্রাশ রোমাঞ্চকর, ছন্দ রবীন্দ্র-বিনিন্দিত?

প্রতি শিল্পেই সূক্ষ্মবোধ বহুসাধনাসাপেক্ষ। জলছবি ও রবিবর্ম্মার যুগের চোখ আর অবনীন্দ্রনাথ ও অর্দ্ধেন্দুকুমারের যুগের চোখ এক নয়। এ যুগের চোখ যথেষ্ট সাধনা ক'রেছে; তাই রবিবর্ম্মার ছবিতে বহুকাল বাঙালীর চোখ তৃপ্তি পেয়েছে এতে তার না আছে তৃপ্তি না আছে সান্ত্বনা। যদি কিছু থাকে—আছে লজ্জা যে এ ছবিও তার একদিন এত ভালো লাগ্‌ত। বহুকাল ধ'রে বাঙালী গানামোদীরা গোপাল উড়ে, রাম কথক, দাশুরায়ের গানে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অতুলপ্রসাদের বাংলা গান শোনার পরে গোপাল উড়ের গানকে সে আর গ্রহণ করতে পারে কি? লোক-সঙ্গীতের মাপকাটি দিয়ে উচ্চ সঙ্গীতের বিচার হয়? না ঢোল ডুগ্‌ডুগির ঢক্কাপদ্ধতি দিয়ে মৃদঙ্গের বোল পড়নের পেলব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাল বিভাগের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়? উচ্চতর ষ্টাণ্ডার্ড ও রসের আস্বাদ যে পায় তার কাছে নিম্নতর ষ্টাণ্ডার্ড ও রস পান্‌শে লাগেই। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, বুদ্ধদেবের অনবদ্য ছন্দে যে মজেছে সে খনার বচনের বাঁধুনিতে, আটপৌরে ছড়ার গাঁথুনিতে, মামুলি পয়ারে, কবির লড়াইয়ে কি আর মজতে পারে?

অমূল্যবাবুর দৃষ্টান্তগুলি দেখে অত্যন্ত অবাক্‌ লেগেছে ব'লেই এধরণের প্ল্যাটিচিউডেরও পুনরুক্তি করতে হ'ল। অমূল্য বাবুর সম্বন্ধে এর পরে আর বেশি কিছু হয়ত না লিখ্‌লেও চল্‌ত কিন্তু তিনি যে-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোবিশ্লেষকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা এতই যাকে বলে naive যে সে সম্বন্ধে দুটো কথা না লিখ্‌লে অন্যায় হবে।

অমূল্যবাবুর দৃষ্টান্তগুলির পরে স্বতঃসিদ্ধ দাঁড়ায় প্রায় এই যে যেখানে যে কবি যা লিখেছেন তা-ই প্রামাণ্য। নইলে তিনি "সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল অগ্নি দিল গায়" * কে যৌগিক

* 'সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল অগ্নি দিল গায়" ধরণের লাইন যে যৌগিক পয়ার হিসেবে সর্ব্বত্রই একেবারে অচল একথা আমি বলি না। আমি শুধু বলি এটি যৌগিক পয়ারের নিখুঁৎ দৃষ্টান্ত নয়। আজকালকার পয়ারে হাজার করা নয়শ' নিরানব্বইটি চরণে এ ধরণের মাত্রাবৃত্ত পর্ব্ব দেখা যাবে না। এ রকম ছন্দ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিতলালের যৌগিক চতুর্দ্দশী পয়ারে দৃষ্ট হবে না…একটিও খুঁজলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিধান সর্ব্বত্রই চলে। তাই রসের খাতিরে ব্যতিক্রম হিসাবে কোথাওই যে "সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল" ধরণের পর্ব্ব যৌগিক পয়ারে থাক্‌তে পারে না তা বলি না। অষ্টাদশী পয়ারে রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র একটি স্থলে এরকম ধরণের মাত্রিক পর্ব্ব ব্যবহার ক'রেছেন, যথা "যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে" (পূরবী)। এই নজীরে

পয়ারের নিখুঁৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করেন? "দূরে থাকিয়া প্রহস্ত রাবণে নোয়ায় মাথা" ধরণের লাইন? "সন্ধ্যাগগনে নিবিড় কালিমা অরণ্যে খেলিছে নিশি, ভীত বদনা পৃথিবী হেরিছে ঘোর অন্ধকারে মিশি"—ধরণের লাইন? আরও কত! কী ক'রে যে তিনি এধরণের দুষ্টছন্দ লাইন অকুতোভয়ে ছন্দের আদর্শ হিসেবে উত্থাপন করলেন ভেবে সত্যিই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়! "সন্ধ্যাগগনে···"চরণ দুটিই নেওয়া যাক্—হেমচন্দ্রের। কেউ কি বলেন আজকের দিনে এরকম খুঁতে ভরা, বেতো পঙ্গু যথেচ্ছাচারী চরণ কোনো তৃতীয় শ্রেণীর কবিও লিখ্‌তে সাহসী হবেন? ওর প্রথম পর্ব্বে "সন্ধ্যা" ওজনে তিনমাত্রা—মাত্রাবৃত্তগন্ধী। অথচ তৃতীয় পর্ব্বে "অরণ্যে" ওজনে তিন—যৌগিক পন্থী। দ্বিতীয় লাইনে 'ভীত বদনা'-তে ভীত-কে টেনে তিন ক'রে পড়তে হয় সংস্কৃত ছন্দের মতন ঈ-কে দুমাত্রা দিয়ে। আবার ঠিক্ তার পরেই 'ঘোর অন্ধকারে'-তে অন্ধকার ওজনে চার। রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দে লেখা যে-কোনো কবিতাকে এভাবে বদ্‌লে ধরলেই বোঝা যাবে আমাদের কাণে এ ধরণের ছন্দ সঙ্কর কী বিশ্রী লাগে!—'সুরদাসের প্রার্থনা'-য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (এটা মানসীর থেকে উদ্ধৃত এর পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে নানান্ ছন্দের আরও ঢের উন্নতি হ'য়েছে):

বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়
আঁধার হৃদয় নীল উৎপল
চিরদিন র'বে হায়!

আমি নিজে যৌগিক চতুর্দ্দশী পয়ারে একস্থলে 'রূপান্তরিত ছায়া" আট ব্যষ্টি হিসাবে ব্যবহার ক'রেছি। অন্য একস্থলে "পুরুষোত্তম সাথে।" কারণ এখানে "আন্" ও "ওৎ"-এর উদাত্ত টানে গাম্ভীর্য্য আসে ব'লে আমি অনুভব ক'রেছি। কোনো নিয়মই অনড় অচল নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ কারণে তাকে ভাঙা চলে। যেমন এরূপ ক্ষেত্রে। কিন্তু এসব স্থলে বল্‌তে হবে যে যৌগিক পর্ব্বে মাত্রিক পর্ব্বের আমদানী হ'ল যেমন ইংরাজীতে iambus-এ anapaest বা trochee-তে dactyl-এর পর্ব্ব আমদানী হয়। কিন্তু তাই ব'লে বলা চলে না "সর্ব্বাঙ্গ ঘলে গেল" ধরণের পর্ব্ব যৌগিক পয়ারে rule হিসেবে গ্রাহ্য—যেহেতু এরা exception, এবং exception only proves the rule, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

একে বদ্‌লে যদি লিখি

বাসনা পঙ্কিল নয়ন কলঙ্ক
ছায়া সঞ্চরে না তায়
আঁধার অন্তর নীল কমল
চিরদিন রবে হায়।

অমূল্যবাবুর উদ্ধৃত হেমচন্দ্রের "সন্ধ্যাগগনে···" যদি অনবদ্য হয়—"বাঙালীর কান ঐ কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ" ক'রেছে এই অদ্ভুত যুক্তির জোরে, তবে রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্ত্তিত লাইন দুটি দেখেও বলার পথ থাকবে কি "Bottom! thou art translated?" বল্‌তে হবে না কি: "By jove Bottom! the sub-human head fits thee as perfectly as the human!!"

এ পরিহাস নয়। অমূল্যবাবুর উদাহরণগুলি যদি গ্রহণ করতে হয় তবে কোনোমতেই এ সিদ্ধান্তকে ঠেকানো চলে না: "Saraswati is in heaven and all is right A I. with Bengali metres and has always been."

(৩) এবার অমূল্যবাবুর শেষ সূত্রটি নেওয়া যাক্। প্রবন্ধ বড় হ'য়ে যাচ্ছে তাই সংক্ষেপেই বল্‌তে হবে। অমূল্য বাবু বলছেন: "বাংলা ছন্দ মাত্রেই বাংলা ছন্দ" যেহেতু "বাংলায় চার সিলেবল্ বা পাঁচ সিলেবলের ছন্দ নেই, আছে চার বা পাঁচ মাত্রার ছন্দ।"

একথা সর্ব্বথা ভুল। কারণ বাংলায় তিন, চার, এমন কি ছয় সিলেবলের ছন্দও দেখা গেছে ইতিপূর্ব্বে। যথা

(ক) তিন সিলেবলের ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ রচনা ক'রে গেছেন যথা, তাঁর "ঝরণার গান"—চপলপায় | কেবল ধাই ইত্যাদি। চতুঃস্বরপর্ব্বিক স্বরবৃত্তে মাঝে মাঝে যেরকম ত্রিস্বর পর্ব্ব আছে তাকেই পরের পর্ব্বে জের টেনে বাড়ালে সহজেই ত্রিস্বরপর্ব্বিক স্বরবৃত্ত রচনা হ'তে পারে, যথা

বাপ্ বল্‌লে | কান্না তোর | আজ দুষ্টু | রাখ্—কিম্বা
কেবল মন | অনুক্ষণ | গগন চাঁদ | চায়
ধরায় হায় | না পায় তায় | উড়েই মন্ | ধায়

অমূল্য বাবু এসব ছন্দকেও বলেন চাতুর্ম্মাত্রিক ছন্দ কেমন ক'রে বলেন তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ওরে

অমূল্যবাবু বোধ হয় উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বল্‌বেন যে ছন্দে অধিকার না থাক্‌লে বোঝা যায় না তাঁর এসব ব্যাসকূট—যা শৈলেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য ক'রে ব'লছেন। বল্‌লে নাচার। কারণ এসব ছন্দের দোলা যে তিনেরই—(চারের নয়)—এ যতক্ষণ তিনি প্রমাণ করতে না পারছেন ততক্ষণ আমরা তাঁর ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করতে পারি নিরাপদে।

(খ) পাঁচ সিলেব্‌লের ছন্দের উদাহরণ—স্বরমাত্রিকে:

কুঞ্জের্‌ মঞ্জীর্‌ মাঝ্‌	সুর্‌হীন্‌ স্বর্‌পায়্‌ লাজ্‌
অন্তর্‌ গায়্‌—সাজ্‌ সাজ্‌	উৎসব্‌ রব্‌ ছন্দে
মন্থর্‌ প্রাণ্‌ কুঞ্জে	মূর্চ্ছন্‌ গিড়্‌ মুঞ্জে
ভৃঙ্গের্‌ আশ্‌ গুঞ্জে	ফাল্গুন্‌ স্তব্‌ গন্ধে

মানি একে মাত্রিক ক'রেও scan করা যায়—চারের কদমে—কিন্তু তাতে এর পাঁচের কদম অপ্রমাণ হয় না। বস্তুতঃ এ স্বরমাত্রিক ছন্দ, কাজেই উভধর্ম্মী তো বটেই। অন্ততঃ আমি একে পাঁচের কদমেই রচনা ক'রেছিলাম এ কথা শপথ ক'রে বল্‌তে পারি। ছন্দজ্ঞরা বিচার করবেন।

(গ) ছয় সিলেব্‌লের ছন্দ। দ্বিজেন্দ্রলালের "ভক্ত" ও "স্নাক্স" কবিতা দ্রষ্টব্য আলেখ্যে):

কি সের্‌ তবে দর্প	কি সের্‌ তবে গর্ব্ব
কি সের্‌ জন্য তোমায়্‌	এত শ্রেষ্ঠ ভাবো
পোলাও তোমার কাছে	নয়ক তেমন স্বাদু
যেমন এই শাকান্ন	আমার কাছে সুধা

দ্বিজেন্দ্রলালই একমাত্র এ অপূর্ব্ব ছন্দে কবিতা রচনা ক'রেছেন। আমার বিশ্বাস একে ছয় ছয় সিলেব্‌ল্‌ অন্তরে ভাগ ক'রে পড়লেই এর যথার্থ কদমটি পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্র ওকে ষট্‌স্বরপর্ব্বিক স্বরবৃত্ত বলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁ'র সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। ছন্দোবিৎরা আমার সঙ্গে সায় দেবেন এ আমার মনে হয়।

অথবা:

তুমি চায়ের সঙ্গে | মিষ্ট ছন্দোবন্ধে |
স্বদেশ হিতৈষণা | চাখো নি "ভক্ত" কবিতা

এ দুটি কবিতাতেই ধ্বনিসাম্য হ'য়েছে শুধু ছয় ছয় স্বরে প্রতি পর্ব্বে।

এথেকে কি প্রমাণ হয় না যে বাংলা ছন্দ মাত্রই মাত্রা-প্রধান ছন্দ নয়? স্বরবৃত্তে ব্যষ্টি (unit) স্বরমাত্রাবৃত্তে ব্যষ্টি—মাত্রা, যৌগিকে ব্যষ্টি—কখনো মাত্রা কখনো স্বর। এ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রই যে ঠিক্‌ পথে চ'লেছেন ও ভেবেছেন এ কথা দুদিন বাদে স্বীকৃত হবেই—এবং অমূল্যবাবুর চিন্তা-ধারা যে ছন্দের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে কাউকে বিশেষ সাহায্য করবে বা আলো দেবে তা-ও মনে করার বিশেষ কোনো কারণ নেই।

অমূল্যধন বাবু কেবল একটা প্রশ্ন তুলেছেন যা অবান্তর নয়। যে, যেহেতু চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর পর্ব্বও খারাপ শোনায় না * সেহেতু স্বরবৃত্তে স্বরই আসল কথা হবে কেমন ক'রে?

এ কথা সত্যি যে চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর-পর্ব্ব চতুঃস্বর-পর্ব্বের সঙ্গে চমৎকার কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে পারে। কিন্তু এর খুব সত্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রবোধ বাবু। তিনি দেখিয়েছেন (গত ভাদ্রের বিচিত্রা) যে স্বরবৃত্তে ছয়মাত্রার স্থান অনেক পর্ব্বেই ** যাকে বলে এ রকমটা ঘটা সম্ভব হয়—অর্থাৎ এক ছন্দে অপর ছন্দের কদম এলেও ছন্দলালিত্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। ইংরাজীতেও এমন ধারা হয়—Iambus-এ Anapaest এবং Trochee-তে Dactyl আসে—ইত্যাদি। কিন্তু তাই ব'লে "শিবুঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যা দান" ধরণের চরণ ছড়ায় গ্রাহ্য হ'লেও কখনই ছন্দের আদর্শ হিসেবে প্রামাণ্য নয়। এখানে "শিবঠাকুরের'ই ঠিক (আমিও শিব-ঠাকুরের-ই শুনেছি ছেলেবেলা থেকে প্রবোধবাবু শৈলেন্দ্রবাবুর মতন, এ বিষয়ে শৈলেন্দ্র বাবু যা ব'লেছেন সবই ঠিক, ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রশংসনীয়—এই ভুল বোঝার ও গোল-মালের দিনে) শিবঠাকুরের লিখ্‌লে ছন্দ পতন হবেই।

* যথা, আয় আয় সই | জল আনি গে | জল আনি গে | চল্‌
লাইনে প্রথম পর্ব্বে তিন স্বর মাত্র। এরকম অনেক পর্ব্ব চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে থাকে ও বেশ খাপ খায় চতুঃস্বর পর্ব্বের সঙ্গে।

** যদিও অনেক পর্ব্বে আবার সাত মাত্রা, এমন কি আটও থাকে যথা
"এস গোকুল | সংবাদ পত্রের" ("স্পাই" রবীন্দ্রনাথ)—
৮ মাত্রা শেষ পর্ব্বে।
একটি পয়সায় | রঙীন পুতুল। পেলে সে তো। সুখের চরম
(দ্বিজেন্দ্রলাল) ৭ মাত্রা প্রথম পর্ব্বে।
এটা একটা প্রধান যুক্তি যে স্বরবৃত্তে স্বরই আসল কথা, মাত্রা নয়। মাত্রাসাম্য দিয়ে এ ধরণের লাইনকে কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না, যেহেতু মাত্রাসাম্য এখানে কখনই নেই।

এবং আমার বিশ্বাস ছড়ায় এ ধরণের শৈথিল্য চল্‌লেও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথের পরে এ ধরণের ছন্দ-শৈথিল্যে কেউই সায় দেবেন না, বা কেউ এ ধরণের ছন্দ লিখ্‌তে সাহসী হবেন না—অন্ততঃ সীরিয়াস কবিতায় তো নয়ই। (প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ লেখবার সময় "শিবঠাকুরের"ই লিখেছেন।)

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কথার প্রতিবাদ ক'রে এ-প্রবন্ধের সমাপ্তি টান্‌ব। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন প্রাকৃত ছন্দ—যাকে প্রবোধচন্দ্র বল্‌ছেন চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দ—যে আসলে তিনেরই ছন্দ, চারের নয়, তার একটা প্রমাণ তাঁর ও-ছন্দে লেখা গান প্রায়ই একতালায় সুর দেওয়া।

আমার বক্তব্য, গানের তাল ও কবিতার ছন্দ এক বস্তু নয়। বহু গানকেই ইচ্ছে করলে বিভিন্ন তালে গাওয়া যায় ও গাওয়া হ'য়ে থাকে, তিনের কদমে রচিত গানকে চারের তালে, চারের ছন্দোবদ্ধ গানকে পাঁচের তালে, পাঁচের ঝোঁক-ওয়ালা গানকে সাতের তালে ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ত্রিমাত্রিক মাত্রাবৃত্তে-রচিত বিখ্যাত "নৃত্যের তালে তালে" গানটি এ কথার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর প্রথম স্তবক (Stanza) একতালার (৩+৩) ছন্দে সুর-দেওয়া; দ্বিতীয় স্তবক চৌতালের (২+২ বা ২+২+২) ছন্দে; তৃতীয় স্তবক তেতালার (৪+৪) ছন্দে ও চতুর্থ স্তবক ঝাঁপতালের (২+৩) ছন্দে। অথচ ও চারটে স্তবকেরই কাব্যছন্দ "তোমার চরণকমল পরশে" ধরণের ত্রিমাত্রিক ছন্দে রচিত। অন্য নানা রচয়িতার গান থেকেও আমার এ কথার বহু উদাহরণ আমি দিতে পারি, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন গান-শ্রেণীর কবিতায় প্রায়ই সুরের আকাশ রাখা হয়—ধ্রুপদে, খেয়ালে, ভজনে, গজলে, কীর্ত্তনে, বাউলে, আধুনিক বাংলা গানে, ছড়াশ্রেণীর সুরে। কাজেই গানে অনেক সময়ে ছন্দের শৈথিল্য দেখা যায়—(স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গানেও আছে)—যেখানে ছন্দের ফাঁক সুরে ভরাট ক'রে নেওয়া হয়। ছড়ার আবৃত্তিতেও এইভাবে সুর টেনে অনেক সময় ছন্দপতন ঢাকা দেওয়া হ'ত—যেজন্যে ছড়ার ছন্দ দোষদুষ্ট হ'লেও কানে স'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবিতার ছন্দের যতই উন্নতি হয় ততই তার আদর্শ হয় ঢের বেশি নিখুঁৎ—সব দেশেই। মানি, কবিতার ছন্দকে ইচ্ছামত টেনেবুনে জোড়াতাড়া দিয়ে আবৃত্তির সুরের পায়ে ভর ক'রে দাঁড় করানো চল্‌তে পারে না। অনেক চতুঃস্বর স্বরবৃত্তকে (যদিও চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে রচিত সব কবিতাকে নয়) টেনে প্রতি পর্ব্বে ছয়ের মাত্রা পূরণ ক'রে আবৃত্তি করা চলে। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ

ব'লেছেন রূ প্‌ সা গ রে এ | ডু ব্‌ দি য়ে ছি ই |

তাঁর এই ঢঙ্গে ও-গানটিকে scan করবার সময়ে। কিন্তু তা থেকে কি প্রমাণ হয় "রূপসাগরে"…ছ মাত্রার ছন্দ? এ-যুক্তি যদি সত্য হয় তবে

রবীন্দ্রনাথের প ঞ্চ শ রে এ | দ গ্ধ ক রে এ |

ভাবে টেনে প'ড়ে বলা যাবে না কেন যে এ পাঁচের ছন্দ নয়—ছয়েরই ছন্দ? কিম্বা

গোবিন্দদাসের নন্দনন্দন অ | চন্দ চন্দন অ |
গ ন্ধ নি ন্দি ত অ | অ ঙ্গ সাতের ছন্দ নয়—আটেরই ছন্দ?

আসল কথা জীবনে যেমন, ছন্দের বেলায়ও তেমনি—"স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।" কোনো কবিতা টেনে প'ড়ে তার স্বভাবেতর অন্য ছন্দে দাঁড় করানো গেলেও তাতে প্রমাণ হয় না যে শেষোক্ত ছন্দই তার আসল রূপ। স্বরবৃত্তকে স্বরব্যাষ্টি ও মাত্রাবৃত্তকে মাত্রাব্যাষ্টি ধরলে তবেই এদুই ছন্দের স্বাভাবিকতম ও সরলতম রূপ ও স্বাদটি মেলে। এ পক্ষে প্রবোধচন্দ্রের বিশ্লেষণ ও যুক্তি আমার মনে হয়—invulnerable—অনবদ্য। তিনিই সব প্রথম বাংলা ছন্দকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ক'রে যথাযথ ভাবে প্রতি ছন্দের স্বরূপটি দেখিয়েছেন। শুনেছি ওয়েল্‌স্ সাহেব কোন্ এক লেখকের সম্বন্ধে ব'লেছিলেন,—"Take your hats off, men!—a great genius at last!" আমরাও আজ বলি প্রবোধচন্দ্রকে অভিনন্দন ক'রে: "Take your hats off, metrists!—a great prosodist at last—and at long last!"

শ্রীদিলীপকুমার রায়

—০—

হেমন্ত লক্ষ্মী

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

আজি হেমন্ত লক্ষ্মী এসেছে অরুণ-মধুর প্রাতে
মাথার উপরে গুণ্ঠন ধীরে টানি,'
গ্রামের প্রান্তে দাঁড়ায়েছে আসি' কনক থালিটি হাতে
মঙ্গলময়ী মৌন সে কল্যাণী।
নীরব তাহার করুণ দু'খানি নত নয়নের দানে
ভরি' উঠে মাঠ সোণার ফসল ক্ষেতে,
নবীন প্রাণের শিশির-স্বপন মেলে যায় ধানে ধানে,
নূতন গন্ধে বাতাস উঠেছে মেতে।

আকাশের বুকে ঢেউ তু'লে যায় হাঁসের বলাকামালা
দূর হ'তে দূরে কোথায় চ'লেছে মিশি',
শুভ্র মেঘের ভেলাগুলি ছাড়ে আন্‌মনা দিক্‌বালা,
গগন-কিনারে ফেরে তা'রা দিশি দিশি।
শঙ্খচিলের অলস পাখায় শান্ত কিরণ মেখে
প্রভাতের বেলা ব'হে যায় ধীরে ধীরে;
মাটির আঁচলে প্রজাপতিদল জুটে আসি' একে একে,
উড়াউড়ি করে নবীন কুঁড়িরে ঘিরে'।

আজি হেমন্তলক্ষ্মী এসেছে গ্রামের বিজন বাটে,
মাঠের বাঁশিতে বাজে তারি আগমনী;
উজান বাহিয়া দূর-পল্লীর তরণী ভিড়েছে ঘাটে,
পরাণে পরাণে ছুঁয়েছে পরশমণি।
আন'গো গ্রামের কল্যাণী বধূ, মঙ্গলঘট ভরি',
ঘরের দুয়ারে আঁক' নব আলপনা;
দূর হ'তে যা'র স্বপন দেখা'ল শরতের কোজাগরী,
আজিকে প্রভাতে এসেছে সে সুনয়না।

বাংলার রসকলা প্রতিভা

শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

চিত্রকলা ও বর্ণ বিন্যাসের প্রতিভা বাংলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে এখন পর্য্যন্তও এত বহুব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে যে তাহা ভেবে দেখলে অবাক হ'তে হয়। যদিও অনেক দেশেই পল্লীশিল্পের জীবন্ত উজ্জ্বল ধারা কোন এককালে বর্ত্তমান ছিল অথবা এখনও কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে, তবু এটা জোর করে বলা যেতে পারে যে চিত্রকলার ও বর্ণবিন্যাসের প্রতিভা বাংলার পল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে এখনও যে রকম ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে—এবং শুধু ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান নয়—এই প্রতিভা এত উচ্চস্তরের—যে এ রকম বোধ হয় আজকাল এই পণ্যতন্ত্রতার দিনে খুব কম দেশেই আছে। বাংলার পল্লী—প্রতিভার এই বিভাগে প্রথম স্থানের অধিকারী পশ্চিম বাংলার পল্লী গ্রামের চিত্রশিল্পী পটুয়াগণ। আমাদের নাগরিক শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই পশ্চিম বাংলার পটশিল্পের সঙ্গে পরিচয় নাই, ব'লেই তাঁরা এখনও একে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন অথবা এই পটশিল্পের কথা অবজ্ঞার সঙ্গে উল্লেখ করেন। কিন্তু বিগত মার্চ্চমাসে পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের অঙ্কিত বহু সংখ্যক জড়ানো পটের যে প্রদর্শনী কলিকাতায় Indian Society of Oriental Art-এর ভবনে আমি করেছিলাম তা দেখবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁদের অনেকেই আশা করি এখন বুঝতে পেরেছেন যে এগুলি কত উঁচুদরের চিত্রকলা। রেখারূপের বর্ণরূপের ও পরিকল্পনা—সমষ্টির সৃষ্টির রসবত্তাগৌরবে এগুলি আজকালকার অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য রসকলার বিচারপদ্ধতির দিক দিয়েও খুব উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য। বাংলার পল্লীর সহজ সরল ধর্ম্মজীবনের উৎস থেকেই এগুলি স্বতঃ উৎসরিত হয়েছে বলে এগুলিতে ভাবের এমন একটি আদিম তেজস্বিতা, সারল্য ও আধ্যাত্মিক এমন একটি রসগর্ভতা ও রসব্যঞ্জনশীলতা আছে যে আমাদের আধুনিক সহরের কৃত্রিম অনুকরণ ও বিলাসিতামূলক কলাশিল্পে সেটি খুব কমই দেখা যায়। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্ট যে সকল রূপসৃষ্টির নিদর্শন আমাদের মাঝে এখনও বিদ্যমান রয়েছে এইগুলিকে দিয়ে আধুনিক বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মন প্রাণকে আমাদের অভিসিঞ্চিত করে দিতে হবে। এবং তা করতে পারলেই আজকালকার বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতর দিয়ে বাংলার আসল ও আপন রূপ ফুটে উঠবে, যা অন্য প্রদেশের অথবা অন্য দেশের সৃষ্ট রূপাবলীর অনুকরণ করে ফুটা অসম্ভব। বাংলার এই নিজস্ব চিত্রশিল্পের পদ্ধতি কোন নাগরিক শিল্পীসঙ্ঘের সোসাইটিতে অথবা কলাভবনে আবদ্ধ ছিল না এবং আধুনিক বণিকতন্ত্র সভ্যতা প্রণালীর



গোপিকা-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ
পল্লী চিত্রকর সুরেন্দ্রনাথ পটুয়া কর্ত্তৃক অঙ্কিত, শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

অনুকরণে এগুলি জাতীয় জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট ছিল না। কেবল এক পটুয়া জাতির সংখ্যাই বাংলার গ্রামে গ্রামে ছিল অজস্র এবং চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক চর্চ্চা তাতে করে এটা সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যারা শ্রেষ্ঠ কলারসিক তাদের বিবেচনায় এগুলি যে আমাদের নাগরিক শিল্পের চেয়েও উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। এদের মধ্যে আছে রেখার ও রংএর ছন্দ বিন্যাসের সহজাত প্রতিভা, ভাবের শুচিতা ও গভীরতা, আদিম সারল্য ও তেজস্বিতা এবং কারিকরের ও মাল মসলা প্রয়োগের সহজ প্রাঞ্জলতা। এ সব গুণ আজকাল পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক রসকলাপদ্ধতির বিচারের দিক দিয়া নাগরিক শিল্পের কৃত্রিম অনুকরণমূলক রেখা বিন্যাসের ও রংএর চাকচিক্য ও বিলাসিতাব্যঞ্জক প্রয়োগ কৌশলের চেয়েও বড় জিনিস।



শ্রীরাধার প্রসাধন—প্রাচীন পটের অংশ
শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্যগণ এখনও পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে যে সকল চালচিত্র এঁকে থাকেন সেগুলিতে পল্লী কলাপদ্ধতির উল্লিখিত গুণগুলি যথেষ্ট পরমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এরা পূর্ব্ব বাংলার অশিক্ষিত

জাতির মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ব্যাপকতা লাভ করতে পেরেছিল। জাতির গভীর প্রাণ প্রকৃতির ও চিন্তাধারার এবং দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর সঙ্গে ছিল এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই জাতীয় প্রাণপ্রকৃতির ও চিন্তাধারার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে তাই এরা অতি সহজ ও সত্যরূপে তাদের চিত্র-কলায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। এই পটুয়ারা ছিল পেশাদার চিত্রশিল্পী। কিন্তু এই সহস্র সহস্র পেশাদার পটুয়াশিল্পী ছাড়া বাংলার পল্লীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও নরনারী নির্ব্বিশেষে চিত্রশিল্পের প্রতিভা ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও আছে। এই সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্য এবং কুম্ভকার, পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মালাকার জাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল জাতির কি পুরুষ কি মেয়েদের



পুতনা বধ—প্রাচীন পটের অংশ—শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

মধ্যে চিত্রকলার একটি উচ্চাঙ্গের সহজাত প্রতিভা বর্ত্তমান আছে। আমাদের সহরে শিক্ষিত লোক এবং নাগরিক শিল্পীগণ এদের দিকে অবজ্ঞার ভয়ে যে চেয়েও দেখেন না মুসলমানদের জন্য "গাজীর পট" নামে এক রকম জড়ানো পটও আঁকতেন। তাতে সুন্দর রংয়ের ও রেখার বিন্যাসে সাধারণ জনপ্রবাদমূলক ব্যাঘ্রের দেবতা বড়খাঁ গাজীর

নানাপ্রকার কীর্ত্তির ছবি আঁকা থাকত। এ রকম একটা গাজীর পট থেকে একটা ছবি এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হল। রেখার অবলীলায়িত জোরাল বিন্যাসের ও বিশুদ্ধ উজ্জ্বল রং এর ছন্দোবদ্ধ প্রয়োগের সবিশেষ কৌশল এগুলিতে পাওয়া যায়। আজকাল পূর্ব্ববাংলায় মেলা ইত্যাদিতে সাধারণতঃ যে সকল গাজীর পট পাওয়া যায় সে গুলিতে আচার্য্যদের আঁকা পুরাণো পটের মত চিত্রকলা-কৌশল নেই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাঁরা তুচ্ছ জিনিসগুলিকেও সৌন্দর্য্যের গৌরবে পরিপূর্ণ করে তোলেন। রঙ্গপুরের মালাকারগণ সামান্য সোলার রঙ্গিন চাল চিত্র এঁকে ও সোলার কাঠামো তৈরী করে তাতে মনসার ছবি ইত্যাদি রং দিয়ে এঁকে এ রকম সুন্দর রূপসৃষ্টি করে যে তা দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার কুম্ভকারদের যে কেবল মাটির ভাস্কর্য্যে পারদর্শিতা আছে তা নয়; চিত্রকলায় প্রতিভাও ইহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এখনো রয়েছে। আর কেবল



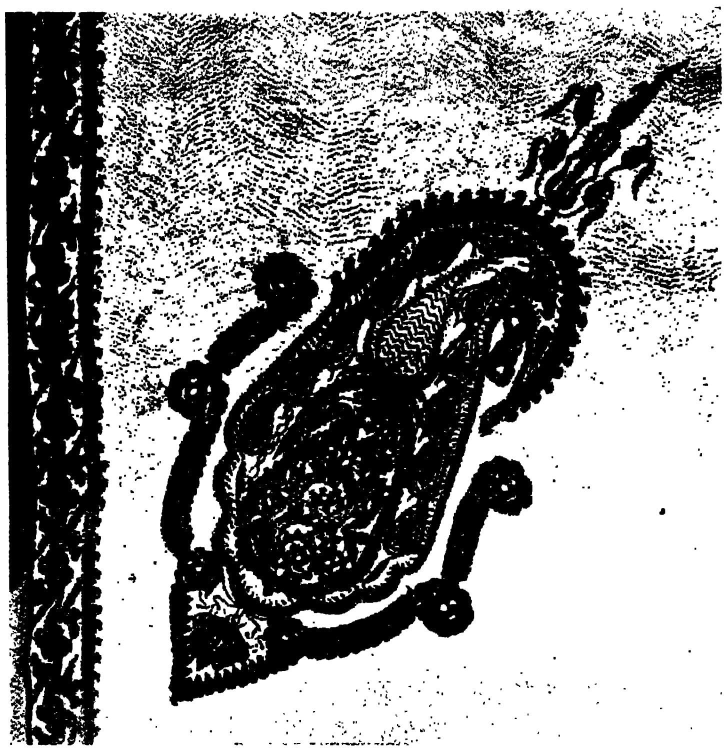
মৃগ-ভ্রমে দশরথ অন্ধক মুনির পুত্রকে হত্যা করিয়া স্কন্ধে বহন করিতেছেন
শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক বীরভূম হইতে সংগৃহীত—প্রাচীন বাংলা পটের অংশ

বঙ্গের মালাকাররা বিবাহ ইত্যাদি পর্ব্বের জন্য ঘড়া ও সরার উপরে যে সকল চিত্র এঁকে থাকে তাতেও রেখা ও রং এর প্রয়োগের এমন একটা সহজাত কৌশল লক্ষিত হয় যা সহরে চিত্রকলায় দুর্লভ।

বাংলার পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীদের চিত্রকলা প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে এবং নানা উৎসবাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত সব জিনিসেই তাঁদের এই সহজাত প্রতিভা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে' কুম্ভকারজাতীয় পুরুষদের মধ্যে নয় মেয়েদের মধ্যেও। যশোর জেলায় চালচিত্রের জন্য কুম্ভকারগণ যে সকল রঙ্গিন ছবি এঁকে থাকে, সেগুলি বড়ই সুন্দর এবং লক্ষ্মীর সরা, লক্ষ্মীর ঘড়া ও বিবাহ ইত্যাদিতে সুচিত্রিত রঙ্গিন সরা প্রস্তুত করতে এদের মধ্যে কি পুরুষ কি মেয়ে সকলেই বিশেষ পারদর্শী।

বাংলার পল্লীর সর্ব্বশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে চিত্র শিল্পের প্রতিভার বহুব্যাপকতার ও উৎকর্ষের প্রমাণ আমরা পাই

মাটিতে, পিঁড়িতে ও ঘড়া ইত্যাদিতে সাদা এবং রঙ্গিন আলপনা এবং দেয়ালে রঙ্গিন চালচিত্র ও পদ্ম ইত্যাদির পরিকল্পনা আঁকার ভিতর দিয়ে। আমাদের সহুরে শিক্ষার ফলে আলপনা আঁকার প্রবৃত্তি ও কৌশল শিক্ষিতা মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছেন কিন্তু এটা যে কত বড় একটা জাতীয় সম্পদ তা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা আমাদের একবার হলে আল্‌পনা আঁকার বহুব্যাপক চর্চ্চা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রথাটি আজকাল প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই তুচ্ছ বাঁশের তৈরী বরণ-কুলা গুলিকে বাংলার পল্লীর মেয়েদের অসাধারণ কলা প্রতিভা যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার করে তোলে তা বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। যশোরের মিকশিমিল গ্রামের সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীমতী ক্ষীরোদ-কামিনী মিত্রের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আঁকা একটি

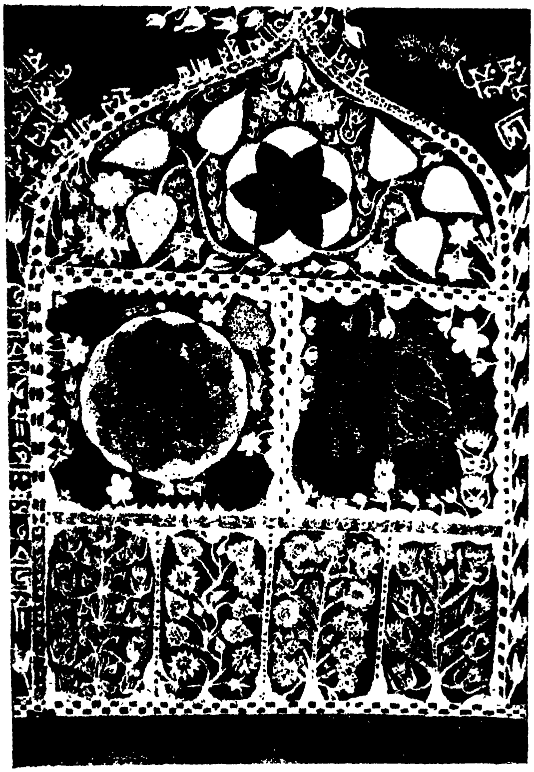


কাঁথার কল্‌কা
খুলনা হইতে শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক জীবনে আমাদের দেশে আবার জেগে উঠবে বলে আমি আশা করি। লীলায়িত রেখার অঙ্কন কৌশলের ও রসব্যঞ্জনাময় ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসের দিক দিয়া এগুলি একটি অতি উঁচুদরের কলাসম্পদ।

বিবাহ ইত্যাদি পর্ব্বে বরণ-কুলা ব্যবহারের প্রথা বাংলার পল্লীজীবনে একটি অতি মনোরম জিনিস; যদিও অতি পুরাণো রঙ্গিন বরণ কুলার ছবি (গত সংখ্যায় প্রকাশিত) এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া গেল। লীলায়িত রেখা ও বিচিত্র রংএর নকসার মনোরম ও নয়নাভিরাম পরিকল্পনার রসাত্মক সমন্বয় ও পূর্ণ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটা একটি অপূর্ব্ব বস্তু। মেয়েরা কুলার ভিতরের দিকটায় একটা কাপড় লাগিয়ে তাতে মাটির একটা পাতলা প্রলেপ দিয়ে তার উপরে চিত্র এঁকে থাকেন।

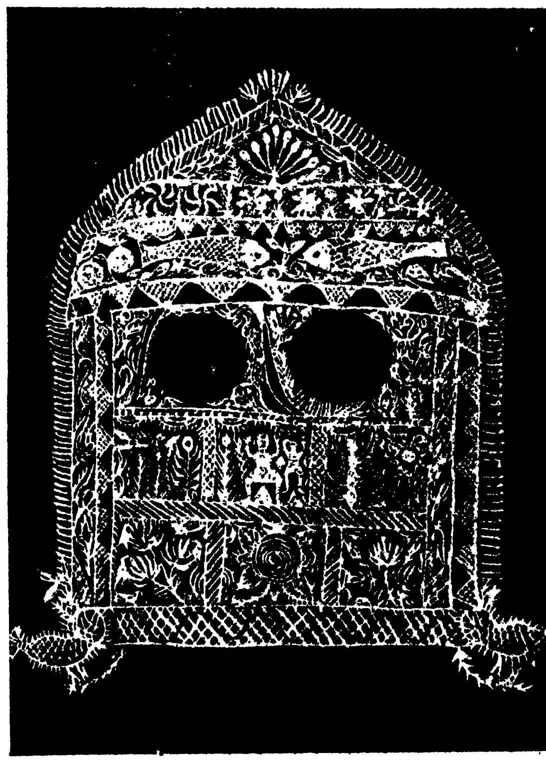
বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের কাঁথাশিল্পেও আমরা রেখাবিন্যাস ও বর্ণ প্রয়োগ কৌশলের অতি চমৎকার



আলপনা
শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্তৃক বীরভূম হইতে সংগৃহীত

দৃষ্টান্ত পাই। নিত্য ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিষগুলিকে মানুষ আপন অন্তরের সহজাত রসানুভূতি ও রসব্যঞ্জনা প্রতিভার বলে যে কি চমৎকার সৌন্দর্য্যের আধার করে তুলতে পারে, পল্লী মেয়েদের তৈরী কাঁথাগুলি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাঁথাগুলির পাড়ে, কলকায়, পদ্মে ও কাঁথার গায়ে সন্নিবিষ্ট নানাপ্রকার কাহিনী ব্যঞ্জক আকৃতিগুলির পরিকল্পনায় ও সমন্বয়পূর্ণ বিন্যাসে একটা শ্রেষ্ঠ সহজাত জাতীয় কলাপ্রতিভার পরিচয় আমরা পাই। পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের ও পূর্ব্ব বাংলার আচার্য্য ও গণকদের প্রতিমা শিল্পের ভাস্কর্য্যে ও চিত্রকলায় একটা উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল এখনও বর্ত্তমান আছে। পল্লীর মেয়েদের নিজের হাতে পাথরের উপর খোদাই করা ক্ষীরের ছাঁচে ও আমসত্ত্বের ছাঁচেও আমরা বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ ও রসব্যঞ্জনা মূলক পরিকল্পনার সহজাত প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় পাই।

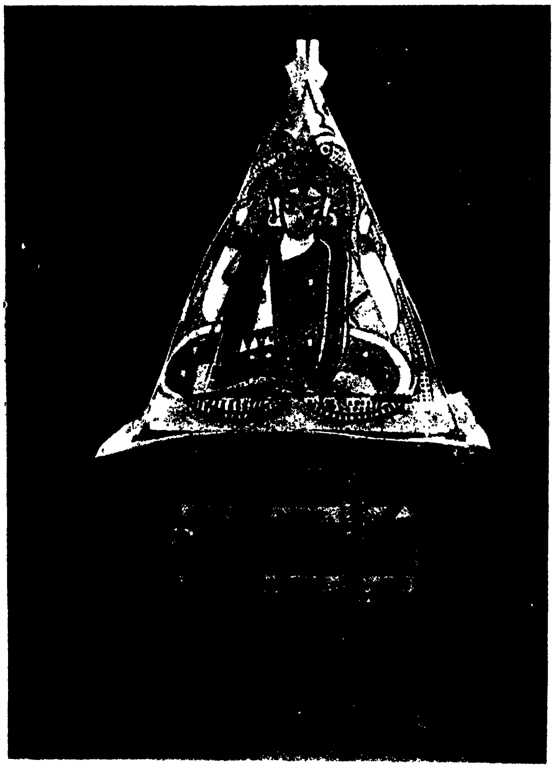
এই যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের কৌশলের ব্যাপক নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে এটা একটা বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ। এটা যে কেবল শিল্পের দিক দিয়ে একটা বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ তা নয়, এটা আমাদের প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির আদিম তেজস্বিতার, সরলতার ও আধ্যাত্মিক রসগর্ভতা ও রসব্যঞ্জনাশীলতার একটা বিশিষ্ট পরিচায়ক। বাংলার পল্লীর রসকলার



আলপনা
শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত

প্রতিভাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই কারণ উপরোক্ত গুণাবলীর দিক দিয়া ইহা আধুনিক নাগরিক শিল্পকলা

চেয়েও মূল্যবান ও জাতির পক্ষে সবিশেষ কল্যাণকর। এই পল্লী শিল্পকলাকেই করতে হবে আমাদের দেশের প্রত্যেক স্কুলে স্কুলে শিক্ষার সোপান ও ভিত্তি এবং তা করতে পারলেই আমাদের জাতীয় প্রতিভা এবং জাতীয় চরিত্রের বিশুদ্ধ ও শক্তিময় বিকাশ আবার সম্ভবপর হবে; এবং আমাদের আধুনিক সহুরে জীবনে যে কৃত্রিমতার,



সোলার কাজ
শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক রংপুর হইতে সংগৃহীত

বিলাসিতার, রুচিবিকৃতির এবং ধর্ম্মহীনতার ও নীতি হীনতার বিকট মূর্ত্তি মাথা তুলে উঠছে তার নিরাকরণ করে জাতির জীবন ও চরিত্রকে আবার সহজ সরল তেজীয়ান ও বিশুদ্ধ করে আমরা তুলতে পারব। আর কেবল তা নয় একমাত্র এই জাতীয় পল্লী-শিল্প-প্রতিভার বিকাশের ভিতর দিয়েই আমাদের পণ্য শিল্পের সম্পূর্ণ ও সুন্দর বিকাশ সম্ভব হবে এবং সেই পণ্যশিল্প কৌশলের বিকাশের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে।

বাংলার পল্লীর শিল্পকলার এই যে উচ্চস্থান নির্দ্ধারণ করবার জন্য আমি কিছুকাল থেকে নানা রকম চেষ্টা করেছি তার দিকে আমাদের দেশের অনেক নাগরিক শিল্পী এবং কলারসিক ও শিক্ষিত লোকেই অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি আমি ভারতীয় বর্ত্তমান নাগরিক শিল্পের প্রথম এবং প্রধান প্রবর্ত্তক এবং ভারতীয় নাগরিক কলা শিল্পীদের গুরু-স্থানীয় শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত ই, বি, হ্যাভেল মহাশয়ের নিকট হইতে এই সম্পর্কে যে পত্র পেয়েছি তা নিম্নে উদ্ধৃত। করলাম।

[শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের পত্র]

"প্রিয় দত্ত মহাশয়,

"আপনার ২৫শে মে তারিখের চিঠি এবং তৎসহ প্রেরিত আপনার লোকশিল্প-প্রদর্শনীর বিবরণী ও অন্যান্য পুস্তিকাগুলি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

"বাংলার নিজস্ব শিল্পকলার পুনরভ্যুত্থানের জন্য আপনি যে কাজ করিতেছেন, তাহাতে আপনাকে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইতেছি। আপনি এই বিষয়ে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও যে সকল কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া আমি মনে করি। রস-শিল্প-শিক্ষার ভিত্তিসংগঠন কার্য্যে লোক-শিল্পের জীবন্ত পদ্ধতির মূল্য অপরিসীম। আপনি এই বিষয়টির একেবারে গোড়ায় হাত দিয়াছেন। আমি জানি, এই কাজে সফলতা লাভ বহু সময়-সাপেক্ষ ও বহু কষ্টসাধ্য; কিন্তু ইহা যে একান্ত কর্ত্তব্য কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রসকলা-পদ্ধতির সম্মিশ্রন করিয়া যাঁরা এক একটা মিশ্র-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চান বা করেন, তাঁদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের ছোঁয়াচ থাকে। আমি এই মিশ্র-পদ্ধতির কিছুমাত্র সমর্থন করি না; কারণ ইহাতে উন্নতির নামে বাস্তবিক পক্ষে রসকলার মূল উৎসমুখটিই শুকাইয়া দেওয়া হয়। যে সকল রসকলা-

পণ্ডিত আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির অনুসরণে ব্যস্ত তাঁরা হয়ত আপনার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার যথেষ্ট সমাদর প্রদান না-ও করিতে পারেন, কিন্তু আপনি এই কাজের মধ্যেই আপনার সম্যক্ পুরস্কার পাইবেন।



পাথরে খোদাই আমষত্ত্বের ছাঁচ
ফরিদপুরে একটি বৃদ্ধা পল্লীবাসিনীর দ্বারা খোদিত

"ভারতের পল্লীর শিল্প-ধারাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেই ভারত আবার ধনে, স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে।

"পুনরায় ভারতবর্ষে আসা আমার আর সম্ভবতঃ ঘটিয়া উঠিবে না। তবে হয়ত আপনি আবার কোনোদিন ইউরোপে বেড়াইতে আসিবেন এবং ততদিন যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও ভাববিনিময় করিয়া আনন্দ লাভ করিব। যতদিন তা না হয় ততদিন আপনি নিশ্চিত জানিবেন, যে যাহাতে আপনার কাজের সর্ব্বদা সংবাদ রাখিতে পারি এবং প্রতিনিয়তই ইহার উত্তরোত্তর সাফল্যের খবর শুনিতে পাই, এই আশায় থাকিব।

"অক্সফোর্ড, ভবদীয়—
"২৯শে জুন, ১৯৩২ **ই, বি, হ্যাভেল**

বাংলার পল্লীর রসকলা পদ্ধতির জীবন্ত ক্রমচর্য্যা গুলিকে যাঁরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের উপরোক্ত মত পাঠ করে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হবে বলে আমি আশা করি। মোট কথা, বাংলার প্রতিভার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় আমাদের দৃষ্টি বিন্যস্ত করতে হবে—প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ বাইরের বিশ্বের দিকে নয়—বাংলার নিভৃত পল্লীর কোলে এখনও যে কলাসম্পদ্ লুক্কায়িত আছে তার দিকে। বাঙ্গালীকে মনে প্রাণে চরিত্রে ও কলাপদ্ধতিতে প্রথমে আবার হতে হবে খাঁটী বাঙ্গালী। বিশ্বের দশদিক থেকে আলো হাওয়ার ও অনুপ্রেরণার আহরণ করবার সময় হবে তারপর।

গুরুসদয় দ

প্রবাসী

(চিত্র)

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

জায়গাটা হাওয়া খাইতে যাইবার মত। রেলের প্লাটফর্ম্মের উপর নবদম্পতী পায়চারী করিতেছিল—বিবাহটা খুবই সম্প্রতি হইয়াছে। ছেলেটি মেয়েটিকে এক হাত দিয়া জড়াইয়া আছে--মেয়েটি তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মেঘের ফাঁক দিয়া চাঁদ তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভুরু কোঁচ্‌কাইল—যেন আপনার বিফল যৌবনের কথা ভাবিয়া মনে মনে তাহার ঈর্ষা ও বিরক্তি জন্মিতেছে। লাইলাক ও বন-চেরীর গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। লাইনের ওপারে কোথায় যেন ঝিঁ ঝিঁ ডাকার শব্দ···

বধূ কহিল—কী সুন্দর সাশা, কী চমৎকার! সত্যি মনে হচ্ছে সব যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! দেখ, দেখ, ঐ ছোট্ট, বনটা!—ভারী সুন্দর, যেন ভারী মিষ্টিভাবে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে!—আর এই মোটা মোটা টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো—নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে--চারিপাশের দৃশ্যটাকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে—বল্‌ছে যেন, ঐখানে ঐ দূরে ও যেন মানুষের বাস···আচ্ছা, বলো, তোমার ভালো লাগে না, সত্যি, যখন খুব দূরে চলা গাড়ীর শব্দ ক্ষীণভাবে হাওয়ায় ভেসে আসে!

হ্যাঁ...কিন্তু তোমার হাত দুটো কী ঠাণ্ডা গো! তুমি ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছ, মনে হচ্ছে···আচ্ছা, ভারিয়া আজ রাতের খাবারের কী ব্যবস্থা হলো?

'ক্রাস্' আর কচি মুরগী···মুরগী যা আছে তাতে আমাদের দু'জনের বেশ কুলিয়ে যাবে। আর, তোমার জন্যে সহর থেকে 'সার্ডিন,' আর মাছের দাগা পাঠিয়েছে।

বিরক্ত হইয়া চাঁদ মেঘের আড়ালে সরিয়া গেল। মানুষের সুখ দেখিয়া যেন পাহাড় ও বনের ধারে তাহার আপনার নিঃসঙ্গ শয্যার কথা মনে পড়ে!··

গাড়ী আস্‌ছে!—ভারিয়া বলিল,—কী মজা!

দূরে আগুনের ভাঁটার মত তিনটা চোখ জ্বল্ জ্ব করিতেছে। প্লাটফর্ম্মের উপর রেলবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। লাইনের দুই ধারে এখানে সেখানে সিগ্‌ন্যালের বাতী জ্বলিয়া উঠিল।

চলোনা, গাড়ীখানা দেখা যাক তারপর বাড়ী যাবো, কেমন'?—বলিয়া সাশা হাই তুলিল।—আমরা দু'জনে এমন আনন্দে আছি, নয় ভারিয়া?—এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, সত্যি না স্বপ্ন!

কৃষ্ণকায় দৈত্যটা নিঃশব্দে প্ল্যাটফর্মের কাছে আসিয়া থামিল। গাড়ীর স্বল্পালোক কাম্‌রাগুলার জান্‌লায় জান্‌লায় আধো ঘুমন্ত মুখ, টুপী, কাঁধ···

এই জো, এই জো!—একটা কাম্‌রা হইতে কে চেঁচাইয়া উঠিল।—আরে, এই জো, ভারিয়া তার বরকেও নিয়ে এসেছে আমাদের আন্‌তে! ঐ যে তারা দু'জনে। ভারিয়ন্‌কা, ···ভারিচকা। এই জো!

গাড়ী হইতে দুইটি মেয়ে সর্ সর্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ভারিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের পেছু পেছু একটি স্থূলকায়া বর্ষিয়সী মহিলা, এবং রোগা লম্বা চেহারার একটি ভদ্রলোক, গালের দুই পাশে তাহার পাকা গালপাট্টা—দুইটি ছোট ছোট ছেলে, সঙ্গে একরাশ মালপত্র লইয়া নামিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের পিছনে একটি ঝি, এবং ঝির পিছনে দিদিমা।

—আর এই জো বাবা, আমরা সব এই জো!—সাশার করমর্দ্দন করিয়া ভদ্রলোকটি সুরু করিলেন—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো না কী? মনে মনে বোধ হয় বল্‌ছিলে, কাকাবাবু আর এলেন না!—কোলিয়া," কস্তিয়া, নীনা,

ফীকা,—এই ছেলেমেয়েরা সব! সাশুদা'কে চুমু খা!—হ্যাঁ, ছেলেপুলে সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আসা গেল, দিন তিন চারেকের জন্যে, আশা করি কোনো কষ্ট হবে না। না, না, কুটুম্বিতা কিছু করিস্ নে বাপু—

সগোষ্ঠী খুল্লতাতের আবির্ভাবে নবদম্পতি যেন একটু অবাক হইয়া গেল। খুড়ামহাশয় যখন সচুম্বন অভিনন্দনে রত তখন সাশার মনে যে দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিল, তাহা এই:—অতিথিদের সেবার জন্য তাহাদের আপনাদের মাত্র তিনখানি ঘর তাহাও ছাড়িতে হইবে—তাহার পর বালিশ, কম্বল; মাছের দাগা, 'সার্ডিন্', 'ক্রাস', সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যাইতে দুই সেকেণ্ডও লাগিবেনা—খুড়তুতো ভাইগুলা ফুল ছিঁড়িবে, কালী ফেলিবে, হৈ চৈ করিবে—খুড়ী সারাদিন ধরিয়া আপনার রোগের বিবরণ দিবেন, পেটেব্যথা, আরও কী কী সব—তারপর ব্যারনেস্ ফন্ ফিন্‌তিথ্-এর বংশে তাঁর জন্ম এই সব ...

সাশা বিরক্তিভরে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া চুপি চুপি বলিল—তোমার কাছে এলেন সবাই—যতো সব হাঙ্গামা—

আমার কাছে কেন, তোমার কাছে!—তাহারও চোখে মুখে ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—বলি এসবত আমার নয়, তোমারই ত গুষ্টিবর্গ সব।—

তারপর সস্মিত অভ্যর্থনার সুরে মুখে হাসি টানিয়া অভ্যাগতদের দিকে ফিরিয়া বলিল—এই যে, চলুন সব, ভারী আনন্দ হচ্ছে আমার!

মেঘের পিছন হইতে আবার চাঁদ দেখা দিল, যেন মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।—তাহার আত্মীয় স্বজনের কোনো বালাই নাই। সাশা মুখটা ফিরাইয়া লইল পাছে তাহার বিরক্ত ও নিরাশ ভাবটা অতিথিদের চোখে ধরা পড়ে। হর্ষের সুরে অত্যন্ত খুশীর ভাব দেখাইয়া বলিল—

আসুন, আসুন,—বেশ, বেশ!—চমৎকার!

অনুবাদক
শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল



—আন্তন্ পিত্রোভিচ, চোখ্‌ফ্‌-এর মূল রুশীয় হইতে।

স্বাবলম্বন আন্দোলন ও বাংলার ছাত্রসম্প্রদায়

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাশ

সমস্ত পৃথিবীব্যাপি যে দারুণ অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায়ের উপরও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্রই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের সন্তান। ইহাদের অভিভাবকগণ অতিকষ্টে ইহাদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কারণ, ইঁহাদের অধিকাংশেরই আয়ের জন্য কোননা কোন ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ক্ষুদ্র জমিদার তাঁহারা অর্থাভাবে সরকারী রাজস্বই পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না। কারণ, প্রজার নিকট হইতে তাঁহারা কিছুই আদায় করিতে পারিতেছেন না। এদিকে ঋণ চাহিলেও ঋণ পাইতেছেন না। ফলে, অনেক জমিদারী নিলামে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহারা তালুকদার বা বড় জোতদার তাঁহারা প্রায়ই মজুরের সাহায্যে কৃষি-কার্য্য করেন। কৃষি ভিন্ন ইঁহাদের আয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রকমে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের পক্ষে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া জমিদারের খাজনা দেওয়াই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী বর্ত্তমানে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অবশ্য, চাকরীজীবীদের অবস্থা তেমন শোচনীয় নহে। অভিভাবকদের যখন এই অবস্থা তখন ছাত্রদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কারণ প্রায় সকল ছাত্রকেই অর্থের জন্য অভিভাবকের উপর নির্ভর করিতে হয়। অর্থাভাবে ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্রকে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইয়াছে। যদি বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে আরও অনেককে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইবে।

অভিভাবকগণ অর্থসাহায্য করিতে অক্ষম হইলেই আমাদের দেশের ছাত্রগণ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়েন। পড়া বন্ধ করা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য উপায় থাকে না। নিজের শক্তিতে নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ আমাদের দেশের ছাত্রগণের নাই। মুষ্টিমেয় কতজন ছাত্র গৃহশিক্ষকতা দ্বারা আপন আপন শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহ করেন বটে; কিন্তু, বিরাট ছাত্রসমাজের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বহু সংখ্যক ছাত্র যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন, এইরূপ কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা আমাদের দেশে এযাবত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহার কারণ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিবার শিক্ষার অভাব।

বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের পর হইতে পাশ্চাত্য দেশে ছাত্রদের মধ্যে স্বাবলম্বন আন্দোলন অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু ছাত্র স্বীয় উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। জার্ম্মানীতে এই আন্দোলন জন্ম লাভ করে। এবং ঐ দেশেই ইহার সাফল্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মহাযুদ্ধের পর সীমান্ত হইতে ফিরিয়া আসিয়া জার্ম্মেন যুবকগণ দেখিতে পাইলেন, তাহাদের অভিভাবকগণ হৃতসর্ব্বস্ব। শিক্ষাব্যয় দূরের কথা, তাহাদের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক অভিভাবকের ছিল না। বিশ্বের বাজারে জার্ম্মানী তখন দেউলিয়া। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সমগ্র দেশের উপর পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থাতেও জার্ম্মেনীর যুবক ছাত্রের দল বিচলিত হয় নাই। হতাশ হইয়া তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন নাই। যেরূপ অসীম সাহসের সহিত তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ বীরদর্পেই তাহারা এই নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হইলেন। সমগ্র জার্ম্মেনীর ছাত্র সম্প্রদায়

সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাবলম্বন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সাধু যাহার প্রচেষ্টা, ঈশ্বর তাহার সহায়। বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত আমেরিকার ছাত্রদিগের নিকট হইতে বিপন্ন জার্ম্মান ছাত্রগণ প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের বিপদ দূর হইল। জার্ম্মান ছাত্রদের স্বাবলম্বন আন্দোলন জয়যুক্ত হইল।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে জার্ম্মান ছাত্রগণ স্বাবলম্বন আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এক একটি বৃহৎ ছাত্র-সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির অধীন নানাবিধ শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই ছাত্রগণের নানাবিধ অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেন। যথা—(১) ঋণদান সমিতি। এই সমিতি দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা সুদে ঋণ দিয়া থাকেন। ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করেন। প্রথমে, প্রধানতঃ আমেরিকার ছাত্রদের প্রদত্ত অর্থেই সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) আর একটি সমিতি স্থাপিত হয় ছাত্রদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য। জার্ম্মেনীতে বাসগৃহের সমস্যা একটি প্রবল সমস্যা। গরীব ছাত্রগণ যাহাতে সস্তায় স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে পারেন, এই সমিতি সেই ব্যবস্থা করেন। কতক ছাত্র যাহাতে ভদ্র পরিবারে খোরাকী দিয়া থাকিতে পারেন সমিতি সেই বন্দোবস্তও করিয়া থাকেন। এতদ্ ভিন্ন যাহাতে ছাত্রগণ কোন অস্থানে কুস্থানে বাস না করেন সমিতি সেই দিকেও দৃষ্টি রাখেন।

(৩) সমবায় রেঁস্তোরা বা ভোজনাগার। দরিদ্র ছাত্রদিগকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য এই সমস্ত ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত ভোজনাগারের দ্বারা আর একটি প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা অনেক ছাত্র নানাভাবে কাজ করিবার সুবিধা লাভ করেন ও অর্থোপার্জ্জন করেন।

(৪) কর্ম্ম সরবরাহ সমিতি। যে সমস্ত ছাত্র অবসর সময়ে কাজ করিয়া আপন আপন শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক এই সমিতি তাহাদিগের কাজের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

ইহা ভিন্ন গরীব ছাত্রদিগকে বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজ ছাত্রসমিতি করিয়া থাকেন। ছাত্ররাই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তবে অধ্যাপকগণ, বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগকে এই সব কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। জার্ম্মেনীর স্বাবলম্বন আন্দোলন সফল হওয়ার ইহাও একটি প্রধান কারণ

এই স্বাবলম্বন আন্দোলন জার্ম্মেনীর ছাত্রগণকে যে শুধু শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ করিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মান ছাত্রগণ পাঠ্যাবস্থাতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা লাভ করেন। এই শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাদের অনেক কাজে লাগে। ইহা ভিন্ন ছাত্রাবস্থায় নানা বিভাগে কাজ করিয়া ইঁহারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে তাহা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিয়া থাকে।

জার্ম্মেনীর ছাত্রগণকে একদিন যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল আজ বাংলার ছাত্রগণের সম্মুখেও প্রায় সেই সমস্যাই উপস্থিত। সুতরাং, বাংলার ছাত্রসমাজ যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, তাহাহইলে তাঁহাদের সে চেষ্টা অবশ্যই সফল হইবে ও দুর্গত ছাত্রদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের এই অভিনব প্রচেষ্টা অচিরে ভারতের সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কাজ করিতে হইলে বাংলার ছাত্র-সমাজকে বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া এক হইতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র নেতাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বাংলার ছাত্রসমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। সমগ্র ছাত্র-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার যে সাধু প্রচেষ্টা একদা আরম্ভ হইয়াছিল, রাষ্ট্রনীতির ঘোরপাকে পড়িয়া তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এ-বি-এস-এ ও বি-এস্-এ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান। ইহারা পরস্পরের মাথায় লাঠির আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। বাংলার ছাত্রদের কোন ব্যক্তিত্ব নাই। ইহারা রাষ্ট্রনেতাদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ছাত্রগণকে প্রথমে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। আত্মশক্তিতে

তাঁহাদের বিশ্বাসী হইতে হইবে। বাংলার ছাত্রগণ যখন বুঝিতে পারিবেন, যে তাঁহাদেরও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, যখন উপলব্ধি করিবেন, যে, অন্যের পরিচালনা ব্যতীত তাঁহারাও মহৎ কার্য্য করিতে পারেন, তখনই তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন।

একতাবদ্ধ ছাত্রসমাজ কলিকাতায় একটি কেন্দ্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র প্রথমে কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। সমিতি ছাত্রদের নানাবিধ অভাব দূরীকরণের জন্য নানাবিধ শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কোন প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই অর্থের কথা ভাবা দরকার। আমাদের প্রস্তাবিত সমিতি প্রথমে ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন। শুধু কলিকাতার স্কুল ও কলেজের ছাত্রা-ছাত্রীদের নিকট হইতে প্রথমে চাঁদা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে সমিতির সভ্য করিতে হইবে। সভ্য হইবার চাঁদা কলেজের ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৎসরে যথাক্রমে চারি আনা ও দুই আনা ধার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে যে অর্থ সংগ্রহ হইবে তদ্বারাই কাজ চালাইবার মত অর্থ পাওয়া যাইবে। তারপর, ধীরে ধীরে সমিতির কার্য্যকলাপ যখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তখন সমিতি সাধারণের সাহায্য হইতেও বঞ্চিত হইবেন না।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, যে, সমিতি সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে বিরত থাকিয়া ছাত্রদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলজনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। এবং সেই কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিবেন।

জার্ম্মাণ ছাত্রগণের ন্যায় প্রথমে নিম্নলিখিত সমিতিগুলি সংস্থাপিত করিতে হইবে।

১। ঋণদান সমিতি। এই সমিতি সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রদিগকে ঋণ দিয়া সাহায্য করিবেন। ঋণগ্রাহী ছাত্রকে সুদ দিতে হইবে না, বা কোন জামিন দিতে হইবে না। তবে, শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি টাকাগুলি পরিশোধ করিবেন; এই মর্ম্মে তাঁহাকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে।

উল্লিখিত সংগৃহীত অর্থের দ্বারা এই সমিতির কাজ আরম্ভ হইবে।

২। সমবায় ভোজনাগার। অনেক ছাত্র অর্থাভাবে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে পারেন না। ইঁহারা জঘন্য হোটেলে বা মেসে খাদ্যের নামে নানাপ্রকার অখাদ্যে উদর পূর্ত্তি করিতে বাধ্য হ'ন। এই সমস্ত ছাত্রদিগকে সস্তায় পুষ্টিকর আহার সরবরাহ করিবার জন্য এই সমস্ত ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কলিকাতার বহু রেঁস্তোরা এবং ভোজনাগার শুধু ছাত্রদের কল্যাণেই টিকিয়া আছে। সুতরাং, ছাত্ররা যদি নিজেদের রেঁস্তোরা প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে তাঁহারা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। এই সমস্ত ভোজনাগারে ম্যানেজার, পরিবেশক ইত্যাদিরূপে কাজ করিয়া অনেক ছাত্র অর্থোপার্জ্জনও করিতে পারিবেন। এই ভোজনাগারগুলি সমবায় নীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে ও লাভের টাকা ভোজনাগারগুলির উন্নতির জন্যই ব্যয়িত হইবে।

৩। বাসগৃহ সমিতি। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বেশী। অর্থাভাবে অনেক গরীবছাত্র অস্বাস্থ্যকর কদর্য্যস্থানে বাস করেন। সমিতি ইহাদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। সমিতির তহবিল হইতে বাড়ীভাড়া করা হইবে ও ছাত্রদের নিকট হইতে খুব সামান্য ভাড়া আদায় করা হইবে। ইহা ভিন্ন, কোন কোন ছাত্র যাহাতে ভদ্রপরিবারে খোরাকী দিয়া থাকিতে পারেন সমিতি সেই চেষ্টাও করিবেন। মফঃস্বলে কোন কোন স্থানে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

৪। সমবায় ভাণ্ডার। কলিকাতায় প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে এই সমস্ত ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত ভাণ্ডারে ছাত্রদিগের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিষ থাকিবে। কলিকাতায় শুধু ছাত্রদের জন্য বহু দোকান চলিতেছে। সুতরাং ছাত্ররা যদি নিজেরা দোকান করেন তবে সেই দোকানের উন্নতি নিশ্চিত।

সমবায় নীতি অনুসারে সেয়ার বিক্রয় করিয়া এই সমস্ত

ভাণ্ডারের মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। লভ্যাংশ মূল সমিতির তহবিলে জমা হইবে। এই সমস্ত ভাণ্ডারের দ্বারা যে শুধু বহু ছাত্রের কর্ম্মসংস্থান হইবে তাহা নহে, ইহাদ্বারা ছাত্রগণ 'স্বদেশী' প্রচার করিতে পারিবেন।

৫। কর্ম্ম-সরবরাহ সমিতি। যে সমস্ত ছাত্র অবসর সময়ে কাজ করিতে চাহেন, সমিতি তাহাদিগকে কাজ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কর্ম্ম প্রার্থীকে ১৲ টাকা দিয়া সমিতির আফিসে নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ হইতে আফিসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মূল সমিতির তহবিলে জমা হইবে।

৬। শিক্ষা সহায়িনী সমিতি। এই সমিতি দরিদ্র ছাত্রদিগকে বৃত্তি, কলেজের বেতন-হ্রাস প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এতদ্‌ভিন্ন, একটি গ্রন্থাগারও পরিচালনা করিবেন। এই গ্রন্থাগারে প্রধানতঃ ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক থাকিবে। যে সমস্ত দরিদ্র ছাত্র অর্থাভাবে বই কিনিতে পারেন না তাহারা এই সমস্ত বই ব্যবহার করিবেন। মূল সমিতি হইতে এই সমিতি প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করিবেন।

৭। প্রচার সমিতি। এই সমিতির একটা নিজস্বঃ ছাপাখানা থাকিবে। ইহার সাহায্যে ছাত্র সমাজের মুখপত্ররূপে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করা হইবে। ছাপাখানাটি লাভজনক করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা সমিতি করিবেন। ইহার জন্য উপযুক্ত কমিশনে ছাত্র ক্যানভেসার নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে প্রচার ভিন্ন কোন কার্য্যই সফল হয় না। সুতরাং, ছাত্রদের সমবায় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার প্রধান দায়িত্ব থাকিবে এই সমিতির। এই সমিতিও বহু ছাত্রের কর্ম্মের সংস্থান করিতে পারিবেন।

৮। স্বাস্থ্য সমিতি। নানা কারণে বাংলার যুবকগণ আজ ভগ্নস্বাস্থ্য। বাঙ্গালী ছাত্রদের অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীন, রোগগ্রস্ত। অসুস্থ দেহ নিয়া কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। আধুনিক যুগে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, লৌহদৃঢ় মাংস পেশীর প্রয়োজন। বাংলার ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির ভার ছাত্রদিগকেই লইতে হইবে। প্রস্তাবিত সমিতি—নানাস্থানে ক্লাব, জিম্‌নাসিয়াম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার প্রচলন করিবেন। এই সমিতি দীর্ঘ অবকাশের সময় ছাত্রদের পদব্রজে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিবেন। ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। ইহারা প্রথমে বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিবেন। পরে, ক্রমশঃ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সুনাম লাভও হইবে; তাঁহারা যথার্থ দেশকে জানিতে পারিবেন।

ইহা ভিন্ন আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাহাদের কর্ত্তব্য হইবে বিভিন্ন দেশের ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলার ছাত্রদের ভাবের আদান প্রদান ইত্যাদি দ্বারা যোগাযোগ সংস্থাপন করা। এই সমিতি বৎসরে একবার করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদিগকে একটি সভায় আহ্বান করিবেন। ইহাতে আরও একটা লাভ এই হইবে যে, সমগ্র দেশের ছাত্রগণের মধ্যে একটা যোগ-সূত্র সংস্থাপিত হইবে। ২।৩ বৎসর পর পর একবার নিখিল ভারতের ছাত্রসম্প্রদায়কে লইয়া একটি সভা করা হইবে।

ছাত্রগণ দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা। যে গুরুভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব যদি ছাত্র সমাজ উপলব্ধি করেন তবেই তাঁহারা নিজকে তদুপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন।

এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে স্বাবলম্বন আন্দোলন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রদিগকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার উপযোগী করিতে পারে না। স্বাবলম্বন আন্দোলন শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবে।

মানবের কল্যাণের নিমিত্ত যত আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যুবকেরাই প্রাণ দিয়া তাহা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলার তরুণ ছাত্রবন্ধুদিগকে একটি মহান আন্দোলনের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিলাম। সুধী ছাত্রসমাজের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

উপেন্দ্রকুমার দাশ

মৃত্যু-জল্পনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গেলো কয়েক দিন ধরে আমার শরীর ভালো থাকছে না। কী হয়েছে, বলা শক্ত। নির্দ্দিষ্ট কোনো ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করে নি, আমার শরীরে কোনো যন্ত্রণা, এমন কি কোনো অস্বস্তিও নেই; স্নানাহারাদি স্বাস্থ্যোচিত ক্রিয়া নিয়মিতরূপে চল্‌ছে। নিয়মিতরূপে—এবং নিছক নিয়ম-হিসেবে, শুধুই নিয়মরক্ষার খাতিরে। অনেক দিনকার অলঙ্ঘ্য অভ্যেস-অনুসারে—তা-ই মনে হয়—ডান হাতের আঙুলগুলো খাদ্য তুলে দিচ্ছে মুখে, নেহাৎই কর্ত্তব্য পরায়ণভাবে দাঁত চিবোচ্ছে, মুখ অনিবার্য্যরূপে ভরে' উঠ্‌ছে রসে। এবং উদরস্থ খাদ্যের ওপর যে শরীরযন্ত্রের সূক্ষ্ম সব প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণভাবে চল্‌ছে, তার পরিচয় পাচ্ছি পরবর্ত্তী আহারে। এ থেকে অনুমান্ কর্‌তে হয় যে শরীরের কলকব্জা মোটামুটি ঠিক ভাবেই চল্‌চে। তবু এ-ও ঠিক যে আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি; এত অসুস্থ শীগ্‌গির হই নি।

সম্প্রতি আমি নিজের মধ্যে একটা ক্লান্তি অনুভব কর্‌ছিলাম। কয়েকটা দিন আমি ছুটী নেবো, মনে-মনে আমি বলেছিলাম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম কর্‌বো। খাওয়া, ঘুম আর পড়ায় সীমাবদ্ধ যে-জীবনযাত্রা, তা'র মত লোভনীয়, তার চেয়ে সুখকর কী আর আছে? তখন, অনিচ্ছায় লেখ্‌বার দায়ে পীড়িত, অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বিব্রত, তখন আমার তা-ই মনে হয়েছিলো। এবং তা-ই আমি কর্‌লাম। গেলো কয়েক দিনে আমি কাগজের ওপর কলম ছোঁয়াই নি; বহুকাল ধরে যে সব বই পড়বো বলে' আত্ম-প্রতিশ্রুত হ'য়ে আছি, তা-ই নিয়ে আমার সময় কাটছে। সাধারণতঃ রাত্রিশেষ অবধি জাগরণে বাধা, বারোটা না বাজ্‌তেই ঘুমিয়ে পড়্‌ছি। কী সুখের জীবন!—কল্পনা কর্‌তেও, কল্পনা করতেই কী সুখের! হ্যাঁ, কল্পনা করতেই সুখের। কারণ, আসলে, এই বিশ্রাম-চিকিৎসার একমাত্র ফল হয়েছে আমার ক্লান্তিকে আরো গভীর করে' তোলা। সাত ঘণ্টার গাঢ় নিদ্রার পর ক্লান্ত হ'য়ে আমি বিছানা থেকে উঠি। ক্লান্তভাবে কোনো সমসাময়িক উপন্যাসের পাতা উল্টিয়ে যাই। ক্লান্তভাবে খেতে বসি। দুপুর বেলা পড়তে-পড়তে বার-বার ঝিমিয়ে পড়ি। শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিচারে যে-বইকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীয় বলে' নির্দ্দিষ্ট করেছেন, তা'তেও মন বসে না। এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তি আর সহ্য কর্‌তে না পেরে অযথা দেরী না ক'রে শুতে যাই। সমস্ত শরীর যেন দীর্ঘ দিন ভরে' এরি প্রতীক্ষা কর্‌তে থাকে; বালিশে মাথা রাখবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম: সাময়িক মৃত্যু। ঐটুকু সময় শুধু বাঁচি, কারণ শুধু ঐটুকু সময় ক্লান্তির দুর্ব্বিষহ নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাই। জাগ্রত অবস্থাতেও মন থাকে ঘুমিয়ে; শরীরের যান্ত্রিক নড়াচড়া, তাই, অস্বাভাবিক, বিসদৃশ, এমন কি, উৎকট ঠেকে। শুধু ঘুমের মধ্যেই ঘটে শরীর ও মনের সুরসঙ্গতি। এক বিশাল ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করেছে।

বোদ্‌লেয়ার এক রকম ক্লান্তির কথা বলেছেন, যা কিনা 'assumes the proportions of immortality.' সেই ভীষণ ক্লান্তির আনুসঙ্গিক হচ্ছে ক্ষয়কারী তিক্ততা, অসীম হতাশা। জীবনের দিক থেকে তা যতই অবাঞ্ছিত, যত বড় অমঙ্গলই হোক্, তা কাব্যে ফলপ্রসূ হ'তে পারে। সুতরাং তা সক্রিয়, তা সজীব। যা থেকে কবিতায় প্রাণ সঞ্চারিত হ'তে পারে, মৃত্যুর তা পরিপন্থী হ'তে পারে না। কবিতার প্রেরণা হ'বার ক্ষমতা তা রাখে, এবং সেখানেই তা'র মহান্ সার্থকতা। আর এক রকম ক্লান্তি আছে, টেনিসন-বর্ণিত মধুভুক্‌দের ক্লান্তি, সুইন্‌বর্ণের অলস ছন্দ যা আমাদের চেতনাগোচর করে। প্রসার্পিনার ঘুমের মাঠে লাল হয়ে আফিম ফুল ফুটেছে: নেশার আচ্ছন্নতা, বিস্মৃতি,

ঘুম। কাজের, কথার কলরোল অস্পষ্টভাবে কানে এসে বাজছে, পার্থিব জীবনের স্মৃতি ক্রমশ-বিলীয়মান কুয়াশার মত: জীবনের আমরা শেষ দেখেছি, এইবার ঘুমোবো। ঘুম, ঘুম। ঘুমের নেশার মত সুইন্‌বর্ণের ছন্দ। এই ক্লান্তি কাল্পনিক, উপাখ্যানমূলক; কিন্তু এর মূলে জীবনের সত্য আছে। কারণ, এই অবস্থা কখনো-না-কখনো আমরা কামনা করি (কীট্‌স-উল্লিখিত fever and fret-এর এটা একটা অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া); কামনা করি—এবং অনুভবও করি। এমন সময় আসে, যখন আমরা ছায়ার মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে যাই। সে-ক্লান্তি মধুর, উপভোগ্য; এক রকমের আধ্যাত্মিক আত্ম-রমণ। উপরন্তু, সেটাও একটা সম্ভাব্য কাব্য-উৎস।

কিন্তু এই ক্লান্তি, যার ভেতর দিয়ে আমি সময় কাটাচ্ছি (কঠিন ধৈর্য্যসহকারে, এই কঠিন আশ্বাসে যে এটা সাময়িক, এখনকার মত যতই মর্ম্মঘাতী হোক্, এটা কেটে যাবে)—এ দু'য়ের কোনো শ্রেণীতেই তা পড়ে না। এ-ক্লান্তিতে বোদ্‌লেয়ারের ভীষণ তিক্ততা কি প্রসার্পিনার আফিম-ফোটা ঘুমের মাঠের শ্লথ মাধুর্য্য নেই; বস্তুত, কিছুই এতে নেই। সমস্ত অনুভূতির অভাব, মনের সমস্ত আবেগ, চিন্তার নেতিত্ব—এই ক্লান্তি একটা বিরাট শূন্যতা। চারদিকে কিছু নেই, আমি নেই। আমি নেই—কেননা, আমি আর অনুভব কর্‌তে পারি নে, চিন্তা করতে পারি নে, অবিশ্রান্ত-বহমান বিশ্বস্রোত থেকে কিছু গ্রহণ কর্‌তে পারি নে। যে-বিশ্ব থেকে সহস্র অদৃশ্য যোগনালী দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমি প্রাণ আহরণ করেছি, যেন এক হিংসাপরায়ণ অপদেবতার অভিশাপে তা থেকে আমি এখন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত: যোগসূত্র গেছে ছিঁড়ে, হাজার চেষ্টা করেও সেই সহজাত, প্রবৃত্তিমূলক সংস্পর্শকে আর স্থাপন করতে পার্‌ছি নে। যে-সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির সমগ্রতার সঙ্গে, বিশ্বের জীবনের সঙ্গে আমার সংযোগ, তা'দের মুখ গেছে অবরুদ্ধ হ'য়ে। সংক্ষেপে, আমি জীবিত আছি, কিন্তু আমার জীবন নেই। দীর্ঘ দুপুর বই হাতে নিয়ে শুয়ে আছি—মাঝে-মাঝে বইয়ের খোলা পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুজে এসেছে; ঠিক ঘুম নয়—সতন্দ্র অবস্থায় চোখ বুজে পড়ে' থাকা, মনে হয়েছে, সেটা ভালো লাগ্‌বে, কিন্তু খানিক পরে তা'তেও ক্লান্তি ধরেছে, ক্লান্ত চোখ আবার নিবিষ্ট হয়েছে বইয়ের পাতায়। আর সারাক্ষণ, আমার চারদিকে যা-কিছু আছে, যা-কিছু ঘটছে—জানালা দিয়ে দেখা রোদে-ঝল্‌সে-যাওয়া আকাশ, রাস্তায় ট্যাক্সির হর্ণ, উড়ে পানের দোকানে হল্লা, আমার বাসে পরিপূর্ণ এই ঘর, অতি-পরিচিত আসবাব, বই—সব আমার পক্ষে অসার, অবাস্তব, যেন সত্যি-সত্যি এদের অস্তিত্ব নেই: কিম্বা, এরা আছে অস্তিত্বের অন্য-এক স্তরে, যেখানে আমি পৌঁছতে পার্‌ছি নে। আমাকে যেন আবৃত করেছে একটা কুয়াশা, আমার ও রিয়্যালিটির মাঝখানে একটা পর্দ্দা, যতই ছটফট করি, সংগ্রাম করি, সেই পর্দ্দা আমি সরাতে পার্‌বো না—কিছুতেই, কিছুতেই নয়। যে-লোক অন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তা'র দৃষ্টির ওপর যে-পর্দ্দা নামে, আমার শরীরের সব ইন্দ্রিয়, মনের সব চেতনার ওপর সেই পর্দ্দা। নিজকে আমি প্রশ্ন করি: কী হ'লে তোমার ভালো লাগে? যে-কোনো সময়ে যা-কিছু আমি কামনা করেছি, একে-একে সব আউড়ে যাই: বৃথা, মন একটাতেও সাড়া দেয় না। কিছু না, কিছুই আমার ভালো লাগে না; ভালো লাগবার ক্ষমতাই আমার নেই। তা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে আর আকাশ-পাতাল খুঁজে বেড়াতে হো'ত না; সাধারণ জীবনের ছোট-খাটো সব জিনিষ থেকেই আমি প্রচুর আনন্দ পেতুম। বই থেকে, কবিতা থেকে, নব-উজ্জীবন সংগ্রহ কর্‌বার চেষ্টা করি, এ-কৌশলও ব্যর্থ হয়। মনে কর্‌বার চেষ্টা করি, আমি খুব অসুখী: অসহ, অসহায়রূপে অসুখী হওয়া—তা'র একটা শক্তি আছে, এমন কি, আনন্দ আছে। কিন্তু অসুখী আমি নই, তা হ'লে যে বাঁচতাম। বিতৃষ্ণা কি আনন্দ, উপভোগ্য কি যন্ত্রণাকর—যে-কোনো জিনিষ, যে-কোনো জিনিষ, যা থেকে কোনো তীব্র হৃদয়াবেগ প্রসূত হয়, অনুভব কর্‌তে পার্‌লে আমি এখন বেঁচে যেতাম। সত্যি-সত্যি, আক্ষরিক অর্থে বেঁচে যেতাম। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, এখন আমি বেঁচে নেই; আমি জীবিত আছি মাত্র—আমার জীবন নেই। সব চেয়ে আমি ঘৃণা করি, ভয় করি এই অসাড়তাকে, এই নির্জীব নিশ্চেতনত্বকে—অগণ্য বিচিত্র উপায়ে পারিপার্শ্বিক দ্বারা প্রভাবান্বিত

হ'বার অক্ষমতাকে। এক অন্তহীন, অনতিক্রম্য শূন্যের মধ্যে আমি এক শূন্য—এ যেন আত্মার অ্যাট্রফি, একরকম মৃত্যু। এর চেয়ে ঢের ভালো শরীরের কোনো অসহ্য যন্ত্রণা, মর্ম্মমূলে তীক্ষ্ণ তরবারির মত প্রবিষ্ট কোনো দুঃখ: সেটা তবু একটা অস্তীতি, মনের বৃত্তিগুলোকে তা জড়ীভূত করে' দেয় না; বরং সূক্ষ্মতরো রূপে অনুভূতিশীল করে' তোলে। ঢের ভালো এর চেয়ে, যদি সত্যি-সত্যি কোনো কষ্টকর রোগ আমাকে আক্রমণ করতো, কোনো কঠিন শোক আমাকে আঘাত করতো। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ জড়ত্ব, এই বন্ধ্যা শূন্যতা—হ্যাঁ, এ-ই তো মৃত্যু। আমার নিঃশ্বাস পড়ছে, শ্রান্তিহীন নিয়মিতত্বে হৃৎপিণ্ড ধ্বনিত হচ্ছে, শরীরের প্রতি মুহূর্ত্তের ক্ষয় খাদ্য-পানীয় গ্রহণে পুরিত হচ্ছে; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি মৃত; গূঢ়তম, প্রকৃততম অর্থে মৃত; কেননা, আমার এখন যা হচ্ছে, এই নিশ্চেতন জড়িমা, তা একটা বিলুপ্তি, আলোর নির্বাপন, সক্রিয়তার সমাপ্তি, শূন্যতা। কারণ, সচেতনতাই তো জীবন।

* * *

আফ্রিকায়, প্রকৃতি যেখানে তা'র বন্যতম-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সি-সি (tse-tse) বলে' একরকম মাছি আছে, যা'র দংশন অনিবার্য্যরূপে কালান্তক। জীব-দেহযন্ত্রের ওপর এই মাছির বিষের যা প্রতিক্রিয়া, তা'কে ঘুম রোগ—sleeping sickness—বলা হ'য়ে থাকে। সি-সি একবার যাকে কামড়েছে, সে ঝিমিয়ে পড়তে-পড়তে, আস্তে-আস্তে, একটু-একটু করে' শেষ ঘুমে মিলিয়ে যাবে, রোগের প্রথম সূচনা থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বেশ দীর্ঘকালের ব্যাপার। এবং এই দীর্ঘকাল, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিঃশ্বাস-পাতের, প্রতি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তা'র জীবনীশক্তি নির্গত হ'তে থাকে—তা'র নিজেরই অজ্ঞাতে, কারণ, তা'র কী হচ্ছে, তা উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও তা'র থাকে না। এক দারুণ অবসাদ আক্রমণ করে তা'কে; মুহূর্ত্ত থেকে মুহূর্ত্তে, দিন থেকে দিনে তা গাঢ়তরো হয়: ফাটা পাত্র থেকে বিন্দুর পর বিন্দু নিঃসরণকারী জলের মত জীবন চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে—বিরামহীন, শ্রান্তিহীন, যতক্ষণ না প্রাণবর্জ্জিত শরীর শুধু মাটিকে উর্ব্বর করবার উপযুক্ত কতগুলো রাসায়নিকের সমষ্টিতে পরিণত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতেও পারে না যে সে মরছে; আর যদি বা পারে, তবু, মৃত্যুকে রোধ করতে চাইবার মত ইচ্ছাশক্তি, রোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সজীবতা—যা কিনা মানুষের অন্ধ প্রবৃত্তির অংশ, জাতির প্রবহমানতার সর্ব্বপ্রধান সর্ত্ত—তা-ও তা'র থাকে না: সে হ'তে দেয়, গা ছেড়ে দেয়, দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্ন তন্দ্রায় লুপ্ত হ'য়ে থাকে, সত্যি-সত্যি মৃত্যু ঘটবার অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়। নিঃশব্দ, নিঃসাড়, সে শুধু পড়ে' পড়ে' ঝিমোবে। কোনো শ্বেত পরিব্রাজক আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ কোনো পল্লীতে প্রবেশ করে' হয়-তো দেখতে পায়, সমস্ত গ্রাম সি-সি-আক্রান্ত; প্রত্যেক বাড়ির দাওয়ায় অধিবাসীরা বসে'-বসে' ঝিমোচ্ছে—কেউ কেউ হয়-তো মরে'ও গেছে। সমস্ত গ্রাম মৃত্যুর এক অখণ্ড মূর্ত্তি। যত ভয়াবহ রূপে জীবের মৃত্যু ঘটেছে, তা'র মধ্যে এর মত ভয়াবহ কিছু আছে বলে' আমি ধারণা করতে পারি নে। মৃত্যুর ভীষণতম রূপ—এই স্লিপিং সিক্‌নেস্; কারণ আর-কিছুতেই মানুষের চৈতন্যকে, ইচ্ছাশক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হয় না। অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, যে-আহত, চলৎশক্তিরহিত সৈনিক সন্নিকট ট্যাঙ্কের আওয়াজ শুনে উন্মত্তের মত চীৎকার করতে থাকে, সে-ও তা'র সেই চীৎকারে মৃত্যুর বিরুদ্ধে তা'র শেষ প্রতিবাদ ঘোষণা করে' যায়, যে-প্রবৃত্তির প্রতীক সেই চীৎকার, শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু তা'র কাছে পরাস্ত হ'তে বাধ্য। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও যেখানে লুপ্ত হ'য়ে যায়, বাঁচবার অদম্য ইচ্ছা অপসারিত হয়, মৃত্যুর ভয়ঙ্কর চেতনাও থাকে না—সেখানেই মৃত্যু হয় জয়ী, জীবনের গভীরতম মূল সেখানেই উৎপাটিত হয়। মরতেই যদি হয়, জেনে-শুনেই মরবো—এই গর্ব্ব মানুষের। সচেতনতাই জীবন; এবং মৃত্যুর মুখেও সে-জীবন আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। সেই কারণে, পুরাণের বীরেরা ছিলেন ইচ্ছামৃত্যু: জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু অসহায় কীটের মত এক অন্ধ, খেয়ালী শক্তির অধীনে থাকার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন; সময় যখন হ'বে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মৃত্যুর কাছে তাঁরা আত্ম-সমর্পণ করবেন; মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রিত করবেন তাঁরা;

নিজের ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি করবেন নিজের মৃত্যু, অনিয়মিত দৈবের বশবর্ত্তী হ'বেন না। এখন পর্য্যন্ত, সজ্ঞানে মৃত্যু-লাভ পুণ্যাত্মার লক্ষণ বলে' বিবেচিত হ'য়ে থাকে। সচেতনতা, জ্ঞান—তা-ই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব—নিছক জীবত্ব থেকে তা'কে যা আলাদা করে। সচেতন হওয়া, জানা—মানুষের শতাব্দীব্যাপী সভ্যতার, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের এ-ই তো সারবস্তু।

* * *

মৃত্যুকে আমরা সবাই ভয় করি—ভয় করি আর ঘৃণা করি, জীবনের কোনো-না-কোনো দিন রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে মৃত্যু-ভয়ে তা'র বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায় নি, এ-কথা যে বলে সে হয় মূঢ়মন না হয় মিথ্যাবাদী। ইতিহাসে অবিশ্যি দেখা যায়, সব দেশে এবং সব সময়ে, নিজের কি অন্যের হাতে, কোনো-না-কোনো উন্মত্ততার ঝোঁকে মানুষ ইচ্ছে করে' মরেছে; কিন্তু এতে শুধু এ-ই প্রমাণ হয় যে ও-সব ক্ষেত্রে তখনকার মত ভয় পরাভূত হয়েছিলো, ভয় ছিলো না, তা নয়। ভয় ছিলো, চিরকাল ছিলো—এবং থাক্‌বে। যে-কোনো দেশের পুরাসাহিত্যে কোনো-না-কোনো রকম মৃতসঞ্জীবনীর উল্লেখ পাওয়া যাবে। ইতর ধাতুকে সোনায় পরিণত করবার চেষ্টা থেকে যেমন রসায়ন শাস্ত্রের, তেম্‌নি চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা থেকে। কিন্তু মৃত দেহে কখনো প্রাণ ফিরে আসেনি; সমস্ত ভয় আর ঘৃণা নিয়ে মানুষ বাধ্য হয়েছে মৃত্যুকে স্বীকার করে' নিতে। মৃত্যুর ধারণার সঙ্গে মানুষ নিজকে এক রকম মানিয়ে নিয়েছে, কেননা প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। সব মানুষই বিচ্ছিন্নভাবে, নিছক একটা ফ্যাক্ট-হিসেবে এ-কথা মানে যে একদিন তা'র মৃত্যু হ'বে। কিন্তু মানুষ যা কখনো মেনে নিতে পারে নি, তা হচ্ছে তা'র সচেতনতার বিলুপ্তি। মৃত্যুকে সে যে এত ভয় করে, তা তা'র শরীর নষ্ট হ'য়ে যাবে বলে' নয়, তার চৈতন্যের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কায়। 'ঘুমকে তুমি রোজই আহ্বান করো, অথচ মৃত্যুকে ভয় পাও, ঘুমের বেশি যা কিছু নয়।...ঘুম, স্বপ্ন। কিন্তু সেই মৃত্যুর ঘুমে, কী স্বপ্ন?' পাছে মৃত্যুর ঘুমের স্বপ্ন জীবনের চেয়েও বেশি ভয়াবহ হয়, সেই ভয়ে হ্যামলেট আত্মহত্যা করলো না। কিন্তু আমরা যে মরতে ভয় পাই, তা দুঃস্বপ্নের জন্য নয়; পাছে মৃত্যুর ঘুমে কোনো স্বপ্নই না থাকে, সেই কারণে। পাছে সেটা একেবারে পূর্ণচ্ছেদ হয়, চরম বিরতি, পাছে আমাদের চৈতন্যের কোনো প্রবহমানতা সেখানে না থাকে। পাছে এক মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সর্ব্বকালের মত শেষ হ'য়ে যাই। নির্ব্বাণ আমরা কামনা করি নে, কল্পনা করতে পারি নে। হ্যামলেট ভয় পেয়েছিলো, যদি কিছু থাকে, আমরা ভয় পাই, যদি কিছু না থাকে। যদি কেউ আমাদেরকে এমন আশ্বাস দিতে পারে যে মৃত্যুর পরে আছে ভীষণ দুঃস্বপ্ন, নিশ্চিতরূপে আছে, তা হ'লেও আমরা খানিকটা সান্ত্বনা পাই। কিন্তু যে-সন্দেহ আমাদেরকে সব সময় হানা দেয়, এবং কিছুতেই যা সহ্য করা যায় না, তা হচ্ছে এ-ই: বোধ হয় তা-ও নেই, কিছুই নেই, শুধু ভীষণতম শূন্যতা। অথচ, সেই ভীষণ শূন্যতা, সৃষ্টির আগে যা ছিলো, আত্মজ ব্রহ্মা যা থেকে বিশ্বকে নিষ্কাষিত করেছিলেন, মানুষের তা ধারণার অতীত। মৃত্যুর পরেও কি তা-ই? আমরা কল্পনা করতে পারি নে। আমাদের সচেতনতা মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে, মৃত্যু অতিক্রম করে,' রূপান্তরিত হ'য়ে অস্তিত্বের কোনো সূক্ষ্মতরো স্তরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের চৈতন্য স্রোত অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে না, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব। এর চেয়ে কষ্টকর চিন্তা মানুষের পক্ষে কিছু নেই। দেহহীনতা ধারণা করা হয়-তো যায় (যদিও রূপে অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে তা সহজসাধ্য নয়; ঈশ্বরকে সে কল্পনা করেছে নিজের মূর্ত্তিতে; এমন কি, প্রেতকেও সে দিয়েছে অতিরিক্তরকম মানবীয় আকৃতি); কিন্তু মানুষের সত্তার যা সার, সেই সচেতনতা কখনো থাক্‌বে না, তা ভাবা যায় না। মানুষ আর-সব ছাড়তে পারে, শুধু তা'র সচেতনতাকে নয়। তা সে সব সময় রক্ষা করবে, তা'র ওপর কোনো আক্রমণ সহ্য করবে না। নিছক মৃত্যুর চেয়েও তা'র বিরতির সম্ভাবনাতেই সে বেশি ভয়াক্রান্ত। এবং সেই ভয়কে খণ্ডন করবার জন্য তা'কে কল্পনা করতে হয়েছে আত্মার অমরত্ব, পুনর্জন্ম, শেষ বিচারের

দিনে মৃতের পুনরুত্থান। একটা আশ্বাস, যে-কোনো একটা আশ্বাস চাই। অমরত্ব…? হ্যাঁ, অমরত্ব আছে বই কি। টি, এইচ্, হাক্সলি তাঁর 'শরীরতত্ত্বে' লিখছেন: 'উদ্ভিদ্ জগতের ভেতর দিয়ে ক্রিয়াশীল সূর্য্যের আলো (মৃতদেহস্থ) কার্ব্বনিক এ্যাসিড, জল, অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন লবণের বিচ্ছিন্ন অণুগুলোকে শস্যদেহে নির্ম্মিত করে' তোলে। সেই শস্য প্রাণীরা খায়, প্রাণীরা পরস্পরকে খায়, এবং মানুষ শস্য ও অন্যান্য প্রাণী দুই-ই খায়। আর এ থেকে খুবই সম্ভব যে, যে-সব অণু একদা জুলিয়স সীজরের ব্যস্ত মস্তিষ্কের অখণ্ড অংশ ছিলো, তা এখন আলাবামার নিগ্রো সীজরের এবং কোনো ইংরেজ গৃহের পোষা কুকুর সীজরের দেহসংঘটনে প্রবিষ্ট হয়েছে।' এবং এ-ই হচ্ছে, এ-ই হচ্ছে একমাত্র অমরত্ব, আমরা মর-জীব যা'র বড়াই করতে পারি।

বুদ্ধদেব বসু

ধূলার মাণিক

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

ধূলা ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে
সব ঠাঁই আছে ছড়ায়ে।
ধূলিধূসরিত দুটি বাহু মেলে
দুঃখীরে ধরে জড়ায়ে!
উষার ভুবন ধূলায় ধূলায়
তবু পাখী গায় আপন কুলায়,
তবু শ্যামলিমা অনুখণ দেয়
শোভায় নয়ন জুড়ায়ে।

যেখানে যা পাই আপনার মনে
রাখি সঞ্চয় করিয়া,
দু'হাত বাড়ায়ে যা ধরিতে চাই
ধূলা ওঠে মুঠি ভরিয়া।
দুঃখ কখন চুপি চুপি আসি
আমারে করিল ধূলা-ঘরবাসী,
এই ধূলাতেই গোপন রয়েছে,
লব সেই ধন কুড়ায়ে।

প্রদোষ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রত্যুষকালের আলোআঁধারি অবস্থাটিকে প্রকাশ করবার জন্তে 'প্রদোষ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তার জন্তে কেউ কেউ তাঁকে দোষ দিয়েছেন। এর জন্তে প্রদোষ শব্দটিই দায়ী, কারণ তার মধ্যেই দোষের প্রকর্ষ মজ্জাগত হ'য়ে র'য়ে গেছে। দোষদর্শীদের প্রধান অভিযোগ এই যে যে-অর্থে কবিগুরু প্রদোষ শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই অর্থ তাঁরা যে অভিধান দেখেছেন সেই অভিধানে পাওয়া যায় নি।

যদি মেনেই নেওয়া যায় যে 'প্রদোষ' শব্দটি যে অর্থে কবীন্দ্র প্রয়োগ করেছেন, তা অভিধানসম্মত হয়নি, তথাপি তার জন্তে তাঁকে অসম্মানজনক বাক্য বল্‌বার কোনো হেতু নেই। এ পর্য্যন্ত যত অভিধান রচিত হয়েছে তাতে প্রদোষ শব্দের যদি ঐ অর্থ না থাকে, তবে এর পরে যেসব বাংলা অভিধান রচিত হবে তাতে ঐ নব অর্থ নির্দ্দেশ করতে হবে। একএকজন শক্তিশালী লেখক একএকটি শব্দ নূতন অর্থে প্রয়োগ করেন, আর তাঁর পরবর্ত্তী আভিধানিকেরা সেই অর্থ নির্দ্দেশ করেন। এই রকম ক'রেই প্রত্যেক শব্দ বহু এবং সময়ে সময়ে বিরুদ্ধ অর্থ সঞ্চয় ক'রে নানার্থকবাচক হ'য়ে ওঠে। ইংরেজী নিউ অক্‌স্‌ফোর্ড ডিক্‌শনারী খুল্‌লেই দেখা যায় যে ইংরেজীর একএকটি শব্দ কোন্ সালে কা'র দ্বারা ব্যবহৃত হ'য়ে নব নব অর্থ পরিগ্রহ করেছে। শেক্‌স্‌পীয়ার কত শব্দ মনগড়া অর্থে প্রয়োগ ক'রে গেছেন, কিন্তু সেই অপপ্রয়োগের জন্য কেউ তাঁকে তো গালি দেয় না, বরং তাঁর ব্যবহৃত শব্দের জন্ম স্বতন্ত্র অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করতে হয়েছে, কারণ তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা—শক্তিশালী ব্যক্তি সাধারণের পথ থেকে যদি কিছু ব্যতিক্রম করেন তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

প্রদোষ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে দুটি অংশ আছে—একটি 'প্র' উপসর্গ, আর 'দোষ' শব্দ। দোষ শব্দের ধাতুগত অর্থ দূষণ অর্থাৎ বিকৃতি। প্রদোষ মানে প্রকৃষ্ট দোষ, তা থেকে অন্ধকার তম আনয়ন করে ব'লে সন্ধ্যা বা রাত্রির যেকোনো অংশের নাম হয় প্রদোষ—মাঘের শিশুপাল বধ কাব্যের ২য় সর্গের ৯৪ শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ লিখেছেন—প্রদোষো দুষ্ট-রাত্র্যংশাবিতি বৈজয়ন্তী—প্রদোষ মানে দুষ্ট এবং রাত্রির যেকোনো অংশ, বৈজয়ন্তী কোষের মতে। রঘুবংশের প্রথম সর্গের ৯২ শ্লোকে প্রদোষ শব্দের অর্থ মল্লিনাথ করেছেন 'রাত্রি'। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্কলিত অভিধানে প্রদোষ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—The word primarily means 'corrupt' or 'bad', 'a disordered condition.' তা থেকে এই দোষ শব্দ 'রাত্রি' অর্থ লাভ করেছে নিশ্চয় কোনো শক্তিশালী লেখকের রূপক প্রয়োগ থেকে। প্র উপসর্গটি সম্মুখের দিক্ নির্দ্দেশ করে। অতএব প্রদোষ শব্দের অর্থ করা যেতে পারে—যেসময়ের সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যেসময়—রাত্রির প্রবণতা যেদিকে। অতএব এতে ক'রে সন্ধ্যা বা প্রত্যুষ উভয় সময়ের আলোআঁধারি ভাবটিকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

পণ্ডিতপ্রবর Otto Bohtlingk ও Rudolph Roth কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য Sanskrit-Worter-buch নামক St. Petersburgh Dictionary প্রদোষ শব্দের নানা অর্থের মধ্যে একটি অর্থ দিয়েছেন—'নিশাবসান', এবং এই অর্থের সমর্থনের জন্ম প্রয়োগ নির্দ্দেশ করা হয়েছে যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ লেখক বরাহমিহির তাঁর বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে (৮৮।৭) এই শব্দ নিশাবসান অর্থে ব্যবহার করেছেন। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (৩।৪) প্রদোষ শব্দের অর্থ ধরা হয়েছে মধ্যরাত্রি—প্রদোষম্ অর্দ্ধরাত্রং চ।

পণ্ডিতপ্রবর মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ তাঁর অভিধানে একটি অর্থ দিয়েছেন—প্রক্রান্তা অতিক্রান্তা রাত্রির্‌ অত্রেতি। এখানে প্রক্রান্ত শব্দের অর্থ অতিক্রান্ত করাতে 'প্র' উপসর্গটির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, প্রক্রান্ত মানে আক্রান্ত ও অতিক্রান্ত দুই হ'তে পারে, অর্থাৎ প্র সম্মুখ ও অন্ত দুই দিকই নির্দ্দেশ করে।

স্মার্ত্ত নিবন্ধকার রঘুনন্দন তাঁর তিথিতত্ত্বে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করেছেন—

প্রদোষেঽধ্যয়নং ধীমান্‌ ন কুর্ব্বীত যথাক্রমম্‌।

এবং এখানে প্রদোষ শব্দ বল্‌লে কি বুঝ্‌তে হবে তার জন্যে তিনি নানা আভিধানিকের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন—প্রদোষ-শব্দোঽত্র প্রথমপ্রহরপর ইতি হোমাদ্রিঃ, রাত্রিপর ইতি নির্ণয়ামৃতকৃৎ।

বাচস্পত্য অভিধান ও বিশ্বকোষ তিথিতত্ত্বের এই বিবিধ অর্থ উদ্ধৃত ও সমর্থন করেছেন। তাঁরা লিখেছেন—তথা চ প্রদোষ-শব্দস্য রাত্রি-মাত্রং······চার্থঃ, কর্ম্মভেদে তস্য গ্রাহ্যতা। অর্থাৎ প্রদোষ শব্দে সমস্ত রাত্রির যে-কোনো অংশকে বুঝাতে পারে, বিষয় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার অর্থ নির্ণয় কর্‌তে হবে, ইংরেজীতে যাকে বলে with reference to the context.

এই-সব প্রাচীন প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দেখে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে প্রদোষ শব্দ সমস্ত রাত্রির যে-কোনো অংশ বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং তা 'নিশাবসান' 'রাত্রিপর' এবং 'অতিক্রান্তরাত্রি' অর্থে ব্যবহার কর্‌লে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় না। আর ভাষা সজীব হ'লে তাতে নব নব শব্দ ও পুরাতন শব্দের নব নব অর্থ সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতন ভাষা-ও-সাহিত্য-স্রষ্টার কোনো শব্দে নূতন অর্থ সংযোজনা কর্‌বার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৯

সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে দাদার খেয়াল বেড়ে চল্‌ল। এখন থেকে ঘুম একেবারে কমিয়ে ফেল্লে। বিছানায় শুলে আরাম হ'লে ঘুম বেশী হ'বে বলে কম্বলে শুতো, মশারি ফেলতোনা, শীতকালে লেপ গায়ে দিতো না। এই সময় দাদাকে চস্‌মা নিতে হোল। মাথার যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পেতো।

এইবারে পূজোর সময় আমরা দাদার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম। কে জান্‌ত তখন, দাদার সঙ্গে কাশী যাওয়া এই শেষ। দাদা বেড়াতে যেত একলা, আমরা বাবার সঙ্গে আগে বেড়াতে যেতাম। আমরা বেড়িয়ে ফেরবার সময় দেখতুম, দাদা কোন নির্জ্জন ঘাটে চুপ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছে, আমরা পাশ দিয়ে চলে গেলেও টের পেত না। সে-সময় দাদার ভিতর কেমন একটা অস্থির ভাব এসেছিল—কি যেন পেতে চায়—পাচ্ছেনা বলে সর্ব্বদাই বিমর্ষ হ'য়ে থাক্‌তো। প্রাণের মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল, প্রাণপণে সেটা চাপা দিয়ে রাখবার সে চেষ্টা করতো। মিনিট পাঁচ ছয় বেড়িয়ে দাদা আবার নিজের ঘরটীতে ফিরে আসতো। দাদার ঘর ছিল চারতলায়। আমরা তেতলায় থাকতুম। দাদা বেশী সময় নিজের ঘরে কাটাতো মাঝে মাঝে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতো, কখন বা ঝগড়া করতো। শুধু আমাদের সঙ্গে হ'লে যাহোক হয়। কিন্তু কোনদিন হয়তো বাবার সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে তর্ক

উঠ্‌তো। আর দাদা তর্ক পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতো, কিছুতেই থামতে চাইতো না। এ দিকে বাবার শরীর তখন খুব খারাপ একটু কথা বল্লেই অসুখ করতো। এই নিয়ে দাদাকে আমরা সবাই বকতুম "দাদা তোমার একটু হুঁস থাকে না, বাবার শরীর খারাপ তুমি একটু চুপ করে থাক্‌তে পার না।" দাদা বল্‌তো কি করবো আমি তর্ক করতে গেলে সব ভুলে যাই; তর্কের সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না।" বাবাকে বল্‌তো "বাবা আপ্‌নি কোন কথা বল্‌বেন না, কথা বল্‌লে আপনার শরীর খারাপ হয়, আমি খুব কথা বল্‌তে পারি আমার কিছু কষ্ট হয় না।" একদিন রাত্রে দাদা আর আমি ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। দিদি বলে দিয়েছিল দাদাকে বুঝিয়ে বল্‌তে, যা'তে দাদা যেন বাবার সঙ্গে কোন বিষয়ে তর্ক না করে। আমাদের বাড়ীতে সবাই জান্‌তো দাদা বোনেদের মধ্যে আমায় বেশী ভালবাসে, অনেক সময় আমার কথা দাদা শুন্‌তো। আমি দাদাকে বল্লাম "দাদা ভেবে দেখ তুমি, বাবার সঙ্গে তর্ক করা তোমার উচিত হয় না, বাবার যে রকম শরীর খারাপ হ'য়েছে, তাতে বাবা আর আমাদের কাছে বেশী দিন থাক্‌বেন না। বেশী কথা বল্লে বাবার কি রকম কষ্ট হয় তাতো তুমি জান, তুমি বাবাকে বেশী বকিও না।" দাদা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠ্‌ল "ওরে অমন কথা বলিস্‌ না, বাবা যদি চলে যান্‌, আমি তাহলে আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচবো না।" দাদাকে এরকম ভাবে কথা বল্‌তে কখনো শুনিনি, তবে জানতাম দাদার প্রাণ খুব কোমল একটু সামান্য আঘাত দিলে বড় বেশী বাজতো। আমরা সকলেই জানতুন দাদা বাবাকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু এতটা যে গভীর তা বুঝতে পারিনি। আমি আর কিছু বল্‌লাম না, দাদাও কথাটা বলে ফেলে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

একদিন দাদা বল্লে "প্রকৃতি, আমার ঘরে মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করিস্‌নারে, একা একা ভাল লাগে না।" আমরা দাদার ঘরে মাঝে মাঝে যেতাম, বেশী যেতাম না কেননা গল্প করলে দাদার পড়ার ক্ষতি হোত। দাদা বেশী গেলে যদি রাগ করে এ ভয়ও ছিল। দাদা যেতে বল্‌তে আমি বল্লুম "বেশ তো তুমি যদি রাগ না করো, আমি যাব।" সন্ধ্যের পর কি দুপুরে দুজনে খুব গল্প করতুম। বেশীর ভাগই দাদার কবিতা, প্রবন্ধ পড়া হোত মাঝে মাঝে সাহিত্যের সমালোচনাও হোত। দাদার মতের সঙ্গে আমার মতের খুব মিল ছিল। দাদা একটা খাতা খুলে বল্লে "টেনিসনের একটা কবিতার থেকে বল্‌ছি শোন্‌—

"Break, break, break,
On thy cold grey stones, O sea!
And I would that my tongue could utter
The thoughts that arise in me."

কেমন ভাল নয়?" আমি বল্লুম "হ্যাঁ ভাল লাগে কিন্তু তুমি Break, Break করছিলে আমার প্রাণ চমকে চমকে উঠ্‌ছিল।" দাদা বল্লে "আচ্ছা তোর কোন বাজনার শব্দ ভাল লাগে।" আমি বল্লুম "খুব মিঠে আওয়াজ ভাল লাগে আমার।" দাদা বল্লে আমি বাঁশী বাজানো শিখবো, আমায় অখিলবাবু শিখিয়ে দেবেন বলেছেন, বড় হ'য়ে এস্রাজ বাজাতে শিখ্‌বো, আমার কিন্তু সব চেয়ে ঢাকের শব্দ ভাল লাগে, ঢাকের শব্দ শুন্‌লে যেন প্রাণটা তালে তালে নাচ্‌তে থাকে, মনে হয় যুদ্ধে যাবার জন্য সকলকে ডাকছে।" আমি বল্লুম "তোমার সবই অদ্ভুত! আমার তো ঢাকের আওয়াজে বুকের ভেতর ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে।"

ঘরে ঢুকে দরজা, জান্‌লা খুলে দিতে একরাশ সাদা ফুলের মত জ্যোৎস্না মেজেয় ছড়িয়ে পড়ল। দাদা তিনটে ধূপ জ্বালিয়ে দিলে, ছোটবেলা থেকে ধূপের গন্ধ দাদার বড় প্রিয় ছিল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম— এম্‌নি কোজাগরীতে যদি বাংলার কোন পল্লীগ্রামে থাকতুম; তবে কি সুন্দর দৃশ্যই না দেখ্‌তে পেতুম। দাদা মেঝের ওপর সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ে বল্লে "গান গা।" আমি বল্লুম "আমি তো ভাল সুর জানি না দাদা।" দাদা বল্লে "তা হোক্‌গে তুই যা জানিস্‌ তাই বল্‌।" দুটো তিনটে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলুম, দাদা মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিল। তারপর খানিকটা কবিতা পড়া হোল। আমার মুখস্থ কবিতা থেকে গোটা-কতক বল্লুম। দাদা আবার বল্লে "'যতবার আলো জ্বালাতে চাই' ঐ গানটা বল্‌তো রে।" এই গানটা খুব দাদার মনের মত ছিল

২০

তুতিন দিন পরে একদিন রাত্রে ঘরে বসে দাদাতে আমাতে কথা হচ্ছিল। দাদা বল্লে "দেখ্ আমার মতে ছেলেদের ইণ্টারমিডিয়েট অবধি বাপের কাছে থেকে পড়বার খরচ নেওয়া উচিৎ তারপর নিজে পারে উপার্জ্জন করে পড়বে। তুই কাউকে এখন বলিস্ না আমি মনে করছি, মনে করছি কেন ঠিকই করিছে যে B. A পড়্বার সময় আমি টুইশানি করে পড়ার খরচ চালাবো।" আমি বল্লুম "দাদা তুমি এখন ওসবে যেওনা, তাহলে বাবা মনে বড় কষ্ট পাবেন, আর তা'ছাড়া তুমি কিসের জন্য টুইসানি করতে যাবে আমায় বল তোমার কি টাকার অভাব পড়েছে, টুইস্যানি করতে গেলে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে সে ভাবছোনা।" দাদা বল্লে "না পড়ার ক্ষতি হবে কেন?" আমায় চুপ করে থাকতে দেখে দাদা বল্লে "বেশ আমি বাবার কাছ থেকে টাকা নেবো, আর আমার যা হবে জমিয়ে বাবাকে দেবো।" আমি বল্লুম তোমার যা' খুসী তাই করো আমি কিছু জানিনা।"

কাশী ছাড়বার দিন ক্রমে এসে পড়্ল। কাশীর পোলের ওপর যখন গাড়ী উঠ্ল কি এক অব্যক্ত বেদনায় আমার চোখ জলে ভরে উঠ্ল; কে জানে হয়তো এই আমার শেষ আসা।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, আমি দাদার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে লাগলাম। একটু রাত হতে দাদা বল্লে "আমার ভারি ঘুম আস্ছে তুই আমার কাছে একটু বোস।" আমি বস্তে দাদা আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্ল। দাদা বেশ ঘুমিয়ে পড়ল, আমারো খুব ঘুম আস্ছিল, অনেকক্ষণ একভাবে বসে আমার ঘাড় ও পা কন্কন্ করছিল, কিন্তু একটুও নড়ে বস্তে পারছিলুম না, নাড়া পেলে দাদা যদি উঠে পড়ে, চুপ করেই বসে রইলাম। খানিক পরে এক ভদ্রলোক তাঁর একটী ছোট ছেলে নিয়ে উঠ্লেন, বস্তে জায়গা পাচ্ছিলেন না দেখে বাবা নিজের কাছে জায়গা করে দিলেন। ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তাঁর মেয়ের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনে আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। কিন্তু এ কিছু নতুন নয় বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে নারীর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। এইতো আমাদের বাড়ীতেই এর চেয়ে বেশী তুটো তিনটে হ'য়ে গেছে, কেউ জীবন হারালো কেউ জীবন্মৃত হ'য়ে রইল।

* * *

পূজোর পর থেকে দাদা কোথাও স্থির হতে পারছিলনা, তুদিন ডায়মণ্ডহারবারে তুদিন কলকাতায়, এই রকম ভাবে সময় কাটাতে লাগল। সামনে পরীক্ষা সেদিকে খেয়াল নেই। বাবা মার ইচ্ছে এইখানে থেকে পড়া তৈরি করে' পরীক্ষা দেয়। আর দাদার যে কি ইচ্ছা তা' দাদা নিজেই বুঝতে পারছিল না, কখন বলে 'হাঁ এখানে থাকবো', আবার একটু পরে বলে 'না কল্কাতায় থাক্বো।' একদিন সকালে কলকাতায় যাবে বলে সব গুছিয়ে স্যুটকেশ ঠিক করে এল, বল্লে 'একটার গাড়ীতে যাব'। একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলে 'না যাবনা', বই গুছিয়ে আবার টেবিলে ঠিক করে রাখ্ল। আবার খানিক পরে বল্লে 'না যাব।' আবার সব গুছিয়ে রাখলে। আমি বল্লাম "দাদা তোমার মাথায় কি কিছু ঢুকেছে। হয় থাক নয় যাও একটা যাহোক কিছু করো।" দাদা বল্লে "আমি কিছু ঠিক করতে পারছিনা, আয় দেখি তুজনে একটা পরামর্শ ঠিক করি।" দাদা বল্লে "আমরা এখন পরামর্শ ঠিক করবো তোমরা কেউ এসনা।" আমি দাদার কথা শুনে হাস্তে হাস্তে বল্লুম "এসব রাজনৈতিক ব্যাপার, আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা হবে।" দাদাকে বল্লাম "দেখ দাদা, এখানে থেকে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে যদি তোমার খারাপ হয় তবে তোমার বলবার মুখ থাকবে, কিন্তু কলকাতায় থেকে দিয়ে যদি খারাপ হয় তা হ'লে তোমার বল্বার পথ থাক্বেনা।" দাদা বল্লে "ঠিক বলেছিস্, এখানে থাকাই ঠিক কর্লাম।" মার কাছে গিয়ে বল্লে "মা সুমেরুও যদি নড়ে যায় তাহলেও আমি নড়ছিনা এখান থেকে।" ঘণ্টা খানেক পরে স্নান সেরে এসে বিষন্ন মুখে বল্লে "না মা আমি যাব এক্ষুণি।' আমি অবাক হয়ে বল্লাম "সেকি! এই তুমি বল্লে যাবেনা, তোমার কথার কিছু ঠিক্ নেই দেখ্ছি।" দাদা বল্লে "কি করবো বল্ আমি বেশ বুঝতে পারছি আমায় যেন কেউ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

দাদা চলে গেল, কিন্তু তার পরদিন ফিরে এল। দিন চার পাঁচ থেকে আবার কল্‌কাতায় চলে গেল। দাদা একবার এসে গল্প করতে করতে বল্লে "আমি একদিন বেড়িয়ে এসে নিজের ঘরে শুয়ে আছি, পাশের ঘরের ছেলে গুলো ভেবেছে আমি ঘরে নেই, আমার কথা আলোচনা করতে লেগেছিল। বল্‌ছিল 'এবারে একটা ভাল ছেলে নষ্ট হ'য়ে গেল, কিচ্ছু পড়েনা ওর যা হ'বে তা' জানাই আছে পাশ হয়তো হবে না।' আমি তাই শুনে সেদিন খুব পড়লুম, কিন্তু পরদিন আবার যে সেই।" দাদা যখন কল্‌কাতায় রোহিতাশ্বদা একদিন এসে বল্লে "অচুকে ভাল করে বলে দেবেন একটু যাতে পড়াশোনা ভাল কোরে করে। আমি এত দিন বলিনি, সারা সেকেণ্ড ইয়ার মোটে পড়েনি এখন পড়ছে না কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, দুপুরের মাথাফাটা রোদে, ছাতি না নিয়ে কেবল শুধু শুধু ঘুরে বেড়াবে, বৃষ্টিতেও অম্‌নি করে। একদিন দুপুরে আমি অচুর কাছে যেতে বল্লে 'চলুন বেড়িয়ে আসা যাক'। আমি বল্লুম 'এই রোদে কোথায় বেড়াতে যাবে, তার উপর তুমি এখন খাওনি" বল্লে 'তা' হোক এবেলা তো আর ভাত খাওয়া হবেনা, রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাবে।' খানিকদূর গিয়ে বল্লে 'চলুন হাওড়ায় যাই।' আমি বল্লুম 'বেশ তুমি যদি ট্রামে কি বাসে ওঠো তা'হলে যাব, না হ'লে যাওয়া হবেনা।' আমার কথা কিছুতেই শুন্‌লোনা, বল্লে আপনার যদি কষ্ট হয় আপনি ফিরে যান্ আমি একাই যাব। আমি ভাবলুম যদি সঙ্গে যাই তবে ওর খেয়ালের প্রশ্রয় দেওয়া হবে, না গেলে হয়তো ফিরে আসবে, আমি চলে এলুম খানিক বাদে ওদের মেসে গিয়ে দেখি স্নান করছে। আমায় দেখে রেগে উঠে বল্লে "আপনি এসেছেন কেন? আপনারা সব ভাল ছেলে, খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশলে খারাপ হ'য়ে যাবেন……" আমি বল্লুম "তুমি মোটে পড়া শোনা করোনা আমি বাবাকে লিখে দেবো" তাতে বল্লে 'আপনি লিখবেন কি আমিই লিখে দিচ্ছি যে এবার পরীক্ষা দেবোনা ঠিক করেছি।" আমরা সবাই চম্‌কে উঠলাম। মা বল্লেন "পরীক্ষা দেবেনা কিরকম, এসব ও কোথা থেকে শিখ্‌লে। তারপর রোহিতাশ্বদাকে বল্লেন "তুমি বাবা ওকে একটু বুঝিয়ে বলো ওসব খেয়াল যেন না করে।" রোহিতাশ্বদা বল্লে "হ্যাঁ আমি দুবেলা যাই, প্রায় দেখি চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছে; ভয়ানক খেয়ালী হয়ে উঠ্‌ছে, নানারকম অদ্ভুত খেয়ালের ঝোঁকে চল্‌বে, যত রাজ্যের খেয়ালি বই পড়বে, নাওয়া খাওয়ার নিয়ম নেই।" রোহিতাশ্বদা সব কথাই বল্লেন কিন্তু একটি কথা কেবল চেপে গেলেন বোধহয় আমরা ভয় পাব ভেবেছিলেন, পরে সে কথা বোল্‌বো।

দাদার পরীক্ষা আরম্ভ হোল, প্রত্যেকদিন পরীক্ষা দিয়েই বাবাকে চিঠি লিখে জানাতো কি রকম পরীক্ষা দিলে। ইংরাজি ও বাংলা ছাড়া কোন বিষয়ই ভাল করে দেয়নি, রোহিতাশ্বদা রোজ যেতো। তিনি বল্লেন "ও যে পরীক্ষা দিয়েছে এই যথেষ্ট, প্রত্যেক পেপারে তিন ঘণ্টা করে সময় দেয়, অচু দেড় ঘণ্টা থেকে চলে এসেছে।" দাদা নিজেও বল্লে "আমি পাশ করবার মত লিখে এসেছি। ফার্ষ্ট ডিভিসানে পাস্ করবো এইটুকু ভেবে রেখো এর বেশী কেউ আশা কোরনা।"

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ঘোষ

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

জার্ম্মানি ও ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ এবং জার্ম্মানির মধ্যে ধীরে ধীরে একটি মানসিক যোগসূত্র গড়িয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে Deutsche Akademieর ভারত পরিষদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আগামী বিশ্ববিদ্যালয়-ষাণ্মাসিকীতে এই পরিষদ ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিউনিক ও জার্ম্মানির অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা এই সকল বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বিশ্ববিখ্যাত প্রবাসী বাঙ্গালী লেখক শ্রীযুত তারকনাথ দাশ মহাশয়ও ইহাঁদের অন্যতম।

একাডেমির সেনেটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বর্ষের জন্য বিশ্বভারতীর স্থাপয়িতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সি-ভি-রমন একাডেমির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসর স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গৌরব ও আনন্দের কথা। এই প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বৎসর ধরিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন শীঘ্রই তাহার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণী ইংরাজীতে তাঁহারা বাহির করিবেন।

মিউনিকের আন্তর্জাতিক ছাত্রসঙ্ঘের সভাপতি ডক্টর বি-কে-ঘোষ সংবাদ পত্রে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩২এর গ্রীষ্মে জার্ম্মানিতে অন্ততঃপক্ষে একশত জন ভারতীয় ছাত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনস্থিত হাই কমিশনার মহাশয়, জার্ম্মানিতে প্রায় ৫০টি ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন ইহাঁর মতে তাহা ভ্রমাত্মক। ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের ন্যায় জার্ম্মানিতে জ্ঞানচর্চ্চা কেন্দ্রীভূত নহে বলিয়া হাই-কমিশনার মহাশয় এরূপ ভুল করিয়াছিলেন। গত গ্রীষ্মার্দ্ধে এক বার্লিনেই ৩৯ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং মিউনিকে ইহাঁদের সংখ্যা এই সময়ে ২৭ ছিল। গত গ্রীষ্মার্দ্ধে মিউনিক হইতে ৪ জন ভারতীয় ছাত্র, এখানকার সর্ব্বোচ্চ সম্মান ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করেন। ইহা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

চারি বৎসর পূর্ব্বে মিউনিকে মাত্র চারিজন ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। চাকরী অথবা—সখের সস্তা মোহে ভারতীয় ছাত্রদের জার্ম্মানিতে যাইবার সম্ভাবনা কম। তাহা ব্যতীত ভাষার অসুবিধাও আছে। কাজেই, জার্ম্মানিতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ইহাঁদের উচ্চবিদ্যানুরাগের পরিচায়ক। আমাদের মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদানের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে বিদেশে ভারতের মর্য্যাদা বাড়ান যাইতে পারে। আশা করা যায়, এইরূপে জার্ম্মানি এবং অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বর্ত্তমানের হীন ধারণা দূর হইবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে মৌলানা সৌকত আলিকে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেন দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্ন এসেম্ব্লিতে দুই দিন উত্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সহিত আইন-অমান্য-আন্দোলনের সম্পর্ক নাই এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা ও আলোচ্য সমস্যা একই প্রকারের, অথচ, সরকারের ব্যবস্থা দুইক্ষেত্রে দু'প্রকারের হইল কেন এরূপ প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হেগ বলেন,

অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে নৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারের সহিত ইহা সম্পর্কিত নহে এবং সরকার মহাত্মাজীকে সাধারণ রাজনীতিক আলোচনায় যোগ দিবার অনুমতি দিতে পারেন না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও যে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল—তাহা, শেষ পর্য্যন্ত স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যেজন্য মহাত্মাজী উপবাস করিয়াছিলেন এবং একটা অবস্থাসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে গভীর সামাজিক-হিত-বুদ্ধি এবং নীতির প্রেরণা থাকিলেও, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিক ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং হিন্দুমুসলমানের মিলন সমস্যার সহিত তাহার সাদৃশ্যও অবিসংবাদী। সেটি ছিল, হিন্দুদের মধ্যে যাহাতে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী না গড়িয়া উঠে তাহার চেষ্টা; এবং এটি হইতেছে, যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা।

তাহা হইলেও প্রথম ব্যাপারটি সম্বন্ধে সরকারের অপেক্ষাকৃত শিথিল মনোভাবের কারণ, এই বলিয়া অনুমিত হইতে পারে যে, সরকার জানিতেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপর অবিচার সম্বন্ধে একটা চেতনা জাগিয়াছে এবং ইহা দূর করিবার জন্য কিছুদিন হইতে হিন্দু-সমাজের ভিতর প্রবল চেষ্টা চলিতেছে; মহাত্মাজীও সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দাবীর সহিত সমান জোরে, অস্পৃশ্যতা সমূলে দূর করিবার কথা বলিতেছিলেন; কাজেই, সরকার হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন, এই ব্যাপারটির মীমাংসার সুযোগ দিলে ইহা প্রধানতঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিবে এবং মহাত্মাজীর শক্তি ও প্রভাব ইহাতেই নিযুক্ত হইবে, ও তাহার ফলে দেশের রাজনীতিক আন্দোলন কিছু হ্রাস পাইবে। সরকার এই প্রকার অনুমান করিয়া থাকিলে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই বলিতে হইবে; যদিও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায়, আমাদের রাজনীতিক লাভ কিছুমাত্র কম হইবে না।

সরকার আরও একটা বিষয় বোধ হয় বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ খুসী হইয়াছিলেন না; এবং এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ভাব জাগিতেছিল। অথচ, এতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা সরকারের বিশেষ অনুগত ছিলেন। কাজেই, সরকার হয়ত এই অবস্থাটা এড়াইবার জন্য কতকটা ইচ্ছুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মাজীর উপবাসে তাহার সুযোগ জুটিয়া গিয়াছিল।

বাস্তবিকপক্ষে দুইটি সমস্যা পৃথক কিনা

অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সহিত উন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মিলন এবং হিন্দু মুসলমানের মিলন যে একই প্রকারের এবং এই উভয় সমস্যার মধ্যে যে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে তাহা সুনিশ্চিত। আমাদের রাজনীতিক স্বার্থ, নৈতিক নির্ম্মলতা এবং সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্য এই উভয় সমস্যার সমাধান সমানই প্রয়োজনীয়। কিন্তু, এ দু'য়ের প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও রহিয়াছে এবং তাহা অবহেলা করিবার মত নয়।

উভয় শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার হইতেই তাহার উৎপত্তি। ইহাই বাড়িতে বাড়িতে রাজনীতিক্ষেত্রেও একটা সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে; রাজনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক এইটুকু মাত্র। আর মুসলমানের সহিত যে হিন্দুদের মিল নাই, সে কথা আমরা প্রথম বুঝিতে পারিলাম রাজনীতিক্ষেত্রে আঘাত খাইয়া। এই ক্ষেত্রে যাহাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়, ও আমরা একযোগে কাজ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রচেষ্টার মূলে মুখ্যভাবে রহিয়াছে। সামাজিক এবং নৈতিক প্রেরণা এখানে গৌণ।

হিন্দু ও মুসলমান এখনও দেশে দুইটি পৃথক সম্প্রদায়রূপে বাস করিতেছেন। যেখানে সাধারণ স্বার্থের জন্য একযোগে কাজ করা দরকার, সেখানে অসুবিধা হইলেও পরস্পরের সহিত কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকায়, একের সামাজিক ব্যবস্থা অপরকে স্পর্শ বা হীন করিতে পারে নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু সামাজিক হীনাবস্থার জন্য অনেক সুখ সুবিধা এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং

নিজের উপর বিশ্বাস ও পরের নিকট মর্য্যাদা হারাইয়াছেন; কাজেই ইঁহাদের কথা প্রধানতঃ সামাজিক ও নৈতিক, শুধু মাত্র ঘটনাক্রমে আংশিকভাবে রাজনীতিক হইয়া দাড়াইয়াছে। দুইটি প্রতিবাসী পরিবারের মধ্যে মিল না থাকা এবং নিজের পরিবারের মধ্যে কাহারও পূর্ণমর্য্যাদা ও অধিকার না থাকার মধ্যে যে পার্থক্য, আলোচ্য সমস্যা দুটির মধ্যে পার্থক্যও অনেকটা সেই প্রকারের।

জাপানে সংবাদপত্র

চার্চ্চ-মিশনারি সোসাইটির Rev. Murray Walton প্রচার কার্য্যোপলক্ষ্যে কিছুদিন জাপানে ছিলেন। জাপানী সংবাদপত্রকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার বড় বড় দৈনিকগুলি প্রতিদিনই নয়টি পর্য্যন্ত সংস্করণ বাহির করে। দুইটি জাতীয় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ এবং অন্য পাঁচ ছয়টি আড়াই লক্ষ লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। সংবাদ সংগ্রহের জন্য ইহাদের নিজেদের এরোপ্লেন আছে এবং ৩৬০ মাইল ব্যবধানযুক্ত ওসাকা ও টোকিওর মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত পায়রাও ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা সংবাদ দাতার কার্য্য করিয়া থাকেন এবং সহরের মধ্যে ছাত্রেরাই সাধারণতঃ সংবাদপত্র বিলি করিয়া থাকেন।

জাপানের অর্দ্ধেক সংখ্যক পরিবার একটি করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র গ্রহণ করে এবং দেশে দৈনিকের সংখ্যা তিনশতের উপর। আর ডাকবিভাগ মাত্র অর্দ্ধপয়সারও কম টিকিটে এগুলি গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির, তাহাদের উৎকর্ষ ও সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং গ্রাহক সংখ্যার কথা ভাবিলে, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় এবং আমরা যে আজও আধুনিক জগতের কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা মনে করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়।

সার এন-এন-সরকারের নিকট তার

বাংলার আইন সভার ২৫জন সদস্য সার এন-এন-সরকারের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, পুনাচুক্তি বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই করা হইয়াছে; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলায় অনুন্নত-সম্প্রদায় সমস্যা নাই, লোথিয়ান কমিটিও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; আম্বেদকার প্রভৃতির বাংলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, এখানে তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও প্রকার রাজনীতিক অসুবিধা ভোগ করেন না; পুণাচুক্তি বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তনের সূচনা করিবে এবং ইহা বাংলার হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে সমূলে বিনষ্ট করিবে; লোথিয়ান কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বাংলার সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছে বলিয়া পুণাচুক্তির সংশোধনের জন্য সাগ্রহে প্রার্থনা জানান যাইতেছে। ইহার নকল প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কেও পাঠান হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহার সব কথাই সত্য। নিখিল ভারতীয় সকল ব্যাপারেই বাঙ্গালীকে কোণ-ঠাসা করিবার চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশের লোকের এবং সরকারের আছে বলিয়া কোনও কোনও বাঙ্গালী সন্দেহ করেন; আবার—যোগ্যতার অভাবে বাঙ্গালী পিছাইয়া পড়িতেছে এমন ধারণাও অনেকের আছে, বাংলা কাউন্সিলেও একবার শেষোক্ত উত্তরটি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু, কারণ যাহাই হউক বাঙ্গালী যে সকল ব্যাপারেই কতটা পিছাইয়া পড়িয়াছেন তাহা গত কয়েক বৎসরের সরকারি বেসরকারি সর্ব্বপ্রকার সভাসমিতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। কাজেই, বাঙ্গালীর সম্মতি ব্যতীত অনেক ব্যাপারেই যে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা পুণাচুক্তির ব্যাপারেও সত্য হইয়াছে।

ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের ন্যায় বাংলায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা যে জটিল নহে তাহাও সত্য। সাইমন কমিশন নাকি শুনিয়াছিলেন যে, এখানে ডাকপিওনেরা অনেকস্থলে অস্পৃশ্যদের চিঠি বিলি করিতে চায় না। আমরা অবশ্য এমন কথা কখনও শুনি নাই। তবুও, বাংলায়ও যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিক্ষা এবং অর্থ থাকিলেও, তাঁহারা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ন্যায় সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন না; এবং রাজনৈতিক বাধা না

থাকিলেও, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভাব ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং ইঁহাদের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরিত না হইতে পারেন, এমন আশঙ্কা হয়ত ইঁহারা করিতে পারেন। তাহা হইলেও উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যপদ রক্ষিত রাখিয়া সম্মিলিত নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর ব্যবস্থা রাখিলেই চলিতে পারিত। আংশিকভাবে পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী যে সামাজিক অগ্রগতিকে কতকটা বাধা দিবে তাহা সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে সাইমন কমিশনের নিম্নোদ্ধৃত মতটি প্রণিধান যোগ্য।

"এরূপ ব্যবস্থাদ্বারা (পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী) অনুন্নত সম্প্রদায় এবং অন্য হিন্দুদের মধ্যের ব্যবধানকে চিরস্থায়ী করিতে আমরা ইচ্ছা করি না—আমাদের বিবেচনায় এই ব্যবস্থা পরিণামে অন্যদের সহিত ইহাদের রাজনৈতিক মিলনের পথে কঠিন এবং অভিনব বাধার সৃষ্টি করিবে। বিশেষ করিয়া যে সকল প্রদেশে ব্যবধান দূরীকরণের কার্য্য খুব অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন কোনও প্রকারেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সমর্থন করা যায় না।...... ইহাতে এই তালিকান্তর্গত প্রত্যেক ভোটদাতাকে (এই নাম দ্বারা) কলঙ্কিত করা হইবে এবং অনুন্নতদের সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির জন্য যে কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে ও যে কার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন আছে ইহা তাহার বিরুদ্ধে যাইবে।"

[ভাষান্তরিত। Report of the Indian Statutory Commission: Volume 2, Para 5, para 79]

এ সকল কথা সত্ত্বেও পুণাচুক্তির সর্ত্ত লইয়া কাহারও গোলমাল করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, উৎকট আকারে না থাকিলেও বাংলায়ও কিছু পরিমাণে অস্পৃশ্যতা ও তাহার আনুসঙ্গিক দোষ বিদ্যমান আছে। যে সকল স্থানে বাস্তবিকই হয়ত বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে এবং যে সকল স্থানের নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কতকগুলি লোকের মনে বিদ্রোহ এবং পৃথক হইবার কথা জাগিয়াছে—সেই সকল স্থান হইতেই এই স্বাতন্ত্র্য আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। যে সকল স্থানে অবিচার ও বৈষম্যের পরিমাণ অল্প এবং বাহিরের উত্তেজনা ব্যতীত হয়ত যে সকল স্থানে এই আন্দোলন কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না, সেই সকল স্থানের অসন্তুষ্ট লোকেরাও এই আন্দোলনের সমগ্র শক্তি, (যাহার মূল অন্যত্র) নিজেদের কাজে লাগাইতে পারিতেছেন। ইহাকে বাধা দিতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। বাহিরের লোক সম্পর্কে এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইলে, তাহাকে প্রাণপণে বাধা দেওয়াই হয়ত উচিত হইত। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে শান্তির প্রবর্ত্তকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, হিন্দু সমাজের দুইপক্ষ লুপ্ত হইয়া যাহাতে এক হইয়া যায়; কাজেই, কোনও পক্ষের লাভ লোকসানে বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। অবশ্য আসল ক্ষতি হইবে, ইহাদ্বারা সমাজে যে কৃত্রিম বিভাগের সৃষ্টি হইবে তাহার জন্য। কিন্তু, সমাজে সেই অন্তর্বিরোধ পূর্ব্বেই জাগিয়াছে, এবং এখন তাহাই প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের বিকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষতি-স্বীকার তাঁহাদেরই করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি একথাও তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের কার্য্য এবং মনোভাব পরিবর্ত্তনের উপরই হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এলাহাবাদের মিলন বৈঠক

বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-নীতির পরিবর্ত্তে সকলের সুবিধা ও সম্মতি অনুযায়ী মিশ্র-নির্ব্বাচন নীতি ও তাহার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার পরিপোষক শাসন-তন্ত্রের উদ্ভাবন করা যায় কিনা, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য, প্রধানতঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মৌলনা সৌকৎ আলির উদ্যোগে ও চেষ্টায়, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এলাহাবাদে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সম্মিলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটি ৩রা নভেম্বর কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৭ই রাত্রিতে তাহা শেষ করেন। এই কমিটির শেষ অধিবেশন মুলতুবী রহিয়াছে। কয়েকটি অমীমাংসিত বিষয় এই সময় আলোচিত হইবে এবং তৎপরে এই কমিটির রিপোর্ট সম্মিলন কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, সকল সম্প্রদায়ের বৃহত্তর সম্মিলনে ইহা আলোচনা ও গ্রহণের জন্য পেশ করা

হইবে। কমিটির অধিবেশনের প্রথম দিকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গও যোগ দিয়াছিলেন। কমিটির সর্ব্বসমেত ২৩টি বৈঠক হইয়াছিল এবং তাঁহারা ১৩৬ ঘণ্টা আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

যেরূপ দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সহিত নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ইঁহারা কাজ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই সম্মিলন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নীতি সরকার অথবা দেশের সর্ব্বজন গ্রহণ করুন বা না করুন, তাহার দ্বারা ইহার সাফল্যের বিচার করা যাইবে না। এখানে যে মনোভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, সকল দল এবং সকল মতের লোকই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে একটি মিলিত রাষ্ট্র পদ্ধতির উদ্ভাবনা সম্ভব হইয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ইহার মূল্য কম নহে।

বাংলার কথা

এলাহাবাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী বাংলায় মুসলমানেরা শতকরা ৫৬ (মোট ১২৭), হিন্দু ও অন্যেরা ৪৪.৭ (মোট ১১২) এবং ইউরোপীয়েরা মোট ৭, ভারতীয় খৃষ্টানেরা ২ এবং য়্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানেরা ২টি সদস্যপদ পাইবেন।

মিলন-বৈঠকের সূচনায় বাংলার হিন্দু নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য অধিক সংখ্যক পদ রক্ষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বগণতান্ত্রিক শাসননীতির বিরোধী এবং কার্য্যতঃ ইহা এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

নির্ব্বাচন নীতি

মিশ্র-নির্ব্বাচন নীতি স্বীকৃত হইলেও, কার্য্যতঃ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় দ্বৈতভাব রাখা হইয়াছে। যে সকল নির্ব্বাচনপ্রার্থী নিজ সম্প্রদায়ের অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভোট (নিজ সম্প্রদায়ের সমগ্র ভোট সংখ্যার) পাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি মিশ্রিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অধিকতম সংখ্যক ভোটের অধিকারী হইবেন তিনিই সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। যদি কেহই নিজ সম্প্রদায়ের শতকরা ৩০ ভোটের অধিকারী না হন, তাঁহা হইলে নিজ সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধিক সংখ্যক ভোটের অধিকারী দুইজন প্রার্থীর মধ্যে যিনি সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নিকট হইতে সবচেয়ে বেশী ভোট পাইবেন, তিনিই নির্ব্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রথমতঃ এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল; আদৌ ইহা কার্য্যোপযোগী কিনা সন্দেহ। তাহার পর নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ইহাতে বিশেষ কিছু কমিবে না; বরং পুণা চুক্তিতে যে প্রকার প্রাথমিক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে তাহা ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। সেখানে সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলী চারিজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ইঁহাদের এতখানি স্বাধীনতা থাকিবে না। কারণ, প্রতিটি পদের জন্য চারিজন প্রার্থীর শতকরা ৩০ ভোট পাওয়া সম্ভব নহে; তাহার কম প্রার্থী এই যোগ্যতা লাভ করিলে, সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইল। যদি একজন মাত্র এই যোগ্যতা লাভ করেন (অনেক ক্ষেত্রে তাহাই করিবেন) তবে, তাঁহার উপর সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কিছুমাত্র হাত থাকিবে না। আর যদি কেহই এই যোগ্যতা লাভ না করেন, তাহা হইলে মাত্র দুইজনের মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার সাধারণের রহিল। শুনা যায়, সংযুক্ত নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর দাবী স্বীকৃত হইবে, এই আশায় বিধিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক সংখ্যাধিক্যে হিন্দুরা মত দিয়াছিলেন। বাংলাকে বিশেষ কেহ পুছে না বলিয়া, তাঁহাদের কথা সহজে উপেক্ষিত হইতে পারিয়াছে।

মিলন বৈঠকের মুলতুবী অধিবেশন

এলাহাবাদ ঐক্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটি ১২ই ডিসেম্বর ১১টার সময় মিলিত হইবেন। তার পরদিন বিকালে সম্মিলনের বৈঠক বসিবে। আর তার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর বৃহত্তর সর্ব্বদলের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের ৪০ চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান ইহাতে যোগদিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি আছে।

নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত, পাঞ্জাবের ৮টি, বম্বের ৫টি, এবং অন্যান্য প্রদেশের অনেক দল ইহার মধ্যে আছেন। কিন্তু বাংলার মাত্র ২টি দল, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন আহূত হইয়াছেন! সমগ্র ভারতের মুসলমানদের কথা ধরিলে, তাঁহাদেরও ৭টি দল নিমন্ত্রিত হইয়াছেন দেখা গেল। অথচ বাংলার সমস্যা সবচেয়ে জটিল এবং বাংলার লোকসংখ্যা বম্বে এবং পাঞ্জাবের মিলিত লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। বাংলার হিন্দুরা সম্মিলনের সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে আপত্তি করিতেছেন, ইঁহাদের সংখ্যাও বম্বে ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের মিলিত সংখ্যার চেয়ে সামান্যই কম। হাঙ্গামা এড়াইয়া সম্মিলনের কাজ সহজ করিবার জন্যই এরূপ করা হয় নাই ত ?

কলিকাতায় শিখ সম্মিলন

পাঞ্জাবের বাহিরে যাহাতে শিখদিগের স্বার্থ কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়, 'সেজন্য শিখ-অধিকার' বৈঠকে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, আসাম, বম্বে, সিন্ধু এবং ব্রহ্মদেশের আইনসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানে শিখদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়াছেন। ঐক্য সম্মিলনেও বাংলার আইন সভায় তাঁহারা সদস্যপদের দাবী করিয়াছিলেন। আগামী সর্ব্বদল-সম্মিলনে তাঁহাদের দাবী স্বীকৃত না হইলে শিখ নেতাগণ যাহাতে মীমাংসায় তাঁহাদের শেষ সম্মতি দান না করেন সেজন্য খালসা-দরবার অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। সমস্ত সংখ্যা-ন্যূন সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু, শিখদিগের রাজনীতিক দাবীর অনেকগুলি তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে একটু অধিক বলিয়া মনে হয়। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ইঁহাদের সংখ্যা মাত্র ২,৩৬০.০০০ (১৯২১) অর্থাৎ ২৫ লক্ষেরও কম। বাংলায় ইঁহাদের সংখ্যা মাত্র ২,০০০ দুই হাজার। ইঁহারা পাঞ্জাবের বাহিরের শিখদের স্বার্থরক্ষার কথা বলিতেছেন, অথচ পাঞ্জাবের বাহিরে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ইঁহাদের সংখ্যা মাত্র ৬৬০০০ (ছয়ষট্টি হাজার)।

এলাহাবাদ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দিল্লীর মুসলমান বৈঠক

নিখিল ভারত মুস্‌লীম কন্‌ফারেন্সের কার্য্যকরী সমিতি, মুসলীম-লীগের কার্য্যকরী সমিতি এবং কাণপুরের জমীয়াৎ-উল-উলেমা, দিল্লীতে এক মিলিত বৈঠকে, এলাহাবাদ সিদ্ধান্ত মুসলমানদিগের স্বার্থ-বিরোধী বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কোনও বিশিষ্ট হিন্দুনেতা এলাহাবাদ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মুসলমানেরা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইয়াছেন, এবং হিন্দুরা জাতীয় ঐক্যের জন্য ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। মুসলমানদের মধ্যে একটি দল বলিতেছেন, তাঁহাদের স্বার্থ ইহাতে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং তাঁহারা ইহা মানিয়া লইবেন না। এখন, ব্যাপার কি দাঁড়াইতে পারে দেখা যা'ক।

মিলন ও ঐক্যের জন্য হিন্দুদের আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যুক্ত-নির্ব্বাচনের কথা তাঁহাদের সকল দলের সকল মতের ছোট বড় নেতা ও প্রতিষ্ঠান বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন। এলাহাবাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও তাঁহাদের যে বিশেষ কোনও আপত্তির কারণ আছে এমন কথা প্রকাশ পায় নাই, অবশ্য এক বাংলা ব্যতীত (বাংলার আপত্তিও যে গ্রাহ্য করা হইবে না, লক্ষণ দেখিয়া তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতেছে)। অন্যদিকে মুসলমানদের একটা বড় দল ইহাতে রাজী হইতেছেন না; তাঁহারা বা শিখেরা সম্মত না হইলে মীমাংসায় পৌছান যাইবে না। কাজেই, হিন্দুদের আরও ত্যাগ করিতে বলা হইবে এবং হিন্দুরা যদি তাহাতে সম্মত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য মিলনপ্রয়াস ব্যর্থ হইল, এরূপ কথা উঠিবার আশঙ্কা থাকিবে।

ব্রহ্মদেশ ও ভারত সাম্রাজ্য

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত থাকিবে অথবা পৃথক হইবে, তাহা লইয়া অনেক দিন হইতে বিতণ্ডা চলিতেছে। এবারে এই বিষয়টিকে ভিত্তি করিয়া দুই দল নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে

নামিয়াছিলেন। ইহার ফলে দেখা গিয়াছে, বিচ্ছেদ-প্রয়াসী দলের শক্তি অধিক নহে। এই নির্ব্বাচনে বিচ্ছেদ-বিরোধী-দল জয়লাভ করায় ভারতবর্ষের উপর ব্রহ্মদেশের যে আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উভয় দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। ব্রহ্ম কাউন্সিলেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে; মনোনীত সভ্যগণ যাহাতে এই ব্যাপারে যোগদান না করেন, সেজন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। এই ব্যাপারটিকে কেহ কেহ এইজন্য নিতান্ত অন্যায় মনে করিতেছেন যে, যেখানে দেশবাসীর মনোভাব জানা দরকার, সেখানে যাঁহারা সরকারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন মাত্র, তাঁহাদিগকে যোগদান করিতে দিয়া আসল ব্যাপারটিকে কতকটা অস্পষ্ট করিয়া ফেলা হইবে। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গুরুবায়ুর মন্দির ও মহাত্মাজীর অনশন

১লা জানুয়ারীর মধ্যে যদি গুরুবায়ুর মন্দিরে 'হরিজন'দের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ২রা জানুয়ারী হইতে মহাত্মাজী অনশন আরম্ভ করিবেন। অবশ্য যদি মন্দিরগামী অধিকাংশ লোকের আপত্তি থাকে অথবা ২রা জানুয়ারীর মধ্যে সমাধান হইতে পারে না, এমন কোনও আইনগত অসুবিধা থাকে, তাহা হইলে তিনি অনশন স্থগিত রাখিবেন।

শ্রীযুত কেলাপ্পন এবং তাঁহার সহযোগীরা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দিরটির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতেছিলেন এবং মহাত্মাজীর অনশনের সময় তিনিও প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সংকল্পের কথা পূর্ব্বে জ্ঞাপন না করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করেন বলিয়া মহাত্মাজী তাঁহাকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তিনিও তদনুসারে অনশন স্থগিত রাখেন ও ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাঁহার অভিলাষানুযায়ী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ২রা হইতে উপবাস আরম্ভ করিবেন, তাহাও জানাইয়া রাখেন। কেলাপ্পনের যদি উপবাস করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে তবে, নৈতিক দায়িত্বের জন্য মহাত্মাজীকেও ঐ সময় হইতে উপবাস করিতে হইবে, মহাত্মাজী এরূপ সংকল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কালিকাটের রাজার (জামোরীণ) উপর এই বৃহৎ ব্যাপারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত তাঁহার মত বা ব্যবহার অনুকূল বলিয়া জানা যায় নাই।

সংকল্পিত সত্যাগ্রহ শুধুমাত্র এই বিশেষ মন্দিরটিকে দোষমুক্ত করিবার জন্য। কাজেই, সাধারণভাবে মন্দির-সত্যাগ্রহ উচিত কিনা, সে প্রশ্ন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে না। অবশ্য ইহার পরোক্ষ প্রভাব সারা ভারতবর্ষের সকল মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষই অনুভব করিবেন।

বহু সনাতনীও নাকি পাল্টা উপবাস আরম্ভ করিবেন। যদি করেন, তাহা হইলে প্রাচীন-পন্থী এবং পরিবর্ত্তন প্রয়াসীদের মধ্যে একটা শক্তি পরীক্ষা হইয়া যাইবে। যে পক্ষে অধিকতর সত্যনিষ্ঠা দৃঢ়তা ও দুঃখভোগের ক্ষমতা থাকিবে তাঁহারাই জয় লাভ করিবেন। ইহাও একপ্রকার যুদ্ধ।

পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের জন্য লোকে পূর্ব্বেও যুদ্ধ করিয়াছে এখনও করে। তাহাতে বহু ধন সম্পত্তি ও প্রাণ-নাশ হয়; নির্দ্দোষ ও নিরপেক্ষ লোকেরাও পরিত্রাণ পান না। কিন্তু, এই যুদ্ধে নিজের দুঃখবরণের দ্বারাই সত্য এবং জয় লাভ করিতে হয়। নিরুপদ্রব ও অহিংস প্রকৃতিই ইহার বিশেষত্ব।

অবশ্য এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। মহাত্মাজীর প্রাণের ন্যায় অমূল্য প্রাণ যদি এই প্রকারে লওয়া হয়, তাহা হইলে জগতের নিকট এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকট আমাদের লজ্জা ও গ্লানির আর অন্ত থাকিবে না। ভারতবর্ষের সমস্ত বিশিষ্ট লোক এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জামরিণকে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের মুখরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আশা করা যায় এই সকল চেষ্টা, আবেদন এবং মহাত্মাজীর প্রভাব কথনই ব্যর্থ হইবে না।

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক

লণ্ডনে ক্ষুদ্রতর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দিয়াছিলেন এবং তাবার প্রতিনিধিরূপে মহাত্মাজী সেখানে উপস্থিত

ছিলেন, কাজেই দেশবাসীর মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। এবারকার বৈঠক ভারতবর্ষে তেমন আশা বা আগ্রহের সঞ্চার করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মনোভাব যথার্থরূপে এবং যথাযথরূপে বিবৃত করিবেন, এমন কোনও প্রতিনিধি এবার বৈঠকে যোগ দেন নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু বিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সহিত ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও তাহাদের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ

এ সম্বন্ধে গত মাসের বিচিত্রায় যে মন্তব্য করা হইয়াছিল, তাহাতে 'জনৈক ভারতীয় খৃষ্টান' এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা এবং খৃষ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। মন্তব্যগুলি ধীরভাবে পড়িলে পত্রলেখক দেখিতে পাইবেন, কতকগুলি লোকের একটি বিশেষ কার্য্যকে নিন্দা করা হইয়াছে মাত্র, খৃষ্ট বা খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করা হয় নাই। খৃষ্টের প্রতি 'দেশের কথা'র লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা আছে।

[উল্লিখিত পত্রে লেখকের নাম বা ঠিকানা কিছুই না থাকার দরুণ পত্রের বহুবিধ ভাষাগত দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াও উহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না—বিঃ সঃ।]

সুশীলকুমার বসু

পুস্তক পরিচয়

বাংলার সমস্যা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রণীত। "প্রবাসী" কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১৫৮ : মূল্য আট আনা মাত্র।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান বাংলার নানা রকমের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সে সম্বন্ধে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া তিনি নিজের দেশের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সব দিকেই যে পরিবর্ত্তন ঘটান দরকার সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। তিনি নিজে চাকুরী হইতে অবসর লইয়া কাজে নামিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে নারীদের মধ্যে এবং নারীদের দ্বারা দেশোন্নতির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি একটি "জননী-প্রতিষ্ঠানের" প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রন্থকারের সুচিন্তিত পুস্তকখানি অনেকেরই মনে অনুরূপ চিন্তার উদ্রেক করিবে। গ্রন্থকারের দুই একটা ভবিষ্যদ্বাণীতে সকলে সায় দিতে নাও পারেন; যথা, তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ২৪) এখন প্রায় সকল দেশেই চীনা মাটির বাসনেরই ব্যবহার—ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও ধাতুর বাসন উঠিয়া যাইবে।

শ্রীরমেশ বসু

চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, ও অধ্যাপক শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৭৫; মূল্য ‖৵০।

স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরে"র নানা দিক আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাত্র-সম্প্রদায়ের কাজে লাগিবে। ভাষা দুই এক জায়গায় একটু সেকেলে হইয়াছে, যথা (পৃঃ ৩০) "মসীবর্ণ ক্ষেপণ করা হইয়াছে।" গ্রন্থকারেরা শ-দ্বারা মুশলমান লিখিয়াছেন। দুএক জায়গায় ছাপার ভুল আছে, যথা—পৃঃ ৬ "১৮৫৪

(?৮) খৃষ্টাব্দে…কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন… ।”

শ্রীরমেশ বসু

বাংলার প্রাণ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নলিনীবাবুর বিভিন্ন সময়ের লেখা প্রবাসী, বিচিত্রা, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত নয়টী আর পরিশিষ্টের নূতন প্রবন্ধ একটি মোট দশটী অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকরূপে প্রকাশিত দেখে আমরা আনন্দিত হলেম। নানান পত্রিকায় ছড়ানো এই সুচিন্তিত রচনাগুলি পুস্তকাকারে শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হওয়ায় বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নিপুণ বিশ্লেষণ আর নব্য বাংলার সমাজ ও সাহিত্য গঠনে রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র প্রমুখ যুগ প্রবর্ত্তক মনীষীগণের প্রভাব বিষয়ে নলিনীবাবুর নিবিষ্ট-গবেষণার সম্যক পরিচয় বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই লাভ করতে পারবেন। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) মূল্য ২৲

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে এই বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিন বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই ভ্রমণ কাহিনী পাঠকদের চিত্তাকর্ষক হয়েছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন—বইখানা দেখে সুখী হয়েছি। দেশের হাওয়া ফিরেছে—এরকম বইয়ের আদর হবে। সেই আদর হয়েছে দেখে—আমরা সুখী হলেম।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

“নীললোহিত”—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো। দাম এক টাকা।

প্রথম তিনটি গল্পের নায়কের নামে বইয়ের নাম। প্রমথবাবুর এই নীললোহিত এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। কেউ কিছু শক্ত কাজ করেছে, কেউ কোথাও বুদ্ধি বা সাহসের পরিচয় দিয়েছে শুনলেই নীললোহিত বল্লে বসত সেও তা করেছে, শুধু তাই নয়, তার চেয়ে বেশী করেছে। কারণ, বুদ্ধিই বল, আর বীরত্বই বল, আর প্রেমই বল, নীললোহিতের যে তাতে সহজ অধিকার! যে-ঘটনা, যে-অভিজ্ঞতার কথাই অন্যে তুলুক না কেন, নীললোহিতের কাছে তা পুরোনো; অন্যের কাছে যা অসাধারণ, নীললোহিতের তা নিতান্ত পরিচিত। সুতরাং অন্যের চিন্তা বা অভিজ্ঞতা, বা অন্যের বর্ণিত ঘটনা নীললোহিতের গল্পের হত খেই। একবার তাকে এই খেই ধরিয়ে দিলেই হল, তারপর আর সকলের চুপ ক'রে শোনার পালা। একান্ত অনায়াসে নীললোহিতের কল্পনা এক অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে আরেক অদ্ভুত ঘটনা যোজনা ক'রে সম্পূর্ণ একটি গল্প গেঁথে তবে ক্ষান্ত হত। কোথায় সুরু করতে হয় আর কোথায় সারা, এটা জানা যদি গল্পের আর্ট হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে নীললোহিত ছোট গল্পে একজন পাকা আর্টিষ্ট।

নীললোহিতের গল্পে দেখি বাস্তবের সঙ্গে কল্পলোকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কি স্থানের কি মানুষের বর্ণনায় নীললোহিতের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাই যথেষ্ট। নানারকম মানুষ সে দেখেছে, আর নানা দেশ। লোকের মুখের কথা যেমন সে শুনেছে হরেক রকমের, তাদের গলার গানও যে তেমনি শুনেছে সব চালের, তা দেখি রামসিংদের গীতপর্ব্বের বর্ণনায়। নীললোহিত যা জানে তা ভাল করেই জানে, ভাসা ভাসা ভাবে নয়। অথচ তার প্রকৃতি হচ্ছে মূলতঃ romantic, এবং সে বাস করে প্রধানতঃ কল্পনারই জগতে। সত্যমিথ্যার প্রচলিত ব্যবধানের অস্তিত্বই নেই নীললোহিতের কাছে। অন্যের পক্ষে যা মিথ্যা, নীললোহিতের মুখে তা হয়ে ওঠে “কল্পলোকের সত্য কথা।”

এই অদ্ভুত চরিত্রের original প্রমথবাবু জীবনে কোথাও দেখেছেন কিনা জানিনা। তবে আপন মনের মধ্যে আমরা অনেকেই এর সাক্ষাৎ কি পাইনি? যা আমরা হইনি, কিন্তু হলেও-হতে-পারতাম, নীললোহিত যেন তাই। নীললোহিতের গল্পে আমাদের জীবনের “might have been” অংশটা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

বইয়ের অন্য গল্পের মধ্যে তিনটী আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে; “ঝাঁপান খেলা”, “সহযাত্রী,” ও “দিদিমার

গল্প"। গল্পগুলির ঘটনা ও চরিত্র দুই-ই অসাধারণ। এ বইয়ের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। যা নিতান্ত সাধারণ, যে জীবন যাত্রা একেবারে গতানুগতিক, প্রমথবাবু তার ছবি এ বইয়ে আঁকেন নি। নিত্য পথেঘাটে যাদের দেখা যায় বলেই যারা চোখে পড়েনা, তাদের কথা এতে নেই। সহজে যাদের দেখতে পাইনা, অথচ একবার দেখলে যাদের আর ভোলবার জো নেই এ গল্পগুলির নায়ক তারাই। লেখক কয়েকটি আঁচড়ে তাদের একেবারে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। শিকারী সাধু সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর, "কালোপাথরের Apollo" নির্ভীক বীরবল, কিম্বা "মূর্ত্তিমান পাপ" ভৈরব নারায়ণ, এদের ভয় বা শ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে পারি, ভুলতে পারি না। সত্যিকারের চেনা মানুষের মত এরা মনে এমন দাগ কেটেছে যা মুছ্‌বে না।

গল্পলেখক প্রমথবাবুকে আমরা অনেকদিন দেখতে পাইনি। "চার ইয়ারী কথার" লেখক, "আহুতির" লেখক যে শুধু প্রবন্ধ লেখক নন সেকথা হয়ত কেউ কেউ ভুলতে বসেছিল। এ বই আমাদের নুতন করে মনে করিয়ে দিল প্রবন্ধকার হিসাবেই যে লেখক অসাধারণ তা নন, গল্পেও তাঁর প্রতিভা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করেছে। শ্রেষ্ঠ গল্পের সকল লক্ষণই এ বইয়ের অধিকাংশ গল্পে আছে। প্রথম থেকেই আমাদের কৌতূহল আকৃষ্ট হয়, শেষ পর্য্যন্ত তা শিথিল হয় না। দুচার টানে চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠে, বর্ণিত ঘটনা হয়ে ওঠে বাস্তব। বলার ভঙ্গী অনবদ্য। আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অথচ সুন্দর ভাষা তরতর করে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, কোথাও গতি মুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ বা আড়ষ্ট হতে পায় নি। লেখায় বুদ্ধির খেলা যথেষ্ট, বিদগ্ধ মনের ছাপ পাতায় পাতায়। কিন্তু কল্পনার খেলা দেখিয়ে বা অলঙ্কারের বৈচিত্র্য দিয়ে গল্পকে কোথাও আচ্ছন্ন করা হয়নি। গল্পকে গল্প হিসাবেই যখন আমরা উপভোগ করতে চাই, তখন গল্পের বদলে লিরিক পেলে বা প্রবন্ধ পেলে বিশেষ খুসি হয়ে উঠিনা। কিন্তু এই নিছক গল্প লিখতে যে সংযম, বর্ণনীয় বস্তুর যে নির্ভুল নির্ব্বাচন, যে right objectivity প্রয়োজন, তা নিতান্তই দুর্লভ। প্রমথবাবুর কয়েকটি গল্পে এই দুর্লভ সংযম ও objectivity আমাদের মুগ্ধ করেছে, এবং প্রমাণ করেছে যে তিনি ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের সমশ্রেণীর।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

নৈশ-জ্যোৎস্না—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, প্রণীত। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত। প্রকাশক—শ্রীবরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি,এ—পূরবী সাহিত্যমন্দির, খড়দহ। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। মূল্য আট আনা।

"নৈশ-জ্যোৎস্না" তেইশটি সনেটের সমষ্টি। শ্রদ্ধেয় ভূমিকাকার যথার্থই বলিয়াছেন "ভাল সনেট লেখা যে কোনও কবির পক্ষে কঠোর সাধনার ফল। ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতি না থাকিলে সে সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না।" কবির এই পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল তিনি সে সাধনায় যেরূপ আন্তরিক আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে কালে সিদ্ধিলাভ করিলেও করিতে পারেন। কবি জানেন যে প্রেম অবিনশ্বর। হয়ত ইহজগতে তাঁহার প্রেম সফল না হইলেও হইতে পারে—কারণ পার্থিব ব্যবধান দুইটি মিলনোৎসুক আত্মাকে জোর করিয়া পৃথক করিয়া দিবে, তবুও তাঁহার আশা আছে একদিন ইহা সার্থক হইবেই,

"তুমি যাবে অস্ত-তীরে, আমি উদয়েতে,—
দেখা হ'বে কাল-চক্র-পথে, যেতে, যেতে।"

—প্রেম অবিনশ্বর। তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। জগতের আর যাহা কিছু আছে, তাহাতে সুখ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শান্তি পাওয়া যাইতে পারে না। একমাত্র প্রেমেই তাহার প্রাপ্তির সম্ভব। কিন্তু একথা তিনি আগে বুঝিতে পারেন নাই,—পার্থিব জিনিষের সহিত প্রেমের দাম কষিতে গিয়া কাচ ভ্রমে হীরা হারাইয়াছিলেন। তিনি আজ জানিয়াছেন—

—"অযাচিত অধরের উচ্ছ্বসিত সুধা,—
অনাদরে ঠেলেছিনু—সেই অভিশাপে
আজিও নিখিল পেয়ে মেটেনিক' ক্ষুধা!"

—এইরূপ কোন কোন কবিতা বেশ মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীমহিমাঞ্জন ভট্টাচার্য্য

রসায়ন—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক—সিংহ প্রিন্টিং এাণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত রামেন্দু বাবুর "ভুলের ফুল" গল্প-পুস্তক পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছিলাম। আলোচ্য পুস্তকে সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির মধ্যে শেষের দুইটি গল্প—"৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯" এবং "লেডিজ্ রিষ্ট-ওয়াচ্" —আমাদের ভালো লাগিয়াছে। "বাঘনাচ" গল্পটি ঠিক গল্প হয় নাই, বিবরণের মত হইয়া গিয়াছে। ইহার ভূমিকাটি ছোট অক্ষরে দিয়া অথ্যান-ভাগ একটু ঘুরাইয়া সাজাইলেই এটিও ভালো গল্প হইত। বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নানা কথা

প্রফুল্ল জয়ন্তী

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, কলিকাতার টাউন হলে দেশবরেণ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাননীয় শ্রীনীলরতন সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রফুল্ল জয়ন্তী সমিতির অভিনন্দন পঠিত হওয়ার পর বাঙলা দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্রাদি পাঠ এবং উপঢৌকনাদি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক অভিনন্দনের ভাষায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ব্যক্ত হয়েছিল।

বিশ্ববিজ্ঞান মন্দিরের কৃতী সাধক, ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, বাঙলা দেশের একান্ত হিতৈষী বন্ধু, দুঃখী-দরিদ্র-বিপন্নের চিরজাগ্রত সহায়, ত্যাগী প্রফুল্লচন্দ্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে বাঙলা দেশ গৌরবান্বিত হয়েচে। আমরা নীচে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ অভিভাষণটি মুদ্রিত করলাম।

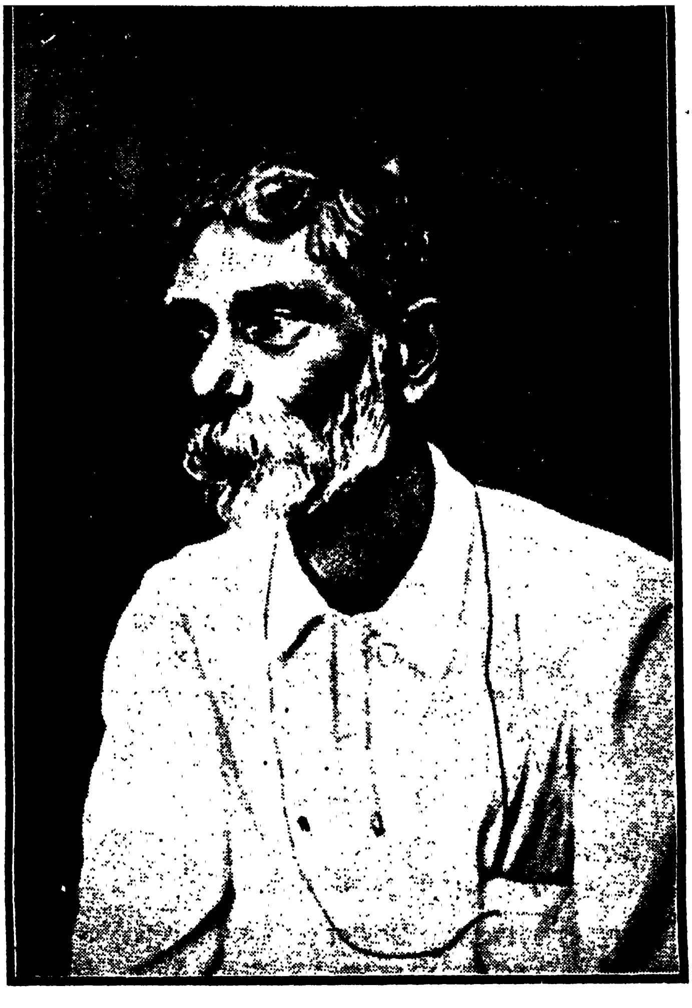
রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেচেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বল্‌লেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েচেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেচেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যা-বিতানে মুকুলিত হয়েছিল; আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দলবিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হোলো। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেচেন, সে তাঁর কণ্ঠমালায় ভূষণরূপে নিত্য হয়ে রইল। ভারতের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বিগত ২৩শে নভেম্বর ১৯৩২ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বাবু সত্যেন্দ্রনাথ রায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল।



৺সত্যেন্দ্রনাথ রায়

সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অম্বিকাচরণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট্ স্বর্গীয় অনারেব্‌ল্ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ছিলেন। প্রথমে তিনি সাউথ্ সুবার্চ্চন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ লাভ করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বৎসরই সত্যেন্দ্রনাথ ২৪ পরগণার দক্ষিণ মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। বহুদিন তিনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বেহালা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বেহালা চতুষ্পাঠী, বেহালা বালিকা বিদ্যালয়, সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল কমিটি, ও বেহালা দাতব্য ঔষধালয় কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং আলিপুর সদর লোকাল বোর্ডের সভ্য ছিলেন। কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের তিনি অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ভট্টপল্লীর বিশিষ্ট পণ্ডিত সমাজ তাঁকে সেজন্য "বিদ্যাসিন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই জনহিতকামী ব্যক্তির মৃত্যুতে চব্বিশ পরগণার বেহালা অঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

আমরা সত্যেন্দ্রনাথের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

এই সম্পর্কে প্রাপ্ত সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের চিঠিখানি হইতে সারাংশ আমাদের পাঠক-পাঠিকার গোচর করা গেল। আমরা এই সম্মেলনের সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য কামনা করি।

আপনারা পূর্ব্বেই অবগত আছেন যে আগামী বড়দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন স্থানীয় এঙ্গলো বেঙ্গলী ইণ্টার মিডিয়েট কলেজে হইবে। অধিবেশনের দিন ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ ইংরাজী ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর স্থির করা হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাহিত্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন।

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সাহিত্যশাখায়, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর দর্শনশাখায়, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় ইতিহাস শাখায়, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী শিল্পশাখায় এবং অধ্যাপক ডাক্তার হরপ্রসাদ চৌধুরী বিজ্ঞান শাখায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি প্রতিনিধিদিগের আহার ও বাসস্থানের যথাসম্ভব বন্দোবস্ত স্থানীয় এঙ্গলো বেঙ্গলী ইণ্টার মিডিয়েট কলেজে করিবে। মহিলা প্রতিনিধিদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতিনিধিদিগের দেয় চাঁদা (১৬ হইতে ২০ বৎসরের ছাত্রদিগের জন্য ৩্ তিনটাকা ও অন্য সকলের জন্য ৫্ পাঁচ টাকা) অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীনন্দিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট (৫নং কোটাপার্চ্চা এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধাদি ৫ই পৌষ ইং ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট (১৫৮ নং কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

অধিবেশনের সময় একটি শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে পত্রাদি শিল্প সামগ্রী অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট (অতুলকুটির লুকারগঞ্জ এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

সভায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক প্রতিনিধিবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইবেন।

গ্রন্থকার-মণ্ডলী

সম্প্রতি কলিকাতায় জন-কয়েক সাহিত্যিক মিলে,—এক গ্রন্থকার মণ্ডলী স্থাপন করেছেন,—উদ্দেশ্য সস্তায় বই ছাপিয়ে সস্তায় প্রচার করা। এই নূতন উদ্যম সফলতা লাভ করলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা। গ্রন্থকার মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদেরই কথায় তাঁদের ব্যবস্থাটা আমাদের পাঠক পাঠিকার গোচর করা গেল।

সম্প্রতি আমরা একটি গ্রন্থকার-মণ্ডলী স্থাপিত করেছি; তার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে ও যথাসম্ভব কম দাম করে' আমাদের নিজেদের বই প্রকাশ করা। অনেকের কাছে অভিযোগ শুনেছি যে আমাদের বইয়ের খুব বেশি দাম বলে'

তাঁরা কিনতে পারেন না। সব সময় সাধারণ লাইব্রেরী থেকে নিয়ে বা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করে' বই পড়া সম্ভব হয় না—এবং আমাদের দেশের এই বই ধার দেয়া ও নেয়ার অভ্যেস যত শিগ্‌গির দূর হয়, ততই মঙ্গল। তা ছাড়া. অনেকে বই কিন্‌তে চান, রাখ্‌তে চান; এবং যেহেতু আর্থিক সচ্ছলতা রসজ্ঞতার কোনো মান নয়, সকল শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে', পরিমিত আয়ের পাঠকের মধ্যে যা'তে আমাদের লেখার বিস্তৃত প্রচার হয়, সেইজন্য আমাদের এই উদ্যোগ।

প্রথমত, এই গ্রন্থকার-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি নতুন কবিতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি। তা'দের নাম যথাক্রমে 'আমরা' ও 'একটি কথা'। কবিতাগুলি যত্ন সহকারে নির্ব্বাচিত হয়েছে; উভয় কবির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা আমরা দিচ্ছি। প্রতি পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোলো, কাগজে বাঁধাই, দাম চার আনা। ক্রিসমাসের ছুটীর আগেই এ-দুটি প্রকাশিত হ'বে; এবং জানুয়ারি মাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিতকুমার দত্তেরও অনুরূপ কাব্যপুস্তিকা বেরোবে। প্রতি পুস্তিকার পাঁচ শো কপি ছাপা হবে—এবং **এই পুস্তিকাগুলির আর পুনর্মুদ্রণ হবে না।** পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠালে ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় একটি পুস্তিকা পাঠানো হবে। একসঙ্গে চার কপি নিলে এক টাকা মণি-অর্ডার কর্‌লেই চল্‌বে; ডাকমাশুল লাগ্‌বে না। এত কম দামের বই বলে' ভি-পি করে' না পাঠানোই ভালো। অর্ডার দেবার ঠিকানা এম্, সি সরকার এণ্ড্ সন্স্, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, কি বুদ্ধদেব বসু, ৪৭।১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। যাঁরা আমাদের লেখা ভালোবাসেন, তাঁরা আশা করি আমাদের এই উদ্যোগে প্রচুরভাবে সহযোগিতা করবেন।

(স্বাক্ষরিত) প্রেমেন্দ্র মিত্র
অজিতকুমার দত্ত
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু

"সাধারণ মেয়ে"

গত অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় ৬৩৭ পৃষ্ঠায় "সাধারণ মেয়ে" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটিতে পূর্ব্ব ঘটিত কোনো প্রসঙ্গের ইঙ্গিত থাকা হেতু তার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হ'য়ে বিচিত্রার পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। গত কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ে নামে কবিতাটি পাঠ করলে বিচিত্রার কবিতাটি বুঝতে অসুবিধা হবে না।



Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.